উচ্চ মাধ্যমিক

বাংলা দ্বিতীয় পত্র

জ্যোতিভূষণ চাকী
রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

পুথিঘর

পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ-কর্তৃক নির্ধারিত নূতন পাঠ্যক্রম অনুসারে লিখিত

উচ্চ মাধ্যমিক
বাংলা দ্বিতীয় পত্র

[একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণী]

[নব প্রবর্তিত পাঠ্যক্রম অনুসারে রচিত]

জ্যোতিভূষণ চাকী, বি. এ. (অনার্স), কাব্যতীর্থ
বাংলা ও সংস্কৃতের শিক্ষক, বালিগঞ্জ জগবন্ধু ইনষ্টিটিউশন, কলিকাতা ;
প্রাক্তন শিক্ষক, মডার্ন স্কুল, পার্ক সার্কাস, কলিকাতা

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী, এম. এ., ডিপ্. লিব্.
অধ্যাপক, আনন্দমোহন কলেজ, কলিকাতা ;
প্রাক্তন অধ্যাপক, মৃণালিনী দত্ত মহাবিদ্যাপীঠ, বিরাটী

পুথিপত্র
১ এ্যান্টনি বাগান লেন, কলিকাতা ৭০০ ০০৯
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩

প্রকাশক এ, সাহা
পুথিপত্র। ৯ এ্যাণ্টনি বাগান লেন। কলিকাতা-৭০০ ০০৯

পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ষষ্ঠ সংস্করণ, জুলাই, ১৯৮৫

মুদ্রাকর
এস, সাহা। ক্যালকাটা প্রিণ্টার্স। ৯ এ্যাণ্টনি বাগান লেন। কলিকাতা ৭০০ ০০৯
ও
বি, রায়। রায় প্রিণ্টার্স। ৯ এ্যাণ্টনি বাগান লেন। কলিকাতা ৭০০ ০০৯

[সরকারী আনুকূল্যে প্রাপ্ত স্বল্পমূল্যের কাগজে মুদ্রিত]

মূল্য : চল্লিশ টাকা

নূতন সংস্করণের ভূমিকা

পরিবর্তিত পাঠক্রম অনুসারে এই সংস্করণটি সম্পূর্ণ পরিমার্জিত এবং পরিবর্ধিত। যাতে ছাত্রছাত্রীদের বিষয়বোধের সঙ্গে সাহিত্যচেতনা উদ্দীপিত হয় বইটির সংরচন (composition) অংশ সেইভাবে পরিকল্পিত। প্রবন্ধের শেষে চিন্তাসহায়ক বাণী-সংযোজন নিঃসন্দেহে এই বইটির উপযোগিতা বৃদ্ধি করবে। এই-সব সুভাষিত যে তারা রচনাংশে সরাসরি ব্যবহার করবে এমন নয়, এগুলোর তাৎপর্য তারা নিজের ক'রে নেবে, তারপর শুধু প্রবন্ধে নয় যে-কোনো সংরচনে তা প্রয়োগ করবে এবং অনুরূপ চিন্তায় অনুপ্রাণিত হবে। সংলাপ, পত্র ও ভাষণাদি সম্বন্ধেও অনুরূপ সুভাষিত সন্নিবেশ এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পত্র ও ভাষাণদি যোজনা ছাত্রছাত্রীদের রচনাদর্শের সহায়ক হবে।

ব্যাকরণাংশে শুধু পরিবর্তিত পাঠক্রমই আমরা অনুসরণ করেছি। পাঠ্যাতিরিক্ত সন্ধি সমাসাদি প্রকরণ যোজনা অনাবশ্যক বিবেচনায় বর্জন করেছি। আলোচিত বিষয়গুলিতে প্রচুর উদাহরণ ও অনুশীলনী সংযোজিত হওয়ায় তা ছাত্রছাত্রীদের ভাষাচর্যায় বিশেষ সহায়ক হবে বলে মনে করি। প্রবাদ-প্রবচন অংশে প্রবাদের উৎস ও তুলনীয় প্রবাদের উল্লেখ করায় এবং অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্য থেকে উদাহরণ দেওয়ায় বিষয়টির প্রতি ছাত্রছাত্রীদের আগ্রহ বাড়বে বলে মনে হয়। সাহিত্যের ইতিহাস ও ছোটোগল্পের আলোচনায় সম্ভাব্য সমস্ত জিজ্ঞাসারই উত্তর মিলবে আশা করি। এ ক্ষেত্রেও সাহিত্য-বোধের উদ্দীপনাই আমাদের ঈপ্সিত।

এই গ্রন্থরচনায় আমাদের নানাভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীরামকৃষ্ণ চক্রবর্তী, শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র রায়চৌধুরী, শ্রীবিশ্বপতি চাকী ও শ্রীঅমিত দে। এঁদের আমরা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। মুদ্রণ ও ব্যবস্থাপনা বিভাগের কর্মিবন্ধুদের কাছেও আমরা কৃতজ্ঞ। সম্পাদনায় বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন শ্রীস্বদেশ ঘোষ ও শ্রীসমরেন্দ্র সাহা।

সংস্করণের মধ্যে দিয়েই গ্রন্থের ত্রুটিহীনতা ও উৎকর্ষের দিকে যাত্রা। এই যাত্রায় সহযোগী শিক্ষকবন্ধুদের পরামর্শ আমাদের পরম পাথেয়।

জ্যোতিভূষণ চাকী
রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

পাঠক্রম

বাংলা 'ক' ভাষা

পূর্ণ সংখ্যা—২০০

প্রথম পত্র

গদ্য—৩৬ ; কবিতা—৩৬ ; নাটক—১৮ = ৯০

দ্বিতীয় পত্র

প্রবন্ধ রচনা—১৫ (শব্দ সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকবে অনধিক ৬০০)

ব্যাকরণ —২০

ভাবসম্প্রসারণ, ভাবার্থ, সংক্ষিপ্তসার

গল্পলেখা, পত্ররচনা, সংলাপ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা (যে কোন একটি)—১২

সাহিত্যের ইতিহাস—২৫

সহায়ক পাঠ —১৮

৯০

দ্বিতীয় পত্র

১। **প্রবন্ধ রচনা**

২। **ভাবসম্প্রসারণ, ভাবার্থ, সংক্ষিপ্তসার—**
গল্পলেখা, পত্ররচনা, সংলাপ,
তাৎক্ষণিক বক্তৃতা (যে কোন একটি)।

৩। **সাহিত্যের ইতিহাস**

আদি ও মধ্য যুগ :

(১) বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব ; বাংলা সাহিত্যের গোড়া পত্তন এবং যুগ বিভাগ (২) বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ—চর্যাপদ ; সমাজচিত্র ও সাহিত্যসম্পদ।

মধ্যযুগ

(১) তুর্কীবিজয় ও তার ফলশ্রুতি—সামাজিক অবস্থা ; (২) বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী (বিঃ দ্রঃ-চণ্ডীদাস সমস্যার বিষয়ে আলোচনার প্রয়োজন নেই।) ; (৩) (ক) কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ (খ) মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় (সংক্ষিপ্ত পরিচয়) ; (৪) মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ এবং মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজ জীবন ; (৫) মনসামঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী ও প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা (বিজয়গুপ্ত, নারায়ণ দেব এবং কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ) ; (৬) সাহিত্যে ও সমাজ জীবনে চৈতন্যদেব (৭) চণ্ডীমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত

কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা (দ্বিজমাধব ও মুকুন্দরাম); (৮) চৈতন্য-জীবনী সাহিত্যের প্রধান কবি ও কাব্যের পরিচয় (চৈতন্য ভাগবত, চৈতন্যমঙ্গল, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত); (৯) বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাসের পদাবলী; (১০) ধর্মমঙ্গলের সংক্ষিপ্ত কাহিনী এবং প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা—রূপরাম চক্রবর্তী (সংক্ষিপ্ত পরিচয়), প্রধানত ঘনরাম চক্রবর্তী; (১১) কাশীরাম দাসের মহাভারত, সংক্ষেপে কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দীর পরিচয়; (১২) আরাকান রাজসভার প্রধান কবিসহ কাব্যালোচনা; দৌলতকাজী ও সৈয়দ আলাওল; (১৩) ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল; (১৪) সামাজিক পটভূমিতে শাক্তপদাবলী (রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত) এবং বাউল (লালন ফকির)।

৪। **সহায়ক পাঠ**

(ক) শাস্তি—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; (খ) মহেশ—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়; (গ) বিরিঞ্চি বাবা—রাজশেখর বসু (পরশুরাম); (ঘ) পাশফেল—মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

৫। **ব্যাকরণ**

১। সাধু ও চলিত রীতি।

২। শব্দের অর্থ পরিবর্তন [অর্থবিস্তার, বর্ণবিপর্যয়, নাসিক্যীভবন, অর্থসংকোচ, অর্থের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ, অর্থের রূপান্তর]

৩। ধ্বনিতত্ত্ব [সমীভবন, স্বরসঙ্গতি, স্বরভক্তি, অপিনিহিতি, অভিশ্রুতি]

৪। বাক্য পরিবর্তন [বাক্য সংকোচন, বাক্য সম্প্রসারণ, সরল জটিল যৌগিক বাক্য—একটি থেকে অন্যটিতে পরিবর্তন। বাক্যের অন্তর্গত প্রকারভেদ এবং একটি থেকে অন্যটিতে পরিবর্তন (অস্ত্যর্থক, নঞর্থক, প্রশ্নাত্মক, অনুজ্ঞাবাচক, প্রার্থনাসূচক, কার্যকারণাত্মক, সন্দেহদ্যোতক) প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ উক্তির পরিবর্তন।

৫। বাচ্য পরিবর্তন [কর্তৃবাচ্য, কর্মবাচ্য, ভাববাচ্য—একটি অন্যটিতে পরিবর্তন]

৬। ছেদ ও যতি চিহ্নের ব্যবহার

৭। প্রবাদ প্রবচন (৫০টি)

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

ভাবসম্প্রসারণ

ভাবার্থ

সারসংক্ষেপ

বিষয় পৃষ্ঠা

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

সহায়ক পাঠ

ব্যাকরণ

বিষয় পৃষ্ঠা

———

প্রবন্ধ

প্রবন্ধ কথাটি নানা অর্থ বহন করেও শেষ পর্যন্ত যে 'রচনা' অর্থে প্রযুক্ত হয়েছে তার কারণ হয়তো কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যেই নিহিত। 'প্রবন্ধ' মানে প্রকৃষ্ট বন্ধ অর্থাৎ অবিচ্ছেদ। এ অবিচ্ছেদ কিসের? ভাবের। অর্থাৎ ভাবপরম্পরা-যুক্ত যে বিশেষ রচনা তাই হল প্রবন্ধ। প্রবন্ধবাচক 'রচনা'-কথাটিও যোগরূঢ়, কারণ কথাটি ব্যাখ্যা, ভাবার্থলিখন ইত্যাদি সবরকম লেখাকে না বুঝিয়ে বিশেষ একধরনের লেখাকেই বোঝায়—যার ইংরেজি প্রতিশব্দ essay। Essay কথাটির মানে প্রচেষ্টা বা প্রয়াস, তার থেকে—প্রকাশপ্রচেষ্টা। ফরাসী essayer মানে চেষ্টা করা।

প্রথম essay (মূল ফরাসীতে essai) লেখেন ফরাসী লেখক Michel de Montaigne. তিনি তাহাকে 'essai' বললেন, কারণ 'he was attempting to explore some subject that interested him'. লেখকেরা কোনো বিষয়কে অবলম্বন করে তাঁদের চিন্তাকে প্রকাশ করতে সচেষ্ট হবেন। এই প্রয়াসই হল essay।

এবারে প্রবন্ধরচনার স্বীকৃত রীতিগুলো নিয়ে একটু আলোচনা করা যাক।

এতক্ষণ ব্যুৎপত্তিগত যে-আলোচনা হল তার মধ্যেই কিন্তু এই রীতিগুলোর কিছুটা ইঙ্গিত বা আভাস আছে।

প্রথমেই বিষয়টাকে একটু পরখ করে দেখতে হবে। সেটা কী এবং কী নয় তা ভালো করে বুঝে না নিলে মুশকিল।

তারপর সেই-বিষয় সম্বন্ধে তথ্য, উদাহরণ বা উদ্ধৃতি যা যেমন মনে আসবে চট্‌পট্ সূত্রাকারে লিখে রাখতে হবে।

এর পরের কাজ সেগুলোর গুরুত্ব যাচাই করা। যেটা অপ্রয়োজনীয় বা অবান্তর মনে হবে তা তৎক্ষণাৎ বাদ দিতে হবে।

এবারে যেসব চিন্তাসূত্রগুলো থাকল সেগুলোকে যার পর যেটা থাকা যুক্তিসম্মত সেইভাবে সাজাতে হবে।

এতক্ষণ শুধু কাঠামোটুকুই তৈরি হল। এইবারে তা থেকে প্রতিমা গড়তে হবে। চিন্তাসূত্রগুলোকে ভাষার আধারে রূপ দিতে হবে।

রচনার সবচেয়ে বড়ো গুণ প্রসাদগুণ; অর্থাৎ প্রাঞ্জলতা। চিন্তার মধ্যে যদি জট না থাকে ভাষাতেও থাকবে না। ভাষা হবে সহজ সরল। কিন্তু সেই সারল্যের সঙ্গে যুক্ত হবে শ্রী। 'শ্রিয়া দেয়ম্'। যা দেবে তা শ্রীমণ্ডিতভাবেই দেবে। তবে সারল্যই হোক বা শ্রী-ই হোক, রচনার কোনো মূল্যই হবে না যদি তাতে 'সংবিৎ' অর্থাৎ চেতনা বা চিন্তন না থাকে। তাই 'শ্রিয়া দেয়ম্' শুধু নয়, 'সংবিদা দেয়ম্।'

চিন্তার দারিদ্র্য থাকলে কোনো অলঙ্করণেই তা লুকিয়ে রাখা যায় না। তাই রচনা যেন চিন্তাসমৃদ্ধ হয় এবং অন্যের চিন্তাকে উদ্বুদ্ধ করে।

এই চিন্তাসমৃদ্ধির জন্যে চাই অধ্যয়ন, অনুচিন্তন এবং সর্বত্র সজাগ দৃষ্টি। পাঠ শুধু পুঁথির পাতা থেকে নিলেই চলবে না, নিতে হবে পুঁথির বাইরের বিরাট জগৎ থেকে। অভিজ্ঞতা থেকে বক্তা যদি কিছু বলেন তার দাম পুঁথিপ'ড়োর বক্তব্যের চেয়ে বড়ো হবেই। তাই যে-বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে হবে, তোমার পাঠ্যের গণ্ডি বা অভিজ্ঞতার জগৎ থেকে তার মালমসলা জোগাড় করে নিতে হবে। অনেকসময় জানা জিনিসও আমাদের মনে পড়ে না; লেখবার পর মনে হয়, এটা দিলে ভালো হত, সেটা দিলে ভালো হত। লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে পারলে দেখবে উপকরণ যেন সাজানোই আছে। অবশ্য অনেক অনুশীলনেই কাজটা সহজ মনে হবে।

একটি উপকরণ বা অলঙ্করণ হিসেবে উদ্ধৃতির কথা তোলা যেতে পারে। উদ্ধৃতিটি যদি রচনার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী হয়ে যায় ভালোই, আর যদি তা নয়, উদ্ধৃতির লোভ ত্যাগ করতে হবে। বহুব্যবহৃত উদ্ধৃতি বর্জন করাই ভালো, কারণ তা মনের উপর কোনো রেখাপাত করে না।

সাধু বা চলিত দুটোর যে-কোনো একটিকে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নিতে পার। তবে মিশ্রণ সর্বদা এড়িয়ে চলতে হবে।

রচনায় ভূমিকা এবং উপসংহারটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ভূমিকায় পাঠককে বিষয়টির প্রতি উন্মুখ করে তুলতে হবে, আর উপসংহারে দিতে হবে পূর্ণ পরিতৃপ্তি।

এবারে নিয়মগুলোকে সূত্রাকারে লিখে ফেলা যাক:

- কোনো প্রদত্ত বিষয় সম্বন্ধে চিন্তার সূত্রগুলোকে (points) লেখ।
- এবারে এই সূত্রগুলোকে এমনভাবে পর পর সাজাও যাতে পাঠক একটা ভাব থেকে সম্পর্কিত আর-একটি ভাবে স্বচ্ছন্দে পৌঁছতে পারেন।
- এরপর এক-একটি সূত্র বা চিন্তার স্ফুলিঙ্গগুলোকে এক-একটি অনুচ্ছেদে বিস্তারিত কর। বক্তব্যকে অনুচ্ছেদে ভাগ করাটা প্রবন্ধরচনার ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
- মূল বিষয়ে অবতারণের আগে বিষয় সম্বন্ধে পাঠককে উন্মুখ করে তুলতে হবে ভূমিকায়। আর এই ভূমিকার প্রথম বাক্যটি খুবই আকর্ষক হওয়া চাই।
- মূল বক্তব্যের পর উপসংহারটিও মনোজ্ঞ হওয়া চাই। পাঠক যেন অনুভব করেন লেখকের সঙ্গে যে-ভাব-যাত্রায় তিনি সহযাত্রী হয়েছিলেন সেই যাত্রাটি সার্থক হল।
- প্রবন্ধ-রচনা একটি বিশিষ্ট সাহিত্যকর্ম, তাই ভাবসৌষ্ঠব যাতে আগাগোড়া বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য থাকা দরকার।
- শুদ্ধ বা চলিত যে-কোনো ভাষাতেই প্রবন্ধ-রচনা করতে পার, কিন্তু এই দুই ভাষার মিশ্রণ সর্বদা বর্জনীয়।

- বক্তব্যকে সমর্থিত বা সরস করবে এমন উদ্ধৃতি অবশ্যই ব্যবহার করা যাবে, কিন্তু রচনাটিতে বেশি উদ্ধৃতি যেন না থাকে।
- সবচেয়ে বড়ো কথা তোমার নিজস্ব মনের ছাপ যেন রচনায় থাকে।

রচনার শ্রেণীভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রচনাকে নানাভাগে ভাগ করা যেতে পারে। তবে বিষয়-বস্তুর দিক থেকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে আমরা প্রবন্ধকে ভাগ করে থাকি :

১। চিন্তামূলক বা ভাবমূলক, ২। তথ্যমূলক এবং ৩। বর্ণনামূলক।

চিন্তা বা ভাবমূলক প্রবন্ধে লেখকের উপলব্ধিই প্রধান, অবশ্য এই উপলব্ধির সমর্থনে তথ্য আসতেই পারে। স্বদেশপ্রেম, শ্রমের মূল্য, স্বাবলম্বন প্রভৃতি বিষয় এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

নাম থেকেই বোঝা যায় দ্বিতীয় শ্রেণীটিতে তথ্যই বড়ো কথা। তবে প্রবন্ধ তো তথ্যের পুঞ্জমাত্র হলে চলবে না, তার মধ্যে ভাব বা উপলব্ধি তো নিশ্চয় থাকবে। পাতাল রেল, মহাকাশে প্রথম মানুষ, কলকাতার উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয় এই শ্রেণীতে পড়বে। জীবনী ও আত্মকথামূলক প্রবন্ধকেও অংশত এই শ্রেণীতে ফেলা যেতে পারে।

বর্ণনামূলক প্রবন্ধে ঘটনা, বিষয়, অভিজ্ঞতা ইত্যাদির বর্ণনাই হবে প্রধান, তবে এখানেও তথ্যনির্ভরতা এবং ঘটনার তাৎপর্য উপলব্ধি অবশ্যই প্রয়োজনীয়। একটি চিত্তাকর্ষক ফুটবল ম্যাচ, একটি ঝড়ের রাত, একটি প্রদর্শনী ইত্যাদি বিষয় এই শ্রেণীর।

দেখা যাচ্ছে তিনটি শ্রেণীর মধ্যে পারস্পরিকতা আছে, একটি আর-একটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেই। শ্রেণী যা-ই হোক লেখক নিজের মনন ও প্রকাশভঙ্গীতে তাকে উপভোগ্য করে তোলেন, তাঁর নিজের লেখাকে সকলের করে তোলেন। এই সর্বসাধারণী কৃতি হল সাহিত্যের লক্ষ্য।

তুমি পরীক্ষার হলে বিশেষ প্রশ্নপত্র থেকে বিষয় নির্বাচন করে প্রবন্ধ লিখছ বটে, কিন্তু মনে রাখবে তখন তুমি নিছক পরীক্ষার্থী নও, তুমি লেখক, তুমি শুধু বিশেষ একজন পরীক্ষকের জন্যে লিখছ না, তুমি সকলের জন্যে লিখছ। সকলেই তোমার চিন্তার 'সহিত' অর্থাৎ সঙ্গী। ঐ 'সহিত' শব্দ থেকেই 'সাহিত্য' শব্দের সৃষ্টি।

দেশপ্রেম

[সূচনা—স্বরূপ—স্বদেশপ্রেম ও মানবিকতা—দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতা—যথার্থ দেশপ্রেম—উপসংহার]

সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে,
সার্থক জনম, মাগো তোমায় ভালবেসে।

সূচনা

—স্বদেশপ্রেম বোধ হয় মানুষের সহজাত। স্বদেশের নামে উদ্বেলিত হয় না এমন মৃত-হৃদয় কারো নেই।

স্বরূপ

তবে এই গাছ, মাটি, ফুল-ফলই তো স্বদেশ নয়, স্বদেশের প্রতীক—নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের পরিচিত চিহ্ন। আমার স্বদেশ আমার দেশবাসী মানুষ। তাই বাঙলার মাটি বাঙলার জলের সঙ্গে স্বাভাবিক ভাবেই আসে, বাঙালীর ঘরে যত ভাইবোনের ঐক্যকামনা। দেশের মানুষ—তার রীতি-নীতি, আচার-আচরণ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এই সব মিলিয়েই আমার দেশ। এই 'আমার দেশ' উচ্চারণের সময়ের যে সর্বাঙ্গীণ আশ্চর্য অনুভূতি, এটিই মাটির মানুষের বুকের স্বর্গ। কিন্তু 'স্বদেশপ্রেম' শুধুমাত্র দেহসীমায় বদ্ধ কোনো অনুভূতি মাত্র নয়, তা দেশবাসীর কল্যাণের ব্রত এবং কল্যাণের পরিপন্থী শক্তির বিরুদ্ধে অকুতোভয় সংগ্রামের নির্ভীক মন্ত্র।

তাই স্বদেশের গৌরবের জন্যে কৃত যে-কোনো কাজই স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ। ঘরের সামনের কাঁটাগাছ উৎপাটন থেকে দেশের সামগ্রিক জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের প্রচেষ্টা—সবটাই স্বদেশপ্রেমের অঙ্গ। মহত্ত্বে, মর্যাদায় তা প্রণম্য।

স্বদেশপ্রেম ও মানবিকতা

মানুষের চিরন্তন গতি থেকে বৃহত্তর জগদভিমুখী, তাই পরার্থপরতা তার ধর্ম, আত্মত্যাগ তার ব্রত। তাই যথার্থ স্বদেশপ্রেম কখনই কোনো নির্দিষ্ট ভৌগোলিক সীমায় বদ্ধ থাকে না, কারণ স্বদেশপ্রেম তো প্রকৃত অর্থে মানবপ্রেম, যার বিস্তারসীমা বিশ্বজগৎ। অনেক সময় উগ্র দেশপ্রেম সঙ্কীর্ণতার নামান্তর। তার জয়ধ্বনি গীত হয় বিদেশের ঠাকুরের থেকে স্বদেশের কুকুরের মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠায়। তার ভয়ঙ্কর প্রকাশ আমরা দেখেছি হিটলারের জার্মানীতে, মুসোলিনীর ইতালীতে। তারা অমানবিক নিষ্ঠুরতায় বিদেশের মূল্যে স্বদেশের তথাকথিত মঙ্গলসাধনের স্বপ্ন দেখেন। ইতিহাসে তাঁরা চিহ্নিত হন, স্বদেশপ্রেমিক হিসেবে নয় মানবতাবিরোধী হিসেবে।

দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতা

প্রকৃতপক্ষে মানুষের প্রাথমিক কামনা-বাসনার ক্ষেত্রে তো কোনো দেশ-কালের ভেদরেখা নেই। সে হিসেবে যে ভৌগোলিক ভূখণ্ড আমার স্বদেশ, তার কল্যাণের সঙ্গে নির্দিষ্ট সীমারেখাবহির্ভূত মানুষের কল্যাণের বিরোধ থাকতে পারে না। বরং তা সামগ্রিক কল্যাণসাধনের সহায়ক হওয়াই স্বাভাবিক। স্বদেশপ্রেমের সঙ্গে আন্তর্জাতিকায় তাই কোনো বিরোধ নেই। 'বিশ্বেষাং কল্যাণমস্তু' প্রার্থনার মধ্যে তো আমার কল্যাণও নিহিত। 'সর্বঃ সর্বত্র নন্দতু' প্রার্থনায় সর্বের মধ্যে তো আমার দেশটুকুও বর্তমান।

সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধনের যুদ্ধই স্বদেশপ্রেমিকের একমাত্র যুদ্ধ। এই যুদ্ধ

মাঠে মাঠে ফসল ফলানো, কলে-কারখানার উৎপাদনে নিযুক্ত থাকা, সমাজে আপন ক্ষেত্রে আপন কর্তব্য পালন এবং অসাম্য-অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ। স্মৃতিতে দেশের ঐতিহ্য, বুকে দেশের সংস্কৃতি এবং কর্মক্ষেত্রে নবনব সম্ভাবনার সৃষ্টি—স্বদেশপ্রেমের এটিই যথার্থ প্রকাশ। দেশের সমস্ত সম্পদে প্রত্যেকের সমানাধিকারের অনুভূতিই দেশপ্রেমিকের অনুভূতি এবং ভৌগোলিক গণ্ডির বাঁধন মুক্ত করে সমগ্র মানবজাতির সার্বিক মঙ্গলে আত্মনিয়োগ করাই যথার্থ স্বদেশপ্রেমিকের কর্তব্য।

যথার্থ দেশপ্রেম

স্বদেশপ্রেমের মহৎ অনুভূতিতে উদ্বুদ্ধ মানুষের জীবন কখনই ব্যর্থ হয় না, কারণ সাফল্যের মাপকাঠি সে ক্ষেত্রে আত্মপরতা নয়, আত্মপ্রীতি নয়, পরার্থপরতা ও মানবপ্রীতি। তাই সব সময়েই দেশপ্রেমিকরা মানব মহত্ত্বের চরম বিকাশের প্রতিরূপ হিসেবে আমাদের শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করেন। যিনি 'বন্দেমাতরম্' বলে দেশকে মাতৃরূপে বন্দনা করেন, তিনি দেশের সমস্ত মানুষকে ভ্রাতৃভাবে দেখেন। এই দেখাই যথার্থ দেশপ্রেম। সে দেশপ্রেমে স্বদেশের প্রতিটি ধূলিকণা যেমন হয় স্বর্ণরেণু, তেমনি প্রতিটি মানুষ হয় নিজের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—
১. পরাধীন ভারতে স্বদেশপ্রেম। ২. দেশপ্রেমের আদর্শ। ৩. আন্তর্জাতিকতা বনাম দেশপ্রেম।

চিন্তাসহায়ক বাণী

আমার কাছে দেশসেবা ইউরোপীয় রাজনীতির অনুকরণ নয়। সে আমার ধর্মের অঙ্গ, আমার জীবন। আমার দেশমাতৃকার মূর্তির মধ্যে আমার ভগবান্‌ও জাগ্রত। —চিত্তরঞ্জন দাশ, অভিভাষণ।

সকল ধর্মের উপরে স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না। —বঙ্কিমচন্দ্র, ধর্মতত্ত্ব।

For a man to love his country truly, he must also know how to love mankind, and this love must be the sustaining force in the search for world order.
—A. E. Stevenson (1900-65)

জীবন আয়ুতে নহে, কল্যাণপূত কর্মে

[জীবনের সংজ্ঞা বা অর্থ—ভারত সংস্কৃতিতে জীবনধর্ম—আমাদের মনীষীদের জীবনব্রত—কল্যাণকর্মের আনন্দ—উপসংহার]

জীবনের সংজ্ঞা কী তা জানি না। জীবন মুহূর্ত বা কোনো কালবিভাগের সমষ্টি এ কথা বললে তা হবে নিতান্ত গাণিতিক। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে যে-ভাবেই ব্যাখ্যা করা হোক না কেন, সাধারণ দৃষ্টিতে দেখলে আমাদের মনে হয় জীবন এমন একটি স্পন্দন যা একটি প্রতি-স্পন্দনের সৃষ্টি করে। আমি আছি এই বোধটুকুই শুধু নয়, আমি অন্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছি, অন্যের জন্যে আছি এই বোধটুকুই বোধ হয় জীবনবোধ। এইভাবে জীবনকে দেখলে বলা যায় জীবনের ধর্ম হচ্ছে 'জীবনে জীবন যোগ করা।'

জীবনের সংজ্ঞা বা অর্থ

উপনিষদ বলেছেন 'মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে, মিত্রস্যৈব চক্ষুষা মাং সর্বাণি ভূতাণি সমীক্ষন্তাম্'—আমি যেন সকলকে মিত্রের চোখে দেখি, আমাকেও যেন সকলে মিত্রের চোখে দেখে।

ভারতসংস্কৃতিতে জীবনধর্ম

এই দেখার তাৎপর্য কী? মিত্র মিত্রের কল্যাণ করে। সকলে আমার মিত্র, আমি সকলের কল্যাণ করব। এই মৈত্রীভাবনা আর কল্যাণভাবনা প্রায় সমার্থক। এ যুগের পরমর্ষি (পরম+ঋষি) রামকৃষ্ণদেবও শিবজ্ঞানে জীবসেবার আদর্শ ঘোষণা করে গেছেন। ঋষি-কবির কণ্ঠেও একই অমৃতবাণী: 'স্বার্থমগ্ন যে জন বিমুখ বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনও শেখেনি বাঁচিতে।' সত্যি বাঁচার অর্থই হচ্ছে পরের জন্য বাঁচা, নিজের জন্যে নয়।

নিজেকে অন্যের মধ্যে উপলব্ধি করাই যথার্থ ব্রহ্মবোধ। নিজের কল্যাণ আর অপরের কল্যাণ এই উপলব্ধিতেই সমার্থক হয়ে ওঠে। ভারতের ধর্মচেতনাকে তাই কল্যাণ চেতনা আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

আমাদের মনীষীদের জীবনব্রত

আমাদের দেশের কর্মী পুরুষদের দিকে তাকালে দেখি তাঁরা জীবনকে কল্যাণপূত কর্মেই নিয়োজিত করেছেন। বিদ্যাসাগর-বিবেকানন্দেরা কল্যাণ কর্মে সর্বস্বদক্ষিণার মন্ত্রই আমাদের দিয়ে গেছেন:

হায় হায় জনমিয়া কি ফল লভিলে
একটি কুসুমকলি যদি না ফুটালে,
একটি জীবন ব্যথা যদি না জুড়ালে
বুকভরা প্রেম ঢেলে বিফল জীবনে।

আমাদের দেশবন্ধুরা সারা জীবন দিয়ে এ কথা বলে গেছেন।

কল্যাণকর্মের আনন্দ

কোনো ফলের আশা করে কেউ কল্যাণকর্ম করে না। 'নেকী কর ঔর দরিয়া মে ডাল' এই ভারতীয় প্রবাদটি নিঃস্বার্থ কল্যাণের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। তবে, কল্যাণকর্ম করে তা বিস্মৃত হতে হতে পবিত্র আনন্দটুকু আমাদের দ্বিতীয় কল্যাণের দিকে পরিচালিত করে, এ আনন্দ যে পেয়েছে সে জানে 'পরের কারণে মরণেও সুখ'।

দীর্ঘজীবী স্বার্থসর্বস্বের চেয়ে ক্ষণজীবী পরহিতব্রতীর জীবন যে সার্থকতর তা বলার অপেক্ষা রাখে না। যে অন্যের জন্যে না ভেবে বাঁচে সে নিশ্বাস ফেললেও বেঁচে আছে একথা বলা যায় না—শ্বসন্নপি ন জীবতি।

উপসংহার

আমরা বিদ্যার্থী। বিদ্যা আহরণই আমাদের তপস্যা। কিন্তু 'বিদ্যা' মানে তো শুধু পুঁথিগত বিষয়বোধ নয়। বিদ্যা মানে জানা—অর্থাৎ জীবনকে জানা। তাই জীবন যে আয়ুতে নয়, কল্যাণপূত কর্মে এই সত্যকে আমরা উপলব্ধি করব। আর শুধু উপলব্ধি নয় সে সত্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার সামান্যতম সুযোগও আমরা হারাব না। ভালোকাজ করতে গেলে পুরস্কারের বদলে তিরস্কারও ভাগ্যে জোটে, কিন্তু তাতে বিচলিত হব না। আমরা মনে রাখব নবকুমার প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই বাণী: 'আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি

তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম —তাই বলিয়া আমি উত্তম হইব না কেন?'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. মনীষীদের জীবন-বাণী। ২. কর্মই ধর্ম।

চিন্তাসহায়ক বাণী

ধর্ম কী? মানব-প্রেম। —কনফুসিয়াস।

মালাকার পরপর ফুল গেঁথে যেমন মালা গড়ে তেমনি পরপর কল্যাণ কর্ম করে যাও। —বুদ্ধদেব

The best portion of a good man's life in his little, nameless, unremembered acts of kindness and love. —Wordsworth

A man's true wealth hereafter, is the good he deso in this world to his fellow-man. —Mahammed

জীবনচরিত পাঠের প্রয়োজনীয়তা

[ভূমিকা—পাঠের উপকারিতা—গ্রন্থনির্বাচন—চরিতগ্রন্থের বৈচিত্র্য—অনুসৃতির প্রয়াস—উপসংহার।]

ভূমিকা মহাপুরুষদের জীবনীই বাণী। তাই জীবনচরিত পাঠ মানে জীবনে এমন বাণীর সন্ধান পাওয়া যা জীবনকে দেবে এক নতুন অর্থ। জীবনচরিত পাঠ যেন সব-পেয়েছির-দেশে ভ্রমণ—যে ভ্রমণ জীবনবোধেরই নামান্তর।

পাঠের উপকারিতা মহাপুরুষেরা ইতিহাসের পাতায় মহানুভবতা ও কল্যাণব্রতের যে-অবদান রেখে গেছেন আমরা চরিতগ্রন্থ পাঠ করে সেই-সব অবদানের সঙ্গে পরিচিত হই—সঙ্গে সঙ্গে পাই অন্ধকারে পথ চলার প্রেরণা। সংসারে স্বার্থবুদ্ধি আর সঙ্কীর্ণ কামনা-বাসনা থেকে মুক্ত করে মানুষকে আবার অমৃতের পুত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে মহামানবের জীবনদর্শন। আমরা সাধারণ মানুষ, রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'সাড়ে পনেরো আনা' আমাদের জীবনে কোনো বৈচিত্র্য নেই, সহস্র তুচ্ছতা নিয়ে এই 'কান্নাহাসির দোলদোলানো' সংসার সাগরতীরে বাস করি আমরা। কিন্তু একদিন তুচ্ছতার মধ্যে বাস করতে করতে যখন হাঁপিয়ে ওঠে প্রাণ, তখনই অন্ধকারের সীমা পেরিয়ে মহাপুরুষের আলোকবর্তিকা আমাদের উদ্দীপিত করে। স্পর্শমণির ছোঁয়ায় আমরাও উঠি সোনা হয়ে।

অসংখ্য জীবনীগ্রন্থের ভিড়ে আমরা দিশেহারা না হই। আমাদের সেইসব জীবনী-

গ্রন্থই পাঠ করতে হবে যা মানুষকে মানবতার বৃহত্তর আকাশে উত্তীর্ণ করবে, জীবনের সঠিক পথনির্দেশ করবে। অন্যের জন্যে যাঁরা জীবন উৎসর্গ করেছেন, যাদের প্রজ্ঞা ও মনীষা মানবসমাজের সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁদের অবদান সর্বজনস্বীকৃত তাঁদের জীবনচরিতই আমাদের পাঠ করা উচিত। এ বিষয়ে গ্রন্থাগারিক এবং অভিজ্ঞ শিক্ষকের সাহায্য আমরা নিশ্চয় পাব।

গ্রন্থনির্বাচন

সাধারণ মানুষে মানুষে যেমন ব্যবধান, যেমন বৈচিত্র্য, মহামানবদের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। পৃথিবীতে যেমন ধর্মগুরুদের আবির্ভাব হয়েছে তেমনি জন্মেছেন দেশপ্রেমিক বীরগণ। তাই চরিতগ্রন্থে যেমন পাই যীশু-মহম্মদ-চৈতন্য-নানক-শ্রীরামকৃষ্ণকে, অন্যদিকে তেমনি পাই রাণাপ্রতাপ-গ্যারিবল্ডি-নেপোলিয়ন আর নেতাজীকে। এই ভাবে জ্ঞান-বিজ্ঞানে, রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতিতে, মানবসেবায়, আর্তের ত্রাণে, শিল্পে সাহিত্যে যাঁরা বিশ্বমানবকে নতুন পথের সন্ধান দিয়েছেন তাঁরাও স্মরণীয়। তাই তাঁদের জীবনকথা পাঠের প্রয়োজন আছে। যারা যে-পথের পথিক যে-রসের রসিক তারা নিজেদের ঈপ্সিত পথের নির্দেশ খুঁজে নেবে এই সব জীবনীগ্রন্থ থেকে।

চরিতগ্রন্থের বৈচিত্র্য

ছোটো ছেলে মা-বাবাকে অনুকরণ করে। অনুকরণ না করলে শিশু হাঁটতে পারে না, অনুকরণ না করলে শিশু লিখতে শেখে না। অনভিজ্ঞতা ও অজ্ঞানে পরিণত বয়সেও আমরা শিশুরই মতো। পথের নির্দেশ আমাদের খুবই প্রয়োজন। আর এই জন্যেই মহাপুরুষদের অনুসরণ বা অনুকরণ আমাদের নিতান্ত প্রয়োজন। মহাভারতে যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম প্রশ্ন করেছিলেন—'কঃ পন্থাঃ' অর্থাৎ পথ কী? উত্তরে ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—মহাজন যে-পথে গমন করেছেন সেটাই পথ অর্থাৎ মহাপুরুষকে অনুসরণ করাই আমাদের কর্তব্য। জীবনীগ্রন্থ পাঠে আমরা মহৎকে অনুসরণের প্রেরণা পাই। কিন্তু একটা কথা সর্বদাই মনে রাখতে হবে, অন্ধ অনুকরণ সর্বদাই বর্জনীয়। কোনো আদর্শের অনুকরণ যদি আমাদের শক্তি এবং চরিত্রের অনুকূল না হয়, যদি আদর্শকে একান্তভাবেই শ্রদ্ধার সঙ্গে নিজের করে গ্রহণ করতে না পারি, তা হলে অন্ধ অনুকরণ হয়ে পড়ে একান্তভাবেই বাইরের জিনিস। তখন মহতের অনুকরণও হিতকর হতে পারে না। তাই অনুকরণ করব কিন্তু অন্ধ অনুকরণ নয়।

অনুসৃতির প্রয়াস

জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যাঁরা বড়ো হয়েছেন তাঁদের জীবনচরিত বড়ো কিছু করবার প্রেরণা দেয় আমাদের। মহৎ যদি আমরা না-ও হতে পারি মহতের পথে যাত্রাই আমাদের মনুষ্যত্বকে ধরে রাখতে পারবে। আমরা যতটুকু ভালো হতে পারব ততটুকুই লাভ। মনীষীরা goodness-কে greatness-এর চেয়ে ছোটো করে দেখেন নি।

উপসংহার

পাঠসহায়ক বাণী

The best teachers of history are the lives of great men.

—Orson Squire Fowler (1809-87)

Biography, especially of the great and good who have risen by their own exertions to eminence and usefulness, is an inspiring and ennobling study. —H. Mann (1796-1859)

সহিষ্ণুতার মূল্য

[উঃ মাঃ পরীক্ষা, ১৯৭৮]

[ভূমিকা—ধরিত্রী ও সহিষ্ণুতা—সহিষ্ণুতার সহোদর—সহিষ্ণুতার গুণ—অসহিষ্ণুতার দোষ—সহিষ্ণুতা অভ্যাস—উপসংহার।]

ভূমিকা

'যে সহে সে রহে'—সহিষ্ণুতার কী মূল্য তা বোধ হয় এই ছোট্ট প্রবাদটুকুর মধ্যেই সম্পূর্ণ ধরা আছে। সত্যি, আমাদের জীবনচর্যা বা অস্তিত্বের মূলেই আছে এই সহিষ্ণুতা বা সহ্য করবার প্রবণতা।

ধরিত্রী ও সহিষ্ণুতা

আমরা কথায় বলি ধরিত্রীর মতো সহিষ্ণু। কথাটি গভীর তাৎপর্যময়। জীবনধাত্রী বসুন্ধরা কত ঝড়-ঝঞ্ঝা আর পরিবর্তন বুকে বয়ে তাঁর কর্তব্য করে যাচ্ছেন তা ভাবলে বিস্মিত হতে হয়। আবার জীবসৃষ্টির সেই আদিমযুগের পৃষ্ঠা উলটিয়ে দেখি পরিবর্তিত আবহাওয়া যারা সইতে পেরেছে, তারাই রয়ে গেছে, যারা পারে নি তারা লুপ্ত হয়েছে। 'Survival of the fittest' কথাটির বিশ্লেষণে আমরা মূলত একটি সহনশীল শক্তিকেই উপলব্ধি করি।

সহিষ্ণুতার সহোদর

'সহিষ্ণুতা' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ সহনশীলতা অর্থাৎ সহ্য করার স্বভাব বা প্রবণতা। সেদিক থেকে ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহিষ্ণুতার প্রায় সমার্থকই বলা চলে। বরং বলা যায় ধৈর্য ও অধ্যবসায় সহিষ্ণুতারই সহোদর।

সহিষ্ণুতার গুণ

সহিষ্ণুতাই আমাদের অগ্রগতির সহায়ক। সহিষ্ণুতা আমাদের দেহে-মনে যে অমিত-শক্তির যোগান দেয় ভবিষ্যতে তারই সুপ্রয়োগে আমরা প্রতিষ্ঠা অর্জন করি। ব্যক্তিগত জীবনে ও সমাজগত জীবনে এমন কি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সহিষ্ণুতা একান্ত দরকার। বলতে গেলে আমাদের সুখশান্তি এবং স্থৈর্য মূলত নির্ভর করে আছে সহিষ্ণুতার উপর। এ সত্য যেন আমরা না ভুলি। সহিষ্ণুতার পরশপাথরের ছোঁয়ায় অনেক অমঙ্গলের লোহাও সোনা হয়ে ওঠে। পাশ্চাত্য দেশের একজন মনীষী বলেছেন, Cultivate forbearance till your heart yields a fine crop of it. Pray for a short memory as to all unkindness.

পারিবারিক ক্ষেত্রে আমরা দেখি ভাইদের মধ্যে বা বধূদের মধ্যে কেউ অসহিষ্ণু হলে

ভাঙন ধরে যায় সংসারে। এই অসহিষ্ণুতার জন্যেই মা-বাবা, ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব সকলের মধ্যেই বিবাদ-বিসংবাদের সৃষ্টি হয়। খেলার মাঠে অসহিষ্ণু হয়ে উঠলে ভালো খেলোয়াড়ের খেলা পড়ে যায়। খেলার যিনি পরিচালক তাঁর কোনো সিদ্ধান্তে খেলোয়াড়রা অসহিষ্ণু হয়ে উঠলে খুব ভালো ফুটবল বা ক্রিকেট খেলাও তো নষ্ট হয়। আমাদের অনেক রাজনৈতিক অশান্তির মূলে এই অসহিষ্ণুতা। অথচ পরমত-সহিষ্ণুতার আদর্শ আমাদের দেশে সুপ্রচারিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভয়াবহ বহু যুদ্ধের মূলেই থাকে এই অসহিষ্ণুতা। ইতিহাসের দিকে তাকালে এমন বহু দৃষ্টান্তই চোখে পড়বে।

অসহিষ্ণুতার দোষ

সহিষ্ণুতা কি চেষ্টা করলেই আয়ত্ত হয়? সরাসরি এই প্রশ্নের হাঁ-বাচক উত্তর গ্রহণযোগ্য হবে কিনা জানি না, তবে একথা বলব, চেষ্টার অসাধ্য কিছুই নেই। আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, সহিষ্ণুতা দুর্বলতার নামান্তর নয়, বরং সবলতা-সাধনার একটি বলিষ্ঠ অঙ্গ, তা হলে এই সদ্‌গুণ-চর্চার সম্ভাব্য পথের সন্ধানও আমরা পাব। মনে রাখতে হবে—'Tolerance is the only test of civilization.'

সহিষ্ণুতা অভ্যাস

কিন্তু এই সহিষ্ণুতা যেখানে সত্যিই দুর্বলতা সেখানে আমাদের তা ত্যাগ করাই হবে সমীচীন—'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্য বাক্যগুলি উঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে।'

উপসংহার

চিন্তাসহায়ক বাণী

He conquers who endures.—Persius (34-62 A.D.)—Roman poet.

By bravely enduring, an evil which cannot be avoided is overcome.
—Proverb.

A man can bear more than ten oxen can pull.
—Yiddish Proverb.

To endure is the first thing that a child ought to learn, and that which he will have most need to know.
—Jean Jacques Rousseau (1712-1778)
French philosopher and author.

ধৈর্যে হও উটের মতো। —শ্রীঅরবিন্দ

শ্রমের মূল্য

[উঃ মাঃ পরীক্ষা, ১৯৭৯, ত্রিপুরা ১৯৮০]

[ভূমিকা—শ্রমের জয়গান—সভ্যতা ও শ্রম—শ্রম ও বিদ্যার্থী—উপসংহার]

ভূমিকা

আদম আর ইভকে নন্দনকানন থেকে মর্ত্যে নির্বাসিত করার সময়ে ঈশ্বর বললেন—'যাও, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খেটে খাও গে।' একেই বলা হয় মানুষের original punishment বা আদিম দণ্ড। কিন্তু একে দণ্ড না বলে বরং দণ্ডচ্ছলে আশীর্বাদই বলা ভালো, কারণ শ্রমেই মানুষ মহত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত।

শ্রমের জয়গান

উপনিষদেও শ্রমকে শ্রদ্ধার চোখে দেখা হয়েছে—নানা শ্রান্তায় শ্রীরস্তি। যে শ্রান্ত নয় তার শ্রী নেই। এর চেয়ে বড়ো কথা আর কী হতে পারে। গতির মন্ত্রে বলা হয়েছে—যদি ক্লান্তি আসে, সূর্যের দিকে তাকাও প্রেরণা পাবে।

সূর্যস্য পশ্য শ্রেমাণং
যো ন তন্দ্রয়তে চরন্।

—শ্রমশীল সূর্যের দিকে তাকাও যিনি কর্মরত অবস্থায় কখনও তন্দ্রাচ্ছন্ন হন না। একজন সুফী কবি একটি গজলে বলেছেন—

'খুব ক্লান্ত হয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যদি নিজেকে কুৎসিত ব'লে মনে হয় তাহলে রাগ করে আয়নাটা ভেঙো না, বরং কাজ করে আরও একটু ক্লান্ত হও, কারণ, জেনো ঐ ক্লান্ত তোমার চেয়ে সুন্দরতর পৃথিবীতে তখন আর কেউ নেই।'

সভ্যতা ও শ্রম

সভ্যতা শ্রমেরই দান। সেই আদিযুগে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে অসহায় মানুষকে সাহায্য করতে তো কোনো দেবতা নেমে আসেন নি। মানুষ হাত ধরাধরি করে দুর্জয় শ্রমে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, ধাপে ধাপে এগিয়েছে সভ্যতার তোরণাদ্বারে। সভ্যতা মানেই নির্মিতি, আর এই নির্মিতির মূলে আছে সর্বশ্রেণীর মানুষের অকুণ্ঠ শ্রম। শ্রমের দেবতা তখনই নেমে এসে শ্রমিকের পাশে এসে দাঁড়ান যখন সে কর্মক্লান্ত।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ধুলামন্দির' কবিতার অনবদ্য পঙ্‌ক্তিগুলোর কথা স্মরণ করা যেতে পারে—

'তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা চাষ
পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ খাটছে বারো মাস।
রৌদ্রে জলে আছেন সবার সাথে,
ধূলা তাঁহার লেগেছে দুই হাতে;
তাঁরি মতন শুচি বসন ছাড়ি আয় রে ধুলার 'পরে।'

শ্রমের মূল্য বিদ্যার্থীকে বুঝতে হবে মনপ্রাণ দিয়ে। বিদ্যা অর্জন করতে হয় 'ক্ষণশঃ কণশশ্চৈব'। উপনিষদ্ বলেছেন—'তেজস্বি নাবধীতমস্তু'। কিন্তু বিদ্যার অর্জনে অতন্দ্র না হলে তো অধ্যয়নকে তেজোময় করে তোলা যায় না। 'অলসস্য কুতো বিদ্যা?'

'অলসের বিদ্যালাভ হবে কী ক'রে?' মহাপুরুষেরা যেন সারা জীবন দিয়ে বলছেন শ্রম করো, 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।' বিদ্যাসাগরের জীবন মানেই শ্রমের একটি আশ্চর্য পাঠ। আজীবন তিনি যে অবিশ্রান্ত শ্রম করেছেন, তারই মূল্য তিনি পেয়েছেন দুহাত ভরে, সে মূল্য অর্থে নয়, দেশবাসীর ভালোবাসায় আর শ্রদ্ধায়। বঙ্কিম, রবীন্দ্র, বিবেকানন্দ—কে শ্রমিক নয়, আমাদের তো মনে হয়—এঁদের পরিচয় দেওয়া উচিত মহান্ শ্রমিক বলে। জীবনের সর্বক্ষেত্রে যার যতটুকু সাফল্য এসেছে তা তো শ্রমের মূল্যেই। রবিশঙ্করের সেতার, আমীর খাঁর গান এসব শ্রমেরই বহুমূল্য উপহার ছাড়া আর কী? তাই আমরা যখন কোনো শিল্পী, সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী বা ক্রীড়াকুশলীর কৃতিত্ব দেখে বিমুগ্ধ হই তখন সেই বিমুগ্ধতা আমাদের দৃষ্টিকে যেন না আচ্ছন্ন করে, আমরা যেন নৈপুণ্যের পিছনে তাঁদের বিপুল শ্রম ও নিষ্ঠাকে প্রত্যক্ষ করি এবং অনুপ্রাণিত হই।

শ্রম ও বিদ্যার্থী

আমরা বিদ্যার্থী। আমাদের সম্মুখে দীর্ঘ পথ। দীর্ঘ পথ দেখে আমাদের ক্ষান্ত হলে চলবে না—দৃঢ় পদক্ষেপে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। আমাদের মনে প্রাণে বাজবে সেই দুর্জয় মন্ত্রগান—

উপসংহার

জড়তাতামস হও উত্তীর্ণ
ক্লান্তিজাল করো দীর্ণবিদীর্ণ।

চিন্তাসহায়ক বাণী

Labour is prior to and independent of capital. Capital is only the fruit of labour. ……Labour is the superior of capital, and deserves much the higher consideration.

—Abraham Lincoln (1809-1865)
Sixteenth Presedent Dec. 3, 1868.

A man's best friend is his ten fingers. —Robert Collber (1823-1912)., A famous clergyman.

Labour rids us of three great evils—isksomeness, vice, and poverty. —Voltaire (1694-1778), French author.

স্বাবলম্বন

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

[স্বাবলম্বন কী—পরস্পর-নির্ভরতা কি দোষের?—স্বাবলম্বনের গুণ—উপসংহার।]

'স্ব'-কে অর্থাৎ নিজেকেই অবলম্বন—এক কথায় স্বাবলম্বন। যে-কাজ আমার নিজেরই করবার কথা, অন্য কারো উপরে নির্ভর না করে সে-কাজ নিজেই করতে হবে—এই হল স্বাবলম্বন।

স্বাবলম্বন কী

কিন্তু সমাজ-জীবনে অনেক কাজের জন্যেই তো আমরা পরের উপর নির্ভর করি।

সেটা কি দোষের ? না। বহু প্রয়োজনমুখী সমাজ-জীবনে একের উপর অন্যকে নির্ভর করতে হবেই। চাষী যোগায় শস্য, বণিক যোগায় পণ্য। এদের উভয়কেই উভয়ের উপর নির্ভর করতে হবে, কারণ দুজনের কাজের ক্ষেত্র পৃথক। একে আমরা বলতে পারি পারস্পরিকতা। সমাজ জীবনে এই পারস্পরিকতা অপরিহার্য। নানা জনের নানা অবদানকে অবলম্বন করেই আমাদের সমাজ-জীবন এগিয়ে চলেছে।

পরস্পর-নির্ভরতা কী দোষের ?

ব্যক্তিগত জীবনেও আমাদের চলার পথে কারো-কারো সহায়তার প্রয়োজন হতে পারে। অসময়ে বন্ধুই হয় আমাদের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু নিজে কর্মবিমুখ হয়ে আমারই করণীয় কর্মে যদি অন্যের উপর নির্ভর করি সেই পরনির্ভরতাই হবে দোষের।

শ্রম পবিত্র। সকলকেই জীবনযাত্রার প্রতিক্ষেত্রে শ্রম করতে হবে। যে শ্রমকাতর সেই পরনির্ভর। আমাদের স্বাভাবিক শক্তি এই পরনির্ভরতার অভ্যাসে নষ্ট হয়ে যায়, আমরা হয়ে পড়ি পঙ্গু, আমাদের বার্ধক্য আসে 'বৃদ্ধত্বং জরসা বিনা'। পক্ষান্তরে নিজের উপর বেশি করে নির্ভর করলে আমাদের সুপ্ত শক্তি ওঠে জেগে, সেই শক্তি-প্রয়োগে আমরা কঠিনকে সহজ করতে পারি।

স্বাবলম্বনের গুণ

গাড়ির চাকা কাদায় বসে গেলে চালক যদি নিজে সেই কাদা থেকে চাকা ওঠানোর ব্যাপারে শক্তি প্রয়োগ না করে বিপদুদ্ধারের জন্যে দেবতাকে ডাকতে থাকে, কোন্ দেবতা নেমে আসবেন তাকে সাহায্য করতে ?

খাটিয়ায় শুয়ে থাকত এক অলস লোক। ছারপোকার কামড়ে সে ছটফট করত। কিন্তু নিজেহাতে ছারপোকা মারবার মেহনৎ না করে সে দেবতাদের ডাকত : তোমরা এই বিপদে আমাকে সাহায্য করো। কিন্তু তার ডাকে সাড়া দিয়ে দেবতারা ছারপোকা মারতে আসতেন না। শেষে অভিযোগ করে দেবতাদের উদ্দেশ্যে কড়া কথা শোনাল সে—'এই রকম ছোটখাটো কাজে তোমরা সাহায্য করলে না, আর করবে বড়ো কাজে ? আর তোমাদের ডাকব না।' অলস লোকটা বুঝল না ছারপোকার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে যে নিজের উপর নির্ভর করতে পারে না, দেবতারা তার কোন কাজেই সহায় হন না।

যারা নিজেদের সাহায্য করে ঈশ্বর তাদের সহায়তার জন্যেই ছুটে আসেন—God helps those who help themselves.

আমরা ছাত্র। এখন যে অভ্যাস করব সেই অভ্যাসই আমাদের থেকে যাবে পরবর্তী জীবনে। তাই আত্মনির্ভর হতে শিখব আমরা এখন থেকেই। আমাদের মনে হয় কর্মমুখী শিক্ষা শুধু মাধ্যমিক স্তরে নয়, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও সংযোজিত হলে ভালো হয়, কারণ এই শিক্ষা আমাদের স্বাবলম্বী হবার প্রেরণা দেবে। রবীন্দ্রনাথ ও মহাত্মা গান্ধী তাঁদের শিক্ষাপরিকল্পনায় স্বাবলম্বনকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন।

উপসংহার

বহু কঠিন কাজ আমাদের করতে হবে, দেশ যে আমাদের মুখের দিকেই চেয়ে

আছে। কাদায় গাড়ির চাকা চেপে বসে গেলে আমরা ডাকব না শক্তির দেবতাকে, নিজেই কাঁধ লাগাব চাকাতে। কারণ শক্তির দেবতা যে আমাদেরই মধ্যে নিত্য বর্তমান।

চিন্তাসহায়ক বাণী

This (self-help) does not mean indifference to or rejection of outside help, but it means the capacity to be at peace with oneself, to preserve one's self-respect, when outside help is not forth coming or is refused. —M. K. Gandhi.

Trust thyself : every heart vibrates to that iron string.
—Emerson (1803-1882)
American essayist & author.

শিক্ষা ও মাতৃভাষা

[ভূমিকা—ইংরেজি প্রভাব বিস্তারের পশ্চাৎপট—বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের অসুবিধা—বর্তমান পরিস্থিতি—আমাদের করণীয়—উপসংহার।]

ভূমিকা

যা শিখি তা যে ভাষাতেই হোক না কেন, তাকে আপন করে রাখি মাতৃভাষায়। সুতরাং যখন এই শেখা বিদেশী ভাষায় হয়, তখন বুদ্ধির একটি বাড়তি পরিশ্রম করা প্রয়োজন হয়ে পড়ে—তা হল ঐ শেখা জিনিসটির নিজের ভাষায় রূপান্তরীকরণ। কারণ সর্বদাই প্রকাশের সর্বোত্তম মাধ্যম মাতৃভাষা। পরিশ্রমটা অনর্থক এবং ক্ষেত্রবিশেষে অসুবিধাজনকও বটে। কিন্তু বর্তমানের এই পরিশ্রম ও অসুবিধা বরণের এক ঐতিহাসিক কারণ আছে। ব্রিটিশ শক্তি একসময়ে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে। 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য' সে সময়ে অস্ত যেত না। কিন্তু সাম্রাজ্যের বিস্তার ও রক্ষা শুধুমাত্র রাজনৈতিকভাবেই হয় না, প্রয়োজন হয় ভাষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিস্তার। এই পথেই ইংরেজি ক্রমে ক্রমে সর্বাধিক শক্তিসম্পন্ন ভাষা হয়ে উঠল এবং বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারের প্রকাশমাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করল।

ইংরেজির প্রভাব-বিস্তারের পশ্চাৎপট

ভারতবর্ষ শাসনকালে ইংরেজরা যথানিয়মে প্রদেশে প্রদেশে আপন শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তারের জন্যে ইংরেজিশিক্ষা প্রচলনের চেষ্টা করল। সে সময়ে এই শিক্ষা-প্রচলনের স্বপক্ষে অনেকেই ছিলেন, কিন্তু তার মাধ্যম কী হবে? ইংরেজি, না স্থানীয় সমৃদ্ধ আঞ্চলিক ভাষা—এ নিয়ে মতদ্বৈধ দেখা দিল। রাজার আইনে শেষ পর্যন্ত ইংরেজি ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে অনুমোদিত হল এবং সে সময় থেকেই ইংরেজির আসন এ দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু শিক্ষার মাধ্যম যদি কোনো বিদেশী ভাষা হয়, মনের দরজায় আসতে শিক্ষাকে যদি অন্য কোনো ভাষাকে বহন করতে হয়, তাহলে সে শিক্ষার আত্মীকরণ অসম্ভব। তা ছাড়া, শিক্ষণীয় বিষয়ে আগ্রহ বা দক্ষতা যতই থাক না কেন শিক্ষার্থীকে বিষয়টি

জানার জন্যেই আর-একটি ভাষা শিখতে হচ্ছে, সে ভাষা আয়ত্ত করা যত অসুবিধা-জনক হোক না কেন। সময় এবং শক্তির কী বিপুল অপচয়। খাদ্য যদি আমাদের শুধুমাত্র গলাধঃকরণ করতে হয়, তা হলে তা এক শ্রমসাপেক্ষ শাস্তিবিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা তার স্বাদ গ্রহণ করি এবং সর্বোপরি সেই খাদ্যের জীবিকা-শক্তিতে রূপান্তরীকরণ ঘটে এবং আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষা হয়। শিক্ষার ক্ষেত্রেও তাই। যদি শেখার আনন্দ না থাকে, বিষয়কে শুধুমাত্র গলাধঃকরণ করতে হয়, তা হলে মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে সে শিক্ষার কোন ভূমিকা তো থাকেই না, উপরন্তু তা শাস্তিবিশেষ হয়ে দাঁড়ায়। ফলে শিক্ষা আমাদের জীবনের অঙ্গীভূত হয় না। তা ছাড়া, অনেক ক্ষেত্রে সেই ভাষার দক্ষতা অর্জনই শিক্ষার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায়। তাই আজও ব্রিটিশ-শাসন অবসানের প্রায় তিন দশক পরেও আমাদের ধারণা ইংরেজি ভাষা আয়ত্ত করাই শিক্ষার একমাত্র মাপকাঠি। এই অসুবিধার কথা বহুকাল আগে থেকেই আমরা উপলব্ধি করেছি, কিন্তু সমস্যামুক্তির পথে বিশেষ অগ্রসর হতে পারি নি।

বিদেশী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের জন্যে বহু শিক্ষাবিদ ও মনীষীর দীর্ঘকালব্যাপী ক্রমাগত চেষ্টার ফলে বর্তমানে উচ্চশিক্ষার দরজা মাতৃভাষার সামনে উন্মুক্ত হয়েছে বটে, কিন্তু দীর্ঘদিনের অবহেলা ও অব্যবহারের ফলে এ ক্ষেত্রে বিরাট বাধা সৃষ্টি হয়েছে—অন্তত অনেকের অভিমত তাই। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অসুবিধা হল উপযুক্ত পরিভাষা এবং গ্রন্থাদির অভাব।

বর্তমান পরিস্থিতি

কিন্তু এসব অসুবিধা আমরা অনায়াসে না হোক অল্প আয়াসে দূর করতে পারি। বিজ্ঞান, অঙ্কশাস্ত্র, কারিগরী বিদ্যা বা অন্যান্য বিষয়ের পরিভাষা এই মুহূর্তে তৈরি করা না গেলেও, আমরা সেই সব নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে বিদেশী শব্দকেই গ্রহণ করতে পারি—এতে আমাদের ভাষাও সমৃদ্ধ হবে। তা ছাড়া কাজ শুরু করলে অনেক নতুন পরিভাষাও তৈরি করা সম্ভব হবে। শুধু প্রয়োজন এ বিষয়ে নিরলস উদ্যম ও প্রচেষ্টা।

আমাদের করণীয়

কিন্তু ভাবনা অন্যত্র। অনেকে আজও মনে করেন শিক্ষাসরস্বতীকে শাড়ি পরালে তাঁর মানহানি হবে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে স্বরাজ আয়ত্ত করা আজও দুরূহ। অথচ বাংলা বা আরও কয়েকটি আঞ্চলিক ভাষার সমৃদ্ধির চিহ্ন আমাদের সামনেই রয়েছে, সেই সব ভাষায় রচিত উন্নত সাহিত্য এর সমৃদ্ধি ও সম্ভাবনার সুস্পষ্ট প্রমাণ। তা সত্ত্বেও আমাদের ইংরেজির মোহ যদি না ঘোচে, তা'হলে শিক্ষা চিরদিনই জীবন-বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে, কোনোদিনই তা আমাদের অন্তরের সামগ্রী হয়ে উঠবে না।

আবাল্য ভাববিনিময়ের মাধ্যমকে অস্বীকার করে যথার্থ শিক্ষালাভ স্বপ্ন মাত্র। চিন্তা ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে যথার্থ সাবালকত্ব অর্জন করতে হলে, শিক্ষিত ও অশিক্ষিত ব্যবধান দূর করতে গেলে, শিক্ষার বিস্তার ঘটাতে হলে এবং শিক্ষা ও ব্যবহারিক জীবনে সামঞ্জস্য বিধান করতে হলে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃতি দান অবশ্য কর্তব্য। 'স্বীকৃতি' মানে নিজের করে

উপসংহার

নেওয়া। মাতৃভাষাকে আমরা সব কাজে নিজের করে নেব না একথা তো ভাবতেই পারা যায় না।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১। শিক্ষার মাধ্যম। ২। শিক্ষায় ইংরেজিভাষার স্থান।

চিন্তাসহায়ক বাণী

(বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন)

তোমার অভ্রভেদী শিখরচূড়া বেষ্টন করে পুঞ্জ পুঞ্জ শ্যামল মেঘের প্রসাদ আজ বর্ষিত হোক ফলে শস্যে, সুন্দর হোক পুষ্পে পল্লবে, মাতৃভাষার অপমান দূর হোক, যুগশিক্ষার উদ্‌বেল ধারা বাঙালি চিত্তের শুষ্ক নদীর রিক্ত পথে বান ডাকিয়ে বয়ে যাক, দুই কূলে জাগুক পূর্ণ চেতনায়, ঘাটে ঘাটে উঠুক আনন্দধ্বনি।

—রবীন্দ্রনাথ।

বাংলায় উচ্চ অঙ্গের শিক্ষাগ্রন্থ বাহির হইতেছে না এটা যদি আক্ষেপের বিষয় হয় তবে তার প্রতিকারের একমাত্র উপায়, বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলায় উচ্চ-অঙ্গের শিক্ষা প্রচলন করা।

—রবীন্দ্রনাথ।

And now more than ever has arisen the need of adopting the language of the province as the medium of instruction in all classes within the university.........This foreign language (English) has been a real hindrance to rapid spread of literacy in the country. —সত্যেন্দ্রনাথ বসু। (সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ)

বিদ্যালয়ে কর্মমুখী শিক্ষা

[সংজ্ঞা—প্রয়োজন—প্রাচীন ভারতে কর্মমুখী শিক্ষা—ব্রিটিশ যুগ—কর্মমুখী শিক্ষার ধারা রুদ্ধ হল—স্বাধীন ভারতে প্রচেষ্টা—রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী—নতুন উদ্যম—করণীয়—উপসংহার।]

দেশের প্রবহমান জীবনধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ শিক্ষাই কর্মমুখী শিক্ষা। সমাজের সমসাময়িক চাহিদার পরিপূরণেই শিক্ষা সফল হয়। 'বিশুদ্ধ শিক্ষা' যা শুধুমাত্র মনোগত হয়েই থেকে যায়, সমাজের কোনো ক্ষেত্রে যার প্রয়োগ-সম্ভাবনা থাকে না বা যার প্রয়োগে দেশের কোনোরকমের উন্নতি ঘটে না, সে শিক্ষা বাস্তব অর্থে ব্যর্থ। শিক্ষার উদ্দেশ্য দেশের আর্থিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক ও জীবনযাত্রার মানের উন্নতিসাধন। বিষয়গুলির মধ্যে কোন্‌টি কোন্ সময়ে অধিকতর গুরুত্ব পাবে তা দেশের সে সময়ের অবস্থানবিন্দুর উপর নির্ভরশীল।

সংজ্ঞা

শিক্ষার এই বাস্তব উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টিপাত না করে আমরা যদি শুধুমাত্র শিক্ষার জন্যেই শিক্ষাচর্চা করে যেতে থাকি, তার অবশ্যম্ভাবী ফল সমাজের গতিহীনতা, স্থবিরত্ব, দেশের সমগ্র প্রাকৃতিক সম্পদ ও মানবশক্তির অপচয়।

প্রয়োজন

প্রাচীন ভারত এ বিষয়ে সচেতন ছিল, সমাজের বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী শিক্ষার সুবন্দোবস্ত ছিল, এবং সমাজে ভারসাম্য রক্ষায় কোন অসুবিধা দেখা দেয় নি। এক্ষেত্রে একটি বিষয় উল্লেখযোগ্য—এই বৃত্তিগত শ্রেণীগুলির মধ্যে সাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন, বোঝা দরকার যে সমাজের প্রতিটি অংশই সামাজিক চাহিদা পরিপূরণে আপন ভূমিকা পালন করছে। এই ভূমিকাপালনে দক্ষতার কথাই বিবেচ্য।

প্রাচীন ভারতে কর্মমুখী শিক্ষা

এরপর ব্রিটিশ যুগে শাসক শক্তি আপন শাসনকার্যে সহায়তার উদ্দেশ্যে এ দেশে 'কেরানী গড়ার শিক্ষা' প্রচলন করল এবং বৃত্তিজীবীরা ক্রমশ সংখ্যায় ক্ষীণতর হতে হতে প্রায় ধ্বংস হয়ে গেল। দেশের উৎপাদন ও প্রয়োজনীয় পণ্য সরবরাহ সামগ্রিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করল শাসকগোষ্ঠী এবং তাদের শিক্ষায় শিক্ষিত জনসাধারণের এক বিরাট অংশ তাদের সে কাজে সহায়তা করল। ব্রিটিশ-শাসন অবসানের পর দীর্ঘকাল এই অবস্থাই বজায় রইল। কর্মমুখী শিক্ষার স্রোত তখন প্রায় সম্পূর্ণ রুদ্ধ।

ব্রিটিশ যুগ—কর্মমুখী শিক্ষার ধারা রুদ্ধ হল

এরপর ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে ভারত স্বাধীন প্রজাতন্ত্র হিসাবে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির কথা বিবেচনা করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করল। তখন আবার নতুন করে প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেল কর্মমুখী শিক্ষার। তৎকালীন শিক্ষা কমিশনগুলি এ বিষয়ে যথাযথভাবে সুপারিশ করলেন এবং সেই অনুযায়ী শিক্ষার কাঠামো বদল করা হল। কর্মমুখী শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নতুন ব্যবস্থা কিন্তু তত সুফল হল না, কারণ সাধারণ শিক্ষা একটি বিশেষ স্তর পর্যন্ত গ্রহণ করার পর তার সঙ্গে যুক্ত করা হল কর্মমুখী শিক্ষা, অর্থাৎ প্রথম থেকে শিক্ষার এই দু'টি ধারা যুক্ত হয়ে চলে নি। কর্মশিক্ষা হয়েছে সাধারণ শিক্ষার উপধারা। যাই হোক, সাময়িক ব্যর্থতার পর আবার নতুন করে ভাবনা-চিন্তা শুরু করা হল।

স্বাধীন ভারতের প্রচেষ্টা

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই বিষয়ে ভারতে দুই শিক্ষাবিদ্ রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী বহুকাল আগেই ভেবেছিলেন, এবং তারই জন্যে শ্রীনিকেতন ছিল শান্তিনিকেতনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, আর গান্ধীজী প্রবর্তন করেছিলেন বুনিয়াদী শিক্ষার। এই দু'টি শিক্ষাব্যবস্থার ক্ষেত্রেই কর্মমুখী শিক্ষা গুরুত্ব পেয়েছিল। কিন্তু দেশের সার্বিক শিক্ষাব্যবস্থার ব্যতিক্রম হয়ে কোনো নির্দিষ্ট ব্যবস্থা টিকতে পারে না।

রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীজী

আবার নতুন করে ভাবনা শুরু হল। এবার কর্মমুখী শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমে ঠাঁই পেল। মাধ্যমিক স্তরের একেবারে প্রথম থেকেই এটি একটি নির্দিষ্ট বিষয় এবং অন্যান্য পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বিষয় হিসেবেই গণ্য হল। ফলে ছাত্ররা পুঁথির কথাকে যতদূর সম্ভবপর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যাচাই করে নেওয়ার সুযোগ পেল। শিক্ষা যথার্থ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিল। অন্তত ক্ষুদ্রশিল্প-নির্ভর হয়ে ভবিষ্যতে বাঁচার সংস্থানের প্রতিশ্রুতি আনল এই শিক্ষাক্রম।

নতুন উদ্যম :

প্রবন্ধ-২

এই সদ্যপ্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার সাফল্য সম্বন্ধে কিছু বলার সময় এখনও আসে নি, কারণ সময়ের কষ্টিপাথরে এর যাচাই হওয়া বাকি, তবে আমরা এবিষয়ে নিরুৎসাহ নই, বরং আশাবাদী। এই বিষয়টি এখনও খুব সুষ্ঠুভাবে সর্বত্র অধীত হচ্ছে একথা বলা যায় না। এর মূল কারণ বিষয়টি সর্বত্র এখনও খুব স্পষ্ট নয়, এটিকে সকলের কাছে স্পষ্ট করে তোলা প্রয়োজন। তা ছাড়া, অধিকাংশ বিদ্যালয়ের এই পরিকল্পনার রূপায়ণের ক্ষেত্রে আর্থিক অসুবিধা দেখা দেবে। সুতরাং আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন, সর্বোপরি শিক্ষণশিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকের অভাব তো মেটাতে হবেই ; না হলে এর সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ দেখা দেবে। প্রথম স্তরে এই সব কারণে সুষ্ঠু পরিদর্শন ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন।

করণীয় ঃ

মনে রাখতে হবে কর্মমুখী শিক্ষা নতুন কোনো শ্লোগান নয়। সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতে শিক্ষার সঙ্গে কর্মধারা যুক্ত ছিল। যে গুরু শিষ্যকে বেদ ও বেদাঙ্গ শিক্ষা দিতেন সেই গুরুই তাঁকে বলতেন 'সমিধমাহর'—সমিধ আহরণ করো। জ্ঞান ও সমিধ একই সঙ্গে আহৃত হত। জ্ঞানের সঙ্গে কর্ম যুক্ত হলেই জ্ঞানের শক্তি বৃদ্ধি হয়। আমাদের প্রার্থনা হোক—তেজস্বি নামধীতমস্তু। সেই 'অধীত' বা অধ্যয়নের সঙ্গে যুক্ত হোক কর্মশিক্ষা।

উপসংহার ঃ

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. আমাদের নতুন শিক্ষা। ২. শিক্ষার একাল সেকাল।

চিন্তাসহায়ক বাণী

Education of the hand must follow education of the mind.
John Dewey (1859—1952)

Education is the knowledge of how to use the whole of one-self.—H. W. Beecher. (1813—87)

জনশিক্ষা ও বেতারবার্তা

[ভূমিকা—আবিষ্কার—কার্যপদ্ধতি—দূরাগত কণ্ঠ—জনজীবনে বেতারের প্রভাব—উপসংহার]

ভূমিকা

আদিকালের অসহায়, প্রকৃতির কৃপাপ্রার্থী মানুষ আজ প্রকৃতিকে আপন কাজে ব্যবহার করে বিশ্বজগতের সংশয়াতীত অধীশ্বর হয়ে উঠেছে।

আবিষ্কার :

দূরত্বকে সে বহুভাবে জয় করেছে, তারই অন্যতম হল দূরান্তরে বেতার শব্দপ্রেরণ। এরই নাম বেতারবার্তা। ইটালিয়ান বৈজ্ঞানিক মার্কনীকে আমরা এই যন্ত্রের উদ্ভাবক হিসাবে জানি, প্রকৃতপক্ষে এটি বহু বিজ্ঞানীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফল। আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর অবদান এবিষয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শব্দ ইথার-সমুদ্রে কম্পন সৃষ্টি করে। বেতার কেন্দ্রে প্রথমে শব্দতরঙ্গ বিদ্যুৎ-তরঙ্গে এবং তারপর বিদ্যুৎ-তরঙ্গ আবার ইথার-তরঙ্গে রূপান্তরিত হয়। এই ইথার-তরঙ্গ দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হতে থাকে। বেতার কেন্দ্র থেকে প্রেরক যন্ত্রের দ্বারা প্রেরিত এই ইথারতরঙ্গ গ্রাহক যন্ত্রে প্রতিহত হয় এবং এই তরঙ্গ বিপরীত প্রক্রিয়ায় প্রথমে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে এবং তারপর শব্দতরঙ্গে পরিণত হয়। আমরা ঘরে বসে শুনি আকাশপারের ধ্বনি—গান, ভাষণ ইত্যাদি।

কার্যপদ্ধতি :

মানুষের আত্মীয়তার এক বড়ো বাধা ছিল দূরত্ব। বেতারযন্ত্র তাকে দূর করল, দূরদেশের গায়ক আজ আমার নিকট-প্রতিবেশী, সাগরপারের বক্তার চিন্তাশীল ভাষণের আমি ঘরে-বসা শ্রোতা। বিশ্বসংসার যেন মানুষের এক মহামিলনক্ষেত্রে পরিণত।

দূরাগত কণ্ঠ :

মানুষের কল্যাণের আরেকটি পথ উন্মুক্ত করল বিজ্ঞান। সকলের জন্যে আনন্দ ও শিক্ষা বিতরণ করা আজ সহজসাধ্য। শুধু প্রয়োজন বেতারযন্ত্রকে সর্বসাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনা। উন্নত উৎপাদন-ব্যবস্থার দ্বারা এই কাজকে সম্ভবপর করে তোলা আদৌ দুঃসাধ্য নয়।

জনমানসে বেতারের প্রভাব অপরিসীম। বিশ্বব্যাপী সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি ইত্যাদির যে নিরন্তর প্রবাহ বয়ে চলেছে, মানুষের উন্নততর ভবিষ্যতের যে-বিপুল সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে, তাকে জানতে, তার সঙ্গে যুক্ত মানবজাতির অংশ হিসাবে প্রত্যেকের বাসনা থাকা স্বাভাবিক। সেই বাসনার বাস্তব ও সার্থক রূপায়ণ করতে পারে বিজ্ঞানের এই অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারটি। এক্ষেত্রে বেতারের ভূমিকা সুদূরপ্রসারী। এক কথায় মানবজীবনের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পথনির্দেশ বেতার যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব।

জনজীবনে বেতারের প্রভাব :

আমাদের দেশে বেতারের যথাযথ ব্যবহারের গুরুত্ব তুলনামূলকভাবে বেশি। অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা, কুসংস্কার ইত্যাদির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বেতারযন্ত্র অন্যতম প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠতে পারে।

নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে বেতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে সক্ষম। অবশ্য এবিষয়ে সুচিন্তিত কর্মসূচী গ্রহণের ওপর অনেক কিছুই নির্ভর করে। গ্রামাঞ্চলে বহু রোগ আজও মহামারী হিসেবে দেখা দেয়, বেতারে স্বাস্থ্যবিধি প্রচারের দ্বারা তার মোকাবিলা করা সম্ভব। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন বৃত্তিজীবীদের তাঁদের স্ব-স্ব কর্মের ক্ষেত্রে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থাদি সম্বন্ধে বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে অবহিত করে আমরা তাদের বাস্তব উন্নতির পথ উন্মুক্ত করতে পারি। বিশেষ করে কৃষি-সংক্রান্ত নানা আলোচনায় কৃষিজীবীরা তাঁদের সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত পান এবং অধিক ফলনের নানা নির্দেশ পান। এতে তাঁরাই যে শুধু উপকৃত হন তা নয়, সমস্ত দেশই পরোক্ষভাবে উপকৃত হয়। কারণ কৃষিমঙ্গল সারা দেশেরই মঙ্গল বয়ে আনে।

জীবিকা ছাড়াও জনজীবনের নানা দিক সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবহিত রাখতেও

বেতারের অবদান কম নয়। সুনাগরিকের একটি প্রধান গুণ তাদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন থাকা, তাঁদের সে বিষয়ে সচেতন রাখতেও বেতারের ভূমিকা কম নয়।

এই ভাবে বিভিন্ন উপায়ে জনজীবনে মঙ্গলময় পরিবর্তন আনার কাজে বেতারের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শুভবোধ-নির্দেশিত পথে পরিচালিত হয়ে জনজীবনে যুগান্তকারী পরিবর্তন আনার কাজে বেতারকে আমরা যেন ব্যবহার করতে পারি, এই আমাদের ঐকান্তিক কামনা।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. বিজ্ঞানের আশীর্বাদ। ২, বেতার ও আধুনিক জীবন। ৩. সভ্যতা বিকাশে বেতার।

আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থা

[ভূমিকা—পরীক্ষার স্বরূপ—পরীক্ষার বর্তমান অবস্থা—পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা—অসুবিধা ও সমাধান—পরীক্ষা পদ্ধতি—পদ্ধতি পর্যালোচনা—আধুনিক ব্যবস্থা—সমাধান—বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা —উপসংহার]

শেখা মানে এগোনো—সামনে চলা ; অদৃষ্টপূর্ব হাজারো বিস্ময়ভরা পথে চোখ-কান-মন খুলে চলা। আর এই শেখাই শক্তি, নব নব ক্ষমতার উন্মেষ। এ যাত্রায় মনের ক্লান্তি নেই কিন্তু শরীর তো ক্ষান্তি চায়, চলার পথে তাই প্রয়োজন বিশ্রাম গ্রহণ। বিশ্রামের সময় মন পেরিয়ে-আসা পথ বেয়ে ফিরে চলে ; দেখার আনন্দ তখন অভিজ্ঞতায় পর্যবসিত। কিছু বাদ গেল না তো দেখায় ? কোনো প্রয়োজনীয় সুন্দর ? কোনো কিছু কি না-বোঝা থেকে গেল ? হোক না তার পরীক্ষা।

ভূমিকা

তারপর আবার চলা, আবার শেখা, শেখার—পরীক্ষার—আবার শেখার অন্তহীন পথপরিক্রমা এই জীবন। যা দেখেছি যা পেয়েছি তার সালতামামি পরীক্ষা ; দুনিয়ার হাটে দিনভর বেচাকেনার পর দিনান্তের অবশ্যকরণীয় জমা-খরচের হিসেবের নাম পরীক্ষা।

পরীক্ষার স্বরূপ

সুতরাং, বলা বাহুল্য, পরীক্ষা শিক্ষার আবশ্যিক অঙ্গ। কিন্তু এমন যদি হয় হিসেবলেখার জন্যেই বেচা-কেনা। তা হলে না রইবে দেওয়া-নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়ার অবকাশ, না হবে সারাদিনের আলোয় চোখ মেলা, সবটাই ব্যর্থ ; পরীক্ষা দেওয়ার জন্যেই যেন শেখা, ছন্দ-অলংকার নির্ণয়ের জন্যেই যেন কবিতা লেখা।

আমাদের বর্তমান শিক্ষাপদ্ধতিতে পরীক্ষাব্যবস্থা যেন সেই অবস্থায় এসে পৌঁছেছে শেখার আনন্দ নেই, তাই চলা নেই, বদ্ধ জলা, স্তব্ধগতি শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ পচন আজ স্পষ্ট। ভূতটা এখানে সরষের অর্থাৎ খোদ পদ্ধতির মধ্যেই। সেটা একটু খতিয়ে দেখা যাক।

পরীক্ষার বর্তমান অবস্থা

আমাদের পরীক্ষাব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ, দু'পর্যায়ে বিভক্ত,—আভ্যন্তরীণ ও বহিঃস্থ।

প্রথম ক্ষেত্রে পরীক্ষাগ্রহণ, ফলপ্রকাশ ইত্যাদি দায়িত্ব শিক্ষায়তন-কর্তৃপক্ষের, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে এই দায়িত্ব বহিঃস্থ কোনো সংস্থা বা 'বোর্ডের' হাতে ন্যস্ত থাকে। সাধারণত কোনো পরীক্ষা পাশের স্বীকৃতিজ্ঞাপক অভিজ্ঞান-পত্র দান বা ডিগ্রি বিতরণ ইত্যাদি দায়িত্বও থাকে ঐ বহিঃস্থ পরীক্ষাগ্রহণকারীর হাতে। কিন্তু এই সব পরীক্ষা-নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির সঙ্গে শিক্ষায়তনগুলির যোগাযোগ থাকে না। ফলে পড়াশোনার মান, শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ইত্যাদির সঙ্গে প্রশ্নপত্রের সামঞ্জস্য বজায় থাকে না।

পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা

পরীক্ষকেরা বোঝেন শিক্ষায়তনভেদে উত্তরপত্রের মানের কী পরিমাণ তারতম্য ঘটে। এই সমস্যা দূর করার জন্যে শিক্ষায়তন ও নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও বোঝাপড়া প্রয়োজন।

অসুবিধা ও সমাধান

এবার আসে পরীক্ষাপদ্ধতির কথা। পদ্ধতির ক্ষেত্রে আমাদের ব্যবস্থাকে বলা যায় প্রাচীনপন্থী, রচনাধর্মী। পরীক্ষার সময়ে ছেলেরা প্রশ্নপত্র পায় এবং তার থেকে নির্দিষ্টসংখ্যক প্রশ্নের উত্তর তাদের লিখতে হয়—এই উত্তর পত্র থেকে তাদের লব্ধ শিক্ষার মান নির্ধারণ করা হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতি

কিন্তু এই পদ্ধতিতে নানা অসুবিধা আছে, বিশেষত এ ভাবে পরীক্ষার্থীদের যথার্থ মূল্যায়ন করা অত্যন্ত দুরূহ। বিষয়বস্তু ছাড়াও লিখনভঙ্গী, হস্তাক্ষর ইত্যাদি আনুষঙ্গিক বিষয় দ্বারা পরীক্ষক প্রভাবিত হতে পারেন। ফলে মূল্যায়নের সম্বন্ধে যথার্থ সন্দেহ থেকে যায়। অবশ্য এর ভালো দিকও আছে। পরীক্ষার্থীর জ্ঞান, লিখনক্ষমতা ইত্যাদির প্রকাশ তার লেখায় ঘটে।

পদ্ধতি পর্যালোচনা

আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতিতে পরীক্ষার এই রীতি প্রায় বাতিল হয়ে যায় এবং পরিবর্ত রীতি হিসেবে আসে নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি। আমাদের নতুন মাধ্যমিক শিক্ষায় এই পদ্ধতিকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। এই রীতিতে অনেক বেশি প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় পরীক্ষার্থীকে, তবে সমস্ত উত্তরই আকারে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। অনেক ক্ষেত্রে উত্তর প্রশ্নপত্রে দেওয়া থাকে, পরীক্ষার্থীকে সত্যমিথ্যা-নির্ধারণ বা ঠিক উত্তর বাছাই করতে হয়।

আধুনিক ব্যবস্থা

পদ্ধতিতে মূল্যায়ন নিঃসন্দেহে সহজতর, কিন্তু পাঠ্যবিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি করা বা সাহিত্যবোধ গঠন করা, যা শিক্ষালাভের অন্যতম প্রাথমিক উদ্দেশ্য, তা কতদূর সিদ্ধ হয় ভাবার আছে।

নৈর্ব্যক্তিক

এখন এই দুই পদ্ধতিকে গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা পরিমার্জিত করে নতুন কোনো উন্নততর পদ্ধতি সৃষ্টি করা প্রয়োজন। এবার পরীক্ষাগ্রহণের সময়সংক্রান্ত সমস্যাটির আলোচনা করা যাক। এক্ষেত্রেও কিছু বাঞ্ছিত পরিবর্তন প্রয়োজন। সাধারণত শিক্ষায়তনগুলিতে একটি শিক্ষাবর্ষে দু'টি পরীক্ষা গ্রহণ করা হয়—ষাণ্মাসিক ও বাৎসরিক। ছেলেরা গুরুত্ব দেয় শুধুমাত্র বাৎসরিক পরীক্ষার,—কারণ বছরশেষের বৈতরণী পার হওয়াই হল শিক্ষালাভের মাপকাঠি। সেক্ষেত্রে যা ঘটে তা এই: অধিকাংশ ছাত্র সারা বছর নমো-নমো করে বছর শেষে

সমাধান

গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিপুজোর প্রস্তুতিতে বসে, পরিশ্রান্ত হয়, বিরক্ত হয়, ভীত হয়, বছরের পড়াশোনার 'নীট' ফল এই! এ ক্ষেত্রে যদি সারা বছর ধরে পরীক্ষা নেওয়া হয়, পরীক্ষার সংখ্যা বাড়ানো যায়, ছেলেদের 'এক মাসের' পরিশ্রমকে 'বারো মাসে' ভাগ করে দেওয়া যায়, তা হলে পরিশ্রান্ত হতে হয় না, বিরক্ত হতে হয় না এবং বারবার পরীক্ষা দিতে দিতে পরীক্ষাভীতিও কমে। স্বাধীনতালাভের পরবর্তী কালে গঠিত শিক্ষাকমিশনগুলির অনেকেই এজাতীয় পরীক্ষার সুপারিশ করেছিলেন। এ সম্বন্ধে চিন্তা করা আশু প্রয়োজন। এখন অবশ্য অনেক বিদ্যালয়েই এই ধারাবাহিক পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসৃত হচ্ছে।

উন্নত দেশগুলিতে শিক্ষা আজ মূলত কর্মকেন্দ্রিক। সেখানে শিক্ষার্থী যা পড়ে, তা করে, যা দেখে, যা করে, তা শেখে এবং সেই শেখা জিনিসের প্রয়োগ ঘটায়। ফলে প্রথমত, শেখা জিনিস ভোলে না, দ্বিতীয়ত, শিক্ষায় মরচে পড়ে না। আমাদের দেশে কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের অসংখ্য অসুবিধার কথা স্বীকার করেও বলা যায় যে, আমরা অন্তত একটা নির্দিষ্ট, সম্ভবপর সীমা পর্যন্ত এ পদ্ধতির অনুসরণ করতে পারি। এবং তা করলে নির্জীব, নিরানন্দ শিক্ষায় হয়তো আবার প্রাণ সঞ্চার, করতে পারব।

বিদেশী শিক্ষাব্যবস্থা :

আশার কথা, সম্প্রতি শিক্ষাক্ষেত্রে এই সব সমস্যা দূর করার জন্যে একটা রদ-বদলের কথা শোনা যাচ্ছে, এর সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়ার সময় এখনও আসে নি, তবু আমাদের একান্ত প্রার্থনা অশিক্ষার তাপে শুষ্ক এই মরুভূমি শিক্ষার ধারাবর্ষণে যেন সুজলা, সুফলা হয়ে ওঠে।

উপসংহার :

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. পরীক্ষাব্যবস্থার একাল ও সেকাল। ২. জীবনে পরীক্ষার প্রয়োজনীয়তা।

চিন্তাসহায়ক বাণী

Examinations are formidable even to the best prepareds, for the greatest fool asks more than the wisest man can answer.
—C. C. Colton

স্বাধীন ভারতে ইংরেজী ভাষার স্থান

[সূচনা—এক সময় ইংরেজি ভাষার প্রয়োজন—ইংরেজি ভাষার ব্যর্থতা—সাফল্যের দিগন্ত—ইংরেজি গ্রহণীয় না বর্জনীয়—মাতৃভাষায় শিক্ষা—শেষকথা]

নানান দেশে নানান ভাষা
বিনা স্বদেশী ভাষা
পুরে কি আশা। —রামনিধি গুপ্ত

সূচনা : প্রায় দুশো বছরের শাসনশৃঙ্খল ছিন্ন করে ভারত স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু রাজনীতিক পরাধীনতা থেকে মুক্তি পেলেও সাংস্কৃতিক পরাধীনতা থেকে ভারত আজও মুক্তি পায়নি। আজও আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে, সরকারী কাজে ইংরেজির রাজত্ব অব্যাহত। ইংরেজরাজত্বের অবসান হলেও জানি না, কবে ইংরেজিরাজত্বের অবসান হবে!

এক সময় ইংরেজি ভাষার প্রয়োজন : ভারতে একদিন ইংরেজিভাষার প্রভূত আভিজাত্য ছিল, ছিল প্রচুর সম্ভ্রমমর্যাদা। সেদিন মুষ্টিমেয় মানুষ ইংরেজি ভাষায় প্রবন্ধ রচনা করেছে, বিতর্ক-মূলক আইনের খসড়া তৈরি করেছে। সেদিন আমাদের কাছে ইংরেজি ছিল কল্পতরু—দেশবাসীর আশাআকাঙ্ক্ষা ও বাস্তব জীবনের সিদ্ধির নিয়ামক। বলা বাহুল্য, দেশের জল-হাওয়া-মাটি-আলোর সঙ্গে তার কোনো যোগবন্ধন ছিল না, আজও নেই। এখন ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে গেছে, আমরা স্বাধীন হয়েছি। এই স্বাধীন ভারতে ইংরেজির স্থান কী, গুরুত্বই বা কতখানি, সে বিষয়ে চিন্তা করার সময় এসেছে।

ইংরেজি ভাষার ব্যর্থতা : অগণিত জনগণের সুপ্ত মনুষ্যত্বকে উদ্বোধিত করে তোলা, জীবনসংগ্রামে জয়ী হবার শক্তিসামর্থ্য দান করা, জ্ঞানের আলো বিকিরণ করে জাতিকে বৃহত্তর কল্যাণের পথে এগিয়ে দেওয়া হল শিক্ষার উদ্দেশ্য। কিন্তু বহুকালের ইংরেজি শিক্ষা এর কোনোটাই করতে পারে নি। উপরন্তু দেশের সর্বসাধারণের শিক্ষাপ্রবাহকে রুদ্ধ করেছে, পঙ্গু করেছে স্বদেশী ভাষাকে, মানুষে মানুষে বিভেদ ঘটিয়ে জাতীয় সংহতিকে করেছে দুর্বল। এই বিভেদের রন্ধ্রপথে বহু অকল্যাণ প্রবেশ করেছে, প্রবেশ করেছে বহু সর্বনাশ।

সাফল্যের দিগন্ত : তবে ইংরেজির মাধ্যমেই আমরা ইউরোপীয় চিন্তাধারার সঙ্গে ও পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান, দর্শন, রাজনীতি, সমাজনীতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। এরই ফলে ভারতীয় জাতীয় জীবনে দেখা দিয়েছিল রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ। এমন কি, দেশাত্মবোধের শিক্ষাও আমরা পেয়েছি এই ইংরেজির মাধ্যমে। জ্ঞানের ক্ষেত্র সম্প্রসারণে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে ধারণার অভিনবত্বে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য একদিন জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

ইংরেজি গ্রহণীয় না বর্জনীয় : প্রায় দুশো বছর ইংরেজিভাষা আমাদের মনের মাটিতে শিকড় গেড়ে বসেছে : যদিও আজ ইংরেজপ্রভুর রক্ত-চক্ষু শাসন নেই, তবু ইংরেজিভাষার কবল থেকে আমরা সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারি নি। আজ দ্বৈত-চিন্তা আমাদের মনে এসেছে : কখনও মনে হয়েছে এ ভাষা গ্রহণীয়, কখনও মনে হয়েছে বর্জনীয়। যাঁরা গ্রহণীয় বলে মনে করেন, তাঁরা বলেন ইংরেজি ভাষা হল জ্ঞানচক্ষু; সারা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার ইংরেজির মাধ্যমে আমাদের অধিগত হয়। আর যাঁরা বর্জনীয় বলে মনে করেন তাঁরা বলেন, ভারত গণতন্ত্রের দেশ। তাই জনগণের ভাষাকেই মর্যাদা দিয়ে ইংরেজির অবসর গ্রহণ করা উচিত।

কেন্দ্রীয় সরকারের পরলোকগত শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ এক

সময় বলেছিলেন : "ইংরেজি ভাষা এতকাল ধরে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে ও সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিশেষ স্থান অধিকার করেছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে তা আর সেই স্থানটি দখল করতে পারে না। ভারতীয় কোন একটি ভাষাকেই ধীরে ধীরে তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।" পরলোকগত শিক্ষামন্ত্রী 'ধীরে ধীরে' কথাটির উপর জোর দিয়েছেন। দুশো বছরের শিকড়গাড়া ভাষাকে রাতারাতি বদলে দিতে পারা যায় না, তা হলে জীবনের নানা ক্ষেত্রে বিপর্যয় দেখা দেবে। ভারতীয় কোনো একটি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভের উপযুক্ত করে তুলতে হবে। বর্তমানে হিন্দী ভাষা সেই মর্যাদায়।

ইংরেজিভাষার মাধ্যমে আমরা একদিন সুদূরকে জেনেছি। কিন্তু আমাদের ঘর বা ঘরের মানুষকে জেনেছি কতখানি সে প্রশ্ন আজ দেখা দিয়েছে। স্কুল-কলেজে

মাতৃভাষায় শিক্ষা :

ইংরেজিভাষার প্রভাবে কী অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে ধরা পড়ে : 'স্কুলকলেজে ইংরেজি ভাষায় অবগুণ্ঠিতা বিদ্যা স্বভাবতঃই আমাদের মনের সহবর্ণিনী হইতে পারে নাই। সেইজন্য আমরা যে পরিমাণে শিক্ষা পাইয়াছি সেই পরিমাণে বিদ্যা পাই নাই। আমাদের শিক্ষার ভোজে ঘটে তাই অমেয় অপচয়।' কবির আরও দুঃখ, 'চারিদিকের আবহাওয়ার থেকে এ বিদ্যা বিচ্ছিন্ন।'

মাতৃভাষার মাধ্যমেই চিত্ত-মুক্তি ঘটা সম্ভব। আমাদের পার্থিব জীবনের সব ভাবনাচিন্তা আশা-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণ মাতৃভাষা ছাড়া সম্ভব নয়। ভারতীয় মনীষিগণের চেষ্টায় ভারতীয়-ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হলেও এখনও ভারতীয় ভাষা উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হতে পারে নি। বিজ্ঞানশাস্ত্র, ডাক্তারি বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর গ্রন্থগুলি এখনও ভারতীয় ভাষায় রচিত হয় নি। উচ্চশিক্ষার ব্যাপারে দেশীয় ভাষাকে উপযুক্ত পরিভাষার সাহায্যে সমৃদ্ধ করে তুলে যাতে শিক্ষার বাহন রূপে গণ্য করা যায় আমাদের সেদিকেও নজর দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে আগ্রহী হতে হবে দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলিকেও।

ভাষা সমস্যা যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি জটিল। তাই এর সমাধান সর্তকতার সঙ্গে না করলে একটি সমস্যার জায়গায় বহু সমস্যা দেখা দেবে। অন্ধ প্রাদেশিকতা প্রথমেই

শেষকথা :

বর্জন করতে হবে। বর্জন করতে হবে নিছক ভাবালুতাকেও। শিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজির দিকে পিঠ ফিরিয়ে দাঁড়ালে আমরা শক্তিকেই নির্বাসন দেব কিনা সে কথা ভাবতে হবে। আমাদের মনে হয় প্রাদেশিক ভাষার উন্নয়ন করতে গিয়ে ইংরেজি হটানোর প্রয়োজন আমাদের হবে না। ভারতীয় সংস্কৃতির গোড়ার কথা হল আত্মীকরণ। ইংরেজির ব্যাপারেও ভারত সেই সমন্বয়ের পথ থেকে বিচ্যুত হবে না।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা। ২. ভারতের রাষ্ট্রভাষা।

৩. শিক্ষায় মাতৃভাষা বনাম ইংরেজিভাষা।

চিন্তাসহায়ক বাণী

রাষ্ট্রিক কাজের সুবিধা করা চাই বই-কি, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কাজ দেশের চিত্তকে সরস ও সমুজ্জ্বল করা। সে কাজ আপন ভাষা নইলে হয় না।

—রবীন্দ্রনাথ।

ইতিহাসপাঠের প্রয়োজনীয়তা

[সূচনা—সাধারণ মানুষ ইতিহাসবিমুখ—ইতিহাস কী, ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন কতখানি—নীরব শিক্ষকের বাণী—ইতিহাস পাঠের প্রভাব—শেষকথা]

কথা কও, কথা কও।
অনাদি অতীত, অনন্ত রাতে
কেন বসে চেয়ে রও?
কথা কও, কথা কও।—রবীন্দ্রনাথ

সূচনা

পৃথিবীতে মানুষ হল পথিক। তারা ক্রমাগত চলেছে এক সভ্যতা থেকে অন্য সভ্যতায়, এক যুগ থেকে অন্য যুগে। তাদের চলার এই ধ্বনি স্তম্ভিত হয়ে আছে ইতিহাসের পাতায়। যে-কথা যে-কাহিনী কালের গর্ভে লীন হল সবাই ভুলে গেল তাদের কথা, কিন্তু ইতিহাস তাদের মণিমুক্তার মতো সযত্নে কুড়িয়ে নিয়ে গেঁথে রাখল নিজের কণ্ঠহারে। কবি তাই বলেছেন: "যাহাদের কথা ভুলেছে সবাই তুমি তাহাদের কিছু ভোল নাই।"

সাধারণ মানুষ ইতিহাস-বিমুখ

সাধারণ মানুষ তেমন ইতিহাস-সচেতন নয়। তাদের কারবার বর্তমান আর ভবিষ্যৎ নিয়ে, তাই তারা অতীতচারী নয়। তাদের কাছে অতীত মৃত, তাই তারা ভাবে—কী হবে মৃত অতীতের কথা জেনে, যার মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রাপ্তির কোনো সম্ভাবনা নেই, নেই পার্থিব সম্পদ লাভের গোপন চাবি। সেই কারণে তাদের দৃষ্টি বর্তমানেই আবদ্ধ, বড়োজোর ভবিষ্যতের দিগন্তের দিকে প্রসারিত। কিন্তু প্রকৃত জ্ঞানীর কাছে ইতিহাস অবহেলিত হয় না। দেখার চোখ নেই বলেই অতীতকে মৃত বলে মনে হয়, কিন্তু ঋষিকবি বলেন: 'হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে কাজ করে যাও গোপনে গোপনে।'

ইতিহাস কী, ইতিহাস পাঠের প্রয়োজন কতখানি

প্রত্যেক মনীষীই ইতিহাসপাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেছেন। সে কি কেবল মৃত কাহিনীর কঙ্কাল ঘাঁটার জন্যে? এ প্রশ্নের উত্তর খোঁজার আগে ইতিহাস সম্পর্কে আমাদের একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন। অনেকে ইতিহাস বলতে বোঝে, রাজা-মহারাজাদের কাহিনী, তাঁদের বংশের পরিচয়, যুদ্ধবিগ্রহের বিবরণ আর সাম্রাজ্যবিস্তারের কথা। তাই ইতিহাস পড়তে গিয়ে আমরা রাজাবাদশার সিংহাসন আরোহণের নির্ভুল সাল তারিখ মুখস্থ বলতে পারি, কিন্তু সে সময়কার সমাজ-জীবন, অর্থনৈতিক জীবন বা সৃষ্টি-মূলক কর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে কোনো কথা বলতে পারি না। আমরা ভুলে যাই ইতিহাস একটি

জাতির সামগ্রিক জীবনচর্যা ও সর্ববিধ কর্মপ্রচেষ্টার ধারাবাহিক বিবরণ। একটা জাতির জীবনের দর্পণ হল ইতিহাস।

আমাদের মনীষীরা তাই ইতিহাসের কাছে শিক্ষা নিতে বলেছেন। কারণ অতীত পৃথিবীর জ্ঞানসমুদ্র ইতিহাসের পাতায় পাতায় স্তব্ধ হয়ে আছে। অতীত আমাদের পথ দেখায়, অন্ধকারে আলোর দিশারী হয়ে। ইতিহাস মানুষের সবচেয়ে বড়ো শিক্ষক। কোন্ পথে চলতে হবে, কোন্ পথে চলে কোন্ দেশ উন্নতি করেছে আর কোন্ পথে অগ্রসর হলে জাতীয় জীবনে চরম সর্বনাশ ঘনিয়ে আসবে, এসব শিক্ষাই তো ইতিহাসের শিক্ষা। জাতিগঠনে তাই সবচেয়ে বড়ো ভূমিকা ইতিহাসের। আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র গড়তে হলে উন্নতশীল দেশের ইতিহাস পর্যালোচনা আবশ্যক। তবেই এক জাতির ইতিহাস অন্য জাতির ইতিহাসের পরিপূরক হয়ে উঠবে।

নীরব শিক্ষকের বাণী

নীরব শিক্ষক এক বিশাল পাঠশালা খুলে বসে আছে। শ্রদ্ধা আর নিষ্ঠা থাকলেই এখানে প্রবেশ করা যায়। সেখানে নীরব ভাষায় এই ইতিহাস পাঠদান করে: পশুশক্তির বলে কোনো জাতি যদি অন্য দেশকে পদানত করে, তার ন্যায়বোধ ধ্বংস ক'রে হিংস্রতার নখদন্ত বিস্তার করে তার পতন অনিবার্য। পৃথিবীর সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তার প্রমাণ। কোথায় গেল রোম সাম্রাজ্য, আলেকজাণ্ডারের বীরবিক্রম, ব্রিটিশসিংহের বিশ্বগ্রাসের অভিলাষ, হিটলার-মুসোলিনীর মানবতাবিরোধী বিশ্বসন্ত্রাসী রণনীতি? ভারতের বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি, কুসংস্কার ও বিলাসপ্রিয়তা কি আমাদের কপালে পরাধীনতার কালিমা লেপন করে নি? ইতিহাস শিক্ষা দেয় আর বলে: সাবধান! এপথে হেঁটো না, এপথে চোরাবালি আছে, এপথে আছে ডুবো পাহাড়—তোমাদের সর্বনাশ হবে এপথে পাড়ি দিলে।

ইতিহাস পাঠের প্রভাব

স্বদেশের ইতিহাস পড়ে আমরা দেশকে ভালবাসতে শিখি। দেশের অতীত গৌরব ও বীরত্ব আমাদের মনে অনুরূপ ভাবের সঞ্চার করে। আমাদের বুদ্ধ, অশোক, অতীশ দীপঙ্কর, আমাদের শ্রীচৈতন্য, রাণাপ্রতাপ আর শিবাজীর কাহিনী আমাদের হীনম্মন্যতা দূর করে গৌরবময় অতীতের অংশীদার করে তোলে। আমাদের পূর্বসূরীদের কাহিনী কানে কানে অবিরত বলতে থাকে: তুমি ছোটো নও, তুমি দুর্বল নও—তুমি সিংহের শিশু সিংহ। অতএব ওঠো জাগো। ইতিহাসখ্যাত মহাপুরুষদের জীবন ও কর্মের আদর্শ আমরা প্রয়োজনমতো গ্রহণ করতে পারি, প্রয়োগ করতে পারি মানবকল্যাণে। উদাহরণ হিসাবে শ্রীচৈতন্যের আইন অমান্য আন্দোলনের কথা বলতে পারি। কাজীর আদেশে হরিনাম সংকীর্তন বন্ধ হলে শ্রীচৈতন্য অহিংস উপায়ে আইন অমান্য করার যে-জীবন্ত দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন তার তিনশো বছর পরে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনকেই যুগোপযোগী করে আমরা কি ব্যবহার করি নি? একেই বলে ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

ইতিহাস পার্থিব বস্তুর নশ্বরতার দিকে আমাদের দৃষ্টি ফেরায়। আমরা দেখি:

'রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে,

জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে,
রক্তমাখা অস্ত্রহাতে যত রক্ত আঁখি,
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।'

যা চিরকালের সম্পদ নয়, তা কালস্রোতে ভেসে যাবে বুদ্বুদের মত, লীন হবে শূন্যতায়। তাই মানুষকে চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারী হতে ইতিহাস শিক্ষা দেয়।

শেষকথা

ইতিহাস বলে 'ইতি হ আস' অর্থাৎ 'এই রকমই ঘটেছিল, এইরকমই ছিল'। অর্থাৎ ইতিহাস বলছে যা যেভাবে আর যে-কারণে ঘটেছে তা তো দেখলে, এবারে তোমরা কীভাবে চলবে বিচার করে চলো। ইতিহাস গড়ে তোলো ইতিহাস হাতে নিয়ে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. নিজের দেশকে জান। ২. দেশ গঠনে ইতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা।

চিন্তাসহায়ক বাণী

প্রকৃত ইতিহাস লোকসমাজের দর্পণ-স্বরূপ। মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে পাঠকের দূরদর্শিতার বিস্তার করা এবং মানবের কার্য-পরম্পর' সম্বন্ধে পাঠকের বিচারশক্তির উন্মেষ করা ইহার উদ্দেশ্য। —রজনীকান্ত গুপ্ত : ইতিহাস রচনার প্রণালী

ইতিহাস মানুষের সজ্ঞান কার্যের বিবরণ। কোন্ জাতি কবে কোথায় কী করিয়াছে, কেবল তাহার তালিকা রাখা ইতিহাসের উদ্দেশ্য নহে। সেই সকল কার্যের কারণ কি, ও তাহাদের ফলই বা কী? এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির অভ্যুত্থান, উন্নতি ও অবনতি কী নিয়মে ঘটিয়াছে। মনুষ্যজাতিই বা কী নিয়মে কোন্ পথে অগ্রসর হইতেছে, এই সকল তত্ত্ব নির্ণয় ইতিহাসের উদ্দেশ্য।

—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : জ্ঞান ও কর্ম

Not to know what has been transacted in former times is to be always a child. If no use is made of the labours of past ages, the world must remain always in the infancy of knowledge.

—Cicero (100—43 Bc),
—Roman plilosopher

শিক্ষাক্ষেত্রে খেলাধূলা

[ভূমিকা—খেলাধূলার আধুনিক মূল্যায়ন—খেলাধূলা সম্পর্কে পুরানো চিন্তা—শিক্ষা সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারা—খেলাধূলা শিক্ষার অঙ্গ—সিলেবাসে খেলাধূলা—শিক্ষাক্ষেত্রে খেলাধূলার প্রতিক্রিয়া—খেলাধূলা শিক্ষণীয় বিষয়—সমস্যার কথা—উপসংহার]

"All work and no play makes Jack a dull boy" কথাটি বহুশ্রুত। কিন্তু

কথাটা আমরা হাল্কা ভাবে ব্যবহার করলেও এর গুরুত্ব যথেষ্ট আছে। 'dull boy' কথাটি শুধু বুদ্ধিবৃত্তি বিকাশের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। একটি ছেলের পরিপূর্ণ আত্মবিকাশের ক্ষেত্রে খেলাধূলা অপরিহার্য। মাঠের সঙ্গে পাঠের নিবিড় সম্পর্ক। কবির কথায় বলতে হয়,

ভূমিকা

আমাদের খেলাধূলা নয় তো নিছক খেলা
খেলার ছলে আমরা সবাই বসাই প্রাণের মেলা।

খেলাধূলার আধুনিক মূল্যায়ন

বর্তমান যুগে নতুন নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে খেলাধূলার মূল্য বিচার করা হচ্ছে। বিজ্ঞানসম্মত ও মনস্তাত্ত্বিক চিন্তাধারার আলোকে খেলাধূলার গুরুত্ব ভেবে দেখা হচ্ছে এবং সেই-সব ভাবনার বাস্তব প্রয়োগও দেখা হচ্ছে। আজকাল খেলাধূলা যথেষ্ট মর্যাদা পাচ্ছে। খেলার গণ্ডি আজ এক বিশাল রাজ্যে সম্প্রসারিত।

খেলাধূলা সম্পর্কে পুরানো চিন্তা

কিছুদিন আগেও খেলাধূলার তেমন কদর ছিল না। খেলাধূলাকে ছোটো করে দেখা হত। মনে করা হত এটা সময়ের অপব্যবহার। অধ্যয়ন যেখানে তপস্যা হিসেবে বিবেচিত সেখানে খেলাধূলা অবাঞ্ছিত। যেসব ছেলেরা খেলাধূলা নিয়ে বেশি মাতামাতি করত তাদের বাউণ্ডুলে হিসেবে দেখা হত। পাঠের মধ্যে মাঠের স্থান বড়ো একটা ছিল না। খেলাধূলা যে শিক্ষার অঙ্গ এ কথা ছিল অবাস্তব। সাধারণভাবে শারীরচর্চা, ব্রতচারী ইত্যাদির ব্যবস্থা থাকলেও তার আয়োজন ছিল সীমিত।

শিক্ষা সম্পর্কে নতুন চিন্তাধারা

স্বাধীনতার পর থেকে দেশের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে নতুন নতুন চিন্তাধারা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল। আজও চলেছে নানা গবেষণা, নানা ধারার প্রবর্তন ইত্যাদি। সিলেবাসেরও পুনর্বিন্যাস ও পরিবর্তন চলছে। নানাবিষয়ের সঙ্গে খেলাধূলাকে সিলেবাসে কীভাবে স্থান দেওয়া যায় তা নিয়ে অনেক আলোচনা চলছে। খেলাধূলার নতুন মূল্যায়ন এবং কী-ভাবে তার বাস্তব প্রয়োগ ঘটানো যায় তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা অনেক চিন্তা করছেন। খেলাধূলা শেষ পর্যন্ত সাদর অভ্যর্থনাই পেয়ে গেল।

খেলাধূলা শিক্ষার অঙ্গ

খেলাধূলাকে আজ শিক্ষার অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বুদ্ধির সর্বাঙ্গীণ উৎকর্ষ, ব্যক্তিত্বের বিকাশ, শরীর ও মনের উন্নয়ন—এ সব কিছু খেলাধূলার মাধ্যমে কী ভাবে সম্ভব হতে পারে তা নিয়ে মোটামুটিভাবে এক সিদ্ধান্তে আসা গেছে। খেলাধূলা বিদ্যালয়ের শিক্ষার সহায়তা করে—অর্থাৎ খেলাধূলাকে শিক্ষার বিশেষ অঙ্গ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

সিলেবাসে মাধ্যমিকের পাঠক্রমসূচীতে খেলাধূলা আজ একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। এর জন্যে উপযুক্ত শিক্ষণ ও পরীক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। বিদ্যালয়ে ফুটবল, ক্রিকেটের সঙ্গে আরো অন্যান্য খেলাধূলার ব্যবস্থা রাখার কথাও বলা হয়েছে। অনেক লুপ্তপ্রায় বা পুরোনো দিনের খেলাও ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চলছে—যেমন, কাবাডি,

খো খো ইত্যাদি খেলাধূলার জন্যে বিশেষ অর্থবরাদ্দেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। রুটিনে খেলাধূলার জন্যে বিশেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে। খেলাধূলার পরিচালনার জন্যে বিশেষ শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকও নিয়োগ করা হয়েছে। যেসব বিদ্যালয়ে মাঠ নেই সে সব বিদ্যালয়েও যাতে অন্য কোথাও খেলা যায় তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বা হচ্ছে।

সিলেবাসে খেলাধূলা

শিক্ষাক্ষেত্রে খেলাধূলার আয়োজন যে ছাত্রছাত্রী মহলে বিশেষ সাড়া জাগিয়েছে এতে কোনো সন্দেহ নেই। মাঠের সঙ্গে যোগাযোগে পাঠ অনেকখানি আনন্দময় হয়ে উঠেছে, এ কথা অস্বীকার করে লাভ নেই। অভিভাবকবৃন্দও এই ব্যবস্থাকে মেনে নিতে কুণ্ঠিত হন নি। তবে ক্ষেত্রবিশেষে বিরূপ সমালোচনাও চলছে। সেটা নানা কারণে, সে-প্রসঙ্গে আমরা পরে আসছি।

শিক্ষাক্ষেত্রে খেলাধূলার প্রতিক্রিয়া

শিক্ষাক্ষেত্রে খেলাধূলার সার্থকতা নির্ভর করে খেলাধূলার বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষাদানের ওপর। অন্যান্য বিষয়ের মতো খেলাধূলাও শেখবার জিনিস। এই শিক্ষার সাফল্যের জন্যে চাই উপযুক্ত পরিবেশ, সাজসরঞ্জাম, যোগ্য শিক্ষকের মাধ্যমে শিক্ষাদান। ছাত্রছাত্রীদের অধ্যবসায়, মনোযোগ, সাধনা, আন্তরিকতা—এসব চাই-ই। বিশেষ ক্ষমতা বা প্রতিভা না থাকলে কেবল শিক্ষার গুণে মানুষ পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। আজকাল সারা বিশ্বে বিজ্ঞানসম্মত কোচিং-এর ব্যবস্থা করা হচ্ছে। আমাদের এই ভারতেও পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় আছে কোচিং শিবির। সেখানে খেলোয়াড়দের গড়ে তোলার প্রচেষ্টা করা হচ্ছে। অল্প বয়সের ছেলেদের জন্যেও কোচিং-এর ব্যবস্থা করা চলছে। মোট কথা, খেলাধূলা বিশেষ শিক্ষা ছাড়া যে প্রত্যাশিত পর্যায়ে আসে না, এটা আজ মেনে নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খেলাধূলায় ভারতের মান নিচু বলেও আজ খেলাধূলার ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই তো বলছেন, শিক্ষাক্ষেত্রে খেলাধূলাকে আরো সম্প্রসারিত এবং আবশ্যিক করা হোক।

খেলাধূলা শিক্ষণীয় বিষয়

শিক্ষাক্ষেত্রে খেলাধূলাকে বিশেষ স্থান দেওয়া হলেও অনেক সমস্যা দেখা দিচ্ছে। বিশেষত গ্রামের দিকে এই সমস্যার প্রচণ্ডতা বেশি। মাঠের অভাব, উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব, সাজ-সরঞ্জামের ঘাটতি, তারপর ছাত্রদের জলখাবারের সমস্যা প্রভৃতি বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। খেলাধূলার মাধ্যমে শরীরচর্চা হলেও এর জন্যে বিশেষ ধরনের শরীরচর্চার ব্যবস্থা বা সুযোগ থাকা দরকার। দুঃখের বিষয়, খুব কম বিদ্যালয়েই খেলাধূলার ভালো ব্যবস্থা দেখা যায়। আর একটা সমস্যা হল, বড়ো বড়ো খেলার আসরে উচ্ছৃঙ্খলতা আজ সমগ্র খেলাধূলার জগৎকে কলুষিত করেছে। এ সম্পর্কে বিশেষ ব্যবস্থা দেওয়া দরকার।

সমস্যার কথা

শিক্ষাক্ষেত্রে যাতে খেলাধূলা বিশেষ ভাবে সফল হয়ে উঠতে পারে তার জন্যে সরকারের উদ্যোগ, আনুকূল্য, পর্যবেক্ষণ এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের আরো বেশি স্বচেষ্ট হওয়া দরকার। খেলা খেলা বলে যতটা চেঁচানো হচ্ছে কাজ

উপসংহার

বোধ হয় ততটা হচ্ছে না। All work and no play যেমন কাম্য নয়, তেমনি All play and no work-ও অনাকাঙ্ক্ষিত।

চিন্তাসহায়ক বাণী

খেলার বৃত্তি আর প্রয়োজন সাধনের বৃত্তি মূলে একই। সেইজন্য খেলার মধ্যে জীবনযাত্রার নকল এসে পড়ে। —রবীন্দ্রনাথ

কেমনে মানুষ হবে না করিলে খেলা? খেলা। —রবীন্দ্রনাথ

আমাদের আবশ্যক—লৌহের মতো পেশী ও বজ্রদৃঢ় স্নায়ু —বিবেকানন্দ

শিক্ষাবিস্তারে গণমাধ্যমগুলির ভূমিকা

[ভূমিকা—দুইধারা—সংবাদপত্র—বেতার—দূরদর্শন—চলচ্চিত্র ও নাটক—গ্রন্থাগার—মিউজিয়াম—উপসংহার]

ভূমিকা

শিক্ষাই আলো। ঐ আলোতেই আমরা মিলিত। পরাধীন ভারতে বিদেশী শাসকেরা অন্ধকারকে কায়েম করে রাখতে চেয়েছিল, কারণ অন্ধকারই শোষণের উপযুক্ত পরিবেশ। শিক্ষারআলো ছড়ালে তারা শোষকদের স্বরূপ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠবে এই ভয়ে তাঁরা শিক্ষার বিস্তার চান নি। কিন্তু এখন আমরা বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত, আমরা নিশ্চয় আশা করব এবারে শিক্ষাবিস্তারের পথে আমরা দ্রুত গতিতে এগিয়ে যেতে পারব। কিন্তু দুঃখের বিষয় স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘদিন কেটে গেলেও আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরে।

দুইধারা

শিক্ষাবিস্তারকে আমরা প্রধানতঃ দুটি ধারায় ভাগ করতে পারি। একটি ধারায় চলবে যারা নিরক্ষর তাদের স্বাক্ষর করে তোলার চেষ্টা আর একটি ধারায় চলবে যারা স্বল্পশিক্ষিত তাদের মধ্যে আরও বেশি করে শিক্ষার আলো ছড়ানো। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে নানা ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে এ চেষ্টা চলেছে ঠিকই কিন্তু এই বিরাট দেশের প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই অপ্রতুল। এ ব্যাপারে গণমাধ্যমগুলোর ভূমিকা তাই এত গুরুত্বপূর্ণ।

গণমাধ্যম বলতে আমরা বুঝি সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন চলচ্চিত্র ইত্যাদি।

সংবাদপত্র

সংবাদ শিক্ষার পর্যায়ে পড়লেও শুধু সংবাদ পরিবেশন ও সংবাদ সমীক্ষাই আধুনিক সংবাদপত্রের কাজ নয়। সংবাদপত্র কৃষি, শিল্প ইত্যাদি নানা সাময়িক বিভাগ রেখে কৃষক শ্রমিক প্রভৃতি নানা বৃত্তির মানুষের মধ্যে বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা করে থাকে। কৃষি সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে বিশেষ জ্ঞান যুক্ত হলে কৃষকেরা দূর করতে পারবে ফসলের রোগ, ভূমিপ্রকৃতি ও তার বিশেষ শস্য ফলানোর যোগ্যতা সম্বন্ধেও হবে ওয়াকিবহাল। বীজ নির্ধারণের ব্যাপারেও হবে আরও

সতর্ক, সার প্রয়োগ ও অধিক ফলনের সম্ভাবনার ব্যাপারেও হতে পারবে অবহিত। বিভিন্ন বিভাগে বিশেষ বৃত্তির লোকেরাই যে এতে উপকৃত হবে তা নয়, জনসাধারণও দেশের মঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কিত নানা বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন করতে পারবে। একজন পড়ছে আর দশজন শুনছে এইভাবে পাঠচক্রের মধ্যে দিয়ে নিরক্ষররাও প্রয়োজনীয় বিষয় সম্বন্ধে জেনে নিতে পারে।

বেতার

নিরক্ষরদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে বেতারের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। 'পল্লীমঙ্গল' ইত্যাদি আসরের মধ্যে দিয়ে পল্লীর মানুষের কাছে তাদের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য যেমন তুলে ধরা হয়, তেমনি লোকসঙ্গীত, লোকনাট্য, তরজা, যাত্রা, পালাগান ইত্যাদির মাধ্যমে তাদেরকে আনন্দ দেওয়াও এই সব আসরের উদ্দেশ্য। একদিন পল্লীগ্রামে কথকতা ছিল শিক্ষাবিস্তারের মাধ্যম। রামায়ণ মহাভারত ভাগবত ইত্যাদি মহাগ্রন্থের কাহিনী অবলম্বনে পরিকল্পিত এই আঙ্গিক ছিল অত্যন্ত উপভোগ্য। বেতারে এই আঙ্গিকটির পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা ভাবা যেতে পারে।

দূরদর্শন

দূরদর্শন আজ অত্যন্ত জোরালো এক গণমাধ্যম। দৃশ্যতা ও শ্রাব্যতায় মিলে দূরদর্শন জনমনে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে। দূরদর্শনের প্রচার-পরিধির মধ্যে যে-সব পল্লী অঞ্চল সেখানে সরকারী উদ্যোগে বিশেষ বিশেষ জায়গায় টি. ভি. সেট রাখবার ব্যবস্থা করা দরকার। শিশু কিশোর যুবক—সব বয়েসের ছেলেমেয়েদের জন্যে শিক্ষামূলক নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন দূরদর্শনে থাকলেও বিশেষ করে নিরক্ষরদের স্বাক্ষর করবার জন্যে সুপরিকল্পিত অনুষ্ঠান প্রবর্তন করলে ভালো হয়। বলা বাহুল্য আঞ্চলিক ভাষাতেই এই ধরনের অনুষ্ঠান পরিকল্পিত হবে।

চলচ্চিত্র ও নাটক

চলচ্চিত্রের মতো একটি সজীব মাধ্যম শিক্ষাবিস্তারের বদলে জনরুচিকে বিকৃতই করে তুলছে, এটি একটি গভীর পরিতাপের বিষয়। মুষ্টিমেয় আর্ট ফিল্ম বাণিজ্যিক মনোভাব নিয়ে তৈরি ফিল্মের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় পরাস্ত। বিদেশী পুরস্কার বয়ে আনলেও দেশের মাটিতে তার শিকড় দৃঢ়মূল নয়। শিক্ষণীয় কিছু তথ্যচিত্র নির্মিত হলেও প্রয়োজনের তুলনায় তা খুবই কম। গ্রামে গ্রামে ভ্রাম্যমাণ ফিল্ম্ ইউনিট জনশিক্ষাবিস্তারে বিরাট ভূমিকা নিতে পারে, কিন্তু সেরকম পরিকল্পনা শুধু কথার কথাই রয়ে গিয়েছে, বাস্তবে রূপায়িত হয় নি।

নাট্য আন্দোলনেরও একটি ধারা পল্লীতে প্রসারিত হতে পারে। শিক্ষামূলক নানা অনুষ্ঠান নাট্য বা যাত্রার আঙ্গিকে পরিবেশিত হতে পারে। নাটকের মতো জনপ্রিয় মাধ্যম বোধহয় আর কিছুই নেই।

গ্রন্থাগার

গ্রন্থাগার আর একটি গণমাধ্যম। শুধু শিক্ষিতদের গ্রন্থসরবরাহ করাতেই গ্রন্থাগারের কাজ নয়, গ্রন্থাগারকে অবলম্বন করে শিক্ষামূলক নানা অনুষ্ঠান পরিকল্পিত হতে পারে। নিরক্ষরতা দূরীকরণে গ্রন্থাগার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

সম্প্রতি কলকাতায় বেশ কিছু মিউজিয়াম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের পরিপূরক হিসেবে কাজ করছে। ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ও বিড়লা টেকনোলজিকাল মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষ জনশিক্ষা বিস্তারে বিশেষ উদ্যোগী হয়েছেন। তাঁরা স্লাইড, ফিল্ম ইত্যাদির মাধ্যমে আঞ্চলিক প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করে থাকেন।

মিউজিয়াম

বিজ্ঞানের হাত ধরে আমরা যদি পথ চলি, আমাদের গণমাধ্যমগুলোকে আমরা যদি ঠিক মতো কাজে লাগাতে পারি তাহলে অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা দেশের মধ্যে এমন একটা হাওয়া আনতে পারব যে-হাওয়ায় অন্ধকারের কালো মেঘ কেটে যাবে।

উপসংহার

শিক্ষাবিস্তারে গ্রন্থাগারের ভূমিকা

[ভূমিকা—গ্রন্থাগারের প্রয়োজন—গ্রন্থাগার জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়—শিক্ষাবিস্তারের নানান পদ্ধতি—রেফারেন্স সার্ভিস—প্রদর্শনী ও আলোচনা—উপসংহার]

"লাইব্রেরির মধ্যে আমরা সহস্র পথের চৌমাথার উপরে দাঁড়াইয়া আছি। কোনো পথ অনন্ত সমুদ্রে গিয়াছে, কোন পথ অনন্ত শিখরে উঠিয়াছে, কোন পথ মানব হৃদয়ের অতলস্পর্শে নামিয়াছে। যে যে-দিকে ধাবমান হও, কোথাও বাধা পাইবে না। মানুষ আপনার পরিত্রাণকে এতটুকু জায়গার মধ্যে বাঁধাইয়া রাখিয়াছে।"—এর চেয়ে সূক্ষ্মতর কথায় গ্রন্থাগারের প্রাণের কথাটি ধরা অসম্ভব।

ভূমিকা

অনন্ত বিশ্বের অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার গ্রন্থের কারাগারে বন্দী। সেই সব গ্রন্থ ব্যক্তিগতভাবে একটি মানুষের পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। গ্রন্থাগার হল যৌথ প্রতিষ্ঠান, এখানে বহু মানুষের চেষ্টায় বহুদিনে সংগৃহীত হয় মহাসমুদ্রের নীরব কলতান। নদীর স্রোতের মতো এখানে জ্ঞান-প্রবাহ দেশ-দেশান্তর ও যুগযুগান্তরের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এক সময় গ্রন্থ ছিল সৌখীন ধনীর প্রাসাদের অলঙ্কার। "মেহগিনীর মঞ্চজুড়ি পঞ্চ হাজার গ্রন্থ" থাকত অনাঘ্রাতা যুথীর মতো—অপঠিত। বর্তমানে গণতন্ত্রের যুগে এই গ্রন্থাগারই হল মানুষের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু, যাকে আমরা মানবকল্যাণে ব্যবহার করতে পারি।

গ্রন্থাগারের প্রয়োজন

প্রত্যেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজস্ব গ্রন্থাগার থাকে। এই সব গ্রন্থাগারের কাজ হল প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রীদের হাতে প্রয়োজনীয় গ্রন্থ তুলে দিয়ে তাদের বিদ্যালাভে সাহায্য করা। কিন্তু এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বাইরেও পড়ে আছে দেশের অগণিত জনসাধারণ, যারা বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে পড়ার সুযোগ পায় নি। এই সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে ভাষা জোগাবার, জ্ঞানের আলো দেখাবার দায়িত্ব নিয়েছে গ্রন্থাগার। এখানেই গ্রন্থাগারের

গ্রন্থাগার জনগণের বিশ্ববিদ্যালয়

সবচেয়ে বড়ো কর্মক্ষেত্র। তাই প্রত্যেক সভ্যদেশে সাধারণের জন্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে—আমাদের দেশেও তার ব্যতিক্রম হয় নি।

'জাতীয় গ্রন্থাগার' থেকে শুরু করে দেশের গ্রামীণ গ্রন্থাগার সব একই উদ্দেশ্যে সৃষ্ট ও পরিচালিত। গ্রন্থাগারের উদ্দেশ্য হল মানুষের হাতে বই তুলে দেওয়া। "Right book for the right man at the right time." এই ব্রতের দিকে তাকিয়ে দেশের গ্রন্থাগার পরিকল্পনা করা হয়েছে। শহর অঞ্চল থেকে শুরু করে সুদূর পল্লী-অঞ্চলেও আজ গ্রন্থাগার ব্যবহারের সুযোগ প্রসারিত করা হয়েছে। পশ্চিম বাংলায় গ্রামীণ গ্রন্থাগারের সংখ্যা প্রায় পাঁচশ।—এই সব গ্রন্থাগার ব্যক্তিগতভাবে সভ্যদের হাতে বই তুলে দেওয়া ছাড়াও শিক্ষা বিস্তারের জন্যে নানান পদ্ধতি ও পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

শিক্ষা বিস্তারের নানান পদ্ধতি

গ্রন্থাগার হল অশিক্ষিত বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষের বিশ্ববিদ্যালয়। তাই গ্রন্থাগারের কাজ এই সব অজ্ঞান মানুষকে জ্ঞানের আলো দান করা। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে গ্রন্থাগার থেকে নানান পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। তার মধ্যে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যারা গ্রন্থাগার থেকে অনেক দূরে আছে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগারের সাহায্যে নিয়মিত সময়ে সেই সব মানুষের হাতে তুলে দেওয়া হয় জ্ঞানের প্রদীপশিখা। গ্রন্থ আদান-প্রদান ছাড়াও নানারকম চার্ট ও ম্যাপের সাহায্যে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা আছে। তা ছাড়া নানান শিক্ষামূলক চলচ্চিত্র প্রদর্শন, ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে শিক্ষামূলক তথ্য পরিবেশন এই পরিকল্পনার অন্তর্গত।

রেফারেন্স সার্ভিস

রেফারেন্স সার্ভিস হল আধুনিক গ্রন্থাগারের একটি বড়ো কাজ। জনসাধারণের গ্রন্থাগারের সঙ্গে রেফারেন্স সার্ভিসের জন্যে একটি বিভাগ খোলা হয়েছে। অজানাকে জানার আগ্রহ মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি। কিন্তু সত্য সংগ্রহে মানুষ এককভাবে সার্থক হতে পারে না। গ্রন্থাগারের রেফারেন্স বিভাগ পাঠকের সেই অভাব দূর করে। এই বিভাগে কোনো প্রশ্ন নিয়ে উপস্থিত হলে উক্ত বিভাগের কর্মীরা সাধ্যমতো প্রশ্নের উত্তর সরবরাহ করে পাঠকের জ্ঞানপিপাসা চরিতার্থ করেন।

প্রদর্শনী ও আলোচনা সভা

প্রদর্শনী এবং নানা বিষয়ের আলোচনার মাধ্যমে গ্রন্থাগার শিক্ষার প্রসার ঘটাতে পারে। কোনো কবি বা সাহিত্যিক্যের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে গ্রন্থাগার যদি একটি গ্রন্থ প্রদর্শনীর আয়োজন করে, এবং সেই কবি বা সাহিত্যিকের উপর আলোচনার ব্যবস্থা করে, তা হলে সাধারণ মানুষ তাঁর সাহিত্যের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠে। এই ভাবে আলোচনার মাধ্যমে মানুষের মনে জ্ঞানের স্পৃহা জাগিয়ে পাঠাগার শিক্ষাবিস্তারে সহায়তা করে।

উপসংহার

গ্রন্থাগারের উন্নতি জাতীয় উন্নতির সঙ্গে এক সূত্রে বাঁধা। তাই গ্রন্থাগারের পরিচয় একটি সমগ্র জাতির পরিচয়। আমাদের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে গ্রন্থাগারের উন্নতি ভিন্ন গতি নেই। কারণ আমরা নিত্য নতুন

বই কিনতে পারি কজন? কিন্তু আমার জন্যে পছন্দমত বই কিনে সাজিয়ে রেখেছে আমাদেরই প্রিয় কোনো গ্রন্থাগার।

চিন্তাসহায়ক বাণী

The true university of these days is a collect on of books.— Thomas Carlyle. (1795—1881) Famous essayist and historian.

Over the door of a library in Thebes is the inscription 'Medicine of the Soul.'

—Diodorus Siculus
(Late 1st century, B.C)
Greek historian.

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

(নমুনা প্রশ্ন)

[ভূমিকা—শিক্ষার উদ্দেশ্য—সেকালের বৃত্তিশিক্ষা—বিদেশী—শাসন মহাত্মা ও রবীন্দ্রনাথ—বর্তমান পরিস্থিতি—বৃত্তিমুখিতার সম্ভাব্য ত্রুটি ও সমাধান—উপসংহার]

ভূমিকা

যা দিয়ে আমাদের বর্তমানতা বা জীবনধারণ তাই হল বৃত্তি। নানা বৃত্তি যেমন আমাদের মুখে অন্ন তুলে দেয়, তেমনি সমাজজীবনকেও ধরে রাখে পারস্পরিকতার বন্ধনে।

শিক্ষার উদ্দেশ্য

সাধারণত 'শিক্ষা' বলতে আমরা যা বুঝি তা মূলত বৃত্তিমুখিতার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে না। শিক্ষা মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বোধিত করে, তার বিবেককে উদ্দীপিত করে। শিক্ষাই আলো যাতে মানুষ নিজেকে চেনে, তেমনি অন্যকেও চিনে নেয় পরমাত্মীয় বলে। শিক্ষা মানুষকে শ্রেয়ের পথে পরিচালিত করে।

সেকালের বৃত্তিশিক্ষা

প্রাচীন ভারতে মনুষ্যত্ব সাধনের শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষাও যুক্ত ছিল। কিন্তু বৃত্তি ছিল ধর্মগত। 'চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ' এ উক্তি স্পষ্টতই বলে দেয় গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুযায়ীই পরিকল্পিত হয়েছিল চাতুর্বর্ণ্য। ব্রাহ্মণের বৃত্তি ছিল অধ্যয়ন-অধ্যপনা, ক্ষত্রিয়ের সামরিক শিক্ষা, বৈশ্যদের বাণিজ্য, এবং শূদ্রদের হস্তশিল্প ও অন্যান্য বর্ণের জীবনযাত্রার উপাদান যোগানো। তখন বৃত্তি ছিল বংশানুক্রমিক, সূত্রধরের ছেলে সূত্রধরই হত বংশপরম্পরায়। এতে বৃত্তির ক্ষেত্রে গুণোৎকর্ষ ঘটত সন্দেহ নেই, তবে বিশেষ বৃত্তির গুণী অন্য বৃত্তিতেও হয়তো যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিতে পারত, বর্ণ বা বৃত্তি-গত নিয়ন্ত্রণের ফলে সে সেই-

সুযোগ থেকে বঞ্চিত হত। নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও অবশ্য ক্ষত্রিয়দের অনেকেই অধ্যাত্মবিদ্যাচর্চায় গভীর উপলব্ধির পরিচয় দিয়েছেন। অধ্যাত্ম বিদ্যাচর্চায় নিম্নবর্ণের মানুষও যে চিন্তার স্বর্ণসূত্র রচনা করেছেন 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণ' কথাটির মধ্যেই তার ইতিহাস লুকনো আছে। তবে সাধারণ ভাবে বলা যেতে পারে সমাজে বৃত্তি বর্ণভিত্তিকই ছিল।

বিদেশী শাসন

বিদেশী শাসনে এ অবস্থার কিছুটা পরিবর্তন ঘটল। শাসকদের প্রয়োজনে নানারকম বেতনভুক পদের সৃষ্টি হল। মুসলমান আমলে বিভিন্ন বর্ণের হিন্দুরা ভূমি-সংক্রান্ত নানারকম কাজে নিযুক্ত হতে লাগলেন। সরকার, মজুমদার, তরফদার, চাকলাদার ইত্যাদি উপাধির মধ্যে এ ইতিহাসের সাক্ষ্য আছে। ব্রিটিশ আমলে দীর্ঘদিন বৃত্তির কাঠামো অনেকটা একই রকম ছিল, তবে অফিস আদালতের কাজে নতুন শিক্ষিত সমাজের বড়ো একটি অংশকে ব্যবহার করা হল, তাঁদের শাসনযন্ত্র চালানো কাজে, সস্তা শিক্ষিত শ্রমিক হিসেবে। বৃত্তিমূলক বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা শাসকদের শিক্ষাপরিকল্পনায় ছিল না বললেই হয়।

মহাত্মা ও রবীন্দ্রনাথ

মুক্তি আন্দোলনে যাঁরা অগ্রণী ছিলেন তাঁরা জনগণের স্বনির্ভরতার প্রয়োজনের দিকে তাকিয়ে কিছু গঠনমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। এ ব্যাপারে মহাত্মা গান্ধীর উদ্যোগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষাকে যুক্ত করবার উদ্দেশ্য নিয়েই শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

বর্তমান পরিস্থিতি

স্বাধীনতা লাভের পরে পরপর কয়েকটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কর্মহীনতার সমস্যা সমাধানে যে কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়, তার মধ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণের দিকটিও ভাবা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে কিছু শিক্ষা সংস্থাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মাধ্যমিক স্তরে কর্মমুখী শিক্ষা এবং উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বৃত্তিমূলক শাখা প্রবর্তিত হয়েছে। কিন্তু কর্মসংস্থানের ক্ষেত্র অত্যন্ত সীমিত হওয়ার দরুন সমস্যা থেকেই যাচ্ছে।

বিদেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রয়োজনের দিকে তাকিয়েই সেই অঞ্চলের শিক্ষা পরিকল্পিত হয়। কিন্তু আমাদের সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে জীবনের প্রয়োজনের যোগসূত্র ক্ষীণ। তাই আমাদের সমস্যা খুবই বড়ো হয়ে দেখা দেবে এ তো স্বাভাবিক।

স্বাধীনতা লাভের পর দীর্ঘদিন হয়ে গেল, এখনও আমরা গড্ডলিকা প্রবাহেই ভেসে চলছি, কোনো সুষ্ঠু শিক্ষা পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করতে পারি নি। উচ্চ বা উচ্চতর শিক্ষার উপযোগী মেধা বা আর্থিক সঙ্গতি যাদের আছে তারা তা অবশ্যই গ্রহণ করুক। দেশের নির্মিতি ও উন্নতির জন্যে চিন্তাবিদ, দার্শনিক, ইঞ্জিনিয়ার ডাক্তার এ তো চাই-ই। কিন্তু যারা এগোতে পারল না তাঁদের কর্মসংস্থানের সম্ভাবনাকে বর্ধিত করবার জন্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষার ব্যাপক সম্প্রসারণ প্রয়োজন।

বৃত্তিমুখিতার সম্ভাব্য ত্রুটি ও সমাধান

বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণের কল্যাণকর ভূমিকা সম্বন্ধে কিন্তু অনেক শিক্ষাবিদ সংশয়ান্বিত। তাঁরা বলেন বৃত্তিমুখিতার দিকে বেশি ঝুঁকলে সূক্ষ্মবোধ বা মানবিকতার বিকাশ বিঘ্নিত হবে। মৌল প্রয়োজনের দিকে বেশি উৎসাহ দেখা দিলে কল্পনা, নৈতিকতা, ঔদার্য ইত্যাদি গুণ হ্রাস পাবে। সমাজ-

জীবনের পক্ষে তা কল্যাণ বয়ে আনবে না। তাঁরা বলেন মনের শিক্ষার কথা ভাবতেই হবে, তার সঙ্গে হাতের শিক্ষা যুক্ত হোক ক্ষতি নেই। তার মানে এ দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে হবে আমাদের। কীভাবে তা করা সম্ভব তা শুধু শিক্ষাবিদরাই ভাবলে চলবে না, তাঁদের ভাবনার শরিক হবেন সরকার ও সমাজসেবীরা।

উপসংহার

আমাদের মনে হয় 'সাধারণ' বা 'বৃত্তিমূলক'—এভাবে বিভাজিত করে শিক্ষাকে না দেখে সামগ্রিক ভাবেই দেখা উচিত। এমন শিক্ষারই আমরা স্বপ্ন দেখি যে-শিক্ষা আমাদের যেমন দেবে আলো, তেমনি দেবে বেঁচে থাকবার শক্তি, যে শিক্ষা যথার্থই এ পৃথিবীকে বাসযোগ্য করে তুলবে।

চিন্তাসহায়ক বাণী

There are obviously two educations—one should teach us how to make a living and the other how to live.

James Truslow Adams,
1878—1949 Essayist & historian

He is to be educated not because he is to make shoes, nails and pins but because he is a man.

—William Ellery Channing (1780—1842)
Famous clergyman.

One who is in the habit of applying his powers in the right way will carry system into any occupation, and it will help him as much to handle a rope as to write a poem.

—Francis Marion Crowford (1854—1909)
A novelist.

বাংলার লোকসাহিত্য

[সূচনা—বাংলার হৃদয়ের সম্পদ লোকসাহিত্য—লোকশিক্ষা ও লোকরঞ্জন—ছেলেভুলানো ছড়া—যাত্রা ও ব্রতকথা—কবিগান—পূর্ববঙ্গ ও ময়মনসিংহ গীতিকা, ডাক ও খনার বচন—বাউলগান, ভাটিয়ালী, মুর্শিদা, জারী—শেষ কথা।]

সূচনা

মাটি যদি মুখ ফুটে কথা বলে তা হলে যা হয় লোকসাহিত্য হয়তো তাই। পল্লীর নিজস্ব সৃষ্টি হলেও লোকসাহিত্য সমস্ত মানুষের, কারণ মানুষের সনাতন ইচ্ছে আর সংস্কার বাসা বেঁধে আছে এই লোকসাহিত্যে।

ওপারে তিল গাছটি তিল ঝুর ঝুর করে।
তারি তলায় মা আমার লক্ষ্মীপ্রদীপ জ্বালে॥

এই লক্ষ্মীপ্রদীপ-জ্বালা পল্লীবাংলার প্রাণকেন্দ্র থেকে আমরা নির্বাসিত হয়েছি।

তাই আধুনিক কালের সাহিত্যে গ্রামবাংলার ছবি অস্পষ্ট। একদিন পল্লীবাংলার আকাশ-বাতাস ধুলোমাটির মধ্যেই জন্ম নিয়েছিল জনগণের নিজের সাহিত্য, যে-সাহিত্যের গায়ে পানাপুকুর, বাঁশবন আর ভাঁটফুলের গন্ধ জড়ানো। কোন্ সে স্মরণাতীত কালে নিরক্ষর মানুষগুলির হৃদয়-ভূমিতে জন্ম নিয়েছিল ছেলেভুলানো ছড়া, পাঁচালী, ব্রতকথা, রূপকথা, গীতিকথা, কবিগান, ভাটিয়ালী, বাউল, মাণিকপীরের গান, গোপীচন্দ্রময়নামতীর গান, আরও কত হাসি-কান্না হীরাপান্নায় গাঁথা মালা।

বাংলার হৃদয়ের সম্পদ লোকসাহিত্য

'পিঠা বল চিড়া বল ভাতের মত না,
মাসি বল পিসি বল মায়ের মত না॥'

এক দিকে শিক্ষা, অন্যদিকে লোকরঞ্জন। লোকসাহিত্যে এ দুয়ের মিলন ঘটেছে। এখানে কত সহজ ভাষায় জ্ঞানের কথা বলা হয়েছে, ভাবতে অবাক লাগে :

লোকশিক্ষা ও লোকরঞ্জন

'কোদাল কোদাল মেঘের গা
মাঝে মাঝে দিচ্ছে ঘা॥
কৃষক ভাই বান্ধ আইল।
আজ না হইলে হইবে কাল॥'

শাখায় প্রশাখায় পল্লবিত এই বিশাল বনস্পতি ছিল পল্লীর নিরক্ষর মানুষগুলির কাছে জীবন্ত বিদ্যালয়।

'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদী এল বান।
শিবঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যে দান॥'

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'এই ছড়াটি বাল্যকালে আমার নিকট মোহমন্ত্রের মতো ছিল এবং সেই মোহ এখনো আমি ভুলিতে পারি নাই।' অথচ মজার কথা হল এই সব কবিরা কেউ কাব্যশাস্ত্রের ধরাবাঁধা পথে বিচরণ করেন নি। গ্রামবাংলার ঠাকুমা-দিদিমারা এর কাব্যকার। ঘুটঘুটি অন্ধকার, বাইরে টিপ টিপ করে বৃষ্টি পড়ছে, ঠাকুমা-দিদিমারা নাতি-নাতনীদের নিয়ে মাদুর পেতে বসেছে ঘরের দাওয়ায়। জীবনের অভিজ্ঞতা আর চোখের জলের সঙ্গে রূপ-রস মিশিয়ে তারা রচনা করেছে অপরূপকে :

ছেলেভুলানো ছড়া

'ওপারের ধঞ্চে গাছটি রামছাগলে খায়।
আশ্রুমণি দিদি আমার শ্বশুর বাড়ী যায়।'

শিশুমনস্তত্ত্ব নয়, এতে শুনতে পাই শিশুকণ্ঠের মতোই কলভাষী এক সঙ্গীত।

যাত্রাগানের উপজীব্য ছিল রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের বিচিত্র কাহিনী। যে কাহিনী, গ্রামের অসংখ্য মানুষকে সত্যসুন্দরের মন্দিরপ্রাঙ্গণে আহ্বান করত। রামচন্দ্রের পিতৃ-ভক্তি, সীতা-সাবিত্রীর সতীধর্ম, কর্ণের বীরত্ব, ধ্রুবপ্রহ্লাদের ভক্তি-ব্যাকুলতা মানুষকে আনন্দ দিত, সেই সঙ্গে দিত শিক্ষা। এই যাত্রার মতোই পল্লীর সহজ সরল জীবনে ব্রতকথারও একটা বিশেষ স্থান আছে। ভাদ্র, মাঘ-

যাত্রা ও ব্রতকথা

মণ্ডল, তুষতুষলি, থুয়া, সেঁজুতি এই ধরনের অসংখ্য ব্রতকথার মধ্যে কোথাও ভাই, কোথাও স্বামী-পুত্র, কোথাও সমগ্র পরিবারের কল্যাণ কামনা করা হয়েছে।

কবিগান

সখীসংবাদ, বিরহ, গোষ্ঠ, আগমনী ইত্যাদি বিষয়কে অবলম্বন করে, কবিওয়ালারা গান বাঁধতেন। অনেক সময় আসরে দাঁড়িয়ে এই গান তৈরি করতে হত, তাই এদের সাহিত্যিক মূল্য বিশেষ ছিল না। তবে এক দিকে লোকমনোরঞ্জন অন্য দিকে ব্যঙ্গবিদ্রূপের ঝলকানিতে কোনো কোনো কবির পদ বিশেষ কাব্য-গুণাশ্রিত হয়ে উঠত।

পূর্ববঙ্গ ও ময়মনসিংহ গীতিকা, ডাক ও খনার বচন

এই গীতিকাগুলির গায়ে বাংলার শ্যামল মাটির গন্ধ জড়ানো। দেবদেবীর কথা নয় কেবল মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নাকে তিল তিল করে সংগ্রহ করে রচিত হয়েছে এই সব গীতিকা। হয়তো কবিরা ছিলেন নিরক্ষর। কিন্তু চোখে দেখা আর হৃদয় দিয়ে অনুভব-করা বিষয়কে স্বাভাবিক কবিপ্রতিভায় তাঁরা কাব্যে রূপ দিতেন :

কোথায় পাইবাম কলসী কন্যা কোথায় পাইবাম দড়ি।
তুমি হও গহীন গাঙ্, আমি ডুইব্যা মরি !"

গভীর জলে ডুবে মরার সঙ্গে প্রেমের তুলনা দিয়ে পল্লীকবি যে-ভাবকল্প উপহার দিলেন তার বুঝি তুলনা নেই।

এর পাশাপাশি রচিত হয়েছে ডাক-খনার-বচন, প্রবাদ আর প্রবচন। কত ছোটো কথার কত বড়ো ভাবের ব্যঞ্জনা :

সুখ সুখ পরাণের বরি,
সুখের ঘরে কপাট দিয়ে
আমি দেশে দেশে ফিরি।

অথবা,
যার কথায় আছে রস
তার ঘন ঝাড়ের বাঁশ,
তার পথে চলে দেশ।

বাউলগান, ভাটিয়ালী, মুর্শিদা ও জারী

বাউল-ভাটিয়ালী মুর্শিদা ও জারী পল্লীবাংলার নিজের সম্পদ। 'কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে।' এই মনের মানুষকে বাউল গানের মধ্যে দিয়ে ডেকেছে। ভাটিয়ালী মুর্শিদ-জারী, বাংলার প্রকৃতির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে। ভাঁটফুল, ঢোল কল্মীর মতোই তারা গজিয়ে উঠেছে 'জলাংগীর ঢেউয়ে ভেজা বাংলায় এ সবুজ করুণ ডাঙায়।'

শেষকথা

লোকসাহিত্য হল অনেকটা দর্পণের মতো। একটি জাতিকে গভীরভাবে জানবার যদি কোনো দর্পণ থাকে তবে সে দর্পণ হল লোকসাহিত্য। তাই ছড়িয়ে থাকা হারিয়ে যাওয়া লোকসাহিত্যের রত্ন গুলিকে সংগ্রহ এবং সংরক্ষিত করা একান্ত প্রয়োজন। কারণ এগুলি হল বাংলার অলিখিত ইতিহাসের পাণ্ডুলিপি।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়...

১. জন-শিক্ষায় লোকসাহিত্য। ২. ইতিহাস রচনায় লোকসাহিত্যের প্রয়োজন।

চিন্তাসহায়ক বাণী

গানের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার পল্লীর ঘাটেমাঠেবাটে ছড়ানো রয়েছে। তাতে কত প্রেম, কত আনন্দ, কত সৌন্দর্য, কত তত্ত্বজ্ঞান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। চাষী, মাঝিমাল্লা, ফকীর, বৈরাগী—এরাই এর রচয়িতা। বনফুলের মত মিষ্ট সুবাস বিলিয়ে তারা কালে বিস্মৃতির মরুভূমিতে ঝরে পড়ে।

—ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌

বাংলার শিশুসাহিত্য

[ভূমিকা—শিশুসাহিত্যের উৎসসন্ধান—শিশুসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস—প্রথম শিশু-পত্রিকা—বিদ্যাসাগরের যুগ—রবীন্দ্রনাথের যুগ—শিশুসাহিত্যের স্বর্ণ যুগ—আধুনিক যুগ—শিশুদের পত্র-পত্রিকা—উপসংহার]

ভূমিকা

কোনো দেশের অগ্রগতি সে দেশের শিশুসাহিত্যের মান দেখলে বোঝা যায়, —এ কথা অনেকেই বলে থাকেন। কিন্তু শিশুসাহিত্য নাম দিয়ে সাহিত্যের কোনো নির্দিষ্ট বিভাগ সৃষ্টি কি আদৌ সম্ভব? শিশুসাহিত্য কী? কিছু আনন্দ, কিছু নীতিকথা, কিছু উদ্ভট কল্পনা আর কিছু শিক্ষাদান প্রচেষ্টা, এগুলির যথাযথ মিশ্রণ—সাধারণ ধারণা তাই, কিন্তু এ ধরনের ভাবনায় আমরা শিশুদের খাটো করে দেখি। তাদের জগতের বিচিত্র সৌন্দর্য আমাদের স্মৃতিতে থাকে না,—তাই অযথা কষ্টকল্পনা দ্বারা ভারাক্রান্ত হই, কিন্তু তাদের মন ছুঁতে পারি না, আর যা তাদের ছোঁয় তাকে চিনলে অবাক হয়ে দেখি তা কত সহজ। ওদের জগৎকে ছুঁতে যে পারে সে আপনি পারে।

শিশুসাহিত্যের উৎসসন্ধান

বাংলার শিশুসাহিত্যের ধারা প্রায় দেড়শ' বছর ধরে প্রবাহিত। অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, মায়ের মুখের ঘুমপাড়ানী গান বা শিশুর মুখের আপাত-অর্থহীন আগডুম বাগডুম,—এগুলির কোনো বয়স নেই, এরা অনাদি, অনন্ত। আমরা যে শিশুসাহিত্যের হিসেব নিতে চলেছি, তা সচেষ্ট সৃষ্টি।

১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা স্কুল বুক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরের বছর ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে রামকমল সেন, রাধাকান্ত দেব ও তারিণীচরণ মিত্রের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আঠারোটি গল্পে সমৃদ্ধ 'নীতি কথা' প্রকাশিত হল। এই নীতিবাচক গল্পগুলি থেকেই বাংলা শিশুসাহিত্যের জন্ম। তারপর কত শিশু স্বপ্ন দেখেছে, কত কাহিনী রচিত হয়েছে, কত রূপান্তর ঘটেছে শিশুসাহিত্যের।

শিশুসাহিত্যের ধারাবাহিক ইতিহাস

আমরা সেই রূপান্তরের সন্ধান নেব। রূপান্তর ঘটেছে দুটি ক্ষেত্রে,—আঙ্গিকে ও বিষয়বস্তুতে আর শিশুসাহিত্যের উৎস প্রবাহিত হয়েছে দুটি ধারায়। এক : মুখাশ্রিত ছড়া, রূপকথা, দুই : উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে রচিত বিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তক।

প্রথম ধারাটি আবহমান কাল ধরে প্রবাহিত। চিরকালের শিশুরা তা শুনেছে, কল্পনার সওয়ার হয়েছে আর তা সমর্পণ করেছে উত্তরপুরুষদের হাতে।

প্রথম শিশু পত্রিকা

আর দ্বিতীয় ধারাটির ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য এই যে, পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনে আন্তরিকতার অভাব না থাকলেও তা ছিল নীতি কথায় ভারাক্রান্ত। অবশ্য উপহারের বইগুলি আনন্দলোকের সীমায় পৌঁছেছিল। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য প্রকাশন 'উষ্ট্রের মনোরঞ্জন ইতিহাস,' 'ঠাকুরদাদার হস্তিবিষয়ক ইতিহাস' ইত্যাদি। আর এই সময়ের প্রথম সচিত্র পত্রিকা 'পশ্বাবলি' ছিল আপন বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

বিদ্যাসাগরের যুগ

শিশুসাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায় বিদ্যাসাগরের যুগ, মধুসূদনের যুগ। তাঁরা নিজস্ব ভঙ্গীতে কাব্যরসাশ্রিত সাহিত্য সৃষ্টি করলেন এবং বিষয়বৈচিত্র্য আনলেন। এ-সময়ের আরো দু-জন উল্লেখযোগ্য শিশুসাহিত্যিক হলেন স্বর্ণকুমারী দেবী ও মধুসূদন মুখোপাধ্যায়। স্বর্ণকুমারী দেবীর 'গল্প-সল্প' শিশুসাহিত্যে প্রথম ঘরোয়া হাওয়া আনল আর মধুসূদন মুখোপাধ্যায় বিদেশী রূপকথার অনুবাদ করে অনুবাদ সাহিত্যের পথিকৃৎ হলেন।

রবীন্দ্রনাথের যুগ

এরপর রবীন্দ্রনাথ এলেন ; সাহিত্যের অন্যান্য ধারার মতো শিশুসাহিত্যও তাঁর হাতে সঞ্জীবিত হল। যোগীন্দ্রনাথ সরকারকে দিয়ে এর শুরু ; ১৮৯১ খ্রীঃ তাঁর প্রথম বই 'হাসি ও খেলা' প্রকাশিত হলে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁকে স্বাগত জানালেন। ছড়া, গল্প, কবিতা, জীবজন্তুর গল্প ইত্যাদি অজস্র লিখেছিলেন তিনি। প্রাচীন ছড়ার সঙ্কলনও সম্ভবত তাঁর হাতেই প্রথম হয়। রামায়ণ-মহাভারতকে শিশুদের উপযোগী করে প্রথম লেখার প্রচেষ্টাও এই সময়ে শুরু। ১৮৯১ খ্রীঃ প্রকাশিত নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্যের শিশুরঞ্জন রামায়ণ এ-বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ। তারপর ১৯০৭ খ্রীঃ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার প্রাচীন লোকসাহিত্য থেকে রূপকথা সংগ্রহ করে প্রকাশ করলেন 'ঠাকুরমার ঝুলি'।

শিশুসাহিত্যের স্বর্ণ যুগ

এবার আসে রবীন্দ্রনাথের কথা। বাংলা শিশু সাহিত্যে তিনি সৌন্দর্যের, ভাবের ও কল্পনার প্লাবন আনলেন। ১৮৮৫ থেকে ১৯৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত দীর্ঘ ষাট বছর ধরে তিনি শিশুসাহিত্যকে সহস্রদল পদ্মের মতো বিকশিত করে তুললেন। শুধু তাই নয়, তাঁরই প্রভাবে, প্রেরণায় ও উৎসাহে শিশুসাহিত্যের অনেক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক প্রকাশ পেল। উপেন্দ্রকিশোর, অবনীন্দ্রনাথ, জগদানন্দ, দক্ষিণারঞ্জন এঁদের অন্যতম। উপেন্দ্রকিশোরের কাছে আমরা পেলাম মহাভারত, টুনটুনির বইয়ের মতো অমূল্য সম্পদ। তাঁর আর একটি দান ছবি। তাঁর আগেও ছোটদের বইতে ছবি আঁকা থাকত, কিন্তু তা গল্পের কথাকে প্রকাশ করার সহায়ক মাত্র, উপেন্দ্রকিশোর প্রথম

ছবিকে রঙ-বেরঙে সাজিয়ে ছেলেদের মনোহারী করে তুললেন। আর 'ওবিন ঠাকুর' তো আজও অনন্য। তাঁর শকুন্তলা, ক্ষীরের পুতুল, বুড়ো আংলা, নালকের তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। দেশের জল, মাটি, আকাশ, আর রূপকথার আজব রাজ্য একত্রিত হয়ে বিচিত্র বর্ণে প্রকাশ পেল তাঁর তুলিতে আর কলমে। জগদানন্দ বিজ্ঞানের বিষয়কে সহজ ভঙ্গীতে পরিবেশনের কাজে এগিয়ে এসে আজও আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে আছেন। কুলদারঞ্জন বিদেশী শিশুসাহিত্যের অনুবাদে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করলেন। আর তারপর এলেন 'আবোল তাবোলে'র অতুলনীয় সুকুমার রায়। তাঁর সার্থক উত্তরসূরী আমরা আজও পাই নি। সুনির্মল বসুর কবিতা ও লীলা মজুমদারের গল্পে অবশ্য তাঁর সামান্য আভাস মেলে।

আধুনিক যুগ

আধুনিক যুগে অনেকেই এগিয়ে এসেছেন শিশুদের আনন্দদানে। এঁদের মধ্যে হেমেন্দ্রকুমার রায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সীতা দেবী, শান্তা দেবী, সুখলতা রাও প্রমুখ লেখক-লেখিকাদের নাম উল্লেখযোগ্য।

শিশুদের পত্র-পত্রিকা

পত্র-পত্রিকার যে-ধারা উপেন্দ্রকিশোরের সন্দেশ থেকে শুরু, তাও আজ অনেক পরিপুষ্ট হয়েছে মৌচাক, শিশুসাথী, রামধনু ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার দ্বারা।

উপসংহার

শিশুসাহিত্যের আজকের বিচিত্র সম্ভার দেখলে ভরসা হয়, সাহিত্যের এই আনন্দ-সর্বস্ব ধারাটি হয়তো তার প্রাপ্য গুরুত্ব ও মর্যাদা পেতে চলেছে। বলতে ইচ্ছে হয় শিশুসাহিত্যই একমাত্র সার্বজনীন সাহিত্য। শ্রেষ্ঠ শিশুসাহিত্য সর্বকালের সর্বজনের তীর্থভূমি।

চিন্তাসহায়ক বাণী

বাংলার শিশুসাহিত্যের বৈশিষ্ট্য এই যে এই ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়েছে সারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কোনো কোনো বুদ্ধি, মহত্তম কোনো কোনো মন : যার আদি পুরুষ বিদ্যাসাগর, যাকে রবীন্দ্রনাথ নানা স্থলে স্পর্শ করে গেছেন, যাতে আছেন অবনীন্দ্রনাথের মতো হৃদয়বান ও সুকুমার রায়ের মতো গুণী পুরুষ, তার দুটো-একটা রোগলক্ষণে ভীত হবার কারণ দেখি না, কেননা তার আপন ঐতিহ্যেই আরোগ্যশক্তি সঞ্চিত আছে।

—বুদ্ধদেব বসু। সাহিত্যচর্চা। ১৯৫২।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়

১. শিশুসাহিত্যের গতিপ্রকৃতি। ২. তোমার প্রিয় শিশুসাহিত্যিক।

বাংলা নাটক ও নবনাট্য আন্দোলন

[সূচনা—উনবিংশ শতকের মঞ্চ ও নাটক—সাধারণ রঙ্গালয়—বাংলা নাটক ও রবীন্দ্রনাথ—নবনাট্য ও গণনাট্য সংঘ—বহুরূপী ও লিট্‌ল্ থিয়েটার—ষাট ও সত্তর দশকের নাটক ও নাট্যসংস্থা—শেষকথা।]

সূচনা

বঙ্গদেশে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠা এবং নাটক রচনার মূলে আছে পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার প্রভাব। উনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্ত্য সভ্যতায় শিক্ষিত তরুণ-বাংলার সাংস্কৃতিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে বাংলা নাট্যকলার জন্ম হল। জন মনোরঞ্জনের জন্যে যাত্রা কবিগান পাঁচালী প্রভৃতি ছিল কিন্তু এসবে শিক্ষিত বাঙালীর মন ভরত না—তাই, 'তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিত রোদন'। বাংলা কাব্য পারে প্রাচীনতার দাবি নিয়ে দাঁড়াতে। হাজার বছরের অন্ধকার অতীতের পর্দা সরালে শুনতে পাই চর্যাপদের কলধ্বনি, কিন্তু বাংলা নাটক সেই অর্থে কুলীন নয়, সে হল সাহিত্য শাখার আধুনিক কালের ফসল—সাহিত্যসম্রাটের কনিষ্ঠা কন্যা।

উনবিংশ শতকের মঞ্চ ও নাটক

বাংলা নাটক ও রঙ্গমঞ্চ কোনো ব্যক্তিবিশেষের সৃষ্টি নয় এর সৃষ্টিমূলে আছে একটি সমগ্র যুগের চাহিদা। নাট্যানুরাগের ফলে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছিল নাট্যশালা। ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে প্রসন্নকুমার ঠাকুরের হিন্দু থিয়েটার, শ্যামবাজারে নবীন বসুর থিয়েটার, বাগবাজারের এ্যামেচার থিয়েটার—এগুলিই ছিল প্রধান। অবশ্য এর অনেক আগেই হেরাসিম লেবাডেফ নামে এক রুশ পরিব্রাজক কলকাতায় বাংলা নাটকের অভিনয় করিয়েছিলেন ১৭৯৫ খ্রীস্টাব্দে। কিন্তু তার সঙ্গে বাংলা নাটক বা রঙ্গমঞ্চের কোনো যোগ নেই। সেটা ছিল বর্ষার আকাশে রামধনুর মতো ক্ষণিকের অতিথি। তারাচরণ সিকদারের 'ভদ্রার্জুন' থেকে গিরিশ ঘোষের ন্যাশনাল থিয়েটার পর্যন্ত স্মরণীয় নাট্যকার হলেন মোট তিন জন। নাটুকে রামনারায়ণ, মধুসূদন ও দীনবন্ধু মিত্র। মধুসূদনের হাতে বাংলা নাটকের আধুনিকতার সৃষ্টি ও যৌবনের শক্তি-সৌন্দর্যের বিকাশ। 'কুলীনকুল-সর্বস্ব' নাটকের-অভিনয়-দেখা বাঙালী দর্শকের চোখের সামনে সহসা একদিন গ্রীকোসেক্সপিরীয়ান নাটকের অভিনয় আরম্ভ হল। এক দিকে 'কৃষ্ণকুমারী' অন্য দিকে 'একেই কি বলে সভ্যতা', 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ', অথবা দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণ', 'সধবার একাদশী' এই পটপরিবর্তন-শক্তির উৎস।

সাধারণ রঙ্গালয়

১৮৭২ খ্রীস্টাব্দে পেশাদারী রীতির প্রথম নাট্যশালা ন্যাশনাল থিয়েটার স্থাপিত হল। এখানে জনসাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল বলেই উত্তরোত্তর নাটকের চাহিদা বাড়তে লাগল। এই চাহিদার সঙ্গে তাল রেখে এলেন কলাকুশলী, অভিনেতা, পরিচালক, নাট্যশিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়ে জীবিকার সন্ধানে। এযুগের নাটক ও শিল্পকলার মূল বৈশিষ্ট্যগুলিকে সূত্রাকারে তুলে ধরলে দেখতে পাই পৌরাণিক নাটকের সঙ্গে বাস্তবের চেয়ে মধ্যযুগীয় ভক্তিরসের সম্পর্ক ছিল বেশি। ঐতিহাসিক নাটকে স্বাদেশিকতাপ্রচারের প্রয়াস লক্ষণীয়। সামাজিক নাটকে সমাজ-

সমস্যার প্রতিফলন ঘটলেও স্পষ্ট কোনো সমাজ-চেতনা প্রকাশিত হয় নি। রঙ্গমঞ্চের প্রয়োজনে প্রথম নাটক লিখতে আরম্ভ করলেও প্রায় ৮০টি নাটক রচনা করে গিরিশ ঘোষ এযুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকারের গৌরব অর্জন করেন।

বাংলা নাটক ও রবীন্দ্রনাথ

পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের বাইরে থেকে রবীন্দ্রনাথ বাংলানাটক নিয়ে নানা পরীক্ষা চালিয়েছেন। কাব্যনাট্য, রূপক নাট্য, দ্বন্দ্বনাট্য, সর্বক্ষেত্রেই তাঁর প্রতিভার উজ্জ্বল মুদ্রাঙ্কন সুস্পষ্ট। তিনিই বাংলা সাঙ্কেতিক নাটকের জনক। 'রাজা ও রাণী', 'বিসর্জন', 'চিরকুমার সভা', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'রাজা', 'ফাল্গুনী', 'শারদোৎসব' প্রভৃতি নাটক তাঁর অসামান্য নাট্য-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। তিনিই বঙ্গ-রঙ্গালয়ের অন্তঃপুরে ইউরোপীয় নাট্য-রীতিকে আমন্ত্রণ করলেন নবরূপে।

নবনাট্য ও গণনাট্য সংঘ

উনবিংশ শতাব্দীর সঙ্গে বিংশ শতাব্দীর নাট্যরীতির মূল প্রভেদ হল সাহিত্যগুণগত। নাট্যকার দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, ক্ষীরোদপ্রসাদ, শচীন সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রমুখ নাট্যকারের নাম এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। এ যুগের কাব্য বা উপন্যাসের মতো জীবনের কঠিন বাস্তবের ছবি নাটকে ধরা পড়ল না।

তুলসী লাহিড়ীই সর্ব প্রথম তাঁর 'দুখীর ইমান' নাটকে শ্রমজীবী মানুষের ছবি তুলে ধরলেন। শ্রমিকশ্রেণীর ভিতর থেকে এল নায়কনায়িকা। মন্বন্তরের পটভূমিতে লেখা 'নবান্ন' নাটকে বিজন ভট্টাচার্য বাস্তব সমস্যার আর এক নবদিগন্তের সন্ধান দিলেন। এই সময় পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের বাইরে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার পথ ধরে এগিয়ে এল গণনাট্য সংঘ। এক দিকে মঞ্চব্যবস্থা, অভিনয়-কৌশলের পরিবর্তন, অন্য দিকে এল নবনব নাট্য-রচনার প্রেরণা। তীক্ষ্ণ সমাজ-চেতনার সঙ্গে রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রচারের প্রবণতা এই সব নাটকের ছিল প্রাণধর্ম। 'রাহুমুক্ত' নতুন আঙ্গিকে রচিত নবনাট্য সংঘের আর এক অভিনব নাট্যপ্রয়াস। এখানে যাত্রার সঙ্গে নাটকের সামঞ্জস্যবিধানের চেষ্টা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় উনবিংশ শতাব্দীর নাট্যকারদের কথা। বিষয়বস্তুর দিক থেকে বাস্তব-ধর্মী কয়েকটি নাটক রচনা করেছিলেন দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়: 'বাস্তুভিটা', 'তরঙ্গ', 'সংক্রান্তি', 'বিশে জুন' এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

বহুরূপী ও লিট্‌ল্ থিয়েটার

বহুরূপী নাট্যসংস্থা রবীন্দ্রনাথের সাঙ্কেতিক নাটকের অভিনয়কে কেন্দ্র করেই পরিণত শিল্পনৈপুণ্যের সৃষ্টি করেছে। বহুরূপীঅভিনীত 'রক্তকরবী', 'রাজা', 'চার অধ্যায়', 'বিসর্জন', 'ডাকঘর', 'মুক্তধারা', 'দশচক্র', 'পুতুল খেলা', 'রাজা অয়দিপাউস', 'পথিক', 'ছেঁড়া তার', 'এইতো দুনিয়া', 'ধর্মঘট', 'অংশীদার', 'কাঞ্চন রঙ্গ', 'বাকি ইতিহাস', 'পাগলা ঘোড়া', 'অপরিচিতা', 'চোপ আদালত চলছে' গ্যালিলিও ও আগুনের পাখি প্রভৃতির পরিবেশনা অভিনয়-কৃতিত্বের সঙ্গে শক্তিশালী করেছে নবনাট্য আন্দোলনকে।

লিট্‌ল থিয়েটার গোষ্ঠী পেশাদারী রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে নবনাট্য আন্দোলনের মিলন ঘটা-বার চেষ্টা করেছিলেন। সেক্সপীয়ারের ইংরাজি নাটক এবং তার অনুবাদের অভিনয়ের

মাধ্যমে এই গোষ্ঠীর সুনাম প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। গোর্কির নীচের মহল, উৎপল দত্তের নতুন আঙ্গিকে লেখা 'অঙ্গার', 'ফেরারীফৌজ', 'কল্লোল', এক সময় বাংলাদেশের দর্শকসমাজকে কল্লোলিত করে তুলেছিল।

নবনাট্য আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে এল নতুন নাটক লেখার তাগিদ। সলিল সেনের 'নতুন ইহুদি', 'মৌচোর'; তরুণ রায়ের 'একমুঠো আকাশ'; কিরণ মৈত্রের 'বারোঘণ্টা' প্রভৃতি নাটক উল্লেখযোগ্য।

এই সময়কার নাট্যসংস্থার মধ্যে সবার আগে নান্দীকারের কথা মনে পড়ে। নান্দীকার অভিনীত অধিকাংশ নাটকই বিদেশী নাটকের বঙ্গানুবাদ। সর্বপ্রথম এই সংস্থা 'নাট্যকারের সন্ধানে' ছটি চরিত্রের অভিনয়কে কেন্দ্র করেই খ্যাতিলাভ করেছে। তাদের অভিনীত 'শের আফগান', 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী', 'তিন পয়সার পালা', 'ভালোমানুষ', 'আন্তিগোনে', 'সদাগরের নৌকো' পরিবেশনা এবং অভিনয় কৃতিত্বে নবনাট্য আন্দোলনকে শক্তিশালী করেছে। চেতনা গোষ্ঠীর 'মারীচ সংবাদ', 'ভালোমানুষের পালা'; নক্ষত্র গোষ্ঠীর 'মৃত্যুসংবাদ', 'ক্যাপটেন্ হুররা', 'লম্বকর্ণপালা'; থিয়েটার ওয়ার্কশপের 'রাজরক্ত', 'চাকভাঙা মধু' 'নরকগুলজার' 'সহকালীর বাচ্চা,' এবং 'বিসর্জন,' নবনাট্য আন্দোলনকে দিয়েছে গতি, দিয়েছে শক্তি।

ষাট ও সত্তরের দশকের নাটক ও নাট্যসংস্থা

নবনাট্য আন্দোলনের প্রভাব পড়েছে পেশাদরী রঙ্গালয়ের উপর। যে-সব রঙ্গমঞ্চ এতদিন শেষপ্রহরের অপেক্ষায় দিন গুণছিল তাদের সামনে নতুন রাস্তা খুলে দিল এই সব অপেশাদারী নাট্যসংস্থা। বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের একশো বছর পূর্ণ হয়েছে কিন্তু অন্যান্য সাহিত্য শাখার তুলনায় এখনও বাংলা নাট্য সাহিত্য কিছুটা দুর্বল। এই দুর্বলতা দূর করার জন্যে নাট্যকর্মী এবং লেখকদেরই অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। প্রমোদকরে জর্জরিত হলে নাট্য চর্চা বিঘ্নিত হবে। সেদিক থেকে সরকারের সহানুভূতিপূর্ণ সহযোগিতাও এ ব্যাপারে অপরিহার্য।

শেষকথা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়
সাম্প্রতিক বাংলা নাটকের গতিপ্রকৃতি।

পাঠসহায়ক বাণী

A Play should give you something to think.—T. S. Eliot
(1888-1956) Eng. poet and critic.

The duty of dramatists is to express their times and guide the public through the perplexities of those times, R. E. Sherwood. (1896-1955)
American playwright

বাংলা ছোটোগল্প

[সূচনা—ছোটোগল্প কী—ছোটোগল্পের জীবনজিজ্ঞাসা ও বিশ্বসাহিত্যে ছোটোগল্প—বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প ও রবীন্দ্রনাথ—শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমার—কল্লোল, কালিকলম ও তাদের উত্তরসূরী—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের গল্প—শেষকথা।]

সূচনা

গল্পের জন্ম হয়েছে ইতিহাস-পূর্ব মানুষের কালে। কিন্তু ছোটোগল্প হল আধুনিক যুগের ফসল। বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প এসেছে বিশ্বসাহিত্য থেকে। আর রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করেই সে করেছে সকলের হৃদয় জয়। সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধির মূলে এই ছোটোগল্প। যাকে নিয়ে আমরা গর্ব করতে পারি, গৌরব করতে পারি, প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারি বিশ্বসাহিত্যের পাশে।

ছোটোগল্প কী

বয়সে ছোটো বলে ছোটোগল্প সম্পর্কে শেষ কথা বলার দিন এখনও আসে নি। তাই মানতে হয় নানামুনির নানামত। তবে একথা ঠিক, একটি মাত্র ভাব বা ঘটনাকে ছোটোগল্প প্রকাশ করে আর প্রকাশ করতে গিয়ে 'নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা' অর্থাৎ 'To produce maximum effect with minimum materials'। কেউ আবার বলেন ছোটোগল্প হল চোরালণ্ঠনের আলো, একটি বিশেষ বস্তুর উপরই সে আলো ফেলে। ইংরেজিসাহিত্য সমালোচক Hudson বলেন : "We may say that a short story is a story that can be easily read at a single sitting." এ যেন সেই অন্ধদের হাতি দেখার মতো। সামগ্রিক পরিচয় কেউ দিতে পারে নি।

ছোটোগল্পের জীবন-জিজ্ঞাসা ও বিশ্ব-সাহিত্যে ছোটোগল্প

ছোটোগল্প হল বেদনার যুগের ফসল। একদিকে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ আর পরিবর্তিত মূল্যবোধ, অন্যদিকে যন্ত্রসভ্যতার গতিময়তা, অর্থ নৈতিক বৈষম্য, সমাজ চেতনা, ছোটোগল্প রচনার পটভূমি তৈরি করেছে। রোমান্টিক অভিসার নয়, শরাহত পাখির মতো এ যুগের মানুষ বাস্তবের মাটির ওপর পড়ে আর্তনাদ করেছে, মাথা ঠুকেছে নিজের রক্তকর্দমের ওপর। প্রাত্যহিক জীবনের এই আশা-আকাঙ্ক্ষা সুখদুঃখের কথা নিয়ে লেখা হয় ছোটোগল্প।

ফরাসী লেখক গী দ্য মোপাসাকে বলা হয় ছোটোগল্পের গুরু। তাঁর লেখা 'নেকলেস' গল্পটি পড়ে নি পৃথিবীতে এমন লোকের সংখ্যা অতি নগণ্য। এর পরেই রুশ লেখক শেকভের স্থান। তাছাড়া বিশ্বসাহিত্যে ছোটোগল্পের ধারাকে যাঁরা সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের মধ্যে আছেন ব্যালজাক, ম্যাক্সিম গোর্কি, আলফাঁস দোদে, ডি. এইচ. লরেন্স, ফ্লবেয়ার, আলবেয়ার কামু, সমর সেট মম, টমাস মান, আরও অনেকে।

সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্পের ভরা জোয়ার। কিন্তু এ জাতীয় গল্প-রচনার ইতিহাস বেশিদিনের নয়। বাংলা গল্প-উপন্যাসের গোড়া পত্তন করেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। কিন্তু তিনি মূলত ঔপন্যাসিক। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে নয়, ছোটোগল্পের জন্ম বঙ্কিম পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের হাতে। প্রথম স্রষ্টার গৌরব তাঁরই।

বাংলা সাহিত্যে ছোটোগল্প ও রবীন্দ্রনাথ

গীতিকবিতার মতো ব্যঞ্জনাই ছোটোগল্পের আত্মা। রবীন্দ্রনাথের প্রত্যেক ছোটোগল্পের এটাই হল বৈশিষ্ট্য। গীতিকাব্য রচনার প্রতিভা তিনি ছোটোগল্প রচনায় প্রয়োগ করেছেন,

সার্থকও হয়েছেন। ছোটোগল্পের অজস্র সম্পদে তিনি বাংলা সাহিত্যকে করেছেন সমৃদ্ধ। তাঁর 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'মণিহারা', 'পোস্টমাস্টার', 'কঙ্কাল', 'কাবুলিওয়ালা', 'অতিথি', 'ছুটি', 'শুভা', 'মেঘ ও রৌদ্র' প্রভৃতি গল্পের সাহিত্যিক মূল্য সুদুর্লভ।

শরৎচন্দ্র ও প্রভাতকুমার

শরৎচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক। তাঁর প্রতিভা ছোটোগল্প রচনার অনুকূল না হলেও কয়েকটি ছোটোগল্প তিনি রচনা করেছেন। প্রতিটি গল্পে তাঁর ব্যক্তিত্ব ও রচনাধর্মের স্পষ্ট চিহ্ন অঙ্কিত হয়েছে। শরৎচন্দ্রের গল্পে ছোটোগল্পের লক্ষণ-গুলি সর্বত্র না থাকলেও গল্পের স্বাদুতা কিন্তু কোথাও কম নয়। 'অভাগীর স্বর্গ', 'মামলার ফল', 'একাদশী বৈরাগী', 'মন্দির', 'মহেশ' তাঁর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

এক সময় বাংলা ছোটোগল্প রচনায় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অসামান্য খ্যাতি লাভ করেছিলেন। তাঁকে বলা হত 'বাংলার মোপাঁসা'। রবীন্দ্রনাথের ভাবধর্মিতা বা শরৎচন্দ্রের মতো রূঢ়বাস্তবতা তাঁর রচনার ধর্ম নয়। জীবনের লঘুচপল দিক নিয়েই ছিল প্রভাতকুমারের কারবার। তাঁর 'আদরিণী' চিরকাল বাংলা সাহিত্যের আদরিণী হয়ে থাকবে।

কল্লোল কালিকলম ও তাদের উত্তরসূরী

কল্লোল, কালিকলমের যুগে আসার আগে রবীন্দ্র-শরৎ অনুসারী কয়েকজন গল্প-লেখকের কথা বলতে হয়। এরা হলেন সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। এর পরেই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের জোয়ার এসে লাগল বঙ্গদেশের সমাজশরীরে। সমাজপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যেও দেখা দিল নতুন আন্দোলন। পুরনো ঐতিহ্য থেকে কিছুটা ভিন্ন পথে গল্পের গতি ধাবিত হল। ভাঙনের প্রেক্ষাপটে মানবহৃদয়ের কাহিনী নিয়ে গল্পের মালা গাঁথলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যার, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুবোধ ঘোষ, মনোজ বসু, সন্তোষ ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র প্রভৃতি লেখকেরা। এঁদের গল্পে ভিড় করে এল সমাজের একতলার সাধারণ মানুষ। এল মধ্যবিত্ত, কুলিমজুর, পতিত আর পতিতা।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর কালের গল্প

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর অর্থনৈতিক, সামাজিক আর রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রে এল আরও পরিবর্তন। এল অবক্ষয়, কঠিনতম যন্ত্রণা। তাকে রূপ দেবার জন্যে এগিয়ে এলেন যুদ্ধোত্তর কালের তরুণ লেখকেরা; বিমল কর, আশাপূর্ণা দেবী, সমরেশ বসু, নবেন্দু ঘোষ, জরাসন্ধ, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, রমাপদ চৌধুরী, শঙ্কর প্রমুখ গল্পলেখকেরা।

শেষকথা

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এল ভারতের স্বাধীনতা। কিন্তু চাঁদের সঙ্গে কলঙ্কের মতোই এল নিষ্ঠুর আঘাত, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশ-বিভাগ। এই আশাহীন বিকৃত পটভূমিকায় সমাজ-মানসে ভিড় করে এল শূন্যতাবোধ ও গভীর নৈরাশ্য। এই যুগচিন্তার অনিবার্য ছবি ফুটেছে অতিসাম্প্রতিককালের ছোটোগল্পের মধ্যে। বেদনা যত

গভীর হবে ছোটোগল্পের ক্ষেতে ততই ফলবে সোনার ফসল। কারণ ছোটোগল্পের প্রাণ আছে বেদনার কৌটোয় ভরা।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়

১. অতি সাম্প্রতিক বাংলা ছোটোগল্প। ২. রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প।

একটি অভিধানিক সংজ্ঞা

A relatively brief invented prose narrative that typically deals with a limited group of characters involved in a single action, usually aims at unity of effect, and often concentrates on the creation of mood rather than the telling of a story.

—Webster's Third New International Dictionary.

বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম

[সূচনা—প্রথম দেশপ্রেমের উদ্ভব—ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলাল-হেমচন্দ্রের কাব্যে দেশপ্রেম—শ্রীমধুসূদন ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম—রবীন্দ্রসাহিত্যে দেশপ্রেম—বাংলা নাটকে স্বদেশপ্রেম—বাংলা উপন্যাসে ও গানে—শেষকথা।]

সূচনা

জননী আর জন্মভূমির প্রতি অনুরাগ মানুষের এক সহজাত প্রবৃত্তি। এই জন্মভূমির আকাশ-বাতাস, নদনদী, পাহাড়-পর্বত, ধূলোমাটি দেশের মানুষের কাছে পরম পবিত্র বস্তু। 'চিরদিন তোমার আকাশ তোমার বাতাস আমার প্রাণে বাজায় বাঁশি'—এই হল দেশপ্রেমিকের অন্তরের কথা।

প্রথম দেশপ্রেমের উদ্ভব

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য ছিল মূলত ধর্মীয় সাহিত্য। পার্থিবজীবন নয়, অপার্থিব স্বর্গলোক ছিল তাদের কামনার বস্তু। যদিও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বিদেশী তুর্কী শাসন এদেশে কায়েম হয়েছে, ক্ষুণ্ণ হয়েছে আমাদের স্বাধীনতা, তবু সাহিত্যের দর্পণে দেখি সে যুগের কামনা স্বাধীনতা নয়, মোক্ষ। বাংলা সাহিত্যে দেশপ্রেম নিতান্তই আধুনিক যুগের ফসল।

ঈশ্বর গুপ্ত-রঙ্গলাল-হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রের কাব্যে দেশপ্রেম

বাংলা সাহিত্যে প্রথম স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ ঘটেছে ঈশ্বরগুপ্তের রচনায়। তিনিই প্রথম বিদেশের ঠাকুরকে ফেলে স্বদেশের কুকুরকে বরণ করে নেবার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এ ছাড়াও নানাভাবে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তিনি ইংরেজ অনুকরণের প্রবণতাকে জর্জরিত করেছিলেন। স্বদেশের কথা থাকলেও এগুলি বিশুদ্ধ স্বদেশপ্রেমের কবিতা নয়; বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম উচ্চারিত হয়েছে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতায়।

"স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে
কে বাঁচিতে চায়?
দাসত্ব-শৃঙ্খল বল কে পরিবে পায় হে
কে পরিবে পায়?"

হেমচন্দ্রের 'ভারত সংগীত', 'ভারত বিলাপ', 'পদ্মের মৃণাল' প্রভৃতি কাব্যে স্বাধীনতা-কামনার বাণী শোনা গেল। নবীনচন্দ্র 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যে দেশবাসীকে ইতিহাস সচেতন করেছেন। এই কাব্যের মোহনলাল চরিত্রের মধ্যে স্বাধীনতার গৌরবগান কবির স্বদেশপ্রেমের পরিচয়।

শ্রীমধুসূদন ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রেম

'ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগার ; লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে'। মেঘনাদের এই দম্ভের মধ্যে মধুসূদন সুকৌশলে আধুনিক দেশপ্রেমের মর্মবাণী প্রকাশ করেছেন। তাঁর কণ্ঠেই শুনতে পেলাম 'নির্গুণ স্বজন শ্রেয়—পর পর সদা'। এইসব উক্তির মধ্যে সে যুগের পরপদানত বাঙালী নিজের হৃদয়সঙ্গীত শুনতে পেয়েছে।

বঙ্কিমের সাহিত্যে এসে স্বদেশপ্রেম পূর্ণতা লাভ করল। তিনিই নতুন যুগের মন্ত্রদাতা গুরু। তাই বঙ্কিম হলেন ঋষি। তাঁর 'আনন্দ মঠ' স্বদেশপ্রেমের গীতা। আর বন্দে-মাতরম্-সঙ্গীত জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদায় অভিষিক্ত। কাব্যের ভাবনির্ভর স্বদেশপ্রেমকে তিনি ঐতিহাসিক কাহিনীর মধ্যে দিয়ে বাস্তবের মাটির ওপর দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'সীতারাম', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ'—স্বদেশ-প্রেমের বাস্তব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

রবীন্দ্রসাহিত্যে দেশপ্রেম

স্বদেশপ্রেমের আবহাওয়ায় রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশ। বঙ্গভঙ্গ, হিন্দুমেলা, দেশব্যাপী স্বাধীনতা আন্দোলন, জালিয়ানওয়ালাবাগের নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, নানাভাবে বিশ্বকবির সাহিত্যকে তরঙ্গিত করে তুলেছে। তাঁর অসংখ্য গানে কবিতায় ভারতমাতার ভাবঘন কল্পমূর্তি প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর 'মানসী', 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'খেয়া', 'স্বদেশ ও সংকল্প', 'গীতাঞ্জলী'র কবিতায় ও বিভিন্ন উপন্যাসে দেশকে ভালবাসা, দেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধা অনবদ্য ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে।

বাংলা নাটকে স্বদেশপ্রেম

নাটকে স্বদেশপ্রেমের জোয়ার এল ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দে দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ' থেকে। গিরিশচন্দ্র তাঁর 'সিরাজদ্দৌলা' ও 'মীরকাশিম' নাটকে দেশপ্রেম আরোপ করেছেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরু বিক্রম', 'সরোজিনী', 'অশ্রুমতি', দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রতাপ সিংহ', 'চন্দ্রগুপ্ত', 'দুর্গাদাস', 'মেবার পতন', ক্ষীরোদপ্রসাদের 'বঙ্গের প্রতাপাদিত্য', 'পদ্মিনী', প্রভৃতি নাটকে স্বদেশপ্রেম প্রকাশিত হয়েছে। মুকুন্দদাসের স্বদেশী যাত্রাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মন্মথ রায়ের 'দেবাসুর', 'কারাগার' এবং শচীন সেনগুপ্তের 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজ-দ্দৌলা' প্রভৃতি নাটক স্বদেশপ্রেমমূলক ভাবনার উজ্জ্বল নিদর্শন।

বাংলা উপন্যাসে ও গানে

বঙ্কিমযুগ ও তাঁর পরবর্তী কালের উপন্যাসে স্বদেশানুরাগের স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায় রমেশচন্দ্র দত্তের উপন্যাসে। প্রত্যক্ষভাবে স্বদেশপ্রেমের বিষয় অবলম্বন করে শরৎচন্দ্র রচনা করলেন তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পথের দাবী'। স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগে এই উপন্যাসটি স্বদেশপ্রেমের গীতায় পরিণত হয়েছিল। তারাশঙ্করের অনেক উপন্যাসে স্বদেশপ্রেম একটি প্রধান বিষয়-রূপে গৃহীত হয়েছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের 'যে দিন সুনীল জলধি হইতে,' 'বঙ্গ আমার জননী আমার' অথবা 'ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা' প্রভৃতি গান দেশপ্রেমের আবেগ দিয়ে ঠাসা। বিদ্রোহী কবি নজরুলের কাব্য এবং সঙ্গীত একদিন সারাদেশে দেশপ্রেমের বন্যা এবং বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়েছিল।

শেষকথা

যুগে যুগে সাহিত্যের ধারা বদল হয়, পুরনো ভাবের স্থানে আসে নতুন ভাব, নতুন আদর্শ। কিন্তু স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে যেমন স্বদেশপ্রেমের প্রয়োজন, স্বাধীনতা রক্ষার জন্যে এবং দেশোন্নয়নের জন্যেও চাই স্বদেশপ্রেম। এদিক থেকে বিষয়টি বিবেচনা করে দেখলে সাহিত্যে দেশপ্রেমের অবকাশ আজও সমানভাবে আছে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়

১. বাংলা গানে স্বদেশপ্রেম। ২, রবীন্দ্রসাহিত্যে স্বদেশপ্রেম। ৩. বাংলা নাটকে স্বদেশপ্রেম।

চিন্তাসহায়ক বাণী

সাহিত্যের আর একটা কাজ হচ্ছে, মানুষ যা অত্যন্ত ইচ্ছা করে সাহিত্য তাকে রূপ দেয়। এমন করে দেয় যাতে সে আমাদের মনের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে।

—রবীন্দ্রনাথ

দেশ মৃন্ময় নয়, চিন্ময়। মানুষ যদি প্রকাশমান হয় তবেই দেশ প্রকাশিত

—রবীন্দ্রনাথ।

বাংলার ব্রত

[ভূমিকা—বংলার ব্রতের স্বরূপ—ব্রতের বৈচিত্র্য—ব্রতের প্রাচীনত্ব—ব্রত ও উপাসনা—ব্রতাচারণ পদ্ধতি ও তার শিক্ষাগত দিক—পরবর্তী কালে সামাজিক কারণে নতুন সংযোজন—ব্রতের উদ্দেশ্য—ব্রতের উপকরণ—দেশ-বিদেশের ব্রত ও বাংলার ব্রত—উপসংহার]

ভূমিকা

শিল্পসৃষ্টির মূলে থাকে মানুষের তীব্র আবেগে। কিন্তু আবেগের বলে কিছু করলেই তা শিল্প হয় না। সম্ভবত কামনার তীব্র আবেগ আর তার চরিতার্থতা এ দুয়ের মধ্যের যে-বিচ্ছেদ, যে-শূন্যতা, মন তাকে ভরে তোলে নানা কল্পনায়, রঙে, রসে, বর্ণে, গন্ধে—এই সময়টাই শিল্পসৃষ্টির অনুকূল। অনেক সময় সম্ভাবনা আর বিফলতা,—আশা-আকাঙ্ক্ষা আর যন্ত্রণা—এ থেকেও সৃষ্টি হয় শিল্পের।

বাংলার ব্রতের স্বরূপ

কিন্তু কোনো সমাজ তার সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখকল্পনা ও সমৃদ্ধির আশাকে আবাহন করে,—তার সেই লোকাচার জন্ম দেয় শিল্পের বিভিন্ন আঙ্গিক—চিত্রকলা, ছড়া, গান এমন কি নাট্যশিল্পও।

বাংলার ব্রত এই সব মিলিয়ে। ভবিষ্যতের কিছুর জন্যে প্রতীক্ষার সময়টাকে

মানুষ ভরিয়ে তুলেছে এই ধরনের লোকাচারে। দৈনন্দিন জীবনযাপনের সাধারণতম অংশও বিশুদ্ধ আবেগের স্পর্শে অপরূপ হয়ে উঠেছে তাদের জীবনে।

ব্রতের বৈচিত্র্য

অসংখ্য ধরনের ব্রত আছে আমাদের—শাস্ত্রীয় ব্রত, যোষিৎ-প্রচলিত বা মেয়েলী ব্রত, কুমারী ব্রত, নারী ব্রত ইত্যাদি। এর কোনোটি শাস্ত্রসম্মত, কোনোটি লোকাচার-সম্মত, কোনোটি কুমারী মেয়েদের, আবার কোনোটি হয়তো বা বিবাহিতা মেয়েদের দ্বারা পালিত হয়। এগুলির মধ্যে প্রক্রিয়াগত তফাৎ থাকা স্বাভাবিক এবং আছেও, কিন্তু এগুলির মূলগত প্রকৃতিতে এবং পার্থিব বস্তুর কামনাতেই সব ব্রত অনুষ্ঠিত হয়। তাই ব্রত সর্বদাই সাধারণ সম্পত্তি, কোনো ধর্মবিশেষ বা দলবিশেষে বদ্ধ নয়। বিভিন্ন প্রাকৃতিক কারণে মানুষের যে-বিপর্যয় ঘটত সেগুলিকে রোধ করবার ইচ্ছা এবং প্রচেষ্টা থেকেই অধিকাংশ ব্রতের উৎপত্তি।

ব্রতের প্রাচীনত্ব

আর্যরা ভারতে এসে এখানকার মানুষদের ডাকলেন 'অন্যব্রত' নামে,—এ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় দেশীয় ব্রতগুলি প্রাগার্য সংস্কৃতি। আজও তা আমাদের গ্রামাঞ্চলে একই ভাবে পালিত হচ্ছে। তার কারণ মানুষের বাইরেটা যত দ্রুত বদলায় ভেতরটা তত দ্রুত বদলায় না, আর এগুলিও আমাদের ভেতরের জিনিস। তা ছাড়া, মানুষের প্রাথমিক কামনা-বাসনার স্বরূপ মূলত এক। তাই জীবনের জটিলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রতের সন্ধান আমরা হারিয়ে ফেললেও তা অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো আজও বহমান।

ব্রত ও উপাসনা

ব্রত কখনই একার নয়, তা সকলের। উপাসনার সঙ্গে ব্রতের এখানেই তফাৎ। আর উপাসনায় 'উপাসনাই' চরম, কিন্তু ব্রতের শেষ কামনার সফলতায়। ভাদুলীব্রতে অঙ্কিত আল্পনার এক-একটি চিত্র তুলে ধরে একসঙ্গে সমস্বরে, প্রশ্ন উচ্চারিত হয়, 'নদী নদী ! কোথা যাও ? বাপ-ভায়ের বার্তা দাও।' —সকলেরই বাপ-ভাই উপার্জনের তাগিদে বাইরে, দূর দেশে, শরতের আগমনে তাঁরা ফিরবেন। তাঁদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের কামনায় বর্ষায় পালিত হয় এই ব্রত।

ব্রতাচারণ পদ্ধতি ও তার শিক্ষাগত দিক

বাংলার প্রায় অধিকাংশ ব্রতের আচরণপদ্ধতি অনুধাবন করলে আমরা দেখব, তার প্রথম অঙ্গ আল্পনা, যার ভেতর কামনার রূপকধর্মী প্রকাশ ঘটে, দ্বিতীয় অঙ্গ ছড়া বা গান গীত হয় আকাঙ্ক্ষার বাঙ্ময় প্রকাশ হিসাবে এবং সবশেষে থাকে ব্রতকথা শোনা, যার মাধ্যমে সমাকাঙ্ক্ষী মানুষ পরস্পর মিলিত হয়।

ব্রতের প্রথম অংশ চিত্রশিল্প, দ্বিতীয় অংশ কাব্য এবং তৃতীয় অংশ কাহিনী ও নাট্য-রসে সমৃদ্ধ। কিন্তু আশ্চর্য, সরল ও সহজ এদের প্রকাশভঙ্গী, যার স্নিগ্ধতা, সৌন্দর্য ও রুচি আমাদের অনায়াসে মুগ্ধ করে।

পরবর্তী কালে সামাজিক কারণে নতুন সংযোজন

ব্রাহ্মণশাসিত সমাজ-জীবনে অনেক সময়ে ব্রাহ্মণেরা নিজেদের সুযোগ-সুবিধার জন্যে বিভিন্ন ব্রত প্রচলনের চেষ্টা করেছেন। পরবর্তী কালে সংযোজিত ব্রতগুলি অনুকারী বলেই হয়তো সহজ নয়, এবং 'নকল' হিসাবে ধরা পড়ে যায়। তবে এগুলির প্রচলনে তারা খুব ব্যর্থ হয় নি, কারণ সমাজবিধি ছিল তাদের হাতে।

ব্রত পালন করেন মেয়েরা। ব্রতের উদ্দেশ্য যত বিচিত্র হোক না কেন, সর্বত্রই চিরন্তন নারীধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কখনও বৃষ্টি-কামনায়, কখনও পুত্রকামনায়, কখনও আরো ফসলের জন্যে, আবার কখনও প্রবাসী প্রিয়জনের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের আকাঙ্ক্ষায় পালিত ব্রতগুলিতে আমরা চিরকালের জায়াজননীদের চিনতে পারি।

ব্রতের উদ্দেশ্য

ব্রত-উদ্‌যাপনে প্রয়োজনীয় বস্তুগুলিও অত্যন্ত বিচিত্র। ধানের শীষ, পিটুলিগোলা, পিঁড়ি, সরা, প্রদীপ ইত্যাদি ব্রতে শিল্পকলার বা মঙ্গলকামনার উপকরণ।

ব্রতের উপকরণ

দেশ-বিদেশের ব্রতপালনের সঙ্গে স্বভাবতই এইসব ব্রতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে মিল পাওয়া যায়। কারণ ব্রতপালনের মূলে যে-সব পার্থিব কামনা-বাসনাগুলি কাজ করে, সেগুলি দেশকালের অতীত। সেজন্যে যে-কোনো প্রাচীন কৃষিজীবী বা বৃত্তিজীবী সমাজের সঙ্গে এই লোকাচারগুলির মিল পাওয়া যায়, তফাৎ যা থাকে তার মূল কারণ ভৌগোলিক ও সামাজিক অবস্থা।

দেশ-বিদেশের ব্রত ও বাংলার ব্রত

আধুনিক জীবনধারায় মানুষের শিল্পবোধের এই আশ্চর্য প্রকাশ হারিয়ে যাচ্ছে। এর কারণ জীবনাচরণ-পদ্ধতির পরিবর্তন। সামাজিক ও অর্থ নৈতিক পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তন অত্যন্ত স্বাভাবিক।

উপসংহার

তবে আশার কথা লোকসংস্কৃতির এই আশ্চর্য অঙ্গটি নিয়ে চর্চা ক্রমশই বাড়ছে। উদ্ধারের কাজও চলছে সেই সঙ্গে। স্নাতকোত্তর লোকসাহিত্যের ছাত্রছাত্রীরাও এ বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছেন।

১. এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়
ভারতীয় শিল্পে ব্রতের অবদান।

কথামৃত শতবার্ষিকী

[ভূমিকা—সংকলক-পরিচিতি—কথামৃত-মাধুর্য—উপসংহার।]

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (১৮৫৪-১৮৩২) ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী সংকলন করতে শুরু করেন। সেই বাণী-সংকলন শুরু হবার পর ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে ১০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। ঐ বছরে তাই কথামৃত শত-বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

ভূমিকা

মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত (শ্রীম) 'মাস্টার মহাশয়' নামেই সমধিক পরিচিত। কারণ তিনি বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন এবং সিটি, রিপন ও মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপক ছিলেন। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের সঙ্গে প্রথম তাঁর সাক্ষাৎ হয় ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮২। তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে যে

সংকলক-পরিচিতি

দিনলিপি লিখে রাখেন তাই অবলম্বন করে ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁর Gospel of Sri Ramkrishna প্রকাশিত হয়। পরে শ্রীম কথিত এই নামে 'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত' পাঁচ-খণ্ডে প্রকাশিত হয় (১৯০৪-১৯৩২)। 'কথামৃত' অধ্যাত্মচেতনায় এবং সাহিত্য-সুষমায় বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ।

কথামৃত-মাধুর্য

যা অতিমধুর ও প্রাণপ্রদ, তাই অমৃত। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণীও তাই। এইজন্যে তাঁর বাণীকে শ্রীম 'কথামৃত' বলেছেন। বহু জটিল দার্শনিক তত্ত্বকে শ্রীরামকৃষ্ণ অতি সহজ উপমাগর্ভ বাক্যে প্রকাশ করেছেন। ব্রহ্ম স্বরূপ বা ব্রহ্ম ও শক্তি সম্বন্ধে বলেছেন—'জল স্থির থাকলেও জল—তরল হলেও জল।' 'সাপ চুপ করে কুণ্ডলী পাকিয়ে থাকলেও সাপ, আবার তির্যক গতি হয়ে এঁকে বেঁকে চললেও সাপ'। 'বাবু যখন চুপ করে আছে তখনও যে ব্যক্তি, যখন কাজ করছে তখনও সেই ব্যক্তি।'

কী আশ্চর্য সমীক্ষা ও প্রকাশনা! সত্যি, উপমা রামকৃষ্ণস্য।

একজন জিজ্ঞাসা করল, কৈ ঈশ্বরকে দেখতে পাই না কেন? তা মনে উঠলো, বললুম, 'বড় মাছ ধরবে, তার আয়োজন কর। চার কর; সুতো ছিপ জোগাড় কর। গন্ধ পেয়ে গভীর জল থেকে মাছ আসবে। জল নড়লে টের পাবে, বড় মাছ এসেছে।'

নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে এই ধরনের কথা। বিবেকানন্দ সম্বন্ধে চট্ করে বললেন—

'ডোবা পুষ্করিণীর মধ্যে নরেন্দ্র বড় দীঘি। যেমন হালদার পুকুর।'

'সংসারে কী ভাবে থাকবে?—পাঁকাল মাছের মতো।'

'সৎসঙ্গ সর্বদাই দরকার। গঙ্গার কাছে যতই যাবে ততই হাওয়া।'

'বিষয়াসক্ত মন যেমন ভিজে দেশলাই, যত ঘষো জ্বলে না।'

এসব উপমা শুধু বাক্যের নয়, আত্মার অলংকার।

আর parable-জাতীয় গল্পগুলির বিশ্বসাহিত্যে তুলনা মেলা ভার।

'এক বাপের দুটি ছেলে। ব্রহ্মবিদ্যা শিখবার জন্য ছেলে দুটিকে বাপ আচার্যের হাতে দিলেন। কয়েক বৎসর পরে গুরুগৃহ থেকে ফিরে এল, এসে বাপকে প্রণাম করলে। বাপের ইচ্ছা দেখেন, এদের ব্রহ্মজ্ঞান কিরূপ হয়েছে। বড় ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন বাবা, তুমি ত সব পড়েছ, ব্রহ্ম কিরূপ বল দেখি! বড় ছেলেটি বেদ থেকে নানা শ্লোক বলে বলে ব্রহ্মের স্বরূপ বোঝাতে লাগল। বাপ চুপ করে রইলেন। যখন ছোট ছেলেকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে হেঁট মুখে চুপ করে রইল। মুখে কোনো কথা নেই। বাপ তখন প্রসন্ন হয়ে ছোট-ছেলেকে বললেন, 'বাপু! তুমিই একটু বুঝেছ। ব্রহ্ম যে কি, তা মুখে বলা যায় না।'

সাহিত্য বা কাব্যে যত সুলক্ষণ তা-ই তাঁর কথায় পাওয়া যাবে। তাঁর গল্পগুলিতে আছে আশ্চর্য নাট্যরস। এগুলির নাট্যে রূপায়ণ ও অভিনয় সংস্কৃতিচর্যায় এক বিশেষ মূল্যবান উপাদান হয়ে উঠতে পারে।

শুধু অধ্যাত্মতত্ত্ব নয়, আমাদের জীবনের প্রয়োজনের দিক, আমাদের মধ্যেকার

সংকীর্ণতা বা অসঙ্গতি এ সব কিছুই অনবদ্য বাগভঙ্গীতে তিনি দেখিয়েছেন। মানুষের যা শ্রেয় তার দিকেই তাঁর অঙ্গুলীনির্দেশ। রামকৃষ্ণ কথামৃত তাই আধুনিক যুগেরও অমৃত। আমরা আশা করব কথামৃত-শতবার্ষিকীতে শ্রীমসংকলিত গ্রন্থটির কোনো সুলভ সংস্করণ হবে যা ঘরে ঘরে পৌঁছবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায়

১. রামকৃষ্ণের বাণী।

পঁচিশে বৈশাখ

[ভূমিকা—পঁচিশে বৈশাখের তাৎপর্য—জন্মদিন পালনের ব্যাখ্যা—চির নতুনেরে দিল ডাক—গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজো—তোমার পূজার ছলে—আমাদের পঁচিশে বৈশাখ—বৈচিত্র্য চাই—রবীন্দ্রব্যবসা নয়—দ্বারে এসে দিল ডাক।]

ভূমিকা

"চির নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ, হে নূতন।"

একটি বছরের বিশেষ একটি দিন বিশেষ একজন মানুষের উদ্দেশ্যে নিবেদিত। পঁচিশে বৈশাখ যেন প্রতিটি বাঙালীর কাছে উৎসবের দিন, আনন্দের দিন। মহাকালের পৃষ্ঠায় পঁচিশে বৈশাখ অতীতে বহুবার পদাঙ্ক রেখে গেছে। কিন্তু বাংলা ১২৬৮ সালের পঁচিশে বৈশাখ একদিন ঘোষিত হয়েছিল মঙ্গলশঙ্খে। যে শুভ্র নব শঙ্খ পরাণ ভরে বেজেছিল সে এক মহামনীষীর আগমনবার্তা ঘোষণা করে। তারপর থেকে আরো বহুবার বাঙালীর জাতীয় জীবনে পঁচিশে বৈশাখ এসেছে। এখন আমরা এগিয়ে চলেছি আর এক পঁচিশে বৈশাখের দিকে। আর এক প্রজন্মের দিকে।

রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর 'পঁচিশে বৈশাখ' কবিতায় এই দিনটির বিশেষ তাৎপর্যের দিকটি নিরাসক্ত ও ধ্যানী মানুষের দৃষ্টিতে সুন্দরভাবে ব্যক্ত করে গেছেন। আমাদের কাছে এই দিনটির তাৎপর্য তাই আরো নিবিড়ভাবে, গভীরভাবে ধরা পড়েছে। এদিন তাই চিরদিনের, এদিন তাই আমাদের নিজেদের খুঁজে পাবার দিন। 'নানা রবীন্দ্রনাথের মালা' কথাটির নিহিত অর্থ উপলব্ধি করতে পারলে দেখা যাবে আমরা কী অপার মানসিক ঐশ্বর্য আর জীবনদর্শনের গরিমা লাভ করেছি। এ তো শুধু নানা উৎসবের সঙ্গীত, কথকতা আর নিছক নৃত্য-গীতের মাধ্যমে প্রথারক্ষার প্রচেষ্টা নয়। এদিনের আসল তাৎপর্য হল এর নিগূঢ় ভাবগত দিক, আত্মোপলব্ধির প্রয়াস, সত্য আবিষ্কারের উন্মুখতা ও শপথপালনের সমবেত আন্তর উৎসব।

পঁচিশে বৈশাখের তাৎপর্য

জন্মদিন কেন পালন করা উচিত—তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শান্তিনিকেতন' গ্রন্থের প্রসঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন। যে শিশুর জন্ম হল তাকে আমরা বরণ করে নিই। পৃথিবীতে তার আগমনের নিশ্চয়ই কোনো উদ্দেশ্য ও মূল্য আছে। তাই 'তোমাকে আমরা পেয়েছি' এ স্বীকৃতি জানাতে হয় জন্মদিনের আয়োজনে। একটি মানুষের জন্ম বহুবার হয়। তার নতুন ভাব, নতুন দর্শন ও চিন্তাধারার জন্মের মাধ্যমে সে নিজে বা তার সমগ্র সত্তা নতুন হয়ে ওঠে। জন্মদিন পালনের মধ্য দিয়ে তার নিত্য নতুন জন্মলাভকেই আমরা স্বীকৃতি জানাই। জন্মদিন প্রতিপালনের মাধ্যমে আমরা পৃথিবীতে তার আগমনের গুরুত্ব ও মূল্য স্মরণ করিয়ে দিই। সে যে ভাগ্যচক্রে বা নিয়তির বিধানে হঠাৎ পথ ভুল করে অনাহূতের মতো পৃথিবীতে এসে পড়ে নি—এটা আমরা তাকে জন্মদিনের মধ্য দিয়েই স্মরণ করিয়ে দিই।

জন্মদিন পালনের ব্যাখ্যা

পঁচিশে বৈশাখ চির নতুন। এই চির নতুনকে আমরা ডাক দিই। আমরা নতুন করে কবিকে পাই। তাঁর ভাবধারা, তাঁর সঙ্গীত, তাঁর সবকিছুই আমরা নতুন করে বুঝে নিই, গ্রহণ করি। আর তাঁর মধ্য দিয়ে, তাঁর গানের ভেতর দিয়ে ভুবনটাকে দেখার চেষ্টা করি। এ ভুবন প্রতিবার কেমন নতুন হয়ে, বিচিত্ররূপে ধরা দেয়। 'তুমি নব নব রূপে এসো প্রাণে'। তাঁকে এই ভাবে বিচিত্র রূপে আমরা দেখার চেষ্টা করি আর ধন্য করি নিজেদের।

চির নতুনেরে দিল ডাক

রবীন্দ্রনাথের কাব্য, সঙ্গীত আর রচনা-সম্ভারের আয়োজনেই আমরা তাঁর জন্মদিন পালন করি। তাঁর ফুল দিয়েই তাঁকে শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাই। কিন্তু এই পুজোর পুণ্যফল নিশ্চয়ই আছে। তবে যথার্থ উপলব্ধি আর নিষ্ঠার মাধ্যমে যদি আমরা তাঁর জন্মদিন উদ্‌যাপিত করি তবেই আমাদের পুজো সার্থক। পুজো সার্থক করার অর্থ আত্মোন্নতি।

গঙ্গাজলে গঙ্গাপুজো

'তোমার পূজার ছলে তোমায় ভুলেই থাকি'। পূজা তখনই ছল হয়ে দাঁড়ায় যখন সে পূজায় হৃদয় থাকে না। তখন ধূপের ধোঁয়া পলে পলে দেবতাকেই মলিন করে। রবীন্দ্রপূজার নামে যদি আমরা নিছক অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখি নিজেদের, তবে পঁচিশে বৈশাখ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। তাই আমাদের কর্তব্য তাঁর সৃষ্টিকে বুঝতে চেষ্টা করা, তাঁর ভাবনার তাৎপর্য যথার্থভাবে উপলব্ধি করা। কবি তাঁর সৃষ্টিতে ধরা পড়েন। তাই কবির সৃষ্টিকে সঠিক ভাবে বুঝে নিতে পারলে কবিকে চেনা যায়, বোঝা যায়।

তোমার পূজার ছলে

বর্তমানে আমাদের পঁচিশে বৈশাখ কতকগুলি নির্দিষ্ট অনুষ্ঠানসূচীর মাধ্যমে সীমিত। প্রতি বছর সেই একই চিত্র। ভোরবেলা জোড়াসাঁকোয় লোকের মিছিল, ঠেলাঠেলি, কলরব। রবীন্দ্রসদনের সামনে প্রচণ্ড দাবদাহে আকাশের নীচে অগণিত মানুষের ভিড়। জনপ্রিয় শিল্পীদের ব্যাপক সমাবেশ। প্রায় পঞ্চাশ জন শিল্পীর দীর্ঘ তালিকা, ঘুরে

ফিরে একই গান। ভ্রাম্যমাণ রবীন্দ্রানুষ্ঠান, ভাষণ। সেই একই কথা, একই সুর।

আমাদের পঁচিশে বৈশাখ

বই দেখে খ্যাতিমান আবৃত্তিকারদের কবিতা পাঠ। এঁরা এত দিন ধরে কবিতা আবৃত্তি করছেন, অথচ মুখস্থ রাখার তাগিদ নেই, প্রচেষ্টা নেই। এই কি রবীন্দ্রভক্তির পরিচয়? সঙ্গীত-শিল্পীও খাতা অথবা গীতবিতান দেখে গান গেয়ে যান। গান মনে রাখাটা তাঁদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না। পঁচিশে বৈশাখের অনুষ্ঠানে এই শৈথিল্য কি সমর্থনযোগ্য?

পঁচিশে বৈশাখে আমরা বৈচিত্র্য চাই। নতুনভাবে, নতুন রূপে রবীন্দ্রজয়ন্তী প্রতিপালিত হোক। রবীন্দ্রনাথের অনেক কবিতা আছে যেগুলি শোনা যায় না বা

বৈচিত্র্য চাই

শুনতে পাওয়া যায় না, অনেক গান আছে যা গাওয়া হয় না। রবীন্দ্রনাথের অনেক দিক আছে যা নিয়ে আলোচনা করা হয় না। মোটকথা, রবীন্দ্রনাথকে আরো বিশদভাবে, নতুনভাবে বৈচিত্র্যের মাধ্যমে তুলে ধরা হোক। রবীন্দ্রনাথ যে কৃষি ব্যাপারটা নিয়ে কত ভাবতেন সে কথা কি আমরা ভেবে দেখি? তিনি কৃষিবিষয়ক শিক্ষার জন্মে নিজের ছেলে ও জামাইকে বিদেশে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথের কৃষি বা অর্থনৈতিক চিন্তাবিষয়ক কোনো অনুষ্ঠান শোনা বা দেখা যায় কি?

বলতে দুঃখ হয়, পঁচিশে বৈশাখের সুযোগ নিয়ে অনেকের বাণিজ্যিক স্বার্থ চরিতার্থ

রবীন্দ্রব্যবসা নয়

হয়। রবীন্দ্রব্যবসা কথাটা কোনো এক প্রখ্যাত আধুনিক কবির ব্যবহৃত। এই ব্যবসার রূপ অবশ্য নানাভাবে দেখা যায়। রবীন্দ্রব্যবসা যেমন, তেমনি অন্ধ রবীন্দ্রভক্তিও অযৌক্তিক। রবীন্দ্রনাথের ভাবধারার মূল্যায়ন চাই। এ প্রচেষ্টা পঁচিশে বৈশাখকেই সার্থক করবে।

তবু দ্বারে এসে দিল ডাক পঁচিশে বৈশাখ। আবার একটা পঁচিশে বৈশাখ ডাক

দ্বারে এসে দিল ডাক

দিয়ে গেল সেদিন। আবার আমরা রোমাঞ্চিত হলাম, অনুপ্রাণিত হলাম। আমরা অপেক্ষা করে আছি আর-একটির জন্মে যা 'সূর্যের মতন' আমাদের হৃদয় মনকে প্রদীপ্ত করে তুলবে।

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায়—

১. রবীন্দ্রজয়ন্তী। ২. রবীন্দ্রনাথ ও আমরা। ৩. সমাজ-জীবনে রবীন্দ্রপ্রভাব।

সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা

ভূমিকা—সাহিত্য কী—কিন্তু কেন—সাহিত্যপাঠের বিচিত্র আনন্দ—সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্—সাহিত্যের প্রেরণা—নতুন পথের দিশারী—সাহিত্য ও সমাজ—প্রয়োজনের দিক—সাহিত্যের আরো শিক্ষা—দৈনন্দিন জীবনে সাহিত্যপাঠের প্রভাব—উপসংহার।

"পৃথিবীর আর সব সভ্য জাত যতই চোখের সংখ্যা বাড়াতে ব্যস্ত আমরা ততই

ভূমিকা

আরব্য উপন্যাসের একচোখা দৈত্যের মতো ঘোৎ ঘোৎ করি আর চোখ বাড়াবার কথা তুলতেই চোখ রাঙাই। চোখ বাড়াবার পন্থাটা কী? প্রথমত, বই পড়া এবং তার জন্যে দরকার বই পড়ার প্রবৃত্তি।" বই পড়াটা যে আমাদের পক্ষে কতটা জরুরি তা সৈয়দ মুজতবা আলির এই মন্তব্য থেকেই বোঝা যায়।

সাহিত্য কী

সাহিত্য কী এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন নেই। সাহিত্য লেখক-মনের সঙ্গে পাঠক-হৃদয়ের যে সেতুবন্ধন রচনা করে তা অনস্বীকার্য। সভ্যতার পরম গৌরব এই সাহিত্য। যুগ যুগ ধরে সাহিত্যপাঠ জনপ্রিয়তা অর্জন করে চলেছে। আমাদের প্রিয় লেখককে আমরা হৃদয়ের সিংহাসনে বসাই, প্রণতি জানাই। অন্তরের শ্রদ্ধাঞ্জলি দিয়ে সাহিত্যকে সম্মানিত করি। সাহিত্যসম্পদে দেশ ও জাতি গৌরব লাভ করে।

কিন্তু কেন

সাহিত্য যে আজ বিশ্বজোড়া ফাঁদ পেতেছে এর কারণ কী? এর কারণ হল, সাহিত্য মানুষের কথা বলে। মানুষের কান্না-হাসি, সুখ-দুঃখ, জীবনের ঘাত-প্রতিঘাত, নানা প্রশ্ন, সমস্যা—তার উত্তর, এই সব নিয়েই গড়ে ওঠে সাহিত্য। একটা দেশ ও জাতি চিন্তাধারায় ও সংস্কৃতিচেতনায় কতটা অগ্রসর তার পরিচয় বহন করে সাহিত্য। সাহিত্যপাঠক সাহিত্যে অনেক ক্ষেত্রেই নিজের প্রতিফলন দেখতে পায়, নিজের চেনা জগৎটার প্রতিচ্ছবিটি খুঁজে পায়। অনেক প্রশ্নের জবাবও পেয়ে যায়। তারপর সাহিত্যের শিল্পগত দিক—অর্থাৎ এর প্রকাশশৈলী, ভাষামাধুর্য, অলঙ্কারও পাঠককে আনন্দ উপহার দেয়।

সাহিত্যপাঠের বিচিত্র আনন্দ

সাহিত্যপাঠের আনন্দ বড়ো বিচিত্র। মানুষের চিত্তে যে রসবোধ আছে তার উৎসারণ ঘটে সাহিত্যের মাধ্যমে। পণ্ডিত-ব্যক্তিরা সাহিত্যের নব রসের কথা বলেন। 'বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্'। সাহিত্যের বাক্য রসসমৃদ্ধ। রসের বিভিন্নতা মানুষকে বিচিত্র স্বাদ দান করে নন্দিত করে, তৃপ্ত করে। হৃদয়ের কাছে যে-কোনো রসের মূল্য আছে। তাই করুণ রসও আমাদের আনন্দ দেয়। দুঃখের বর্ণনায় বুকটা ব্যথিয়ে ওঠে, চোখে নামে অশ্রুধারা। তবু তা আমাদের আনন্দ দেয়। প্রসঙ্গত শেলীর কথা মনে পড়ে, Our sweetest songs are those that tell of saddest thoughts.

সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্

সাহিত্যে থাকে সত্যের অর্চনা, আর যা মানুষের কল্যাণের সঙ্গে সম্পৃক্ত তার বর্ণনা। তা ছাড়া, সাহিত্যে থাকে সুন্দরের আরাধনা। অবশ্য এসব কথা সৎ সাহিত্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য। জীবনে চলার পথে সত্য, শিব আর সুন্দর —এই ত্রয়ীর মিলনও অপরিহার্য। তাই সাহিত্যপাঠে পাঠকের শুভচেতনা হয় জাগ্রত। সাহিত্য আমাদের মঙ্গলের সঙ্গে ও সত্যের সঙ্গে যুক্ত করে।

সাহিত্যের প্রেরণা

সাহিত্যের প্রেরণা নানা দিক দিয়ে অনুভূত হতে পারে। বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে উন্নত গ্রন্থের চরিত্র আমাদের জীবন-সংগ্রামে নানাভাবে সহায়তা করে। পার্ল বাকের 'গুড্ আর্থ', ন্যুট হামসুন-এর 'হাঙ্গার',

টলস্টয়ের 'রেজারেক্সন' যুগ যুগ ধরে আমাদের প্রেরণা দেয়। আমাদের জীবনবোধে উদ্দীপিত করে, আশা আর শক্তি যোগায়, নবজীবনের গান শোনায়।

নতুন পথের দিশারী

সৎ সাহিত্য আমাদের নতুন পথের সন্ধান দিতে পারে, নতুন জীবনবোধে অনুপ্রাণিত করতে পারে। নতুন সমাজ গড়ার ব্যাপারে সন্ধান দেয় সাহিত্য। সাহিত্যের শিক্ষা বেশি কার্যকর, কারণ এ শিক্ষা আনন্দের মাধ্যমে। এ শিক্ষায় কৃত্রিমতা নেই, আছে স্বাভাবিক অনুপ্রেরণা।

সাহিত্য ও সমাজ—প্রয়োজনের দিক

সমাজের ওপরে সাহিত্যের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেয়। অনেক বিশ্ববিখ্যাত গ্রন্থ সমাজ-গঠন, এমন কি সমাজ-বিপ্লবের প্রেরণা দিয়েছে। আমাদের এই ভারতে স্বদেশী আন্দোলনে সাহিত্য বিরাট ভূমিকা নিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ', শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' অনুপ্রাণিত ও উদ্বেলিত করেছে অগণিত স্বাধীনতাকামী মানুষকে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেমের উদাত্ত কবিতা, কাজী নজরুলের 'অগ্নিবীণা'র অগ্ন্যুদ্গার, সুকান্তের বিদ্রোহের কাব্য একদিন সারা দেশকে উত্তাল করে তুলেছিল—এ কথা কে না জানে! তাই সাহিত্যকে বাদ দিয়ে জীবন চলে না।

সাহিত্যের আরো শিক্ষা

সাহিত্য নানা জ্ঞানের ভাণ্ডারী। ইতিহাস-সমাজদর্শন থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন জ্ঞানের বাহন এই সাহিত্য। বর্তমান যুগে সাহিত্যের কত বৈচিত্র্য। 'সায়েন্স ফিকশন'ও আজ বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। কাজেই সাহিত্যে বিজ্ঞানের শিক্ষাও উপেক্ষণীয় নয়। এ ছাড়া, সাংবাদিকতার সাহিত্যও আমাদের আনন্দের মাধ্যমে নানা তত্ত্ব ও তথ্যের উপহার দেয়।

দৈনন্দিন জীবনে সাহিত্যপাঠের প্রভাব

সাহিত্যপাঠ পাঠককে একটা সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী দেয়। ভাষাকে মার্জিত করে, সুন্দর করে, রসবোধকে জাগ্রত করে দেয়। সাধারণ কথাবার্তাও অনেক সময় সাহিত্যের ছোঁয়ায় সুন্দর হয়ে ওঠে। আড্ডাও জমে ওঠে সাহিত্য আলোচনায়। অনেক গুরুগম্ভীর অথবা বিষাদাচ্ছন্ন পরিবেশও সাহিত্যিক ভাষায় বা প্রকাশভঙ্গিমায় সরস হয়ে ওঠে। নানা সাহিত্যগ্রন্থ পাঠের অধিকারী যে সে অনেক ক্ষেত্রেই অপরের ওপরে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে, সমাদৃত হয়। স্কুল-কলেজের শিক্ষাতেও সাহিত্যপাঠের প্রয়োজনীয়তা বোঝা যায়। সাহিত্যপাঠ শিক্ষার্থীকে ভাষার উৎকর্ষ ও ভাবের বৈচিত্র্য দান করে। এ ছাড়া, অনেক বিষয়ে জ্ঞানের পরিধির বৃদ্ধিও ঘটায়। সাহিত্যের অনেক শিক্ষা দৈনন্দিন জীবনে চলার পথে পাথেয় হয়ে ওঠে।

উপসংহার

যে কথা দিয়ে এই প্রবন্ধের শুরু, সে কথা দিয়েই এ প্রবন্ধের সমাপ্তি টানা যায়। বই আমাদের পড়তেই হবে। আর সে পড়ার মধ্যে সাহিত্যপাঠের স্থান অনেকখানি। আমরা আরব্য উপন্যাসের একচোখা দৈত্য হব না।

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায়—

১. সাহিত্য ও শিক্ষা। ২. সাহিত্যের অবদান।

চিন্তাসহায়ক বাণী

সমগ্র জীবনের অনুভূতিই সাহিত্য। —চিত্তরঞ্জন দাশ।

সাহিত্য জাতীয় হৃদয়ের আদর্শ—জাতীয় হৃদয়ের ইতিহাস। যে জাতির হৃদয় যে-ভাবে পরিপূর্ণ কি পরিপ্লুত থাকে, সেই জাতির সেই সময়ের সাহিত্যও সেইভাবে সম্পূর্ণরূপে বিলাসিত রহে।— —কালীপ্রসন্ন ঘোষ।

সাহিত্যই মানুষের যথার্থ মিলনের হেতু। —রবীন্দ্রনাথ।

স্বভাবের ও ভাবের সুনির্মিত শব্দ-শরীরই সাহিত্য। —ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।

The study of literature nourishes youth, entertains old age, adorns prosperity, solaces adversity, is delightful at home, and unobtrusive abroad.—Cicero.

সমাজ-জীবনে আড্ডা

ভূমিকা—আড্ডার নানা রূপ—গ্রামের আড্ডা—শহরে আড্ডা—আড্ডার গুণ—আড্ডার দোষ—উপসংহার।

ভূমিকা

আড্ডা কথাটার আসল মানে ঘাঁটি বা ডেরা। ঐ কথাটাই কী করে সব কাজ-ভোলানো রসালো মজলিসের অর্থ বয়ে আনল, কথাটা কোন্ ভাষা-গোষ্ঠীর, কত দিনের পুরানো সেসব নিয়ে ভাষাতাত্ত্বিকেরা মাথা ঘামান। আমরা ততক্ষণ একটু আড্ডা দিয়ে এর 'ব্রহ্মস্বাদসহোদর' রস আস্বাদন করি।

আড্ডার নানা রূপ

দুয়ের আড্ডা থেকে দশের আড্ডা—সবই সমান সুখকর। গল্প গুজব পরনিন্দা, পরচর্চা—এ সবই হল আড্ডার রসনিষ্পত্তির অনুপান। আড্ডার নানা রূপ, নানা রং। ছোটোদের আড্ডা, বড়োদের আড্ডা, ছোটোয়-বড়োয় আড্ডা—সবই সমান সরস, সমান সুখের। আড্ডার ছন্দ সমবিষম মাত্রা, লয় বিলম্বিত। আড্ডার বন্দেজ লঘুগুরু, বিষয় সর্বগ্রাসী—গড়ের মাঠ থেকে ব্রহ্ম পর্যন্ত।

গ্রামের আড্ডা

আড্ডা আছে তাই সমাজ আছে। সমাজের আর এক নাম আড্ডা। পল্লীসংস্কৃতির পীঠস্থান চণ্ডীমণ্ডপ। পুজো হয় বৎসরে একবার কিন্তু সংবৎসর সেখানে আড্ডার মহোৎসব। নীলু চক্রবর্তীর তামাকে-কাশির সঙ্গে হরিদাস খুড়োর প্রসঙ্গটি হঠাৎ-ই উঠে পড়ে, আর অমনি শুরু হয় রঙ্গব্যঙ্গের বিদ্যুৎতরঙ্গ। আসর জম্‌জমাট। ওদিকে পুকুরঘাটে পল্লীললনারা হয়ে ওঠেন শতমুখ। দুপুর বেজে চলে, তবু কান-কথা নিয়ে চলতেই থাকে কানাকানি। গ্রামের ছোট্ট মুদি-দোকানটার সামনের মাচাটা সবসময়েই পূর্ণ। কেনাকাটা গৌণ, আড্ডাটাই মুখ্য।

শহরের আড্ডা, না আড্ডার শহর? রেস্তর্াঁয় আড্ডা, রকে ক্লাবে আড্ডা, তেমাথায় আড্ডা, ফুটপাতে আড্ডা, কোন্ জায়গায় নয়? কলকাতা শহরটাই আড্ডা থেকে জন্মেছে। বটতলা শুধু শোভাবাজারেই ছিল না, অমন চাতালচত্বর পুরানো কলকাতার সর্বত্রই ছিল। আর আধুনিক কলকাতার সব কিছুই বারোয়ারি। বারোয়ারি মানে বারো-ইয়ারী। ইয়ার যে আড্ডার সঙ্গী তা বুঝিয়ে না বললেও চলবে।

শহরে আড্ডা

আড্ডাই তো জীবনের নুন। সমস্যা আর সমস্যা। শুধু স্নায়ুর চাপ, অভাব অনটন—এসব মানুষকে-যে নস্যাৎ করতে পারছে না তার মূলে আছে ঐ একমেব অদ্বিতীয়ম্ আড্ডা। 'নহিলে মানুষ বুঝি ফিরে যেত বনে'। কিন্তু জীববিদ্‌রা বনের পশুর আড্ডার যে-ছবি এঁকেছেন তাতে পশুরাজ্যেও জিনিসটা যে জীবনরসায়ন তা বুঝতে ভুল হয় না।

আড্ডার গুণ

কাজের জগৎটা থেমেই যেত যদি আড্ডা গোপনে গোপনে তাতে প্রাণসঞ্চার না করত। যদি বলি ইস্কুল মানে আড্ডা, কলেজ মানে আড্ডা, কথাটা হেঁয়ালি শোনাবে। কিন্তু ঐ পড়াশোনার সঙ্গে জমাট আড্ডাটির অলিখিত ঢালাও ব্যবস্থা যদি না থাকত তা হলে বিদ্যালয়-অঙ্গনটি খাঁ খাঁ করত। অফিসপাড়াও কাজে-কথায় সমানুপাতিক। আর এ তো খুবই স্বাভাবিক, কারণ creation এবং recreation হাত ধরাধরি করে চলে।

শিবের চেয়ে বড়ো যোগী আর কে? কিন্তু সেই শিবই নন্দী-ভৃঙ্গী আদি অনুচরদের সঙ্গে গোষ্ঠী-সুখ অনুভব করেন। আড্ডার ইংরেজি প্রতিশব্দ ঠিক ঠিক না থাকলেও সংস্কৃতে আছে। শব্দটি—'গোষ্ঠী সুখ'।

এ হেন আড্ডা যদি মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তবে কিন্তু 'গণইতে দোষ গুণলেশ না পায়বি যব তুঁহু করব বিচার'। তাস-পাশা-দাবা এমনিতে খারাপ নয় কিন্তু এর সঙ্গে-যে মাত্রাছাড়ানো আড্ডার নেশাটি জড়িয়ে থাকে তাতেই 'তাস-দাবা-পাশা তিন কর্মনাশা।' দাবার আড্ডায় ছেলেকে সাপে কামড়েছে শুনেও দাবাড়ু যখন শুধোন 'কাদের সাপ', তখন আড্ডাই যে সাপ হয়ে ছোবল মারতে পারে তা বোঝা যায়।

আড্ডার দোষ

আড্ডা নেশার মতোই আমাদের বশ করে ফেলে। কলেজের সময় বয়ে যায় কিন্তু রকের আড্ডা তখনও ভাঙে না। নতুন নতুন বিষয়ের অবতারণায় ক্রমশ আরও সরস হয়ে ওঠে ঘনিষ্ঠ পরিবেশটি। আড্ডা মুখে-দড়ি-দেওয়া জন্তুর মতো আমাদের নাচিয়ে চলে। আড্ডাকে বশে না রেখে আড্ডার বশবর্তী হলেই মুশকিল। আড্ডা থেকে সত্যিই কিছু পেতে হলে ঠিক সময়মত আড্ডা থেকে উঠতে হবে। এটি যিনি পারেন তিনিই জীবনের একুল ওকুল দুকূল রক্ষা করতে পারেন।

পসংহার

চিন্তাসহায়ক বাণী

আড্ডা জিনিসটা সর্বভারতীয় কিন্তু বাংলাদেশের সজল বাতাসেই তার পূর্ণ বিকাশ। আমাদের ঋতুগুলো যেমন কবিতা জাগায়, তেমনি আড্ডাও জাগায়। আমাদের চৈত্র-

সন্ধ্যা, বর্ষার সন্ধ্যা, শরতের জ্যোৎস্না-ঢালা রাত্রি, শীতের মধুর উজ্জ্বল সকাল—সবই আড্ডার নীরব ঘণ্টা বাজিয়ে যায়, কেউ শুনতে পায়, কেউ পায় না।.........

আড্ডা স্থিতিশীল নয়, নদীর স্রোতের মতো প্রবহমাণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার রূপের বদল হয়। মন যখন যা চায়, তাই পাওয়া যায় তাতে। কখনো কৌতুকে সরস, কখনো আলোচনায় উৎসুক, কখনো প্রীতির দ্বারা সুস্নিগ্ধ। বন্ধুতা ও অন্তর্বীক্ষণ, হৃদয়বৃত্তি ও বুদ্ধির চর্চা, উদ্দীপন ও বিশ্রাম—সব একসঙ্গে শুধু আড্ডাই দিতে পারে; যদি সত্যিই তা ঐ নামের যোগ্য হয়।

—বুদ্ধদেব বসু। আড্ডা : ১৯৪৪

সমাজ-জীবনে বিজ্ঞাপন

সূচনা—বিজ্ঞাপনের প্রয়োগক্ষেত্র—বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য—বহুরূপে বিজ্ঞাপন—আশালীন বিজ্ঞাপন ও সমাজ—শেষকথা।

সূচনা

বর্তমানে আমরা যে-যুগে বাস করছি তাকে বলা যেতে পারে বিজ্ঞাপনের যুগ। ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা হাতে ঘুমভাঙা সকাল থেকে শুরু করে রাত্রে আবার ঘুমোতে যাবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত আমরা যা দেখি যা শুনি, সবকিছুকেই বিজ্ঞাপন নামে চিহ্নিত করা যায়। তাই এ যুগ বিজ্ঞাপনের, এ যুগ আত্মপ্রচারের।

বিজ্ঞাপনের প্রয়োগক্ষেত্র

বাণিজ্যের সঙ্গে বিজ্ঞাপনের সম্পর্ক হরপার্বতীর মতো। মূলত, শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই বিজ্ঞাপনের প্রয়োগ করা হয়। বাণিজ্য হল বিজ্ঞাপনের বিচরণ ক্ষেত্র। কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য ছাড়াও সমাজে নানাভাবে মানুষ বিজ্ঞাপনের ব্যবহার করে আসছে। মানুষ নিজে যা ভাবে সমাজের আর পাঁচজনকে সেই ভাবনার অংশ দিতে চায়, নিজে যা দেখে আর পাঁচজনকে না দেখালে তার তৃপ্তি হয় না, এ ছাড়াও নিজের সুখ-ঐশ্বর্য-রূপ-যৌবন কেবল নিজের নয়—সমাজে আর পাঁচজনের কাছে তার গৌরব ঘোষিত না হলে মানুষের তৃপ্তি হয় না। তাই নানা কৌশলে মানুষ আত্মপ্রচারের পথে অগ্রসর হয়। এই আত্মপ্রচারই হল বিজ্ঞাপন। কখনো তা শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে বিজ্ঞাপন নাম গ্রহণ করে, আবার শিল্প-বাণিজ্য ছাড়া অন্য ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হলে তাকে বলি আত্মপ্রচার। অবশ্য আত্মপ্রচারও অনেক সময় বাণিজ্য প্রতিযোগিতায় জয়লাভের হাতিয়ার হয়ে দেখা দেয়। তখন আত্মপ্রচারকে বলব বিজ্ঞাপন।

বিজ্ঞাপনের উদ্দেশ্য

বাণিজ্য সমাজকে ঐশ্বর্যশালী করে, আর বিজ্ঞাপন বাণিজ্যকে করে আকর্ষণীয়। বর্তমান সভ্যসমাজে আমরা বিজ্ঞাপন ছাড়া বাণিজ্যের কথা চিন্তা করতে পারি না। প্রাচীন বাণিজ্য ছিল জটিলতামুক্ত, কিন্তু এখন তা হয়েছে জটিল, এসেছে তীব্র প্রতিযোগিতা। এই প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করতে হলে বিজ্ঞাপন অস্ত্রের প্রয়োগ অনিবার্য। মানুষের মনে আছে সৌন্দর্য-পিপাসা, আছে

শিল্পবোধ। এই বৈশিষ্ট্যগুলির কাছেই বিজ্ঞাপনের আবেদন। রূপ দিয়ে সে চোখ ভোলায়, কথা দিয়ে প্রাণমন ভোলায়। উদ্দেশ্য দুটি, কিন্তু ছলাকলা অসংখ্য। উদ্দেশ্য দুটি হল : পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি এবং পণ্যের প্রতি ক্রেতার মনোযোগ আকর্ষণ। বিজ্ঞাপন সংবাদ দেয়, সন্ধান দেয়, ঘটকের মতো ক্রেতা-বিক্রেতায় যোগাযোগ ঘটায়।

উদ্দেশ্য এক, কিন্তু বিজ্ঞাপনের শিল্পকৌশল অসংখ্য। এখানে বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সন্ধি হল বিজ্ঞানের, দুজনে দুই বন্ধুর মতো হাত ধরে এগিয়ে চলেছে। ফলে বিজ্ঞানের যত নতুন নতুন আবিষ্কার হচ্ছে, বিজ্ঞাপনের ততই সাজবদল হচ্ছে। ইস্তাহার, প্রচারপত্র, প্রাচীরপত্র, সংবাদপত্রের আশ্রয় তো আছেই, কিন্তু সেইসব পত্র-পত্রিকার ছবির তরুণীদল যখন জীবন্ত হয়ে ঘরে ঘরে পণ্য হাতে প্রচার করতে যান তখন গৃহিণীরা সহজেই প্রভাবিত হন, কারণ ছায়ার চেয়ে কায়ার আবেদন বেশি। প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শনীর ফাঁকে রূপালী পর্দায় বিজ্ঞাপনের স্লাইড এসে পড়ে, কখনও নাটকীয় চলন্ত কাহিনীর সাহায্য নেওয়া হয়, বিজ্ঞাপন হিসেবে এদের আবেদনও কম নয়। পথেঘাটে অসংখ্য আলোর মালা পরে বিজ্ঞাপন পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এ ছাড়াও আছে বেতার-টেলিভিশনের বিশেষ বিভাগ, যাদের কাজ হল বিশেষ বিশেষ পণ্যের ঢাক পেটানো। লটারি, পুরস্কারঘোষণা, সভা-সমিতিতে পণ্যবিলি ব্যবস্থা, এসব হল সর্বাধুনিক বিজ্ঞাপন-কৌশল। বিদেশে বিমান থেকে আলো বা গ্যাসের সাহায্যে বিজ্ঞাপন দেবার রীতি প্রচলিত আছে। আমাদের দেশে অদূর ভবিষ্যতে আশা করি এই রীতিও অনুসৃত হবে।

বহুরূপে বিজ্ঞাপন

প্রচারের ঢাক পেটাতে গিয়ে মাত্রাজ্ঞানের অভাবে বিজ্ঞাপন সময় সময় সমাজের ক্ষতি করে বসে। পথে-ঘাটে ট্রামে-বাসে পত্র-পত্রিকায় অথবা সিনেমায় এমন অনেক বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে যাতে সমাজের আতঙ্কিত হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপনের কথা বলছি। এই রুচি বিকৃতিকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়। ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, কারণ সেটাই বিজ্ঞাপনের কাজ, তা বলে সমাজের ন্যায়নীতিকে পদদলিত করে, সমাজচরিত্রের সর্বনাশ সাধন করে পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধির অধিকার আমরা বিজ্ঞাপনদাতাদের হাতে তুলে দিই নি। কোন সুস্থ সমাজ তা দিতে পারে না। এই কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপনের বিরুদ্ধে সজাগ হতে হবে জনসাধারণকে, সরকারকে হতে হবে তৎপর। কঠোর হাতে দমন করতে হবে অশালীন বিজ্ঞাপন দানের প্রবণতা। প্রয়োজনে সরকারকে আইন করে বন্ধ করতে হবে কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন, বাঁচাতে হবে সমাজকে। কারণ সেন্ট, সাবান, মাথার তেল, শ্যাম্পু আর শাড়ি-গহনার চেয়ে অনেক বেশি দরকার সমাজের স্বাস্থ্য রক্ষা করা।

আশালীন বিজ্ঞাপন ও সমাজ

বিজ্ঞাপন-শিল্পকে অবলম্বন করেই সমাজের একটা বিরাট অংশ বেঁচে আছে। বিজ্ঞাপনের সঙ্গে তাদের বাঁচা-মরার প্রশ্ন যুক্ত। শিল্পী, শ্রমিক, পত্র-পত্রিকা, ছোটো

ছোটো কুটির শিল্প, এ ছাড়াও অসংখ্য কর্মী নানাভাবে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত। তাই আমরা বিজ্ঞাপন-সঙ্কোচনের কথা ভাবি না। কারণ তার ফলে বেকারসমস্যায় জর্জরিত দেশে বেকারের সংখ্যাই কেবল বাড়বে। আমরা চাই বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রিত হোক, কুরুচিপূর্ণ বিজ্ঞাপন বন্ধ হোক। আর অসাধু ব্যবসাদার উপলব্ধি করুক সমাজের জন্যে বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনের জন্যে সমাজ নয়।

শেষকথা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. বিজ্ঞাপন কী ও কেন ২. বাণিজ্য ও বিজ্ঞাপন। ৩. বিজ্ঞাপন শিল্প।

চিন্তাসহায়ক বাণী

If advertising had a little more respect for the public, the public would have a lot more more respect for advertising.

James Randalph Adams.
(1898—1950)
A famous adv. executive.

Advertising promotes that divine discontent which make people strive to improve their economic states—Ralph Stan Butler
An adv.-executive

You can tell the ideals of a nation by its advertisement.

—Norman Douglas
(1868—1952)
An English author

The advertising man is a liason between the products of business and the mind of the nation. He must know both before he can secure either.

—Glenn Frank
(1837-1940)
(Educator & Editor)

সমাজ-জীবনে চলচ্চিত্র

সূচনা—দেখা এবং শোনায় আনন্দের পূর্ণতা—জীবনের সর্বস্তরে চলচ্চিত্রের প্রভাব—প্রভাবের গতি যদি উল্টো দিকে যায়—শিক্ষামূলক চিত্র—শেষরক্ষা।

মানুষের মনের মাটিতে চলচ্চিত্র কবে থেকে শিকড় গেড়ে বসেছে? এ প্রশ্নের একমাত্র উত্তর হল : অ-বাক চলচ্চিত্র স-বাক হল যেদিন তখন থেকেই মানুষের মন তার হাতের মুঠোয় বন্দী, প্রভাবের অদৃশ্য সুতোর পাকে পাকে জড়ানো। সে হাসায় কাঁদায়, সাজায়, চলায়, বলায়,—বাজীকরের মতো পুতুল খেলায়। আর আমরা যত বড়ো নীতিবিদ হই না কেন, প্রবল বৈরাগ্যে গোমড়া মুখে আপত্তি-সূচক যত মাথাই নাড়ি না কেন হঠাৎ একদিন ধরা পড়ে যাই,

সূচনা :

ধোপার বাড়িতে দেওয়া পুরানো পাঞ্জাবির পকেট থেকে যখন বেরিয়ে পড়ে বাজারচলতি রমরমে ছবির পুরানো টিকিট !

দেখা এবং শোনায় আনন্দের পূর্ণতা

দেখার সঙ্গে শ্রবণের ব্যাপারটা চলচ্চিত্রে থাকায় এর উপভোগ্যতা বেড়েছে। এটাই হল তার প্রভাবের মূলধন। মঞ্চ যা পারে নি তার অনিবার্য সীমাবদ্ধতায়, ফোটোগ্রাফির কল্যাণে সিনেমায় তা সম্ভব হল। পাহাড়, ঝর্ণা, সমুদ্র, রণক্ষেত্রের ধ্বংসলীলা—পর্দায় এঁকে এঁকে মঞ্চ আর কতটুকু দেখাতে পারত! ওদিকে অ-বাক চিত্র স-বাক হয়ে চোখের সামনে তুলে ধরল ছবির পর ছবি—চলমান—শব্দময়। কানে শুনি আর চোখে দেখি। মুগ্ধ হই, শেষে হই প্রভাবিত।

জীবনের সর্বস্তরে চলচ্চিত্রের প্রভাব

ঢিলে পাজামার সঙ্গে কলার-উঁচু পাঞ্জাবিতে ছেলেটিকে সুন্দর মানিয়েছে। কিন্তু লাইটপোস্টে হেলান দিয়ে ওর দাঁড়ানোর ভঙ্গী দেখে হঠাৎ মনে পড়ে যায় বিখ্যাত এক চলচ্চিত্র-অভিনেতার কথা। পোশাক থেকে চলন-বলন, চুলের কায়দা, নামের বাহার সবই আমাদের পাওয়া সিনেমার কল্যাণে। তা হলে আসল কোন্‌টা? সময় সময় মনে এ প্রশ্ন জাগে। আমাদের এ জীবনটাও কি অদৃশ্য প্রেক্ষাগৃহের রূপালী পর্দার ছবি? এ প্রশ্নের উত্তর পাই নি, তবে এ কথা ঠিক আমরা চলচ্চিত্রের যতটা নকল করি চলচ্চিত্র আমাদের ততটা নকল করে না অর্থাৎ চলচ্চিত্রের ওপর সমাজের প্রভাব পড়ে না—কিন্তু চোখ বন্ধ করে আমরা নায়ক-নায়িকার হাঁটাচলা থেকে মুখভঙ্গিটা পর্যন্ত হুবহু নকল করে চলি। আর চর্মচক্ষে একবার ওঁদের দর্শন? সে তো দেবদর্শন! দৈবাৎ যদি তেমন ঘটনা কখনও ঘটে তা হলে আর রক্ষে নেই, ট্রাফিক জ্যাম, ভিড় সরাতে পুলিশ হিমসিম। হয়তো বা ব্যাপারটা মৃদু লাঠি-চার্জ অবধি গড়াতে পারে।

প্রভাবের গতি যদি উল্টো দিকে যায়

এই হল সমাজের গড্ডলিকা প্রবাহের ছবি। কিন্তু আমাদের পান-পাত্র যেদিন নিঃশেষ হবে, সস্তা নেশার অবসন্নতা কেটে গিয়ে সত্যের আলোয় নিকেল-করা রঙটা বেরিয়ে পড়বে? সমাজ-জীবনে সেই ভয়াবহ অবক্ষয় নামার আগেই গড্ডলিকা প্রবাহের মুখটা অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে। এক কথায় প্রভাবের সুযোগ নিয়ে সোনা ফলাতে হবে। উচ্চাঙ্গের চলচ্চিত্র যেমন দর্শকের রুচি তৈরি করবে, তেমনি শিল্পী, পরিচালক, চলচ্চিত্র ব্যবসায়ী, মায় গীতিকার-অভিনেতা সকলের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করবে, কারণ 'Art inspires art'.

শিক্ষামূলক চিত্র

নদী থেকে খাল কেটে চাষের জমিতে সেচের ব্যবস্থা আছে। সেচের মতো চলচ্চিত্র-শিল্পকে সমাজের নানা কল্যাণমূলক কাজে ব্যবহার করা যায়। বিদেশের প্রায় সব দেশেই তা হচ্ছে। ওরা শিক্ষামূলক তথ্যচিত্র তৈরি করে ভূগোল, ইতিহাস, প্রকৃতি বিজ্ঞান, জীববিদ্যাকে কত সহজ সরল আর সুন্দর করে ছাত্রদের মনের জমিতে সিঞ্চন করছে। আমাদের দেশেও তথ্যচিত্র তৈরি হয়, কিন্তু তার ব্যবহার কেবল প্রচারের কাজেই সীমাবদ্ধ। সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে আরও বেশি করে শিক্ষামূলক চিত্র তৈরির দিকে মন দিতে হবে। একে করতে হবে

জনশিক্ষার বাহন। আগ্রহী হবেন অনেকেই যদি ছবি তৈরির মূলধন আসে সরকারের হাত থেকে।

মন আর মনন হল মানুষের মূলধন। আদি-অনন্ত কাল থেকে ভারতবাসী যে-মননের চর্চা করে এসেছে তারই প্রতিফলন আমরা চলচ্চিত্রে দেখতে চাই। সস্তা প্রমোদ বিতরণ বন্ধ রেখে চলচ্চিত্র দেশের সেই চলৎ চিত্তকে বাস্তবে রূপায়িত করুক, যে চিত্তভূমির একদিকে আছেন রামমোহন অন্যদিগন্তে রবীন্দ্রনাথ।

শেষকথা

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—
১. চলচ্চিত্র ও জনশিক্ষা। ২. চলচ্চিত্রের মাধ্যমে শিক্ষা। ৩. চলচ্চিত্র আশীর্বাদ না অভিশাপ।

চিন্তাসহায়ক বাণী

We seem to pay too much attention to the cinema. It is undoubtedly an excellent medium for many good things but unfortunately it has not proved to be particularly inspiring.

—Jawaharlal Nehrn.

সমাজ-জীবনে সংবাদপত্র

ভূমিকা—সংবাদপত্রের আদি কথা—দৈনন্দিন জীবনে সংবাদপত্র—আমাদের দেশের সমস্যা—সংবাদপত্রের বহুমুখী কাজ—সমাজ জীবনে ও জাতীয় জীবনে সংবাদপত্র—সংবাদপত্রের যথার্থ ভূমিকা পালনের প্রয়োজন—সংবাদপত্রের দায়িত্ব—উপসংহার।

ভূমিকা

সকালে সীমিত পরিসরে বিশ্বের হৃৎস্পন্দন ধ্বনিত হয় সংবাদপত্রের মুদ্রিত অক্ষরে। বিশ্বের নিয়ত বহমান কর্মপ্রবাহের তরঙ্গবিক্ষেপ, উত্থান-পতন প্রতিবিম্বিত হয় সংবাদপত্রে। আধুনিক বিজ্ঞানের যেসব আবিষ্কার মানুষকে নৈকট্যের বাঁধনে বেঁধেছে, তার সম্মিলিত ফসল সংবাদপত্র।

বিশ্বের দূরতম প্রান্তকে শ্রুতি বা দৃষ্টির দরবারে এনে হাজির করে এমন যন্ত্র আরো আছে। যেমন বেতার বা দূরদর্শন ইত্যাদি, কিন্তু সংবাদপত্র এগুলির তুলনায় অনেক সহজলভ্য, তাই সর্বসাধারণের কাছে সংবাদপত্রের দ্বার অবারিত।

সংবাদপত্রের আদি কথা

আজ আমাদের কাছে সংবাদপত্রহীন জগৎ কল্পনাতীত। কিন্তু এ কথা বাস্তব সত্য যে, একদিন ছিল যখন দূরের মানুষ দূরেই থাকত, কাছের খবরও দুষ্প্রাপ্য ছিল, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত।

দূরের খবর কখনও পৌছলে মানুষ উদ্‌গ্রীব হয়ে, উৎকর্ণ হয়ে শুনত। দূরকে নিকট করার চেষ্টা সভ্যতার ধর্ম, তারই ফলে একদিন সংবাদপত্রের আবির্ভাব হল।

সংবাদপত্রের প্রথম আবির্ভাব হয় চীনে। ভারতবর্ষে মোঘল আমলে রাজ্যশাসন-সংক্রান্ত প্রয়োজনে সংবাদপত্রের প্রচলন ছিল, কিন্তু সে সংবাদপত্রের বিচরণ ক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ, জনসম্পর্কহীন। ইউরোপে যথাক্রমে ইতালী, জার্মানী ও ইংলণ্ডে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সংবাদপত্রের প্রচলন হয়। ভারতবর্ষে প্রথম সংবাদপত্র প্রকাশিত হল ইংরেজ-রাজত্বকালে।

আজ সংবাদপত্র আমাদের প্রাত্যহিক জীবনচর্চার অঙ্গস্বরূপ। মুদ্রণ, টেলিগ্রাফ ইত্যাদির বিস্ময়কর উন্নতি, ইতিহাসের ধারাবাহিকতায় গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ইত্যাদির ফলে সংবাদপত্রের প্রচলন ত্বরান্বিত হয়। মানুষের সামাজিক ও রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের প্রমাণ সংবাদপত্রের গতিশীলতা।

দৈনন্দিন জীবনে সংবাদপত্র

কিন্তু আমাদের দেশে এ বিষয়টি অন্য সমস্যাসম্পৃক্ত। এ দেশের মোট জনসংখ্যার এক ক্ষুদ্রতম ভগ্নাংশ সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক। এর কারণ দ্বিবিধ—সাক্ষরের অত্যন্ত নিম্ন হার এবং ক্রয়ক্ষমতার অভাব। অথচ এ কথা সর্বজনস্বীকৃত সত্য যে, জনমতগঠনে ও লোকশিক্ষার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম।

আমাদের দেশের সমস্যা

সংবাদপত্র একের মধ্যে বহু। রাজনীতি, সমাজনীতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ক্রীড়া, চলচ্চিত্র, নাটক, বাজার দর, জীবিকা-সংস্থান ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ের সহাবস্থানের ক্ষেত্র সংবাদপত্রের পাতা।

সংবাদপত্রের বহুমুখী কাজ

জাতীয় জীবনে সংবাদপত্রের গুরুত্ব শুধুমাত্র তথ্য সরবরাহে সীমাবদ্ধ নয়। রাজনৈতিক ভাষ্য, দেশী ও বিদেশী রাষ্ট্রসমূহের অনুসৃত পন্থা, তার সমালোচনা ইত্যাদির দ্বারা গণচেতনার উন্মেষ সাধনে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পারিপার্শ্বিক অন্যায় বা অসাম্যের প্রতিবাদ বা প্রতিবিধানের দাবিতে গণকণ্ঠ মুখর হয়ে ওঠে সংবাদপত্রের মাধ্যমে।

সমাজ-জীবনে ও জাতীয় জীবনে সংবাদপত্র

এক্ষেত্রে সংবাদপত্র যদি যথার্থভাবে স্বাধীন, নিরপেক্ষ ও নির্ভীক ভূমিকা পালনে অপারগ হয়, তাহলে তা দলগত বা সম্প্রদায়গত স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

সংবাদপত্রের যথার্থ ভূমিকা পালনের প্রয়োজন

অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক ক্ষমতার অপপ্রয়োগের দ্বারা সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়, এ অবস্থা কখনই কাম্য নয়। আবার বহু ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল তার সমালোচনা বন্ধ করে, সংবাদপত্রকে শুধুমাত্র তার জয়গানে মুখরিত করে তোলে, এর অবশ্যম্ভাবী ফল গণতন্ত্রের মৃত্যু।

স্বতরাং এ কথা এখন সহজবোধ্য যে, জনজীবনের ঋতপথ সৃষ্টি করার দায়িত্ব বহুলপরিমাণে বহন করে সংবাদপত্র। জনসাধারণ, সাংবাদিক ও বিবেকবান রাজনৈতিক নেতাদের কাছে এই সত্যসচেতনতা আমরা দাবি করি। ক্ষুদ্র স্বার্থের প্ররোচনায় তাঁরা যদি দেশের কল্যাণ ও মঙ্গলকে বিস্মৃত

সংবাদপত্রের দায়িত্ব

হন, ক্ষমতারক্ষার যূপকাষ্ঠে যদি জনস্বার্থকে বলি দেন, লোকশিক্ষার দায়িত্বকে অস্বীকার করেন, তবে ভাবীকালের ইতিহাস তাঁদের ক্ষমা করবে না।

উপসংহার

উদ্ভাবনী শক্তি, বিশ্লেষণী ক্ষমতা, সত্যনিষ্ঠা, ন্যায় ও যুক্তিবোধ ইত্যাদির দ্বারা সংবাদপত্র যদি ঠিকপথে পরিচালিত হয়, তবেই গণতন্ত্রের রক্ষা ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে আমরা আশান্বিত হতে পারি।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—
১. সংবাদপত্র। ২. আধুনিক জীবনে সংবাদপত্রের প্রভাব। ৩. সংবাদপত্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

চিন্তাসহায়ক বাণী

Newspapers are the world's mirror.

—James Ellis (1769-1849) An author.

Newspapers are the world's cyclopaedia of life, telling us everything from every quarter of the globe. They are a universal whispering gallery for mankind, only their whispers are sometimes thunderous.

Tryon Edwards (1809-1894) Compiler of New Dictionary of thoughts

A good newspaper, I suppose, is a nation talking to itself.
— Arthur Miller (1915—) A playright.

We live under a government of men and morning newspapers.
—Wendell Phillps (1811-1884) A reformer.

সমাজ ও যুবশক্তি

ভূমিকা—যুবশক্তির ঐতিহাসিক ভূমিকা—বর্তমান পরিস্থিতি ও যুব সমাজ—অবক্ষয়ের কারণ—উপসংহার।

ভূমিকা

'Old order changeth yielding place to new.'—নতুনের হাতে সভ্যতার পাঞ্চজন্য ওঠে বেজে। পুরাতন প্রাকৃতিক নিয়ম জরা ও মৃত্যুর কবলে কবলিত হয়। মানুষের সভ্যতার জয়পতাকা নিয়ে যুবশক্তি এগিয়ে গিয়েছে সব যুগেই, সভ্যতার রথকে টেনে নিয়ে গিয়েছে আরও সামনে, অবশেষে এক সময় উত্তরপুরুষের হাতে অর্পণ করে বিদায় নিয়েছে। সমাজব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজের মূলশক্তি এই যুবসমাজ। তাই একটা জাতির মেরুদণ্ড ঋজু

রেখে উত্তরোত্তর অগ্রগতির পথে এগিয়ে যাওয়ার একটি আবশ্যিক শর্ত হচ্ছে সেই জাতির যুবশক্তির উপযুক্ত ব্যবহার।

ইতিহাসের পৃষ্ঠা সাক্ষ্য দেবে যুবসমাজ এগিয়ে গিয়েছে অত্যাচারী শাসকের হাত থেকে রাজদণ্ড কেড়ে নিতে। কারণ ত্যাগ ও দেশপ্রেমের পরীক্ষায় আত্মত্যাগের চূড়ান্ত নিদর্শন রেখেছে এ বয়স পৃথিবীর ইতিহাসে—কারণ 'আঠারো বছর বয়স যে দুর্বার। পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান।' আবার 'বিপদের মুখে এ বয়স অগ্রণী'। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসের দিকে তাকালেই যুবশক্তির এই বিপুল ক্ষমতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আত্মত্যাগের চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন ক্ষুদিরাম, বিনয়-বাদল-দীনেশ। স্বাধীনতা অর্জনের জন্যে ভারতবর্ষ জুড়ে যে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল তার নেতৃত্বও করেছিল যুবসমাজ। তাই দেশের স্বাধীনতা-অর্জনে যুবশক্তির যে-ভূমিকা, দেশগঠনের ক্ষেত্রেও তাদের সেই ভূমিকা।

যুবশক্তির ঐতিহাসিক ভূমিকা

কিন্তু ঔচিত্যবোধ এবং তার বাস্তব রূপায়ণের সামঞ্জস্য সামাজিক পরিবেশ ও পরিস্থিতির উপর নির্ভরশীল। আর আমাদের পরিস্থিতির দিকে তাকালে আমরা দেখব এক হতাশা-দীর্ণ যুবসমাজ—মহাযুদ্ধ, দাঙ্গা, দেশভাগ যাদের জীবন-বোধকে কুয়াশাচ্ছন্ন করে দিয়েছে, মূল্যবোধকে করেছে স্তিমিত।

বর্তমান পরিস্থিতি ও যুব সমাজ

কিন্তু এই আলোকচিহ্নহীন দুর্যোগের ব্যাপক তিমিরের কারণ কী? সচেতন চিন্তায় এ প্রশ্নের যে-উত্তর আসে তাকে মোটামুটি ভাবে আমরা কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করতে পারি,—শিক্ষানীতিক, সামাজিক, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক।

অবক্ষয়ের কারণ

শিক্ষানীতিক: আজকের শিক্ষাব্যবস্থায় নীতি, আদর্শ ও শ্রদ্ধা-নামক বস্তুগুলি প্রায় অনুপস্থিত। সার্বিক শিক্ষাই আজ নীতিহীন ও আদর্শভ্রষ্ট, ফলত শ্রদ্ধাবোধ-জাগরণে অক্ষম। সর্বোপরি শিক্ষাদান, শিক্ষাগ্রহণ দু'টিই লক্ষ্যহীন; এবং উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্পষ্ট না থাকলে কোনো কিছুই একাগ্রতা সহকারে গ্রহণ করা মানবচিত্তের ধর্মবিরোধী।

সামাজিক: আর যে-সামাজিক পরিবেশে আজকের শিশু তার বাল্য ও কৈশোর পেরিয়ে যৌবনে উপনীত হয় সে-পরিবেশ যেন অবসাদগ্রস্ত, যৌবন যখন আপন নিয়মে আসে, সে দুর্দমনীয় শক্তি কোথায় খুঁজে পাবে?

পারিবারিক: আর পরিবারও সমাজের ক্ষুদ্রতম সংগঠন। স্বভাবতই পারিবারিক পরিবেশও আকাঙ্ক্ষিত বিকাশের অনুকূল হয় না, সেখানেও আমরা দেখি চারিত্রিক দুর্বলতার অসংখ্য প্রকাশ—যৌবনধর্ম ধ্বংসের আরেক জীবাণু এখানে ক্রিয়াশীল।

অর্থনৈতিক: অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিকাশমান অসাম্য হৃদয়ে চরম হতাশার সৃষ্টি করে। দারিদ্র্য সর্বদাই স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী।

রাজনৈতিক: রাজনৈতিক মতবাদের টানাপোড়েনেও অনেক সময় যুবসমাজ হয়ে হয়ে পড়ে বিভ্রান্ত।

প্রতিকার : তবে ভরসা এই যে, যুবশক্তির এই অবক্ষয় ও বিপথগামিতার পাশাপাশি আছে আত্মত্যাগের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। আমাদের দেশের যুবশক্তিকে অধিক কর্ম-কাণ্ডে নিয়োজিত করে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পুনর্গঠনের কাজ ত্বরান্বিত করার জন্যে আশু প্রয়োজন এই যুবসমাজের হতাশা ও নৈরাশ্য দূরীকরণের প্রচেষ্টা। দেশের বুদ্ধিজীবী, শিক্ষক ও নেতাদের অগ্রণী হওয়া যেমন দরকার, ঠিক তেমনি প্রয়োজন সরকারী প্রচেষ্টার। বুদ্ধিজীবীরা যদি যুবসমাজের এই অবক্ষয়ের মূল ভাইরাসগুলির দিকে সতর্ক দৃষ্টিপাত না করেন, শিক্ষকসম্প্রদায় যদি যথার্থ শিক্ষাদানের মাধ্যমে যুবসম্প্রদায়ের মূল্যবোধ, ত্যাগ ও অধ্যবসায়ের ইচ্ছাকে জাগ্রত ও পুনরুজ্জীবিত না করেন তাহলে কোনোক্রমেই প্রতিবিধানের কথা চিন্তা করা যায় না। বেকারসমস্যার সমাধান—দেশগঠনের কাজে এই বিশাল শক্তিকে নিয়োজিত করা, শিক্ষার আমূল পরিবর্তনের মাধ্যমে যুবসমাজে আশার সঞ্চার করতে হবে।

ভারতবর্ষের যুবসমাজের অতীত ইতিহাস গৌরবের। এই ঐতিহ্যকে স্মরণ করে আমরা আশা করতে পারি ভারতবর্ষের যুবসমাজ পথভ্রষ্ট হবে না। সাময়িক যে অবস্থা তাদের বিচলিত করে তুলেছে যুবশক্তি নতুন উৎসাহ ও উদ্দীপনার জোয়ারে ভাসিয়ে দেবে সেই জঞ্জাল। সম্মুখের লক্ষ বাধাকে অতিক্রম করে সার্থক উত্তরণে ও দেশবাসীর সুখে-দুঃখে নির্ভীক সৈনিকের ভূমিকায় আমরা দেখতে পাব আমাদের যুবশক্তিকে, সেই আশাই করছি। সরকার-গৃহীত প্রগতিমূলক বিভিন্ন কর্মসূচীর রূপায়ণে যুবসমাজ আজ বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—
১. সমাজসেবা। ২. আজকের যুবক কোন্ পথে ৩. সমাজসেবার আদর্শ।

চিন্তাসহায়ক বাণী

বিঘ্ন ভাঙা যৌবনের ভাষা
অসীম তার আশা। —রবীন্দ্রনাথ

The youths of a Nation are the trustees of Posterity.
—Benjamin Disraeli, British Prime Minister and Author

Tell me what are the prevailing sentiments that occupy the mind of your young men and I will tell you what is to be the character of the next generation.

—Edmund Burke.
(1729-1779)
British statesman and orator.

বিদ্যুৎ ও সমাজজীবন

ভূমিকা—বিদ্যুৎ ছাঁটাই—বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা—সমাজ-উন্নয়নে বিদ্যুতের ভূমিকা—বিদ্যুৎ অপচয় ও নাগরিক কর্তব্য—উপসংহার।

বর্তমান সভ্যতা বিদ্যুতের দান। এ কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি যখন গ্রীষ্মের কোনো গুমোট সন্ধ্যায় হঠাৎ লোডশেডিংয়ের কল্যাণে শহরের প্রাণপ্রবাহ যায় স্তব্ধ হয়ে। শহরকে তখন মনে হয় অন্ধকারের পর্দা-ঢাকা প্রাণহীন বিশাল এক মৃতদেহ। তারপর থেকে সেই বিশাল দেহে প্রাণসঞ্চারের জন্যে লক্ষ লক্ষ মানুষের আকুল প্রতীক্ষা, তিল তিল করে প্রহর গোনা। তাই আধুনিক নগর-জীবনে বিদ্যুৎ হল প্রাণের জীয়নকাঠি।

ভূমিকা

কিছুদিন ধরে প্রয়োজনের সঙ্গে বিদ্যুৎ-উৎপাদনের সামঞ্জস্য রক্ষা করতে না পারায় দেখা দিচ্ছে বিদ্যুৎ-ছাঁটাই, যার বহুপরিচিত নাম লোড-শেডিং। ফলে জীবনে দুর্বিষহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। হঠাৎ বন্ধ হচ্ছে কলকারখানা, ট্রেন-ট্রাম, অফিস-আদালত। এক কথায় উৎপাদন হয়েছে ব্যাহত, ফলে দিকে দিকে লে-অফ আর লক্-আউটের হিড়িক। এই সর্বনাশা লোড-শেডিংয়ের হিড়িক শুরু হয়েছে ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাস থেকে। এই বছর বিভিন্ন কলকারখানায় ৩,১০,৭৩৬ জন শ্রমিকের লে-অফ করা হয়। ১৯৭৩ খ্রীস্টাব্দে এই সংখ্যা দাঁড়ায় ৫,৩৫,৭৯৯ আর ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের লে-অফের সংখ্যা হল ২,৭০,০০০। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি কেবল পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সারা ভারতের; তবে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্কট-তীব্রতা কিছু বেশি। আজ এতদিন পরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কিছু কিছু ত্রুটি ও ব্যর্থতা বিশেষজ্ঞ মহলের চোখে ধরা পড়েছে। তাঁরা দেখেছেন বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলির আয়ু খুব তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাচ্ছে, যে-পরিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদনের কথা ছিল তা হচ্ছে না সেখানে; তারই ফল আজ আমাদের ভোগ করতে হচ্ছে। আলোঝলমল রাতের বুকে সহসা নামছে অন্ধকার, অসহ্য গুমোটে বন্ধ হচ্ছে বৈদ্যুতিক পাখা। জন-জীবন এক সঙ্কটের মুখোমুখি এসে থমকে দাঁড়িয়েছে।

বিদ্যুৎ ছাঁটাই

পশ্চিম বাংলায় যেসব বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্র আছে তাদের মোট উৎপাদন-ক্ষমতা হল ১৫৩০ মেগাওয়াট। এই উৎপাদনের তুলনায় আমাদের দেশে বিদ্যুতের প্রয়োজন অনেক বেশি। এই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন-ব্যবস্থা না থাকলে এবং যে-কোনো একটি কেন্দ্রের যন্ত্রপাতি বিকল হলে ঘাটতির পরিমাণ বাড়ে, আর সঙ্গে সঙ্গে জনজীবনে নামে অন্ধকার। সম্প্রতি বিদ্যুৎ ঘাটতি রোধে সরকারী প্রচেষ্টা অভিনন্দনযোগ্য। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের জুলাই-অগস্ট মাসে প্রতিদিন প্রায় ১০০ মেগাওয়াটের মতো লোড্-শেডিং হত। কিন্তু সম্প্রতি নতুন বিদ্যুৎ-নিয়ন্ত্রন আদেশের ফলে পরিস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে বদলে গেছে। বর্তমানে লোড-শেডিং প্রান্তিক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। রাজ্য সরকার নতুন অথবা সম্প্রসারিত শিল্পে ২৮ মেগাওয়াট আর রাত্রের শিফ্‌টের জন্য ৩৪ মেগাওয়াটেরও বেশি

বিদ্যুৎকেন্দ্রের উৎপাদন-ক্ষমতা

লোড মঞ্জুর করেছেন। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ২৯-এ আগস্ট তারিখে সাঁওতালডিহি বিদ্যুৎ-কেন্দ্রের দ্বিতীয় ইউনিটটির উদ্বোধন করা হয়। ফলে ১২০ মেগাওয়াট অতিরিক্ত বিদ্যুৎ বণ্টনের জন্যে পাওয়া যাচ্ছে। রাজ্য সরকার পঞ্চম পরিকল্পনা কালের মধ্যে সাঁওতালডিহি বিদ্যুৎকেন্দ্রের তৃতীয় এবং চতুর্থ ইউনিট, ব্যাণ্ডেল বিদ্যুৎকেন্দ্রের পঞ্চম ইউনিটটি যাতে চালু হয় তার জন্যে সচেষ্ট। আশা করা যায়, এই পরিকল্পনা সার্থক হলে বিদ্যুৎ-সংকট পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিদায় নেবে।

ভারতে উন্নয়ন-প্রকল্পকে পূর্ণতা দান করতে বিদ্যুতের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিকল্পে বিদ্যুৎশক্তিকে প্রত্যেক সভ্য দেশের মানুষ ব্যবহার করে আসছে। আমরাই বা পিছনে পড়ে থাকব কেন? তাই শহর থেকে গ্রামে বিদ্যুতের উদার হস্ত প্রসারিত হচ্ছে। গড়ে উঠছে ছোটো-বড়ো হাজারো কলকারখানা।

সমাজ-উন্নয়নে বিদ্যুতের ভূমিকা

আগে যে-কাজ মানুষ হাতে করত সেই কাজ এখন হচ্ছে বিদ্যুৎ-চালিত যন্ত্রে। ফলে উৎপাদন বাড়ছে, সময় ও শ্রমের অপচয় রোধ হচ্ছে। বাস্তব প্রয়োজন ছাড়াও মানুষের সাংস্কৃতিক জীবনেও বিদ্যুতের প্রয়োজন ক্রমবর্ধমান। সম্প্রতি টেলিভিশনের অনুষ্ঠান তো বিদ্যুতেরই অবদান। আজ আমরা যে নৈশ ফুটবলের কথা ভাবতে পারছি সে তো সম্ভবপর হতে পারে কেবল বিদ্যুতেরই কল্যাণে। কলকাতায় পাতাল রেল এবং পরিকল্পিত ট্রলি বাস চালনায় বাড়তি বিদ্যুতের দরকার হবে।

বিদ্যুৎশক্তিকে হাতের মুঠোয় পেয়ে আমরা রাতের উৎসবপ্রাঙ্গণে দিনের আলো ফুটিয়ে তুলি। কিন্তু দিনের আলোয় যদি রাতের উৎসব-বাতি নেবানো না হয়, তাহলে সেটা হয় বিদ্যুতের অপচয়। এ অপচয় কেবল অন্যায় নয়, অপরাধ। যখন তখন ঘরের আলো জ্বালিয়ে রাখা, বন্ধ ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা ঘোরানো, দিনের আলোয় পূজা-প্যাণ্ডেলের সব আলো জ্বালিয়ে রাখা এ-সব আমাদের অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। কারণ এইসব ছোটো ছোটো গাফিলতিই তিল তিল করে এক ভয়াবহ বিদ্যুৎসঙ্কটের সৃষ্টি করতে পারে। যে-বিদ্যুৎ শিল্প-উৎপাদনের প্রাণ, সভ্যতার জীয়ন-কাঠি, বিনা প্রয়োজনে তাকে নষ্ট করে ঘাটতির সময়ে কপাল চাপড়ানো বৃথা।

বিদ্যুৎ অপচয় ও নাগরিক কর্তব্য

একটা কথা কিন্তু ভাবতেই হবে আমাদের। বিদ্যুৎমুখাপেক্ষিতা আমাদের স্বভাব-শক্তিকে যেন নিষ্ক্রিয় বা পঙ্গু করে না দেয়। লিফ্‌ট থাকুক, কিন্তু সিঁড়ি ভাঙার সাহসে যেন ভাটা না পড়ে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. শিল্প-বাণিজ্যে বিদ্যুৎ। ২. আধুনিক সভ্যতা বিদ্যুতের দান। ৩. নগরজীবন ও বিদ্যুৎ।

পল্লীসংস্কার

ভূমিকা—গ্রামের প্রাচীন গৌরব ও বর্তমান দুরবস্থার কারণ—উন্নতির প্রচেষ্টা ও ফল—সমস্যা ও সমাধানের জন্যে কী করণীয়—উপসংহার।

ভূমিকা

ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে পল্লীসংস্কার দেশোন্নয়নের সমার্থক। কারণ আজও এদেশে শহরের সংখ্যা নগণ্য, পল্লী অগণ্য। ভারতবর্ষের মোট জনসংখ্যার শতকরা আশী ভাগ গ্রামবাসী। সুতরাং আমাদের দেশের উন্নতি বিধানের জন্য আমাদের পল্লীমনস্ক হতেই হবে।

গ্রামের প্রাচীন গৌরব ও বর্তমান দুরবস্থার কারণ

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবন ছিল গ্রাম-নির্ভর; কৃষি ও কুটির শিল্প ছিল তখন ভারতবর্ষের মানুষদের প্রধান জীবিকা, ফলে এ দুটিতে স্ব-নির্ভর গ্রামগুলিকে কেন্দ্র করেই তৎকালীন ভারতবর্ষের শিল্প-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। পরবর্তী কালে, ইংরেজ শাসনের শুরু থেকেই ভারতের অর্থনৈতিক জীবনের দ্রুত পরিবর্তন সাধিত হয়, এবং শিল্প ও ব্যবসাকেন্দ্রগুলিকে ঘিরে শহর গড়ে উঠতে থাকে, অর্থনৈতিক জীবন শহর-কেন্দ্রিক হয়ে পড়ে। ফলত শহরগুলিই শিক্ষা-সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে পড়ে। গ্রামগুলির অনাদর ক্রমাগত বাড়তে থাকে। শেষ অবধি শহরগুলি হয়ে ওঠে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আনন্দ ও অন্নসংস্থানের কেন্দ্রবিন্দু আর গ্রামগুলি ক্রমশ রোগ, অশিক্ষা, কুসংস্কার-দারিদ্র্যের বাসস্থানে পরিণত হয়।

উন্নতির প্রচেষ্টা ও ফল

এ কথা সহজবোধ্য যে দেশের শতকরা আশি-জন মানুষকে অশিক্ষা, কুসংস্কার, দারিদ্র্যে নিমজ্জিত রেখে দেশের উন্নতির কথা ভাবা স্বপ্নবিলাস মাত্র। হয়তো দিনের আলোর মতো স্পষ্ট এ কথাকে এড়ানো যায় না বলেই প্রতিবছর পল্লী-উন্নয়নের নানাবিধ পরিকল্পনা গৃহীত হয়, কিন্তু অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক কারণে তা কার্যকর হয় না।

সমস্যা ও সমাধানের জন্য কী করণীয়

পল্লীজীবনের সমস্যা অসংখ্য। দারিদ্র্য, কুসংস্কার, অজ্ঞতা, শিক্ষাহীনতা, স্বাস্থ্যহীনতা, যোগাযোগ-ব্যবস্থার অভাব, আধুনিক জীবনের সুখ-সুবিধার অভাব ইত্যাদি ভারতের গ্রামগুলিকে দিনদিন অবক্ষয়ের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এর সমাধানের জন্যে প্রয়োজন :

অশিক্ষা দূর করা : সমস্যা সৃষ্টির ক্ষেত্রে অশিক্ষা একাই একশ। ফলে পল্লীসংস্কারের জন্যে প্রাথমিক প্রয়োজন শিক্ষাবিস্তার ; যে-অজ্ঞানতার অন্ধকার হাজার-হাজার মানুষের জীবনকে পঙ্গু করে রেখেছে, তাকে দূর করা। এর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের একমাত্র অস্ত্র অবৈতনিক, আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা। কাজটি অবশ্য আয়াসসাধ্য, কিন্তু অবশ্য করণীয়। কারণ শুধুমাত্র এইটুকুই অনেক সমস্যা দূর করবে এ কথা নিশ্চিত ভাবেই বলা যায়। তবে লক্ষ রাখা দরকার, এই শিক্ষার সঙ্গে যেন গ্রামজীবনের যোগ থাকে।

স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার : গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের ব্যবস্থা করাও আশু প্রয়োজনীয়। এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করতে পারে। অপুষ্টি এ দেশে

এক অভিশাপ। স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির এ ব্যাপারেও ভূমিকা আছে, প্রয়োজনে খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তন করানোর দায়িত্বও তাদের নিতে হবে।

আধুনিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য বিস্তার : বিজ্ঞান আমাদের জীবনে যে-স্বাচ্ছন্দ্য এনে দিয়েছে গ্রামাঞ্চলে তা প্রসারিত করা দরকার।

সুস্থআনন্দ দান : যাতায়াতের সুবন্দোবস্ত, বৈদ্যুতিক আলোর ব্যবস্থা ইত্যাদি গ্রামাঞ্চলে বিস্তৃত হবে। এ ছাড়া খেলাধুলা, যাত্রা ইত্যাদি সুস্থ আনন্দোপকরণের ব্যবস্থা যদি করা যায় আনুষঙ্গিক বহু সমস্যা দূর হতে পারে। গ্রামীণ অর্থনীতির পুনরুজ্জীবনের গুরুত্ব এক্ষেত্রে সর্বাধিক।

কৃষিব্যবস্থার উন্নতি : এজন্য দুটি পথ অবশ্য গ্রহণীয়, প্রথমত, কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন। এজন্যে প্রয়োজন কৃষি ব্যবস্থায় বৈজ্ঞানিক প্রথা অবলম্বন। বীজ সংরক্ষণ, জমি প্রস্তুতকরণ, উন্নত জাতের বীজ রোপণ, সারপ্রয়োগ, সেচব্যবস্থার উন্নতিসাধন এবং সর্বোপরি চাষীদের পরিশ্রমের যথার্থ মূল্যদান। এর জন্যে পল্লীঅঞ্চলে কৃষি সমবায় সমিতি গড়া যেতে পারে।

কুটিরশিল্পের উন্নতি : দ্বিতীয়ত, প্রয়োজন কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন। উপযুক্ত সুযোগ পেলে কুটিরশিল্পের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক মানে পণ্যদ্রব্য প্রস্তুত করতে সক্ষম বহু দক্ষ বৃত্তিজীবী আছেন আমাদের দেশে। এর দ্বারা-যে শুধুমাত্র জাতীয় ঐতিহ্য-সম্পন্ন শিল্পদ্রব্যের পুনরুত্থান ঘটবে তাই নয়, বহু গ্রামবাসী আর্থিক দিক থেকে স্বনির্ভর হতে পারবেন।

উপসংহার

মনে রাখা দরকার, ভাবী ভারতবর্ষের যে-স্বপ্ন আমরা দেখি, তার রূপায়ণ শুধু গ্রামগুলিকে আবার ‘শান্তির নীড়’ করে তোলার উপরেই নির্ভরশীল। কারণ গ্রামই ভারতের আত্মা।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. পল্লী উন্নয়ন। ২. বাংলার পল্লী। ৩. ‘ফিরে চল মাটির টানে’।
৪. একালের পল্লী বনাম সেকালের পল্লী।

চিন্তাসহায়ক তথ্য ও বাণী

পরিকল্পনা খাতে যে-সব গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে তার মধ্যে ইন্টিগ্রেটেড রুরাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম বা সুসংহত গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্প বিশেষ উল্লেখের অপেক্ষা রাখে।

ষষ্ঠ পরিকল্পনায় “সুসংহত” গ্রামীণ উন্নয়নের ওপরে জোর দেওয়া হয়েছে।

স্থির হয়েছে দারিদ্র্যসীমার নিচে যাঁরা রয়েছেন, অর্থাৎ যাঁদের বছরে ৩৫০০ টাকার বেশি আয় হয় না, তাদের ভিতর থেকে প্রতি ব্লকে প্রতি বছরে ছশো পরিবারকে বেছে নিয়ে সুসংহত ও সার্বিক সহায়তার মাধ্যমে দারিদ্র্যসীমার উর্ধ্বে তোলা হবে।

এই রাজ্যে ব্লকের সংখ্যা ৩৩৫। কাজেই প্রতি ব্লকে ৬০০ পরিবার হিসেবে বছরে দু'লক্ষের মত পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা যায়। —বেতারে প্রচারিত

বিজ্ঞান মানুষকে মহাশক্তি দিয়েছে। সেই শক্তি যখন সমস্ত সমাজের হয়ে কাজ করবে তখনই সত্যযুগ আসবে।...মানুষের শক্তির এই নূতনতম বিকাশকে গ্রামে গ্রামে আনা চাই। এই শক্তিকে সে আহ্বান করে আনতে পারে নি বলেই গ্রামে জলাশয় নেই, ম্যালেরিয়ার প্রকোপে দুঃখশোক পাপতাপ বিনাশমূর্তি ধরেছে, কাপুরুষতা পুঞ্জীভূত। চারদিকে যা দেখছি এ তো পরাভবেরই দৃশ্য।

—রবীন্দ্রনাথ, ১৯৩৪।

বাংলার সামাজিক উৎসব

সূচনা—বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা—লক্ষ্মীপূজার উৎসব—কালীপূজা ও দেওয়ালী উৎসব—সরস্বতী পূজা—দোল—অনুষ্ঠানের স্বরূপ—অন্যান্য অনুষ্ঠান—উপসংহার।

সূচনা

উৎসবপ্রাণ বাংলায় বারমাসে তের পার্বণ—উৎসব আর উৎসব। এক উৎসব শেষ হতে না হতেই আর এক উৎসবের আগমনী বেজে উঠে। আসলে উৎসব-প্রাঙ্গণ চণ্ডীমণ্ডপে ছিল না, উৎসব-প্রাঙ্গণ ছিল বাঙ্গালীর হৃদয়ে। বাইরের অনুষ্ঠান, সে তো কেবল হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। তাই বাংলার উৎসব বাঙ্গালীর অফুরন্ত প্রাণধারার নিদর্শন।

বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজা

দুর্গাপূজা বাংলার শ্রেষ্ঠ জাতীয় উৎসব। যে-পূজার নামে মানুষ আত্মহারা সে এই দুর্গাপূজা। মানুষের মতো প্রকৃতির বুকেও তখন বইতে থাকে আনন্দের বন্যা। শরতের সোনালী আলো, শিউলি-ঝরা আঙিনা, সাদা মেঘ আর কাশফুল যেন দেবীর আগমনী রচনা করে। দেবী দুর্গা হলেন শক্তি আর বিত্তের প্রতীক। অন্যদিকে ইনিই আমাদের মাতা, কন্যা। কন্যারূপে বছরে কেবল তিনটি দিনের জন্যে পিতৃগৃহে আসেন, আবার চলে যান শিবগৃহ কৈলাসে। অন্য রূপে তিনিই দেশমাতৃকা। আধ্যাত্মজীবনের সঙ্গে ভাবজীবন মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। শরতের বাতাসে যখন আগমনী সঙ্গীত ভেসে আসে মনটা তখন ছুটির আনন্দে মেতে ওঠে। সমস্ত অন্তর আগমনীর সুরে বলতে চায়:

গিরি, এবার আমার উমা এলে, আর উমা পাঠাব না।
বলে বলবে লোকে মন্দ, কারো কথা শুনব না।
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয়
তখন মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া, জামাই বলে মানব না।

লক্ষ্মীপূজার উৎসব

দুর্গাপূজার বিসর্জনের বাজনা থামার সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপূজার উৎসব শুরু হয়। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত, জ্যোৎস্নাধোয়া বিশ্বচরাচর যেন দেবীর আগমনী ঘোষণা করে। ধনীর প্রাসাদ আর দরিদ্রের পর্ণকুটির একই আনন্দধারায় অভিষিক্ত হয়। কোথাও দেবীর ঘট, কোথাও

পট, কোথাও আবার মাটির প্রতিমা। সর্বত্রই শুভ্রশুচিতার ভাবে পূর্ণ। বাংলার পুরনারী এই পূজার পুরোধা। মানুষের কল্যাণ আর স্বাচ্ছন্দ্যকামনাই লক্ষ্মীদেবীর আরাধনার উদ্দেশ্য।

কালীপূজা ও দেওয়ালী উৎসব

কালীপূজা ও দেওয়ালী আমাদের জাতীয় উৎসব। এই জড় বিশ্বের প্রাণকেন্দ্রে যে-মহাশক্তি অদৃশ্যভাবে বিরাজমান তারই প্রতীক মহাকালী। অমাবস্যার ঘন অন্ধকার রাত্রে শক্তিরূপিণী এই মহাদেবীর পূজা অনুষ্ঠিত হয়। সহস্র দীপাবলীর আলোয় অপসারিত হয় অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকার। দীপান্বিতার এই উৎসবের সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ হল আতসবাজি। জ্বলন্ত তারাবাজি-হাতে শিশুর মুখের হাসি সহস্র দীপান্বিতার আলোকেও বুঝি ম্লান করে দেয়।

সরস্বতী পূজা

বাংলার আর-একটি স্মরণীয় উৎসব হল সরস্বতী পূজা। সরস্বতী হলেন বিদ্যার দেবী। মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী তিথিতে বাংলার ছাত্রসমাজ বিদ্যাদেবী সরস্বতীকে বন্দনা করে। এই পূজার অনুষ্ঠানে একটি শুভ্র শুচিতার ভাব আছে। সরস্বতী পূজা বিদ্যার্থীদের প্রাণের উৎসব। সরস্বতী কেবল বিদ্যার দেবী নন, তিনি ললিত-কলারও দেবী। তাই সরস্বতী-পূজার উৎসবকে কেন্দ্র করে শিল্পচর্চার আয়োজন করা হয়।

দোল

দোল হল বসন্ত ঋতুর উৎসব। বসন্তের আগমনে প্রকৃতির বুকে জাগে নতুন জীবনের বন্যা। ফলে-ফুলে-পাতায় নবজীবনের বিজয়-কেতন। প্রকৃতির বুক থেকে রঙের বন্যাকে মানুষ নিজের বুকের মধ্যে গ্রহণ করে। প্রকৃতির রঙে মনের উত্তরীয় নেয় রাঙিয়ে। আবার এই উৎসবকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে এক ধর্মীয় অনুষ্ঠান। যার নাম দোল উৎসব। সেখানেও রঙের খেলা। প্রকৃতির রঙ মনের আর ফাগের রঙ মিলে রচনা করে এক মহারঙের খেলা।

অনুষ্ঠানের স্বরূপ

এই সব ধর্মীয় অনুষ্ঠানই সমাজজীবনে বিপুল আনন্দ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে সামাজিক অনুষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সমাজের অর্থনীতির উপরেও এইসব উৎসব-অনুষ্ঠানের প্রভাব যথেষ্ট। পূজানুষ্ঠানগুলি ব্যাপকভাবে এখন সর্বজনীন রূপ নিয়ে সমাজজীবনের সঙ্গে আরও ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত হয়েছে।

অন্যান্য অনুষ্ঠান

'নববর্ষ', '২৫শে বৈশাখ' 'বর্ষামঙ্গল' ইত্যাদি উৎসবও এখন সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়েছে।

উপসংহার

কিন্তু বর্তমানে উৎসবের ভাবসত্য ভুলে গিয়ে বাইরের আড়ম্বরের দিকে আমরা নজর দিয়েছি বেশি করে। তাই আজ আর উৎসবে প্রাণ নেই, নেই অনাবিল আনন্দের প্রকাশ। প্রাচীন উৎসবের মধ্যে যে-প্রীতির টানে বহু এক হতে পারত, আজ আবার নতুন করে তা ফিরে পেতে হবে। উৎসব হল রাখী-বন্ধন। এ রাখী ভ্রাতৃত্বের, এ রাখী কল্যাণের।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১, বাংলার জাতীয় উৎসব। ২, উৎসবপ্রাণ বাংলা। ৩, বাংলার পালপার্বন

৪, শিল্প-সংস্কৃতিতে উৎসবের অবদান।

মানব-জীবনে অবকাশ

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

ভূমিকা—অবকাশ কী—আমার পারিপার্শ্বিক ও অবসর—অবসর-বিনোদন নিজস্ব ব্যাপার—নানা দেশে অবসর-যাপন—এদেশে অবসর-যাপন—অবকাশ—নানা বয়েসের—অবকাশ—স্বল্প ও দীর্ঘ—অবসর-প্রাপ্তের অবসর—উপসংহার ।

ভূমিকা

মানুষ বড় ব্যস্ত। বৃহৎ কর্মযজ্ঞে হাত মিলিয়েছে সবাই। রুটির তাগিদে উদ্‌ভ্রান্ত মানুষ নিরন্তর খেটে চলেছে। তাই সহজে মেলে না অবকাশ। আর যখন মেলে তখন তার মতো মধুর আর কিছু নেই। কবি ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ তাঁর একটি কবিতায় বলেছিলেন "The world is too much with us." আর-এক ইংরেজ কবি অবকাশের জন্যে দুঃখ করে বলেছিলেন, অবকাশ নেই, তাই প্রকৃতির সৌন্দর্য থেকে মানুষ হয় বঞ্চিত। যে মানুষ কাঠবেড়ালি কেমন করে ঘাসে লুকোচুরি খেলে দেখতে পেল না সামান্য একটু অবকাশের জন্যে—সে বড়োই অভাগা। আর-এক কবি সৌন্দর্য উপভোগ করবেন বলে কঠিন শীতের দিনে এক নির্জন বনে ঘোড়া থামিয়েও শেষ পর্যন্ত কাজের ঘণ্টা শুনে বিদায় নিলেন।

অবকাশ কী

অবকাশ হল বাঁধা রুটিনের ফাঁকের সময়টুকু। এ যেন চলতে চলতে একটু থামা। একটু জিরিয়ে নেওয়া, দম ফেলা। অনেকে বলেন, অবকাশ হল কাজেরই অঙ্গ। নতুন উদ্যমে আবার কাজ শুরু করার জন্যেই এর প্রয়োজন। কিন্তু এ তো গেল প্রয়োজনের দিক। অবসরের অন্য দিকও আছে, যার জন্যে মানুষের জীবনে অবসরের এত মূল্য।

আমার পারিপার্শ্বিক ও অবসর

প্রত্যেক মানুষের যেমন নিজস্ব কক্ষপথ আছে তেমনি আছে নিজস্ব জগৎ। নিজের চারিদিকে কত না আয়োজন। মানুষ তার নিজস্ব পটভূমি-সম্পর্কে কিছুই জানবে না তা কি হয়? আর এই জানাটুকুর জন্যে অবসর তার চাই। আমার বাড়ির চার পাশেই কত বৈচিত্র্য, কত বৈশিষ্ট্য, তা কি লক্ষ্য করার নয়? আমি যাদের নিয়ে আছি বা যারা আমাকে ঘিরে আছে—তাদের চিনতে গেলে, বুঝতে গেলে, আমার চাই অবসর। তা ছাড়া, একটু অবসর পেয়ে কিছু ভাববার প্রয়োজনীয়তাও নিশ্চয়ই আছে। ভাবনা তো কর্মেরই প্রেরণা। কর্ম হল ভাবেরই ভাষ্য। ভাবলেশহীন জীবন অকল্পনীয়।

অবসর-বিনোদন নিজস্ব ব্যাপার

কে কেমনভাবে অবসর যাপন করবে তা নির্ভর করে ব্যক্তিগত রুচি-অরুচির ওপরে। কেউ অবসর পেয়ে বই পড়ে, কেউ বা বেড়াতে যায়, কেউ আবার মাছ ধরে। অনেকে আড্ডা দেয়—একেবারে নির্ভেজাল আড্ডা। কেউ আবার নেহাৎ শুয়ে-বসে দিন কাটায়। অনেকে অবসর পেয়ে ঘুমোয়।

নানা দেশে অবসর-যাপন

পাশ্চাত্যে অবসর-বিনোদনের নানা রূপ দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে সমুদ্রের তীরে কত মানুষ রৌদ্রস্নান করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অনেকে আবার বেরিয়ে পড়ে শিকারে। কেউ নৌকা চালায়। জলে কিংবা বরফের ওপর স্কেটিং করে কেউ কেউ। আবার অনেকে নাচে, কিংবা রেস্তোরাঁয় আমোদ-প্রমোদে সময় কাটায়। এ ছাড়া, কেউ চলে যায় গ্রামের দিকে। সেখানে সবুজ ঘাসের কার্পেটে দেহ এলিয়ে দিয়ে গল্প-কবিতা পড়ে। মাঝে মাঝে কানে বাজে পাখির কাকলি। সব মিলে একটা অপূর্ব পরিবেশ।

এদেশে অবসর-যাপন

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কেমন করে অবসর যাপন করব তা ভাবতে ভাবতেই অনেক সময়ে অবসর ফুরিয়ে যায়। তবে আমরা বাঙালিরা আড্ডা জমিয়ে অবসর কাটাতে ভালোবাসি। রকে বসে ওঠে আড্ডা, কখনো বা ফুটপাথে রেলিং-এর গায়ে হেলান দিয়ে অনেকে মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা। অনেকে আবার অবকাশ পেলে পুরোনো বন্ধু বা আত্মীয়স্বজনের বাড়ি ঘুরতে যায়। এটা মন্দ নয়। স্বজন-পরিজনের এ এক পুনর্মিলনের অবকাশ। এতে জীবনে বৈচিত্র্যের স্বাদ লাগে।

অবকাশ—নানা বয়সের

যুবকদের অবকাশ-যাপন-পদ্ধতি-সম্পর্কে মোটামুটি আভাস দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, তারা অবশ্য খেলা, সিনেমা কিংবা নাটক দেখেও অবকাশ যাপন করে। একটু বয়স্ক লোকদের দেখা যায় দুপুরে ঘুমোতে বা রেডিও শুনতে। পুরনো দিনের গান বাজিয়ে তাঁরা পুরনো কালের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে চান হয়তো। বিকেলে এঁরা অনেক সময় উদ্দেশ্যবিহীনভাবে কোনো রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকেন। বড়ো রাস্তার মোড়ে বা ফুটপাথে বই-এর দোকানে বই-এর পাতা ওল্টাতে থাকেন। বৃদ্ধদের দেখা যায় পার্কের বেঞ্চে বসে গল্প করতে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প। কে কত কম দরে চাল কিংবা ঘি পেয়েছিলেন সে গল্পও চলে। কখনও বা কর্পোরেশনের আলোয় জমে তাস-পাশার আড্ডা।

অবকাশ—স্বল্প ও দীর্ঘ

স্বল্প অবকাশ-যাপন-সম্পর্কে বাঁধাধরা কিছু থাকে না। তবে দীর্ঘ অবকাশে, যাদের সামর্থ্য আছে তাঁরা বাইরে কোথাও বেড়াতে যান। অবশ্য যাঁদের ভ্রমণের নেশা আছে তাঁরাই যান। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী অথবা শিক্ষক-অধ্যাপকেরাই দীর্ঘ অবকাশের সুযোগ পান। ভ্রমণের মাধ্যমে এঁরা অবসরকে সার্থক করেন।

অবসরপ্রাপ্তের অবসর

অবসরপ্রাপ্তের অবসরই সবচেয়ে ক্লান্তিকর। আমাদের দেশে অনেক কর্মক্ষম লোককে বয়সের নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে গেলেই কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এটা এক ধরনের নির্বাসনদণ্ড। এঁদের অবসর তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে।

কর্মী মানুষের কাছেই অবসর সত্যকারে বাঞ্ছিত। আর কর্মক্লান্ত মানুষ যে অবসর পায় সেই অবসরই প্রত্যাশিত। ফলে এই অবসর-যাপনে বিশেষই বিচক্ষণ হতে হবে। বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে অবসর যাপন করতে হবে। কেমন করে অবসর কাটালে তা সুন্দর হবে এটা নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে। তা না হলে অবসর তার মর্যাদা হারাবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায়—
১. অবসর যাপন—রীতি ও পদ্ধতি। ২. কর্ম ও অবসর।

চিন্তাসহায়ক বাণী

কাজের মধ্যে মধ্যে অবকাশ মেলে। কিন্তু পুরো অবকাশের মধ্যে অবকাশ পাওয়া দুর্লভ। কালান্তর। —রবীন্দ্রনাথ

প্রাচীন ভারতে একটা জিনিস প্রচুর ছিল,…সত্যকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মতো মনের উদার অবকাশ। কালান্তর। রবীন্দ্রনাথ

Employ the time well if that means to gain leisure.
—Benjamin Franklin. (1706-1790)
American Statesman, scientist and author.

A broad margin of leisure is as beautiful in a man's life as in a book.
—H. D. Thoreau (1817-1862)
American author and naturalist.

অপসংস্কৃতি একটি সামাজিক ব্যাধি

অপসংস্কৃতি কী—সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি—অপসংস্কৃতির জন্ম—অপসংস্কৃতির প্রভাব—অপসংস্কৃতির নানা রূপ—সিনেমা দূরদর্শন—লোভী মানুষ—ব্যাধির চিকিৎসা—সরকারের দায়িত্ব—উপসংহার।

অপসংস্কৃতি কী

অপসংস্কৃতির ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের আগে সংস্কৃতি কথাটির মানে বুঝে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে বলেছেন, পদ্মাসন যদি হয় ফুল তবে তা থেকে বিচ্ছুরিত আভাই হল সংস্কৃতি। অর্থাৎ মানুষের চিন্তাধারার উন্নত রূপই হল সংস্কৃতি। তাই সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের শুভ কল্যাণময় বিশেষ উন্নত পরিশীলিত রুচি। এই রুচি মানুষের ক্রিয়াকলাপ-প্রকাশিত। তাই যে-রুচিতে মানুষের অশুভ ও বিকৃত মনের প্রকাশ তাই হল অপসংস্কৃতি।

পাশ্চাত্ত্যে অবসর-বিনোদনের নানা রূপ দেখা যায়। শীতপ্রধান দেশে সমুদ্রের তীরে কত মানুষ রৌদ্রস্নান করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। অনেকে আবার বেরিয়ে পড়ে শিকারে। কেউ নৌকা চালায়। জলে কিংবা বরফের ওপর স্কীইং করে কেউ কেউ। আবার অনেকে কাফে, কিংবা রেস্তোরাঁয় আমোদ-প্রমোদে সময় কাটায়। এ ছাড়া, কেউ চলে যায় গ্রামের দিকে। সেখানে সবুজ ঘাসের কার্পেটে দেহ এলিয়ে দিয়ে গল্প-কবিতা পড়ে। মাঝে মাঝে কানে বাজে পাখির কাকলি। সব মিলে একটা অপূর্ব পরিবেশ।

নানা দেশে অবসর-যাপন

দুঃখের বিষয় আমাদের দেশে কেমন করে অবসর যাপন করব তা ভাবতে ভাবতেই অনেক সময়ে অবসর ফুরিয়ে যায়। তবে আমরা সাধারণত আড্ডা জমিয়ে অবসর কাটাতে ভালোবাসি। রকে জমে ওঠে আড্ডা, কখনো বা ফুটপাথে রেলিং-এর গায়ে হেলান দিয়ে অনেকে মিলে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আড্ডা। অনেকে আবার অবকাশ পেলে পুরোনো বন্ধু বা আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি ঘুরতে যায়। এটা মন্দ নয়। স্বজন-পরিজনের এ এক পুনর্মিলনের অবকাশ। এতে জীবনে বৈচিত্র্যের স্বাদ লাগে।

এদেশে অবসর-যাপন

যুবকদের অবকাশ-যাপন-পদ্ধতি-সম্পর্কে মোটামুটি আভাস দেওয়া হয়েছে। এ ছাড়া, তারা অবশ্য খেলা, সিনেমা কিংবা নাটক দেখেও অবকাশ যাপন করে। একটু বয়স্ক লোকদের দেখা যায় দুপুরে ঘুমোতে বা স্টিরিও শুনতে। পুরনো দিনের গান বাজিয়ে তাঁরা পুরনো কালের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে চান হয়তো। বিকেলে এঁরা অনেক সময় উদ্দেশ্যবিহীন-ভাবে কোনো রাস্তা ধরে হাঁটতে থাকেন। বড়ো রাস্তার মোড়ে বা ফুটপাথে বই-এর দোকানে বই-এর পাতা ওল্টাতে থাকেন। বৃদ্ধদের দেখা যায় পার্কের বেঞ্চে বসে গল্প করতে। বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গল্প। কে কত কম দরে চাল কিংবা ঘি খেয়েছিলেন সে গল্পও চলে। কখনও বা কর্পোরেশনের আলোয় জমে তাস-পাশার আড্ডা।

অবকাশ—নানা বয়েসের

স্বল্প অবকাশ-যাপন-সম্পর্কে বাঁধাধরা কিছু থাকে না। তবে দীর্ঘ অবকাশে, যাঁদের সামর্থ্য আছে তাঁরা বাইরে কোথাও বেড়াতে যান। অবশ্য যাঁদের ভ্রমণের নেশা আছে তাঁরাই যান। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রী অথবা শিক্ষক-অধ্যাপকেরাই দীর্ঘ অবকাশের সুযোগ পান। ভ্রমণের মাধ্যমে এঁরা অবসরকে সার্থক করেন।

অবকাশ—স্বল্প ও দীর্ঘ

অবসরপ্রাপ্তের অবসরই সবচেয়ে ক্লান্তিকর। আমাদের দেশে অনেক কর্মক্ষম লোককে বয়সের নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে গেছেন বলে কাজ থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এটা এক ধরনের নির্বাসনদণ্ড। এঁদের অবসর তাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই গুরুভার হয়ে ওঠে।

অবসরপ্রাপ্তের অবসর

কর্মী মানুষের কাছেই অবসর সবচেয়ে বাঞ্ছিত। আর কর্মক্লান্ত মানুষ যে অবসর পায় সেই অবসরই প্রত্যাশিত। তবে এই অবসর-যাপনে নিশ্চয়ই বিচক্ষণ হতে হবে। বিশেষ পরিকল্পনা নিয়ে অবসর যাপন করতে হবে। কেমন করে অবসর কাটালে তা সুন্দর হবে এটা নিজেকেই ঠিক করে নিতে হবে। তা না হলে অবসর তার মর্যাদা হারাবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায়—

১. অবসর যাপন—রীতি ও পদ্ধতি। ২. কর্ম ও অবসর।

চিন্তাসহায়ক বাণী

কাজের মধ্যে মধ্যে অবকাশ মেলে। কিন্তু পুরো অবকাশের মধ্যে অবকাশ বড়ো দুর্লভ। কালান্তর। —রবীন্দ্রনাথ

প্রাচীন ভারতে একটা জিনিস প্রচুর ছিল,… সত্যকে খুব বড়ো করে ধ্যান করবার এবং উপলব্ধি করবার মতো মনের উদার অবকাশ। কালান্তর। রবীন্দ্রনাথ

Employ the time well if that means to gain leisure.

—Benjamin Franklin. (1706-1790)
American Statesman, scientist and author.

A broad margin of leisure is as beautiful in a man's life as in a book.

—H. D. Thoreau (1817-1862)
American author and naturalist.

অপসংস্কৃতি একটি সামাজিক ব্যাধি

অপসংস্কৃতি কী—সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি—অপসংস্কৃতির জন্ম—অপসংস্কৃতির নানাচক্র—অপসংস্কৃতির নানা রূপ—বিপন্ন যুবসমাজ—দোষটা কার—ব্যাধির চিকিৎসা—সরকারের দায়িত্ব—উপসংহার।

অপসংস্কৃতি কী

অপসংস্কৃতির সংজ্ঞা-নির্ধারণের আগে সংস্কৃতি কথাটির মানে বুঝে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'শেষের কবিতা' উপন্যাসে বলেছেন, সভ্যতা যদি পদ্মরাগ মণি হয় তবে তা থেকে বিচ্ছুরিত আলোই হল সংস্কৃতি। সভ্য মানুষের চিন্তাধারার উন্নত ফসল হল সংস্কৃতি। তাই সংস্কৃতির সঙ্গে জড়িয়ে আছে মানুষের সুস্থ রুচিসম্পন্ন বিশেষ উন্নত পর্যায়ের কৃতি। এই কৃতি মানুষের শুভচিন্তা-প্রণোদিত। তাই যে-কৃতিতে মানুষের অশুভ ও বিকৃত মননের প্রকাশ তাই হল অপসংস্কৃতি।

সংস্কৃতি বনাম অপসংস্কৃতি

আলোর সঙ্গে কালো, শুভর সঙ্গে অশুভ, সভ্যতার সঙ্গে অসভ্যতা—তেমনি সংস্কৃতির সঙ্গে অপসংস্কৃতি। কিন্তু তাই বলে সংস্কৃতির পরিপূরক হিসেবে অপসংস্কৃতিকে ধরার প্রশ্ন উঠছে না। আসলে সংস্কৃতির বিপরীত হল অপসংস্কৃতি। সংস্কৃতি যদি মঙ্গলকামী মানুষের ধর্ম হয় তবে অপসংস্কৃতি হল অশুভ বা অসুস্থ-চেতনার মানুষের ধর্ম। এদের মধ্যে তাই পারস্পরিক বিরোধ অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে। যদিও একটি দেশে সংস্কৃতি আর অপসংস্কৃতি পাশাপাশি চলে। এটাই একটা বিস্ময়, পৃথিবীর সব দেশেই এটা দেখা যায়।

অপসংস্কৃতির জন্ম

মানুষের রুচিবিকার থেকেই অপসংস্কৃতির জন্ম। আর এই অপসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করে চলে অসুস্থ মানসিকতাসম্পন্ন মানুষ। বিকৃত ক্ষুধার খাদ্য হিসেবে অপসংস্কৃতির নানা ভোজ্য সৃষ্টি চলতে থাকে। আর মানুষের এই বিকৃত ক্ষুধার আগুন ক্রমশ বাড়তে থাকে, ছড়াতে থাকে।

অপসংস্কৃতির নানাচক্র

প্রত্যেক দেশেই একদল মানুষ নামধারী জীব থাকে যারা মানুষের বিকৃত রুচির সুযোগ নিয়ে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে। বাণিজ্যের প্রশ্ন তো আছেই, সেই সঙ্গে আরো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্য সক্রিয় থাকে। এরা ক্রমশ অপসংস্কৃতির বীজাণু ছড়িয়ে দিয়ে দেশের পরিবেশকে দূষিত করে, বিশেষ করে যুব-সম্প্রদায়কে আক্রান্ত করে। তারপর অপসংস্কৃতির দুরারোগ্য ব্যাধি সমগ্র সমাজকে বিপন্ন করে তোলে।

অপসংস্কৃতির নানা রূপ

সাহিত্য-সিনেমা-নাটক সংস্কৃতির গৌরবময় বাহন। আমরা সংস্কৃতির এইসব সম্পদ নিয়ে গর্ব করি। কিন্তু অপসংস্কৃতির ব্যাধি এই সব সম্পদকেই গ্রাস করতে এগিয়ে আসে। এগুলো হল জনপ্রিয় শিল্পমাধ্যম। তাই এরা রাহুগ্রস্ত হলে দেশের বৃহৎসংখ্যক মানুষ এক কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। অপসংস্কৃতির রাহুগ্রাসে সাহিত্যে আসে অশ্লীলতা, সিনেমায় দেখা দেয় জিঘাংসা আর সেক্স-এর মাতামাতি, নাটকে স্থান পায় নগ্ন নৃত্য কিংবা অসংযত অশ্লীল প্রদর্শনী, সিনেমা, নাটকের পোস্টারে, বিজ্ঞাপনের ছবিতে মাত্রাহীন বিকৃত রুচির রূপায়ণের প্রতিযোগিতা।

বিপন্ন যুবসমাজ

অপসংস্কৃতির ব্যাধিতে সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত ও বিপন্ন দেশের যুব-সম্প্রদায়। অসংস্কৃত বিকৃত রুচির ছায়াচিত্রের প্রভাবে যুবক আজ বিভ্রান্ত। যুব-সমাজের অনেকাংশের মানসিকতাই আজ বিকারগ্রস্ত।

দোষটা কার

কিন্তু যুব-সমাজকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। অপসংস্কৃতির ভাইরাস যারা দেশের আকাশে-বাতাসে ইচ্ছাকৃতভাবে ছড়িয়ে দিচ্ছে দোষটা তাদের। আর এ রোগ বড় ছোঁয়াচে, একজন রোগগ্রস্তের স্পর্শে অন্যজন এই মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। গোটা জেনারেশন বিপর্যস্ত হচ্ছে। যেসব স্বার্থান্বেষী, কুচক্রী শত্রুগোষ্ঠী এই ব্যাধির জীবাণু ছড়াচ্ছে তারা নেপথ্যে থেকে যাচ্ছে।

অপসংস্কৃতির ব্যাধি দুরারোগ্য হলেও আরোগ্যের অতীত নয়। এর জন্যে চাই দেশের নেতৃবৃন্দ, সরকার, শিক্ষকগোষ্ঠী, অভিভাবক-শ্রেণী তথা সকল মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মানুষের যৌথ ও বলিষ্ঠ প্রচেষ্টা। নিরক্ষরতা-দূরীকরণের মতো অপসংস্কৃতি-দূরীকরণের ব্রত নিতে হবে আমাদের। এটা সবাইকে মেনে নিতে হবে যে, এটা আজ একটা জাতীয় সমস্যা। এই সমস্যা দূর না হলে সমগ্র জাতির বিপর্যয় অবধারিত ও আসন্ন। সকলের শুভবুদ্ধির প্রতি আবেদন জানাতে হবে। সবাইকে সচেষ্ট হতে হবে।

ব্যাধির চিকিৎসা

অপসংস্কৃতি বন্ধের জন্যে প্রয়োজনে সরকারকে কঠোর ব্যবস্থা নিতে হবে। অপসংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক, ধারকবাহকদের খুঁজে বার করতে হবে এবং তাদের শাস্তি-বিধান করতে হবে। সিনেমা-নাটকের ক্ষেত্রে কঠোর সেন্সারের প্রয়োজন। বিজ্ঞাপন বা প্রচারের ক্ষেত্রে সুনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থা গ্রহণীয়।

সরকারের দায়িত্ব

কিন্তু অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে যুবসমাজকেই রুখে দাঁড়াতে হবে। তারা যদি নিজেরাই বিকৃত রুচির ছবি, গান, সাহিত্য বর্জন করে তবে অপসংস্কৃতির ব্যাধি দূরে পালাতে পথ পাবে না। দেশের যুবসমাজ শুভবুদ্ধি-নির্ভর হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে পারলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়। যুবসমাজকেই প্রেয় আর শ্রেয় চিনে ও বিচার করে নিতে হবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায়—

১, সমাজ ও মূল্যবোধ। ২, যুবজীবনে অপসংস্কৃতি।

সাহিত্য ও সমাজ

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

সাহিত্য কী—সাহিত্যের উপজীব্য—প্রাচীন যুগের সাহিত্য—মঙ্গলকাব্যে মানুষ ও সমাজ চিত্র—সাহিত্যে সমাজ—সমাজের জটিলতা—সাহিত্যে সমাজচিত্র—চলমান যুগের সাহিত্য ও সমাজ—সমাজ-নিয়ন্ত্রণে সাহিত্য—সৎ সাহিত্য সৎ সমাজ গড়ে—উপসংহার।

'সাহিত্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থের মধ্যে এর ব্যঞ্জনাটি সুন্দরভাবে নিহিত। 'সহিত'-এর সঙ্গে ষ্য-প্রত্যয়ের যোগে গঠিত হল 'সাহিত্য'। সাহিত্য তাই লেখকের সঙ্গে পাঠকের সম্বন্ধ সূচিত করে। লেখকের বিচিত্র ভাববৈচিত্র্যের সঙ্গে পাঠক-মনের মিতালি ঘটায় সাহিত্য। সাহিত্য সভ্য ও শিক্ষিত মনের ফসল। সাহিত্য সভ্যতা ও সমাজের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

সাহিত্য কী

গল্পবলা মানুষের চিরন্তন স্বভাব। আর গল্প শোনার আকুতিও মানুষের ধর্ম।

গল্পের শুরু যে কবে হয়েছে তা বলা যায় না। গল্পের বিষয়বৈচিত্র্য কত বিস্তারিত পল্লবিত। দৈত্য-দানা, ভূতপ্রেত, রাজপুত্তুর-রাজকন্যে, পরী আর রাক্ষস-খোক্কস সব কিছু নিয়ে তৈরি হল গল্প। তারপর গল্প উঠে এল পুঁথির পাতায়। শুরু হল সাহিত্যের অভিযান। ক্রমশ, গল্প ঝুঁকলো মানুষের কথায়। মানুষ এল গল্পে। এ মানুষ রূপকথার মানুষ নয়, এ পৃথিবীর রক্ত-মাংসের মানুষ। মানুষের হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা এল সাহিত্যে। মানুষের কান্না-হাসির দোল-দোলানো কথায় সাহিত্যের পাল্লা হল ভারী। কিন্তু সে এক দীর্ঘ ইতিহাস।

সাহিত্যের উপজীব্য

প্রাচীন যুগের সাহিত্যে মানুষের কথা ছিল না। ছিল অসম্ভব ঘটনার বর্ণনা কিংবা দেবদেবীর মাহাত্ম্য-প্রচার। প্রথমে এসেছে কবিতা। তারপর গদ্য। মানুষ তখন মানুষের কথা বলে নি। বলেছে অন্য কথা। আমাদের এই চেনা পৃথিবীটাকে দেখাবার কোনো প্রচেষ্টাই ছিল না তখনকার সাহিত্যে।

প্রাচীন যুগের সাহিত্য

মঙ্গলকাব্যে দেবদেবীর সঙ্গে কয়েকটি মানুষের জীবন্ত চরিত্র চিহ্নিত হল। মনসা-মঙ্গল এল চাঁদসদাগরের মতো বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চরিত্র নিয়ে। আবার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে এল অত্যন্ত বাস্তবসম্মত খল-চরিত্র ভাঁড়ু দত্ত। সেই সঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে সমাজের রূপরেখাটিও ফুটে উঠল। ক্রমশ মানুষ ও তার সমাজের অনুপ্রবেশ ঘটতে লাগল, সাহিত্য হতে লাগল সমৃদ্ধ।

মঙ্গলকাব্যে মানুষ ও সমাজ চিত্র

মানুষ নিয়েই সমাজ। তাই মানুষ আর তার সমাজের পারিপার্শ্বিক আবহাওয়া সাহিত্যে এল। সাহিত্যের বক্তব্য গেল বেড়ে। বাড়ল সাহিত্যের বৈভব। সমাজের বৈশিষ্ট্য, টানা-পোড়েনের বৈচিত্র্য সবই এল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল সাহিত্য মানেই হল সমাজচিত্র, সাহিত্য মানেই হল সমাজের আয়না।

সাহিত্যে সমাজ

সমাজ কখনও সরলরেখা ধরে চলে না। পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পন্থা বেয়ে সমাজের গতি। সমাজের ভাঙ্গা-গড়া, আঘাত-সংঘাত, বিপর্যয়-জটিলতা অনিবার্যভাবে গভীর ছায়া ফেলে সাহিত্যে। সমাজের সমস্যা বিভিন্ন। সমাজের ইতিহাসে দেখা যায় কখনও যুদ্ধ, কখনও মন্বন্তর, কখনও বা কুসংস্কার সমাজকে নাড়া দেয়, ধাক্কা দেয়। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ বহুমানবের মিলনক্ষেত্র, এখানে মহাদেশীয় পরিবেশ ও বৈশিষ্ট্যের অস্তিত্ব। কত দেশ, কত সমাজ এখানে বিচিত্রমূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করেছে। এতে বৈচিত্র্যের সঙ্গে বেড়েছে জটিলতা। আর এই অনিবার্য জটিলতা সাহিত্যকে নতুন নতুন চিন্তাধারার সন্ধান যুগিয়ে চলেছে, সাহিত্যকে করে তুলেছে বিচিত্র, সর্বত্রগামী।

সমাজের জটিলতা

বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাসে সে যুগের সামাজিক বৈশিষ্ট্যগুলো নানা চরিত্রের আয়োজনে পরিস্ফুট হয়েছে। তাঁর সাহিত্য কোনো কোনো সামাজিক বিবর্তনের প্রামাণ্য দলিল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সমাজ এসেছে আরও স্পষ্ট এবং প্রত্যক্ষ ও নিবিড়ভাবে। গ্রামবাংলার সমাজ একেবারে

সাহিত্যে সমাজচিত্র

রক্ত-মাংসের রূপ ধরে আলোকচিত্রের মত ধরা দিয়েছে। 'পল্লী-সমাজ' একাই তো বাংলার পল্লীসমাজের প্রতিনিধি। মাঝে মাঝে মনে হয়, শরৎ-সাহিত্যে সমাজের ভূমিকা সবচেয়ে উজ্জ্বল, প্রত্যক্ষ। তাঁর সাহিত্যরচনার উদ্দেশ্যই যেন সমাজকে নিখুঁতভাবে উপস্থাপিত করা। তাঁর লেখার অপূর্ব শৈলীতে সাহিত্য ও সমাজ-সম্পৃক্ত হয়ে আছে।

চলমান যুগের সাহিত্য ও সমাজ

আজকের লেখকেরা অনেক বেশি পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ। তাঁদের অনেকের ধারণা আর্ট'স ফর লাইফ্স সেক-এর কাছাকাছি। সমাজের খুঁটিনাটি, এর হীনতা-নীচতা, পঙ্কিলতা সব কিছুই প্রায় অপরিবর্তিত ভাবে আজকের সাহিত্যে স্থান পাচ্ছে। আজকের সমাজের সমস্যাও অনেক বেশি জটিলতর, বহুমুখী। বিগত বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পথভ্রষ্ট রক্তক্ষয়ী রাজনীতির কদর্যতা, সামাজিক অবক্ষয়ের নগ্নতা, দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত ও শোষিত মানুষের উৎকেন্দ্রিকতা, বেকারির বিভীষিকা, শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের বীভৎসতা, জেনারেশন গ্যাপের ক্রমিক ব্যাধিক্লিষ্টতা—মোটকথা, ক্ষতবিক্ষত গোটা সমাজের কুৎসিত চেহারাটা আজ সাহিতের দর্পণে প্রতিফলিত।

সমাজ-নিয়ন্ত্রণে সাহিত্য

সাহিত্য মানুষকে সচেতন করে। এতে দ্বিমত নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে বহুবার সাহিত্যকে সমাজের দিশারী হিসেবে দেখা গিয়েছে। ফরাসী সমাজকে একদিন সে যুগের সাহিত্য বিপ্লবের প্রেরণা জুগিয়েছে। রাশিয়ার সাহিত্য সোভিয়েত সমাজকে নাড়া দিয়েছে। আমাদের দেশে, অর্থাৎ ভারতবর্ষে সমাজের ওপরে সাহিত্যের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। রামায়ণ-মহাভারতও যুগ-যুগ ধরে ভারতীয় সমাজকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। বৈদিক সাহিত্যের প্রভাবও সুদূর-প্রসারী। আধুনিক কালে স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে বঙ্কিমের 'আনন্দমঠ' কিংবা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' গোটা সমাজকে উদ্বেলিত করেছে।

সৎ সাহিত্য সৎ সমাজ গড়ে

সমাজের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ঘন-সন্নিবিষ্ট। তাই সাহিত্যের প্রকৃতি সমাজের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। সৎ সাহিত্যের সংজ্ঞা কী তা সঠিক ও নির্দিষ্টভাবে বলা যায় না। কিন্তু সাহিত্যের সৎ চরিত্রের ওপরে যে-সামাজিক চরিত্রের আদর্শ অনেকটা নির্ভরশীল তা স্বীকার করা যেতে পারে।

উপসংহার

তবে এই সঙ্গে এ কথাও স্মরণযোগ্য যে, সমাজই সাহিত্যের মাল-মসলার যোগান দেয়। তাই সমাজের চলমান ও বাস্তব অবস্থার ওপরে সাহিত্যও নির্ভর করে। সাহিত্যের পটভূমি হল সমাজ। সাহিত্যে কেবল গালভরা আদর্শ উচ্চারণ করলে সমাজ বদলায় না। সাহিত্যিক সমাজ-সংস্কারক নয়। সমাজ গঠনের দায়িত্ব শুধু সাহিত্যের নয়, এ দায়িত্ব সকলের।

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায়—

১, সাহিত্যের আদর্শ। ২, সাহিত্যে নীতি।

সমাজ জীবনে শিষ্টাচার ও সৌজন্যের প্রয়োজনীয়তা

(উচ্চ মাধ্যমিক, ত্রিপুরা, ১৯৮৪)

[ভূমিকা—সমাজ ও সৌজন্য—ক্রীড়াঙ্গনে—কর্মস্থলে—ট্রামে বাসে—স্কুলে ও কলেজে—গৃহাঙ্গনে—হাটে বাজারে—সামাজিক উৎসব ও সৌজন্যে—আতিশয্য—প্রীতি ও সৌজন্য—উপসংহার]

ভূমিকা

চরিত্র ও সৌজন্যই মানুষের সব। যে চরিত্রবান যখন সুজন। সুজনের ভাবই সৌজন্য। যে চরিত্রবান সে শিষ্ট, তার আচারই শিষ্টাচার। সৌজন্য ও শিষ্টাচার শব্দটি সংযোগক অব্যয় যোগে সহচর শব্দ হিসেবে ব্যবহার হলেও মূলতঃ শব্দ দুটি সমার্থক। একটা ভালো ছবি তুলতে তাকে আমরা পর্যাপ্ত আলো দিতে যতটা আগ্রহী, সৌজন্য প্রদর্শনেও আমাদের ঠিক ততটাই আগ্রহী হওয়া উচিত।

সমাজ ও সৌজন্য

সমাজজীবনে সৌজন্যই আলো। পরিচিতের সঙ্গে সাক্ষাতে একটি কুশল প্রশ্ন সামান্য হলেও অসামান্য। 'কেমন আছেন' শব্দটাতে আমরা একেবারে কাছাকাছি আসি, অন্তরঙ্গ হই। 'সমাজ' কথাটার অর্থই মিলিত হওয়া, ইংরেজি Society কথাটির মূলে Socia, যার মানে ally অর্থাৎ বন্ধু। বিভিন্নভাষার 'সমাজ' বাচক শব্দ বিশ্লেষণ করলে আমরা এই কাছে থাকা বা অন্তরঙ্গ হওয়ার ভাবটা পাই।

সমাজের কাছে আমরা সবাই ঋণী। পারস্পরিকতাই সমাজের ভিত্তি সৌজন্য বা শিষ্টাচার এই পারস্পরিকতারই দ্যোতক।

ক্রীড়াঙ্গনে

সমাজজীবনের সর্বত্র এই সৌজন্য বিস্তারিত হওয়া চাই। খেলার মাঠকে আমরা শিক্ষার একটি বিশিষ্ট অঙ্গন বলে মনে করি, কিন্তু এই খেলার মাঠে সাধারণ সৌজন্যটুকু আমরা বজায় রাখি কি? বিজেতাকে অভিনন্দন জানানো বিজিতের শিষ্টাচার। কিন্তু বিজিতের আচরণে তা সর্বদা প্রকাশ পায় কি?

কর্মস্থলে

অফিস-আদালতে কর্মীরা সমাজসেবী বৈ তো কিছু নন, কিন্তু তাঁদের আচরণে কি তা প্রকাশিত? যিনি জরুরি কাজে এসেছেন নানা কারণে তাঁর কার্য উদ্ধারে বিলম্ব হতে পারে কিন্তু ঐ শিষ্টাচার বা সৌজন্যটুকু কর্মীদের কাছে পেলে তিনি অনেক ধকল হাসিমুখে সইতে পারেন। ঊর্ধতন কর্মী অধস্তনকে অনেক সময় 'বসুন' না বলেই কাজের কথা বলতে থাকেন। সৌজন্য প্রকাশ করলে কেউ তো কখনও ছোট হয়ে যায় না।

ট্রামে-বাসে

ট্রামেবাসে ভিড়ের মধ্যে গুঁতোগুতি তো অত্যন্ত স্বাভাবিক। একটু 'sorry'-বলা আওয়াজ অনেক উত্তপ্ত আবহাওয়াকে এড়াতে পারে। অথচ সামান্য ব্যাপারে চলন্ত শকট প্রায় কুরুক্ষেত্র হয়ে ওঠে। 'মশাই, ভদ্রতা জানেন না' কথাটা এমন সক্রোধ তারস্বরে উচ্চারিত হয় যে বক্তার ভদ্রতাবোধ সম্বন্ধেই প্রশ্ন উঠতে পারে।

ট্রামেবাসে ছোটোরা সীট্ ছেড়ে বড়োদের বসতে দেবে এই তো স্বাভাবিক। কিন্তু অনেক সময় উপবিষ্ট অল্পবয়সী কারো পাশে পলিতকেশ বৃদ্ধকেও তো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়।

স্কুলে-কলেজে

স্কুলেকলেজে ছাত্রশিক্ষক সম্বন্ধ মধুর হবে এই তো আকাঙ্ক্ষিত। অথচ সামান্য সহিষ্ণুতা আর সৌজন্যের অভাবে তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে বেধে যায় দক্ষযজ্ঞ।

গৃহাঙ্গনে

গৃহের শান্তিও শিষ্টাচার ও সৌজন্যের ওপর নির্ভর করে। বাড়িতে মা কিছুই চান না, শুধু সকলের সেবা করেই তিনি সুখী। চরম অসুস্থতাও তিনি গোপন করে চলেন। ছেলে যদি শুধু জিজ্ঞেস করে, 'মা, তোমার কি শরীর খারাপ?' শুধু এই জিজ্ঞাসাতেই আনন্দে তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হয়। হেসে বলেন, 'না রে, ও কিছু না, একটু মাথা ধরেছে শুধু।' অফিসে যাবার সময় বাবার জুতোটা একটু এগিয়ে দিতে গেলে, তিনি মুখে নিশ্চয় বলবেন, থাক থাক। কিন্তু ঐ টুকুতে তাঁর বুক ভরে যাবে পরিতৃপ্তিতে।

হাটেবাজারে

হাটে বাজারেও ব্যবসায়ীর সাফল্য শুধু তার ব্যবসায়-বুদ্ধিতে নয়, তার সৌজন্য ও শিষ্টাচারে। সৌজন্যে তৃপ্ত হলে লোকে দুটো পয়সা বেশি দিতে কুণ্ঠিত হয় না। মধু যতই ভালো হোক দোকানীর মুখে মধু না থাকলে তার মধু কেউ কেনে না।

সামাজিক উৎসব ও সৌজন্য

সামাজিক উৎসবগুলোতে আমরা সৌজন্যচর্চার সুযোগ পাই। বিজয়া-দশমীতে বা ঈদ উৎসবে অভিবাদন ও আলিঙ্গন আমাদের সামাজিক সম্পর্ককে মধুর করে তোলে। নিমন্ত্রণ বাড়িতে সৌজন্যের অভাবে ভোজ্যের প্রাচুর্য যে ব্যর্থ হয় তা তো আমরা সবাই উপলব্ধি করি।

আতিশয্য

আতিশয্য সব জিনিসেই খারাপ। সৌজন্যেও তাই. সৌজন্যে বাড়াবাড়ি থাকলে তা কৃত্রিম হয়ে পড়ে। নজরুল ইসলামের 'সাহেব ও মোসাহেব' কবিতায় এই আতিশয্যকে কটাক্ষ করা হয়েছে।

প্রীতি ও সৌজন্য

অনেকে বলেন সৌজন্য কৃত্রিম জিনিস, একটা লোক-দেখানো ব্যাপার, তাই তার মূল্য নেই কোনো। এঁদের এ কথার উত্তরে বলতে হয় Habit is second nature. অর্থাৎ অভ্যাস করতে করতেই তা স্বভাবে পরিণত হয়। এটা ঠিক হৃদয়ে প্রীতি না থাকলে বাইরে সৌজন্য ফুটে ওঠে না। এই প্রীতিকেই হৃদয়ে আমন্ত্রণ করতে হবে।

প্রীতিপ্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে

প্রীতিই মানব হৃদয়ের রস। রসের ভারে ফল যেমন নত হয়, প্রীতিতে মানুষ তেমনি

উপসংহার

নম্র হয়, নত হয়।

চিন্তাসহায়ক বাণী

Civility costs nothing but buys everything.
—Lads M. W. Montague (Eng. Poet, 1689—1762)

Nothing is more reasonable and cheap than good manners.
—Anonymous.

ভদ্র হইতে গেলে আলস্য-অবহেলা বিসর্জন করিতে হয়—সর্বদা আপনাকে উন্নত সামাজিক আদর্শের উপযোগী করিয়া প্রস্তুত রাখিতে হয়, নিয়ম স্বীকার করিয়া আত্মবিসর্জন করিতে হয়। —পঞ্চভূত। রবীন্দ্রনাথ।

জাতি-উপজাতি জীবনে সংস্কৃতির প্রভাব

[ভূমিকা—সংস্কৃতি কী—ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির মিশ্র সংহতি—উপজাতিদের পূজা-পার্বণ—বাঙালীদের পূজা-পার্বণ—উভয় জনগোষ্ঠীর সাধারণ পূজা-উৎসব-মেলা—হোলি উৎসব—মিশ্র সংস্কৃতি রক্ষার উপায়—উপসংহার।]

ভূমিকা

ইংরাজী 'কালচার' কথাটার প্রতিশব্দ হলেও 'সংস্কৃতি' আরও ব্যাপক। সংস্কৃতিবান শিক্ষিত লোকের কাছে ধর্ম-দর্শন-রীতিনীতি-ভাষা-সাহিত্যই সংস্কৃতি। অপর পক্ষে সাধারণ লোকের কাছে ধর্মই সংস্কৃতি। প্রকৃতপক্ষে ধর্ম-শিক্ষা-সাহিত্য কোনোটাই সংস্কৃতির উদ্দেশ্য নয়—সংস্কৃতি অর্জনের অবলম্বন মাত্র।

সংস্কৃতি কী

সমাজজীবনের চিৎপ্রকর্ষের ব্যঞ্জনাময় সমন্বিত ফলই হল সংস্কৃতি। ব্যক্তিমনুষ্যত্বের একক বিকাশের মাধ্যমে সমাজ-মনুষ্যত্বের তথা জাতীয় জীবনের উন্মেষের ফলশ্রুতিই সংস্কৃতি। লোকজীবন থেকে উদ্ভূত বহুযুগের সামাজিক রীতিনীতি জীবন ও ধর্মীয় অনুশীলন, শিল্প-সাহিত্য, উৎসব, মেলা-পার্বণ অনুষ্ঠানে পুনঃপৌনিক কর্ষণে প্রকাশিত সামগ্রিক মানসিকতাকেই লোকসংস্কৃতি আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা আর পার্বত্য জনজীবন আরণ্যক ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য এনে দিয়েছে। মহাভারতীয় আর্যযুগে যে-সংস্কৃতির বিকাশ, নানা ঐতিহাসিক পথ পরিক্রমার মধ্য দিয়ে তার ধারাবাহিকতা চলে এসেছে বর্তমান রূপে। আদিবাসী অধ্যুষিত

লোকসংস্কৃতির মূলধারার সঙ্গে পূর্ববাংলা থেকে উৎখাত জনজীবনের সংস্কৃতিও কালে কালে যুক্ত হয়েছে। রাজানুকূল্যে বঙ্গসংস্কৃতি বহু পূর্বেই ত্রিপুরা আঙিনায় সমাদৃত। এ দেশীয় মুদ্রায় বাংলাভাষার রাজকীয় মর্যাদা দেখে বিদ্যাসাগর মুগ্ধ হয়েছিলেন। গোমতী-লংগাই-মহুরীর জলধারার সঙ্গে পদ্মা-মেঘনা-ধলেশ্বরীর ধারা মিশে একাকার হয়ে গেছে এই ত্রিপুরায়। জাতি-উপজাতি সমবায়ে এক বৈচিত্র্যময় বিমিশ্র সংস্কৃতি এ রাজ্যের বৈশিষ্ট্য। ত্রিপুরার জনমানসে নিত্য মুখরিত হয়ে চলেছে উভয় ধারায় এক বিচিত্র লোকসংস্কৃতি। এখানে যেমন ত্রিপুরী-হালাম-লুসাই-রিয়াং উপজাতীয় জনগোষ্ঠীর স্বতন্ত্র পূজা-পার্বণ ও নৃত্যগীত নিত্য প্রবহমান, তেমনি বঙ্গসংস্কৃতির বার মাসে তের পার্বণও সমানভাবেই বর্তমান। এক কথায় ত্রিপুরার সংস্কৃতি মিশ্র। লোকসংস্কৃতি গতিশীল। নানাভাবে নানাকালে তার রূপান্তর ঘটে। একটা জাতির মূল বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে অপরাপর সংস্কৃতির সঙ্গে তার সমন্বয় সাধনের মাধ্যমেই তার পরিপুষ্টি লাভ ঘটে। আর্যসংস্কৃতির ধারায় পরিপুষ্ট বাঙালীর নিজস্ব বেশভূষা আচার-আচরণ, খাদ্যপ্রণালী, পূজাসাধন, পলি মাটির দেশের স্বাতন্ত্র্য, পার্বত্য ত্রিপুরার খণ্ডজাতি গোষ্ঠীর বেশভূষা, আচার-আচরণ, খাদ্যপ্রণালী, পূজা-উৎসব পাহাড়ী পরিবেশে এসে পরিবর্তিত হয়েছে অনেকাংশে। আবার এই উন্নত ধারার সংস্কৃতির প্রভাবে এসে নিজস্ব ধারা বজায় রেখেও চাকমা, হালাম, ত্রিপুরী, লুসাই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতেও নতুন ধারায় অনেক কিছু সংযোজিত হয়েছে। এই উভয় সম্প্রদায়েই সংস্কৃতির আত্মীকরণ যত সফল হবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন তত দৃঢ় হবে।

ত্রিপুরার জাতি-উপজাতির মিশ্র সংস্কৃতি

জুমনির্ভর ত্রিপুরার পাহাড়ী সভ্যতা। বৃষ্টির আনুকূল্যে পাহাড়ী ঢালে ফসলের প্রাচুর্য ছিল এককালে। অরণ্যপ্রকৃতি-নির্ভর বলে তাদের সংস্কৃতিতেও প্রকৃতির প্রভাব বেশি। জুমচাষের প্রস্তুতি পর্বে অথবা উৎপন্ন ফসল পাহারা দেবার সময় নয়তো নবান্নের সময় তারা নিজেদের হাতে তৈরি বাঁশের বাঁশি বা সামু, সারিন্দা বাজিয়ে 'কলতাইমা' গান পরিবেশন করত। প্রত্যেক জাতি-উপজাতির জাতীয় উৎসব নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে ঘিরেই গড়ে উঠে। ত্রিপুরী, জমাতিয়া, নোয়াতিয়া, রিয়াংগোষ্ঠীর নিজস্ব সংস্কৃতির পূজা হল গড়িয়া পূজা। বৈশাখ মাসের সাত তারিখে এ পূজা হয়। সারা বছরের সুখসমৃদ্ধি ও শান্তি প্রার্থনা করাই এ পূজার লক্ষ্য। সম্প্রদায় ভেদে পূজার পদ্ধতিগত পার্থক্য থাকলেও উপজাতিদের এক মহান গৌরবময় পূজা উৎসব হল 'গড়িয়া'। গড়িয়া চৈত্র সংক্রান্তি থেকে আরম্ভ হয় বলে শিবপূজা বলা হয়। মতান্তরে এই পূজাকে গণেশ পূজাও বলা হয়। সাত-দিন ধরে এই উৎসবে স্ত্রী-পুরুষ-নির্বিশেষে নাচে-গানে যোগ দেয়। পুরুষ-পাখি, বিশেষ করে মোরগ বলি এই পূজার অঙ্গ। এই পূজা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া; ইচ্ছে করলেই নতুন করে দেওয়া যায় না।

উপজাতিদের পূজা-পার্বণ

আদিবাসীদের মধ্যে গড়িয়া পূজা ছাড়া শিবচতুর্দশী, চতুর্দশদেবতা, গঙ্গাপূজা, খারচী ও কেরপূজা হয়ে থাকে। চার-পাঁচটি গ্রামের আদিবাসীরা চাঁদা করে মার্চ-এপ্রিল মাসে

যে-পূজাটি করে থাকে তা হল গঙ্গাপূজা। নদীর মাঝখানে বাঁশ পুতে এই পূজায় পশু বলি দিয়ে তারা সংক্রামক ব্যাধি থেকে পরিত্রাণের জন্য দেবতার কাছে প্রার্থনা জানায়। এই পূজায় অনেকগুলি গ্রাম মিলিত হয়ে মেলা উৎসবে মেতে উঠে।

বাঙালীদের পূজা-পার্বণ

এছাড়া রয়েছে লেবিং বুমানি নৃত্য। গড়িয়া পূজার পর মনসুনের অপেক্ষায় উপজাতীয়দের কিছুদিন কেটে যায়। এসময় রঙীন একধরনের কীট পাহাড়ের উপর বিচরণ করতে থাকে। লেবাং নামে এই পোকারা পাহাড়ের ঢালে বীজ খুঁজতে থাকে। উপজাতীয় যুবক-যুবতীরা দুটি বাঁশের টুকরার সাহায্যে অদ্ভুত শব্দ করে নাচতে থাকে। লেবাং পোকারা এই শব্দে আকৃষ্ট হয়ে বেরিয়ে আসে। এইভাবে তারা ফসল রক্ষার জন্য যে নৃত্য-গীত করে থাকে তাকে লেবাং বুমানি নৃত্য বলে।

আজ জুমচাষ কমে এলেও আদিবাসী সমাজে জুমসংস্কৃতি অনেক গভীরে প্রবেশ করেছে। তাদের মনে অতীত স্মৃতির রোমন্থনে জুমসংস্কৃতির প্রভাব সক্রিয়।

লুসাইদের মধ্যে চেরাও নৃত্য পরলোক বিশ্বাসের উপর প্রতিষ্ঠিত। জম্পুই-এর ৩০০০ হাজার ফুট শীর্ষে বসবাসকারী এই জাতির বিশ্বাস মৃত্যুর পর মানুষ স্বর্গে যায়। গর্ভবতী নারীর মৃত্যু হলে স্বর্গে যেতে অসুবিধা হবে এই ধারণা থেকে সন্তানসম্ভবা নারীর মঙ্গলকামনায় রাতভর লুসাইরা চেরাও নৃত্য পরিবেশন করে থাকে। বৌদ্ধধর্মাবলম্বী চাকমাদের চৈত্রসংক্রান্তি বা বিজু উৎসবও এই সঙ্গে মনে করতে হয়। নাচ-গানের মধ্য দিয়ে এ উৎসবে পুরনোকে বিদায় এবং নতুনকে আহ্বান করা হয়।

উভয় জনগোষ্ঠীর সাধারণ পূজা-উৎসব-মেলা

এবার কতকগুলি উৎসবের বা মেলার উল্লেখ করতে হয় যেগুলি উপজাতি সম্প্রদায়ের হয়েও খণ্ড উপজাতিদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। খারচী পূজা এদের মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয়। আগরতলার অদূরে কৃষ্ণমাণিক্যের রাজধানী পুরানো হাবেলিতে চতুর্দশ দেবতার পূজাই খারচি পূজা নামে খ্যাত। প্রতি বৎসর জুলাই মাসে সাতদিন ধরে এই উৎসবে জাতি ও উপজাতি উভয় সম্প্রদায়ের লোক সমবেত হয়। খারচির পনের দিন পর পরিপূরক উৎসব হয় কের পূজা।

গোমতী নদীর উৎসমুখ ডম্বুরের পৌষসংক্রান্তির উৎসবটিও সার্বজনীন। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির সাগরমেলার মত এখানেও সারা রাজ্যের লোক সমাগম হয়। অনুরূপ আর একটি মেলা বসে চৈত্রমাসের অশোকাষ্টমীতে কৈলাশহরের ঊনকোটি পাহাড়ে। এটি উভয় সম্প্রদায়ের জনপ্রিয় উৎসব। পাথরে খোদাই-করা অসংখ্য দেবদেবীর মূর্তিকে ঘিরে সেদিন মেলা বসে।

উপজাতিদের উৎসবে যেমন বাঙালী সমাজ মেতে উঠে তেমনি বাঙালী সমাজের দোল-দুর্গোৎসবে উপজাতিরাও মেতে উঠে। বাঙালীর বারমাসে তের পার্বণও আজ উপজাতিদের ঘরে ঘরে পালিত হয়। এ ভাবেই ত্রিপুরার মিশ্র সংস্কৃতি ধারা চলে আসছে।

অতি সামান্য হলেও ভারতীয় সংস্কৃতির ধারায় ত্রিপুরার হোলি উৎসবে ঐতিহ্যের

সংযোজন রয়েছে। অনাদি অতীত থেকে রাজতন্ত্রের ছত্রছায়ায় সাহিত্য সংস্কৃতি পুষ্টি লাভ করেছে এখানে। হোলি উৎসবকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরার সঙ্গীত-সাহিত্য-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। মহারাজা স্বয়ং হোলির গান রচনা করতেন। রাজধানী আগরতলা ফাগুয়ায় মেতে উঠত। জাতি-উপজাতি সকলেই এই উৎসবে যোগ দিত। প্রকৃতির লীলাভূমি ত্রিপুরা। প্রকৃতির সজীবতাকে জীবনের রঙে মিশিয়ে ত্রিপুরার অধিবাসীরা ভাবে মশগুল হয়ে যায়। হোলির দিনে রঙে রঙে লাল হয়ে বাঁশী বাজিয়ে তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। রাজধানীতেই হোলি উৎসব সীমাবদ্ধ নয়। বাইরেও এর প্রভাব পড়েছিল উপজাতি সংস্কৃতিতে। জমাতিয়া সংস্কৃতিতে দোল ও হোলি উৎসবের প্রভাব অপরিসীম।

হোলি উৎসব

ত্রিপুরার সংস্কৃতি বলতে তাই আজ ত্রিপুরী, রিয়াং, লুসাই, হালাম ও চাকমা উপজাতিদের লোকসংস্কৃতিকে যেমন বুঝায় তেমনি সমতলবাসীদের সংস্কৃতিকেও বুঝায়। এই মিশ্র সংস্কৃতিকে রক্ষা করতে হলে একদিকে উপজাতিদের স্বাতন্ত্র্যকে যেমন রক্ষা করতে হবে সেই সঙ্গে তাদের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের ধর্ম ও সংস্কৃতির কথাগুলোকে সুন্দর ও সহজবোধ্য করে তুলে ধরতে হবে। তাছাড়া এত সুন্দর লোকসংস্কৃতির ধারক যে-সকল খণ্ড জাতির তাদের মধ্যেও রয়েছে কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস। ওদের কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাস থেকে রক্ষা করতে হবে। পাশাপাশি ওদের অর্থ নৈতিক সঙ্কট মোচনেও এগিয়ে আসতে হবে। এটি অবশ্য সরকারের কর্তব্য। জাতি ও উপজাতির মধ্যে স্বাভাবিক মিলনের এবং সংস্কৃতি বিনিময়ের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। তবেই জাতি-উপজাতির মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন সুদৃঢ় হবে।

মিশ্র সংস্কৃতি রক্ষার উপায়

ত্রিপুরার পাহাড়ে প্রান্তরে অরণ্য কান্তারে নদীর জলধারায় ডম্বুরের উচ্ছলতায় বহু বিচিত্র সংস্কৃতির অপরূপ প্রকাশ। বাঙালী সংস্কৃতি ধারার পাশাপাশি উপজাতির লোক-সংস্কৃতির ধারা প্রবহমাণ। মাঝে মাঝে এই মিশ্র সংস্কৃতির শান্ত প্রবহমানতায়ও সংশয় দেখা যায়। বার বার রাজনৈতিক, অর্থ নৈতিক ও ধর্মীয় সঙ্কটের সৃষ্টি হলে এই মিশ্র সংস্কৃতির উপর আঘাত আসে। এই সঙ্কট সংশয় কাটিয়ে উঠে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে সম্পর্ক স্থাপিত করে সংস্কৃতির ধারাকে সজীব রাখতে হবে। একথা স্মরণযোগ্য যে, যে-কোন মূল্যে ত্রিপুরার সংস্কৃতিকে পরি-পুষ্ট ও সমুন্নত করতে হবে, কারণ সংস্কৃতিই মানুষে-মানুষে জাতিতে-উপজাতিতে মিলন ঘটাতে পারে, ভেদ বিরোধের অবসান ঘটাতে পারে।

উপসংহার

অনুরূপভাবে লেখা যায়:—

(ক) ত্রিপুরায় সংস্কৃতি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। (খ) মিশ্র সংস্কৃতিই ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধি এনে দেবে।

নগরজীবন ও পল্লীজীবন

ভূমিকা—ইতিহাস—পল্লী ও নগর—একালের চিত্র—উপসংহার]

ভূমিকা

কথায় বলে, দেবতা সৃষ্টি করেছেন গ্রাম, আর মানুষ সৃষ্টি করেছে নগর। পল্লী-জীবনের উদারতা এবং সরলতার পাশে নগরজীবন হল মানুষের কৃত্রিম যোজনা। কোন্ সেই স্মরণাতীত কালে সৃষ্টি হয়েছে পল্লী, তার মাঠ-ঘাট, বন-প্রান্তর সবই যেন সমুদ্র-পর্বতের মতো আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছে। আর মানুষ তিল তিল করে গড়েছে নগর। তাই নগর হল মানুষের হৃদয়ের তিলোত্তমা মূর্তি।

ইতিহাস

কৃষিভিত্তিক পল্লীকে কেন্দ্র করেই প্রথম মানুষের সভ্যতার বিকাশ। পল্লী হল মানুষের আদি জননী। সেখানে মানুষ কৃষির সঙ্গে সঙ্গে সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করেছিল কুটিরশিল্পকে। এখানেই অনাড়ম্বর জীবনের অবকাশে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন ভারতের রাজারা থাকতেন রাজধানীতে, কিন্তু পল্লীকে তাঁরা ভুলে থাকতেন না। তাই পল্লী ছিল প্রাচীন-কালে রাজাদের শক্তির উৎস, চিত্তের বিশ্রাম। গ্রাম-শহরে নির্মিত হয়েছিল এক মিলন-সেতু। মুসলমান শাসন-কালে নগরজীবনের তুলনায় পল্লীজীবন হয়েছে উপেক্ষিত। তারপর বণিকের মানদণ্ড যেদিন থেকে রাজদণ্ড রূপে দেখা দিল, তখনই বিদেশী শাসকদের শোষণ-শাসনের যন্ত্রে গ্রামগুলি হয়ে উঠল আরও হতশ্রী। নীলকর অত্যাচার, জমিদারী প্রথার পত্তন, পশ্চিমে শিল্পবিপ্লব প্রভৃতি গ্রামীণ সভ্যতাকে নগরমুখী করেছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে আমাদের পল্লীর কুটিরশিল্প গিয়েছে বন্ধ হয়ে। তখন নিরন্ন শ্রমিক শহরে এসে ভিড় করেছে চাকরির আশায়। এইভাবে গ্রামীণ জীবনের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নগরজীবনও হয়ে উঠেছে জটিল ও শ্রীহীন।

পল্লী ও নগর

পল্লী হল অনন্ত সৌন্দর্যের আলয়। তার আকাশ-বাতাস-জল-মাটি-আলো-হাওয়া পল্লীবাসীর হৃদয়ে বাঁশি বাজাত। ছিল গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, পুকুরভরা মাছ—এক কথায় সম্পদের প্রাচুর্য। একদিকে প্রাচুর্য অন্যদিকে অনন্ত সৌন্দর্য, অবসর-অবকাশ পল্লীর মানুষকে শিল্প-সাহিত্য রচনার প্রেরণা দিয়ে এসেছে। তারা রচনা করেছে মঙ্গলকাব্য, পদাবলী, বাউল, ভাটিয়ালী। কিন্তু অত্যাচারী শাসকের শোষণযন্ত্রে গ্রাম হয়ে উঠল শ্মশান—যে গ্রামবাংলার রূপ আঁকতে গিয়ে কবি সুকান্ত বললেন :

> "এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি
> নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি .
> কোথাও নেইকো পার
> মারী ও মড়ক, মন্বন্তর ঘন ঘন বন্যার
> আঘাতে আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
> এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল।"

অন্যদিকে নগর হয়ে উঠল আধুনিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। এখানে স্থাপিত হল

অফিস, আদালত, কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল। সর্বরিক্ত পল্লীর মানুষ ছুটে এল অন্নের আশায় চাকরির আশায়, এই সব নগরের দিকে। যে-নগর সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র, যে-নগর গড়ে উঠেছে বিপুল বৈভবে, সেখানেই তৈরি হতে লাগল শ্রমিকের ছাপরার ঘর—অন্ধকূপ। আলোর পাশে অন্ধকারের মতো এখানে স্পষ্ট বৈষম্য চোখে পড়ে। একদিকে বৈভব, অন্যদিকে রিক্ততা।

স্বাধীন ভারতে ধীরে ধীরে গ্রাম-শহরের এই নিদারুণ বৈষম্যকে কমিয়ে আনার কিছুটা চেষ্টা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামোন্নয়ন, কৃষিসংস্কার এবং কুটিরশিল্পের উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পল্লীর কৃষি ও কৃষকের উন্নতি বিধানের জন্যেও গৃহীত হয়েছে নানা ব্যবস্থা। এক কথায় বলা চলে, পূর্বের সেই শ্রীহীনতার ছবি পল্লীজীবনের বুকে আজ আর ততটা লেগে নেই। গ্রামেও স্থাপিত হয়েছে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-হেল্‌থসেণ্টার-পোস্টঅফিস। পল্লী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহও বেড়েছে।

একালের চিত্র

কৃষির উন্নতির পাশে কুটিরশিল্পেরও উন্নতি হয়েছে। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তিকেও কিছুটা কাজে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু পল্লীর শিক্ষিত ছেলেরা আজ আর গ্রামে বাস করতে চায় না, চায় না পৈতৃক পেশাকে গ্রহণ করতে। অন্যদিকে নগরজীবন আজ যন্ত্রণাদগ্ধ সমস্যাসঙ্কুল। তার নানা সমস্যা—বাসস্থানের, পথঘাটের, যানবাহনের, আলো-হাওয়ার, বিদ্যুতের। সর্বোপরি বেকারসমস্যা ও জনসমস্যা তো আছেই। তবু নগরজীবন মানুষকে গ্রাম ছেড়ে আসবার জন্যে হাতছানি দেয়।

কবি বলেছেন, 'ফিরে চল মাটির টানে যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।' কবির সঙ্গে আমরা একমত। গ্রামকে অবজ্ঞা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। সেই সঙ্গে শহরকেও থাকতে হবে গতিচঞ্চল শক্তির উৎস হয়ে। এই ভাবে শহর ও গ্রাম হাতে হাত মিলিয়ে অগ্রসর হলে তবেই আসবে আমাদের সার্বিক উন্নতি।

উপসংহার

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায়—পল্লীজীবনের সুখদুঃখ।

চিন্তাসহায়ক বাণী

চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি—
সেই তো নগরী। —রবীন্দ্রনাথ

If country life be healthful to the body, it is no less so to the mind.

—Giovanni Ruffini

(1807-1881) Italian author in England

নগরজীবন ও পল্লীজীবন

ভূমিকা—ইতিহাস—পল্লী ও নগর—একালের চিত্র—উপসংহার]

কথায় বলে, দেবতা সৃষ্টি করেছেন গ্রাম, আর মানুষ সৃষ্টি করেছে নগর। পল্লী-জীবনের উদারতা এবং সরলতার পাশে নগরজীবন হল মানুষের কৃত্রিম যোজনা। কোন্ সেই স্মরণাতীত কালে সৃষ্টি হয়েছে পল্লী, তার মাঠ-ঘাট, বন-প্রান্তর সবই যেন সমুদ্র-পর্বতের মতো আপনাতে আপনি বিকশিত হয়ে উঠেছে। আর মানুষ তিল তিল করে গড়েছে নগর। তাই নগর হল মানুষের হৃদয়ের তিলোত্তমা মূর্তি।

ভূমিকা

কৃষিভিত্তিক পল্লীকে কেন্দ্র করেই প্রথম মানুষের সভ্যতার বিকাশ। পল্লী হল মানুষের আদি জননী। সেখানে মানুষ কৃষির সঙ্গে সঙ্গে সহযোগী হিসাবে গ্রহণ করেছিল কুটিরশিল্পকে। এখানেই অনাড়ম্বর জীবনের অবকাশে শিল্প-সাহিত্য-সঙ্গীতের সৃষ্টি হয়েছে। প্রাচীন ভারতের রাজারা থাকতেন রাজধানীতে, কিন্তু পল্লীকে তাঁরা ভুলে থাকতেন না। তাই পল্লী ছিল প্রাচীন-কালে রাজাদের শক্তির উৎস, চিত্তের বিশ্রাম। গ্রাম-শহরে নির্মিত হয়েছিল এক মিলন-সেতু। মুসলমান শাসন-কালে নগরজীবনের তুলনায় পল্লীজীবন হয়েছে উপেক্ষিত। তারপর বণিকের মানদণ্ড যেদিন থেকে রাজদণ্ড রূপে দেখা দিল, তখনই বিদেশী শাসকদের শোষণ-শাসনের যন্ত্রে গ্রামগুলি হয়ে উঠল আরও হতশ্রী। নীলকর অত্যাচার, জমিদারী প্রথার পত্তন, পশ্চিমে শিল্পবিপ্লব প্রভৃতি গ্রামীণ সভ্যতাকে নগরমুখী করেছে। শিল্প বিপ্লবের ফলে আমাদের পল্লীর কুটিরশিল্প গিয়েছে বন্ধ হয়ে। তখন নিরন্ন শ্রমিক শহরে এসে ভিড় করেছে চাকরির আশায়। এইভাবে গ্রামীণ জীবনের অবক্ষয়ের সঙ্গে সঙ্গে নগরজীবনও হয়ে উঠেছে জটিল ও শ্রীহীন।

ইতিহাস

পল্লী হল অনন্ত সৌন্দর্যের আলয়। তার আকাশ-বাতাস-জল-মাটি-আলো-হাওয়া পল্লীবাসীর হৃদয়ে বাঁশি বাজাত। ছিল গোলা-ভরা ধান, গোয়াল-ভরা গরু, পুকুরভরা মাছ—এক কথায় সম্পদের প্রাচুর্য। একদিকে প্রাচুর্য অন্যদিকে অনন্ত সৌন্দর্য, অবসর-অবকাশ পল্লীর মানুষকে শিল্প-সাহিত্য রচনার প্রেরণা দিয়ে এসেছে। তারা রচনা করেছে মঙ্গলকাব্য, পদাবলী, বাউল, ভাটিয়ালী। কিন্তু অত্যাচারী শাসকের শোষণযন্ত্রে গ্রাম হয়ে উঠল শ্মশান—যে গ্রামবাংলার রূপ আঁকতে গিয়ে কবি সুকান্ত বললেন :

পল্লী ও নগর

"এই যে আকাশ, দিগন্ত, মাঠ, স্বপ্নে সবুজ মাটি
নীরবে মৃত্যু গেড়েছে এখানে ঘাঁটি .
কোথাও নেইকো পার
মারী ও মড়ক, মন্বন্তর ঘন ঘন বন্যার
আঘাতে আঘাতে ছিন্ন-ভিন্ন ভাঙা নৌকার পাল,
এখানে চরম দুঃখ কেটেছে সর্বনাশের খাল।"

অন্যদিকে নগর হয়ে উঠল আধুনিক সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র। এখানে স্থাপিত হল

অফিস, আদালত, কল-কারখানা, স্কুল-কলেজ, হাসপাতাল। সর্বরিক্ত পল্লীর মানুষ ছুটে এল অন্নের আশায় চাকরির আশায়, এই সব নগরের দিকে। যে-নগর সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র, যে-নগর গড়ে উঠেছে বিপুল বৈভবে, সেখানেই তৈরি হতে লাগল শ্রমিকের ছাপরার ঘর—অন্ধকূপ। আলোর পাশে অন্ধকারের মতো এখানে স্পষ্ট বৈষম্য চোখে পড়ে। একদিকে বৈভব, অন্যদিকে রিক্ততা।

স্বাধীন ভারতে ধীরে ধীরে গ্রাম-শহরের এই নিদারুণ বৈষম্যকে কমিয়ে আনার কিছুটা চেষ্টা হয়েছে। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় গ্রামোন্নয়ন, কৃষিসংস্কার এবং কুটিরশিল্পের উন্নতির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। পল্লীর কৃষি ও কৃষকের উন্নতি বিধানের জন্যেও গৃহীত হয়েছে নানা ব্যবস্থা। এক কথায় বলা চলে, পূর্বের সেই শ্রীহীনতার ছবি পল্লীজীবনের বুকে আজ আর ততটা লেগে নেই। গ্রামেও স্থাপিত হয়েছে বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-হেল্‌থসেণ্টার-পোস্টঅফিস। পল্লী অঞ্চলের মানুষের মধ্যে শিক্ষার আগ্রহও বেড়েছে।

একালের চিত্র

কৃষির উন্নতির পাশে কুটিরশিল্পেরও উন্নতি হয়েছে। সেই সঙ্গে বিদ্যুৎশক্তিকেও কিছুটা কাজে লাগানো হচ্ছে। কিন্তু পল্লীর শিক্ষিত ছেলেরা আজ আর গ্রামে বাস করতে চায় না, চায় না পৈতৃক পেশাকে গ্রহণ করতে। অন্যদিকে নগরজীবন আজ যন্ত্রণাদগ্ধ সমস্যাসঙ্কুল। তার নানা সমস্যা—বাসস্থানের, পথঘাটের, যানবাহনের, আলো-হাওয়ার, বিদ্যুতের। সর্বোপরি বেকারসমস্যা ও জনসমস্যা তো আছেই। তবু নগরজীবন মানুষকে গ্রাম ছেড়ে আসবার জন্যে হাতছানি দেয়।

কবি বলেছেন, 'ফিরে চল মাটির টানে যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে।' কবির সঙ্গে আমরা একমত। গ্রামকে অবজ্ঞা করলে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। সেই সঙ্গে শহরকেও থাকতে হবে গতিচঞ্চল শক্তির উৎস হয়ে। এই ভাবে শহর ও গ্রাম হাতে হাত মিলিয়ে অগ্রসর হলে তবেই আসবে আমাদের সার্বিক উন্নতি।

উপসংহার

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায়—পল্লীজীবনের সুখদুঃখ।

চিন্তাসহায়ক বাণী

চিত্তের কঠিন চেষ্টা বস্তুরূপে
স্তূপে স্তূপে
উঠিতেছে ভরি—
সেই তো নগরী। —রবীন্দ্রনাথ

If country life be healthful to the body, it is no less so to the mind.

—Giovanni Ruffini

(1807-1881) Italian author in England

The city is the epitome of the social world.—Edwin Hubbel Chapin.

There is hardly one in three of us who live in the cities who is not sick with unused self—Ben Hecht (1894—1964) American author

সমাজ-জীবনে দুর্নীতি ও মানবতাবোধ

[ভূমিকা—সমাজে দুর্নীতির উৎস ও প্রভাব—সমাজ-জীবনের মানবতাবোধ, উন্মেষ ও প্রভাব—মানবতাবোধের প্রসার ও দুর্নীতির ধ্বংস]

ভূমিকা

সমাজ-জীবনে দুটি পরস্পরবিরোধী প্রবণতা যে-কোনো সমাজতাত্ত্বিক বা সূক্ষ্মদর্শীর দৃষ্টি এড়ায় না। এর মধ্যে একটি, সামাজিক মানুষের হীন দুর্নীতি, আর একটি, সমুচ্চ মানবতাবোধ। এ যেন পৃথিবীর বুকে ঘনান্ধকার রাত্রি ও সূর্যালোকিত দিন। একদিকে বিবেকহীন দুর্নীতির প্রভাবে সমাজদেহ পচে-গলে ক্ষয়িষ্ণুতার চরম সীমায় উপনীত হচ্ছে, আর একদিকে এক শ্রেণীর বিবেকী মানুষের আন্তরিক মানবতা বোধের সক্রিয় অভিব্যক্তিতে সেই জীর্ণ সমাজের পুনরুজ্জীবন ঘটছে। বস্তুতপক্ষে এই অবক্ষয়ের পর নতুনের সৃষ্টি না হলে মনুষ্যসমাজের বহু পূর্বেই বিলুপ্তি ঘটত।

সমাজে দুর্নীতির উৎস ও প্রভাব

ঈশ্বর মানুষের মধ্যে দু'টি বিরোধী প্রবৃত্তির সৃষ্টি করে দিয়েছেন—সু এবং কু। সু-প্রবৃত্তি মানুষের মনে সৎ-ভাবের জন্ম দিয়ে মানুষকে ব্যক্তি এবং সমাজের কল্যাণজনক কাজে উদ্বুদ্ধ করে, অপর পক্ষে কু-প্রবৃত্তি মানুষের মনে অসৎ ভাবের সঞ্চার ঘটিয়ে মানুষকে সমাজপরিপন্থী অশুভ কাজের দিকে দুর্নিবার বেগে আকর্ষণ করে। বস্তুতপক্ষে মানুষের দুর্নীতিমূলক সমস্ত কাজের উৎস এই কু-প্রবৃত্তি।

সু-প্রবৃত্তির মতো কু-প্রবৃত্তিও মানুষের সহজাত। নিরন্তর অনুশীলনের সাহায্যে মানুষ কু-প্রবৃত্তিমুক্ত হয়ে সমাজকল্যাণমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারে। কিন্তু সমাজে দুর্নীতিমূলক কাজের প্রলোভন এত বেশি এবং এ ধরনের কাজ এত লাভজনক যে মানুষ সাধারণত অনুশীলনের সাহায্যে কু-প্রবৃত্তিমুক্ত হয়ে দুর্নীতিমূলক কাজ থেকে বিরত হতে চায় না। সরকারী-বেসরকারী কাজে হোক, শিল্প-বাণিজ্য জগতে হোক, যেখানেই মানুষ ক্ষমতার অধিকারী সেখানেই সে দুর্নীতির দ্বারা সহজেই প্রভাবিত হয়। বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী কাজে নিযুক্ত কিংবা শিল্প-বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত শুধুমাত্র মধ্য বা নিম্ন স্তরের কর্মীরা নয়, উচ্চ স্তরের কর্মীরাও দুর্নীতির দুরতিক্রম্য প্রভাবে কিভাবে সমাজবিরোধী কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে, তার বহু উদাহরণ আমরা প্রতিদিনই সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় দেখতে পাই। আজ অসৎ-প্রবৃত্তির এক শ্রেণীর মানুষের দুর্নীতি বাস্তব জীবন

ধারণের ক্ষেত্রে সমাজ-জীবনকে কী দুর্বিষহ পরিণতির সম্মুখীন করেছে—তা যে-কোনো চক্ষুষ্মান মানুষের অগোচর নয়। এই সমাজে দুর্নীতির প্রভাব এত বিষাক্ত এবং সুদূর-প্রসারী যে তা নির্দিষ্ট সময়-সীমায় সীমিত না থেকে বংশানুক্রমে বিস্তৃতি লাভ করে, এবং সমাজের প্রাণসম্পদ বিনষ্ট করে সামাজিক মানুষকে অবক্ষয়ের চরমসীমায় পৌছিয়ে দেয়। এই পরিণতি এত ভয়াবহ যে, এর থেকে দুর্নীতিমুক্ত সৎ-জীবনে প্রত্যাবর্তন সহজ হয় না। আমাদের সমাজ-জীবন যে আজ মূল্যবিহীনতার শিকার—এ তো আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের অভিজ্ঞতা।

সমাজ-জীবনের মানবতাবোধ, উন্মেষ ও প্রভাব

মানবতাবোধের উৎস মানুষের সৎ-প্রবৃত্তি এবং এ পর্যায়ের বৃত্তির উন্মেষও অনুশীলন-সাপেক্ষ। সদ্গ্রন্থপাঠ, সৎ মানুষের সাহচর্য, সমাজ-জীবনের উত্থান-পতনের মূল কারণের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচিতি মানুষের মনে সৎ প্রবৃত্তির উদ্বোধক। এই জগতে সৎ প্রবৃত্তিই মানুষের মনে মানবতাবোধের মহত্তর আদর্শ সঞ্চার করে। মানুষের সৎ প্রবৃত্তি যদি আন্তরিক উপলব্ধিজাত হয়, তবে তার মানবতাবোধেও এমন বেগ ও বলিষ্ঠতা আসে—যার সাহায্যে সে সমস্ত বিরোধী শক্তিকে উন্মূলিত করতে সমর্থ হয়। এই বলিষ্ঠ মানবিকতা-বোধের উৎস অবশ্য একটি সমুচ্চ মানব-নীতিবোধ—যার প্রভাবে সমাজকল্যাণমূলক কাজের প্রসার ঘটে।

পৃথিবীর যে-সমস্ত মানবতাবাদী মহাপুরুষ মানবমুক্তির জন্যে আজীবন সংগ্রাম করেছেন, তাঁদের মানবতাবাদের প্রথম উন্মেষ ঘটে সমাজ-মুক্তির প্রেরণায়। নানা কুসংস্কারে অন্ধ স্বীয় সমাজে মানুষকে পরম মঙ্গলময় 'এক' ঈশ্বরের প্রতি অনুরক্ত এবং মানবপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করবার প্রেরণাই যীশুখ্রীস্টকে মর্মান্তিক পরিণতির সম্মুখীন করে। মহামানব বুদ্ধদেবও মানবতাবাদী জীবনবোধের প্রেরণায় স্ব-যুগের এবং স্ব-সমাজের যুক্তিহীন আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে প্রেম, মৈত্রী এবং করুণার বাণী প্রচার করেন। মানবপ্রেমশূন্য আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে মহাপুরুষ চৈতন্য-দেব যে মানবতার বাণী প্রচার করেন, তা শুধু স্ব-যুগের সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত করে নি—তাঁর মানবতাবোধ অন্তর্গূঢ় ভাবধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত বলে এ যুগে তা সমগ্র বিশ্বে প্রসার-লাভ করেছে।

মানবতাবোধের প্রসার ও দুর্নীতির ধ্বংস

সমাজ-জীবনে যে-পরিমাণে মানবতাবোধের প্রসার হবে, সে পরিমাণে দুর্নীতিরও ধ্বংস হবে। এটাই স্বাভাবিক। আমাদের সমাজে বিশুদ্ধ সংস্কৃতির প্রসার এখনও ঘটে নি—এ সত্য প্রাজ্ঞজন-স্বীকৃত। নিরন্তর অনুশীলনের সাহায্যে আমাদের সমাজে যদি যথার্থ সংস্কৃতির উন্মেষ ঘটত, তবে সামাজিক মানুষের কাছে মানুষের মূল্যবোধও স্বীকৃত হত। সে অবস্থায় সমাজের অন্তর্গত কোন মানুষ অন্য মানুষের অকল্যাণকর কোনো কাজ করতে পারত না। সার্বিক মানবতাবোধের জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে দুর্নীতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে সমাজ থেকে বিদায় নিত।

উপসংহারে এটাই শুধু বক্তব্য, সমাজ-জীবনের সর্বব্যাপী দুর্নীতিকে সমূলে ধ্বংস

করতে সক্ষম একমাত্র পরিশীলিত সামাজিক মানুষের সক্রিয় মানবতাবোধের জাগরণ।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. সমাজ ও মূল্যবোধ

চিন্তাসহায়ক বাণী

Where there is the most love to God there will be them the tiuest and most enlanged philanthropy.

—Robert Southy (Eng. poet, 1774—1843)

He who wishes to secure the good of others, has secured his own.

—Confucius (chinese philosopher 551 ? — 479 Be)

আমার প্রিয় কবি

[ভূমিকা—সুকান্ত ও সমসাময়িক ভারত—সাহিত্য ও সমাজ—সুকান্তর কাব্য—উপসংহার।]

বলা বাহুল্য, আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠকের সংখ্যা নাটক বা উপন্যাসের পাঠকের তুলনায় কম। তা সত্ত্বেও বাংলা ভাষায় কবিতা লেখার বিষয়টি নিঃসন্দেহে ব্যাপক, যা শিক্ষিত বাঙালীর একটি বিশেষ রুচি ও বৈশিষ্ট্যের পরিচয় বহন করছে। একনিষ্ঠ কবিতাপাঠকের সংখ্যাও-যে ক্রমশ বাড়ছে এও লক্ষণীয় বিষয়।

ভূমিকা :

তাই কাব্যের কাছে সমস্যার ডালি সাজিয়ে হাজির হলে কাব্য তার আন্তরিক প্রচেষ্টায় সযত্ন হয় পাঠকের সমস্যার সমাধান করতে। হতাশা, নৈরাশ্য আর বিষাদের গ্লানিকে ধুয়ে মুছে এনে দেয় সুন্দর জগতের ঠিকানা, সেইখানে বোধ করি পাঠক আশ্রয় নেবেন। এ যেন রৌদ্রদগ্ধ মধ্যাহ্নে মরুদ্যানের শীতল আশ্রয়। এ যুগের জটিলতা আর সমস্যায় তাই চোখে পড়ে সুকান্ত ভট্টাচার্যের কাব্যগ্রন্থ—মাঝে মাঝেই মনে হয়েছে সুকান্ত এনে দিয়েছেন 'নোতুন খবর'। এই কারণেই সুকান্ত দখল করেছে আমার প্রিয় কবির আসনটি।

সুকান্ত জন্মগ্রহণ করেছেন ১৩৩৩ বঙ্গাব্দের ৩০-এ শ্রাবণ। সুকান্তের মৃত্যু হয় ১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২৯-এ বৈশাখ। এই স্বল্প সময়ে সুকান্ত রচনা করেছেন অনবদ্য কিছু কবিতা। গদ্যরচনা সুকান্তের খুবই কম। তা হলেও সময় এতই কম ছিল যে, সুকান্তের গদ্যরচনা-সম্পর্কে এ মন্তব্য অবান্তর হবে। কলকাতার এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন সুকান্ত। খুব অল্প বয়সেই দারিদ্র্যের তীব্র জ্বালা, জটিল সামাজিক সমস্যা সুকান্তকে নাড়া দেয়। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের জোয়াল দরিদ্র মধ্যবিত্ত জনসাধারণকে ক্রমশ

সুকান্ত ও সমসাময়িক ভারত

ভীষণতর অবস্থার সম্মুখস্থ করেছে। পরাধীনতার জ্বালায় দীর্ঘ দু'শ বছরের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গিয়েছে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত স্বাধীনতা আন্দোলনের বিক্ষোভে ফেটে পড়ছে। কোটি কোটি মানুষ তখন চাইছে স্বাধীনতা—একমাত্র স্বাধীনতাই তাদের কাম্য। প্রথম মহাযুদ্ধ তখন শেষ হয়েছে। সুকান্ত এলেন প্রথম ও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী সময়ে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা সুকান্ত দেখেছেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালের অবস্থাও প্রত্যক্ষ করেছেন। দীর্ঘ রোগভোগের পর অসুস্থ অবস্থায় ক্ষয়রোগে সুকান্তের মৃত্যু হয়।

বঙ্গদেশে কবির সংখ্যা অল্প নয়, একথা আগেই বলেছি। বিশিষ্ট কবিরাও রয়েছেন এঁদের মধ্যে। তা ছাড়াও রয়েছেন আধুনিক অর্থাৎ সাম্প্রতিক অগ্রণী কবির দল। কিন্তু সুকান্ত ভট্টাচার্য কেন প্রিয় কবি হলেন? এর জন্যে একটু তাকিয়ে দেখা যাক্ সাহিত্য ও কবিতা-সম্পর্কিত সমালোচনার জগতে। সার্থক কবিতা কী? মানুষ ও সমাজের সঙ্গে কবিতার সম্পর্কই বা কতটুকু?

সাহিত্য ও কাব্য একটি আয়না, যেখানে প্রতিফলিত হয় সমাজ-চেতনা। সমাজ-জীবনের সার্থক চিত্রকরই-সার্থক কবি। কিন্তু কবিতার সেই সার্থকতার উৎস কোথায়?

সাহিত্য ও সমাজ

'জীবনে জীবন যোগ করা' সম্ভব না হলে সেই সার্থক সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব নয়। রবীন্দ্রনাথের শেষ জীবনের আত্মসমীক্ষায় রবীন্দ্রনাথ নিজের এই ত্রুটি উল্লেখ করেছেন এবং একই সঙ্গে স্বাগত জানিয়েছেন জনজীবনের কবিকে।

সুকান্ত এই জনজীবনের কবি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সুকান্তর যোগ ছিল অন্তরের। সুকান্তের কাব্যসৃষ্টির দৃঢ় ভিত্তি তাই দুর্বল হয়ে ওঠেনি। সুকান্ত সংগ্রামী মানুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন লড়াই-এর ময়দানে—রূপ দিয়েছেন কবিতায় মানুষের

সুকান্তর কাব্য

যুগযুগবাঞ্ছিত বাসনার। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থগুলি হচ্ছে 'ছাড়পত্র', 'পূর্বাভাষ', 'ঘুম নেই'। পৃথিবীর সমস্যাজর্জরিত পরিবেশে যে-শিশুর আবির্ভাব হল আগামী দিনের সেই মানুষের কাছে সুকান্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন,

> চলে যাব—তবু আজ যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
> প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
> এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি—
> নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

এত স্পষ্ট ভাষায় এত সহজভাবে এত দৃঢ় প্রতিশ্রুতি কে আর দিতে পেরেছে সুকান্ত ছাড়া? সুকান্তের কাব্যে সুকান্ত চিত্রিত করেছেন বন্যা, দুর্ভিক্ষ মহামারী আর মানুষের তৈরি সমাজব্যবস্থার সার্থক ছবি। মানুষের সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশার ছবি প্রতিফলিত হয়েছে, একই সঙ্গে কবির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে লক্ষ কোটি ভারতবাসীর বলিষ্ঠ দৃপ্তকণ্ঠের নির্ভীক ঘোষণা। ছন্দের নৈপুণ্য, আঙ্গিকের ব্যবহার ও স্বচ্ছন্দ সাবলীল প্রকাশের ভঙ্গীতে কিশোর কবির এই কবিতাগুলি হয়ে উঠেছে সুখপাঠ্য।

সুকান্ত বেঁচে থাকলে হয়তো অনেক-কিছু লিখে যেতে পারতেন সাধারণ মানুষের জন্যে। আমাদের দুর্ভাগ্য ও অক্ষমতা সুকান্তকে আমরা বাঁচিয়ে রাখতে পারি নি। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ভাষায়, 'সুকান্ত নতুন যুগের সার্থক কবি। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এমন একাত্মতা, সহজ কথা সোজাসুজি বলার এমন দুঃসাহসী ক্ষমতা সুকান্তের সমসাময়িক আর কোনো কবি দেখাতে পেরেছেন কিনা সন্দেহ।' সুকান্ত'র কাব্য তাই আমার প্রিয় কাব্য—সুকান্ত আমার প্রিয় কবি। যদিও 'আমার বিনিদ্র রাতে সতর্ক সাইরেন ডেকে যায়', যদিও 'আমার বসন্ত কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়' তবুও বলি,

উপসংহার

'হে সূর্য!
তুমি আমাদের উত্তাপ দিও—'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. কবি সুকান্ত। ২. বাংলা সাহিত্যে সুকান্তের অবদান।

আমার প্রিয় ঔপন্যাসিক

[ভূমিকা—শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য—চরিত্রচিত্রণ—পরিবেশ সৃষ্টি—সংলাপ—ব্যথার রূপকার শরৎচন্দ্র—উপসংহার।]

একাধিক ঔপন্যাসিক আমার প্রিয়। নির্দিষ্টভাবে একজনের সম্বন্ধে তাই লেখা সহজ নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শবাদ, স্বদেশপ্রেম, ঘটনা-সংঘটন-দক্ষতা, রবীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মী ভাষা, মানুষের প্রতি সুগভীর ভালবাসা, দেশকালের গণ্ডিমুক্ত আর্যদৃষ্টি আমাকে মুগ্ধ করে। আর শরৎচন্দ্রকে,—শরৎচন্দ্রের ব্যথায় টলটলে মনটাকে আমি যেন ছুঁতে পারি।

ভূমিকা

ভালোয়-মন্দে, সুখে-দুঃখে, মহত্ত্বে-নীচতায় মেশা এই-যে অসংখ্য অসহায় মানুষ, তাঁদের প্রতি অন্তহীন মমতা শরৎচন্দ্রের সাহিত্যে প্রকট। এই সহজ সরল, অনাড়ম্বর ভালোবাসার শক্তিতেই তিনি অপরাজেয়। তিনি তাই আমার এত প্রিয়।

শরৎচন্দ্রের বৈশিষ্ট্য

সংসারে যারা শুধু দিলে, পেলে না কিছুই তাদের মূক, ম্লান, মূঢ় মুখে সত্যিই ভাষা দিয়েছেন তিনি; ঐ নিপীড়িত মানুষগুলো আমাদের অভিযুক্তের কাঠগড়ায় দাঁড় করায়, আর তাদের পক্ষ নিয়ে শরৎচন্দ্র হন বাঙ্ময়।

চোখের জলের যে-ইতিহাস তিনি লিখেছেন তা এত আন্তরিক যে, কখনই তা আমাদের অপরিচিত অভিজ্ঞতাবহির্ভূত মনে হয় না।

চরিত্রসৃষ্টির এমন অসাধারণ ক্ষমতা সাহিত্যে সত্যিই বিরল। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা এক দক্ষ শিল্পীর যিনি প্রয়োজনের বেশি একটি আঁচড়ও কাটেন না, এবং তাঁর অঙ্কিত চিত্রটি

নিরাভরণ, স্বাভাবিক রূপে প্রকাশ পায়। আর আশ্চর্য অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে শুধু মানুষটিকেই

চরিত্রচিত্রণ

নয়, তার হৃদয়াভ্যন্তরের খবরও তিনি আমাদের দিয়ে দেন। চরিত্র-সৃষ্টির উদাহরণ হিসেবে অসংখ্য নাম মনে ভীড় করে আসছে, তাদের উল্লেখে অনাবশ্যক ভাবে প্রবন্ধকে ভারাক্রান্ত না করাই ভালো। এ প্রসঙ্গে তাঁর আরেকটি ক্ষমতার বিষয় স্মর্তব্য। তা হল তাঁর পরিবেশ-সৃষ্টির অসাধারণ নৈপুণ্য।

সাহিত্যপাঠক মাত্রেই বোঝেন পরিবেশের ভূমিকা কত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষ পরিবেশের দ্বারা সর্বদাই প্রভাবিত হয়, সেজন্যে কোনো চরিত্রের আচরণের যুক্তিসিদ্ধতার জন্যেও দক্ষ

পরিবেশ-সৃষ্টি

সাহিত্যিক পরিবেশকে কাজে লাগান। এ বিষয়ে শরৎচন্দ্র সত্যিই অনন্য। সুনিপুণ আলোকচিত্রশিল্পীর মতো তিনি শুধু মাত্র প্রকাশয়িতব্য অংশটুকুতেই আলোকরশ্মি নিবদ্ধ করেন। তিনি-যে প্রথম শ্রেণীর কবি তা বোঝা যায়—পরিবেশরচনার বৈচিত্র্যে। 'শ্রীকান্তে'র আঁধারের রূপ গদ্যে লেখা হলেও কি আসলে কবিতা নয়?

বিশেষ করে বলতে হয় শরৎ-সাহিত্যের সংলাপের কথা। কী সহজ, স্বাভাবিক অথচ

সংলাপ

প্রাণবন্ত সংলাপ! বার বার পড়লেও পুরানো হয় না।

'ওকি পারু? কাঁদছ?' 'দেবদা, নদীতে কত জল। অত জলেও কি আমার কলঙ্ক চাপা পড়বে না?'

দেবদাসে পার্বতীর এই সংলাপের মতো কত সংলাপই না আমাদের মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে থাকে।

'পথের দাবী'-তে ভারতী ডাক্তারকে বলছে, 'আর কিছু ভয় না কর সাপের ভয়টা তো করতে হয়?'

ডাক্তার—'সাপ তো বিলেত থেকে আসে নি দিদি, তাদের ধর্মজ্ঞান আছে, বিনা অপরাধে কামড়ায় না।'

টীকা নিষ্প্রয়োজন।

অত্যাচারিতের ক্রন্দনধ্বনি তিনি শ্রুতিপথে এনেছেন। হাজার বিধিনিষেধে মানুষকে বেঁধে রেখেছে সমাজের গোঁড়ামি। মানুষের স্বাভাবিক গতিপথকে, পদে পদে ব্যাহত

ব্যথার রূপকার শরৎচন্দ্র

করেছে। রুদ্ধগতি না হলে যে-মানুষ আপন মহত্ত্বে পরিপূর্ণ বিকশিত হয়ে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারত,—তার সারাজীবন ভরে গেছে হাহাকারে। এরকম অসংখ্য ব্যর্থ জীবনের হাহাকার শরৎ-সাহিত্য জুড়ে ধ্বনিত। সমাজের ক্লেদ, গ্লানি, মনুষ্যত্ব বিকাশের পরিপন্থী বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে তাঁর অশ্রুরুদ্ধ প্রতিবাদ আমাকে গভীর ভাবে স্পর্শ করে।

প্রকৃতির সুন্দরকে তিনি দেখেছিলেন, তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে তার প্রমাণ মেলে।

উপসংহার

কিন্তু মানুষের সুন্দরকে প্রকাশিত করার সাধনা তাঁর কাছে ছিল অধিকতর গুরুত্বসম্পন্ন—তাই তিনি শ্রদ্ধেয়, সাধারণ মানুষের অন্তহীন ভালবাসায় নিষিক্ত।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—মানব-দরদী শরৎচন্দ্র।

চিন্তাসহায়ক বাণী

আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের ঘরের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ঘরোয়া হৃদয়ের সহস্র বর্ণসুষমা দিয়ে সরল ও প্রাঞ্জল যে কাহিনী-সাহিত্য রচনা করেছেন সেটা ভারতীয় শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী নগরনির্মাণের আদর্শোচিত স্থাপত্যের মতো রূপে ও গুণে সর্বতোভদ্র, বাংলার সমাজজীবনের সুখদুঃখ প্রতিচ্ছবিত করেও বিশ্বজনীন আবেদনে চিরপ্রসন্ন।

তোমার প্রিয় গল্পলেখক

(ত্রিপুরা ১৯৮৪)

[ভূমিকা—ঔৎসুক্য—বৈচিত্র্য—বৈচিত্র্য ও রম্যতা—কেন ভালো লাগে—উপসংহার।]

ভূমিকা

গল্প। কথাটার মধ্যেই একটা জাদু আছে যেন। যে-কোনো গল্পই আমার ভালো লাগে। তবে গল্প বলতে এখানে 'ছোটো গল্প'ই বোঝাচ্ছে। আমার পড়ার পরিধি তো খুব বেশি নয়। তবে যতটুকু পড়েছি রবীন্দ্রনাথের গল্পই আমাকে সবচেয়ে বেশি করে আকর্ষণ করে।

ঔৎসুক্য

বিভিন্ন পাঠ্য সংকলনে ওঁর গল্প পড়ে আরও পড়ার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে। তারপর সুযোগ পেলাম গল্পগুচ্ছের সব গল্প পড়ে ফেলবার। এ এক আশ্চর্য জগৎ। এক-একটা গল্প এক-একটা স্বাদ। গল্পগুচ্ছকে বলতে ইচ্ছে হয় সব পেয়েছির দেশ। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাই পদ্মানদীকে, আর সেই মাটিকে, যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে। শিলাইদহের পল্লীর মানুষই তো তাঁকে দিয়েছিল ছোটো গল্প লেখার প্রেরণা। উৎসটা যে-ই খুলে গেল অমনি অজস্রধারে বইল তাঁর গল্পের রসধারা।

বৈচিত্র্য ও রম্যতা

পল্লীর পরিবেশ নিয়ে 'অতিথি', 'পোস্টমাস্টার' ইত্যাদি গল্প কোনো দিনই পুরনো হবে না। তারাপদকে ধরে রাখা গেল না। স্নেহের কোনো বন্ধনই সে মানল না। বর্ষায় মেঘান্ধকার রাতে উদাসীন পৃথিবী মায়ের কাছে চলে গেল সে। হায় চারুশশী! হায় সোনামণি!

ওদিকে পোস্টমাস্টারকেও ধরে রাখা গেল না। রতনের হৃদয়-কুসুমকে একটি আশার বৃন্ত ধরে রেখেছিল। সে কুসুম ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। মানুষের মন যা চায় তা কি পায়?

ফটিক তো বাড়ি যাবার ছুটি পেয়েছিল, জীবন থেকেই ছুটি হল তার। 'একবাঁও মেলেনা দুবাঁও মেলেনা'—এই স্বর আমাদের মনের মধ্যে বেজে চলে। এ গল্পে বারো-তেরো বছরের ছেলেদের প্রতি তাঁর কী গভীর মমতা প্রকাশিত। সত্যি মা ছাড়া এদের অবস্থা কী করুণ।

আসলে তাঁর সব গল্পগুলোতে আছে মানুষের জন্যে বেদনাবোধ। নিরুপমার অসহায় অবস্থা কী গভীর দরদ দিয়ে প্রকাশ করেছেন তিনি। কত নিরুপমা যে এই-ভাবে শ্বশুর বাড়ির লোভের শিকার হয়। কতদিন আগে লেখা গল্পটি, কিন্তু আজও কি আমাদের সমাজ এতটুকু এগিয়েছে কোনো আদর্শের দিকে?

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কী সবল প্রতিবাদ 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটিতে। ডোমের দল বিশ্বাসই করতে পারল না জয়কালী ঠাকরুন রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দেবেন। নিখিলজগতের যিনি বিধাতা তাঁর চেয়ে সমাজের ভাগ্যবিধাতাদের রুচিবোধ অনেক উঁচুদরের কিনা, তাই সমাজে চলে মানুষের হাতে মানুষের লাঞ্ছনা। 'সবলা' কবিতায় কবি বলেছিলেন: নারীকে আপনভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা? তাঁর এই প্রশ্নই তিনি তুলে ধরেছেন 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে।

মানবজীবনের কত রহস্যই যে রবীন্দ্রনাথের গল্পে আভাসিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই শাহীবাগের অতৃপ্ত আত্মার কথা ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়। তারই মধ্যে হঠাৎ মেহের আলির 'তফাৎ যাও সব ঝুটা হৈ।'—এ কি প্রলাপ মাত্র, না জীবনের গভীর গহন কোনো কথা? 'কঙ্কাল' আর 'মণিহারাতেও' গা-ছমছম করা রহস্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে জীবনজিজ্ঞাসা।

একটু রূপকথা বা পৌরাণিক ধরনের গল্পের মধ্যে আমার সব চেয়ে ভালো লাগে 'জয়-পরাজয় গল্পটি। পরাজয় জয় হয়ে উঠল—স্থূলরুচি বাক্যবাগীশ পুণ্ডরীকের কাছে পরাজিত হলেও সুরসিকা অপরাজিতার জয়মাল্য পড়ল যথার্থ কবিরই কণ্ঠে।

কেন যে গল্পগুলো এত ভালো লাগে তেমন করে হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারব না।

কেন ভালো লাগে

মনে হয় কবিতা যেমন আস্বাদ্যতায় মূল্যবান, গল্পগুলোও তাই। কবিতার সঙ্গেই তার আত্মীয়তা। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতা যেমন ফুটেছে তাঁর কবিতায়, তেমনি গল্পেও। 'বলাই' তো কবিরই প্রতিনিধি। হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ দেখেন কবি। গল্পলেখক হিসেবেও দুটি পিতৃহৃদয়কে একসূত্রে গেঁথে দেন 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে। পড়ার শেষেই যেন গল্পের শুরু।

অন্তরে অতৃপ্তি রবে পাঠ সাঙ্গ করি যবে
শেষ হয়ে না হইল শেষ।

কিন্তু শুধু কাব্যধর্মিতার জন্যেই যে তাঁর গল্প এত ভালো লাগে তা নয়, তাঁর গদ্য ভাষার আশ্চর্য লাবণ্য আর পরিমিতিও ইন্দ্রজাল বিস্তার করে মনের ওপর। সর্বোপরি তাঁর জীবন-বোধ। যখন যে-গল্প পড়ি, তখনই মনে হয়, এ তো আমাদের সকলেরই মনের কথা।

অনেকে বলেন আর কিছু না লিখে রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু গান লিখতেন তা হলেই

উপসংহার

অজরামর হয়ে থাকতেন তিনি, আমার বলতে ইচ্ছে হয়, আর কিছু না লিখে শুধু যদি গল্প লিখতেন তিনি, বিশ্বসাহিত্যে তাঁর স্থান অম্লান হয়ে থাকত।

এই প্রবন্ধের অবলম্বনে লেখা যায়—ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথ।

চিন্তাসহায়ক বাণী

আমাদের সৌভাগ্য, আমাদের ঘরের কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ঘরোয়া হৃদয়ের সহস্র বর্ণসুষমা দিয়ে সরল ও প্রাঞ্জল যে কাহিনী-সাহিত্য রচনা করেছেন সেটা ভারতীয় শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী নগরনির্মাণের আদর্শোচিত স্থাপত্যের মতো রূপে ও গুণে সর্বতোভদ্র, বাংলার সমাজজীবনের সুখদুঃখ প্রতিচ্ছবিত করেও বিশ্ব-জনীন আবেদনে চিরপ্রসন্ন।

তোমার প্রিয় গল্পলেখক

(ত্রিপুরা ১৯৮৪)

[ভূমিকা—ঔৎসুক্য—বৈচিত্র্য—বৈচিত্র্য ও রম্যতা—কেন ভালো লাগে—উপসংহার।]

ভূমিকা

গল্প। কথাটার মধ্যেই একটা জাদু আছে যেন। যে-কোনো গল্পই আমার ভালো লাগে। তবে গল্প বলতে এখানে 'ছোটো গল্প'ই বোঝাচ্ছে। আমার পড়ার পরিধি তো খুব বেশি নয়। তবে যতটুকু পড়েছি রবীন্দ্রনাথের গল্পই আমাকে সবচেয়ে বেশি করে আকর্ষণ করে।

ঔৎসুক্য

বিভিন্ন পাঠ্য সংকলনে ওঁর গল্প পড়ে আরও পড়ার ইচ্ছেটা প্রবল হয়ে ওঠে। তারপর সুযোগ পেলাম গল্পগুচ্ছের সব গল্প পড়ে ফেলবার। এ এক আশ্চর্য জগৎ। এক-একটা গল্প এক-একটা স্বাদ। গল্পগুচ্ছকে বলতে ইচ্ছে হয় সব পেয়েছির দেশ। মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাই পদ্মানদীকে, আর সেই মাটিকে, যে মাটি আঁচল পেতে চেয়ে আছে মুখের পানে। শিলাইদহের পল্লীর মানুষই তো তাঁকে দিয়েছিল ছোটো গল্প লেখার প্রেরণা। উৎসটা যে-ই খুলে গেল অমনি অজস্রধারে বইল তাঁর গল্পের রসধারা।

বৈচিত্র্য ও রম্যতা

পল্লীর পরিবেশ নিয়ে 'অতিথি', 'পোস্টমাস্টার' ইত্যাদি গল্প কোনো দিনই পুরনো হবে না। তারাপদকে ধরে রাখা গেল না। স্নেহের কোনো বন্ধনই সে মানল না। বর্ষায় মেঘান্ধকার রাতে উদাসীন পৃথিবী মায়ের কাছে চলে গেল সে। হায় চারুশশী! হায় সোনামণি!

ওদিকে পোস্টমাস্টারকেও ধরে রাখা গেল না। রতনের হৃদয়-কুসুমকে একটি আশার বৃন্ত ধরে রেখেছিল। সে কুসুম ধুলোয় লুটিয়ে পড়ল। মানুষের মন যা চায় তা কি পায়?

ফটিক তো বাড়ি যাবার ছুটি পেয়েছিল, জীবন থেকেই ছুটি হল তার। 'একবাঁও মেলেনা দুবাঁও মেলেনা'—এই স্বর আমাদের মনের মধ্যে বেজে চলে। এ গল্পে বারো-তেরো বছরের ছেলেদের প্রতি তাঁর কী গভীর মমতা প্রকাশিত। সত্যি মা ছাড়া এদের অবস্থা কী করুণ।

আসলে তাঁর সব গল্পগুলোতে আছে মানুষের জন্যে বেদনাবোধ। নিরুপমার অসহায় অবস্থা কী গভীর দরদ দিয়ে প্রকাশ করেছেন তিনি। কত নিরুপমা যে এই-ভাবে শ্বশুর বাড়ির লোভের শিকার হয়। কতদিন আগে লেখা গল্পটি, কিন্তু আজও কি আমাদের সমাজ এতটুকু এগিয়েছে কোনো আদর্শের দিকে?

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে কী সবল প্রতিবাদ 'অনধিকার প্রবেশ' গল্পটিতে। ডোমের দল বিশ্বাসই করতে পারল না জয়কালী ঠাকরুন রাধানাথ জীউর মন্দিরের মধ্যে অশুচি জন্তুকে আশ্রয় দেবেন। নিখিলজগতের যিনি বিধাতা তাঁর চেয়ে সমাজের ভাগ্যবিধাতাদের রুচিবোধ অনেক উঁচুদরের কিনা, তাই সমাজে চলে মানুষের হাতে মানুষের লাঞ্ছনা। 'সবলা' কবিতায় কবি বলেছিলেন: নারীকে আপনভাগ্য জয় করিবার কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা? তাঁর এই প্রশ্নই তিনি তুলে ধরেছেন 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে।

মানবজীবনের কত রহস্যই যে রবীন্দ্রনাথের গল্পে আভাসিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। সেই শাহীবাগের অতৃপ্ত আত্মার কথা ভাবতে গায়ে কাঁটা দেয়। তারই মধ্যে হঠাৎ মেহের আলির 'তফাৎ যাও সব ঝুটা হৈ।'—এ কি প্রলাপ মাত্র, না জীবনের গভীর গহন কোনো কথা? 'কঙ্কাল' আর 'মণিহারাতেও' গা-ছমছম করা রহস্যের মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে জীবনজিজ্ঞাসা।

একটু রূপকথা বা পৌরাণিক ধরনের গল্পের মধ্যে আমার সব চেয়ে ভালো লাগে 'জয়-পরাজয় গল্পটি। পরাজয় জয় হয়ে উঠল—স্থূলরুচি বাক্যবাগীশ পুণ্ডরীকের কাছে পরাজিত হলেও সুরসিকা অপরাজিতার জয়মাল্য পড়ল যথার্থ কবিরই কণ্ঠে।

কেন যে গল্পগুলো এত ভালো লাগে তেমন করে হয়তো বুঝিয়ে বলতে পারব না।

কেন ভালো লাগে

মনে হয় কবিতা যেমন আস্বাদ্যতায় মূল্যবান, গল্পগুলোও তাই। কবিতার সঙ্গেই তার আত্মীয়তা। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের একাত্মতা যেমন ফুটেছে তাঁর কবিতায়, তেমনি গল্পেও। 'বলাই' তো কবিরই প্রতিনিধি। হৃদয়ে হৃদয়ে যোগ দেখেন কবি। গল্পলেখক হিসেবেও দুটি পিতৃহৃদয়কে একসূত্রে গেঁথে দেন 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে। পড়ার শেষেই যেন গল্পের শুরু।

অন্তরে অতৃপ্তি রবে পাঠ সাঙ্গ করি যবে
শেষ হয়ে না হইল শেষ।

কিন্তু শুধু কাব্যধর্মিতার জন্যেই যে তাঁর গল্প এত ভালো লাগে তা নয়, তাঁর গদ্য ভাষার আশ্চর্য লাবণ্য আর পরিমিতিও ইন্দ্রজাল বিস্তার করে মনের ওপর। সর্বোপরি তাঁর জীবন-বোধ। যখন যে-গল্প পড়ি, তখনই মনে হয়, এ তো আমাদের সকলেরই মনের কথা।

উপসংহার

অনেকে বলেন আর কিছু না লিখে রবীন্দ্রনাথ যদি শুধু গান লিখতেন তা হলেই অজরামর হয়ে থাকতেন তিনি, আমার বলতে ইচ্ছে হয়, আর কিছু না লিখে শুধু যদি গল্প লিখতেন তিনি, বিশ্বসাহিত্যে তাঁর স্থান অম্লান হয়ে থাকত।

এই প্রবন্ধের অবলম্বনে লেখা যায়—ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথ।

সাহিত্যে নীতি

[ভূমিকা—প্রাচীন সাহিত্যে নীতির স্থান—সাহিত্যে নীতি কি সাহিত্যকে ক্ষুণ্ণ করে—উপসংহার।]

ভূমিকা

মানুষের সৃষ্টির মূলে আছে আনন্দ। সৃষ্টির আনন্দেই সে সৃষ্টি করে, কুসুমিত নিকুঞ্জে যেন পাখির গান। কিন্তু পাখির সঙ্গে মানুষের কিঞ্চিৎ প্রভেদ আছে, মানুষ হল সামাজিক জীব। তাই নিছক সৃষ্টির জন্যে সৃষ্টি করার শর্তহীন ছাড়পত্র সমাজ তার হাতে তুলে দেয় নি। শিল্পের শেষ কথা আনন্দ, কিন্তু আনন্দই একমাত্র কথা নয়। সামাজিক নানা দায়দায়িত্ব—সুনীতি-দুর্নীতিবিষয়ক নানা প্রশ্ন ও তার সমাধান—সৃষ্টির অকারণ আনন্দে স্রষ্টা এড়িয়ে যেতে পারে না। তাই 'art for art's sake'-এর বিশ্বাসে আজ ফাটল ধরেছে। সেই ফাটলের ফাঁক দিয়ে দৃশ্যমান হয়েছে সাহিত্যে নীতি।

প্রাচীন সাহিত্যে নীতির স্থান

ভারতীয় প্রাচীন শিল্পসাহিত্যে নীতির প্রশ্নটি কোনো দিন দেখা দেয় নি। শিল্প ছিল সুন্দরের প্রকাশ। কেবল সুন্দর নয়, তার সঙ্গে স্রষ্টা যুক্ত করতেন সত্য ও শিবকে। প্রেয়কে তাঁরা শ্রেয় থেকে আলাদা করে দেখতেন না।

সাহিত্যবিচারে নানা মুনির নানা মত। এক শ্রেণীর সমালোচক বলেন শিল্পসাহিত্যের উপর সমাজনীতির বোঝা চাপানো অবান্তর। কারণ সৃষ্টি তো জীবনের অনুকৃতি নয়। জীবনকে অবলম্বন করে জীবনকে অতিক্রম করে যাওয়ার নামই শিল্প। প্রতিভার জাদুস্পর্শে রূপ হয়ে ওঠে অরূপ। তাই সামাজিক নীতি ও আদর্শের মাপকাঠিতে এদের বিচার করতে গেলে শিল্পের প্রতি অবিচার করা হবে। আর এক শ্রেণীর বক্তব্য হল শিল্পকে আমরা কেবল শিল্প হিসাবে দেখব না, সমাজের আদর্শে ফেলে তার মূল্যায়ন করব। এই মূল্যায়নের দৌলতেই সাহিত্যে দেখা দিয়েছে মতবাদ। আধুনিক সাহিত্যে পরস্পরবিরোধী দুটি মতবাদ প্রাধান্য লাভ করেছে। একটি হল আদর্শবাদ বা নীতিবাদ, অন্যটি বস্তুবাদ। আমাদের আলোচ্য বিষয় হল সাহিত্যে নীতি।

সাহিত্যে নীতি কি সাহিত্যকে ক্ষুণ্ণ করে?

শিল্পসাহিত্যে আদর্শবাদ, সামাজিক ন্যায়নীতি ও মঙ্গলকে, মানুষের আদর্শ স্বপ্নকে সমাজ-জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। কিন্তু ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে শিল্পী যখন শিল্পের দাবি অস্বীকার করেন তখনই তিনি হয়ে পড়েন প্রচারক। এই ত্রুটির জন্যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচকদের কাছে অভিযুক্ত হয়েছেন। 'চন্দ্রশেখর,' 'বিষবৃক্ষ,' 'আনন্দমঠ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রভৃতি উপন্যাসে শিল্পী বঙ্কিম হয়েছেন সমাজ-সংস্কারক—নীতিনিষ্ঠ বঙ্কিম। ফলে সাহিত্যের গতি হয়েছে রুদ্ধ, উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের হৃদয়ধর্ম অনেক ক্ষেত্রে হয়তো হয়েছে উপেক্ষিত। আর এটা খুবই স্বাভাবিক, যুগসন্ধিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে সুরুচির কথা বিশেষ করে ভাবতে হয়েছিল।

শিল্পীর সৃজনী প্রতিভায় যদি সৃষ্টির ধর্ম এবং নীতি উভয়ের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য স্থাপিত হয় তাহলেই শিল্পধর্ম রক্ষিত হয়। সাহিত্যস্রষ্টা শরৎচন্দ্র সত্যসুন্দরকে যেমন

উপেক্ষা করেন নি, তেমনি উপেক্ষা করেন নি সামাজিক ন্যায়নীতিকে। এই দুয়ের মিলন ঘটেছে বলেই তাঁর সাহিত্যের সার্বজনীন আবেদন। চিরন্তন মানবধর্মকে তিনি অগ্রাহ্য করতে পারেন নি। তাই বলে সমাজকে কোথাও অস্বীকার করেন নি তিনি। তাই শরৎ-সাহিত্যে বাল্যবিধবাদের শেষ পর্যন্ত কাশীবাসী হতে হয়, অচলাকে পথের মাঝে বর্জিত হতে হয়, কিরণময়ীকে অবৈধ প্রণয়ের শাস্তিস্বরূপে হতে হয় উন্মাদিনী। শরৎ-সাহিত্যে নীতি আছে, সেই সঙ্গে আছে নীতি লঙ্ঘন করার ইঙ্গিত।

উপসংহার

সামাজিক ন্যায়নীতির দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে শিল্পসৃষ্টি সম্ভব নয়। সাহিত্যধর্মের সঙ্গে আদর্শের মিলন ঘটিয়েই তবে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য, যুগোত্তীর্ণ সাহিত্য রচিত হয়। শিল্পস্রষ্টা তাঁর স্বধর্মকে যেমন রক্ষা করবেন তেমনি ন্যায়নীতিরও প্রতিষ্ঠা করবেন। শরৎচন্দ্র নিজেই বলেছেন:

'যা অসুন্দর' যা immoral, যা অকল্যাণ, কিছুতেই তা আর্ট নয়!' 'Art for Art's sake' কথাটা যদি সত্যি হয় তাহলে কিছুতেই তা immoral বা অকল্যাণকর হতে পারে না। অকল্যাণকর এবং immoral হলে 'art for art's sake' কথাটা কিছুতেই সত্য নয়, শত সহস্র লোক তারস্বরে বললেও সত্য নয়—।' এই দুইয়ের মিলন যিনি সুন্দর-ভাবে ঘটাতে পারবেন তিনিই হবেন কালজয়ী শিল্পী।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. সাহিত্য কি সমাজের দর্পণ? ২. সাহিত্যে আদর্শবাদ। ৩. আদর্শবাদ বনাম বস্তুবাদ।

চিন্তাসহায়ক বাণী

Literature does not please by moralizing us; it moralizes us because it pleases.

—H. W. Garrod (Eng. writer)

আমার ভালোলাগা একটি নাটক

[ভূমিকা—কাহিনী—অভিনয়—মঞ্চ-আলো-আবহসঙ্গীত—উপসংহার।]

ভূমিকা

নান্দীকার প্রযোজিত 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' নাটকের অভিনয় দেখতে গিয়ে সাহিত্যে দেওয়া-নেওয়ার কথাই মনে হচ্ছিল। শিল্প-বাণিজ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতির বড়ো কথা যেমন 'দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে' সাহিত্যও তেমনি। সাহিত্যে দেওয়া-নেওয়ার কাজ চলে, অনুবাদের মাধ্যমে। উন্নততর সাহিত্য থেকে অনুবাদকর্ম চলে আসছে বহু আগে থেকেই। ফলশ্রুতি, সাহিত্যের পুষ্টি আর বিকাশ। 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' সর্বাঙ্গে এদেশী নাম আর স্থানের লেবেল এঁটে বসলেও মূলত এটি সোভিয়েত লেখক শেকভের 'চেরী আর্চার্ড' নাটকের ছায়া অবলম্বনে রচিত। অনুবাদ করেছেন শ্রীঅজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়।

ঊনবিংশ শতাব্দীর রাশিয়া, তার সমাজ-জীবন, সামন্ততন্ত্রের অন্তিম প্রহর, সব কিছুকেই অনুবাদক তুলে এনে উপস্থিত করেছেন পশ্চিম বাংলার পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল

কাহিনী

মানভূম-সিংভূমের পটভূমিতে। নাটকে যুগপরিবর্তনের ছবি আঁকা হয়েছে। কালপ্রবাহের সঙ্গে বদলায় সভ্যতা-সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি আর মানসিকতা।

কাহিনী যখন শুরু হল তখন শীতের সকাল। গ্রামের বাড়িতে আসবেন বিধবা জমিদারগিন্নী। তাই বাড়ির পুরানো ঝি-চাকরদের মধ্যে পড়ে যায় সাজ সাজ রব। এর মধ্যে চোখে পড়ে লালমোহন বলে একটি মানুষ। জমিদারগিন্নীর সে বিশেষ অনুগত। তার নিজের জবানীতেই জানতে পারি বাপ-ঠাকুরদা ছিল জমিদারবাড়ির চাকর, সে নিজেও ছোটোবেলায় বড়ো বাড়ির উঠানে বসে রাঙা রাঙা চালের ভাত নুন দিয়ে খেয়েছে। কিন্তু আজ সুদের কারবার করে লালমোহন লাল হয়েছে! লালমোহন জমিদারগিন্নীকে বারবার উপদেশ দেয়: 'অমা মাগ্‌গো আমি বলি কি এই আমের বাগানটো পলট পলট কর‍্যা বিকাইয়া ছান।' জমিদারির একটা বড়ো অংশ ছিল বিশাল আমের বাগান। দেনার দায়ে সেই আমবাগান, ঘরবাড়ি সব নিলামে উঠবে। কিন্তু কে সে কথা ভাবছে? জমিদারগিন্নী আর তার কল্পনাবিলাসী বড়ো ভাই 'খোকাবাবু' বাস্তব ভুলে পুরনো দিনের রঙিন স্বপ্নে বিভোর। বাড়ির বৃদ্ধ চাকর ফেলাদার চোখেও পুরানো দিনের স্বপ্ন। তাই বাড়ির মেয়ের সঙ্গে সাধারণ মানুষের মেলামেশাটা সে ভালো চোখে দেখে না। নজির দেয় কর্তাদের আমলের। তারপর একদিন সত্যি সত্যি সম্পত্তি নিলামে উঠল। ঠিক ছিল খোকাবাবু সম্পত্তিটা সত্তর হাজার টাকায় ডেকে নেবেন। কিন্তু সাপুরের চক্রবর্ত্তি বাবুরা ডাক শুরু করলেন বাহাত্তর হাজার থেকে। ফলে খোকাবাবুর দম ফুরুল সেখানেই। তারপরের ঘটনা বেশ নাটকীয়ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে লালমোহনের জবানীতে। আমরা জানতে পারলাম শেষ অবধি একলাখ পঁচিশ হাজার টাকায় জমিদারিটা ডেকে নিয়েছে লালু অর্থাৎ লালমোহন। এর ক'দিন পরেই ঘরবাড়ি ছেড়ে চিরদিনের জন্যে কাশীতে চলে যাবেন গিন্নীমা। তার ভাই খোকাবাবু ঠিক করলেন, আর বিলাসিতা নয়, এবার সত্যি সত্যি কিছু কাজ করতে হবে! তাই স্কুলের ইংরেজি শিক্ষকের চাকরি নেবার কথা ভাবতে থাকেন তিনি। শেষ দৃশ্যে রোগজীর্ণ বৃদ্ধ ফেলাদার ঘুম ভাঙবে আমগাছ কাটার শব্দে। একটার পর একটা আমগাছ কেটে প্লটের জন্যে জমি তৈরি করছে লালমোহন। একটা একটা করে আমগাছ লুটোচ্ছে মাটিতে, এদিকে ফেলার চোখে নামছে মৃত্যুর ছায়া। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে নাটকের সমাপ্তি।

তিন অঙ্কের এই নাটকের চরিত্রসংখ্যা অনেক। প্রধান প্রধান পাত্র-পাত্রী ছাড়াও আছে এক বেকার যুবক, পোস্ট মাস্টার, স্টেশন মাস্টার, ঝি-চাকর। এদের সকলের অভিনয়ই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু অভিনয়াংশে যিনি সকলের আগে প্রাণ কেড়ে

অভিনয়

নেন তিনি হলেন লালমোহনরূপী অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মুখে মানভূম-সিংভূমী উচ্চারণ যেমন বিশুদ্ধ তেমনি সাবলীল। তাঁর নিলামের পরের দৃশ্য ভোলবার নয়। একদিকে প্রচণ্ড আনন্দ অন্যদিকে জমিদার-

গিন্নীর জন্যে তাঁর বুকভরা বেদনা। হাসি আর কান্না। হাসতে হাসতে কান্না আবার কাঁদতে কাঁদতে হাসি, সে এক আশ্চর্য অভিনয়। গ্রামের ঝি দুর্গার ভূমিকায় কেয়া চক্রবর্তী এবং একজন ছাপোষা সাধারণ মানুষের ভূমিকায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের অভিনয় স্মরণীয়। জমিদারবাড়ির বিশুচাকরের ভূমিকায় স্বমৌলীন্দ্র আচার্য জুগিয়েছেন হাসির খোরাক। তাঁর অভিমানে আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে পকেটে বিষ নিয়ে ঘোরা, কথায় কথায় —'অবিশ্যি সে লিয়ে আমার মনে গজগজানি নাই'—এই কর্ম ও কথার মধ্যে আছে অফুরন্ত হাসির উপাদান। ফলে ওকে স্টেজে দেখলেই আমি হাসি চাপতে পারছিলাম না। অন্যান্য চরিত্রের শিল্পীরাও যৌথ অভিনয়ের দায়িত্ব পালন করেছেন।

মঞ্চ-আলো-আবহসঙ্গীত

সারা নাটকে কোথাও পটপরিবর্তন নেই। প্রথম থেকে শেষ অবধি একটি দৃশ্যেই নাটকের অভিনয় হয়েছে। দৃশ্যান্তরের অভাব পূরণ করা হয়েছে বর্ণনার মাধ্যমে। আলোক সম্পাত চলনসই। অবশ্য আলোর খেলা দেখাবার অবকাশ এ নাটকে বড়ো একটা নেই। তবে আবহসঙ্গীত উচ্চাঙ্গের সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে যে-সব সিম্বলিক মিউজিকের ব্যবহার করা হয়েছে তা সত্যিই অনবদ্য।

নান্দীকারের 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'র অভিনয় দেখে আমার মনে হয়েছে যেন অনুপম এক বৃন্দবাদন। এর দৃশ্যসজ্জা, অভিনয়, আবহসঙ্গীত, রূপসজ্জা, প্রত্যেকটি অঙ্গের

উপসংহার

ব্যবহার সুপরিমিত যেন একটি পটে আঁকা ছবি। তার যেখানে যেটুকু রঙের প্রয়োজন ঠিক সেইটুকু দিয়েই যেন চিত্রটি অঙ্কিত হয়েছে। সেই সঙ্গে অসংখ্য নয়ননন্দন নাট্যলক্ষণ, অসামান্য কিছু কম্পোজিশন। সব মিলিয়ে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশিত 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী' স্মরণীয় প্রযোজনা বললে বেশি বলা হয় না। এই নাট্যসংস্থার উপর আমাদের অনেক আশা-ভরসা। তাই আশা করি তাঁরা একদিকে যেমন অনুবাদ-নাটকের অভিনয় করবেন অন্যদিকে তেমনি অভিনয় করবেন মৌলিক নাটকেরও, ফলে প্রয়োজনের তাগিদেই সৃষ্টি হবে নতুন নতুন নাটক।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়

১. এ যুগের নাটক। ২. কলকাতার একটি স্মরণীয় নাটক।
৩. বাংলা নাটক কোন্ পথে।

আমার ভালোলাগা একটি চলচ্চিত্র

[ভূমিকা ছবির কাহিনী—ছবির বিশেষত্ব—বিশেষ বিশেষ দৃশ্য, পরিস্থিতি ও সঙ্গীত—অভিনয়—উপসংহার।]

ভূমিকা

সত্যজিৎ রায়ের ছবির জন্যে অধীর আগ্রহে প্রতীক্ষা করে থাকে সারা পৃথিবীর মানুষ, কিন্তু আমার প্রতীক্ষা তার জন্যে নয়। আমি অপেক্ষা করেছিলাম, কবে তিনি আমাদের মতো কিশোরদের জন্যে ছবি করবেন, তারই জন্যে। অবশেষে কেমন করে জানি না আমাদের মনের ইচ্ছেটা শিল্পীর

হৃদয়কে স্পর্শ করল, আর তিনি নিজের কিশোর-উপন্যাস 'সোনার কেল্লা'কে চিত্রায়িত করার কাজে হাত দিলেন। এ সংবাদ জানার পর থেকে আমার বিরামহীন প্রহর গোনা। কবে কবে করতে করতে এসে গেল সেই দিনটি—১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ২৭-এ ডিসেম্বর, যেদিন 'সোনার কেল্লা' মুক্তি পেল। বড়োদিনের ছুটি তখনও ফুরোয় নি। মনে হল এবছর আমাদের বড়োদিনের বড়ো উপহার হল সত্যজিৎ রায়ের 'সোনার কেল্লা'।

ছবির কাহিনী

সোনার কেল্লার কাহিনী শুরু হয় জাতিস্মর মুকুলকে নিয়ে। তার পূর্বজন্ম এবং গুপ্তধনের সংবাদ কাগজে বেরুলে গুপ্তধনের আশায় দুজন প্রতারক মুকুলকে চুরি করবার চেষ্টা করে। কিন্তু সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে তারা চুরি করে দ্বিতীয় মুকুল অর্থাৎ ভুল ছেলেকে। এখান থেকেই গল্পের রহস্য জমজমাট। মুকুল ডাঃ হেমাঙ্গ হাজরার সঙ্গে রাজস্থানে কেল্লা দেখতে দেখতে চলেছে ; সঙ্গে দুই ভিলেন। পথেই ডাক্তারকে পাহাড় থেকে ফেলে দিয়ে ওরা মুকুলকে হাত করে। এদিকে মুকুলের বাবা ভয় পেয়ে গোয়েন্দা ফেলুকে রাজস্থানে পাঠান। সঙ্গে যায় তার খুড়তুতো ভাই তোপসে। রোমাঞ্চ আর সাসপেন্স চরমে উঠেছে যখন ফেলুদার সঙ্গে ভিলেনদের দেখা এবং এক সঙ্গে অবস্থান। শেষে ভিলেন মন্দারকে পরাস্ত করে আর নকল হাজরা মিঃ বর্মনকে গ্রেপ্তার করে শিশুনায়ক মুকুলকে উদ্ধার করে ফেলুদা। জয়সলমীরের ভগ্ন-দুর্গের ইট-পাথরের মাঝে দাঁড়িয়ে মুকুলের মোহ ভঙ্গ হল, সে এই প্রথম হাসল, আর ফেলুদাকে বলল—'আমি বাড়ি যাব কলকাতায়'।

ছবির বিশেষত্ব

আমার কাছে ছবিটি প্রথম থেকে শেষ অবধি উপভোগ্য। ছোটো আর বড়ো সকলের কাছেই উপভোগ্য হবে বলে মনে করি। ছবির স্নিগ্ধ সরস কৌতুক আর বহিরঙ্গের লাবণ্যে সকলেই তৃপ্তি পাবেন। কালার ফটোগ্রাফিতে রাজস্থানের পটভূমি সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। এমন কালার ফটোগ্রাফি আমাদের দেশের ছবিতে বিরল।

বিশেষ বিশেষ দৃশ্য, পরিস্থিতি ও সঙ্গীত

গভীর রাতে মুকুলের বাড়ির পরিবেশ, মুকুলকে সম্মোহন করার সময় 'বিগ ক্লোজআপ'। রামদেওরা যাওয়ার পথে উটের সারি এবং দূর থেকে ট্রেন আসার দৃশ্য, লাঠি-স্টেশনে সূর্যাস্তের ছবি এবং টুকরো টুকরো 'জুম'-শটের ব্যবহারে যে-পেন্টিং-সুলভ শিল্পচিত্র দেখা গেল তার মধ্যে চিত্রশিল্পী সত্যজিৎ রায়কে চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। এই সঙ্গে ছবির আবহসঙ্গীত রচনায় বিভিন্ন সুরের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক শব্দ যুক্ত করে পরিচালক যে বাস্তবতা গড়ে তুলেছেন তা উচ্চাঙ্গের। বিশেষ করে 'সোনার কেল্লা'র ইমেজ আনতে যে-স্বপ্নময় সুর মাঝে মাঝেই বেজে উঠেছে তা অতুলনীয়। রাজস্থানী ঘটনা, তাই ছবির আবহসঙ্গীতে আছে রাজস্থানী বাদ্যযন্ত্র। বিকানীর কেল্লার বাইরে এক দেবমন্দিরের চাতালে বসে বৃদ্ধা রাজপুতানীর গান 'মন মেরা রাম নাম ভজে'—সত্যি মন কেড়ে নেয়।

সত্যজিৎবাবুর ছবির যেটা বড়ো গুণ ও বৈশিষ্ট্য তার বেশ কিছুটা সোনার কেল্লাতেও দ্রষ্টব্য। তার একটি হল হিউমার, যা এই ক্রাইম চিত্রটিকেও প্রায় প্রতিদৃশ্যে উপভোগ্য করে। সত্যজিৎ রায়ের সংলাপের মধ্যেই হিউমার। জটায়ু যখন ময়ূর দেখে

'ন্যাশনাল বার্ড' বলছেন তখন দর্শক হাসবে, হাসতে হবে তখন যখন অন্য মুকুল, 'মিস্টেক মিস্টেক', বলবে। তা ছাড়া জটায়ুর হিন্দী বলার ধরন দেখে তো হাসতে হাসতেই পেটে খিল ধরবে।

এ ছবিতে শিল্পীরা অভিনয় করেছেন বলে মনেই হয় না। এটাই শিল্পীদের বড়ো কৃতিত্ব, যা বিশেষভাবে দেখিয়েছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়—ফেলুদার ভূমিকায় অভিনয় করে। তাঁর অভিনয় বুদ্ধিদীপ্ত সপ্রাণ। তোপসের ভূমিকায় সিদ্ধার্থ চট্টোপাধ্যায় সপ্রতিভ। সবদিকে সর্বদা তার সতর্ক দৃষ্টি। আহত ডাক্তার হাজরার ভূমিকায় শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের মূক অভিনয়ের দৃশ্য স্মরণীয়। তাঁর রূপসজ্জা এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। জটায়ুর ভূমিকায় সন্তোষ দত্ত, ভিলেনদ্বয় অজয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও কামু মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়কে অভিনয় বলে চেনাই যায় না। অভিনয়াংশে সবার আগে মন কেড়ে নেয় মুকুলের চরিত্রে কুশল চক্রবর্তীর তন্ময় অভিনয়। ছ-বছরের শিশু কুশলকে দিয়ে পরিচালক কী করে এমন ব্যক্তিত্বময় চরিত্রের গভীরে প্রবেশ করালেন তা দেখে আমি বিস্মিত হয়েছি।

অভিনয়

সত্যজিৎবাবুর কাছে আমাদের অনুরোধ, আরও ছবি চাই। ছোটোদের জন্যে ছবি, কিশোরদের জন্যে ছবি। আমাদের নিজস্ব ছবি তৈরি হয় না বলেই তো আমরা বড়োদের ছবিতে ভাগ বসাই। সরকার ও অন্য পরিচালকদের বিষয়টা একবার ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়

১. একটি স্মরণীয় চলচ্চিত্র। ২. কিশোরদের জন্যে চলচ্চিত্র।

দুর্গোৎসব

[ভূমিকা—পৌরাণিক পটভূমি—দুর্গামূর্তি—বাঙালীর মনন—একাল সেকাল—উপসংহার।

যা দেবী সর্বভূতেষু—

'সর্বভূতেষু' কিনা জানি না, তবে বাঙালী হৃদয়ে যে এই দেবী যথার্থ মাতৃরূপেণ সংস্থিতা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই। বাঙালী সারা বছরে চলার শক্তি সঞ্চয় করে এই বৎসরান্তিক দুর্গোৎসব থেকে।

ভূমিকা

ঋগ্বেদের দেবীসূক্তের মাতৃদেবী-ই পৌরাণিক দুর্গায় বিবর্তিত কিনা সেটা তর্কের বিষয়। তবে বেদ-পুরাণ-তন্ত্র ইত্যাদি বা দর্শন ও উপাখ্যানের মিলিত ফল যে দুর্গা তা মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে। পুরাণে সুরথ রাজার বাসন্ত দুর্গোৎসবের কথা আছে। শ্রীরামচন্দ্রের দুর্গোৎসব অকালবোধন বলে কীর্তিত। শ্রীরামচন্দ্র শক্তিভিক্ষার জন্যে দেবীকে অকালে আহ্বান করে এনেছিলেন শরৎকালে। সেই থেকে শারদ দুর্গাপূজার প্রবর্তন। কিন্তু বাসন্ত দুর্গোৎসব যথার্থ সামাজিক উৎসব হয়ে উঠল না, উঠল শারদ দুর্গোৎসব। শরৎ সত্যিই উৎসবের ঋতু।

পৌরাণিক পটভূমি

বর্ষণ শেষ। নীল আকাশ। রোদে অদ্ভুত মাদকতা। সমস্ত প্রকৃতি প্রসন্ন। সবচেয়ে বড়ো কথা 'মাঠে মাঠে ধান ধরে না ক আর।' কৃষিপ্রধান দেশের মানুষের কাছে এর চেয়ে বড়ো উৎসবের ঋতু আর কী হতে পারে? চণ্ডীতে দেবীকে বলা হয়েছে শাকম্ভরী। কথাটি বিশেষ ইঙ্গিত বহন করে। দুর্গা প্রকৃতই ফসলের ঋতু। নবপত্রিকা পূজাই তার প্রধান প্রমাণ।

দুর্গার মূর্তি-পরিকল্পনায় আমাদের ভাব ও চিন্তাই প্রতিফলিত। পুরাণের মহিষাসুর-মর্দিনী দুর্গা আমাদের কাছে হয়েছেন অমঙ্গলনাশিনী মাতৃদেবী। লক্ষ্মী, সরস্বতী; কার্তিক, গণেশ যথাক্রমে ঋদ্ধি, বিদ্যা, শক্তি ও সিদ্ধির প্রতীক। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাবদৃষ্টিতে দুর্গা স্বদেশ-জননীর সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়েছেন। 'আমরা অন্য কোন মা মানি না, স্বদেশজননীই আমাদের মা।' ভবানন্দের এই বাণী দুর্গাকে আর দেশমাতৃকাকে এক করে দিয়েছে।

দুর্গামূর্তি

এই ভাবমূর্তির সঙ্গে মিলেছে বাঙালীর নিজস্ব মনন। বাঙালী মহিষাসুরমর্দিনী দেবীকে গৃহকন্যা করেছে:

বাঙালীর মনন

শরৎকালের রানী বলে বিনয় বচন
আর শুনেছ গিরিরাজ নিশার স্বপন
বৎসর হয়েছে গত করছে শিবের ঘর
যাও গিরিরাজ আনতে গৌরী কৈলাসশিখর।

মেয়েকে পরের ঘরে দিয়ে মায়ের যে হৃদয়-বেদনা আগমনী-বিজয়ার গানে তারই অনুরণন। তিনদিন পর উমা যখন আবার কৈলাসে যান তখন সমস্ত বাঙলার চোখে জল ভরে আসে।

বঙ্গদেশে দুর্গোৎসব অনেক কালের। সেই নবকৃষ্ণ দেবের ন লাখ টাকার পুজোর প্রবাদ বাদ দিলেও বাংলার সম্পন্ন গৃহস্থেরা 'আশ্বিনে অম্বিকা পূজা' করতেন। আর সেই উপলক্ষে সকলে আনন্দোৎসবে মেতে উঠতেন। গাছের পাতায় শরতের প্রথম রোদের ঝিলিক লাগতেই কুমোরপাড়ায় সাড়া পড়ত। ঢাকীরা ঢাক সারিয়ে নিত। আসন্ন মেলার সওদা বেচবার প্রস্তুতি নিত ব্যবসায়ীরা। আত্মীয়স্বজন এই সময়ে একসঙ্গে মিলত। একজনের পুজো হয়ে উঠত সর্বজনের পুজো।

একাল সেকাল

আজ সার্বজনীন পুজো বিশেষ অর্থ বহন করে। অনেকে মিলে চাঁদা তুলে যে-পুজো তাই হল সার্বজনীন পুজো। শহরে এখন এই সার্বজনীন পুজোরই ধুম। প্যাণ্ডেল, মাইক, আলোকসজ্জা আরও কত কী। প্রতিমা গড়ার উপকরণেও কত বৈচিত্র্য। আতিশয্য কোথাও নিশ্চয় আছে, তবু বাঙালীর শিল্পবোধ এই দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে নানাভাবে উৎসারিত হয়।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, দুর্গাপুজো এখন অবাঙালীদের মধ্যে সম্প্রসারিত। বাঙালী ও অবাঙালী মিলে সার্বজনীন পুজো চলেছে বিভিন্ন প্রদেশে। দুর্গাপুজো এইভাবে সাংস্কৃতিক ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করছে।

উৎসবের আনন্দটাই যেন মুখ্য না হয়ে ওঠে, দুর্গোৎসবের তাৎপর্যটা আমরা যেন হৃদয়ঙ্গম করি, ভ্রাতৃত্বের দৃঢ় বন্ধনে আমরা বাঁধা পড়ি, সকলের কল্যাণে উদ্বুদ্ধ হই। আর তা যদি না হয় :

উপসংহার

'তবে মিছে সহকার-শাখা
তবে মিছে মঙ্গল কলস।'

ঈদুজ্জোহা

[ভূমিকা—সময় ও পালনবিধি—উৎসবের ঐতিহাসিক পটভূমি—আধ্যাত্মিক তাৎপর্য—উপসংহার]

ভূমিকা

ঈদ মানে খুশি বা আনন্দ। ঈদুলফিৎর্ হল রোজার ঈদ আর ঈদুজ্জোহা কোরবানীর ঈদ। মূল শব্দটি 'ঈদ-আল্-আজহা' অর্থাৎ উৎসর্গের আনন্দ! 'ঈদ-আল্-আজহা' কথাটিই ধ্বনিসংশ্লেষে 'ঈদুজ্জোহা' উচ্চারিত।

সময় ও পালনবিধি

জুল হজ্জ চাঁদের ১০ তারিখে এই উৎসব পালিত হয়। এইদিন প্রতিটি মুসলিম পরিবার ছাগাদি পশু কোরবান করেন এবং পরিজন ও প্রতিবেশীদের তার মাংস বিতরণ করেন। নতুন জামাকাপড় পরে ভেদাভেদ ভুলে সবাই প্রফুল্ল অন্তরে পরস্পর আলিঙ্গনাবদ্ধ হন। এই আলিঙ্গন হল সৌভ্রাত্রের দ্যোতক।

এই দিন কোনো বড়ো মাঠ বা ময়দানে উচ্চনীচ ভেদাভেদ ভুলে সকলে একসঙ্গে নামাজ পড়েন। বিশ্ববিধাতার উদ্দেশে এই মিলিত শ্রদ্ধা নিবেদনের দৃশ্যটি মহৎ ও গম্ভীর ভাবোদ্দীপক। এই দিন মক্কা শরীফের আরফা ময়দানে দেশ-বিদেশের মুসলমান-ভায়েরা একসঙ্গে মিলিত হয়ে নামাজ পড়েন। এই মিলন বিশ্বভ্রাতৃত্বের এক অপূর্ব প্রতীক।

উৎসবের ঐতিহাসিক পটভূমি

হজরত ইব্রাহিম (আঃ) স্বপ্নাদেশ পেলেন তাঁর পুত্র ইসমাইলকে (আঃ) কোরবান করতে হবে। ইব্রাহিম তাঁর স্বপ্নাদেশের কথা প্রিয়পুত্র ইসমাইলকে জানালেন। ইস-মাইল অবিচলিত কণ্ঠে বললেন, 'পিতা, আপনি ঈশ্বরের আদেশ পালন করুন, আমাকে উৎসর্গ করুন। ধন্য হোক আমার জীবন।' ইব্রাহিম ইসমাইলকে নিয়ে গেলেন পর্বতে। হাতে নিলেন তীক্ষ্ণধার অস্ত্র, চোখ বেঁধে নিলেন নিজের। ইসমাইল শায়িত। এইবার আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে ইব্রাহিম আঘাত করলেন পুত্রের দেহে। দ্বিখণ্ডিত হল সে দেহ। কিন্তু ঈশ্বরের বাণী ধ্বনিত হল, 'ইব্রাহিম তাকিয়ে দেখো তোমার পুত্র অক্ষত। তার পরিবর্তে একটি দুম্বার দেহ দ্বিখণ্ডিত হয়েছে। আমি দুম্বাকে পাঠিয়েছি।' ইব্রাহিম আনন্দে বুকে জড়িয়ে ধরলেন পুত্রকে। সেইদিন থেকে প্রবর্তিত হল কোরবানী—ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রিয়তম বস্তু উৎসর্গের প্রতীক হিসাবে ছাগাদি উৎসর্গ।

ঈদুজ্জোহা আসে ঈশ্বরপ্রেমের বার্তা নিয়ে : হে ঈশ্বর আমি তোমার সান্নিধ্য চাই তোমার জন্যে আমার প্রিয়তম বস্তুটি উৎসর্গ করতে আমি কুণ্ঠিত নই। আমাকে পবিত্র করো। এই ছাগাদি উৎসর্গ মানুষের কুমতি আর রিপুকে বলি দেবার প্রতীক। আর ঈদুজ্জোহা সৌভ্রাত্রের প্রতীক-উৎসবও বটে। ঈশ্বর এক, আমরা তাঁর সন্তান, আমরা একই সূত্রে গ্রথিত—এই ভাবটিও এই উৎসবের মূলে আছে।

আধ্যাত্মিক তাৎপর্য

উৎসবের আনন্দ তো আছেই কিন্তু উৎসবটি যেন আনন্দসর্বস্ব না হয়। এর তাৎপর্যটি হৃদয়ঙ্গম করে মানুষে মানুষে প্রীতির সেতু গড়ে তুলব এই হোক প্রার্থনা। 'ঈদ' কথাটির একটি অর্থ যা ফিরে ফিরে আসে। প্রতি বছরই ফিরে আসবে ঈদুজ্জোহার উৎসব। আমরাও দৃঢ়তর শপথে বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের পতাকা উড্ডীন করব আর সেই সঙ্গে মনে রাখব ইসমাইলের কণ্ঠে ধ্বনিত ত্যাগের সেই অমৃতবাণী : ঈশ্বরেচ্ছায় তুমি আমাকে অবিচলিত দেখতে পাবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় : একটি মুসলিম উৎসব।

সমাজে উৎসবের ভূমিকা

[উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮২]

[ভূমিকা—মানুষের জীবনে কাজ ও উৎসব—উৎসবের অবদান ও সংস্কৃতির প্রকাশ—উৎসবের শ্রেণীবিভাগ—উৎসবের অর্থনৈতিক দিক—উপসংহার।]

আমাদের আনন্দ যখন পরিবার-জীবনের সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যোগসূত্র রচনা করে সকলের শুচিস্পর্শে ধন্য হয় তখনই তাকে বলি উৎসব। উৎসবের মধ্যে আমাদের ব্যক্তিগত আনন্দ হয়ে ওঠে বহুর আনন্দ। বলেন্দ্রনাথ বলেছেন, "আমার আনন্দ সকলের আনন্দ হোক, আমার শুভে সকলের শুভ হোক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।"

ভূমিকা

কর্ম হল মানুষের ধর্ম। কর্মহীন মানুষ জড় পদার্থ, প্রাণহীন। সেই আদি যুগ থেকে শুরু করে মানুষ নিজের চেষ্টায় সভ্যতার সুউচ্চসোপানে আরোহণ করেছে। তার উন্নতির মূলমন্ত্র হল কর্ম। কাজ না করে আমরা যদি আলস্যে দিন কাটাতাম তাহলে আমাদের সভ্যতা আজও সেই প্রস্তর যুগের সভ্যতা হয়ে থাকত। কিন্তু কেবল কাজ আর আর কাজ মানুষকে যন্ত্রে পরিণত করে। তাই মানুষ একঘেয়ে কর্মের ক্লান্তি দূর করার জন্যে নানা উৎসবের আয়োজন করেছে। উৎসব হল কর্মময় জীবনের শক্তি, যে-শক্তির অমৃতস্পর্শে মানুষ আবার নতুন করে ফিরে পায় কর্মের উদ্যম। এ সত্য প্রাচীন কালের মানুষ উপলব্ধি করেছিল বলেই সমাজে উৎসবের জন্ম হয়েছে।

মানুষের জীবনে কাজ ও উৎসব

মানুষের জীবনেও পৃথিবীর গতির মতো দুটি গতি আছে, একটির নাম আহ্নিক গতি, অন্যটির নাম বার্ষিক গতি। আহ্নিক গতিতে মানুষ দৈনন্দিন কর্মে রত থাকে, অন্য-গতিতে মানুষ সম্বৎসর সমাজের আর-পাঁচজনকে নিয়ে ধন্য হতে চায়। এটাই তার স্বার্থহীন সামাজিক রূপ। উৎসবের মধ্যে মানুষের এই স্বার্থহীন সামাজিক রূপটাই প্রকাশ পায়। উৎসব যেমন কর্মময় একঘেয়ে জীবনের অবসান ঘটিয়ে মানুষকে নব উদ্দীপনা এনে দেয় তেমনি আবার প্রকাশ করে মানুষের শিল্পী ও সাংস্কৃতিক রূপের এক অপরূপ ছবি। উৎসবকে কেন্দ্র করে শিল্পী আঁকেন, কবি-সাহিত্যিক লেখেন, ছেলেমেয়েরা গান করে, মহিলারা বিশেষ বিশেষ ধরনের রন্ধন শিল্পের আয়োজন করেন। এই ভাবে উৎসব কেবল আমাদের আনন্দই দেয় না, সেই সঙ্গে শুভ উৎসব হয়ে ওঠে শিল্প-সংস্কৃতি প্রকাশের মাধ্যম।

উৎসবের অবদান ও সংস্কৃতির প্রকাশ

মানুষ বিভিন্ন পরিবেশে ও ধর্মীয় আবেষ্টনীর মধ্যে উৎসবের আয়োজন করে। তাই সমাজে আজ নানান উৎসবের সমারোহ। কোনো উৎসব ধর্মীয়, কোনো উৎসব ঋতুকেন্দ্রিক, কোনো উৎসব সামাজিক এবং কোনো উৎসব জাতীয়।

উৎসবের শ্রেণীবিভাগ

ভারতে বিভিন্ন ধর্মের মানুষের বাস। তাদের ধর্মীয় উৎসব-অনুষ্ঠানে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়ে ওঠে। ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে নববর্ষ-উৎসব, দশহরা, ঈদ্, মহরম, রথযাত্রা, রাখী পূর্ণিমা, দুর্গোৎসব, লক্ষ্মীপুজো, দেওয়ালী, ছটপরব ও খ্রীসমাস প্রভৃতি প্রধান।

প্রকৃতির রূপ-রঙ বদলের সঙ্গে মানুষের মনেও রঙ বদল হয়। প্রাচীনকাল থেকেই মানুষের মনে ঋতুকেন্দ্রিক উৎসবের জন্ম হয়েছে। এদের মধ্যে বৃক্ষরোপণ, বর্ষামঙ্গল, নবান্ন-হোলি উৎসব প্রভৃতি প্রধান।

আমাদের ঘরে ঘরে সামাজিক উৎসব তো লেগেই থাকে। অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন, বিবাহ, জামাইষষ্ঠী প্রভৃতি সামাজিক উৎসবের অন্তর্গত।

সমাজে নবনব উৎসবেরও জন্ম হয়। ভারতের জাতীয় উৎসবগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, অথবা পঁচিশে বৈশাখ আজ জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

উৎসব আমাদের মনের খোরাক যোগায়, নির্মল আনন্দ দান করাই তার একমাত্র লক্ষ্য। কিন্তু উৎসবের একটা অর্থনৈতিক দিকও আছে। এই উপলক্ষে মেলা বসে, যেখানে চলে বিভিন্ন পণ্যের কেনা-বেচা। এই ভাবে কামার, তাঁতি, বাজিকর, মালাকার—বিভিন্ন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত মানুষ এখানে খুঁজে পায় পণ্যের বাজার। ফলে সমাজেরও ঘটে অর্থনৈতিক উন্নতি।

উৎসবের অর্থ-নৈতিক দিক

অনেক সময় আমরা ভুলে যাই সমাজের আনন্দে এবং কল্যাণে আমাদের কল্যাণ। উৎসব-অনুষ্ঠানে হৃদয়ের প্রতিষ্ঠা অপেক্ষা যদি সম্পদের গরিমা প্রবল-ভাবে আত্মপ্রকাশ করে তা হলে উৎসবের সব সার্থকতাই নষ্ট হয়। উৎসবের মধ্যে আছে সমাজবোধ আর সমাজকল্যাণের বীজ, তাকে অঙ্কুরিত করে তোলাই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য।

উপসংহার

চিন্তাসহায়ক বাণী

আনন্দের ভোজে বাহিরের চেয়ে অন্তরের অনুষ্ঠানটাই গুরুতর। —রবীন্দ্রনাথ

যে মাহেন্দ্রক্ষণে আমরা খণ্ডকে মিলিত করিয়া দেখি, সেই ক্ষণেই সেই মিলনেই আমরা সত্যকে উপলব্ধি করি এবং সেই অনুভূতিতেই আমাদের আনন্দ। —রবীন্দ্রনাথ

কোনো স্থানীয় উৎসব

[ভূমিকা—স্থানীয় উৎসব কাকে বলে—স্থানীয় উৎসবের নাম ও অবস্থান—উৎসবের অঙ্গ—উৎসবের বর্ণনা—উপসংহার।]

ভূমিকা

উৎসব-প্রাণ বাংলার বারমাসে তের পার্বণ, উৎসব আর উৎসব। একদিন এমন ছিল এক উৎসব শেষ হতে না হতেই আর এক উৎসবের আগমনী বেজে উঠত। আসলে উৎসব-প্রাঙ্গণ চণ্ডীমণ্ডপে ছিল না, উৎসবপ্রাঙ্গণ ছিল বাঙালীর হৃদয়ে। বাইরের অনুষ্ঠান তো কেবল হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। বাংলার উৎসব বাঙালীর অফুরন্ত প্রাণধারার নিদর্শন।

স্থানীয় উৎসব কাকে বলে

উৎসবপ্রাণ বাংলার শ্রেষ্ঠ উৎসবগুলির পরেও আছে অসংখ্য অখ্যাত উৎসবের বন্যা। দুর্গোৎসব দেওয়ালি উৎসব হল বাংলা তথা ভারতের জাতীয় উৎসব। এই সব উৎসবের সঙ্গে প্রত্যেক বাঙালীর পরিচয় আছে। কিন্তু পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন জেলায় এমন অসংখ্য স্থানীয় উৎসব আছে যার পরিচয় হয়তো অনেকের জানা নেই। আঞ্চলিক ভাষার মতো এই সব আঞ্চলিক উৎসব সেই বিশেষ অঞ্চলের মানুষকে শত শত বছর ধরে শক্তি এবং আনন্দ দান করে এসেছে। এই ভাবে বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বেজে চলে চেনা ও অচেনা উৎসবের বাঁশি।

স্থানীয় উৎসবের নাম ও অবস্থান

আমাদের আলোচ্য উৎসবটি যদিও এক স্থানীয় শ্মশান-কালী পুজোকে কেন্দ্র ক'র সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু এর ধর্মীয় আচার-আচরণের দিকটি কখনই বড়ো হয়ে ওঠে নি। বড়ো হয়ে উঠেছে উৎসবের মতো এর মিলন আর আনন্দের দিকটি। তাই বিভিন্ন ধর্মের মানুষ এই কালীপুজোর উৎসবকে কেন্দ্র করে মিলিত হয়।

মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার কংসাবতীর তীরে সেকেন্দারী গ্রামে অনুষ্ঠিত হয় এই ফল আহারিণী শ্মশান কালীর পুজোর উৎসব। শ্মশানের ওপর প্রতিষ্ঠিত কালীমন্দির। মন্দিরের চারদিকে মেলাপ্রাঙ্গণ। বছরের অন্য সময় এই প্রাঙ্গণ ভাঙা মন্দির বুকে নিয়ে ঘুমিয়ে থাকে কিন্তু জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যার তিথিতে সহসা মানুষের কলতানে ঘুমন্ত প্রাঙ্গণ জেগে ওঠে, ভোর থেকে রাত, প্রায় এক পক্ষকাল।

মেলা হল গ্রামীণ উৎসবের অঙ্গ। গ্রামে যে-কোনো উৎসবকে কেন্দ্র করেই মেলা বসতে দেখা যায়। সেকেন্দারী গ্রামের ফল আহারিণী কালীপুজোর উৎসবকে কেন্দ্র করে তার বিশাল প্রাঙ্গণে বসে মেলা। নির্দিষ্ট দিনে মানুষের কলতানে শ্মশানের নীরবতা ভাঙলেও উৎসবের আয়োজন শুরু হয়ে যায় তার অনেক আগেই। তৈরি হয় বাঁশের নহবৎমঞ্চ, মেলার জন্যে দোকান-পশার। খড় আর তাল পাতায় ছাওয়া সদ্য-তৈরি চালাঘর থেকে ভেসে আসে মিষ্টি সোঁদাগন্ধ। যে গন্ধ বলে দেয়, "উৎসব এসে গেল বন্ধু, তোমার পয়সা জমানো সার্থক।"

উৎসবের অঙ্গ

গ্রামের মানুষ এই উৎসব আর মেলার জন্যে সারাটা বছর আকুল হয়ে প্রহর গণনা করে, পয়সা জমায়, গ্রামের মেয়েরা শ্বশুরঘর থেকে বাপের বাড়িতে আসে। চারদিকে বেজে ওঠে ছুটির বাঁশি। এখানকার স্থানীয় মানুষের কাছে দুশো বছরের পুরনো এই উৎসবটি দুর্গোৎসবের চেয়ে কম আকর্ষণীয় নয়। তাই স্থানীয় মানুষ প্রাণ উজাড় করে নানাভাবে এই উৎসবকে আকর্ষণীয় করে তোলে। মেলায়, যাত্রায়, গানে হাসি আর হুল্লোড়ে কদিন শ্মশানের প্রাঙ্গণ হয়ে ওঠে মিলনক্ষেত্র।

প্রত্যূষে বাঁশের নহবৎ মঞ্চ থেকে বেজে ওঠে সানাইয়ের সুরে ভৈরবী। শ্মশানকালিকা দেবী হলেন ফল-আহারিণী। তাই ফল হল পুজোর নৈবেদ্য। গ্রামের কিশোর-কিশোরীর দল সকাল থেকে শুরু করে ফলের নৈবেদ্য সাজানোর কাজ। ফল-ফল আর ফল। এক সময় সৃষ্টি হয় একটি ছোটোখাটো ফলের পাহাড়। বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পুজো প্রাঙ্গণ মেলা প্রাঙ্গণে পরিণত হয়। নতুন জামা-কাপড় পরে আসে এ গ্রাম ও গ্রামের ছেলেমেয়ে, কৃষাণবধূ আসে কাঁচের চুড়ির সন্ধানে, পাঁপড় ভাজার গন্ধে মেলার বাতাস ভারী হয়ে যায়। পুজোর শেষে এখানে হাতে হাতে প্রসাদ বিতরণ করা হয় না, মন্দিরসংলগ্ন বিশাল আটচালায় পাতা পেতে চেনা-অচেনা মানুষকে পেটভরে খাওয়ানো হয় ফল আর মিষ্টি। এটাই এই স্থানীয় উৎসবের বিশেষত্ব। আগে ভিনদেশী অতিথি সৎকারের পর তবেই স্থানীয় মানুষ প্রসাদ গ্রহণ করে। এখানে একদিন রাত্রে অবশ্যই যাত্রার অনুষ্ঠান থাকে। যাত্রা হয় মন্দিরের আটচালায়। অপরাহ্ণ বেলায় কামান দেগে যাত্রার সঙ্কেত পাঠানো হয়। স্থানীয় মানুষ এ সঙ্কেত বোঝে। তাই সন্ধ্যে হতে না হতেই হাতে লণ্ঠন নিয়ে সারবন্দী মানুষ আলপথ ধরে চলতে থাকে সেকেন্দারী গ্রামের বারোয়ারীতলার দিকে। অন্ধকারের বুকের ওপর বিন্দু বিন্দু সোনার টিপ।

উৎসবের বর্ণনা

জেলার বাইরে স্থানীয় এ উৎসবের কথা কেউ জানে না। আমাদের মনে হয় কলকাতার দূরদর্শন কেন্দ্রের এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া উচিত। বাংলার গ্রামে গ্রামে এই ধরনের নানান স্থানীয় উৎসব ছড়িয়ে আছে। দূরদর্শনের মাধ্যমে তাদে প্রচার ও প্রসারের প্রয়োজন। তা হলে স্থানীয় উৎসব হয়ে উঠবে সার্বজনীন এক শুভ উৎসব, সারা দেশের, সারা বাংলার।

উপসংহার

বাঙালীর উৎসব—সেকাল ও একাল

[ভূমিকা—জন্মের কারণ—উৎসবের শ্রেণীবিভাগ—একাল সেকাল—চিন্তার কথা—নতুন উৎসব উপসংহার।]

আমাদের আনন্দ যখন পরিবার জীবনের সীমা অতিক্রম করে বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে যোগ সূত্র রচনা করে সকল মানবের শুচিস্পর্শে ধন্য হয় তখনই তাকে বলি উৎসব।

ভূমিকা

আমাদের ব্যক্তিগত আনন্দ হয়ে ওঠে বহুর আনন্দ। "আমার আনন্দ সকলের আনন্দ হোক, আমার শুভ সকলের শুভ হোক, আমি যাহা পাই তাহা পাঁচ জনের সহিত মিলিত হইয়া উপভোগ করি—এই কল্যাণী ইচ্ছাই উৎসবের প্রাণ।"

কেবল আনন্দ লাভের প্রেরণায় উৎসবের জন্ম হয়েছিল এমন কথা মনে করা ভুল। আসলে সামাজিক মানুষের কামনা পূরণের ছায়াপাত ঘটেছে এই উৎসবের মধ্যে।

জন্মের কারণ

দুর্গাপুজো ধর্মীয় উৎসব। সমাজের মানুষ কবে নিজের দুর্গতি মোচনের কামনা করেছিল তাই সেই দুর্গতিহারিণী দেবী দুর্গার আশ্রয় প্রার্থনা করেছে। 'পুণ্যিপুকুর' লৌকিক উৎসব, শুধু উৎসব নয়, মেয়েলি ব্রত। দেশ ঘিরে বর্ষা নামুক। ধরণী ধনে ধানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠুক, এই উৎসবের পিছনে ছিল সেই কামনা।

বঙ্গদেশে চিরকাল বারোমাসে তেরো পার্বণ ছিল। কোনো উৎসব ঋতুকেন্দ্রিক, কোনো উৎসব সামাজিক, আবার কোনো উৎসব জাতীয়। ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে নববর্ষ উৎসব,

উৎসবের শ্রেণীবিভাগ

দশহরা, ঈদ্‌, মহরম, রথযাত্রা, রাখীপূর্ণিমা, দুর্গোৎসব, দেওয়ালী, বড়োদিন প্রভৃতি প্রধান।

প্রকৃতির রূপ-রঙ বদলের রঙ্গে মানুষের মনেও রঙ বদল হয়। প্রাচীন কাল থেকে মানুষের মধ্যেও ঋতুকেন্দ্রিক উৎসবের জন্ম হয়েছে। এই সব উৎসবের মধ্যে বৃক্ষরোপণ উৎসব, বর্ষামঙ্গল, নবান্ন, হোলি উৎসব প্রভৃতি প্রধান।

বাংলার ঘরে ঘরে তো সামাজিক উৎসব লেগেই থাকে। অন্নপ্রাশন-চূড়াকরণ, উপনয়ন-বিবাহ-জামাই ষষ্ঠী প্রভৃতি হল সামাজিক উৎসবের অন্তর্গত।

সমাজে নব নব উৎসবেরও জন্ম হয়। বাংলা তথা ভারতের জাতীয় উৎসবগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, পঁচিশে বৈশাখ, নেতাজীর জন্মদিন, শিশু দিবস আজ জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে।

প্রাচীন বাংলায় বারো মাসে তেরো পার্বণ ছিল। আজও আছে। হয়তো পার্বণের সংখ্যা এখন তেরো ছাড়িয়ে ছাব্বিশে দাঁড়িয়েছে কিন্তু সেই আনন্দ কোথায়? যে-পাপেই হোক না কেন সমাজজীবন থেকে আজ আনন্দ নির্বাসিত। তাই সেখানে বাঁশি আর বাজে না! বাঁশির স্থান দখল করেছে মাইক। উচ্চতম গ্রামে সুতীব্র তানে নিনাদিত

একাল সেকাল

মাইক। আজকাল ঘেঁটু পুজোর উৎসবেও মাইক বাজে! উৎসবে আজ আর সানাই বাজে না, বাজে না শঙ্খ, শোনা যায় না উলুধ্বনি। অতীত উৎসবের সেই শুচিস্নিগ্ধ রূপ আজ আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কেবল বাইরের রূপেই নয়, অনেক প্রাচীন উৎসবেরও বিলুপ্তি ঘটেছে। এ রূপান্তর ঘটেছে কালধর্ম অনুসারে। এ যুগ ব্যস্ততার যুগ—ঋতু-উৎসবগুলি প্রায় লুপ্ত হতে বসেছে। সামাজিক উৎসব হয়ে আসছে সংক্ষিপ্ত। উপনয়নের পর আজ আর নবীন ব্রহ্মচারীকে তিন দিন অন্ধকার ঘরে বন্দী থাকতে হয় না। কোথাও কোথাও মস্তক মুণ্ডন রীতিও বন্ধ হয়েছে। বাঙালী আজ বুঝতে পেরেছে, অন্ন যেখানে নেই সেখানে নবান্ন উৎসব হাস্যকর। অর্থের অভাবেই বোধ হয় মনোরম হোলি খেলা আজ কর্দমলীলায় পর্যবসিত। উৎসব এখন আর আনন্দের উৎসব নয়, বহু ক্ষেত্রেই আতঙ্কের উৎস। বারোয়ারী চাঁদার বিভীষিকা!

কিন্তু যে-কোনো উৎসবই হোক অতীতে তা আমাদের হৃদয়-ভাবের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেই হৃদয়ের সম্পর্কে ফাটল দেখা দিয়েছে বলেই ব্যাপারটা চিন্তনীয়। ভাইফোঁটা বাঙালীর একটি স্নিগ্ধ উৎসব—বোনেরা ভাইয়ের কপালে কাজল ও চন্দনের টিপ দিয়ে ভাইয়ের আয়ু বৃদ্ধির কামনা করে। এমন আর একটা পবিত্র ও করুণ অনুষ্ঠানের কথা ভাবা যায় না। কিন্তু এমন অনুষ্ঠানেও বোনেরা থালা সাজিয়ে বসে থাকে, কাজের তাড়ায় ভাই আসবার সময় পায় না। এ যেন উৎসবের অপমৃত্যু।

চিন্তার কথা

একালে এমন কিছু কিছু জাতীয় উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে যা সেকালে ছিল না। যেমন স্বাধীনতা দিবসের উৎসব, সাধারণতন্ত্রদিবস ও রবীন্দ্রজয়ন্তী প্রভৃতির উল্লেখ করা চলে। এসব উৎসব আমাদের দেশে নিষ্ঠার সঙ্গেই পালন করা হয়। তাই মনে হয়, কোনো কোনো প্রাচীন, সামাজিক বা ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে মানুষ আজ পূর্বের সেই আনন্দ ও আকর্ষণ খুঁজে পায় না—তাই সেগুলির অনুষ্ঠান নিত্যকর্ম পদ্ধতির মতো বছরের বিশেষ দিনে বা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়ে চলে। উৎসবপ্রাণ বাংলার হৃদয়ের উৎস যে শুকিয়ে যায় নি, জাতীয় উৎসবগুলিই তার প্রমাণ। কোনো কোনো সামাজিক ও ধর্মীয় উৎসবের অবক্ষয়ের কারণ অনুসন্ধান আমাদের এক জাতীয় কর্তব্য।

নতুন উৎসব

বর্তমানে উৎসবের ভাবসত্যের কথা ভুলে গিয়ে আমরা বাইরের আড়ম্বরের দিকে বেশি করে নজর দিয়েছি। তাই আমাদের উৎসবে বাঁশি বাজে না, বাজে মাইক। প্রাচীন উৎসবের মধ্যে যে-শুচিতা যে-কল্যাণ ছিল, যে-প্রীতির টানে বহু এক হতে পারত, আবার তা ফিরিয়ে আনতে হবে। কারণ উৎসব হল রাখীবন্ধন, এ রাখী ভ্রাতৃত্বের, এ রাখী কল্যাণের।

উপসংহার

বাংলার নববর্ষ উৎসব

[ভূমিকা—প্রাচীন নববর্ষ উৎসব—বর্তমানে নববর্ষ উৎসব—নববর্ষের অনুষ্ঠান—উৎসবে সেকাল-একালের প্রভেদ—উপসংহার।]

ভূমিকা

আনন্দের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ মানুষের সহজাত ধর্ম। এই আনন্দ মানুষ একা একা উপভোগ করতে চায় না, পরিবারের এবং সমাজের পাঁচজনকে নিয়েই তার আনন্দের পূর্ণতা। আনন্দ যখন একা নিজের তখন তা ব্যক্তিগত সম্পদ কিন্তু যখন আনন্দ ব্যক্তিজীবনকে অতিক্রম করে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ে তখনই তা উৎসবের রূপ নেয়। উৎসবের এই সর্বজনীন দিকটিই উৎসবের মর্মকথা।

প্রাচীন নববর্ষ উৎসব

একসময় অগ্রহায়ণ মাস থেকে বর্ষ আরম্ভ হত। মানুষ সেদিন চন্দ্রসূর্যের গতি দেখে বর্ষগণনা করতে শেখে নি, শিখেছিল প্রাকৃতিক স্বভাবের লক্ষণ দেখে কিন্তু কালের গতি বদলায়, তাই একসময় অগ্রহায়ণের বদলে বৈশাখ থেকেই শুরু হল বর্ষগণনা। বিশাখা নক্ষত্রযুক্ত মাস বৈশাখ মাস আমাদের কাছে একটি পবিত্র মাস।

বর্তমানে নববর্ষ উৎসব

বর্তমানে বৈশাখ মাস থেকে শুরু হয় নতুন বছর। এটি আমাদের কাছে পুণ্যমাস। এই দিনটিতে আমরা ভুলে যাই অতীতের গ্লানি, যত ক্ষয়ক্ষতি। এদিনের নতুন প্রভাত আমাদের কাছে নতুন বাণী বয়ে আনে। একদিক থেকে নববর্ষ আমাদের নবপ্রাণ, নব আনন্দ-চেতনার জন্ম দেয়। তাই নববর্ষ আমাদের সবচেয়ে বড়ো উৎসব।

নববর্ষের অনুষ্ঠান

পল্লীবাংলার কোথাও কোথাও নববর্ষে মেলা বসে। মেলায় মেলামেশার আনন্দে পণ্যবিক্রয়ের লেনদেনে নববর্ষ হয়ে ওঠে মুখর। নানা প্রতিষ্ঠানে হালখাতার মহরৎ উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হয় সিদ্ধিদাতা গণেশের পূজো। আমন্ত্রিত ক্রেতাদের মিষ্টান্ন দিয়ে আপ্যায়ন করা হয়। কোথাও নাচগানে, শোভাযাত্রা এবং সভাসমিতিতে দিনটি হয়ে ওঠে অনবদ্য। শহরে কোথাও কোথাও প্রভাতফেরীর মাধ্যমে দিনটির শুভ সূচনা হয়। নববর্ষ উৎসব উদ্‌যাপনের জন্যে নির্মিত হয় উৎসব মণ্ডপ। নববর্ষ-সন্ধ্যায় সেখানে চলে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এক কথায় সারা বাংলা এদিনে উৎসবের এক পরিপূর্ণ মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। সর্বত্রই সহজ অবারিত আন্তর-প্রীতির বন্যা বয়ে যায়, সকলের মুখেই আঁকা থাকে প্রফুল্লতার উজ্জ্বল দীপ্তি।

উৎসবে সেকাল-একালের প্রভেদ

প্রাচীন নববর্ষের উৎসবের সঙ্গে আধুনিক নববর্ষের একটা প্রভেদ চোখে পড়ে। প্রাচীনকালে নববর্ষের উৎসব ছিল কিছুটা ধর্মীয় উৎসব, পূজা-অর্চনা জাতীয় আচরণ আর কিছুটা ব্যবসাগত দিক। এখন এই উৎসব জাতীয়তার ভাব-ধারার দ্বারা সমৃদ্ধ। পূজার্চনা গৃহগত উৎসব অবশ্যই আছে—সেই সঙ্গে আমরা স্বার্থমগ্নতার ক্ষুদ্র গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে এক মহা-জীবনের উদার সান্নিধ্য অনুভব করি। কিন্তু সেকালে নববর্ষ উৎসবের মধ্যে যে-প্রাণপ্রাচুর্য

ছিল বর্তমানে তা যেন কমে এসেছে। এখন উৎসবের মধ্যে সাজ আছে, ঘটা আছে কিন্তু প্রাণ নেই। বলেন্দ্রনাথ বলেছেন: "সমারোহসহকারে আমোদ-প্রমোদ করায় আমাদের উৎসবকলা কিছু মাত্র চরিতার্থ হয় না।" বর্তমান নববর্ষের উৎসবে বলেন্দ্রনাথের এই কথা আমাদের মনে রাখতে হবে।

উপসংহার

পয়লা বৈশাখ জীবনের পথে নতুন উৎসাহে যাত্রা করার দিন তাই এই দিনটিকে আর সব দিনের থেকে আলাদা করে রাখতে হবে, রাখতে হবে অমলিন পবিত্র।

বিদ্যাসাগর

[ভূমিকা—বাল্যকাল ও যৌবন—বিদ্যাসাগর—কর্মজীবন—স্বাধীন কর্মক্ষেত্র—দরদী মন—উপসংহার।]

ভূমিকা

'বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাঁহারা খুব বড় বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত, ঐ গ্রন্থ এক-খানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন।' আচার্য রামেন্দ্রসুন্দরের এই উক্তি যথার্থ। চারপাশে সমতল ভূমি, তার এই শালপ্রাংশু ব্যক্তিত্বের সম্মুখীন হওয়া মাত্র মনে হবে—বিধাতা বাঙালী গড়তে গড়তে ভুলে এক মানুষ গড়ে ফেলেছেন।

মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খ্রীস্টাব্দের ২৬-এ সেপ্টেম্বর রামজয় তর্কভূষণ ঘোষণা করলেন, 'ওরে, একটা সুসংবাদ শোন, আজ আমাদের এক এঁড়ে বাছুর জন্মাল। অতিদরিদ্র এক হিন্দু ব্রাহ্মণ পরিবারের এই 'এঁড়ে বাছুর'ই ঈশ্বরচন্দ্র।

বাল্যকাল ও যৌবন

ঈশ্বরচন্দ্রের বাল্যকাল কাটে দারিদ্র্যের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করতে করতে। গ্রাম্য পাঠশালার পাঠ সমাপ্ত হওয়ার পর পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁকে নিয়ে এলেন কলকাতায়। পিতার ইচ্ছা, পুত্রের প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ হোক। মেদিনীপুর থেকে আসার পথে মাইলস্টোন দেখেই ঈশ্বর ইংরেজী সংখ্যা শিখে ফেলেছিলেন। এই আগ্রহ, নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও জ্ঞানার্জনের তৃষ্ণা আজীবন ঈশ্বরচন্দ্রকে সচল করে রেখেছিল—তাঁর জীবনসংগ্রামে এনে দিয়েছিল অনবদ্য এক গতি। কলকাতায় তাঁর বাসস্থান স্থির হল বড়বাজারে। সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত হওয়ার কামনায়। কিন্তু বঙ্গদেশে তখন আলোড়িত নব্য ইংরেজীশিক্ষিত যুবক সমাজের পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রতি একান্ত অনুরাগের বিক্ষুব্ধ তরঙ্গে। বিদ্যাসাগরের জন্মের বহু পূর্বেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে, বিদ্যাসাগরের জন্ম হয়েছিল রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ এই সময়কালের মধ্যভাগে। সংস্কৃত শিক্ষা ও সনাতন হিন্দুধর্মের বিস্তীর্ণ আগাছা পরিবৃত অঞ্চলে সনাতনপন্থীরা সাহস করেন নি সংস্কারের কাজে অগ্রণী হতে। সংস্কৃতশিক্ষায়

শিক্ষিত হয়েও বিদ্যাসাগর ব্রতী হলেন পাশ্চাত্ত্যশিক্ষার সঙ্গে সমন্বয় সাধনার ব্রতে। যুগ-চেতনাকে গ্রহণ করার মানসিক ঔদার্য বিদ্যাসাগরচরিতকথার একটি বৈশিষ্ট্য।

'বিদ্যাসাগর'

সতেরো বছর বয়সে স্মৃতি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন ঈশ্বরচন্দ্র। বেদান্ত, ন্যায় ইত্যাদি সংস্কৃত কলেজের বিভাগগুলির সমস্ত পাঠ সাঙ্গ করে ঈশ্বরচন্দ্র বিবিধ শাস্ত্রে পারঙ্গম হয়ে উঠলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের বহুশ্রুত উপাধি—পরবর্তী কালে যা নামেই পর্যবসিত হয়েছিল—সেই 'বিদ্যাসাগর' উপাধি এই সময়েই তাঁকে দেওয়া হয়।

কর্মজীবন

ঈশ্বরচন্দ্রের কর্মজীবনের শুরু ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিতরূপে (২৯-এ ডিসেম্বর, ১৮৪১ খ্রীস্টাব্দ)। ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর পর্যন্ত বিদ্যাসাগর সরকারী শিক্ষা বিভাগের সঙ্গেই যুক্ত ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রীস্টাব্দে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদক হলেন। সেখান থেকে আবার এলেন ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে। বৃত হলেন সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যের অধ্যাপক পদে, অবশেষে অধ্যক্ষ পদে। কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটায় তেজস্বী বিদ্যাসাগর ১৮৫৮ খ্রীস্টাব্দে পদত্যাগ করেন—সরকারি চাকুরি ও চাকুরীজীবনের এখানেই ইতি। এই দীর্ঘ সময়ে শিক্ষাসংস্কারে ঈশ্বরচন্দ্রের একনিষ্ঠ প্রয়াস দেখা গিয়েছে বারবার। সরকারী নীতির সঙ্গে ঘটেছে আদর্শ ও নীতির সংঘর্ষ। এই সময়ের মধ্যে তিনি সরকারী পরিদর্শকরূপে শিক্ষাবিস্তারের অপরিসীম প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন, বহু বিদ্যালয় ও বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন, দেশের শিক্ষাসংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, নারীশিক্ষাবিস্তারের দুরূহ কাজটিকে সহজসাধ্য করে তুলেছেন।

স্বাধীন কর্মক্ষেত্র

চাকুরী-জীবন থেকে অবসর নিয়ে বিদ্যাসার কিন্তু আত্মমুখী চিন্তায় দিনাতিপাতের কথা ভাবেন নি। ভেবেছিলেন এই কুসংস্কারাচ্ছন্ন সমাজব্যবস্থার কিছু সংস্কারের কথা। তাঁর এই কর্মপ্রবাহ প্রধানত ত্রিধারায় বিভক্ত। প্রথমত, বিধবাবিবাহের প্রচলনে শাস্ত্রীয় অনুশাসনের বিধিনিষেধ খণ্ডন করলেন। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাজগতের সংস্কারে এগিয়ে এলেন, স্বকীয় রচনা ও সম্পাদনার প্রতিভা নিয়ে। বেথুন স্কুল, মেট্রোপলিটন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। এই সময়েই তিনি কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষক, পাঠ্যনির্বাচক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। তৃতীয়ত, সাহিত্যক্ষেত্রে শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার বিষয়ে গ্রন্থ রচনা তাঁর এই সময়েরই কাজ।

দরদী মন

এই বহুমুখী কর্মকাণ্ডে বিদ্যাসাগরের যথেষ্ট পরিচয় পরিচয় পাওয়া গেলেও স্বাধীনচেতা, নির্ভীক, মানবপ্রেমিক এই মানুষটির পরিচয় পাই অন্য কোথাও—তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপে। বিদ্যাসাগর সংস্কৃতভাষার কঠিন ব্যাকরণের প্রবেশের দুর্গমপথকে সাবলীল করেছেন সংস্কৃতভাষার উপক্রমণিকা ও কৌমুদী রচনা করে। বঙ্গদেশের শিশুর হাতে পৌঁছে দিয়েছেন 'বর্ণ-পরিচয়ে'র সহজ পদ্ধতি। গ্রন্থরচনাই হোক বা শিক্ষাসংস্কারই হোক, সর্বত্রই বিদ্যাসাগরজীবনের সেই মৌলিক ধারাটি প্রবহমান ছিল। সেই ধারাটি মানুষের প্রতি মানুষের ভালবাসার ধারা, স্বদেশের প্রতি অনুরাগ, আর স্বদেশবাসীর প্রতি গভীর দায়িত্ববোধের ধারা। দুঃখ দেখলেই

অশ্রুমোচন করেছেন বিদ্যাসাগর। নিজেকে নিঃশেষ করেও মানুষের বেদনা দূর করতে এগিয়ে এসেছেন। বাংলার মানুষ কি করে তাঁর ঋণ শোধ করবে?

কিন্তু দয়া নয়, বিদ্যাসাগরের আসল পরিচয় তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তায়। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলি—'দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, তাঁহার অক্ষয় মনুষ্যত্ব'। উপসংহার

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায়:
১. একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী। ২. করুণাসাগর বিদ্যাসাগর।

চিন্তাসহায়ক বাণী

বৃহৎ বনস্পতি যেমন ক্ষুদ্র বনজঙ্গলের পরিবেষ্টন হইতে ক্রমেই শূন্য আকাশে মস্তক তুলিয়া উঠে, বিদ্যাসাগর সেইরূপ বয়োবৃদ্ধিসহকারে বঙ্গসমাজে সমস্ত অস্বাস্থ্যকর ক্ষুদ্রতাজাল হইতে ক্রমশই শব্দহীন সুদূর নির্জনে উত্থান করিয়াছিলেন; সেখান হইতে তিনি তাপিতকে ছায়া এবং ক্ষুধিতকে জলদান করিতেন; কিন্তু আমাদের শতসহস্র ক্ষণজীবী সভাসমিতির ঝিল্লিঝংকার হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিলেন। ক্ষুধিত-পীড়িত অনাথ-অসহায়দের জন্য আজ তিনি বর্তমান নাই, কিন্তু তাঁহার চরিত্রের যে অক্ষয়বট তিনি বনভূমিতে রোপণ করিয়া গিয়াছেন তাহার তলদেশ সমস্ত বাঙালীজাতির তীর্থস্থান হইয়াছে।—রবীন্দ্রনাথ

শ্রীশ্রীসারদা মা

[ভূমিকা—জন্ম ও শৈশব—কৈশোরের স্বামীসান্নিধ্য—দক্ষিণেশ্বরে সারদামণি—ষোড়শীরূপে আরাধিতা সারদা-মা—সকলের জননীরূপে সারদামণি—তিরোধান।]

শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনাকে সম্পূর্ণ জানতে হলে সারদা মাকেও জানতে হবে। সাধন-ক্ষেত্রে ওঁরা পরস্পর সম্পূরক। যদি বলা হয়, শ্রীরামকৃষ্ণের আলোতেই সারদা-মা আলোকিত তাতে মার অগৌরবের কিছু নেই, তবে আমরা বলব আলো তাঁর নিজেরই ছিল, সে আলো শ্রীরামকৃষ্ণ দেখতে পেয়েছিলেন আর সেই আলোতে নিজেও নতুন একভাবে আবিষ্ট হয়েছিলেন। ভূমিকা

বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটি কামারপুকুর থেকে মাত্র তিন মাইলের মধ্যে। এই জয়রামবাটিতেই এক দরিদ্র ধর্মপ্রাণ ব্রাহ্মণ পরিবারে সারদামণির জন্ম হয় ১৮৫৩ খ্রীস্টাব্দের ২২এ ডিসেম্বর। সারদা-মায়ের বাবার নাম রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় আর মায়ের নাম শ্যামাসুন্দরী দেবী। খুব ছোটো বেলাতেই কাজকর্মে নিপুণা হয়ে ওঠেন সারদামণি। ভাইদের বই নিয়ে নাড়াচাড়া করলেও পড়াশোনা ঠিক হয়ে ওঠে নি শৈশবে, বড়ো হয়ে নিজের চেষ্টায় পড়তে শিখেছিলেন। জন্ম ও শৈশব

খুব অল্প বয়সেই তখন মেয়েদের বিয়ে হত। মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণদেবের

সঙ্গে সারদামণির বিয়ে হয়েছিল। বিয়ে উপলক্ষে কয়েকদিন কামারপুকুরে কাটিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব আবার দক্ষিণেশ্বরে ফিরে গেলেন এবং সাধন-ভজন নিয়ে বিভোর হলেন।

সারদামণির যখন চোদ্দ বছর বয়স তখন শ্রীরামকৃষ্ণ কিছুদিনের জন্যে কামারপুকুরে এলেন। সারদামণিকেও জয়রামবাটী থেকে কামারপুকুরে আনা হল। ভগবৎ-সাধনা সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের অমৃতময় কথা শুনে সারদামণির মন ভরে গেল। সংসারে কিভাবে চলতে হবে সে সম্বন্ধে স্বামীর কাছ থেকে অনেক উপদেশ পেলেন সারদামণি। তাঁর মন থেকে একটা পাথর নেমে গেল যেন। লোকে যা বলে তা হলে তা সত্যি নয়: মোটেই পাগল নন তাঁর স্বামী। বিষয়ী মানুষ এমন ঈশ্বর-প্রাণ মানুষকে 'পাগল' ছাড়া আর বলবে কী?

কৈশোরের স্বামীসান্নিধ্য

বছরকয়েক বাদে জনশ্রুতি প্রবলতর হল। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবতন্ময়তার কাহিনী নানাভাবে পল্লবিত হয়ে বিকৃত রূপ নিল। চিন্তিত হলেন সারদামণি। অসুস্থ শরীরেই তিনি বাবার সঙ্গে রওনা হলেন দক্ষিণেশ্বরে। সেখানে গিয়েই কিন্তু সব সংশয়ের অবসান হল। সেই সদাহাস্যময় প্রশান্ত মূর্তি, সেই আপনকরা সহৃদয় সদয়, ব্যবহার। শ্রীরামকৃষ্ণের আদরযত্নে আরোগ্য লাভ করলেন সারদামণি। সেই থেকে দক্ষিণেশ্বরেই রয়ে গেলেন তিনি। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের ঘরের উত্তর দিকে যে-নহবৎখানা তারই একতলায় বাস করতে লাগলেন তিনি। ঐটুকু ঘরকেই সাজিয়ে গুছিয়ে নিয়ে ওরই মধ্যে চলল তাঁর সেবাব্রত আর সাধনভজন। নিস্তব্ধ রাত্রে চন্দ্রালোকিত গঙ্গাবক্ষের দিকে অপলক নয়নে চেয়ে বলতেন 'জ্যোৎস্নার মত নির্মল হোক আমার জীবন'। এইখানেই ভাবসমাধি হত তাঁর। কেউ জানতেও পারত না সে-সব কথা।

দক্ষিণেশ্বরে সারদামণি

এই সময় তার জীবনে হল এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। শ্রীরামকৃষ্ণ ষোড়শীদেবী রূপে সারদা-মাকে সাজিয়ে তাঁকেই পুজো করলেন আনুষ্ঠানিকভাবে। সারদাদেবী মাতৃভাবে অধিষ্ঠিতা হলেন। দাম্পত্য সম্পর্ক এক দিব্য মহিমায় উন্নীত হল। জগতে নারী সেই মুহূর্তেই এক অভাবিত গৌরবে গৌরবান্বিতা হলেন। সারদামণি হয়ে উঠলেন সারদা-মা—জগন্মাতৃকার প্রতিনিধি।

ষোড়শীরূপে আরাধিতা সারদা-মা

১৮৮৬ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই আগস্ট স্থূল দেহ ত্যাগ করে অমরধামে প্রয়াণ করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। শিষ্যবর্গ সারদা-মাকে নানা তীর্থ ঘুরিয়ে আনলেন। শোক কথঞ্চিৎ প্রশমিত হলে সারদা-মা সন্তানজ্ঞানে সবাইকে সেবা করার ব্রতে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োজিত করলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অবর্তমানে তিনি তাঁর অসমাপ্ত কাজ করার দায়িত্ব পালন করতে লাগলেন। শোকার্তকে সান্ত্বনাদান, হতাশাক্লিষ্টকে আশ্রয়দান, সর্বোপরি মানুষকে ঈশ্বরমুখী করে তোলার কাজই হল তাঁর সাধনা। ছেলেদের ভাবনা যেমন মা-ই ভাবেন, তিনিও সেই ভাবেই ভাবতেন:

সকলের জননীরূপে সারদামণি

"হে ঠাকুর আমার ছেলেদের সকলের নাম আমার মনে পড়ছে না, তারা নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। দয়াময় তুমি, তাদের ইহকাল পরকাল দেখিও।"

সন্তানদের সমস্ত স্নেহডোর ছিন্ন করে মাতৃরূপা সারদামণি দিব্যধামে প্রয়াণ করলেন

তিরোধান

১৯২০ খ্রীস্টাব্দের ২১ জুলাই (বাংলা ১৩২৭ সনের ৪ঠা শ্রাবণ)।

সারদা-মায়ের জীবনকথা আমাদের ভারতীয় মহীয়সী নারী গার্গী-মৈত্রেয়ীদের স্মরণ

উপসংহার

করিয়ে দেয়, যাঁরা ভূমিতে দাঁড়িয়ে ভূমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে বলতে পারেন যেনাহং নামৃতা স্যাং তেনাহং কিং কুর্যাম্ ?

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—ভারতের একজন মহীয়সী নারী।

'ছাই মাখা বেরাল' —শ্রীরামকৃষ্ণ

(অর্থাৎ দেখে বোঝবার উপায় নেই, কিন্তু আসলে বিশ্বমাতৃকা)

'জ্যান্ত দুর্গা' —স্বামী বিবেকানন্দ।

(অর্থাৎ তিনি সাধারণ মানবী নন, দুর্গাস্বরূপিণী)

স্বামী বিবেকানন্দ

[ভূমিকা—বাল্যকাল—যৌবন—ঈশ্বরদর্শনের ব্যাকুলতা—অর্থকষ্ট—রামকৃষ্ণের দর্শন—সন্ন্যাস-গ্রহণ—প্রত্যাবর্তন—আদর্শ ও ধর্ম—মহাপ্রয়াণ—উপসংহার।]

দর্শনে সুপণ্ডিত, হিন্দুশাস্ত্রে বিশারদ, সমাজসংস্কারের পুরোহিত স্বামী বিবেকানন্দ

ভূমিকা

কলকাতার সিমুলিয়া অঞ্চলের বিশ্বনাথ দত্তের পুত্র। বিশ্বনাথ দত্ত ছিলেন হাইকোর্টের এটর্নী। শোনা যায় ভুবনেশ্বরী দেবী শিবের কাছে প্রার্থনা করেছিলেন পুত্রলাভের কামনায়। নবজাত পুত্রের নাম রাখলেন বীরেশ্বর, বীরেশ্বরের পোশাকী নাম হল নরেন্দ্রনাথ দত্ত। আর ডাক নাম বিলে।

দুর্দান্ত হয়ে উঠলেন এই শিশু। বাধানিষেধ, ভর্ৎসনা বা প্রহারকে অগ্রাহ্য করে এক ঝড়ের গতি নিয়ে বড়ো হতে লাগলেন। মাথায় খেলতে লাগল নিত্য নতুন দুষ্টুমিবুদ্ধি। প্রাথমিক শিক্ষার স্তর পার হয়ে নরেন্দ্রনাথ ভর্তি হলেন মেট্রোপলিটন ইনস্টিটিউশনে।

বাল্যকাল

স্কুলেও তার দুরন্তপনার সীমা ছিল না। কিন্তু অসাধারণ বুদ্ধি এই বালকের। নরেন্দ্রনাথের স্মৃতিশক্তির কথা প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও ছিল অসীম সাহস, কর্তব্যবুদ্ধি, বাগ্মিতায় পারদর্শিতা। সব মিলিয়ে সেই ছোটবেলায় নরেন্দ্রনাথ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। পিতা বিশ্বনাথ দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, 'নরেন, তুই বড়ো হয়ে কী হবি ?' অসঙ্কোচে উত্তর দিলেন, 'সহিস হবো।' গাড়ি চড়ার শখ ছিল নরেন্দ্রনাথের শৈশবে।

অসুস্থ হয়ে পড়লেন নরেন্দ্রনাথ। রোগের উপর্যুপরি আক্রমণে শয্যাশায়ী হলেন। কিন্তু অসাধারণ মনোবল ছিল তাঁর। অসুস্থতার মধ্যেও প্রবেশিকা পরীক্ষায় কৃতিত্বের

যৌবন

সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। এর পর ভর্তি হলেন প্রেসিডেন্সী কলেজে। পরে 'জেনারেল এসেম্বলী' ইনস্টিটিউশনে আসেন। দর্শনে নরেন্দ্র-নাথের অনুরাগ ছিল অসাধারণ। এই সময়েই তিনি পাশ্চাত্ত্য দর্শন অধ্যয়ন শুরু করেন।

কেন্ট, হিউম, হেগেল, ডারউইনের দার্শনিক মতবাদ। মূর্তিপূজায় অবিশ্বাস গড়ে উঠল তাঁর। ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হলেন নরেন্দ্রনাথ।

সংশয় দেখা দিল নরেন্দ্রনাথের মনে। সত্যের সন্ধানে ব্যাকুল হয়ে উঠলেন তিনি। ঈশ্বরদর্শনের আকুতি তাঁকে অস্থির করে তুলল। ঠিক এই সময়ে সাক্ষাৎ হল শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সঙ্গে। প্রশ্ন করলেন 'আপনি কি ঈশ্বরের দর্শনলাভ করেছেন?' রামকৃষ্ণ বললেন, 'হ্যাঁ, দেখেছি, তোকেও দেখাতে পারি।' উন্মাদ ভাবলেন রামকৃষ্ণকে। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে পরবর্তী কালে তাঁর হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরাগ জন্মে এবং তিনি ঠাকুরের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন।

ঈশ্বরদর্শনের ব্যাকুলতা

ইতিমধ্যে নরেন্দ্রনাথের পিতৃবিয়োগ হয়। সাংসারিক ভাবনা-চিন্তার ভার এসে পড়ে তাঁর উপর। নিদারুণ অর্থকষ্টের মধ্যেও নরেন্দ্রনাথ আত্মীয়স্বজনের সাহায্য গ্রহণ করেন নি। চাকরীর সন্ধানে কলকাতার রাজপথে নরেন্দ্রনাথ ঘুরে বেড়িয়েছেন। কিন্তু সুরাহা কিছুই হল না। ইতিমধ্যে পৈতৃক ভিটা থেকে গৃহচ্যুত করার জন্য জ্ঞাতিরা ফাঁদলেন মোকদ্দমার ফাঁদ। সব মিলিয়ে এক অসহনীয় অবস্থায় নরেন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনের দিনগুলিতে অসীম ধৈর্য, সঙ্কল্প আর নীতি-বোধ নিয়ে সংগ্রাম করেছিলেন।

অর্থকষ্ট

শ্রীরামকৃষ্ণের ক্যানসার রোগাক্রান্ত হওয়ার সংবাদ শোনার পর নিজের হাতে তাঁর চিকিৎসা করতে শুরু করলেন। রামকৃষ্ণ বললেন, 'তোর পরিবারের ভাত-কাপড়ের অভাব হবে না, মার কৃপায়।' নরেন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন মাতৃমূর্তির সামনে সাংসারিক সচ্ছলতা প্রার্থনা করতে। বারবার চেষ্টা করেও মাতৃমূর্তির সামনে নরেন্দ্রনাথ এই পার্থিব সুখের জন্যে প্রার্থনা করতে পারেন নি।

রামকৃষ্ণের দর্শন

শ্রীরামকৃষ্ণের কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে নরেন্দ্রনাথ সন্ন্যাসধর্ম নিলেন। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে সচক্ষে দরিদ্র মানুষের দুঃখ দেখলেন। অবশেষে শিকাগোর ধর্মীয় মহাসম্মেলনে যোগ দিলেন ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে। মুগ্ধ হয়ে আমেরিকাবাসী শুনেছিল হিন্দুধর্মের কথা। এরপর সারা পৃথিবীতে ধর্মপ্রচার করেন স্বামী বিবেকানন্দ নামে। বক্তৃতায় লব্ধ অর্থে গড়ে তুললেন রামকৃষ্ণ মঠ ও প্রতিষ্ঠান।

সন্ন্যাস গ্রহণ

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে স্বামীজি ফিরলেন কলম্বোয়। ২৮-এ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় আসার পর নাগরিকদের পক্ষ থেকে তাঁকে মানপত্র প্রদান করা হয়।

প্রত্যাবর্তন

ব্যক্তিগত কল্যাণ ও ঈশ্বর সাধনার পরিবর্তে এক নতুন ধর্মের প্রবর্তন করলেন—সে ধর্ম মানবসেবার ধর্ম। দেশবাসীকে ডাক দিলেন, 'ক্ষুধার্তকে অন্ন দাও, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দাও, নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দাও, দুর্বলকে দাও শক্তি। তোমরা সংসার ছেড়ে এসেছ জগৎ সংসারের মধ্যে নিজেকে ছড়িয়ে ব্যাপ্ত করে দিতে।

আদর্শ ও ধর্ম

১৯০২ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা জুলাই এই যুগপুরুষের মহাপ্রয়াণ হয়।

কিন্তু আজও সেই কণ্ঠ ভারতবর্ষের প্রান্তে ধ্বনিত হয়: 'বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর? জীবেপ্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী। ২. বিবেকানন্দের বাণী ও আদর্শ।

চিন্তাসহায়ক বাণী

তাঁহার 'দরিদ্রনারায়ণ' পরবর্তীকালে গান্ধীজীর কাছে 'হরিজন' রূপে দেখা দেন। অজ্ঞ, নিরক্ষর, সামাজিকঅত্যাচার ও অবজ্ঞায় নিপীড়িত, দারিদ্র্য-নিষ্পেষিত ভারতের নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক জনগণের উন্নয়নের জন্য তাঁহার পূর্বে কে এতটা বিক্ষোভ দেখাইয়াছেন? —সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভগিনী নিবেদিতা

[ভূমিকা—প্রথম জীবন—বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ—নারী শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা—স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ—ভারতীয় লোক-সাংস্কৃতিতে অনুরাগ—গ্রন্থরচনা—মৃত্যু—উপসংহার

ভূমিকা

যে-মানুষ মানুষকে ভালোবাসিতে শিখেছে, সে কি দেশ, জাতি, ধর্ম, সমাজের কল্পিত বিভেদরেখায় ভালোবাসাকে সীমিত রাখতে পেরেছে? ভালোবাসাকে সে ছড়িয়ে দিয়েছে আদিগন্ত বিস্তৃত মাটিতে, ছড়িয়ে দিয়েছে সমস্ত মানুষের মধ্যে। তাই বোধহয় আয়ারল্যাণ্ডের যাজক পরিবারের এক নারী বাধাবন্ধন ছিন্ন করে চলে এসেছেন ভারতভূমির মাটিতে—এই ভূখণ্ডের মানুষকে ভালোবেসেছিলেন মনপ্রাণ দিয়ে। এদেশের প্রিয় আসনটি দখল করেছিলেন—ভগিনীর মমতায় বেঁধেছিলেন তাদের। মার্গারেট নোবেল্ হলেন ভগিনী নিবেদিতা। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'লোকমাতা'।

প্রথম জীবন

১৮৬৭ খ্রীস্টাব্দের ২৮-এ অক্টোবর আয়ারল্যাণ্ডের এক গ্রামে নিবেদিতার জন্ম হয়। যাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ তাঁকে উত্তরাধিকার সূত্রে দিয়েছিল ধর্মের প্রতি অনুরাগ। মার্গারেট এলিজাবেথ নোব্‌লের পিতা স্যামুয়েল রিচমণ্ড নোব্‌ল ছিলেন পাদ্রী। হ্যালিফাক্স কলেজ থেকে শিক্ষা সমাপ্ত করে নিবেদিতা শিক্ষকতার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু ধর্মচর্চা ও সমাজসেবাও চলতে থাকে একই সঙ্গে। অধ্যাত্ম-পিপাসা খ্রীস্টধর্মের গণ্ডিকে অতিক্রম করে তাঁর মনে সঞ্চার করে ধর্মাতীত জিজ্ঞাসার।

বিবেকানন্দ এলেন ইংল্যাণ্ডে। ভারতবর্ষের এক প্রান্ত কলকাতা থেকে স্বামী বিবেকানন্দ পাশ্চাত্ত্য দেশে এযাবৎ অজ্ঞাত স্বল্প-আলোচিত বিশ্বের প্রাচীনতম তত্ত্ব-জিজ্ঞাসার বাণী নিয়ে উপস্থিত হলেন ইংল্যাণ্ডের মানুষের কাছে। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে

ভারতবর্ষের এই সন্ন্যাসীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল মার্গারেট নোবলের। তাঁর কাছে শুনলেন

বিবেকানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ

ধর্মকথা—হিন্দুধর্মের আলোচনা। বিস্মিত হলেন, মুগ্ধ হলেন এই আইরিশ মহিলা। বললেন, He is just divine. মনে মনে স্বামী বিবেকানন্দকেই বরণ করলেন তাঁর অধ্যাত্মজীবনের গুরু হিসাবে। নতুন পথে তাঁর যাত্রা শুরু হল। বেদান্তের পাঠ নিলেন স্বামীজীর কাছ থেকে। সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রবক্তা সেই ভারতভূমিতে আগমনের আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠল নিবেদিতার হৃদয়। অবশেষে গুরুর অনুমতি পেলেন। ১৮৯৮ খ্রীস্টাব্দে মার্গারেট নোব্‌ল এলেন ভারতবর্ষে। দু'চোখ মেলে দেখলেন তাঁর স্বপ্নের ভারতবর্ষকে, সে দেশের মানুষকে। স্বামীজীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করলেন, মার্গারেট নোব্‌ল হলেন ভারতভূমির মানুষের সেবায় নিবেদিতপ্রাণা মহীয়সী 'নিবেদিতা'।

হিন্দুধর্মের প্রচারে সক্রিয় হয়ে উঠলেন তিনি। স্বামীজির সঙ্গে বেদ-উপনিষদের বাণী নিয়ে ছুটে বেড়ালেন পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে। বাগবাজারের এক অখ্যাত গলিতে তাঁর বাসস্থান ছিল। সেখানে গড়ে তুললেন একটি বালিকা

নারী শিক্ষায় অগ্রণী ভূমিকা

বিদ্যালয়। ইউরোপের মানুষকে দেখেছিলেন নিবেদিতা। ভারতবর্ষের মাটিতে যুগ যুগ লাঞ্ছিত অজ্ঞানের অন্ধকারে, সংস্কারের ভারে পীড়িত ভারতের নারী মুক্তির নতুন অধ্যায় রচনার ব্রত নিলেন। যথার্থই বুঝেছিলেন নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা। তাই পীড়িতের সেবা, বন্যাত্রাণ, জনসেবা, ধর্মপ্রচার—এসবের মধ্যেও তিনি নারীজাতির কল্যাণে নিয়োজিত করলেন তাঁর মহামূল্য সময়।

ভারতবর্ষকে ভালোবেসেছিলেন নিবেদিতা। তাই ভারতবাসীর পরাধীনতার জ্বালা দগ্ধ করেছিল তাঁর ইউরোপীয় চেতনা। স্বাধীনতার জন্যে সারা ভারতবর্ষের মানুষ যখন

স্বাধীনতা আন্দোলনে শপথগ্রহণ

একজোট, দিকে দিকে গড়ে উঠেছিল বিপ্লবীদের গুপ্তদল, নিবেদিতা আর পারলেন না নিজেকে গুটিয়ে রাখতে। ভারতবর্ষের রাজনীতির সঙ্গে সক্রিয় যোগাযোগ স্থাপিত হল তাঁর। পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচনে এগেয়ে এলেন তিনি। অরবিন্দের বিপ্লবী দলে যোগ দিলেন। কংগ্রেসের তৎকালীন নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন। ঋষি অরবিন্দের 'কর্মযোগিন্' পত্রিকার সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ভারতবর্ষের গৌরব ছিল তাঁরই গৌরব। তাই পাশ্চাত্ত্য দেশে পৌঁছে দিলেন রবীন্দ্রনাথের পরিচয়। জগদীশচন্দ্র বসুর আবিষ্কারের কথা জানালেন বিশ্ববাসীকে।

ভারতীয় লোকশিল্প, ভারতীয় সংস্কৃতিতে তাঁর ছিল প্রগাঢ় অনুরাগ। তাই বাঙালী নারীর পিতৃগৃহে আগমনের আগমনী গান 'গিরি, গৌরী আমার এসেছিল' তাঁর দু'চোখ

ভারতীয় লোক-সংস্কৃতিতে অনুরাগ

প্লাবিত করেছিল হৃদয়ের দ্রবীভূত বেদনায়। বাগবাজারের বিদ্যালয়টি পরিচালনার জন্যে দেশবাসীর কাছে আবেদন করেছিলেন নিবেদিতা মাসিক ত্রিশ টাকা সাহায্যের। নিদারুণ অর্থকষ্টে দিনাতিপাত করেও নিবেদিতা হারিয়ে যান নি, হেরে যান নি তাঁর গভীর আদর্শবোধের প্রেরণায়।

বহু প্রবন্ধ ও গ্রন্থ রচনা করেছেন নিবেদিতা ভারতবর্ষের দর্শন, ধর্ম, লোকশিল্প আর ভারতবর্ষের মানুষের জীবন নিয়ে। Cradle Tales of Hinduism; Kali the Mother; My Master, as I saw Him—আন্তরিক আলোচনায় আর প্রীতিময় পরিবেশনার জন্যে চিরস্মরণীয় হয়ে রয়েছে।

গ্রন্থরচনা

১৯১১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই অক্টোবর দার্জিলিঙে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ভারতবর্ষের মানুষের বড়ো আদরের ভগিনী—ভগিনী নিবেদিতা।

মৃত্যু

নিবেদিতার ভারতপ্রেমের গভীরতা আত্মত্যাগের কষ্টিপাথরে পরীক্ষিত। তাঁর জীবনবোধ ও সাধনার কাছে ভারতের ঋণ অপরিশোধ্য। দেশের কল্যাণকর্মের মধ্যে দিয়েই আমরা সেই ঋণশোধের চেষ্টা করতে পারি।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. একজন মহীয়সী মহিলা। ২. ভারতীয় সংস্কৃতিতে নিবেদিতার দান।

চিন্তাসহায়ক বাণী

Greatness consists in what you can renounce. The two essential tenets of religion—renunciation of the ego and awakening of the spirit within found their true expression in Nivedeta's life. She gave up the world and engrossed herself so much in the welfare of the Indian people that every British ruler suspected her to be as anarchical nationalist.

—ডঃ রাধাকৃষ্ণাণ

মহাত্মা গান্ধী

[ভূমিকা—প্রথম জীবন—দক্ষিণ আফ্রিকার কর্মজীবন—ভারতে কর্মজীবনের শুরু—অসহযোগ আন্দোলন থেকে ডাণ্ডি অভিযান—ভারত ছাড় আন্দোলন—উপসংহার।]

ভারতের মাটিতে যুগে যুগে মহামানবের আবির্ভাব ঘটেছে, যাঁদের জীবনসাধনায় মূর্ত হয়ে উঠেছে ভারতের আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বপ্ন। তাঁরা জাতিকে আশ্রয় দেন, অন্ধকারে দেখান পথের সন্ধান। মহাত্মাজী হলেন এমনি একজন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ। জাতীয় জীবনের এক সন্ধিক্ষণে যাঁর কর্মপ্রেরণা লাঞ্ছিত মানুষকে নতুন মন্ত্রে সঞ্জীবিত করেছে।

ভূমিকা

মহাত্মাজীর নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ১৮৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২রা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে মহাত্মাজীর জন্ম। মহাত্মাজী তাঁর পিতা করমচাঁদ গান্ধীর কাছে পেয়েছেন সত্যানুরাগ আর তেজস্বিতা, মা পুতুলী বাইয়ের কাছে পেয়েছেন ধর্মপ্রেরণা ও দয়া। মাত্র তের বছর বয়সে কস্তুরী বাঈয়ের সঙ্গে মোহনদাসের বিবাহ হয়। আর প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি বিলেতে যান ব্যারিস্টারী পড়তে। ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে দেশে ফিরে মহাত্মাজী বোম্বাই হাইকোর্টে আইন ব্যবসা আরম্ভ করেন।

প্রথম জীবন

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার নাটালেই মহাত্মাজীর প্রকৃত কর্মজীবন শুরু হয়। সেখানে তিনি ব্যারিস্টারী করতে গিয়ে নাটাল সরকারের অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে শুরু করেছিলেন কঠোর সংগ্রাম। এ সংগ্রাম ছিল অহিংস সংগ্রাম। কিন্তু এই অহিংস সংগ্রামের কাছেই প্রথম শাসকশক্তিকে পরাজিত হতে দেখা গেল। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে মানুষের ভালবাসা আর অহিংস আন্দোলনের অভিজ্ঞতা নিয়ে একুশ বছর পর দেশে ফিরলেন মহাত্মাজী।

দক্ষিণ আফ্রিকার কর্মজীবন

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতে আরম্ভ হল মহাত্মাজীর কর্মজীবন। প্রথমে আমেদাবাদে সবরমতীর তীরে সত্যাগ্রহ আশ্রম নির্মাণ করে তিনি সমাজসেবা ও গঠনমূলক কাজে মন দিলেন।

ভারতে কর্মজীবনের শুরু

১৯১৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার বলেছিলেন ভারতকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার দিবেন। কিন্তু যুদ্ধ শেষ হলে ইংরেজ সরকার সে কথা রাখেননি। অকৃতজ্ঞ ব্রিটিশ সরকার স্বায়ত্তশাসনের পরিবর্তে ভারতে 'রাউলাট আইন' নামে এক কঠোর আইন চালু করলেন। ইংরেজের অকৃতজ্ঞতায় সারা ভারত হল ক্ষুব্ধ। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা কংগ্রেস অধিবেশনেই মহাত্মাজী ইংরেজ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের জন্যে তাঁর পূর্বপরীক্ষিত অসহযোগ আন্দোলনের হাতিয়ার তুলে দিলেন ভারতবাসীর হাতে। সেদিন থেকেই ভারত মহাত্মাজীকে মন্ত্রগুরু বলে মেনে নিল। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস 'পূর্ণ স্বরাজ' ঘোষণা করে আইন অমান্য আন্দোলনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল। এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন মহাত্মাজী। এই সময় জাতীয় শক্তিকে সংহত করে লবণ আইন অমান্য করার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন তিনি। আরম্ভ হল তাঁর ঐতিহাসিক ডাণ্ডি অভিযান।

অসহযোগ আন্দোলন থেকে ডাণ্ডি অভিযান

মহাত্মাজীর নেতৃত্বে ভারতে দ্রুত রাজনীতির পট পরিবর্তন শুরু হল। ১৯৪১ খ্রীস্টাব্দে বিশ্বব্যাপী দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দাবানল জ্বলে উঠল। ইংরেজ সরকার স্বাধীনতার দাবি অগ্রাহ্য করে ভারতের কাঁধে যুদ্ধের দায়িত্ব চাপাতে চাইল। ১৯৪২ খ্রীস্টাব্দে মহাত্মাজী দিলেন 'ভারত ছাড়' আন্দোলনের ডাক। ফলে গান্ধীজীসহ ভারতের বহু নেতাকে কারারুদ্ধ করা হল। দিকে দিকে জ্বলে উঠল বিদ্রোহের অগ্নিশিখা। কারাগার থেকে মহাত্মাজীর অভয় বাণী শোনা গেল : 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'। আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত ইংরেজ সরকার ভারতের স্বাধীনতার দাবি স্বীকার করে নিলেন। কিন্তু যে দ্বিজাতিতত্ত্বের বীজ তাঁরা ভারতের মাটিতে রোপণ করলেন, তারই বিষময় ফল হল ১৯৪৬ খ্রীস্টাব্দের ভ্রাতৃদ্বন্দ্ব। শান্তির দূত গান্ধীজী ছুটে বেড়ালেন সাম্প্রদায়িক উন্মত্ততার শ্মশানে শ্মশানে। পূর্ব বাংলার নোয়াখালি থেকে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতায়, কলকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে। ভারত স্বাধীন হল কিন্তু গান্ধীজীর সাধের অখণ্ড ভারত আর থাকল না। ভারত দ্বিধাবিভক্ত হল। জন্ম হল নতুন ভারত আর পাকিস্তানের। এরপর ভারতের রাজনীতির ইতিহাসে ঘটল এক বেদনাময় কলঙ্কজনক ঘটনা। ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দের ৩০-এ

ভারত ছাড় আন্দোলন

জানুয়ারি প্রার্থনা-সভায় নাথুরাম বিনায়ক গডসে নামে এক হিন্দু যুবকের গুলিতে মহাত্মাজীর মহাজীবনের অবসান হল।

উপসংহার

এই মানবপ্রেমিক আজ আমাদের চোখের সামনে নেই। কিন্তু তাঁর মরণবিজয়ী জীবনবাণী আজও আছে। সত্য-শিব-সুন্দরের মৃত্যু নেই। মহাত্মাজীর সাধনা সত্যের সাধনা। তাই মৃত্যুর আঘাতে তাঁর মরদেহের বিনাশ হলেও তাঁর আদর্শের মৃত্যু নেই। তাঁর আদর্শ মানব-প্রেম নিয়ে তিনি চিরদিনর আমাদের হৃদয়-আকাশের অনির্বাণ জ্যোতিষ্ক হয়ে থাকবেন।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়
১. একজন শ্রেষ্ঠ ভারতীয়। ২. আমাদের স্বাধীনতায় মহাত্মাজীর অবদান।

চিন্তাসহায়ক বাণী

পূর্বপুরুষের পুনরাবৃত্তি করা মনুষ্যধর্ম নয়। জীবজন্তু তাদের জীর্ণ অভ্যাসের বাসাকে আঁকড়ে ধরে থাকে; মানুষ যুগে যুগে নব নব সৃষ্টিতে আত্মপ্রকাশ করে, পুরাতন সংস্কার কোনোদিন তাকে বেঁধে রাখতে পারে না। মহাত্মাজি ভারতবর্ষের বহুযুগব্যাপী অন্ধতা মূঢ় আচারের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ এক দিক থেকে জাগিয়ে তুলেছেন, আমাদের সাধনা হোক সকল দিক থেকেই তাকে প্রবল করে তোলো।
—রবীন্দ্রনাথ ১৩৩৮

We were but small men. He picked us up, made us part of a great movement and something of its greatness pressed into us.
—Jawaharlal Nehru

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

[ভূমিকা—ছেলেবেলা ও ছাত্রজীবন—কংগ্রেসে যোগদান ও কারাবরণ—আপোসহীন সংগ্রামী ও কংগ্রেস সভাপতিরূপে—কংগ্রেস ত্যাগ—ভারত ত্যাগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন—আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব—উপসংহার।]

ভূমিকা

তরুণ ভারতবাসীর রক্তশিরায় দোলাদেওয়া নাম নেতাজী সুভাষ, যিনি বলেছিলেন: 'তোমরা আমাকে রক্ত দাও তার বদলে আমি তোমাদের দেব স্বাধীনতা।' বীরত্বের এক গৌরবময় নতুন ইতিহাস তিনি রচনা করেছেন। যে-ইতিহাসের পথরেখা অবলম্বন করেই এশিয়ার মানুষ আজ দাসত্বের শৃঙ্খলে দিয়েছে চরম টান, কাঁপিয়ে তুলেছে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির দুর্ভেদ্য অচলায়তন।

১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩-এ জানুয়ারি উড়িষ্যার কটক জেলায় সুভাষচন্দ্রের জন্ম। তাঁর বাবার নাম জানকী নাথ বসু, মা প্রভাবতী দেবী। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে কটকের রাভেনশ

কলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। পরে ভর্তি হন কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে। শোনা যায় এই কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক ওটেন ভারতবাসী-সম্পর্কে অসম্মানসূচক উক্তি করলে সুভাষচন্দ্র তার যোগ্য উত্তর দিয়েছিলেন। এই অপরাধে তাঁকে কলেজে ছাড়তে হল। পরে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় তিনি স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ পেলেন। এই কলেজ থেকে দর্শনশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে সুভাষচন্দ্র বি. এ. পাশ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই স্বদেশপ্রেম ও ধর্ম-জীবনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন সুভাষচন্দ্র। এই গৃহত্যাগী মহাপুরুষ ছাত্রজীবনেও গৃহত্যাগ করে বেরিয়েছিলেন সন্ন্যাসী হয়ে।

ছেলেবেলা ও ছাত্রজীবন

সুভাষচন্দ্রের মত প্রতিভাবান তরুণ বিলেতে গিয়ে আই. সি. এস. হবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু স্বাধীনতাযজ্ঞের যে-পুরোহিত দেশের জন্য সর্বস্ব দান করতে এসেছেন তাঁকে কি সিভিল সার্ভিসের গদি-আঁটা চেয়ার ধরে রাখতে পারে? পারে না। তাই কৃতিত্বের সঙ্গে আই. সি. এস. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েও দেশের জন্যে ত্যাগ করলেন সিভিল সার্ভিসের মোহ। ঠিক এই সময়ে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের বন্যায় সারা ভারত উত্তাল। সুভাষচন্দ্রের অন্তরেও স্বদেশপ্রেমের সুপ্ত বহ্নিশিখা লেলিহান হয়ে উঠল। তিনি কংগ্রেসে যোগ দিলেন। বঙ্গদেশের নেতৃত্ব তখন দেশবন্ধুর হাতে। সুভাষ হলেন তাঁর ভাবশিষ্য। এই রাজসন্ন্যাসী চিত্তরঞ্জন সুভাষচন্দ্রকে দিলেন আত্মত্যাগের দীক্ষা, আপোসহীন সংগ্রামের দীক্ষা। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে গুরুর সঙ্গে শিষ্য সুভাষচন্দ্র প্রথম কারাবরণ করলেন।

কংগ্রেসে যোগদান ও প্রথম কারাবরণ

প্রথম থেকেই বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সুভাষচন্দ্রকে তাদের প্রধান শত্রু বলে চিনে নিয়েছিল। তাই ১৯২১ খ্রীস্টাব্দের কারাবরণের পর ১৯২৪ থেকে তিন বছরের জন্যে তাঁকে করা হল অন্তরীণ। কিন্তু দেশবাসীর প্রচণ্ড আন্দোলনের চাপে পড়ে ইংরেজ সরকার তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে আবার তিনি কারাবরণ করেন; আর কারাগারে বসেই নির্বাচিত হন কলকাতার মেয়র। এই সময়ে ভগ্নস্বাস্থ্য উদ্ধারের জন্য ইংরেজ সরকার তাঁকে ভারতের বাইরে যাবার অনুমতি দিলেন। ইউরোপ-ভ্রমণকালেই বিশ্বরাজনীতির সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় হল। বুঝলেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন। ১৯৩৬ খ্রীস্টাব্দে এই দিব্যদৃষ্টি নিয়ে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গে তিনি হলেন অন্তরীণ।

আপোসহীন সংগ্রামী ও কংগ্রেস সভাপতিরূপে

১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দে সুভাষচন্দ্র হলেন কংগ্রেস সভাপতি। ইউরোপে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁকে বলেছিল—যুদ্ধ আসন্ন, ইংরেজ যখন ঘর সামলাবে তখনই আমাদের দাসত্বশৃঙ্খলে দিতে হবে চরম টান। কিন্তু কংগ্রেসের আপোসমূলক মনোভাব তাঁর ডাকে সাড়া দেয় নি বলেই ১৯৩৯ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রকে সভাপতির আসন থেকে সরে দাঁড়াতে হল।

নিজের স্বাধীন মতবাদের জন্যে কোন আপোসরফা করতে পারতেন না তিনি।

তাই কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে গড়লেন নতুন রাজনৈতিক দল 'ফরওয়ার্ড ব্লক'।

কংগ্রেস ত্যাগ

১৯৪০ খ্রীস্টাব্দে রামগড় সম্মেলনে সুভাষচন্দ্র ঘোষণা করলেন : ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে ফেলার দিন এসেছে। মহাযুদ্ধ আসন্ন। এই সুযোগ আমরা হাতছাড়া করতে পারব না। এখানে কী বিপুল জনসমর্থন তিনি লাভ করেছিলেন Indian Wins Freedom বইটি হল তার জীবন্তদলিল।

১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে নিজের বাসস্থান থেকে সুভাষচন্দ্রের অন্তর্ধান এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য। ইংরেজ পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে তিনি প্রথমে জার্মানি, পরে জাপানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তার আগেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে।

ভারত ত্যাগ ও আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠন

তিনি জাপানীদের হাতে বন্দী ভারতীয়দের নিয়ে গড়ে তুললেন জাতীয় মুক্তি বাহিনী—আজাদ হিন্দ ফৌজ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সবচেয়ে গৌরবোজ্জল ইতিহাস রচনা করেছিল সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ ফৌজ। মালয়, ব্রহ্মদেশ, সিঙ্গাপুরে আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মক্ষেত্র বিস্তার লাভ করে। আজাদ হিন্দ ফৌজের কাছে সুভাষচন্দ্র হলেন 'নেতাজী'। নেতাজীর নেতৃত্বে শুরু হল দুঃসাহসিক অভিযান, 'দিল্লী চলো'। ভারত-ব্রহ্ম সীমান্তে, আরাকানে, টিড্ডমে, কোহিমায় আর ইম্ফলের রণক্ষেত্রে তাদের বীরপদধ্বনি মন্ত্রিত হল। বুকের রক্তে ভিজল দিল্লী যাবার পথে ফৌজ ধূলো। মণিপুরের আকাশে আজাদ হিন্দ প্রথম ওড়াল ভারতের জাতীয় পতাকা।

ইংরেজ সরকার নানাভাবে সুভাষচন্দ্রের উজ্জ্বল বক্তিত্বকে মসীলিপ্ত করতে চেয়েছেন।

আজাদ হিন্দ ফৌজের প্রভাব

তাঁকে বলেছেন দেশদ্রোহী—কুইস্‌লিং। কিন্তু সব চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেশের মানুষ সেদিন সুভাষচন্দ্রকে চিনতে পেরেছিল তাই স্বাধীনতাযুদ্ধে গ্রহণ করেছিল নেতাজী প্রচারিত 'জয়হিন্দ' মন্ত্র। রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে আজাদ হিন্দ ফৌজ যে-ইতিহাস রচনা করেছে তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী।

১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে জাপানী সংবাদপত্রে আমরা প্রথম শুনলাম নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ। তার পর থেকে কত বার সরকারী বেসরকারী ভাবে তাঁর মৃত্যুরহস্যের তদন্ত হল কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই অন্তর্ধান রহস্যের কোন সমাধান হল না। না হোক, আমরা জানি সেই

উপসংহার

অপরাজিত শক্তির বিলয় নেই, নেতাজী সুভাষের মৃত্যু নেই—তিনি জাতির ভাবজগতে অক্ষয় আসনে অধিষ্ঠিত। তিনি জাতির নায়ক। রবীন্দ্রনাথ একদিন বলেছিলেন, 'সুভাষচন্দ্র, বাঙালি কবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণ করি। গীতায় বলেন, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরণায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক!'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়

১. একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালী। ২. স্বাধীনতা আন্দোলনে নেতাজী
৩. নেতাজীর জীবন ও আদর্শ।

চিন্তাসহায়ক বাণী

দুঃখকে তুমি করে তুলেছ সুযোগ, বিঘ্নকে করেছ সোপান। সে সম্ভব হয়েছে, যেহেতু কোনো পরাভবকে তুমি একান্ত সত্য বলে মানো নি। তোমার এই চালিত শক্তিকেই বাংলাদেশের অন্তরের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেবার প্রয়োজন সকলের চেয়ে গুরুতর। —রবীন্দ্রনাথ মে, ১৯৩৯

তাঁর মাঝে এমন কি ছিল যার বলে তিনি মানুষের হৃদয় এমনি করে জয় করে নিলেন, এমনি করে তাদের গভীর শ্রদ্ধা, অপরিমেয় ভালবাসা লাভ করলেন? কি গুণেই বা তিনি পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয়দের অবিসংবাদিত নেতা বলে গণ্য হলেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে বলতে হবে—এসব পেয়েছেন তিনি তাঁর মহান চরিত্র, অতুলনীয় সাহস ও অনন্যসাধারণ উদারতার গুণে।

—শাহ্‌নওয়াজ খান

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

[ভূমিকা—শৈশব ও যৌবন—ছাত্রজীবন—কর্মজীবন—শিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ—মাতৃভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা—উপসংহার।]

ভূমিকা

বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় মৌলিক অবদানের জন্যে যে-কয়েক-জন বিজ্ঞানী ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-পিপাসু মানুষের কাছে প্রাতঃস্মরণীয় হয়ে আছেন, বিজ্ঞানাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু তাঁদের অন্যতম। শুধু মৌলিক আবিষ্কারের প্রয়াসই নয়, বিজ্ঞানচার্যের জীবনপঞ্জীর এক দিকে তাকালেই দেখা যায় গোটা জাতিকে বিজ্ঞানভিত্তিক ধ্যানধারণায় উদ্বুদ্ধ করে তোলার কী একনিষ্ঠ প্রয়াস ছিল তাঁর।

শৈশব ও যৌবন

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি উত্তর কলকাতার গোয়াবাগান অঞ্চলে সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্ম। সত্যেন্দ্রনাথের পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন ইস্ট বেঙ্গল রেলওয়ের হিসাবরক্ষক। বঙ্গদেশে সর্বপ্রথম রাসায়নিক প্রতিষ্ঠান ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস-এর প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে তিনি একজন। সত্যেন্দ্রনাথের মাতার নাম আমোদিনী। মাতাপিতার একমাত্র সন্তান সত্যেন্দ্রনাথ জোড়াবাগান অঞ্চলে নর্মাল স্কুলে পড়াশুনা শুরু করেন। পরবর্তী কালে হিন্দু স্কুলে ভর্তি হন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও জ্ঞানার্জনের আকাঙ্ক্ষা দেখা যায় তাঁর ছাত্রজীবনেই। হিন্দুস্কুলের গণিতের শিক্ষক উপেন্দ্রনাথ বক্সী মশাই তাঁকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষার টেস্টে ১০০'র মধ্যে ১১০ নম্বর দিয়ে বলেছিলেন, সত্যেন্দ্রনাথ পিথাগোরাস বা ল্যাম্পবাস-এর মত প্রতিভার গণিতজ্ঞ হবে। তাঁর ভবিষ্যদ্বাণী সত্য হয়েছিল। এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ পঞ্চম স্থান অধিকার করলেন।

প্রেসিডেন্সী কলেজে আই. এস-সি পড়তে এলেন সত্যেন্দ্রনাথ। সেকালের কৃতী বিজ্ঞানী ও ছাত্রহিসাবে জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী সরকার প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁরা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের সহপাঠী। পাঠ্যাবস্থায় সত্যেন্দ্রনাথের আগ্রহ শুধু পাঠ্যপুস্তকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না। পাঠ্যাতিরিক্ত বহু বিষয়ে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। সাহিত্যে তাঁর বিশেষ আগ্রহের কথা শোনা যায়। তাঁর আগ্রহে ও সম্পাদনায় 'মনীষা' নামে একটি হাতেলেখা ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করা হত। বি. এস্. সি. ক্লাসে সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর সহপাঠীরূপে পেয়েছিলেন পরবর্তী কালের কৃতী বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহাকে। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে বি. এস্. সি. গণিত অনার্সে প্রথম স্থান অধিকার করলেন সতেন্দ্রনাথ। ১৯১৫ খ্রীস্টাব্দে এম. এস্. সি. পরীক্ষায় সত্যেন্দ্রনাথ প্রথম হলেন। মেঘনাদ সাহা দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন।

ছাত্রজীবন

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার কাজে যোগ দেন তিনি। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সতেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদ সাহা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে অধ্যাপনার কাজ করেন। ১৯২১ খ্রীস্টাব্দে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার রীডার হিসাবে যোগদান করেন। এই সময়েই তাঁর গবেষণামূলক নিবন্ধটি আইনস্টাইনের কাছে পাঠান। সত্যেন্দ্রনাথকে চিঠি দিয়ে আইনস্টাইন তাঁর অভিমত জানান। সত্যেন্দ্রনাথের এই কাজটি 'বোস আইনস্টাইন সংখ্যায়ন' নামে সুবিদিত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থসাহায্যে সত্যেন্দ্রনাথ ১৯২৪ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপ যাত্রা করেন। ফ্রান্সে কিছুকাল অবস্থানের পর তিনি জার্মানীতে আসেন। ফ্রান্স ও জার্মানীতে বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। আইনস্টাইনের সঙ্গে সাক্ষাৎ-পরিচয় এই যাত্রাতেই ঘটে। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে স্বদেশে ফিরে এসে সত্যেন্দ্রনাথ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক-পদে যোগদান করেন। ১৯২৯ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থবিজ্ঞান শাখার সভাপতিপদে তাঁকে নির্বাচিত করা হয়। ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৩১তম অধিবেশনের মূল-সভাপতির পদে তাঁকেই অভিষিক্ত করা হয়। ১৯৪৫ খ্রীস্টাব্দে সত্যেন্দ্রনাথ আবার ফিরে এলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পদার্থবিজ্ঞানের খয়রা অধ্যাপক পদে নিযুক্ত থাকার পর ঐ বিভাগের অধ্যক্ষের আসন লাভ করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে এই যোগ স্থায়ী হয়ে যায়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় অধ্যাপক পদে থাকাকালীন ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন কার্যবশত যাতায়াতের জন্যে সাময়িকভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান কলেজ ভবনের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হলেও তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট ঘরটিই কার্যত তাঁর বাসস্থান ছিল।

কর্মজীবন

ছাত্রদরদী সত্যেন্দ্রনাথ বিজ্ঞান কলেজে থাকাকালীন অধ্যাপনার কাজ ছাড়াও সহাস্যবদনে ছাত্রদের অকাতর সাহায্যে এগিয়ে আসতেন। বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের অনুষ্ঠানে শিশিরকুমারের "মাইকেল মধুসূদন" নাটকের অভিনয় দেখে মঞ্চে উঠে

জড়িয়ে ধরেছেন শিশিরকুমারকে। আবার বন্ধু দিলীপ রায়ের গান শুনেছেন নিবিষ্ট মনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। বিজ্ঞানসাধনার অবসরে তন্ময় হয়ে বেহালা বাজাতেন বিজ্ঞানাচার্য আইন্‌স্টাইন। জ্যোৎস্নারাতে বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথের হাতে এস্রাজের স্বরমূর্ছনা অভিভূত করত শ্রোতাকে। ঢাকার রমনার বাড়িতে তাঁর এই স্বরসাধনার স্মৃতি এখনও অনেকেরই মনে আছে। ফরাসী ও জার্মান ভাষায় দখল ছিল সত্যেন্দ্রনাথের। তাঁর সাহিত্যের প্রতি অনুরাগের কথা সর্বজনবিদিত, কিন্তু পাণ্ডিত্যও তাঁর ছিল প্রগাঢ়। সংস্কৃতসাহিত্য তাঁর পড়াশোনাও ছিল যথেষ্ট। সত্যেন্দ্রনাথের কাছে জ্ঞানের কোন শ্রেণীবিভাগ ছিল না ইতিহাস, বিজ্ঞান,ভূতত্ত্ব-বিদ্যা, সাহিত্য, ভাষার জটিল সমস্যা—সর্বত্রই ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। এই বিচরণ সম্ভব হয়েছিল অসাধারণ গতিশীলতার জন্যে।

শিল্পী সত্যেন্দ্রনাথ

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার কাজে সত্যেন্দ্রনাথ ছিলেন বিশেষ আগ্রহী। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের তিনি একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'দেশের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য সর্বস্তরে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা ছাড়া গত্যন্তর নাই। ···যাঁরা বলেন বাংলাভাষায় বিজ্ঞানচর্চা সম্ভব নয়, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান জানেন না। আমার যদি অর্থবল থাকত, তাহলে আমি নিজেই একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করে দেখাতাম মাতৃভাষায় উচ্চ-বিজ্ঞান পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া যায় কিনা এবং তার ফল কত স্বর্ণপ্রসূ হয়।'

মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চা

বয়সের ভারে কর্মক্লান্ত নয়, প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর এই বিজ্ঞানসাধক মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত কর্মব্যস্ত ছিলেন। স্বল্পকালের অসুস্থতার পর হঠাৎ ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি মৃত্যু হল তাঁর। অসংখ্য বিজ্ঞানী, গুণমুগ্ধ ছাত্র, সাধারণ মানুষ মর্মাহত হলেন বিজ্ঞানীর মহাপ্রয়াণে। সত্যেন্দ্রনাথের হাতে গড়া বিজ্ঞান কলেজের লব্ধপ্রতিষ্ঠ বিজ্ঞানীরা অতন্দ্র রইলেন মানুষ সত্যেন্দ্রনাথের আরব্ধ কাজ সম্পাদনের মহান দায়িত্ব নিয়ে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

বিজ্ঞানসাধনায় কোন বাঙালীর অবদান।

চিন্তাসহায়ক বাণী

বিজ্ঞানীরা বিশ্বের সকল জাতিকে এক নবযুগের সন্ধান দিতে পারেন—যে যুগে বিভিন্ন জাতি বৈষয়িক প্রগতির তারতম্য সত্ত্বেও বিশ্বভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের সাধারণ সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে।···এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে কিছু ভ্রাতৃসুলভ সদিচ্ছা জাগরিত হয়, তা হলে আমরা সুফলের আশা করতে পারি এবং তখনই আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ও বৈজ্ঞানিক অনুশীলন কেবলমাত্র মাতৃভূমির কল্যাণে নয় সমগ্র মানব জাতিক কল্যাণে নিয়োজিত হবে।

—আন্তর্জাতিক আলোচনা ভাষণের অংশানুবাদ।

একটি বাঙালী মনীষা

(আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়)

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

[সূচনা—জীবনকথা—অনন্য মনীষা—মানুষ সুনীতিকুমার—উপসংহার ।]

সূচনা

'সুধর্মা' নামে বাড়িটার সেই জীবন্ত বিশ্বকোষটিকে আর আমরা দেখতে পাব না। সেই মহা-মনীষী দেশে-বিদেশে তাঁর জ্ঞানের আলো বিকীর্ণ করে লোকান্তরিত হলেন ১৯৭৭ খ্রীস্টাব্দের ২৯-এ মে।

জীবনকথা

সুনীতিকুমারের জন্ম ১৮৯০ খ্রীস্টাব্দের ২৬-এ নভেম্বর, হাওড়ার শিবপুরে। পড়েছিলেন কলকাতায়, মতিলাল শীলের ফ্রী স্কুলে, স্কটিশ চার্চ কলেজে এবং প্রেসিডেন্সি কলেজে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজিতে অনার্স নিয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হয়ে স্নাতক হন এবং ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে এম. এ-তেও ইংরেজিতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। কয়েক বছর পরেই পি, আর, এস, হন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুবিলি রিসার্চ পুরস্কার পান। ১৯১৩ থেকে ১৯১৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত প্রথমে বিদ্যাসাগর কলেজে এবং পরে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যাপনা করেন। এর পর ভারত সরকারের বৃত্তি পেয়ে ভাষাতত্ত্ব পড়বার জন্যে ইউরোপে যান। ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে বাংলা ভাষাতত্ত্বের বিশেষ গবেষণার জন্যে লণ্ডন-বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. উপাধি লাভ করেন। 'Origin and Development of the Bengali Language' গ্রন্থ তাঁর এই অক্লান্ত গবেষণার ফল। ১৯২১ থেকে ১৯২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি প্যারী বিশ্ববিদ্যালয়েও ভাষাতত্ত্ব-বিষয়ে অধ্যয়ন করেন এবং সারা ইউরোপ ভ্রমণ করেন। ভারতে ফিরে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাতত্ত্ব বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত হন। ১৯২৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে মালয়, সুমাত্রা, জাভা, বালী এবং শ্যাম দেশ ভ্রমণ করেন, এবং সফরকালে বিভিন্ন বিদ্বৎসমাজে ভারতের সংস্কৃতি বিষয়ে বক্তৃতা দেন। এর পরও বহুবার তিনি নানা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বিদেশে গিয়েছেন, সংস্কৃতি বিষয়ে ভারতের প্রতিনিধিত্বও করেছেন। ভারতের শিল্পকলা-বিষয়ক বহু গুরুত্বপূর্ণ সংস্থার সঙ্গে তিনি আজীবন যুক্ত ছিলেন। এই সেদিনও কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের রম্য পরিবেশে জাতীয় অধ্যাপক হিসেবে বহু গবেষককে তিনি সাহায্য করেছেন, নিজের জ্ঞানচর্চায়ও থেকেছেন অতন্দ্র।

অনন্য মনীষা

শুধু ভাষাতত্ত্বের গবেষক নন, জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ছিল তাঁর অবাধ সঞ্চরণ। সাহিত্য, ইতিহাস, ধর্ম, শিল্প-সংস্কৃতি-বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ও অনুশীলন ছিল। তাঁর জ্ঞানের পরিধি কত বিস্তৃত ছিল প্রায় একলক্ষ গ্রন্থ-সংবলিত তাঁর বিশাল গ্রন্থাগারটিই তার সাক্ষ্য দেবে। বহু অধ্যয়নে এবং বহু পর্যটনে তাঁর মন হয়েছিল উদার ও সংস্কারমুক্ত। সকলের মতকেই তিনি শ্রদ্ধা করতেন। তাঁর বহু গ্রন্থ এবং অজস্র রচনায় তাঁর জ্ঞানের গভীরতা, সৌন্দর্যবোধ, মানবপ্রেম এবং ঔদার্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

জ্ঞানবৃদ্ধ হলেও তাঁর মনটা ছিল চিরতরুণ। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমায় রসেবশে রাখিস, মা আমায় শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে।' সুনীতিকুমারের জীবনে বোধহয় এইটিই ছিল সবচেয়ে বড়ো প্রার্থনা। ভাষার কচ্‌কচি তাঁকে 'শুকনো সন্ন্যাসী' করে নি, রসের জগতে ছিল তাঁর অবাধ সঞ্চার। ছবিই হোক, গানই হোক, ভাস্কর্যই হোক—যে-কোন শিল্পের রসগ্রহণে তাঁর শক্তি ছিল অসাধারণ। শুধু রস নয়, রসনা-প্রিয়ও ছিলেন তিনি। শুধু মনের খাদ্য নয়, দেহের খাদ্যকেও সমান মর্যাদা দিতেন তিনি। শেষ বয়সে তিনি বলতেন, 'হজম যখন হয় খাব না কেন?'

মানুষ সুনীতিকুমার

রসে-বশের এই মানুষটিকে চিনতে রসিক রবীন্দ্রনাথের ভুল হয় নি। আর রবীন্দ্রচর্চা থেকেও সুনীতিবাবু কখনও বিরত হন নি। রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারকে 'ভাষাচার্য' আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সুনীতি চাটুর্য্যের 'ভাষাতত্ত্ব'। এ-সম্মান সুনীতিকুমার ভোলেন নি কখনও।

উপসংহার

সুনীতিকুমার আজ নেই, কিন্তু তিনি আজও এক জীবন্ত প্রেরণা। বাংলার মনীষা সুনীতি-স্মরণে উদ্দীপিত হোক, সারা পৃথিবী সেই মনীষার দিকে চেয়ে থাকুক।

চিন্তাসহায়ক বাণী

সুনীতকুমারের উদ্দেশ্যে রচিত একটি সনেট।

শুধুই কি ভাষাচার্য ভাষার কঙ্কাল/দেখে শুনে বলে গেলে কে কাহার জাতি,
কোথা মিল গরমিল সে রহস্যজাল/উন্মোচিত ক'রে গেলে তাই তব খ্যাতি?
তা তো নয়, তা'হলে কি শিল্পে ইতিহাসে/গহন নন্দনতত্ত্বে ক'রে আনাগোনা
রেখে গেলে উপচার অনিন্দ্য প্রকাশে/তাই কি তোমার নাম স্বর্ণসূত্রে বোনা?
তাও নয়; ভাষা আর জ্ঞানের অতীতে / সব দেশে সবকালে যে অপরাজেয়
সেই মানুষেরই ধ্যানে শ্রদ্ধানতচিতে / জেনেছিলে মানুষের সব কিছু জ্ঞেয়।
এই সত্য রেখে গেলে আমাদের কাছে/মানুষ জীবনে নয় মরনেই বাঁচে।

(জন্ম ২৬শে নভেম্বর ১৮৯০)

(মৃত্যু ২৯শে মে ১৯৭৭)

পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

[ভূমিকা—পূর্বজীবন—অভিনব চিকিৎসকরূপে আবির্ভাব—সমস্যা নির্ধারণে প্রকল্প—কৃষি-শিল্প ও উপনগরী—উপসংহার]

ভূমিকা

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন চিকিৎসা-জগতের প্রবাদপুরুষ। 'উনি একেবারে বিধান রায়' এমন কথা আমরা হামেসাই বলতে শুনি। কেবল রোগের নয়, সমস্যা জর্জর এই পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার-রূপে তিনি এক অভিনব চিকিৎসকের পরিচয় দিয়েছেন।

পূর্বজীবন

পাটনার বাঁকিপুরে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুলাই বিধান রায়ের জন্ম হয়। অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি. এ. আর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে বিলেত যান। দুবছর পরে এম. আর. সি. পি. এবং এফ. আর. সি. এস. ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফেরেন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল এবং কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুপ্রেরণায় তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কয়েকবার কারাবরণও করেন। দেশ স্বাধীন হবার এক বছর পরে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আমৃত্যু ঐ পদে যুক্ত থাকেন।

অভিনব চিকিৎসকরূপে আবির্ভাব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ প্রভৃতি সমস্যায় দেশ যখন জর্জরিত ও বিপর্যস্ত সেই সময় বাস্তহারা সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা রাতারাতি চার কোটিতে এসে দাঁড়াল—নানা সঙ্কটের মুহূর্তে বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে দুর্বল জাতিকে শক্ত মাটির ওপর দাঁড়াবার সুযোগ করে দিলেন। সমস্যা হল সামাজিক রোগ। দেখা গেল চিকিৎসক বিধানচন্দ্র সামাজিক রোগ সারানোর ব্যাপারেও সুদক্ষ। রোগ তো পশ্চিমবঙ্গের একটি-আধটি নয়। এখানে নানান সমস্যা—একদিকে অনাহার, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, বাস্তহারা সমস্যা—অন্যদিকে বেকার-সমস্যা, কৃষি-শিল্পের সমস্যা, পথ ও পরিবহণ সমস্যা। এখানেও রাখলেন তাঁর দক্ষতার পরিচয়।

সমস্যা নির্ধারণে প্রকল্প

বাস্তহারা-পুনর্বাসনের জন্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার জন্ম হল। পথ ও পরিবহণের কাজে হাত দিয়ে তিনি বাঙালী ড্রাইভারের হাতে তুলে দিলেন ট্যাক্সির লাইসেন্স—পত্তন করলেন 'কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা।' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী তাঁর স্বপ্নমানস থেকে জন্মলাভ করেছে। এরা সকলেই তাঁর মানস পুত্র অথবা কন্যা। খড়্গপুর আই. আই. টি., কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্পের রূপায়ন তাঁরই কৃতিত্বের পরিচয়-বাহী।

জ্ঞানবৃদ্ধ হলেও তাঁর মনটা ছিল চিরতরুন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'আমায় রসেবশে রাখিস, মা আমায় শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে।' সুনীতিকুমারের জীবনে বোধহয় এইটিই ছিল সবচেয়ে বড়ো প্রার্থনা। ভাষার কচ্‌কচি তাঁকে 'শুক্‌নো সন্ন্যাসী' করে নি, রসের জগতে ছিল তাঁর অবাধ সঞ্চার। ছবিই হোক, গানই হোক, ভাস্কর্যই হোক—যে-কোন শিল্পের রসগ্রহণে তাঁর শক্তি ছিল অসাধারণ। শুধু রস নয়, রসনা-প্রিয়ও ছিলেন তিনি। শুধু মনের খাদ্য নয়, দেহের খাদ্যকেও সমান মর্যাদা দিতেন তিনি। শেষ বয়সে তিনি বলতেন, 'হজম যখন হয় খাব না কেন ?'

মানুষ সুনীতিকুমার

রসে-বশের এই মানুষটিকে চিনতে রসিক রবীন্দ্রনাথের ভুল হয় নি। আর রবীন্দ্রচর্চা থেকেও সুনীতিবাবু কখনও বিরত হন নি। রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারকে 'ভাষাচার্য' আখ্যা দিয়েছিলেন তাঁর 'বাংলা ভাষা পরিচয়' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে। রবীন্দ্রনাথ 'শেষের কবিতা'য় অমিত রায়ের হাতে তুলে দিয়েছিলেন সুনীতি চাটুর্য্যের 'ভাষাতত্ত্ব'। এ-সম্মান সুনীতিকুমার ভোলেন নি কখনও।

উপসংহার

সুনীতিকুমার আজ নেই, কিন্তু তিনি আজও এক জীবন্ত প্রেরণা। বাংলার মনীষা সুনীতি-স্মরণে উদ্দীপিত হোক, সারা পৃথিবী সেই মনীষার দিকে চেয়ে থাকুক।

চিন্তাসহায়ক বাণী

সুনীতকুমারের উদ্দেশ্যে রচিত একটি সনেট।

শুধুই কি ভাষাচার্য ভাষার কঙ্কাল/দেখে শুনে বলে গেলে কে কাহার জাতি,
কোথা মিল গরমিল সে রহস্যজাল/উন্মোচিত ক'রে গেলে তাই তব খ্যাতি ?
তা তো নয়, তা'হলে কি শিল্পে ইতিহাসে/গহন নন্দনতত্ত্বে ক'রে আনাগোনা
রেখে গেলে উপচার অনিন্দ্য প্রকাশে/তাই কি তোমার নাম স্বর্ণসূত্রে বোনা ?
তাও নয়; ভাষা আর জ্ঞানের অতীতে / সব দেশে সবকালে যে অপরাজেয়
সেই মানুষেরই ধ্যানে শ্রদ্ধানতচিতে / জেনেছিলে মানুষের সব কিছু জ্ঞেয়।
এই সত্য রেখে গেলে আমাদের কাছে/মানুষ জীবনে নয় মরনেই বাঁচে।

(জন্ম ২৬শে নভেম্বর ১৮৯০)
(মৃত্যু ২৯শে মে ১৯৭৭)

পশ্চিমবঙ্গের রূপকার ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

[ভূমিকা–পূর্বজীবন –অভিনব চিকিৎসকরূপে আবির্ভাব–সমস্যা নির্ধারণে প্রকল্প–কৃষি-শিল্প ও উপনগরী–উপসংহার]

ভূমিকা

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন চিকিৎসা-জগতের প্রবাদপুরুষ। 'উনি একেবারে বিধান রায়' এমন কথা আমরা হামেসাই বলতে শুনি। কেবল রোগের নয়, সমস্যা জর্জর এই পশ্চিমবঙ্গের কর্ণধার-রূপে তিনি এক অভিনব চিকিৎসকের পরিচয় দিয়েছেন।

পূর্বজীবন

পাটনার বাঁকিপুরে ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দের ১লা জুলাই বিধান রায়ের জন্ম হয়। অঙ্কে অনার্স নিয়ে বি. এ. আর কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ থেকে ডাক্তারি পাশ করে বিলেত যান। দুবছর পরে এম. আর. সি. পি. এবং এফ. আর. সি. এস. ডিগ্রী নিয়ে দেশে ফেরেন। ক্যাম্বেল মেডিক্যাল স্কুল এবং কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অনুপ্রেরণায় তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি কয়েকবার কারাবরণও করেন। দেশ স্বাধীন হবার এক বছর পরে ১৯৪৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে আমৃত্যু ঐ পদে যুক্ত থাকেন।

অভিনব চিকিৎসকরূপে আবির্ভাব

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, মহামারী, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশবিভাগ প্রভৃতি সমস্যায় দেশ যখন জর্জরিত ও বিপর্যস্ত সেই সময় বাস্তুহারা সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা রাতারাতি চার কোটিতে এসে দাঁড়াল—নানা সঙ্কটের মুহূর্তে বিধানচন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের নেতৃত্বভার গ্রহণ করে দুর্বল জাতিকে শক্ত মাটির ওপর দাঁড়াবার সুযোগ করে দিলেন। সমস্যা হল সামাজিক রোগ। দেখা গেল চিকিৎসক বিধানচন্দ্র সামাজিক রোগ সারানোর ব্যাপারেও সুদক্ষ। রোগ তো পশ্চিমবঙ্গের একটি-আধটি নয়। এখানে নানান সমস্যা—একদিকে অনাহার, অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য, বাস্তুহারা সমস্যা—অন্যদিকে বেকার-সমস্যা, কৃষি-শিল্পের সমস্যা, পথ ও পরিবহণ সমস্যা। এখানেও রাখলেন তাঁর দক্ষতার পরিচয়।

সমস্যা নির্ধারণে প্রকল্প

বাস্তুহারা-পুনর্বাসনের জন্যে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার জন্ম হল। পথ ও পরিবহণের কাজে হাত দিয়ে তিনি বাঙালী ড্রাইভারের হাতে তুলে দিলেন ট্যাক্সির লাইসেন্স—পত্তন করলেন 'কলকাতা রাষ্ট্রীয় পরিবহন সংস্থা।' যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, রবীন্দ্রভারতী তাঁর স্বপ্নমানস থেকে জন্মলাভ করেছে। এরা সকলেই তাঁর মানস পুত্র অথবা কন্যা। খড়্গপুর আই. আই. টি., কল্যাণী কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন এবং হরিণঘাটা দুগ্ধ প্রকল্পের রূপায়ণ তাঁরই কৃতিত্বের পরিচয়-বাহী।

কৃষির উন্নতির জন্যে দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা তাঁরই কৃতিত্বের পরিচয়-বাহী। কিন্তু তাঁর সবচেয়ে বড় সৃষ্টি হল দুর্গাপুর শিল্পকেন্দ্র ও উপনগরী। তাঁর সাধনায় দুর্গাপুর আজ পশ্চিমবঙ্গের 'রূঢ়'। চিত্তরঞ্জনে লোকোমোটিভ এবং রূপনারায়ণ-পুরে কেবল্‌স্ ফ্যাক্টরি তাঁরই অবদান। হলদিয়া বন্দর, ব্যাণ্ডেল ও সাঁওতালদি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, কলকাতার লবণহ্রদ উপনগরী (বর্তমানে যা বিধাননগর নামে খ্যাত) তাঁরই পরিকল্পনা অনুসারে গড়ে উঠেছে। ব্যবসায়-প্রকল্পেও তিনি প্রতিভার ছাপ রেখে গেছেন। শিলং ইলেক্‌ট্রিক কোম্পানির তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। জাহাজ,-বিমান ও ইন্সিওরেন্স ব্যবসার সঙ্গেও তাঁর সংযোগ ছিল।

কৃষি-শিল্প ও উপনগরী

১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে প্রজাতন্ত্র দিবসে তিনি 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত হন। তিনি ছিলেন সত্যই ভারতরত্ন, এ উপাধি কেবল বাইরে থেকে আরোপিত অলঙ্কারমাত্র নয়। সারাজীবন তিনি পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের সেবা করে গেছেন। তাঁর ইচ্ছা অনুসারে আজ তাঁর বাসভবনে রোগনির্ণয় গবেষণাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। অর্থাৎ বিধানচন্দ্রের কাছে আমাদের ঋণের বোঝা ক্রমে বেড়েই চলেছে। জানি না, পশ্চিমবঙ্গ কিভাবে এই নববঙ্গের মহান রূপকারের ঋণ শোধ করবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধ অনুসরণে লেখা যায়—
তোমার আদর্শ মহাপুরুষের জীবনচরিত।

কালো টাকা

[ভূমিকা—কালো টাকার জন্ম—লালসার ফলশ্রুতি—বাজারের উপর কালো টাকার প্রভাব—কালো টাকার প্রতিরোধ-ব্যবস্থা—সরকারি প্রতিরোধ—সাদা মনের আলোতে]

'কালো টাকা'! কথাটার মধ্যেই একটা অশুভ ইঙ্গিত রয়েছে। কর ফাঁকির উদ্দেশ্যে—হিসাবের বাইরে অন্ধকারে লুকিয়ে রাখা টাকাই হল কালো টাকা। যার দাপটে সাদা টাকা অর্থাৎ হিসাবের কড়ি আজ কোণঠাসা হয়ে পড়েছে। বাজারে কেনাবেচার একটা বড় অংশ পরিচালিত হয় কালো টাকার মাধ্যমে। ফলে মার খায় সাদা টাকার মালিক, যারা সৎ নাগরিক। তাই চিন্তানায়কদের কপালে আজ গভীর বলিরেখা দেখা দিয়েছে, কালো টাকার গতিরোধে তৎপর হয়েছেন দেশের সরকার।

ভূমিকা

কালো টাকার জন্ম হয় নানাভাবে। তবে সবচেয়ে বড় উৎস হল কর ফাঁকি আর

চোরাকারবার। বছরের পর বছর কর-ফাঁকি দিয়ে আর চোরাকারবার করে অসাধু ব্যবসাদারের হাতে যে-বিপুল কালো টাকার পাহাড় জমে ওঠে তার হিসাব আয়-কর বিভাগের অজানা। হঠাৎ দেখা যায় প্রয়োজনীয় পণ্যের যোগান বন্ধ ; শিশুর খাদ্য, রোগীর ওষুধ বাজার থেকে উধাও হয়েছে। পণ্যমূল্য হয়েছে দশগুন। আয়কর ফাঁকি দিয়ে সেই টাকা চলে যায় অসাধু ব্যবসাদারের ঘরে। এ ছাড়াও আছে ভেজালের কারবার, ঘুষ, সেলামী, লাইসেন্সবিক্রি ইত্যাদি কারবার। যার ফলে ঘটছে কালো টাকার বংশবৃদ্ধি।

কালো টাকার জন্ম

মানুষের মাত্রাতিরিক্ত অর্থগৃধ্নুতা কালো টাকার চাহিদা সৃষ্টি করে। আর লোভের তো পরিতৃপ্তি নেই। ক্রমবর্ধমান লোভ মেটানোর জন্যে চাই অর্থ। সোজা পথে অর্থ সহজে আসে না। তাই লুব্ধ মানুষ পা বাড়ায় চোরাগলির অন্ধকার রাজ্যে। এই রাজ্যে একবার ঢুকলে আর নিস্তার নেই, মুক্তিরও উপায় নেই। অন্ধকারে তলিয়ে যায় মানুষ। কালো টাকার কালো ছায়া বিস্তারিত হয়। কালো টাকার রাহুগ্রাসে কবলিত মানুষের বিষাক্ত নিঃশ্বাসে চারিদিক কলুষিত হয়। সাধারণ ভালো মানুষেরাও লোভের ফাঁদে পা দিতে বাধ্য হয়।

লালসার ফলশ্রুতি

কালো টাকার চাপে দেশের মুদ্রানীতি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। কালোবাজারী, চক্রবৃদ্ধিহারে পণ্যমূল্য-বৃদ্ধি, মজুতদারী আর ব্যাপক ফাটকাবাজি চলছিল অবাধে। এদের অনিবার্য ফল হিসাবে দেখা দিয়েছিল তীব্র মুদ্রাস্ফীতি। সঙ্গে সঙ্গে দেশের উন্নয়নপ্রকল্প বিঘ্নিত হচ্ছিল আর সৃষ্টি হচ্ছিল এক নতুন ধনী-সমাজ। কর ফাঁকি অর্থনীতির গলা টিপে এক অদ্ভুত তাণ্ডবের সৃষ্টি করেছিল। ফলে কালো টাকা অর্থাৎ যে টাকা অর্জন করতে শুল্ক দিতে হয় না, তা বাজারের ক্রয়ক্ষমতা কালোবাজারী আর চোরাচালানীদের হাতে তুলে দিয়েছিল! এই অবস্থা আর কতদিন চলতে পারে? যদি এর প্রতিকার সরকার না করতেন তা হলে কি ভয়াবহ পরিস্থিতি দেখা দিত তা কল্পনা করা যায় না। সরকার শক্ত হাতে কালো টাকার গতিরোধে তৎপর হয়েছেন।

বাজারের উপর কালো টাকার প্রভাব

এই কালো টাকার কণ্ঠ রোধ করে মুদ্রাস্ফীতি প্রতিরোধ করতে না পারলে জাতীয় অর্থনীতি-যে ক্রমশ ধ্বসে পড়বে এটা সম্যক্‌ভাবে বুঝতে পেরেই আমাদের প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী মূল্যবৃদ্ধির প্রবণতা রোধ করতে এগিয়ে এসেছিলেন। চোরাচালান-প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে নেওয়া হয়েছে। Maintenance of Internal Security Act-প্রয়োগ হল ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে। পরে ১৯-এ ডিসেম্বর ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে Cofeposa Act প্রয়োগ করা হল। এর পরে জরুরী অবস্থা ঘোষিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বহুলোক যারা এই চোরাচালানের ব্যবসায়ে জড়িত তাদের আটক রাখা হল। প্রধানমন্ত্রীর কুড়ি দফা কর্মসূচীতে চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা জোরদার করার কথা ঘোষণা করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায় পুলিশী তৎপরতা। তারা নানা জায়গায় হানা দিয়ে বহু পণ্য বাজেয়াপ্ত করেছে আর অসাধু ব্যবসায়ীদের আটক করেছে। এক বছরে ৯১২

কালো টাকার প্রতিরোধ-ব্যবস্থা

জন চোরাকারবারীর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী হয়। ১৯৭৬-এর জানুয়ারিতে আর একটি আইন করে চোরাকারবারীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১৯৮২-তেও সরকার নানা ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সম্প্রতি আমাদের তরুণ প্রধানমন্ত্রী কালো টাকার বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের সঙ্কল্প ঘোষণা করেছেন। যে-সব আইনগুলো অকেজো হয়ে আছে সেগুলোকে তিনি প্রয়োগ করবেন এবং প্রয়োজন বোধে নতুন আইনের প্রবর্তনের কথাও ভাববেন। তাঁর নির্দেশ মতো কালোটাকা ধরবার অভিযানও ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। বিভিন্ন ব্যাঙ্কের লকারে, বেনামে গাড়ি-বাড়ি, সোনার অলঙ্কার ছাড়াও বস্তাবন্দী হয়ে হাস ফাঁস করছে কালোটাকা। তাই মালিকেরা কালো টাকা লুকোবার নানা ফন্দি ফিকির খুঁজছেন, কিন্তু এবারে কালোটাকা রোধে যে-সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী তাতে এই ব্যাধির কবল থেকে লোকে ক্রমশ মুক্তির পথে যাবে, এ আশা প্রবল হয়ে উঠেছে।

সরকারী প্রতিরোধ

জরুরী অবস্থা ঘোষণার পর থেকে হিসাববহির্ভূত টাকা রাখা অর্থনৈতিক অপরাধ বলে গণ্য হয়েছে। আর অর্থনৈতিক অপরাধীদের চরম শাস্তি ঘোষণার পর থেকে কালোটাকার দাপট অনেকটা খর্ব হয়েছে। যুগ যুগ ধরে যে কালোবাজার চলে আসছে তার মূল উৎপাটন করতে প্রত্যেক নাগরিকের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

সাদা মনের আলোতে

একমাত্র মানুষের সাদা মনের আলোতেই কালোটাকার কালিমা দূর হতে পারে। অর্থাৎ মানুষ যদি তার উদগ্র লালসা আর অশুভ মানসিকতার ছোঁয়া থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারে তবেই কালোটাকার রাহুগ্রাস থেকে দেশের মুক্তি ঘটতে পারে। কিন্তু মনটাকে সাদা রাখা সহজ ব্যাপার নয়। শুভ বুদ্ধির জাগরণও সোজা কথা নয়। সাদা মনের উন্মেষ চাই। তা না হলে সব আইনই তামাসা হয়েই থাকবে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—মুদ্রাস্ফীতি।

বাণিজ্যে ন্যায়নীতি

[ভূমিকা—বাণিজ্যের লক্ষ্য অকল্যাণ নয়; কল্যাণ—অন্ধকারের উপকথা—দুর্নীতির নানারূপ—দুর্নীতির কণ্ঠরোধে সরকারী উদ্যোগ—উপসংহার।]

ভূমিকা

পৃথিবীতে শুভ-অশুভ, ন্যায়-অন্যায়ের যুদ্ধ চলেছে দেবাসুরের মত। সেই যুদ্ধে অসুর বুঝি দেবতাকে এনেছে কোণঠাসা করে, তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রের মত বাণিজ্যজগৎ থেকেও শুভবোধ আজ নির্বাসিত। নীতিভ্রষ্টেরা নিরীহ মানুষের মুখের সামনে ওষুধের নাম করে তুলে ধরে বিষের পাত্র। ভেজালের ফলাও কারবার আর শিশুর খাদ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলে ওরা ব্যাঙ্কে টাকার অঙ্ক বাড়ায়। আর সাধারণ মানুষের বাড়ে দেনা।

"লক্ষ্মীর অন্তরের কথাটি হচ্ছে কল্যাণ, সেই কল্যাণের দ্বারা ধন শ্রী লাভ করে"—একথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। অকল্যাণ নয়, কল্যাণ সাধনই হল বাণিজ্যের উদ্দেশ্য।

বাণিজ্যের লক্ষ্য অকল্যাণ নয়, কল্যাণ

কিন্তু ভারতের বাণিজ্য চলে গিয়েছে অর্থলোভী ধনকুবেরদের হাতের মুঠোয়। "কুবেরের অন্তরের কথা হচ্ছে সংগ্রহ"—এইসব সংগ্রহ-বাতিকগ্রস্ত ব্যবসাদার দেশের কল্যাণ চায় না। নীতিবোধকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়েই তারা ব্যবসা ফেঁদে বসেছে। বাজারীয়া পণ্যের হ্রাস-বৃদ্ধির ভেল্কি দেখিয়ে মানুষের রক্তভেজা টাকা ওরা ঘরে তোলে। ফলে কল্যাণের বদলে বড় হয়ে দেখা দেয় বিকৃতি।

পৃথিবীতে দুটি যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে। যুদ্ধের ফলে অকল্যাণের প্রতিষ্ঠা। জীবনের শ্রেষ্ঠ মূল্যবোধই যুদ্ধের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। আজ মানুষের চোখের সামনে বিগত

অন্ধকারের উপকথা

শতাব্দীর আদর্শবোধ নেই যা মানুষকে কল্যাণের পথে চালিত করে। তার পরিবর্তে এসেছে লালসা। এ লালসা অর্থের। কালোবাজারী, মজুতদারী তো যুদ্ধেরই সৃষ্টি। এদের চক্রান্তে সংঘটিত হয়েছে পঞ্চাশের মন্বন্তর। দুর্নীতি হয়তো আগেও ছিল কিন্তু তার ভয়াবহ নগ্নপ্রকাশ ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে।

নীতিবোধ না থাকায় অসাধু ব্যবসাদারের বিবেকের লাগাম গিয়েছে আল্‌গা হয়ে। পাগলা ঘোড়াটা ছুটেছে অপরাধের অলিগলি দিয়ে। আয়কর ফাঁকি দেবার প্রবণতায়

দুর্নীতির নানারূপ

ওদের ছলচাতুরীর অন্ত নেই। তার জন্যে দু রকমের হিসাব রাখার ব্যবস্থা। এ ছাড়াও আছে আমদানি-রপ্তানির কারচুপি, বৈদেশিক মুদ্রা ফাঁকি। ফলে প্রতারিত হয় জাতীয় অর্থনীতি। আইন ওদের স্পর্শ করতে পারে না, কারণ আইনের আওতার বাইরেই ওদের বৃদ্ধি ও পুষ্টি। অবশ্য সম্প্রতি পুলিশের তৎপরতায় বহু কালোবাজারী ও ভেজাল ওষুধের কারবারী ধরা পড়েছে।

১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে ভারতে Prevention of Food Adulteration Act চালু হয়।

দুর্নীতির কণ্ঠরোধে সরকারী উদ্যোগ

অতএব দেখা যাচ্ছে, অনেক আগে থেকেই ভেজাল কারবারের কণ্ঠরোধ করতে সরকার তৎপর। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় এই ভেজাল-নিবারণী বিধির ব্যবহার তেমন ব্যাপক নয়। তা ছাড়া, ভেজাল ওষুধ খাইয়ে লক্ষ মানুষ মেরে আদালতে কিছু অর্থদণ্ড দিয়েই যদি রেহাই পাওয়া যায়, তা হলে শাস্তি কোথায়? তাই কঠোরতম কোন আইনের প্রয়োজন। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাচক্র ১৯৫৪ খ্রীস্টাব্দের Prevention of Food Adulteration Act-কে আরও শক্তিশালী করার সুপারিশ করেছিল। তারই ফল হল ৯৬৬ খ্রীস্টাব্দের দুটি নতুন বিধি। এই নতুন আইনে অপরাধীদের শাস্তির মাত্রা কঠোর হয়েছে।

সম্প্রতি কঠোর হাতে আমাদের সরকার এই চোরাকারবারী অসাধু ব্যবসায়ীদের

উপসংহার

দমনে তৎপর হয়েছেন। তার জন্যে চালু হয়েছে নানা আইন। তৎপর হয়েছেন পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগ। কিন্তু দেশের স্বার্থে আরও কঠোর আইন প্রণয়ন করে এই ঘুঘুচক্রের মূলোৎপাটন করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে

সৎ নাগরিককে ব্যবসার দায়িত্বভার তুলে নেবার জন্যে এগিয়ে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে সমাজের কল্যাণেই বাণিজ্য, বাণিজ্যের জন্যে সমাজ নয়। বাণিজ্যে বাস করেন লক্ষ্মী। তাই লক্ষ্মীই বাণিজ্যের লক্ষ্য। আমাদের সুস্থ ও সৎ বাণিজ্যের মাধ্যমে আমরা যেন লক্ষ্মীকেই ঘরে তুলতে পারি।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. বাণিজ্যের একাল সেকাল। ২. সমাজ সেবায় বাণিজ্য।

আমাদের বেকার-সমস্যা

[ভূমিকা—পশ্চিমবঙ্গের চিত্র/শহরে—গ্রামে—কারণ—সরকারের ভূমিকা—বেকার ভাতা—করণীয় —উপসংহার।]

ভূমিকা

ছাতা হাতে হরিপদ কেরানীদের দিকে তাকিয়েও ওরা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে : ভগবান্, যদি দশটা-পাঁচটার যা হোক একটা কিছু হাতের মুঠোয় পেতাম। ওরা কারা? কবি যাদের যৌবনে রাজটিকা দিয়েছেন, তারা! ঝড়ের থেকে বজ্রকে কেড়ে আনার দাবি নয়—একটুকু কাজের আশা।

পশ্চিমবঙ্গের চিত্র/শহরে

বাবা ছোট ছেলেটাকে ধমকে বললেন, 'আজ বাদে কাল পরীক্ষা, এখনও টোটো কোম্পানি'। মৃদুকণ্ঠে ছেলেটি যা বলে গেল মায়ের কানে গেল শুধু : 'দাদা তো অনেক পড়াশোনা করে পাশ করে বসে আছে, আমি পড়ে করব কি? পাশ যতক্ষণ না করছি, বেশ আছি। পাশ করলেই সমস্যা!'

ঝাঁকে ঝাঁকে পাশ করে বেরুচ্ছে ছেলেমেয়েরা। কাজ চাই, কাজ নাই। রামের বোনের নাম জানলেও চাকরি হবে না, চাঁদের ওজন জানলেও চাকরি হবে না। হবে কি করে? কাজ একটা, প্রার্থী এক লাখ! তারপর আছে ছাঁটাই, লক-আউট, লে-অফ—নানা পরিভাষার অভিধান।

গ্রামে

গ্রামের চেহারাও এক। চাষের কাজ আর কতটুকু সময়ের। তারপর? বেকার। জমিও তো সকলের নেই। গফুরেরা তাই আমিনাদের হাত ধরে চটকলে আসে। আর চটকলের অবস্থা? দেশবিভাগের পর থেকেই তো একটানা মন্দা।

কারণ

কারণ, জনসংখ্যা বাড়ছে জ্যামিতিক প্রগতিতে আর কাজের ক্ষেত্র, তা হাঁ করে তাকিয়েই দেখছে, হেঁটে চলতে ভুলে যাচ্ছে। ধনীদের হাতেই কলকাঠি। এক হাতে টাকা জমছে, সমবণ্টন নেই। তার ওপর যন্ত্র এসেও মানুষের হাতের কাজ কেড়ে নিয়েছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক কারণও

যথেষ্ট আছে। শিল্পে অশান্তি, ব্যবসায়ে সঙ্কট, লোড শেডিং, মালিক-শ্রমিকে মর্যাদার লড়াই, সরকারের নমনীয় নীতি প্রভৃতি তো আছেই।

সরকারের ভূমিকা

কর্মপ্রকল্প বাড়াবার জন্যে সরকার নানা পরিকল্পনা নিয়েছেন। নতুন নতুন কর্মোদ্যোগের আয়োজনও করা হয়েছে। বেকার যুবকদের ঋণ দিয়ে সাহায্য করার জন্যেও সম্প্রতি ব্যাপক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। কালো টাকা উদ্ধার করে দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে প্রাণপ্রবাহ আনবার চেষ্টাও বেকারসমস্যা দূর করার ব্যাপারে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

বেকার ভাতা

গত কয়েক বছর হল সরকার বেকার যুবকদের জন্যে বেকার ভাতা প্রবর্তন করেছেন। মোটামুটি ভাবে বছর তিনেক একজন বেকার যুবক এই ভাতা পেতে পারেন। এই ব্যবস্থা সাধু সন্দেহ নেই। কিন্তু এটা তো সান্ত্বনা পুরস্কারের মতো। আর ভাতার পরিমাণও যৎ সামান্য। তবু একজন বেকার যুবকের পক্ষে এ ভরাডুবির মুষ্টিলাভের মতো ব্যাপার।

করণীয়

সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত করতে হবে—বাড়াতে হবে কাজের ক্ষেত্র। কাজের ক্ষেত্র যদি না বাড়ে বৃত্তিমূলক শিক্ষা সম্প্রসারণেও কোন ফল হবে না। দেশের ব্যাঙ্কগুলো সম্প্রতি বেকার যুবকদের কর্মপ্রকল্প গড়তে যে হাত বাড়িয়েছে তা অভিনন্দনযোগ্য, তবে এ বিষয়ে আরও একটু অগ্রণী হলে ভাল হয়।

যুবকদেরও রুচিগত পরিবর্তন দরকার। চাকরি না হয় না হল। যত শ্রমসাপেক্ষ হোক না কেন যে-কোন কাজেই তাদের এগিয়ে আসতে হবে। অল্প মূলধনে নানা-রকম ছোটখাটো ব্যবসা গড়ে তোলায় তাদের আরও উদ্যোগী হতে হবে। এই রকমের কার্যকর নানা পরিকল্পনার কথা সকলকেই ভাবতে হবে। এ ধরনের পরিকল্পনার জন্যে পুরস্কার ঘোষণা করলে এ বিষয়ে উৎসাহের সঞ্চার হতে পারে।

উপসংহার

কঠিন রোগ হলে ভয় পেতে নেই। রোগীর বন্ধু সমাজে অনেকে। 'মরবার সময়ে আমার দাদার চেহারাও আপনার মত হয়েছিল।' এ কথা বললে রোগী আর যাই হোক, ভরসা যে মোটেই পায় না, তা বলা বাহুল্য। তাই হতাশাকে উত্তাপিত করে লাভ নেই। আশার কথা, প্রেরণার কথাই আজ ধ্বনিত হোক, সবাই মিলে আমরা যাতে বুক বেঁধে দাঁড়াতে পারি।

বাণিজ্যে বাঙালী

[ভূমিকা—বাণিজ্যে সেকাল—আধুনিক বাণিজ্যে বাঙালী—উপসংহার।]

ভূমিকা

প্রাচীন বাংলার মানুষ দেখেছে বাঙালী বণিক সপ্ত ডিঙা ভাসিয়ে সিন্ধু-পারের দ্বীপে দ্বীপে বাণিজ্য করতে গিয়েছে, বিনিময়ে এনেছে লক্ষ্মীর জয়মাল্য। সেদিন বাংলার পণ্য ছিল বিশ্বের বাজারের আদরের সামগ্রী।

"বাংলার মসলিন বাগ্‌দাদ রোম চীন,
কাঞ্চন মূল্যেই কিনতেন একদিন।"

এ তো কেবল কবিকল্পনা নয়, এ হল ঐতিহাসিক সত্য।

বাণিজ্যে সেকাল

প্রাচীন বাংলার নির্ভরযোগ্য কোন ইতিহাস নেই। সে অভাব পূরণ করেছে প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য। মঙ্গলকাব্য থেকে আমরা জানতে পেরেছি চাঁদসদাগর, ধনপতি সদাগর, শ্রীমন্ত সদাগরেরা সিন্ধু পার হয়ে বাণিজ্য করতেন। কবিরা তাঁদের সম্পদের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন :

"আগে তোলে ধনখণ্ড, স্বর্ণ তোলে ভাণ্ড ভাণ্ড
সাধু নহে ধনেতে কাতর।
হীরামণি মাণিক্য ভরা ডিঙ্গায় তুলিল সারা
আর তোলে বিচিত্র পাথর।"

এশিয়ার শ্রেষ্ঠ বন্দর তাম্রলিপ্ত ছিল বাঙালীর বাণিজ্যের একটি প্রাণকেন্দ্র। এ ছাড়াও ছিল বন্দর সপ্তগ্রাম। এইসব বন্দর দিয়ে বাঙালী বণিকেরা বাণিজ্যে যেতেন। পণ্য-বিনিময়ের সঙ্গে সঙ্গে হত সংস্কৃতি-বিনিময়। রবীন্দ্রনাথের 'সাগরিকা' কবিতায় এই সাংস্কৃতিক বিনিময়ের চিত্র ফুটে উঠেছে :

"চাহিলে হাসি মুখে—
আধো চাঁদের কনক মালা দোলানু তব বুকে।
মকরচূড় মুকুটখানি কবরী তব ঘিরে—
পরায়ে দিনু শিরে।"

পরিবর্তনের ছবিটিও কবির কথাতেই তুলে ধরি :

"ফুরাল দিন কখন নাহি জানি,
সন্ধ্যাবেলা ভাসিল জলে আবার তরীখানি।
সহসা বায়ু বহিল প্রতিকূলে
প্রলয় এল সাগরতলে দারুণ ঢেউ তুলে।
লবণ জলে ভরি
আঁধার রাতে ডুবাল মোর রতন-ভরা তরী।"

ইউরোপীয় বণিক বাংলার বাণিজ্য-বাজার দখল করতে ছুটে এল। তারা বাঙালীর মত কেবল বণিক ছিল না। তারা ছিল এক দিকে বণিক, অন্য দিকে জলদস্যু। বাঙালী বণিক তাদের কাছে বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতায় পরাজিত হল। এই 'হার্মাদ দস্যুদের'

অত্যাচারে বন্ধ হল বাঙালীর সমুদ্রযাত্রা, বঙ্গোপসাগরের উপকূল হল জনশূন্য অরণ্যভূমি। বাংলার শিল্পবাণিজ্যে নেমে এল দুর্দিন। যে-বাংলার মসলিন বোগ্‌দাদ-রোম-চীন স্বর্ণমূল্যে ক্রয় করত তার জন্মভূমি ঢাকা, শান্তিপুর, ফরাসডাঙা, ধনেখালি, চন্দ্রকোণা বিদেশী শক্তির নিষ্ঠুর আক্রমণে ধ্বংস হল। একদিন "বাঙালী শুধু কৃষিজীবী ছিল না। * * * তাঁত-যন্ত্র ছিল তার ধনের প্রধান বাহন। তখন শ্রী ছিল তার ঘরে, কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে। অবশেষে আরও বড়ো যন্ত্রের দানব তাঁত এসে বাংলার তাঁতীকে দিলে বেকার করে। সেই অবধি আমরা দেবতার অনিশ্চিত দয়ার দিকে তাকিয়ে কেবলই মাটি চাষ করে মরছি—মৃত্যুর চর নানাবেশে নানা নামে আমাদের ঘর দখল করে বসল।"

এই হল বাঙালীর প্রাচীন বাণিজ্যিক গৌরবের ও পরাভবের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত।

আধুনিক বাণিজ্যে বাঙালী

তার পরেও বহুকাল অতিক্রান্ত হল, বণিকের ছদ্মবেশে ইংরেজ এল, রাজা হয়ে বসল, আবার একদিন সে ইংরেজ শাসনেরও অবসান হল। গড়ে উঠল নতুন অর্থনৈতিক কাঠামো। কৃষিজ আর খনিজ সম্পদে সম্পদশালী হয়েও একদিন বাঙালী ইংরেজ আমলে চাকুরে জাতিতে পরিণত হয়েছিল। বাণিজ্যিক দুঃসাহসিকতার অভাব, শ্রমবিমুখতা একদিন বাঙালীর বৈশিষ্ট্য বলেই বিবেচিত হত। এর সঙ্গে ছিল মূলধনের অভাব, স্বাস্থ্যহীনতা আর ভাবপ্রবণতা। কিন্তু পুঁথিগত বিদ্যা অধিগত করে অবাঙালী বণিকের দরজায় দরজায় চাকরির আবেদন হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াবার দিন আজ শেষ হয়েছে। আজ তরুণ বাঙালী বুঝতে পেরেছে 'চাকরি করে কোন জাত বড় হয়নি, হতে পারে নি, পারবেও না।' তাই দেখি চাকরি খোঁজার ব্যর্থ চেষ্টা না করে শিক্ষিত বাঙালী আজ পথের ধারেই অল্প মূলধনে বাণিজ্যসম্ভার সাজিয়ে বসেছে; ব্যাঙ্কের ঋণে গড়ে তুলেছে কুটিরশিল্প। মিনিবাসের ব্যবসা তো তরুণ বাঙালীদের হাতে। প্রতিভার ধর্মই হল সোনা ফলানো। বাঙালীর যে-প্রতিভা একদিন চাকরির কাজে নিযুক্ত হত, আজ তা শিল্প-বাণিজ্যের অবাধ ক্ষেত্রের মূলধন। তাই অবাঙালী শিল্পপতির পাশে আজ বাঙালী বণিকের নামও চোখে পড়ে। যদিও তা প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য, তবু আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে ভারতীয় বাণিজ্যে বাঙালী বণিক এক বিশিষ্ট স্থান অধিকার করবে।

উপসংহার

আজ আমাদের সেই তাম্রলিপ্ত বন্দর নেই, নেই বন্দর সপ্তগ্রাম, কিন্তু আছে নবনির্মিত বন্দর হলদিয়া, আছে কলকাতা। এই সব বন্দরকে কেন্দ্র করেই নবযুগের পণ্য নিয়ে আবার নতুন করে বাঙালীকে বাণিজ্য-যাত্রা করতে হবে। বহু যুগের অবহেলিত 'মধুকর' নবপ্রাণবন্যায় আবার ভাসবে বন্দর থেকে বন্দরে, বিশ্বের ঘাটে ঘাটে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. বাঙালী কি বাণিজ্যবিমুখ? ২. প্রাচীন বাংলার বাণিজ্য। ৩. বাণিজ্যে বাঙালীর অবদান।

বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

[ভূমিকা—প্রাচীন যুগে এ দেশের বাণিজ্য—নতুন যুগ—বাণিজ্যে অবনতির কারণ—মানসিকতার পরিবর্তন—উপসংহার।]

ভূমিকা

সংস্কৃত প্রবাদ-বচনটি বাণিজ্যের অর্থকর দিকটার প্রতিই ইঙ্গিত করে নি, তাকে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। লক্ষ্মীর একটি অর্থ যেমন সম্পদ্ আর একটি অর্থ শ্রী। দেশের শ্রী বাণিজ্যনির্ভর—এ কথা কে অস্বীকার করবে?

প্রাচীন যুগে এ দেশের বাণিজ্য

সুপ্রাচীন কালে ভারত বাণিজ্যসূত্রে পৃথিবীর সুদূর দেশগুলোর সঙ্গে যুক্ত ছিল। এই বাণিজ্য চলত স্থলপথে এবং জলপথে। বহির্দেশ থেকে প্রচুর অর্থ আসত ভারতে। ভারতের এই বাণিজ্যে বাংলার একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর 'বেনের মেয়ে' উপন্যাসে ব্যবসায়ী বিহারী দত্তের সুমাত্রা, জাভা ইত্যাদি দ্বীপের সঙ্গে বাণিজ্যের বিবরণ আছে। ঝড় উঠে এসেছে। নৌকো ডোবে ডোবে। নৌকো বাঁচাতেই হবে, কারণ নৌকোয় সপরিবারে আছেন বিহারী দত্ত। 'সে যদি ডোবে বাংলা দেশটা অন্ধকার হইয়া যাইবে।' বড় ব্যবসায়ীকে অবলম্বন করেই দেশের অর্থনীতির বনিয়াদ গড়ে উঠত। মঙ্গলকাব্যগুলোতে বাংলার এই বাণিজ্য-সমৃদ্ধির আভাস পাওয়া যায়। ধনপতি সদাগরের মতো আরও বহু সদাগরই এদেশে সম্পদ্ বয়ে এনেছিল বিদেশ থেকে। 'সপ্তডিঙা মধুকর' এই বাণিজ্য-লক্ষ্মীরই ছবি।

নদী নদী কোথা যাও
বাপ-ভায়ের বার্তা দাও।

নদীপথে বাপ-ভায়েরা দূর দেশে যেত। তাদের মঙ্গল কামনায় নদীতে ফুলের অর্ঘ্য দিয়ে কত ব্রতের ছড়া গাইত মেয়েরা।

নতুন যুগ

তারপর হল পট-পরিবর্তন। সম্পদই হল বিপদ। লুব্ধ ইংরেজেরা এল এ দেশে। কুটিরশিল্প প্রায় লোপ পেল। কোথায় গেল তাম্রলিপ্ত! কোথায় গেল সপ্তগ্রাম! গড়ে উঠল নতুন বাংলার হুগলি। তারপর কলকাতা। ইংরেজদের সঙ্গে অসম বাণিজ্যদ্বন্দ্বে পরাজয় বরণ করল বাঙ্‌লার ব্যবসায়ীরা। ক্রমে বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবসায়ীরা এল বাঙ্‌লায়। বাঙালীর বাণিজ্য হল স্তিমিত। বাঙালী যুবকেরা একান্তভাবে চাকরিজীবী হয়ে পড়ল।

বাণিজ্যে অবনতির কারণ

এই পরাজয়ের বহু কারণের মধ্যে ছিল নব্য বাঙালীর শ্রমকাতরতা ও প্রয়োজনীয় ব্যবসাবুদ্ধির অভাব। প্রচলিত শিক্ষা বাঙালীর ভাব ও কল্পনাকে হয়তো উদ্দীপিত করেছিল কিন্তু জীবন-মুখী করতে পারে নি।

আজ বেকার-সমস্যা ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। যে-কোন যুবকই আজ যে-কোন

কাজ করতে প্রস্তুত ; ভ্রান্ত মর্যাদাবোধ আর কারো নেই। ব্যবসায়ে নেমে পড়েছে বাঙালী যুবকেরা। উপযুক্ত পুঁজির অভাবে তাদের সংগ্রাম খুবই কঠিন হচ্ছে। সমবায়-পদ্ধতিতেও অনেকে হাত মিলিয়েছে। এই নতুন উদ্যমকে কাজে লাগাতে হলে সরকারী ঋণদানের ব্যবস্থা আরও ব্যাপক করতে হবে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলোকেও এ বিষয়ে আরও অগ্রণী হতে হবে।

মানসিকতার পরিবর্তন

আমরা আশা করব বাঙালী 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ' এই সত্যকে তার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। সারা ভারতে বাণিজ্যিক উত্থানের সঙ্গে বাঙ্‌লাও যুক্ত হবে।

উপসংহার

বাঙালী নাও কাঙালী নাও
পবন নাইয়ের বাটে
এ গলুই ওই গলুই রাঙা সিঁদুর
রতনগঞ্জের ঘাটে।
ছলাৎ ছলাৎ দাঁড়ের টান
মাঝি মাল্লার সারি গান
উজান ভাটি চলল নাও
বোঝাই পণ্য পাটে।

—এই বাণিজ্যিক ব্যস্ততা আর মঙ্গল ছবিটি কি আবার আমরা আমাদের জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারব না?

বাংলার কুটিরশিল্প

[ভূমিকা—কুটির শিল্পের ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য—আমাদের কুটিরশিল্প অবলুপ্তির পথে—বাংলার কুটির-শিল্পের পুনরুদ্ধার দরকার—যন্ত্রশিল্প—পাশে কুটিরশিল্পের অবস্থান—কুটিরশিল্পের উন্নতির বাধা দূর করতে হবে—কুটিরশিল্পের উন্নয়ন প্রয়াস—উপসংহার]

বাংলার কুটিরশিল্পজাত পণ্য একদিন বিশ্বমানবের হৃদয় হরণ করেছিল। সেই গৌরবময় স্মৃতির কাব্যরূপ নিয়ে বাঙ্গালী কবি গাইলেন, 'বাংলার মসলিন বোগ্‌দাদ রোম চীন/কাঞ্চনমূল্যেই কিনতেন একদিন।' এই বাংলায় একদিন কুটিরে যে কুসুম শিল্প রচিত হয়েছিল তা ছিল অনন্য। ফুলের বিচিত্র নানা আভরণ দেখে ঔরংজীবের পুত্র মহম্মদ পিতাকে লিখেছিলেন, 'কী আর দিল্লীর জড়োয়া অলঙ্কারের লোভ দেখাও পিতা, বাংলার কুসুম অলঙ্কার সকল শিল্পকে পরাজিত করে।'

ভূমিকা

কারু শিল্প থেকে দারু শিল্প—সব ক্ষেত্রেই বাংলার কুটিরশিল্প একদিন ঐতিহ্য রচনা করেছিল। ধাতু শিল্পের সুষমা, মৃৎশিল্পের কারুকার্য, শঙ্খ শিল্পের গরিমা, বস্ত্র শিল্পের বৈভব একদিন মুগ্ধ করত দেশী-বিদেশী সবাইকেই। বাংলার পর্ণকুটিরে বসে সেদিন শিল্পীরা আশ্চর্য-শিল্প কীর্তির নজির রেখেছিলেন।

কুটির শিল্পের ঐতিহ্য ও বৈচিত্র্য

বাংলা তথা ভারতের কুটিরশিল্পের গৌরবোজ্জ্বল দিনের অবসান ঘটেছে। আজ কোথায় ঢাকাই মসলিন, কোথায় চন্দ্রকোণার চরকার গান? এই পরাভবের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই, অষ্টাদশ শতাব্দীতে য়ুরোপে যে-শিল্পবিপ্লবের সূচনা হয়েছে পরবর্তী একশ বছরের মধ্যে উৎপাদনক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে তার প্রতিক্রিয়া। কিন্তু বাংলা তখনও শিল্পের শক্তিচর্চা ভুলে শিল্পের সৌন্দর্যসাধনায় মগ্ন থেকেছে। পরে য়ুরোপ থেকে শিল্পজাত পণ্যের অবাধ আমদানি বাংলার কুটিরশিল্পজাত পণ্যের উপর মারাত্মকভাবে আঘাত হানল। যন্ত্রশিল্পের আশীর্বাদপুষ্ট শক্তির কাছে বাংলার শিল্পের পরাজয়ের এটাই হল কারণ। যন্ত্রশিল্পের কাছে হস্তশিল্প দাঁড়াতে পারে না, পল্লীর শিল্পীরা তাই নিরুপায় হয়ে তাদের জন্মগত ব্যবসা পরিত্যাগ করতে বাধ্য হল। তারপর একদিন চর্চার অভাবে শিল্পীর দক্ষতা লুপ্ত হল, উৎপাদন-নৈপুণ্য হয়ে এল দুর্বল। য়ুরোপের যন্ত্রসভ্যতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলার শিল্পী সংগ্রহ করতে পারে নি যন্ত্র, পায় নি উৎকৃষ্ট কাঁচামাল, সেই সঙ্গে মূলধন, ফলে পল্লীর কেন্দ্রচ্যুত দরিদ্র বেকার শিল্পী ক্রমাগত শহরে ভিড় করতে লাগল, সেই সঙ্গে বাড়িয়ে তুলল বেকার-সমস্যা।

আমাদের কুটিরশিল্প অবলুপ্তির পথে

এতদিন কুটিরশিল্পের প্রতি উদাসীন থাকার ফলে শিল্প-বাণিজ্যে বাংলার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা, দেশীয় শিল্পের উদ্ধারসাধনের দিকে আমাদের আজও লক্ষ্য নেই। আজ আমাদের জাপান অথবা জার্মানীর শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলির কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে কিভাবে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পাশে কুটিরশিল্প তার নিজের স্থান দখল করতে পারে।

বাংলার কুটিরশিল্পের পুনরুদ্ধার দরকার

বিগত যুদ্ধের সময় দেখা গিয়েছে যেখানে যান্ত্রিক উৎপাদন চাহিদা-পূরণে ব্যর্থ, কুটিরশিল্প নিজের অস্তিত্বের সার্থকতা বিশেষভাবে প্রমাণ করেছে।

মৃতপ্রায় কুটিরশিল্পের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে শহরের মানুষকে গ্রামে ফেরানো যাবে না। 'ফিরে চল মাটির টানে' বললেই মানুষ কোনদিন শহর থেকে গ্রামে যাবে না। বড় বড় কলকারখানাগুলো সাধারণত শহর অঞ্চলেই গড়ে ওঠে এবং জাতীয় সম্পদ্ বৃদ্ধির জন্য বৃহৎশিল্পের সাহায্য আমাদের গ্রহণ করতেই হবে। কিন্তু এই বৃহৎশিল্পের দ্বারা কখনই এতবড় দেশের বেকার-সমস্যা দূর করা যাবে না। আমাদের দেশে বৃহৎশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা কুটিরশিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকসংখ্যার চেয়ে কম। তাই ক্ষুদ্র শিল্প বা কুটিরশিল্পকে যদি উন্নত করে তোলা যায় তাহলে শ্রমিকদের আর্থিক দুর্দশার হাত থেকে

যন্ত্রশিল্পের পাশে কুটিরশিল্পের অবস্থান

আমরা মুক্তি দিতে পারব। তাই বৃহৎশিল্প যে ভাবে গড়ে উঠছে তাতে ক্ষতি নেই, তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে গড়ে উঠুক কুটিরশিল্প-প্রতিষ্ঠান।

কুটিরশিল্পের উন্নতির বাধা দুর করতে হবে

যে-সব প্রতিবন্ধকের জন্যে ঘটেছে কুটিরশিল্পের অবনতি, সবার আগে সেই সব বাধা অপসারণের প্রয়োজন। দারিদ্র্য এবং শিক্ষার অভাব শিল্পোন্নতির সবচেয়ে বড় শত্রু। অর্থাভাবে শিল্পীরা ধূর্ত মহাজনদের শরণাপন্ন হয়, ফলে দারিদ্র্য বেড়ে চলে। মহাজনী দাদন ছাড়া কাঁচা মাল সংগ্রহ করা যায় না। মূলধনের অভাব দূর করতে হবে, সেই সঙ্গে উপযুক্ত শিক্ষা এবং গবেষণার সুযোগ দিতে হবে। বাংলার কতকগুলি নিজস্ব শিল্প ছিল, যেমন—তাঁত ও রেশমী বস্ত্রশিল্প, মৃৎশিল্প, কাঠশিল্প, শাঁখা এবং চিরুনী শিল্প। এই সব শিল্প আজ কোনরকমে তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখেছে। কোনটি হয়েছে অবলুপ্ত। কিন্তু এই সব পুরনো শিল্পের যেমন চাহিদা আছে তেমনি আছে উন্নতির সুযোগ-সুবিধা। উপযুক্ত সুযোগ এবং উৎসাহ পেলে আমাদের দেশে এখনও যে কত বিচিত্র পণ্য তৈরি হতে পারে তার দৃষ্টান্ত কবিগুরুর শ্রীনিকেতন।

কুটিরশিল্পের উন্নয়ন প্রয়াস

১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে হার্ভে কমিটির সুপারিশক্রমে কুটিরশিল্পের নবজীবনায়নের সূচনা হয়েছে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পরিকল্পনায় স্থির হয়েছে বৃহৎ শিল্পের সঙ্গে কুটিরশিল্পের উন্নতি ঘটাতে হবে। বড় শিল্প ছোট শিল্পের পরিপূরক রূপে গড়ে উঠবে। দক্ষ শিল্পী নিযুক্ত করতে হবে, আনতে হবে উন্নত মানের যন্ত্রপাতি। এরপর চাই শিল্পের বাজার, সেই সঙ্গে শিল্পীদের মধ্যে সমবায়-প্রথার প্রচলন।

উপসংহার

আজ দিকে দিকে শুরু হয়েছে কুটিরশিল্পের পুনরুজ্জীবন। হাতে তৈরি কাগজ, সাবান, তালগুড়, মধু এবং চর্মশিল্পের উৎপাদনের দিকে লক্ষ্য দিয়ে আশানুরূপ ফল পাওয়া গিয়েছে। এইসব শিল্পে সাতাশ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে, উৎপন্ন হয়েছে চব্বিশ হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্য। এই উন্নতি ভবিষ্যতের পাথেয় হয়ে কুটিরশিল্পকে শক্তিদান করবে।

ত্রিপুরার কুটিরশিল্প

[ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮২]

[সংজ্ঞা—ভারতে কুটিরশিল্পের ঐতিহ্য—পটভূমি ত্রিপুরা—ত্রিপুরার কুটিরশিল্প—বিপণন—প্রয়োজন—সমস্যা ও প্রতিকার—উপসংহার]

'কুটিরশিল্প' কথাটি খুব বেশিদিনের নয়। এটিকে ইংরেজি Cottage Industry-র

অনুবাদ বলা যেতে পারে। কুটিরশিল্পকে গৃহশিল্প বা হস্তনির্মিত শিল্পও বলা হয়।

সংজ্ঞা

সহজ কথায়, যা ঘরে বসে হাতে বা ছোটোখাটো যন্ত্রপাতির সাহায্যে তৈরি করা যায় তাই কুটিরশিল্প। অনেক বিদ্যুৎ-চালিত ক্ষুদ্রশিল্পও এখন কুটিরশিল্পের পর্যায়ে পড়ে।

ভারতের কুটিরশিল্পের ঐতিহ্য

ভারতের কুটিরশিল্প একদিন বহির্বিশ্বে আদৃত হত।

বাংলার মসলিন বোগ্‌দাদ রোম চীন
কাঞ্চনমূল্যেই কিনতেন একদিন।

ভারতে কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারিকা সর্বত্রই, রেশমশিল্প, পশমশিল্প, ধাতুশিল্প, গজদন্ত শিল্প, কাষ্ঠ-শিল্প ইত্যাদি খ্যাতি অর্জন করেছে। এদেশের নৌশিল্পও ছিল বিস্ময়কর।

যেখানে যে-উপকরণের প্রাচুর্য বা সহজলভ্যতা সেখানে প্রধানত সেই উপকরণেই গড়ে ওঠে কুটিরশিল্প। ত্রিপুরার শতকরা ৪০ ভাগ অঞ্চলই বনাঞ্চল। এখানে বাঁশ,

পটভূমি ত্রিপুরা

কাঠ এবং বেতের প্রাচুর্য। তাছাড়া, জাত শিল্পীর অভাব নেই ত্রিপুরায়। এখানকার শিল্পীদের সুস্থ ও সূক্ষ্ম রুচি বিস্ময়কর। শিল্পীদের সৃষ্টিধর্মী মন কখনো স্থির থাকে নি। এখানকার অপরূপ প্রকৃতি শিল্পীর প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রিত করেছে প্রতিনিয়ত। প্রকৃতির আশ্চর্য রঙের স্পর্শে শিল্পী মন সম্পৃক্ত হয়েছে। তাঁরা নিত্য নতুন সৃষ্টির স্বপ্নে বিভোর হয়ে কুটিরে কুটিরে রচনা করে গেছেন নানা শিল্প। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিল্পী চেতনায় ধ্যানী মনের প্রেরণায় ত্রিপুরার কুটিরশিল্পের ঐতিহ্যের কথা বহুবার স্মরণ করেছেন।

ত্রিপুরার শিল্প প্রধানত এই সহজলভ্য বাঁশ, কাঠ ও বেতের উপকরণেই গড়ে উঠেছে। এ গুলোকে দু ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক রকমের জিনিস দৈনন্দিন প্রয়োজনে ব্যবহার করবার জন্যে, আর একরকমের জিনিস হল ঘর সাজাবার জন্যে, এক কথায় মণ্ডন শিল্প। প্রয়োজনীয় জিনিসের মধ্যে পড়ে—মোড়া, মাদুর, ডালা, কুলো, পাখা, টেবল-

ত্রিপুরার কুটিরশিল্প

ল্যাম্পের টোপর, কলমদান ইত্যাদি। বাঁশ বা বেতে তৈরি এখানকার কুটিরই কুটিরশিল্পের সুন্দর নিদর্শন। ঠাকুর-দেবতা ও নানারকম খেলনাও এই উপকরণে তৈরি হয়। মণ্ডন-শিল্পের মধ্যে নানারকম চিত্রিত দেয়াল-পট এবং ফলক উল্লেখযোগ্য, এগুলোর সূক্ষ্মতা সত্যিই বিস্ময়কর। এ ছাড়া, অন্যান্য কুটিরশিল্পের মধ্যে তাঁতের কাপড়, দড়ি-শিল্পের উল্লেখ করা যেতে পারে। ত্রিপুরার লাইছম্বি নামে এক ধরনের চাদরের চাহিদা খুব। এগুলো তুলো আর সুতোর মিশ্রণে বোনা।

এই সব শিল্পসামগ্রী স্থানীয় বাজারের চাহিদা মিটিয়ে অন্যান্য রাজ্যেও বিক্রি হয়। ত্রিপুরার সূক্ষ্ম মণ্ডন-শিল্পের চাহিদা বিদেশেও আছে। স্থানীয় খাদি প্রতিষ্ঠান এবংকিছু

বিপণন

সমবায়-বিপণন-কেন্দ্র এইসব জিনিস বিক্রির ব্যাপারে সাহায্য করে। অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফটস্ বোর্ড শিল্পোন্নয়ন, পরিকল্পনা, সমীক্ষণ, বিপণন ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য করে।

ত্রিপুরা প্রধানত কৃষিপ্রধান। ধান এখানকার প্রধান ফসল। অবসর সময়ে কৃষিজীবীরা কুটিরশিল্পের মধ্য দিয়ে পণ্যের চাহিদা মেটাতে পারে, বাড়তি উপার্জনও করতে পারে। বেকার যুবকেরাও সুপরিকল্পিতভাবে কুটিরশিল্প অবলম্বন করলে বেকারসমস্যা কিছুটা লাঘব হতে পারে।

প্রয়োজন

সমস্যা মূলত মূলধনের। ব্যাঙ্কগুলো যদি এগিয়ে আসে তা হলে এ ব্যাপারে কিছুটা সুরাহা হয়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ বার্ষিক পরিকল্পনায় কুটিরশিল্পের উপর বেশ জোর দেওয়া হয়েছে। ভারী শিল্পকে কেন্দ্র করেই অনেক কুটিরশিল্প গড়ে উঠতে পারে। যেমন এখানকার চা-শিল্পকে কেন্দ্র করে প্যাকিং বাক্স তৈরির উদ্যম চলতে পারে কুটিরশিল্প হিসেবে।

সমস্যা ও প্রতিকার

যে-কোনো শিল্পদ্রব্যের দ্রুত বিপণনের জন্যে প্রয়োজন সুষ্ঠু যোগাযোগ-ব্যবস্থা। সেদিক থেকে ত্রিপুরা পিছিয়ে আছে। সম্প্রতি ত্রিপুরাকে রেলপথে যুক্ত করার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এই পরিকল্পনা রূপায়িত হলে ত্রিপুরার কুটিরশিল্পে নতুন প্রাণস্রোত দেখা দেবে।

ত্রিপুরার কুটিরশিল্পের সেল্‌স্ এমপোরিয়াম বিভিন্ন রাজ্যে প্রধান প্রধান নগরগুলিতে আছে। এমপোরিয়ামে প্রবেশ করলে সূক্ষ্ম কারুর বৈচিত্র্যে চোখ ঝলসে যায়, কিন্তু কেনবার ইচ্ছেটা চেপেই রাখতে হয়, কারণ এই সব জিনিসের দাম খুব বেশি। আমার মনে হয়, যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নতি ঘটলে দাম নিশ্চয় কমবে এবং ত্রিপুরার মণ্ডন-শিল্প ঘরে ঘরে শোভা পাবে।

উপসংহার

পশ্চিমবাংলার কৃষক ও কৃষি-সমস্যা

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-১৯৮১]

[ভূমিকা—কৃষিনির্ভরতা – দারিদ্র্য – কৃষি-অবনতির কারণ—উন্নতিবিধানের প্রয়াস]

একদিন ছিল ‘চাষা আর চষা মাটি এই নিয়ে দেশ খাঁটি।’ একটা দেশের পরিচয়ের অনেকটা নিহিত থাকে তার কৃষিতে। তা ছাড়া-যে ‘দেশ কৃষিপ্রাণ সে দেশের কৃষি ও চাষীর গুরুত্ব অপরিসীম।

ভূমিকা

Agriculture থেকে culture-ও সৃষ্ট হয়। বাংলার কৃষি ও কৃষকের কথকতা নিয়ে যে লোকসংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা অপূর্ব। সঙ্গীতে, ছড়ায়, প্রবাদে, গাথায় বাংলার কৃষি সংস্কৃতি কত বিচিত্র।

বাংলা কৃষিপ্রধান অঞ্চল। আমাদের প্রায় তিনভাগ মানুষই কৃষিনির্ভর। তাই কৃষির ভবিষ্যতের সঙ্গে বাংলার অধিকাংশ মানুষের মরণ-বাঁচনের প্রশ্ন জড়িত। বাংলার কবি অতীতের সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা মাতৃকা-মূর্তি আঁকতে গিয়ে বলেছেন ‘কোলভরা যার কনক-ধান্য বুকভরা যার স্নেহ’। এই কল্পনা হয়তো কেবল কবিকল্পনা

ছিল না কোনো একদিন। কিন্তু বাংলাকে অনেক দুর্যোগের অমারাত্রি পার হতে হয়েছে, তাকে ঘর করতে হয়েছে অনেক মারী আর মড়ক নিয়ে—তাই তার সর্বাঙ্গে আজও সেই রাক্ষসীর আঁচড়ের দাগ।

প্রাচীন বাংলায় কৃষি এবং শিল্প একে অন্যের পরিপূরক ছিল। অর্থাৎ একের চাহিদা অন্যে পূরণ করায় একটা শ্রমবিভাগ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু জনসংখ্যা-বৃদ্ধি এবং ক্রমশ বিদেশী যন্ত্রশিল্পের প্রতিযোগিতায় দেশীয় শিল্পের বিলোপ জনসাধারণকে **কৃষিনির্ভরতা** কৃষিনির্ভর করে তুলল। কিন্তু জনসংখ্যার তুলনায় দেশে জমির পরিমাণ বাড়ে নি, ফলে আর্থিক বনিয়াদ ভেঙ্গে পড়ল। জনসংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যদি শিল্পপ্রসার ঘটত তা হলে কৃষির উপর এতটা চাপ পড়ত না।

আমাদের দেশে শতকরা পঁচাত্তর জন মানুষ কৃষিনির্ভর। কেবল কৃষির উপর নির্ভর করতে হয় বলেই তারা এত বেশি দরিদ্র। দারিদ্র্যের জন্যে তারা দু বেলা পেট ভরে ভাত খেতে পায় না, অবশেষে ভাগ্যের হাতে নিজেকে সমর্পণ করে **দারিদ্র্য** ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হয়। এর পর অতি বৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টিতে ফসল নষ্ট হলে তাদের দুর্দশার সীমা থাকে না। তখন ঋণের জন্য মহাজনের কাছে উপস্থিত হতে হয়। কিন্তু সে ঋণ শোধ করা হয়তো তাদের পক্ষে সম্ভবপর হয় না—তখন জমি-জায়গা খুঁইয়ে তাদের হতে হয় 'দুই বিঘা জমি'র উপেন। রবীন্দ্রনাথ এদের বলেছেন "সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে। উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।"

প্রাচীন চাষপ্রথা আমাদের কৃষি-উন্নয়নের প্রতিবন্ধক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষ করে পৃথিবীর বহুদেশ যেখানে কৃষির ফসল বাড়িয়ে তুলেছে সেখানে আমরা এখনও প্রাচীন যুগের লাঙল-কোদাল মই নিয়ে চাষ করছি। সেই বুড়ো **কৃষি-অবনতির কারণ** গোরু, ভোঁতা হাল আর জীর্ণশীর্ণ কৃষক। রাশিয়া, চীন, আমেরিকা প্রভৃতি দেশ যেখানে কৃষির কাজে যন্ত্রের ব্যবহার করে অসাধ্য সাধন করেছে, সেখানে আমরা এখনও মান্ধাতার আমলের চাষপ্রথা চালিয়ে যাচ্ছি। 'রাশিয়ার চিঠি'তে রবীন্দ্রনাথ সেই যুগেই রাশিয়ার কৃষি-উন্নতির কথা বলতে গিয়ে বলেছেন, "এসব জায়গায় কৃষিবৃত্তা, সমাজতত্ত্ব প্রভৃতি সম্বন্ধে উপদেশ দেবার ব্যবস্থা আছে; যারা নিরক্ষর তাদের পড়াশুনো শেখানোর উপায় আছে, এখানে বিশেষ বিশেষ ক্লাসে বৈজ্ঞানিক রীতিতে চাষ করার ব্যবস্থা কৃষকদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়।"

ভারত স্বাধীন হবার পর সবার আগে কৃষির উন্নতির দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। কারণ আমাদের কৃষিপ্রধান দেশের শতকরা পঁচাত্তর থেকে আশিভাগ **উন্নতিবিধানের প্রয়াস** মানুষ কৃষির সঙ্গে যুক্ত। তাদের উন্নতি ছাড়া দেশের অগ্রগতি সম্ভবপর নয়। তাই স্বাধীন ভারতে গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন উদ্যোগ গৃহীত হল, রচিত হল পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় কৃষিকেই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই এই পরিকল্পনা ভারতের অবহেলিত কৃষি ও মুমূর্ষু কৃষককে এনে দিয়েছে নতুন জীবন। রাশিয়া-চীন-আমেরিকার সঙ্গে তুলনায় নগণ্য

হলেও বাংলার প্রকৃতি-নির্ভর কৃষি আজ বিজ্ঞানের প্রসাদপুষ্ট। আজ বিদ্যুৎ কৃষির সহায়, ঘটেছে জলসেচ-ব্যবস্থার উন্নতি, গভীর নলকূপ ও নদীপরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণ বাংলার কৃষিক্ষেত্রকে রেখেছে সবুজ করে। উন্নতমানের বীজ, সার আজ কৃষকের হাতের মুঠোয়। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক আর সমবায় প্রতিষ্ঠান কৃষককে সুদখোর মহাজনের অত্যাচার থেকে রক্ষা করেছে। এ ক্ষেত্রে পশ্চিম বাংলায় ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যা ক্রমহ্রাসমান, অপারেশন বর্গায় ভাগচাষীরা পেয়েছে চাষের জমি। গ্রামে গ্রামে বসেছে কৃষি শিক্ষার আসর। 'আকাশবাণীর' কৃষি-শিক্ষার আসর কৃষিকে আধুনিক হবার প্রেরণা দিচ্ছে। দেশের নানাস্থানে আজ প্রতিষ্ঠিত কৃষি বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় এমন কি কৃষি-বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। স্থাপিত হয়েছে কৃষি-বিষয়ক গবেষণাগার, কৃষিমেলা আজ তো দেশের একটা বড়ো আকর্ষণ। আর কৃষকদের জন্যে 'পেনশন' প্রথা চালু করে সরকার দেশের কৃষি ও কৃষককে মর্যাদা দিয়েছেন।

আজ দেশের মানুষ বুঝতে পেরেছে চাষী যদি বাঁচে তবেই দেশ বাঁচবে। কারণ 'তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে।'

উপসংহার

কেবল একটা জিনিস লক্ষ্য করতে হবে, গ্রাম্য দলাদলি বা অসুস্থ রাজনীতি যেন বাংলার কৃষিকে গ্রাস করতে না পারে—কারণ এরাই হল মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু।

কলকাতা

[ভূমিকা—কলকাতার পত্তন—নামকরণ—আজকের কলকাতা—কলকাতার সমস্যা—উপসংহার]

হুগলী নদীর তীরে দাঁড়িয়ে আছে কলকাতা শহর। হুগলী নদীর উপর রবীন্দ্রসেতু পেরিয়ে ট্রামলাইন চলেছে কলকাতা শহরের হৃৎপিণ্ডকে ভেদ করে। বিরাট প্রাসাদ—শত বৎসরের পুরানো স্মৃতি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। তার পাশেই আছে

ভূমিকা

হাল-আমলের হাল-ফ্যাশানের কারিগরের তৈরি বহুতল-অট্টালিকা। যে-মানুষগুলো হেঁটে যাচ্ছে তাদের কথাগুলো শুনে বুঝতে পারবেন— দক্ষিণভারতীয় কানাড়া-মালয়ালম্-তেলুগু-তামিল থেকে বাদশাহী আমলের রাজভাষা উর্দু, আবার প্রাচ্যের প্রান্তদেশের এক অখ্যাত ভাষা বিষ্ণুপুরী বা ঢাকা-নোয়াখালির বাংলা থেকে শুরু করে পার্বত্য অধিবাসীর মাতৃভাষা, সব মিলে এক অদ্ভুত শব্দের কোলাহল তুলেছে কলকাতার পথযাত্রীরা। আকৃতি ভিন্ন আচার-ব্যবহারে পৃথক, পেশায় এরা এক নয়—তবু এরা কলকাতার অধিবাসী। হয়তো কেউ এসেছে সামান্য সময় কাটিয়ে যেতে। হাতের কাজ ফুরোলে পাড়ি দেবে ভারতবর্ষের অন্য প্রান্তে। কেউ এসেছে বেশ কয়েক-পুরুষ আগে। কলকাতা এখন আর তার পরদেশ নয়। কলকাতার মাটির সঙ্গে প্রাণের যোগাযোগ ঘটেছে তার, কলকাতার মাটিতে গড়ে তুলেছে আস্তানা।

ব্যস্ততায়, প্রাণচাঞ্চল্যে যানবাহনের শব্দে লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশে, ভিন্ন জাতির ভিন্নতর জীবনযাত্রার বৈচিত্র্যে, ভারতবর্ষের রাজনীতি আর শাসনদণ্ডের রদবদলের অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সাক্ষ্য নিয়ে কলকাতা এক রহস্যময় আজব শহর।

কলকাতার পত্তন

কলকাতার পুরনো জীবনচর্চার দিকে একবার তাকানো যাক্। সাতসমুদ্র তেরোনদী পার হয়ে বাণিজ্য করতে এসেছিল যারা, তারা একদিন পাকাপাকি বন্দোবস্ত করে নিয়েছিল, দেশটাকে লুটেপুটে, মন্থন করে নিয়ে যাওয়ার জন্যে সবচেয়ে বড়ো যে হাতিয়ার সেই শাসনদণ্ডটা তাদের হাতে নিয়ে। কিন্তু এদেশের সম্পদ পাচার করতে হবে সমুদ্রপারে। সেটা তো আর উড়োজাহাজের যুগ নয়। সমুদ্র পাড়ি দিতে জাহাজেই যেতে হবে। জাহাজ নোঙর করতে চাই বন্দর। জব চার্নক সাহেব এলেন হুগলী নদীর তীরে স্থতানুটী গ্রামে। স্থতানুটী গ্রামের দক্ষিণে কলিকাতা গ্রাম। বড়বাজার থেকে চৌরঙ্গী পর্যন্ত এর বিস্তৃতি। পাশেই গোবিন্দপুর, শেষ হয়েছে হুগলী নদীর তীরে। ১৬৯০ খ্রীস্টাব্দের ১০ই মে বরিষা-বেহালার জমিদার সাবর্ণ চৌধুরীদের কাছ থেকে মাত্র তেরশো টাকায় এই তিনটি গ্রাম কেনা হল। ক্রমে এই তিনটি গ্রামকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল কলকাতা শহর। বন্দর গড়ে উঠল বাণিজ্যতরীর আর রণতরীর যাতায়াতের জন্যে। ধীরে ধীরে ভারতবর্ষ জুড়ে কায়েম হল ইংরেজশাসন। কিন্তু কলকাতা শহরকে কেন্দ্র করেই সারা ভারতবর্ষের বিস্তৃত সাম্রাজ্যকে সংহত করেছিল ইংরেজ। পূর্বদিকে বার্মা, পশ্চিমে আফগানিস্তানের বর্ডার, উত্তরের হিমালয়, দক্ষিণের মহাসাগর—এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা। তাই স্বাভাবিক নিয়মে শহরকে করতে হল জমকালো। পথঘাট বাঁধাতে হল। দুর্গ তৈরি হল। তা ছাড়া, সমুদ্রের ওপার থেকে এত নেটিভদের শাসন করতে আসবে যে-ব্রিটিশপুঙ্গব তার আমোদ-প্রমোদেরও তো বন্দোবস্ত চাই। সুদৃশ্য ভিলা তৈরি হল। মনোরম উদ্যান ও আমোদ-প্রমোদের হরেক রকমের ব্যবস্থার কোনো ত্রুটি রইল না। গড়ে উঠল কলকাতাশহর প্রাচ্যের সমস্ত নগরীর সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়ে।

নামকরণ

কলকাতা শহরের নামকরণের ব্যাখ্যা দিয়েছেন ঐতিহাসিকেরা। কলিকাতা গ্রামের নামানুসারেই নামকরণ হয়েছিল কলকাতা শহরের, কেউ কেউ তাই মনে করেন। ভাষাতত্ত্ববিদ্ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন "কলিকাতা একটি খাঁটি বাংলা শব্দ। ইহার অর্থ কলি বা কলিচূণের জন্যে 'কাতা' বা শামুকপোড়া। সুতার নুটী বা গোলার হাট বা আড়ত হইতে যেমন সুতানুটী নাম, তেমনি কলির বা চূণের ও কলিচূণের জন্য শামুকের আড়ত, এবং চূণের কারখানা হইতে 'কলিকাতা' নাম।" তাই বোধ হয় একথা আমরা স্বচ্ছন্দে বলতে পারি কলকাতা শহরের নির্মাতারা বিদেশী হলেও, কলকাতা শহরের নির্মাণের কারিগরিবিদ্যা সমুদ্রের ওপার থেকে এলেও শহরের নামটি একটি খাঁটি বাঙালী নাম।

রবীন্দ্রনাথের 'ছেলেবেলা'র কলকাতা, যে-শহরে 'স্যাকরাগাড়ি ছুটছে ছড় ছড় করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বেরকরা ঘোড়ার পিঠে' সেই কলকাতা

আর নেই। কলকাতায় এখন পাল্কীতে চড়ে বাবুরা অফিসে যান না। সকাল হতে না হতেই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ যেন ঝাঁপিয়ে পড়ে কলকাতার বুকের উপর। দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, প্রাইভেটকার, মিনিবাস—রংবেরঙের যানবাহন। সম্প্রতি পাতালরেল ও চক্ররেল আংশিকভাবে চালু হয়েছে। তবু উপচে পড়ছে মানুষ। ভিড়ের চাপে একদিকে কাত হয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটছে অফিসযাত্রীদের নিয়ে কলকাতার বাস। কলকাতায় সন্ধ্যা হলে এখন জ্বলে ওঠে নিয়ন, মার্কারি আলো। আমোদ-প্রমোদের আধুনিকতম উপকরণ সাজিয়ে কলকাতা এখন আধুনিক নগর। কিন্তু তা সত্ত্বেও কলকাতার সমস্যা অনেক। কলকাতার অধিবাসীদের সমস্যা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠছে।

আজকের কলকাতা

১৯১১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কলকাতা ছিল সারা ভারতবর্ষের রাজধানী। কলকাতা শহরের পাশে হুগলী নদীর দুধারে গড়ে উঠেছে কলকারখানা। ভারতবর্ষের শিল্পাঞ্চলগুলির মধ্যে এটিই বৃহত্তম। চারপাশের প্রদেশগুলি থেকে জীবিকার তাগিদে ভিড় করেছে মানুষ। তাই ভিড় বেড়েছে। কলকাতার সমস্যাও বেড়েছে। পথঘাটগুলির পরিসর বাড়ানোর প্রয়োজন। যানবাহন-চলাচলের আধুনিকতম ব্যবস্থা গড়ে না তুলতে পারলে কলকাতার গতি স্বাভাবিক নিয়মেই শ্লথ হয়ে আসবে। কলকারখানাগুলির ধোঁয়া, দূষিত বাতাস কলকাতার আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তুলেছে। কলকাতার 'স্কাই ক্র্যাপার'-এর পাশে রয়েছে অসংখ্য বস্তি অঞ্চল, নোংরা পথঘাট, আবর্জনার স্তূপ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ, ভিখারীর জটলা। ফুটপাথের পাশে পাশেই গড়ে উঠেছে আর-এক কলকাতা। রাস্তার উপরে ইটের উনুনে কাঠ আর কাগজ জ্বালিয়ে তৈরি হয় এদের খাবার। রাত্রের শয্যাও এই পথঘাটে। দারিদ্র্য আর ঐশ্বর্য পাশাপাশি কলকাতা শহরের বুকে যেন কাঁদছে আর হাসছে—কখনও মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফেটে পড়ছে বিক্ষোভে।

কলকাতার সমস্যা

মিছিলের নগরী কলকাতা, ভারতবর্ষের রাজনীতির প্রাণকেন্দ্র কলকাতা, স্বাধীনতা সংগ্রামের শত শহীদের স্মৃতিবিজড়িত কলকাতা ভারতবর্ষের সংস্কৃতি-চেতনায় এক অনন্যসাধারণ ভূমিকা নিয়েছে। তাই কলকাতার বেঁচে থাকার প্রয়োজন আছে—কলকাতাকে বাঁচিয়ে রাখার প্রয়োজন আছে। আমরাও যেন সেই একই কথা বলতে চাই প্রাণ ভ'রে, 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।'

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. শহর কলকাতার ইতিকথা। ২. কলকাতার সমস্যা।

চিন্তাসহায়ক বাণী

কলকাতায় আমরা মানুষ, সেখানে ইতিহাসের মাথাতোলা চেহারা কখনও দেখিনি, আমাদের চাহনি খুব কাছের দিকে বেঁটে সময়টাতেই বাঁধা।

—ছেলেবেলা। রবীন্দ্রনাথ

কলিকাতার যেন কোনো চেহারা নাই, সে যেন যেমন তেমন করিয়া জোড়াতাড়া দিয়া তৈরী হইয়াছে।

—পথের সঞ্চয়। রবীন্দ্রনাথ

কলকাতা শহরের উন্নয়ন-পরিকল্পনা

[ভূমিকা—সমস্যা-কণ্টকিত কলকাতা—পরিকল্পনা সংস্থা—পরিকল্পনার রূপরেখা—পথঘাট ও যানবাহন—বস্তি-উন্নয়ন ও জঞ্জাল-অপসারণ—কলকাতার পাতাল রেল—উপসংহার।]

ভূমিকা

হঠাৎ যদি জব চার্ণক কোনো মায়ামন্ত্রবলে ফিরে আসেন তাঁর অনেক সাধের এই কলকাতা শহরে, তিনি কি পারবেন তাঁর মানস-কন্যাকে চিনতে? না। কারণ এ শহর সেদিনের হোগলা বন আর খালবিলে-ভরা মশামাছির রাজত্ব নয়, সে এখন কল্লোলিনী কলকাতা। কিন্তু কুসুমে কীটের মতো এ মহানগরীও সমস্যার জটিল জালে আচ্ছন্ন। তাই আজ বিশেষজ্ঞমহলের কপালে চিন্তার রেখা।

সমস্যা-কণ্টকিত কলকাতা

কলকাতা আজ নানা সমস্যায় কণ্টকিত। সমস্যা তার বাসগৃহের, পরিবহণের, জলনিষ্কাশনের, জঞ্জাল-অপসারণের, শিক্ষা আর স্বাস্থ্যরক্ষার। আধুনিক শহরের একটা পরিকল্পনা থাকে, সেই পরিকল্পনা অনুসারেই তারা গড়ে ওঠে। কিন্তু আদি পর্ব থেকে কলকাতা-সৃষ্টির পিছনে কোনো সুপরিকল্পিত বৈজ্ঞানিক চিন্তা না থাকায় নানা সমস্যায় আজ তার নাভিশ্বাস উঠেছে। পথে পথে অসংখ্য মানুষের ভিড়, ট্রেনে-বাসে, ট্রামে, দোকানে বাজারে, রেশনলাইনে, সিনেমায়, খেলার মাঠে। ফুটপাথ হাঁটার অযোগ্য, পথে জঞ্জালের স্তূপ, হাসপাতালে শয্যার অভাব, অভাব পানীয় জলের। অন্য দিকে কলেরা, টাইফয়েড, ক্ষয়রোগ শহরবাসীর নিত্যসঙ্গী। তাই কলকাতা কেবল মিছিল নগরী নয়, কলকাতা হল সমস্যার মহানগরী।

পরিকল্পনা সংস্থা

সমস্যা-কণ্টকিত কলকাতাকে বাঁচানোর জন্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ তৎপর হয়েছেন। পঁয়ষট্টি লক্ষ মানুষের জন্যে সুস্থ ও উন্নততর পরিবেশ রচনার উদ্দেশ্যে বৃহত্তর কলকাতা মহানাগরিক পরিকল্পনার জন্ম হয়েছে। সম্প্রতি কলকাতা মেট্রোপলিটান্ পরিকল্পনা সংস্থা (C. M P. O.) এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশন ও রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে রচিত হয়েছে একটি কল্যাণমূলক পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় উলুবেড়িয়া থেকে বাঁশবেড়িয়া আর কল্যাণী থেকে বজবজ ও বারুইপুর—এই ১১৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকার নাম দেওয়া হয়েছে 'কলকাতা মেট্রোপলিটান জেলা'। এই মেট্রোপলিটান জেলার সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার দায়িত্বভার ও কর্মক্ষমতা অর্পিত হয়েছে 'কলকাতা মহানাগরিক উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ' নামে একটি সংস্থার উপর, যার সংক্ষিপ্ত নাম C. M. D. A.।

ইংরেজ সরকারের ঔদাসীন্যে যে-সমস্যা তিল তিল করে প্রায় দুশো বছরে তৈরি হয়েছে তার সমাধান দুদিনে সম্ভবপর নয়। তবু C. M. D. A. নেমেছে কোমর

বেঁধে। প্রথমেই পানীয় জল সরবরাহের কাজে এই সংস্থা হয়েছে তৎপর। তাই তেত্রিশ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। নতুন নতুন জলসত্র ও জলপ্রেরণের স্টেশন নির্মাণের কাজ চলেছে দ্রুত গতিতে। শুরু হয়েছে নতুন জলের পাইপ বসানো আর পুরানো পাইপ মেরামতির কাজ। সেই সঙ্গে চলেছে পয়ঃপ্রণালীর কাজ। অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তৈরি সেকালের পয়ঃপ্রণালীগুলো আজ শহরের জল নিষ্কাশনে অক্ষম। তাই সামান্য বৃষ্টিতেই কলকাতার পথঘাট জলে থৈ থৈ করে বাঁধভাঙা বন্যার মতো। এই সমস্যার প্রতিকারকল্পে C. M. D. A. একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনার কাজ শেষ হলে শহরবাসী মানুষকে হাঁটুজল ভেঙে অফিস-আদালতে দৌড়তে হবে না, হবে না স্কুল-কলেজে যাওয়ার পথে ছাত্র-ছাত্রীদের জল দেখে থমকে দাঁড়াতে।

পরিকল্পনার রূপরেখা

এর পরেই কলকাতার বড়ো সমস্যা হল পথঘাট আর যানবাহনের সমস্যা। যার সমাধানকল্পে ছত্রিশ কোটি টাকার এক পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। এর জন্যে নতুন রাস্তা নির্মাণ ও পুরানো রাস্তার সংস্কার এবং যানবাহনের সংখ্যা-বৃদ্ধির কাজ চলেছে পুরোদমে। ঠিক হয়েছে কলকাতার চারদিকে একটি বৃত্তাকার সড়ক নির্মাণ করা হবে। প্রিন্সেপ ঘাটের কাছে এবং কল্যাণীতে হুগলী নদীর উপর দুটি সেতু নির্মাণও এই পরিকল্পনার অন্তর্গত। জনবহুল পথে সেতু ও অধিসেতু-নির্মাণের কথাও আছে। কোনো কোনো অঞ্চলে এ কাজ সমাপ্ত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ হাওড়া স্টেশনের কাছে নতুন সাবওয়ের উল্লেখ করা চলে। শেয়ালদার মোড়ের কাছে এক পথসেতুও নির্মিত হয়েছে। এর ফলে এ অঞ্চলে দৈনিক ট্রাফিকজ্যামের আতঙ্ক আর থাকছে না। ইতিমধ্যে চেতলা সেতু-নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। বালিগঞ্জ স্টেশনরোডে সেতু-নির্মাণের কাজও সমাপ্ত। পরিবহণের কাজেও সি. এম. ডি. এ. কর্তৃপক্ষ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছেন।

পথঘাট ও যানবাহন

কলকাতার বস্তি-উন্নয়ন ও জঞ্জাল-অপসারণে উক্ত সংস্থার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। বস্তিবাসীদের জন্যে পাকা রাস্তা, নলকূপ বসানো, উন্নততর স্বাস্থ্যব্যবস্থা ছাড়াও নতুন গৃহ-নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয়স্থাপন, হাসপাতালে অতিরিক্ত শয্যা ও ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসাগার প্রভৃতির ব্যবস্থা করা হয়েছে। জঞ্জাল অপসারণের কাজে কলকাতা কর্পোরেশন ও বিভিন্ন পৌর সভাগুলির সঙ্গে হাত মিলিয়ে এই সংস্থা কাজ করে চলেছে।

বস্তি-উন্নয়ন ও জঞ্জাল অপসারণ

পূর্বরেল কর্তৃপক্ষ কলকাতায় পাতাল রেল নির্মাণের এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের ২৯-এ ডিসেম্বর এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রকল্পের কাজে ব্যয় হবে ২৫০ কোটি টাকা। বেলগাছিয়া থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত সতেরো কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথে থাকবে সতেরোটি স্টেশন। এই কর্মযজ্ঞ সমাপ্ত হলে উপকৃত হবে বৃহত্তর কলকাতা মহানগরীর প্রায় ৯০ লক্ষ নাগরিক। ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পাতাল রেলের জন্য খরচ হয়েছে প্রায় ১০ কোটি ১০ লক্ষ টাকা এবং ১৯৮২-৮৩

কলকাতার পাতাল রেল

খ্রীস্টাব্দের জন্যে বরাদ্দ হয়েছে ৩১ কোটি ১০ লক্ষ টাকা। ১৯৮১-৮২ খ্রীস্টাব্দের বরাদ্দের চেয়ে এই পরিমাণ প্রায় ১২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা বেশি। বর্তমান লক্ষ্য অনুযায়ী ১৯৮৭ খ্রীস্টাব্দের ৩১-এ মার্চের মধ্যে এই প্রকল্পের কাজ শেষ হবার কথা। এই প্রকল্পে পরামর্শ এবং প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম দিয়ে সোভিয়েত রাশিয়া ভারতকে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে। সম্প্রতি এস্প্লানেড থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত পাতাল রেল চালু হয়েছে। বেলগাছিয়া-দমদম শাখার কাজও দ্রুত চলছে। সেই সঙ্গে চলছে টালিগঞ্জ পর্যন্ত এই রেলপথকে সম্প্রসারিত করে তোলার কাজ। চক্ররেলের পরিকল্পনা ডাঃ বিধান রায়ের আমলেই হয়েছিল, কাজ কিছুটা আরম্ভ হয়ে তা পরিত্যক্ত হয়। সম্প্রতি সেকাজও ত্বরান্বিত করার আয়োজন হয়েছে। চক্ররেল অংশত চালুও হয়েছে।

উপসংহার

রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথ-বিবেকানন্দের স্মৃতিবিজড়িত পুরানো শহর কলকাতা শুধু যে চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রেই বিশিষ্টতার ছাপ রেখে যাবে তা নয়। প্রযুক্তিবিদ্যাকে কাজে লাগিয়ে তাকে তার স্বাচ্ছন্দ্য, সমৃদ্ধি ও সর্বাঙ্গীণ অগ্রগতির পথ প্রশস্ত করতে হবে। কারণ কলকাতার উন্নয়নের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সারা দেশের ভবিষ্যৎ।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. আধুনিক শহরের সমস্যা। ২. কলকাতার পথ ও পরিবহণ।
৩. পাতাল রেল।

কলকাতায় টেলিভিশন

[ভূমিকা—নামকরণ—পটভূমি—টেলিভিশনের ভূমিকা—অনুষ্ঠানসূচী—সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান—পরিধি—উপসংহার।]

ভূমিকা

না। আর জল্পনা-কল্পনা নয়। অবশেষে কলকাতায় টেলিভিশন এসেছে। যে কলকাতা সংস্কৃতিচর্চার প্রাণকেন্দ্র সেখানে এমন একটি প্রকাশ-মাধ্যম না থাকাটা কল্পনাই করা যায় না।

নামকরণ

টেলিভিশনের পারিভাষিক প্রতিশব্দ হিসেবে 'দূরেক্ষণ' কথাটি চলত। এখন নামকরণ হল 'দূরদর্শন'। 'ঈক্ষণের' চেয়ে 'দর্শন'ই বোধ হয় সহজবোধ্য।

পটভূমি

১৯৫৯ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর দিল্লীতে প্রথম টেলিভিশন-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। তারপর বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে টেলিভিশন চালু হয়। পঞ্চম যোজনার শেষাশেষি ভারতের জনসংখ্যার অর্ধাংশকে টেলিভিশনের আওতায় আনা হয়েছে। কলকাতায় আনুষ্ঠানিকভাবে টেলিভিশনের উদ্বোধন হয় ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ৯ই আগস্ট। রাধা ফিল্ম স্টুডিওতে সম্প্রতি দূরদর্শন-কেন্দ্র স্থাপিত

হয়েছে। স্থায়ী কেন্দ্র গড়বার জন্যে টালিগঞ্জ গল্‌ফ্‌ ক্লাবের পূর্বদিকে দশ একর জমি কেনা হয়েছে এবং সেখানে কাজও আরম্ভ হয়েছে।

বেতারের সঙ্গে টেলিভিশন যুক্ত হয়ে জনশিক্ষাবিস্তার ও জনচিত্তবিনোদনের ক্ষেত্রে আমরা অনেকখানি এগিয়ে গেলাম। প্রিয় শিল্পী ও বক্তাদের আমরা এখন পর্দায় দেখতে পাচ্ছি, সেই সঙ্গে শুনছি তাদের সঙ্গীত বা বাদ্য-পরিবেশন অথবা ভাষণ। খেলার মাঠ উঠে এসেছে টেলিভিশনের পর্দায়। রেডিওতে শুধু ধারাবিবরণী শুনে দুধের সাধ আমরা ঘোলে মেটাতাম, এখন আমরা খেলার মাঠের ছবিটা তো দেখতে পাচ্ছি। বহু কলাকুশলীকেও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে দেখার সুযোগ হয়েছে আমাদের। বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলোও টেলিভিশনে অনেক সহজ করে বুঝিয়ে দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে। তাতে ছাত্রছাত্রীরাও উপকৃত হচ্ছে।

টেলিভিশনের ভূমিকা

কলকাতার টেলিভিশন দশ বছরে পড়ল। এখন অনুষ্ঠান হচ্ছে সন্ধ্যা ছটা বা সাড়ে ছটা থেকে রাত্তির সাড়ে নটা পর্যন্ত। 'বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ', 'সাহিত্য ও সংস্কৃতি', 'দর্শকের দরবারে', 'স্বস্বাস্থ্য', 'ঘরে বাইরে', 'চিত্রমালা', ইত্যাদি বিভিন্ন বিভাগে নানা ধরনের অনুষ্ঠান প্রচারিত হচ্ছে। ছোটোদের জন্যে আছে 'হরেকরকমবা', 'চিচিং ফাঁক', 'জানা-অজানা', ইত্যাদি বিভাগ। এছাড়া 'তরুণদের জন্যে' ও 'youth time' এ দুটি বিভাগ যুবকদের। এছাড়া আলোচনা, প্রশ্নোত্তরের আসর, দেশবিদেশের খেলাধূলা, নাটক, চলচ্চিত্র, কণ্ঠসঙ্গীত ও যন্ত্রসঙ্গীতের বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়সূচীর অন্তর্গত। বর্ণিত ঘটনায় চিত্র যুক্ত হওয়ায় সংবাদপাঠও আকর্ষক হয়ে উঠছে। বিভিন্ন কাজের অঙ্গন থেকে ছবি তুলে বিশেষ ধরনের আলোচনা-চক্রের আয়োজন করাতে সমাজজীবনের বিভিন্ন দিক-সম্বন্ধে জানবার সুযোগ হচ্ছে। বিদেশের বিশিষ্ট ব্যক্তি বা বিশেষজ্ঞরা কলকাতায় এলে তাঁদের সঙ্গে ইণ্টারভিউয়ের বিশেষ অনুষ্ঠানও কর্মসূচীতে যুক্ত হয়েছে।

অনুষ্ঠানসূচী

কলকাতা দূরদর্শন কেন্দ্র থেকে আজকাল রাত ৯ টার পর থেকে প্রচারিত হচ্ছে সর্বভারতীয় নানা অনুষ্ঠান। জাতীয় সংহতির উদ্দেশ্যে ভারতের সব কেন্দ্র থেকেই এই অনুষ্ঠান প্রচারিত হয়ে থাকে। উদ্দেশ্য সাধু সন্দেহ নেই। তবে অনুষ্ঠানে চাই আরো বৈচিত্র্য ও বলিষ্ঠ পরিকল্পনা। জাতীয় সংহতি বজায়ের দায় বড়ো গুরুভার। এর জন্যে চাই বিচক্ষণতা ও আরো শিল্পসম্মত অনুষ্ঠান পরিকল্পনা।

সর্বভারতীয় অনুষ্ঠান

এখন প্রায় ৭০ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত দূরদর্শনের অনুষ্ঠান-প্রচার সম্ভবপর হচ্ছে। খুব শিগ্‌গিরই হয়তো আরও বেশি দূরত্বে অনুষ্ঠান প্রচার করা যাবে, উচ্চতর টাওয়ার সংযোজিত হবার পর।

পরিধি

মার্কিন উপগ্রহ Skylab-কে কাজে লাগিয়ে সারা দেশে শিক্ষামূলক বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্রচারের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন ভারত সরকার। অলিম্পিক গেম্‌সগুলো কলকাতায় টেলিভিশনে আমরা দেখতে পেয়েছি এই স্কাইল্যাবের কল্যাণে। মণ্ট্রিল থেকে ছবি পাঠানো হয়েছে স্কাইল্যাবে, সেখান থেকে দিল্লীর মারফৎ আমাদের কলকাতা দূরদর্শনের

পর্দায় এসেছে ছবি। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন খেলাধূলাও আমরা দেখতে পাচ্ছি। প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এ এক বিস্ময়কর অবদান।

উপসংহার

দূরদর্শন-সম্বন্ধে জনসাধারণের আগ্রহ প্রচুর। কিন্তু থাকলে কী হবে? টেলিভিশন সেট কেনবার সামর্থ্য ক'জনের? তাই উল্লেখযোগ্য প্রোগ্রাম কিছু থাকলে 'এন্টেনা' দেখে কোনো বাড়িতে ধর্ণা দেওয়া ছাড়া আর গত্যন্তর কী? কিন্তু মাসিমা-পিসিমা পাতিয়ে অন্যের বাড়িতে আসন পাতা তো আর রোজ রোজ সম্ভবপর নয়।

টেলিভিশনের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি শিক্ষামাধ্যমকে সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে আনতেই হবে। রেডিওর মতোই ঘরে ঘরে থাকবে টেলিভিশন। আমাদের সরকার ও বৈজ্ঞানিকরা এ বিষয়ে নিশ্চয় ভাবছেন।

আর একটি বিষয়ও ভাবতে হবে। দূরদর্শনের অনুষ্ঠানগুলো খুবই ব্যয়সাপেক্ষ। তাই যাঁরা প্রযোজক তাঁদের বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে অনুষ্ঠানগুলোর উৎকর্ষের দিকে। শুধু জ্ঞানগর্ভ হলেই চলবে না, শিল্পকলার সামগ্রিকতায় তাকে হতে হবে রসোত্তীর্ণ। শিল্পী বা 'ট্যালেন্ট'দেরও এ বিষয়ে অবহিত হতে হবে। শেষ বর্ষণের শেষ কথাটা এ বিষয়ে স্মরণীয়:

"রাজা—উত্তম হয়েছে।
রাজকবি—আরও উত্তম হতে পারতো।"

ক্ষুদে পত্রিকা

[ভূমিকা—ক্ষুদে পত্রিকার সঙ্কট ও তার বিরুদ্ধে নিয়ত লড়াই—টিকে থাকার শক্তি কোথায়—সমস্যা—আমাদের কর্তব্য—উপসংহার]

ভূমিকা

এক নবীন গবেষক সেদিন বলছিলেন ক্ষুদে পত্রিকার অপরিহার্যতার কথা, যার অধিকাংশই নাকি আশ্চর্য শক্তিতে চিন্তার স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত করে। অর্থাৎ ক্ষুদে পত্রিকা অগ্নিগর্ভ। একথা সন্দেহাতীত সত্য। কিন্তু আরো আশ্চর্য সত্য—এই সব ক্ষুদে পত্রিকার প্রতিমুহূর্তে হৃৎস্পন্দন স্তব্ধ হওয়ার আশঙ্কা বুকে নিয়ে টিকে থাকা,—শুধু টিকে থাকা নয়, দীপ্তি বিকিরণ করা।

ক্ষুদে পত্রিকার সঙ্কট ও তার বিরুদ্ধে নিয়ত লড়াই

হয়তো সঙ্কটের বিরুদ্ধে নিয়ত লড়াই চেতনাকে ইস্পাত করে তোলে, আত্মপ্রকাশের বাধাই সঞ্জীবিত করে আত্মশক্তিতে। তাই ইতিহাসে বারবার দেখা যায় মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত-সম্প্রদায়ই সৃষ্টি করে সভ্যতার বৈভব চরমসঙ্কটের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। হয়তো এইভাবেই বলদর্পী অশুভ শক্তির হুঙ্কারের বিরুদ্ধে সত্য, সৎ ও ন্যায় নীরবে অথচ সুদৃঢ় ভঙ্গীতে প্রকাশমান হয়।

কিন্তু এ শক্তির উৎস কোথায় ? কখনও একক, বা ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর ঐকান্তিক নিষ্ঠা, সদিচ্ছা, আত্মপ্রকাশের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা,—ব্যস,—এইটুকুই ! সঙ্গতি নেই, জীবনধারণের নিশ্চিন্তি নেই, নেই অলস অপব্যয়ের জন্যে পর্যাপ্ত সময়,—পারিপার্শ্বিকে প্রতিনিয়ত ধ্বনিত সাইরেন, পটভূমি দ্রুত পরিবর্তনশীল,—তার মাঝেই এদের উদ্ধত ঘোষণা—"বেঁচে আছি, বেঁচে আছি।"

টিকে থাকার শক্তি কোথায়

এ যৌবন দিন শুরু করে প্রেস-মালিকদের তাগাদা শুনে, দ্বিপ্রহর কাটায় জীবিকার্জনের ফাঁকে ফাঁকে লেখক-মানুষের সেতুবন্ধনের কাঠবেড়ালী হয়ে। সূর্যাস্ত থমকে দাঁড়ায় এদের হৃদয়ের বর্ণচ্ছটাদর্শনে, আর রাত্রি স্তব্ধ হয়, দেখতে থাকে কেমন করে মানুষের মনে মানুষের জন্য স্বপ্ন দানা বাঁধে।

সমস্যা

কিন্তু আমরা ?—আমরা কি এখনও এদের ছেড়ে দেব এই হালভাঙা পাল-ছেঁড়া যাত্রায় ? —এরা সাহায্যপ্রত্যাশী নয়, কিন্তু সহানুভূতি, সহমর্মিতার হাত বাড়িয়ে দিয়ে এদের আরো দুর্জয় করে তোলার কর্তব্য-সম্বন্ধে কি আমরা সচেতন হব না ?—সাধারণত এইসব পত্রিকার অর্থাগম নির্ভর করে বিজ্ঞাপন-প্রাপ্তির ওপর। অতএব বিজ্ঞাপনই হল এই সব ঢাল-তলোয়ারহীন ক্ষুদে পত্রিকা-সম্পাদকগণের বিশল্যকরণী। কিন্তু হায় ! অধিকাংশ বিজ্ঞাপন-দাতাই আঙুলগুণে জীবনের হিসাব মেলাতে বদ্ধ-পরিকর। আর লেখকগোষ্ঠী ? তাঁরা সমাজের সচেতন মানুষ,—কিন্তু তা সত্ত্বেও কি তাঁদের কখনও কখনও দায়িত্ব-বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হয় না ?

আমাদের কর্তব্য

অবশ্য আমরা জানি—সন্দিহানের হিসেবী প্রশ্ন উঠবে, কেন সাহায্য করব ?—কী হবে এই প্রয়াসের ফসল ?—হ্যাঁ, তারও উত্তর আছে। উদ্ধত যৌবনের এই প্রয়াস আমাদের মনে করিয়ে দেবে যে, মানুষই সৃষ্টি করে তার সময়-কালকে,—নির্বিকার সময় বৈশিষ্ট্য লাভ করে মানুষের হাতে, তাই মানুষের বাঁচাটা স্রষ্টার বাঁচা। তাছাড়া মানুষের সাম্প্রতিক ভাবনার সঙ্গে পরিচিতি ঘটবে আমাদের,—মুষ্টিমেয়ের মেকী, জীবনবিমুখ যে ভাবনার প্রতিফলন প্রচারযন্ত্রের সহায়তা-ধন্য হয়ে স্ফীত হয়ে উঠছে,—তার অবসান-ঘটানোর জন্যে প্রয়োজনীয় গণচেতনা গড়ে ওঠা সম্ভবপর হবে এবং তার দ্বারাই মিটবে ভবিষ্যতের দেনা। জীবনকে বোঝা ভাবার ভয়ঙ্কর মিথ্যা থেকে উত্তীর্ণ হয়ে অবাধে চলার আনন্দে পাথেয় উৎসার করে দিতে দিতে দর্পী যৌবনের সঙ্গে সমস্বরে আমরাও বলতে পারব,—"বেঁচে আছি, বেঁচে আছি।",

উপসংহার

লোকাল ট্রেনে নিত্যযাত্রা

[ভূমিকা—বিচিত্র মানুষ—চলমান হরিসভা—উপসংহার]

ভূমিকা

"না ঠাকুরমশাই, আপনার সত্যিই বয়স হয়ে গেছে, আজও ন'টা বিয়াল্লিশের সিগনাল হয়ে গেল।" "বাবু, আপনাকে রোজই বলি আরেকটু তাড়াতাড়ি বেরোন, তা আপনার সাড়ে সাঁইত্রিশ না হলে বেরোনই হয় না।" কথা শেষ হতে না হতেই স্টেশন এসে গিয়েছে। ঠাকুরমশাই'র রিক্সার সঙ্গে ব্যবস্থাটা মাসকাবারী বলে ভাড়া দেওয়ার সময়টুকু বাঁচিয়ে দৌড়ানো গেল। পায়ের তলায় ট্রেনের জমি অনুভব করলাম, আর গাড়িও 'মঙ্গল শঙ্খ' বাজিয়ে যাত্রা পুনরারম্ভ করল।

বিচিত্র মানুষ

চেনা কম্পার্টমেন্ট, চেনা মুখ, চেনা কণ্ঠ, চেনা দৃশ্য—সব একবার মিলিয়ে নিলাম।

বাঁ-দিকে তাস্বড়ে (বলা যায় ত ?) সার্বজনীন তারাদা যিনি তাঁর তাস খেলায় কোনো ভুল ধরলে সঙ্গে সঙ্গে ব্যাগ থেকে একটি অব্যবহৃত সৌখীন টর্চ বার করে দেখিয়ে বলে দেন—এটা তিনি ব্রিজ কম্পিটিশনে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়নকে হারিয়ে পেয়েছিলেন, —সেই তারাদা আজ কোনো কারণে গরহাজির। অর্থাৎ প্রতি স্টেশনে গাড়ি ছাড়ার সময়ে একবার করে পিলেচমকানো 'জয় তারা' ধ্বনি শোনা যাবে না। শোনা যায় যে, পিলেচমকানো 'তারা' ধ্বনিই নাকি তার নামকরণের কারণ। উল্টোদিকে তাঁর চির-প্রতিদ্বন্দ্বী বিকাশবাবু একটু মনমরা। তিনি বলেন, সাউথ সেকশনে কোনো স্টেশনের কাছাকাছি কোনো হাসপাতাল তারাদার জীবদ্দশায় গড়ে উঠবে না। কারণ রোগীদের তারাধ্বনিতে হার্টফেলের আশঙ্কা! আর তার উত্তরে তারাদা বলেন,—যাকগে সে কথা। পরের স্টেশন এসে গেল। অকাতর চিত্তে পান-বিতরণ-কারী 'পানাসক্ত' চিত্তবাবু তাঁর আগে গাড়িতে পদার্পণকারী এক নবীন যুবকের প্রতি অগ্নিদৃষ্টি হেনে বললেন, এ লাইনে নতুন নিশ্চয়ই! নইলে জানতে, এ গাড়িতে, এ কম্পার্টমেণ্টে চিত্ত চৌধুরীর আগে কেউ পদার্পণ করে না। এখানকার নিয়ম হল 'চিত্ত ফার্স্ট'। বলা বাহুল্য, ট্রেনে ভীড়ের কমতি নেই। তার মধ্যেই নিয়ম মেনে আমাদের লাইনের কবি 'নারাণ ভাই'য়ের গত রাত্তে দু'টোর সময়ে ঝড়ে মৃত বকুল গাছের 'এলিজি' পাঠ করা চলছে। শ্রোতাদের কাউকেই অবশ্য করুণ রসে আপ্লুত হতে দেখা গেল না। বরং তাদের মুখে-চোখে হাস্যরসেরই প্রবল প্রকাশ।

চলমান হরিসভা

ওদিকে পুরোদমে নিত্যযাত্রীদের একটা দলের হরিনামের বন্যা বয়ে চলেছে। সঙ্গে বেজে চলেছে খোল করতাল। বেঞ্চের সবাই গাইছে, দুলছে। দেওয়ালে লাল সালু টাঙানো হয়েছে। 'আলিপুর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভা।'

এরা হরিনামে মশগুল, গাড়ি একটার পর একটা স্টেশন টপকাচ্ছে। কত ঘটনা, কলরব চলেছে, কিন্তু এঁদের হুঁশ নেই। এদের মধ্যে হেড অফিসের বড়ো বাবু থেকে শুরু করে সওদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরানীটি পর্যন্ত আছেন। ছাব্বিশ থেকে ছেষট্টি

—সব বয়েসী মানুষের ভক্তিরসাপ্লুত সমাবেশ। মাঝে মাঝে কালো কোট-পরা চেকার দাদারাও এঁদের পাশে বসে গলা দিতে থাকেন।

ইতিমধ্যে 'সর্বব্যথার মলম'-প্রশস্তি শুনে বোঝা গেল আরও দু'টো স্টেশন পেরিয়ে গিয়েছে। উচ্চকণ্ঠে ধ্বনিত হতে থাকল ইলেকশনী ব্যথা, চাকরি-না-পাওয়া ব্যথা, পরীক্ষা-ফেল ব্যথা—সব ব্যথা মাত্র একবার মলম-প্রয়োগেই নিশ্চিত নিরাময়, শুধু সারবে না মনের ব্যথা—তবে সে ব্যথা সারানরও উপায় আছে,—হ্যাঁ, মাত্র এক প্যাকেট ইঁদুর-মারা বিষ—রেজিস্টার্ড ডাক্তার-কর্তৃক প্রস্তুত।

উপসংহার

এ দিকে আমার যাত্রা শেষ। পরের স্টেশনেই নামতে হবে। ভীড় ঠেলে এগোতে থাকলাম। বাস-লাইন, বাদুড়-ঝোলা। সারাদিনের রুটিন একবার মনশ্চক্ষে দেখে নিলাম। সবশেষে বাড়ি ফেরা। ছ'টা বত্রিশের লোকালে। ক্লান্ত দিনপরিক্রমার শেষ পর্যায়। বাড়ি—আশ্রয়, মমতা, উত্তাপ, দায়িত্ব, অভাব, ভাবনা—সবকিছুর সম্মিলিত নাম। সেখানেই কাটবে আগামী যাত্রা শুরুর প্রতীক্ষাকাল। নিত্যযাত্রী আমরা সবাই। জীবনের হাজার স্টেশন ছুঁয়ে চলেছে প্রাণের রেলগাড়ি,—"কোথা যাবে জানে না সে।" যাত্রাপথ যে অনন্ত, তাই চলাও অশেষ।

কলকাতায় চক্ররেল

[ভূমিকা—পাতালরেল—চক্ররেল—চারটি পর্যায়—রূপায়ণে বিলম্বের কারণ—প্রথম পর্যায়—উপযোগিতা বৃদ্ধি—সমস্যা—উপসংহার]

ভূমিকা

হিন্দীতে একটা প্রবাদ আছে দিন দু-গুণা রাত চৌগুণা। অর্থাৎ দিনে দ্বিগুণ রাতে চৌগুণ। কলকাতা যেন ঠিক এই ভাবেই বেড়ে চলেছে। এই বাড়ন্ত কলকাতা অনিবার্যভাবেই হয়ে উঠেছে চলন্ত কলকাতা।

পাতাল রেল

না-ছিল ট্রাম না-ছিল বাস্-এর কলকাতা এখন যানবাহনেরই নগরী। কিন্তু জনসংখ্যা এত বেড়েছে যে ট্রাম-বাস-ট্রেনেও কলকাতার ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থা। ভূমিতে সূচ্যগ্র মেদিনী নেই, তাই ভূগর্ভে নামতে হল। পাতালরেলের পথ তৈরি করত। ব্যাপারটা অবাস্তব বলেই মনে হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সর্বংসহা এই মহানগরী অনেক যন্ত্রণা সহ্য করেও পাতালরেলের জন্মকে স্বাগত জানালো। ইতিমধ্যে একটি পর্যায়ে পাতাল রেল চলতে শুরু করেছে।

চক্ররেল

বিশেষজ্ঞেরা অবশ্য বলেছিলেন পাতালরেলও কলকাতায় পরিবহণ সমস্যা মেটাতে পারবে না তবু যতটা হয় ততটাই লাভ। এখন নিশ্চিন্ত। পাতাল-রেলের সম্পূরক হিসেবে চক্ররেলের পরিকল্পনা অনেকদিন থেকেই ছিল। কী ছিল বিধাতার মনে, চক্ররেলকেও আর 'এ নহে কাহিনী এ নহে স্বপন, বলা যাচ্ছেনা, চক্ররেলও চলছে দ্রুততার সঙ্গে।

এই চক্ররেলকে রূপ দেবার দায়িত্ব যাঁদের সেই ইস্টার্ন-রেলওয়ের কর্তৃপক্ষ বলছেন সম্পূর্ণ পরিকল্পনাকে রূপ দিতে সাড়ে চার বছর লাগবে। এই প্রকল্পের ব্যয় ধরা

হয়েছে ৭৫'৩৬ কোটি টাকা। চারটি পর্যায়ে ভাগ করা হয়েছে এই পরিকল্পনাকে : (ক) হেষ্টিংস্ থেকে বাগবাজার, (খ) বাগবাজার থেকে দমদম জংশন (গ) হেংষ্টিস থেকে মাঝের হাট (ঘ) বৃত্ত সম্পূর্ণ করতে যা বাকি থাকবে। সম্পূর্ণ পথ তৈরি হলে পূর্ববর্তী রেলপথের সঙ্গে যুক্ত হয়ে তা গোটা শহরকে যেন বেষ্টন করবে, তাই এর নাম চক্ররেল।

চারটি পর্যায়

আর্থিক সমস্যার জন্যে এ পরিকল্পনা গৃহীত হলেও তার রূপায়ণের কাজে হাত দিতে দেরি হচ্ছিল। ১৯৮৪-৮৫-এর কেন্দ্রীয় বাজেটে প্রথম পর্যায়ে ৫ কোটি টাকা মঞ্জুর হওয়ায় কাজ শুরু হতে পেরেছে। জমি পাওয়ার সমস্যাও মিটেছে। ক্যালকাটা পোর্টট্রাস্ট কর্তৃপক্ষও তার মালবাহী পথটিকে ব্যবহার করতে দিতে রাজী হয়েছেন কয়েকটি শর্তে।

রূপায়ণে বিলম্বের কারণ

এখন শুধু প্রথম পর্যায়ের কাজ (হেষ্টিংস—বাগবাজার) শেষ হয়েছে। রেলপথ সম্পূর্ণ হলে প্রথমে সাধারণ বগিই চালানো হবে ডিজেল ইঞ্জিনে। প্রথমে তিন থেকে পাঁচ জোড়া ট্রেন চলবে এ লাইনে। চতুর্থ পর্যায় সম্পূর্ণ হলে চলবে নয়-কোচের (ই-এম-ইউ) বত্রিশ জোড়া ট্রেন। প্রথম পর্যায়ের রেল পথটির মধ্যে তিনটি স্টেশন থাকবে. ইডেন গার্ডেন্স্, ফেয়ারলি প্লেস, বড়বাজার। স্টেশনগুলোতে ১০ ফিট প্রস্থের প্ল্যাটফর্ম থামবে সিংগ্‌ল্ লাইনে। ইঞ্জিন ঘোরানো হবে প্রান্তিক স্টেশন দুটির লুপ লাইন দিয়ে। প্রথমে সমস্ত দৈর্ঘ্যের জন্যে ৫০ পয়সার টিকিট হবে ঠিক হয়েছিল, এখন তা বেড়ে একটাকা হয়েছে। প্রত্যেকটি কোচে ১৬০ জন যাত্রী ভ্রমণ করতে পারবে। এই সংখ্যাকে আমরা বেশ কয়েকগুণ বাড়িয়ে নিতে পারি, কারণ আমাদের অভিজ্ঞতা বলে যেখানে ট্রেনে লেখা থাকে চল্লিশজন বসিবেক সেখানে আর একটা শূন্য অলিখিত থাকে।

প্রথম পর্যায়

এখন প্রশ্ন হল চক্ররেল কি পরিবহণে প্রয়োজনীয় স্বাচ্ছন্দ্য আনতে পারবে ? বিশেষজ্ঞেরা বলছেন স্টেশনের সংখ্যা প্রস্তাবিত পনেরোর জায়গায় প্রায় দ্বিগুণ করা সম্ভব কিনা দেখতে হবে। তা ছাড়া মেট্রোরেলকে যদি ব্যাস হিসেব ধরা যায় তাহলে চক্ররেলের স্টেশন পয়েন্টগুলোর সঙ্গে মেট্রোরেলের স্টেশন পয়েন্টগুলোর সংযোগের ব্যবস্থা করার দরকার হবে। এই ক্রস্-লিংক্ প্রবর্তিত হলে এই দুই ট্রেনের উপযোগিতা বৃদ্ধি পাবে।

উপযোগিতা বৃদ্ধি

সমস্যা হল অর্থ-বরাদ্দের। টাকা পেতে দেরি হলে কাজ আটকে থাকবে। ইতিমধ্যে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম যাবে বেড়ে। ফলে বাজেটে ধরবে টান। নূতন করে ব্যয়বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিতে হবে। ফলে পরিকল্পনা রূপায়ণে বিলম্ব অপরিহার্য হয়ে উঠবে।

সমস্যা

সব কিছু নির্ভর করে আমরা কী চোখে ব্যাপারটাকে দেখছি তার উপরে। যাতায়াতে কলকাতার জনসাধারণের অবর্ণনীয় যন্ত্রণার উপশম হোক এ যদি কর্তৃপক্ষ চান চক্ররেল এবং মেট্রোরেলকে যুদ্ধকালীন ভিত্তিতে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর একটি কথা—কলকাতার স্বাচ্ছন্দ্য এবং অগ্রগতির সঙ্গে

উপসংহার

সারা দেশেরই স্বার্থ জড়িত হয়ে আছে তাই কোনো সংকীর্ণ দৃষ্টি নিয়ে বিষয়টিকে দেখলে চলবে না।

ফুটপাতের গল্প-পত্ত

[ভূমিকা—দিনের শুরু—জীবিকা—সন্ধ্যা—দিনান্ত বেলা—উপসংহার]

ভূমিকা ধরা যাক শহরে এখন রাত। আমরা জানলেও হয়তো কেউ ভাবছি না যে এখন, এই সময়ে প্রায় আট হাজার মানুষ ফুটপাতে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোচ্ছে? না, স্বপ্ন দেখছে!—নিকানো আঙিনা চাঁদের আশ্চর্য নরম আলোয় প্লাবিত, চালে লতিয়ে উঠেছে কুমড়ো গাছ, লাল শাকের ঝোপে চুপিসারে নড়াচড়া করছে মেঠো ইঁদুর, বাতাসে তিরতির করে কাঁপছে বুকে-দুধ-আসা কচি ধানের ঘ্রাণ। অথচ সবকিছু যাচ্ছে বিফলে—বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে এই স্বপ্নদ্রষ্টা প্রৌঢ়ত্বের সীমোত্তীর্ণ।

ফুটপাথবাসী কিশোর যুবকের স্বপ্নেও এখন দৃশ্য। অর্থহীন দৃশ্য ক্রমাগত সরে যায়। সরোষ গর্জনে ধাবমান দোতলা বাস, ছাইরঙা প্রেতের মতো সন্ধ্যা, সিনেমার লাইন··· অ-নে-ক পেছনে সে দাঁড়িয়ে, অ-নে-ক পেছনে।

দিনের শুরু এবার ভোর। রাস্তায় জল দেওয়া শুরু হয়ে গেছে। জবা-কুসুম-সঙ্কাশের উদয়লগ্নে ওদের প্রথম অনুভূতি জাগে পেটে—একটা মোচড়-দেওয়া ব্যথা জানিয়ে যে, ওরা জীবাত্মা। খিদে,—হ্যাঁ খিদে। সাময়িক ভাবে সেই খিদে তারা মিটিয়ে ফেলে, কেমন করে বলা মুশকিল,—কারণ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার অভাব। তারপর একে একে বেরিয়ে পড়ে সবাই, কাজে বা কাজের চেষ্টায়। তার আগে প্রাত্যহিক নিয়মানুসারে ঘটে যায় কলহ, যার মূল কারণ নিহিত থাকে ঘৃণায়—তীব্র উদগ্র ঘৃণায়—যে জীবন তাদের মানুষের কোনো অধিকার দেয় নি, সেই জীবনের প্রতি একরোখা ঘৃণায়।

জীবিকা কাজ তাদের নানারকম। চায়ের দোকানে কাজ, বাবুদের বাড়িতে কাজ, ভিক্ষার কাজ—আরও নানাধরনের অনুল্লেখ্য কাজ। সারা দিন,—দীর্ঘ সময়, ক্লান্তি, বিরক্তি, হতাশা, ক্রোধ,—পাকে পাকে জড়াতে থাকে। সময় এগোতে থাকে।

সন্ধ্যা তারপর শহরের কোলাহল-মুখর পরিবেশের বুক চিরে রক্তাক্ত সূর্যাস্ত ঘটে যায়। এবার ঘরে ফেরার পালা। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, পদক্ষেপ মাটির বুকে পদাঘাত হতে চায়। শেষ পর্যন্ত সবাই পরস্পরের মুখোমুখি হয় আবার। বাবা-মা, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, বন্ধু-পরিজন ইত্যাদি মহৎ নামাঙ্কিত সম্পর্কে সম্পর্কিত মানুষগুলো। তবু অবসাদ। দৃষ্টি ক্ষণতরেও প্রোজ্জ্বল হয় না। উদ্দেশ্যহীন, আশাহীন দিনযাপনের, প্রাণ-ধারণের গ্লানি কালি এঁকে যায় সমস্ত চেতনায়, তবু বাঁচার বিষাক্ত আবেগ নিয়ে জীবনকে সুকঠিন ভাবে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে বেঁচে থাকা।

শহরে আবার রাত্রি নেমেছে। ওরা এবার ঘুমোক। বেদনা, ক্রোধ, টিকে থাকার হাজার ফন্দী এবার সাময়িক ভাবে তলিয়ে যাবে সুগভীর আদিম অবচেতনে। আর চেনা স্বপ্নের মিছিল এগিয়ে চলবে ওদের অবচেতন ইচ্ছাপূরণের পথ বেয়ে।

দিনান্তে বেলা

ঘুমোক ওরা। চিরকালের পঙ্গুত্বকে ক্ষণকাল ভুলে থাকুক, না হলে আমরা, যারা এ সময়ে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় আচ্ছন্ন আছি, অনেক দায়িত্ব এড়ানোর যন্ত্রণায় বঞ্চিত হব এই নিদ্রাসুখ থেকে।

উপসংহার

অতএব গ্রহ-আবর্তনের নিয়ম মেনে আবার আবর্তিত হতে থাকবে এদের সুখদুঃখ, দুঃখ-সুখ, দিনরাত্রি, রাত্রিদিন, স্বপ্ন, স্বপ্নভঙ্গ, কলহ-ক্রোধ, বিরক্তি, ঘৃণা, ক্ষণস্থায়ী ভালবাসা, সর্বোপরি জীবন নামে মোহকে আঁকড়ে থাকা, কিন্তু কতদিন,—আরও কতদিন ?

কল্লোলিনী কলকাতা

[ভূমিকা—এই কলকাতা—অতীত থেকে বর্তমান—সকাল থেকে সন্ধ্যে—কলকাতার ঐতিহ্য—জন অরণ্যের কলকাতা—বৈপরীত্যে শহর কলকাতা—বৈশিষ্ট্য—উপসংহার]

বিশ্বজগতের হৃৎস্পন্দন বসুধা-শরীরের যে-অংশে অনুভূত হয় তার নাম কলকাতা। কলকাতা কোনো সুপরিকল্পিত নগরী নয়, প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি নয়,—কলকাতা দুঃস্বপ্নের নগরী, কলকাতা মিছিলের শহর—কলকাতা আমাদের ভালোবাসার শহর। কলকাতা বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের শহর, কলকাতা 'নবান্নে'র শহর, দেবব্রত বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্রের শহর, কলকাতা উদয়শঙ্কর, রবিশঙ্কর, ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, যামিনী রায়ের শহর।

ভূমিকা

কলকাতা দারুণ গ্রীষ্মে গলিত পিচে বিরক্তিকর, বর্ষায় জলেকাদায় ঘৃণ্য (যদিও আকাশ এখানেও মেদুর), আবার শরতে-হেমন্তে প্রাণবন্ত, শীতে ঝলমলে-উজ্জ্বল, আর বসন্তে ইট-কাঠের ফাঁকে হঠাৎ ফুলের উঁকি দেওয়া শহর। কলকাতা মানে ঐতিহ্য, কলকাতা মানে সংস্কৃতি, কলকাতা মানে এক দুরন্ত গতিশীল জীবন-চর্যা, কলকাতা মানে কি আমাদের বেঁচে থাকা ?

এই কলকাতা

জন্মলগ্ন থেকেই দুরন্তগতি এই শহর আশ্চর্য শক্তিতে সময়ের পরিবর্তনকে মূর্ত করেছে। জব চার্ণকের কলকাতার এণ্টনী কবিয়াল থেকে আজকের কলকাতায় কার্জন পার্কের নাটুকে দল সেই ঐতিহ্যেরই বহমান ধারা। কলকাতা যখন সর্বাধিক ধিকৃত অন্ধকূপ, আবর্জনার শহর, তখনই শিল্পীরা দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন, সমস্ত কলকাতা আমাদের ক্যানভাস।

অতীত থেকে বর্তমান

সকালে রাস্তায় জল দেওয়া, স্বাস্থ্যোদ্ধার-কর্মীদের ভ্রমণ, আর মন্থরগতি ট্রামের যাত্রা শুরুর সঙ্গে সঙ্গে ঘুম ভাঙে শহরের, মনে হয় শেষ রাতে ঘুমিয়ে পড়ার আলস্য তার সর্বাঙ্গে। কিন্তু তার পরেই এখানে জীবনের লয় দ্রুততর হয়, বাজার জমজমাট, পথঘাট মুখর,—আর একটু পরেই উপচে-পড়া ভীড় ট্রামে-বাসে, পথচলা দায়; এত মানুষের নিরাপত্তার ভাবনা—কলকাতা এখন চিন্তাগ্রস্ত অভিভাবক।

সকাল থেকে সন্ধ্যে

দুপুর—ক্লান্তির প্রথম চিহ্ন পড়ে শহরের বুকে। এর পর সময় গড়িয়ে বিকেল, সন্ধ্যা—শ্রান্ত মানুষের ঘরে ফেরা, সিনেমা-থিয়েটার, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গুঞ্জন, ঝলমলে পার্ক স্ট্রীট, অন্ধকার ডালহৌসী, গঙ্গার ধার, ভিক্টোরিয়ার আশেপাশে অন্য কলকাতা। স্কুল-কলেজ শান্ত, কফি হাউস অবসন্ন, ফুটপাথের মা সারাদিনের সঞ্চয় উনুনে চাপিয়ে নিষ্পলক তাকিয়ে সেদিকে। হয়তো কলকাতা একদিন তিলোত্তমা হবে।

কলকাতা আমাদের আপন ঘর। তার দেয়াল ভেঙে পড়ে গেলেও, মাথার ছাদ ফেটে চৌচির হলেও, তাকে বাতিল করা যায় না। আমরা ভুলি কী করে যে, ঔপনিবেশিক শাসনের অমানিশায় দুঃখী কলকাতা জলে উঠতে চেয়েছিল, ভুলি কী করে যে, আধুনিক ভারতবর্ষের নান্দীপাঠ এই কলকাতায়?

কান পাতলে কলকাতায় কি এখনও শোনা যায় না নিধুবাবুর টপ্পার আসর, শোনা যায় না ডেভিড হেয়ারের স্মৃতিরক্ষার্থে টাউনহলে রামগোপাল ঘোষের উদাত্ত ভাষণ, শোনা যায় না কবিকণ্ঠে পথেঘাটে ধ্বনিত বাংলার মাটি, বাংলার জল? চোখ মেললে কি দেখা যায় না রামমোহন পথে নেমেছেন ডফ সাহেবের স্কুলের জন্য ছাত্র সংগ্রহ করতে, গরাণহাটায় ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম ভারতীয় মুদ্রাযন্ত্রে ছাপছেন 'গীতা', আর 'কারবালা কাহিনী' ছাপছেন মির্জাপুরের সফিউদ্দি? স্মৃতিভারে ভারাক্রান্তা প্রাচীনা কলকাতা, আপন কথায় প্রগল্‌ভা কলকাতা—কলকাতা অবিস্মরণীয়া! ধোঁয়া-ধুলো পেট্রোলের গন্ধে, বহু ভাষার বিচিত্র কলরবে এ শহর সদামুখর। কখনও ইট-কাঠের, কখনও ট্রাম-বাসের বিচিত্র খাঁচায় বদ্ধ মানুষ এখানে প্রাণান্ত হয়েও প্রাণোচ্ছল। বালক প্রবীরের অর্জুনের অশ্বমেধের ঘোড়া আটকানোর মতই এখানে রিক্সা-ঠেলা রুদ্ধ করে দেয় দ্রুতগতি যানের পথ। পাতাল রেল চালু হয়েছে, চলছে চক্ররেলও কিন্তু কলকাতার ভাগ্যচক্রে সেই যানবাহনে বাদুড়-ঝোলার দৃশ্য আজও একই। প্রাণ হাতে করে পথ চলাতেও মানুষ অকম্পিত, ঐ অবস্থাতেও কৌতুক রঙ্গ চলতে থাকে অফুরন্তভাবে। জাহান্নামের আগুনে বসেও এমন পুষ্পের হাসি কোথায় আর কে হাসে? এখানে আবর্জনার পাহাড়ের পাশেই ফুচকা-ভেলপুরীতে মানুষ বিভোর, বেকার যুবকের হাঁকা ফেরীতে বাঁচার আকুতি, জনারণ্যে নিত্যরথের মেলা—আর তারই আড়ালে কোথা দিয়ে যেন কৃত্তিবাস-কাশীরামের সুমন্থর পয়ার ছন্দে বইতে থাকে ট্র্যাডিশন।

কলকাতার ঐতিহ্য

কলকাতার স্থায়ী বাসিন্দার সঙ্গে যখন মিশে যায় বহিরাগতি ভাসমান জনস্রোত

তখন কলকাতা রূপান্তরিত হয় মানুষের অরণ্যে। বড়োবাজারে খোপে খোপে ব্যবসায়ীর কর্মতৎপরতা—আলপিন থেকে এলিফ্যাণ্ট নিয়ে জোরালো কারবার। শেয়ার মার্কেটে আর্ত চীৎকারে জনজীবন চমকিত, শেয়ালদার পসয়া-নাচানো মানুষের ডাকাডাকি আর হুকারের এলোমেলো চীৎকারে জীবন স্পন্দিত। যন্ত্রের মতো মানুষ অঙ্গভঙ্গি করছে। রোবটের মতো প্রাণহীন কর্মপরায়ণতা। এই অরণ্যে কেউ হারায় না। আবার রণক্লান্ত দেহটাকে টানতে টানতে ফিরে আসে কিন্তু গোয়ালার গলিতে।

জনঅরণ্যের কলকাতা

বৈপরীত্যের শহর কলকাতায় প্রাসাদের ঝলমলে ঐশ্বর্যের পাশেই সঙ্কুচিত অস্তিত্ব পোড়া-ঘা বস্তির। রবীন্দ্রসদনে, কলামন্দিরে যখন সেতারে পূরবী, মাড়োয়া, তখনই পাশের দোকানে ফিল্মী গানের চটুল উল্লাস। তবু কলকাতা আছে সেই কলকাতাতেই। মানুষের আবেগ-ভালবাসা যে এখানে অনিঃশেষ তার প্রকাশ ঘটে কস্‌মোপলিটান কলকাতার বিচিত্র সামাজিক মিলনোৎসবে।

বৈপরীত্যের শহর কলকাতা

পে-স্কেল, প্রমোশন, গ্রেড এখনও রাহুগ্রস্ত করে নি এ শহরকে। তাই কলকাতা আজও প্রতিবাদের শহর, কবিতার শহর। হাজার সমস্যাকে রক্তাক্ত পদক্ষেপে দলে আশ্চর্য প্রাণশক্তিতে এগিয়ে চলে এ শহর।

বৈশিষ্ট্য

কলকাতাকে তাই বাঁচাতেই হবে, সমগ্র দেশের স্বার্থে বাঁচাতে হবে তাকে। মনে রাখতে হবে চরম সঙ্কটেও কলকাতা কখনই ইতিহাসের পাটলীপুত্র বা উজ্জয়িনী হতে পারে না। কলকাতার পথে রক্তের ছাপ রেখে মৃত কবি স্বপ্ন দেখেছিলেন 'কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে।'

উপসংহার

চিন্তাসহায়ক বাণী

কলিকাতায় অনেক তর্ক, অনেক কথা, সেখানে দেখিতে দেখিতে বুদ্ধি অকালে পাকিয়া কঠিন হইয়া উঠে। —গল্পগুচ্ছ। দৃষ্টিদান।

এখানে সুরকিতে ইটেতে, ধূলিতে নানা যন্ত্রে, গাড়ীতে ঘোড়াতে হঠযোগ চলিতেছে। —বিচিত্র প্রবন্ধ। সরোজিনী প্রয়াণ।

আমাদের জাতীয় পতাকা

[ভূমিকা—মন্ত্রশক্তি ও জাতীয় পতাকা—এই পতাকার আদি রূপ—পতাকার পরিবর্তন—নাগপুর কংগ্রেসে জাতীয় পতাকার রূপান্তর—করাচী অধিবেশনের পর—স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা—উপসংহার]

জাতীয় পতাকা এক খণ্ড কাপড়ের টুকরো নয়। প্রতিকৃতি যেমন মানুষের প্রতীক, জাতীয় পতাকাও তেমনি স্বাধীনতার প্রতীক। দেশমাতার মতোই দেশের জাতীয়

পতাকা পরম পবিত্র বস্তু। এই পতাকা হাতে নিয়ে কত পরাধীন জাতি মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে স্বাধীনতার জন্যে, দেশমাতার শৃঙ্খল- মোচনের জন্যে, মরণপণ সংগ্রাম করেছে। ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে শত শহীদের আত্মত্যাগের কাহিনী আমাদের এই জাতীয় পতাকার সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

ভূমিকা

আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রামে এই জাতীয় পতাকা জাতির প্রাণে নতুন বল সঞ্চার করেছে, অন্ধকারে দেখিয়েছে আশার আলো। উনিশ শো বিয়াল্লিশের সেই উদ্দীপনার দিন, মহাত্মাজীর 'ভারত ছাড়' আন্দোলন ইতিহাসের পাতায় অমর হয়ে থাকবে। সেদিন দেশের যুবশক্তির মুখের ভাষা ছিল, 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' আর হাতে ছিল ত্রিবর্ণরঞ্জিত জাতীয় পতাকা। এই পতাকা হাতে নিয়ে:

মন্ত্রশক্তি ও জাতীয় পতাকা

'পড়ি গেল কাড়াকাড়ি,
আগে কেবা প্রাণ করিবেক দান
তারই লাগি তাড়াতাড়ি।'

১৯০৫ খ্রীস্টাব্দে কার্জনের কুখ্যাত বঙ্গভঙ্গ আইনের প্রতিবাদে উত্তাল হল শান্ত বাংলার নরনারী। আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক জাতীয় পতাকার জন্ম হল এই সময়ে। উত্তর কলকাতার এক ক্ষুদ্র ময়দানে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হল। লাল হলুদ আর সবুজ, এই ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা। তার উপর অঙ্কিত ছিল আটটি পদ্মফুল, একটি অর্ধচন্দ্র আর লেখা ছিল ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বন্দে মাতরম্'।

এই পতাকার আদি রূপ

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে লোকমান্য বালগঙ্গাধর তিলক এবং অ্যানি বেসান্ত হোমরুল আন্দোলন শুরু করেন। এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশের কাছ থেকে স্বায়ত্তশাসন লাভ করা। আন্দোলনকালে যে-জাতীয় পতাকার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছিল তার রূপ অভিনব। এই পতাকায় সমান্তরালভাবে সাজানো ছিল পাঁচটি লাল ও চারটি সবুজ রঙ। পতাকার বাঁ দিকে অঙ্কিত ছিল ব্রিটিশ ইউনিয়ন জ্যাক। এ ছাড়াও ছিল সাতটি তারকা চিহ্ন। আন্দোলনের শেষে এই পতাকা অপ্রচলিত হয়ে পড়ে। বলা বাহুল্য, ব্রিটিশের ইউনিয়ন জ্যাক মুদ্রিত পতাকা ভারতের জাতীয় পতাকার মর্যাদা পেতে পারে না।

পতাকার পরিবর্তন

১৯২৩ খ্রীস্টাব্দের নাগপুর কংগ্রেসে মহাত্মাজীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনের পরিকল্পনা গৃহীত হল। এই গুরুত্বপূর্ণ আন্দোলনের আগে মহাত্মাজী ভারতের জাতীয় পতাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। প্রথমে নির্বাচিত হল হিন্দু-মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের প্রতীক দুটি রঙ—লাল ও সবুজ। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতীক হিসাবে গৃহীত হল সাদা রঙ। এর উপর ছিল চরকার চিহ্ন। ১৯৩১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত এই পতাকাই ছিল আমাদের জাতীয় পতাকা।

নাগপুর কংগ্রেসে জাতীয় পতাকার রূপান্তর

১৯৩১ খ্রীস্টাব্দে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে আবার পতাকা পরিবর্তনের কথা উঠল। ভারতের শিখ সম্প্রদায় নিজেদের কালো রঙ জাতীয় পতাকায় সংযোজনের

দাবি তোলে। ফলে নতুন করে পতাকার রঙ নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা শুরু হয়।

করাচি অধিবেশনের পর

এই আলোচনায় ঠিক হল ভারতের জাতীয় পতাকায় থাকবে তিনটি রঙ, যথাক্রমে—গেরুয়া, সাদা আর সবুজ। তিনটি সম্প্রদায় নয়, রঙ তিনটি হল তিনটি গুণের প্রতীক। গেরুয়া হল ত্যাগের, সাদা শান্তির আর সবুজ হল বিশ্বাসের প্রতীক। পতাকার সাদা অংশে অঙ্কিত হল চরকার চিত্র। চরকা হল অগণিত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক।

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীন ভারতের জন্যে এক নতুন পতাকার প্রয়োজন হল। জাতীয় পতাকার তিনটি রঙ

স্বাধীন ভারতের জাতীয় পতাকা

বজায় থাকল, কেবল চরকার স্থানে এল অশোক-চক্র। অশোক-চক্র হল প্রেম ও ত্যাগের প্রতীক। ভারতের বাণী—বুদ্ধের প্রেমের বাণী, অশোকের ত্যাগের বাণী। আমরা সব সঙ্কীর্ণতার উপরে থেকে বিশ্বমানবের সঙ্গে সাম্য আর মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হব, ভারতের জাতীয় পতাকা এই বাণী ঘোষণা করে।

পৃথিবীর আকাশ আজও দুর্যোগের কালো মেঘে ছেয়ে আছে। চারদিকের এই ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ভারতের ত্যাগ ও মৈত্রীর বাণী যেন এক উজ্জ্বল দীপশিখা।

উপসংহার

ভারত বিশ্বকে সত্যপথের সন্ধান দেবে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়ে —১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট আমরা এই অঙ্গীকার করেছি। আমাদের অঙ্গীকার সার্থক হোক সাধনার শক্তিতে। জাতীয় পতাকার মর্যাদা অপরিসীম। একটা দেশের স্বপ্ন, আশা, আকাঙ্ক্ষা স্বাধীনতা সব কিছু সংহত এই জাতীয় পতাকায়। তাই জাতীয় পতাকার গৌরব ও মর্যাদা রক্ষার জন্যে চাই শক্তি ও সামর্থ। ঈশ্বর আমাদের সেই শক্তির অধিকারী করুন। কবির কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে বলি : 'তোমার পতাকা যারে দাও তারে বহিবারে দাও শকতি।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. জাতীয় পতাকার মর্যাদা। ২. জাতীয় পতাকার প্রয়োজনীয়তা।

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক

[ভূমিকা—অশোকস্তম্ভ—প্রতীকের ব্যঞ্জনা—ভারতের জাতীয় প্রতীক ও তার অর্থ—সার্বভৌমত্বের চিহ্ন—প্রতীকের মর্যাদা ও উদ্দেশ্য—জাতীয় সংহতির সমস্যা—ভারতের আদর্শ—উপসংহার]

গল্প নয়, ইতিহাস। অনেক দিন আগে একজন রাজা ছিলেন এ দেশে। মস্ত রাজা, বিরাট সাম্রাজ্যের অধীশ্বর। কিন্তু তিনি যুদ্ধ করতেন না, দেশ জয় করতেন ধর্মপ্রচার

ভূমিকা

করে, মানুষকে ভালবেসে, শিকারে না গিয়ে যেতেন তীর্থে, ক্লান্ত পথিককে ছায়া দিতে তিনি রোপণ করাতেন ছায়াতরু, তৃষ্ণার্তকে জলদান করার জন্যে পথের ধারে কূপ খনন করাতেন, রোগীর আরোগ্যের জন্যে হাস-

পাতাল স্থাপন করতেন, কোন জীবকে কষ্ট দিতেন না, আর চেষ্টা করতেন প্রজাদের তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ করতে। তিনি ছিলেন মৈত্রী ও করুণার মন্ত্রে দীক্ষিত এক রাজর্ষি, নাম তাঁর অশোক।

অশোকস্তম্ভ

প্রজাদের ধর্মশিক্ষার জন্যে ইনি রাজ্য জুড়ে অনেক স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন, তাদের গায়ে উৎকীর্ণ করে গিয়েছিলেন ধর্মবাণী। এমনই একটি স্তম্ভ তিনি স্থাপন করেন সারনাথে, যেখানে বুদ্ধদেব বোধিলাভের পর পঞ্চশিষ্যের কাছে প্রথম প্রচার করেন তাঁর করুণাঘন বাণী, প্রবর্তন করেন অন্তহীন কাল ধরে আবর্তিত ধর্মচক্রের।

অশোক-স্থাপিত সারনাথের এই স্তম্ভের শীর্ষে একটি প্রতীক অঙ্কিত আছে, একটি বেদীর উপর চারটি সিংহ বিভিন্ন দিকে মুখ করে দাঁড়ানো আর বত্রিশটি শরসহ একটি বড় চক্র। আর রয়েছে চারটি জন্তুর প্রতিকৃতি—ঘোড়া, ষাঁড়, হাতি ও সিংহ—এই জন্তুগুলিকে পৃথক করা হয়েছে চারটি ছোট চক্রের দ্বারা, এই ছোট চক্রগুলির প্রত্যেকটির শরসংখ্যা চব্বিশ। সম্পূর্ণ প্রতীকটি পাথরে খোদাই করা।

প্রতীকের ব্যঞ্জনা

এই প্রতীকটির ব্যঞ্জনা বা গূঢ়ার্থ হিসাবে বিভিন্ন মতামত পাওয়া যায়। এই মতামতগুলির সার সঙ্কলন করলে অর্থটি কী দাঁড়ায় তা আলোচনা করা যাক।

বড় চক্রটি মহাজীবনের বত্রিশটি বিশেষ চিহ্নের প্রতীক, ছোট চক্রগুলি জগতের চব্বিশটি প্রাথমিক সত্যকে নির্দেশ করে আর বিভিন্ন জীবজন্তু দিব্যজীবনের প্রতীক।

রাজর্ষি অশোকের এই প্রতীক-চিহ্ন স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণকে ধর্মজীবনে উদ্বুদ্ধ করা। প্রতীকটি মহাজীবনের আদর্শ ও জাগতিক সত্যের প্রকাশ।

ভারতের জাতীয় প্রতীক ও তার অর্থ

স্বাধীন ভারতবর্ষ রাষ্ট্রীয় প্রতীক হিসাবে সারনাথের এই স্তম্ভশীর্ষকে সামান্য পরিবর্তন করে গ্রহণ করেছে। আমাদের জাতীয় প্রতীকে চারটি সিংহ পরস্পরের দিকে পিছন করে দাঁড়িয়ে আছে। বেদীতে সামনে একটি ও দুইপাশে দুটি ছোট চক্র এবং ঘোড়া ও ষাঁড়ের প্রতিকৃতি আছে। আর বেদীর নীচে দেবনাগরি হরফে উৎকীর্ণ করা আছে উপনিষদের বাণী 'সত্যমেব জয়তে', সত্যই জয়ী হয়। আমাদের এই প্রতীক ধর্মজীবন ও জাগতিক সত্যের বাণীবাহক।

সার্বভৌমত্বের চিহ্ন

রাষ্ট্রীয় প্রতীক দেশের সার্বভৌমত্বের প্রতীক। সার্বভৌমত্ব শব্দটি দেশ ও জাতির ক্ষেত্রে আত্মস্বাতন্ত্র্য ও সার্বিক স্বাধীনতা বোঝায়। সে হিসাবে রাষ্ট্রীয় প্রতীক দেশের আত্মস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রতীক। ১৯৫০ খ্রীস্টাব্দের ২৬-এ জানুয়ারি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের প্রথম নিজস্ব প্রতীক-গ্রহণ। জাতির ও দেশের মর্যাদার সঙ্গে এই প্রতীকের মর্যাদা ওতপ্রোতভাবে যুক্ত।

প্রতীক নিঃসন্দেহে গ্রহীতার মনোভাব ও উদ্দেশ্যের পরিচায়ক। ভারতবর্ষ অহিংসা

ও মৈত্রীর মহান আদর্শে বিশ্বাসী। মৈত্রী, করুণা ও অহিংসার মহামন্ত্রের উদ্গাতা বুদ্ধদেব এবং সেই মন্ত্রের এক নিরলস অনুসারী ও প্রচারক প্রিয়দর্শী অশোকের স্মৃতিযুক্ত আমাদের প্রতীকটি, আমাদের বিশ্বাস ও নীতির পরিচায়ক।

প্রতীকের মর্যাদা ও উদ্দেশ্য

প্রেম, প্রীতি, সহিষ্ণুতা, করুণা ও মৈত্রীর মহামহিম আদর্শনীতির দ্বারাই একমাত্র আদর্শ রাষ্ট্র গঠন সম্ভবপর ; এবং সেই কল্যাণব্রতে অবিশ্রান্ত আত্মনিয়োজন মহৎ আদর্শের দ্বারাই সম্ভবপর, অশোক তার প্রমাণ। কল্যাণব্রতী, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রগঠনে তিনি প্রেরণাস্বরূপ। রাজা হিসাবে তাঁর সম্পূর্ণ শক্তিকে তিনি সার্বিক মঙ্গলের জন্য নিয়োগ করে এ বিষয়ে তিনি এককভাবে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে রয়েছেন।

ভারতবর্ষও সেই আদর্শে বিশ্বাসী, সেই পথানুসরণে দৃঢ়সঙ্কল্প। তৃষ্ণার শান্তি, ক্লান্তির অবসান, রুগ্‌ণের আরোগ্য, ধর্মজীবনের অনুপ্রেরণা, মৈত্রী, অহিংসা ও সর্বজীবে করুণার সেই চিরকালীন আদর্শের সঙ্গে আধুনিক ভারতবর্ষে যুক্ত হবে শিক্ষাবিস্তার, উৎপাদন ও বণ্টন-ব্যবস্থার সুষ্ঠু নীতি এবং মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজন মেটানোর অদম্য প্রচেষ্টা। তবেই আমরা যোগ্য হয়ে উঠব এই প্রতীক গ্রহণ করার। এ ক্ষেত্রে আমরা যদি বিফল হই তা হলে বঞ্চিত হব ঐ প্রতীক-গ্রহণের অধিকার থেকে। সুতরাং দায়িত্ব আমাদের অনেক।

ভারতের আদর্শ

আদর্শসচেতন থেকে প্রতীকের মর্যাদারক্ষার জন্যে দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে লক্ষ্যসাধনের পথে এগোতে হবে আমাদের ; পথ দুর্গম। আমাদের সঙ্কল্প হোক দুর্জয় ও শক্তি হোক অশেষ।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. জাতীয় প্রতীকের উদ্দেশ্য ও মর্যাদা। ২. রাষ্ট্রীয় প্রতীক ও জাতীয় পতাকা।

ভারতের জাতীয় সংহতি

[ভূমিকা—বিদেশী আক্রমণ—জাতীয় সংহতির সমস্যা—সমাধানের সূত্র—উপসংহার]

ভারতবর্ষ জনসংখ্যা ও ভূখণ্ডের দিক থেকে পৃথিবীর বৃহৎ দেশগুলির অন্যতম। আসমুদ্র-হিমাচল-বিস্তৃত এই বিশাল ভূখণ্ডে বিভিন্ন জাতি ও ধর্মের এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছে। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে। আমাদের মাতৃভাষাও ভিন্ন। আচার-ব্যবহারে উত্তরাঞ্চলের ব্রাহ্মণ পরিবারের কোন সন্তান দক্ষিণাঞ্চলের ব্রাহ্মণ সন্তান অপেক্ষা বেশি বৈদিক অনুশাসনসম্মত জীবন ধারণের পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকতে পারে, আবার হিন্দুধর্ম ছাড়া অন্য ধর্মাবলম্বীরা তাদের নিজেদের ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে সর্বৈব কঠোরতা অবলম্বন করতে পারে—কিন্তু এক অখণ্ড ভারতবোধ মায়ের বিনিদ্র প্রহরার মত তাদের চেতনাকে ঘিরে আছে।

ভূমিকা

বহু প্রাচীনকাল থেকেই এ দেশের মানুষের মনে এই বোধ জাগ্রত রয়েছে। এই ঐক্যের মধ্যে বৈচিত্র্য—ভারতভূমির এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

ভারতবর্ষের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে সহজেই নজরে পড়বে বিদেশী আক্রমণের কী প্রভাব পড়েছে জাতীয় সংহতির উপর। আর্য জাতি ভারতবর্ষে আসার আগে ভারতবর্ষের প্রাচীনতম অধিবাসীরা এই দেশে একটি সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটাতে পেরেছিল। আর্যরা ভারতবর্ষের বুকে তাদের সাম্রাজ্য স্থাপন করে ক্রমশ ভারতবাসীদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। ফলত আর্য-সভ্যতা ভারতীয় সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বিবেচিত হয়েছে। এর পরবর্তী কালে মুসলমান রাজত্বে সারা ভারতবর্ষ জুড়ে যে-রাজত্ব ও কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা স্থাপিত হয়—ভারতভূমিকে একত্রিত করার ক্ষেত্রে তারও একটি ভূমিকা ছিল। আরও পরে ইংরেজরা এদেশে তাদের উপনিবেশ গড়ে তুলে একই কারণে সারা ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতি ও ভাষাভাষীদের একসূত্রে গ্রথিত হতে সাহায্য করেছিল। ইংরেজ রাজত্বের সময়ে হিন্দু-মুসলমান-বিরোধের অবাঞ্ছনীয় ও অপ্রীতিকর ঘটনা মাঝে মাঝে ঘটলেও একটি ধারণা ছিল, সর্বভারতীয় ঐক্যবোধ অবশেষে বিদেশী আধিপত্যের বিরুদ্ধে কার্যকর হয়ে উঠবে। বস্তুতপক্ষে, বিদেশী শাসকেরা বার বার এই ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করে এ দেশে তাদের রাজত্ব দীর্ঘদিন চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সতর্কবাণী স্মরণ করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথ 'পথ ও পাথেয়' প্রবন্ধে লিখেছিলেন, 'শুনিয়াছি এমন কথাও কেহ কেহ বলেন যে, ইংরেজের প্রতি দেশের সর্বসাধারণের বিদ্বেষই আমাদিগকে ঐক্যদান করিবে।…এ কথা যদি সত্যই হয় তবে বিদ্বেষের কারণটি যখন চলিয়া যাইবে, ইংরেজ যখনই এ দেশ ত্যাগ করিবে, তখন কৃত্রিম ঐক্যসূত্রটি তো এক মুহূর্তে ছিন্ন হইয়া যাইবে।' আজকের ভারতবর্ষেও তাই জাতীয় সংহতির সমস্যা চিন্তাশীল মহলে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করেছে।

বিদেশী আক্রমণ

সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক, উপজাতীয়, জাতিভেদ-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সমস্যা ভারতের সংহতির ভিত্তিমূলে বারবার সজোরে আঘাত করেছে। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনই এবিষয়ে একটি আলোচনাচক্রের আয়োজন করেন। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীদের ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতাদের একটি সম্মেলন আহ্বান করা হয়। সম্পূর্ণানন্দজীর নেতৃত্বে ভারতের সংহতির জন্যে যে-কমিটি গঠন করা হয় (Committee of Emotional Integration) ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে তার রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। জাতীয় সংহতি সম্মেলনও আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।

জাতীয় সংহতির সমস্যা

জাতীয় সংহতির মূল সমস্যাগুলির মধ্যে বীভৎসতম রূপ ধারণ করে সাম্প্রদায়িকতা। ধর্মের নামে সাধারণ মানুষ অন্ধ। সুতরাং বিভেদকামীরা এই ধর্মকেই তাদের হাতিয়ার করে সমস্ত সুস্থ ও শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। চরিত্রের দিক থেকে এর দোসর হচ্ছে জাতিভেদ-সমস্যা। উচ্চ ও নীচ বর্ণের সংঘাত এই বিরোধের জন্ম দেয়। ভাষাগত, আঞ্চলিক, সংখ্যালঘু বা আদিবাসী ঠিক এক পর্যায়ের

নয়। এই সমস্যাগুলির পিছনে আছে বিভিন্ন জাতির আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের কামনা। অর্থনৈতিক ও সামাজিক কারণ ও তার সাথে বিভেদকামীদের স্বার্থরক্ষার জন্যে প্ররোচনামূলক কাজকর্ম মূলত এই বিরোধগুলির জন্যে দায়ী।

বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিরোধের অবসান ঘটাতে হলে মূল প্রয়োজন জাতি ও উপজাতিগুলির আত্মবিকাশের যথেষ্ট সুযোগ দেওয়া। বিভিন্ন জাতি ও প্রদেশের অধিবাসীরা যাতে একইরকম অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া একান্ত কর্তব্য। অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার জন্যে যথাসম্ভব উন্নয়ন-মূলক কর্মসূচী গ্রহণ ও বিভিন্ন ভাষাভাষী জাতি ও উপজাতিদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার-প্রতিষ্ঠার মাধ্যমেই এই সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভবপর। এইজন্যে ভারতীয় সংবিধানে উল্লিখিত প্রধান তেরোটি ভাষাকে সমভাবে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত করা দরকার। বিভিন্ন রাজ্য ও ভাষাভাষীদের সংযোগের ভাষা ক্রমে একটি ভাষাতে চালু করা সম্ভবপর।

সমাধানের সূত্র

বিভিন্ন রাজ্যের ভাষাগত বা ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকেও নজর রাখা প্রয়োজন। স্বার্থান্বেষীরা নিজেদের প্রয়োজনে এই বিরোধগুলির সূত্রপাত ঘটায়, তাই, সরকারের ও জনসাধারণের উচিত এই স্বার্থান্বেষীদের খুঁজে বের করা এবং এক অখণ্ড ভারতবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে যে-কোন প্রতিকূল শক্তির মোকাবিলা করা।

উপসংহার

চিন্তাসহায়ক বাণী

একতাই জাতিযোগের ভিত্তিভূমি।

—অক্ষয়চন্দ্র সরকার

একের গর্ভে বহুত্বের সমাধান করাই একনিষ্ঠতা।

—ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়।—বর্ণাশ্রমধর্ম

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. জাতীয় সংহতি স্বাধীনতার স্তম্ভ। ২. মিলনই ভারতের মন্ত্র।

আমাদের গণতন্ত্র

[ভূমিকা—এ যুগ গণতন্ত্রের—ভারতীয় গণতন্ত্রের আদর্শ ও মৌলিক অধিকার—জনগণের সরকার ভোটের দ্বারা নির্বাচিত—আদর্শ গণতন্ত্র-প্রতিষ্ঠার উপায়—উপসংহার]

কোন রাষ্ট্রের শাসনভার যখন জনসাধারণের হাতে ন্যস্ত থাকে আর সেই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা জনগণের স্বার্থের অনুকূলে পরিচালিত হয় তখন সেই শাসনব্যবস্থাকে আমরা বলি গণতন্ত্র। আদর্শ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রত্যেক নাগরিকের সমান অধিকার। তার মূল মন্ত্র হল Government by the people, for the people and of the people.

ভূমিকা

এ যুগ গণতন্ত্রের

এ যুগ জনগণের, এ যুগ গণতন্ত্রের। স্বাধীনতার উষালগ্নেই ভারতীয় নেতারা উপলব্ধি করেছিলেন একমাত্র গণতন্ত্রই ভারতের মত বিশাল দেশের সার্বিক কল্যাণ সাধন করতে পারে। কেবল রাজনৈতিক গণতন্ত্র ভারতের শেষ কথা নয়, এ কেবল একটি পদক্ষেপ মাত্র। এর মধ্যে দিয়েই আসবে অর্থনৈতিক গণতন্ত্র। এই অর্থনৈতিক গণতন্ত্র ছাড়া রাজনৈতিক গণতন্ত্র মূল্যহীন; কিছুটা দেবতাহীন মন্দিরের মত। এ কথা ভারতীয় চিন্তানায়কদের অজানা নেই। তাই ডঃ আম্বেদকর বলেছেন : "We have established political democracy and it is also desired that we should lay down as our ideal economic democracy"। এই উক্তির মধ্যেই ভারতীয় গণতন্ত্রের রূপরেখাটি প্রতিফলিত হয়েছে।

ভারতীয় গণতন্ত্রের আদর্শ ও মৌলিক অধিকার

ভারতীয় গণতন্ত্রের মূল আদর্শ চারটি। ন্যায়বিচার, সাম্য, স্বাধীনতা এবং মৈত্রী; এবং চারটি আদর্শের স্তম্ভের উপর আমাদের গণতন্ত্র দাঁড়িয়ে আছে। এ ছাড়াও জনগণের মৌলিক আদর্শের সীমারেখা আমাদের সংবিধানে চিহ্নিত। এখানে বলা হয়েছে—ধর্ম, জাতি ও বর্ণভেদ থাকবে না। অস্পৃশ্যতা-বর্জনের অঙ্গীকার আছে ভারতীয় সংবিধানে। 'সেই নিম্নে নেমে এসো নহিলে নাহিরে পরিত্রাণ'—ঋষি কবির অমর বাণীকেই গণতন্ত্র বাস্তবে রূপ দিয়েছে। মত-প্রকাশের অধিকার, বৃত্তি-নির্বাচনের অধিকার আমাদের গণতান্ত্রিক সংবিধানে স্বীকৃত। তবে মত-প্রকাশের অধিকার মানে এই নয় যে, কোন ব্যক্তি এই অমূল্য অধিকারের অপব্যবহার করবে। জনকল্যাণবিরোধী বা রাষ্ট্রবিরোধী কাজ করার অধিকার সংবিধানে স্বীকৃত নয়। আইনগত অধিকারও মানুষের মৌলিক অধিকার। আইনের চোখে প্রত্যেক ভারতীয় নাগরিক সমান। আইনসম্মত উপায় ছাড়া কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি বা স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করা চলবে না। সংবিধান আমাদের যে-অধিকার দিয়েছে সেগুলি খর্ব হলে আমরা তার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবি করতে পারি। এ অধিকার প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার।

জনগণের সরকার ভোটের দ্বারা নির্বাচিত

ভারতের সরকার ভোটের দ্বারা নির্বাচিত সরকার। প্রথমে ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয় আইনসভা; এই সভার সংখ্যাগুরু দল মন্ত্রিসভা গঠন করে। মন্ত্রিসভা রাজ্যে রাজ্যপাল এবং কেন্দ্রে রাষ্ট্রপতি দ্বারা নির্বাচিত হলেও তাঁরা দায়ী থাকেন আইনসভার কাছে। কেবল রাষ্ট্রপরিচালনায় নয়, এই গণতন্ত্রের মূল জেলা, থানা এবং গ্রাম-পঞ্চায়েৎ পর্যন্ত প্রসারিত। গণতন্ত্রে ভোটাধিকারের বলে কার্যত জনগণই শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করে। তাই প্রত্যেক নাগরিকই পরোক্ষভাবে শাসনকার্যে অংশ গ্রহণ করার আনন্দ লাভ করে।

শিক্ষার সঙ্গে গণতন্ত্রের নিবিড় যোগ আছে। অশিক্ষিত জনগণ আদর্শ গণতন্ত্র-বিকাশের বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তাই ভারতে শিক্ষাকে সর্বস্তরে প্রসারিত করার জন্যে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। অশিক্ষা ছাড়াও গণতন্ত্রের শত্রু হল প্রশাসনিক

দুর্বলতা ও দুর্নীতি, ধনতান্ত্রিক শোষণ এবং নৈতিক অধঃপতন। এই তিন শত্রুর সঙ্গে স্বাধীনতার আদি পর্ব থেকেই আমাদের সংগ্রাম করতে হচ্ছে। বহুযুগের সঞ্চিত পাপ এত অল্প সময়ের মধ্যে দূর করা যায় না, তবু আমাদের অনুশাসন-পর্ব, জরুরী অবস্থা এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বিশদফা কর্মসূচীর মাধ্যমে আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছে।

আদর্শ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উপায়

আমাদের মনে রাখতে হবে কেবল ভোটের অধিকার দান করলেই গণতন্ত্রের আদর্শ প্রতিষ্ঠিত হয় না। তার জন্যে চাই অনুকূল পরিবেশ। উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি না হলে গণতন্ত্রের দেবতা বন্দী হয়ে থাকবেন ধনীর সোনার শৃঙ্খলে, অর্থের কারাগারে। ধনবৈষম্য ও দারিদ্র্য দূর করতে আমাদের সরকার আজ বদ্ধপরিকর। তাই 'গরিবী হটাও' আমাদের এক নতুন শপথ।

ভারতের গণতন্ত্র অগণিত জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রদীপশিখা। এই শিখাকে অনির্বাণ রাখা ভারতবাসী হিসেবে প্রত্যেক নাগরিকের কর্তব্য। কারণ গণতন্ত্র শক্তি-শালী হলে মানুষের স্বাধিকার। আমরা বিশ্বাস করি গণতান্ত্রিক পন্থায় একদিন ভারতে আসবে এমন এক সমাজ যেখানে অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা বা স্বাস্থ্যের অভাব থাকবে না, থাকবে না বেকার-জীবনের দুঃসহ গ্লানি।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. গণতন্ত্র বনাম একনায়কতন্ত্র। ২. গণতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র।

বিশ্বশান্তি স্থাপনে ভারতের ভূমিকা

[সূচনা—রাজনীতির দ্বৈতরূপ—শান্তিস্থাপনে দু'টি আন্তর্জাতিক সংস্থা—বিশ্বশান্তিস্থাপনে ভারতের ভূমিকা—উপসংহার]

১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে জন্মলাভের পর থেকেই ভারতবর্ষ-যে বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ইতিহাসচেতনার সাহায্যে ভারতের রাষ্ট্র-নিয়ামকেরা তখন থেকেই অনুভব করেছিলেন ভারতবর্ষ চিরকালই শান্তিকামী দেশ। এই দেশের বুকেই একদিন মহামানব বুদ্ধদেব আবির্ভূত হয়ে শান্তি, প্রেম এবং করুণার বাণী প্রচার করেছিলেন—যে মহাবাণী-প্রভাবে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ লোক তাঁর ধর্মমতের অনুগামী হয়েছিল। 'পঞ্চশীল'-এর মাধ্যমে যে-শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি ভারত একদিন গ্রহণ করেছিল—তার মহান্ আদর্শ এ যুগেও স্বীকৃত। স্বাধীনতালাভের পর ভারতবর্ষ বর্তমান পৃথিবীর দ্বন্দ্বরত বৃহৎ কোন শক্তিগোষ্ঠীতে যোগ না দিয়ে ভারতের অনুসৃত সেই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতিরই আশ্রয় নিল।

সূচনা

এ যুগের আন্তর্জাতিক রাজনীতির দ্বৈতরূপ যে-কোন সচেতন ব্যক্তির দৃষ্টি এড়ায়

না। একদিকে বৃহৎ শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের অখণ্ড স্বাধীনতা এবং বিশ্বের তাবৎ মানুষের মানবাধিকার ঘোষণায় উচ্চকণ্ঠ, আর একদিকে একটু সুযোগ পেলেই শক্তিমান রাষ্ট্রগুলি ছলে-বলে-কৌশলে দুর্বল রাষ্ট্রগুলির স্বাধীনতা হরণে তৎপর। ইটালি-কর্তৃক আবিসিনিয়া-গ্রাস, জার্মানি-কর্তৃক পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতা-হরণ, জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল, আমেরিকার সঙ্গে অদম্য স্বাধীনতা-প্রেমিক ভিয়েৎনামবাসীদের দীর্ঘকালস্থায়ী যুদ্ধ এবং অতি-সাম্প্রতিককালে সোভিয়েত-সৈন্য-বাহিনী-কর্তৃক আফগানিস্তানে বিপুল সৈন্য এবং অস্ত্রশস্ত্রের সমাবেশ—এ সমস্ত ঘটনা ফ্যাসীবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী শক্তির নগ্নরূপ জগতের সামনে অনাবৃত করেছে।

রাজনীতির দ্বৈতরূপ

এই পররাজ্য-লোলুপ সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসীবাদী শক্তিকে কার্যক্ষেত্রে বাধা দেবার উদ্দেশ্যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে সৃষ্টি হয়েছিল এককালে পৃথিবীর সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের রাজনৈতিক সংস্থা 'লীগ্ অফ্ নেশন্স্' (League of Nations)। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা গেল, পররাজ্যলোলুপ বৃহৎ শক্তির গ্রাস থেকে ক্ষুদ্র রাষ্ট্রকে রক্ষা করতে এই আন্তর্জাতিক সংস্থার কোন কার্যকরী ভূমিকা নেই। এত বড় একটা সম্মিলিত রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠানের এই অক্ষমতা দেখে অনেক রাষ্ট্রই তার ওপর বিশ্বাস হারাল। ফলে 'লীগ অফ নেশন্স' ভেঙে গেল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বশান্তিরক্ষার জন্য আরও তোড়জোর করে, আরও ব্যাপক প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা নিয়ে সৃষ্টি হল আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংস্থা 'ইউ. এন. ও.' (U. N. O.)। বিশ্বশান্তি অক্ষুণ্ণ রাখা, এবং পৃথিবীর অনগ্রসর দেশগুলির উন্নয়নের জন্য এই আন্তর্জাতিক সংস্থার কত শাখা, এবং কত অফুরন্ত তার অর্থ তহবিল! কোন শক্তিমান রাষ্ট্র অপর কোন দুর্বল রাষ্ট্রের স্বাধীনতা হরণে উদ্যত হলে তার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টির জন্য একটি সশস্ত্র আন্তর্জাতিক সেনাবাহিনীকে প্রস্তুত রাখা হল। বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠায় এই মহতী সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা উৎপাদনের জন্য এর সেক্রেটারি জেনারেলও নিযুক্ত হতে থাকল পালাক্রমে বিভিন্ন সদস্য-রাষ্ট্র থেকে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, কোন সবল রাষ্ট্র অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের ওপর যখন সামরিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তার কোন প্রতিরোধ হয় না—যেহেতু সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জ সংস্থা ইউ. এন. ও.-ও বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তি দ্বারা প্রভাবিত। এর জলন্ত উদাহরণ দেখা গিয়েছে মার্কিন দেশ-কর্তৃক ভিয়েৎনাম-আক্রমণে, এবং সাম্প্রতিক কালে একজন আফগান শাসককে পুতুল সাজিয়ে সোভিয়েত সামরিক শক্তি-কর্তৃক আফগানিস্তান-এর সমস্ত ক্ষমতা অধিকারে।

শান্তিস্থাপনে দু'টি আন্তর্জাতিক সংস্থা

ভারতবর্ষ বিশ্বরাজনীতির এই জটিলকুটিল রূপ দেখে স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর থেকেই কোন বৃহৎ শক্তিগোষ্ঠীতে যোগ না দিয়ে বিশ্বশান্তিকামী জোট-নিরপেক্ষ শক্তির সঙ্গে হাত মেলালো। এ প্রসঙ্গে স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক কর্ণধার পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর পররাষ্ট্রনীতির কথা স্মর্তব্য। যুগোশ্লাভিয়ার প্রয়াত মহান্ রাষ্ট্রনেতা মার্শাল টিটোর জোট-নিরপেক্ষ বিশ্বের রাষ্ট্রশক্তিকে নিয়ামক শক্তি হিসাবে সংহত করবার প্রয়াসও এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মৃত্যুর পরও ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক কর্ণধারগণ

বিশ্বশান্তি স্থাপনে ভারতের ভূমিকা

শান্তিময় সহাবস্থানমূলক 'পঞ্চশীল'-নীতিতে অটল থেকে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে আসছেন। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পর স্বদেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ভারতবর্ষ একাধিক বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে সশস্ত্র সংঘর্ষে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু সেই সমূহ সঙ্কটমুহূর্তেও কোন শক্তিজোটে যোগদান করে নি। বরং বিশ্বের যে-কোন ফ্যাসীবাদী শক্তি অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যখনই আগ্রাসী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, বিশ্বশান্তিকামী ভারতবর্ষ সেই পররাজ্যলোলুপ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানিয়েছে। বিশ্বশান্তি-প্রতিষ্ঠায় ভারতের এই অবিচ্ছিন্ন প্রয়াস আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভারতের মর্যাদা বাড়িয়েছে।

বর্তমান হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে জোটনিরপেক্ষ শান্তিবাদীর ভূমিকায় অটল থাকা অগ্নিপরীক্ষার মত। তবু মহামানব বুদ্ধদেব এবং মহাত্মা গান্ধীর অহিংসা মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ ভারতবর্ষ মানব-মুক্তির জন্য সেই কঠিন পরীক্ষারত।

ভারতের নদীপ্রকল্প ও বন্যানিয়ন্ত্রণ

[ভূমিকা—ইংরেজ-ভারতে নদীপ্রকল্প ও সেচব্যবস্থা—রাজস্থান খাল ও চম্বল প্রকল্প—কোশী, রিহন্দ বাঁধ, গণ্ডক, রামগঙ্গা ও হীরাকুদ-বাঁধ-প্রকল্প—পশ্চিমবঙ্গের নদীপ্রকল্প—উপসংহার]

খেয়ালী মৌসুমী মেঘের এক হাতে আছে সুধাভাণ্ড, অন্য হাতে মৃত্যুর অভিশাপ-ভরা ঝাঁপি। একদিকে সে ধরণীকে করে সুজলা-সুফলা-শস্যশ্যামলা, অন্যদিকে ধ্বংস করে সৃষ্টিকে দুঃসহ খরায় অথবা মহাপ্লাবী বন্যায়। শিব ও রুদ্র, রক্ষক ও সংহারক—একই দেহে দুই বিপরীতধর্মী শক্তির লীলা। নিষ্ঠুর খেয়ালী প্রকৃতির বিচিত্র লীলায় অসহায় মানুষ, দিশাহারা মানুষ তাকে পূজা করেছে দেবী বলে, কল্যাণের জন্যে তার সাধনায় জীবনপাত করেছে। কিন্তু প্রকৃতি কোন দিন প্রসন্ন দৃষ্টিতে ফিরে তাকায় নি, অসহায় মানুষের দুঃখে কোনদিন ডেকে আনে নি তার জলভারে নত মৌসুমী মেঘের দল। তার পর এল প্রকৃতিজয়ের পালা। মানুষ আজ নিজেই নিজের ভাগ্যবিধাতা। মৌসুমী মেঘের দিকে তাকিয়ে না থেকে নদীবুক থেকে ছিনিয়ে আনছে ধরণীর তৃষ্ণাহরা অমৃত। অথবা নদীর বুকেই বন্দী করে রাখছে মহাপ্লাবনের সম্ভাবনাকে।

ভূমিকা

প্রাকৃতিক নিয়মেই ভারতের বড় বড় নদীগুলি পলিপূর্ণ হয়ে একদিন জলবহনের ক্ষমতা হারাল। সংস্কারের অভাবে খালগুলিও এল পূর্ণ হয়ে। ফলে নদনদীর আশীর্বাদ শস্যক্ষেত্রে পৌঁছতে পারল না, যা পৌঁছল তা প্রকৃতির অভিশাপ, বন্যারূপে, ধ্বংসের তাণ্ডবলীলায় চারিদিক প্লাবিত করে। আবার কখনও দুঃসহ খরায় মজে-আসা নদীর বালুকাময় প্রান্তর ধূ ধূ করা মরুভূমির রূপ পরিগ্রহ করে মানুষকে মরণ-আলিঙ্গনে গ্রাস করতে এসেছে। কখনও বন্যা কখনও উষর মরুর প্রেতনৃত্য। এই হল ভারতীয় কৃষির

ভাগ্যলিপি। প্রাচীন ভারতের রাজারা নদনদী-সংস্কার, কূপখনন, খালখননের দিকে নজর দিতেন। বিদেশী ইংরেজ আমাদের শোষণ করেছে, শাসন করেছে, কিন্তু যে-জলধারা কৃষির সবচেয়ে বড় অবলম্বন তাকেই করেছে অবহেলা। ফলে প্রাচীন সেচব্যবস্থাসম্পূর্ণ ভেঙে পড়ে। তখন বাধ্য হয়েই ইংরেজ সরকারকে কয়েকটি সেচ-পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়। সিন্ধুপ্রদেশের 'লয়েড বাঁধ' ইংরেজ-ভারতে জল-সেচের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব। এ ছাড়া পাঞ্জাবের শতদ্রু-উপত্যকা-প্রকল্প, উত্তর প্রদেশের সারদা-খাল-প্রকল্প ও মাদ্রাজে কাবেরী-বাঁধ-প্রকল্প উল্লেখযোগ্য।

ইংরেজ-ভারতে নদী-প্রকল্প ও সেচব্যবস্থা

স্বাধীন ভারতে-যে বহুমুখী নদীপ্রকল্প গৃহীত হয়েছে তার মুখ্য উদ্দেশ্য হল—কংক্রিটের বাঁধ দিয়ে উচ্ছৃঙ্খল জলধারাকে বন্দী করে দেশকে বন্যার হাত থেকে রক্ষা করা আর শস্য-ক্ষেত্রে পাঠানো তৃষ্ণার জল। এ ছাড়াও আছে শিল্পাঞ্চলের জন্যে জল-বিদ্যুৎ। এইসব সম্ভাবনার কথা ভেবেই গৃহীত হয়েছে স্বাধীন ভারতের বহুমুখী নদী-প্রকল্পগুলি। পাঞ্জাব, রাজস্থান, হরিয়ানায় ২৭৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের জন্যে গৃহীত হল ভাকরা-নাঙ্গাল প্রকল্প। বিপাশা প্রকল্পের কাজে হাত দিয়েছেন পাঞ্জাব ও রাজস্থান সরকার। দেশ-বিভাগের ফলে সিন্ধুনদের নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতা অনেকটা চলে যায় পাকিস্তানের হাতে। অথচ ভারতের প্রায় ২০ লক্ষ হেক্টর জমি সিন্ধুনদের খালগুলির দ্বারা জল-সিঞ্চিত হয়। শেষ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় বারো বছর আলাপ-আলোচনার পর ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের জলচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১০৪·০৯ কোটি টাকায় শতদ্রু-নদীর ওপর নির্মিত 'হারিকেন বাঁধ' থেকে খাল কেটে আনা হয়েছে রাজস্থানের মরু-অঞ্চলে। এই খালের দুটি শাখা। একটির নাম 'রাজস্থান ফীডর', অন্যটির নাম 'রাজস্থান খাল'। এই খালদ্বয় দ্বারা জলসিক্ত হয়েছে প্রায় ৬·৮ লক্ষ হেক্টর জমি। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থান সরকার একযোগে গ্রহণ করেছেন বিখ্যাত চম্বল-প্রকল্প। এখানে নির্মিত হয়েছে 'গান্ধী সাগর বাঁধ' ও 'কোটা বাঁধ'। এতে উভয় রাজ্যের প্রায় ৪·৪ লক্ষ হেক্টর জমির তৃষ্ণা মিটবে।

রাজস্থান খাল ও চম্বল-প্রকল্প

বিহার ও উত্তর প্রদেশের কোশী, রিহন্দ্‌-বাঁধ এবং গণ্ডক-প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। আশা করা যায়, কোশী-প্রকল্পে বিহারের ৫·৬ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচ করা যাবে। উত্তর প্রদেশের রিহন্দ্‌-বাঁধ-প্রকল্পে ৯১৪·৪০ মিটার দীর্ঘ এবং ৯১·৪৪ মিটার উচ্চ কংক্রিটের বাঁধ নির্মিত হয়েছে। ৬·৯ লক্ষ হেক্টর জমিতে জল-সেচের জন্য নির্মিত রামগঙ্গা নদী-প্রকল্প। উড়িষ্যার উর্বর মাটির ঘুম ভাঙাতে রচিত হয়েছে হীরাকুদ-বাঁধ-প্রকল্প। এই বাঁধ ৪৮০০ মিটার দীর্ঘ। এতে উড়িষ্যার ১·৫৪ লক্ষ হেক্টর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা রয়েছে। অনগ্রসর উড়িষ্যা রাজ্যের কৃষিশিল্পের মহতী সম্ভাবনার বাণী বহন করে এনেছে এই হীরাকুদবাঁধ-প্রকল্প। এর পরেই দক্ষিণ ভারতের নদী-প্রকল্পের কথা। তুঙ্গভদ্রা, নাগার্জুন সাগর, কৈনা, ভদ্রা জলসংরক্ষণ, কাকড়া পাড়া প্রভৃতি প্রকল্পের উদ্দেশ্য অন্ধ্র-মহীশূর, মাদ্রাজ, কেরালা প্রভৃতি রাজ্যে জলসেচের নবদিগন্ত উন্মোচন করা।

কোশী, রিহন্দ বাঁধ, গণ্ডক, রামগঙ্গা ও হীরাকুদ-বাঁধ-প্রকল্প

পশ্চিমবাংলার বেশির ভাগ নদীই পাহাড়ী নদী। এই সব নদীর মধ্যে দামোদর হল এক বিশিষ্ট নদ, পূর্বে এই নদকে বলা হত 'দুঃখের নদ'। কারণ দামোদরের বন্যা ছিল প্রত্যেক বর্ষার ভাগ্যলিপি। কিন্তু বর্তমানে 'দামোদর উপত্যকা কর্পোরেশন' গঠিত হওয়ার ফলে বর্ষার বন্যাকে নদীখাতে বন্দী করে রাখা সম্ভবপর হয়েছে। পাঞ্চেৎ, মাইথন, দুর্গাপুর প্রভৃতি স্থানে বাঁধ তৈরি করে জল আটকে রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। এই জল আবার প্রয়োজন মত খাল কেটে চাষের জমিতে নেওয়ার পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। হুগলী ও বর্ধমান জেলার একটা বড় অংশ এই পরিকল্পনায় হয়েছে শস্যশ্যামল। ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনায় অজয় নদকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভবপর হয়েছে। দক্ষিণ বাংলার কংসাবতী প্রকল্পের কাজ সমাপ্ত হলে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এবং হাওড়াও হবে বন্যার কবলমুক্ত, আর চাষের উর্বর মাটি পাবে তৃষ্ণার জল।

পশ্চিমবঙ্গের নদীপ্রকল্প

দক্ষিণ বাংলার সমুদ্র উপকূলবর্তী সুন্দরবন অঞ্চল সর্বদাই থাকে বন্যা-কবলিত। এখানে নদীর দু-তীরে যে-বাঁধ দেওয়া থাকে তার স্থানীয় নাম ভেড়ি। বাঁধের কোথাও কোথাও জল-প্রবেশের দরজা থাকে, তাকে বলে 'স্লুশগেট'। অনেক সময় এই বাঁধ ভেঙে ফসলের ক্ষেতে বানের জল ঢুকে পড়ে। লোভী মাছচাষীর দল অনেক সময়ে ইচ্ছে করেই বাঁধ কেটে চাষের জমিতে জল ঢুকিয়ে 'মেছো ঘেরি' তৈরি করে। তাই বলা চলে সুন্দর বনের বন্যার অনেকটাই মানুষের তৈরি।

অতিবৃষ্টি-জনিত বন্যা-রোধের একমাত্র উপায় জল-নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা। তার জন্যে খাল খনন করতে হবে এবং সেই খালকে নদীর সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। নদীর জলপরিবহণক্ষমতা বাড়াবার জন্যে নদী-খালখনন করাও আবশ্যক। পরিকল্পনা অনুসারে নদীগুলির যে-পরিমাণ জল-ধারণের ক্ষমতা ছিল, সে পরিমাণ জল ধারণ করা কেন সম্ভবপর হচ্ছে না তার জন্যে তদন্ত কমিশন বসানো দরকার। বন্যা দেখা দিলে তখনই কেবল স্বল্পমেয়াদী ব্যবস্থায় খাদ্য ওষুধ কম্বল নিয়ে না ছুটে বেড়িয়ে চিরদিনের মত বন্যাস্ফীতির কণ্ঠ রোধ করতে হবে। এর জন্য এগিয়ে আসতে হবে তরুণ বৈজ্ঞানিক ইঞ্জিনিয়ার আর বিশেষজ্ঞদের।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়

১. বন্যা-নিয়ন্ত্রণের আধুনিক ব্যবস্থা। ২. ভারতের নদী-বাঁধ-পরিকল্পনা।
৩. ফারাক্কা-পরিকল্পনা। ৪. দামোদর-পরিকল্পনা।

'সবুজ বিপ্লবে' ভারত

[ভূমিকা—কৃষির অবনতি—ব্যর্থতার উৎস-সন্ধানে—সবুজ বিপ্লবের সূচনা—সবুজ-বিপ্লবের কারণ —উপসংহার]

"আমাদের দেশে চাষের ক্ষেতের উপরে সমস্ত পৃথিবীর জ্ঞানের আলো ফেলিবার দিন আসিয়াছে। আজ শুধু একলা চাষীর চাষ করিবার দিন নাই, আজ তাহার সঙ্গে

বিদ্বানকে, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হইবে। আজ শুধু চাষীর লাঙলের ফলার সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির সংযোগ যথেষ্ট নয়—সমস্ত দেশের বুদ্ধির সঙ্গে, দেশের বিদ্যার সঙ্গে, অধ্যবসায়ের সঙ্গে, তাহার সংযোগ হওয়া চাই।" —রবীন্দ্রনাথ

ভূমিকা

মায়ের কাছে ছোটছেলে যেমন আবদার করে, মাটির কাছে আমরাও তেমনি অনাদি অনন্তকাল ধরে আবদার করে এসেছি। কত হাজার হাজার বছর ধরে এই মাতা ধরিত্রী আমাদের দাবি মিটিয়ে এসেছে। এই সুদীর্ঘ কালসীমায় কত রাজ্যের পতন হয়েছে, এসেছে নতুন রাজা নতুন রাজদণ্ড হাতে নিয়ে, কত সভ্যতা লীন হয়েছে বিস্মৃতির অতল তলে—এসেছে নতুন সভ্যতা নতুন যুগের বাণী নিয়ে। আমরা কিন্তু সেই মান্ধাতার আমলের হাল লাঙল নিয়ে আলবাঁধা টুকরো জমিতেই ফসল ফলিয়ে গেছি। কিন্তু ভারতের অহল্যা-কৃষির শাপমোচনের কোন চেষ্টাই করি নি। কেবল আবদার করেছি মাটির কাছে আর সেই আবদার মেটাতে না পারলে শিখেছি তাকে অশ্রদ্ধা করতে।

কৃষির অবনতি

অথচ প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় ভারতের কৃষি-কৌলীন্য নেহাত কম ছিল না। এই কৃষির লোভেই একদিন ইউরোপের দৃষ্টি পড়েছিল ভারতের দিকে। আর ভারত হয়েছে সেই সব বিদেশী বণিকদের কাঁচা মাল যোগাবার কামধেনু। তারা কেবল দোহন করেছে, কিন্তু জমির স্বাস্থ্য অর্থাৎ উৎপাদন-শক্তি-বৃদ্ধির দিকে কোনদিন ফিরে তাকায় নি। তার পরেও আছে রাজনৈতিক চক্রান্ত, দেশবিভাগ। ফলে, বহু কৃষি-সমৃদ্ধ অঞ্চল এখন আমাদের হাতের বাইরে। তার ফলে মাটির ঋণ আমাদেরই শোধ করতে হচ্ছে সবুজ বিপ্লবের মাধ্যমে। চীন-তাইওয়ান-জাপান বা ভিয়েৎনামের কৃষিসমৃদ্ধির সঙ্গে আজ তাকে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে হবে—তাই ঢেলে সাজাতে হবে ভারতের প্রাচীন কৃষি-ব্যবস্থাকে।

ব্যর্থতার উৎস-সন্ধানে

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'আজকে কৃষির সমস্যা একলা কৃষক মেটাতে পারবে না। তাদের সঙ্গে বিদ্বান, বৈজ্ঞানিককে যোগ দিতে হবে।' কৃষির মত গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার একলা চাষীর ওপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয়, একথা বোঝবার দিন এসেছে আজ। খাতায়-কলমে বহু পূর্বেই ভারতের কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতি হয়েছে,—কিন্তু বিজ্ঞান-ভাগীরথী মহাদেবের জটাজালেই আবদ্ধ হয়ে থাকলেন, তাঁর পবিত্র স্পর্শে এতদিন ধন্য হয় নি শাপগ্রস্ত ভারতের কৃষিব্যবস্থা। কেন এই বৈজ্ঞানিক সাফল্য এতদিন কৃষিক্ষেত্রে পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হয় নি? এর উত্তরে বলতে হয় ভারতের প্রাচীন ভূমিব্যবস্থা, কৃষি-প্রকরণগত সমস্যা, আর কৃষক-সমাজের নানা সমস্যাই এতদিন রচনা করেছে বাধার বিন্ধ্যাচল। আলবাঁধা ছোট ছোট জমি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাষের অনুপযুক্ত। কৃষির প্রকরণগত সমস্যাও সামান্য নয়, এর মধ্যে আছে জলসেচ, বীজ-সার, কৃষিযন্ত্রপাতি, চিকিৎসা ও শস্য সংরক্ষণ। কৃষির কাজে আধুনিক যন্ত্রের প্রয়োগ, উন্নতমানের ফলনশীল বীজের ব্যবহার, ওষুধের ব্যবহার স্বাধীনতাপূর্ব ভারতের ছিল স্বপ্নের অতীত। এ ছাড়াও ছিল কৃষকসমাজের নানা সমস্যা। দারিদ্র্য, অশিক্ষা, কুসংস্কার, স্বাস্থ্যহীনতা, ঋণের বোঝা, আরও কত কী। সুখের কথা, স্বাধীনতা-

লাভের পর থেকে ভারত উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, কৃষকের সমস্যা অপসারিত না হলে বিজ্ঞান-ভাগীরথীকে কৃষির জমিতে টেনে আনা যাবে না। আর উপলব্ধি করেছে বলেই ভারতের সবুজ-বিপ্লব আজ রচনা করেছে সম্ভাবনাময় এক নতুন দিগন্ত।

সবুজ বিপ্লবের সূচনা

১৯৬৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতে-যে কৃষিশস্যের অভাবনীয় উন্নতি হল তা কৃষি-অর্থনীতির ইতিহাসে ছিল অভূতপূর্ব ব্যাপার। খাদ্যশস্যের ফলন ৭ কোটি ৬০ লক্ষ টন থেকে ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টনে বৃদ্ধি পেয়ে কৃষি-উৎপাদনের ইতিহাসে এক নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করল। আবার ১৯৭০ খ্রীস্টাব্দে এই উৎপাদনের পরিমাণ ছাড়িয়ে গেল ১০ কোটি টনের রেকর্ড-সীমা। এই অভূতপূর্ব উন্নতির কারণ অনুসন্ধানের জন্যে বিশেষ গবেষণার প্রয়োজন হবে না। ভারতীয় কৃষির-যে ত্রিবিধ সমস্যা ছিল—অর্থাৎ ১. ভূমি সমস্যা, ২. প্রকরণগত সমস্যা, ৩. কৃষক সমাজের সমস্যা—ধীরে ধীরে সেই ত্র্যহস্পর্শ কাটিয়ে উঠেই ভারতীয় কৃষি তার উন্নতির নবদিগন্ত রচনা করেছে।

সবুজ বিপ্লবের কারণ

স্বাধীন ভারতে অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্যে যখন যোজনা কমিশন গঠিত হল তখন থেকেই এই কমিশনের বিশেষজ্ঞরা কৃষিকেই ভারতীয় অর্থনীতির কেন্দ্রে স্থাপন করে পরিকল্পনার খসড়া রচনা করেছিলেন। তারই ফলে গৃহীত হয় নদীবাঁধ ও সেচখাল-খননের পরিকল্পনা। গড়ে ওঠে রাসায়নিক সারের কারখানা, উন্নত ধরনের বীজও কৃষিকাজে ব্যবহার করে অহল্যা কৃষির ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা, ফলে দশ বছরের ব্যবধানে ভারতীয় কৃষির ক্ষেত্রে যে-পরিবর্তন সূচিত হল তা নিম্নরূপ :

	১৯৬৯-৭০	১৯৭৯-৮০
চাল :	৪ কোটি ২০ লক্ষ টন	৪ কোটি ২২ লক্ষ টন
গম :	২ কোটি ১ লক্ষ টন	৩ কোটি ১৫ লক্ষ টন
পাট :	৫১ লক্ষ বেল।	৬১ লক্ষ বেল

কৃষি-উন্নতি একদিকে যেমন মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা বাঁচিয়েছে, তেমনি দেশ কৃষি-অর্থনীতিতে ক্রমেই স্বয়ম্ভরতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

কৃষির উন্নতিতে আমাদের দেশে সরকার ও প্রশাসন যন্ত্রের একটা বড়ো অবদান রয়েছে। আজ ভারতের নানা অঞ্চলে সরকারী উদ্যোগে সৃষ্টি হয়েছে কতগুলি নির্বাচিত এলাকায় 'প্যাকেজ প্রোগ্রাম', অর্থাৎ 'নিবিড় কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা'। কৃষকদের সামনে উন্নততর কৃষি পদ্ধতির নতুন কৌশল তুলে ধরা ও সেই কৌশল প্রয়োগে তাদের সহায়তা করা এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য। ভারতীয় কৃষি অর্থনীতিতে যে-আশাব্যাঞ্জক নতুন দিনের সূচনা হয়েছে তার মূলে আছে এই নিবিড় কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা।

"আমাদের চাষী বলে, মাটি হইতে বাপ-দাদার আমল ধরিয়া যাহা পাইয়া আসিতেছি তাহার বেশি পাইব কী করিয়া? এ কথা চাষীর মুখে শোভা পায়, পূর্বপ্রথা অনুসরণ

করিয়া চলাই আমাদের শিক্ষা। কিন্তু এমন কথা বলিয়া আমরা নিষ্কৃতি পাইব না। এই মাটিকে এখনকার প্রয়োজন অনুসারে বেশি করিয়া ফলাইতে হইবে —নহিলে আধপেটা খাইয়া, জ্বরে, অজীর্ণরোগে মরিতে কিংবা জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে।" রবীন্দ্রনাথের এই বাণীর মর্ম আমরা আজ উপলব্ধি করতে পেরেছি। তাই ভারতের নতুন যুগের স্বপ্ন ও সাধনা কৃষি-অহল্যার ঘুম ভাঙাবার জন্যে বদ্ধপরিকর। দিকে দিকে তাই সবুজ বিপ্লবের বার্তা ঘোষিত হচ্ছে, কর্মে আর সাধনায় ঘটছে তার রূপান্তর।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. ভারতের খাদ্যসমস্যা। ২. ভারতের প্রাচীন কৃষিব্যবস্থা।
৩. আধুনিক কৃষিব্যবস্থায় ভারত। ৪. কৃষিপ্রধান বাংলা।

আর্যভট্ট : ভারতের প্রথম মহাকাশযান

[ভূমিকা—আর্যভট্ট কী ও কেন—গৌরবের পূর্ব-ইতিহাস—বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া—আর্যভট্টের সাফল্যে রোহিণীর পরিকল্পনা—উপসংহার]

মহাকাশ-জয়ের ক্ষেত্রে একটার পর আর একটা সাফল্যের দ্রুত চলচ্ছবি দেখতে দেখতে আমরা যেন বিস্মিত হতেও ভুলে গেছি। শুধু একটা কথা চাপা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মনের কোণে উঁকি দিত—ভারতের ভূমিকা কি শুধু নির্বাক দর্শকের? না। সেই অপেক্ষিত মুহূর্তটিকে আমরা হাতের মুঠোয় পেয়েছি। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯-এ এপ্রিল ভারতের কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট' উৎক্ষিপ্ত হল মহাশূন্যে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানীদের পাশে আসন গ্রহণ করল ভারতীয় বিজ্ঞান-সাধক।

ভূমিকা

ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে 'আর্যভট্ট'। প্রাচীন ভারতে আর্যভট্ট ছিলেন প্রখ্যাত জ্যোতির্বিজ্ঞানী। আজ থেকে দেড় হাজার বছর আগে জ্যোতির্বিজ্ঞান এবং গণিতবিষয়ক গ্রন্থ আর্যভট্টীয়প্রণেতা এই আর্যভট্ট। তিনি ছিলেন সে যুগের কুসুমপুর অর্থাৎ পাটনার অধিবাসী। ভারতের প্রথম মহাকাশযানটির নাম এই জ্যোতির্বিজ্ঞানীর নাম অনুসারেই রাখা হয়েছে আর্যভট্ট। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও রুশ প্রযুক্তিবিদ্‌গণের সহযোগিতায় নির্মিত এই উপগ্রহটি রাশিয়ার বিয়াস লেক থেকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। আর্যভট্টের ওজন ৩৬০ কিলোগ্রাম। আর্যভট্ট পৃথিবীর প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে সর্বাধিক ৬২৩ কিলোমিটার এবং সর্বনিম্ন ৫৬৪ কিলোমিটার দূরত্ব রক্ষা করে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে চলেছে। একবার পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে আর্যভট্টের সময় লাগে ৯৬·৪১ মিনিট। কতগুলি সৌর ব্যাটারি এ গ্রহের শক্তির উৎস এবং এর তাপ নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থাও আছে। আর্যভট্ট বিষুবরেখার সঙ্গে ৫০·৪ ডিগ্রী কোণ উৎপন্ন করে রয়েছে।

আর্যভট্ট কী ও কেন

খুঁটিনাটি যেসব বৈজ্ঞানিক তথ্য আর্যভট্টকে অবলম্বন করে সংগৃহীত হবার পরিকল্পনা, তার মধ্যে ছিল মহাজাগতিক উৎস থেকে ভেসে আসা এক্স-রশ্মি পরিমাপ, নিউটন কণিকার অনুসন্ধান, সূর্য থেকে আসা গামা বিকিরণের পরীক্ষানিরীক্ষা। তা ছাড়া, পৃথিবীকে ঘিরে রয়েছে যে-অয়নমণ্ডল তার সম্পর্কেও আর্যভট্টের গবেষণার কথা। আর্যভট্টের দেহ-সন্নিবেশিত যে-টেপরেকর্ডার রয়েছে তাতে নিশ্চয়ই মহাকাশতথ্য লিপিবদ্ধ হয়েছে, আর সে তথ্য এসেছে নিয়ন্ত্রণ-কেন্দ্রগুলিতে। সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীরা বলেছেন আর্যভট্টের প্রথম মহাকাশ অভিযান সফল। সে পৃথিবী থেকে পাঠানো নির্দেশ পালন করে চলেছে।

এই মহাকাশযান উৎক্ষেপণের গৌরব একদিনে অর্জিত হয় নি। এর পেছনে আছে নিরবচ্ছিন্ন সাধনার ইতিহাস। ভারতের পারমাণবিক গবেষণা বিভাগ ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে মহাকাশ-গবেষণার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে ডঃ বিক্রম সারাভাই-এর সভাপতিত্বে ভারতীয় মহাকাশগবেষণা সমিতি গঠিত হল আর ত্রিবান্দ্রমের কাছে থুম্বাতে রাশিয়া, আমেরিকা ও ফ্রান্সের সহযোগিতায় গড়ে উঠল রকেট উৎক্ষেপণ-কেন্দ্র। এর পরবর্তী সাত বছরের ইতিহাস একটানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার। ১৯৭১ খ্রীস্টাব্দে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটায় এক বিরাট রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপিত হল। এই সময়ে ডঃ সারাভাই-এর পরলোকগমন এবং অধ্যাপক মেননের ভারতীয় মহাকাশ-গবেষণা-সংস্থার সভাপতি হওয়া এক স্মরণীয় ঘটনা। তারপর ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে সোভিয়েত বিজ্ঞান আকাদেমি ও ভারতীয় মহাকাশ-গবেষণা সংস্থার মধ্যে এক সহযোগিতা-চুক্তি স্থাপিত হয়। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত কৃত্রিম-উপগ্রহ-সৃষ্টি-প্রকল্প গ্রহণ করে। মহাকাশযানের নক্‌শা এবং তাকে গড়ে তোলার পরিকল্পনায় যিনি সবচেয়ে বেশি প্রতিভার পরিচয় রেখেছেন তিনি হলেন অধ্যাপক ইউ. আর. রাও। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে মহাকাশযানের সাজসরঞ্জাম রাশিয়ায় নিয়ে গিয়ে রকেট-উৎক্ষেপণ-যন্ত্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হয়। তারপর ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে মহাকাশযানের মডেল নিয়ে আর একবার রাশিয়ায় গিয়ে চূড়ান্ত পরীক্ষা করা হয়। তার পর এল সেই শুভ মুহূর্ত, ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯-এ এপ্রিল ভারতীয় সময় দুপুর একটা, প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ 'আর্যভট্ট' উৎক্ষিপ্ত হল আকাশে। ঘোষিত হল ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের সাধনার গৌরব।

গৌরবের পূর্ব-ইতিহাস

প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ আর্যভট্টের উৎক্ষেপণের ঠিক এক বছর আগে ভারত তার প্রথম পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বিশ্বসভায় আপন গৌরবের আসনটি অধিকার করেছে। এই দুই গৌরবজনক ঘটনার পর বিশ্বের দৃষ্টি আজ ভারতের দিকে নিবদ্ধ হয়েছে। উঠেছে আলোচনা আর সমালোচনার ঝড়। রাশিয়ার সরকারী মুখপাত্র Izvestia বলেছে : এই রকেট উৎক্ষেপণ করে ভারত বিশ্বে মহাকাশবিজয়ী শক্তিগুলির অন্যতম শক্তিরূপে পরিগণিত হল। ভারতকে যাঁরা যথার্থভাবে জানেন তাঁরা বিশ্বাস করেন ব্যয়বহুল হলেও ভারত তার পরীক্ষণটিকে কল্যাণমুখী করে তুলতে সক্ষম হবে।

বিভিন্ন প্রতিক্রিয়া

১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় দ্বিতীয় মহাকাশযানটি রাশিয়ার মাটি থেকেই উৎক্ষিপ্ত করা হয়। সোভিয়েত মহাজাগতিক সংস্থার সভাপতি ডঃ নিকোলাই নেভিকভ-এর বিবৃতি অনুসারে : ভারতীয় দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহটি আকারে এবং গঠনে আর্যভট্টের মতোই। কিন্তু এর ওজন কিছু বেশি। চান্দ্র-তিথি-সংক্রান্ত চতুর্থ নক্ষত্র রোহিণী মহাকাশের এক অতি উজ্জ্বল তারকা। এই তারকার নামে দ্বিতীয় উপগ্রহের নাম হয়েছে রোহিণী। আর্যভট্ট মহাকাশ-গবেষণার ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের যে-নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে রোহিণীর উৎক্ষেপণে সে দিগন্ত আরও প্রসারিত হয়েছে।

আর্যভট্টের সাফল্যে রোহিণীর পরিকল্পনা

আমরা আশা করব আর্যভট্টের পর ভারতের পরবর্তী কৃত্রিম উপগ্রহেরা আমাদের চোখের সামনে উন্মোচিত করবে অচেনা অজানা জগতের ছবি। শোনাবে কত অশ্রুত সঙ্গীত। আর্যভট্ট সেই সম্ভাবনার দুয়ার উন্মুক্ত করেছে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. দেখব এবার জগৎটাকে। ২. বিজ্ঞানের আশীর্বাদ।

ভারতের পারমাণবিক নীতি ও পারমাণবিক বিস্ফোরণ

[ভূমিকা—ভারতের পারমাণবিক চিন্তা—পারমাণবিক নীতির পরিবর্তন—শান্তির উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ—বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব—দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়া—পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার—উপসংহার।]

ভারতের চিন্তাধারা ও জীবনচর্চার বিশিষ্টতা তাকে এমন একটি উজ্জ্বল স্বাতন্ত্র্য দিয়েছে যা কারো দৃষ্টি এড়াবার নয়। এই স্বাতন্ত্র্যের মূলে আছে তার সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের এক মহান্ আদর্শ। পাশ্চাত্যের বিভিন্ন জাতি যখন সুখস্বাচ্ছন্দ্যের তাড়নায় নতুন দেশ-জয়ের আশায় ছুটেছে তখন ভারতের মনীষা আত্মপ্রকাশ করেছে সাহিত্যে, দর্শনে, আধ্যাত্মিক অনুশীলনে, সাম্য-মৈত্রী ও শান্তির বাণীতে। মহামানব বুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে মহাত্মা গান্ধী পর্যন্ত সব নেতাই প্রচার করে গেছেন অহিংসা-ত্যাগ-শান্তি ও মৈত্রীর বাণী।

ভূমিকা

ধ্বংসের কাজে পারমাণবিক শক্তির ভয়াবহ পরিণামের কথা ভেবেই ভারত এতদিন পরমাণু-শক্তি-সঞ্চয়ের কাজে বিরত থেকেছে। সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বের শক্তিশালী দেশগুলির কাছে আবেদন করেছে, তারা যেন পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণ না করে। এই পরমাণু অস্ত্র-নিরস্ত্রীকরণের প্রবক্তা ছিলেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহেরু। তাঁর আদর্শে এবং সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ক্রুশ্চেভের চেষ্টায় রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে নিরস্ত্রীকরণের এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দে গঠিত হয় নিরস্ত্রীকরণ কমিটি। কিন্তু প্রথম থেকেই ফ্রান্সের

ভারতের পারমাণবিক চিন্তা

অসহযোগিতায় এই কমিটির কোনো প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ হয় নি। ফ্রান্স একের পর এক পরমাণু-বোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে—সঙ্গে সঙ্গে চীনও একাধিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে দূষিত করেছে বিশ্বের বাতাস।

পারমাণবিক পরীক্ষা করলেও ভারত কিন্তু পারমাণবিক অস্ত্র প্রস্তুত করতে চায় না, ভারত চায় শান্তির কাজে, বিশ্বের কল্যাণে, মানব সেবায় এই পারমাণবিক শক্তিকে কাজে লাগাতে। ধ্বংস নয় সৃষ্টি। এই আদর্শের রূপায়ণকল্পে ডঃ ভাবার নেতৃত্বে ১৯৫৩ খ্রীস্টাব্দে বোম্বাইয়ের ট্রম্বেতে পারমাণবিক শক্তি উৎপাদন ও গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপিত হয়। ১৯৫১ খ্রীস্টাব্দে এখানে শুরু হয় ইউরেনিয়াম ধাতুর পরমাণু-বিভাজনের কাজ। ইতিমধ্যে একে একে গড়ে উঠতে লাগল পারমাণবিক চুল্লী বা Reactor. ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম তৈরি Reactor-এর নাম দেওয়া হয় 'অপ্সরা', তারপর 'সাইরাস', 'জারলিনা', 'পূর্ণিমা', 'রাণাপ্রতাপ-সাগর', 'কলপক্কম'—প্রভৃতি নামের পারমাণবিক চুল্লী তৈরি হতে থাকে। ১৯৬৪ খ্রীস্টাব্দে তৈরি হয় প্লুটোনিয়ম জ্বালানি—যা পারমাণবিক বিস্ফোরণ-কাজের অপরিহার্য উপাদান। তারপরে ডঃ ভাবার আকস্মিক মৃত্যুতে গবেষণার কাজ ব্যাহত হয়। কিন্তু কয়েকজন তরুণ উত্তরসূরী এসে গ্রহণ করেছেন সেই অসমাপ্ত কর্মভার। এঁরা হলেন ডঃ হোমী শেঠ্না, ডঃ রাজা রামান্না, ডঃ পি. কে. আয়েঙ্গার ও ডঃ অনিলকুমার গঙ্গোপাধ্যায়।

পারমাণবিক নীতির পরিবর্তন

১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মে এই দিনটি ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। এই দিনেই রাজস্থানের পোকরান অঞ্চলে মাটির নিচে বিস্ফোরণ ঘটিয়ে প্রথম পারমাণবিক শক্তিতে শক্তিমান্ হয় ভারত। ডঃ ভাবার সাধনা তথা ভারতীয় বিজ্ঞানীদের সাধনা সার্থক হয়। এই পারমাণবিক বিস্ফোরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভারতের মাননীয়-প্রধানমন্ত্রী যে-কথা সেদিন বলেছিলেন, তার মর্ম হল এই—কোনো যুদ্ধ বা ধ্বংসের কাজে নয়, শান্তি ও মানব-কল্যাণের কাজে পারমাণবিক শক্তিকে প্রয়োগ করাই ভারতের উদ্দেশ্য। পারমাণবিক শক্তি কমিশন এক বিবৃতিতে প্রায় একই কথা ঘোষণা করেছেন, তাঁরা বলেছেন, এটা শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহারের উদ্দেশ্যে একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা। হিরোসিমা-নাগাসাকির ভয়াবহ পরিণতির কথা ভেবে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক জোলিও ক্যুরী দুঃখ করে বলেছিলেন, 'নাগাসাকি ও হিরোসিমায় পারমাণবিক বোমা ব্যবহারের জন্য যারা দায়ী, তারা বিজ্ঞানকে অপবিত্র করেছে।'—ভারত তাঁর সঙ্গে একমত। আমরা বিজ্ঞানকে ধ্বংসের কাজে ব্যবহার করতে চাই না, চাই কল্যাণের কাজে ব্যবহার করতে। তাই শান্তির উদ্দেশ্যেই আমাদের পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানো।

শান্তির উদ্দেশ্যে পারমাণবিক বিস্ফোরণ

ভারতের বৈজ্ঞানিকদের সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব এই, বিস্ফোরণকে তারা পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ-সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। বিস্ফোরণ বায়ুমণ্ডলে তেজস্ক্রিয়-ভস্মরাশি ছড়িয়ে বায়ুমণ্ডলকে বিষাক্ত করে, এর ফলে ভূমিকম্প ঘটা বা মাটিতে ফাটল ধরা

কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু ভারতীয় পারমাণবিক বিস্ফোরণে এসব কিছুই ঘটে নি।

বিজ্ঞানীদের কৃতিত্ব

যদিও বিস্ফোরণের ক্ষমতা দশ থেকে পনেরো টি. এন. টি.-র বিস্ফোরণের সমান বলে দাবি করা হয়েছে। যে-সব যন্ত্রের সাহায্যে বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছে এবং বিস্ফোরক হিসাবে যে-প্লুটোনিয়ম ব্যবহার করা হয়েছে তা সবই ভারতের এবং ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের তৈরি।

দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়া

১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই মের বিস্ফোরণের পর দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকা নানা সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠে। কেউ বলেছে দরিদ্র দেশের পক্ষে পারমাণবিক শক্তি সঞ্চয় করা অশোভন। কেউ বলেছে বুদ্ধ-গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-নেহেরুর দেশের মানুষের পক্ষে শান্তির বাণী ভুলে পশ্চিমী শক্তিগোষ্ঠীর অন্ধ-অনুকরণ করা নীতিবিরুদ্ধ। আর একদল কিন্তু অকুণ্ঠচিত্তে বলেন—ভারত তার দুর্বলনীতির পরিবর্তন ঘটিয়ে আজ পৃথিবীর শক্তিশালী দেশের পাশে নিজের আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে।

পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার

ভারতীয় জীবন-দর্শনে ধ্বংসের দেবতা রুদ্র, তিনিই আবার সৃষ্টির দেবতা ভোলানাথ শিব। কেমন করে ধ্বংসের শক্তিকে সৃষ্টির কাজে ব্যবহার করতে হয় ভারত সে কথা জানে। ভারত তার নিজের প্রতিভায় পারমাণবিক শক্তির ধ্বংসাত্মক ক্ষমতাকে সৃষ্টি ও কল্যাণের লীলায় পরিণত করার এক মহৎ অঙ্গীকার করেছে। মানব-কল্যাণের যে-উদ্দেশ্যে এই শক্তি ব্যবহৃত হবে তা হল : ১. বিমান, জাহাজ, ট্রেন প্রভৃতি যানবাহন-চালনায় প্রযুক্ত হবে। ২. অল্প ব্যয়ে গ্রামে গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া সম্ভবপর হবে। ৩. চিকিৎসা-বিজ্ঞানে আনা হবে যুগান্তকারী পরিবর্তন। ৪. খনিজ-সম্পদের কাজে এই শক্তির ব্যবহার হবে। ৫. মরুভূমি-অঞ্চলে পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে জল-সংরক্ষণের ব্যবস্থা হবে। ৬. এ ছাড়াও কৃষিকাজে পারমাণবিক শক্তি আনবে যুগান্তকারী পরিবর্তন।

উপসংহার

বহু সম্ভাবনাময় এক বিপুল শক্তি আজ আমাদের হাতের মুঠোয়। অসংখ্য বিজ্ঞানীর সাধনালব্ধ এই শক্তিকে হাতে নিয়ে আমরা অগ্রসর হব শুভ কর্মপথে আর প্রহর গুণব সেই অনাগত সোনালী দিনের জন্যে যেদিন আমাদের দেশে দারিদ্র্য থাকবে না, অকালমৃত্যু থাকবে না, ভয়ঙ্কর ক্যান্সার রোগের তীব্র যন্ত্রণায় অসহায় মায়ের কোলে মরবে না শিশুপুত্র। জানি, সেদিন আর বেশি দূরে নেই। ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই মে এই সত্য, শিব ও সুন্দরের আগমনবার্তা বহন করে এনেছে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায় :

পারমাণবিক শক্তি ও ভারতের পরিকল্পনা

চিন্তাসহায়ক বাণী

'Is it the contention that it is all right for the rich to use nuclear energy for destruction but not right for a poor country to find out whether it can be used for construction ?'

—Indira Gandhi

হলদিয়া বন্দর

[ভূমিকা—হলদিয়ার ঐতিহ্য ও প্রয়োজনীয়তা—হলদিয়ার অবস্থান, যোগাযোগ ও পশ্চাদ্‌ভূমি —হলদিয়া প্রকল্প : অবাধ আমদানি অঞ্চল ও বন্দর—অবাধ-বাণিজ্য-প্রেরণার সুফল—উপসংহার]

ভূমিকা

হলদিয়া বন্দর আজ নতুন কিন্তু তার বুকে কান পাতলে শোনা যাবে অতি প্রাচীন এক বন্দরের কলতান। সে বন্দরের নাম তাম্রলিপ্ত। তাম্রলিপ্তের অস্তাচলগামী সৌভাগ্য-সূর্য হলদিয়ার উদয়দিগন্তে অরুণ আলোয় রচনা করেছে নতুন দিনের আগমনী সঙ্গীত।

হলদিয়ার ঐতিহ্য ও প্রয়োজনীয়তা

হলদিয়া নতুন হলেও বিশ্ববিখ্যাত তাম্রলিপ্ত বন্দরের প্রাচীন ঐতিহ্যকে সে পেয়েছে উত্তরাধিকারসূত্রে। বালুকাময় বিস্তীর্ণ প্রান্তরে হাজার বছরের ঘুমিয়ে থাকা তাম্রলিপ্ত আবার জেগে উঠেছে মানুষের স্পর্শ পেয়ে, তবে সেই পুরনো নামে নয়,—নতুন নামে নতুন পরিচয়ে। হাজার বছরের মৃত অতীতকে আধুনিক যুগের মৃত্যুঞ্জয়ী মানুষ নতুন করে বাঁচিয়েছে, কিন্তু কেন? এর উত্তরে কেবল একটি কথাই বলতে হয়: কলকাতা বন্দরকে বাঁচাবার জন্যে।

যে-হুগলী নদীর দয়া-দাক্ষিণ্যে কলকাতা বন্দরের যশোগৌরব একদিন ছিল বিশ্ববিখ্যাত, পলি পড়ে পড়ে সেই হুগলী নদীর হয়েছে এমনই দশা যে, বিদেশ থেকে বড়ো বড়ো জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসতে পারে না। তার ওপর নানা নদী-প্রকল্পে বাঁধ নির্মিত হওয়ায় জলধারায় ক্ষীণতা দেখা দিয়েছে হুগলী নদীতে। এই সব কারণে কলকাতা বন্দরের সহায়ক বন্দরের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে হলদিয়া।

হলদিয়ার অবস্থান, যোগাযোগ ও পশ্চাদ্‌ভূমি

হলদিয়া বন্দর হল মেদিনীপুর জেলার তমলুক মহকুমার হুগলী নদীর মিলন স্থানে, কলকাতা থেকে নব্বই কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। বন্দরের প্রাণ হল দুটি (১) যোগাযোগ ব্যবস্থা, (২) পশ্চাদ্‌ভূমি। যোগাযোগ ব্যবস্থার দিকে প্রথম থেকেই নজর দেওয়া হয়েছে। সেইজন্যে দক্ষিণপূর্ব রেলপথের পাঁশকুড়া স্টেশন থেকে হলদিয়া পর্যন্ত ৮·২০ কোটি টাকা ব্যয়ে রেলপথ তৈরি হয়েছে। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ট্রেন চলাচল শুরু হয়েছে। উড়িষ্যা ক্যানেল ও হিজলী ক্যানেলের সংস্কার সাধন করে যোগাযোগ-ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে। ৬নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে হলদিয়াকে যুক্ত করার কাজ

সমাপ্ত এবং ৪১ নং জাতীয় সড়কের সংস্কার করা হচ্ছে। আশা করা যায়, স্থলপথে ও জলপথে বন্দরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যোগাযোগ-ব্যবস্থার আরও উন্নতি হবে। পশ্চাদ্‌ভূমি হিসাবে হলদিয়া পাবে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার কিছু অংশ। এই সব অঞ্চল কৃষি ও শিল্পে সমৃদ্ধ। কৃষি ছাড়া এই তিন প্রদেশের খনিজ সম্পদ আছে হলদিয়ার মুঠোয়—যে খনিজ-সম্পদে রচিত হয় শিল্পের নব দিগন্ত।

প্রচুর সম্ভাবনা নিয়ে হলদিয়া বন্দর গড়ে উঠেছে। এখানে থাকবে পাঁচটি বার্থযুক্ত ডাক-ব্যবস্থা। ৩০ কোটি টাকা ব্যয়ে তৈরি হবে একটি তৈল-শোধনাগার। তৈল-জেটির কাজ শেষ হয়েছে। পেট্রো-কেমিক্যাল কমপ্লেক্স, দস্তা-স্মেলটার, তৈল-রসায়ন শিল্প প্রভৃতি বিভিন্ন শিল্প-প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা আছে। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মার্কিন প্রতিষ্ঠান ফিলিপ্‌স্ পেট্রোলিয়ম কোম্পানির সহায়তায় একটি রাসায়নিক সার কারখানার প্রতিষ্ঠা। সম্প্রতি ২০০ কোটি টাকা ব্যয়ে এখানে একটি পেট্রোকেমিক্যাল কারখানার পরিকল্পনা রচিত হয়েছে। এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্মতিও পাওয়া গিয়েছে। এর ফলে বেকার সমস্যারও কিছু সমাধান হবে বলে আশা করা যাচ্ছে। এই সব প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণের জন্যে এই অঞ্চলে মূলধনী দ্রব্য, কাঁচা মাল ইত্যাদির অবাধ প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-নির্মাণের অনুমতি দিয়ে হলদিয়াকে অবাধ-আমদানি অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে। কেবল অবাধ-আমদানি-অঞ্চল নয়, একদিন হলদিয়া হবে অবাধ-বাণিজ্য-বন্দর, ঠিক সিঙ্গাপুর বা হংকং বন্দরের মতো।

হলদিয়া প্রকল্প: অবাধ আমদানি অঞ্চল ও বন্দর

অবাধ-বাণিজ্য-বন্দরের জন্যে একটি বাণিজ্য-অঞ্চল গড়ে উঠবে হলদিয়াকে কেন্দ্র করে। এই অঞ্চলের উৎপন্ন পণ্য ভারতে ও বিদেশে রপ্তানি হবে। এখানে বিনাশুল্কে মূলধনী দ্রব্য, কাঁচা মাল আমদানি করা যাবে এবং বৈদেশিক ও ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সহজেই এখানে কারখানা স্থাপন করতে আগ্রহী হবে। অর্থনীতির ক্ষেত্রে এর অবদান হবে সুদূরপ্রসারী। ভারতীয় কারখানা বিদেশী কলকারখানার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াবার শক্তি পাবে। হলদিয়ার অবাধ বাণিজ্য বহু প্রতিষ্ঠানকে আকৃষ্ট করবে। ভারত থেকেই মূলধনী কাঁচা মাল সংগৃহীত হবে, তাই ভারত ঘরে বসেই বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করবে। প্রচুর বিদেশী মূলধন, কাঁচা মাল হলদিয়ায় মজুত থাকবে, ফলে দেশী ব্যবসাদার সেগুলি ঘরে বসেই পাবেন।

অবাধ-বাণিজ্য-প্রেরণার সুফল

১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে হলদিয়া-বন্দরের নির্মাণ-কাজ শেষ হবার কথা ছিল এবং অনুমান করা হয়েছিল এর নির্মাণ-ব্যয় হবে ৪০ কোটি টাকা। কিন্তু ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত খরচ হয়েছে প্রায় ১২৭ কোটি টাকা।

১৯৭০ খ্রীস্টাব্দের ২২-এ মে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বলেছিলেন: 'হলদিয়া বন্দরের উন্নয়নের কাজ ত্বরান্বিত করা হবে। শীঘ্রই 'টাউনশিপ এ্যাক্ট' অনুযায়ী হলদিয়াকে উপনগরী বলে ঘোষণা করা হবে।' এখানে নির্মিত হবে কয়েকটি প্রাথমিক স্কুল, একটি উচ্চ মাধ্যমিক স্কুল, দু'টি হাস-

উপসংহার

পাতাল। দূর করা হবে পানীয় জলের সমস্যা। রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদ বিদ্যুৎ সরবরাহের দায়িত্ব নিয়েছে। বৃহৎ ও মহৎ এই পরিকল্পনা, সন্দেহ নেই। কিন্তু অবাধ-বাণিজ্য-বন্দরের সুযোগ নিয়ে দুর্নীতি-পরায়ণ কালোবাজারী আর চোরা-চালানকারীর দল যাতে তৎপর হয়ে উঠে দেশের সর্বনাশ করতে না পারে সেদিকে অতন্দ্র প্রহরীর মত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

১. ভারতের নদী-বন্দর। ২. ভারতের নবনির্মিত বন্দর। ৩. হলদিয়া-বন্দরের ভবিষ্যৎ। ৪ ভারতের অবাধ-বাণিজ্য-বন্দর।

গ্রাম ত্রিপুরার উন্নয়ন

[ভূমিকা—গ্রামনির্ভর সভ্যতা—কৃষকের অবস্থা—আদিবাসী পল্লী ও সমতলবাসী বহিরাগতদের গ্রামীণ সভ্যতা—মিশ্র গ্রাম-ব্যবস্থা—দৈবনির্ভর গ্রাম—সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী—ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন—জাতীয় ও রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা—উপসংহার।]

ভূমিকা

ভারতীয় সভ্যতার প্রাণকেন্দ্র হল গ্রামগুলি। লক্ষ লক্ষ গ্রামের মেলায় এই পুণ্য ভারতভূমির ঐতিহ্য নিহিত। আরণ্যক ত্রিপুরাও গ্রাম-নির্ভর। ৮০ শতাংশের অধিক সংখ্যক লোক এখানে গ্রামে বাস করে। আর এই ৮০ শতাংশেরও বেশি জনগণ এ রাজ্যে দারিদ্র্যসীমার নিচে অবস্থান করছে। সর্বভারতীয় পরিসংখ্যান অপেক্ষা ৩০ শতাংশ বেশি।

গ্রামনির্ভর সভ্যতা

কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সভ্যতার বীণাযন্ত্রে যে-সুর বাঁধা আছে তাকে উপেক্ষা করলে ভারতীয় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করতে হয়। ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হবার কথা নয়। ধরণীর ধূসরতায় যারা ঋতুতে ঋতুতে শ্যামলিমা এনে দেয় তারা তো এই ক্ষুদ্র রাজ্যের কৃষক সম্প্রদায়।

কৃষকের অবস্থা

আজ শতাব্দীর ব্যবধানেও গ্রামের কৃষকদের পরিবর্তন সামান্যই সূচিত হচ্ছে। ত্রিপুরার সংস্কৃতির মতো গ্রামগুলিও মিশ্র। পাহাড়ের ঢালে জঙ্গল পুড়িয়ে জুম পদ্ধতি উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে এখনও প্রচলিত। চাষের সুবিধার জন্যে জুম পাহাড়কে ঘিরে আদিবাসী পল্লী নিতান্তই অস্থায়ী হতশ্রী। এক নাগাড়ে অনেকদিন ফসল হয় না বলেই বসতি বদল করতে হয়। এই তল্পীতল্পা গুটিয়ে আদিবাসীদের স্থানান্তর গমনকে 'ফুরুৎ' করা বলে। স্বাভাবিক ভাবেই এই সকল অস্থায়ী পাহাড়ী বস্তীর কোনো রকম উন্নতি করা হয় না। আদিমতম পদ্ধতিতে এই রকম জুম চাষের নির্ভরতা যতই কমে যাচ্ছে ততই সংঘবদ্ধ স্থায়ী পল্লী পত্তনের সদিচ্ছা বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে পরিলক্ষিত হচ্ছে। পাহাড়ের উপরে

অথবা পাহাড়ী ঝোরা ঝরনার পাশে বর্ধিষ্ণু না হলেও অল্পবিস্তর গ্রামীণ সভ্যতার বিকাশ বিরল নয়। লেখাপড়ায় যে-গোষ্ঠী যত উন্নত সে গোষ্ঠীর তত বেশি স্থায়ী বাসের প্রতি লক্ষ্য পড়ছে।

গ্রাম-সভ্যতা বলতে ত্রিপুরায় যা বোঝায় তা হল পূর্ববঙ্গ থেকে উৎখাত লক্ষ লক্ষ উদ্বাস্তুদের নয়া বসতি বিকাশ। স্বাধীনতা উত্তর এই জনস্রোতের বিশাল অংশ কৃষিনির্ভর —ত্রিপুরার পাহাড়ে জঙ্গলে উপত্যকায় তারাই গ্রাম পত্তন করে পূর্ব বাংলার কৃষি নির্ভর গ্রামীণ সভ্যতার আমদানি করল এ রাজ্যে।

আদিবাসী পল্লী ও সমতলবাসী বহিরাগতদের গ্রামীণ সভ্যতা

আজকাল অবশ্য সমতলবাসীদের মতো উপজাতি জনগোষ্ঠীর লোকেরাও গ্রামের বাসিন্দা হতে শুরু করেছে। তাই মিশ্র সংস্কৃতির মতো এই রাজ্যের গ্রামীণ সভ্যতাও বিমিশ্র।

দৈবনির্ভর ত্রিপুরার গ্রামগুলি অনাবৃষ্টি-অতিবৃষ্টি, সেচ ও জল নিষ্কাশনের অভাব, পুরাতন পদ্ধতিতে চাষাবাদ, সরঞ্জামের মূল্যবৃদ্ধিজনিত অসুবিধা, কৃষিজাত উদ্বৃত্ত ফসলের বিপননের অব্যবস্থা এবং অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে বিচ্ছিন্নতার ফলভোগ করে আসছে। ত্রিপুরার আদিবাসী-অধ্যুষিত পূর্বতন অস্থায়ী বসতিগুলির সমস্যা ছোটো করে দেখার উপায় নেই। 'জুম' চাষ থেকে প্রথাগত কৃষিব্যবস্থায় পরিবর্তিত করতে না পারলে এই সকল জনগোষ্ঠীরই শুধু ক্ষতি সাধিত হবে না সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার ঐতিহ্যময় বনজ সম্পদও বিনষ্ট হতে বাধ্য। ছড়া-নদী-নালার গভীরতা কমে গিয়ে বন্যা আর বনাঞ্চল বিনষ্টির ফলে বৃষ্টিপাতের হার কমে যাওয়ার বৈজ্ঞানিক কারণ রয়েছে। অপর দিকে প্রথাগত চাষীদের সীমাবদ্ধ জমির উপর বৈজ্ঞানিক চাষ পদ্ধতি চালু না করলে অচিরেই ত্রিপুরার গ্রামগুলির ধ্বংস অনিবার্য।

দেশ স্বাধীন হবার পর জাতীয় সরকার ত্রিপুরায় গ্রামোন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। গ্রামীণ জীবনের ব্যাপক দারিদ্র্য দূর করার জন্যে সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। আধাআধি বখরায় এই উন্নয়নে টাকা ব্যয় করবে কেন্দ্র ও রাজ্য। এছাড়া রয়েছে ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামে পাহাড়ে ১৭টি সমষ্টি ও উপজাতি উন্নয়ন ব্লক। এই সবের অধীনে যে সমস্ত গ্রাম বা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল রয়েছে তাদের দেখাশোনা করার ভার গ্রামসেবকদের (V.L.W.) উপর। প্রতিটি গ্রামসেবক কেন্দ্রে সার, বীজ, চারা সরবরাহ করার ব্যবস্থা আছে। প্রতিটি ব্লক সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৃষকদের প্রয়োজন মেটাবার জন্যে নির্দিষ্ট। গ্রামের পথঘাট, শিক্ষা নৈশবিদ্যালয় সহ, কৃষকদের ঋণ দেবার ব্যবস্থা, কৃষিযন্ত্রপাতি সরবরাহ, গ্রামীণ ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পে ঋণ ও কারিগরি দক্ষতা যোগান দেবার ব্যবস্থা রয়েছে এই সকল সরকারী কার্যালয়গুলির। ব্যাঙ্ক জাতীয়করণের পর গ্রামীণ ব্যাঙ্কের শাখাও বিভিন্ন গ্রামে স্থাপিত হয়েছে। এই সকল ব্যাঙ্ক কৃষকদের সুদখোর গ্রাম্য মহাজনের হাত থেকে রক্ষা করতে সচেষ্ট হয়েছে।

মিশ্র গ্রাম-ব্যবস্থা

১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের পরবর্তী সময়ে উভয় কর্মসূচীকে একত্র করে সমাজের দুর্বলতর অংশের জনগণের আর্থিক মান উন্নয়নে ও কল্যাণে পরিচালিত করা হল। তফশিলী ও

উপজাতি সম্প্রদায়ের ২০ শতাংশের উন্নতি ছাড়াও রাজ্যের গরীব মানুষের কল্যাণ সাধনে এই কর্মসূচীর বিরাট ভূমিকা রয়েছে। ত্রিপুরায় দারিদ্র্য সীমার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অধিকাংশই ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষী, দিনমজুর, গ্রামীণ কুটীর শিল্প কারিগর, কৃষিশ্রমিক প্রভৃতি। তাদের চিহ্নিত করে প্রতিবছর এক একটি ব্লকে ৬০০শত পরিবারকে উন্নত করে পাঁচ বছরে সারা রাজ্যে গ্রামগুলিতে মোট ৫১ হাজার লোকের উপকার করা সম্ভব। এদের মধ্যে সংখ্যালঘু মণিপুরী মুসলমান সহ তফশিলী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকেদের সংরক্ষিত অংশও রয়েছে। এই সকল চিহ্নিত পরিবারের জমির পরিমাণ, লোকসংখ্যা, জীবিকা ও আয়, কারিগরি দক্ষতা প্রভৃতি ক্ষেত্রে তথ্য সংগ্রহ করে প্রতি পরিবারের জন্যে নির্দিষ্ট "বিকাশ পত্রিকায়" লিপিবদ্ধ করে উন্নয়নের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে।

দৈবনির্ভর গ্রাম

গ্রাম-ত্রিপুরার উন্নয়নে এই কর্মসূচী খুব কার্যকরী। ছোটো ও প্রান্তিক চাষী অথবা উপজাতি চাষীদের বিনিয়োগে ভর্তুকীর ব্যবস্থা গ্রহণ করে প্রতিটি পরিবারের উন্নয়নে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে জমিতে সেচ-ব্যবস্থাও করা হয়। গ্রাম উন্নয়নের ক্ষেত্রে কৃষকদের রেশম বা রবার শিল্পে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ভর্তুকী দেওয়া হচ্ছে মৎস্য চাষেও।

সুসংহত গ্রামোন্নয়ন কর্মসূচী

গ্রামীণ দুঃস্থ কারিগরদের আর্থিক অনুদান ছাড়া যন্ত্রপাতি সাজ-সরঞ্জাম কেনার জন্যেও সাহায্য দেওয়া হচ্ছে। এতে কুটীরশিল্পের প্রসার সম্ভব হবে। নিজস্ব আয়ের জন্যে উপায় হিসাবে স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্পের সাহায্য দেওয়ায় রিক্সাচালক, সবজীবিক্রেতা ও ছোট ব্যবসায়ীরা লাভবান হচ্ছেন। রাজ্যের ১৬টি ব্লকে আড়াই লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে একবছরে স্বনির্ভর কর্মসংস্থানে ৪০০ লোককে এই কর্মসূচীতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এইগুলির মধ্যে সেলাই, বাঁশ ও বেতের কাজ, কাপড় বোনা, মৌমাছি পালন প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

ক্ষুদ্র চাষী উন্নয়ন

পল্লীকেন্দ্রিক ত্রিপুরার হতশ্রী দূর করার জন্যে সাড়া জেগেছে লক্ষণীয়ভাবে। বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে চাষবাসে। ১৫ শতাংশ ফলন বেড়েছে। আর সেচসেবিত ভূমির পরিমাণ বেড়ে চার হাজার হেক্টর থেকে ১০ হাজার হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। গ্রামীণ জলসরবরাহ বেড়েছে। পূর্বে যেখানে ১৬৪টি গ্রামে গ্রামীণ জলসরবরাহ হত আজ সেখানে ৩৬৪টি গ্রামে হচ্ছে। বর্তমান ত্রিপুরার বিদ্যুতায়িত গ্রামের সংখ্যা সাত শতের উপরে। প্রাথমিক শিক্ষা সম্প্রসারণ হল গ্রামোন্নয়নের মূলকথা। ত্রিপুরার পাহাড় কন্দরে অনেক প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এমনকি গত কয়েক বছর চার শতাধিক নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল প্রথা চালু হওয়ায় ছাত্রসংখ্যা বাড়লেও অভিভাবকদের চরম দারিদ্র্য এ রাজ্যের শিশুদের শিক্ষার প্রধান অন্তরায়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের সুষ্ঠু ব্যবস্থার মাধ্যমে ত্রিপুরার ৬৮৯টি 'গ্রামসভা' যেদিন সত্যিকারের আলোয় আলোকিত হবে সেদিনই গ্রামনির্ভর ত্রিপুরার প্রকৃত অগ্রগতি সূচিত হবে।

জাতীয় ও রাজ্য সরকারের প্রচেষ্টা

ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত ত্রিপুরার পাহাড়ী বা সমতলে বিস্তৃত গ্রামগুলি আজ আর সুপ্ত নেই। সামরিক ও রাজনৈতিক চেতনাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আজ তাদের মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষণও সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। জম্পুই পাহাড়ের গ্রামগুলিতে কমলালেবুর চাষ বা সুদূর দক্ষিণাঞ্চলে পাতিদড়িতে রবার বাগানের সম্প্রসারণ অথবা ডম্বুর জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের মাধ্যমে নতুনবাজার যতনবাড়ির বিদ্যুতায়িত গ্রামগুলিতে তাঁতশিল্পের উন্নয়ন সমস্ত কিছুই ত্রিপুরার গ্রামজীবনের অগ্রগতিকে সূচিত করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের উদার হস্ত আর রাজ্য সরকারের সদিচ্ছা-চালিত নৈষ্ঠিক প্রচেষ্টাই একমাত্র ত্রিপুরার আদিবাসী ও সমতলবাসীর গ্রাম্য জীবনে হাসি ফোটাতে পারে, পারে প্রাণের জোয়ার বইয়ে দিতে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়:

১. ত্রিপুরার পল্লীসমস্যা ও সমাধান। ২. ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নে গ্রামের ভূমিকা।
৩. ত্রিপুরার গ্রাম বিকাশ।

দেশভ্রমণ

[ভূমিকা—ভ্রমণ ও শিক্ষা—দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য—দেশভ্রমণের প্রাচীনত্ব—দেশভ্রমণের নানা উদ্দেশ্য—দেশভ্রমণের অভ্যাস-গঠন ও তার জন্যে কী করা যেতে পারে—দুঃসাহসিক ভ্রমণ—উপসংহার।]

বিশ্বসংসারে মানুষই একমাত্র জীব যে উচ্চারণ করেছে চলার মন্ত্র 'চরৈবেতি', দেশভ্রমণের আকাঙ্ক্ষা তার রক্তে বহমান। অথচ মানুষ দেশকালবদ্ধ জীব, প্রাত্যহিক করণীয় তার নিয়মে বাঁধা। তবু তার সেই একই ছন্দে বহমান দিনরাত্রির মধ্যে হঠাৎ কখনও আসে সুদূরের আহ্বান, নিজের পরিধির ব্যাপ্তি তখন যেন হঠাৎ ধরা পড়ে তার ভাবনায়। চারপাশের অজানাকে জানার বাসনায় মন তখন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। এই ব্যাকুলতাই গতির মূল, শিক্ষার আবশ্যিক শর্ত। এ জন্যেই মানুষ যতদিন বাঁচে ততদিন শেখে।

ভূমিকা

বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ পুঁথিগত শিক্ষার সঙ্গে জীবনের অনেক ব্যবধান। কারণ পড়া, শেখা আর দেখা একত্র হয়ে সম্পূর্ণ করে শিক্ষার বৃত্ত। বিদ্যালয়ে তার অংশবিশেষ মেটে, বাকিটুকু সম্পূর্ণ হয় সারাজীবন ধরে। পৃথিবীর মস্ত পুঁথি আমাদের সামনে চিরকাল খোলা। প্রথমে শিখি বিদ্যালয়ের কাছে, তারপর সেখান থেকে ছুটি পেয়ে চলে আমাদের জীবনভোর পাঠ। তার জন্যে প্রয়োজন দেশভ্রমণ। মানুষ আর প্রকৃতি, এই নিয়েই জগৎ। দেশভেদে তা বদলায়, নতুন দেশ মানেই নতুন মানুষ, নতুন প্রকৃতি। চিন্তা দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে জানা পুঁথির পাতার অস্পষ্ট ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রত্যক্ষ হয়ে যখন ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞান হয়ে ওঠে, তখন তা আমাদের চেতনায় বাস্তব মূর্তি পরিগ্রহ করে।

ভ্রমণ ও শিক্ষা

দেশভ্রমণের শুধু যে আনন্দের দিক, তা-ও অমূল্য। নিসর্গ এবং মানুষকে ঘিরে যে চিরবহমান জীবনস্রোত তার সঙ্গে নিজের সংযুক্তির উপলব্ধিও মানবজীবনের এক পরম প্রাপ্তি।

দেশভ্রমণের প্রয়োজনীয়তা ও মূল্য

নিজের দেশকে না জানলে যথার্থভাবে দেশকে ভালবাসা যায় না, আর দেশকে জানার জন্যে প্রয়োজন দেশভ্রমণ। দেশের বিভিন্ন অংশের ভৌগোলিক পরিবেশ, ইতিহাসের বিক্ষিপ্ত উপাদান, বিচিত্র সমাজ-জীবন, আচরণপদ্ধতি, বিচিত্র জীবিকায় নিযুক্ত মানুষকে জানাই দেশকে জানা, এর জন্যে দেশভ্রমণ অপরিহার্য। তা ছাড়া মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারের সীমা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। শিক্ষা, বিজ্ঞান, রাষ্ট্রপরিচালন-পদ্ধতি, বাণিজ্য ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেশে-বিদেশে বহু নতুন-নতুন পরিবর্তন আসছে, দেশের উন্নতির জন্যে এগুলির প্রত্যক্ষ জ্ঞান দরকার এবং তা আসতে পারে একমাত্র দেশভ্রমণের মাধ্যমে।

আত্মোন্নতির ক্ষেত্রে দেশভ্রমণের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মানুষ যখন শুধু দিনযাপনের, শুধু প্রাণ-ধারণের গ্লানিতে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে, তখন বিশাল সমুদ্র বা অভ্রভেদী পর্বত-শিখরের প্রেক্ষাপটে নিজেকে দেখলে কোথায় মিলিয়ে যায় দৈনন্দিন তুচ্ছতা বা গ্লানি। বিরাটের অনুভূতিতে মনের দিগন্তের বহুদূর বিস্তার ঘটে।

দেশভ্রমণের প্রাচীনত্ব

জ্ঞানীভিক্ষু মানুষের দেশভ্রমণের ইতিহাস অনাদিকালের। শুধু দু'চোখ ভরে দেখার নেশায় আপদ-বিপদ তুচ্ছ করে মানুষ দূরদূরান্তর অতিক্রম করে ছুটে গিয়েছে। এক দেশের লব্ধ অভিজ্ঞতার দ্বারা উপকৃত হয়েছে অন্য দেশ।

দেশভ্রমণের নানা উদ্দেশ্য

ভ্রমণের নেশায় ঘরছাড়া হয় মানুষ। অনেক মানুষের মধ্যে আছে বোহেমিয়ান মন, যা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায়। সাগরের উন্মত্ত আহ্বান, পর্বতের হাতছানি তাকে পথে টানে। তার যেন পথ চলাতেই আনন্দ। তবু অনেকে উদ্দেশ্য নিয়েও ভ্রমণে বেরোয়। একই নৌকোর যাত্রীদের মধ্যে উদ্দেশ্যের তারতম্য থাকে বৈকি। সাগর সঙ্গমে নবকুমার কাহিনীর বৃদ্ধ গঙ্গাসাগরে গেলেন পুণ্য সঞ্চয় করতে। আর নবকুমার গেলেন সমুদ্র দেখতে। 'আহা কী দেখিলাম, জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।' বিহারী লাল দত্ত বাণিজ্য করতে গেলেন পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও কন্যা, বাণিজ্যও হল। আবার দেশভ্রমণও হল।

দেশভ্রমণের সুবিধা-অসুবিধা

বিদেশের তুলনায় ভ্রমণকারীর সংখ্যা আমাদের দেশে কম। তার অবশ্য বিভিন্ন কারণ আছে, আমাদের দেশে ভ্রমণের ব্যবস্থা তেমন উন্নত নয়, সুযোগ-সুবিধা তুলনায় কম, সর্বোপরি অর্থাভাব তো আছেই।

দেশভ্রমণের অভ্যাস-গঠন ও তার জন্য কী করা যেতে পারে

অথচ ভ্রমণের অভ্যাস ছাত্রাবস্থা থেকেই গড়ে তোলা প্রয়োজন। সবসময়েই-যে ব্যয়বহুল দূরদূরান্ত-ভ্রমণে যেতে হবে তা নয়, আমাদের অনেকেরই নিজেদের পারিপার্শ্বিককে চেনা হয় নি, তাই দিয়েই শুরু করা যেতে পারে। প্রয়োজন শুধুমাত্র অভ্যাসগঠন—উৎসাহদান। এ বিষয়ে যথাযোগ্য ব্যবস্থা নিতে পারলে শিক্ষাক্ষেত্রেও নিঃসন্দেহে সুফল ফলবে।

বর্তমান নানা যানবাহনের যুগেও অনেক যুবক পায়ে হেঁটে অথবা সাইকেলে দেশভ্রমণে যান। এঁরা স্বেচ্ছায় পথের কষ্ট বরণ করেন। পাহাড়ে ঘোরেন, ডিঙ্গি নৌকোয় সাগর পাড়ি দেন। দেশভ্রমণের রোমাঞ্চ ও আনন্দ দুই-ই লাভ করেন।

দুঃসাহসিক ভ্রমণ

বিজ্ঞানের প্রসাদে দেশভ্রমণ এখন অনেক সহজসাধ্য। এই সুযোগ গ্রহণ করে আমরা যদি নিজেদের মাঝে মাঝে মুক্তি দিই প্রাত্যহিকতার গণ্ডী থেকে, তা হলে বুঝতে পারব বিপুল শক্তির বিস্তৃত পরিধি, অনুভব করতে পারব প্রকৃতির প্রসন্ন সান্নিধ্যের অপরিসীম মূল্য। বেঁচে থাকার আনন্দ যাবে বেড়ে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—
১ ভ্রমণের শিক্ষা। ২ ভ্রমণের একাল ও সেকাল

চিন্তাসহায়ক বাণী

আমাদের এই ভ্রমণের কালটা ব্যাপ্তির দিকে যেরকম প্রাপ্তির দিকে সেরকম নয়। আমাদের ভ্রমণের তালটা চৌদূন লয়ে।...মৌমাছিকে ঝোড়ো হাওয়ায় তাড়া খেয়ে কেবল যদি উড়তেই হয়, ফুলের উপর একটুমাত্র পা ছুঁইয়েই তখনই যদি সে ছিটকে পড়ে, তা হলে তার ঘুরে-বেড়ানোটা যেমন ব্যর্থ হয়, আমার মনও তেমনি ব্যর্থতার দমকা হাওয়ায় ভন্‌ভন্ করেই মোলো তার চলার সঙ্গে পৌঁছনোর যোগ হারিয়ে গেছে।

—২১ জাভাযাত্রীর পত্র—রবীন্দ্রনাথ।

Travel teaches toleration.—
Benjamine israeli

A traveller without observation is a bird without wings.
—Saadi (1184—1291)
Persian Poet.

বেড়িয়ে এলাম

[ভূমিকা—যাত্রা—যাত্রাপথের বর্ণনা—স্থানবর্ণনা—উপসংহার]

সমুদ্রতীরে বেড়িয়ে এলাম। কলকাতার জীবনে একটা আশ্চর্য গতি আছে, আমরা আকর্ষিত হই, যুক্ত হই, অতঃপর ক্লান্ত হই, এবং সাময়িক ক্লান্তির সেই সময়টাতে ব্যাকুল হই দূরে কোথাও যেতে। সুযোগ মেলে কদাচিৎ। তেমনই একটা সুযোগ এই শীতের ছুটিটায় মিলে গেল।—অতএব যাত্রা হল শুরু।

ভূমিকা

সকাল ছ'টায় ট্রেন ধরলাম শেয়ালদা থেকে গন্তব্য ডায়মণ্ডহারবার। শীতের কুয়াশাচ্ছন্ন মন্থর সকাল ভেদ করে চলল আমাদের গাড়ি। সংক্ষিপ্ত যাত্রার ব্রাত্য লোকাল ট্রেন, অত সকালেও ভীড় মন্দ নয়; আর যাত্রাপথে বৈচিত্র্যের আস্বাদ আনা বিভিন্ন ফেরিওয়ালার অনর্গল ওঠা-নামা তো রয়েছেই। প্রাত্যহিক যাত্রীর দলে 'হোল্ড-অল' সমেত আমিই একমাত্র ছন্দপতন।

যাত্রা

খানিকক্ষণের মধ্যে এল সোনারপুর, তারপর বারুইপুর সেখানে চা খাওয়া গেল। সর্বসমেত দু'-আড়াই ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছলাম ডায়মণ্ডহারবার। গঙ্গাতীরে ছোটো মফঃস্বল শহর। সুন্দর পরিপাটি পরিচ্ছন্ন। সেখান থেকে বাসে গেলাম কাকদ্বীপ, দূরত্ব খুব কম নয়, সাতাশ মাইল—ঘণ্টা দেড়েক লাগল যেতে, সেখানে আবার বাস বদল, যেতে হবে নামখানা। নামখানায় স্নান-খাওয়া সারা হল। এবার যাত্রা জলপথে; ছোট্ট নদী হাতানিয়া-দোয়ানিয়া পেরোলাম খেয়ানৌকায়। ওপারে অপেক্ষা করছিল বাস, এ যাত্রার শেষ বাহন, আমাদের পৌঁছে দেবে ফ্রেজারগঞ্জ। বাস চলল। দু'পাশে ধু-ধু মাঠ, ফসলকাটা সারা, ধানগাছের গোড়া এখন হলদেটে, জায়গায় জায়গায় খড় শুকোচ্ছে। পথের ধারে দশ বছরের দিদির কোলে চার বছরের ভাই, রোদে পোড়া চেহারা। অবাক চোখে তাকিয়ে থাকে এই দ্রুতগামী যান আর তার সওয়ার সব ভাগ্যবান মানুষের দিকে, দিনে মাত্র দু'টো বাস দেখে তাদের বিস্ময় মেটে না। যাত্রীদের অধিকাংশই চাষী, হাটুরে, ক্বচিৎ দু'একজন চাকুরীজীবী বাবু, মোয়ার হাঁড়ি নিয়ে সপ্তাহান্তিক ছুটিতে বাড়ি ফিরছেন। বাসে সমুদ্র-দর্শনার্থী বোধ হয় একমাত্র আমিই। হঠাৎ চমক! দু'পাশের শ্যামসমারোহ দূরদিগন্তে নীলিমায় বিলীন। দৃষ্টিপথের শেষসীমা নীলের পাথারে হাবুডুবু। আমি এ দৃশ্যের মুখোমুখি এই প্রথম নই, আগে বহুবার গেছি সমুদ্র-সন্দর্শনে, কিন্তু আশ্চর্য, প্রতিবারই প্রথম দর্শনের সেই অনাস্বাদিত রোমাঞ্চ, তৃপ্তি, বিস্ময়—সবটাই খুঁজে পাই।

যাত্রাপথের বর্ণনা

প্রকৃতির রাজ্যে কিছু মহৎ শিল্প আছে, যা আপন ধর্মানুযায়ী কালজয়ী, প্রতিদিন নতুন, প্রতিদিন নবীন, প্রতিদিন সৌন্দর্যের অমলিন পসরাবাহী, যেমন, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত-ঋতুচক্র, গাছপালা, পাহাড় এবং আকাশ ও সমুদ্র। যাই হোক, পথ সরল, বাস দ্রুত ধাবমান, দৃষ্টি সমুদ্রনিবদ্ধ এবং মন ততক্ষণে সমুদ্রসঙ্গী।

পৌঁছলাম। তখন হব-হব সন্ধ্যা। আকাশে-সমুদ্রে সূর্যের শেষ আলোটুকু এবার জাদুকর হবে। নিঃস্পন্দ দাঁড়িয়ে আছি। একটি ছোটো ছেলে এসে হাত ধরল। ইঙ্গিত করল একটি ছোটো দরমার ঘরের দিকে,—নাম 'সাগরিকা', সামন্তবাবুর হোটেল। চারপাশে বাসস্থানের চিহ্ন বলতে রয়েছে ঐ একটি আর দুটি সরকারী কার্যদপ্তর, এখন ফাঁকা, সুতরাং একমাত্র আশ্রয়দাতা হতে পারেন সামন্তবাবু। সেই ব্যবস্থাই নিলাম। আমার জিনিসপত্র নিয়ে ছেলেটি চলে গেল, আমি বসলাম সেইখানেই। শীতের সমুদ্র অপেক্ষাকৃত শান্ত, তবু গর্জনমুখর, নিয়ত বিক্ষুব্ধ, বিরামহীন তরঙ্গবিক্ষেপে অস্থির, বাধাহীন মুক্ত হাওয়া যথারীতি ধাবমান। ততক্ষণে রঙের উৎসব শুরু হয়ে গেছে। লাল, ফিকে লাল, নীল, বেগুনে, গোলাপী হাজার রঙের পরশ বুলিয়ে সূর্যদেব বিদায়

নিলেন। অন্ধকার, অবিশ্রাম কালিমা। তখন বোধহয় কৃষ্ণপক্ষ মাথার, উপরে মসীময় নিঃসীম আকাশে অল্প কয়েকটি তারা দৃশ্যমান, সামনে অন্তহীন সমুদ্র, ফেনায়িত, তরঙ্গ তখন ভয়ঙ্কর।

বিরাটের সামনে এলে আমাদের বোধহয় অসহায়ত্বের ভীতিকর বোধ জাগে, আমি সেই অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হয়ে চলে এলাম আমার আগামী দু'-একদিনের আশ্রয়দাতা ও আশ্রয়স্থলকে দেখতে।

স্থানবর্ণনা

মেঝেয় খড়ের বিছানা তৈরি, ওপাশে রান্না হচ্ছে। ক্লান্তি সারা শরীরে, কিন্তু সামনে সমুদ্র। পোশাকবদল, খাদ্যগ্রহণ ইত্যাদি সেরে আবার এলাম সমুদ্রতীরে। জনৈক ফ্রেজার সাহেবের প্রিয়স্থান ছিল এইটি, তাঁরই নামানুসারে জায়গার নাম ফ্রেজারগঞ্জ। পূর্বদিকে আড়াই মাইল দূরে বকখালি নামে ছোট্ট নদীর মোহনা। ওখানে পরদিন সকালে যাব ঠিক করে ফিরে এলাম। ভোর না হতেই আবার সমুদ্র-তীর। এসে লক্ষ করলাম দূরে জম্বুদ্বীপ দৃশ্যমান। আকাশ আবার অপরূপ। বেলা বাড়ার আগেই ঢেউয়ের জলে পা ভেজাতে ভেজাতে চললাম বকখালির দিকে। অপূর্ব ! বাঁ-দিকে এরিকো, পাম আর দেবদারুর সারি, অযত্নলালিত ক্যাকটাসের ইতস্তত বর্ণ বিচ্ছুরণ, বিস্তৃত সাদা বেলাভূমি, অসংখ্য লাল কাঁকড়া রোদ পোহাচ্ছে তার উপর, আমার পদশব্দে চকিত, টুপটাপ গর্তে অদৃশ্য হল সব। আর 'সী গাল' ঝাঁকে ঝাঁকে, আকাশে, মাটিতে। জীবনের চিহ্ন ওখানে ঐ কাঁকড়া, পাখি আর আমি। তবে এমন নিশ্চয়ই থাকবে না। সরকারী উদ্যোগে পর্যটক-ভবন তৈরি হচ্ছে শুনলাম।

তারপর, ফিরে এলাম ; একই পথে। ইচ্ছা-অনিচ্ছা প্রশ্নাতীত। সংক্ষিপ্ত ছুটি শেষ, অতএব আবার কর্মস্থল কলকাতা। যাই হোক, বেড়িয়ে এলাম। রবীন্দ্রনাথের জীবন স্মৃতির 'বাহির যাত্রার কথা' মনে পড়ল। ইট-কাঠ দিয়ে ঘেরা কলকাতার হাঁ-করা মুখবিবরে আবার প্রবেশ করলাম। কিন্তু সঙ্গে নিয়ে এলাম মধুমাখা স্মৃতির পসরা। যা ওয়ার্ডসওয়ার্থের ভাষায় 'Bliss of solitude-এর মতো কাজ করবে।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—প্রথম সমুদ্র দেখার আনন্দ।

ছাত্রজীবনে নিয়মানুবর্তিতা

[ভূমিকা—জীবনের নানা অঙ্গনে শুধু নিয়ম আর নিয়ম—নিয়ম কথাটির তাৎপর্য—ছাত্রজীবনে নিয়মানুবর্তিতা—উপসংহার।]

ভূমিকা

আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ—
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান—
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার প্রাণ।

সূর্য তারা নিয়ে এই যে বিপুল বিশ্ব, তার দিকে চেয়ে চেয়ে আমাদের বিস্ময়ের অন্ত

নেই। এই বিপুল বিশ্বসৃষ্টিকে ধারণ করে আছে নিয়মরূপ একটি বৃন্ত। মানব-জীবনের বিধৃতিও এই নিয়মবন্ধনে। গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে যে-জ্যোতির্লোক সেখানে মুহূর্তের বিচ্যুতি যেমন মহাপ্রলয় ঘটিয়ে তুলবে, নিয়মানুবর্তী না হলে মানব-জীবনেও ঘটবে মহতী বিনষ্টি।

জীবনের নানা অঙ্গনে শুধু নিয়ম আর নিয়ম

আমাদের জীবনের নানা অঙ্গনে নিয়মের রাজত্ব। শিল্প-কলাতেও এই নিয়মবদ্ধতা। গাণিতিক নিয়ম শুধু পুঁথির পাতায় নয়, সর্বক্ষেত্রে। একটু ছন্দঃপতন হলেই আর রক্ষে নেই। একটু তাল কাটলেই সর্বনাশ —নন্দনলোক থেকে নির্বাসন।

নিয়ম কথাটির তাৎপর্য

নিয়ম কথাটির মূলে আছে 'যম্' ধাতু, যার অর্থ হল রাশটানা, নিয়ন্ত্রণ বা সংযম। 'সৃজ্' ধাতুর মানে সৃষ্টি করা। কিন্তু এই 'সৃজ্' ধাতুর সঙ্গে 'যম্' ধাতুর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। সমস্ত সৃষ্টি নিয়ম মেনেই চলে ; এ নিয়ম শৃঙ্খল নয়, শৃঙ্খলা। তাই তাকে ভয় করা ভুল।

ছাত্রজীবনে নিয়মানুবর্তিতা

ছাত্রেরা যৌবনের দূত। তারা চঞ্চল। বেড়া ভাঙে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বেড়া ভাঙা মানে নিয়ম-ভাঙা নয়। নিয়মের নামে যে অনিয়ম তাই হল বেড়া বা বাধা।

দূরে তাকিও নাকো
ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো
চলো সমান পথে
চলো নিয়ম মতে।

এমন উপদেশ ছাত্রদের জন্যে নয়। এ হল তাসের দেশের শুক্‌নো নিয়ম। তাসের দেশ হল নিয়মের নামে কুসংস্কারের জড়তা। রাজপুত্র আর সদাগর পুত্র সেই শুক্‌নো নিয়ম ভেঙে দিল তাসের দেশে এসে।

এদের মতোই ছাত্রেরা সমস্ত জড়তার বেড়া ভেঙে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু নিয়ম তাদের মানতেই হবে। নিজেকে গড়ে তুলতে হলে তাদের নিয়মের বন্ধু-হাত ধরতেই হবে। তাদের বহু পড়তে হবে, বহু দেখতে হবে, বহুজনের কথা ভাবতে হবে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় এগিয়ে যেতে হবে। তাদের হতে হবে, এক-একটি বড়ো শক্তি। এই শক্তির মূল কথাও নিয়ম। গৃহে হোক, বিদ্যালয়ে হোক, খেলার মাঠে হোক, কঠোর ভাবে তাদের নিয়ম মানতে হবে। সেখানে কোনো ফাঁকি থাকলে জীবনের অঙ্ক কোনো দিনই মিলবে না। বিদ্যালয়ের অঙ্গনে যে নিয়ম না মেনে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে, সে কিন্তু তার পায়ে শৃঙ্খল পরবে। খেলার মাঠে যে খেলার বিচারকে আঘাত করবে সে নিজের ভবিষ্যৎকেই আঘাত হানবে।

উপসংহার

যারা অধ্যেতা, অধ্যয়ন যাদের তপস্যা তাদের নিজের জীবন-সাধনাকে তপস্যার মতোই দেখতে হবে। তপস্বীর নিয়মপূত গম্ভীর মূর্তি মনের মধ্যে রেখে ছাত্ররা যেন সমস্বরে বলতে পারে—

'তেজস্বি নাবধীতমস্তু'

—আমাদের অধ্যয়ন হোক তেজোময়।

এই তেজ কথাটির মধ্যে শক্তি ও দীপ্তি দুটি অর্থই বিবৃত। অধ্যয়ন এই শক্তি ও দৃপ্তি ছড়িয়ে চলবে দেশময়। অধ্যয়নলব্ধ এই গুণের উৎস নিয়ম ও সংযম।

চিন্তাসহায়ক বাণী

Order is power—H. F. Amiel
(1821-81), Swiss poet

Good order is the foundation of all good things.—
Edmund Burke (1729-79),
British Statesman and orator.

Order is heaven's first law.
—Alexander Pope (1688-1744)
English poet.

বড়ো হয়ে কী হতে চাই

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

[ভূমিকা—প্রেরণা—প্রস্তুতি—উপসংহার।]

ভূমিকা

না, আমি তো আর ছোটো নই। উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র আমি, বড়ো বই কি! তবু আরও বড়ো হব, অনেক দায়িত্ব পড়বে কাঁধে। অনেক পথ, যাত্রা সবে শুরু। ভাবতে কেমন রোমাঞ্চ লাগে। কল্পনায় দেখি কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে হয়তো বা কোনো পুরনো মাস্টারমশাই সস্নেহে চিবুক ধরে বললেন—কী নাম? মনে তো নাই। প্রণাম করে নাম বলছি আমি। তার পরের প্রশ্ন নিশ্চয়—কী করছিস এখন? তাই তো, কী বলব? কী করতে চাই আমি? চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদী। তবু চাই—হ্যাঁ, মন বুঝেই বলছি, শিক্ষক হতে চাই।

প্রেরণা

কিন্তু কেন? শিক্ষক হবার প্রেরণা পেলাম কোথা থেকে? এই প্রশ্নের উত্তরে চলে যেতে হয় শৈশবের এক সোনালি দুপুরে। অনাদিবাবু বললেন, না রে, ক্লাসের চার দেয়ালের বাধা ভালো লাগছে না। চল্‌, যাই সবাই মিলে বসি গিয়ে সবুজ গালিচায়। কী আনন্দ আমাদের! অনাদিবাবু আমাদের নিয়ে স্কুলের মাঠের এক কোণে বসে গেলেন, একটা জামরুল গাছের নিচে। আলোছায়ার খেলা চলছিল সেখানে। গল্পটা বলতে লাগলেন অনাদিবাবু। পাঠ্য বইকে ছাপিয়ে গেল তাঁর জীবনকথা। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম তাঁর কথা। পরে জেনেছিলাম—ব্যাপারটা সৃষ্টিছাড়া বলে মনে করা হয়েছিল।

নেই। এই বিপুল বিশ্বসৃষ্টিকে ধারণ করে আছে নিয়মরূপ একটি বৃন্ত। মানব-জীবনের বিধৃতিও এই নিয়মবন্ধনে। গ্রহ-নক্ষত্র নিয়ে যে-জ্যোতির্লোক সেখানে মুহূর্তের বিচ্যুতি যেমন মহাপ্রলয় ঘটিয়ে তুলবে, নিয়মানুবর্তী না হলে মানব-জীবনেও ঘটবে মহতী বিনষ্টি।

আমাদের জীবনের নানা অঙ্গনে নিয়মের রাজত্ব। শিল্প-কলাতেও এই নিয়মবদ্ধতা।

জীবনের নানা অঙ্গনে শুধু নিয়ম আর নিয়ম

গাণিতিক নিয়ম শুধু পুঁথির পাতায় নয়, সর্বক্ষেত্রে। একটু ছন্দঃপতন হলেই আর রক্ষে নেই। একটু তাল কাটলেই সর্বনাশ—নন্দনলোক থেকে নির্বাসন।

নিয়ম কথাটির মূলে আছে 'যম্' ধাতু, যার অর্থ হল রাশটানা, নিয়ন্ত্রণ বা সংযম।

নিয়ম কথাটির তাৎপর্য

'সৃজ্' ধাতুর মানে সৃষ্টি করা। কিন্তু এই 'সৃজ্' ধাতুর সঙ্গে 'যম্' ধাতুর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। সমস্ত সৃষ্টি নিয়ম মেনেই চলে ; এ নিয়ম শৃঙ্খল নয়, শৃঙ্খলা। তাই তাকে ভয় করা ভুল।

ছাত্রেরা যৌবনের দূত। তারা চঞ্চল। বেড়া ভাঙে। কিন্তু মনে রাখতে হবে,

ছাত্রজীবনে নিয়মানুবর্তিতা

বেড়া ভাঙা মানে নিয়ম-ভাঙা নয়। নিয়মের নামে যে অনিয়ম তাই হল বেড়া বা বাধা।

দূরে তাকিও নাকো
ঘাড় বাঁকিয়ো নাকো
চলো সমান পথে
চলো নিয়ম মতে।

এমন উপদেশ ছাত্রদের জন্যে নয়। এ হল তাসের দেশের শুক্‌নো নিয়ম। তাসের দেশ হল নিয়মের নামে কুসংস্কারের জড়তা। রাজপুত্র আর সদাগর পুত্র সেই শুক্‌নো নিয়ম ভেঙে দিল তাসের দেশে এসে।

এদের মতোই ছাত্রেরা সমস্ত জড়তার বেড়া ভেঙে উদ্দাম গতিতে ছুটে চলুক, ক্ষতি নেই, কিন্তু নিয়ম তাদের মানতেই হবে। নিজেকে গড়ে তুলতে হলে তাদের নিয়মের বন্ধু-হাত ধরতেই হবে। তাদের বহু পড়তে হবে, বহু দেখতে হবে, বহুজনের কথা ভাবতে হবে, ঝড়ে ঝঞ্ঝায় এগিয়ে যেতে হবে। তাদের হতে হবে, এক-একটি বড়ো শক্তি। এই শক্তির মূল কথাও নিয়ম। গৃহে হোক, বিদ্যালয়ে হোক, খেলার মাঠে হোক, কঠোর ভাবে তাদের নিয়ম মানতে হবে। সেখানে কোনো ফাঁকি থাকলে জীবনের অঙ্ক কোনো দিনই মিলবে না। বিদ্যালয়ের অঙ্গনে যে নিয়ম না মেনে শৃঙ্খলা ভঙ্গ করবে, সে কিন্তু তার পায়ে শৃঙ্খল পরবে। খেলার মাঠে যে খেলার বিচারকে আঘাত করবে সে নিজের ভবিষ্যৎকেই আঘাত হানবে।

যারা অধ্যেতা, অধ্যয়ন যাদের তপস্যা তাদের নিজের জীবন-সাধনাকে তপস্যার মতোই

উপসংহার

দেখতে হবে। তপস্বীর নিয়মপূত গম্ভীর মূর্তি মনের মধ্যে রেখে ছাত্ররা যেন সমস্বরে বলতে পারে—

'তেজস্বি নাবধীতমস্তু'

—আমাদের অধ্যয়ন হোক তেজোময়।

এই তেজ কথাটির মধ্যে শক্তি ও দীপ্তি দুটি অর্থই বিবৃত। অধ্যয়ন এই শক্তি ও দৃপ্তি ছড়িয়ে চলবে দেশময়। অধ্যয়নলব্ধ এই গুণের উৎস নিয়ম ও সংযম।

চিন্তাসহায়ক বাণী

Order is power—H. F. Amiel
(1821-81), Swiss poet

Good order is the foundation of all good things.—
Edmund Burke (1729-79),
British Statesman and orator.

Order is heaven's first law.
—Alexander Pope (1688-1744)
English poet.

বড়ো হয়ে কী হতে চাই

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

[ভূমিকা—প্রেরণা—প্রস্তুতি—উপসংহার।]

ভূমিকা

না, আমি তো আর ছোটো নই। উচ্চ মাধ্যমিকের ছাত্র আমি, বড়ো বই কি! তবু আরও বড়ো হব, অনেক দায়িত্ব পড়বে কাঁধে। অনেক পথ, যাত্রা সবে শুরু। ভাবতে কেমন রোমাঞ্চ লাগে। কল্পনায় দেখি কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাথে হয়তো বা কোনো পুরনো মাস্টারমশাই সস্নেহে চিবুক ধরে বললেন—কী নাম? মনে তো নাই। প্রণাম করে নাম বল্‌ছি আমি। তার পরের প্রশ্ন নিশ্চয়—কী করছিস এখন? তাই তো, কী বলব? কী করতে চাই আমি? চাওয়া আর পাওয়ার মধ্যে সাত সমুদ্র তেরো নদী। তবু চাই—হ্যাঁ, মন বুঝেই বলছি, শিক্ষক হতে চাই।

প্রেরণা

কিন্তু কেন? শিক্ষক হবার প্রেরণা পেলাম কোথা থেকে? এই প্রশ্নের উত্তরে চলে যেতে হয় শৈশবের এক সোনালি দুপুরে। অনাদিবাবু বললেন, না রে, ক্লাসের চার দেয়ালের বাধা ভালো লাগছে না। চল্‌, যাই সবাই মিলে বসি গিয়ে সবুজ গালিচায়। কী আনন্দ আমাদের! অনাদিবাবু আমাদের নিয়ে স্কুলের মাঠের এক কোণে বসে গেলেন, একটা জামরুল গাছের নিচে। আলোছায়ার খেলা চলছিল সেখানে। গল্পটা বলতে লাগলেন অনাদিবাবু। পাঠ্য বইকে ছাপিয়ে গেল তাঁর জীবনকথা। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনলাম তাঁর কথা। পরে জেনেছিলাম—ব্যাপারটা সৃষ্টিছাড়া বলে মনে করা হয়েছিল।

সেই অনাদিবাবু ছোট্ট আমার মনে গভীর রেখাপাত করেছিলেন। তখুনি মনে মনে বললাম—বড়ো হয়ে শিক্ষক হব। অনাদিবাবুর মতো অনেক পড়ব, অনেক জানব, ছাত্রদের অমনি করে ভালোবাসব।

জানি, ভাবাটা যত সহজ করাটা তত নয়। শিক্ষক হতে গেলে ভালো ছাত্র হতেই হবে, পাঠ্যের গণ্ডি ছাড়িয়ে চঞ্চল হতে হবে সুদূরের আহ্বানে। তাতে শ্রম আছে, কিন্তু আছে রোমাঞ্চ। সেই রোমাঞ্চকর জগতে প্রবেশের জন্যে সচেষ্ট হই। ছোটোদের বোঝবার চেষ্টা করি। ছোটোদের মন এক অনন্ত রহস্য। এইটুকু বুঝেছি তাদের ফাঁকি দেওয়া যায় না। তাদের জন্যে যে শ্রমের প্রয়োজন তার সঙ্গে তপস্যারই তুলনা করা চলে। রবীন্দ্রনাথ আশ্রমের অধ্যয়ন পরিকল্পনায় শিক্ষকদের সাধকরূপই দেখতে চেয়েছিলেন। পেয়েছিলেনও সতীশ সেন, জগদানন্দ রায়, মোহিতচন্দ্র সেনের মতো শিক্ষক। সেই সাধনাকেই বরণ করে নিতে মন চায়। শিক্ষাবিজ্ঞানের ভালো ভালো বই পড়ছি, জানার পরিধিকে যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে নিতে চেষ্টা করছি। শিক্ষক হবার স্বপ্ন তো দেখছি কিন্তু জানি না ভাগ্যে কী আছে। আমার এক বন্ধুর দাদা তো ব্রিলিয়ান্ট স্কলার। শিক্ষকতাই করতে চান। আবেদন করেছেন প্রচুর। কিন্তু কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজ তো পান নি, সবাই 'অভিজ্ঞ শিক্ষক' চান, কাজের সুযোগ না পেলে 'অভিজ্ঞ' হওয়া যাবে কী করে—সে প্রশ্ন চাপা পড়েই থাকে। তা ছাড়া শুধু পাঁচ বছর কি সাতবছর শিক্ষকতা করলেই কি আদর্শ শিক্ষক হওয়া যায়। শিক্ষকতা যাঁদের কাছে বৃত্তিমাত্র, আর কিছু নয়, এমন শিক্ষক কি নেই? যাই হোক এসব প্রশ্ন তোলা হয় তো আমার উচিত হবে না, আমাকে স্থির সিদ্ধান্তের দিকে এগোতে হবে। কিন্তু ভয় হয়, যে কাজ চাই, যোগ্যতা অর্জন করেও তা পাব তো? উদ্দীপনার আলোকে ম্লান করে দেয় হতাশার ছায়া।

প্রস্তুতি

তবু ভেঙে পড়ি না, আশায় বুক বাঁধি। স্বপ্ন দেখি, অনাদিবাবুর মতো আমিও একদিন ছাত্রদের নিয়ে আনন্দলোক রচনা করেছি, তাদের ভালোবাসায় শ্রদ্ধায় আমি জীবনকে ধন্য করতে পেরেছি।

উপসংহার

চিন্তাসহায়ক বাণী

Have a purpose in the life, and having it throw into your work such strength of mind and muscle as God has given you.

—Thomas Carlyle (1795-1881), Scottish essayist and historian.

ছাত্রজীবনে শিষ্টাচার ও সৌজন্য

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

[ভূমিকা—শিষ্টাচার কী—ছাত্রজীবনে শিষ্টাচার—জীবনে শিষ্টাচারের প্রয়োজনীয়তা—শিষ্টাচার শিক্ষা—উপসংহার।]

ভূমিকা

কয়েকজন মানুষ থাকেন যাঁদের মুখোমুখি হওয়ার অর্থ এক প্রসন্ন অনুভূতি। কিছু নয়, হয়তো সামান্য দু'একটি বাক্য-বিনিময়, কখনও হয়তো তাও নয়, শুধুমাত্র উজ্জ্বল প্রসন্ন স্মিত দৃষ্টি-বিনিময়,—অথচ তাতেই হৃদয় ভরে ওঠে এক অনাবিল আনন্দে। যে জাদু তা সম্ভব করে তারই নাম শিষ্টাচার ও সৌজন্য।

শিষ্টাচার কী

মানুষের মনের যে-সব বোধ বা অনুভূতি জীবনকে সুন্দর করে—তারই প্রকাশ এই শিষ্টাচার ও সৌজন্য। এর মূলে থাকে মানুষের প্রতি মর্যাদাবোধ ও সহানুভূতি। শিষ্টাচার আসলে একটি অপরিহার্য মানবধর্ম। যে-বিবেক (rationality) মানুষকে পশু থেকে পৃথক করেছে সেই বিবেক-জাত আচরণই শিষ্টাচার।

ছাত্রজীবনে শিষ্টাচার

ছাত্রজীবনে মানুষের সব কিছুই গড়ে ওঠে। অবশ্য এক অর্থে মানুষ আজীবন ছাত্র,—তবু বিদ্যালয়-জীবনে লব্ধ শিক্ষার মূল প্রোথিত হয় অনেক গভীরে। তাই মানুষের প্রতি এবং জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠারও যথার্থ সময় এই ছাত্রজীবন। শিষ্টাচার ও সৌজন্য এই সময়ই আয়ত্ত করা দরকার। আর যেহেতু শিষ্টাচারের মূল মর্যাদাবোধে, শ্রদ্ধায় ও সহানুভূতিতে,—সে:কারণে শিক্ষালাভের পরম সহায়ক এই শিষ্টাচার। ছাত্রজীবন বিদ্যা ও সদ্‌গুণ আহরণের সময়। এই বিদ্যার পরিণাম বিনয়ে আর সমস্ত সদ্‌গুণ যে গুণটির অভাবে বৃথা তাহল বিনয় বা সৌজন্য। বলা যেতে পারে, 'বিনা তেন ন শোভন্তে সংখ্যাঙ্কেষি বিন্দবঃ।' উক্তিটির তাৎপর্য হল পূর্বে সংখ্যা ছাড়া বিন্দুরা অর্থহীন। তেমনি বিনয় বা সৌজন্যগুণ ছাড়া অন্যান্য গুণও মর্যাদাহীন।

জীবনে শিষ্টাচারের প্রয়োজনীয়তা

সৌহার্দ্য জগৎ-সংসারকে সুন্দর করে, দীর্ঘায়ু করে,—আর শিষ্টাচার এই সৌহার্দ্যের মূল। জীবনের বিষময় ফলগুলো, অর্থাৎ ঈর্ষা, বিদ্বেষ, হিংসা উৎপাটিত হয় সৌজন্যের দ্বারা। অতএব আধুনিক জীবনে, যে-জীবনে মানুষের আবেগ ক্রমাগত স্তিমিত হয়ে যাচ্ছে, যে-জীবনে মানুষের মুখ কেবলই জলে প্রতিফলিত ছায়ার মতো যথার্থ আকার হারিয়ে ফেলে,—সে জীবনে শিষ্টাচার ও সৌজন্যের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব অপরিসীম। সামান্য একটা আচরণ, কুশল প্রশ্ন আমাদের 'গভীর, গভীরতর অসুখ'কে নিরাময় করে দিতে পারে। মধুবিক্রেতার গল্পটি আমাদের সমাজজীবনে বিশেষ মূল্যবান। দুই মধুবিক্রেতার মধ্যে একজন যে বহু ক্রেতা টানতে পেরেছিল তার কারণ তার শিষ্টাচার।

শিষ্টাচার শিক্ষা বই পড়ে আসে না। আসে হৃদয়বৃত্তি থেকে, আর আসে শিষ্টাচারী

ব্যক্তির আচরণ দেখে। শিক্ষার সঙ্গে অভ্যাসের সম্পর্ক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। শিষ্টাচারের অভ্যাসের মধ্যে দিয়েই তা স্বভাবে দাঁড়াতে পারে। আর সেই স্বভাব হয়ে উঠতে পারে চরিত্র।

শিষ্টাচার শিক্ষা

মানুষের সমস্ত উদ্যম ও প্রচেষ্টার মূল উদ্দেশ্য যদি হয় জীবনকে সুন্দর করে তোলা, তা হলে শিষ্টাচার-সৌজন্যই সব প্রচেষ্টার সারাৎসার। কারণ শিষ্টাচার যে বেঁচে থাকাকে মধুরতর করে একথা প্রত্যক্ষ বাস্তব। আমাদের মন্ত্র হোক—মধু মনিষ্যে, মধু জনিষ্যে, মধু বক্ষ্যামি, মধু বদিষ্যামি—আমি মধুর বিষয়ে চিন্তা করব, মধুর ভাব সৃষ্টি করব, মধুর বিষয় বহন করব, মধুর কথা বলব।

উপসংহার

চিন্তাসহায়ক বাণী

Courtesy is a Science of the highest importance.—Montaigue (1533-1592), French essayist.

Manners easily and rapidly mature into morals
—Horace Mann (1796-1859), American thinker.

তোমার প্রিয় বই

[উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮৩]

[সূচনা—স্বাধীনতা-আন্দোলনে এর প্রভাব—কাহিনী—'পথের দাবী' উপন্যাসের সামাজিক দিক —'পথের দাবী'র ভালোলাগা চরিত্র—কেন ভালো লাগে—উপসংহার।]

বই হল মানুষের বন্ধু। আর প্রিয় বই তো আমাদের প্রিয় বন্ধুর মতো। প্রিয় বন্ধুকে আমরা কোনোদিন ভুলতে পারি না, তেমনি ভুলি না জীবনে ভালোলাগা বইয়ের কথা। আমার প্রিয় বই হল, অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের লেখা 'পথের দাবী'। অসংখ্য বইয়ের ভিড়ে হারিয়ে যাবে আমার পড়া কত বই, কিন্তু 'পথের দাবী' আমার মনের আকাশে এক উজ্জ্বল তারকা যার স্মৃতি কোনো দিন ম্লান হবে না।

সূচনা

'পথের দাবী' ঠিক আর পাঁচটা উপন্যাসের মতো নয়। 'পথের দাবী' হল ভারতীয় স্বাধীনতা-আন্দোলনের গীতা। এদিক থেকে বিচার করলে 'পথের দাবী'কে গর্কির 'মাদার' উপন্যাসের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাই অগ্নিকরা এই উপন্যাসটিকে রবীন্দ্রনাথ 'উত্তেজক' বলে অভিহিত করেছেন। এখানে কিঞ্চিৎ সামাজিক সমস্যার উল্লেখ থাকলেও 'পথের দাবী' নিঃসন্দেহে রাজনৈতিক বিপ্লবের উপন্যাস। রাজনৈতিক বিপ্লবের উপন্যাস

হলেও এর মূল বিষয় বিপ্লব-প্রচার নয়। পরাধীন ভারতের অন্ধকারাচ্ছন্ন দিনগুলিতে স্বাধীনতাকামী মানুষের কিছু কিছু স্বপ্নকে এখানে চিত্রায়িত করবার চেষ্টা হয়েছে। 'পথের দাবী'র কার্যকলাপ পাঠকদের মনকে নিয়ে যায় সেখানে যেখানে বাতাসে ভেসে আসে বারুদের গন্ধ, গায়ে লাগে আগুনের তাপ। 'পথের দাবী' উপন্যাসের সর্বত্র শরৎচন্দ্রের রাজনৈতিক ভাব-ধারার প্রতিফলন ঘটেছে যদিও ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের চেয়ে ইংরেজ-বিদ্বেষ অনেকটা স্থান অধিকার করে আছে, তবু 'পথের দাবী'র মূল রসধারা যে শরৎচন্দ্রের নিখাদ দেশপ্রেম তাতে সন্দেহ নেই।

স্বাধীনতা-আন্দোলনে এর প্রভাব

এই উপন্যাসের শুরুতে আমরা লক্ষ্য করি, আচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ অপূর্ব চাকরি নিয়ে এল বর্মায়। সেখানে প্রথমে ভারতীদের পরিবারের সঙ্গে তার বিরোধ ঘটে। পরে অবশ্য এই ভারতীই হয়ে দাঁড়াল প্রবাসী দুর্বল অকর্মণ্য অপূর্বর একমাত্র ভরসাস্থল। ভারতী তাকে নিয়ে যায় তাদের 'পথের দাবী' সমিতিতে; সেখানেই অপূর্ব চিনতে পারে সব্যসাচীকে। এই সব্যসাচীকেই সে পূর্বে দেখেছে পুলিশের চোখে ধুলো দিতে। এখানেই উপন্যাসে দুটি কাহিনী পাশাপাশি বর্ধিত হয়েছে। একদিকে সব্যসাচীর কর্মকাণ্ড, অন্যদিকে ভারতী-অপূর্বর ব্যক্তিগত জীবনের সমস্যা সমাধান। দুটি ঘটনা এ:কে অন্যের পরিপূরক। উপন্যাসের অন্তিমলগ্নে সব্যসাচী বর্মার আস্তানা পরিত্যাগ করে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করেন। সবাইকে চোখের জলে ভাসিয়ে অপরিচিত অগ্নিময় পথেই তার যাত্রা শুরু হল এক নতুন পথের উদ্দেশ্যে। এই উপন্যাসের শেষে লেখকের মতো আমারও সব্যসাচীর উদ্দেশ্যে বলতে ইচ্ছে করে—"তুমি তো আমাদের মতো সোজা মানুষ নও, তুমি দেশের জন্যে সব দিয়াছ, তাই তো দেশের খেয়াতরী তোমাকে বইতে পারে না, সাঁতার দিয়া তোমাকে পার হইতে হয়। তাই তো দেশের রাজপথ তোমার কাছে রুদ্ধ, দুর্গম পাহাড়-পর্বত তোমাকে ডিঙাইয়া চলিতে হয়। কোন্ বিস্মৃত অতীতে তোমারই জন্য প্রথম শৃঙ্খল রচিত হইয়াছিল, কারাগার তো শুধু তোমাকে মনে করিয়াই প্রথম নির্মিত হইয়াছিল—সেই তো তোমার গৌরব।"

কাহিনী

'পথের দাবী' উপন্যাসে বিপ্লবী কার্যকলাপ এবং রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ডের পাশাপাশি চলেছে গল্পের সামাজিক দিক। এখানে শরৎচন্দ্র সমাজের লজ্জিত অপমানিত নারীর ভালবাসার মর্যাদা দিয়েছেন। 'পথের দাবী'তেই আমরা দেখি যে নারী দেশের কাজ করবার জন্যে তার স্বামীকেও পরিত্যাগ করে এসেছেন। কিন্তু সমাজের মানুষ সতীত্বের দোহাই দিয়ে তাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছে, কিন্তু লেখকের কাছে তথাকথিত সতীত্ব কোন মূল্য পায় নি।

'পথের দাবী' উপন্যাসের সামাজিক দিক

'পথের দাবী'তে অপূর্ব ও ভারতী প্রধান চরিত্র হলেও সবচেয়ে আকর্ষণীয় চরিত্র হল ডাক্তার অর্থাৎ সব্যসাচী। এই চরিত্রটির মধ্যে লেখকের দেশপ্রেম ও বৈপ্লবিক ভাবের প্রকাশ ঘটেছে। সব্যসাচী যেন কুয়াশায় ঘেরা এক ছায়াময় রাজ্যের মানুষ।

অসম্ভব মানসিক ও শারীরিক শক্তি নিয়ে তিনি যখন পাঠকের সামনে এসে দাঁড়ালেন তখন ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রাম যেন অন্ধকারে আলোর সন্ধান পেল। এই অসাধারণ চরিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে আমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকি। দেখি তার দৃঢ়তা, দীপ্তির ছটা, প্রশান্তির মাধুর্য, কোমলতার মায়াময় অভিব্যক্তি। সব্যসাচীর কথা মনে পড়লেই আমি যেন চোখের সামনে দেখতে পাই নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে। সুভাষচন্দ্রই যেন সব্যসাচীর বাস্তব সংস্করণ। তাই আমার চেতনায় সুভাষচন্দ্র ও সব্যসাচী দুই এক হয়ে মিশে গেছে।

'পথের দাবী'র ভালোলাগা চরিত্র

'পথের দাবী' আমার প্রিয় বই। বহুবিতর্কিত এই উপন্যাস সত্যই শরৎসাহিত্য-ভাণ্ডারের এক অপূর্ব রত্ন। এই উপন্যাস পড়ার সময়ে চোখের সামনে উন্মোচিত হয় বিগতদিনের কুসংস্কারাচ্ছন্ন পরাধীন হিন্দু জাতির এক বেদনাময় জীবনের ছবি। যে ছবি ফুটে ওঠে অপূর্ব-ভারতীর কাহিনীর মাধ্যমে। আবার সব্যসাচীর কথায় নেচে ওঠে বুকের রক্ত, শুনতে পাই দেশের কান্না, পরাধীনতার ব্যথা আর অক্ষমের ক্ষোভ। এখানেই শরৎচন্দ্র ঘোষণা করেছেন যে, জীবনে চলার পথের সমস্ত বাধা-নিষেধ চূর্ণবিচূর্ণ করতে হবে মানুষকেই। পরে যারা আসবে আমাদের উত্তরপুরুষ তারা যেন নিরুপদ্রবে পথ চলতে পারে। তাদের চলার গতি সহস্র বাধার বিন্ধ্যাচলে যেন রুদ্ধ না হয়। 'পথের দাবী' আমার মনে সৃষ্টি করে এমন এক দুঃখময় আনন্দের দ্যোতনা যে পড়া শেষ করে উপন্যাসের ভারতীর মত আমিও নিস্পন্দ নির্বাক হয়ে অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভাবি, এর পর? এই পথের দাবী শেষ হবে কোথায় ও কেমন করে!

কেন ভালো লাগে

'পথের দাবী' পড়ার সময়ে বারবার মনে পড়ে সেই সব বীর শহীদের কথা যাঁরা কারাগারে বসেও একদিন গোপনে পড়তেন 'পথের দাবী'। কারণ 'পথের দাবী' তাঁদের কাছে ছিল দেশপ্রেমের গীতা। ভারতীয় শহীদদের কথা যেমন আমরা ভুলব না, তেমনি কোনোদিন ভুলতে পারব না শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী'কে।

উপসংহার

মানবিকী শাখা কেন বেছে নিলাম

[ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮৩]

[ভূমিকা—কেন বেছে নিলাম—জানার আগ্রহে—ভবিষ্যতের জন্য—অন্য শাখার সঙ্গে সম্বন্ধ—উপসংহার।]

"এ কিরে, তুই শেষকালে Humanities নিলি?"—বন্ধুদের বিস্মিত প্রশ্ন। বিস্মিত হবারই কথা, কারণ প্রথম বিভাগে পাশ করে আমি অনায়াসে বিজ্ঞান-শাখায় যেতে পারতাম। কিন্তু অন্য শাখাতে যাবার যোগ্যতা থাকতেও কেন আমি এই অবহেলিত শাখায় এলাম বলছি।

ভূমিকা

কেন বেছে নিলাম

আপনারা হয়তো ভাবছেন আমার পরিবারের আত্মীয়স্বজন নিশ্চয়ই এই শাখায় কৃতিত্ব দেখিয়ে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তাঁদেরই প্রভাব পড়েছে আমার উপর। মোটেই তা নয়। আমার বাবা-কাকারা সবাই বিজ্ঞানের ছাত্র। তাঁরা এঞ্জিনিয়ার। আমার বড়দা ডাক্তার। আমি ইঞ্জিনিয়ার বা ডাক্তারের বৃত্তিকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চোখে দেখি। কিন্তু আমার মনটা আমারই, মানবিকী বিদ্যাচর্চার রসটা আমি কী করে পেলাম জানি না। ভবিষ্যৎকে আমি এই বিদ্যার সাহায্যেই গড়ে তুলব। আমার ভাগ্য ভালো আমার অভিভাবকেরা আমার ইচ্ছেয় বাধা দেন নি। এজন্যে আমি এঁদের কাছে কৃতজ্ঞ।

জানার আগ্রহ

সবাই বিজ্ঞান-বিজ্ঞান করে অজ্ঞান। মানবিকী বিদ্যা যেন বিদ্যাই নয় অবিদ্যা—এই ধারণাই সকলের মনে। আশ্চর্য! হুজুগে মানুষ বোধ হয় অন্ধ হয়। যার বিজ্ঞান পড়বার কোনো যোগ্যতাই নেই সেও হুমড়ি খেয়ে পড়ে বিজ্ঞান-শাখার দুয়ারে। আসলে সবাই উপার্জনের দিকটা দেখেই বিদ্যার্জনের ধারাটি ঠিক করে। কিন্তু আমার কি উপার্জনের ইচ্ছা নেই বা সমাজে প্রতিষ্ঠিত হবার বাসনা নেই? আমি কি বনবাসী হব? মোটেই না। আমি বিশ্বাস করি মানবিক শাখায় যদি আমি ভালো ফল করতে পারি তাহলে আমি উচ্চতর বিদ্যায় এই শাখারই কোনো একটি বিষয় নিয়ে এগিয়ে যেতে পারব। আমার ইচ্ছে উচ্চতর বিদ্যায় ইতিহাস হবে আমার বিষয়। মানুষের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে জানার চেয়ে জানবার আর কী আছে? ইতিহাস আমাদের সেই সুযোগ দেয়। আমার ইচ্ছে আমি ইতিহাসের উপাদান নিয়ে ভবিষ্যতে গবেষণা করব।

ভবিষ্যতের জন্য

ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়েই যে শুধু ভবিষ্যৎ গড়া যায় তা নয়, বর্তমানকে কর্মনিষ্ঠা আর আন্তরিকতায় ভরে তুলতে পারলেই ভবিষ্যৎ আপনা থেকে গড়ে ওঠে। এই বিশ্বাসই আমাকে বল দেবে। বাবা স্বল্পভাষী তবে এই একটি কথাই বলতেন—আত্মবিশ্বাসই বল।

বলা বাহুল্য, মানবিক শাখা নিয়ে সংগ্রামটা খুব কঠিনই হবে। তবে সে সংগ্রামে আমি ভীত নই। সংগ্রামের জন্যে যে-প্রস্তুতি দরকার তা আমি নেবই।

অন্য শাখার সঙ্গে সম্বন্ধ

এখন উচ্চ মাধ্যমিকে ইংরেজী বাংলা ছাড়া আমার বিষয়গুলি হল—ইতিহাস, পলিটিকাল সায়েন্স এবং অর্থনীতি। এই তিনটি বিষয় পরস্পর সম্পর্কিত। আমি জানি ইতিহাস ভালো করে জানতে হলে পরের দুটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি। চতুর্থ বিষয় নিয়েছি সাইকোলজি। এ বিষয়টাও আমার অত্যন্ত প্রিয়। মনস্তত্ত্ব কোথায় না প্রযোজ্য? ইতিহাসে একটা জাতির মানসিকতা না জানলে তার কর্মধারাকে বোঝা যায় না। মনস্তত্ত্ব এখানেও কাজে লাগে। চারটি বিষয়ই পরস্পর গ্রথিত বলে অধ্যয়নে আমি প্রচুর উৎসাহ পাব এবং পরস্পরের সম্পর্ক লক্ষ্য করে চলব।

উপসংহার

প্রার্থনা করি আমার বন্ধুরা বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় সফল হোক, সেই সঙ্গে এও প্রার্থনা করি তাদের পাশে যেন আমিও বড়োমুখ নিয়ে দাঁড়াতে পারি।

তুমি কেন বিজ্ঞান-শাখার ছাত্র হয়েছ

[ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮৩]

[ভূমিকা—কেন বেছে নিলাম—বিজ্ঞানের অশুভ ফল—আমার উৎসর্গ—রোগ নিরাময়ে বিজ্ঞান—উপসংহার।]

ভূমিকা

আধুনিক সভ্যতায় মানুষ যে পথে চলেছে তা হ'ল বিজ্ঞানের পথ। বিজ্ঞানের বুকেই প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ-চেতনা। বর্তমান পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার চাহিদা যখন ক্রমবর্ধিষ্ণু, অন্যদিকে খনির অন্ধকারে যখন পৃথিবীর খনিজ-সম্ভার কঠিন ঘুমে অচেতন, মানুষের প্রায়োপবেশনের উদ্দেশ্যে কৃষিভূমি যখন পাষাণী অহল্যার মতো অভিশপ্তা, মানুষের শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যখন সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাবে নিম্নমুখী, তখনই মানুষের প্রয়োজন হল এমন এক শক্তির যা তাদের পৌঁছে দেবে জীবন-পথের শীর্ষচূড়ায়। মানুষের অন্তরের এই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম হয়েছে বিজ্ঞান-সাধনার।

কেন বেছে নিলাম

মানুষ যেদিন চাকা তৈরি করল সেদিন থেকেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আবর্তিত হয়ে চলল মানুষের কল্যাণের আঙিনায়। ছোটবেলা থেকেই আমরা বিজ্ঞানের অপূর্ব মহিমা প্রত্যক্ষ করে চলেছি। কেবলমাত্র যান্ত্রিক দিকেই নয়, চিকিৎসা-শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান আনছে নতুন নতুন পথের সন্ধান।

তাই আমি মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাবার জন্যে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি।

বিজ্ঞানের অশুভ ফল

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি মানবসভ্যতাকে তার পতনের শেষ সন্ধিস্থলে এনে দাঁড় করিয়েছে। রক্তাক্ত সংগ্রামের ভয়ঙ্করতা, পরমাণু-যুদ্ধের বিভীষিকা পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণে যখন মানুষের মনুষ্যত্বকে বারবার করেছে ধূলিসাৎ তখন সত্যই ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে সেখানে যেখানে কাজলের মতো কাল অন্ধকারে প্রবেশ করে নি বিজ্ঞানের আলো।

কিন্তু সবদিক থেকে ভালোভাবে বিবেচনা করলে আমরা বুঝতে পারব যে এই দোষ বিজ্ঞানের নয়। দোষ বিজ্ঞান-প্রয়োগ-পদ্ধতির। বিজ্ঞানকে মানুষ তার প্রয়োজনের হাতিয়ার করেছে। তাই বিজ্ঞান আজ এমন বিধ্বংসী রূপে আবির্ভূত হয়েছে মানুষের দ্বারে। তাই সুপথে বিজ্ঞানকে চালিত ক'রে মানব-জীবনে আনতে হবে সুদিনের আহ্বান।

আমার উৎসর্গ

এই বিজ্ঞানকেই তাই আমি করতে চাই আমার চলার সাথী। এই বিষয়ে আমার অদম্য আগ্রহ চিকিৎসা-শাস্ত্রের ক্ষেত্রে। আমার মনের আশা যে আমি ডাক্তার হয়ে মানব-জীবনের কল্যাণসাধনে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারব।

মানুষ বরাবরই অসহায়। ভয়ঙ্কর রোগ মারী-মড়ক—বিভিন্ন দিক থেকে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই মানুষের মতো অসহায় জীব হয়তো পৃথিবীতে আর কেউ নেই। মানুষের এই আকুল ক্রন্দন সর্বদা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

বহুযুগ আগে মানুষ ছিল আরও নিঃসহায়। বিভিন্ন অজ্ঞাত রোগে শত শত প্রাণ অকালেই ঝরে যেত। কলেরা, ম্যালেরিয়া, জলাতঙ্ক প্রভৃতি দুর্দমনীয় রোগের হাতে মানুষ ছিল খেলার পুতুল মাত্র, তাদের বাধাদানের শক্তিটুকু পর্যন্ত ছিল না, তাই অল্পবয়সেই আলিঙ্গন করতে হত এক দুঃসহনীয় ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আজ দক্ষতা অর্জন করেছে, বিভিন্ন রোগের হাত থেকে জগদ্‌বাসী পেয়েছে পরিত্রাণ। আজও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দ্বারা মানুষের উন্নতির সাধনা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে দেশ থেকে দেশান্তরে।

রোগ নিরাময়ে বিজ্ঞান

আমি বিজ্ঞানকে ভালবাসি। পড়াশুনার ক্ষেত্রে ভালবাসাটাই প্রধান, অন্য সব গৌণ। আর যে বিষয় মানুষের বিবেচ্য হওয়া উচিত তা হল জগতের উপকারের প্রশ্ন। আমার মতে বিজ্ঞানের এই পথেই প্রত্যক্ষভাবে মানুষের উপকারের ক্ষেত্র সব থেকে বিস্তৃত। আর মানুষের প্রতি ভালবাসাই যেখানে ভগবানের সেবার একমাত্র পথ সেখানে এই পথই আমার একমাত্র কাম্য।

দেশের উপকার, দশের উপকার। এর মধ্যেই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা। আমরা পৃথিবীতে আসি নিজের ক্ষুদ্র জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করার জন্য নয়, মানুষের সুখের সাথী হয়ে মানুষের দুর্বিষহ জীবনকে সুখকর করার জন্য, মানুষের চোখের জল মোছাবার জন্য। তাই বিজ্ঞান-সাধনার পথেই সার্থক হোক আমার জীবন-সাধনার স্বপ্ন।

উপসংহার

স্কুল-কলেজে বিতর্ক-সভা

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯-'৮১]

[সূচনা—বিতর্ক-সভা কেন—বিতর্ক-সভার উপযোগিতা—আয়োজন ও সংগঠন—সুফল—উপসংহার।]

শিক্ষা আমাদের জগৎ-সংসারকে চেনায়, গ্রহণীয়কে যুক্তির সাহায্যে গ্রহণ করতে শেখায়। আর এই শিক্ষালাভের জন্যে আমাদের সামনে সদা উন্মুক্ত রয়েছে পৃথিবীর না-পড়া বই। সেই বই পড়তে সক্ষম করে তোলে আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা। স্কুল-কলেজের শিক্ষা কেবলমাত্র ক্ষুদে ক্ষুদে ছাপার অক্ষর চিনিয়ে দেওয়ার জন্যে নয়,—প্রতিটি ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করার জন্যেই এই শিক্ষা। ছাত্রের মধ্যে যে-সম্ভাবনার বীজ আছে, তাকে অঙ্কুরিত করে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করে স্কুল-কলেজ।

সূচনা

তুমি কেন বিজ্ঞান-শাখার ছাত্র হয়েছ

[ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮৩]

[ভূমিকা—কেন বেছে নিলাম—বিজ্ঞানের অশুভ ফল—আমার উৎসর্গ—রোগ নিরাময়ে বিজ্ঞান—উপসংহার।]

ভূমিকা

আধুনিক সভ্যতায় মানুষ যে পথে চলেছে তা হ'ল বিজ্ঞানের পথ। বিজ্ঞানের বুকেই প্রতিফলিত হয়েছে মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ-চেতনা। বর্তমান পৃথিবীর ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যার চাহিদা যখন ক্রমবর্ধিষ্ণু, অন্যদিকে খনির অন্ধকারে যখন পৃথিবীর খনিজ-সম্ভার কঠিন ঘুমে অচেতন, মানুষের প্রায়োপবেশনের উদ্দেশ্যে কৃষিভূমি যখন পাষাণী অহল্যার মতো অভিশপ্তা, মানুষের শ্রমের উৎপাদন-শক্তি যখন সুষ্ঠু ব্যবহারের অভাবে নিম্নমুখী, তখনই মানুষের প্রয়োজন হল এমন এক শক্তির যা তাদের পৌঁছে দেবে জীবন-পথের শীর্ষচূড়ায়। মানুষের অন্তরের এই ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম হয়েছে বিজ্ঞান-সাধনার।

কেন বেছে নিলাম

মানুষ যেদিন চাকা তৈরি করল সেদিন থেকেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা আবর্তিত হয়ে চলল মানুষের কল্যাণের আঙিনায়। ছোটবেলা থেকেই আমরা বিজ্ঞানের অপূর্ব মহিমা প্রত্যক্ষ করে চলেছি। কেবলমাত্র যান্ত্রিক দিকেই নয়, চিকিৎসা-শাস্ত্রের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞান আনছে নতুন নতুন পথের সন্ধান।

তাই আমি মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশুনা চালিয়ে যাবার জন্যে একাদশ শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছি।

বিজ্ঞানের অশুভ ফল

কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আমাদের মনে হয় বিজ্ঞানের এই অগ্রগতি মানবসভ্যতাকে তার পতনের শেষ সন্ধিস্থলে এনে দাঁড় করিয়েছে। রক্তাক্ত সংগ্রামের ভয়ঙ্করতা, পরমাণু-যুদ্ধের বিভীষিকা পূর্ব থেকে পশ্চিম, উত্তর থেকে দক্ষিণে যখন মানুষের মনুষ্যত্বকে বারবার করেছে ধূলিসাৎ তখন সত্যই ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে সেখানে যেখানে কাজলের মতো কাল অন্ধকারে প্রবেশ করে নি বিজ্ঞানের আলো।

কিন্তু সবদিক থেকে ভালোভাবে বিবেচনা করলে আমরা বুঝতে পারব যে এই দোষ বিজ্ঞানের নয়। দোষ বিজ্ঞান-প্রয়োগ-পদ্ধতির। বিজ্ঞানকে মানুষ তার প্রয়োজনের হাতিয়ার করেছে। তাই বিজ্ঞান আজ এমন বিধ্বংসী রূপে আবির্ভূত হয়েছে মানুষের দ্বারে। তাই সুপথে বিজ্ঞানকে চালিত ক'রে মানব-জীবনে আনতে হবে সুদিনের আহ্বান।

আমার উৎসর্গ

এই বিজ্ঞানকেই তাই আমি করতে চাই আমার চলার সাথী। এই বিষয়ে আমার অদম্য আগ্রহ চিকিৎসা-শাস্ত্রের ক্ষেত্রে। আমার মনের আশা যে আমি ডাক্তার হয়ে মানব-জীবনের কল্যাণসাধনে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারব।

মানুষ বরাবরই অসহায়। ভয়ঙ্কর রোগ মারী-মড়ক—বিভিন্ন দিক থেকে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাই মানুষের মতো অসহায় জীব হয়তো পৃথিবীতে আর কেউ নেই। মানুষের এই আকুল ক্রন্দন সর্বদা আমার মনকে আচ্ছন্ন করে রাখে।

বহুযুগ আগে মানুষ ছিল আরও নিঃসহায়। বিভিন্ন অজ্ঞাত রোগে শত শত প্রাণ অকালেই ঝরে যেত। কলেরা, ম্যালেরিয়া, জলাতঙ্ক প্রভৃতি দুর্দমনীয় রোগের হাতে মানুষ ছিল খেলার পুতুল মাত্র, তাদের বাধাদানের শক্তিটুকু পর্যন্ত ছিল না, তাই অল্পবয়সেই আলিঙ্গন করতে হত এক দুঃসহনীয় ভয়ঙ্কর মৃত্যুকে। কিন্তু চিকিৎসা-বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ আজ দক্ষতা অর্জন করেছে, বিভিন্ন রোগের হাত থেকে জগদ্বাসী পেয়েছে পরিত্রাণ। আজও বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার দ্বারা মানুষের উন্নতির সাধনা অনুষ্ঠিত হয়ে চলেছে দেশ থেকে দেশান্তরে।

রোগ নিরাময়ে বিজ্ঞান

আমি বিজ্ঞানকে ভালবাসি। পড়াশুনার ক্ষেত্রে ভালবাসাটাই প্রধান, অন্য সব গৌণ। আর যে বিষয় মানুষের বিবেচ্য হওয়া উচিত তা হল জগতের উপকারের প্রশ্ন। আমার মতে বিজ্ঞানের এই পথেই প্রত্যক্ষভাবে মানুষের উপকারের ক্ষেত্র সব থেকে বিস্তৃত। আর মানুষের প্রতি ভালবাসাই যেখানে ভগবানের সেবার একমাত্র পথ সেখানে এই পথই আমার একমাত্র কাম্য।

দেশের উপকার, দশের উপকার। এর মধ্যেই মানব-জীবনের চরম সার্থকতা। আমরা পৃথিবীতে আসি নিজের ক্ষুদ্র জীবনের সুখদুঃখ, হাসিকান্না, আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জীবন অতিবাহিত করার জন্য নয়, মানুষের সুখের সাথী হয়ে মানুষের দুর্বিষহ জীবনকে সুখকর করার জন্য, মানুষের চোখের জল মোছাবার জন্য। তাই বিজ্ঞান-সাধনার পথেই সার্থক হোক আমার জীবন-সাধনার স্বপ্ন।

উপসংহার

স্কুল-কলেজে বিতর্ক-সভা

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯-'৮১]

[সূচনা—বিতর্ক-সভা কেন—বিতর্ক-সভার উপযোগিতা—আয়োজন ও সংগঠন—সুফল—উপসংহার।]

শিক্ষা আমাদের জগৎ-সংসারকে চেনায়, গ্রহণীয়কে যুক্তির সাহায্যে গ্রহণ করতে শেখায়। আর এই শিক্ষালাভের জন্যে আমাদের সামনে সদা উন্মুক্ত রয়েছে পৃথিবীর না-পড়া বই। সেই বই পড়তে সক্ষম করে তোলে আমাদের স্কুল-কলেজের শিক্ষা। স্কুল-কলেজের শিক্ষা কেবলমাত্র ক্ষুদে ক্ষুদে ছাপার অক্ষর চিনিয়ে দেওয়ার জন্যে নয়,—প্রতিটি ছাত্রের অন্তর্নিহিত শক্তিকে জাগ্রত করার জন্যেই এই শিক্ষা। ছাত্রের মধ্যে যে-সম্ভাবনার বীজ আছে, তাকে অঙ্কুরিত করে তোলার জন্যে প্রয়োজনীয় আবহাওয়া সৃষ্টি করে স্কুল-কলেজ।

সূচনা

এই অর্থে যথার্থ শিক্ষার উদ্দেশ্য সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব-গঠন, জীবনের প্রতি সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী-সৃষ্টি। কিন্তু আধুনিক মননে এ দুয়ের জন্যেই বিশেষভাবে দরকার যুক্তিবোধ। সুসংবদ্ধ যুক্তিবোধই শ্রেয় ও প্রেয়কে চেনায়। আর যুক্তিবোধই সুস্থ মানবিকতার উৎস। বিতর্ক-সভা এই যুক্তিকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

বিতর্ক-সভা কেন

বিতর্ক-সভা একাধারে ভাবা ও বলার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। নিজের বিশ্বাসকে যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করতে উদ্বুদ্ধ করে বিতর্ক-সভা। সর্বোপরি উন্নততর যুক্তিকে মেনে নিতে শেখায় এই বিতর্ক-সভা—যার প্রয়োজন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অবিসংবাদী সত্য হয়ে বারবার দেখা দেয়। তা ছাড়া, বিচারকবৃন্দের সিদ্ধান্তকে মেনে নেওয়ার মধ্যে যে-খেলোয়াড়ী মনোভাব আছে, তাও লাভ করা যায় বিতর্ক-সভা থেকে।

বিতর্ক-সভার উপযোগিতা

স্কুল-কলেজে বিতর্ক-পরিচালনার জন্য যিনি ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক থাকেন তিনি প্রতি সপ্তাহে বা প্রতি পক্ষে কয়েকজন ছাত্রকে নির্বাচিত করেন যাঁদের ওপরে বিতর্কের বিষয়বস্তু-নির্বাচন বা অংশগ্রহণকারীদের নাম গ্রহণ করার দায়িত্ব দেওয়া থাকে। ছাত্ররা সেই নির্দিষ্ট বিষয়ের পক্ষে বা বিপক্ষে নিজেদের বক্তব্য রাখে ও যুক্তি ও বাগ্‌ভঙ্গীর ওপর নির্ভর করে ফলাফল ঘোষণা করা হয়। অনেক সময় পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্গত কোনো বিতর্কিত বিষয় নিয়েও বিতর্ক-সভা আয়োজিত হতে পারে, যেমন 'তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন?' (সাগরসঙ্গমে নবকুমার) আন্তঃশ্রেণী বিতর্ক-প্রতিযোগিতা বিতর্কে আগ্রহ বাড়ায়। আন্তঃবিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতায় এই আগ্রহ আরও বৃদ্ধি পাবে। পুরনো ছাত্রদের মধ্যে যারা বিতর্ককুশলী ছিলেন তাদের বিচারক হিসাবে আমন্ত্রণ জানালে ভালো হয়। তাঁদের নিয়েও বিতর্ক-সভার আয়োজন করলে ছাত্রেরা যেমন উৎসাহিত হবে, তেমনি উপকৃত হবে।

আয়োজন ও সংগঠন

এই ধরনের সভার আয়োজন নানাভাবে ছাত্রদের উপকার করে। প্রথমত, ছাত্ররা সংগঠনের দায়িত্ব ও অভিজ্ঞতা লাভ করে। দ্বিতীয়ত, আত্মপক্ষ-সমর্থনের জন্য যুক্তি-সংগ্রহের তাগিদে তারা নানা বিষয়ের ওপর বিভিন্ন ধরনের বই পড়তে উদ্বুদ্ধ হয়। সর্বোপরি, ভাবা ও বলার প্রয়োজনীয় চর্চা তো ঘটেই।

সুফল

মনন, চিন্তন ও যুক্তি-দ্বারা গ্রহণ—এই তিন প্রক্রিয়া আমাদের পাথেয়। বিতর্ক-সভা একাধারে এই তিন বোধের চর্চা ও পরিশীলন সম্ভবপর করে তোলে। অতএব, বিদ্যালয়গুলিতে আরও ব্যাপকভাবে বিতর্ক-সভার আয়োজন করা দরকার।

উপসংহার

ছাত্রজীবনের কর্তব্য

[উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮২]

[ভূমিকা—অধ্যয়ন—বিদ্যালয়ে—গৃহে—সাধারণ্যে—উপসংহার।]

ভূমিকা

জীবন পরম দুর্লভ একটি প্রাপ্তি। নিজের এবং পরের প্রতি কর্তব্যপালনের মধ্য দিয়েই আমরা জীবনের ঋণ শোধ করি। জীবনবিকাশের পথে বিদ্যার্জনের বিশেষ একটি পর্ব বা পর্যায় হল ছাত্রজীবন। বিদ্যাই অমৃত, তাই এই বিদ্যার্জনের কালেই জীবনকে করে তুলতে হবে অমৃতময়।

অধ্যয়ন

অধ্যয়নকে ছাত্রদের তপস্যা বলা হয়েছে। তপস্যা তো বটেই, একনিষ্ঠ না হলে অধ্যয়ন হয় না। যা আমাদের সম্মুখে এগিয়ে দেয় তাই হল অধ্যয়ন—অধি-অয়ন।

আগেকার দিনে তপোবনের ঋষিরা শিষ্যদের পাঠদানের শুরুতেই আবৃত্তি করতেন—

ওঁ সহ নাববতু সহ নৌ ভুনক্তু
সহ বীর্যং করবাবহৈ।
তেজস্বিনাবধীতমস্তু
মা বিদ্বিষাবহৈ।

এর মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ "তেজস্বিনাবধীতমস্তু"—অর্থাৎ আমাদের অধ্যয়ন তেজোময় হোক। এই অধ্যয়ন তেজোময় হতেই পারে না যদি না আমরা তাকে তপস্যার মতো দেখি। যা শিখব তা খুব ভালো করে শিখলেই তা শক্তি এবং দীপ্তি দান করে। সে শিক্ষা প্রয়োগের সময়েও কার্যকর হবে। আর যদি মনপ্রাণ দিয়ে না শিখি তবে সে শিক্ষা কোনো কাজেই আসবে না। একটা ছোট্ট উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। মনে করা যাক আমার অধ্যেয় বিষয় পূর্তবিজ্ঞান। এই বিদ্যা আহরণে আমার যদি কোনো শৈথিল্য থাকে, অধ্যয়নে আমার যদি কোনো ফাঁকি থাকে তাহলে বিশেষ অভিজ্ঞানপত্র পাওয়া সত্ত্বেও আমার অধীত বিদ্যাকে আমি সার্থকভাবে ব্যবহার করতে পারব না। যে সেতুগড়ার দায়িত্ব আমার ওপর পড়ল সেই সেতুতে আমারই ভ্রান্তিজনিত কোনো ত্রুটি যদি থাকে তাহলে তা অনর্থ ঘটাতে পারে।

বিদ্যালয়ে

একদিন তপোবনের গুরুর কাছে থেকে অধ্যয়ন করত ছাত্ররা, তাই তাদের নাম ছিল 'অন্তেবাসী'। এখন বিদ্যালয়ই ছাত্রদের গুরুগৃহের মতো। এখানেও ছাত্ররা কর্তব্যের বাঁধনে বাঁধা। শিক্ষকদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে ছাত্রদের, কারণ শ্রদ্ধাই জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ। ছাত্রদেরও নিজের ভাইয়ের মতো করে নিতে হবে শিক্ষকের। বিদ্যালয়কে করে নিতে হবে দ্বিতীয় গৃহ। বিদ্যালয়ের নিয়ম-নিষ্ঠাকে কঠোরভাবে মেনে চলতে হবে ছাত্রকে, এই নিয়মানুবর্তিতাই ভবিষ্যৎ জীবনে তাকে বহু সাফল্য এনে দেবে।

গৃহ আমাদের গ্রহণ করেছে, পালন করেছে, তাই গৃহের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্য। বাবা-মা, ভাই-বোন সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ছাত্রের লক্ষ্য থাকবে। বাড়ির দাসদাসীকেও সে সদয় ব্যবহারে আপনজন করে নেবে। যৌথ পরিবার নিজেই এক বিদ্যালয়। এখানে পাওয়া যাবে যথার্থ ত্যাগের শিক্ষা।

গৃহে

এইবার আসে সমাজের কথা। ছাত্ররাই হবে ভবিষ্যৎ নাগরিক। তাই তাদের সমাজ সচেতন হতে হবে, সমাজের কিসে মঙ্গল, কিসে অমঙ্গল সে বিষয়ে তাদের অবহিত হতে হবে। সমাজের কল্যাণে সে হবে অতন্দ্র, সমাজের কাছে আমাদের যে-ঋণ সমাজের কল্যাণ করেই সে ঋণ আমাদের শোধ করতে হবে। তরুণ ছাত্রছাত্রীই চিরদিন মানবতার ডাকে সাড়া দিয়ে আসছে।

সাধারণ্যে

দেখা যাচ্ছে সমস্ত মানবিক কর্তব্যই ছাত্রজীবনের কর্তব্য বলে চিহ্নিত হচ্ছে, এ তো খুবই স্বাভাবিক। ছাত্রজীবনই মানবজীবনের শ্রেষ্ঠ সময়, তাই মানবজীবনের পক্ষে যা শ্রেয় যা কর্তব্য তা স্বভাবতই ছাত্রদের উপরেই বর্তাবে। মনে রাখতে হবে, শুধু পড়াশোনায় ভালো হওয়াই আদর্শ ছাত্রের লক্ষ্য নয়, আদর্শ ছাত্র দেহে-মনে সুগঠিত, সমাজ চেতনায় উদ্দীপ্ত, সমাজ-কল্যাণে অতন্দ্র।

উপসংহার

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায়:

১. ছাত্রজীবনের আদর্শ। ২. ছাত্র ও সমাজ।

ছাত্রজীবনে সমাজ-কল্যাণের প্রয়োজনীয়তা

অথবা, সমাজ-কল্যাণে ছাত্রসমাজ

[উ. মা. ১৯৮২, ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৮২]

[ভূমিকা—ছাত্রজীবন ও সমাজকল্যাণ—সংঘচেতনা—মানসিক বৃত্তির বিকাশ—পরিতৃপ্তি ও উৎসাহ—সমাজ-সচেতনতা—উপসংহার।]

পুরনো পাথরের যুগ পেরিয়ে নতুন পাথরের যুগে এসে মানুষ যৌথজীবনের প্রয়োজনীয়তা বেশি করে বুঝেছে, চাষের সঙ্গে সঙ্গেই এসেছে বাসের প্রয়োজন, বাসের প্রয়োজনেই সমাজ। সমাজে সকলের কাছেই সকলের ঋণ। সে-ঋণ শোধ দিতে হবে সমাজসেবা করেই। সে-ঋণ শোধ না দিলে আমরা হব কৃতঘ্ন।

ভূমিকা

সমাজকল্যাণ সকলের জন্যেই, তবে বিশেষ করে ছাত্রদের এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ হবার প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। ছাত্রেরা সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর, সমাজের মানুষের যে-কোনো আর্তি তাদের সমব্যথী করে তুলবে এই তো স্বাভাবিক। এই সমবেদনা

তাদের কল্যাণকর্মে প্রেরণা দেবে, আর এই প্রেরণা তাদের দুহাত ভরে দেবে সম্পদ।

ছাত্রজীবন ও সমাজকল্যাণ

সংসারীদের হিসেবী মন এগোতে চায় না, সব কিছুতেই লাভ-ক্ষতির অঙ্ক কষে, স্বার্থ কতখানি সিদ্ধ হবে তাই দেখে। ছাত্রেরাই সর্বদা স্বার্থকে অতিক্রম করে চলে। আদর্শের দিকে ছোটে সমস্ত বাধা তুচ্ছ করে। সমাজকল্যাণে সবদেশে সবকালে তাই তরুণ ছাত্রছাত্রীর ভূমিকা সবচেয়ে বড়ো।

সংঘচেতনা

এক সঙ্গে কাজ করার মধ্য দিয়ে তাদের মধ্যে আসবে সংঘচেতনা—দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ। দশজন হাতে হাত মেলালে এক আশ্চর্য শক্তি সঞ্চারিত হয় সকলের মনে, কল্যাণকর্মে এ শক্তি হয় দ্বিগুণিত।

মানসিক বৃত্তির বিকাশ

কল্যাণকর্মে সবলের সঙ্গে যুক্ত হলে মনের সমস্ত সূক্ষ্ম শক্তি বা বৃত্তিগুলো বিকশিত হয়ে ওঠে। সেবার কাজ তো সবসময়ে সহজ নয়। বন্যার তাণ্ডবে যাঁরা সেবাব্রত গ্রহণ করেছেন তাঁরাই জানেন কী বিপুল অধ্যবসায়, সাহস আর ধৈর্য এর জন্যে দরকার। প্রাণ হাতের মুঠোয় নিয়ে এসব জায়গায় কাজ করতে হয়। এই সব দুরূহ কাজের মধ্য দিয়ে হয় শক্তির উদ্দীপন।

পরিতৃপ্তি ও উৎসাহ

বন্যাপীড়িতদের বা যে-ক্ষেত্রে দুর্গতদের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে সেবা-দল যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তি লাভ করে তার তুলনা নেই। এই পরিতৃপ্তি সেই সেবাদলকে কঠিনতর কাজে নির্ভয় করে তুলবে। কঠিনের অঙ্গনে ছাত্রদল যে-পাঠ গ্রহণ করে ভবিষ্যৎ জীবনে তাই তাদের সার্থকতা ও পূর্ণতার পথে এগিয়ে দেয়।

সমাজ-সচেতনতা

এই সব কল্যাণমুখী কর্মসাধনার মধ্য দিয়ে আমাদের সমাজসচেতনতা বাড়ে। আমাদের অভাব-অভিযোগ ত্রুটি-বিচ্যুতি আমাদের বেশি করে চোখে পড়ে, তার ফলে তা সংশোধনের একটা উদ্যম নেবার ইচ্ছা ছাত্রদের অনেক ক্ষেত্রেই হয়। এই ইচ্ছা পাঠক্রমকে জীবনমুখী করে তোলে। কোনো মনীষীর প্রবন্ধ পড়তে পড়তে তারা ভাবতে থাকে সমাজ-জীবনে এইসব তত্ত্ব বা উপ-দেশকে তারা জীবনের কাজে লাগাতে পারে। অধ্যয়নের সার্থকতাই তো এইখানে।

উপসংহার

ছাত্ররাই ভবিষ্যৎ নাগরিক, তারাই গড়বে ভবিষ্যতের সুখী সমাজ। কল্যাণকর্মের মধ্য দিয়ে তাদের যে-সমাজবোধ জাগবে তা হবে তাদের আগামীদিনের পাথেয়। ছাত্রদের অধ্যয়ন তপস্যাও বটে, তবে সমাজসেবাও তাদের নানাভাবে শিক্ষা দান করে বলে একে অধ্যয়ন বলে গণ্য করলে অন্যায় হবে না। মনে রাখতে হবে, বিবেকানন্দের বাণী—

যাতে মানুষের চরিত্রবল, পরার্থপরতা, সিংহসাহসিকতা এনে দেয় না সে কি আবার শিক্ষা?

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. ছাত্রজীবনের আদর্শ। ২. আদর্শ ছাত্র। ৩. শিক্ষার আদর্শ।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ছাত্রসমাজ

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-'৮১]

[ভূমিকা—পূর্ব-ইতিহাস—স্বাধীনতার পর—কারণ অনুসন্ধান—নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যর্থতা—ছাত্রদলের ভূমিকা—উপসংহার।]

ভূমিকা

কোন্ সুদূর অতীতে ভারতীয় ঋষির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল—'শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ'—'অমৃতের সন্তানগণ শোন, দিব্য ধামে যিনি অবস্থান করেন আমি সেই মহান্ পুরুষকে জানি, যিনি অন্ধকারের পরপারে আছেন। তাঁকে জেনে মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়'। ভাবতে অবাক লাগে দিব্যজ্ঞান-লাভে ধন্য সেই ভারতবর্ষে আজ অধিকাংশ মানুষই নিরক্ষর।

পূর্ব-ইতিহাস

প্রাচীন ভারতে সকলেই যে শিক্ষিত বা সাক্ষর ছিল এমন কথা মনে করার কারণ নেই। তবে বৈদিক এবং বৌদ্ধ যুগে শিক্ষায় সরকারী উদ্যোগ থেকে মনে হয় সরকার ও জনগণ শিক্ষা সম্পর্কে সচেতন ছিল। মুসলমান যুগের প্রথমে শিক্ষা, শিল্প ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কিছুদিন চলল রক্ত্যুৎসব। ফলে শিক্ষা-সংস্কৃতির ধারা গেল রুদ্ধ হয়ে। ইংরেজ-রাজত্বের গোড়ার দিকে বিদেশী শাসকদের বিমাতৃ-স্থলভ মনোভাবের জন্যে শিক্ষা-সরস্বতীর পাতাল প্রবেশ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। একদিকে দারিদ্র্য, অন্যদিকে অশিক্ষা—এই দুই শত্রু নিয়ে আমাদের ঘর করতে হয়েছে বহুকাল। পরবর্তী কালে শিক্ষার প্রসার ঘটলেও তার আলো গিয়ে পড়ে নি দেশের সর্বস্তরের মানুষের অন্তরে।

স্বাধীনতার পর

চরম দারিদ্র্য আর অশিক্ষার তিলক কপালে এঁটে আমাদের যাত্রা শুরু হল ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই আগস্ট। দশ বছরের মধ্যে ভারতের বুক থেকে নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করার শপথবাণী উচ্চারিত হয়েছে আমাদের সংবিধানের মধ্যে। কিন্তু শপথবাণী আজও থেকে গেছে সংবিধানের পাতায় বন্দী হয়ে। আরও কতদিন প্রতিশ্রুতিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে তা কে জানে? আজ স্বাধীনতা লাভের এতগুলি বছর পার হবার পরেও আমরা ভারতের প্রায় সত্তর ভাগ মানুষের চোখে শিক্ষার আলো ফোটাতে পারি নি। এটা আমাদের দুর্ভাগ্য—কবির ভাষায়:

"এ তোমার এ আমার পাপ
বহু যুগ হতে—

কারণ অনুসন্ধান

নিরক্ষরতার কারণ অনুসন্ধানের জন্যে আমাদের বেশি দূরে যেতে হবে না। কেবল এটুকু বললেই যথেষ্ট হবে, কৃষিপ্রধান দেশ ভারতে কৃষির অনুন্নতি, ভূমিহীন কৃষকের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধি—নিরক্ষরতাকে চিরস্থায়ী করে তুলেছে। এক কথায় আমাদের নিরক্ষরতার কারণ হল দারিদ্র্য, কুসংস্কার, এবং উৎসাহহীনতা।

স্বাধীনতা লাভের পর থেকেই গ্রামে গ্রামে প্রাথমিক বিদ্যালয়, নৈশ বিদ্যালয় এবং

বয়স্ক-শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। চেষ্টার ত্রুটি নেই, শিক্ষক আছেন, সরকার তাদের মাইনে দিচ্ছেন; আলোর খরচ, বইপত্তর, চক্‌, ডাস্টার, মায় টিফিন খরচ পর্যন্ত দিয়েও প্রত্যাশিত ফল আজও হস্তগত হয় নি। জাতীয় সেবাপ্রকল্প গঠন করে এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য নিয়েও নিরক্ষরতা-দূরীকরণে সরকারী উদ্যোগ তেমন ফলপ্রসূ হয় নি।

নিরক্ষরতা দূরীকরণে ব্যর্থতা

এত বড়ো যজ্ঞের সার্থক রূপায়ণ একা সরকারের পক্ষে সম্ভবপর নয়। ছাত্রদল হল দেশের শক্তি—প্রাণের প্রতীক। তারাই পারে জীবনে শিক্ষাদানের মহান্ ব্রত গ্রহণ করতে। তারাই পারে কুসংস্কার দূর করে শিক্ষার জন্যে প্রচার-অভিযানে নামতে। সমাজসেবী রাজনীতিবিদ্‌গণের ভূমিকাও এখানে নগণ্য নয়। তাদের আদর্শ জীবন ও উৎসাহ ছাত্রসমাজের পথ-চলার পাথেয়। আমাদের দেশের ছাত্ররা বছরে দুবার দীর্ঘ ছুটি ভোগ করে। সেই ছুটির সময়ে তারা জনশিক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করে গ্রামে বস্তীতে ঘুরে ঘুরে নিরক্ষর জনগণকে সাক্ষর করে তোলার চেষ্টা করতে পারে।

ছাত্রদলের ভূমিকা

তা ছাড়া, পরীক্ষার পর দীর্ঘ সময় তাদের হাতে করার কিছুই থাকে না, তখন ছাত্ররা কোনো নৈশ বিদ্যালয় চালু করে শিক্ষা-ব্রত উদ্‌যাপন করতে পারে। ছাত্ররা যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের সহায়তা না-ও পায় তাহলেও 'each one teach one' পদ্ধতিতে অগ্রসর হলে অনেক অন্ধকার তারা দূর করতে পারবে। প্রশাসনের যান্ত্রিকতা যা পারে না, ছাত্রদলের আন্তরিকতা ও মিলিত উদ্যোগই তা সম্ভব করতে পারে।

আসলে আমরা কী চাই তাই আমাদের জানা নেই। নিরক্ষরতা দূরীকরণকে যদি দেশের কল্যাণের পক্ষে সবচেয়ে জরুরী মনে করতাম তা হলে আমাদের এ হাল হবে কেন? নিরক্ষরতা দূরীকরণের পরিকল্পনা আমরা নিয়েছি কিন্তু সংকল্পের দৃঢ়তা তাতে ছিল না, ইংরাজিতে যাকে বলে Half hearted action—এ হয়েছে তাই। সেই জন্যেই যাদের হৃদয় আছে—পূর্ণ হৃদয় আছে সেই ছাত্রদের ভূমিকাই এবিষয়ে সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

উপসংহার

কয়লাখনির একটি বালক শ্রমিকের আত্মকথা

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

[ভূমিকা—খনিএলাকায় আসবার কথা—অভিজ্ঞতা—ফিরে এলাম।]

আমি রানীগঞ্জ আসানসোল অঞ্চল থেকে বলছি। এখানকার একটি কয়লাখনিতে কাজ করি। আমার নাম রতন। আমি সামান্য মানুষ। আমার কথাও খুব সামান্য। সে-কথা শোনাতে আমার সঙ্কোচ হচ্ছে। তবু নিজের কথা বলতেও তো ইচ্ছে হয়।

ভূমিকা

বাবা-মার সঙ্গে থাকতাম বর্ধমানে। আমাদের বাড়ি বলতে ছিল একটাই ঘর, তার সঙ্গে সামান্য একটু বাগান। ঐ বাগানেই খেলা করতাম। মা ডাকতেন 'রতু' বলে। কী মিষ্টি করে ডাকতেন, সেই গলার স্বর আমি কখনও ভুলব না। পড়াশোনা কিছু করতে পারি নি। বাবা ছোট্ট একটা দোকানে কাজ করতেন। আমাকে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন। আমাদের সংসার চলাই মুশকিল ছিল। তাই ছোটোবেলাতেই রোজগারের কথা ভাবতে হয়েছিল আমাকে। কিন্তু কোন্ কাজ করে রোজগার করব? কেবল ঐ কথাই ভাবি। এমনি এক সময়ে আমাদের বাড়িতে এলেন আমার দূরসম্পর্কের একজন কাকা। আমরা বসন্তকাকা বলতাম। তিনি সব শুনে বললেন, 'বেশ তো, আমার সঙ্গে কয়লাখনিতে চলুক। দেখি ওখানে কিছু করে দিতে পারি কিনা।' বসন্তকাকার সঙ্গে রানীগঞ্জের কয়লাখনি এলাকায় এলাম। বালক শ্রমিকদের খনির ভিতরের কাজ দেওয়া হয় না। যোগানদারের কাজ পেলাম।

খনিএলাকায় আসবার কথা

অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, খনির আওয়াজ শুনতাম, আর ভাবতাম কবে খনির ভিতরটা দেখতে পাব; বসন্তকাকা তো খনির ভিতরেও যান, একদিন যদি—। হ্যাঁ, একদিন সেই সুযোগই এল। তিনি নিজেই আমাকে খনির ভিতরে কী করে কাজ হয় বিশেষ অনুমতি নিয়ে তা দেখাতে গেলেন। সুড়ঙ্গের মতো পথ চলে গিয়েছে খাদের নীচে, ওপর থেকে ডুলিতে করে নেমে যাচ্ছে শ্রমিকেরা, হাতে গাঁইতি আর লণ্ঠন। পাতালপুরীর জমাট অন্ধকার। চলছে কয়লা-কাটা। মাথার উপরকার ছাদও কয়লার। রাশি রাশি কয়লা কেটে ট্রলিতে বোঝাই করে যন্ত্রের সাহায্যে উপরে তোলা হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল যেন গল্পের কোন এক দৈত্যপুরীতে এসে পড়েছি। ভয় করছিল খুব। মাঝে মাঝে নাকি আগুন লেগে যায় গ্যাস থেকে—মিথেন গ্যাস।

অভিজ্ঞতা

একদিন খনি অঞ্চলে গান হচ্ছিল। বাইরে থেকে কিছু কর্মীও এসেছিল। আমার কয়েকটা লাইন মনে আছে—

ঘরে ঘরে বাতি জ্বলে
দেশ ছেয়ে যায় কলে কলে
রেলগাড়ি আর জাহাজ চলে
মোদের গাঁইতি চলে বলে ॥

দুর্ঘটনাও ঘটত মাঝে মাঝে। একবার কয়লা ভেঙে পড়ে নিষ্পিষ্ট হল বেশ কিছু শ্রমিক। মা-বোনের কান্না আর থামে না।

আমি মাঝে মাঝে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। মা বুকে জড়িয়ে ধরতেন, তাঁর চোখের জল আমার মাথায় এসে পড়ত। তখন বাবা অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বাবাকে কেমন অসহায় মনে হত।

আমরা কয়েকজন খনির বাইরে কিছু কিছু হালকা কাজ করতাম। কিন্তু একদিন

একজন পরিদর্শক এসে জানালেন বালক শ্রমিক আর রাখা হবে না—ব্যাপারটা বেআইনী।

ফিরে এলাম

তারপর আমি ফিরে এসেছি বাবা-মার কাছে। এখন কী করব জানি না। বাবা দোকানের মালিককে আমার জন্যে অনেক করে বলেছেন। তিনি বলছেন এখন তাঁর কোনো লোকের দরকার নেই।

আমাদের ঘরের পিছনে যে ছোট্ট বাগানটুকু ছিল, সেটা আর নেই, ওখানে অন্য একজনের ঘর উঠেছে।

কয়লাখনির সমস্ত পরিবেশটা মনের পটে ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করি, কিন্তু আমার জীবনের পথ এখন কোন্ দিকে মোড় নেবে কে জানে?

একটি পোড়োবাড়ির আত্মকথা

[জন্ম—সুখস্মৃতি—বেদনার দিনগুলি—স্মৃতিসুখ।]

একটু কান পেতে শোন তো, কোথায় যেন মিষ্টি সুরে সানাই বাজছে না। কি আবোল তাবোল বকছি তাই না, কোথায় সানাইয়ের সুর। ওতো ঝিঁঝি পোকার ডাক এই ঝোপঝাড় আর হাড় পাঁজোর বের করা পোড়ো বাড়িতে বসে কে আর সানাই বাজাবে। সানাই বাজছে আমার মনে। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে এই দিনটিতেই আমার জন্ম হয়েছিল। তোমরা যাকে বল গৃহপ্রবেশ সেই গৃহপ্রবেশই হল আমার জন্ম মুহূর্ত।

জন্ম

সেদিন সকাল থেকে সানাই বাজছিল। দরজার দুপাশে কলাগাছ, ধারঘট, আম্র-পল্লব, নানান মাঙ্গলিক চিহ্ন। কত বেদমন্ত্র উচ্চারণ, মিষ্টান্ন বিতরণ। নর-নারীর কলহাস্যে সেদিন আমার বুক ভরে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় যেন শুরু হল দেওয়ালী উৎসব। শত প্রদীপের আলোয় সেদিন উদ্ভাসিত হয়েছিল আমার নব কলেবর।

আজও সেই দিনের স্মৃতি আমি ভুলি নি, ভুলব না কোনো দিন। কারণ সেটাই ছিল আমার জন্মদিনের প্রথম উৎসব। প্রথম দিনের কথা এত সহজে কি ভোলা যায়?

সেদিন অনেক রাত্রে বড় বাবু আর বড় বউমা ছাদে এসে বসলেন। ওদের দেখে হঠাৎ আমার মনে হল ওরা যেন আমার বাবা মা। আমি চুপি চুপি ডাকলাম, 'বাবা-মা-মাগো'। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরল না। সেই মুহূর্তেই বুঝলাম আমি কোনোদিন কথা বলতে পারব না। কেবল কথা জমবে আমার বুকে। কথা জমে জমে পাহাড় হবে তবু কেউ সে কথা শুনতে পাবে না।

সুখস্মৃতি

আমি বারবার ডাকতে লাগলাম, 'বাবা-মা মাগো'।—জানি না কি ভেবে বড়ো বউমা বললেন, 'ও কিসের শব্দ?'

বাবা-মার সঙ্গে থাকতাম বর্ধমানে। আমাদের বাড়ি বলতে ছিল একটাই ঘর, তার সঙ্গে সামান্য একটু বাগান। ঐ বাগানেই খেলা করতাম। মা ডাকতেন 'রতু' বলে। কী মিষ্টি করে ডাকতেন, সেই গলার স্বর আমি কখনও ভুলব না। পড়াশোনা কিছু করতে পারি নি। বাবা ছোট্ট একটা দোকানে কাজ করতেন। আমাকে মাঝে মাঝে নিয়ে যেতেন। আমাদের সংসার চলাই মুশকিল ছিল। তাই ছোটোবেলাতেই রোজগারের কথা ভাবতে হয়েছিল আমাকে। কিন্তু কোন্ কাজ করে রোজগার করব? কেবল ঐ কথাই ভাবি। এমনি এক সময়ে আমাদের বাড়িতে এলেন আমার দূরসম্পর্কের একজন কাকা। আমরা বসন্তকাকা বলতাম। তিনি সব শুনে বললেন, 'বেশ তো, আমার সঙ্গে কয়লাখনিতে চলুক। দেখি ওখানে কিছু করে দিতে পারি কিনা।' বসন্তকাকার সঙ্গে রানীগঞ্জের কয়লাখনি এলাকায় এলাম। বালক শ্রমিকদের খনির ভিতরের কাজ দেওয়া হয় না। যোগানদারের কাজ পেলাম।

খনিএলাকায় আসবার কথা

অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতাম, খনির আওয়াজ শুনতাম, আর ভাবতাম কবে খনির ভিতরটা দেখতে পাব; বসন্তকাকা তো খনির ভিতরেও যান, একদিন যদি—। হ্যাঁ, একদিন সেই সুযোগই এল। তিনি নিজেই আমাকে খনির ভিতরে কী করে কাজ হয় বিশেষ অনুমতি নিয়ে তা দেখাতে গেলেন। সুড়ঙ্গের মতো পথ চলে গিয়েছে খাদের নীচে, ওপর থেকে ডুলিতে করে নেমে যাচ্ছে শ্রমিকেরা, হাতে গাঁইতি আর লণ্ঠন। পাতালপুরীর জমাট অন্ধকার। চলছে কয়লা-কাটা। মাথার উপরকার ছাদও কয়লার। রাশি রাশি কয়লা কেটে ট্রলিতে বোঝাই করে যন্ত্রের সাহায্যে উপরে তোলা হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল যেন গল্পের কোন এক দৈত্যপুরীতে এসে পড়েছি। ভয় করছিল খুব। মাঝে মাঝে নাকি আগুন লেগে যায় গ্যাস থেকে—মিথেন গ্যাস।

অভিজ্ঞতা

একদিন খনি অঞ্চলে গান হচ্ছিল। বাইরে থেকে কিছু কর্মীও এসেছিল। আমার কয়েকটা লাইন মনে আছে—

ঘরে ঘরে বাতি জ্বলে
দেশ ছেয়ে যায় কলে কলে
রেলগাড়ি আর জাহাজ চলে
মোদের গাঁইতি চলে বলে॥

দুর্ঘটনাও ঘটত মাঝে মাঝে। একবার কয়লা ভেঙে পড়ে নিষ্পিষ্ট হল বেশ কিছু শ্রমিক। মা-বোনের কান্না আর থামে না।

আমি মাঝে মাঝে মা-বাবার সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। মা বুকে জড়িয়ে ধরতেন, তাঁর চোখের জল আমার মাথায় এসে পড়ত। তখন বাবা অন্য দিকে তাকিয়ে থাকতেন। বাবাকে কেমন অসহায় মনে হত।

আমরা কয়েকজন খনির বাইরে কিছু কিছু হালকা কাজ করতাম। কিন্তু একদিন

একজন পরিদর্শক এসে জানালেন বালক শ্রমিক আর রাখা হবে না—ব্যাপারটা বেআইনী।

ফিরে এলাম

তারপর আমি ফিরে এসেছি বাবা-মার কাছে। এখন কী করব জানি না। বাবা দোকানের মালিককে আমার জন্যে অনেক করে বলেছেন। তিনি বলছেন এখন তাঁর কোনো লোকের দরকার নেই।

আমাদের ঘরের পিছনে যে ছোট্ট বাগানটুকু ছিল, সেটা আর নেই, ওখানে অন্য একজনের ঘর উঠেছে।

কয়লাখনির সমস্ত পরিবেশটা মনের পটে ভেসে ওঠে মাঝে মাঝে। কেমন একটা আকর্ষণ বোধ করি, কিন্তু আমার জীবনের পথ এখন কোন্ দিকে মোড় নেবে কে জানে?

একটি পোড়োবাড়ির আত্মকথা

[জন্ম—সুখস্মৃতি—বেদনার দিনগুলি—স্মৃতিসুখ।]

একটু কান পেতে শোন তো, কোথায় যেন মিষ্টি সুরে সানাই বাজছে না। কি আবোল তাবোল বকছি তাই না, কোথায় সানাইয়ের সুর। ওতো ঝিঝি পোকার ডাক

জন্ম

এই ঝোপঝাড় আর হাড় পাঁজোর বের করা পোড়ো বাড়িতে বসে কে আর সানাই বাজাবে। সানাই বাজছে আমার মনে। আজ থেকে ঠিক একশো বছর আগে এই দিনটিতেই আমার জন্ম হয়েছিল। তোমরা যাকে বল গৃহপ্রবেশ সেই গৃহপ্রবেশই হল আমার জন্ম মুহূর্ত।

সেদিন সকাল থেকে সানাই বাজছিল। দরজার দুপাশে কলাগাছ, দ্বারঘট, আম্র-পল্লব, নানান মাঙ্গলিক চিহ্ন। কত বেদমন্ত্র উচ্চারণ, মিষ্টান্ন বিতরণ। নর-নারীর কলহাস্যে সেদিন আমার বুক ভরে গিয়েছিল। সন্ধ্যায় যেন শুরু হল দেওয়ালী উৎসব। শত প্রদীপের আলোয় সেদিন উদ্ভাসিত হয়েছিল আমার নব কলেবর।

আজও সেই দিনের স্মৃতি আমি ভুলি নি, ভুলব না কোনো দিন। কারণ সেটাই ছিল আমার জন্মদিনের প্রথম উৎসব। প্রথম দিনের কথা এত সহজে কি ভোলা যায়?

সেদিন অনেক রাত্রে বড় বাবু আর বড় বউমা ছাদে এসে বসলেন। ওদের দেখে

সুখস্মৃতি

হঠাৎ আমার মনে হল ওরা যেন আমার বাবা মা। আমি চুপি চুপি ডাকলাম, 'বাবা-মা-মাগো'। কিন্তু আমার মুখ দিয়ে কোনো শব্দ বেরল না। সেই মুহূর্তেই বুঝলাম আমি কোনোদিন কথা বলতে পারব না। কেবল কথা জমবে আমার বুকে। কথা জমে জমে পাহাড় হবে তবু কেউ সে কথা শুনতে পাবে না।

আমি বারবার ডাকতে লাগলাম, 'বাবা-মা মাগো'।—জানি না কি ভেবে বড়ো বউমা বললেন, 'ও কিসের শব্দ?'

বড়বাবু বললেন, 'কিছু নয় রাতজাগা পাখি ডাকছে'।

বড়ো বউমা বললেন, 'তাই বলো, আমি ভাবলাম কেউ যেন মা বলে ডাকল।'

একেই বলে মায়ের প্রাণ, ঠিক শুনেছে।

বড়োবাবু শীতলপাটির উপর শুয়ে শুয়ে আকাশের চাঁদ দেখছিলেন। হঠাৎ বড়ো বউমা বললেন, "আমাদের বাড়িটার একটা নাম দিলে কেমন হয়?"

বড়োবাবু বললেন, 'আমিও তাই ভাবছি'। নিজের আর কী ছিল বলো, মায়ের গয়না বিক্রির টাকায় বাড়ি, তাই এর নাম হল "মায়ের আশীর্বাদ"।

আমার নাম "মায়ের আশীর্বাদ"। আজ আমি একশো বছরের জবুথবু হাড় পাঁজোর বের করা এক বুড়ি। কিন্তু সেদিন এই ভুবনডাঙায় আমার পাশে দাঁড়াবার ক্ষমতা ছিল কার? রূপে গুণে আমিই ছিলাম ঐ তল্লাটের সবচেয়ে সেরা বাড়ি।

কিন্তু এই আশীর্বাদের উপর প্রথম ঈশ্বরের অভিশাপ বর্ষিত হল সেদিন, আমার যখন মাত্র দশ বছর বয়েস।

কী হয়েছিল সঠিক বলতে পারব না—সাগঞ্জের কুণ্ডু বাবুর গোলায় কাজ করতেন বড়োবাবু, একদিন দেখি কয়েকজন লোক তাকে ধরাধরি করে বাড়িতে আনছে।

তাই দেখে বড়ো বউমার সে কী কান্না! আমারও কান্না পাচ্ছিল কিন্তু আমি তো আর কথা বলতে পারি না তোমাদের মতো। তাই বুকের কান্নাটা বুকের মধ্যেই গুমরে কেঁদে কেঁদে বেড়ালো।

বেদনার দিনগুলি

তারপর একদিন অনেক রাত্রে থমথমে অন্ধকারকে চমকে দিয়ে এবাড়ির বড়োবউ আমার মা, ডুকরে কেঁদে উঠল, "আমার কী সর্বনাশ হল গো"। সেদিন আমি পিতৃহীন হলাম।

বুঝলাম, এ সংসার সুখদুঃখ হাসি-কান্নার মিলন মেলা। দুদিন হাস, কাঁদ, খেলা কর, তারপর খেলাঘর শূন্য করে চলে যাও।

বড়োবাবু যাবার পর থেকেই শুরু হল মায়ের কষ্টের দিন। নাবালক চার চারটি ছেলে, বাজারে একগাদা দেনা, তার ওপর আত্মীয়দের শত্রুতা বড়ো বউমার জীবনটাকে দুর্বিসহ করে তুলল।

সবচেয়ে বড়ো আঘাত এল আরও ক'বছর বাদে। বড়োবাবুর ভাইয়েরা সব পৃথক হয়ে গেল। একই বাড়ি কিন্তু পৃথক হাঁড়ি। ওরা সকলেই চাকরি করে। কেউ শহর কলকাতায়, কেউ সাগঞ্জের গোলায়। তাই ওদের ছেলেমেয়েরা থাকে দুধে ভাতে।

কিন্তু বড়োবাবুর ছেলেরা দুবেলা পেট পুরে খেতে পায় না। কতদিন ওদের না খেয়ে স্কুলে যেতে দেখেছি, দেখেছি ছেঁড়া জামা কাপড় তালি দিয়ে পরতে। তবু ওদের চোখেই দেখতাম আগামী দিনের সোনালী স্বপ্ন। ঠিক বড়োবাবুর মত।

হয়তো আকাশে চাঁদ উঠেছে, চারিদিকে বসন্তের উতরোল হাওয়া, আমার মা ছেলেদের নিয়ে ছাদের মাঝখানে গোল হয়ে বসেছে। গল্প হচ্ছে। আগামী দিনের গল্প, ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখছে ওরা।

বড়ো ছেলে মাকে বলত, 'দেখো আমি একটা পাশ দিয়েই কলকাতায় চলে যাব, চাকরি করব তখন তোমার কোনো কষ্ট থাকবে না।'

তারপর সত্যি সত্যি একদিন ছেলেটার স্বপ্ন সার্থক হল। শহরে গিয়ে চাকরি পেল, ভাইদের মানুষ করল, মায়ের মুখে হাসি ফোটাল। তারপর একদিন সানাই বাজিয়ে হাজার প্রদীপের আলো জ্বালিয়ে নতুন বউ ঘরে আনল সে।

বড়োবাবুদের আবার বাড় বাড়ন্ত অবস্থা। আমারও কপাল ফিরল। ইটের পাঁজরের উপর পড়ল সিমেন্ট বালির প্লাস্টার, আমার সর্বাঙ্গে গোলাপী প্রলেপ। আমিও যেন নববধূ। সেই আমার জীবনে শেষ উৎসব, শেষ রঙ পরে সাজা, আলোর মালা গলায় দুলিয়ে হাসা।

নববধূ কলকাতা শহরের মেয়ে। তাই বছর কয়েক বাদে শুনলাম সে একদিন স্বামীকে বলছে, "আমি তোমাদের এই গণ্ডগ্রামে থাকতে পারব না। মশা-মাছি, পুকুর ডোবা, ম্যালেরিয়া—মাগো!"

কিছুদিন বাদে ওরা চলে গেল। গেলনা কেবল আমার মা এ বাড়ির বড়োবৌ। সেদিন যার একমাথা পাকা চুল, বয়সের ভারে কোটরাগত চক্ষু। আমার সেই মা বসে বসে আপন মনে যেন আমার সঙ্গেই কথা বলত, কত সুখদুঃখের কথা!

ম্যালেরিয়ার ভয়ে অন্য সরিকরাও একদিন গ্রাম ছেড়ে উঠে গেল শহরে, বাঁধল নতুন বাসা। পড়ে রইলাম আমি আর আমার বৃদ্ধা মা, এবাড়ির বড়োবউ।

তারপর একদিন সেই মাও আমাকে ছেড়ে চলে গেল। মায়ের মৃত্যুসংবাদ পেয়ে ছেলেরা সব এল, শহর থেকে। দেখলাম তাদেরও বয়েস হয়েছে, মাথার চুলে ধরেছে পাক।

আবার উৎসব। খাওয়া দাওয়া। গান বাজনা। তবে এবারের উৎসবে কেমন একটা করুণ করুণ বিষণ্ণভাব।

দুদিন বাদে দরজায় তালা লাগিয়ে সবাই ফিরে গেল শহরে। সেই থেকে আমি একা, সম্পূর্ণ একা, নীরব সাক্ষীর মত দাঁড়িয়ে আছি। ধীরে ধীরে একদিন আমার চারধারে যে ফুলের বাগান ছিল,সে বাগান আগাছা জঙ্গলে পূর্ণ হল, মাথার ওপর থেকে ছাদ পড়ল ধ্বসে। জীর্ণ কাঠের জানালা দরজাগুলো খুলে নিয়ে গেল চোরে। এমনকি দরজার সামনে "মায়ের আশীর্বাদ" লেখা মার্বেল পাথরটা অবধি মানুষের লালসার হাত থেকে রেহাই পেল না, সেটাও খোয়া গেল।

তারপর থেকেই আমি আর "মায়ের আশীর্বাদ" নই পোড়ো বাড়ি মাত্র। তবু আজও আমি শুনি কোথায় যেন সানাই বাজছে। তোমরা বলবে সানাই নয় এ ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। পোড়ো বাড়িতে ঝিঁঝিঁ পোকা ছাড়া কে আর সানাই বাজাবে বলো। কিন্তু আমার মনে? মনে যে সহস্র স্মৃতির সানাই বেজে চলেছে তাকে মিথ্যে বলবে কেমন করে?

স্মৃতিসুখ

চা-বাগানের একজন শ্রমিকের আত্মকথা

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

[ভূমিকা—শৈশবস্মৃতি—কাজের আঙিনায়—পরিবেশ—স্মৃতি—অভিজ্ঞতা—উপসংহার।]

ভূমিকা

আমি চা-বাগানের একজন সাধারণ শ্রমিক আমি। নাম সুখনলাল। বয়সের ভারে আমি এখন ক্লান্ত। এই শিমুলগাছটার মূলে বসে পুরনো দিনের কথা ভাবছি। পুরনো দিনের কথা ভাবতে কার না ভালো লাগে?

শৈশবস্মৃতি

মাকে আমার অল্প অল্প মনে পড়ে, বাবার কথা মনে পড়ে না। আমার জন্মের পরপরই তিনি মারা গিয়েছেন। মা চা-পাতা তুলতে যেতেন—দুটিপাতা একটি কুঁড়ি। আমাকে রেখে যেতেন বাড়িতে। খেলতে খেলতে ঘুমিয়ে পড়তাম। খিদে লাগলে খুব কাঁদতাম, তখন পাশের বাড়ির বুড়ি-মা এসে কিছু খেতে দিতেন, তাঁর বাড়িতেও নিয়ে যেতেন কখনও কখনও।

বাগানের নাম কিংডং। জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলের চা-বাগান। প্রথমে ছিল সাহেবদের, তারপর হাতবদল হল কতবার।

আমি বড়ো হয়ে উঠলাম। মাকে সাহায্য করতাম। আমার খুব বন্ধু ছিল সুনিয়া। আমরা এক সঙ্গে খেলা করতাম। সব মায়েরাই দল বেঁধে পাতা কাটতে যেত। এই পাতাকাটা চলত মার্চ মাস থেকে অক্টোবর মাস পর্যন্ত।

কাজের আঙিনায়

একদিন আমরাও পাতা-তোলা শিখলাম। তবে আমাদের প্রথমে একাজে লাগানো হত না। আমি আর আমার বন্ধুদের কয়েকজন ফ্যাক্টরিতে কাজ করতাম, চা-পাতা ঝাড়াইয়ের কাজ ছিল আমাদের।

ক্রমে বড়ো হতে লাগলাম। একজন সাহেব আমাদের জড়ো করে চা-গাছের নানা রকম কাজ শিখিয়ে দিতেন। পরে ডাল ছেঁটে দেওয়ার কাজ করতাম আমি। তারপর নতুন গাছ লাগানোর কাজেও আমাকে লাগানো হয়েছে।

পরিবেশ

আমাদের লেখাপড়া-শেখানোর একটা ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু যিনি পড়াবেন তিনি প্রায়ই আসতেন না, ছেলেদের পড়ার উৎসাহও তেমন ছিল না। রাত্রিতে শ্রমিকরা দল বেঁধে গান করত। গভীর রাতে তারা ঘুমিয়ে পড়ত। সিটি বাজার সঙ্গে সঙ্গে খুব ভোরে তারা উঠে পড়ত। চা-বাগানটার উপর আমার কেমন মন পড়ে গিয়েছিল। চা-গাছগুলোকে খুব আপন বলে মনে হত। বাগানের মধ্যে মধ্যে ছিল বাবলা বা শিমুল গাছ। এই সব গাছকে আমার মনে হত মায়েদের মতো, এরা যেন সন্তানদের ছায়া দিয়ে রক্ষা করত।

বাগানে সাজো সাজো রব পড়ে যেত মালিক এলে, ঝাড়পোঁছ করে সব ঝকঝকে তকতকে করে রাখা হত। মালিক এলে আমাদের খুব কাজ বেড়ে যেত। গেটে মালিকের গাড়ির শব্দ পেলেই আমরা তটস্থ হয়ে পড়তাম।

বাগানের ম্যানেজারবাবুদের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ছিল। ওঁরা একনাগাড়ে

বেশি দিন থাকতেন না। কিছুদিনের জন্যে এসে আবার চলে যেতেন অন্য বাগানে। একটি পরিবারের কথা আমি ভুলব না। আমার ছোটোবেলায় মা আমাকে কোলে নিয়ে ওঁদের বাড়ি যেতেন, কিছু কাজ করে দিতেন। আমার-বয়েসী একটা ছোটো ছেলে ছিল ম্যানেজারবাবুর। আমরা দুজনে খেলতাম। ম্যানেজারবাবু আর তাঁর স্ত্রী দুজনেই খুব ভালবাসতেন আমাকে; বলতেন 'আমাদের বাড়ি যাবি ?' আমার আব্‌ছা আব্‌ছা মনে পড়ে এখনও।

দেখতে দেখতে কতদিন চলে গেল। এখন আমি বুড়ো হয়েছি। সুখ-দুঃখের কত স্মৃতি একটার পর একটা মনে আসে। মা একদিন কাশতে কাশতে রক্ত তুললেন। তারপর মাস খানেক বাদেই তিনি আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

স্মৃতি

যত বড়ো হয়েছি ততই বুঝেছি মালিকেরা গাছপালাকে ভালবাসে না, তারা চায় টাকা। তাদের শুধু জিজ্ঞাসা—"এত কম উৎপাদন কেন ? তোমরা কি বসে খাও ? সব ছাঁটাই করে দেব"। অত্যাচার ও নির্যাতনের অনেক দৃশ্যই আমার মনে আছে। এক দিন দেখেছি শ্রমিকদের প্রতিবাদ করতে, এক সঙ্গে দাবিদাওয়ার কথা জানাতে। তাদের মধ্যে আমিও ছিলাম একজন।

অভিজ্ঞতা

আমার বন্ধুরা অনেকেই নেই এখন, পুরনো দিনের বন্ধু এখনও কয়েকজন আছি আমরা। আমাদের ভারি কাজ করতে হয় না, আমরা কাজ দেখাশোনা করি। আমাদের অভিজ্ঞতার কথা ওদের বলি। এখানকার ম্যানেজারবাবু আমাদের পুরনো কয়েকজনকে ভালবাসেন। আমাদের সঙ্গে নানাবিষয়েই অন্তরঙ্গভাবে কথা বলেন। ইনি নিজে অসম্ভব পরিশ্রম করেন বলেই শ্রমিকরা তাঁকে শ্রদ্ধা করে, তাঁর কথা শোনে। শ্রমিকদের অসুবিধা তাঁর চেয়ে আর কেউ ভালো জানে না। তিনি যথাসাধ্য তা দূর করারও চেষ্টা করেন। এমনই তো হওয়া উচিত—আমি তোমারটা দেখব, তুমি দেখবে আমারটা।

কিংডং। পুরনো বাগান, বহু হাতবদলের সাক্ষী। বহু ইতিহাসের সাক্ষী। একদিন আমরা থাকব না। থাকবে এই বাগান। নতুন শ্রমিক, নতুন দিন। সেই দিনকে আমাদের শুভেচ্ছা জানাই।

উপসংহার

একটি বেকার যুবকের আত্মকথা

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

(ভূমিকা—শৈশব থেকে যৌবন—মানসিক অবস্থা—হঠাৎ আলো)

বেকার যুবকের আবার আত্মকথা! শুনে হাসি পায়। না, শুধু হাসি নয়, হাসির সঙ্গে কান্নাও মিশে থাকে। কিন্তু বেকারেরও একটা জীবন আছে, সে-জীবনেরও হয়তো কথা আছে, কিন্তু শোনবার কেউ আছে কী ? যদি না থাকে ক্ষতি নেই, এ আমার স্বগতোক্তি।

ভূমিকা

আমার নাম ? নাম দিক্‌পতি। নামটা কে দিয়েছিলেন আমি জানি। দিয়েছিলেন আমার রাঙা কাকু। তিনি ইহলোকে নেই। খুব ভালবেসেই তিনি এ নাম দিয়েছিলেন —অনেক আশা করে। বিধাতা হেসেছিলেন। যাক্, নামে কী আসে যায় ? আমি কিন্তু সার্থকনামা। কারণ সমস্ত দিকেই আমার বিচরণ, কোনো স্থিতি নেই, আমি ভবঘুরে, বেকার। তাই দিক্‌পতিই বটে !

শৈশব থেকে যৌবন

শৈশব কেটেছিল রাঙাকাকুর কাছে মালদায়। ওখানেই পড়তাম স্কুলে, স্কুলফাইন্যালও ওখান থেকে দিয়েছিলাম। পাশ করেছিলাম দ্বিতীয় বিভাগে। রাঙাকাকু অকালে চলে গেলেন।

তার পর ? আমার এক দূর সম্পর্কের মামাবাড়িতে—কলকাতায়। ওখানে থেকে সিটি কলেজে পড়তাম। আমার অবস্থা হল ফটিকের মতোই। প্রতি মুহূর্তে ছুটি চাইত মন, কিন্তু আমি ছুটি নিই নি, অসহ্য নির্যাতনের মধ্যেই আমি প্রি-ইউনিভার্সিটি পাশ করলাম। মামা ব্যবসা করতেন, বললেন—সন্ধ্যায় আমার দোকানে বসবি, হিসেবপত্তর রাখবি। তাই করলাম কিছুদিন। কিন্তু হিসাবে বড়ো একটা গরমিল হল। মামা বললেন, এমন হতেই পারে। মামী বললেন, হতেই পারে না। তাই 'আমি আজ চোর বটে'।

এবারে আমার চোখের সামনে পথ—শুধু পথ। কোথায় চলেছি জানি না। এক অজানা ভবিষ্যতের পথে নিঃসহায় এক নাগরিক।

অনেক বড়ো গল্পকে ছোট্ট করে বলছি—আমি এক সহপাঠীর আশ্রয়ে, ওর বাবা সদাগরী অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী।

মানসিক অবস্থা

ভাবি, শুধু ভাবি। এখানে থাকব, না চলে যাব ? কোথায় যাব ? এ জীবনের কী কোনো দাম আছে ? প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে একটা কিছু করা দরকার, অন্তত এঁদের জন্যে—অরুণের বাবা-মার জন্যে। কী বড়ো মন এঁদের। নিজেদেরই চলে না তবু আমার ওপর এঁদের কী আন্তরিক ভালোবাসা আর যত্ন। আমাকে সান্ত্বনা দিতে ওর বাবার সে কী মমতাময় আকুতি—'একটা কিছু নিশ্চয়ই হয়ে যাবে, আমি বড়োবাবুকে বলেছি। এমন সুন্দর ছেলে তুমি, ইংরেজি জান, লিখতে জান, পাশও আছে দুটো। চিন্তা কী ? কিছু ভেবো না তুমি।'

কিন্তু ভাবনা কি যায় ? কত রাত অরুণের পাশে শুয়ে শুয়ে জানালা দিয়ে আকাশের তারা দেখতে দেখতে রাত ভোর করেছি। আকাশ-পাতাল কত চিন্তা—জীবনটা কী ? এর মানে কী ? জীবনের সার্থকতা কোথায় ? পরমুহূর্তে মনে হয়েছে এ সব তত্ত্বচিন্তার অধিকার কি একজন বেকার যুবকের আছে ?

একটা দুর্বল মানসিকতার মধ্যে কাটছিল। প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-এর সঙ্গে বাঁধা পুরনো বইয়ের দোকান দেখতে দেখতে হাঁটি। কত বই, কিনতে ইচ্ছে করে, কিন্তু উপায় তো নেই।

ঐ পুরনো বই দেখতে দেখতেই হঠাৎ একটা শিরোনাম দেখে চমকে উঠলাম—

'কিসের ভয় ?'

—কয়েক পাতা পড়ে দেখলাম। আশ্চর্য! কোথা থেকে যেন মনে জোর পেলাম। আমাদের দেশের পুরনো দিনের কিছু উক্তি, আর তার ব্যাখ্যা। বাণী নয়, যেন সঞ্জীবনী। বই নয়, যেন হাতিয়ার।

হঠাৎ আলো

ছোট্ট বই, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সম্পূর্ণটাই পড়ে ফেললাম আমি। আমি যেন নতুন মানুষ! মনের সে অবসাদটা আর নেই। একটা প্রবল আশা সামনে। নিশ্চয় কিছু পাব—এমন একটা বলিষ্ঠ অনুভূতি এখন আমাকে ঘিরে।

আমি চলছি—সমস্ত কলকাতার স্পন্দন বুকে নিয়ে। নিজেকে তেমন বিচ্ছিন্ন করে আর দেখছি না। লক্ষ লক্ষ যুবক বেকার—আমি তাদেরই একজন। দিন বদলাবে। সেই নতুন দিনের স্বপ্ন আমার চোখে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়

১. বেকার জীবনের ভাবনা-চিন্তা।

বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য

[ভূমিকা—ঋতুচক্র—গ্রীষ্ম—সরসা বর্ষা—ধূসর হেমন্ত—পৌষের ডাক—বসন্ত—উপসংহার]

কবিরা এই বাংলাকে বলেছেন সোনার বাংলা, রূপসী বাংলা। সেই রূপসী বাংলার মুখ দেখতে হলে পল্লীবাংলার দিকে চোখ ফেরাতে হবে। সেখানে আকাশ-বাতাস জল-মাটি বন-প্রান্তর অপরূপ রূপের ডালি সাজিয়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। বিচিত্র ঋতুর সমারোহে বাংলার এই প্রকৃতি চির ঐশ্বর্যময়ী।

ভূমিকা

এক-একটি ঋতু যায়, তার শূন্য স্থানে আসে আর এক নতুন ঋতু। প্রকৃতির সৌন্দর্য-ভাণ্ডারে রেখে যায় তার নিজস্ব উপহার। এমনি করে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শরৎ, হেমন্ত, শীত আর বসন্তের আসা-যাওয়া :

ঋতুচক্র

'নাচে ছয় ঋতু, না মানে বিরাম, বাহুতে বাহুতে ধরিয়া
শ্যামল স্বর্ণ বিবিধ বর্ণ নব নব বাস পরিয়া।'

গ্রীষ্মের মূর্তি আমাদের কাছে ভয়াল ভয়ঙ্কর। মাথার উপর সূর্যটা যেন বিশাল অগ্নিকুণ্ড। তার ধূ ধূ আগুনের ঢেউ নেমে আসে বঙ্গপল্লীর শ্যামল প্রান্তরে। শুরু হয় ধ্বংসের তাণ্ডব। গ্রীষ্মের কালবৈশাখী ধুলো-বালির সঙ্গে বুঝি মনের জীর্ণতাও দূর করে। এই রুদ্র সন্ন্যাসী যেন মহাযোগী, তার বাণী ত্যাগের বাণী। রবীন্দ্রনাথের কথায় :

গ্রীষ্ম

"সমস্ত রস-বাহুল্য দমন করিয়া, জঞ্জাল মারিয়া তপস্যার আগুন জ্বালিয়া সে নিবৃত্তি-মার্গের মন্ত্র সাধন করে।"

ফুল নয়, গ্রীষ্মের কারবার ফল নিয়ে। তাই ফলের ডালা সাজিয়ে গ্রীষ্মপ্রকৃতির দিন কাটে।

গ্রীষ্ম বিদায় নিয়ে যায়, আসে বর্ষা। মেঘের ডমরু বাজিয়ে বজ্রমাণিকের মালা গলায় পরে বর্ষা তার শুভ আগমন সূচিত করে মৃত প্রকৃতির বুকে জাগে সাড়া। কদম-কেয়া-কামিনী আর জুঁই ফুলের গন্ধে চারদিক হয় আমোদিত। চারদিকে জল আর জল। ধরণী আর গগনের এই মিলনের দিনে সমস্ত প্রকৃতি যেন জলকলস্বরে কথা বলে। কবিরা এই ঋতুতে সবচেয়ে বেশি উতলা হন। কালিদাসের 'মেঘদূত' বর্ষার জলধরের অনুপম বর্ণনা। বর্ষার ঋতু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সবচেয়ে বেশি গান রচনা করেছেন। তিনি তাঁর শান্তিনিকেতনে যে 'বর্ষামঙ্গল' উৎসব উদ্‌যাপন করতেন তা তাঁর বর্ষাপ্রীতির উজ্জ্বল স্বাক্ষর। রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ বর্ষাবিষয়ক গান 'জলসিঞ্চিত ক্ষিতি সৌরভ রভসে' সম্পৃক্ত।

সরসা বর্ষা

বর্ষা বিদায় নিতে শরৎ-লক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটে। বাংলায় শরৎ হল ছুটির ঋতু। আকাশ থেকে সরে গেছে জলভরা কালো মেঘ ; নীল আকাশ যেন সাদা মেঘের ভেলা ভাসিয়ে দিয়েছে। কাঁচা-সোনা রোদ। মাঠভরা কাশ-ফুলে আলোছায়ার লুকোচুরি খেলা। শিউলির গন্ধে ভাসে পুজোর আগমনী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন : "শরতের রঙটি প্রাণের রঙ। অর্থাৎ তাহা কাঁচা, বড়ো নরম। ...এই জন্য শরৎ নাড়া দেয় আমাদের প্রাণকে।" এই ঋতুতে বাঙালী তার শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপূজায় মেতে ওঠে। একদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য অন্যদিকে উৎসবের আনন্দ।

কিন্তু শরৎ হল 'ক্ষণিকের অতিথি'। ঝরা শেফালির পথ বেয়ে সে আসে। আবার চলে যায় কালোয় আলোয় মিলতে মিলতে সবার অলক্ষ্যে। বাতাসে তার আভাস থাকে ছড়িয়ে। আকাশের ভিজে চোখের চাওয়ায় তার সত্তা থাকে জড়িয়ে। কাশ-বনের শুভ্রতায় পুজোর পবিত্রতা। শিউলির মুখচোরা সুবাসে শরতের বিদায়বেলার বিষণ্ণতার ব্যথিত আশ্লেষ।

হেমন্ত হল শরতের পরিণতি। এ রূপ সকরুণ বৈরাগ্যের। মানুষের জীবনে প্রৌঢ়ত্বের সঙ্গে এর মিল আছে। কবি বলেছেন : "দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ।" তাই রূপের প্রতি হেমন্তের আসক্তি নেই, নেই নিজেকে প্রকাশ করার তাগিদ। তাই বুঝি কুয়াশার পর্দায় হেমন্তলক্ষ্মী নিজের মুখ ঢেকে রাখে। পল্লীবাংলার ক্ষেতেখামারে হাটেমাঠে নতুন ধানের গন্ধ। আর এই গন্ধই হল হেমন্তের।

ধূসর হেমন্ত

প্রৌঢ়ত্ব বার্ধক্যের বার্তাবহ। হেমন্তেও শুনি শীতের পদধ্বনি। শীতের শুকনো কঠিন ভাব দেখে মনে হয় সে যেন কঠোর তপস্যায় রত। কিন্তু এ তপস্যার রূপ গ্রীষ্মের মতো ভয়ঙ্কর নয়। এ রূপ শান্ত মধুর।

পৌষের ডাক

শীতের পাতাঝরা তপোবনে ধানকাটা মাঠে দিকজুড়ে নামে এক মহাশূন্যতা। শীতের কাজের অন্ত নেই। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যস্ততার ছবি এঁকেছেন : 'তাহার পাকাধান কাটাই-মাড়াইয়ের আয়োজনে চারিটি প্রহর ব্যস্ত, কলাই-যব-ছোলার

প্রচুর আশ্বাসে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ। ···পথে পথে ভারে মন্থর হইয়া গাড়ি চলিয়াছে; আর ঘরে ঘরে নবান্ন এবং পিঠা-পার্বণের উদ্যোগে ঢেঁকিশালা মুখরিত।'

বসন্ত — বসন্তকে আহ্বান করে শীত নেয় বিদায়। ঘুমন্ত প্রকৃতি প্রাণ পেয়ে জেগে ওঠে। রিক্ত শাখায় জাগে নব কিশলয়। ফুলের ঋতু হল বসন্ত। অশোকে-পলাশে-শিমুলে যেন বনে বনে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রকৃতির এই রঙের উৎসবকে মানুষ নিজের জীবনে গ্রহণ করেছে। হোলি উৎসবের রঙ-খেলা তাই বসন্তের উৎসব। বসন্ত একদিকে ভোগী অন্যদিকে ত্যাগী। কবি তাই বলেন:

'বসন্ত কি শুধু কেবল ফোটা ফুলের মেলা রে
দেখিস নে কি শুকনো পাতা ঝরা ফুলের খেলা রে।'

এই দুটি রূপের মিলনেই বসন্তের পূর্ণতা।

উপসংহার — কিন্তু দুঃখের কথা, আজ যন্ত্রসভ্যতা মানুষকে প্রকৃতির কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দূর থেকেই প্রকৃতির লীলারঙ্গ দেখে আমাদের মন উতলা হয়, কিন্তু প্রকৃতির ভিতর মহলে প্রবেশ করার দরজাটা যেন বন্ধ, সেই বন্ধ দরজার চাবিটা আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। বহিরঙ্গে না-ও যদি হয়, অন্তরঙ্গে আমরা যেন অনুভব করতে পারি, বলতে পারি, 'ফুল ফুটুক না ফুটুক আজ বসন্ত।'

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. মানবজীবনে ঋতুর প্রভাব। ২. ঋতু ও উৎসব।

চিন্তাসহায়ক বাণী

ঋতুতে ঋতুতে যে ভেদ সে কেবল বর্ণের ভেদ নহে, বৃত্তিরও ভেদ···। গ্রীষ্মকে ব্রাহ্মণ বলা যাইতে পারে। সমস্ত রসবাহুল্য দমন করিয়া, জঞ্জাল মারিয়া তপস্যার আগুন জ্বালিয়া সে নিবৃত্তিমার্গের মন্ত্রসাধন করে। ······ইহার আহারের আয়োজনটা প্রধানত ফলাহার। —পরিচয়। আষাঢ়

ঋতুর মেলায় প্রকৃতির লীলাভূমি ত্রিপুরা

[ভূমিকা—সংস্কৃতি কী? মিশ্র সংস্কৃতি—বাঙালী ও উপজাতি—ভৌগোলিক পরিবেশ—বিভিন্ন ঋতুর মেলা—বিভিন্ন উৎসব—উপসংহার।]

ভূমিকা — প্রকৃতির লীলাভূমি ত্রিপুরা। কোথাও তার ঢেউ খেলানো পর্বতমালা সুন্দরীর আলুলায়িত কেশ, কোথাও সোনালী ঝালর-দেয়া সবুজ সীমান্ত, আবার রূপোর পাত একচিলতে নদী কোথাও বনভূমির-গভীরে উঁকি দিচ্ছে। এখানে পাহাড়ের ঢেউয়ে, বনানীর সবুজে-প্রান্তরে সোনালী ধানের শীষে সংবৎসর ঋতুর পার্বণ বিরাজ করছে।

ভৌগোলিক ব্যবধান রূপ-বৈচিত্র্য এনে দেয়। বাংলাদেশের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্যও ভিন্নতর। এ রাজ্যের উপর দিয়ে কাল্পনিক কর্কটক্রান্তি রেখা চলে যাওয়ায় নিরক্ষীয় অঞ্চলের মতো না হলেও বছরে ৮০″ বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। সারি সারি পর্বতরাশি উত্তরে-দক্ষিণে প্রলম্বিত হয়ে পশ্চিম থেকে পূর্বে পর পর দাঁড়িয়ে আছে। বাংলাদেশের সমতল এখানে এসে পর্বত পাদপ্রান্ত ছুঁয়েছে। পর পর ছটি পর্বতশ্রেণী পশ্চিম থেকে পূর্বে সাজানো। বড়মুড়া-আঠারমুড়া-লংতরাই-শাখান ও জম্পুই ছাড়াও অমরপুরে কালাঝারি বিলোনিয়ায় কিছু পাহাড় আছে। দুটি পাহাড়ের মাঝের অববাহিকায় এক বা একাধিক পাহাড়ী নদী রয়েছে। পাহাড়গুলিও ক্রমান্বয়ে পূর্বদিকে উচ্চ হয়ে উচ্চতম জম্পুইটং-এ লেগেছে। জম্পুইয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ বেতলিঙ্গ-শিব তিন হাজার ফুটের অধিক। এ পাহাড়ের বৈশিষ্ট্য হল শীত-গ্রীষ্ম সর্বকালেই তার আবহাওয়া নাতিশীতোষ্ণ। দশটি লুসাই গ্রাম-সমৃদ্ধ ত্রিশ মাইল দীর্ঘ এই পর্বতটির শোভা মনোরম। উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারলে এটি ত্রিপুরার মুসৌরী হতে

সংস্কৃতি কী

পারত। দেরাদুন থেকে মুসৌরী যাবার ২৫/২৬ মাইল সর্পিল পথটির মতো কাঞ্চনপুর থেকে জম্পুই যাবার ১২/১৩ মাইল রাস্তাটিও এঁকেবেঁকে উপরে উঠে গেছে। উচ্চতাও মুসৌরীর চেয়ে জম্পুই-এর কম। তবু আবহাওয়া সর্বঋতু উপযোগী বলে পর্যটকদের কাছে জম্পুই-এর আকর্ষণ বেশি হবার কথা। পশ্চিম থেকে পূর্বে বা উত্তর থেকে দক্ষিণে উপত্যকার সমতলভূমি ছাড়া সমগ্র রাজ্যটির দুই-তৃতীয়াংশই পার্বত্য অঞ্চল। এই রকম ভৌগোলিক অবস্থানে জলবায়ুর পরিবর্তন স্বাভাবিক—আর অনুরূপ কারণেই বাংলাদেশের জলহাওয়া থেকে ত্রিপুরা ব্যতিক্রম। সারা বছরে এখানে ৮০″ ইঞ্চির বেশি যেমন বৃষ্টি হয় তেমনি শীতে তাপমাত্রা অনেক নিচে নেমে যায়। নদী-গুলি পাহাড়ী অঞ্চল থেকে সরাসরি বেরিয়ে প্রাথমিক গতিসম্পন্ন। লংগাই মিজোরামের সীমান্তে পূর্ববাহিনী হয়ে কাছাড়ে প্রবেশ করেছে। জুড়ি, দেও, মনু, খোয়াই, ধলাই উত্তরবাহিনী হয়ে বাংলাদেশে আবার হাওরা,বিজয়, গোমতী পশ্চিমবাহিনী, ফেনী, মুহুরী দক্ষিণবাহিনী হয়ে বাংলাদেশেই প্রবেশ করেছে। আজ সড়ক-ব্যবস্থা অনেক উন্নত হওয়ায় এদের উপযোগিতা কমে এলেও লংগাই-দেও-গোমতীর উজান বেয়ে পণ্য সামগ্রী এখনও গভীরতর অরণ্যে পর্বতে আদিবাসী-অধ্যুষিত অঞ্চলে যাতায়াত করে। কোথাও এরা যোগাচ্ছে পানীয় জল, কোথাও এই খরস্রোতার জলে আদিবাসীরা অবগাহনসুখ অনুভব করছে, কোথাও আবার বিজ্ঞানের সাহায্যে এদের জল দিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন হচ্ছে বা চাষবাস হচ্ছে।

ত্রিপুরা রাজ্যে বাংলাদেশের মতো প্রকট না হলেও প্রায় ছ'টি ঋতুই দেখা যায়। গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীত-বসন্ত। ষড়্ঋতুর এমন মেলা বাংলাদেশ ছাড়া আর কোথাও এত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে নি। গ্রীষ্মের খরতাপে মৌনী পাহাড়ী ত্রিপুরার রূপ এক তপঃক্লিষ্ট ক্ষীণ তাপসের তনু। বনস্পতি পত্রশূন্য, ঝোপঝাড়-শুকনো—সর্বত্রই সবুজের কৃপণতা। পাহাড়ী ক্ষীণতোয়া স্রোতস্বতী অবগাহনের

মিশ্র সংস্কৃতি

সুখ থেকেও বঞ্চিত করেছে সকলকে। তপঃক্লিষ্ট ব্রাহ্মণের মতোই

নীরস, বাহুল্যবর্জিত ও উদাস গ্রীষ্ম। কবিগুরুর মতে গ্রীষ্ম ব্রাহ্মণ! 'প্রখর তপন তাপে' ধরিত্রীর বক্ষ বিদীর্ণ। এরই মধ্যে নেমে আসে কালবৈশাখী। পাহাড়ের ঢালে স্তূপীকৃত 'পিঙ্গল জটাজালে' ভীষণ ভয়াল রূপ রুদ্র তাপসকেই বুঝি মানায়। জাম, জারুল, শাল, কুই, কাঞ্চন, করই অথবা কনক-কুমিরা-কাজিকারার বনে আর গর্জন গামাই সুন্ধি বনস্পতি শীর্ষে মাতাল কালবৈশাখীর দাপটে আরণ্যক ত্রিপুরার রূপ মনোহারী।

গ্রীষ্মের লেলিহান হোমশিখা ত্রিপুরার পর্বত-অরণ্যের শীর্ষে সবুজ দিগন্তে স্তরে স্তরে জমতে থাকে। গ্রীষ্মের দাবদাহকে প্রশমিত করে বীরবেশে নেমে আসে বর্ষা। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "মেঘের পাগড়ি" মাথায় যোদ্ধবেশে তার আবির্ভাব। 'অতি ভৈরবহরষে' তার শুভাগমন প্রকাশিত। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে প্রচণ্ড গতিতে সে নেমে আসে পাদদেশে। শীর্ণতোয়া নদী স্ফীতকায়া হয়ে ফুঁসতে থাকে। আদিবাসীদের জুমপোড়ানো পাহাড় ধুয়ে মুছে একসা করে দিয়ে গুরুগম্ভীর বজ্রনিনাদে বনস্থলী কাঁপিয়ে তোলে। নিদাঘদগ্ধ ধরিত্রীর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' মুছে যায়। আসে শান্ত-স্নিগ্ধ শীতল "শ্যামছায়াঘন দিন"। বনানী পাহাড়ের রূপই যায় পাল্টে।

বাঙালী ও উপজাতি

সর্বত্র সবুজের বন্যা প্রাণের উচ্ছ্বাসে জেগে উঠে ত্রিপুরার বনপাহাড়। মথুরা, ধনেশ, উড়ন্ত কাঠবিড়ালীর আনন্দ উপচে পড়ে। জম্পুই পাহাড়ের কোলে কোলে ভাসমান মেঘরাশি ভম্বরের জলোচ্ছ্বাস লংগাই-এর চড়াই আটকে-পড়া পণ্যবাহী তরণীর গতিলাভ আর সবুজ অববাহিকার নতুন ফসলে ধরণীর ডালা পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। ধর্মনগরের জঙ্গলে তখন সেরা অর্কিড ফুলের সমারোহ। সব মিলিয়ে ত্রিপুরার বর্ষা লোভনীয়। পাহাড় জঙ্গলে তার আগমন যেমন বহু প্রত্যাশিত—তার অবস্থান, ধারাপাত তেমনি বিরক্তি-জনক। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আধার ত্রিপুরাকে বর্ষায় আরো মনে পড়ে তার বিখ্যাত ফল কাঁঠাল-আনারস-লিচু-আমের সমারোহের জন্যে।

গ্রীষ্মে নববর্ষ 'গড়িয়া উৎসব' দিয়ে সূচনা হলেও বর্ষায় ত্রিপুরার সেরা জাতীয় উৎসব 'খারচি পূজা'। আগরতলার উপকণ্ঠে সপ্তদিবস ব্যাপী চতুর্দশ দেবতার পূজা জাতি-উপজাতি উভয় জনগোষ্ঠীর মিশ্র সংস্কৃতির মেল-বন্ধন রচিত হয়।

বর্ষণ শেষে মেঘেরা সমতলে ছাড়া পেলেও পাহাড়ের সুউচ্চ প্রাচীরে এসে বাধা পড়ে শরতে। আলোছায়ার খেলা চলে পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে। স্বপ্নিল মায়াময় পরিবেশে কমলা বাগানে রঙীন ফলের বাহার প্রকৃতি-পাগলাদের হাতছানি দেয়, বর্ষণধৌত অনাবিল লংগাই-গোমতীর জলে আদিবাসী ললনারা অবগাহনসুখ অনুভব করে। সমতলে নদীতীরে কাশবনে শিউলির উদাস বাতাসে শারদোৎসবের আগমনী সুরে বেজে ওঠে। গিরি-কন্দর-বনানী জোছনার আরশিতে নিজের প্রতিবিম্ব দর্শনে বিস্ময়ে হতবাক। শারদবরণে এগিয়ে আসে উভয় জনগোষ্ঠীর লোক। আনন্দের লহরী সমতলে পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে থাকে। বর্ষণ-মুখর বর্ষায় মুখ-ভার ত্রিপুরার আরণ্যক প্রকৃতি যৌবনের উদ্দাম তরঙ্গে শরতে হাসির ফোয়ারা ছড়ায়।

ভৌগোলিক পরিবেশ

শরতের আনন্দঘন পরিবেশের নিঃশব্দ চরণে শীতের কান্না শুরু হয়ে যায়। প্রভাতের তৃণশস্তে শিশিরের আলিম্পন নজর এড়াতে পারে কিন্তু ডিসেম্বরের হাড়কাঁপানো শীত সত্যি সত্যি ভোলা যায় না। আবার সে যদি পাহাড় আর জঙ্গলসমাকীর্ণ কোনো অঞ্চল হয় তবে তো সোনায় সোহাগা। বংশূল পাহাড়ের পাদদেশে পানিসাগরে অধিক বেলাতেও কুয়াশার চাদর অপসৃত হয় না। খুব বেশিদিন না হলেও শীত ভালোভাবেই জাঁকিয়ে বসে অসমতল পাহাড়ে। ব্যতিক্রম শুধু জম্পুই-এর তিন হাজার ফুট উঁচু পাহাড়। সেখানে শীত সমতল অপেক্ষা অনেক কম। আদিবাসী সমাজের লোকেদের টং ঘরে তখন দিনরাত 'ধুনি' জ্বলতে থাকে। সমতলের দুর্বলতর শ্রেণীর অবশ্য শীত অভিশাপ। তবে রাজধানী ও মহকুমা শহরগুলিতে শীতে রঙীন পোশাকের বাহার। ফসলশূন্য মাঠ আর পাহাড়ের ঢালে হিমেল শূন্যতা বিরাজ করে।

বিভিন্ন ঋতুর মেলা

শীত-ঘুমের জড়ত্ব কাটিয়ে প্রকৃতির লীলাভূমি ত্রিপুরা আবার জেগে ওঠে ঋতুশ্রেষ্ঠ বসন্তে। আরণ্যক জীবনে বসন্তরাজের এমন রাজসিক আগমন আর কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। পাতাঝরা বনস্পতির কিশলয়ে কৃষ্ণচূড়ার বনে হোরির মাতন সূচিত হয়। সর্বভারতীয় সংস্কৃতিতে ত্রিপুরার অবদান নগণ্য হলেও তার হোরি উৎসবের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জাতীয় সংহতি ক্ষেত্রে অস্বীকার করার উপায় নেই। সুদূর অতীত থেকে ত্রিপুর রাজানুকুল্যে এই বসন্ত উৎসব পরিপুষ্ট। এমন সময় প্রকৃতি বসন্তের রূপ-সজ্জায় সজ্জিতা। ত্রিপুরার হোলির আনন্দ ও বৈশিষ্ট্য ভারতের অন্যান্য স্থান থেকে কোন অংশে কম নয়। আদিবাসী সমাজে দোল ও হোলি উৎসবের সংস্কৃতি বিস্তৃত আছে।

বিভিন্ন উৎসব

ত্রিপুরার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার প্রকৃতিতেই শুধু নেই, আছে তার আদিবাসী ও সমতলবাসী উভয় সম্প্রদায়ের উৎসব মেলা পূজা পার্বণের মিশ্র সংস্কৃতিতে। উত্তরায়ণ সংক্রান্তির ডম্বুর মেলায়, আশোকাষ্টমীর উনকোটি পাহাড়ে উৎসবে, গড়িয়া খারচি-দুর্গোৎসবে আরণ্যক ত্রিপুরার প্রকৃত সৌন্দর্য নিহিত। গিরি কন্দর বনানীর মতো দেশের অধিবাসীও সে দেশের সম্পদ। তাই ত্রিপুরার জাতি-উপজাতি জনগোষ্ঠী নিজের দুঃখ-দৈন্য বিবাদ-বিসংবাদের মধ্যেও প্রকৃতির লীলা-ভূমির রূপবৈচিত্র্যে নতুন করে এই আরণ্যক ত্রিপুরাকে আপন করে ভালবাসে। এই রাজ্যের সৌন্দর্যই রাজ্যবাসীর জীবনে গতি যোগায়।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ত্রিপুরা। ২. ত্রিপুরার ঋতুবৈচিত্র্য।

পরিবেশ দূষণ : কারণ ও প্রতিকার

[উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮৫]

[ভূমিকা—পরিবেশ ও আমরা—দূষণ—দূষণের ভীষণতা—দূষণ নিয়ে আজ পৃথিবী সোচ্চার—জনসাধারণের সচেতনতা—প্রতিকার ।]

ভূমিকা

পরিবেশ কথাটি ইংরেজি environment কথাটির প্রতিরূপ। আমাদের চারদিক-কার বায়ুমণ্ডল, গাছপালা, জলাশয় ইত্যাদি নিয়ে যে পরিমণ্ডল তাকেই আমরা পরিবেশ বলছি। পরিবেশকে আমরা প্রকৃতিও বলি। যথার্থ প্রতিশব্দ বোধ হয় 'নিসর্গ'।

পরিবেশ ও আমরা

এই পরিবেশের সঙ্গে আমাদের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ। এই পরিবেশ থেকে আমরা আমাদের জীবনাধায়ক উপকরণ সংগ্রহ করছি। আমাদের জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য ও অক্সিজেন এই পরিবেশরই দান। আমাদের জীবনের মৌল প্রয়োজনের আরও দুটি উপকরণ আবাস ও পরিচ্ছদ এই পরিবেশ থেকেই আমরা পাচ্ছি। পরিবেশের কিছু প্রতিকূলতাও আছে, বুদ্ধিবলে বা বিজ্ঞান-বলে তাকে প্রতি-রোধ করছি। প্রকৃতির উপর মানুষ যেন আধিপত্য বিস্তার করে চলেছে। বনের সঙ্গে মানুষের যেন শত্রুতা বাড়ছে। অনেকদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'লুব্ধ মানুষ অরণ্যকে ধ্বংস করে নিজেরই ক্ষতি ডেকে এনেছে, বায়ুকে নির্মল করার ভার যে গাছপালার উপর, যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করেছে। বিধাতার যা কিছু কল্যাণের দান আপনার কল্যাণ বিস্মৃত হয়ে মানুষ তাকেই নষ্ট করছে।

দূষণ

বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে মানুষের জীবনধারণের ধারাও পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। নগর, আরও নগর, আরও কল, আরও কারখানা—এই ভাবে আধুনিক মানুষ ক্রমশ স্বাভবিক পরিবেশকে যেন আক্রমণ করে চলেছে; প্রকৃতির সম্পদগুলোও যেন লুণ্ঠন করে চলেছে। এর ফল মানুষের পক্ষে ভালো হতে পারে না, কারণ মানুষ প্রকৃতিরই অংশ।

কলকারখানার ধোঁয়া, মোটর-ট্রাক-লরির গ্যাস শহরের বাতাসকে নিরন্তর কলুষিত করে চলেছে। তাছাড়া শক্তিধর রাষ্ট্রগুলোর নানা ধরনের বোমা-পরীক্ষাও মানুষের পরিবেশকে বিষাক্ত করে তুলে মানুষকে বহু ব্যাধির কবলে নিয়ে আসছে।

কারখানার পরিত্যক্ত তেলকালি ও শহরের আবর্জনা-নিক্ষেপের ফলে নদী-নালাও বিষিয়ে উঠেছে।

ব্যাপকভাবে যে আজ পেটের রোগ, হার্টের রোগ, লাংসের রোগ দেখা দিচ্ছে তার কারণ এই পরিবেশ-দূষণ।

শব্দজনিত দূষণও আর এক বিড়ম্বনা। যানবাহনের শব্দ, উচ্চগ্রাম রেকর্ডের গান, মাইক্রোফোনের শব্দ সব মিলে নগরজীবনের যে শব্দ বা কোলাহল বাড়ছে মনের উপর তার প্রভাব অত্যন্ত খারাপ, দেহের উপরেও তার প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

কয়েকটি নমুনা তুলে দিলে পরিবেশ দূষণ যে কী ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিচ্ছে তা বোঝা যাবে :

কলকাতা ও হাওড়া—এই দুই শহরের যানবাহন থেকে প্রত্যেক দিন গড়ে ২১০ মেট্রিক টন ও লোকোমোটিভ থেকে প্রতিদিন গড়ে ১০৫ মেট্রিক টন ধোঁয়া, কয়লা প্রভৃতি বায়ুদূষক বাতাসে এসে মিশছে।

দূষণের ভীষণতা

বছরে প্রায় ১১০টি জাহাজ কলকাতা বন্দরে আসে। এর থেকে দৈনিক প্রায় ৪৩ মেট্রিক টন দূষিত পদার্থ বায়ুতে ছড়িয়ে পড়ে। কলকাতার বাতাসে বিভিন্ন জ্বালানী থেকে প্রতিদিন প্রায় ২,৫০০ টন আবর্জনা সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীতে বিশুদ্ধ বায়ুর পরিমাণ এতই কমে যাচ্ছে যে পরিসংখ্যান অনুসারে দেখা গিয়েছে—নিউইয়র্ক শহরে দৈনিক শ্বাসগ্রহণ ৩৮টি সিগারেট খাওয়ার সমান।

এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বছরে প্রায় ১৪ লক্ষ হেক্টর জমি মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই, কারণ এতে শুধু লোকের মনে আতঙ্কই ছড়াতে পারে। প্রতিকারের ব্যাপারে আমরা যেন হাত-পা-বাঁধা হয়ে আছি।

দূষণ নিয়ে আজ পৃথিবী সোচ্চার

১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে স্টকহোম সম্মেলনের পর থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন সরকার পরিবেশ দূষণের ব্যাপার নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন। প্রতি বছর ৫ই জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবসে অনুষ্ঠিত নানা অনুষ্ঠানে বিভিন্ন পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্যে কর্মসূচী নেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে পরিবেশ বিষয়ক মন্ত্রীর পদ সৃষ্টি করা হয়েছে পরিবেশ দূষণ প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে। পরিবেশ সুরক্ষায় রাজ্যে এবার পৌর আইন সংশোধন করা হচ্ছে। বায়ু দূষণ রোধের জন্যেও নাকি একটি স্বয়ংশাসিত পর্ষৎ গড়ে তোলা হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও নানা কর্মসূচী গৃহীত হচ্ছে।

জনসাধারণের সচেতনতা

পরিবেশ দূষণ প্রতিকারের দায়িত্ব আমাদের সকলের। এর জন্য চাই জনসাধারণের চেতনার জাগরণ। স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে আরো সচেতন হতে হবে ও শিশু অবস্থা থেকেই ছেলেমেয়েদের পরিবেশ সুস্থ ও সুন্দর রাখার শিক্ষা ও প্রেরণা দিতে হবে। আমার গৃহের পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার দায়িত্ব তো আমায় নিজেকেই নিতে হবে। তবে একটা দেশের পরিবেশ সুস্থ রাখার জন্যে প্রয়োজন সরকারের জনকল্যাণমূলক কর্মতৎপরতার সঙ্গে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতার সম্মিলন।

সম্প্রতি ভূপালের ইন্‌সেকটিসাইড কারখানায় অতিক্রুত কিছু বিষাক্ত গ্যাস নির্গমনের ফলে যে জীবনহানি হল এবং বহু লোক চিরপঙ্গু হল পৃথিবীর ইতিহাসে তার তুলনা মেলা ভার। ভূপাল আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে পরিবেশ দূষণের ব্যাপারে আমাদের সতর্কতা কত ব্যাপক হওয়া দরকার। আমরা দুর্ঘটনা ঘটে যাওয়ার

পর সতর্ক হই, কিন্তু দুর্ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্যে আমরা আগে থেকে সতর্ক হই না। কারখানা থেকে এই ধরনের দূষণ সাংঘাতিক হয়ে উঠতে পারে এমন বহু অঞ্চলই আছে। সে-সব অঞ্চলেও যুদ্ধকালীন দ্রুততায় সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।

প্রতিকার

নির্বিচারে গাছপালা কাটা চলবে না, কারণ এরা কার্বন গ্রহণ করে অক্সিজেন ত্যাগ করে, যা আমাদের পক্ষে অত্যন্ত দরকার। পরিত্যক্ত গ্যাস বা আবর্জনার এমন কোনো রূপান্তর দরকার যাতে তা ক্ষতিকারক না হয়। যানবাহনও এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে শব্দ নিয়ন্ত্রিত হবে। বৃক্ষ-রোপণকে আরও ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত করে তুলতে হবে। মনে রাখতে হবে, প্রকৃতিপীড়ন নির্বিচারে করা চলবে না, কারণ—পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য (ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮৫)। ২. পরিবেশ ও আমরা।

প্রাকৃতিক সম্পদের মানবিক ব্যবহার

[উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮৪]

[ভূমিকা—অকৃপণ প্রকৃতি—ভূমি ও জলসম্পদ—অরণ্য সম্পদ—খনিজসম্পদ—বিজ্ঞান ও সম্পদ আহরণে ব্যাপকতা—অন্তরীক্ষ—উপসংহার]।

ভূমিকা

আমরা, মানুষেরা একদিন ইচ্ছে হয়ে প্রকৃতির মনের মধ্যে ছিলাম, তারপর একদিন, হয়ে উঠলাম। সত্যি কী অচ্ছেদ্য বন্ধন আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে। প্রকৃতি যে আমাদের মনে আনন্দহিল্লোল আনে, কখনও যে ভাবিয়ে তোলে, কখনও যে উদাস করে দেয়, কখনও যে করে দেয় উন্মাদ এতে প্রমাণিত হয় প্রকৃতি আমাদের অন্তরঙ্গ, আমাদের ঘনিষ্ঠ একটি সত্তা।

অকৃপণ প্রকৃতি

এই প্রকৃতি দুহাত ভরে আমাদের তুলে দিচ্ছে তার অজস্র সম্পদ, অবশ্য তার জন্যে আমাদের বুদ্ধি আর শ্রমকে খাটাতে হচ্ছে ঠিকই। এই যে মাটি জল গাছপাথর এ সবই আমাদের অক্ষয় সম্পদ।

ভূমি ও জলসম্পদ

সেই আদি যুগে যেদিন মানুষ মাটিতে ফলালো ফসলের সোনা, সেদিনই তার সভ্যতার পতাকা উড়ল পৃথিবীর বুকে। নদীর জলকে সে কাজে লাগাল এই ফসল ফলাতে। নীলনদ, টাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস, হোয়াংহো, সিন্ধু এই সব নদীকে দিয়েই গড়ে উঠল মানব-সভ্যতা—নদীমাতৃক সভ্যতা। কোমল মাটিকে সে কাজে লাগালো মাটির বাসন তৈরির কাজে। কুমোরের চাকা সভ্যতাকে দিল অনেক এগিয়ে। কোমল মাটিকে কঠিন করে তুলে সে ক্রমে ইট গড়তে শিখল, অমনি শুরু হল নগরসভ্যতা।

অরণ্য হল মানুষের বন্ধু। অরণ্য তার সম্পদ। ইট পোড়াতে চাই কাঠ, অজস্র

কাঠ। অরণ্যের কাছ থেকে সে নিল কাঠ। আগে চেয়েছিল শুধু ফল, আর কিছু বন্য প্রাণী,—আহার হিসেবে। ক্রমে পশুকে সে কাজে লাগাল চাষের কাজে, দুধ জোগানোর কাজে, গাড়ি টানার কাজে। অরণ্যের তরুখণ্ডকে সে সেই আদিযুগেই নৌকো করে ভাসিয়েছে জলে।

অরণ্য সম্পদ

সভ্যতার পথে যতই মানুষ এগোতে লাগল প্রাকৃতিক সম্পদকে ততই সুকৌশলে ব্যবহার করতে লাগল আরও বেশি করে।

মাটির ওপরকার জিনিসই শুধু নয় মাটির নিচেকার ধাতুসম্পদের সন্ধানও সে পেল। মানুষ সেদিন হল আরও শক্তিমান। কবির কথায় বলি—

খনিজসম্পদ

কঠিন লোহা কঠিন ঘুমে ছিল অচেতন
ও তার ঘুম ভাঙাইনু রে,
লক্ষ যুগের অন্ধকারে ছিল সঙ্গোপনে,
ওগো তায় জাগাইনুরে।

একদিনকার ভূগর্ভে বিলীন অরণ্যকে অঙ্গার হিসাবে নিষ্কাশিত করছি আমরা। মাটির পাথুরে স্তর থেকে তুলে আনছি তেল। আর এই কয়লা আর তেল বিভিন্ন শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের স্বাচ্ছন্দ্যকে বাড়িয়ে দিচ্ছে শতগুণে।

বিজ্ঞান ও সম্পদ আহরণে ব্যপকতা

নদীপরিকল্পনায় আমরা প্রকৃতির জলসম্পদকে কাজে লাগাচ্ছি নানাভাবে, জলশক্তি থেকে পাচ্ছি বিদ্যুৎ, এই বিদ্যুৎ আলাদীনের আশ্চর্য দীপ হয়ে আমাদের সহস্র উপকারে আসছে। অরণ্যের উদ্ভিদ ও প্রাণীতে পাচ্ছি রোগজয়ী ভেষজের সন্ধান। পর্বতের অজস্র শিলাসম্পদকেও কাজে লাগাচ্ছি পথ ও গৃহ নির্মাণে ও নদীশাসনে। সমুদ্র থেকেও পাচ্ছি আহার্য আর শক্তির যোগান।

স্থলেজলে প্রকৃতির সম্পদকে ভোগ করতে করতে আমরা তাকে প্রায় নিঃশেষ করে আনছি। তাই এখন আমরা পাড়ি দিচ্ছি অন্তরীক্ষে। উদ্দেশ্য দুটি— প্রথম উদ্দেশ্য উপগ্রহ চাঁদ বা অন্য কোনো গ্রহে নতুন সম্পদের সন্ধান, দ্বিতীয় উদ্দেশ্য—অন্তরীক্ষ থেকে পার্থিব সম্পদের নূতন ঠিকানার সন্ধান।

অন্তরীক্ষ অভিযান

প্রকৃতির সম্পদ আহরণ আমাদের করতেই হবে, কিন্তু তা যদি হয় লুব্ধ, অপরিমিত ও অসংযত তাহলে আমাদের এক ভয়াবহ অবস্থার সম্মুখীন হতে হবে একথা যেন আমরা স্মরণে রাখি। আজ পরিবেশ দূষণের সমস্যায় আমরা জর্জরিত। এই পরিবেষ দূষণরোধে প্রকৃতিই হতে পারে আমাদের সহায়। প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করেই আমরা পরিবেশকে সুস্থ রাখতে পারি। বনমহোৎসবের তাৎপর্য আমরা যেন হৃদয়ঙ্গম করি। বন বা তরুচ্ছেদে আমরা প্রকৃতির যে ক্ষতি করেছি সুপরিকল্পিত তরুরোপণের মধ্যে দিয়ে আমরা যেন সেই ক্ষতি পূরণ করবার চেষ্টা করি। এই চেষ্টাই যথার্থ উৎসব।

উপসংহার

মানব-সভ্যতায় বন-সংরক্ষণ

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

[ভূমিকা—প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ—প্রাচীনকালে বনের প্রয়োজন—ভারতের প্রাচীন বন—আবহাওয়ার উপর প্রভাব—পরোক্ষ অবদান—দেশ ও জাতির স্বার্থে বনসংরক্ষণ—উপসংহার]

ভূমিকা

প্রায় পাঁচ লক্ষ বছর আগে বিবর্তনের সিঁড়ি বেয়ে মনুষ্যপদবাচ্য জীবের যখন পৃথিবীতে আবির্ভাব ঘটল, তখন পৃথিবীর স্থলভাগের প্রায় সবটুকু জুড়ে ছিল বন আর গাছপালা। বনই তখন মানুষকে লালন-পালন করেছে। গাছের ফল আর কন্দ খেয়ে মানুষ জীবন-ধারণ করেছে। পরবর্তীকালে যখন তারা তীর, ধনুক, কুঠার ইত্যাদি আবিষ্কার করল তখন পশুপাখির মাংস তার খাদ্য-তালিকায় স্থান পেল, কাজেই বনের বাইরে কোথাও জীবন-ধারণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভবই ছিল না।

প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ

কালক্রমে মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে লাগল, সেই সঙ্গে বনে শিকার-যোগ্য প্রাণীর সংখ্যাও কমে এল। মানুষ বুঝল শিকার করে সম্পূর্ণ খাবার সংগ্রহ করা যাবে না, তখন সে পশুপালন আবিষ্কার করল। গৃহপালিত পশু থাকলে দুধ আর মাংসের সরবরাহ অব্যাহত থাকে, এই তথ্যটি বুঝতে শিখল। পশুপালন করতে গিয়ে দেখা গেল বিস্তৃত এবং সরস বনভূমি না থাকলে সুষ্ঠু পশুপালন সম্ভবপর নয়, তাই বনের একস্থানে বাস না করে তাকে যাযাবর-বৃত্তি নিতে হল। যেখানে পশুর খাদ্য সহজলভ্য, সেখানেই তাকে যেতে হল। এই ভাবে এবং গাছের ফলমূল দিয়ে কোন রকমে জীবন-যাত্রা চললেও জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে পরিস্থিতি এমন হল যে, যাযাবর বৃত্তিতে আর সংসার চলে না। মানুষ তখন আবিষ্কার করল শস্য-চাষ। এর সুবিধা হল এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস করা চলে, আর ফল-কন্দ সংগ্রহের অনিশ্চয়তা স্থায়ী চাষে নেই। বনের মধ্যে তাই মাঝে মাঝে বসতি গড়ে উঠল। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, যাকে আমরা বলি বৈদিক সভ্যতা, তার বিকাশ ও বিস্তার হল বনে—তপোবনে।

প্রাচীনকালে বনের প্রয়োজন

বৈদিক যুগে শস্য-চাষের প্রচলন থাকলেও চাষের বিস্তৃতি তত ছিল না। বেশির ভাগ অঞ্চল জুড়ে তখনও বন ছিল জীবন-যাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কুটিরের জন্যে কাঠ, খড়, বেত যোগাত বন। বনেই হত পশুচারণ। শিকার করে মাংস আহরণ করতে হত, কাজেই তখনও সব ব্যাপারেই মানুষকে বননির্ভর না হয়ে উপায় ছিল না। অবশ্য আমরা আজও কতখানি বননির্ভর তা হয়তো অনেকেরই অজানা। বাড়ি, ঘর, আসবাবপত্র, পরিবহনের নৌকা, রেল, বাস, রেললাইন পাতবার স্লিপার, সবকিছুতেই কাঠের প্রয়োজন, আর বনই তার যোগান দেয়। প্লাষ্টিক, কাগজ ইত্যাদির কাঁচা মাল হল বাঁশ আর কাঠ। রবার, ট্যান, রজন, সাবান তৈরির তেল সবই বৃক্ষজাত। এসবের কোনটি বাদ দিয়ে আজকাল জীবনযাত্রার কথা ভাবা যায় না। শিশুর দোলনা থেকে মৃতের কফিন বা চিতা পর্যন্ত মানুষের জীবনের প্রতিটি স্তরেই বনের অবদান রয়ে গেছে। বনৌষধি যুগ যুগ ধরে মানুষকে

নিরাময় করে এসেছে আর আজও নানারকম রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্র বনৌষধি থেকে প্রস্তুত করা হয়। বৈদিক যুগের চেয়ে আধুনিক যুগের মানুষ সম্ভবত অধিক পরিমাণেই বননির্ভর, কেবল তফাৎ এই যে, বৈদিক যুগে লোকে বনক্ষয় না করে শুধু তার উপস্বত্ব ভোগ করত, কিন্তু আধুনিক সভ্যতার সর্বগ্রাসী ক্ষুধা বনকেই গ্রাস করেছে। কৃষি আবিষ্কার করে মানুষ সুলভে খাদ্য ও বসনের যোগান সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হল। তার সম্পদও বাড়তে লাগল আর অধিক সংখ্যায় লোক কৃষিকাজে মন দিল। নদীর উপত্যকায় বনোৎপাদন করে তৈরি হল চাষের জমি। ক্রমশ জনবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চাষের জমি যেমন বাড়তে লাগল, সেই সঙ্গে বন সঙ্কুচিত হতে লাগল, যার ফলে দেখা দিতে লাগল খরা আর অল্প বৃষ্টিতে প্লাবন, যার তাণ্ডবে একদিন গোটা সভ্যতাই ধুয়ে মুছে গেল। এইভাবে মহেঞ্জোদারোর প্রাচীন সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে অনেক হাত পলিমাটির তলে। পণ্ডিতদের অনুমান, একইভাবে তলিয়ে গেছে প্রাচীন মিশর আর ব্যাবিলনের সভ্যতা। বাইবেলের যুগে, মধ্যপ্রাচ্যে ছিল নিবিড় দেবদারু-বন যেখানে এখন ধূ-ধূ করছে মরুভূমি।

বৈদিক যুগে রাজস্থানে থর মরুভূমি এত বিস্তৃত ছিল না, রাজ্যটি ছিল বেশ বনাকীর্ণ, আর তার মধ্য দিয়ে বয়ে যেত স্বচ্ছ-সলিলা সরস্বতী নদী যা এখন মরুভূমিতে বিলীন।

ভারতের প্রাচীন বন

মহাভারতে আমরা কাম্যক বন, দ্বৈত বন প্রভৃতির উল্লেখ দেখতে পাই। এগুলি সবই ছিল রাজস্থানে, যেখানে আজ আর বন নেই, আর দেশের প্রায় সবটাই থর মরুভূমির কবলে।

'বিজ্ঞান-প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে' আমরা প্রকৃতির অনেক তথ্য জেনেছি, যার মধ্যে একটি হল যে বনসঙ্কোচনের ফলে যে-কোন স্থানের বৃষ্টিপাত কমে যায়। বৃষ্টিপাত বনের একটি

আবহাওয়ার উপর প্রভাব

পরোক্ষ অবদান, আর তা কমে গেলে কৃষিকার্য ব্যাহত হবেই। বন বা বৃক্ষের আর একটি ধর্ম হল মাটিকে স্বস্থানে এবং সরস করে ধরে রাখা। বনভূমির প্রকৃতি হল স্পঞ্জের মতো ভূগর্ভে জল ধরে রাখা। বনহীন তথা বৃক্ষহীন অঞ্চলে মাটি ক্রমশ নীরস হয়ে ভূমির অবক্ষয়ের সাহায্য করে আর চারপাশের জমির উর্বরতা কমে যায়। বনভূমি বৃষ্টির জলের ধারা রোধ করে আর প্রায় তিনভাগ শুষে নেয়, যা বনহীন ভূমির পক্ষে সম্ভবপর নয়। সেখানে বৃষ্টি হলেই প্লাবনের আশঙ্কা হয়। বন্যারোধে যে বনভূমির একটা সার্থক ভূমিকা আছে, বৈজ্ঞানিক মহল তা স্বীকার করেন।

আরও একটি পরোক্ষ অবদান আছে, আর তা হল বাতাসে অক্সিজেনের সরবরাহ অব্যাহত রাখা। নিঃশ্বাসের সঙ্গে আমরা যে বাতাস টেনে নিই, শরীর তার থেকে

পরোক্ষ অবদান

অক্সিজেন শুষে নেয় আর তার বদলে প্রশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস ছেড়ে দেয়। কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাস শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। প্রকৃতির বরে উদ্ভিদ্ তার সবুজ পাতার মাধ্যমে এই কার্বন ডাই-অক্সাইড শুষে নিজের কলেবর বৃদ্ধি করে, আর একই প্রক্রিয়ায় উদ্বৃত্ত অক্সিজেন ত্যাগ করে, যা বাতাসে মিশে গিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখে। প্রকৃতি এই ব্যবস্থা না করলে

একদিন বায়ুমণ্ডলের সব অক্সিজেন নিঃসন্দেহে নিঃশেষিত হত, আর তখন প্রাণী-জগতের যে অবস্থা হত তা সহজেই অনুমেয়। অক্সিজেন হল প্রাণবায়ু, যা ছাড়া কোন প্রাণী বেঁচে থাকতে পারে না। আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে উত্তরোত্তর বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন আমরা বেশি পরিমাণেই খরচ করছি। যন্ত্রনির্ভর আধুনিক সভ্যতায় যন্ত্র চালাতে কয়লা, পেট্রল প্রভৃতি জ্বালানীর প্রয়োজন হয়, আর, কিছু জ্বালতে গেলেই অক্সিজেনের খরচ বৃদ্ধি পায়। শুধু তাই নয়, জালানী পুড়ে গেলে কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্ট হয়, যা বায়ুমণ্ডলে পুনরায় জমা হয়। অর্থাৎ যান্ত্রিক যুগে বৃক্ষ তথা বনের প্রয়োজন অনেক বেশি আর তা না হলেই ঘটবে পরিবেশদূষণ যা নিয়ে আজ সারা বিশ্বের জনগণ চিন্তিত। অনেকের মতে পরিবেশদূষণের সঙ্গে সঙ্গে দুরারোগ্য ক্যানসার রোগের প্রসার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বন-সঙ্কোচনের ফলে সারা পৃথিবী জুড়ে ভূমির অবক্ষয় প্রকট হয়ে উঠেছে যার ফলে কৃষি-উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে, আর ভূমিক্ষয় রোধ করতে সার্থক ভূমিকা নিতে পারে একমাত্র উদ্ভিদ্‌ই।

দেশ ও জাতির স্বার্থে বনসংরক্ষণ

অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর বিজ্ঞানীরা স্থির করেছেন যে ভূমির উর্বরতা এবং সরসতা স্থির রাখতে দেশের অন্তত ত্রিশ শতাংশে বনভূমির প্রয়োজন। গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে বা যেখানে বৃষ্টিপাত বেশি বা পাহাড়ী অঞ্চলে প্রয়োজন আরও বেশি, এমন কি সত্তর শতাংশ পর্যন্ত, যা কেবল জাপানেই আছে। উন্নত দেশগুলিতে ঐ হার বজায় থাকলেও অনুন্নত দেশগুলিতে জনবৃদ্ধির চাপে বনভূমিকে বলি দিতে হয়েছে চাষের জন্যে। তাই প্রকৃতির অমোঘ নিয়মে দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলে জমির উর্বরা-শক্তি ক্ষীয়মাণ, ফলে জীবনযাত্রার মান ক্রমশ নিম্নমুখী।

উপসংহার

বনের বিকল্প কিছু নেই, বনের অভাব বন সৃষ্টি করেই মেটাতে হবে। নতুন বন সৃষ্টি করে দেশের সম্পদ যে বাড়ান যায় তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ইস্রায়েল রাষ্ট্র। পৃথিবীর অন্যতম কনিষ্ঠ এই রাষ্ট্রটি মরুভূমিতে বন রচনা করে শুধু সকলকে চমৎকৃতই করে নি, বিদেশে কাগজের মণ্ড রপ্তানি করতে সক্ষম হয়েছে। বনের সঙ্গে সঙ্গে আশপাশের ভূমি হয়েছে সরস আর সেখানে তারা ফলের গাছ লাগিয়ে আর শস্যের চাষ করে দেশকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। পৃথিবীর অনেক দেশই ভাবতে আরম্ভ করেছে, বিত্তশালী মরুভূমি-প্রধান দেশগুলির পেট্রল ফুরিয়ে গেলে কী করে তারা বাঁচবে। খনিজের বদলে বনসম্পদ্ থাকলে দুর্ভাবনা কম হত, কারণ বনসম্পদ্ নিঃশেষিত হবার নয়, বন কেটে পুনরায় বন রচনা সম্ভব, আর সেটাই সবচেয়ে বড় আশার কথা।

চিন্তাসহায়ক বাণী

বিশ্বপ্রাণের মূক ধাত্রী এই গাছ নিরবচ্ছিন্ন কাল ধরে দ্যুলোককে দোহন করে ; পৃথিবীর অমৃতভাণ্ডারের জন্যে প্রাণের তেজ, প্রাণের রস, প্রাণের লাবণ্য

সঞ্চয় করে ; আর উৎকণ্ঠিত প্রাণের বাণীকে অহর্নিশি আকাশে উচ্ছ্বসিত করে তোলে, 'আমি থাকব'। গল্পগুচ্ছ/বলাই

নির্জন অরণ্যের সুগভীর কেন্দ্রস্থলে একটা সুনিবিড় সম্মোহন আছে যেখানে চলছে তার বুড়ো বুড়ো গাছপালার কানে কানে চক্রান্ত, যেখানে ভিতরে ভিতরে উচ্ছ্বসিত হচ্ছে সৃষ্টির আদিম প্রাণের মন্ত্রগুঞ্জরণ। দিনে দুপুরে ঝাঁ ঝাঁ করে ওঠে তার সুর উদাত্ত পর্দায়, রাতে দুপুরে তার মন্ত্রগম্ভীরে ধ্বনি স্পন্দিত হতে থাকে জীবচেতনায়, বুদ্ধিকে দেয় আবিষ্ট করে।

—তিনসঙ্গী/ছোটগল্প,
শেষকথা।

মহাবিশ্বে মহাকাশে

[ভূমিকা—মহাকাশ জয়ের প্রথম পর্ব—দ্বিতীয় পর্ব—প্রথম মহাকাশচারী—চাঁদে পদার্পণ—উপসংহার]

ভূমিকা

সভ্যতার জয়যাত্রার পথে স্বপ্নপুরীর দানব-দেবতাদের রহস্য উন্মোচন করতে করতে মানুষের রথ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দূর গ্রহ-তারার দিকে প্রসারিত করেছে তার গতিপথ। অচিন্ দেশের খবর আনতে ছুটে চলেছে সেই রথ—কারণ আজ রাতের গ্রহ-তারা-নক্ষত্র-ছায়াপথের আলোক-বিচ্ছুরণ, চন্দ্রালোকিত রাত্রির মায়াময় স্বপ্নিল আবেশ তাকে বেঁধে রাখতে পারে নি। মানুষের প্রয়োজনে আলোর উৎস-সন্ধানে তার যাত্রা—যেমনটি শুরু হয়েছে সভ্যতার আদি-পর্ব থেকে।

মহাকাশ জয়ের প্রথম পর্ব

মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রার প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে উড়োজাহাজের আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে। আকাশে পাখির মত ডানা মেলে উড়ে যাওয়ার স্বপ্ন সফল হল। কিন্তু শুরু হল পৃথিবীর পথ ছেড়ে আরও দূরে চাঁদের দেশে যাত্রা করার তোড়জোড়। বাধা অনেক—বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হল বিজ্ঞানে উন্নত দেশগুলির বিজ্ঞানাগারে। অঙ্ক কষার পালা শেষ করে বৈজ্ঞানিক বললেন, 'হ্যাঁ, সম্ভবপর।' পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ-শক্তির ক্ষেত্রকে অতিক্রম করে চন্দ্রের মাধ্যাকর্ষণ ক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়া সম্ভবপর।

দ্বিতীয় পর্ব

দূরবীক্ষণ-যন্ত্র তার শক্তিশালী চোখ দিয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিল চাঁদের দেশের। ছোটখাটো একটা মানচিত্র পৌঁছে দিল মানুষের হাতে। পৃথিবীর উন্নত দুই দেশে প্রচেষ্টা শুরু হল—যাত্রার প্রস্তুতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ও সোভিয়েত রাশিয়া একই সঙ্গে প্রচেষ্টা শুরু করেছিল। জুলে ভার্নের কল্পনা হল বাস্তবায়িত। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে রাইট ভ্রাতৃদ্বয়ের উড়োজাহাজ আবিষ্কারের পর নতুন যে-মহাকাশ-যান মহাবিশ্বে তার যাত্রা শুরু করল তার নাম দেওয়া হল 'স্পুটনিক'।

১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৪ঠা অক্টোবর তারিখটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকেরা সারা বিশ্বকে বিস্মিত ও অভিভূত করে মহাকাশে প্রেরণ করলেন প্রথম উপগ্রহ। ১৮৪.৩ পাউণ্ড ওজনের এই উপগ্রহটি ঘণ্টায় ১৮,০০০ মাইল বেগে ভূপৃষ্ঠের ৩০০ মাইল উপর (কখনও ৯০০ মাইল) দিয়ে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করতে থাকে। ১৯৫৭ খ্রীস্টাব্দের ৩রা নভেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন তার দ্বিতীয় উপগ্রহ প্রেরণ করল। এবার যাত্রী 'লাইকা' নামে একটি কুকুর। পৃথিবী থেকে প্রেরিত উপগ্রহের যাত্রী 'লাইকা' চার মাস পরে প্রত্যাবর্তনের পথে বায়ুস্তরের সঙ্গে সংঘর্ষে 'স্পুটনিক'টি ভস্মীভূত হওয়ায় লাইকা মারা যায়। ১৯৫৮ খ্রীস্টাব্দের ১লা ফেব্রুয়ারি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ 'আলফা'কে প্রেরণ করে। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে ১৯-এ আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন আবার একটি স্পুটনিক উৎক্ষেপণ করে। অন্তর্বর্তী কালীন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আরও কয়েকটি স্পুটনিক প্রেরণ করলেও, এবারের উপগ্রহটি যাত্রিবাহী। যাত্রী বেল্কা আর স্ত্রেল্কা নামে দুইটি কুকুর, কয়েকটি ছোট-বড় ইঁদুর, মাছি, উদ্ভিদ, ছত্রাক ও উদ্ভিদের বীজ। পরের দিন মহাকাশযানটি ভূপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন করে। মহাকাশচারী প্রাণীর ভূপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন এই প্রথম।

পরীক্ষা-নিরীক্ষার এই দীর্ঘ পর্যায় অতিক্রম করে অবশেষে এল সেই বহুপ্রতীক্ষিত দিনটি। ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল রুশ মহাকাশচারী ইউরি গাগারিন 'ভোস্তক-১' মহাকাশযানটিতে মহাকাশে যাত্রা করেন। ১ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট মহাকাশে অবস্থানের পর পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে গাগারিন পৃথিবীতে ফিরে আসেন। প্রথম মার্কিন মহাকাশচারী জন গ্লেন 'ফ্রেণ্ডশিপ-৭' যোগে ৪ ঘণ্টা ৫৬ মিনিটে ৩ বার পৃথিবী পরিক্রমা করেন ১৯৬২ খ্রীস্টাব্দের ২০-এ ফেব্রুয়ারি। সোভিয়েত রাশিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহাশূন্যে একের পর এক যাত্রিবাহী উপগ্রহ প্রেরণ করতে থাকে। ১৯৬৩ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জুন পৃথিবীর প্রথম মহাকাশচারিণী ভ্যালেন্তিনা তেরেশকোভা রুশ উপগ্রহ 'ভোস্তক-৬' যোগে ৭০ ঘণ্টা ৫৩ মিনিটে ৪৯ বার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন।

প্রথম মহাকাশচারী

১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দের ২০-এ জুলাই মানুষের মহাকাশ-অভিযান এক বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করল। ১৬ জুলাই মার্কিন মহাকাশ-যান অ্যাপোলো-১১ অভিযাত্রী-ত্রয় নীল আর্মস্ট্রং, অলড্রিন, মাইকেল কলিন্সকে নিয়ে যাত্রা শুরু করে। অবশেষে 'ঈগল' নামে মহাকাশযানের একটি অংশ আর্মস্ট্রং ও অলড্রিনকে নিয়ে চাঁদে অবতরণ করে। সেখানে তাঁরা চন্দ্র-বিজয়ের স্মারক ফলক প্রোথিত করেন ও কিছু বৈজ্ঞানিক কাজ শেষ করে 'ঈগল'-এ ফিরে আসেন। 'ঈগল' মূল মহাকাশযানটির সঙ্গে মিলিত হয় ও তিন মহাকাশচারীকে নিয়ে ২৪-এ জুলাই পৃথিবীতে ফিরে আসে। মানুষের চাঁদে পদার্পণের প্রথম ঘটনা হিসাবে অ্যাপোলো-১১র এই যাত্রা চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। অ্যাপোলো-১২ নামে মহাকাশযানটির তিন মার্কিন অভিযাত্রী ছিলেন কনরাড, গর্ডন ও অ্যালেন বীন। এঁরা চার ঘণ্টা চন্দ্রপৃষ্ঠে অবস্থান করেন, সেখানে একটি পরমাণুচালিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রালয় স্থাপন করেন।

চাঁদে পদার্পণ

বৈজ্ঞানিক গবেষণার জন্যে শুক্রগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছে উপগ্রহ। মঙ্গলগ্রহের উদ্দেশ্যেও উপগ্রহ প্রেরিত হয়েছে। সেই উপগ্রহ থেকে পাওয়া গেছে বহু আলোকচিত্র যা ভবিষ্যৎ গবেষণার মূল্যবান্ তথ্য। ব্যয়সাপেক্ষ হওয়ার জন্যে ধনী দেশগুলি ছাড়া আর কোন অনুন্নত দেশের পক্ষেই এই অভিযান চালানো সম্ভবপর নয়। মহাকাশে মানুষের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। পৃথিবীতে মানুষ যতদিন জীবিত থাকবে অজানাকে জানার কৌতূহল তাকে ছুটিয়ে নিয়ে যাবে আরও দূরে সৌরজগতের সীমানা ছাড়িয়ে ছায়াপথে—ছায়াপথের সীমানা ছাড়িয়ে দূর-দূরান্তরে। মহাবিশ্বে মহাকাশে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হোক মানুষের বিজয়শঙ্খ—মহাবিশ্বের রহস্যলোকে রহস্যোদ্‌ঘাটনের শুভযাত্রা সার্থক হোক।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১, আকাশ-বিজয় বা মহাশূন্যে পাড়ি। ২, চন্দ্র বিজয়।

চিন্তাসহায়ক বাণী

নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যুঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবেনা দেখা দেবতার অমর মহিমা?

—বলাকা ৩৭

বিজ্ঞানের গতি-প্রকৃতি

[ভূমিকা—আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ—যুদ্ধ ও বিজ্ঞান—হিংসা কেবল হিংসার জন্ম দেয় —বিজ্ঞান কোন পথে—মানুষের লোভ কিন্তু পশুশক্তি পরাভব—উপসংহার।]

ভূমিকা

বিজ্ঞান হল মানুষের বহুযুগের সাধনার ফসল। মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্যে সভ্যতার তিলোত্তমা মূর্তি রচনা করেছে। বিজ্ঞান ছাড়া সভ্যতার রথচক্র অচল হয়ে যেত, কারণ সে হল আমাদের শক্তি, আমাদের বেগ, আমাদের বাহন।

আমাদের জীবনে বিজ্ঞানের আশীর্বাদ

বিজ্ঞানের বরে মানুষের হাতের মুঠোয় এসেছে যেন আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। সেই অলৌকিক শক্তির বলেই সে যেন খনির অন্ধকারে জেলেছে আলো, বন্ধ্যা ধরণীকে করেছে শস্যশ্যামলা, ঊষর প্রান্তরকে করেছে জলসিক্ত, দূরকে করেছে নিকট, সে এক-হাতে বিদ্যুৎকে করেছে বন্দী, অন্য হাতে তার পারমাণবিক অস্ত্র। স্থলে চলেছে মোটর-ট্রেন, বিচিত্র যানবাহন, আর জলে ছুটেছে জাহাজ, আকাশে উড়েছে বিমান পোত, পাড়ি দিচ্ছে রকেট। প্রতিদিনের জীবনে বিজ্ঞান আমাদের সাতপাকে বেঁধেছে, একপাও তাই বিজ্ঞান ছাড়া

চলা যায় না। বিজ্ঞান এসেছে বেতার-দূরদর্শনরূপে, চলচ্চিত্র রেফ্রিজারেটার রূপে, বৈদ্যুতিক বা গ্যাসচুল্লি, এয়ার কণ্ডিশন, লিফট, আলো, পাখা, টাইপরাইটার, কমপিউটার আর কঠিন ব্যাধির ওষুধরূপে—আমাদের ঘরে আমাদের প্রাণে আমাদের চেতনায়। কিন্তু এতো কেবল বিজ্ঞানের উজ্জ্বল দিগন্ত। অন্যদিকে জমেছে অনেক ব্যথা বেদনার বিরহগাথা।

যুদ্ধ ও বিজ্ঞান

বিজ্ঞানের শৈশব কালে মানুষ বীরত্বের পরিচয় দিতে গিয়ে যুদ্ধ করেছে, দেশপ্রেমিক দেশ রক্ষার উদ্দেশ্যে যুদ্ধে করেছে অংশ গ্রহণ। এইভাবে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে হিরোসীমা নাগাসাকির সর্বনাশা ধ্বংস রূপকে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ট্রয়, কুরুক্ষেত্র, থার্মপলি, হলদিঘাটের যুদ্ধ অবলম্বনে রচিত হয়েছে কাব্য-মহাকাব্য। এই সব যুদ্ধে মানুষের ধর্মবোধ বিসর্জিত হয়নি। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সমর কৌশল যেমন বদলেছে তেমনি যুদ্ধ থেকে বিসর্জিত হয়েছে ধর্মবোধ আর মানবতা। বর্তমান যুগের যুদ্ধ বাহুবলের নয়, মানুষের বুদ্ধি আজ বাহুবলকে বহুদূরে অতিক্রম করে গেছে।

সাম্প্রতিক কালের যুদ্ধ বিজ্ঞানের সঙ্গে বিজ্ঞানের যুদ্ধ, এক গবেষণাগারের সঙ্গে আর এক গবেষণাগারের যুদ্ধ। যুদ্ধের জন্যে তাই রণক্ষেত্রের প্রয়োজন হয় না, প্রয়োজন হয় গবেষণাগারের। এই যুদ্ধের তাগিদেই বিজ্ঞান নিত্য নতুন মারণাস্ত্র প্রস্তুত করে চলেছে। তাই বিজ্ঞান আর বিজ্ঞানীর দিকে বিশ্বের মানুষ বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে একটি কথাই কেবল ভাবছে, বিজ্ঞান কী চায় সৃষ্টি না ধ্বংস? বিজ্ঞান কি বহুযুগের সাধনার আশীর্বাদ না অভিশাপ?

হিংসা কেবল হিংসার জন্ম দেয়

বিজ্ঞানের শক্তিকে মানুষ আজ প্রতিযোগিতার কাজে লাগিয়েছে। এই ভাবেই চলেছে আক্রমণ আর আত্মরক্ষা, উগ্র থেকে উগ্রতর হয়ে। বোমারু বিমানের জন্য তৈরি হল বিমান ধ্বংসী কামান, বিষবাষ্প প্রতিরোধে সৃষ্টি হয় গ্যাসমুখোস, এ্যাটম বোমাকে প্রতিরোধ করার জন্যে গবেষণা চলেছে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের। আণবিক অস্ত্রের চলেছে পরীক্ষা আর, প্রদর্শনীমূলক প্রতিযোগিতা। এক কথায় হিংসা সৃষ্টি করে চলেছে নব নব হিংসাকে। যার সামনে অসহায় মানুষের উঠেছে নাভীশ্বাস। তাই বিজ্ঞানের কাছে মানুষের প্রশ্ন মানব সভ্যতাকে সে কোথায় নিয়ে চলেছে?

বিজ্ঞান কোন পথে

মানুষ একদিন ছিল প্রকৃতির হাতের পুতুল। কিন্তু বিজ্ঞান-সাধক শ্রেষ্ঠ মনীষীরা অতন্দ্র সাধনায় মানুষকে এনে দিয়েছে নিষ্ঠুর প্রকৃতিকে শাসনের অধিকার। প্রকৃতির কত গোপন সম্পদ আর শক্তি আজ মানুষের হস্তগত। জলে-স্থলে-মহাকাশে তার অবাধ বিচরণ। যে ভয়ঙ্করকে সে সাধনার দ্বারা একদিন শুভঙ্কর করে তুলেছিল সেই সাধনায় আজ নতুন করে তৈরি করেছে ধ্বংসের পথ। তবে কি বিশ্বকল্যাণ বিজ্ঞানের দ্বারা ব্যর্থ হতে চলেছে? আজ বিজ্ঞানীর কাছে তাই এই জাতীয় অসংখ্য প্রশ্ন নিয়ে মানুষ উপস্থিত হয়েছে। মানুষের প্রশ্ন কেন তারা—অশুভ কাজে নিজের শক্তি ও মনীষাকে ব্যবহার করে? জীবন-সাধনার পরিবর্তে কেন

তাদের এই মৃত্যু সাধনা? এই সব প্রশ্নের উত্তর আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে। রোগের কারণ জানা গেলে তবেই রোগের ওষুধ আবিষ্কৃত হতে পারে।

মানুষের লোভে কিন্তু পশুশক্তি পরাভব

আধুনিক রাষ্ট্রনীতি ও সমাজ ব্যবস্থাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মুষ্টিমেয় মানুষের সীমাহীন লোভ পররাজ্য গ্রাসের ইচ্ছাকে দুর্বার করে তুলেছে। এই অন্ধ বর্বর ধনিকশ্রেণীর কাছে আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ তাদের বিবেক-বুদ্ধি বিক্রি করে দিয়েছে। ব্যক্তি স্বার্থ, গোষ্ঠীচেতনা ও রাজনীতি আজ মানবতার উর্ধ্বে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। স্বার্থপর মানুষ গড়ুরের মত বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা নিয়ে বিশ্বকে গ্রাস করতে চায়। এই নরমেধ যজ্ঞে বৈজ্ঞানিক নিয়েছেন পূজারীর ভূমিকা। কিন্তু মানুষের শুভবুদ্ধি এমনি করে চিরকালই বিকৃত ক্ষুধার ফাঁদে ধরা দিতে পারে না। মানুষের স্বার্থবুদ্ধি তথা সাম্রাজ্যবাদ একদিন পৃথিবীর বুক থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে, সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত হবে সাম্য-মৈত্রী ও সমাজতন্ত্র। হয়তো ধ্বংসের বুকে বসেই সেদিনের বৈজ্ঞানিকের মনে শুভবোধের উদয় হবে, প্রাণে আবার জাগবে মানবকল্যাণের প্রেরণা।

উপসংহার

কথামৃতে আছে পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, একই প্রদীপের আলোয় বসে কেউ ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে, কেউ বা দলিলপত্র জাল করে। দোষ গুণ প্রদীপের আলোয় নেই, প্রদীপের আলোকে যারা কাজে লাগায় তাদের মধ্যে। কথামৃতের এই উদাহরণ সামনে রেখে বিজ্ঞান সম্পর্কেও আমরা একই কথা বলতে পারি। দোষগুণ বিজ্ঞানের নয়, দোষগুণ বিজ্ঞান ব্যবহারকারী মানুষের, বিজ্ঞানকে ভাল কাজে ব্যবহার করলে বিজ্ঞান আশীর্বাদ, তা না হলে বিজ্ঞান অভিশাপ।

মহাকাশ-গবেষণায় ভারতের অবদান

[ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৮২]

[ভূমিকা—মহাকাশ-গবেষণায় ভারতের উদ্দেশ্যে—আর্যভট্ট-ভাস্কর-রোহিণী ১, ২—অ্যাপোলোর আকাশ বিচরণ—পৃথিবীর কক্ষপথে ইনস্যাট-১ এ—উপসংহার।]

ভূমিকা

সভ্যতার জয়যাত্রার পথে স্বপ্নপুরীর দানব-দেবতাদের রহস্য উন্মোচন করতে করতে মানুষের রথ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের দূর গ্রহ-তারার দিকে প্রসারিত করেছে তার গতিপথ। অচিন্ দেশের খবর আনতে ছুটে চলছে সেই রথ—কারণ আজ রাতের গ্রহ-তারা নক্ষত্র-ছায়াপথের আলোক বিচ্ছুরণ, চন্দ্রালোকিত রাত্রির মায়াময় স্বপ্নিল আবেশ তাকে বেঁধে রাখতে পারে নি। মানুষের প্রয়োজনে আলোর উৎসসন্ধানে তার যাত্রা—যা শুরু হয়েছে সভ্যতার আদিপর্ব থেকে।

প্রাচীন ভারতীয় বৈজ্ঞানিক মহাকাশ গবেষণায় গৌরব অর্জন করেছিলেন। আধুনিক কালেও গবেষণার সেই ঐতিহ্যময় ধারা ভারতীয় বৈজ্ঞানিকগণ বজায় রেখে চলেছেন।

মহাকাশ-গবেষণার গুরুত্ব উপলব্ধি করে প্রতিষ্ঠিত হল Department of Space এবং ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে সৃষ্টি হল Space Commission। এসবের অধীনে গবেষণার দায়িত্ব ন্যস্ত হল 'ISRO' (Indian Space Research Organisation)-এর উপরে, যদিও কাজ আরম্ভ হয়েছে আরও আগে ত্রিবান্দ্রমের উপকণ্ঠে ডক্টর হোমি ভাবা এবং ডক্টর বিক্রম সারাভাইয়ের নেতৃত্বে। ISRO-র অধীনে আমাদের দেশে যেসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ত্রিবান্দ্রমে TERIS এবং VSSC, ব্যাঙ্গালোরে ISAC—ISRO স্যাটিলাইট সেন্টার; আহমেদাবাদে SAC-স্যাটিলাইট এ্যাপলিকেশন সেন্টার; পূর্ব উপকূলে শ্রীহরিকোটাতে ভারী রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র। ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদ্‌গণ VSSC-তে রকেট এবং ISAC-তে স্যাটিলাইট নির্মাণ-কৌশলে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। থুম্বা থেকে উৎক্ষিপ্ত কয়েকশত আবহাওয়া রকেট মারফৎ নিরক্ষ অঞ্চলে উর্ধ্বাকাশের অনেক নতুন তথ্য জানা গেছে।

মহাকাশ-গবেষণায় ভারতের উদ্দেশ্য

ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহের নাম দেওয়া হয়েছে আর্যভট্ট। ভারতীয় বিজ্ঞানী ও রুশ প্রযুক্তিবিদ্‌গণের সহযোগিতায় নির্মিত এই উপগ্রহটি রাশিয়ার বিয়াস লেক থেকে মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়েছে। ১৯৭৫ খ্রীস্টাব্দের ১৯-এ এপ্রিলে উৎক্ষিপ্ত এই কৃত্রিম উপগ্রহটি নিজের কক্ষপথে থেকে বেশ কয়েক বছর মহাকাশের নানান তথ্য জানাতে সক্ষম হয়েছিল। আর্যভট্টের সাফল্যে ভাস্কর ও রোহিণী-১ ও ২-এর পরিকল্পনা। পরিকল্পনার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষার কাজ দ্রুত এগিয়ে চলল, সফল হল ভাস্কর-রোহিণী এবং বহু পর্যায়ী রকেট SLV-৩ (Satellite Lunce Vehicle)। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা চলে, SLV-৩, ভারতে তৈরি বহুপর্যায়ী রকেট যার সাহায্যে SHAR কেন্দ্র থেকে আমাদের দেশের বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ্‌গণ নিজেদের তৈরি উপগ্রহ রোহিণীকে উৎক্ষেপ করে ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দের ১৮ই জুলাই। এই সব উপগ্রহ ছিল সঞ্চরণশীল। একবার পৃথিবীর প্রদক্ষিণ করতে এদের সময় লাগে প্রায় দেড় ঘণ্টার মতো।

আর্যভট্ট-ভাস্কর-রোহিণী ১, ২

১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের ১৯-এ জুন ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন ভারতীয় সময় সন্ধ্যা ছয় টা তিন মিনিটে ফরাসী গিয়ানার কুরু থেকে রকেটে চড়ে সোনালী রঙের অ্যাপোলো তার নীল পাখা নিয়ে আকাশে পাড়ি জমাল। উৎক্ষেপণের আধ ঘন্টার মধ্যেই শ্রীহরিকোটা ও আমেদাবাদে অ্যাপোলো থেকে পাঠানো সংকেত ধরা পড়ল। এর পর কলকাতার টি. ভি. দর্শকরা ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দের ১৩ই আগস্ট একটা নতুন জিনিস দেখলেন, প্রধানমন্ত্রী ভারতের নিজস্ব যোগাযোগবাহী উপগ্রহ অ্যাপোলোকে জাতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন। এই অনুষ্ঠান একই সময়ে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, আমেদাবাদ ও কলকাতা প্রভৃতি শহর থেকেও দেখা ও শোনা গেল। পরের দিন জাতির উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি যে ভাষণ দিলেন তাও শোনা গেল এবং এই সব দেখা গেল টি. ভি.র পর্দায়। এইভাবে অ্যাপোলো ভারতে দূর-যোগাযোগের ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।

অ্যাপোলোর আকাশ-বিচরণ

পৃথিবীর কক্ষপথে ইনস্যাট-১ এ

এর পর ভারতের প্রথম ব্যবহারিক উপগ্রহ ইনস্যাট-১ এ আমেরিকার কেপ ক্যানিভেরাল থেকে ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের ১২ই এপ্রিল আকাশে ওড়ানো হল। ইসরো উপগ্রহ কেন্দ্রের ঘোষণায় জানা যায় ১২ই এপ্রিল সন্ধ্যায় মূল ইনস্যাট নিয়ন্ত্রণকেন্দ্র থেকে উপগ্রহটির অ্যাপজি মোটর দ্বিতীয়বার চালু করা হয়, তার ফলে ইনস্যাট প্রায় ভূসমলয় কক্ষপথে পৌঁছে যায়।

এই কেন্দ্রের বিজ্ঞানীরা আরও একটা ব্যাপারে সফল হয়েছেন। ইনস্যাটের সৌরকোষ প্যানেলটিকে চূড়ান্ত ভূসমলয় কক্ষপথ অনুসারে বিন্যস্ত করেছেন তাঁরা। এই প্যানেলই উপগ্রহটিকে যোগাচ্ছে সৌর বিদ্যুৎ। এই ইসরো উপগ্রহ-কেন্দ্রের ডিরেকটর হলেন ইউ. আর. রাও। তাঁরই পরিচালনায় ইনস্যাট-১এ মহাকাশে উৎক্ষিপ্ত হয়।

উপসংহার

বর্তমান যুগে মহাকাশ-গবেষণা ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে, নব নব দিগন্ত হয়েছে উন্মোচিত। ভারত পিছিয়ে নেই। অবশ্য অনেকের মনেই আজ একটা প্রশ্ন জেগেছে, নানা সমস্যা-জর্জরিত যে দেশের অসংখ্য মানুষ চরম দারিদ্র্যে দিন কাটায়, সে দেশে মহাকাশ-গবেষণায় কোটি কোটি টাকা খরচ করার সার্থকতা কতটুকু? কথাটা ভেবে দেখার মতো। কিন্তু এ কথা ঠিক, এই সব বৈজ্ঞানিক গবেষণা সার্থক হলে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়ে উন্নতি ও সমৃদ্ধির পথ প্রসারিত হবে। এই আশাই আমরা পোষণ করব। জনশিক্ষা, কৃষি-উন্নয়ন প্রভৃতি কাজে উপগ্রহের অনবদ্য ভূমিকার কথা আজ সবাই জানে। আমাদের আশা, আত্মপ্রত্যয় ও আত্মনির্ভরশীলতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে আগামী দিনের বিজ্ঞান দেশের জটিল সমস্যা মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. মহাবিশ্বে মহাকাশে। ২. ভারতের বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানী।

গৃহকার্যে বিজ্ঞানের ব্যবহার

[উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮২]

[ভূমিকা—বিজ্ঞান আজ আমাদের ঘরে—বাইরের জীবনে বিজ্ঞান—বিজ্ঞান নির্ভরতার কুফল—উপসংহার।]

ভূমিকা

প্রাচীন কালের মানুষ পাহাড়ের গুহায় বাস করত, ব্যবহার করত পাথরের অস্ত্র, পাথরের পাত্রে আহার করত, পরিধান করত পাথরের অলংকার। তাই এই যুগকে বলা হত প্রস্তরযুগ। এই ভাবে মানব-সভ্যতা প্রস্তরযুগ পার হয়ে লৌহ-তাম্র-যুগের ওপর দিয়ে আজ এক নতুন যুগে এসে দাঁড়িয়েছে, যে যুগকে আমরা বিজ্ঞানের যুগ নামে চিহ্নিত করতে পারি।

বিজ্ঞান মানবজীবনকে সুস্থির করেছে, তাকে দিয়েছে শ্রী এবং শক্তি। বিজ্ঞান আজ গৃহবাসী মানুষকে করেছে নগরবাসী। মানুষের ঘরে এবং বাইরে সর্বত্রই শোনা যায় বিজ্ঞানের পদধ্বনি। প্রতিদিন সকালে শয্যাত্যাগ থেকে রাত্রে শয্যাগ্রহণ পর্যন্ত বিজ্ঞান যেন জননীস্নেহে মানুষকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। রেডিয়োর প্রভাতী ঘোষণা শুনে আমাদের ঘুম ভাঙে। বিজ্ঞান এনে দেয় কলের জল, কখনও ঠাণ্ডা কখনো গরম। মাথার ওপর ঘুরছে পাখা, রেকর্ডপ্লেয়ারে অথবা রেডিয়োতে বেজে চলেছে প্রিয় শিল্পীর কণ্ঠের গান। কখনও আবার খেলার মাঠের ছবি ভেসে উঠছে টেলিভিশনের পর্দায়, বিজ্ঞানের কৃপায় ফ্রিজের মধ্যে বন্দী হয়ে আছে একটা মিনি বাজার। মাছ-মাংস থেকে শাক-সব্জী, রান্নার কাজে বিদ্যুতের বা গ্যাসের ব্যবহার আজ তো শহরের ঘরে ঘরে, সুদূরের সংবাদ এনে দিচ্ছে সংবাদপত্র, সুদূরের বন্ধুর কণ্ঠ শোনাচ্ছে টেলিফোন।

বিজ্ঞান আজ আমাদের ঘরে

আবার ঘরের আসবাব, পরনের পোশাক সবই পেয়েছে মানুষ বিজ্ঞানের কৃপায়। রান্নাঘর, শোবারঘর, বৈঠকখানা, স্নানের ঘর, পাঠগৃহ সব কিছুকেই বিজ্ঞান তার মনের মতো করে সাজিয়েছে। স্প্রিংদেওয়া-খাট, গদি, শীতাতপনিয়ন্ত্রণ যন্ত্র, আলমারি-চেয়ার-ফুলদানি-কার্পেট কিছুই এ তালিকা থেকে বাদ পড়ে না। এর পরেও আছে নিত্য-ব্যবহারযোগ্য বিলাস উপকরণ যা না হলে আমাদের চলে না। দাড়িকামানো ব্লেড থেকে শুরু করে মনমাতানো সেন্ট-সাবান সবই এসেছে বিজ্ঞানের দৌলতে।

ভোগ্য আর বিলাস-পণ্যের পাশে বিজ্ঞানের দান—শিক্ষার উপকরণ কালি, কলম, কাগজ, পড়ার বই-পত্রিকা। স্বাস্থ্যরক্ষায় এসেছে ওষুধ।

সংসার-জীবনের বাইরে মানুষের কর্মময় জীবন। সেখানেও মানুষ বিজ্ঞানের আশীর্বাদ-ধন্য। ঘরের বাইরে পা বাড়াতে না বাড়াতেই 'দুয়ারে প্রস্তুত গাড়ি' ট্রাম, বাস, ট্যাক্সি, সাইকেল, স্কুটার, মোটর আমাদের শ্রমলাঘব করে সময় বাঁচায়। চাবি টেপার সঙ্গে সঙ্গে ওপর থেকে নেমে আসে লিফ্‌ট, আমাদের চোখের নিমেষে দশ-বিশ তলা অফিসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দেয়। সেখানে টাইপরাইটারে চিঠি টাইপ করা হয়, কম্‌পিউটারের সাহায্যে তৈরি হয় জটিল হিসাব। এরপর অফিসের শেষে আছে সিনেমা দেখার আনন্দ। এই ভাবে ঘরে আর বাইরে বিজ্ঞান হয়ে উঠেছে মানুষের অনুগত সহচর।

বাইরের জীবনে বিজ্ঞান

বিজান মানুষের দেহ-মনের সঙ্গে এমনভাবে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে যে বিজ্ঞান ছাড়া আমরা এক মুহূর্ত বাঁচতে পারি না। উদাহরণ হিসাবে বিদ্যুৎসংকট, যানবাহন-সমস্যা, ভোগ্য পণ্যের অনটন প্রভৃতির কথা বলতে পারি। অতিরিক্ত বিজ্ঞান-মুখাপেক্ষিতা আমাদের স্বাভাবিক শক্তিকে পঙ্গু করে দিয়েছে। তাই লিফ্‌ট অচল হলে আমরা সিঁড়ি ভাঙার শক্তি হারিয়ে গোমড়া মুখে বিজ্ঞানের নিন্দে করি। এই ভাবে পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রনৈতিক জীবনে আজ নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে।

বিজ্ঞান নির্ভরতার কুফল

বিজ্ঞান শহর-জীবনে অপরিহার্য, কিন্তু পল্লী-জীবনে আজও সে কৃপণ ধনীর মত আচরণ করে চলেছে। এর কারণ অবশ্যই দারিদ্র্য। যতদিন শহর ও গ্রামের এই প্রভেদ দূর না হবে ততদিন বিজ্ঞান-সম্রাটের অভিষেক থাকবে অসমাপ্ত।

উপসংহার

বিজ্ঞান ও ধর্ম

[পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৮২]

[ভূমিকা—মানবজীবনে বিজ্ঞান ও ধর্ম—বিজ্ঞান ও ধর্মের ধ্বংসাত্মক দিক—উপসংহার।]

ভূমিকা

বিজ্ঞানের কাজ প্রত্যক্ষ বাস্তব বিষয়বস্তু নিয়ে, আর মানুষের বহুকালের অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধিজাত যে-সমস্ত নিয়মনীতি মানবসমাজকে ধারণ করে আছে, তাই ধর্ম। বিজ্ঞান ও ধর্ম উভয়ের লক্ষ্য সত্যের অনুসন্ধান। তবে বিজ্ঞান সত্যের অনুসন্ধান করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে, আর ধর্মের সত্যানুসন্ধানের পথ মানুষের প্রত্যয়জাত উপলব্ধি। সুতরাং ধর্মের মাধ্যমে সত্য উপলব্ধির পথ নীরন্ধ্র নিশীথকালে শর-সন্ধানের মত, সে পথ কণ্টকময়, দুর্গম। ধর্মের অনুসন্ধানের পথে সত্যসন্ধানী যীশুখ্রীস্টকে বিধর্মীদের হাতে নিষ্ঠুর মৃত্যু বরণ করতে হয়েছিল। মহামানব বুদ্ধদেব এই সত্যসন্ধানে রাজ্যসম্পদ্, সুন্দরী স্ত্রী এবং স্নেহের পুত্র ত্যাগ করে কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনা বরণ করেছিলেন, হজরত মহম্মদকে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল, আর নদীয়াবাসীর প্রাণপ্রতিম নিমাই সুন্দরী স্ত্রীর প্রেম এবং মায়ের স্নেহডোর ছিন্ন করে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। কঠোর জীবন-সাধনার দ্বারা এ সমস্ত মহামানব মানবমুক্তির মন্ত্রদীক্ষিত যে জ্যোতির্ময় সত্যের জগতে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, আধুনিক দ্বন্দ্বরত, উদ্‌ভ্রান্ত পৃথিবীতে তার প্রভাব এখনও সজীব। বিজ্ঞানীর সত্যলাভের সাধনাও ত্যাগব্রতী মহামানবদের জীবনসাধনার মত কঠিন ও কঠোর হলেও মানব সমাজের ওপর তার প্রভাব অনন্তকাল স্থায়ী নয়। বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কার সত্য-স্বরূপকে যুগে যুগে রূপান্তরিত করছে, এ কারণে বিজ্ঞান-সত্যে চরম বলে কোন কথা নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষা-পরায়ণ বৈজ্ঞানিকের কাছে সত্য আপেক্ষিক।

মানবজীবনে বিজ্ঞান ও ধর্ম

ধর্ম যেমন সর্বযুগের মানুষকে যন্ত্রণা ও মোহমুক্ত করার কাজে নিয়োজিত, বিজ্ঞানের নব নব আবিষ্কারও তেমনি মানুষের দুঃখ-যন্ত্রণা-লাঘবের কাজে বহুদূর অগ্রসর। ধর্মের মতই বিজ্ঞান প্রত্যক্ষবাদী যুক্তি-প্রয়োগে মানুষকে কুসংস্কারমুক্ত করেছে। এ ছাড়া পরীক্ষামূলক বিজ্ঞান এ যুগের যন্ত্রণাজর্জর মানুষকে শুধু দুঃসহ ব্যাধিমুক্ত করে নি, যন্ত্রপ্রয়োগের সাহায্যে হৃদ্‌রোগাক্রান্ত মানুষের নিশ্চিত মৃত্যু পর্যন্ত সাময়িকভাবে ঠেকিয়ে রেখেছে। আধুনিক প্রযুক্তি-বিজ্ঞানের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা মানুষের বহুযুগ-লালিত কল্পনার জাল ছিন্ন ভিন্ন

করে আংশিক হলেও মহাজাগতিক রহস্য উদ্ঘাটন করে সংস্কারাচ্ছন্ন মানুষকে প্রত্যক্ষ সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এই মহাজাগতিক রহস্য-আবিষ্কারে কত বিজ্ঞানীর কত বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে, কত অর্থ-সম্পদ্ ও প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জিত হয়েছে তার হিসেব মেলাতে গেলে অবাক হয়ে যেতে হয়।

বিজ্ঞান ও ধর্মের ধ্বংসাত্মক দিক

ধর্ম যেমন মানুষকে সদ্জীবনচর্যা এবং মুক্তিপথের নির্দেশ দিয়েছে, বিজ্ঞানও তেমনি জীবনদায়ক বহু ঔষধ, যন্ত্র-আবিষ্কার, দ্রুত গমনাগমনের জন্য আধুনিক যানবাহন-আবিষ্কার, রাসায়নিক সার-প্রয়োগে কৃষিসম্পদ-বৃদ্ধি প্রভৃতির সাহায্যে মানুষের যন্ত্রণাজর্জর দুঃসহ জীবনকে অনেকটা সুসহ করে তুলেছে। সমীক্ষার সাহায্য দেখা গেছে, আধুনিক পরীক্ষামূলক ও প্রযুক্তি-বিজ্ঞান নানাবিধ উদ্ভাবনের সাহায্যে মানুষের চলার পথে বহু বাধাকে অপসারিত করে জীবনকে শুধু সুসহ করে তোলে নি, মানুষের আয়ুঃসীমা পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। তেমনি বহু ধর্মপ্রাণ মহাপুরুষ যুগে যুগে আবির্ভূত হয়ে অধর্ম এবং অসত্যের পথে ভেসে যাওয়া মানুষকে সত্য, ন্যায়নীতি এবং মানবপ্রেমের পথে আকর্ষণ করেছেন। বিজ্ঞান ও ধর্মের মানব-কল্যাণমূলক এই সৎকাজগুলি যে কোন সচেতন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

বিজ্ঞান ও ধর্ম বহির্জীবন এবং অন্তর্জগতের দিক থেকে মানব-প্রগতির জন্য বহু কল্যাণজনক কাজে ব্রতী হলেও বর্তমান সময়ে এমন প্রবণতার পরিচয় দিয়েছে যা মানুষের সুচিরসঞ্চিত সভ্যতার ধ্বংস-সাধনে উদ্যুক্ত। বিজ্ঞানের সব চাইতে ধ্বংসাত্মক ভূমিকা হল মারণাস্ত্র-আবিষ্কারে। আধুনিক জগতের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি তাদের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের নিযুক্ত করেছে কত সূক্ষ্ম এবং অব্যর্থ নিপুণ কৌশলে শত্রুপক্ষের আত্মরক্ষামূলক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি এবং মানুষের জীবন নিমেষে বিনষ্ট করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনে। হিরোশিমা-নাগাশাকিতে আকাশযান থেকে যে আণবিক বোমা নিক্ষেপ করে লক্ষ লক্ষ লোককে মারা হয়েছিল, আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলে সে মৃত্যুবর্ষী ক্ষেপণাস্ত্রের উৎকর্ষ আরও সহস্রগুণ বেড়েছে। আজ আর দীর্ঘপথ অতিক্রম করে বোমারু বিমান থেকে শত্রুপক্ষের লোকহত্যার জন্য আণবিক বোমা-নিক্ষেপের প্রয়োজন হয় না, বিজ্ঞানে অতি প্রগতিশীল দেশগুলিতে এমন ক্ষেপণাস্ত্র এবং উৎক্ষেপণ যন্ত্রের আবিষ্কার হয়েছে যে, কোন দেশের অস্ত্রকেন্দ্র থেকে সে ক্ষেপনাস্ত্র নিক্ষিপ্ত হলে অতি স্বল্প সময়ে তা হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করে লক্ষ্যবস্তুর ওপর পতিত হবে এবং নিমেষেই তাকে ধ্বংস করে দেবে। আজ শক্তিশালী জাতির মধ্যে নিত্যদ্বন্দ্ব বর্তমান থাকা সত্ত্বেও যে তৃতীয় মহাযুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে না তার প্রধান কারণ এই বিধ্বংসী বিদ্যুদ্গামী ক্ষেপণাস্ত্রের ভয়। এ ছাড়াও সভ্যতাগর্বী আধুনিক প্রগতিশীল দেশের মানুষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কৃত বস্তুর সাহায্যে কত মানুষের নির্মম মৃত্যুর কারণ হয়েছে, তার সীমাসংখ্যা নেই। ধর্মের নামে অন্ধ সংস্কারও তেমনি শুধু মধ্যযুগে অগণিত নিরপরাধ মানুষের মর্মান্তিক মৃত্যুর কারণ হয় নি, এই সভ্যতাগর্বী আধুনিক যুগেও মানুষের সংস্কারান্ধ ধর্মচেতনা মানুষের মধ্যে বৈরিতাবুদ্ধি এবং সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বকে যে তীব্র করে তুলেছে, তা আমরা নিত্য-নিয়ত দেখতে পাচ্ছি।

উক্ত আলোচনায় এ সত্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, বর্তমান পৃথিবীর দ্বন্দ্বরত মানুষ এবং মুমূর্ষু মানব সভ্যতাকে রক্ষা করতে সমর্থ একমাত্র বিজ্ঞান ও ধর্মের সুপ্রয়োগ এবং সদ্ব্যবহার।

উপসংহার

এশিয়ান গেম্‌স

[গোড়ার কথা—এশিয়ান গেমসের যাত্রা শুরু ও পরবর্তী অনুষ্ঠান—গত এশিয়ান গেমস এর কথা—এই অনুষ্ঠানে ভারতের ভূমিকা—ভারতীয় ভূমিকার মূল্যায়ন—ভারতীয় খেলার মানোন্নয়নে সতিকারের চেষ্টা চাই—বিরাশির নবম এশিয়ান গেম্‌স—উপসংহার]

এশিয়ান গেম্‌সকে মিনি অলিম্পিক আখ্যা দিলে বোধ হয় খুব একটা অসঙ্গত হবে না। অলিম্পিকের আসরে পাঁচ মহাদেশের সাদর আহ্বান। আর এশিয়ান গেম্‌স সীমাবদ্ধ শুধু এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে। ইউরোপ, আমেরিকার তুলনায় এশিয়ার খেলাধুলার মান যে নিচের দিকে, এটা মানতে দ্বিধা নেই। তাই এশিয়ার অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর খেলাধুলায় উৎকর্ষের জন্যে এশিয়ান গেম্‌স-এর আয়োজন যুক্তিপূর্ণ। এর মধ্যে কোনো সংকীর্ণতা বা একদেশদর্শিতার ব্যাপার নেই। ভারতীয় হিসেবে আমাদের গৌরব এই যে, ভারতই সর্বপ্রথম এশিয়ান গেমস্ সংগঠনে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে। এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে একত্র করে অলিম্পিকের পদাঙ্ক অনুসরণে একটা বড় মাপের খেলার আসর বসানো ছিল এই সংগঠনের লক্ষ্য। আর এশিয়ার দেশগুলোকে খেলার সূত্রে মিলন ও সংহতির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করাটাও ছিল পরোক্ষ উদ্দেশ্য। খেলার মাধ্যমে প্রাণের মেলা বসে। আর এই প্রাণের মেলা বিবিধের মাঝে মহান্ মিলনের সেতু রচনা করে। অতএব উদ্দেশ্য মহৎ, সন্দেহ নেই।

গোড়ার কথা

১৯৫০ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে প্রথম এশিয়ান গেম্‌স অনুষ্ঠিত হয়। অলিম্পিকের মতই চার বছর অন্তর এই খেলা এশিয়ার বিভিন্ন দেশে অনুষ্ঠিত হতে লাগল। ১৯৫৪-তে ফিলিপাইনের ম্যানিলায় দ্বিতীয় অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। তৃতীয় অনুষ্ঠান হল জাপানের টোকিওতে। এর পর পর্যায়-ক্রমে ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায়, থাইল্যাণ্ডের ব্যাঙ্ককে আর ইরানের তেহরানে এশিয়ান গেম্‌স্ অনুষ্ঠিত হয়েছে। ব্যাঙ্ককে আবার অষ্টম এশিয়ান গেম্‌স উদ্‌যাপিত হয় ১৯৭৮-এ।

এশিয়ান গেম্‌সের যাত্রা শুরু ও পরবর্তী অনুষ্ঠান

প্রথম দিকে এশিয়ান গেমসের প্রতিযোগী দেশের সংখ্যা স্বভাবতই কম ছিল। কিন্তু ক্রমশ উৎসাহ-উদ্দীপনা বাড়তে থাকে। ব্যাঙ্ককে অনুষ্ঠিত অষ্টম এশিয়ান গেম্‌সের আসর ছিল জমজমাট। এই আসর শুরু হয় ১৯৭৮-এর ৯ই ডিসেম্বর। মহাসমারোহের মধ্য দিয়ে থাইল্যাণ্ডের রাজা উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠান। মোট ২৭টি দেশ যোগদান করে। প্রতিযোগীর সংখ্যা ছিল সরকারী হিসাবমত তিন হাজার। সংখ্যাটা কিন্তু উপেক্ষণীয় নয়। এই অনুষ্ঠানে

গত এশিয়ান গেমস এর কথা

জাপান বিশেষ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখে। জাপান প্রায় সব বিভাগেই প্রশংসনীয় দৃঢ়তা ও যোগ্যতা দেখিয়ে ৭১টি স্বর্ণপদক লাভ করে। চীন ৫১টি স্বর্ণপদক পেয়ে দ্বিতীয় স্থান লাভ করে। চীন বর্তমানে খেলাধূলায় যথেষ্ট উন্নতি করেছে।

এই অনুষ্ঠানে ভারতের ভূমিকা

ভারত ১৯৭৮-এর খেলায় ১১টি স্বর্ণপদক পেয়ে ষষ্ঠ স্থান অধিকার করে। পাঁচ হাজার ও দশ হাজার মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় ভারতের দৌড়বীর হরি চাঁদ দুটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। আর অ্যাথেলেটিক্স-এ স্বর্ণপদক পান শ্রীরাম সিং, জ্ঞান শরণ, হাকক সিং, বাহাদুর সিং, সুরেশবাবু ও গীতা সুৎসী। কুস্তীতে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়ে স্বর্ণপদক বিজয়ী হন কর্তার সিং ও রাজিন্দর সিং। রণবীর সিং সুটিং-এ স্বর্ণপদক পান। অষ্টম এশিয়ান গেম্স-এ ভারতের ভূমিকা অবশ্য অন্যান্য দেশের তুলনায় নিষ্প্রভ। পাকিস্তানের কাছে হকিতে ভারতের পরাজয় দুঃখজনক। তা ছাড়া, ভলিবল ও বাস্কেট বলেও ভারতের পুরুষ ও মহিলা দলের ব্যর্থতা শোচনীয়। এদিক দিয়ে বিচার করলে ভারতের চেয়ে অনেক ছোট দেশ, বিশেষ করে অ্যাথেলেটিক্স-এ যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে কোরিয়া ও থাইল্যাণ্ডের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় ভূমিকার মূল্যায়ন

এশিয়ার ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা উজ্জ্বল নয়। এ নিয়ে অনেক সমীক্ষা, বাদবিতণ্ডা হয়েছে। অনেক সমালোচনার ঝড়ও বয়ে গেছে। এশিয়ার অনেক ছোট ছোট দেশ যেখানে খেলাধূলায় ক্রমশ এগিয়ে আসছে, সেখানে ভারতের এই ব্যর্থতা সত্যই ভাবনার বিষয়। কিন্তু শুধু ভাবনা নয়, চাই কার্যকরী ব্যবস্থা। কথা তো অনেক হল, কিন্তু আমাদের নানা প্রস্তাব, পরিকল্পনা কতদূর বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যেতে পারে। তবে এ কথাও স্বীকার্য যে খেলাধূলায় প্রশংসনীয় সাফল্য অর্জনের কোনো ফরমূলা বা জাদুবিদ্যা নেই। আমরা এমন কোনো দৈবের কথা ভাবছি না যে ভারত অলিম্পিক কিংবা এশিয়ান্ গেম্স-এ গিয়ে টপাটপ সোনার মেডেল কুড়িয়ে আনুক। আমরা আরো কিছুদিন ধৈর্য ধরতে রাজি আছি।

ভারতীয় খেলার মানোন্নয়নে সত্যিকারের চেষ্টা চাই

একটা দেশের খেলাধূলার মানোন্নয়ন অনেক বিষয়ের ওপর নির্ভর করে। অর্থ চাই, স্বাস্থ্য চাই, সাধনা চাই। এ-ব্যাপারে সরকারী উদ্যোগ ও কর্মনিষ্ঠা চাই সর্বাগ্রে। স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের খেলাধূলার ওপর আরো দৃষ্টি ও যত্ন চাই। গ্রাম উপেক্ষিত থাকলে চলবে না। উপযুক্ত শিক্ষকের শিক্ষা-ব্যবস্থায় খেলাধূলাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। রাজনৈতিক কোন্দলে যেন খেলাধূলা মসীলিপ্ত না হয়। আমাদের রাত্রির তপস্যা নিশ্চয় সোনালি দিন এনে দেবে। এখনও আমরা বিশ্বাসী।

১৯৮২ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে নবম এশিয়ান গেম্স-এর অনুষ্ঠান বসেছিল। সাজ-সাজ-রব পড়ে গিয়েছিল। উদ্যোগ-আয়োজনের অন্ত নেই। স্টেডিয়াম-তৈরী, পথ-ঘাট-নির্মাণ, সুইমিং পুল, নতুন হোটেল স্থাপন, বাড়ি-ঘর তৈরীর কাজ দ্রুত শেষ করা হয়েছে।

আর সমগ্র দিল্লী উত্তাল হয়ে উঠেছিল নবম এশিয়ান গেম্‌সকে কেন্দ্র করে। ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের সংস্কারের কাজ শেষ। লোদি কলোনি ও রাজঘাটে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন সুদৃশ্য স্টেডিয়াম। অতিক্রুত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আচ্ছাদিত সুইমিং পুলের কাজ শেষ হয়েছে তালকোটরা গার্ডেন্‌স-এ। মূল স্টেডিয়ামের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্যে কয়েকটি ফ্লাই ওভার এবং নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার নবম এশিয়ান গেম্‌স এর জন্যে বরাদ্দ করেছিলেন ৫৫ কোটি টাকা। বিশেষজ্ঞের ধারণা, মোট ব্যয় হয়েছে এর দশগুণ।

বিরাশির নবম এশিয়ান গেমস

এত অর্থ ব্যয় করে ভারতের নিদারুণ অর্থ সঙ্কটের দিনে এশিয়ান গেম্‌স এর আয়োজন করার ব্যাপারে নানা বিরূপ সমালোচনাও চলছে। অনেকের বক্তব্য, এই অর্থ ভারতের খেলার মানোন্নয়নে ব্যয় করলে অনেক ভাল হত। আমাদের মতে, ভারতে এশিয়ান গেম্‌স হচ্ছে হোক। কিন্তু এর সঙ্গে চলুক আমাদের খেলাধূলার উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা। আমাদের অ্যাথেলেটিক্‌সের কথা বাদ দিলেও হকি ফুটবলের যে কি হাল হবে এই খেলায়, তা অনুমানের বিষয়। অবশ্য প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। দিল্লী কি দূরস্ত্‌? জানি না।

উপসংহার

অলিম্পিক ও ভারত

[ভূমিকা—অলিম্পিকের জন্মকথা—প্রাচীনকালের অলিম্পিক]

পতাকায় চিহ্নিত পাঁচটি বলয় গ্রথিত হয়ে আছে। আকাশে উড়্‌ছে সেই পতাকা। পাঁচটি বলয় পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক। অলিম্পিকের এই পতাকা মহাদেশীয় সংহতির এক অপূর্ব নিদর্শন। পতাকাটি সুন্দর ব্যঞ্জনায় বলে দেয় অলিম্পিকের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশ যেন পরস্পর হাত ধরাধরি করে আছে। অলিম্পিক বিশ্বভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন। বিশ্বমৈত্রীর শান্তিযজ্ঞ।

ভূমিকা

অলিম্পিকের জন্ম নাকি বহু বছর আগে। প্রাচীন গ্রীসে বসত অলিম্পিকের আসর। যীশুখ্রীস্টের জন্মের অনেক আগে এলিস-প্রদেশের উপত্যকায় অলিম্পিকের সূচনা। এই উপত্যকার নামই ছিল অলিম্পিয়া। গ্রীক দেবতা জিউসের মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে এক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। গ্রীক বীর হেরাক্লস নাকি অলিম্পিকের সূত্রপাত করেন। ইতিহাসে পাওয়া যায়, খ্রীস্টপূর্ব ৭৭৬ থেকে প্রতিচার বছর বাদ দিয়ে অলিম্পিকের কথা। কিন্তু ৩৯৩ খ্রীস্টাব্দে অলিম্পিক বন্ধ হয়ে যায় রোম সম্রাট থেওদাসিতাসের হুকুমে।

অলিম্পিকের জন্মকথা

প্রথম দিকে অলিম্পিক সীমাবদ্ধ ছিল কেবল এক দিনের একটি দৌড় প্রতিযোগিতার মধ্যে। ক্রমশ অবশ্য ক্রীড়াসূচী বাড়তে থাকল। সপ্তাহব্যাপী অলিম্পিকের কথাও শোনা যায়। তখনকার অলিম্পিকেও কিন্তু দর্শকদের কথা ভাবা হত। তাদের জন্য পাথরের তৈরী আসনের ব্যবস্থা থাকত। আর থাকত দেবতাদের রাজা জিউসের মূর্তি। চারিদিকে সাজসজ্জার পরিপাট্যও নাকি ছিল।

প্রাচীনকালের অলিম্পিক

১৮৭৫-৮১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল আদ্যিকালের অলিম্পিক আসরের ধ্বংসাবশেষ। এর পর থেকেই নতুন করে অলিম্পিকের আসরের প্রবর্তনার কথা ভাবতে শুরু করলেন অনেকে। তবে পীয়ের দ্য কুবেয়ারত্যাঁকেই আধুনিক অলিম্পিকের জনক বলা হয়ে থাকে। তিনি ফ্রান্সের অধিবাসী। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক সভায়। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে গ্রীসের এথেন্সে অলিম্পিক শুরু হল নতুন করে। এর পর থেকে চার বছর অন্তর পৃথিবীর কোনো-না-কোনো দেশে অলিম্পিকের আসর বসছে সগৌরবে। গত অলিম্পিকের আসর বসেছিল ১৯৮৪-তে লসএঞ্জেলস্-এ।

আধুনিক অলিম্পিকের উদ্ভব

অলিম্পিকের মূল উদ্দেশ্যের আভাস এ প্রবন্ধের গোড়াতেই দেওয়া হয়েছে। মহামানবের মিলনক্ষেত্র অলিম্পিক। খেলার ছলে প্রাণের মেলা বসানোর আয়োজন এই অলিম্পিক। তা ছাড়া, অন্য উদ্দেশ্যও আছে। সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর নানা দেশের খেলার মান বাড়িয়ে তোলার মাধ্যমও এটি। তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে খেলা ধূলার বিভিন্ন বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের সম্মানিত করাও অলিম্পিকের উদ্দেশ্য।

অলিম্পিকের উদ্দেশ্য

অলিম্পিকের আসরে ভারতও এগিয়ে এসেছে। অলিম্পিকের আনন্দযজ্ঞে ভারতও নিমন্ত্রিত। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, ভারত ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম অলিম্পিকে যোগ দেয়। ব্যক্তিগত বোনা প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের মল্লবীর যাদব ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। এর পর থেকে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় ভারতের ভূমিকা মোটেই উজ্জ্বল হতে পারে নি। তবে হকির আসরে ভারত অলিম্পিকক্রীড়া-ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ রচনা করে রেখেছে। ১৯২৮-এর আমস্টারডম অলিম্পিক থেকে শুরু করে ১৯৫৬-এর মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হকির আসর পর্যন্ত ভারত পর পর ছ'বার স্বর্ণপদক লাভ করে এক রেকর্ড সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু এর পর থেকে ইউরোপের হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ এবং অস্ট্রেলিয়া হকির ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে বেশ শক্তিশালী প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলল। আর ভারতের সবচেয়ে বড়ো বাধা হয়ে দেখা দিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের হকি যেন স্তিমিত হল। কখনও পাকিস্তান কখনও ভারত, এই ভাবে চলতে লাগল চরম উত্তেজনাপূর্ণ হকির জমজমাট আসর।

অলিম্পিকে ভারতের ভূমিকা

আর সমগ্র দিল্লী উত্তাল হয়ে উঠেছিল নবম এশিয়ান গেম্‌সকে কেন্দ্র করে। ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের সংস্কারের কাজ শেষ। লোদি কলোনি ও রাজঘাটে তৈরি হয়েছে নতুন নতুন সুদৃশ্য স্টেডিয়াম। অতিক্রত শীততাপ নিয়ন্ত্রিত আচ্ছাদিত সুইমিং পুলের কাজ শেষ হয়েছে তালকোটরা গার্ডেন্‌স-এ। মূল স্টেডিয়ামের সঙ্গে সংযোগ রাখার জন্যে কয়েকটি ফ্লাই ওভার এবং নতুন রাস্তা তৈরি করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার নবম এশিয়ান গেম্‌স এর জন্যে বরাদ্দ করেছিলেন ৫৫ কোটি টাকা। বিশেষজ্ঞের ধারণা, মোট ব্যয় হয়েছে এর দশগুণ।

বিরাশির নবম এশিয়ান গেমস

এত অর্থ ব্যয় করে ভারতের নিদারুণ অর্থ সঙ্কটের দিনে এশিয়ান গেম্‌স এর আয়োজন করার ব্যাপারে নানা বিরূপ সমালোচনাও চলছে। অনেকের বক্তব্য, এই অর্থ ভারতের খেলার মানোন্নয়নে ব্যয় করলে অনেক ভাল হত। আমাদের মতে, ভারতে এশিয়ান গেম্‌স হচ্ছে হোক। কিন্তু এর সঙ্গে চলুক আমাদের খেলাধূলার উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা। আমাদের অ্যাথেলেটিক্‌সের কথা বাদ দিলেও হকি ফুটবলের যে কি হাল হবে এই খেলায়, তা অনুমানের বিষয়। অবশ্য প্রস্তুতি চলছে জোর কদমে। দিল্লী কি দূরস্ত্‌? জানি না।

উপসংহার

অলিম্পিক ও ভারত

[ভূমিকা—অলিম্পিকের জন্মকথা—প্রাচীনকালের অলিম্পিক]

পতাকায় চিহ্নিত পাঁচটি বলয় গ্রথিত হয়ে আছে। আকাশে উড়্‌ছে সেই পতাকা। পাঁচটি বলয় পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশের প্রতীক। অলিম্পিকের এই পতাকা মহাদেশীয় সংহতির এক অপূর্ব নিদর্শন। পতাকাটি সুন্দর ব্যঞ্জনায় বলে দেয় অলিম্পিকের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর পাঁচটি মহাদেশ যেন পরস্পর হাত ধরাধরি করে আছে। অলিম্পিক বিশ্বভ্রাতৃত্বের সেতুবন্ধন। বিশ্বমৈত্রীর শান্তিযজ্ঞ।

ভূমিকা

অলিম্পিকের জন্ম নাকি বহু বছর আগে। প্রাচীন গ্রীসে বসত অলিম্পিকের আসর। যীশুখ্রীস্টের জন্মের অনেক আগে এলিস-প্রদেশের উপত্যকায় অলিম্পিকের সূচনা। এই উপত্যকার নামই ছিল অলিম্পিয়া। গ্রীক দেবতা জিউসের মন্দিরের সংলগ্ন স্থানে এক ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। গ্রীক বীর হেরাক্লস নাকি অলিম্পিকের সূত্রপাত করেন। ইতিহাসে পাওয়া যায়, খ্রীস্টপূর্ব ৭৭৬ থেকে প্রতিচার বছর বাদ দিয়ে অলিম্পিকের কথা। কিন্তু ৩৯৩ খ্রীস্টাব্দে অলিম্পিক বন্ধ হয়ে যায় রোম সম্রাট থেওদাসিতাসের হুকুমে।

অলিম্পিকের জন্মকথা

প্রথম দিকে অলিম্পিক সীমাবদ্ধ ছিল কেবল এক দিনের একটি দৌড় প্রতিযোগিতার মধ্যে। ক্রমশ অবশ্য ক্রীড়াসূচী বাড়তে থাকল। সপ্তাহব্যাপী অলিম্পিকের কথাও শোনা যায়। তখনকার অলিম্পিকেও কিন্তু দর্শকদের কথা ভাবা হত। তাদের জন্য পাথরের তৈরী আসনের ব্যবস্থা থাকত। আর থাকত দেবতাদের রাজা জিভসের মূর্তি। চারিদিকে সাজসজ্জার পরিপাট্যও নাকি ছিল।

প্রাচীনকালের অলিম্পিক

১৮৭৫-৮১ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেল আদ্যিকালের অলিম্পিক আসরের ধ্বংসাবশেষ। এর পর থেকেই নতুন করে অলিম্পিকের আসরের প্রবর্তনার কথা ভাবতে শুরু করলেন অনেকে। তবে পীয়ের দ্য কুবেয়ারতাঁ্যাকেই আধুনিক অলিম্পিকের জনক বলা হয়ে থাকে। তিনি ফ্রান্সের অধিবাসী। তাঁরই উদ্যোগে ১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিরা মিলিত হলেন প্যারিসে অনুষ্ঠিত এক সভায়। এই সভার সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮৯৬ খ্রীস্টাব্দে গ্রীসের এথেন্সে অলিম্পিক শুরু হল নতুন করে। এর পর থেকে চার বছর অন্তর পৃথিবীর কোনো-না-কোনো দেশে অলিম্পিকের আসর বসছে সগৌরবে। গত অলিম্পিকের আসর বসেছিল ১৯৮৪-তে লসএঞ্জেলস্-এ।

আধুনিক অলিম্পিকের উদ্ভব

অলিম্পিকের মূল উদ্দেশ্যের আভাস এ প্রবন্ধের গোড়াতেই দেওয়া হয়েছে। মহামানবের মিলনক্ষেত্র অলিম্পিক। খেলার ছলে প্রাণের মেলা বসানোর আয়োজন এই অলিম্পিক। তা ছাড়া, অন্য উদ্দেশ্যও আছে। সামগ্রিকভাবে পৃথিবীর নানা দেশের খেলার মান বাড়িয়ে তোলার মাধ্যমও এটি। তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে খেলা ধুলার বিভিন্ন বিভাগের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগীদের সম্মানিত করাও অলিম্পিকের উদ্দেশ্য।

অলিম্পিকের উদ্দেশ্য

অলিম্পিকের আসরে ভারতও এগিয়ে এসেছে। অলিম্পিকের আনন্দযজ্ঞে ভারতও নিমন্ত্রিত। সরকারী পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেখা যায়, ভারত ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে প্রথম অলিম্পিকে যোগ দেয়। ব্যক্তিগত কোনো প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে ভারতের মল্লবীর যাদব ১৯৫২ খ্রীস্টাব্দে হেলসিংকিতে অনুষ্ঠিত অলিম্পিকে তৃতীয় স্থান অধিকার করে ব্রোঞ্জ পদক লাভ করেন। এর পর থেকে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় ভারতের ভূমিকা মোটেই উজ্জ্বল হতে পারে নি। তবে হকির আসরে ভারত অলিম্পিকক্রীড়া-ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ রচনা করে রেখেছে। ১৯২৮-এর আমস্টারডম অলিম্পিক থেকে শুরু করে ১৯৫৬-এর মেলবোর্নে অনুষ্ঠিত হকির আসর পর্যন্ত ভারত পর পর ছ'বার স্বর্ণপদক লাভ করে এক রেকর্ড সৃষ্টি করে রেখেছে। কিন্তু এর পর থেকে ইউরোপের হল্যাণ্ড, পশ্চিম জার্মানী প্রভৃতি দেশ এবং অস্ট্রেলিয়া হকির ক্ষেত্রে বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা নিয়ে বেশ শক্তিশালী প্রতিরোধের প্রাচীর গড়ে তুলল। আর ভারতের সবচেয়ে বড়ো বাধা হয়ে দেখা দিল পাকিস্তান। পাকিস্তানের বিপক্ষে ভারতের হকি যেন স্তিমিত হল। কখনও পাকিস্তান কখনও ভারত, এই ভাবে চলতে লাগল চরম উত্তেজনাপূর্ণ হকির জমজমাট আসর।

অলিম্পিকে ভারতের ভূমিকা

কিন্তু শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানই সবচেয়ে শক্তিশালী দল হিসেবে ভারতকে তার আগের গৌরবের আসন থেকে সরিয়ে দিল। অলিম্পিকে শেষবারের মত ভারত বিজয়ী হয় ১৯৬৮তে। সেবার আসর বসেছিল টোকিওতে। এর পর থেকে হকির জগৎ-সভায় ভারত তার শ্রেষ্ঠ আসনটি হারিয়ে ফেলেছে। এর অর্থ, অলিম্পিকের যে-কোনো বিভাগেই ভারতের ভূমিকা আজ একেবারেই নিষ্প্রভ।

অলিম্পিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতার খেলা। এ খেলার মান যে খুবই উন্নত এতে কোনো সন্দেহ নেই। কাজেই সেই মানে পৌঁছতে হলে প্রতিযোগী বা খেলোয়াড়দের সুকঠিন সাধনার সঙ্গে আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন। চাই ভারত জুড়ে খেলাধুলার বিজ্ঞানসম্মত আয়োজন। সরকারী উদ্যোগ, আনুকূল্য, উপযুক্ত পরিচালন-ব্যবস্থা, খেলার সরঞ্জাম, আরো কত কি! খেলাধুলা শুধু শহরে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। তাকে ছড়িয়ে দিতে হবে গ্রামে, গঞ্জে। খেলাধুলার ক্ষেত্রে কর্তৃপক্ষের রেষারেষি, ক্ষমতার লড়াই ইত্যাদিকেও বিসর্জন দিতে হবে। আমরা বিশ্বমানের চেয়ে অনেক পেছনে পড়ে আছি বলে শুধু আক্ষেপ করলে চলবে না।

অলিম্পিকে ভারতের ব্যর্থতার কারণ

শোনা যাচ্ছে, ভারতে অলিম্পিকের আসর বসাবার জন্যে নাকি দিল্লী থেকে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। অলিম্পিকের আসর বসানোটা রাজসূয় যজ্ঞের চেয়েও অনেক বেশি। এর জন্য শুধু বিপুল পরিমাণে অর্থ চাই তা নয়, চাই দেশজোড়া মানুষের উৎসাহ, উদ্যোগ, নিষ্ঠা ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের মতে এটা বোধ হয় কাঙালের হাতি-পোষার মত ব্যাপার হবে। এ প্রচেষ্টা ভারতের খেলার মানোন্নয়নে লাগালে বোধ হয় অনেক বেশি ভালো হবে।

শেষ কথা

একটি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ম্যাচের বর্ণনা

[ভূমিকা—সূচনা—খেলার বিবরণ—বর্ণনা—উপসংহার।]

ধ্রুপদী সঙ্গীত ধীর গতিতে তান-লয়-মীড়-মূর্ছনার বিস্তারে গড়ে তোলে এক অপূর্ব সৌন্দর্যলোক; খেলার জগতে ক্রিকেট সেই ধ্রুপদী সঙ্গীত। কৌশলী বলের দক্ষ মোকাবিলায়, পীচের বিচিত্র আচরণের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সূক্ষ্মভাবে অলক্ষ্যে ধীরে ধীরে সে-ও বিকশিত করে নিজেকে। মনোযোগী, বোদ্ধা দর্শকের কাছে তার আবেদন তাই দুর্দম।

ভূমিকা

এই আত্মবিকাশের মুহূর্তগুলি ঝলসে উঠে কখনো শ্বাসরোধকারী উত্তেজনায়, কখনো দক্ষতার চূড়ান্ত প্রকাশে, আবার কখনো বা ক্রিকেটের গৌরবময় অনিশ্চয়তার মহিমায়।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট অঙ্গনের গত একশো বছরের ইতিহাসে অসংখ্য খেলাই নানা দিক

থেকে ভাস্বর। তবে সামগ্রিকভাবে সমস্ত দিকগুলির উজ্জ্বলতম প্রকাশে অনন্য হয়ে আছে সেই খেলাটি, অনুষ্ঠানকালের পর দু-দু'টি দশক পেরিয়ে এসেও যার আবেদন পৃথিবীর সর্ব-প্রান্তের মানুষের মনে আজও রোমাঞ্চ জাগায়। সেই কথাই বলব আজ।

সূচনা

খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রিসবেনে; ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দের ৯-১৪ই ডিসেম্বর,—১১ই ছিল খেলার বিরতি। প্রতিযোগী দল দু'টি ছিল ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও অস্ট্রেলিয়া। এই প্রাথমিক তথ্যটুকু দিয়েই আমরা চলে আসি সরাসরি খেলার কথায়।

খেলার বিবরণ

মহান ক্রিকেটার স্যার ফ্রাঙ্ক ওরেলের সম্মানার্থে সেই বছর থেকেই ওয়েস্ট ইণ্ডিজ-অস্ট্রেলিয়া সিরিজের বিজয়ী দলের অধিনায়কের হাতে 'ওরেল ট্রফি' তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। প্রথম বছর সেই ট্রফি লাভ করার চ্যালেঞ্জ খেলার সূচনা-লগ্নেই ঘোষণা করলেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের গোড়াপত্তনকারী ব্যাটস্‌ম্যান কন্‌রাড হাণ্ট। টসে অস্ট্রেলীয় দলের অধিনায়ক রিচি বেনোকে হারিয়ে ওরেল সহজ পীচে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। হাণ্ট প্রথম ওভারের তৃতীয় ও চতুর্থ, পরপর দু'টি বলকে পাঠালেন বাউণ্ডারি সীমানার বাইরে। বল করছিলেন বিখ্যাত অল রাউণ্ডার এ্যালান ডেভিডসন। সেই মুহূর্তেই বোধহয় সকলের অজান্তে প্রতিটি খেলোয়াড় শপথবদ্ধ হয়েছিলেন লড়াই করার। প্রথম দিনে প্রথম ঘণ্টায় ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের রান-সংখ্যা দাঁড়াল 65 রানে 3 উইকেট। আউট হলেন হাণ্ট, স্মিথ ও কানহাই। এলেন সোবার্স,—জুটি বাঁধলেন ওরেলের সঙ্গে। অগ্ন্যুদ্গার ঘটতে থাকল তাঁর ব্যাট থেকে—আউট হলেন 132 রানে,—ওরেল এই ইনিংসকে সোবার্সের জীবনের সেরা ইনিংস বলে অভিহিত করেছেন,—ওরেল নিজে করলেন 65 রান। পরের দিন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ইনিংস শেষ হল 453 রানে। উল্লেখযোগ্য রান করলেন সলোমন (65) ও হল্ (50)। বোলিং-এ বিশেষ কৃতিত্ব দেখালেন ডেভিডসন (135 রানে 5 উইকেট) ও ক্লাইন (52 রানে 3 উইকেট)।

বর্ণনা

প্রত্যুত্তরে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ইনিংসে করল 505 রান। সেঞ্চুরি করলেন নর্ম্যান ওনীল (181 রান),—সেঞ্চুরির দোরগোড়ায় এসে আউট হলেন ববি সিম্পসন,—92 রানে। এ ছাড়া বড়ো অঙ্কের রান করলেন ম্যাকডোনাল্ড (57), ফ্যাভেল (45) ও ডেভিডসন (44)। ওয়েসলি হল্ 140 রানে 4 উইকেট দখল করলেন। এ দিকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হল মাত্র 284 রানে। ভাল রান পেলেন কানহাই (54), ওরেল (65) ও জো সলোমন (47)। ডেভিডসন আবার অসাধারণ বোলিং করলেন,—তাঁর হিসেব দাঁড়াল 87 রানে 6 উইকেট। জয়ের জন্যে অস্ট্রেলিয়ার প্রয়োজন 232 রান। জয়লাভের ঘ্রাণ পেতে পেতে তারা শুরু করল দ্বিতীয় ইনিংস। কিন্তু দু'ঘণ্টার মধ্যে তাদের রান দাঁড়াল 57 রানে 5 উইকেট। চা-বিরতির সময়ে 109 রানে 6 উইকেট। জয়ের জন্য তখন 120 মিনিটে 124 রান দরকার। ক্রিজে রয়েছেন বেনো ও ডেভিডসন। ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের খেলোয়াড়দের

হৃদয় তখন ক্যালিপাসো নাচের ছন্দে মুখর। ডেভিডসন ও বেনো তখন অতিক্রুত সিঙ্গল রান নিতে শুরু করলেন। দর্শকরা উত্তাল হয়ে উঠলেন উত্তেজনায়। ভাবতে অবাক লাগে সেদিন মাঠে হাজির ছিলেন মাত্র 4000 দর্শক। আজ গোটা পৃথিবী তাঁদের ঈর্ষা করে। শেষে যখন খেলার আর 30 মিনিট বাকি, তখন অস্ট্রেলিয়ার জয়ের জন্যে দরকার 27 রান। মাঠে উত্তেজনা তুঙ্গে। হল্ তখন হাতে নিলেন নতুন বল। আবলুসকাঠ খোদাই করে গড়া হলের ঘনকৃষ্ণ স্বাস্থ্যোজ্জ্বল মুখে তখন চিকচিক করছে ঘাম, আর বুকের ওপর দুলছে যীশুর রৌপ্য-নির্মিত ক্রুশবিদ্ধ মূর্তি। খেলা এগিয়ে চলল সকলের হৃৎস্পন্দনকে দ্রুততর করে। শেষে যখন আর 6 মিনিট বাকি জয়ের জন্যে দরকার 7 রান—তখন অসাধারণ নৈপুণ্যে সলোমন রান আউট করলেন ডেভিডসনকে। তাঁর নামের পাশে তখন 80টি রান। মাঠে এলেন গ্রাউট—সোবার্সের শেষ বলে একটি রান নিলেন তিনি। শুরু হল দিনের শেষ ওভার। বল করলেন হল্। প্রথম বলটির আঘাতে মাঠে পড়ে গেলেন গ্রাউট। বেনো ছুটে এসে তাকে বললেন 'রান'। কোনো রকমে গ্রাউট পৌঁছলেন ওদিকের উইকেটে, আর একটি সোনার চেয়ে দামী বাই-রান যুক্ত হল স্কোর বোর্ডে। সেই ওভারের দ্বিতীয় বলে আউট হলেন বেনো। মাঠে এলেন মেকিফ। চতুর্থ বলে তিনি নাটকীয় ভাবে একটি বাই-রান নিলেন। তখন আর বাকী 4 বল (অস্ট্রেলিয়া বনাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের খেলায় 8 বলে ওভার হয়), প্রয়োজন 4 রান। পঞ্চম বলে উঁচু ক্যাচ তুললেন গ্রাউট—কানহাই ঠিক জায়গায় তৈরি ক্যাচ ধরার জন্যে,—উত্তেজনায় আত্মবিস্মৃত হল্ ছুটে এলেন নিজে ক্যাচটি ধরার জন্যে,—দু'জনের ধাক্কায় বল মাটিতে পড়ে গেল। একটি রান হয়ে গেল ইতিমধ্যে। বাকি তিন বল, দরকার তিন রান। ষষ্ঠ বলটি মেকিফ সজোরে মারলেন, নিশ্চিত বাউণ্ডারি এবং জয়,—কিন্তু না—কন্‌রাড হাণ্ট অমানুষিক প্রচেষ্টায় বাঁচালেন সেই বল,—ইতিমধ্যে তিনটি রান নিয়ে চতুর্থ রানের জন্যে ছুটছেন ব্যাটস-ম্যানেরা—90 গজ দূর থেকে বল ছুঁড়ে অবিশ্বাস্য ভাবে গ্রাউটকে আউট করলেন হাণ্ট। গ্রাউট ঝাঁপিয়ে পড়েও শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। রান তখন সমান সমান, 232 রানে 9 উইকেট। ক্লাইন ওভারের সপ্তম বলটিকে মিড উইকেটে ঠেলে রান নিতে ছুটলেন। সলোমন বল ছুঁড়লেন উইকেট লক্ষ্য করে,—এবং হ্যাঁ—আউট। মাঠে সৃষ্টি হল ইতিহাস—শতাব্দী-ব্যাপী টেস্ট ক্রিকেট অঙ্গনের একমাত্র 'টাই টেস্ট'। সমস্ত খেলোয়াড়রা মাঠে প্রবেশ করে পরস্পরকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করলেন,—স্মারক বিনিময় করলেন ওরেল ও বেনো। সে এক মহাকাব্যিক মুহূর্ত।

জীবনের অনেক ঘটনার মতো এই খেলাটিও খেলার ইতিহাসে অবিনশ্বর হয়ে থাকবে। কারণ এটি শুধু খেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নি। হাণ্ট ঠিকই বলেছিলেন

উপসংহার

"এই খেলাটি শুধু ক্রিকেটকে নয়, আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বকেও অন্ধকার থেকে আলোতে এনেছে।" ওরেল-ট্রফি স্বয়ং ওরেল অস্ট্রেলীয় অধিনায়ক বেনোর হাতে তুলে দিয়ে যখন দেশে ফেরার জন্যে রওনা হন তাঁর খেলোয়াড়দের নিয়ে, পথের দুধারে সেদিন দু'লক্ষ মানুষ তাদের চোখের জলে বিদায় জানিয়েছিল। এরই নাম ক্রিকেট।

একটি ফুটবল ম্যাচের শেষ পাঁচ মিনিট

[সূচনা—খেলার প্রথমার্ধ—শেষের পাঁচ মিনিট—অবশেষে—শেষের ছবি—বিজিত দলের কথা—শেষ কথা।]

সূচনা

না, এ কোনো দুই প্রধানের খেলা নয়। তবে কোলকাতার প্রথম ডিভিশন লীগের এক বড়ো দল মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে লীগ কোঠার একেবারে নীচের দিকের একটি দলের, বেহালা ইয়ুথের খেলা। মোহনবাগানের ন'টি খেলা হয়ে গেছে। এখন পর্যন্ত একটি পয়েন্টও নষ্ট করে নি। অন্যদিকে বেহালা এগারোটি ম্যাচ খেলে মাত্র দু'টি পয়েন্ট সংগ্রহ করেছে। তাই এ খেলার কোনো গুরুত্ব ছিল না। দর্শক আসনও সব ভরে নি। তবে সবুজ গ্যালারি পরিপূর্ণ। আমরা এসেছি, মোহনবাগান কয় গোলে জেতে শুধু এটাই দেখতে। খেলা শুরু হল চারটে পনের মিনিটে।

হাল্কা চালে শুরু হল খেলা। মোহনবাগানের নিয়মিত খেলোয়াড়দের অনেকেই নামে নি। অলসভাবে চলছে বল দেওয়া নেওয়া। বল বেশির ভাগ সময়ে ঘোরাঘুরি করছে বেহালার পেনালটি বক্সে। বেহালার ডিফেণ্ডাররা কোনোরকমে পরিস্থিতি সামলে দিচ্ছে। মোহনবাগান ফরোয়ার্ডদের উপর্যুপরি আক্রমণ বার বার ব্যর্থ হচ্ছে। গোলে শট হচ্ছে কিন্তু বেহালার গোলরক্ষক আজ দুর্ভেদ্য। কর্নারের পর কর্নার। কিন্তু কার্যকরী হচ্ছে না একটাও। বহু শট অল্পের জন্যে লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। গোল আর হয় না।

খেলার প্রথমার্ধ

এইভাবে একতরফা খেলার প্রথমার্ধ শেষ হল। মনে হল দ্বিতীয়ার্ধে ঘটনা ঘটবে। কিন্তু সেই একই চিত্র। বরং বেহালার পুরোভাগের খেলোয়াড়রা সুন্দরভাবে বল দেওয়া-নেওয়া করে মোহনবাগানের গোলমুখে বারকয়েক হানা দিল। এদিকে সময় বয়ে যাচ্ছে। দর্শকদের চেঁচামেচি বাড়ছে। গোল চাই, গোল। মোহনবাগানের লেফট স্ট্রাইকারের প্রচণ্ড একটা শট বেহালার ক্রসবারে প্রতিহত হয়ে ফিরে গেল। ফিরতি বল ডান প্রান্তের লিঙ্কম্যানের পায়ে জমল। সামনে অসহায় বেহালার গোলরক্ষক। এবার অবধারিত গোল। কিন্তু বলটা বার উঁচিয়ে গ্যালারির মাঝখানে ছিটকে পড়ল। চারিদিকে হতাশার আর্তনাদ। ঘড়ির কাঁটা দ্রুত এগিয়ে চলেছে। এদিকে গোল হচ্ছে না বলে মোহনবাগানের খেলোয়াড়দের স্নায়ুর চাপ বাড়ছে। দর্শকরা ম্রিয়মাণ। একটি পয়েন্ট সত্যিই গেল তবে। এর অর্থ লীগের দৌড়ে পিছিয়ে পড়া।

ক্লাবের মাঠের পতাকা নেমে গেছে। অস্তগামী সূর্যের নরম আলো ছড়িয়ে পড়েছে মাঠে। দর্শকের উত্তেজিত, পাণ্ডুর মুখেও সে আলোর পরশ। সকলের মনে একই সংশয়। জিজ্ঞাসা—একটা পয়েন্ট নষ্ট হল বুঝি। সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে। নানা মন্তব্যের জোয়ার। অমুককে নামাও, অমুককে নামাও। একে বসাও, ওকে বসাও। বেহালার অর্ধে বল ছুটছে গোলার মতো। মোহনবাগানের দশ জন খেলোয়াড় ওপরে উঠে গেছে। একা গোলরক্ষক গোলপোস্টের ফ্রেমে ছবি হয়ে আছে। বেহালার সমস্ত

খেলোয়াড় প্রতিরোধের নিশ্ছিদ্র প্রাচীর গড়ে তুলেছে। আর পাঁচটা মিনিট কোনো রকমে সামাল দিতে পারলেই ছিনিয়ে নিতে পারবে দুর্ধর্ষ প্রতিপক্ষের কাছ থেকে সাত রাজার ধনের মতো একটি পয়েন্ট। দেওয়ালে পিঠ রেখে লড়াই করে চলেছে বেহালার ছেলেরা। তারা সুযোগ পেলেই বল ওড়াচ্ছে এদিক সেদিক। থ্রোইং হচ্ছে বার বার। দর্শকরা অধৈর্য, ক্ষুব্ধ। ফাউল বাড়ছে। মাঠে ইট পড়ছে। বেহালার খেলোয়াড় একটু চোট পেতে না পেতেই শুয়ে পড়ছে মাঠে। হয়তো সময় নষ্ট করা উদ্দেশ্য। দর্শকরা আরো উত্তেজিত হচ্ছে। আর তিন মিনিট। মহামূল্য সময় বয়ে যাচ্ছে। এদিকে মোহনবাগানের সুযোগগুলো সোনার হরিণের মতো ফাঁকি দিয়ে পালাচ্ছে। ঐ হাফ লাইন থেকে দুর্বার গতিতে মোহনবাগানের স্টপার ছুটে আসছে। একের পর এক বেহালার খেলোয়াড়দের কাটাতে কাটাতে ধেয়ে আসছে। এবারে নিশ্চয়ই নিশ্চিত গোল। ঢুকে পড়েছে পেনালটি বক্সে। ওয়ান-টু-ওয়ান পরিস্থিতি। এবারে শট্‌ নিলেই সেই বহু-প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌঁছানো যাবেই। রেফারি ঘড়ি দেখছেন। ঐ বুঝি বাঁশি বাজে। উত্তেজনায় সারা মাঠ টগবগ করছে। সকলেরই রক্তের চাপ এই মুহূর্তে দুশো ছাড়িয়ে গেছে নিশ্চয়ই। এক্ষুণি গোল গোল উল্লাসে গোটা মাঠ উত্তাল হবে। দর্শকরা মাতবে উদ্দাম নৃত্যে, পটকা ফাটবে, কাগজ জ্বলবে। কিন্তু না। কিছুই হল না। বেহালার একজন খেলোয়াড় প্রচণ্ড গতিতে ছুটে এসে ফাউল করে বাঁচাল নিজের দলকে। ঠিক পেনালটি বক্সের ডি-এর ওপর থেকে ডাইরেক্ট ফ্রি কিক। আশাভঙ্গ, কিন্তু আবার নতুন আশার উন্মাদনায় দর্শকদের দোদুলদোল চিত্ত। কিন্তু সবাইকে আবার চুপসে দিয়ে বল বার উঁচিয়ে উড়ে গেল। আর এক মিনিট। এর মধ্যে মোহনবাগানের দু'জন খেলোয়াড় বদল হয়েছে। তাদের উদ্যম ও প্রচেষ্টা ব্যর্থ হচ্ছে। এক পয়েন্ট হারিয়ে বিষণ্ণ চিত্তে দর্শকরা মাঠ ছাড়তে শুরু করে দিয়েছে। অনেক দর্শক প্রস্তুত হচ্ছে বিক্ষোভ জানাবার জন্যে।

(শেষের পাঁচ মিনিট)

শেষ বাঁশি বাজতে কুড়ি সেকেণ্ড। এমন সময় সেই ঘটনাটা ঘটল। কর্নার থেকে ইনস্যুইং করা বল চকিতে এল মোহনবাগানের এক ফরোয়ার্ডের মাথায়। মাথাটা একটু হেলিয়ে দিতেই সেই প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। গোটা মাঠের ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল, প্রেসার নামল।

(অবশেষে)

সাতরাজার ধন মোহনবাগানেরই ঘরে এল। জয়লক্ষ্মী কৃপা করলেন। মোহনবাগানের গোলদাতাকে ঘাড়ে চাপিয়ে নাচানাচি। পটকা আর প্রচণ্ড চীৎকারে মাঠ ফেটে পড়েছে। কখনও মনে হচ্ছে মহাসাগরের গর্জন। কখনও মনে হচ্ছে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গার।

(শেষের ছবি)

বীরের মতো সংগ্রাম করে বেহালার যুবকেরা মাঠ ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তারা পরাজিত হয়েও আজ গৌরবান্বিত। অনেক দর্শক করতালিধ্বনিতে তাদের প্রশংসা জানাচ্ছে। এক দুরন্ত দলের বিরুদ্ধে তারা মরণপণ সংগ্রাম করেছে। তাদের শেষ চেষ্টা ব্যর্থ হলেও, মোটেই তুচ্ছ নয়।

(বিজিত দলের কথা)

শেষ পাঁচ মিনিটের উত্তেজনা, শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতির কথা ভোলবার নয়। এই

উত্তেজনায় দর্শকদের স্নায়ুর ওপর দিয়ে বয়ে গেল কাল-বৈশাখী ঝড়। প্রচণ্ড ভূমিকম্পে

শেষ কথা

হৃৎপিণ্ড বুঝি বার বার হয়েছে বিদীর্ণ। এই শেষ পাঁচ মিনিট পাঁচ ঘণ্টার চমকে, শিহরণে, ঘটনা-বৈচিত্র্যে আর নাটকীয় সজ্ঘর্ষে উচ্ছলিত। এসব নিয়ে ইতিহাসের কোনো মাথাব্যথা নেই। কিন্তু আমাদের মনে এ খেলার ছবি—এই একদিন—চিরদিন হয়ে থাকবে।

একটি স্মরণীয় ঘটনা

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

[পটভূমি—অবকাশ—ইপ্সিত মুহূর্ত—উপসংহার।]

লেসলীকে ছোটোবেলা থেকেই চিনতাম। ছোটোখাটো চেহারার মানুষ,—সদা-হাসিমুখ, শান্ত। অথচ মাঠে নামলে এক আশ্চর্য ক্ষমতা যেন পেয়ে বসত তাকে,—তখন তার নাগাল পাওয়া ছিল আমাদের সাধ্যাতীত। আমরা দু'জনে একই পজিশনে খেলতাম। স্কুল-টিমে খেলার সময়ে আমাকে অবশ্য জায়গা বদল করতে হত,—নইলে ঠাঁই পাওয়া ছিল অসম্ভব। ওর জায়গা দখল করার কথাই আমরা ভাবতে পারতাম না। দাঁতে দাঁতে চেপে প্র্যাক্‌টিস করেছি দিনে দশ ঘণ্টা পর্যন্ত,—উদ্দেশ্য ওকে ছাড়িয়ে যেতেই হবে। বাড়ির বকুনিকে উপেক্ষা করেছি,—কিন্তু না, ঠিক সময়ে বুঝেছি ও অনতিক্রম্য। আর আশ্চর্য, খুব গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে দেখেছি আমার অজান্তে আমার খেলায় যেন ওরই ছাপ পড়ছে। ক্ষুব্ধ হয়েছি, কিন্তু নিয়তির মতো ও আমাকে অনুসরণ করেছে। স্কুল, স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে কলকাতার

পটভূমি

মাঠে প্রথম ডিভিশনের খেলায়, বিশ্ববিদ্যালয় দলে,—সর্বত্র। হামিদ আমার দুঃখ বুঝত। একবার একটা নির্বাচনী খেলায় ও আমাকে বলল, 'এবার আমি লেসলীকে নাস্তানাবুদ করে ছাড়ব'। আমি ভরসা পেলাম। হামিদ বেশ প্রতিশ্রুতিবান খেলোয়াড়। খেলা শুরু হল। হামিদ সত্যিই দারুণ খেলেছে,—গতিতে বারবার পরাস্ত করেছে লেসলীকে। কিন্তু আশ্চর্য! হামিদ কর্নার ফ্ল্যাগের কাছ থেকে মাইনাস করছে, কখনও ক্রস পাস, বা ২৫ গজ লাইনের কাছ থেকে স্কোয়ার পাস,—প্রতিটি বল লেসলী সেখান থেকে ধরে নিচ্ছে,—ধীর স্থির ভাবে এগিয়ে যথাস্থানে পাঠিয়ে দিচ্ছে সেই বল। খেলার ভাষায় যাকে বলে 'এ্যান্টিসিপেশন,'—তা যে কতখানি নিখুঁত হতে পারে ওকে দেখলে বোঝ যায়, এ ক্ষেত্রে কি ওর কোনো ষষ্ঠেন্দ্রিয় কাজ করে! মুগ্ধ হয়েছি। কিন্তু বীরপূজার ইচ্ছা দমন করেছি। তীব্র ঈর্ষাবাণে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি এবং নির্বাচনের পর যথারীতি দেখেছি লেসলী দলে জায়গা পেয়েছে,—আর আমি স্ট্যাণ্ড-বাই। পোশাক পরে সাইড লাইনের ধারে বসে থাকা, অসহ্য! এমনি ভাবে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তিতে কেটে গেছে আমাদের খেলোয়াড়-জীবনের অনেকগুলি বছর।

সেবার ন্যাশনাল চাম্পিয়ানশিপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে কলকাতাতেই। শোনা যাচ্ছে এবারের খেলার গুরুত্ব অপরিসীম,—কারণ এই খেলা দেখেই নির্বাচন করা হবে আসন্ন বিশ্বপর্যায়ে খেলার জন্যে জাতীয় দল। কিন্তু আমি প্রায় নিরাশ। এত বছরে বুঝে গেছি যে, লেসলীর জায়গা পাওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। মুখ গোমড়া করে খেলার দিন এসেছি মাঠে। কোচ বলেছেন ড্রেস করতে,—অনিচ্ছাসত্ত্বেও করেছি। বসে আছি। খেলা আরম্ভের সময় এসেছে,—হঠাৎ একটা গুজব, লেসলী আসে নি। সে কী! তা হলে?—কী আর করা যায় এখন,—কোচ এগিয়ে এলেন আমার দিকে, বললেন—ওয়ার্ম আপ করো। আমার সমস্ত শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

অবকাশ

মাঠে নামলাম। প্রতিপক্ষ দক্ষ এবারের চাম্পিয়ানশিপে 'হট ফেভারিট'। প্রথম মিনিটেই ওদের রাইট উইঙ্গার দ্রুত এসে একটা বল ফেলল গোলের সামনে, আর লেফট স্ট্রাইকার একটু ছুঁয়ে দিল বলটা,—গোল। বলটা মাথা নিচু করে বার করে আনছি, হঠাৎ গ্যালারির দিকে চোখ পড়ল,—ওকি? লেসলী বসে ওখানে খেলা দেখছে! হাসিমুখে আমার দিকে তাকিয়ে দু'টো আঙুল দেখাল,—কী বোঝাতে চায়?—দু গোল চাই, নাকি 'V' ফর ভিক্টরি! লেসলী, যা বুঝিয়ে থাকো না কেন তুমি আমার আদর্শ খেলোয়াড়, আমি জিতবই আজ। লেসলী, তোমার অযাচিত দানের মর্যাদা রাখবই।

ইপ্সিত মুহূর্ত

খেলা শুরু হল। সেন্টার থেকে বলটা ব্যাক পাস করল, লেফট হাফ একটু উঠে বলটা ফেলল রাইট স্ট্রাইকারের পজিশনে, সে বলটাকে সোয়ার্ভ করে পাঠাল লেফট উইঙ্গারকে। প্রচণ্ড দ্রুতগতিতে এগিয়ে সে একেবারে গোলের কাছে সেন্টার করল বলটা, আমি, আরও কে-কে জানি না, লাফিয়ে উঠলাম, —আমার মাথায় যেন এক হাতুড়ির আঘাত লাগল, মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম—সেই মুহূর্তে কানে গেল গগনভেদী চীৎকার, গো-ও-ল। মাটিতে শুয়েই বললাম, লেসলী আর একটা,—তুমি চেয়েছ,—আমাকে দিতেই হবে। খেলা আবার শুরু হল। ওরা চাপ দিচ্ছে। দারুণ খেলছে অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ইন্দর। প্রথমার্ধ ১-১ থাকল। লেসলীর দিকে আর তাকাই নি। খেলা আবার শুরু হয়ে গেছে। আশ্চর্য, আমার মধ্যে যেন আজ একটা প্রেরণা, শক্তি অনুভব করছি। ওদের রাইট স্টপারের একটা ভুল ক্লিয়ারেন্স আমি পায়ে পেলাম, প্রতিপক্ষের দু'জন খেলোয়াড় সামনে,—কিন্তু আমাকে যে জিততেই হবে, বোধ হয় দেড় সেকেণ্ডের মধ্যে দু'টো আউটসাইড-ইনসাইড করলাম, —শরীরটার মোচড়ে, তৃতীয় খেলোয়াড় পাশে পড়ে গেল, থ্রু-বাড়ালাম হামিদকে,—হামিদ চলতি বলে প্রচণ্ড শট নিল, হ্যাঁ, জালে জড়িয়ে গেছে বলটা। লেসলী, পেরেছি, আমরা পেরেছি।

খেলার পরের অংশের বর্ণনা অবান্তর। ফেরার পথে স্টুডিওতে লেসলীর একটা ছবি দেখলাম, হাসছে সে। একরকম জোর করেই কিনে নিয়েছিলাম ছবিটা সেদিন। আমার ঘরে এখনও আছে সেটা বাঁধানো। ছোটোছেলেরা কেউ আমার কাছে এলে বলি,—খেলোয়াড় আমি নই, উনি, সত্যিকারের খোলায়াড়—ওঁর মতো হও তোমরা।

উপসংহার

বইমেলা

[ভূমিকা—সূচনা—উপকারিতা—পরিবেশ বর্ণনা—কী করলে আরও ভালো হয়—উপসংহার।]

ভূমিকা বইমেলা এই কথাটার সঙ্গে অনেক আনন্দ-হাসি-গান, এক কথায় ছুটি ছুটি মেজাজ মিশে আছে। যে আনন্দ-হাসি-গান এতদিন রথের মেলা অথবা চড়কের মেলার ছিল নিজস্ব সম্পদ্—বইমেলা আজ তাকেই এনেছে, আমাদের জন্যে উপহারের ডালায় সাজিয়ে।

সূচনা আমাদের দেশে, বিশেষ করে কলকাতায়, বই-মেলার জন্ম মাত্র ৮ বছর আগে। ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দেই প্রথম রবীন্দ্রসদনের বিপরীত প্রান্তে ময়দানে এই মেলার অনুষ্ঠান হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন পাবলিশার্স গিল্ড্। সেই থেকে প্রত্যেক বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে এখানে বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। অন্যান্য সংস্থাও বইমেলার আয়োজন করছেন। এর সঙ্গে শুরু হয়েছে সরকারি প্রচেষ্টাও। তার ফলে একই বছরে কলকাতায় একাধিক বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তা ছাড়া প্রত্যেক জেলায় জেলায় আজকাল বইমেলার ধুম পড়েছে, যেমন-'বর্ধমান বইমেলা' 'হাওড়া বইমেলা', 'মুর্শিদাবাদ বইমেলা' ইত্যাদি। এসব মেলা কলকাতা বই মেলার ক্ষুদ্র সংস্করণ। কিন্তু ছোটো হলেও তারা অবহেলার যোগ্য নয়। এই সব মেলা অপূর্ব সম্ভাবনাময় এবং উদ্দীপনাপূর্ণ।

উপকারিতা সাধারণত সাত থেকে দশদিন ধরে এই সব মেলার অনুষ্ঠান চলে। এই দশ দিন ধরে চলে কেনা-বেচা। ফলে ক্রেতা এবং বিক্রেতা উভয়েই উপকৃত হয়। বিক্রেতারা যেমন এই মেলার জন্যে সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে, ক্রেতারাও দিন গুণতে থাকে। অল্প ক'দিনে বেশি বিক্রির ফলে বিক্রেতা যেমন লাভবান্ তেমনি লাভবান্ ক্রেতারাও। তাদের চোখের সামনে কল্লোলিত মহাসমুদ্র যেন নীরব হয়ে থাকে। এক সঙ্গে এত বই দেখবার সৌভাগ্য আর কখনই হয় না। কিনতে না পারলেও ক্ষতি নেই, পাঠক তার পছন্দ করা বইয়ের নাম-ধাম-প্রকাশক ইত্যাদি জেনে নিতে পারে এই মেলায় ঘুরে ঘুরে আড্ডা দিতে দিতে।

কেবল কি বিক্রেতা আর পাঠক? লেখক বা শিল্পীরাও বইমেলায় এসে আঁকার বা লেখার প্রেরণা পান। নতুন ভাবনা-চিন্তার খোরাক দেয় বইমেলা। বইমেলার অর্থনৈতিক দিকের সঙ্গে আনন্দ ও শিক্ষার দিকটির কথাও ভুললে চলবে না। বইমেলা প্রকাশককে শিক্ষা দেয়, এখান থেকে শিক্ষা নেয় শিল্পী, সাহিত্যিক। 'আজকাল কী লিখছেন? আপনার কাছ থেকে অনেক ভালো লেখা আশা করি।' এই মন্তব্যটুকুই তো সাহিত্যিকের কাছে যথেষ্ট। তাঁকে নতুন করে ভাববার প্রেরণা এনে দেয়।

বইমেলার সঙ্গে সাধারণ মেলার খুব একটা প্রভেদ নেই। মিলনের আনন্দ এর প্রাণ। এখানে বাল্যকালের বন্ধুকে কোনো প্রবীণ হঠাৎ আবিষ্কার করে চমকে ওঠেন। প্রবীণ নবীনের মিলনক্ষেত্র এটাই। প্রবীণ সাহিত্যিকের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে স্পর্শ করতে করতে চলেছেন নবীন কোনো লেখক। প্রতিষ্ঠিত প্রকাশকের কাছে

প্রকাশনার কাজে তালিম নিচ্ছেন নবীন প্রকাশক। মেলার পরিবেশরচনায় সংগীতের ভূমিকাও কিছু কম নয়। তাই একটানা রবীন্দ্র-নজরুল-অতুলপ্রসাদের নির্বাচিত গান এই মেলাতে এসে শোনা যায়। বই-বই আর বই। এক একটা স্টলের শিল্পকর্মও সুন্দর। ঘুরতে ঘুরতে দেখতে দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়লে চা বা কফির স্টলে বসার ব্যবস্থা থাকে। চা কিংবা কফির পেয়ালা হাতে এখানে চলে নির্ভেজাল আড্ডা। আলোচ্য বিষয় সত্যজিৎ রায় থেকে রাকেশ শর্মা। মাঝে মাঝেই মাইকের ঘোষণায় শোনা যায় হারানো-প্রাপ্তি-সংবাদ। সন্ধ্যের পরিবেশ আরও মনোরম। গাছে গাছে রঙীন আলোর বাহার যেন স্বপ্নরাজ্য রচনা করে।

পরিবেশ বর্ণনা

শীত হল মেলার উপযুক্ত সময়। বইমেলার অনুষ্ঠানগুলো গরমের দিনে না করে শীতে করলে আরও ভালো হয়। তা ছাড়া, এখানে বই কিনলে যে কমিশন দেওয়া হয় তা খুবই সামান্য। তার চেয়ে অনেক বেশি কমিশন কলেজ স্ট্রীটে বই পাড়াতেই পাওয়া যায়। এ কথা মানি, মেলার জন্যে খরচ আছে, কিন্তু এ কথাও তো সত্য, কমিশন বেশি দিলে গড়ে বিক্রি বাড়বে, ফলে কমিশন বেশি দিয়েও প্রকাশক বিক্রেতারা লাভের অঙ্ক বাড়াতে পারবেন। কলকাতার মানুষ বইপাগল, বার বার এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তবু বিশ্ব-বইমেলা দিল্লীতে কেন?

কী করলে আরও ভালো হয়

আমরা নিজেরাও কি 'বইমেলা' করতে পারি না, পাড়ায় অথবা স্কুলে সীমিত গণ্ডির মধ্যে? বইমেলায় ঘুরতে ঘুরতে বার বার এই কথাই মনে হয়েছে —রবীন্দ্র-জয়ন্তী অথবা নজরুল-সুকান্ত-শরৎচন্দ্রের জন্মদিন উপলক্ষে একটা বইমেলার আয়োজন করলে কেমন হয়? না-ই বা হল বই বিক্রি। একসঙ্গে অনেক বই তো দেখা যাবে।

উপসংহার

চিন্তাসহায়ক বাণী

যতদিন না বাঙালিসমাজ নিজেদের পাঠক হিসেবে না দেখে পুস্তকক্রেতা হিসেবে দেখতে শিখবেন ততদিন বঙ্গসাহিত্যের ভাগ্য সুপ্রসন্ন হবে না। —গ্রন্থক্রেতা যে শুধু নিঃস্বার্থ পরোপকার করেন, তা নয়। চারিদিকে বইয়ের দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকাতে একটা উপকার আছে। বই চব্বিশঘণ্টা চোখের সম্মুখে থেকে এই সত্যটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় যে, এ পৃথিবীতে চমড়ায়-ঢাকা মন নামক একটি পদার্থ আছে।

প্রমথ চৌধুরী (বৈশাখ ১৩২০)

ত্রিপুরা রাজ্যে অনুষ্ঠিত বইমেলা

[ভূমিকা—ইতিহাস—ভারতে বইমেলা—১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের বইমেলা—মেলার বিভিন্ন দিক—জন-শিক্ষার বাহন—পাঠের অভ্যাস—রকমফের বইয়ের চাহিদা—উপসংহার।]

একটি চীনা প্রবাদে বলা হয়ে থাকে বই হল পকেটে বয়ে বেড়ানো সুন্দর ফুলবাগান। বইমেলাকেও এই ফুলবাগানই বলতে ইচ্ছে করে।

ভূমিকা

"একটি পয়সা মেলে যদি, তবে
খাদ্য কিনিও ক্ষুধার লাগি
দুইটি মিলিলে একটিতে তার
ফুল কিনে নিও হে অনুরাগী।"

বাংলাভাষীর পকেটের অবস্থা করুণ হলেও ফুল না কিনে বই কেনে। আর সেই বই-এর মেলা। তবে তো কথাই নেই। পয়সার অভাব হলেই বা কী, পাতা উল্টোতে তো ক্ষতি নেই। কাজেই ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বইমেলাকে সাংবাৎসরিক সংস্কৃতি-উৎসবে রূপান্তরিত করেছে।

খুব সম্ভবত ত্রয়োদশ শতকেই ইংলণ্ডের দুই পুস্তক বিক্রেতা পিটার এ্যাকটস্ ও জোয়ান দি আকুইস্‌গ্রান স্টুর ব্রিজের মেলায় সর্বসমক্ষে পুস্তক পণ্য পসরা হিসাবে সাজিয়ে বসেন। ১৮০১ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৮০৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আমেরিকায় ধারাবাহিক পুস্তক মেলা আরম্ভ হয়। দীর্ঘ বিরতির পর ১৮২৭ খ্রীস্টাব্দে এই মননশীল সংস্কৃতির মেলাকে দেখা যায় জার্মানির লাইপৎসিগ শহরে।

ইতিহাস

"আপন মনে গোপন কোণে লেখা-জোখার কারখানাতে,
দুয়ার রুধে বচন কুঁদে খেলনা আমায় হয় বানাতে।"

আশ্চর্য! খেলনা তৈরির মিছিলে কত কবি-সাহিত্যিক কত যুগ ধরে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে গেছেন তার হিসাব কে রাখে! বিভিন্ন সংগ্রহশালা লাইব্রেরি ব্যক্তিগত সংগ্রহে তাঁরা বন্দী হয়ে আছেন। বন্দীশালা থেকে মেলার প্রসারিত প্রান্তরে সজ্জিত বইয়ের বীথিকায় যখন তাঁদের মুক্তি ঘটে তখন পুঁথিগতপ্রাণ পণ্ডিতের জ্ঞানচক্ষু বিস্ফারিত হয়। বইমেলা আজ জাতীয় সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে গেছে। ভারতের বড়ো বড়ো শহরেই নয় আজ প্রত্যন্ত অঞ্চলেও এই মেলা দেখা যাচ্ছে। গত দশকে রাজধানী দিল্লী ও কলকাতা শহরে বেশ কয়েকটি বইমেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ন্যাশন্যাল বুক ট্রাস্টের উদ্যোগে ১৯৬৯ খ্রীস্টাব্দে বোম্বে শহরে "ক্রস্ ময়দানে" অনুষ্ঠিত বইমেলাই পূর্ণাঙ্গ বইমেলা। কলকাতায় বইমেলা প্রথম হয় ১৯৭৬ খ্রীস্টাব্দে। আর ত্রিপুরার মানুষকে অপেক্ষা করতে হয় ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত। ত্রিপুরা সরকারের 'তথ্য ও পর্যটন দপ্তর'-এর উদ্যোগে প্রথম বই-মেলাতে খুব সাড়া জেগেছিল। সরকারপ্রদত্ত ১০ শতাংশ ভর্তুকী সহ ২০ শতাংশ ছাড় থাকায় বইয়ের কাটতি ভালোই ছিল। জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের ধাঁচে ১৯৭৪ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মানের বিশ্ব-বইমেলা বর্তমান কালের একটি

ভারতে বইমেলা

সংযোজন। সে রকম না হলেও ত্রিপুরায় বইমেলা উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

এই পর্যায়ে উল্লেযোগ্য ১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের দ্বিতীয় বইমেলা। ২৫-এ ফেব্রুয়ারি থেকে ৬ই মার্চ ক'দিনের জন্য রাজধানী শহর আগরতলায় এই মেলা বসেছিল। মোট ৪১টি মণ্ডপ দ্বিতীয় এই মেলায় অংশ গ্রহণ করে। বাইরে থেকেও প্রকাশক-বিক্রেতারা এসেছেন। ত্রিপুরা শিক্ষাবিভাগও একটি স্টল খোলেন। রাজ্যসরকারের উদ্যোগে মণ্ডপ তৈরি হওয়ায় যোগদানকারীদের কোনো ভাড়া দিতে হয় নি। প্রথম বইমেলার দেড়গুণ প্রায় শতাধিক প্রকাশন সংস্থা এতে অংশ গ্রহণ করে। এবারও রাজ্যসরকারের ভর্তুকী সহ ৩০ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়। তবে বিশেষ ক'টি বইয়ের বেলায় এই ছাড় ছিল ৩০ শতাংশ। বইগুলি হল রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা', নজরুলের 'সঞ্চিতা', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পদ্মানদীর মাঝি', অদ্বৈত মল্লবর্মনের 'তিতাস একটি নদীর নাম' ও 'সুকান্ত সমগ্র'। নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই বইগুলি নিঃশেষ হয়ে যায়। উল্লেখযোগ্য, এবার অভিধান ও পাঠ্য-পুস্তকে সরকারী ভর্তুকী ছিল না। বই বিক্রি হয়েছে এবার ১১ লক্ষ টাকার বেশি। বইমেলা থেকে বিভিন্ন সরকারী দপ্তর ও বিদ্যালয় বই কিনেছে। দুই-একটি স্থানীয় প্রকাশনার বইও মেলার শোভাবর্ধন করেছে। ১লা মার্চ শেষরাতে এক অগ্নিকাণ্ডে আংশিক ক্ষতি হওয়া ছাড়া মেলা ছিল জমজমাট।

১৯৮২ খ্রীস্টাব্দের বইমেলা

বইমেলায় হালকা অপেক্ষা মননশীল বই বেশি চলেছে এই বছর। মেলায় পাশাপাশি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আসরও বসেছিল ক'দিন সমানে। তবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বোধ হয়, এবারকার মেলায় রিক্সাচালক কবি নিশিকান্ত বাস্তকরের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "আমরা রিক্সাওয়ালা"। নিচুতলার কবির প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ দুঃসাহসিক প্রচেষ্টাই বটে।

বইমেলার অনেক উদ্দেশ্যের মধ্যে একটি হল জনশিক্ষা। সমাজজীবনের প্রতিটি স্তরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেওয়াই বইমেলার প্রধান লক্ষ্য। স্কুল কলেজ গ্রন্থাগার ও প্রকাশনালয় থেকে লেখকদের জনতার দরবারে পৌঁছে দেওয়ায় সমাজমনে জ্ঞানের আলোর প্রসার হয়ে থাকে। গ্রন্থাগারের বন্দী-জীবন থেকে মেলায় বইয়ের মুক্তি। লোকমুখে প্রচার ও প্রসার হবার ফলে বইমেলাকে জনশিক্ষার বাহন হিসাবে গণ্য করা উচিত। আরণ্যক ত্রিপুরার জনশিক্ষায় এই মেলার ভূমিকা সন্তোষজনক।

মেলার বিভিন্ন দিক জনশিক্ষার বাহন

বইমেলায় বাণিজ্যিক দিকটা বড়ো নয়। সুফল সুদূরপ্রসারী ও দীর্ঘস্থায়ী। ভালোভাবে পরিচালিত হলে সমস্ত সমাজ এতে উপকৃত হয়। ত্রিপুরা এমনিতেই অনগ্রসর রাজ্য। যোগাযোগ-ব্যবস্থার অভাবের দরুণ বহিঃত্রিপুরার সংস্কৃতি সাহিত্যের সঙ্গে রাজ্য-বাসীর ভাবের আদান-প্রদান শূন্যের কোঠায় বললেই চলে। আগরতলায় অনুষ্ঠিত দু'টি বইমেলা এই অভাববোধ আংশিক হলেও পূরণ করতে সক্ষম হয়েছে।

"ধনবানে কেনে বই জ্ঞানবানে পড়ে" কথাটা সত্য হলে বইমেলার অন্যদিক প্রকাশিত

হতে পারে। পুস্তক পাঠেই সার্থকতা পায়, কিনে আলমারির শোভাবর্ধন করায় পুস্তকের অবমূল্যায়ন হয় মাত্র। আবার এমন পাঠক আছেন যাঁর সাধ আছে সাধ্য কোথায়! ফলে যাঁরা বইমেলায় রোজ পাতা উল্টে নিজের মনের খোরাক বাড়িয়ে যান তাঁদেরও প্রয়োজনীয়তা আছে। সমাজে এই শ্রেণীর সংখ্যাও নেহাৎ কম নয়। দামী দামী ইজমের বই দিয়ে বাড়িতে শেল্‌ফসাজান একটা আভিজাত্য হতে পারে তবে অপঠিত পুস্তক সংগ্রহ উর্বর হলেও অকর্ষিত ভূমিখণ্ডের মতোই নিষ্ফল। ত্রিপুরায় এই শ্রেণীর নতুন বিলাস বাবুদের চেয়ে দিনান্তে অন্ন সংস্থান উপায়বিহীন পুস্তক ক্রয়ে অক্ষম নিত্য পাঠকের সংখ্যা অনেক বেশি। মেলার ভিড়ে পুস্তকের সুকুমার অনাঘ্রাত অঙ্গে তাদের কর্কশ অঙ্গুলির ছাপই বেশি পড়ে থাকে। সন্ধানী দৃষ্টিতে তাদের অভ্যন্তর-দর্শন এই শ্রেণীর পাঠকদের দ্বারাই বেশি হয়। বই ব্যবহারেই যদি সার্থকতা তবে তাঁরা তাই করে থাকেন।

পাঠের অভ্যাস

লৌকিকতা রক্ষার উপহার হিসাবে পুস্তকের ব্যবহার বহুকাল ধরেই প্রচলিত। মাঝখানে ভাটা পড়লেও বইমেলার খাতিরে আবার তার জনপ্রিয়তা বাড়ছে। সীমিত আর্থিক সঙ্গতির মধ্যে রুচিসম্মত এমন উপহার বোধ করি দ্বিতীয়টি নেই। তাই বিয়ে-অন্নপ্রাশন-জন্মদিন প্রভৃতির জন্যে মধ্যবিত্ত লোকেদের ছাড়ে পাওয়া বই আগাম কিনে রাখার সুবর্ণ সুযোগ এনে দেয় বইমেলা। আগরতলার এই ধরনের অপাঠক পুস্তক-প্রেমীরাও বইমেলায় সক্রিয় ছিলেন। তাঁদের সঞ্চিত উপহারগুলি দামী ব্যবহারযোগ্য সামগ্রীর সঙ্গে হয়তো টেক্কা দিতে পারবে না। তবে দামী বস্তুগুলো যেদিন নীরব হয়ে যাবে সেদিনও দুই মলাটের ভিতর বন্দী প্রাণগুলো পাতা খুললেই প্রবলভাবে সরব হয়ে উঠবে।

রকমফের বইয়ের চাহিদা

গ্রন্থমেলার অপর যেদিকটি সর্বাগ্রে লক্ষ্য পড়ে তা হল বইয়ের প্রকারভেদ। নানা-রকম বই এই সাম্রাজ্যের বাসিন্দা। গল্পকাহিনী-গল্পকথা-গাথা-উপন্যাস-প্রবন্ধ-নাটক কত না নাম। হালকা মেজাজের মরসুমী ফুলের ক্ষণিকের শোভা বাহারী ধাঁচের বই আবার জ্ঞানমূলক ধ্রুপদী বা চিরায়ত সাহিত্যসম্ভার। বলাবাহুল্য, দ্বিতীয় শ্রেণীর বইগুলির জনপ্রিয়তা সীমিত। টমাস ফুলারের কথাই সত্য—"Learning hath gained most by those books which the printers have lost" "বড়ো লেখকের বই বাজারে কাটে কম কাটে বেশি পোকায়।" যথার্থই বলা হয়ে থাকে। এবারের বইমেলায়ও প্রথম শ্রেণীর বইয়েরই কাটতি বেশি ছিল। তবে সরকারী পর্যায়ে কেনা হয় দ্বিতীয় শ্রেণীর বইগুলি।

ত্রিপুরার রাজধানী শহরে অনুষ্ঠিত গ্রন্থমেলার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। একসঙ্গে অনেক গ্রন্থের সাম্রাজ্য থেকে উত্তম গ্রন্থটি নির্বাচন করে স্বল্পতম মূল্যে সংগ্রহ করার এমন অপূর্ব সুযোগ ত্রিপুরার বইপাগলদের কাছে অভূতপূর্ব। জনপ্রিয়তাও এই জন্যে বেড়েছে গ্রন্থমেলার। গ্রন্থমেলায় লেখক, প্রকাশক, গ্রন্থাগারিক ও পাঠক পরস্পরের সম্মিলনে নতুন গবেষণার পথ উন্মোচন করে দিয়েছে।

উপসংহার

ত্রিপুরার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও এই মেলার বিশেষ মূল্য রয়েছে এবং মেলার বাণী রাজ্যের সর্বত্র পৌঁছে দিতে পারলেই তা সার্থক হবে।

অনুরূপ প্রবন্ধ :

(ক) বই মেলার একটি সমীক্ষা। (খ) তোমার দেখা গ্রন্থমেলার অভিজ্ঞতা।
(গ) ত্রিপুরার সাহিত্য-সংস্কৃতিতে গ্রন্থমেলার ভূমিকা।

জাতীয়তা বনাম আন্তর্জাতিকতা

[ভূমিকা—জন্মকারণ—জাতীয়তা-বোধের স্বরূপ ও পরিণাম—আন্তর্জাতিকতা—উপসংহার।]

ভূমিকা

পৃথিবীর গতি দুটি। একটির নাম আহ্নিক, অন্যটির নাম বার্ষিক। আহ্নিক গতিতে পৃথিবী নিজের মেরুদণ্ডের উপর ঘোরে আর বার্ষিক গতিতে করে সূর্য প্রদক্ষিণ। পৃথিবীর এই গতির মতো মানুষের জাতীয় জীবনের চলার ছন্দ ও ভাবধারাকেও দুটি নামে চিহ্নিত করা যায়। একটির নাম জাতীয়তা, অন্যটির নাম আন্তর্জাতিকতা।

জন্মকারণ

রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে সাতটি কারণে জাতীয়তা-বোধের ভাবধারা গড়ে ওঠে। (১) নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের অধিকারে, (২) জাতিগত একাত্মবোধে, (৩) ভাষাগত ঐক্যে, (৪) ধর্মের একতায়, (৫) সরকারের অধীনতায়, (৬) জাতীয় ঐক্যে এবং (৭) ঐতিহ্যের একতায়। প্রাচীনকালের মানুষের মধ্যে এগুলির সহাবস্থান না ঘটায় জাতীয়তাবোধের জন্ম হয় নি। কিন্তু বিচ্ছিন্ন-মানুষ ধীরে ধীরে বাঁচার তাগিদেই একত্র হয়ে সৃষ্টি করল—এক জাতি—এক প্রাণ—একতার—তখন এক জাতীয়তার ভাবধারা জেগে উঠল।

জাতীয়তা-বোধের স্বরূপ ও পরিণাম

জাতীয়তা-বোধ ও আন্তর্জাতিকতার মধ্যে বিরোধ থাকবার কথা নয়। বর্তমান পৃথিবীতে সর্বত্রই জাতীয়তার বোধ, স্বাজাত্যকামনা বেশ বড়ো আকার ধারণ করেছে। জাতীয় স্বাধীনতা-কামনা এবং জাতীয় উন্নতির বিধান সব মানুষই চায়; নিজেদের রাষ্ট্র নিজেরাই পরিচালনা করব, নিজেদের ভাগ্য থাকবে নিজেদেরই নিয়ন্ত্রণাধীন—এটা তো মানুষের একান্ত স্বাভাবিক কামনা।

কিন্তু অনেক সময়ে এই উগ্র জাতীয়তাবাদ থেকেই সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি জন্ম নেয়। আমাদের জাতি সর্বশ্রেষ্ঠ. পৃথিবী করায়ত্ত করবার অধিকার আমাদেরই আছে, এইরকম অত্যুগ্র জাতীয় ভাবধারায় সাম্রাজ্যবাদীরা উদ্বুদ্ধ হয়। প্রাচীনকাল থেকে শক্তির দম্ভ এক জাতিকে অন্য জাতির উপর ক্ষমতা-বিস্তারে প্রলুব্ধ করত। ধর্মোন্মত্ততাও অনেক সময়ে অপর দেশ অধিকারের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সম্প্রতি এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনুন্নত অপবাদ দিয়ে দুর্বল জাতিগুলিকে অন্ধকার থেকে আলোর রাজ্যে সমুত্তীর্ণ করবার উচ্চকণ্ঠ এবং গর্বিত ঘোষণা।

মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসায়—জাতি-ধর্ম-দেশ-নির্বিশেষে সেবা ও প্রীতির অর্ঘ্যদানে—মনুষ্যত্বের প্রকৃত পরিচয়। বিশ্বমানবের প্রতি প্রেমই পৃথিবীর বুকে কল্যাণ-স্বর্গ নামিয়ে আনতে পারে, আর কিছু নয়। ইতিহাসে অশোকের যুগ থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত বারবার এ কথা প্রমাণিত হয়েছে। একটা কথা মনে রাখতে হবে, জাগতিক মৈত্রী তাদের মধ্যেই সার্থকভাবে সংঘটিত হতে পারে যাদের স্বাতন্ত্র্য সংশয়াতীত, যাদের সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণই আত্মপ্রবুদ্ধ, যা বাইরের কোনো নিয়ন্ত্রণের অপেক্ষা রাখে না। বিজয়ী জাতির সঙ্গে বিজিত জাতির সোৎসাহ মৈত্রী কিংবা আক্রমণকারীর প্রতি আক্রান্তের প্রেম একেবারেই বারেই পৌরুষহীন।

আন্তর্জাতিকা

সুস্থ জাতীয়তাবোধ কখনই বিশ্বমানব মৈত্রী বা আন্তর্জাতিকতা-বিরোধী নয়। অন্যকে আক্রমণ করব না, অন্যের অকল্যাণ চিন্তা করব না, নিজে আক্রান্ত হলে বিনা-বাধায় লুটিয়ে পড়ব না, এটা যে-জাতির প্রতিজ্ঞা, মানবমৈত্রীর মন্ত্র গ্রহণে তার স্বাভাবিক অধিকার আছে। আত্মসত্তা বর্জন করে মৈত্রীস্থাপনে শক্তিহীন মূঢ়তা প্রকাশ পায়, প্রকৃত মৈত্রী বা আন্তর্জাতিক ভাবের সৃষ্টি হয় না। সম্প্রতি মানব-কল্যাণেই বিশ্বমৈত্রী বা আন্তর্জাতিক ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছে আর মানুষের কল্যাণেই তাকে রক্ষা করতে হবে।

আধুনিক যুগের সাধনা হল জাতীয়তাবোধের সংকীর্ণতা থেকে আন্তর্জাতিকতার মহান্ প্রাঙ্গণে প্রবেশের সাধনা। কিন্তু কার্যত মানুষ সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারায় আচ্ছন্ন হয়ে মুখে আন্তর্জাতিকতার কথা বলে। কিন্তু আজ মানুষের সামগ্রিক কল্যাণের জন্যে মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিকতার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে। এই মনোভাব গড়ে তুলতে রাষ্ট্রসংঘ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে।

উপসংহার

চিন্তাসহায়ক বাণী

Of the whole sum of human life one small part is that which consists of a man's relation to his country and his feelings concerning it.

—Gladstone. (1809-1898) British Statesman.

If there is not a drastic change in our ways of thought and practice, our race may die not of a natural catastrophe or disease but of nationalism. —Dr. Radhakrishran. (1888-1975), Indian Philopher.

We are in the midst of a great transition from narrow nationalism to international partnership.

—L. B. Johnson. Thirty-sixth president of USA.

For a man to love his country truly, he must also know how to love mankind, and this love must be the sustaining force in the search for world order.

—A. E. Stevenson. (1900-1965), American Polititian.

আন্তর্জাতিক প্রতিবন্ধী-বর্ষ

(ভূমিকা—প্রতিবন্ধী-বর্ষ—সমস্যার স্বরূপ ও প্রতিকারের আদর্শ—কর্মধারা—শিক্ষাসম্প্রসারণ—উপসংহার।)

ভূমিকা

প্রতিবন্ধীদের জন্যে ভাবনা আমাদের ভারতবর্ষে আজকের নয়। প্রাচীন ঋষিদের মন্ত্রে এই কল্যাণভাবনা ধ্বনিত হয়েছে। 'অন্ধজনে দেহ আলো' এ তো ভারতের চিরদিনের কথা।

প্রতিবন্ধী-বর্ষ

প্রতিবন্ধী সমস্যা সব দেশেই। আমাদের সব সমস্যা সমাধানেই গয়ংগচ্ছ ভাব। তাই রাষ্ট্রসংঘ এক একটি বছরকে এক একটি সমস্যার সমাধানের জন্যে চিহ্নিত করেছেন। আন্তর্জাতিক নারীবর্ষের পর উদ্‌যাপিত হল 'শিশুবর্ষ', তারপর ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দ চিহ্নিত হল প্রতিবন্ধী-বর্ষ হিসেবে।

প্রতিবন্ধী বলতে আমরা বুঝি কোনো-না-কোনোদিক দিয়ে যাদের দৈহিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতা আছে তাদের। এই বছরটায় এদের নিয়ে বিশেষ করে কর্মতৎপর হব আমরা, এই হল প্রতিবন্ধী-বর্ষের তাৎপর্য।

সমস্যার স্বরূপ ও প্রতিকারের আদর্শ

পৃথিবীতে প্রতিবন্ধীর সংখ্যা ৪০ কোটি। ভারতে বর্তমানে তাদের সংখ্যা ৬ কোটি ৮৫ লক্ষ। প্রতিবন্ধী-বর্ষের মূল ভাবটি হল 'পূর্ণ অংশগ্রহণ ও সাম্য'। অর্থাৎ সাম্যের ভিত্তিতে প্রতিবন্ধীদের জন্যে সমাজে পূর্ণ অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। তাদের মৌলিক শক্তির উপর আস্থা রেখে তাদের স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করাই এই প্রতিবন্ধী-বর্ষের উদ্দেশ্য।

কর্মধারা

প্রতিবন্ধী-বর্ষে ভারতসরকার ইতিমধ্যে জাতীয় কমিটি গঠন করেছেন। এই কমিটি একটি জাতীয় কর্মসূচীও গ্রহণ করেছেন। এই কমিটি প্রতিবন্ধী-বর্ষের কর্মসূচী রূপায়িত করবেন। এই কর্মসূচীর আওতায় তথ্য ও বেতার মন্ত্রকের উপরও দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। রাজ্যসরকারগুলিও প্রতিবন্ধীদের জন্যে বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচীতে আছে : চাকুরিসংরক্ষণ, প্রশিক্ষণ, চিকিৎসা, সুলভে বা বিনামূল্যে প্রতিবন্ধীদের কাজের এবং কর্মক্ষমতার সহায়ক উপকরণাদি সরবরাহ করা।

বহু প্রতিবন্ধীর মধ্যে আশ্চর্য দক্ষতা লক্ষ্য করা যায়—হাত নেই কিন্তু পায়ের আঙুলে কলম চেপে অনর্গল লিখে চলেছেন কেউ, কেউ-বা পায়ে সূচ ধরে সূক্ষ্ম এমব্রয়ডারির কাজ করছেন। কোনো-একটি অঙ্গের বিকলতা অন্য-অঙ্গ দিয়ে পূরণ করে তুলতে পারেন এঁরা। সামান্য সাহায্যেই এঁরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারেন। সেই সাহায্যই এঁরা আমাদের কাছে চান, করুণা নয়। করুণার প্রশ্নই ওঠে না, এঁরা তো আমাদেরই ভাইবোন, আমাদেরই সঙ্গে সমতার ভিত্তিতে এঁরা চলবেন। এঁরা সমাজের ভার হবেন না, বরং এঁরাও সমাজকে তাঁদের শ্রমের ফল তুলে দেবেন, এই এঁরা চান। আমাদের কর্মসূচীও সেই ভাবে নির্বাচিত হওয়া চাই।

মূক, বধির এবং অন্ধদের শিক্ষায়তন কিছু আছে বটে, কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা

শিক্ষাসম্প্রসারণ

খুবই কম। এই ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান আরও বাড়াতে হবে এবং অবৈতনিক করতে হবে। প্রতিবন্ধীদের মধ্যে বহু প্রতিভা লুকিয়ে আছে। সুযোগ পেলে এবং প্রয়োজনীয় শিক্ষা পেলে অন্ধজনেও অন্যকে আলো দান করতে পারেন।

শুধু সরকারী প্রচেষ্টায় এত বড়ো সমস্যার সমাধান করা সম্ভব নয়, বেসরকারী প্রচেষ্টাও

উপসংহার

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। ছাত্র-ছাত্রীরাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে নেই। তারাও বিভিন্ন কর্মসূচীর রূপায়ণে সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছে। এই কল্যাণকর্মে ছাত্ররাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এ সুনিশ্চিত।

মনে রাখতে হবে, প্রতিবন্ধী বর্ষ ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দ গেলেই শেষ হয়ে গেল না, ঐ খ্রীস্টাব্দটি উদ্বোধনবর্ষ মাত্র। প্রতিবন্ধীকল্যাণে আমাদের সম্মিলিত কর্মধারাকে অব্যাহত রাখতে হবে।

এই প্রবন্ধের অনুসরণে লেখা যায়—

১. আমাদের প্রতিবন্ধী ভাইবোনেরা। ২. প্রতিবন্ধী পুনর্বাসনের আদর্শ।

একটি শ্রমিক বস্তীতে কয়েক ঘণ্টা

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

[ভূমিকা—অবস্থান ও পরিদর্শনের কারণ—বাহিরের রূপ ও প্রথম অভিজ্ঞতা—বস্তীর মানুষ ও তাদের সমস্যা—আতিথেয়তা—আশার আলো—উপসংহার।]

"চিরকালই মানুষের সভ্যতায় এক দল অখ্যাত লোক থাকে, তাদেরই সংখ্যা বেশি, তারাই বাহন; তাদের মানুষ হবার সময় নেই; দেশের সম্পদের উচ্ছিষ্টে তারা পালিত। সবচেয়ে কম খেয়ে কম পরে কম শিখে বাকি সকলের পরিচর্যা করে; সকলের চেয়ে বেশি

ভূমিকা

তাদের পরিশ্রম, সকলের চেয়ে বেশি তাদের অসম্মান। কথায় কথায় তারা উপোসে মরে, উপরওয়ালাদের লাথি-ঝাঁটা খেয়ে মরে। জীবন-যাত্রার জন্য যতকিছু সুযোগ-সুবিধে সবকিছুর থেকেই তারা বঞ্চিত। তারা সভ্যতার পিলসুজ, মাথায় প্রদীপ নিয়ে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে—উপরের সবাই আলো পায়, তাদের গা দিয়ে তেল গড়িয়ে পড়ে।" আমাদের সমাজজীবনে শ্রমিক ভাইদের গুরুত্ব এই কথাগুলোতে কী আশ্চর্য-ভাবে ফুটেছে।

উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পর সময়গুলো অনড় পাথর হয়ে বুকের ওপর চেপে বসল। দেখার মতো ফিল্ম যে কটা ছিল তা সব শেষ করতে সাতদিন গেল। তারপর আবার সেই

অবস্থান ও পরিদর্শনের কারণ

হাত গুটিয়ে বসে থাকা আর আড্ডা-মারা। এই করেই অলস মন্থর গতিতে দিন কাটছিল। শেষে কজন বন্ধু মিলে ঠিক করলাম সমাজের কোনো শ্রমিক পল্লীতে গিয়ে আমরা একটা নৈশ বিদ্যালয় খুলব, যে-বিদ্যালয়ের পড়ুয়া হবে পল্লীর বালক-বালিকা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধার দল। শেষে আমাদের এক

ট্যাংরাবাসী বন্ধু বলল তাদের বাড়ির খুব কাছেই একটি শ্রমিক বস্তী আছে যা আমাদের কর্মক্ষেত্র হিসাবে একেবারে আদর্শ।

আমরা ঠিক করলাম এটাই হবে আমাদের কর্মক্ষেত্র। কয়েকমাসের মধ্যে অন্তত কাজ চালানো গোছের কিছুটা লেখাপড়া ওদের শেখাতেই হবে। আমাদের বন্ধুটির সঙ্গে বস্তীবাসী কয়েকজনের সামান্য পরিচয় ছিল। সেই ক্ষীণ পরিচয়ের সূত্র ধরে আমরা এক রবিবার দিন সকাল সাতটা-আটটা নাগাদ ট্যাংরার শ্রমিক বস্তীতে হাজির হলাম। হাজির হলাম না বলে হানা দিলাম বলাই সঙ্গত। কারণ আমাদের মতো অপরিচিত কজন কিশোরকে দেখে প্রথমটায় ওরা বেশ হকচকিয়ে গেল। কেউ কেউ দূর থেকে সন্দেহের চোখেও তাকাল। প্রথমটায় আমাদেরও কেমন একটা কিন্তু-কিন্তু ভাব। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ স্থায়ী হল না। এক বৃদ্ধ খাটিয়ায় বসে সুতো দিয়ে কিসের যেন ফাঁস তৈরি করছিল। পরে জেনেছি, ওটা হল মাছ ধরার জাল। সেই বৃদ্ধ আমাদের মুখের দিকে খানিক তাকিয়ে থেকে ফোকলা মুখে একগাল হেসে বলল, 'বাবুদের কোত্থেকে আসা হচ্ছে, ভোটের লিস্টি করবে বুঝি?'

বাহিরের রূপ ও প্রথম অভিজ্ঞতা

সংক্ষেপে আমাদের পরিকল্পনার কথা বৃদ্ধকে বললাম। বুড়ো তো শুনে অবাক, বলল 'কেউ ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ায়?' বললাম, 'কেউ তাড়ায় কিনা জানি না কিন্তু আমরা তাড়াব। তবে মোষ নয় অশিক্ষা রূপ দানবটাকে।' দেখতে দেখতে ছোটো ছোটো পায়রার খোপের মতো ঘর থেকে উঁকি দিল কটি শীর্ণ মুখ, যে-মুখে কোনো আশার আলো নেই, নেই উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। আরও অনেকেই বেরিয়ে এল। ছুটির দিনের সকাল, একটু বেলা করেই সবাই ঘুম থেকে ওঠে। সারা সপ্তাহ হাড়-ভাঙা খাটুনির পর একটা দিন একটু আয়েস করে ঘুম।

আমরা ততক্ষণে বৃদ্ধের খাটিয়ায় আশ্রয় পেয়েছি। উঠোন না হলেও জায়গাটা উঠোনের মতো। চারিদিকে সারি সারি ঘর—আলো-বাতাসহীন। এত বড়ো বস্তীতে একটিই মাত্র গাছ, সেটা নিমগাছ। দাঁতনের জন্যে তার ডাল-পালা ভাঙতে ভাঙতে মুড়ো ঝাঁটার অবস্থা।

কিছুক্ষণ কথা বলার পর ওদের মন থেকে মিথ্যে সন্দেহের অন্ধকার দূর হল। খেয়াজাল-বোনা সেই বৃদ্ধ বস্তীবাসীদের প্রধান। তার মুখেই শুনলাম এ বস্তীর অধিকাংশ মানুষই নিরক্ষর, কাজ করে কোনো-না-কোনো কলে-কারখানায়। কেউ চটকলের শ্রমিক, কেউ রাইস-মিলের, কেউ ডকের, কেউ পটারীর, কেউ কাজ করে ইটভাটায়। সোম থেকে শনি, আটঘণ্টার ওপর দশ ঘণ্টা ডিউটি দিয়ে যখন বস্তীতে ফেরে তখন আর বিন্দুমাত্র জীবনীশক্তি অবশিষ্ট থাকে না ওদের। এমনই নিরক্ষর ওরা যে, দেশে গ্রামে টাকা পাঠানো এক সমস্যা। কোনো রকমে টিপসই দিয়ে ক'টা টাকা ঘরে আনে, তারপর মানিঅর্ডার ফর্ম হাতে এর ওর পায়ে ধরে বেড়ায়। একটা চিঠি পড়াতে হলেও তাই। সব প্রদেশেরই মানুষ আছে এ বস্তীতে, তাদের মধ্যে বাঙালী, বিহারী আর ওড়িয়াবাসী শ্রমিকের সংখ্যাই বেশি।

বস্তীর মানুষ ও তাদের সমস্যা

বৃদ্ধ মাতব্বর আরও জানালো, অশিক্ষা তো একটা বড়ো সমস্যা ঠিকই, তাছাড়াও নানান সমস্যা ওদের। প্রথমে বাসগৃহের কথাই ধরা যাক। ছোটো ছোটো অন্ধকার আলো-বাতাসহীন খুপরী—মানুষ বাসের অযোগ্য। গুমট গ্রীষ্মের রাত্রে মনে হয় এ বস্তীর সব অক্সিজেন বুঝি ফুরিয়ে গেছে। বাথ্‌রুম পাইখানার সেই আদিম ব্যবস্থা—সনাতন রীতি। এতবড়ো বস্তীতে মাত্র দুটি কল, তাই জল নিয়ে কাড়াকাড়ি, মারামারির অন্ত নেই।

কথা হচ্ছে, এমন সময় ছোট্ট তিনটি মেয়ের হাতে তিনটি রেকাবিতে কিছু নারকেলের নাড়ু নিয়ে এক বৃদ্ধা আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। চকচকে পিতলের ঘটিতে একঘটি জল। মাতব্বর বৃদ্ধ পরিচয় করিয়ে দিলেন, 'আমার স্ত্রী ভানুমতী। নাতি-নাতনীদের লেখাপড়া শেখাবার খুব ইচ্ছে, কিন্তু ধারে কাছে তো কোন স্কুল নেই, আপনারা এখানেই স্কুল করবেন শুনে ছুটে এসেছে।' ভানুমতীর হাসিতে সে কথার সমর্থন পাওয়া গেল। 'নিন, খান।' অগত্যা ওদের স্নেহের সেই দানকে ফেরাতে পারলাম না। খেতে হল নারকেলের নাড়ু। এর পর এল মাটির ছোটো ছোটো ভাঁড়ে চা। চা এল বোধ হয় স্থানীয় কোনো দোকান থেকে। বৃদ্ধা ভানুমতী জানালো, 'ইস্কুলের খাতায় আমাদের দুই বুড়োবুড়ির নামটাও লিখে নে বাবু, আমার বই পড়ার খুব সাধ।'

আতিথেয়তা

নাড়ু আর চা খেয়ে আমরা বস্তীর মধ্যে কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়ালাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা হয়ে গেলাম ওদের আপনজন। এই সহজ সরল দরিদ্র মানুষগুলোকে নিয়েই আমাদের কাজ। একটা উপন্যাস আছে নাম—'বারোঘর এক উঠান'। আর এখানে চল্লিশ ঘর এক উঠান। উঠানের প্রান্তে নিমগাছের তলায় আগামী কাল প্রথম আমাদের 'সুকান্ত পাঠশালা' বসবে। স্কুলের নামটা কিশোর কবি সুকান্তের নামেই দেওয়া। কবি সুকান্ত শ্রমিকদের নিয়ে ভাবতেন, অনেক কবিতাও লিখেছেন—তাই আমাদের পাঠশালা হবে কিশোর কবির নামে। চেয়ার টেবিল সংগ্রহ করা যাবে না, কারণ এখানে কারও ঘরেই ওসব নেই। ছাত্ররা যে যার ঘর থেকে শতরঞ্চ, চাটাই বসবার জন্যে আনবে। আমাদের জন্যে খানতিনেক টিনের চেয়ার সংগ্রহ করা সম্ভব হবে, বৃদ্ধ শ্রমিকনেতা আশ্বাস দিলেন।

আশার আলো

বুঝতেই পারি নি কখন ঘণ্টা তিনেক সময় পার হয়ে গেল। আমার জীবনে এক নতুন অভিজ্ঞতা। শ্রমিকদের নিয়ে কবিতা পড়েছি, গল্প পড়েছি—খবরের কাগজেও পড়েছি ওদের কথা, কিন্তু কয়েকঘণ্টা ওদের সঙ্গে কাটিয়ে আসার এ রোমাঞ্চ জীবনে ভুলব না। রোমাঞ্চিত মনে আমি আবৃত্তি করতে থাকি—

উপসংহার

"ওরা কাজ করে
নগরে প্রান্তরে।"

সাহিত্য ও বিজ্ঞান

[ভূমিকা—সাহিত্যের স্বরূপ—সাহিত্যের দৃষ্টি ও ধর্ম—বিজ্ঞানের দৃষ্টি ও ধর্ম—বিজ্ঞানের সত্য ও শিবম্—বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যোগসূত্র—বিজ্ঞানীর সাহিত্য-রচনা—তবে বিরোধ কোথায়—উপসংহার।]

মেকলে সাহেবের একটা উক্তি খুব প্রচলিত আছে। এক জায়গায় তাঁর অভিমত হল, সভ্যতা যত এগোয় সাহিত্যের তত ক্ষয় হয়। কথাটার সত্যতা কতখানি সে প্রশ্নে না গিয়েও বলা যায় এই মন্তব্য সাহিত্যে ও বিজ্ঞানের মধ্যে শুধু এক বৈরীভাব ঘোষণা করে। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিরোধ নিয়ে কিছুদিন আগেও তর্ক হত, চায়ের পেয়ালায় তুফান উঠত। কিন্তু আজকের মানুষের হিসাবে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বিরোধ নিয়ে মাথা ঘামানো অর্থহীন, অযৌক্তিক। দুটোই আজ তুল্যমূল্য। দুই-ই সভ্যতার গৌরব।

ভূমিকা

সাহিত্য আমাদের পরিশীলিত মননের সম্পদ। সাহিত্যের উদ্দেশ্য আনন্দদান। শুধু আনন্দ বললে ভুল হবে, এর সঙ্গে শিক্ষার প্রশ্নও জড়িত আছে। মানুষ শুধু অন্ন চিন্তা করে না, সে অন্য চিন্তাও করে। আর এই অন্য চিন্তার গৌরবে সে গৌরবান্বিত। এক মনের সঙ্গে আর-এক মনের যোগ, একের আনন্দের বা বিস্ময়ের সঙ্গে আর-একজনের মনের যোগসূত্র স্থাপন, এই তো সাহিত্যের লক্ষ্য। এ ছাড়া, মানুষের কল্যাণের সঙ্গেও সাহিত্য সম্পৃক্ত। মানুষের সৌন্দর্যচেতনা স্বর্গীয় গুণের নমুনা। যার অপরূপ সৌন্দর্যবোধ আছে সে ধন্য। তার চেতনার রঙে পান্না হয় সবুজ, চুনী ওঠে রাঙা হয়ে। সে তার সৌন্দর্যের অনুভূতি, জীবনের আনন্দ-বোধ যখন ভাষার মাধ্যমে অপরের মনের দরবারে পৌঁছে দেয় তখন তা হয়ে ওঠে সাহিত্য।

সাহিত্যের স্বরূপ

সাহিত্যের দৃষ্টি ব্যাপক, গভীর। তা বস্তুকে ছাড়িয়ে আরো দূরে প্রসারিত। রূপ থেকে রূপাতীতে, বস্তুরূপ থেকে বস্তুস্বরূপে পৌঁছে যায়। তার দৃষ্টি সত্যম্, শিবম্, সুন্দরম্-এর ধ্যানে আবিষ্ট। সে ফুলকে শুধু ফুল হিসাবে কিংবা গাছকে শুধু গাছ হিসাবে দেখে না। আরো অনেক কিছু দেখে সে। আর এই দেখা বা দর্শনের মাধ্যমে আবিষ্কার করে সত্যকে। সাহিতের উপজীব্য যখন মানুষ, মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, চাওয়া-পাওয়া, সফলতা-ব্যর্থতা, জীবনের সংগ্রাম—তখন তা মানুষের কাছে হয়ে ওঠে পরম সম্পদ। তা হয় মানুষের কল্যাণবাহী।

সাহিত্যের দৃষ্টি ও ধর্ম

বিজ্ঞানের দৃষ্টি সাহিত্যের দৃষ্টি থেকে আলাদা। তা তো হবেই। বিজ্ঞান বস্তুকে দেখে বস্তু হিসেবে। বস্তুর উদ্ভব, গঠন, তার উপকরণ, উপযোগিতা ইত্যাদি নিয়ে মেতে ওঠে। আর এই ভাবে দেখতে দেখতে বিজ্ঞানও সত্যের উদ্ঘাটনে সমর্থ হয়। বৈজ্ঞানিক বোধ-বুদ্ধি, বিচার আর পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে বস্তুর বিচার করেন। সেখানে হৃদয় বা আবেগের কোনো ঠাঁই নেই। বিজ্ঞানী বস্তুকে চিরে চিরে, ওলট পালট করে দেখে, বিচার করে।

বিজ্ঞানের দৃষ্টি ও ধর্ম

তারপর সিদ্ধান্তে আসে। এক-একটা বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা তথ্যের আবিষ্কারের পেছনে কত সাধনা, কত গবেষণা। শাণিত বুদ্ধি-নিয়ন্ত্রিত দৃষ্টি, বিচার-শাসিত চিন্তাধারার সূক্ষ্মতা।

বিজ্ঞানের সত্য ও শিবম্

বিজ্ঞানও সত্যের পূজারী। সত্যকে আবিষ্কার করে মানুষের সামনে হাজির করাই তো তার ধর্ম। তবে এ সত্য মানুষের জীবনের আবশ্যিক দাবির সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সত্যোদ্ঘাটন ও তার প্রয়োগে মানুষের খাওয়া-পরার সমস্যা মেটে, জীবন আরামে বিলাসে স্বচ্ছন্দ হয়, বৈভবমণ্ডিত হয়। আর এটাই তো বিজ্ঞানের কল্যাণের দিক। মানুষের কল্যাণ-কাজেই বিজ্ঞান নিযুক্ত। সভ্যতা বিজ্ঞানের দান বললে মিথ্যে ভাষণ হবে না।

বিজ্ঞান ও সাহিত্যের যোগসূত্র

বিজ্ঞানের সঙ্গে সাহিত্যের যোগসূত্র নিশ্চয়ই দেখানো যেতে পারে। বিজ্ঞান ও সাহিত্য—উভয়কে নিয়েই সভ্য মানুষ গৌরব করতে পারে। উভয়েই সত্যের পূজারী, মানুষের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। সাহিত্য বিজ্ঞানের কাছে অনেক দিক দিয়েই ঋণী। বিজ্ঞান ছাপাখানা না দিলে সাহিত্য আজও ভূর্জপত্রে আবদ্ধ থাকত। সাহিত্যকে বিজ্ঞানসম্মত চিন্তা নিয়ে অবশ্যই চলতে হবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি বর্জন করলে সে সাহিত্য হয়ে উঠবে অর্থহীন। বিজ্ঞান মানুষের জীবনে যে বৈচিত্র্য এবং যন্ত্রণা এনেছে—তার কথা নিয়ে সাহিত্যও বহু দলে বিকশিত হয়েছে। বিজ্ঞানকে কেন্দ্র করে সাহিত্যে যে সায়েন্স ফিকশন গড়ে উঠেছে তার মূল্যও কি কম? আর সাহিত্য বিজ্ঞানকে প্রভাবান্বিত করে নি বা করে না এ কথাও কি জোর দিয়ে বলা যায়? প্রাচীন পুরাণ, সাহিত্য, জুল ভার্ন, এইচ. জি. ওয়েলসের রচনা বিজ্ঞানকে মোটেই অনুপ্রাণিত করে নি, একথা বলা চলে?

বিজ্ঞানীর সাহিত্য-রচনা

আমাদের দেশে আচার্য জগদীশচন্দ্রের হাতে বৈজ্ঞানিক তথ্য ও তত্ত্ব অপূর্ব সাহিত্যের দৃষ্টান্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। রসায়নবিদ্ রামেন্দ্রসুন্দরের সরস বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলো সাহিত্যকৃতির অনন্য নিদর্শন। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিপ্রভাবিত সাহিত্যিকের সাহিত্য আর হৃদয় বেগানুপ্রাণিত বৈজ্ঞানিকের রচনা দুটোই কত অপরূপই না হয়ে উঠতে পারে।

তবে বিরোধ কোথায়?

দুর্ভাগ্যক্রমে বিজ্ঞানের সঙ্গে জড়িত রয়েছে যুদ্ধ আর ধ্বংসের বিভীষিকা। যার ফলে বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেকের মনেই বিরূপতার সৃষ্টি হয়েছে। তাছাড়া, বিজ্ঞান মানুষের জীবনযাত্রাকে যান্ত্রিক করে তুলেছে। যন্ত্রনির্ভর সভ্যতার কিছু বিষবাষ্পও আছে। রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'তে তাই ধ্বনিত হয়েছে মর্মঘাতী আক্ষেপ। বিজ্ঞান আমাদের জীবনে দিয়েছে বেগ কিন্তু কেড়ে নিয়েছে আবেগ। বোধ হয় এইসব কথা ভেবেই মেকলে সাহেব আতঙ্কিত হয়ে ঐ মন্তব্য করেছিলেন। অনেকে বলেন বিজ্ঞানে প্রয়োজনের দিকটা বড়ো, আর সাহিত্যে আনন্দের প্রশ্নই প্রধান। তা হয়তো হবে কিন্তু একটা আপোষ তো চাই। আমাদের বেঁচে থাকতে হলে যেমন চাই খাদ্য, তেমনি চাই ফুল। বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়েই আমাদের গর্ব—দুই-এর হাত ধরেই আমাদের পথ চলা।

বিজ্ঞান ও সাহিত্য উভয়েই আপন বৈশিষ্ট্যে ও গৌরবে উজ্জ্বল। এদের নিয়ে বিতর্ক চলতে পারে কিন্তু বিরোধ চলে না। শেক্সপীয়র নিউটন হতে পারতেন কিনা এ নিয়ে আমরা তর্ক চাই না।

উপসংহার

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায়— ১. বিজ্ঞান কি সাহিত্য বিরোধী ?

চিন্তাসহায়ক বাণী

All literature tends to be concerned with the question of reality. —Lionel Trilling (American auther), (1905)

In Science, read, by preference, the newest work ; in literature, the oldest. The classic literature is always modern.
—Baron Lytton (1803-73), Eng. novelist.

যন্ত্র ও আধুনিক জীবন

[উ. মা. ১৯৮২]

[ভূমিকা—মানবজীবনে যন্ত্রের প্রয়োজন—মানবসেবায় যন্ত্র—যন্ত্রসভ্যতার অভিশাপ—যন্ত্র ও যন্ত্রচালক—অটোমেশন—উপসংহার।]

ভূমিকা

সভ্যতা বিকাশের উষালগ্নে যন্ত্রের উদ্ভব হয়েছিল। সেদিন যন্ত্র ছিল মানুষের কাছে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের হাতিয়ার। যন্ত্রশক্তিকে কাজে লাগিয়ে সেদিন মানুষ হয়েছিল অসীম শক্তির অধিকারী। কিন্তু এই যন্ত্রই একদিন মানুষের চেয়ে অধিক শক্তিশালী হয়ে মানুষকে ক্রীতদাসে পরিণত করেছে। তাই আধুনিক যুগে শুরু হয়েছে মানুষের সঙ্গে যন্ত্রশক্তির সংগ্রাম। এই সংগ্রামে জয়লাভ করতে না পারলে অনিবার্য কারণেই দেখা দেবে সভ্যতার সঙ্কট।

মানবজীবনে যন্ত্রের প্রয়োজন

মানুষের কষ্ট লাঘবের জন্যে যন্ত্রের প্রয়োজন। যন্ত্রের সাহায্যে মানুষ খনিগর্ভ থেকে তুলে আনে সম্পদ, পাষাণের বুকেও ফলায় সোনার ফসল। এক কথায় মানুষের ভোগাকাঙ্ক্ষার চাহিদা মেটাবার জন্যেই যন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে, এসেছে যন্ত্রসভ্যতা—যন্ত্রযুগ। যন্ত্রের শক্তিকে করায়ত্ত করে মানুষ অসীম শক্তিধর হয়েছে। আকাশের বিদ্যুৎকে সে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করেছে, আবিষ্কার করেছে দুর্জয় শক্তিধর পরমাণুকে।

মানবসেবায় যন্ত্র

শিল্প-বিপ্লবের মাধ্যমে যন্ত্রযুগের সূত্রপাত। যে-কাজ মানুষ একদিন নিজের হাতে সম্পন্ন করত সেই কাজে ব্যবহৃত হল যন্ত্রশক্তি। এই ভাবে যন্ত্র মানুষের জন্যে পাহাড় ভেঙে রাস্তা তৈরি করেছে, নদীর বুকে নির্মাণ করেছে সেতু, সুদূরকে করেছে নিকট। উৎপাদন-বৃদ্ধি যন্ত্রসভ্যতার একটি বিশেষ অবদান। বিরুদ্ধ প্রকৃতিকে আমরা যন্ত্রের সাহায্যেই বশীভূত করেছি। পীড়িতের সেবায়, মহামারী-অজন্মায় যন্ত্র তার কল্যাণ-হস্ত প্রসারিত করে দিয়েছে।

অতিরিক্ত যন্ত্রানুগত্যের একটা কুফল আছে। আজ দিকে দিকে এই কুফল ফলতে শুরু করেছে। তাই আজ একটা কথা ভেবে দেখার সময় এসেছে, আমাদের যন্ত্রমুখাপেক্ষিতা আমাদের স্বভাব-শক্তিকে যেন নিষ্ক্রিয় বা পঙ্গু করে না দেয়। লিফ্‌ট চলুক কিন্তু সিঁড়িভাঙার সাহসে যেন ভাটা না পড়ে। আজ যন্ত্র কেড়ে নিয়েছে মানুষের হাতের কাজ, সেই সঙ্গে হরণ করেছে তার মুখের অন্ন। কাপড়ের কল লক্ষ লক্ষ তাঁতিকে বেকার করেছে, তেলের কল এসে বন্ধ করল কলুর কাঠের ঘানি। এইভাবে যন্ত্রদানব মানুষকে ক্রমে ক্রমে নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েছে। মানুষ শক্তি হারিয়ে পঙ্গু হয়ে পড়েছে।

যন্ত্রসভ্যতার অভিশাপ

যন্ত্র একদিন ছিল মানবকল্যাণের প্রতীক। কিন্তু আজ যন্ত্র হয়েছে মুষ্টিমেয় শক্তিধর মানুষের হাতে অস্ত্র। যন্ত্রবলে বলীয়ান হয়ে মুষ্টিমেয় মানুষ লক্ষ লক্ষ মানুষকে শোষণ করে আসছে। তাই দোষটা যন্ত্রের নয়, যন্ত্রচালকের। যতদিন এই সব মানুষের শুভবুদ্ধির উদয় না হয় ততদিন যন্ত্র সভ্যতার আশীর্বাদ না হয়ে অভিশাপ হয়ে থাকবে।

যন্ত্র ও যন্ত্রচালক

মানবশক্তির বিকল্পরূপে অটোমেশনের আবির্ভাব ঘটেছে। বিশ্বের উন্নতিশীল দেশের সর্বত্র জীবনবীমা, ব্যাঙ্ক, রেল এবং অন্যান্য বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে অটোমেশন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। অটোমেশন মাত্রেই অতিরিক্ত যন্ত্রানুগত্য, যা বৈজ্ঞানিক যুগে অস্বীকার করা যায় না। কারণ মানুষের সাধ্যাতীত সূক্ষ্ম হিসাব অটোমেশনের দ্বারাই সম্ভব। এর দ্বারা শ্রমের ক্লান্তি দূর হবে, বৃদ্ধি পাবে লাভের অঙ্ক। কিন্তু ভারতের মতো বেকার সমস্যা-জর্জরিত দেশে অটোমেশন মূঢ়তা ছাড়া আর কিছুই নয়। অটোমেশন হলে লক্ষ লক্ষ মানুষ হবে বেকার, নির্মূল হবে কর্মখালির সম্ভাবনা। তা ছাড়া যে-পরিমাণ বিদেশী মুদ্রার বিনিময়ে আমরা অটোমেশন চালু করব ভারতে তার সঙ্গতি কোথায়?

অটোমেশন

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রক্তকরবী' এবং 'মুক্তধারা' নাটকে যন্ত্রের এই ছিন্নমস্তা রূপ দেখে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছেন। মানুষকে এই যন্ত্রনির্ভরতার জন্যে একদিন চরম মূল্য দিতেই হবে, যে-দিন যন্ত্র যন্ত্রীকে তার ক্রীতদাসে পরিণত করবে। জানি না, শেষের সেদিন কী ভয়ঙ্কর।

উপসংহার

চিন্তাসহায়ক বাণী

Every human advance carries with it not only automatic benefits but also a new responsibility ; and we must remain constantly aware of the dangers that lie in the possible misuse of our enormous skill. —J. Bronowski, (1908-74),
A scientist and a literary critic.

জীবনে খেয়ালখুশির মূল্য

[ভূমিকা—সভ্যতার ইতিহাসে খেয়ালখুশির মূল্য—খেয়ালখুশি ও সৃজনশীলতা।]

ভূমিকা

জীবনরক্ষা এবং জীবনে উন্নতিলাভের জন্যে মানুষকে যন্ত্রের মতোই কাজ করে যেতে হয়, এটা সত্যি—কিন্তু মানুষ যন্ত্র নয়। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা আছে, ভালোমন্দের বিচারশক্তি আছে। তার আছে খেয়ালখুশি মতো চলবার জন্যে মনের কোণে গোপন আকাঙ্ক্ষা—যা যন্ত্রের নেই। যন্ত্র নিয়ম-চালিত, মানুষ যন্ত্রকে চালায়—অপরপক্ষে মানুষকে চালায় তার ইচ্ছাশক্তি। এই ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে মানুষ যে-সব সময় সুশৃঙ্খলভাবে নিয়মের বশবর্তী হয়ে কাজ করে তা নয়,—অনেক সময় তার খেয়ালখুশি মনের জগতে আবির্ভূত হয়ে তাকে নিয়ম-বহির্ভূত কাজেও প্রবৃত্ত করায়। নিয়মের জগতে কেউ এই খেয়ালখুশিমতো কাজ করলে শুভানুধ্যায়ীরা ভয়ে আঁৎকে ওঠেন—ভাবেন, কর্মক্ষেত্রে এই খেয়ালী মানুষটি কোনো সার্থকতা অর্জন করতে পারবে না। কিন্তু বাস্তবক্ষেত্রে দেখা যায়, খেয়ালখুশির অনুবর্তী হয়ে জগতের বহু ব্যক্তি জীবনে এমন স্থায়ী কৃতিত্ব লাভ করেছেন যা নিয়মানুবর্তী বহু লোকের পক্ষে সম্ভব হয় নি। সুতরাং খেয়ালখুশি মাফিক কাজের মূল্য জীবনে সুনিয়ন্ত্রিত, সুবিন্যস্ত কাজের চাইতে কোনো অংশে কম নয়।

সভ্যতার ইতিহাসে খেয়ালখুশির মূল্য

বিজ্ঞান বা শিল্পজগতে যে-সমস্ত আবিষ্কার মানব-সভ্যতাকে ক্রমোন্নতির পথে এগিয়ে নিয়েছে তার অনেকগুলিই মানুষের খেয়ালখুশি মাফিক কর্মজাত। এরকম খেয়ালখুশি-মতো কর্মের সাহায্যেই একটি বালক একদিন খেলাচ্ছলে বাষ্পচালিত ইঞ্জিন তৈরির স্বপ্ন দেখেছিল এবং পরবর্তী কালে তার সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হওয়ায় আধুনিক সভ্যতায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছে। খেয়ালখুশি বশেই মানুষ একদিন আকাশে উড়তে চেয়েছিল। তার সে খেয়াল বাস্তবে পরিণতি লাভ করায় এখন মানুষ স্বল্পতম সময়ে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে যাতায়াত করতে পারে। দূরের মানুষের কাছে সংবাদ পাঠাবার খেয়ালেই আবিষ্কৃত হয়েছে টেলিগ্রাফ, দূরবর্তী মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলবার খেয়ালে আবিষ্কৃত হয়েছে টেলিফোন। ইথার-তরঙ্গের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় খবর এবং আনন্দময় সঙ্গীত পরিবেশন করবার খেয়ালে আবিষ্কৃত হয়েছিল একদিন রেডিও, আবার দূরের সংবাদ প্রচারক, গায়ক বা অভিনেতা-অভিনেত্রীকে স্বচক্ষে দেখবার এবং দেখাবার খেয়ালে আবিষ্কৃত হয়েছে টেলিভিশন। এভাবে মানুষের খেয়ালজাত আকাঙ্ক্ষা আধুনিক বিজ্ঞান সভ্যতায় অভাবনীয় পরিবর্তন সংঘটিত করেছে।

কোনো বালকবালিকা পড়াশোনায় অবহেলা করে খেয়াল-খুশিমতো খেলাধুলার দিকে বেশি ঝুঁকে পড়লে অভিভাবকেরা সাধারণত তাদের ভবিষ্যৎচিন্তায় আতঙ্কিত হন। পরবর্তী কালে দেখা যায় এ সমস্ত ক্রীড়ানুরাগী বালক-বালিকা বিভিন্ন খেলায় নৈপুণ্য অর্জন করে দেশের সর্বজন-প্রিয় হয়েছেন। ছোটোবেলায় খেয়াল-খুশিমতো গান-বাজনায় মেতে থাকে এমন বহু বালক-বালিকা পরিণত যৌবনে বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন, অর্থ এবং

প্রতিপত্তি লাভ করেছেন। কোনো কোনো খেয়ালী ছেলেমেয়ের ছোটো বেলা থেকে ঝোঁক থাকে অভিনয়ের দিকে। পড়াশোনা তাদের ভালো লাগে না। অভিভাবক এবং শুভার্থীরা তাদের ভবিষ্যৎ ভেবে হতাশ হন। অথচ অভিনয়ে সহজাত প্রতিভাসম্পন্ন কোনো কোনো বালকবালিকা উত্তর-জীবনে রঙ্গমঞ্চে এবং চলচ্চিত্রে অভিনয় নৈপুণ্য প্রকাশ করে সমগ্র দেশবাসীর হৃদয় জয় করেন। আবার কোনো কোনো ছেলে-মেয়ে দেখা যায় রঙ-তুলি নিয়ে ছবি আঁকতে ভালোবাসে, কিংবা মাটির মূর্তি গড়ে আনন্দ পায়।

খেয়ালখুশি ও সৃজনশীলতা

অভিভাবকের সেই খেয়ালী ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনার দিকে কিভাবে মনোযোগী করে তুলবেন, সেদিকে চেষ্টার ত্রুটি থাকে না। তাদের প্রয়াস ব্যর্থ হলে এ সমস্ত খেয়ালী ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা সব আশা ছেড়ে দেন। অথচ পরিণত জীবনে দেখা যায় এ সমস্ত খেয়ালী ছেলেমেয়েরাই চিত্রশিল্প বা ভাস্কর্যশিল্পে নৈপুণ্য অর্জন করে স্থায়ী যশের অধিকারী হন। কোনো কোনো খেয়ালী ছেলের শখ থাকে খেলাচ্ছলে ঘর বানাবার দিকে। পরে দেখা যায় এসব খেয়ালী ছেলে ইনজিনিয়ারিং বিদ্যায় কৃতিত্ব অর্জন করে সুদৃঢ় ঘরবাড়ি নির্মাণে উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। ছেলেবেলা থেকে কবিতা বা গল্প রচনার খেয়ালে যারা নিভৃত, বিচ্ছিন্ন জীবন ভালোবাসে, কোনো সক্রিয় কর্মোদ্যমের দিকে যাদের কোনো আগ্রহ থাকে না—তাদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পিতামাতা অনেক সময় হাল ছেড়ে দেন। অথচ পরিণত জীবনে দেখা যায় এ সমস্ত কল্পনাপ্রবণ খেয়ালী ছেলে-মেয়েরা সৃজনধর্মী সাহিত্য জগতে প্রতিষ্ঠা অর্জন করে দেশে-বিদেশে শ্রদ্ধার আসন অর্জন করেছেন। সুতরাং আপাত দৃষ্টিতে গতানুগতিক জীবনের পক্ষে খেয়ালখুশি মূল্যহীন মনে হলেও সৃষ্টিশীল জীবনের দিক থেকে খেয়াল-খুশির মূল্য অপরিসীম।

চিন্তাসহায়ক বাণী

Happy is the man who can make a living by his hobby.
—Bernard Shaw.

যুদ্ধ ও শান্তি

[ভূমিকা—যুদ্ধ হয় কেন—যুদ্ধের তথাকথিত স্তুতি—যুদ্ধের প্রয়োজন—শান্তি—ভারতের আদর্শ—পথ—রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা—শান্তির সংগ্রাম—উপসংহার।]

ভূমিকা

War! that mad game the world so loves to play—*Swift.* এর চেয়ে অল্প কথায় যুদ্ধ-সম্পর্কে বক্তব্য আর কী হতে পারে? যুদ্ধটা যেন সত্যিই নেশার মতো। একবার যুদ্ধের পথে গেলে থামবার আর উপায় নেই।

যুদ্ধের জন্ম দেয় লোভ। রাষ্ট্রগতভাবে যখন ভাবা হয় অন্য কোনো রাষ্ট্রের সম্পদে ভাগ বসাতে পারলে বা তা সম্পূর্ণ গ্রাস করতে পারলে আমার শক্তি বৃদ্ধি হবে, তখনই সেই রাষ্ট্র যুদ্ধের কথা ভাবে। এই লোভের কোন সীমা নেই—আগুনে ঘৃতাহুতির মতো তা ক্রমশ বেড়েই চলে। অনেক সময়ে এই লোভ ধর্মের ছদ্মবেশ নিয়ে আসে এবং বিধর্মী অতএব পাপী, তাই এরা শত্রু, এদের সহ্য না করাই ভালো। এদের যা-কিছু সে-সব গ্রাস করাই হবে ধর্ম। ধর্মের নামে কত যুদ্ধই তো হয়েছে। ইতিহাস তার সাক্ষী।

যুদ্ধ হয় কেন

এই যুদ্ধের ব্যাপারে স্বার্থসর্বস্ব ক্ষমতালোভীরা ধর্মপ্রেম আর দেশপ্রেমকে আফিং হিসেবে ব্যবহার করে। দেশের জন্যে যুদ্ধ, ধর্মের জন্যে যুদ্ধ, অতএব ভাইসব শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে···ইত্যাদি ইত্যাদি বজ্রগর্ভ বক্তৃতায় আকাশ বাতাশ ছেয়ে যায়।

যুদ্ধের তথাকথিত স্তুতি

এইসব স্বার্থবাদীদের বিরুদ্ধেই যুদ্ধের প্রয়োজন। পররাজ্যগ্রাসীদের বিরুদ্ধে দৃপ্ত কণ্ঠে যখন দেশের-হৃদয়-থেকে-উঠে-আসা বীর বিপ্লবী বলেন—Give me blood and I will give you freedom, তখন তা সকলের মনে উদ্দীপনা আনে শত্রুশিবিরে আঘাত হানবার জন্যে।

যুদ্ধের প্রয়োজন

তাই যুদ্ধবাজদের শ্লোগানের সঙ্গে প্রকৃত দেশপ্রেমিকের বিপ্লবী আহ্বানকে মিলিয়ে দেখলে চলবে না।

যথার্থ দেশপ্রেমিক দেশকে গড়ে তুলতে চায়, মূক মুখে ভাষা দিতে চায়, রুগ্ণ ভগ্ন মুখে আশার বাণী ধ্বনিত করতে চায়। এ সম্ভব শুধু শান্ত পরিবেশে। বিধ্বস্ত নাগাসাকি-হিরোসিমা আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছে। অনেকে বলেন যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতেই হবে—কারণ preparation for war is the best security for peace. কিন্তু আমরা একথা মানি না, বারুদের স্তূপ সাজিয়ে মৈত্রীর উৎসব হয় না। শান্তির রথ দুপাশে কামান সাজানো পথ বেয়ে চলতে পারে না।

শান্তি

ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীকেই ভারতের শান্তির আদর্শ বিধৃত। কলিঙ্গের রক্তাক্ত পথ থেকে অশোক সরে এসেছিলেন কল্যাণের পথে। ঐ পথই ভারতের পথ। গৌতম বুদ্ধ সেই শান্তির পথেরই নির্দেশ দিয়েছেন পৃথিবীকে। মনে রাখতে হবে, যুদ্ধ বিকৃতি, শান্তিই প্রকৃতি।

ভারতের আদর্শ

কিন্তু শুধু আদর্শ আর মূল্যবোধ প্রচারেই কি যুদ্ধবাজদের সম্বিৎ ফিরবে? মানুষের শুভবুদ্ধির উপর যার গভীর আস্থা ছিল সেই রবীন্দ্রনাথকেও বলতে হয়েছে 'শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস'? কিন্তু কোন্ পথে তবে শান্তি আসবে? অনেক রাষ্ট্র-তত্ত্ববিদের মতে শ্রেণীহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আছে শান্তির আশ্বাসবাণী। যদি তা সত্য হয়, সে প্রচেষ্টা চলুক কিন্তু তার সঙ্গে মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের অন্য পথের কথাও ভাবতে হবে। সাহিত্য ও সংস্কৃতি এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে পারে বলে মনে হয়। শেক্সপীয়র, টলস্টয়, গ্যয়টে, কালিদাস—এঁরা কোনো বিশেষ দেশের মানুষ নন, এঁরা ভূগোলের সীমানা ছাড়িয়ে

পথ

সমস্ত মানুষের পরমাত্মীয়। অনুবাদের মধ্য দিয়ে বিশ্বের শ্রেষ্ঠচিন্তা, শ্রেষ্ঠসাহিত্য ও কাব্য ছড়িয়ে দিতে হবে বিশ্ববাসীর হাতে, করতে হবে সংস্কৃতি-দূত বা সংস্কৃতি দল-বিনিময়। এইভাবে অবিশ্বাস আর দূরত্ব নিশ্চয় কিছুটা কমতে পারে। সাধারণ মানুষই ভালোবাসার আলোয় সত্য দেখতে পাবে, শাসকদের যুদ্ধং দেহি মনোভাবকে রুখতে পারবে।

রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা

এ বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রসংঘকে নৈতিক দিক দিয়ে হতে হবে লৌহদৃঢ়, তাহলেই তার প্রভাব পড়বে সারা পৃথিবীতে। তাই যখন খবরের কাগজে পড়ি রাষ্ট্রসংঘের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বোমা বর্ষণের সংবাদ তখন মনে হয় এই বিশ্ব-সংস্থার মধ্যেই হয়তো কোনো দুর্বলতা বাসা বেঁধে আছে।

শান্তির সংগ্রাম

সংগ্রাম যদি স্বীকার করতেই হয় তবে শান্তির সংগ্রামই হবে আমাদের একমাত্র সংগ্রাম। নিরস্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নির্লোভীকরণের মন্ত্রপাঠ না থাকলে ওটা কথার কথা ছাড়া আর কিছুই নয়।

উপসংহার

দাদুর কাছে যুদ্ধের বর্ণনা আর যুদ্ধের গুণগান শুনতে শুনতে গল্পের শেষে নাতি-নাতনী বলল—কিন্তু দাদু, বলো তো, কী লাভ হল এতে—it's a wicked thing. আমাদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের গল্প শুনতে শুনতে শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হয় কী লাভ হল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে বা কুরু-পাণ্ডবেরা কী পেলেন? সাধারণ শান্তিকামী পুরবাসীরাই কি পেল?

চিন্তাসহায়ক বাণী

শান্তি? শান্তির দরবার সত্য সত্যই কে করতে পারে? ত্যাগের জন্যে যে প্রস্তুত। ভোগেরই জন্যে, লাভেরই জন্যে যাদের দশ আঙুল অজগর সাপের দশটা লেজের মতো কিল্‌বিল্ করছে তারা শান্তি চায় বটে, কিন্তু সেটা ফাঁকি দিয়ে, দাম দিয়ে নয়। যে শান্তিতে পৃথিবীর সমস্ত ক্ষীররসের বাটি চেটে নিরাপদে যাওয়া যেতে পারে সেই শান্তি। —রবীন্দ্রনাথ।

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস, শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস। —রবীন্দ্রনাথ।

Peace cannot be kept by force. It can only be achieved by understanding. —Albert Einstein (1879-1955) Great Scientist.

In war, whichever side may call itself the victor, there are no winners, but all losers. —A. Chamberlain (1869-1940) British Stateman.

Mankind must put an end to war or war will put an end to mankind. —John Fitgerald Kennedy (1917-1963) Thirty-fifth President of the united states.

তোমার দেখা একটি মেলা

[ভূমিকা—মেলার মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক দিক—নাড়াজোলের রথের মেলা—মেলার বর্ণনা ও অভিজ্ঞতা—উপসংহার।]

ভূমিকা

মিলন থেকে মেলা কথাটির উদ্ভব, তাই মানুষে মানুষে মিলনের সেতু রচনা করাই মেলার উদ্দেশ্য। 'দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে'—এ কথা মেলা সম্পর্কেই বাস্তব সত্য।

মেলার মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক দিক

প্রাচীন কালের মতো আধুনিক যুগেও মেলার গুরুত্ব অসীম। তাই সারা বছর ধরে একটি বিশেষ মেলার জন্যে মানুষ অপেক্ষা করে থাকে। ছোটোরা পয়সা জমায়, শিল্পী তার শিল্পের পসরা সাজাতে থাকে। এমনি করেই কাজে আর চিন্তায় চলে মেলার জন্যে প্রতীক্ষা। বহুদিনের অদেখা কোনো বন্ধু অথবা আত্মীয়কে হঠাৎ মেলার ভীড়ে আবিষ্কার করার যে কী আনন্দ তা বুঝি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কর্মক্লান্ত মানুষ তাই মেলাকে চেয়েছে, কারণ তারা জানে মেলা হল কর্মক্লান্ত জীবনের উপর অমৃতের প্রলেপ। এর সঙ্গে মেলার অর্থ নৈতিক দিকটিও মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। মেলা বিকিকিনির একটা বড়ো মাধ্যম, অর্থনীতিতে যাকে বলে বাজার, তাই। এই বাজারের কথা ভেবেই কত দূর-দূরান্ত থেকে দোকানী পসারীর দল মেলায় আসে বিচিত্র পণ্যসম্ভারের ডালি সাজিয়ে।

নাড়াজোলের রথের মেলা

একবার নাড়াজোলের বিখ্যাত রথের মেলা দেখতে গিয়েছিলাম। মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার কংসাবতী নদীর তীরে নাড়াজোল গ্রামে প্রতিবছর রথের দিন এই মেলা হয়। এই মেলার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ রাজবাড়ির রথ। যদিও নামেই রাজবাড়ির রথ, কিন্তু এ রথ টানার অধিকার সকলের। এত বড়ো রথ জীবনে কোনো দিন দেখি নি। পুরীর জগন্নাথদেবের বিশাল রথের কথা শুনেছি, দেখি নি। তাই নাড়াজোলের মেলার বড়ো আকর্ষণ এই রথ দেখে আমি বিস্মিত হয়েছিলাম। দুজন বন্ধু ছিল আমার সঙ্গে, তাদেরও সেই একই অবস্থা। রথ চলে গেল মাটি কাঁপিয়ে, অসংখ্য মানুষের জয়ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে। বন্ধুদের মধ্যে কে যেন মৃদুস্বরে আবৃত্তি করল :

'রথ ভাবে আমি দেব পথ ভাবে আমি
মূর্তি ভাবে আমি দেব হাসে অন্তর্যামী।'

অন্তর্যামীর হাসিটা নির্ঘাৎ ছোঁয়াচে। তাই মনে মনে না হেসে পারলাম না। বন্ধুকে বললাম, তুই এখন ওটার ভাবসম্প্রসারণ কর, আমরা মেলাটা ঘুরে আসি।

রাজা নেই, সে রাজ্যও নেই, কিন্তু আছে মানুষের মেলা। সে মেলায় 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে'। যে-দিকে চোখ যায় কেবল লোক আর লোক। পথের দুধারে দোকান-পসার, বিশাল মেলা প্রাঙ্গণে বিচিত্র অনুষ্ঠানের আয়োজন। রথটানা দেখে আমরা মেলার দিকে মন দিলাম।

রথের মেলা মানেই তালপাতার ভেঁপু, পাঁপর ভাজা, আর গাছের কলম। কিন্তু এখানে এসে আমাদের সে ধারণা সম্পূর্ণ বদলে গেল। গাছের কলম আর তেলেভাজার দোকান অনেক ছিল, থাকবেও। কিন্তু এ মেলায় সবচেয়ে বড়ো যে-বৈশিষ্ট্য চোখে পড়েছিল তা হল পণ্যসম্ভারের বৈচিত্র্য। কোনো গ্রামের মেলায় এত বিচিত্র দোকান আর বিচিত্র পণ্যের আমদানি হয় তা আমার জানা ছিল না। তার সঙ্গে ছিল মনোহরণের অজস্র আয়োজন। চাঁদমারী থেকে নাগরদোলা, সার্কাস, ম্যাজিক খেলা, কীর্তনগান, সাঁওতালী নাচ, আরও কত কী। আমাদের অবস্থা হল বাঁশবনে ডোম কানার মতো। কোথায় যাব কী করব তা ভাবতে ভাবতেই বৃষ্টি এল। রথের মেলা—বৃষ্টি তো হবেই। প্রবাদে বলে, জগন্নাথ দেবের মাসি নাকি জগন্নাথের অদর্শনে কাঁদেন, তাই বৃষ্টি হয়। ঝিরঝিরে বৃষ্টিতে পাঁপর ভাজা যেন অমৃত মনে হল। বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে কিছুক্ষণ চাঁদমারী করা গেল। বলা বাহুল্য, যে বেলুনটাকে তাক করলাম, ফাটল ঠিক তার পাশেরটা। তাতেই আনন্দ। কবে সেই ছোটোবেলায় নাগরদোলায় চড়েছিলাম মনে পড়ে না, এখানে এসে আর একবার নতুন করে নাগরদোলায় চড়ার আনন্দ পাওয়া গেল।

মেলার বর্ণনা ও অভিজ্ঞতা

ম্যাজিক-সার্কাস কিছুই বাদ পড়ল না। তবে সম্পূর্ণ দেখা হল না, কেবল একটু একটু করে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাওয়া। হঠাৎ একটি ছেলেকে কাঁদতে দেখে কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। ছেলেটি দলছুট হয়ে পড়েছে। ওর এক হাতে তালপাতার ভেঁপু, অন্যহাতে পাঁপরভাজা। তার কান্না দেখে মেলায় মাইকের প্রয়োজন যে কতখানি তা উপলব্ধি করলাম। অবশ্য কিছুক্ষণ বাদেই ছেলের বাবা তার দলছুট ছেলেকে পেয়ে খুশিমনে চলে গেল। আমিও খুশি হলাম, অবশ্য খুশি হলাম অন্য আর একটা কারণে। ছেলেটার কাছে শুনলাম মেলার এক অভিনব প্রতিশব্দ। সে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিল, 'আমি বাপের সঙ্গে জাত দেখতে এসেছি। মেলা অর্থে 'জাত' বলার ব্যবহার আগে কোনো আঞ্চলিক ভাষায় পাই নি। নাড়াজোলের মেলায় এটাই আমার বড়ো আবিষ্কার।

ফুলের সঙ্গে থাকে কাঁটা। মেলার নিটোল-আনন্দের মধ্যে সেই কাঁটাকে উপলব্ধি করলাম ফেরার পথে। মেলার আনন্দ কোলাহল তখনও মিলিয়ে যায় নি, আমরা লঙ্কাগড় থেকে বাসে উঠলাম, যাব ঘাটাল। বাসে উঠে টিকিট কাটতে গিয়েই দেখি আমার পাঞ্জাবির পাশের পকেট বেমালুম হাওয়া। কয়েকটা টাকা আর খুচরো পয়সাও ছিল। বন্ধুদের কাছে হাত পেতে সে যাত্রা উদ্ধার পাওয়া গেল। মেলা দেখার আনন্দের মধ্যে এটাই আমার বেদনার স্মৃতি।

উপসংহার

ত্রিপুরার একটি উৎসব বা মেলা

[ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৮৩]

[ভূমিকা—প্রকৃতি—বর্ষার রূপ—বর্ষার উৎসব খার্চি—ত্রিপুরার উৎসবের বৈশিষ্ট্য—উপসংহার।]

'উৎসব' কথাটির মধ্যে নতুন ক'রে জন্ম নেবার অর্থটি নিহিত। সত্যি, উৎসবের

মধ্য দিয়ে যেন আমরা নতুন প্রাণ পাই। এই উৎসবের জন্যেই আমাদের কর্মধারায় সঞ্চারিত হয় আনন্দ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উৎসবের বিপুল সমারোহ। বাংলার মতো ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও বলা যায়—বারোমাসে তেরো পার্বণ। উৎসবের সঙ্গে প্রকৃতি ও ঋতুর সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। তাই ত্রিপুরার উৎসব-বর্ণনার আগে তার প্রকৃতির পরিচয় নেওয়া যাক।

ভূমিকা

প্রকৃতির লীলাভূমি ত্রিপুরা। ত্রিপুরার ভূমিতে যেমন আছে পর্বতের সমারোহ, তেমনি আছে অরণ্যের বিস্তার। তারই মধ্যে নদী আপন বেগে পাগল-পারা। তরু-সম্পদে সম্পন্ন ত্রিপুরা। জাম, জামরুল, শাল, কুই, কাঞ্চন, করই, গর্জন, গাসাই মাথা তুলিয়ে চলেছে বাতাসের তালে তালে। জুড়ি, দেও, মনু, খোয়াই, ধলাই উত্তরবাহিনী হয়ে, হাওড়া, বিজয় ও গোমতী পশ্চিমবাহিনী হয়ে, ফেণী ও মুহুরী দক্ষিণবাহিনী হয়ে বাংলাদেশে এসে পড়েছে।

প্রকৃতি

এই প্রকৃতির সঙ্গেই ত্রিপুরার উৎসবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ।

গ্রীষ্মের দাবদাহের পর পাহাড়ী ঢাল বেয়ে নামে বর্ষণ-ধারা। ক্ষীণকায় নদীগুলো হয় স্ফীত। বনভূমিতে সাড়া জাগিয়ে ঝাঁকিয়ে আসে বর্ষা। পাহাড়ের চেহারায় আসে পরিবর্তন। সবুজের বন্যা আসে বন-পাহাড়ে। পাহাড়ের কোলে কোলে ভাসমান মেঘখানা করে স্বপ্নরচনা।

বর্ষার রূপ

আগরতলার কাছেই চতুর্দশ দেবতার বাড়ি খয়েরপুর। পূজার স্থান এইটি। চতুর্দশ দেবতারা হলেন—হর, উমা, হরি, বাণী, কুমার, গণপা, বিধি, মা, হিমাদ্রি, অব্ধি, শিখী, কম, বুড়াছা, লক্ষ্মী। পূজার সময় আষাঢ় মাসের শুক্লা অষ্টমী তিথি থেকে সাতদিন চলে এই পূজা। ছাগ, কবুতর ও মহিষ বলি হয় এই পূজায়। এই উপলক্ষে মেলাও চলে সাতদিন ধরে।

বর্ষার উৎসব খার্চি

মামিতা (নবান্ন উৎসব), গড়িয়া (মহাদেব পূজা) ইত্যাদি ত্রিপুরার উল্লেখযোগ্য উৎসব হলেও এই খার্চি পূজাকেই বলা যেতে পারে ত্রিপুরার জাতীয় উৎসব। বিভিন্ন জন-জাতির লোক এই উৎসবে যোগ দেয়। খার্চির পরিপূরক উৎসব খের-পূজা। এই পূজা খার্চির পনেরো দিন পরে অনুষ্ঠেয়। এই পূজা অমাবস্যা তিথিতে অনুষ্ঠিত হয়। বলি এ পূজাতেও চলে। পূজার পুরোহিতকে বলা হয় চণ্ডাই। পূজার প্রাঙ্গণ অথবা বন্ধনীযুক্ত এলাকায় অশৌচ বা জন্মমৃত্যু নিষিদ্ধ।

বাঙালীরা যেমন উপজাতিদের উৎসবে যোগ দেয়, উপজাতিরাও তেমনি বাঙালীদের উৎসবে মেতে ওঠে। উপজাতিদের ঘরে ঘরে দেখা যায় বাঙালীর পূজাপার্বণ। এই ভাবেই ত্রিপুরায় মিলিত-সংস্কৃতির ধারা বয়ে চলেছে।

ত্রিপুরার উৎসবের বৈশিষ্ট্য

মিলনই উৎসবের প্রাণ। বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠায় এইসব উৎসবের বিশেষ ভূমিকা আছে। এইসব উৎসবই ত্রিপুরার জনজীবনে দীপ্তি ও শান্তি বয়ে আনতে সহায়ক হবে।

উপসংহার

জ্যামের জটে আটকে পড়ার অভিজ্ঞতা

[ভূমিকা—গন্তব্য—জ্যামের শুরু—জ্যামের আবর্তে—বাসের ভেতরে—যাত্রীদের নানা মন্তব্য—বাইরের দৃশ্য—নিজস্ব অনুভূতি—উপসংহার।]

ভূমিকা

কল্লোলিনী কোলকাতার নানা বিশেষণ। কে যেন বলেছিল, জ্যাম-জমাট কোলকাতা। এই বিশেষণটি অনুপ্রাসে, শব্দের ঝঙ্কারে চমৎকার। জ্যাম-জমাট কোলকাতার বিচিত্র মূর্তিটি সেদিন যেমন ভাবে প্রত্যক্ষ করলাম তেমনটি এর আগে কোনোদিন করি নি। বাসটা যখন জ্যামের জটে আটকে পড়ল তখন নতুন করে বোঝা গেল, কোলকাতা কোলকাতাতেই আছে। এই আমার কোলকাতা—তুমি আমার পরিচিতা।

গন্তব্য

বালিগঞ্জ বাস স্টপ থেকে দশ নম্বর বাসে চেপেছি। যাব হাওড়া। দোতলা-বাসের একতলায় জানালার ধারেই সীট পাওয়া গেল। মনে হল, বাতায়নবর্তী হয়ে কোলকাতার বিচিত্র রূপ দেখতে দেখতে বেশ আরামেই যাওয়া যাবে। বাস গন্তব্যের দিকে ছুটে চলল। সি-আই-টি রোড পেরোবার আগেই বাস প্রায় মুড়ি-ঠাসা। তবে রাস্তায় তেমন বাধা নেই। বাস সহজে এগিয়ে চলেছে।

জ্যামের শুরু

কলেজ স্ট্রীটের পর থেকেই বাসের গতি মন্থর হতে শুরু করল। ঠেলা, রিক্সা, সাইকেল থেকে শুরু করে সব রকমের যানবাহনের শত ধারা। তার ওপর কাজের শেষে ঘরে ফেরা মানুষের বন্যা, হকারের ভিড়। জন-অরণ্য। হোঁচট খেতে খেতে বাস গড়াচ্ছে। এলো চিত্তরঞ্জন অ্যাভন্যু-এর মোড়। ট্রাফিক পুলিশের হস্ত সঞ্চালনে আমাদের বাসটা আট্‌কে পড়ল। চিৎপুরের দিকে চোখ পড়তেই চক্ষুস্থির। গাড়িতে গাড়িতে ছয়লাপ। যতদূর চোখ পড়ে ট্রাফিকের জট। নিরেট, নিশ্ছিদ্র।

জ্যামের আবর্তে

কোনোরকমে চিৎপুরের মোড় পার হয়ে বাসটা একেবারে বন্দী হয়ে গেল। যাকে বলে ন যযৌ ন তস্থৌ। ট্রামগুলো রেলগাড়ির মতো সোজা এগিয়ে গিয়ে কোথায় যে মিশেছে, কে জানে। বালিগঞ্জ থেকে বাসটা ছেড়েছিল তিনটে কুড়িতে। এখন বিকেল পাঁচটা বাজতে দশ। মনে হচ্ছে তিন দিন তিন রাত হল বাসে চেপেছি। আমাদের বাসের পেছনে কত গাড়ি যে দাঁড়িয়ে তার হিসেব নেই। হাজার, লক্ষ না, অগুন্তি। মনে হচ্ছে, কোলকাতা শহরের যত গাড়ি সব হামা টেনে টেনে এখানে এসে পঙ্গু হয়ে পড়েছে। এখন ক্রেনে করে এদের টেনে তুলে অন্যত্র নিয়ে যেতে হবে।

আমরা গুটিকয়েক ভাগ্যবান্ প্রাণী বসে আছি। কিন্তু দাঁড়িয়ে আছে বেশিরভাগ লোক। আষাঢ় মাস। কিন্তু বর্ষা এখনও তাঁবু ফেলে নি। ভ্যাপ্‌সা গরম। দর দর ধারায় সবাই ঘামছে। আদ্দির পাঞ্জাবি গায়ে ন্যাতা হয়ে সেঁটে আছে। এর মধ্যে কারো হাতে ব্যাগ, থলি, পুটুলি—আরো কত কি। সাবধানী মানুষ হঠাৎ বৃষ্টির আশঙ্কায় ছাতা হাতে। ছাতার খোঁচায়, পায়ের চাপে, দেহের ভারে প্রাণান্ত। অনেকে

হ্যাণ্ডেল ধরার সুযোগটুকুও পায় নি। ভিড়ের চাপে সেঁটে আছে ঘর্মাক্ত শরীর। আমার পাশের ভদ্রলোক এই অবস্থাতেও একটা বই খুলে পড়বার চেষ্টা করেছেন। হঠাৎ দেখি বইয়ের পাতায় টস্ টস্ করে জলের ফোঁটা পড়ছে। ভাবলাম হয়তো খুব দুঃখের কোনো জায়গায় এসে পড়েছেন ভদ্রলোক, তাই চোখের জল সামলাতে পারেন নি। কিন্তু দু'চার সেকেণ্ডের মধ্যে আমায় ভুল ভাঙল। জলের ফোঁটা ভদ্রলোকের চোখের নয়, নাকের ডগায় দাঁড়ানো আর এক স্থূলকায় ভদ্রলোকের কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ছে বইয়ের পাতায়। এই দোতলা বাসটার জানালাগুলো খুবই ছোট ছোট। এই বাসগুলো নাকি বোম্বের তৈরি। বাইরের হাওয়া ঢোকবার পথ চমৎকার এক পরিকল্পনার মাধ্যমে বন্ধ করা হয়েছে। এমন সময় হঠাৎ বাসটা নড়ে উঠল।

বাসের ভেতরে

বাসটা নড়তেই কে একজন চিৎকার করে উঠল, নড়েছে, নড়েছে—বাস নড়েছে। তার পর সুর করে গেয়ে উঠল, সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি, চলো ত দেখি। কিন্তু লাইনটা শেষ হবার আগেই বাস আবার ডেড স্টপ। বাসের চাকা এক পাকও পুরো ঘুরল কিনা সন্দেহ। ড্রাইভারের পিঠে ঝুঁকে পড়ে এক ভদ্রলোক বল্লেন—পাইলট দাদা, একটু বাঁ দিকে চেপে দেখুন দিকি, বেরুতে পারেন কিনা। ড্রাইভার নিথর, নিঃস্পন্দ। আর একজন অন্য জনকে বলল, চল্ নেমে যাই। এর চেয়ে হেঁটে যাওয়া অনেক ভালো। জনৈক রসিক ব্যক্তি বলে উঠলেন, দাদারা, পকেট সাবধান, ফুটো হয়ে না যায়।

যাত্রীদের নানা মন্তব্য

সত্যি অনেকে হেঁটে চলেছে। স্রোতের মতো। ভাবছি, আমিও নেমে যাব। কিন্তু নামাটা বেশ কঠিন। গেট জ্যাম; বাসের ভেতরে নড়াচড়া অসম্ভব। পুলিশ, হোমগার্ড হিমসিম খাচ্ছে। গাড়ির ফাঁকে ফাঁকে মানুষগুলো কিল্‌বিল্ করছে। একটা রিক্সাওয়ালাকে পুলিশ রুলের গুতো মারল। রিক্সাওয়ালা রাস্তার ঠিক মাঝখানে কী করে যে এসে পড়েছে কে জানে। মানুষের কলরব, গাড়ির হর্নের আওয়াজ—সব মিলে দারুণ হট্টগোল। হঠাৎ দেখি, একটা ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে বর বসে আছে জানালার ধারে। বরও জ্যামের জটে অবরুদ্ধ। বরের মুখে বিরক্তি। ঘামে মালা-চন্দনের বেশির ভাগটা গলে গেছে। বরযাত্রীদের দু'-একজন অকারণে ব্যস্ততা দেখাচ্ছে গাড়িটার পাশে দাঁড়িয়ে। এরা হয়তো হাওড়া স্টেশনে কোনো গাড়ি ধরবে। সময় দ্রুত বয়ে যাচ্ছে। গাড়ি ক'টায় কে জানে। তবে সময় যে হাতে বেশি নেই তা ওদের চঞ্চলতা দেখেই বোঝা যাচ্ছে। কিছুক্ষণ পর দেখি বর গাড়ি থেকে নেমে পড়েছে। ঘামে ভেজা সিল্কের পাঞ্জাবী। কুলির মাথায় সুটকেশ-বেডিং উঠল। বর আর তার সহযাত্রীরা ভিড় ঠেলে ঠেলে হাঁটতে শুরু করল। আমাদের বাস থেকে আবার সরস মন্তব্য ছিটকে গেল ওদিকে।

বাইরের দৃশ্য

আমার কষ্ট হলেও এক ধরনের মজাও উপভোগ করছি এই জ্যামে আটকে-পড়া অবস্থায়। পরীক্ষার পর সালকিয়াতে পিসির বাড়ি যাচ্ছি ছুটির কয়েকটা দিন কাটাতে। তাই আমার তেমন তাড়া নেই। অনেকে নেমে হাঁটতে শুরু করলেও আমি আমার

সীটে বসে নানা দৃশ্য দেখছি আর কত কথা ভাবছি। কোলকাতার সব যন্ত্রণারই নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও চেহারা আছে। এগুলো নিরপেক্ষভাবে দেখতে পারলে এক ধরনের অভিজ্ঞতার স্বাদ পাওয়া যায়। জ্যামে আবদ্ধ মানুষের কথাবার্তার মধ্যে দিয়ে বিধ্বস্ত মধ্যবিত্ত জীবনের কত দিকই না অনাবৃত হয়।

নিজস্ব অনুভূতি

শেষ পর্যন্ত আমি ধৈর্যের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। অবশ্য আমার মতো আরো অনেকেই। আমরা বীরের মতো বসেই আছি, নামি নি। বাস এবার জট ছাড়িয়ে চলতে আরম্ভ করেছে। দেখি সেই চাঁদবদনী রসিক দাদাও নামেন নি। এবার গাইলেন, সোহাগ চাঁদ বদনী ধনি, থামো তো দেখি।

উপসংহার

কলকাতার যানবাহন সমস্যা ও পাতাল রেল

[ভূমিকা—পুরনো দিনের কথা—সমস্যা—পাতাল রেল প্রকল্প—বিপক্ষে কথা—সুদিনের আশা—উপসংহার।]

'কলিকাতা চলিয়াছে নড়িতে নড়িতে'। সত্যি এই স্পন্দনময় কলকাতার অনেকখানিই হল যানবাহন—যা জীবনে জীবন যোগ করে চলেছে।

ভূমিকা

'ছেলেবেলা'য় রবীন্দ্রনাথ শুরুতেই বলেছেন, আমি জন্ম নিয়েছিলুম সেকেলে কলকাতায়। শহরে শ্যাকরা গাড়ি ছুটছে তখন ছড়্‌ছড়্‌ করে ধুলো উড়িয়ে, দড়ির চাবুক পড়ছে হাড়-বের-করা ঘোড়ার পিঠে। না ছিল ট্রাম, না ছিল বাস, না ছিল মোটরগাড়ি। সে যুগকে আমরা ঘোড়ার গাড়ির যুগ বলতে পারি। হুতোমী ভাষায় বলা যায়, 'ছক্কোড় যুগ।' কত সব নাম—ল্যাণ্ডো, ফিটন, বগি, আরও কত কী। সেই সঙ্গে অবশ্য পালকিও ছিল। সেযুগে অবশ্য ওতেই চলত। ঐ ছ্যাকরা আর পালকীতে করেই চলাফেরা করেছেন রামমোহন, দ্বারকানাথ, বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র, বিবেকানন্দ।

পুরনো দিনের কথা

প্রথম গণ-যান হল ঘোড়ায় টানা ট্রাম। তার অনেক পরে ১৯০২ খ্রীস্টাব্দে এল ইলেকট্রিক ট্রাম। কলকাতায় প্রথম মোটরগাড়ি এসেছিল ১৮৮১ খ্রীস্টাব্দে। প্রাইভেট বাস চলা শুরু হয়েছিল ১৯২২ খ্রীস্টাব্দে। ধীরে ধীরে কলকাতা হয়ে উঠল যানবাহনের নগরী।

কিন্তু জব চার্ণকের মধ্যদিনের স্বপ্ন থেকে গড়ে ওঠা কলকাতা তো আর সেই কলকাতা নেই। কলকাতায় জনসমুদ্র এখন কল্লোলিত। ব্যস্ততার শহর কলকাতা। পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বড়ো রেল স্টেশন শিয়ালদা। এখন শহরতলীর সঙ্গে যোগাযোগ

রক্ষা করে চলেছে ইলেকট্রিক ট্রেন, আছে সরকারী-বেসরকারী বাস, চালু হয়েছে মিনি বাস। ট্রাম তো আছেই। তবু যানবাহনে ন স্থানং তিলধারণম্। তাছাড়া যখন যান জটে আটকা পড়ে কলকাতা, তখন মনে হয় দেশের ভাগ্যই যেন স্তব্ধ হয়ে আছে। রাস্তা চওড়া করতে এগিয়ে এসেছে সি. এম. ডি. এ.। গড়ে উঠেছে উড়াল পুল। কিন্তু তবু সমস্যার যেন সমাধান নেই। বৃষ্টি হলেই চারিদিকে জল থৈ থৈ, ট্রাম-বাস বন্ধ।

সমস্যা

কলকাতাকে নিদারুণ এই দুর্গতির হাত থেকে রক্ষা করতে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ কলকাতায় পাতাল রেল নির্মাণের একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে ২৯-এ ডিসেম্বর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেন। এই প্রকল্পের কাজে ব্যয় হবে ২৫০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পে উপকৃত হবেন কলকাতা ও শহরতলীর ৯০ লক্ষ নাগরিক। দমদম থেকে টালিগঞ্জ পর্যন্ত ১৭ কিলোমিটার দীর্ঘ রেলপথে থাকবে সতেরোটি স্টেশন—দমদম, বেলগাছিয়া, শ্যামবাজার, শোভাবাজার, গিরিশ পার্ক, মহাত্মা গান্ধী রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিন্যু, চাঁদনী চক, এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রীট, ময়দান, রবীন্দ্র সদন, ভবানীপুর, যতীনদাস পার্ক, কালীঘাট, রবীন্দ্র সরোবর ও টালিগঞ্জ। ভোর পাঁচটা থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ট্রেন চলবে, গতিবেগ হবে ঘণ্টায় সর্বাধিক ৮০ কিলোমিটার, স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে এর গতিবেগ নিয়ন্ত্রিত হবে। এক-একটি ট্রেনে থাকবে ৮টি কোচ। শীতল বায়ু চলাচলের ব্যবস্থা থাকবে। আশা করা গিয়েছিল ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে প্রথম পর্যায় দমদম-শ্যামবাজার এবং এস্প্ল্যানেড-টালিগঞ্জ শাখা চালু হবে। তা অবশ্য সম্ভব হয় নি। তবে ১৯৮৪ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বরে এসপ্ল্যানেড থেকে ভবানীপুর পর্যন্ত পাতাল রেল চালু হয়েছে। টালিগঞ্জ পর্যন্ত সম্প্রসারণের কাজ এবং বেলগাছিয়া-দমদম লাইনের কাজ চলছে। আশা করা যায় ১৯৮৬-র মধ্যে প্রস্তাবিত সমস্তটা পথেই পাতাল রেল চলবে।

পাতাল রেল প্রকল্প

অনেকের মতে কলকাতার মতো এত জরাজীর্ণ শহরের পক্ষে পাতাল রেল অভি-শাপ। এবং ভবিষ্যৎ সম্পর্কেও অনেক আশঙ্কিত। এঁদের মতে কলকাতার দেহ এভাবে ক্ষতবিক্ষত করার অর্থ—কলকাতার আয়ু ক্ষয় করা। কলকাতার বুকে পাতাল রেলের প্রস্তুতিপর্বে যে-খোঁড়াখুড়ির দক্ষযজ্ঞ চলছে তা কলকাতার মানুষকে নিশ্চিত বিপর্যয়ের দিকেই ঠেলে দেবে। অনেকে পাতাল-রেলে আশঙ্কিত বা কল্পিত দুর্ঘটনার কথা ভেবেও নিরাশামলিন। এঁরা বলেন, মাটির ওপরেই কর্তৃপক্ষ রেল ঠিকমতো চালাতে পারছেন না। দিনে দিনে দুর্ঘটনার সংখ্যা বাড়ছে। তাই মাটির তলার রেলে দুর্ঘটনা-যে আরো বাড়তে পারে তাতে সন্দেহ নেই। এসপ্ল্যানেড-ভবানীপুর শাখায় ট্রেন চলাচল শুরু হবার পর অবশ্য এসব আতঙ্ক অনেকটা কমেছে।

বিপক্ষে কথা

এই প্রকল্প চালু করতে, টানেল খোঁড়ার ফলে নগরজীবনে অবশ্যই নানা সমস্যা দেখা দিয়েছে। কোথাও যানবাহনের প্রচলিত পথ পরিবর্তিত করতে হয়েছে, কোথাও

সাময়িকভাবে জলের পাইপ বন্ধ করতে হয়েছে, কোথাও বা বাড়ি ছেড়ে দিতে হয়েছে। আবার টানেলের কাছাকাছি বাড়িতে দেখা দিচ্ছে ফাটল, কোথাও টানেলে ধস নেমে কর্মীরা বিপন্ন হচ্ছেন। খানাখন্দের সৃষ্টি হওয়ায় পদযাত্রীদেরও অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু সুদিনের আশায় সকলেই সাময়িকভাবে এসব অসুবিধা সহ্য করেছেন। বলা বাহুল্য নাগরিকদের সহযোগিতা ছাড়া এত বড়ো প্রকল্প চালু করা সম্ভব হত না।

সুদিনের আশা

যোগাযোগই আধুনিক সভ্যতার প্রাণ। পাতাল রেল প্রকল্প এদিক থেকে নগর-জীবনের একটি আশীর্বাদ হয়েই দেখা দেবে। ভারতের পরিবহণ-ব্যবস্থায় এক নতুন অধ্যায় সংযোজিত হবে এই প্রকল্পে। ক্রমবর্ধমান জনতার দিকে চেয়ে পাতাল রেলের সঙ্গে চক্ররেলের কাজ ত্বরান্বিত হওয়ায় জনসাধারণের মধ্যে উদ্দীপনা দেখা দিয়েছে। হুগলী সেতুর কাজও এরই সঙ্গে চলেছে। একটা বৃহৎ গঠনমূলক ও কল্যাণপ্রসূ কর্মের সূচনায় যে-অসুবিধা ও ক্ষয়ক্ষতি দেখা দিচ্ছে তা আমাদের উদার চিত্তে মেনে নিতে হবে। বৃহৎ স্বার্থে আমাদের ক্ষুদ্র স্বার্থের মাপটিকেও অবশ্যই ছোটো করে নিতে হবে।

উপসংহার

কল্লোলিনী কলকাতার বুকের ওপরে জনস্রোত আর তার বুকের নিচে পাতাল রেল প্রায় নিঃশব্দে লক্ষ মানুষের বোঝা বয়ে নিয়ে চলেছে কলকাতার বাতাসকে দূষিত না করে, শব্দের কলুষ না ছড়িয়ে। সত্যি, ভাবতেও অবাক লাগে।

বন্যাবিধ্বস্ত ত্রিপুরার মানুষের দুর্গতি ও তার স্থায়ী প্রতিকারের উপায়

[ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৮৪]

[ভূমিকা—বন্যার রৌদ্রী মূর্তি—বন্যার ধ্বংসকারী প্রভাব—ত্রিপুরায় বন্যার ভয়াবহ ক্ষয়-ক্ষতি ও মানুষের সীমাহীন দুর্গতি—ত্রাণকার্য—ত্রিপুরায় বন্যার ভয়াবহতার কারণ—স্থায়ী প্রতিকারের পথ—বন্যানিয়ন্ত্রণে বৈজ্ঞানিক কৌশল—উপসংহার।]

মনিমালায় ঘেরা ছোট্ট পাহাড়ী দেশ ত্রিপুরা। প্রকৃতির অদ্ভুত খেয়ালিপনায় এখানে অতিবৃষ্টি আর অনাবৃষ্টিতে বার বার দুর্যোগ নেমে আসে অজান্তে। প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বিশেষ বন্যা কখনো অত্যধিক মাত্রায় বর্ষণে অথবা নদীর উৎপত্তিস্থলে অতিবৃষ্টি কিংবা পর্বতমালায় আকস্মিক তুষারপাতের ফলে পৃথিবীর সব দেশেই সর্বকালে কম বেশি বন্যা হয়েছে এবং হচ্ছে। ত্রিপুরায়ও বন্যা হয়েছে অতীতে, বর্তমানেও। পাহাড়ী দেশ ত্রিপুরার বন্যার ভয়াবহতা সমগ্র ভারতবর্ষে করাল ছায়া ফেলেছে।

ভূমিকা

ত্রিপুরার বন্যার গতি-প্রকৃতিও একটু ভিন্ন ধরনের—ত্রিপুরার বিখ্যাত পাহাড়ী নদী-সমূহ—গোমতী, হাওড়া, লংগাই, জুরী, মনু, ধলাই, খোয়াই, মুহুরী, বিজয় প্রভৃতির

উৎসমূলে বারিপাতের ফলে জল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে রাজ্যে প্রলয়ঙ্করী বন্যার সৃষ্টি করে—তাছাড়া রাজধানীতে হাওড়া ও কাটাখাল অতিবর্ষণে জল আর বুকে ধরে রাখতে পারে না।—বৃষ্টিতে নিচুস্থান সহজেই জলমগ্ন হয়ে পড়ে—নেমে আসে মানুষের অশেষ দুর্গতি। এমনি করেই বিগত ১৯৮৩ সালের আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে এবং পরের বছর ১৯৮৪ সালের মে মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে অর্থাৎ মাত্র ন' মাসের ব্যবধানে ত্রিপুরা দ্বিতীয়বার ভয়াবহ বন্যার কবলে পড়ে—এখানেই শেষ নয়, তারপর মাত্র এক মাস পরেই অর্থাৎ ১৯৮৪-র জুনে ত্রিপুরা ফের বন্যায় আক্রান্ত হয় এবং বর্ষাকালে মানুষের দুর্গতি এক নজিরবিহীন ইতিহাস সৃষ্টি করে চলেছে আজো।

বন্যার রৌদ্রী মূর্তি

স্বল্প ব্যবধানে এবং প্রকৃতির অস্বাভাবিক হিংস্র আক্রমণে অনগ্রসর ত্রিপুরায় দু'দুটো প্রলয়ঙ্করী বন্যায় বহু জনপদ ভেসে গেছে, অসংখ্য শিবিরে দেড় থেকে দু' লক্ষাধিক নরনারী আশ্রয়প্রার্থী হয়েছে, হেলিকপ্টারে বিপন্ন মানুষের কাছে খাদ্য পাঠাতে হয়েছে। মাঠের ফসল বিনষ্ট করে, শত-সহস্র ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত করে, গ্রামের পর গ্রাম জলমগ্ন করে বিধ্বংসী বন্যার তাণ্ডবে ত্রিপুরার 'লাইফ-লাইন' আসাম আগরতলা সড়ক যোগাযোগ বিপর্যস্ত—বহির্ভারতের সঙ্গে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন করে সমগ্র ত্রিপুরা প্লাবিত—উত্তরে, দক্ষিণে, পশ্চিমে শুধু জল আর জল। কৃষকের ঘর থেকে চলে গেছে বহু গবাদি পশু, হারিয়ে গেছে বহু অমূল্য জীবন। আর বন্যাপ্লাবিত অঞ্চলের নিপীড়িত মানুষ যারা শেষ অব্দি বেঁচে রইল, অবশেষে তাদেরও খাদ্যাভাবে, অর্থাভাবে, রোগে-শোকে-দুর্ভিক্ষে জীবন সঁপে দিতে হয়।

বন্যার ধ্বংসকারী প্রভাব

তিরাশির বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল দক্ষিণ ত্রিপুরা। অর্থাৎ উদয়পুর, অমরপুর, বিলোনিয়া প্রভৃতি মহকুমা। বন্যায় পাঁচ লক্ষ মানুষ সরাসরি কমবেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, ধ্বংস হয়েছিল ত্রিশ হাজার ঘরবাড়ি। বহু পুল, রাস্তা ও সরকারী সম্পদ এবং বেশ কয়েক কোটি টাকার ফসল নষ্ট হয়েছিল, আর ত্রিশটি অমূল্য জীবন হারিয়ে গিয়েছিল। তিরাশির আগস্টের বিধ্বংসী বন্যায় ত্রিপুরার ক্ষতির পরিমাণ ছিল কুড়ি কোটি টাকা। পশ্চিম ও উত্তর জেলাতেও বন্যার প্রকোপে অসহায় মানবাত্মার দুর্গতি আকাশ বাতাস মুখরিত করেছিল।

ত্রিপুরায় বন্যার ভয়াবহ ক্ষয়-ক্ষতি ও মানুষের সীমাহীন দুর্গতি

আশ্চর্যের বিষয় ১৯৮৩ সালের আগস্টের পর ১৯৮৪ সালের মে মাসে মাত্র ন' মাসের ব্যবধানে আবার বন্যার করাল গ্রাসে বিপর্যস্ত ত্রিপুরা। প্রসঙ্গত আগের বছরের ভয়ঙ্কর বন্যার তুলনায় এবারের বন্যার গভীরতা আরো ব্যাপক। ১৪ মে থেকে সপ্তাহব্যাপী অবিশ্রান্ত বর্ষণে ত্রিপুরায় ভয়াবহ বন্যা নেমে আসে। প্রকৃতি তার হিংস্র থাবা এবার একটু ঘুরিয়ে নিয়েছে—এবার উত্তর জেলা অর্থাৎ কৈলাশহর, ধর্মনগর, কমলপুর মহকুমার অবস্থা ভয়াবহ রূপ ধারণ করল। ক্ষতির শীর্ষে কৈলাশহর বিভাগ। প্রায় ৭৫ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বন্যা দেখা দেয়। ১ লক্ষ ২৫ হাজার লোক বন্যাক্রান্ত হয়, ৪৭টি ত্রাণশিবিরে ৩৯ হাজার শরণার্থী আশ্রয় গ্রহণ করে। বন্যার তোড়ে ৪টি ছোটবড় ও ১১টি সাধারণ সেতু

ভেঙে গেছে, কৈলাশহরে এমন অবস্থা হয়েছিল যে আকাশ থেকে হেলিকপ্টারে খাদ্য ফেলার স্থানও মেলে নি। কমলপুরে ভয়াবহ বন্যার ফলে শহর থেকে ধলাই নদীর পূর্ব পাড়, চন্দননগর, হালাহালি, বড়লুথমা, পাঞ্চালী, কুচাইনালা, মেতির মিঞা প্রভৃতি গ্রাম বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ধলাই নদীর উপর ঝুলন্ত সেতু পুরো বিধ্বস্ত হয়। মহারাণী গ্রামের পূর্তদপ্তরের রাস্তাটি সম্পূর্ণ নদীগর্ভে চলে গেছে। দক্ষিণ জেলার উদয়পুরে কাকড়াবন, আমতলী, শিলঘাট, কুশামারা, মেলথেরটালা, খিলপাড়া, মহারাণী, শালগড়া, জামজুড়ি, ছাতারিয়া প্রভৃতি গ্রাম জলমগ্ন হয়। ১৬৫০টি পরিবার ত্রাণ শিবিরে আশ্রয় নেয়।

অমরপুরে ছনগাঙের জল বেড়ে কমলাই ও সোনাছড়া গ্রাম নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে—৪৬১টি পরিবার ত্রাণ শিবিরে গিয়েছেন। ধস চাপায় অম্পিনগরে আটজন প্রাণ হারিয়েছেন। ধসে আমবাসা—গণ্ডাছড়া রাস্তাটি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। বিলোনিয়া ও সাবরুমের বিভিন্ন অঞ্চল বন্যা প্লাবিত হয়েছে।

এক কথায় প্রলয়ঙ্করী বন্যায় রাজ্যের দশটি মহকুমাই দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ফলে রাজধানী সদরের সঙ্গে অন্যান্য বিভাগের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়—ত্রিপুরার একমাত্র যোগাযোগ রক্ষাকারী 'লাইফ-লাইন' আসাম আগরতলা সড়কটি বন্যায় ও ধসে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। ধর্মনগর থেকে আসামের করিমগঞ্জ পর্যন্ত একমাত্র রেলপথটিও বন্যায় ও ধসে বিচ্ছিন্ন হয়।

বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ—

কৃষিখাতে—২০ কোটি টাকার উপর,
মৎস্যবিভাগে—৩ কোটি,
সেচ—৫৬ লক্ষ ৮০ হাজার,
স্কুল এডুকেশন—৪৫ লক্ষ ২৫ হাজার,
সড়ক ও সেতু প্রাথমিক হিসাবে—৩ কোটি,
পূর্ত্ত দপ্তরে—৪ কোটি টাকা।

সরকারী হিসেবে বন্যায় ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ২৯ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা।

ত্রাণকার্য

ত্রিপুরার ভয়ঙ্কর বন্যায় মানুষের শোচনীয় অবস্থার সামাল দিতে 'ভারত সেবাশ্রম সংঘের' কৈলাশহরে ত্রাণকার্য পরিচালনা দেখে সবাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী ভারতবর্ষের বিভিন্নরাজ্যে বন্যার্তদের সাহায্যার্থে আহ্বান জানিয়েছেন—সাড়াও মিলেছে। তাছাড়া ত্রিপুরা সরকার যুদ্ধকালীন তৎপরতার সঙ্গে বন্যাবিধ্বস্ত রাজ্যবাসীর ত্রাণ ও পুনর্বাসনে ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন।

ত্রিপুরায় সারা বছর ২০০ সেন্টিমিটারের বেশি বৃষ্টিপাত হয়। নদীগুলো পাহাড়ী অঞ্চল থেকে সরাসরি বেরিয়ে আসায় প্রাথমিক স্তর অতিক্রম করে বিশেষ নাব্য হতে পারে নি এবং সব ঋতুতে জলও থাকে না—ফলে যোগাযোগ ও পরিবহন আশানুরূপ নয়।

দেবনির্ভর ত্রিপুরার গ্রামগুলো অনাবৃষ্টি কিংবা অতিবৃষ্টি অথবা সেচ ও জল নিষ্কাশনের অভাবে প্রতি বছরই দুর্গতির চরম শিখরে পৌঁছে। ত্রিপুরার রাজধানী শহর আগরতলা অপরিকল্পিতভাবে গড়ে ওঠার দুর্ভোগ এখন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে —তাছাড়া এমনিতেই মূল শহর এলাকা নিচু—এর প্রধান খালপথগুলো ক্রমশঃ সরু হয়ে পড়ছে, তদুপরি খালগুলোতে খুঁটি পুঁতে ঘর তোলা, বিভিন্ন এলাকায় বেআইনী দখলের ফলে খালগুলোর জলের প্রবাহ বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

ত্রিপুরায় বন্যার ভয়াবহতার কারণ

আগরতলা নগরীর বৃষ্টির জল নিষ্কাশনী নালা দিয়ে পার্শ্ববর্তী রাজ্য বাংলাদেশে প্রবেশ করে—এই বর্ধিষ্ণু নগরীকে হাওড়া ও কাটাখালের বন্যা থেকে রক্ষা করার পদক্ষেপ হিসাবে পঞ্চাশ দশকে ১৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বাঁধ নির্মিত হয়েছিল। বর্তমানে খালগুলোর মূলপথে বাংলাদেশ সরকার পরপর অনেকগুলো বাঁধ নির্মাণ করায় জল আটকে যায়। অবশ্য এ নিয়ে আগরতলা পুরসভার চেয়ারম্যান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাছাড়া, স্বাধীনোত্তর ত্রিপুরায় পাহাড়াঞ্চলের বনভূমি নির্বিচারে ধ্বংসের ফলে পাহাড়ের বৃষ্টির জলধারা সরাসরি সমতলে নেমে আসায় নদীগর্ভ ক্রমশ ভরাট হয়ে যাচ্ছে—ফলে নদীগুলোর বুকে জল ধারণের ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে, কোথাও কোথাও জলের তীব্র আঘাতে বাঁধ ভেঙে ধ্বংস কার্যে সহায়তা করছে। কাজেই বর্ষাকালে কিংবা আকস্মিকভাবে কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টিপাতের ফলেই ত্রিপুরা বন্যার কবলে পড়ে এবং সর্বত্র ত্রাহি ত্রাহি রব শুরু হয়ে যায়।

সুতরাং বন্যার স্থায়ী প্রতিকারের জন্য চাই সর্বাগ্রে সুষ্ঠু জল নিষ্কাশনী ব্যবস্থা, যা ত্রিপুরার বন্যা নিরোধের একমাত্র উপায় বলা চলে। সুতরাং আগরতলা ও বিভিন্ন মহকুমার বর্ষা বিপর্যয়ের সঠিক চিত্র তুলে ধরতে হবে, খুঁজে বের করতে হবে সঠিক তথ্য—জল জমার প্রকৃত কারণগুলো তুলে ধরে, দুঃসহ চিত্রও জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে। জলজমার কাহিনী আজকে নূতন নয়, বর্ষার শুরুতেই কিংবা দু-চার দিনের বৃষ্টিতেই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জলের নিচে চলে যায়। আগরতলার কোথাও জল নিকাশ প্রণালীগুলোর সঙ্গে খালের সুষ্ঠু যোগাযোগ নেই, খালগুলোর পরিপূর্ণ সংস্কার হয়নি বহু বছর ধরে। পরিকল্পনাহীন নগরায়ণ ও জলনিষ্কাশনের সমস্যা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে।

স্থায়ী প্রতিকারের পথ

প্রায় প্রতি বছরই ত্রিপুরা বন্যার সম্মুখীন হচ্ছে—এবং স্বাভাবিকভাবেই কেন্দ্রীয় অর্থ সাহায্যের উপর নির্ভর করতে হচ্ছে, অথচ সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন নতুন বৈজ্ঞানিক প্রকল্প হাতে নিতে পারেন নি।

অবিলম্বে যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থার গুরুত্ব দিয়ে ত্রিপুরা রাজ্যে বিজ্ঞানসম্মত শক্তিশালী বাঁধ নির্মাণ ব্যতীত বন্যা নিয়ন্ত্রণ অসম্ভব ব্যাপার। অসংখ্য নদীর দেশ ত্রিপুরা—খরস্রোতা নদীগুলোর জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত করে বন্যার বিশাল জলরাশিকে জলাধারে আটকে রেখে বন্যা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব, পক্ষান্তরে জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রচুর সম্ভাবনা সৃষ্টি করা যায়।

চীনের হোয়াংহো নদীকে একদা 'চীনের দুঃখ' বলা হত—আর আজ নদীর দু'পাশে ঘন সবুজ বনানী, জলসেচের জন্য শত শত বাঁধ এবং প্রজেক্ট গড়ে উঠেছে—এখন খাস উপত্যকা থেকে অন্যূন ১২ কোটি একর জমির চাষের উপযুক্ত জল সরবরাহ করা হচ্ছে। ভারতবর্ষে খরা এবং বন্যা জয় করবার জন্য বহুমুখী নদী প্রকল্পগুলোর যাত্রা শুরু হয়েছে—বর্তমানে ত্রিপুরাতেও নূতন প্রয়াস সূচিত হচ্ছে ফসলের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল করে তোলার জন্য। ত্রিপুরায় সরকারী মতে ১৯৭৮ সালের পূর্বে বন্যা নিয়ন্ত্রনের জন্য বাঁধ নির্মিত হয়েছিল মাত্র ২২ কি. মি., এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৯২ কি.মি.। বন্যা নিয়ন্ত্রণে নির্মিত বাঁধের মাধ্যমে সম্ভাব্য প্রতিরোধের এলাকায় এসেছে প্রায় ১৬,০০০ হেক্টর জমি। খরচ হয়েছে ৫০৫ লক্ষ টাকা। তাছাড়া নতুনভাবে নর্দমা খনন করা হয়েছে ৪৬,৪০৫ কি. মি.। রাজধানী আগরতলা নগরীর জল নিষ্কাশন সুব্যবস্থা প্রতিবেশী বাংলাদেশের সহযোগিতায় করা যেতে পারে।

বন্যা নিয়ন্ত্রণে বৈজ্ঞানিক কৌশল

সকলের সম্মিলিত আরব্ধ চেষ্টায় প্রয়াসকে আরও ব্যাপক করে তুলতে হবে। প্রকৃতির লীলাভূমি পর্বতময় ত্রিপুরা তার পুণ্য জলধারা অজস্র মানুষের কল্যাণ বয়ে আনুক এ তো আমাদের সকলেরই কামনা।

উপসংহার

এই প্রবন্ধ অবলম্বনে লেখা যায়—

১. ত্রিপুরার বন্যা। ২. বন্যায় ত্রিপুরার ক্ষয় ক্ষতি। ৩. ত্রিপুরায় বন্যার ধ্বংসলীলা।
৪. ত্রিপুরায় সাম্প্রতিক বন্যা। ৫. একটি স্মরনীয় বন্যার বর্ণনা।

তোমার প্রিয় শখ

[উ. মা. ১৯৮৪]

[ভূমিকা—কী করে এ শখ হল—অনুশীলন—প্রস্তুতি—উপসংহার।]

শখ নেই এমন কি কেউ আছে? বোধ হয় নেই। শখ না থাকলে জীবনটাই কেমন ফিকে হয়ে যায়। আমার নিজের কথা বলতে গেলে আমি তো শখ নিয়েই আছি, হরেক রকক শখ, ছবি আঁকা, বাগান করা, পাখি পোষা—কোন্‌টা নেই। তবে বিশেষ করে যদি কোনো শখের কথা বলতে হয় তাহলে তা 'ফটোগ্রাফি'। অর্থাৎ আলো দিয়ে লেখা। দেখলাম কিছু ভালো লাগল—ক্লিক্ করে একটু আওয়াজ। ব্যস! চিরদিনের জন্যে অক্ষয় হয়ে রইল দৃশ্যটি।

ভূমিকা

এই শব্দটাই কী করে আমাকে পেয়ে বসল ভাবতে গেলে আমার বড়োমামার কথাই আমাকে বলতে হবে। হঠাৎ একদিন বড়োমামা একটা ফোটো দেখিয়ে আমাকে বললেন—চিনতে পারিস? সেই একদিনের ছোট্টো আমি-টিকে সেজোমামার কোলে দেখে আমার যে কী আনন্দ হল ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। ছবিটি আমার প্রথম অন্ন মুখে তুলে দেবার পুণ্য মুহূর্তটিকে ধরে রেখেছে। শুধু তাই নয়। আমার ছোটোবেলার অনেক ছবি, সেই সঙ্গে আমাদের

কী করে এ শখ হল

পরিবারের অনেকের ছবি তুলেছিলেন বড়োমামা। তাঁর অ্যাল্‌বামটা দেখবার মতো। কী আশ্চর্য সব জীবন্ত ফোটোগ্রাফ। এই বড়োমামাকেই জিজ্ঞেস করেছিলাম, ছবি তোলা কি খুব শক্ত? বড়োমামা হেসে বলেছিলেন—সব কাজই অভ্যাসে সহজ। শিখবি নাকি ছবি তোলা? এই প্রশ্নে আমার সমস্ত সত্তায় একটা আনন্দের ঢেউ খেলে গেল। নম্র কণ্ঠে বললাম, 'তুমি যদি শেখাও—'।

হ্যাঁ, বড়োমামার কাছেই আমার ছবি তোলার হাতেখড়ি। বড়োমামার স্নেহ একদিন ভালো একটি ক্যামেরা-রূপে এলো আমার অপটু হাতে। দামী ক্যামেরা, নিয়ম-কানুনও কিছু জানি না। বড়োমামা শুধু একবার বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, বলেছিলেন নিজে থেকেই শিখবি ভুল করতে করতে। সত্যি ভুল করতে করতে শেখার যে কী আনন্দ তা মর্মে মর্মে বুঝতে পেরেছিলাম।

এখন আমি ছবি তুলি, ছবি তোলাই আমার শখ। তবে 'ছবি তুলি' বললে একটু ভুলই হবে। মনের মধ্যেই যতটা ছবি তুলি, ক্যামেরার ফিল্মে ততটা নয়। ফিল্মের যা দাম তাতে এ শখে সৌখীন হবার উপায় আমার নেই। তবু বাবা-মা, রাঙাকাকু, বড়োমামা, এঁদের স্নেহ নিঙরে যা-কিছু সংগ্রহ করি তা যায় ঐ ফিল্মেরই কল্যাণে।

অনুশীলন

এখন এক্সপেরিস্টোল ছবিই বেশি তুলি। সেদিন সকালের সূর্যোদয়কে সন্ধ্যার অস্তায়মান সূর্য করে তুলেছি। ক্লোজ-আপে একটি চোখে আশাতীত বিস্ময় ধরে দিতে পেরেছি। একটি সিলুয়েটে পেয়েছি একটি নারকেল গাছের আশ্চর্য জীবনব্যঞ্জনা।

একটা নতুন অভিজ্ঞতা হয়েছে। বড়োমামা টেলিভিশনে লিপিশিল্পের উপর একটা প্রোগ্রাম করেছিলেন। অনেক দুর্লভ বই থেকে সরাসরি ছবি নিতে হয়েছিল—সবই রঙিন। এই রঙিন ক্যামেরাটি আমার জন্মদিনে বাবা কিনে দিয়েছিলেন। বোঝা যাচ্ছে বাবা আমার এই শখের সমর্থক। সত্যি সখের কোনো সমঝদার বা সমর্থক ছাড়া অনেক শখই উবে যায় কর্পূরের মতো। আমার ভাগ্য ভালো যে আমি এ বিষয়ে অনেকের সাহায্যে পেয়েছি।

একদিক থেকে দেখতে গেলে এটা হচ্ছে ফোটোগ্রাফির যুগ। পুঁথিপত্রে, বিজ্ঞাপনে, বিজ্ঞানের নানা শাখায় ফোটোগ্রাফিরই রাজত্ব। এটি একাধারে কলা ও বিজ্ঞান। তাই আমার আজকের শখ যে একদিন বৃত্তি হয়ে উঠবে না কে বলতে পারে? তাই এই

প্রস্তুতি

বিশেষ কলাটায় নিজেকে দক্ষতর করে তুলতে আমি সর্বদা সচেষ্ট। সর্বদা ভালো ক্যামেরা হাতে থাকলেই ভালো ছবি তোলা হয় না, চাই চোখ, আলোক-সম্পাত সম্বন্ধে নিখুঁত ধারণা, সবার উপরে একটা intution—যাকে বলা যায় ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়।

ঐ বিশেষ বোধটির কাছাকাছি যাতে যেতে পারি তার জন্যে ছবি তোলার চেয়ে ছবি দেখি বেশি। এবারে ইন্‌ফরমেশন সেন্টারে আয়োজিত আলোকচিত্র প্রদর্শনী দেখে আমি খুবই অনুপ্রাণিত হয়েছি। কয়েকটি চিত্র আমার কাছে বিস্ময়কর মনে হয়েছে। অমনি ছবি আমি কবে তুলতে পারব তাই ভাবি।

ছবির জগৎ এক আশ্চর্য জগৎ। এ জগৎ কিন্তু স্থির নয়। এর মধ্যে আছে গতির স্পন্দন। স্থির ছবি অনেক সময় চলচ্চিত্রকে পরাস্ত করে শিল্পগুণে। আমি ঐ ছবির জগতের একজন সামান্য অধিবাসী। ও জগতের আলো হাওয়া আমাকে সঞ্জীবিত করে।

উপসংহার

চিন্তাসহায়ক বাণী

A hobby a day keeps the doldrums away.

—P. McGinley.

মূল্যবোধ

[ভূমিকা—মূল্যবোধ কী—মূল্যবোধহীনতার ব্যাপকতা—কারণ বিশ্লেষণ—মূল্যবোধহীনতার পরিণাম—মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা—উপসংহার।]

বিংশ শতাব্দীর সিংহদ্বারে দাঁড়িয়ে বিবেকানন্দ বললেন, 'এ পৃথিবীতে এখন নতুন করে শিক্ষা শুরু করতে হবে,—কোথাও সভ্যতার শুরুই হয় নি।'

যখন বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদ্যার জয়ডঙ্কা বাজছে সেই সময় বিবেকানন্দ বললেন,— 'Education is yet to be'. এমন জোরালোভাবে আর কেউ আমাদের শিক্ষা-সভ্যতার অসারতাকে তুলে ধরেন নি।

ভূমিকা

শিক্ষা যদি মূল্যবোধই না দেয় তবে তা কিসের শিক্ষা, সভ্যতা যদি মূল্যবোধই না দেয়, তবে তা কিসের সভ্যতা?

'নিতি নব ছোরা গড়িয়া কসাই বলে জ্ঞান বিজ্ঞান, ভগবান!'

'মূল্যবোধ' বলতে কী বোঝায়? নানাভাবেই কথাটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। সহজ কথায়, যার যা কর্তব্য তাকে মূল্য দিতে হবে এই বোধই মূল্যবোধ। বিতর্ক উঠতেই পারে। কর্তব্য কী? কর্তব্যও তো আপেক্ষিক। ভাবের ঘরে চুরি করে লাভ নেই। আমরা জানি কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা শুভ, কোন্‌টা ধর্ম, কোন্‌টা কর্তব্য, কিন্তু সেদিকে তো প্রবৃত্ত হই না, আমরা জানি কোন্‌টা অশুভ, কোন্‌টা অধর্ম, কোন্‌টা অকর্তব্য, কিন্তু তার থেকে তো নিবৃত্ত হতে পারি না।

মূল্যবোধ কী?

জানামি ধর্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।

সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে মূল্যবোধের নিদারুণ অভাব। যে-কোনো দৈনিকপত্র হাতে নিলে দেখা যাবে সমস্ত সংবাদ যেন দর্পণের মতো আমাদের মূল্যবোধহীন সমাজের মুখটা তুলে ধরছে। পণপ্রথার বলি হচ্ছে বধূরা, কোনো ওষুধে ভেজালের শিকার হচ্ছে শিশু। বিদ্যালয়েই বিদ্যার লয়, খেলার মাঠেও খেলা উধাও!

মূল্যবোধহীনতার ব্যাপকতা

এর কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখব লোভের শিকড়। আমার যা প্রাপ্য নয়, তার প্রতিই আমার অন্যায় অধিকার-প্রতিষ্ঠার অদম্য ইচ্ছাই সমস্ত অনর্থের মূলে। আমি আমাকে বড়ো করে তুলতে চাই বলেই অন্যের মূল্য দিই না, কাউকে তুচ্ছ মনে করি, কাউকে অস্পৃশ্য মনে করি। পরমতে অসহিষ্ণুতার মূলেও আছে এই লোভ বা নিজেকে অন্যায়ভাবে বড়ো করার প্রবৃত্তি, আর এই প্রবৃত্তির পথে যে বাধা হয়ে দাঁড়াবে, ভাই হলেও সে আমার শত্রু। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্র থেকে গৃহাঙ্গন পর্যন্ত এই অধিকার-প্রতিষ্ঠার উদগ্র আন্দোলন।

কারণ বিশ্লেষণ

এই মূল্যবোধহীনতার ফলাফল বড়ো ভয়ঙ্কর। আজ আমরা সকলের সঙ্গে সকলে যুক্ত। বিজ্ঞানের আশীর্বাদে সমগ্র বিশ্ব আজ আমারই গৃহাঙ্গন। সকলের ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সহযোগিতার ভিত্তিতেই আমাদের অগ্রগতি, তার অভাবেই আমাদের চরম সর্বনাশ। ভেদবুদ্ধি যদি আমরা বর্জন করতে না পারি তাহলে :

মূল্যবোধহীনতার পরিণাম

মৃত্যু মাঝে হতে হবে চিতা ভস্মে সবার সমান।

আইনস্টাইন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা সভ্যতার এই সঙ্কট সম্বন্ধেই আমাদের হুঁশিয়ার করেছিলেন। এ সঙ্কট মূল্যবোধহীনতার সঙ্কট। আমাদের সমস্ত সমস্যা কিন্তু আমাদেরই সৃষ্টি, আমরা স্বখাত সলিলে ডুবে মরছি। মূল্যবোধকে বিসর্জন দেওয়া মানেই নিজেদের কবর নিজেরা খোঁড়া।

হৃত মূল্যবোধকে জাগানো অত্যন্ত দুরূহ। কিন্তু হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। সাপে কামড়েছে, অন্ততঃ তাগা তো বাঁধতেই হবে যাতে বিষ না ছড়ায় সর্বাঙ্গে। বাঁচার চেষ্টা তো করতে হবে। এবারে ভেবে দেখা যাক কীভাবে কতটুকু চেষ্টা আমরা করতে পারি।

গাছের মূলেই আমাদের জলসেচ করতে হবে, ওপর ওপর জল ঢেলে আমরা তার লাবণ্য ফেরাতে পারব না। যে-মূল্যবোধহীনতার মূল আমাদের অন্যায় লোভ, তাকে দমন করতে হবে। একথা অসম্ভব, এবং হাস্যকর শোনাতে পারে। কিন্তু সজ্ঞান ও সক্রিয় চেষ্টায় মানুষ কী না পারে? সমষ্টিগতভাবে চিন্তা না করে আমরা ব্যক্তিগত ভাবেও চিন্তা করতে পারি। অন্যে কী করেছে, কী ভাবছে তা না-হয় আমি না-ই দেখলাম, আমার নিজের কর্তব্যটুকু আমি যথাযথ করছি কিনা এ প্রশ্ন যদি নিজের কাছেই তুলে ধরি তাহলে হয় তো দেখব, কিছু ফাঁক বা ফাঁকি আছে আমার আচরণে। চেষ্টা করব তা কাটিয়ে উঠতে। মনে করা যাক, আমি কোনো অফিসে বিশেষ কাজের ভারপ্রাপ্ত কর্মী। আমি যদি আর একটু শ্রমশীল হই, মানে আয়েসের লোভটুকু (এখানেও কিন্তু 'লোভ') সংবরণ করতে পারি, তা হলে হয় তো ফাইলটা একটু তাড়াতাড়ি নড়ে, দুচারজন লোকের তাতে উপকার হয়। পেনালটি কিকে গোল দিয়ে সত্যিকারের স্কোরার যে তেমন আনন্দ পান না তার কারণ গোলটাকে তার যেন স্বোপার্জিত বলে মনে হয় না! এতে প্রমাণিত হয় আমাদের মধ্যে কোনো একটি সত্তা আমাদের যথার্থ শ্রমের ফল

মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা

অর্জন করতে বলে, আর ঠিক তেমনি আর একটি সত্তা আছে যা আমাদের অ-শ্রমে বা স্বল্পতম শ্রমে বড়ো ফলের ভোক্তা হতে বলে। আমাদের ঐ প্রথম সত্তাটিকেই জাগিয়ে রাখতে হবে। অবশ্য অ-শ্রম প্রশ্রয় পাবে না, ব্যবস্থাপনার মধ্যে তার আয়োজন চাই। অভ্যাস করতে করতে তা ক্রমে স্বভাবে পরিণত হবে। বামুন ঘরে যাবে কিন্তু চাষী লাঙল তুলে ধরবে না। অভাবে স্বভাব নষ্ট প্রবাদটাকে আমরা মিথ্যা প্রমাণিত করব। অভাব সত্ত্বেও আমরা কোনো কুকাজ করে সে অভাব মেটাবার চেষ্টা করব না। অবশ্য আশা করব, সমাজ আমাদের মূল্য দেবে, আমাদের অভাবের মধ্যে রাখবে না। পারস্পরিকতাই সমাজকল্যাণের মূল্য। সর্বস্তরের মানুষকে এই ভাবেই ভাবতে হবে, আমি সমাজের কাছ থেকে যেমন নেব, সমাজকেও তেমনি দেব, বরং বেশি দিয়ে সমাজকেই মানী করে যাব। আমার ওপর যদি ট্রেন-লাইন তত্ত্বাবধায়কের দায়িত্ব থাকে তা হলে এমন অসতর্ক আমি নিশ্চয়ই হব না যে ট্রেনের নির্দোষ ঘুমন্ত মানুষগুলো চিরঘুমে আচ্ছন্ন হয়।

এই মূল্যবোধ জাগানোর ব্যাপারে শিল্প-সাহিত্যে অগ্রণীদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিল্প-সাহিত্যের প্রভাব জনমনে খুবই বেশি। তাই রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্র ইত্যাদি গণমাধ্যমগুলোকে একাজে ব্রতী হতে হবে।

মধুমৎ পার্থিবং রজঃ।—মধুময় পৃথিবীর ধূলি। ক্রান্তদর্শী কবির এই বাণীকে আমরা সত্য করে তুলতে পারি আমাদের সৎচিন্তা ও সৎকর্মের মধ্য দিয়ে, যার ভিত্তি এই মূল্যবোধ।

উপসংহার

চিন্তাসহায়ক বাণী

শুধু মানুষ চাই, আর সব হইয়া যাইবে। —বিবেকানন্দ।

যাহা ঐক্যের আদর্শকে রক্ষা করে তাহাকেই বলি মঙ্গল। —রবীন্দ্রনাথ।

Morality is the basis of things and truth is the substance of all morality. —Mahatma Gandhi.

ভারতের প্রথম মহাকাশ যাত্রী

[মহাকাশ থেকে রাকেশ বলছি—এসেছে সে একদিন—মহাকাশ যাত্রা ও রুশ সহযোগিতা—এই যাত্রার উদ্দেশ্য—দুবছরের কাজ দুদিনে—অগ্নি পরীক্ষার চেয়ে কঠিনতর—বন্ধু তোমার জন্যে—যদি প্রশ্ন করো—গুপ্তধনের সন্ধানে—মহাকাশের শিক্ষা—চিরন্তন প্রেরণা।]

'সারে জঁহা সে আচ্ছা' মহাকবি ইকবালের এই অমরগীতি আমরা মর্ত্যের ভারতবাসী বহুবার শুনে অনুপ্রাণিত হয়েছি। কিন্তু ৩০০ কিলোমিটার দূর মহাকাশ থেকে ভারতের প্রথম মহাকাশ যাত্রী রাকেশ শর্মার কণ্ঠ থেকে এই বাণী যখন ভেসে উঠল টি. ভি.-র পর্দায়

তার ছবিসহ, তখন কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয় শিহরিত হল। এ এক আশ্চর্য অবিশ্বাস্য ও দুর্লভ অভিজ্ঞতা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দিল্লীর বিমান বাহিনীর দপ্তরের এক বিশেষ ধরনের স্টুডিও থেকে রাকেশ শর্মার সঙ্গে কথা বললেন। সাল্যুট ৭ থেকে সহাস্য রাকেশ উত্তর দিলেন। সাংবাদিকদেরও সব প্রশ্নের উত্তর দিলেন খোশ মেজাজে। মনে হল দূরদর্শনের স্টুডিওর মধ্যেই কথাবার্তা চলছে। রাকেশকে ঘিরে আছেন আরো পাঁচজন সোভিয়েত নভশ্চরী। মহাকাশে বসল যেন জমজমাট এক ঘরোয়া আড্ডা।

মহাকাশ থেকে রাকেশ বলছি

১৯৮৪ সালের ৩রা এপ্রিল ভারতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিন। সোভিয়েত ইউনিয়নের বাইকোনুর মহাকাশ বন্দর থেকে দু'জন রাশিয়ান মহাকাশযাত্রী ভারতের রাকেশ শর্মাকে নিয়ে সয়ুজ টি-১১ মহাকাশযানে চেপে পাড়ি দিলেন মহাকাশে। আট দিন সফল মহাকাশ পরিক্রমার পর নানা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা সেরে ওই তিন নভশ্চর আর এক মহাকাশযান সয়ুজ টি-১০ এ করে সোভিয়েতের কাজাগস্তান অঞ্চলে নির্বিঘ্নে নেমে এলেন। উৎক্ষেপণের চব্বিশ ঘণ্টা পরে ভারতের রাকেশ শর্মা এবং সোভিয়েতের য়ুরি মালিশেভ ও জোনাদি স্টেশলভ সাল্যুতের অন্য তিন সোভিয়েত নভশ্চর লিওনিদ কিজিম, ভ্লাদিমি সোলোতিয়ভ ও ওলেজ আতকভের সঙ্গে মিলিত হলেন। আট দিন ধরে চলল ছয় নভশ্চরের সম্মিলিত মহাকাশ সাধনা। এই সাধনায় একজন ভারতীয় নভশ্চরীর শুভ প্রয়াস মিলিত হল। প্রতিটি ভারতবাসীর কাছে এ পরম গৌরব।

এসেছে সে একদিন

১৯৭২ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় স্পেস কমিশন প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে ভারতের মহাকাশ গবেষণা এগিয়ে চলেছে। ভারতের প্রথম উৎক্ষিপ্ত কৃত্রিম উপগ্রহ 'আর্যভট্ট'। ১৯৭৫-এ ভারতীয় বিজ্ঞানী ও রুশ প্রযুক্তিবিদ্‌দের পারস্পরিক সহযোগিতায় এটি নির্মিত হয়। পরীক্ষা ও পরিকল্পনা একই সঙ্গে চালিয়ে ইনস্যাটের পর্যায়ক্রম উৎক্ষেপণ ও কার্যকারিতা সম্ভব হয়েছে।

মহাকাশ যাত্রা ও রুশ সহযোগিতা

ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বহুকাল ধরে চলমান মহাকাশ গবেষণার যৌথ প্রচেষ্টার ফল এই সাম্প্রতিক সাফল্য। পৃথিবীর প্রথম মহাকাশ অভিযাত্রী উরি গ্যাগারিন অনেকদিন আগেই বলেছিলেন যে, তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, মহাকাশগবেষণায় ভারত ও সোভিয়েত এই দুটি মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ দেশ পরস্পর সহযোগিতা করে চলবে। মহাকাশ গবেষণায় সোভিয়েত-ভারত সহযোগিতা গড়ে তোলার সক্রিয় সমর্থক ছিলেন যশস্বী ভারতীয় বৈজ্ঞানিক বিক্রম সারাভাই। তাই এ প্রসঙ্গে তিনিও স্মরণীয়।

এবারের এই যৌথ কর্মসূচীতে তিনটি প্রধান এলাকায় পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। এই তিনটি এলাকা হল—পৃথিবীর সম্পদ পর্যবেক্ষণ, প্রযুক্তিবিদ্যা ও ভেষজ বিদ্যা। পৃথিবীর সম্পদ পর্যবেক্ষণের ওপরে ভারত বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিল। আশা করা যায় সাল্যুত-৭ থেকে যে অনুসন্ধান-কার্য চালানো হয়েছে তাতে উপগ্রহের সাহায্যে পৃথিবীর সম্পদ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটবে।

এই যাত্রার উদ্দেশ্য

এবারের মহাকাশযাত্রায় ভারতের প্রায় সমগ্র অংশ এবং ভারত মহাসাগরের সন্নিহিত এলাকা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হয়েছে। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে দুর্গম এলাকা—হিমালয় পর্বতমালা ও থর মরুভূমির ওপরে। শক্তিশালী ক্যামেরার সাহায্যে ছবি তোলা হয়েছে। ভারতের কোন্ অঞ্চলে কী ধরনের সম্পদ পাওয়া যেতে পারে এসব ছবি থেকে তার আভাস অবশ্যই মিলতে পারে।

যে সব প্রযুক্তির পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে তার মধ্যে একটি হল ভারশূন্য অবস্থায় নানা সংকরধাতুর আচরণ পর্যবেক্ষণ। ভেষজবিদ্যাসংক্রান্ত পরীক্ষা করা হয়েছে ছ' রকমের—হৃৎপিণ্ড চলাচল, দৃষ্টিশক্তির ক্রিয়াকলাপ নির্ধারণ ইত্যাদি। মহাকাশে চলমান অবস্থায় রাকেশ শর্মা যোগ ব্যায়াম করেছেন। এরও বিশেষ উদ্দেশ্য আছে। মহাকাশে ভ্রমণজনিত পীড়া দূরীকরণের ক্ষেত্রে যোগব্যায়ামের কোনো ভূমিকা আছে কি না তা জানা যাবে। মোট কথা, এই যৌথ অভিযানের সাফল্য বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত। একজন রুশ বিজ্ঞানী বলেছেন, রাকেশদের তোলা চিত্র থেকে যে সব তথ্য পাওয়া যাবে, সাধারণ বীক্ষণের মাধ্যমে সে সব তথ্য পেতে আমাদের সময় লাগবে দু'বছরেরও বেশি। এর অর্থ এই মহাকাশ অভিযান আমাদের অন্ততঃ দু'বছর এগিয়ে দিল। আলাদাভাবে ভারত এই সফল অভিযান থেকে কতটা লাভবান হল তা বুঝতে হলে অবশ্য আমাদের আরো কিছু দিন ধৈর্য ধরতে হবে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে এগোতে হবে।

দু'বছরের কাজ দু'দিনে

মহাকাশে যাবার ছাড়পত্র পাওয়ার জন্যে স্কোয়াড্রন লীডার রাকেশ শর্মাকে অগ্নি পরীক্ষার চেয়েও কঠিনতর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। কয়েক বছর ধরে পর্যায়ক্রমে শিক্ষণ চলেছে। রাকেশ ও তার সহযোগী আর এক বীর যুবক রবীশ মালহোত্রা—দু'জনে নিরলস সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। ভাষাগত বাধা দূর করার জন্যে তাঁরা রুশ ভাষা শিখেছেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে। তারপর আহাররীতি থেকে শুরু করে প্রতিটি খুঁটিনাটি বিষয়ে এই দুই ভারতীয় যুবক অতন্দ্র সাধনা করে গেছেন। প্রতিদিন দীর্ঘ সময় ধরে নানা রকম ব্যায়াম করতে হয়েছে জিমন্যাসিয়ামে গিয়ে। ক্যাপসুলের মধ্যে যে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং নিতে হয়েছে তা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য। কিন্তু রাকেশ ও রবীশ সসম্মানে এই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মহাকাশযাত্রী হিসেবে নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণিত করেছেন। প্রধান প্রশিক্ষকের ভাষায়, "রাকেশ ও রবীশ যে ভাবে তৈরি হয়েছিলেন তা অভাবনীয়। আমাদের ট্রেনিং-এর প্রতিটি স্তর ওঁরা পাশ করেছেন। আমার বিশ্বাস ওঁরা মহাকাশেও সফল হবেন। এবং যেদিন তা হবে তা ব্যক্তিগতভাবে ওঁদের বা আমার নয়—ভারত যেমন মহাকাশ বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে পৌঁছবে, তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মৈত্রীবন্ধন নব পর্যায়ে উপনীত হবে।"

অগ্নি পরীক্ষার চেয়ে কঠিনতর

রাকেশ ও রবীশ দু'জনেই মহাকাশে যাবার উপযুক্ত বিবেচিত হয়েছিলেন। ট্রেনিং-এর সময় দু'জনেই সমান কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রাকেশই নির্বাচিত হলেন। রবীশ বন্ধু রাকেশের নির্বাচনকে হাসিমুখে মেনে নিলেন। বন্ধুর সৌভাগ্যে তিনি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করলেন।

বন্ধু, তোমার জন্যে

রাকেশের কৃতিত্বের পাশাপাশি রবীশের এই নিঃস্বার্থ সৌহার্দ্যের দৃষ্টান্তও অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

যদি প্রশ্ন করো

অনেকের মনে হয় তো প্রশ্ন বা সংশয় জাগবে। ভারতের মতো দরিদ্র দেশের পক্ষে এই মহাকাশ যাত্রা কি বিলাসিতা নয়? এর উত্তর আছে। দরিদ্র দেশের জন্যেই এমন একটা প্রয়াসের প্রয়োজন। কথাটা হয়তো পরিহাসের মতো শোনাবে, কিন্তু এ সত্য।

গুপ্তধনের সন্ধানে

ভারতের মাটিতে কোথায় তেল রয়েছে, গ্যাস রয়েছে বা অন্য কী খনিজ উপকরণ রয়েছে তা জানা যাবে রাকেশের গবেষণা থেকে। ৩২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের এই ভারতের বুকে কোথায় কোন্ রত্নভাণ্ডার আছে তা যদি সত্যই এত স্বল্প সময়ে জানা যায় তবে তো দরিদ্র ভারতের পক্ষে সেটা পরম সৌভাগ্যের ব্যাপার। আর এই গুপ্তধন যদি ভবিষ্যতে ভারতবাসীর কল্যাণে নিয়োজিত হয় তবে তো রাকেশের 'রাত্রির তপস্যা' সুদিনের সূচনাই করবে।

মহাকাশের শিক্ষা

রাকেশ মহাকাশ যানে উড়তে উড়তে আবেগজড়িত কণ্ঠে বলেছিলেন, দূর থেকে পৃথিবীটাকে সমতল দেখাচ্ছে। এই পৃথিবীতে যে কত সমস্যা, দুঃখ আছে এখন তা মনেই হচ্ছে না। রুশ-ভারত মৈত্রী নতুন দিগন্তের উন্মোচন করবে। মহাকাশসাধনা মানুষের চিন্তাধারাকেও উঁচুতে নিয়ে যাবে, মনের সংকীর্ণতা, ভেদবুদ্ধিকে দূর করে দেবে। মানুষের কল্যাণ তো বয়ে আনবেই।

চিরন্তন প্রেরণা

রাকেশ শর্মা ভারতের যুবকদের কাছে সাহস, শক্তি ও বীরত্বের প্রতীক। রাকেশ ভারতীয় যুবকদের মহৎ ও মানবিক কর্মযজ্ঞে উদ্বুদ্ধ করবেন। তাঁর সাধনা ও সাফল্য যুবমানসের কাছে প্রাণপ্রাচুর্যের ও কল্যাণকামী প্রয়াসের চিরন্তন প্রেরণা হয়ে থাকবে।

ত্রিপুরার যোগাযোগ-ব্যবস্থা

[ভূমিকা—প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের অবস্থা—পরবর্তী দ্বীপ-বন্দী ত্রিপুরা উন্নয়নের চাবিকাঠি—সর্বঋতু উপযোগী সড়ক, জাতীয় সড়ক—রেলপথ—বিমান যোগাযোগ—জলপথ—শিল্প—ক্ষুদ্র ও কুটীর, কৃষি, বনজ—যোগাযোগের প্রভাব—উপসংহার।]

ভূমিকা

প্রকৃতপক্ষে যোগাযোগ-ব্যবস্থাই একটা রাজ্য বা দেশকে উন্নত করে। মনুষ্যদেহের শিরা-উপশিরার মতো সড়কপথ দেশের বিভিন্ন অংশের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্করক্ষা করতে পারে। মহাভারতীয় যুগের পার্বত্য ত্রিপুরার স্থান ইতিহাসে থাকলেও অবশিষ্ট ভারতের বৃহত্তম জনগোষ্ঠীর কাছে তার পরিচিতি সংকীর্ণ। গিরিকন্দর অরণ্যবেষ্টিত, দিগন্ত বিলম্বিত মনোহর প্রান্তর, মেঘাবলী আশ্লিষ্ট সুউচ্চ

পর্বতশ্রেণীর শোভা কিংবা পাহাড়ী ঝোরা আর অগণিত খরস্রোতা চঞ্চলা নদীর আকর্ষণও উপেক্ষিত হয়েছে একমাত্র যোগাযোগ-ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্য।

কথিত আছে 'পথের পাঁচালী'র অমর কথাশিল্পী বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একদা রেলে চেপে আখাউড়া নেমেছিলেন। সেখান থেকে ঘোড়ায় টানা গাড়িতে ঐতিহাসিক ত্রিপুরার রাজধানী দেখে এসেছিলেন। এ কাহিনী এ শতাব্দীরই। দেশবিভাগের পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশের রেল-ব্যবস্থাই ছিল এই রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থার একমাত্র মাধ্যম। সে দেশের রেলে চেপে সহজেই যে-কোনো সীমান্ত শহরে চলে আসা যেত। ত্রিপুরা বলতে তখন সীমান্ত শহরকেই বোঝাত। আভ্যন্তরীণ যোগাযোগের জন্য অল্প-স্বল্প-কাঁচামাটির সড়কই যথেষ্ট।

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের অবস্থা

কালের হাওয়া পাল্টে গেল স্বাধীনতা আর দেশ বিভাগের সঙ্গে-সঙ্গেই। পূর্ব প্রান্তের আসাম-মিজোরামের সীমান্তভূমির অংশ বিশেষ বাদ দিলে কিঞ্চিৎ-অধিক দশ হাজার বর্গ কিলোমিটারের এই ক্ষুদ্র অরণ্য পর্বতসঙ্কুল ত্রিপুরা রাজ্যটি অধুনা বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমারেখা দ্বারা দ্বীপবদ্ধ হল। একদা ব্রিটিশ ভারতের করদ মিত্র রাজ্যটি সমগ্র দেশের সঙ্গে যুক্ত হয়েও কার্যত হয়ে পড়ল যোগাযোগ-বিচ্ছিন্ন। পার্শ্ববর্তী বিদেশী রাষ্ট্রের যোগাযোগ-ব্যবস্থা আজ আর কোনো উপকারেই আসছে না। উপরন্তু ওপার বাংলা থেকে অগণিত উদ্বাস্তু স্রোত অনাদিকালের শান্ত সমাহিত মৌন তাপসের তপোভঙ্গ করল। বিদেশী রাষ্ট্রের রাষ্ট্রবিপ্লবে ক্ষণে ক্ষণে বিব্রত হতে হল শরণার্থী আগমনের ভিড়ে। স্বভাবতই পর্বত-সমাকীর্ণ আরণ্যক ত্রিপুরায় যোগাযোগ-ব্যবস্থার অপ্রতুলতার উপর চাপ বাড়তে লাগল। সামান্য রেল যোগাযোগ এবং সড়ক সংযোগে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত থাকলেও আভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতা প্রকট হয়ে উঠল। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে জন-সংখ্যার বিস্ফোরণ হল জ্যামিতিক হারে।

পরবর্তী দ্বীপ-বন্দী ত্রিপুরা উন্নয়নের চাবিকাঠি

এক-তৃতীয়াংশ সমতল কর্ষণযোগ্য ভূমি অবশিষ্টাংশ পাহাড়ী আর ঘন বনানীতে অন্ধকারাচ্ছন্ন। দেশবিভাগের পর দ্রুত জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে। লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা এখানে এসে আশ্রয় নেয়। বর্তমানে ১৯৮১ খ্রীস্টাব্দে লোকসংখ্যা অনধিক ২১ লক্ষে দাঁড়িয়েছে। ১৯১১ খ্রীস্টাব্দে যেখানে প্রতি বর্গমাইলে লোকবসতি ছিল ৩৫ জন, ১৯৬১ খ্রীস্টাব্দে তা দাঁড়ায় ১০৭। বর্তমানে আরো বেড়েছে। জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ আদি-বাসী খণ্ড জাতির লোক। তারা পাহাড়ে জঙ্গলে বসবাস করে। বাকি লোকসংখ্যা সমতলেরই বাসিন্দা। এক-তৃতীয়াংশ সমতল ভূমির উপর দুই-তৃতীয়াংশ লোকের চাপ পড়ায় স্বভাবতই কৃষিজমির উপর নির্ভরশীলতা কমে গেছে। বড়ো আয়তনের শিল্প সৃষ্টি না হওয়ায় ক্ষুদ্র ও কুটীরশিল্পের উপর জননির্ভরতা বেড়েছে। অপরপক্ষে যাতায়াত-ব্যবস্থার অপ্রতুলতা এবং বহির্যোগাযোগ বিপন্ন হওয়ায় যুগপৎ আভ্যন্তীণ কাঁচামাল চলা-চলে অসুবিধা ও উৎপন্ন দ্রব্যের বিপণনে অব্যবস্থা সৃষ্টি হয়েছে।

উন্নয়নের চাবিকাঠি হল সুষ্ঠু যোগাযোগ-ব্যবস্থা। আদিবাসী জনজীবনে সরলতা হেতু

আভ্যন্তরীণ পথঘাট প্রায় ছিল না বললেই চলে। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে রাজধানী আগরতলা থেকে দশ বার মাইল দূর অবধি যেখানে রাঙামাটির রাস্তা ছিল আজ সেখানে সর্বঋতু উপযোগী ৪৪ নং জাতীয় সড়ক তৈরি হয়েছে। রাজধানী আগরতলাকে এই জাতীয় সড়ক অবশিষ্ট ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করেছে। এই দুইশত কিলোমিটার জাতীয় সড়ক চোরাইবাড়ি আসামের কাছাড় সীমান্ত পর্যত বিস্তৃত। অপর একটি শতাধিক কিলোমিটার পথ ত্রিপুরার দক্ষিণ সীমান্ত শহর সাব্রুম এবং বিলোনিয়া পর্যন্ত প্রসারিত। এই দুই জাতীয় সড়ক দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত ত্রিপুরার একমাত্র যোগাযোগ-ব্যবস্থা।

সর্বঋতু উপযোগী সড়ক জাতীয় সড়ক রেলপথ বিমান যোগাযোগ জলপথ

অসংখ্য নদী-নালার উপর দিয়ে এই পথ চলে যাওয়ায় অনেক সময় বর্ষায় সেতু বিচ্ছিন্ন হয়ে যোগাযোগ ব্যাহত হয়। বর্তমানে অধিকাংশ সেতুই স্থায়িভাবে তৈরি হয়ে যাওয়ায় এই অসুবিধা বহুলাংশে দূর হয়েছে। এই প্রধান সড়ক থেকে অনেকগুলি সর্বঋতু উপযোগী ও অস্থায়ী রাস্তা রাজ্যের বিভিন্ন মহকুমা শহর ও অঞ্চলকে সংযুক্ত রেখেছে। অমরপুর, কমলপুর, খোয়াই, কৈলাশহর, ধর্মনগর, সোনামুড়া উদয়পুর সহ অবশিষ্ট ত্রিপুরার সঙ্গে রাজধানী শহর আগরতলার যোগাযোগ এইভাবে রক্ষিত হচ্ছে। অন্য একটি বিকল্প সড়ক তৈরি হচ্ছে ধর্মনগর থেকে কৈলাশহর কমলপুর খোয়াই মহকুমা হয়ে আগরতলা পর্যন্ত। আসাম-আগরতলা সড়কের উপর অবস্থিত কৈলাশহর মহকুমার মনুঘাট থেকে একটি জাতীয় সড়ক মনু-মম্পুই মিজোরামের আইজল পর্যন্ত চলে গেছে। এই নির্মীয়মাণ পথটি ত্রিপুরার পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত জম্পুই পাহাড়ের তিনহাজার ফুট উপর দিয়ে অতিক্রম করে অপর পারে সীমান্ত নদী লংগাই পেরিয়ে মিজোরামের ভিতর প্রবেশ করবে। এই পথ চালু হলে জম্পুই-এর মনোরম দৃশ্য পর্যটকদের আকর্ষণ করবে।

ত্রিপুরা রাজ্যের রেল যোগাযোগ এখনও পর্যন্ত বুড়ি ছোঁয়াই হয়ে আছে। স্বাধীনতার পর আসামের কাছাড়ের কলকলিঘাট থেকে ধর্মনগর পর্যন্ত রেললাইন সম্প্রসারিত হলেও চোরাইবাড়ি-নদীয়াপুর-ধর্মনগর তিনটি স্টেশন মিলে মোট ১২ কিলোমিটার রেলপথ ত্রিপুরার ভাগ্যে পড়েছে। সৌভাগ্যের বিষয় ধর্মনগর থেকে কুমারঘাট অবধি নতুন রেললাইন পাতার কাজ চলছে। রাজ্যের জনগণের দীর্ঘকালের দাবি ধর্মনগর থেকে সাব্রুম পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণের কাজও অচিরেই আরম্ভ হবে বলে আশা করা যায়। খনিজতৈল-সমৃদ্ধ বড়মুড়ার সাফল্যের উপরই এই রেল সম্প্রসারণের কাজের দ্রুততা নির্ভর করছে বলে অনেকের ধারণা।

আকাশপথই একমাত্র জরুরী-ভিত্তিক যোগাযোগ-ব্যবস্থা। তবে ব্যয়বহুল বলে জনসাধারণের নাগালের বাইরে। আগরতলা-দমদম রুটে প্রত্যহ বিমান সংযোগ রয়েছে। স্থলপথে আসাম হয়ে কলকাতা পৌঁছতে যেখানে দুইদিনেরও বেশি লাগে, সেখানে আকাশপথে এক ঘণ্টারও কম সময় লাগে। এই ব্যবস্থাও পর্যাপ্ত নয়। আগরতলা সিঙ্গারবিল ভারতবর্ষের আভ্যন্তরীণ প্রথম শ্রেণীর বারোটি বিমানবন্দরের একটি। সমস্ত ঋতুতে বোয়িং চলাচলের উপযোগী করে এটিকে তৈরি করা হচ্ছে।

জলপথ প্রায় ব্যবহারযোগ্য নয় বললেই চলে। অসংখ্য নদী থাকলেও সেগুলি

পাহাড় থেকে সরাসরি নেমে আসায় প্রাথমিক গতিস্তর অতিক্রম করে নাব্য হতে পারে নি এবং সবঋতুতে জলও থাকে না। ফলে যোগাযোগ ও পরিবহণ ক্ষেত্রে আশানুরূপ সাহায্য নদীগুলির কাছ থেকে পাওয়া যায় না। তবু স্থলপথে যোগাযোগের অভাব থাকায় গোমতী-মনু-লংগাই-দেও কয়েকটি নদীতে পণ্যবাহী নৌকা চলাচল করে।

ত্রিপুরার রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হয়ে গণতন্ত্র স্থাপিত হওয়ার চৌত্রিশ বছর পরও এ রাজ্যটি অবশিষ্ট ভারত থেকে প্রায় বিচ্ছিন্ন রয়ে গেছে। আসামের সঙ্গে নামেমাত্র রেল যোগাযোগ রচিত হলেও তা যেমন ব্যয়বহুল তেমনি সময়সাপেক্ষও। একমাত্র পশ্চিম-বঙ্গের মধ্য দিয়ে এ রাজ্যকে অধিকতর নির্ভর করতে হয় আকাশ পরিবহণের ওপর। দেরিতে হলেও ত্রিপুরার মন্থর আরণ্যক জীবনে কর্মব্যস্ততার ঢেউ এসেছে। অগ্রগতির যাত্রাপথে পদচারণা শুরু হয়েছে।

ত্রিপুরার কুটীরশিল্প, বনজ-সম্পদ, খনিজ-সম্পদ, কৃষি সমস্ত কিছুর উন্নয়নের মূলেই অন্তরায় হল স্থলভ যোগাযোগ-ব্যবস্থা। শিল্পজাত সামগ্রীর বাজার ব্যাহত হচ্ছে। বনজ সম্পদের সদ্ব্যবহার করা যাচ্ছে না। খনিজসম্পদের দ্রুত সন্ধান ও শিল্পায়ন সম্ভব হচ্ছে না। শিল্প-সংস্কৃতি-ভাবধারার বিনিময়ও সহজলভ্য না হওয়ায় জাতীয় সংহতি গড়ে উঠছে না। ত্রিপুরার পর্যটনশিল্পের সম্ভাবনাও উজ্জ্বল। Tourism, a passport to world peace, অবশিষ্ট ভারতের পর্যটকদের আকর্ষণ করার মাধ্যমে যে-ভাববিনিময়ের সুযোগ গড়ে উঠতে পারত তাতে ভারতে তথা বিশ্বে শান্তি সুদৃঢ় হতে পারত। এ সমস্তই বিঘ্নিত হচ্ছে তার যোগাযোগ ও পরিবহণ-ব্যবস্থার অপ্রতুলতার জন্যে। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী স্থলভে সংগ্রহ করে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক উন্নয়নও সম্ভব হচ্ছে না একই কারণে। ত্রিপুরার ঐতিহাসিক শহর উদয়পুর, রবীন্দ্র স্নেহধন্য রাজধানী আগরতলা, রুদ্রসাগরের জলবেষ্টিত প্রাসাদ, তিন হাজার ফুট পাহাড়ের উপর অবস্থিত দশটি লুসাই গ্রাম সর্বঋতুতে ভ্রমণোপযোগী। ত্রিপুরার মুসৌরী জম্পুই-এর শোভা, সিপাহীজলার অভয়ারণ্য, কৈলাশহরে উনকোটি পাহাড়, অমরপুরে ডম্বুর জলপ্রপাত ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্প প্রভৃতি যেমন পর্যটন শিল্পকে সমৃদ্ধ করতে পারত তেমনি সর্বভারতীয় ভাবধারার নিজস্ব সংস্কৃতির সংযোজনও রাখতে পারত। শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসরতা রোধ করতেও যোগাযোগ-ব্যবস্থার একান্ত প্রয়োজন।

শিল্প—ক্ষুদ্র ও কুটীর কৃষি, বনজ—যোগাযোগের প্রভাব

পরিশেষে কৃষি, শিল্প, স্বাস্থ্য, সংস্কৃতি, সাহিত্য ও রাজনীতিতে ত্রিপুরায় যে-জাগরণ ঘটেছে তার প্রভাব পড়েছে ত্রিপুরার শাখান, জম্পুই, বড়মুড়া পাহাড়ের বনভূমিতে; প্রাণধারায় উচ্ছল হয়ে উঠেছে লংগাই-গোমতী-মুন-খোয়াই নদীর উভয় তীরের জাতি-উপজাতি জনজীবন। আধুনিক শিক্ষা-ব্যবস্থা আর যোগাযোগ-পরিবহণ ব্যবস্থার যুগপৎ উন্নতি ঘটলে ত্রিপুরাবাসীর জীবনে অমানিশার অবসানে আলোর রেখা ফুটে উঠবে নিঃসন্দেহে।

উপসংহার

অনুরূপভাবে লেখা যায়:—

(ক) সমস্যাসঙ্কুল ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থা। (খ) ত্রিপুরার শিল্পোন্নয়নে যোগাযোগ-ব্যবস্থা।

মেলার বৈচিত্র্য ও রূপান্তর

[ভূমিকা—মেলার পূর্বরূপ—মেলার মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক দিক—মেলার রূপান্তর—বইমেলা—নতুন মেলা—উপসংহার।]

ভূমিকা

মানুষের মধ্যে মিলনের সেতু রচনা করাই মেলার উদ্দেশ্য। 'দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে'—এ কথা মেলা সম্পর্কে যতটা সত্য ততটা বোধহয় অন্যকিছু সম্পর্কে সত্য নয়।

মেলার বর্ণনা

মেলার ইতিহাস লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রাচীনকালে কোন দেবতা বা দেবীর পূজা উপলক্ষে বছরের বিশেষ একটি সময় একটি নির্দিষ্ট জায়গায় মেলা বসত। সেদিন মেলার সঙ্গে ধর্মের সম্পর্ক ছিল নিবিড়। এইভাবে কোন দেবকল্প মহামানবের জন্মস্থানে তাঁর জন্ম বা মৃত্যুতিথি স্মরণে মেলা বসতো। যদিও ধর্মের বাইরের আবরণ মানুষের প্রাণের আবেগ—মিলনস্পৃহাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না। তাই সেদিন মেলা ছিল সমাজের একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। আজকের মতো সেদিনের মানুষ সারা বছর ধরে একটি বিশেষ মেলার জন্যে অপেক্ষা করে থাকত। এইভাবে স্থানীয় দেবদেবীর নামে চিহ্নিত ধর্মের বিশেষ বিশেষ মেলা—যেমন চড়ক মেলা, রথের মেলা, গৌর মেলা, জয়দেব কেঁদুলির মেলা, পৌষ মেলা বাংলার সমাজে খ্যাতিলাভ করেছে।

মেলার মনস্তাত্ত্বিক ও অর্থনৈতিক দিক

উৎসবপ্রাণ মানুষ সারাবছর মেলার জন্যে অপেক্ষা করে থাকে। ছোটোরা পয়সা জমায়, শিল্পী তার শিল্পের পসরা সাজাতে থাকে। এমনি করেই চলে কাজ আর চিন্তায় মেলার জন্যে প্রতীক্ষা। বহুদিনের অদেখা কোনো বন্ধু অথবা আত্মীয়কে হঠাৎ মেলার ভিড়ে আবিষ্কার করার যে কী আনন্দ তা বুঝি ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কর্মক্লান্ত মানুষ তাই মেলাকে চেয়েছে, কারণ তারা জানে মেলা হ'ল একটানা ক্লান্তিকর জীবনের উপর অমৃতের প্রলেপ। এর সঙ্গে সঙ্গে মেলার অর্থনৈতিক দিকটিও মোটেই উপেক্ষণীয় নয়। মেলা হল বিকিকিনির একটা বড়ো মাধ্যম, অর্থনীতিতে যাকে বলে বাজার—তাই। এই বাজারের কথা ভেবেই কত দূরদেশ থেকে দোকানি-পসারীর দল মেলায় আসে বিচিত্র পণ্যসম্ভারের ডালি সাজিয়ে।

মেলার রূপান্তর

প্রাচীন মেলার পাশে আজ মেলার নব রূপান্তর ঘটেছে। একদিকে যেমন ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে আমাদের দেশে বিচিত্র মেলা গড়ে উঠেছে, তেমনি আবার ধর্মীয় সম্পর্কহীন নানা মেলার উদ্ভব হয়েছে। আগে মেলা বলতে আমাদের চোখের সামনে ভেসে উঠত মহাকালের মেলা, শিবরাত্রির মেলা, মকরস্নানের মেলা, গাজন বা রথের মেলা। আজ নানা বিষয়কে কেন্দ্র করে মেলা মানুষের বিচিত্র আশা আকাঙ্ক্ষাকে মূর্ত করে তুলেছে। তাই আমরা দেখি প্রাচীন মেলার পাশে এসেছে নতুন নতুন মেলা : বই মেলা, শিল্প মেলা, কৃষি মেলা, সাংস্কৃতিক মেলা, বিজ্ঞান মেলা প্রভৃতি। একটা কথা মনে রাখতে হবে মেলার সঙ্গে প্রদর্শনীর অনেক বিষয়ে মিল থাকলেও প্রদর্শনীর সঙ্গে মেলার একটা সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে।

মেলা আর প্রদর্শনীতে অসংখ্য লোক সমাগম হয়, দুটিই সম্মেলন স্থান, মিলন ক্ষেত্র। তবু মেলার মধ্যে প্রাণের পরশ প্রদর্শনীর চেয়ে বেশি। মেলা হল সহজ সরল অনাড়ম্বর জনজীবনের মূর্ত প্রতিচ্ছবি, আর প্রদর্শনী হল একটা ভাবগম্ভীর ব্যাপার, জাঁকজমকপূর্ণ, বেশি মাত্রায় সাজানোগোছানো।

চড়ক পূজোর মেলা, বা বারুণীস্নানের মেলা নয়, এ-এক নতুন জাতের মেলা—নাম বইমেলা। কিছুদিন আগেও এ-মেলার নাম আমাদের দেশে ছিল অজানা। আজ বইমেলাও রথের মেলার মতই অনেক আনন্দ-হাসি-গান—এক কথায় ছুটির মেজাজ নিয়ে এসেছে। যে আনন্দ হাসি গান এক দিন ছিল চড়ক বা শিবরাত্রির মেলার নিজস্বসম্পদ, বই মেলা আজ তাকে এনেছে আমাদের জন্যে উপ-

বই মেলা

হারের ডালি সাজিয়ে। কলকাতার বইমেলার জন্ম ১৯৭৬ সালে। কলকাতার রবীন্দ্রসদনের বিপরীত প্রান্তে ময়দানে এই মেলার অনুষ্ঠান হয়। উদ্যোক্তা ছিলেন পাবলিশার্স গিল্ড। সেই থেকে প্রত্যেক বছর ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে কলকাতায় বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কলকাতার মত বিভিন্ন জেলায় ও প্রদেশেও শুরু হয়েছে বই মেলার জয়যাত্রা। হাওড়া বইমেলা, মুর্শিদাবাদ বইমেলা, বর্ধমান বইমেলা, ত্রিপুরা বই-মেলা আজ আর কারও অজানা নেই। সম্প্রতি সরকারী উদ্যোগেও বইমেলা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। ১৯৮২ সাল থেকেই বইমেলা ব্যাপক আকার ধারণ করে এবং ১৯৮৩ সালে কলকাতার বইমেলা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে।

শিল্প-কৃষি ও বিজ্ঞান মেলা : যে উদ্দেশ্যে বইমেলার জন্ম ঠিক সেই উদ্দেশ্য নিয়েই গড়ে উঠেছে শিল্প-কৃষি আর বিজ্ঞান বিষয়ক মেলা। দেশের মানুষকে বিভিন্ন শিল্পে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে কৃষিকাজে সচেতন করা এই মেলার মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যেই সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগে এদের জন্ম। ত্রিপুরার চামড়া বা বাঁশের শিল্পকার্য, বাঁকুড়ার পোড়ামাটির কাজ, বিষ্ণুপুরের তাঁতের কাপড় যখন কোনো শিল্পমেলায় আমাদের চোখের সামনে সাজানো থাকে, তখন আমরা সেই শিল্পকর্মের মাধ্যমে সমগ্র অঞ্চলের রূপ-টাকেই দেখতে পাই। বিশেষ অঞ্চলের কাঁচামাল, শিল্পী, তাদের সাধনা আমাদের চোখের কাছে রূপ নিয়ে ফুটে ওঠে। কুটিরজাত শিল্পসামগ্রীর মেলার মতোই বড়ো বড়ো কলকার-খানায় প্রস্তুত শিল্পের মেলাও আজকাল মেলার আওতায় এসেছে। যেমন এসেছে কৃষিজাত সামগ্রীর মেলা। কেবল কৃষিজাত সামগ্রী নয়, সেই সঙ্গে থাকে চাষের কাজে ব্যবহৃত নানান আকারের নানান প্রকারের কৃষিযন্ত্র, আর বিজ্ঞানের নব আবিষ্কার। যদিও মেলার সঙ্গে এদের যতটা মিল তারচেয়ে বেশি মিল বোধহয় প্রদর্শনীর সঙ্গেই। কিন্তু প্রাণের আবেগ আনন্দ হাসি গান এখানেও কিছু কম নেই।

আজকাল সংস্কৃতি মেলা নামে আর এক নতুন মেলা চালু হয়েছে। বঙ্গসংস্কৃতি, ত্রিপুরা সংস্কৃতি সম্মেলনের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক মেলার রূপটিকেই খুঁজে পাই। এখানে মেলার বিষয় নাট্যাভিনয়, যাত্রা, কাব্যপাঠ, প্রাচীন

নতুন মেলা

গ্রাম্যসংস্কৃতির অনুশীলন, বাংলা ও ত্রিপুরার প্রাচীন শিল্প প্রদর্শনী। এই সব সাংস্কৃতিক মেলা আমাদের ভাবময় জীবনের মহান ঐতিহ্যের পরিচায়ক।

সাংস্কৃতিক মেলায় আজকাল বাউল গান শোনার জন্যে বিদেশীরাও হাজির হয়। তাই এ-মেলা যেমন স্বদেশের তেমনি বিদেশের। ঘরের সঙ্গে সুদূরকে এক সূত্রে আবদ্ধ করেছে এই মেলা।

উপসংহার

প্রাচীন মেলার মতই নতুন মেলায় সবাই ক্রেতা নয়, কারণ অর্থনৈতিক ব্যাপারটা এখানে সবচেয়ে বড়ো কথা নয়। এখানে মানুষ আসে কেনাবেচা করতে, চোখে দেখতে, হয়তো কেউ হুজুগে পড়ে। কিন্তু প্রাণের আনন্দ উদ্দীপনা এখানেও চাপা থাকে না। এখানে বাল্যকালের বন্ধুকে কোন প্রাচীন হঠাৎ আবিষ্কার করে চমকে ওঠেন। প্রাচীন ও নবীনের মিলনক্ষেত্র এটাই। দর্শক এখানে এসে অনেক কিছু জানেন, শিল্পী সাহিত্যিক অনুপ্রেরণা পান, আর অর্থনীতির দিকটাও অবহেলিত থাকে না।

ত্রিপুরার শিল্প সম্ভাবনা

[ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮৫]

[প্রবন্ধ সংকেত : ভূমিকা—গ্রামকেন্দ্রিক ত্রিপুরা—গ্লানিময় অর্থনৈতিক অবস্থা—শিল্পে সর্বভারতীয় পটভূমিকা—জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পের অপ্রতুলতা—ত্রিপুরায় শিল্প সৃষ্টির বিভিন্ন প্রকার উদ্যোগ—কৃষিনির্ভর শিল্প উন্নয়নের ব্যবস্থাপনা—শিল্প সম্প্রসারণে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা—সমাধান—উপসংহার।]

ভূমিকা

পর্বতের কঠোরতা ও সমতলভূমির সজল কোমলতার সমাহারে অরণ্যশোভিত অঙ্গরাজ্য ত্রিপুরা। বর্ণনাতীত প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে অতুলনীয় হয়েও তার দারিদ্র্যের অবসান হল কই ? দারিদ্র্য তার নিত্যসঙ্গী এবং অনগ্রসরতা তার অদৃষ্টের অমোঘ বিধান। ছোট্ট ত্রিপুরা পল্লীপ্রাণ রাজ্য। এই রাজ্যের দারিদ্র্য, জনগণের সংখ্যা ও সমস্যা সর্বভারতের তুলনায় অধিক। যেখানে সর্বভারতে শতকরা ৫০ ভাগ লোক গরীব, কিন্তু এই রাজ্যে শতকরা ৮৩ ভাগ লোক দারিদ্র্য সীমার নীচে। সুতরাং শিল্পবিকাশ ব্যতীত ত্রিপুরার জনগণের দারিদ্র্য মোচন অসম্ভব। যে কোন উন্নতশীল দেশের দিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখি দ্রুত শিল্প বিকাশই সেই দেশের উন্নতির একমাত্র সোপান।

গ্রামকেন্দ্রিক ত্রিপুরা

১৯৫১ সালে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপুরার উন্নয়ন শুরু হয়। কিন্তু তুলনামূলকভাবে ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়ন আশানুরূপ হয় নি। অবশ্য অস্বীকার করা যায় না যে, স্বাধীনতা লাভের ৩৫ বছরে ত্রিপুরার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি যথেষ্ট হয়েছে। উপযুক্ত শিল্প গড়ে তুলতে হলে আভ্যন্তরীণ যোগাযোগ ব্যবস্থারও উন্নতি অপরিহার্য। সে দিক দিয়ে ত্রিপুরা অনেক পিছিয়ে আছে।

অবশ্য ত্রিপুরার এই হতাশা ব্যঞ্জক অর্থনৈতিক অবস্থার অন্যতম কারণ অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পের অনগ্রসরতা। ১৯৮১ সালে ত্রিপুরার জনসংখ্যা ছিল সাড়ে ছয় লক্ষ। কিন্তু ১৯৭১ সালে তা সাড়ে ১৫ লক্ষ ছাড়িয়ে যায়। ১৯৭১ সালের আদমশুমারী অনুযায়ী ত্রিপুরার লোকসংখ্যা ২০ লক্ষ ৫০ হাজারে গিয়ে দাঁড়ায়।

স্থানিময় অর্থনৈতিক অবস্থা

১৯৭১—৮১ সাল পর্যন্ত সারা ভারতে যেখানে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ২৪.৭৫ ছিল সেক্ষেত্রে ত্রিপুরার জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ৩২.৩৭। সন্দেহ নেই, দেশ বিভাগের পর উদ্বাস্তুদের আগমনে জনসংখ্যা এত বৃদ্ধি পেয়েছে। অন্যদিকে ত্রিপুরার কৃষিজ দ্রব্য, শিল্প ও কলকারখানা নেই বললেই চলে। ফলে এই বর্ধিত জনসংখ্যার জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় পণ্য অন্য রাজ্য থেকে আমদানী করতে হয়।

ত্রিপুরার বেকার সমস্যা ভয়াবহ। এই ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা সমাধান করতে হলে শিল্পস্থাপন প্রয়োজন। ১৯৭৮-৭৯ সালে রাজ্যে বেকারদের সংখ্যা ছিল প্রায় সত্তর হাজার। ১৯৮০-এর শেষ দিকে এটা দাঁড়ায় গিয়ে ৭৫ হাজারে। ১৯৭৮—১৯৮১ সালের মধ্যে সরকার ১৫ হাজারেরও বেশি বেকারদের চাকুরী দিয়েছেন। কিন্তু শিল্পের সম্প্রসারণ না ঘটলে কর্মী বিনিয়োগ সম্ভব হবে না। ত্রিপুরায় ছোটো বড়ো শিল্প গড়ে

শিল্পে সর্বভারতীয় পটভূমি

ওঠার প্রচুর সম্ভাবনা আছে। ভবিষ্যতে শিল্পের সম্প্রসারণের জন্য সরকার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। উপযুক্ত শিল্প গড়ে তুলতে যে সব কাঁচামালের প্রয়োজন তা ত্রিপুরায় যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান। ভারী যন্ত্রপাতির অভাবে ঐ সব কাঁচামাল ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে। মনে হয় ত্রিপুরায় যদি ভবিষ্যতে রেল যোগাযোগ স্থাপিত হয় তবে নিশ্চয়ই শিল্পের সম্প্রসারণ দ্রুততর হবে। ত্রিপুরায় বৃহৎ শিল্প গড়ে উঠতে দেরী হলেও কিন্তু ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

১৯৭৭-৭৮ সালে ত্রিপুরায় ক্ষুদ্র শিল্পের সংখ্যা ছিল ৯৬৫টি। ১৯৮৩-এর মাঝামাঝি এর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে প্রায় দেড় হাজারে। বর্তমানে প্রায় দুই হাজারের মতো ক্ষুদ্র শিল্প রয়েছে। রাজ্যের ক্ষুদ্র শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—চামড়া, ফল সংরক্ষণ, কাঠ, বাঁশ-বেত, পি, ভি, সি পাইপ ইত্যাদির কারখানা।

রাজ্যে একটি চটকল স্থাপিত হয়েছে বটে, বহু বেকারের চাকুরীও হয়েছে, কিন্তু আশানুরূপ উৎপাদন হচ্ছে না। ভবিষ্যতে একটি কাগজের কল স্থাপনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পের অপ্রতুলতা

প্রচুর কাঁচামালের উপর নির্ভর করে কাগজ শিল্পটি গড়ে উঠবে। কাগজ কলটি স্থাপনের জন্য ইরানের একটি শিল্পসংস্থা সহায়তা করবে। দুই শত কোটি টাকার এই প্রকল্পটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের অপেক্ষায় রয়েছে। এর কাজ শেষ হলে দেড় হাজার বেকার প্রত্যক্ষভাবে এবং বিশ হাজার লোক পরোক্ষভাবে উপকৃত হবে। এছাড়া ত্রিপুরায় প্রচুর কাঁঠাল ও আনারস পাওয়া যায়। এই কাঁঠাল ও আনারস থেকে উৎকৃষ্ট ধরনের মদ প্রস্তুত করা যেতে পারে।

কৃষির ক্ষেত্রেও উন্নতির নানাবিধ উদ্যোগ আয়োজন চলছে। জুম প্রথার পরিবর্তে

আধুনিক প্রথায় চাষবাস শুরু হয়েছে। গ্রামীণ অর্থনীতির সঙ্গে কৃষির যেমন সংযোগ কুটির শিল্পেরও তাই। দুটোই অবিচ্ছেদ্যরূপে সংযুক্ত। তাই এখানে কুটির শিল্প প্রসারের সম্ভাবনা বেশি। আরও একটি কারণে কুটির শিল্পের প্রয়োজন রয়েছে। কুটির শিল্পজাত দ্রব্যের প্রতি মানুষের সৌন্দর্য-পিপাসু মনের একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আছে। এ কারণে এত বিপর্যয়ের মধ্যেও এত রুচি পরিবর্তনের মধ্যেও আমরা তাঁতের ধুতি-শাড়িকে দূরে ফেলে দিইনি। ঘর সাজাতে হলে এখনও আমরা বেতের জিনিস আর মৃৎ-শিল্পকে অগ্রাধিকার দান করি। সুতরাং ত্রিপুরা রাজ্যে যত বেশি না বৃহৎ শিল্পের সম্ভাবনা, তার চেয়ে বেশি উজ্জ্বল সম্ভাবনা হল কুটির শিল্পের।

কৃষিনির্ভর শিল্প উন্নয়নের সম্ভাবনা

শোচনীয় বিদ্যুৎ পরিস্থিতি ও দক্ষ কর্মীর অভাব নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার পক্ষে একটি বিশেষ প্রতিবন্ধক। যখন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না, তখন কোনো ব্যবসায়ী কেনই বা চাইবেন নতুন করে কারখানা স্থাপন করে শ্রমিকদের বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিতে? অবশ্য ত্রিপুরায় বেসরকারী মালিকানায় কোনো বৃহৎ শিল্প আজও গড়ে ওঠেনি। যে দু-একটি বৃহৎ শিল্প স্থাপিত হয়েছে বা হওয়ার সম্ভাবনা আছে সবই সরকারী প্রচেষ্টায়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সমস্যা এবং শ্রমিকের দুর্বল উৎপাদন শক্তি বৃহৎ শিল্প গড়ে ওঠার বিশেষ অন্তরায়। এছাড়া এ-রাজ্যের শিল্পোন্নতির আভ্যন্তরীণ কাঠামোও তেমন মজবুত নয় বলেই ত্রিপুরায় অতীতে শিল্প বিকাশের সম্ভাবনায়ও মনোযোগ দেওয়া হয়নি। নতুন নতুন শিল্প প্রতিষ্ঠার বিষয় পর্যালোচনা করতে গিয়ে ভারতের কোনো শিল্পপতি বলেছেন, "একচেটিয়া পুঁজি ও বিদেশী পুঁজির ক্ষেত্রে ভারতে আইনগত কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ রয়েছে। রাজ্যের নানাবিধ সমস্যার কথা চিন্তা করে ভারত সরকার এ দু'টি আইন খানিকটা শিথিল করতে পারেন। তাহলে অনগ্রসরশীল রাজ্যগুলিতে ছোটো বড় শিল্প গড়ে উঠতে কোন অসুবিধা হবে না। ত্রিপুরা রাজ্যে যে শিল্প-সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে তাকে ফলপ্রসূ করে তুলতে হলে ঐ সব অসুবিধাগুলো দূর করা একান্ত অপরিহার্য হয়ে পড়েছে।

শিল্প সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা

সমাধান

ত্রিপুরা ক্ষুদ্ররাজ্য। তথাপি ভারতবর্ষের অগ্রগতির পক্ষে যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। কারণ বিশাল দেহে সামান্য ক্ষতও মৃত্যুর কারণ হয়। তাই ভারতের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ত্রিপুরার শিল্পোন্নতি একান্ত বাঞ্ছনীয়। সেই জন্য ভবিষ্যতে ত্রিপুরার ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্পের উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে। ত্রিপুরায় যে কাঁচামাল রয়েছে তা যদি যথাযথ ব্যবহার করা হয় তবে প্রচুর শিল্প-কারখানার সৃষ্টি হবে। জানি না, এ ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার কতখানি আগ্রহী হবেন। সরকারী উদ্যোগ অবশ্যই অভিনন্দনযোগ্য। শিল্পপতিগণ যাতে কম দামে তাদের শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় মাল-মসলা পেতে পারেন, আগে সেই ব্যবস্থার প্রয়োজন। কলকারখানার পাশে বিশেষ করে কুটির শিল্পকে যন্ত্রশিল্পের অনুপুরকরূপে গড়ে তুলতে হবে। একথা বলা যেতে পারে ত্রিপুরায় অদূর ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র বৃহৎ শিল্পের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল।

উপসংহার

সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ

১. সাহস

ভূমিকা : সাহসে শ্রীঃ প্রতিবসতি—সাহসেই মঙ্গলের বাস। বহু প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করে যে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে তার মূলে আছে তার অদম্য সাহস, যা সমস্ত দুরূহ কাজের মূলে।

দৃষ্টান্ত : অভিযাত্রী সাহসী না হলে দুর্জয় আর দুর্গমের পথে যাবেন কী করে? বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়েই তাঁদের তথ্যকে সত্য বলে প্রমাণিত করেন, এঁদের পাথেয়ও অদম্য সাহস। বাধার পাহাড় পেরিয়েই মহাপুরুষেরা জীবন-পতাকাকে উড্ডীন করেন।

হঠকারিতা আর সাহস এক নয় : ভাবনা-চিন্তা না করে হঠাৎ দুঃসাধ্য কাজে ঝাঁপিয়ে পড়া সাহসীর ধর্ম নয়, সাহসী ঝাঁপ দেবার আগে কোথায় ঝাঁপ দিচ্ছেন দেখে নেবেন বৈ কি! দেবদূতেরা যেখানে ব্যর্থ সেখানে যারা কোনোরকম চিন্তা না করেই পদক্ষেপ করে তারা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয় না। সাহসের সঙ্গে সংযম ও বুদ্ধিমত্তার যোগ হলেই সে সাহস সোনা ফলাতে পারে।

উপসংহার : সমস্ত ভীরুতা আর কাপুরুষতাকে জয় করাই ভারতের সনাতন বাণী, 'ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ' এই হোক আমাদের মাভৈঃ মন্ত্র।

২. কাঁটা হেরি ক্ষান্ত কেন কমল তুলিতে

ভূমিকা : উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা।

উদ্যমই সৌভাগ্যের মূল : মানুষের জয়যাত্রার ইতিহাস নিরবচ্ছিন্ন উদ্যমের ইতিহাস। ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত উদ্যমের জন্যেই আজ মানুষের এই বিস্ময়কর সভ্যতা গড়ে উঠেছে। জীবনের যে-কোন ক্ষেত্রে সক্রিয়তারই জয়, নিষ্ক্রিয়তার পরাজয়। মহাপুরুষদের জীবনের সমস্ত সাফল্যের মূলে উদ্যম। চেষ্টা করে ব্যর্থ হলেও ক্ষতি নেই। ব্যর্থতা সাফল্যেরই ভিত্তিভূমি।

ছাত্রজীবনের উদ্যম : অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা। অধ্যয়নে সর্বদা অতন্দ্র থাকতে হবে বিদ্যার্থীকে। কণত্যাগে কুতো বিদ্যা। একবণা বিদ্যা-আহরণের সুযোগও ছাত্রদের হাতছাড়া করবার উপায় নেই। উদ্যমশীল ছাত্রই জাতীয় জীবনে যোগ্য ভূমিকা নিতে পারে।

উপসংহার : উদ্যমের সঙ্গে স্থির সঙ্কল্প ও আত্মবিশ্বাস যুক্ত হওয়া চাই।

৩. সন্তোষ

সন্তোষ সুখের মূল : মনে সন্তোষ থাকলে অল্পতেই মানুষ সুখী হয়, আর সন্তোষ না থাকলে অনেক পেয়েও মানুষ সুখী হতে পারে না।

'সর্বাঃ সম্পত্তয়স্তস্য সন্তুষ্টং যস্য মানসম্'—যার মন সন্তুষ্ট সব সম্পদ তারই।

উদাহরণ : আমাদের দেশের মনীষীদের আদর্শই ছিল plain living and high thinking আমাদের ছোটো ঘরে বড়ো মন নিয়ে থাকা। বুনো রামনাথের গল্প আমাদের কাছে প্রবাদবাক্যের মত।

অতি সন্তোষের দোষ : অতি সন্তোষ থেকে নিষ্ক্রিয়তা বা আলস্য আসতে পারে। অনেকে বলেন 'অসন্তোষ থেকেই উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি'।

উপসংহার : নিষ্ক্রিয়তা সর্বদাই নিন্দনীয়। আলস্য মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ঠিকই, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর অসন্তোষ তো এক জিনিস নয়। আমি বড়ো হব এ তো সজীব আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যতটা চাইব ততটা না পেলেই মনের অবসাদ যদি আসে তা হলেই তো সর্বনাশ। সন্তোষ সেই সর্বনাশের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

৪. সাহিত্যের একটি চরিত্র

ভূমিকা : সাহিত্যের চরিত্রগুলি আমাদের আপনজনের মতো হয়ে পড়ে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের ফটিক, বিভূতিভূষণের অপু, শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ। আমার অতি প্রিয় চরিত্র ইন্দ্রনাথ।

চরিত্রটির পরিচয় : ইন্দ্রনাথ একটি কিশোর চরিত্র। শ্রীকান্তের সঙ্গে তার হঠাৎ পরিচয়। দুর্দান্ত সাহসী ছেলে ইন্দ্রনাথ। না আছে বাঘের ভয়, না আছে সাপের ভয়, না আছে কোনো মানুষের ভয়। হ্যাঁ, মাছ চুরি সে করত বটে, কিন্তু নিজের কোনো প্রয়োজনের জন্যে নয়, অন্নদাদিদির জন্যে। অন্যের জন্যে যে-কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতেও সে কুণ্ঠিত হত না। তার কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ আমাদের বিস্মিত করে। শ্রীকান্ত যখন বিস্মিত কণ্ঠে বলে : 'এ হৃদয় কী দিয়া কে গড়িয়াছিল ?' তখন তার প্রশ্নের সঙ্গে আমরাও বিস্মিত কণ্ঠ মেলাই।

চরিত্রটির পরিণতি : কিন্তু এমন একটা চরিত্র হঠাৎ কেন হারিয়ে যায় ভেবে পাই না! এক-একবার মনে হয় এ যেন লেখকের অবিচার, ইন্দ্রনাথ যেন 'সাহিত্যে উপেক্ষিত'। আবার মনে হয়, লেখক ঠিকই করেছেন, অমন অসাধারণ চরিত্র বোধ হয় বিদ্যুৎ-দীপ্তির মতোই চমক দিয়ে মিলিয়ে যায়, কিন্তু রেখে যায় স্মৃতি, যে-স্মৃতি মন থেকে কখনও মুছে যাবে না।

উপসংহার : ব্যক্তিগত জীবনে এরকম একটি চরিত্রের সান্নিধ্যে লেখক এসেছিলেন বলেই বোধ হয় ইন্দ্রনাথ চরিত্রটিকে তিনি এমন সজীব করে চিত্রিত করতে পেরেছিলেন।

৫. বেতারের ধারাবিবরণী

ভূমিকা : ধারাবিবরণীর উৎসসন্ধানে যেতে হবে মহাভারতে : দিব্যচক্ষু পাওয়া সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চলচ্ছবি দেখছেন আর তার ধারাভাষ্য দিচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে।

বিভিন্ন ধারাবিবরণী : টেলিভিশনে আমরা ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারি, সেখানে চোখ কান দুই-ই পরিতৃপ্ত। কিন্তু বেতারের আবেদন শুধু

আমাদের কানের কাছে। তাই যা আমরা নিজে দেখছি না, অন্যে আমাদের হয়ে দেখছেন তা-ই তাঁর বিবরণীতে প্রকাশিত হলে আমরা তাকেই বলছি ধারাবিবরণী। রাষ্ট্রীয় উৎসব, বিশিষ্ট অতিথির আগমন, খেলাধুলো—সবকিছুর ধারাবিবরণীই এখন আমরা শুনতে পাই রেডিওর কল্যাণে। তবে সব থেকে জনপ্রিয় বোধ হয় খেলার ধারাবিবরণী।

উপযোগিতা : আধুনিক সমাজ-জীবনে সুযোগ-সময়ের অভাবে সর্বত্র উপস্থিতি আমাদের সম্ভব হয় না, অথচ সমাজ-জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা সম্বন্ধে ধারাবিবরণী মারফৎ মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। ক্রিকেট টেস্টে বা গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল খেলার টিকিট পাওয়া এক সমস্যা। মাঠে আর ক'জন যেতে পারেন। তাই ধারাবিবরণী শুনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া উপায় নেই।

উপসংহার : ধারাবিবরণীতে চোখে দেখার আনন্দ না পাওয়া গেলেও উপভোগের অসুবিধে তেমন নেই। যে খেলা দেখেছে, সে কল্পনা দিয়ে অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে পারে।

৬. বৃত্তি নির্বাচন

ভূমিকা : নিজেকে ঠিকমতো বোঝাই অনেক সময় সবচেয়ে কঠিন।

বৃত্তি নির্বাচনের নীতি : তবু নিজের যোগ্যতা বা প্রবণতাকে মোটামুটি বুঝতে হবেই, তা না হলে নিজের জন্যে ঠিক বৃত্তিটি আমরা নির্বাচন করতে পারব না।

বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমস্যা : বৃত্তি নানারকমের আছে ঠিকই, কিন্তু বৃত্তির চাহিদার সঙ্গে যোগানের পরিমাণ তো মেলে না, বেকার সমস্যা তাই এত প্রবল। তাই আমার ঈপ্সিত বৃত্তিই-যে আমি পাব সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই।

উপসংহার : কাজ পাবার সম্ভাবনাই যেখানে কম, সেখানে ঈপ্সিত বৃত্তি না পেলে হা-হুতাশ করার কিছু নেই। যা পেয়েছি তার জন্যেই উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। নিজেকে সর্বাবস্থায় মানিয়ে নেওয়াই জীবন-চর্যার সবচেয়ে বড় আর্ট।

৭. কল্পনা ও বাস্তব

ভূমিকা : কল্পনা ও বাস্তবের সংজ্ঞা : আমরা যা হতে চাই বা যা হলে ভাল হয় বলে ভাবি তাই আমাদের কল্পনা, আর যা সত্যিই ঘটে বা ঘটেছে, হয় বা হচ্ছে, তাই হচ্ছে বাস্তব।

কল্পনা আর বাস্তবের গরমিল : কল্পনা সবসময়েই বাস্তবকে ছাপিয়ে যায়। বাস্তব কল্পনার নাগাল পায় না। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইয়ারো ভ্যালি সম্বন্ধে কল্পনায় যে-ছবি এঁকেছিলেন, সত্যিই যখন সেখানে এলেন সে ছবি ভেঙে গেল। তিনি সখেদে বললেন :

Is this Yarrow—
is this the Stream ?

আমরাও কবির মতো সব সময়েই বলছি এই কি সেই যার সম্বন্ধে এত ভেবেছিলাম ?

উদাহরণ : আমাদের দেশের মনীষীদের আদর্শই ছিল plain living and high thinking আমাদের ছোটো ঘরে বড়ো মন নিয়ে থাকা। বুনো রামনাথের গল্প আমাদের কাছে প্রবাদবাক্যের মত।

অতি সন্তোষের দোষ : অতি সন্তোষ থেকে নিষ্ক্রিয়তা বা আলস্য আসতে পারে। অনেকে বলেন 'অসন্তোষ থেকেই উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি'।

উপসংহার : নিষ্ক্রিয়তা সর্বদাই নিন্দনীয়। আলস্য মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ঠিকই, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর অসন্তোষ তো এক জিনিস নয়। আমি বড়ো হব এ তো সজীব আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যতটা চাইব ততটা না পেলেই মনের অবসাদ যদি আসে তা হলেই তো সর্বনাশ। সন্তোষ সেই সর্বনাশের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

৪. সাহিত্যের একটি চরিত্র

ভূমিকা : সাহিত্যের চরিত্রগুলি আমাদের আপনজনের মতো হয়ে পড়ে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের ফটিক, বিভূতিভূষণের অপু, শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ। আমার অতি প্রিয় চরিত্র ইন্দ্রনাথ।

চরিত্রটির পরিচয় : ইন্দ্রনাথ একটি কিশোর চরিত্র। শ্রীকান্তের সঙ্গে তার হঠাৎ পরিচয়। দুর্দান্ত সাহসী ছেলে ইন্দ্রনাথ। না আছে বাঘের ভয়, না আছে সাপের ভয়, না আছে কোনো মানুষের ভয়। হ্যাঁ, মাছ চুরি সে করত বটে, কিন্তু নিজের কোনো প্রয়োজনের জন্যে নয়, অন্নদাদিদির জন্যে। অন্যের জন্যে যে-কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতেও সে কুণ্ঠিত হত না। তার কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ আমাদের বিস্মিত করে। শ্রীকান্ত যখন বিস্মিত কণ্ঠে বলে : 'এ হৃদয় কী দিয়া কে গড়িয়াছিল ?' তখন তার প্রশ্নের সঙ্গে আমরাও বিস্মিত কণ্ঠ মেলাই।

চরিত্রটির পরিণতি : কিন্তু এমন একটা চরিত্র হঠাৎ কেন হারিয়ে যায় ভেবে পাই না! এক-একবার মনে হয় এ যেন লেখকের অবিচার, ইন্দ্রনাথ যেন 'সাহিত্যে উপেক্ষিত'। আবার মনে হয়, লেখক ঠিকই করেছেন, অমন অসাধারণ চরিত্র বোধ হয় বিদ্যুৎ-দীপ্তির মতোই চমক দিয়ে মিলিয়ে যায়, কিন্তু রেখে যায় স্মৃতি, যে-স্মৃতি মন থেকে কখনও মুছে যাবে না।

উপসংহার : ব্যক্তিগত জীবনে এরকম একটি চরিত্রের সান্নিধ্যে লেখক এসেছিলেন বলেই বোধ হয় ইন্দ্রনাথ চরিত্রটিকে তিনি এমন সজীব করে চিত্রিত করতে পেরেছিলেন।

৫. বেতারের ধারাবিবরণী

ভূমিকা : ধারাবিবরণীর উৎসসন্ধানে যেতে হবে মহাভারতে : দিব্যচক্ষু পাওয়া সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চলচ্ছবি দেখছেন আর তার ধারাভাষ্য দিচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে।

বিভিন্ন ধারাবিবরণী : টেলিভিশনে আমরা ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারি, সেখানে চোখ কান দুই-ই পরিতৃপ্ত। কিন্তু বেতারের আবেদন শুধু

আমাদের কানের কাছে। তাই যা আমরা নিজে দেখছি না, অন্যে আমাদের হয়ে দেখছেন তা-ই তাঁর বিবরণীতে প্রকাশিত হলে আমরা তাকেই বলছি ধারাবিবরণী। রাষ্ট্রীয় উৎসব, বিশিষ্ট অতিথির আগমন, খেলাধুলো—সবকিছুর ধারাবিবরণীই এখন আমরা শুনতে পাই রেডিওর কল্যাণে। তবে সব থেকে জনপ্রিয় বোধ হয় খেলার ধারাবিবরণী।

উপযোগিতা: আধুনিক সমাজ-জীবনে সুযোগ-সময়ের অভাবে সর্বত্র উপস্থিতি আমাদের সম্ভব হয় না, অথচ সমাজ-জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা সম্বন্ধে ধারাবিবরণী মারফৎ মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। ক্রিকেট টেস্ট বা গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল খেলার টিকিট পাওয়া এক সমস্যা। মাঠে আর ক'জন যেতে পারেন। তাই ধারাবিবরণী শুনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া উপায় নেই।

উপসংহার: ধারাবিবরণীতে চোখে দেখার আনন্দ না পাওয়া গেলেও উপভোগের অসুবিধে তেমন নেই। যে খেলা দেখেছে, সে কল্পনা দিয়ে অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে পারে।

৬. বৃত্তি নির্বাচন

ভূমিকা: নিজেকে ঠিকমতো বোঝাই অনেক সময় সবচেয়ে কঠিন।

বৃত্তি নির্বাচনের নীতি: তবু নিজের যোগ্যতা বা প্রবণতাকে মোটামুটি বুঝতে হবেই, তা না হলে নিজের জন্যে ঠিক বৃত্তিটি আমরা নির্বাচন করতে পারব না।

বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমস্যা: বৃত্তি নানারকমের আছে ঠিকই, কিন্তু বৃত্তির চাহিদার সঙ্গে যোগানের পরিমাণ তো মেলে না, বেকার সমস্যা তাই এত প্রবল। তাই আমার ঈপ্সিত বৃত্তিই-যে আমি পাব সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই।

উপসংহার: কাজ পাবার সম্ভাবনাই যেখানে কম, সেখানে ঈপ্সিত বৃত্তি না পেলে হা-হুতাশ করার কিছু নেই। যা পেয়েছি তার জন্যেই উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। নিজেকে সর্বাবস্থায় মানিয়ে নেওয়াই জীবন-চর্যার সবচেয়ে বড় আর্ট।

৭. কল্পনা ও বাস্তব

ভূমিকা: কল্পনা ও বাস্তবের সংজ্ঞা: আমরা যা হতে চাই বা যা হলে ভাল হয় বলে ভাবি তাই আমাদের কল্পনা, আর যা সত্যিই ঘটে বা ঘটেছে, হয় বা হচ্ছে, তাই হচ্ছে বাস্তব।

কল্পনা আর বাস্তবের গরমিল: কল্পনা সবসময়েই বাস্তবকে ছাপিয়ে যায়। বাস্তব কল্পনার নাগাল পায় না। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইয়ারো ভ্যালি সম্বন্ধে কল্পনায় যে-ছবি এঁকেছিলেন, সত্যিই যখন সেখানে এলেন সে ছবি ভেঙে গেল। তিনি সখেদে বললেন:

> Is this Yarrow—
> is this the Stream?

আমরাও কবির মতো সব সময়েই বলছি এই কি সেই যার সম্বন্ধে এত ভেবেছিলাম?

উদাহরণ : আমাদের দেশের মনীষীদের আদর্শই ছিল plain living and high thinking আমাদের ছোটো ঘরে বড়ো মন নিয়ে থাকা। বুনো রামনাথের গল্প আমাদের কাছে প্রবাদবাক্যের মত।

অতি সন্তোষের দোষ : অতি সন্তোষ থেকে নিষ্ক্রিয়তা বা আলস্য আসতে পারে। অনেকে বলেন 'অসন্তোষ থেকেই উন্নতি বা শ্রীবৃদ্ধি'।

উপসংহার : নিষ্ক্রিয়তা সর্বদাই নিন্দনীয়। আলস্য মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু ঠিকই, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষা আর অসন্তোষ তো এক জিনিস নয়। আমি বড়ো হব এ তো সজীব আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু যতটা চাইব ততটা না পেলেই মনের অবসাদ যদি আসে তা হলেই তো সর্বনাশ। সন্তোষ সেই সর্বনাশের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করে।

৪. সাহিত্যের একটি চরিত্র

ভূমিকা : সাহিত্যের চরিত্রগুলি আমাদের আপনজনের মতো হয়ে পড়ে। যেমন, রবীন্দ্রনাথের ফটিক, বিভূতিভূষণের অপু, শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথ। আমার অতি প্রিয় চরিত্র ইন্দ্রনাথ।

চরিত্রটির পরিচয় : ইন্দ্রনাথ একটি কিশোর চরিত্র। শ্রীকান্তের সঙ্গে তার হঠাৎ পরিচয়। দুর্দান্ত সাহসী ছেলে ইন্দ্রনাথ। না আছে বাঘের ভয়, না আছে সাপের ভয়, না আছে কোনো মানুষের ভয়। হ্যাঁ, মাছ চুরি সে করত বটে, কিন্তু নিজের কোনো প্রয়োজনের জন্যে নয়, অন্নদাদিদির জন্যে। অন্যের জন্যে যে-কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতেও সে কুণ্ঠিত হত না। তার কর্তব্য ও দায়িত্ববোধ আমাদের বিস্মিত করে। শ্রীকান্ত যখন বিস্মিত কণ্ঠে বলে : 'এ হৃদয় কী দিয়া কে গড়িয়াছিল ?' তখন তার প্রশ্নের সঙ্গে আমরাও বিস্মিত কণ্ঠ মেলাই।

চরিত্রটির পরিণতি : কিন্তু এমন একটা চরিত্র হঠাৎ কেন হারিয়ে যায় ভেবে পাই না! এক-একবার মনে হয় এ যেন লেখকের অবিচার, ইন্দ্রনাথ যেন 'সাহিত্যে উপেক্ষিত'। আবার মনে হয়, লেখক ঠিকই করেছেন, অমন অসাধারণ চরিত্র বোধ হয় বিদ্যুৎ-দীপ্তির মতোই চমক দিয়ে মিলিয়ে যায়, কিন্তু রেখে যায় স্মৃতি, যে-স্মৃতি মন থেকে কখনও মুছে যাবে না।

উপসংহার : ব্যক্তিগত জীবনে এরকম একটি চরিত্রের সান্নিধ্যে লেখক এসেছিলেন বলেই বোধ হয় ইন্দ্রনাথ চরিত্রটিকে তিনি এমন সজীব করে চিত্রিত করতে পেরেছিলেন।

৫. বেতারের ধারাবিবরণী

ভূমিকা : ধারাবিবরণীর উৎসসন্ধানে যেতে হবে মহাভারতে : দিব্যচক্ষু পাওয়া সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চলচ্ছবি দেখছেন আর তার ধারাভাষ্য দিচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্রের কাছে।

বিভিন্ন ধারাবিবরণী : টেলিভিশনে আমরা ঘটে যাওয়া ব্যাপারগুলো প্রত্যক্ষ করতে পারি, সেখানে চোখ কান দুই-ই পরিতৃপ্ত। কিন্তু বেতারের আবেদন শুধু

আমাদের কানের কাছে। তাই যা আমরা নিজে দেখছি না, অন্যে আমাদের হয়ে দেখছেন তা-ই তাঁর বিবরণীতে প্রকাশিত হলে আমরা তাকেই বলছি ধারাবিবরণী। রাষ্ট্রীয় উৎসব, বিশিষ্ট অতিথির আগমন, খেলাধুলো—সবকিছুর ধারাবিবরণীই এখন আমরা শুনতে পাই রেডিওর কল্যাণে। তবে সব থেকে জনপ্রিয় বোধ হয় খেলার ধারাবিবরণী।

উপযোগিতা: আধুনিক সমাজ-জীবনে সুযোগ-সময়ের অভাবে সর্বত্র উপস্থিতি আমাদের সম্ভব হয় না, অথচ সমাজ-জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কোনো ঘটনা সম্বন্ধে ধারাবিবরণী মারফৎ মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়। ক্রিকেট টেস্টে বা গুরুত্বপূর্ণ ফুটবল খেলার টিকিট পাওয়া এক সমস্যা। মাঠে আর ক'জন যেতে পারেন। তাই ধারাবিবরণী শুনে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানো ছাড়া উপায় নেই।

উপসংহার: ধারাবিবরণীতে চোখে দেখার আনন্দ না পাওয়া গেলেও উপভোগের অসুবিধে তেমন নেই। যে খেলা দেখেছে, সে কল্পনা দিয়ে অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করে তুলতে পারে।

৬. বৃত্তি নির্বাচন

ভূমিকা: নিজেকে ঠিকমতো বোঝাই অনেক সময় সবচেয়ে কঠিন।

বৃত্তি নির্বাচনের নীতি: তবু নিজের যোগ্যতা বা প্রবণতাকে মোটামুটি বুঝতে হবেই, তা না হলে নিজের জন্যে ঠিক বৃত্তিটি আমরা নির্বাচন করতে পারব না।

বৃত্তি নির্বাচনের ক্ষেত্রে সমস্যা: বৃত্তি নানারকমের আছে ঠিকই, কিন্তু বৃত্তির চাহিদার সঙ্গে যোগানের পরিমাণ তো মেলে না, বেকার সমস্যা তাই এত প্রবল। তাই আমার ঈপ্সিত বৃত্তিই-যে আমি পাব সে বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা নেই।

উপসংহার: কাজ পাবার সম্ভাবনাই যেখানে কম, সেখানে ঈপ্সিত বৃত্তি না পেলে হা-হুতাশ করার কিছু নেই। যা পেয়েছি তার জন্যেই উপযোগী হয়ে উঠতে হবে। নিজেকে সর্বাবস্থায় মানিয়ে নেওয়াই জীবন-চর্যার সবচেয়ে বড় আর্ট।

৭. কল্পনা ও বাস্তব

ভূমিকা: কল্পনা ও বাস্তবের সংজ্ঞা: আমরা যা হতে চাই বা যা হলে ভাল হয় বলে ভাবি তাই আমাদের কল্পনা, আর যা সত্যিই ঘটে বা ঘটেছে, হয় বা হচ্ছে, তাই হচ্ছে বাস্তব।

কল্পনা আর বাস্তবের গরমিল: কল্পনা সবসময়েই বাস্তবকে ছাপিয়ে যায়। বাস্তব কল্পনার নাগাল পায় না। কবি ওয়ার্ডসওয়ার্থ ইয়ারো ভ্যালি সম্বন্ধে কল্পনায় যে-ছবি এঁকেছিলেন, সত্যিই যখন সেখানে এলেন সে ছবি ভেঙে গেল। তিনি সখেদে বললেন:

Is this Yarrow—
is this the Stream?

আমরাও কবির মতো সব সময়েই বলছি এই কি সেই যার সম্বন্ধে এত ভেবেছিলাম?

কল্পনার প্রয়োজনীয়তা : কল্পনা বাস্তবের নাগাল না পেলেও কল্পনা করার নিজস্ব একটা আনন্দ আছে। তা ছাড়া, কল্পনাই অনেক ক্ষেত্রে বাস্তবের জন্ম দেয়। মানুষ আকাশেও উড়ল, চাঁদেও পা দিল। কিন্তু এই অবিশ্বাস্য বাস্তবের গোড়াতে তো শুধু কল্পনাই ছিল।

উপসংহার : মানুষ বিফল স্বপ্ন দেখবে, কল্পনা করবে। আর সেই কল্পনা থেকেই জন্ম নেবে নতুন পৃথিবী।

৮. গুরু নানক

ভূমিকা : কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আসো, সাধক ওগো, প্রেমিক ওগো……

জন্ম ও শৈশব : জন্ম ১৪৬৯ খ্রীস্টাব্দে, লাহোর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে তালওয়ান্দি গ্রামে।

মা তৃপ্তা। বাবা কালু। তিনি ছিলেন ব্যবসায়ী ও কৃষিজীবী। হিসাব পরীক্ষার কাজও তিনি করতেন। পাঁচ বছর বয়সেই শাস্ত্রীয় ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে ব্যুৎপত্তির পরিচয় দেন। পার্থিব সম্পদের প্রতি তাঁর বৈরাগ্য বাল্য থেকেই।

কর্মজীবন : নানকের মতিগতি দেখে নিরাশ হয়ে তাঁর বাবা-মা তাঁকে পাঠালেন বোন নানকির বাড়িতে। ভগিনীপতি জয়রামের সুপারিশে সুলতানপুরে সরকারী চাকরি হল তাঁর। সুলতান দৌলত খাঁও সন্তুষ্ট হলেন তাঁর প্রতি। কিন্তু এখানেও বেশিদিন থাকা নানকের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠল না।

ঈশ্বরোপলব্ধি : রোজ রাবি নদীতে স্নান করতে যেতেন নানক। একদিন স্নানান্তে তিনি ঈশ্বরকে অনুভব করলেন। পৃথিবীকে নতুন দৃষ্টিতে দেখলেন তিনি। বুঝলেন, হিন্দু বা মুসলমান বলে পৃথক কোনো সন্তান নেই। সবাই ঈশ্বরের সন্তান। ঈশ্বর এক।

পরিব্রজ্যা : এরপর নানক সারা ভারত পরিভ্রমণ করে বহু সাধু-সন্তের সান্নিধ্যে এলেন এবং তাঁর নিজস্ব মত প্রচার করলেন।

ধর্মমত : তাঁর শিষ্যদের নাম হল শিখ। পবিত্রতা, নিস্তব্ধতা, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, সৎসঙ্গ ইত্যাদি আট রকম অভ্যাসের উপর জোর দিলেন তিনি। এই অভ্যাসই হল মন্ত্র। তাঁর সঙ্গীত ও বাণীগুলি জপুজী, পাট্টি প্রমুখ পাঁচটি গ্রন্থে সঙ্কলিত।

নানকের তিরোভাব সম্পর্কে কিংবদন্তী : তিরোভাবের পর দাহ না অন্ত্যেষ্টি এই নিয়ে হিন্দু-মুসলমানের দ্বিধা। আচ্ছাদন তোলা হলে দেখা গেল দুই সম্প্রদায়ের দেওয়া ফুল পড়ে আছে, দেহ অন্তর্হিত।

৯. চরিত্রগঠন

ভূমিকা : চরিত্রই মানুষের সম্পদ।

চরিত্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা : ধন নয়, পাণ্ডিত্য নয়, ক্ষমতা বা প্রভুত্ব নয়, চরিত্রই মানুষের প্রধান পরিচয়, প্রধান অবলম্বন। কীর্তি বা খ্যাতি আর কিছুই নয়,

লোকে আমাদের সম্বন্ধে কী ভাবে তারই নিরিখ। পৃথিবীতে সবই নশ্বর, শুধু সচ্চরিত্রের প্রভাবই অবিনশ্বর।

চরিত্রগঠনের উপাদান:

১. চরিত্রবান মানুষের সান্নিধ্য, ২. সদ্গ্রন্থ পাঠ, ৩. কোন আদর্শের প্রভাব, ৪. সদভ্যাস ও নীতিবোধ, ৫. মহাপুরুষদের জীবনী অধ্যয়ন।

উপসংহার: বাল্য বা কৈশোরেই কোন উচ্চ-আদর্শকে সম্মুখে রেখে অগ্রসর হতে হবে:

যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।

১০. স্মৃতিশক্তি

ভূমিকা: স্মৃতিশক্তি মানুষের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের একটি বিশিষ্ট সম্পদ।

উপযোগিতা: এই শক্তি না থাকলে অতীতের সঙ্গে বর্তমানের যোগসূত্রই স্থাপিত হত না। পূর্বাপর স্মৃতিই আমাদের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপে সহায়ক হচ্ছে।

কাজের জগতে এ শক্তি অপরিহার্য। ভালো স্মৃতিশক্তি ছাত্র, শিক্ষক, চিকিৎসক, শিল্পী, বিজ্ঞানী, বক্তা সকলের পক্ষেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। বস্তুত বহু সাফল্যের মূলেই সংগোপনে কাজ করে চলেছে স্মৃতিশক্তি।

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর উপায়: যে-কোনো শক্তি বাড়াতে হলে যেমন অনুশীলন প্রয়োজন স্মৃতিশক্তির ক্ষেত্রেও তাই।

উপসংহার: স্মৃতিশক্তি অনেক সময় স্বাধীন চিন্তা বা মননশক্তির ব্যাঘাত ঘটাতে পারে। সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।

১১. অটোমেশন বা মানুষ বনাম কল

যন্ত্রের জন্ম ও তার ফল: মানুষের মঙ্গলচেতনা থেকে যন্ত্রের জন্ম। মানুষের শক্তিবৃদ্ধি এবং সুখশান্তি ও স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির প্রয়োজনেই এল যন্ত্রযুগ—অটোমেশন এর সাম্প্রতিকতম অবদান।

যন্ত্রের শক্তি ও মানবসেবা: শ্রমলাঘবের জন্যে যন্ত্রের জন্ম হল শিল্প-বিপ্লবেরও আগে। যন্ত্র চালিত হয়েছে নানা শক্তিতে, কখনও পশুর দ্বারা, বায়ু, বাষ্প দ্বারা, বৈদ্যুতিক শক্তি ও পারমাণবিক শক্তি দ্বারা। ব্যবহার—রাস্তা তৈরি, সেতুনির্মাণ, পরিবহণ, কৃষি ও খনির কাজে, আবহাওয়া নিয়ন্ত্রণে, রোগের আরোগ্যে।

মানুষের বিরোধী ভূমিকায় যন্ত্র: সভ্যতার অভিশাপ ও অর্থ নৈতিক শোষণ: যন্ত্রের সঙ্গে মানুষের সংঘর্ষ অনিবার্য। যান্ত্রিকতার একঘেয়েমি মানুষের বৈচিত্র্য হরণ করে। যন্ত্রনির্ভর মানুষ নিজের শক্তিকে ধ্বংস করেছে। বড়ো বড়ো কল-কারখানা ছোটো ছোটো কুটিরশিল্পকে ধ্বংস করে, ফলে বেকারত্ব বৃদ্ধি পায়। ধন এক জায়গায় গিয়ে জমতে থাকে, সমভাবে বণ্টিত হয় না।

অটোমেশনের সপক্ষে যুক্তি: জাতিকে যান্ত্রিক সিদ্ধির ফললাভ থেকে বঞ্চিত রাখা উচিত নয়। বিজ্ঞানকে অস্বীকার করা বৈজ্ঞানিক যুগে প্রগতিবিরোধী।

অটোমেশনে অপচয় রোধ হয়, উৎপাদন-ব্যয় হ্রাস পায়, ক্লান্তিকর একঘেয়েমির হাত থেকে বাঁচা যায়, টাকাপয়সার নির্ভুল হিসাব করা যায়।

অটোমেশনের বিপক্ষে যুক্তি : মানুষের কাজ কমিয়ে বেকারসমস্যা বৃদ্ধি, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়, প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত যন্ত্রের অভাব, প্রশাসনিক নৈপুণ্যের অভাব।

তবু যন্ত্রবিচ্ছেদ অসম্ভব : তবু যন্ত্রকে বাদ দিতে পারে না মানুষ—এই সভ্যতা যন্ত্রের দান।

১২. বনমহোৎসব

ভূমিকা : অরণ্য ছিল আর্য-সভ্যতার প্রাণ। ভারতের প্রাচীন সভ্যতার ভূমিকায় অরণ্যের প্রভাব সুদূরপ্রসারী। রামায়ণ-মহাভারতে তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত আছে।

অরণ্যের উচ্ছেদে অপকার : অরণ্য বিনাশের ফলে বৃষ্টিহীনতা, মৃত্তিকাক্ষয় ও প্রয়োজনীয় গাছপালার অবলুপ্তি ঘটে।

অরণ্যের উপকারিতা : অরণ্য নানাভাবে মানুষের কাজে লাগে। অরণ্য মানুষকে দেয় কাঠ, জ্বালানি, কাগজ, তেল, ঔষধ, জৈবসার। অরণ্যের জন্যে জলবায়ু আর্দ্র থাকে, সমভাবাপন্নতা লাভ করে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য হল অরণ্যের সবচেয়ে বড়ো অবদান। তাই অরণ্যসংক্ষরণ পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

বনমহোৎসবের সূচনা : ১৯৫০-এ বৃক্ষরোপণ উৎসবের জন্ম। অবশ্য সরকারী ভাবে। কারণ বৃক্ষরোপণ প্রাচীন ভারতীয় উৎসব। বৃক্ষরোপণের উপযোগিতা সম্বন্ধে সাধারণের মধ্যে প্রচার একান্ত প্রয়োজনীয়।

বিদেশে অরণ্যসম্পদ, এর অর্থনৈতিক দিক : বিদেশে, বিশেষ করে কানাডা, রাশিয়া, নরওয়ে প্রভৃতি দেশে অরণ্য হল সম্পদ। তাদের অরণ্যসংরক্ষণে মেলে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়। বৃক্ষরোপণে হয় সম্পদবৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি।

মানবজীবন ও বৃক্ষ : ভারতীয় সভ্যতায় বৃক্ষের একটি বিশেষ স্থান আছে। রবীন্দ্রনাথও শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ উৎসবের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বর্তমান সরকারী বনমহোৎসবের অনেক আগে।

১৩. সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও তার প্রয়োজনীয়তা

অবসরের মূল্য : কাজের চাকায় মানুষ বাঁধা—এই কাজের একঘেয়েমি থেকে মাঝে মাঝে তার মন মুক্তি চায়। বিশ্রামই সেই কাজ থেকে মুক্তি আনে,—কিন্তু বিশ্রাম মানে কুঁড়ের মতো বসে থাকা নয়—নিজের খেয়াল মতো কাজ করাও বিশ্রাম। কাজের ফাঁকে কেউ খেলা করে, ঘোড়ায় চড়ে, এটাও বিশ্রাম।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নানা রূপ : সংস্কৃতি কথাটি ব্যাপক—তাই এই

অনুষ্ঠান নানা জাতের হতে পারে : নাচ, গান, সাহিত্যসভা, নাট্যাভিনয়, বিতর্ক, জাদুপ্রদর্শনী ইত্যাদি। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান প্রায় সারা বছর ধরেই চলে—কলেজ, অফিস, কারখানা সর্বত্রই অনুষ্ঠান হয়। সর্বত্রই সাংস্কৃতিক উপ-সমিতির দ্বারা নানা অনুষ্ঠান পালিত হয় : রবীন্দ্র-নজরুল-জন্মোৎসব—বসন্ত উৎসব—বর্ষামঙ্গল—নেতাজী জন্ম দিবস—স্বাধীনতা দিবস।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের উপযোগিতা : সংস্কৃতির নানা দিকের সঙ্গে পরিচয় ঘটে : বরিশালের জারী, মালদার গম্ভীরা, বীরভূমের ভাদু—এই সব অনুষ্ঠানই কলকাতায় বসে রেডিও-তে শোনা যায় এবং পল্লী-সংস্কৃতির ঐশ্বর্যের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অবসরবিনোদনের চৌকাঠ পেরিয়ে বৃহৎ জগতের সঙ্গে মানুষের পরিচয় ঘটিয়েছে।

স্কুল-কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান কেমন হওয়া উচিত : স্কুলে, বিশেষ করে কলেজে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নাম করে অনেক টাকা খরচ হয়। ছাত্ররা বাইরের শিল্পী এনে অনুষ্ঠান করে টাকা খরচ করে, কিন্তু তার পরিবর্তে নিজেরাই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করলে তাদের সৃজনী প্রতিভার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটতে পারে।

১৪. একটি গ্রাম্য যাত্রা

'গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে'—ঝড়ের আগে যাত্রার সংবাদ রটে যায়। গ্রামের মানুষ একটি অথবা দু'টি রাতের জন্যে দিন গুণতে থাকে। তারপর নির্ধারিত দিনে গোরুরগাড়ি বোঝাই বড়ো বড়ো বাক্সো-প্যাটরা নিয়ে নটের দল গ্রামে এসে উপস্থিত হয়।

সেদিন কাজে মন বসে না কারোই। কৃষক তার মাঠে কাজ করার ফাঁকে ঘন ঘন আকাশের দিকে তাকায়। আকাশে মেঘ করলে মনেও নিরাশার মেঘ জমতে থাকে। তারপর সন্ধ্যে হয়। সকাল সকাল খেয়েদেয়ে লণ্ঠন হাতে সারবন্দী মানুষ ছেলে-বুড়ো তরুণ-তরুণী যাত্রা শুনতে আসে। 'হাটখোলা', 'চণ্ডীমণ্ডপ', 'বারোয়ারিতলা'—হাজাক বাতি জেলে ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকে।

এরপর শুরু হয় জায়গা দখলের লড়াই। কে আগে বসবে এই নিয়ে চলে যুদ্ধ। যারা আগেভাগে মাদুর-চাটাই পেতে জায়গা দখল করে রাতের খাবার খেতে বা বাড়ির লোক আনতে গিয়েছিল তারা ফিরে এসে দেখে তাদের আগেভাগে রাখা জায়গা ও-পাড়ার ঘোষেরা অথবা চাটুজ্যেবাড়ির সেজগিন্নী তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে দখল করে বসেছে। তর্কাতর্কি ঠেলাঠেলি দেখে মনে হয় এরা সব যাত্রা শুনতে আসে নি, কয়েক হাত জমি দখল করতে এসেছে।

কখন সখীরা আসবে? কোলের ছোট্ট মেয়েটা প্রশ্ন করে ওর মাকে। ঘোমটা-টানা নোলকপরা কৃষাণ বধূও সে কথা জানে না। সহসা শোনা যায় আসরে যন্ত্র পড়েছে। মুহূর্তে ঠেলাঠেলি চেঁচামেচি থেমে যায়। এই বুঝি শুরু হয়ে গেল। কনসার্ট বাজে। উজ্জ্বল চোখে মানুষগুলি তাকিয়ে থাকে যেন চোখ দিয়ে গান শুনছে ওরা। একবার বাজে

আবার থামে, আবার বাজে আবার থামে, তার ফাঁকে উঠে গিয়ে পান-বিড়ির দোকানে ঘুরে আসে ওরা। ঘন ঘন পান খায়, হাতপাখা চালিয়ে বাতাস করে—তবু যে আরম্ভ হল না। উৎসাহী ছেলেরা সাজঘরে ঘুরে খবর আনে কেমন পোশাক, কেমন ঝক্‌ঝকে অস্ত্র, আর ভীম সেজেছে যে লোকটা, মরলে তাকে গরুরগাড়ি ভিন্ন কেউ শ্মশানে নিতে পারবে না।

সহসা ঘুঙুরপায়ে সাজঘর থেকে সখীরা বেরিয়ে আসে। দর্শকদের বুকেও বুঝি ঘুঙুর বাজতে থাকে। হঠাৎ ঘুমিয়ে-পড়া ছোট্ট ছেলেকে জাগিয়ে দিয়ে তার মা বলে 'ওই দেখ'। শুরু হয়ে যায় যাত্রা। ঘন ঘন হাততালি, আর নানারকম মন্তব্য শোনা যায় 'এনকোর এনকোর', 'ঘুরে ঘুরে ভাই'। গ্রামের মানুষ অবশ্য পৌরাণিক যাত্রা দেখতেই বেশি পছন্দ করে, তারপর ঐতিহাসিক। এসব যাত্রায় সাজ-সজ্জার ঘটা থাকে। আর থাকে যুদ্ধ। যুদ্ধ দেখবার জন্যেই অনেকে আবার যাত্রা শুনতে আসে।

যাত্রা শেষ হতে হতে ভোরের আলো ফুটে ওঠে। তারপর ঘরে গিয়ে রাতজাগা চোখে বেলা অবধি ঘুম। পরদিন যাত্রাওয়ালা ছেলেরা হয়ে ওঠে গ্রামের দর্শনীয়। এবাড়ি ওবাড়ি থেকে ওদের ডেকে ডেকে খাওয়ায়, যাত্রায় শোনা ওদের মুখের গান ঘরে বসে শোনে। আবার সন্ধ্যা ও হ্যাজাক্‌জ্বালা রাতের জন্যে অপেক্ষা করে থাকে।

নটের দল চলে যায়, কিন্তু তাদের গান, তাদের অভিনয় কখনও মানুষের মনে, কখনও মুখে মুখে ফিরতে থাকে। তরুণ কৃষক মাঠে চাষ করতে করতে সহসা আকাশের দিকে তাকিয়ে গেয়ে ওঠে "ছোট্ট আমার পানসিখানি মস্ত বড় গাং।"

১৫. শৈশবস্মৃতি

পারিবারিক এ্যালবাম দেখতে দেখতে হঠাৎ খোকা তার বাবাকে বলল—এই ছোট্ট ছেলেটা কে, পেটের ওপর মস্ত মাদুলী ঝুলছে, হাড়সার চেহারা! বাবা গম্ভীর হয়ে গেলেন। এ্যালবামের পাতা উল্টে গেলেন অনেক বছর পেরিয়ে।

এই ছোট্ট ছেলের মতো আমাদের মনের এ্যালবামের পাতা উল্টে গেলে কত সুখ-দুঃখের কত হাসিকান্নার ছবি বেরিয়ে পড়ে। গ্রামের ছোট্ট বাড়িটা, সঙ্গীসাথী যারা একমুহূর্তে চোখের আড়াল হলে মন কেমন করত, তারা আজ কোথায়? হয়তো একটা কুকুর ছিল, কুলীন নয়,—বঙ্গজ, রাস্তা থেকে কুড়িয়ে আনা। সেটাকে পরম যত্নে কোলে করে ঘুরে বেড়ানোর কথা আজ কি ভাবা যায়? না কেউ ভাবতে পারে, টাকমাথা প্রৌঢ় লোকটি একটা নেড়ি কুকুর কোলে নিয়ে বেড়াচ্ছে!

কিন্তু শৈশবের সেই সোনালী দিনে সবই ছিল সম্ভব। কত অল্প প্রাপ্তিতে মন উঠত ভরে। বিভূতিবাবুর অপুর মতো সব অপুরাই ভাবে বড়ো হলে একটা তামাকের দোকান করবে আষাঢ়ুর হাটে। অবসর সময়ে রামায়ণ-মহাভারত পড়া, রাত্রে যাত্রা শুনতে যাওয়া, ছোট্ট হাঁড়িতে মাছের ঝোল রান্না করে খাওয়া। বড়োদের মতো শহর-বাজারে অফিস-আদালতে কাজ করতে যাবে না।

'পরের দ্রব্য না বলিয়া লইলে চুরি করা হয়।' কিন্তু 'এতটুকু শশা নিলে চুরি করা হয় ?' পড়ে কী ভালো লেগেছে শরৎবাবুকে। মনে হয়েছে পুজো করি। এই রামলাল আমরা অনেকেই। আমচুরি, লিচুচুরির কথা আজ আর মনে পড়ে না, মনে পড়ে না নদী পেরিয়ে অমাবস্যার রাত্রে যাত্রা শুনতে যাবার কথা। কিন্তু শৈশবের যে-ছবিগুলি মনের এ্যালবামে লাগানো আছে—তাদের মানুষ ভুলবে কেমন করে ? খিদের মুখে কতদিন অফিসফিরতি পথে রেস্তোরাঁয় ঢুকে চপ-কাটলেটে কামড় বসাতে গিয়ে অন্যমনস্ক হতে হয়। মনে পড়ে স্কুল থেকে ফিরে এলে মায়ের হাতে চিঁড়ে-মুড়ির পাত্রটার কথা! সে কী অমৃত ? কে জানে! মনে পড়ে মায়ের লালপাড় শাড়িটার কথা, শৈশবের অন্ধকারে আজও যা আছে উজ্জ্বল হয়ে। আর সেই গয়লাদের বুড়ীটা কী যেন নাম, যে নাকি মানুষ করেছিল শৈশবে, সেও কি আসে না চুপি চুপি রোগশয্যার পাশে ?

শৈশবস্মৃতি মধুর। লিখতে গিয়ে কখন নিজেই চলে গেছি নিজের শৈশবের দিন-গুলিতে। এখন পুরনো এ্যালবামের পাতাটা বন্ধ করি।

১৬. সামাজিক কুসংস্কার

কুসংস্কারের সংজ্ঞা : আধুনিক জীবনযাত্রায় পুরানো আচার-বিশ্বাসের জের—আধুনিক জীবনযাত্রার অন্তরায়, সামাজিক প্রগতির বাধাস্বরূপ।

কুসংস্কারের শ্রেণীভেদ : জাতি ও বর্ণগত কুসংস্কার উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণে, ব্রাহ্মণ-কায়স্থ-বৈদ্য প্রভৃতির ক্ষেত্রে সামাজিক বৈষম্য—বিয়ে ও খাওয়া-দাওয়ায় জাতি-বিচার। অস্পৃশ্যতা—নিম্নবর্ণের মানুষের প্রতি উচ্চ সম্প্রদায়ের জন্মগত ঘৃণা ও তাচ্ছিল্য-বোধ—ফলে দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিভেদ ও দুর্বলতা।

নারীজাতি সম্পর্কে বহু প্রচলিত কুসংস্কার : সতীদাহ, বিধবার বিয়ে, স্ত্রীশিক্ষা ও নারী প্রগতির পথে বাধা হল কুসংস্কার—নারী-পুরুষের সামাজিক বৈষম্যে বিশ্বাস—নারীকে অন্তঃপুরে বন্দী করে রাখবার অযৌক্তিক ধারণা।

সাম্প্রদায়িক কুসংস্কার : বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর ঘৃণার ভাব—সম্প্রদায়গত উৎকর্ষের অর্থহীন দাবি।

আচার-আচরণ কুসংস্কার : জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি বহু অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত—অধিকাংশই অর্থহীন ও হাস্যকর।

তিথি-নক্ষত্র-সংক্রান্ত কুসংস্কার : হাঁচি, টিকটিকি, মঘা, অশ্লেষা, দিকশূল প্রভৃতি।

স্বাস্থ্যবিধি-সংক্রান্ত : কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি রোগ দূর করার জন্যে বিভিন্ন দেবদেবীর পুজো ও ঝাড়ফুঁক।

সমাজ জীবনে কুসংস্কারের ক্ষতিকর প্রভাব : জাতিগত কূপমণ্ডূকতা এবং প্রগতিশীল চিন্তাধারার প্রতি বিমুখতা—শক্তির অপচয়—শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অযৌক্তিক বিশ্বাস।

প্রতিকারের উপায়ঃ বিজ্ঞানসম্মত শিক্ষা—মননে এবং আচরণে কঠোর যুক্তিনিষ্ঠা।

১৭. বাংলার জীবজন্তু

ভূমিকাঃ দেশভেদে প্রাকৃতিক পরিবেশের বৈচিত্র্য ও জীবজন্তুর বিভিন্নতা—বাংলাদেশের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—বর্ষাস্নিগ্ধ নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ু—তৃণগুল্ম-পাদপের শ্যামলতা—দক্ষিণে সুন্দরবন ও উত্তরে তরাই বনাঞ্চল—এখানকার জীব-জন্তুর বৈচিত্র্য।

গৃহপালিত জীবঃ গোরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, হাতি, কুকুর, বেড়াল, ঘোড়া ইত্যাদি—মানুষের জীবনযাত্রায় এইসব প্রাণীর স্থান।

বাংলার পাখিঃ গৃহপালিত পাখির মধ্যে হাঁস, মুরগী, পায়রা, টিয়া, চন্দনা, ময়না, বুলবুল, কাকাতুয়া—এইসব পাখির কথা বলতে হবে।

হিংস্র পশুঃ জলে কুমীর আর ডাঙায় বাঘ—সাপ ও অন্য সরীসৃপ—শেয়াল, হাতি, গণ্ডার, ভালুক। দেশের জীবসম্পদ ও আমাদের দায়িত্ব—বন্যপ্রাণী রক্ষার প্রয়োজনীয়তা—বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ সপ্তাহ।

উপসংহার।

১৮. শান্তির সন্ধানে ভারত

ভূমিকাঃ বর্তমান পৃথিবীর সমস্যা—আন্তরাষ্ট্র সংঘাত, উগ্র জাতীয়তাবোধ ও গোষ্ঠীগত বিরোধ—বিশ্বযুদ্ধ এবং তার ভয়াবহ পরিণাম—রণক্লান্ত পৃথিবীতে মানুষের স্বাভাবিক শান্তি কামনা।

ভারতের আদর্শঃ ত্যাগ ও পরার্থপরতা।

ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে জনকল্যাণ ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শঃ অশোক ও হর্ষবর্ধন, ভারতের সাধনায় মানবপ্রেম**:** শ্রীচৈতন্য-নানক-কবীর প্রভৃতি মনীষীদের আদর্শ। ভারতের পরমতসহিষ্ণুতা ও বিশ্বপ্রীতির প্রতীক**:** বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। আমাদের বর্তমান রাজনীতিতে প্রাচীন ভারতের ধর্মজীবন ও রাজনৈতিক ঐতিহ্যের প্রভাব—শ্রীনেহেরু ও ভারতের পররাষ্ট্রনীতির রূপায়ণ।

পঞ্চশীল ও শ্রীনেহেরুঃ রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, অনাক্রমণ, অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, পারস্পরিক কল্যাণে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান।

হিংসাকুটিল বিশ্বে ভারতের শান্তির সাধনাঃ রাজনৈতিক গুরুত্ব—সাফল্যের সম্ভাবনা।

উপসংহার।

অনুশীলনী

সঙ্কেতসূত্র অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা করো :

নতুন শিক্ষাক্রম ও তুমি

ভূমিকা—মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য—উচ্চতর মাধ্যমিকের কাঠামো—তুমি এতে কীভাবে উপকৃত হবে বলে মনে কর—কোনো অসুবিধার কথা মনে হয়ে থাকলে সেগুলো কী কী—এই শিক্ষাক্রমের কোনো ব্যাপারে তোমার কোনো পরামর্শ আছে কিনা—উপসংহার।

বিদ্যালয়ের প্রথম দিনটি

ভূমিকা—ভয়ভাবনা—নাম ডাকায় সাড়া দেবার রোমাঞ্চ—নতুন বন্ধু—পাঠে অংশ-গ্রহণ—ছুটির ঘণ্টা—উপসংহার।

মহরম

ভূমিকা—মহরমের অর্থ—কারবালার কথা—মহরম কিভাবে অনুষ্ঠিত হয়—মহরম অনুষ্ঠানের তাৎপর্য—উপসংহার।

একটি অগ্নিকাণ্ডের বর্ণনা

ভূমিকা—দুর্ঘটনার স্থান—সময়—কারণ—দুর্গত এলাকার দৃশ্য—নির্বাপণ—ক্ষয়ক্ষতি—উপসংহার।

জ্যোৎস্না

ভূমিকা—জ্যোৎস্না কী—সৌন্দর্যবর্ণনা—মনের উপর প্রভাব—শরৎকালীন জ্যোৎস্নার উপভোগ্যতা—উপসংহার।

শরৎপ্রকৃতি

ভূমিকা—ঋতুচক্রে শরৎঋতুর স্থান—শরৎপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য—কবিদের দৃষ্টিতে শরৎ—উপসংহার।

একটি পুরাতন ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থান

ভূমিকা—স্থানটির অবস্থান—ধ্বংসাবলীর বিবরণ—অন্যান্য গুরুত্ব—সংরক্ষণব্যবস্থা—বিশেষ আকর্ষণ—উপসংহার।

ভূমিকম্প

ভূমিকা—কারণ—ফলাফল—কয়েকটি বিখ্যাত ভূমিকম্প—তোমার কোনো অভিজ্ঞতা—উপসংহার।

ছাত্র-অসন্তোষ

ভূমিকা—অসন্তোষের প্রকৃতি—কারণ—সমাধানের উপায়—উপসংহার।

সন্তরণ

ভূমিকা—সাঁতার জানার প্রয়োজনীয়তা—ব্যায়াম হিসাবে সাঁতার—বিভিন্নপ্রকার সাঁতার—সাঁতারশিক্ষার ব্যবস্থা—সাঁতার প্রতিযোগিতা—উপসংহার।

দেওয়ালী

ভূমিকা—উৎসবের উৎস—কীভাবে উদ্‌যাপিত হয়—সার্থকতা—উপসংহার।

মিতব্যয়িতা

ভূমিকা—মিতব্যয়িতার প্রয়োজনীয়তা—অমিতব্যয়িতার পরিণাম—সঞ্চয়ের প্রেরণা ও পদ্ধতি—উপসংহার।

বিদ্যালয়পত্রিকা

ভূমিকা—প্রকাশের ও পরিচালনার দায়িত্ব—প্রকাশের নীতি—বিষয়বৈচিত্র্য—উপকারিতা বা প্রয়োজনীয়তা—উপসংহার।

স্বদেশসেবায় ছাত্রসমাজ

ভূমিকা—স্বদেশসেবার গুরুত্ব—স্বদেশের প্রতি ছাত্রসমাজের দায়িত্ব ও কর্তব্য—ছাত্ররা কীভাবে দেশসেবায় অংশগ্রহণ করতে পারে—পাঠক্রমে দেশসেবামূলক কার্যসূচীর সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা—উপসংহার।

'আ মরি, বাংলা ভাষা'

ভূমিকা—বাংলা ভাষার সুদীর্ঘকালের গৌরবমণ্ডিত ঐতিহ্য—বাংলাভাষায় রচিত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ—দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনে বাংলা সাহিত্যের অবদান—সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহারের সম্ভাবনা—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য উন্নয়ন পরিকল্পনা—উপসংহার।

তোমার বিদ্যালয়ের একটি অনুষ্ঠান

ভূমিকা—তারিখ ও সময়—উপলক্ষ—উদ্যোগ-আয়োজন—ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত অংশগ্রহণ—বৈশিষ্ট্য—উপসংহার।

যে সহে সে রহে

ভূমিকা—ব্যক্তিগত জীবনে সহিষ্ণুতার শক্তি ও ফল—জাতীয় জীবনে সহিষ্ণুতার মূল্য—আলস্য বা জড়তা সহিষ্ণুতা নয়—সহিষ্ণুতার সাধনা—উপসংহার।

আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাসংস্কার

ভূমিকা—শিক্ষার স্বরূপ—ভারতবর্ষে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা ও তার ত্রুটিবিচ্যুতি—শিক্ষাসংস্কারের নানা দিক—উপসংহার।

বৃত্তিমূলক শিক্ষা

ভারতবর্ষের বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থার ইতিহাস—দেশের শিক্ষাব্যবস্থার পটভূমিতে

বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—দেশের বৃত্তিশিক্ষার বিভিন্ন আয়োজন—বৃত্তিশিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বিভিন্ন দিক—উপসংহার।

কর্মশিক্ষা

বর্তমান শিক্ষাব্যবস্থায় কর্মশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—কর্মশিক্ষায় বর্তমান ব্যবস্থা—কর্মশিক্ষার বিভিন্ন দিক—উপসংহার।

ছাত্রজীবনে বিতর্কসভার প্রয়োজনীয়তা

ভূমিকা—বিতর্কের সংজ্ঞা ও সার্থকতা—বিতর্ক-সভার রূপ ও উপকারিতা—ছাত্রজীবনে বিতর্ক সভার প্রয়োজনীয়তা—উপসংহার।

পণপ্রথা : একটি সামাজিক অভিশাপ

ভূমিকা—সমাজে নারীর স্থান ও পণপ্রথা—পণপ্রথার বিষময় ফল—বর্তমান যুগে পণপ্রথা—উপসংহার।

সাহিত্য ও বিজ্ঞান

ভূমিকা—সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ—এই সম্বন্ধের একটি সমীক্ষা—আধুনিক যুগে বিজ্ঞান ও সাহিত্যের বিচ্ছিন্নতা এবং তার কুফল—সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ রচনার প্রয়াস—উপসংহার।

বিদ্যুৎ সংকট

ভূমিকা—সাম্প্রতিক কালের বিদ্যুৎ-সংকট—বিদ্যুৎ-সংকটের স্বরূপ ও তার পরিণাম—বিদ্যুৎ-সংকটের কারণ ও তার প্রতিকার-প্রয়াস—উপসংহার।

শিক্ষা ও চরিত্র গঠনে খেলাধুলার প্রভাব

ভূমিকা—ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে খেলাধূলার স্থান—শিক্ষা ও চরিত্রগঠনে খেলাধূলার প্রভাবের বিভিন্ন দিক—ভারতবর্ষে খেলাধূলার আয়োজন, তার শুভ ও অশুভ দিক—উপসংহার।

সঙ্কেতসূত্র রচনা করে প্রবন্ধ লেখো :

১। বাংলার লোকশিল্প। ২। বাংলার সঙ্গীত। ৩। বাঙালীর ভবিষ্যৎ। ৪। বাঙালী মধ্যবিত্তের সঙ্কট। ৫। আমার ছাত্রজীবনের স্মৃতিকথা। ৬। স্বাধীন ভারতের নাগরিকের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ৭। স্বাধীন ভারতে সামরিক শিক্ষা। ৮। নারীশিক্ষা। ৯। বাস্তুহারার পুনর্বাসন সমস্যা। ১০। ধর্মঘট। ১১। বর্ষার দিনে কলকাতা। ১২। গ্রন্থ মানুষের একটি বড়ো সঙ্গী। ১৩। শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান। ১৪। ভারতের দশমিক মুদ্রা ব্যবস্থা। ১৫। বিজ্ঞান অভিশাপ না আশীর্বাদ। ১৬। বাঙালীর আর্থিক উন্নতির অন্তরায়। ১৭। মহাপুরুষের জন্মশতবার্ষিকী-প্রসঙ্গে। ১৮। আমার প্রিয় বাঙালী গ্রন্থকার :

বঙ্কিমচন্দ্র। ১৯। পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথা লোপ। ২০। বাংলা মহাকাব্য। ২১। সাহিত্যে প্রকৃতি। ২২। শরৎকালের বাংলা। ২৩। শীতের সকাল। ২৪। যে শুইয়া থাকে তাহার ভাগ্যও শুইয়া থাকে। ২৫। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন। ২৬। বাংলার বারো মাসে তেরো পার্বণ। ২৭। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে তৎকালীন সমাজ। ২৮। শিক্ষাপ্রসারে ভ্রমণের উপযোগিতা। ২৯। একটি গ্রামে কয়েকটি দিন। ৩০। সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই। ৩১। সকলের তরে সকলে আমরা, প্রত্যেকে আমরা পরের তরে। ৩২। জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। ৩৩। ফরাক্কা প্রকল্প। ৩৪। আমাদের খাদ্যসমস্যা। ৩৫। বিদ্যালয়-জীবনের সুখদুঃখ। ৩৬। একটি বনভোজনের অভিজ্ঞতা। ৩৭। ভারতপথিক রামমোহন। ৩৮। গঙ্গা-কাবেরী সংযুক্তি প্রকল্প ও ফরাক্কা। ৩৯। আরব-ইসরাইল যুদ্ধ ও ভারতে জ্বালানি-তৈলসঙ্কট। ৪০। মাতৃভাষার মাধ্যমে বাণিজ্য-শিক্ষার উপযোগিতা। ৪১। ভারতীয় টাকার মূল্য। ৪২। নোট-বাতিলকরণ ও স্বর্ণ-নিয়ন্ত্রণ। ৪৩। বাংলার পশুপাখি। ৪৪। বাংলার ফুল। ৪৫। বৃহৎ নগরে বাসের সুবিধা ও অসুবিধা। ৪৬। কলকাতার পার্ক। ৪৭। রথযাত্রা। ৪৮। দোল। ৪৯। বন্ধুনির্বাচন। ৫০। আমরা কি আমাদের পূর্বপুরুষের চেয়ে সুখী? ৫১। আমাদের রাষ্ট্রভাষা। ৫২। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। ৫৩। টেলিফোন ও নগরজীবন। ৫৪। মুদ্রাস্ফীতি। ৫৫। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব। ৫৬। এভারেস্ট অভিযান। ৫৭। কুসংস্কার। ৫৮। প্রবাদবচন। ৫৯। উচ্চাকাঙ্ক্ষা। ৬০। ভাগ্য বনাম পুরুষকার। ৬১। ভৌতিক গল্প। ৬২। গুজব। ৬৩। স্বপ্ন। ৬৪। জীবনবীমা। ৬৫। নাগরিকতা। ৬৬। একটি ঝড়ের অভিজ্ঞতা। ৬৭। একটি বিদ্যালয়ের আত্মজীবনী। ৬৮। একটি পায়ে চলা পথের আত্মজীবনী। ৬৯। 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে'। ৭০। 'আগে চল্ আগে চল্ ভাই'। ৭১। 'জন্ম হোক যথা তথা কর্ম হোক ভাল'। ৭২। 'যত মত তত পথ'। ৭৩। 'যত্র জীব তত্র শিব'। ৭৪। 'যত দিন বাঁচি তত দিন শিখি'। ৭৫। কর্মই ধর্ম।

———

ভাবসম্প্রসারণ

স্বল্পায়তন মূল রচনায় যে ভাবটি থাকে সংহত আকারে তারই বিশদরূপ হল ভাব-সম্প্রসারণ। বলা বাহুল্য যা ছিল সংকুচিত তাকে প্রসারিত করলেই জায়গা দিতে হবে বেশি।

ভাবসম্প্রসারণও একটি বিশিষ্ট রচনা-অনুশীলন। এই অনুশীলনে চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটে।

সারসংক্ষেপ, ভাবার্থ ও ভাবসম্প্রসারণ

প্রথম দুটি বিস্তারিত ভাবকে সংহত করার অনুশীলন, তৃতীয়টি বিপরীতধর্মী অর্থাৎ সংহত ভাবকে বিস্তারিত করার অনুশীলন। কিন্তু সংহতি বা বিস্তার উভয় ক্ষেত্রেই মূল রচনার ভাব বা অর্থবোধের প্রয়োজন সমান গুরুত্বপূর্ণ।

ভাবসম্প্রসারণ করার নিয়ম

- প্রথমেই বার বার মূল রচনাটি পড়ে তার অর্থ বুঝতে চেষ্টা করো।
- মূল ভাবটাকে এবারে ব্যাখ্যা করো।
- প্রসঙ্গ জানা থাকলেও তা দেবার দরকার নেই। কবি বলছেন ঘটনাটাও পরিহার্য।
- ভাব-ব্যাখ্যা করতে গিয়ে উদাহরণ হিসাবে কোনো গল্প প্রবাদ বা উদ্ধৃতি ব্যবহার করা চলবে।
- কোনো রূপক বা প্রতীক থাকলে তা বিশ্লেষিত হওয়া দরকার।
- প্রত্যক্ষ উক্তি না ব্যবহার করাই ভালো।
- পুনরুক্তি যেন না থাকে।
- ভাবসম্প্রসারণের কলেবর সম্বন্ধে বাঁধাধরা কোনো নিয়ম না থাকলেও ফুল্‌স্ক্যাপ সাইজের এক পৃষ্ঠার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখাই উচিত।
- মনে রাখতে হবে সম্প্রসারিত অংশটিও হবে সাহিত্যগুণসম্পন্ন।

॥ উদাহরণ ॥

১। **ওগো পিঁপড়ার সারি,**
তোমরা যে এত বড়, একতায় কর্ম কর,
একই উদ্দেশ্য লক্ষ্য জীবনে সবারি,
এক মন এক প্রাণ, এক স্বার্থ এক ধ্যান,
ভাই ভাই কেহ কারো নহ হিংসাকারী। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

পিঁপড়ে ক্ষুদ্র হতে পারে, কিন্তু আশ্চর্য একতার বলে তারা একমন একপ্রাণ হয়ে সুন্দর এক জীবন গড়ে তুলেছে। পিঁপড়েদের জীবনচর্যার এই বিশিষ্ট দিকটি যথার্থই বিস্ময়কর। তাদের এই ঐক্যবোধ মানুষেরও অনুসরণীয়। মানুষ যে সুস্থ শান্তিময় জীবনের স্বপ্ন দেখে একমাত্র ঐক্যবলেই তা সম্ভব। পারিবারিক জীবনের শান্তি যেমন পরস্পরের মিলনের ভিত্তিতেই রচিত হয় জাতীয় জীবনেও তাই। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও পরস্পর সংঘর্ষ আর স্বার্থের সংঘাত ত্যাগ করে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ হতে পারি তা হলে সমস্ত পৃথিবীর কল্যাণ। বহু প্রাচীন কালে আমাদের অরণ্যগর্ভ থেকে ধ্বনিত হয়েছিল এই ঐক্যের বাণী :

সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাসিং জানতাম্

অর্থাৎ একসঙ্গে চলো, এক সঙ্গে বলো, তোমাদের মন যে এক তা জানো।

২। **ত্যাখ্‌, মানুষের কষ্ট থাকে না হয় যদি লোক খাঁটি**
সোনার ফসল ফলায় যখন পায়ের তলায় মাটি।
মাটিরই যদি না এহেন মূল্য, মানুষের দাম নাই !
এই সংসারে এই সোজা কথা সব আগে বোঝা চাই।

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

মানুষ যদি শ্রমকাতর না হয়, সে যদি মাথার ঘাম পায়ে ফেলে চাষ করে তা হলে মাটি তার দুহাত ভরে দেবে সোনার ফসল : 'ত্রস্ত ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভরে ফলে ফুলে।' সামান্য মাটিই যদি সোনা ফলাতে পারে তা হলে মানুষ কি তা পারবে না ? মানুষও নিশ্চয় সোনা ফলাতে পারবে যদি সে তার মনটা ঠিকমতো গড়ে তুলতে পারে। আবাদ করলে মানবজমিনেও সোনা ফলতে পারে। কিন্তু আমরা তার জন্যে যে-ধরনের কৃষিকাজ দরকার তা জানি না। সে কৃষিকৌশল হল সৎচেষ্টা আর সৎকর্মচেষ্টা। মানুষ যদি সুসংযত ও নিষ্কলুষ হয়, মানুষ যদি তার শক্তি ও সম্ভাবনাকে বিকশিত করে তুলতে পারে, তা হলে মানুষও সোনা হয়ে উঠবে। দুঃখের বিষয় এই সহজ সত্যটি আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

৩। **রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা**
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
[হাস্য মুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।]

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

ভাগ্যদেবীর গর্ব তিনি একদল মানুষকে নিষ্ঠুরভাবে সর্বরিক্ত করেছেন। কিন্তু ভাগ্যের আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়েও এই সর্বহারার দল মাথা উঁচু করে থাকে, অদৃষ্টের তাড়নাকে তারা হাসিমুখে পরিহাস করে। সঙ্ঘশক্তি এবং নিজেদের কর্মকুশলতার বলে তারা দুর্দৈবের মধ্যেও মনোবল অটুট রাখতে পারে। এই সর্বহারা যারা তারাই তাদের শ্রমে এই বিশ্বসভ্যতাকে ধারণ করে রেখেছে। তারা ক্রীতদাস নয়, তারা স্রষ্টা। অথচ নিয়তির নিষ্ঠুর বিধানে অন্নসংস্থানের সম্ভাবনাও তাদের নেই। এই রিক্তের দলই সংখ্যায় সর্বাধিক, তারা যদি বিদ্রোহ করে, সমস্ত বিশ্বকে মুহূর্তে

জয় করে নিতে পারে। প্রতিকূল নিয়তি তাদের দিকে ভ্রূকুটি কুটিল দৃষ্টিতে তাকালেও তাদের মনোবল ও আত্মমর্যাদা বোধকে খর্ব করতে পারবে না। রিক্ততার মধ্যেও তারা মনুষ্যত্বের জয়পতাকা তুলে ধরবে।

৪। **শুনহ মানুষ ভাই**
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

মানুষের মনুষ্যত্ব সর্বাতিশায়ী। এমন একদিন ছিল যখন মানুষ সংস্কারকে বড়ো বলে মনে করত। ধর্ম আর ঈশ্বরের কাছে নিজেকে খর্বিত ও তুচ্ছানুতুচ্ছ মনে করত। সাহিত্যেও মানুষের কোনো মূল্য ছিল না, মানুষ দৈবের হাতে ছিল ক্রীড়নক মাত্র। তারপর এক নতুন চেতনা এল, মানুষকে তা দিল নতুন মূল্য। মানবতার মন্ত্রবাহীরা মানুষকে আহ্বান করে এক নতুন প্রত্যয়ে উন্নীত করল। এই প্রত্যয় হল মনুষ্যত্বের প্রতি অমোঘ আশ্বাস। দৈব, ঈশ্বর, সংস্কার সব কিছুর উপরে মনুষ্যত্ব যা সমস্ত তথাকথিত ন্যায়-নীতির উর্ধ্বে। চণ্ডাল নীতিশাস্ত্রের বিধানে অন্ত্যজ হতে পারে কিন্তু এই নতুন চেতনায় সে মানুষ হিসাবে সব মানুষের সমতুল্য। এই নতুন চেতনায় রজকিনীপ্রেম নিকষিত হেমে রূপান্তরিত হয়।

৫। **স্বপ্ন কহে—আমি মুক্ত। নিয়মের পিছে**
নাহি চলি। সত্য কহে—তাই তুমি মিছে।
স্বপ্ন কয়—তুমি বদ্ধ অনন্ত শৃঙ্খলে
সত্য কয়—তাই মোরে সত্য সবে বলে।

স্বপ্ন বা কল্পনা নিয়ম মেনে চলে না, সে বন্ধনহীন। কিন্তু সত্যকে নিয়মের শৃঙ্খল পায়ে পরে চলতে হয়। তাই বলে সত্যের চেয়ে স্বপ্নের গৌরব আদৌ বেশি নয়।

সত্যকে অনেক কঠিনের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়। ভ্রম ও মিথ্যা অনেক সময় সত্যের রূপ নিয়ে আসে, তাদের চিনে নিতে সত্যকে অনেক সাধনা করতে হয়। এই সাধনা ও সংযম শৃঙ্খল নয়, শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলার জোরেই সত্য অবিমিশ্র ও স্বপ্রকাশ হয়ে উঠতে পারে, সত্যের গৌরব সেখানেই। স্বচ্ছন্দচারী ক্রীড়াচঞ্চল স্বপ্নের স্মিতহাস্যময় মুখের চেয়ে শ্রমক্লান্ত, ঘর্মজলসিক্ত সত্যের মুখ সুন্দরতর। দুঃখব্রতেই মানুষের প্রতিষ্ঠা, লীলালাস্যে নয়।

৬। **এই ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত সীমাহীন—তাহা ততই অন্ধকার।**

অন্ধকার বলেই কোনো কিছু রূপহীন হতে পারে না। তার গভীরতা ও নিঃসীমতার জন্যেই তাকে অন্ধকার বলে মনে হয়। সমুদ্র গভীর তাই তা মসীকৃষ্ণ, গভীর অরণ্যও কৃষ্ণবর্ণ। ঈশ্বর দুর্গম, দুর্বোধ্য তাই কৃষ্ণের ঐ রং, কালীর ঐ রং। ঈশ্বর তো আলোর আলো তবু গভীরের জন্যে, অসীমতার জন্যেই আমরা এঁকে ঐরূপে কল্পনা করেছি। আমরা যার রহস্যের নাগাল পাই না তাই আমাদের কাছে অন্ধকার। মৃত্যু যে আমাদের চোখে কালো তাও এই কারণে।

খণ্ডিত ও বদ্ধ দৃষ্টিতে দেখি বলে আমাদের সত্যদর্শন হয় না। উপলব্ধির গভীরে যেতে পারলে আমরা বস্তুর স্বরূপদর্শন করতে পারি, তখন অন্ধকারকেও আলোকময় দেখি, মৃত্যুও তখন হয় অমরত্বের আলোয় উদ্ভাসিত।

৭। প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণের কথাটা বাজে। আত্মজ্ঞানের অভাব আর রহস্যাবরণের লোভ ও নিরাপত্তার জন্য প্রতিভাবানেরা কথাটা মেনে নেন।

প্রতিভা আদৌ জন্মগত নয়। কিন্তু প্রতিভা জন্মগত একথা শুনলে প্রতিভাবানেরা আত্মপ্রসাদ লাভ করেন। এর কারণ তাঁরা নিজদেরকে ঠিক চেনেন না, অর্থাৎ নিজেদের প্রতিভা উন্মেষের আসল কারণ যে মনন, অনুশীলন ইত্যাদি তা উপলব্ধি করেন না। আর যাঁরা এ সত্য উপলব্ধি করেছেন তাঁরা এ সত্যকে গোপন করতে চান, কারণ সবাই যদি জেনে ফেলে যে প্রতিভা প্রচেষ্টায় লাভ করা সম্ভব তা হলে সবাই তারই জন্যে চেষ্টা করবে, প্রতিভাবানদের একচেটিয়া খ্যাতি তাতে বিঘ্নিত হবে।

৮। চুপ করে বোস যদি
যা-কিছু আছে সমস্তকে আঁকড়িয়ে ধরে
তবে দেখবে, তোমার জগতে ফুল গেল বাসি হয়ে,
পাঁক দেখা দিল শুকনো নদীতে
ম্লান হল তোমার তারার আলো।

জগৎ চলছে বলেই তার নিত্যনবীনতা। তার চলা যদি বন্ধ হয় তা হলেই তার মরণ। ফুলকে যদি ধরে রাখতে চাই তা হলে সে বাসি হয়ে যাবে, আর যদি তাকে ঝরে যেতে দিই তা হলে আবার বৃন্তে নতুন ফুল আসবে। নদী যদি তার প্রবহমানতা হারায় সেখানে দেখা দেবে পাঁক। এইভাবে নিশ্চল হলে তারার আলোও যাবে নিভে। গতিই জীবন। এই গতির বাণীই বিঘোষিত হয়েছে আমাদের উপনিষদের চরৈবেতি মন্ত্রে। পুরাতন-প্রীতি আমাদের মজ্জাগত। তাই সমাজজীবনে যখন ব্যাপক পরিবর্তন আসে তাকে আমরা অবাঞ্ছিত বলেই মনে করি। কিন্তু এই পরিবর্তনের মধ্য দিয়েই সমাজজীবনের সজীবতা বজায় থাকবে এ কথা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

৯। শুধু পড়াশোনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বলতে পারে, হাতে আনা বড় শক্ত।

তেরে কেটে তাক্ তাক্ মুখে বলা সহজ কিন্তু তবলায় ঐ বোল তোলা সহজ নয়। বাদ্যযন্ত্রে বোলগুলো স্পষ্টভাবে তুলতে হলে পরিশ্রম করতে হয়। তেমনি শুধু পড়াশোনায় কিছু হয় না, পুঁথিগত জ্ঞানকে কার্যত প্রয়োগ করতে হলে বহু অনুশীলনে তা আয়ত্ত করা চাই, তা উপলব্ধি করা চাই, সব ব্যাপারেই তাই অনুশীলন ও উপলব্ধিই বড়ো কথা। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে মুখে অনেক শাস্ত্রের বুলি আওড়ানো আদৌ কঠিন ব্যাপার নয়। সাধন জগতে কত সাধকই তো আসেন, কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা আর অনুশীলনের মধ্য দিয়ে উপলব্ধির গভীরে ক'জন পৌছতে পারেন? ঐ ঐশীচেতনাকে জীবনে-মননে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ কাজ নয়।

১০। ধ্বংস দেখে ভয় কেন তোর?
প্রলয় নূতন সৃজন বেদন
আসছে নবীন জীবনহারা
অসুন্দরকে করতে ছেদন।

ধ্বংস দেখে কে না আতঙ্কিত হয়? কিন্তু ধ্বংসের আড়ালে আছে নতুন সৃষ্টির আভাস। নবীন প্রলয়ের রূপ নিয়ে এলেও তা ভয়ঙ্কর নয়, সেই ভয়ঙ্কর রূপের মধ্যে লুকিয়ে আছে শান্ত শিবমূর্তি। রুদ্রের মুখ ভয়ঙ্কর, কিন্তু তিনি দক্ষিণ—তিনি অনুকূল, তিনি অসুন্দরকে বিনাশ করে সুন্দরের প্রতিষ্ঠা করেন। জলস্থলের নিঃশ্বাস হরণ করে কালবৈশাখী আসে তখন সন্ত্রস্ত হই। মেঘের ভীমকুণ্ডল জটায় দেখি সর্বনাশের ইঙ্গিত। কালবৈশাখী ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে আসে কিন্তু তবু তাকে দেখে ধরণী আনন্দিত হয়। কারণ ঐ ধ্বংসের মধ্যেই নববিধানের দুর্ধর্ষ আশ্বাস আছে। শুধু প্রকৃতিতে নয়, মানবসমাজেও বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে শান্তিপ্রতিষ্ঠার সাক্ষ্য দেবে ইতিহাস।

১১। জাল কহে, 'পঙ্ক আমি উঠাব না আর'
জেলে কহে, 'মাছ তবে পাওয়া হবে ভার।'

মাছধরার জন্যে জাল ফেলা হয়। জালে শুধু মাছ ওঠে না, পাঁক বা অন্যান্য আবর্জনাও ওঠে। জাল অবুঝ তাই সে বলে, শুধু মাছই তুলবে, আবর্জনা তুলবে না। কিন্তু বুদ্ধিমান জেলে এ কথা ভালো করেই জানে যে, মাছ পেতে গেলে পাঁক উঠবেই। জাল ও জেলের এই কথাবার্তার মধ্যে একটা সত্য নিহিত আছে। পৃথিবীতে অবিমিশ্র ভালো জিনিস পাওয়া যায় না। সংসারে সব কিছু মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। ভালো মন্দের সঙ্গে মিশে থাকে। সত্য আর মিথ্যা মিশে থাকে। আলো আর অন্ধকার একত্রিত থাকে। তাই ভালো-মন্দ দুটোকেই এক সঙ্গে তুলে নিয়ে মন্দটাকে বর্জন করে ভালোটাকে গ্রহণ করতে হবে। মিথ্যার আবর্জনা সরিয়ে সত্যকে বেছে নিতে হবে। সোনার খনিতেও শুধু সোনা থাকে না, অনেক অপ্রয়োজনীয় মাটিপাথর থাকে। হীরে থাকে কয়লার সঙ্গে মিশে। খনি থেকে তাই আবর্জনার পাহাড় তুলতে হয়। তারপর আবর্জনার স্তূপ থেকে সন্ধানী ও জহুরীর চোখ নিয়ে অনেক শ্রমের বিনিময়ে আসল জিনিসটাকে বেছে নিতে হয়। এ বেছে নেওয়ার মধ্যেই মানুষের গৌরব, মানুষের জয়যাত্রা। যে মানুষ কাঁটা সইবে না বলে গোলাপ নিতে অস্বীকার করে, যে মানুষ অন্ধকারের ভয়ে পিছিয়ে আসে, সে মানুষ গোলাপ কিংবা আলো কোনোটাকেই পায় না। যন্ত্রণা আর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে থেকে সত্যকে চিনে নেওয়া বেছে নেওয়ার ক্ষমতাটাই মানুষের গৌরব।

১২। প্রিয়, ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা
চোখে আর স্বপ্নের নেই নীল মদ্য
কাঠফাটা রোদ সেঁকে চামড়া।

ফুল যেন নন্দনের বার্তা বয়ে আনে। সেই ফুল প্রিয়জনের হাতে দিয়ে আর প্রিয়জনের হাত থেকে পেয়ে বেশি আনন্দ। কিন্তু এ পুষ্পোৎসবের দিন তো নয়, এ যে অগ্নিগর্ভ দিন। মনে হচ্ছে ইতিহাস যেন আমাদের মুছে নেবে। এই রূঢ়-নিষ্ঠুর পরিবেশে দুজনে মুখোমুখি বসে দুজনের চোখে অনন্ত সৌন্দর্য অনুভব করা যায় না। কঠোর বাস্তবের মুখোমুখি হয়ে কল্পনার অনুভূতি অদৃশ্য হয়। এখন কঠিন কর্মের আহ্বানে, রুক্ষ দিনের দুঃখের আহ্বানে সেই কঠিন পথযাত্রায় বেরিয়ে পড়তে হবে।

১৩। কেন খুঁজে ফের দেবতা ঠাকুর মৃতপুঁথি কঙ্কালে?
হাসিছেন তিনি অমৃত-হিয়ার নিভৃত অন্তরালে।

রামকৃষ্ণদেব বলতেন, পাঁজিতে লেখে এক আড়া জল কিন্তু পাঁজি নিংড়ালে এক ফোঁটা জলও পাওয়া যায় না। এর অর্থ হল, শুষ্ক শাস্ত্র, পাঁজি-পুঁথি—এ সবের মধ্যে ঈশ্বর থাকেন না, তিনি থাকেন হৃদয়ের গভীরে। হৃদয়ের প্রকৃত উপলব্ধিতেই ঈশ্বর বিরাজিত। বিদ্যা হল দু-ধরনের, পরা বিদ্যা আর অপরা বিদ্যা। অপরা বিদ্যা শুষ্ক নিষ্ক্রিয় ও প্রকৃত অর্থশূন্য। এই বিদ্যা মানুষকে যথার্থ ঈশ্বরানুভূতি বা অধ্যাত্ম চৈতন্য দান করে না। এ শুধু মানুষের অহংবোধকে জাগ্রত করে। আর যতক্ষণ অহংবোধ প্রবল থাকে ততক্ষণ ঈশ্বর ভক্তের কাছ থেকে দূরে থাকেন। আর এই সত্যটি জানা না থাকায় ভক্ত শাস্ত্র-পুঁথি আর পাষাণ প্রতিমার অন্ধ পাষাণবেদীতে মাথা খুঁড়ে মরে। তার সমস্ত বিদ্যা, বুদ্ধি আর জ্ঞানের গৌরব ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পরা বিদ্যার প্রভাবে ভক্তের মগ্নচৈতন্য জাগ্রত হয়। তখন সে চোখের আলোয় চোখের বাহিরে দেবতাকে না খুঁজে অন্তরের আলোকে অন্তরের অভ্যন্তরেই দেবতাকে খুঁজে পায়। এ হল শুধু আত্মোপলব্ধি, হৃদয়ের জাগরণ। এই জাগরণে ভক্ত দেখতে পায়, অনুভব করতে পারে কখন তার অলক্ষ্যে দেবতা তার হৃদয়ের আসনটি জুড়ে প্রসন্নমুখে বসে রয়েছেন। মানুষের হৃদয়েই তো থাকে আনন্দ-অমৃত। আর এই অমৃতেই দেবতার অভিষেক। ভক্তের হৃদয় হয়ে ওঠে ভগবানের বৈঠকখানা।

১৪। যে নিজে বলে, 'আমি গুরু' সে হীনবুদ্ধি। দাঁড়িপাল্লা দেখ নাই? হালকা দিকটা উঁচু হয়, যে ব্যক্তি নিজে উঁচু হয়, সে হালকা।

মানুষের অহংবুদ্ধি মানুষকে ক্ষুদ্র করে খণ্ডিত করে। বিদ্যার গর্বে, জ্ঞানের অহংকারে সে যখন নিজেকে বড়ো কিংবা গুরু বলে প্রচার করে তখন সে নিজের দীনতা ও হীনতাকে নির্লজ্জভাবে প্রকাশ করে। কিন্তু যে প্রকৃত গুরু সে নির্বাক থাকে। তার আত্মপ্রচারের প্রয়োজন নেই। প্রকৃত জ্ঞানী ও গুণী কখনও অহংকারের ফাঁদে পা দেয় না। সে বিনয়ী, সে নম্র। সে সকলের কাছে বিনীত থাকে, কিন্তু তাই বলে সে তো সামান্য বা তুচ্ছ নয়। আসলে প্রকৃত মানুষের ধর্মই হল আত্মসংযম এবং বিনয়। সে আত্মপ্রচারে বিমুখ, সে স্বভাবে ধীর ও গম্ভীর। যে মানুষ নিজেকে জাহির করতে চেষ্টা করে, জোর করে উঁচু আসনে বসতে চায় সে হয়তো পারে। কিন্তু তার এই প্রচেষ্টা হাস্যকর। ওপরে বসলেই কেউ ওপরের মানুষ বা প্রকৃত পদমর্যাদার মানুষ হয় না। হাল্কা জিনিস তো ওপরেই ওঠে। ভারী জিনিস নিচেই

থাকে। দাঁড়িপাল্লার হাল্কা দিকটা ওপরে উঠে যায়, ভারী দিকটা নিচের দিকে থাকে। হাল্কা বলে তা ওপরে থাকে আর হাল্কা বলে তার মূল্যও কম, কদর কম। যে ভারী বস্তুটি নিচে থাকে তার ওজন বেশি বলে দামও বেশি। আর দাম বেশি বলেই সে সমাদৃত হয়, ওপরতলার গুরুর গুরুগিরি ধোপে টেঁকে না।

১৫। ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি বিলীন, কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন।

জীবন একটা দীর্ঘ সংগ্রাম। এখানে আমরা সকলেই সৈনিক। আঘাত-সংঘাত আর বাস্তব জীবনের নানা সমস্যার বিরুদ্ধে প্রতিনিয়ত লড়াই করে চলতে হয় আমাদের। কিন্তু এই বাঁচার লড়াইয়ে গৌরব আছে, মর্যাদা আছে। জীবনযুদ্ধে যে জয়ী হয় তার জয়ের গৌরব ওয়াটারলুর যুদ্ধ জয়ের গৌরবের চেয়ে বেশি ছাড়া কম নয়। আর এর জন্যেই মানুষ কখনও কল্পনা আর ভাবুকতার জগতে বুঁদ হয়ে থাকতে পারে না। যে থাকে সে মূর্খ, ব্যর্থ, তুচ্ছ। জীবন কুসুমশয্যা নয়। জগতের বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে। কিন্তু দুর্বল বা অক্ষম হলে সংগ্রাম করা যায় না। এর জন্যে প্রয়োজন ক্ষমতা ও স্বাধীন চিন্তাধারার অধিকার। যে মানুষ সক্ষম সেই পারে কর্মক্ষেত্রে সার্থক ও সক্রিয় ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে। আর চাই স্বাধীন বুদ্ধির প্রকাশ ও স্বাবলম্বন। নানা অবস্থায় প্রয়োজনে যোগ্য চিন্তা নেওয়ার ক্ষমতা থাকলে এবং বিপদের মুখেও অটল হয়ে দৃঢ় পদক্ষেপে চলতে পারলে সংসারে মানুষ সার্থক হতে পারে। মানুষের এই আত্মবিশ্বাস ও ক্ষমতার জাগরণের মধ্যে চাই শক্তিমান্ ঈশ্বরের আশীর্বাদ। তাঁর ওপরে বিশ্বাস রাখতে পারলে এবং তাঁকে ধ্রুবতারা করে অগ্রসর হতে পারলে এ সংসার-সমুদ্রে দিশেহারা হবার ভয় থাকে না। ঈশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত, আমরা যেন ভাববিলাসে মগ্ন না থাকি, আমরা যেন কর্মক্ষেত্রে প্রকৃত সৈনিক হতে পারি।

১৬। দণ্ডিতের সাথে
দণ্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে,
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

দণ্ডদাতা আইন অনুসারে অপরাধীর বিচার করেন, তাকে শাস্তি দেন। শাস্তিদানের ব্যাপারে বিচারককে নিরাসক্ত-নির্মম থাকতে হয় ,কারণ তাঁকে সত্য ধর্মের পথ, ন্যায়-নীতির পথ অনুসরণ করতে হয়। এই ন্যায়-নীতির পথ অনুসরণ করতে গিয়ে বিচারককে কঠিন হতে হয়। কিন্তু এই কাঠিন্য যদি সমবেদনাহীন হয় তাহলে বিচারক আদর্শ বিচারকের আসন থেকে ভ্রষ্ট হন। বিচারকের আসল উদ্দেশ্য হল মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো। কিন্তু সে পরিবর্তন নিষ্ঠুরতার দ্বারা সম্ভব নয়। তাই সমব্যথী বিচারকই হলেন শ্রেষ্ঠ বা আদর্শ বিচারক। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকে পিতা সাজাহান বলেছিলেন—"পিতা যখন পুত্রকে শাসন করে পুত্র ভাবে যে, পিতাটি নিষ্ঠুর। সে জানে না যে পিতার উদ্যত বেত্রের অর্ধেকখানি পড়ে সেই পিতার পৃষ্ঠে!" বিচারক যদি এমনই পিতার মতো অনুভূতিপ্রবণ

সংবেদনশীল হন তবেই তাঁর বিচার হয়ে ওঠে আদর্শ বিচার। দণ্ডিতের প্রতি বিচারককে হতে হবে সমব্যথী, কারণ সমব্যথী বিচারকের বিচারই শ্রেষ্ঠ বিচার।

১৭। পথের প্রান্তে আমার তীর্থ নয়,
পথের দুধারে আছে মোর দেবালয়।

প্রকৃত ভক্তের কাছে দেবতা কেবল মন্দিরের মধ্যেই বিরাজিত নন, মন্দিরের বাইরে অসংখ্য মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে তাঁর ঈশ্বরকে খুঁজে পান।

ঈশ্বর হলেন অসীম অনন্ত, তিনি সীমিত গণ্ডির মধ্যে অর্থাৎ মন্দিরের চার-দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থাকতে পারেন না। বন্দী থাকে দেবতার বিগ্রহ। কিন্তু বিগ্রহ তো দেবতা নয়, দেবতার প্রতীক মাত্র। মূর্খ মানুষ এই প্রতীককেই দেবতা বলে ভুল করে তাকে দেবতার আসনে বসায়—তাই তাদের কাছে দেবতা বন্দী হন গণ্ডির মধ্যে, মূর্তির মধ্যে। যখন মূর্তি ভাবে 'আমি দেব' 'হাসে অন্তর্যামী'।

ঈশ্বরকে পেতে হলে মন্দিরে নয়, মানুষের মধ্যে; তাঁর অনুসন্ধান করতে হবে, সন্ধান করতে হবে প্রকৃতির অনন্ত ঐশ্বর্যের মধ্যে। কারণ মানুষের প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-ভালবাসার অনন্তলীলার মধ্যে ঈশ্বর বিরাজিত। তাই মন্দিরে নয়, কান্না-হাসির-দোল-দোলানো এই সংসারের মধ্যেই ঈশ্বরদর্শন সম্ভব।

১৮। উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

সংসারে উত্তম, মধ্যম এবং অধম—এই তিন ধরনের মানুষ চোখে পড়ে। উত্তম তার চারিত্রিক মহিমায় সর্বশ্রেষ্ঠ। এই শ্রেষ্ঠত্ব নষ্ট হবার নয়, তাই নিশ্চিন্তে তাঁরা অধমের সঙ্গে পথ চলতে পারেন। কিন্তু যারা মধ্যম, প্রতি পদে পদে তাদের হারাবার ভয়—ভয় বলেই অধমের সঙ্গে ওঠা-বসা করতে গিয়ে তাদের মনে এত সংকোচ, এত সংশয়।

সোনার গায়ে কলঙ্কের দাগ পড়ে না। শ্রেষ্ঠ মানুষের চরিত্র হল খাঁটি সোনা। ভয় তাদেরই যাদের চরিত্র গিলটি-করা রঙে রঙীন। যে-কোনো মুহূর্তে বিন্দুমাত্র আঘাত লাগলেই তাদের সে রঙ চটে গিয়ে বেরিয়ে পড়বে আসল চেহারা। আরও একটা কারণে মধ্যম শ্রেণীর মানুষ অধমের বা অসৎ-চরিত্রের মানুষের সঙ্গে একত্রে চলতে ভয় পায়, সে কারণটা হল এই—তাদের ভয় থাকে অসৎ মানুষের সংস্পর্শে এসে তারাও হয়তো কোনো একদিন অসৎ হয়ে যাবে। কিন্তু হীনমনা অসৎ মানুষ তার কলঙ্ক দিয়ে কোনো মহান ব্যক্তিকেই স্পর্শ করতে পারে না। তাই যিনি মহৎ তিনি অসৎকেও বুকে স্থান দিতে পারেন, কিন্তু সাধারণ মানুষের পক্ষে দুর্জনকে পরিহার করা ভিন্ন অন্য গতি নেই।

১৯। যে ফুল না ফুটিতে ঝরেছে ধরণীতে,
যে নদী মরুপথে হারালো ধারা।
জানি হে, জানি, তাও হয় নি হারা॥

প্রকৃতির বুকে প্রতিদিন অসংখ্য ফুল ফোটে, কিন্তু ফোটবার আগেই যে অসংখ্য ফুল ঝরে যায় তার হিসাব কেউ রাখে না। তেমনি মরুপথে-ছুটে-চলা নদীর ধারা সিন্ধুতে গিয়ে মিলিত হবার আগেই কখন শেষ হয়ে যায়। আপাতদৃষ্টিতে এই না-ফোটা ফুল আর শুকিয়ে যাওয়া নদীর ধারাকে মনে হয় ব্যর্থ।

কিন্তু সামগ্রিক দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখতে পাই এ পৃথিবীতে কোনোকিছুরই ধ্বংস নেই। মৃত্যু বিলুপ্তি নয়, মৃত্যু জীবনের সিংহদ্বার। মানুষ তার খণ্ডিত দৃষ্টিতে বস্তুর এই রূপান্তর-লীলাকে ধ্বংস বা বিনাশ বলে মনে করে, কিন্তু সত্যদ্রষ্টা ঋষির কাছে তা ভিন্ন অর্থ বহন করে। তাই আপাত-ব্যর্থতা ব্যর্থতা নয়, আসলে তা নব-সৃষ্টির পূর্বাভাস মাত্র। মানুষ তার অন্ধতার জন্যে এই মহাসত্য উপলব্ধি করতে পারে না।

২০। **যত বড়ো হোক ইন্দ্রধনু সে**
সুদূর আকাশে আঁকা,
আমি ভালবাসি মোর ধরণীর
প্রজাপতিটির পাখা॥ [ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৮২]

অফুরন্ত সৌন্দর্যের ডালি সাজিয়ে প্রকৃতি আমাদের কাছে আমন্ত্রণলিপি পাঠায়। সৌন্দর্যপ্রিয় মানুষ এ আমন্ত্রণে সাড়া না দিয়ে পারে না। তাই সে ছুটে যায় সাগর জলে আলোর নাচ দেখতে, তুষারমৌলি হিমালয়ের নির্জনতা উপভোগ করতে। সুদূর আকাশের পটে আঁকা ইন্দ্রধনু প্রকৃতির এক অপরূপ সৃষ্টি। তার রঙবাহারী রূপের মোহে আকৃষ্ট হয়ে মানুষের মন সুদূরের দিকে ধাবিত হয়, কিন্তু বিপুল সুদূরের ব্যবধান আমরা কিছুতেই দূর করতে পারি না। তাই পরম শ্রেয় আমাদের অধরা থেকে যায়। অন্যদিকে প্রজাপতির পাখায় পাখায় যে অনুপম সৌন্দর্য তা আমাদের একান্ত ঘরের সম্পদ। তাকে আমরা উপলব্ধি করি, স্পর্শ করি, একান্ত নিজের করে পাই।

২১। **"রথযাত্রা, লোকারণ্য, মহা ধুমধাম**
ভক্তেরা লুটায়ে পথে করিছে প্রণাম।
পথ ভাবে 'আমি দেব', রথ ভাবে 'আমি',
মূর্তি ভাবে 'আমি দেব', হাসে অন্তর্যামী॥"

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

জগন্নাথদেবের রথের সামনে ভক্ত ভক্তির আতিশয্যে অন্তরের অর্ঘ্য নিবেদন করে তৃপ্ত হতে চায়। ভক্তির আবেগে সে রথ-পথ, এমন কি মূর্তিকেও ঈশ্বর বলে মনে করে। কিন্তু এগুলির কোনোটিই ভগবান নয়, তাঁর প্রতীকমাত্র। ভক্তের লক্ষ্য হল অন্তর্যামী ভগবান। পূজার আচার-অনুষ্ঠান মূর্তি-বলি-মন্ত্র-পুরোহিত এসব হল ভগবৎ-চেতনার বাইরের রূপ। পথের, রথের, এমন কি বিগ্রহের গর্ব দেখে অন্তর্যামী ভগবান অন্তরালে বসে কৌতুকে হাসেন। ধর্মের নামে এই অনাবশ্যক বাহুল্য ও বাহ্যিক অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিরর্থক। তাই বুঝি ঈশ্বরের কৌতুক-হাসির সঙ্গে মিলিত

হয় চোখের জল। ভক্তের অজ্ঞতা দেখেই হয়তো তিনি যুগে যুগে দূত প্রেরণ করেন আমাদের এই সংসার-সীমান্তে, যারা সারা জীবন সত্যসাধনের আদর্শ প্রচার করে যান।

২২। দুঃখ যে পাপের ফল তাহা কে বলিল, পুণ্যের ফলও হইতে পারে। কত ধর্মাত্মা আজীবন দুঃখে কাটাইয়া গিয়াছেন। [উঃ মাঃ ১৯৮২]

সুখ আর দুঃখ নিয়েই মানুষের জীবন। আলো আর অন্ধকারের মতো এরা একে অন্যের পরিপূরক। সাধারণ মানুষের কাছে দুঃখ পাপকর্মের ফল-রূপে বিবেচিত হয়, কিন্তু জ্ঞানী বা চিন্তাশীল মানুষের কাছে দুঃখ সর্বদা বর্জনীয় নয়। তাঁরা মনে করেন, দুঃখের আগুনে পুড়ে মানুষ হয়ে ওঠে সোনার মতো খাঁটি। মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের জন্যে দুঃখ-বেদনা আঘাত-সংঘাতের প্রয়োজন আছে। যারা কেবল নিজের স্বার্থ দেখে, তাদের কাছে ত্যাগ বা দুঃখ এক ভয়াবহ ব্যাপার। কিন্তু ত্যাগ ও দুঃখের মধ্য দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যে আছে মানব-জীবনের চরম সার্থকতা। যদিও স্বার্থত্যাগ করে পরার্থে নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিসর্জন করার মধ্যে আছে দুঃখ বা অসহ্য বেদনা, কিন্তু সেই দুঃখের জ্বালা বা বেদনার তীব্রতাই মানুষকে প্রতিষ্ঠিত করে মনুষ্যত্বের সিংহাসনে। বুদ্ধদেব প্রমুখ ধর্মাত্মারা দুঃখকে বরণ করেছেন জীবন-সাধনারই অঙ্গ হিসাবে। তাঁদের এই দুঃখব্রত জগতে পুণ্যব্রত বলেই স্বীকৃত।

২৩। অন্য খরচের চেয়ে বাজে খরচেই মানুষকে যথার্থ চেনা যায়। কারণ, মানুষ ব্যয় করে বাঁধা নিয়ম অনুসারে, অপব্যয় করে নিজের খেয়ালে। [উঃ মাঃ ১৯৮০]

যেখানে মানুষ প্রতিমুহূর্তে গ্রাসাচ্ছাদন বা মৌল প্রয়োজনবোধের চুলচেরা হিসেবের মধ্যে বাস করে সেখানে কাজ করে তার হিসেবী মন। কিন্তু এই হিসেবের বাইরে যখন সে পা বাড়ায় তখন বেরিয়ে পড়ে তার অন্তরের ছবি। আমরা কাজের জগতে যন্ত্রের মতো। কিন্তু যখন বইমেলায় গিয়ে কোনো কবিতার বই কিনি তখন বেরিয়ে আসে আমাদের অন্তরবাসী সেই মানুষটি যাকে দশটা-পাঁচটার অফিস-পাড়ার ভিড়ে অথবা থলি-হাতে মাছের বাজারে খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন সে দৈনন্দিনতা বা প্রাণধারণের নিত্যকর্ম-পদ্ধতির ঊর্ধ্বে। আবশ্যিক ব্যয়ে মানুষ যেন কুণ্ঠিত, অনাবশ্যক ব্যয়ে যেন সে উন্মোচিত। তাই দরিদ্রের ঘরেও বিষ্ণুপুরের পোড়ামাটির ঘোড়াটি মুহূর্তে দেয় তার সুরুচির পরিচয়।

২৪। যথাসাধ্য ভালো বলে, ওগো আরো ভালো
কোন্ স্বর্গপুরী তুমি করে থাকো আলো।
আরো-ভালো কেঁদে কহে, আমি থাকি হায়
অকর্মণ্য দাম্ভিকের অক্ষম ঈর্ষায়॥ [উঃ মাঃ ১৯৮১]

সাধারণ মানুষ সাধ্যমতো পরিশ্রম করে যা অর্জন করে বা যা সৃষ্টি করে তার মূল্য কম নয়, কিন্তু যে অক্ষম সে সক্ষমের ঐ কৃতিত্বটিকে অবজ্ঞা করে। তার ভাবটা এই—

এ আর এমন কী ? ইচ্ছে করলে আমি এর চেয়ে আরও কত ভালো করতে পারি। বেশ বোঝা যায়, এই মনোভাবটি ঐ অলস ও অকর্মণ্য মানুষটির ঈর্ষাপ্রসূত। 'আরো-ভালো' সর্বদাই কাম্য, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু সাধারণ শক্তির মানুষ সর্বতোভাবে চেষ্টা করে যতটুকু কৃতিত্ব অর্জন করে তাকে অবজ্ঞা করার কিছুই নেই। অবজ্ঞা অশক্তের লক্ষণ, শক্তের নয়।

২৫। বাহিরায় নদী যবে সিন্ধুর উদ্দেশে
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি।

[মেঘনাদবধকাব্য : মধুসূদন]

সঙ্কল্পই শক্তি। দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে যে-কোনো কঠিন কাজে এগিয়ে গেলে সাফল্য নিশ্চিত। পথের সমস্ত বাধা দূরে সরে যায় সঙ্কল্পের ব্যক্তিত্বমণ্ডিত সবল মূর্তিটি দেখে। নদী যখন পাহাড় থেকে নেমে সমুদ্রে যেতে চায় তখন শিলার বাধাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে এগিয়ে চলে। বিদ্যাসাগর যে বাধার দামোদর পেরোতে পেরেছিলেন তার মূলে ছিল তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প। তাই রামেন্দ্রসুন্দর এই প্রসঙ্গে বলেছেন : "সুরনদী যখন ভূমিপৃষ্ঠে অবতরণ করে তখন কাহারো সাধ্য হয় নাই যে, সে গতির পথে দাঁড়াইতে পারে। দেশাচারের দারুণ বাঁধ তাহা রোধ করিতে পারে নাই। সমাজের ভ্রূকুটি-ভঙ্গিতে তাহার স্রোত বিপরীত মুখে ফেরে নাই।"

শিবকে পাবার জন্যে পার্বতী কঠোরতম তপস্যায় মগ্ন হয়েছিলেন। তাঁকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যায় নি। তাই কবি বললেন, এ তো হবেই :

ক ঈপ্সিতস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ
পয়শ্চ নিম্নাভিমুখি প্রতীপয়েৎ।

ঈপ্সিত বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় মন এবং নিম্নাভিমুখী জলধারাকে কে বিপরীত মুখে ফেরাতে পারে ? শিবকে আমরা প্রতীক হিসেবেও নিতে পারি। 'শিব' আর মঙ্গল সমার্থক। মঙ্গলকামনা নিয়ে আমাদের যে-তপশ্চারণ তা সিদ্ধ হবেই। কোনো প্রতিবন্ধকতাই কৃতসঙ্কল্প মঙ্গলকামীর গতিরোধ করতে পারবে না।

২৬। 'আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে'। [অন্নদামঙ্গল : ভারতচন্দ্র]

উচ্চ চিন্তা আর সরল জীবন যাপন এই ছিল প্রাচীন ভারতের আদর্শ। তারা জানত কামনার দ্বারা কামনার উপশম হয় না। এর জন্যে চাই নিবৃত্তি। তাই নিবৃত্তির দ্বারা প্রবৃত্তিকে দমন করা যায় বলে ভারতীয় ঋষিরা সংযম অভ্যাস করতে বলেছেন।

আমাদের দেশের মানুষ চিরকাল অল্পে সন্তুষ্ট। মানুষ কোনো দিন ভোগ বা ঐশ্বর্যের দ্বারা সন্তুষ্ট হতে পারে না, এ সত্য তাদের জানা ছিল। তারা জানত সন্তোষের জন্মভূমি মানুষের হৃদয়। মনের মধ্যে সন্তোষ থাকলে মানুষ সামান্য বস্তুর মধ্যেই অসামান্যের সন্ধান লাভ করতে পারে। তা ছাড়া, অর্থ অনেক সময় অনর্থের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই এদেশের মানুষ বিত্তের চেয়ে চিত্তের সন্তুষ্টিকেই মূল্য দিয়েছে বেশি। তবে বিত্তহীনতা বা দারিদ্র্যকে তারা চায় নি, চেয়েছে মোটামুটি এমন

একটি আর্থিক সামর্থ্য যাতে সন্তানসন্ততিদের মুখে প্রয়োজনীয় আহার্যটুকু তুলে দিতে পারা যায়। দুধে-ভাতে কথাটিতে আছে এই সাধারণ স্বচ্ছলতার ইঙ্গিত।

২৭। নিশার স্বপন সুখে সুখী যে, কি সুখ তার ?
জাগে সে কাঁদিতে।
ক্ষণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাত্র আঁধার
পথিকে ধাঁধিতে !

[আত্মবিলাপ : মধুসূদন দত্ত]

ছলনাময়ী কু-আশা মানুষের আকাঙ্ক্ষার আগুনকে দ্বিগুণ বর্ধিত করে তাকে মোহমন্ত্রে আচ্ছন্ন করে দূরে সরে যায়। আশার মরীচিমায়ায় আচ্ছন্ন হয়ে মানুষ সারা জীবন ছুটে বেড়ায়, অবশেষে তার যাত্রাপথ একদিন চরম সর্বনাশের কিনারে এসে শেষ হয়। দুঃসহ দুঃখযন্ত্রণায় নিপীড়িত মানুষ আশার ছলনায় মুগ্ধ হয়ে এক সৌভাগ্যের স্বপ্নরাজ্য রচনা করে, কিন্তু এই কল্পনার রাজ্য বেশিদিন স্থায়ী হয় না। কু-আশার ঘোর কেটে গেলে মানুষ যখন তার সুখকল্পনার সঙ্গে বাস্তবে কোনো মিল খুঁজে পায় না, তখন সে মোহভঙ্গে বেদনায় আর্তনাদ করতে থাকে। কু-আশার সঙ্গে অন্ধকার রাত্রে বিদ্যুতের তুলনা করা চলে। অন্ধকারে যে পথিক পথ চলে তার চোখে অন্ধকার সহ্য হয়ে যায়। সেই অন্ধকারের বুক চিরে বিদ্যুতের আলো জ্বলে উঠতে দেখে পথিকের মনে হয় সেই আলো বুঝি চিরস্থায়ী। কিন্তু ক্ষণতরে উজ্জ্বল আলো বিকিরণ করেই বিদ্যুদালোক পথিককে আরও গভীর অন্ধকারের মধ্যে নিক্ষেপ করে। আশার ধর্মও তাই। আশা মানুষকে সুখস্বপ্নে বিভোর করে, তাকে পরিচিত পৃথিবী থেকে এক অপরিচিত জগতের মধ্যে টেনে আনে। কিন্তু পরিশেষে মোহমুগ্ধ মানুষকে এক চরম সর্বনাশের কিনারে উপস্থিত করে আশা মায়াবিনীর মতো দূরে সরে যায়।

২৮। ভক্তের হৃদয় ভগবানের বৈঠকখানা।

(শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম ভাগ)

ঈশ্বরসন্ধানে কত মানুষ শাস্ত্রের সাগরে ডুব দেয়। দর্শন-সমুদ্র মন্থন করে মন্দিরে মসজিদে আর গহন তীর্থে ঘোরাঘুরি করে। কিন্তু এ যেন রবীন্দ্রনাথের ‘পরশমণি’ কবিতার সেই ‘ক্ষ্যাপা খুঁজে ফেরে পরশপাথর।’ দেবতার সন্ধান মেলে কই ? অথচ দেবতা ভক্তের অন্তরেই বিরাজিত। এ দেবতা ভক্তের আকুল আহ্বানে ভক্ত-হৃদয়ের দুয়ারে এসে ধরা দেন। দুয়ারে নয়—একেবারে ভক্তহৃদয়ের আপন ঘরে আপনজনের মতো। এখানেই ভক্ত আর ভগবানের সম্পর্ক মধুর আলাপে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে।

ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক নিছক পরিচয়ের বন্ধনে বদ্ধ নয়, গভীর আত্মীয়তার সূত্রে গ্রথিত। আর সেই স্নেহসিঞ্চিত আত্মীয়তার তাগিদেই ভগবান ভক্তের অন্তরে ধরা দেন, ভক্তও ভগবানের স্নিগ্ধ সান্নিধ্যে আবিষ্ট হন। ভক্ত-ভগবানের সম্বন্ধ যখন জমাট বাঁধে তখনই ভক্ত নিশ্চিন্ত বলতে পারেন—‘আমায় নইলে ত্রিভুবনেশ্বর তোমার প্রেম হত যে মিছে।’

আসলে অন্তর-জগতে ঈশ্বরোপলব্ধিই সাধন-সাফল্যের মর্মকথা। এই উপলব্ধি যিনি লাভ করেছেন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় আর 'শুট্‌কে সাধু' থাকেন না, 'রসে বশে' থাকেন। এই একই উপলব্ধি থেকে বৈষ্ণবরসজ্ঞ কবি গেয়ে ওঠেন 'প্রিয়েরে দেবতা করি, দেবতারে প্রিয়।' ভক্ত-ভগবানের সম্পর্ক যখন প্রভু-ভক্তের তখন সেখানে রসের সন্ধান মেলে না। পিতা-পুত্র কিংবা মাতা-পুত্রের সম্পর্কেও সখ্যসুলভ অন্তরঙ্গতার স্পর্শ মেলে না। কিন্তু ভক্ত-ভগবানের পারস্পরিক বন্ধন যখন ঘনিষ্ঠ, বন্ধুর রস-সম্পর্কে সম্পৃক্ত তখনই তা অসঙ্কোচ মিলনের আনন্দে সার্থক। প্রিয়মিলনের প্রত্যাশী ভক্ত কবির ভাষায় গেয়ে ওঠেন :

'আমি হৃদয়েতে পথ কেটেছি, সেথায় চরণ পড়ে তোমার,
সেথায় চরণ পড়ে।' এ চরণ প্রভু ভগবানের নয়, বন্ধু ভগবানের।

২৯। এ সংসারে প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ।

[দুর্গেশনন্দিনী : বঙ্কিমচন্দ্র]

শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রাকালে মহর্ষিদেব বলেছিলেন : 'বুঝিলাম স্নেহ অতি বিষম বস্তু।' অরণ্যবাসী সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর কণ্ঠে এই উক্তি আমাদের কিঞ্চিৎ বিচলিত করলেও এ কথা সত্য যে, স্নেহ এ সংসারে জাদুকরের ভূমিকায় অবতীর্ণ। মানুষ সবকিছু জয় করতে পারে, পারে না স্নেহের শাসনকে জয় করতে। তাই বিশ্বজয়ী লৌহ-হৃদয় মানুষ একটি শিশুর স্নেহে বন্দী হয়েছে এমন ঘটনা পৃথিবীর ইতিহাসে দুর্লভ নয়। শোনা যায়, গ্যারিবল্ডি মৃত্যুর পূর্বে বলেছিলেন, 'আমার জানালায় রোজ একটি পাখি এসে বসে, তাকে কিছু খাবার দিয়ো'। যাকে কেউ বন্দী করতে পারে নি সেই বীর যোদ্ধা শেষ অবধি বন্দী হয়েছিলেন একটি পাখির স্নেহে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নাটকে গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীকে এক বালিকার স্নেহে বিচলিত হতে দেখা গেছে। আর অনুরূপভাবে বিসর্জন নাটকে রঘুপতিকেও শক্তির দম্ভ পরিত্যাগ করে দেখা গেছে স্নেহের কাছে নতজানু হয়ে পরাজয় মানতে।

আমাদের সংসারজীবনেও প্রতিনিয়ত এ সত্য উপলব্ধি করি। শক্তি দিয়ে, অর্থ দিয়ে যাকে জয় করতে পারি না সেই অজেয় পৌরুষ একটি শিশুর একবিন্দু চোখের জলে ভেসে যায়। স্নেহের জাদুকাঠির স্পর্শে সংসারে কত বড়ো বিপর্যয় কেটে যায় তার সবচেয়ে বড়ো সাহিত্যিক নজির ইংরেজকবি টেনিসনের কবিতায় সদ্য-বিধবার একটি উক্তি, যিনি অনাথ পুত্রকে কোলে নিয়ে বলেছিলেন : 'Sweet my child, I live for thee'—মানিক আমার! তোর জন্যেই বাঁচতে হবে আমাকে।

৩০। তুমি বসন্তের কোকিল, শীতবর্ষার কেহ নও।

[কমলাকান্তের দপ্তর : বঙ্কিমচন্দ্র]

নববর্ষার আগমনে অরণ্যপ্রকৃতি এক অপরূপ সৌন্দর্যশোভায় নবযৌবন লাভ করে। ফুলের সৌরভ নিয়ে শীতল বাতাস বইতে থাকে। বিচিত্র ফুলের সমারোহ দেখে নয়ন বিমোহিত হয়। বসন্তের জাগ্রত দূত হল কোকিল। ফুলকুসুমিত

শাখার আড়ালে বসে বসন্তের মৃদুমন্দ বাতাস গায়ে মেখে সে কেবল মনের সুখে গান করে। বসন্ত ছাড়া অন্য কোনো ঋতুতে কোকিলের সন্ধান পাওয়া যায় না। গ্রীষ্মের প্রচণ্ডতায়, বর্ষার সিক্ততায়, শীতের নিদারুণ শৈত্যে এই চিরসুখী পাখিটিকে প্রকৃতির রাজ্যে কোথাও পাওয়া যায় না। তারা হল 'সুখের পায়রা', দুঃখের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই। কোকিল শুধু বনেই থাকে না, মানুষের সমাজেও এক ধরনের কোকিলের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। তারা মানুষ, তবে কোকিল-শ্রেণীর মানুষ। স্বার্থই তাদের কাছে পরমার্থ, স্বার্থ ছাড়া তারা অন্য কিছু বোঝে না। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে সুখের দিনে তারা মানুষের অনুচর হয়, কত হাসে—খায় দায় গান করে, মন ভোলায়। কিন্তু দুঃখের দিনে তাদের আর দেখা যায় না। সুখের বসন্ত শেষ হলে স্বার্থান্বেষী মানুষ স্বার্থের সন্ধানে অন্যত্র গমন করে। একবার পিছনের দিকে ফিরে তাকায় না। এই রকমের মানুষকেই বলা চলে বসন্তের কোকিল।

৩১। স্তাবক অতি ভয়ানক শত্রু [প্রবচন-সংগ্রহ : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

স্তাবকের মতো এত বড়ো শত্রু মানুষের আর নেই। কিন্তু মজার ব্যাপার হল এই যে, তারা মুখে বন্ধুত্বের মুখোস এঁটে আমাদের মন ভোলায়।

স্তাবক সবচেয়ে বড়ো ক্ষতি করে আমাদের আত্মদর্শনের বিঘ্ন ঘটিয়ে। ওদের মিষ্টি কথার মোহে ভুলে আমরা নিজের শক্তি সম্বন্ধে ক্রমেই অন্ধ হয়ে পড়ি। চাটুকারের স্তুতিবাক্যে ভুলে মনে মনে রচনা করি মেঘের উপর প্রাসাদ। ওরা বলে : 'সমুদ্র আপনার আদেশ পালন করে।' কিন্তু ক্যানিউটরা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন স্তাবকের কথায় আর বাস্তবের মধ্যে ব্যবধান কতখানি। এই সব স্তাবকের চেয়ে শত্রুও বুঝি আমাদের বন্ধু। কারণ তারা সমালোচনার মাধ্যমে দোষত্রুটিগুলিকে চোখের সামনে তুলে ধরে চরম সর্বনাশের হাত থেকে আমাদের রক্ষা করে।

৩২। বিপদ অতি নির্দয় গুরু [প্রবচন সংগ্রহ : দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

মানুষের জীবন নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে দিয়েই আবর্তিত। জীবনে যেমন সুখ আছে, তেমনি আছে দুঃখ। সম্পদও যেমন আছে, বিপদও তেমনি আছে। আঘাত-সংঘাতের মধ্যে যে-মানুষ এসে দাঁড়িয়েছে তাকে তো সব বিপদই বরণ করে নিতে হবে। বিপদবরণেই তার সাহসের পরিমাপ, বিপদ-বিজয়েই তার পৌরুষের পুরস্কার।

দুর্বল মানুষ বিপদকে এড়িয়ে চলতে চায়। কিন্তু বিপদই মানুষের মনুষ্যত্ব, তার পৌরুষবিচারের কষ্টিপাথর। বিপদই আমাদের চিনিয়ে দেয় প্রকৃত বন্ধু কে। বিপদই আমাদের শক্ত করে, জীবনের মুখোমুখি দাঁড় করায়, জীবনকে চিনতে সাহায্য করে। বিপদই আমাদের বলে দেয়, জীবন কী ও কেন। এদিক দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, বিপদ আমাদের গুরু। গুরু তাঁর ভক্তকে পথের নির্দেশ দেন। কখনও বা কঠিন আঘাতে জর্জরিত করে তোলেন শিষ্যের নিদ্রিত সত্তার বিকাশের জন্যে। 'রুদ্র যত্তে দক্ষিণং মুখং তেন মাং পাহি নিত্যম্।' ঈশ্বরের কেবল প্রসন্ন মুখদর্শনে আমাদের মানবসত্তা সার্থক হয় না, তাঁর রুদ্র মূর্তির পরিচয়ে আমরা সচেতন হই, জাগ্রত হই।

বিপদ আমাদের জীবনে তাঁর 'মহদ্ভয়ং বজ্রমুদ্যতম্' মূর্তি পরিগ্রহ করে গুরুরূপে আমাদের সামনে উপস্থিত হন। কিন্তু গুরু বড়ো নির্দয়, নির্মম। তিনি চান তাঁর শিষ্য সংঘাতের অগ্নিদহনে পবিত্র হোক, ধন্য হোক। এই বাস্তব জীবনে বিপদরূপী নির্দয় গুরু আমাদের শিক্ষা দেন আত্মবিশ্বাসে পূর্ণ থেকে দৃঢ় হাতে হাল ধরতে।

৩৩। স্বর্গে যদি বিদ্বেষবুদ্ধি থাকে, তাহা নরক বলি; আর অকুল নরকে যদি এক হৃদয় থাকে তাহা স্বর্গতুল্য জ্ঞান করি।

[সাধারণী : অক্ষয়চন্দ্র সরকার]

স্বর্গ আর নরক মানুষের এই ধুলোমাটির পৃথিবী থেকে বহু দূরে কোনো কল্পনার রাজ্যে নেই। কবি বলেছেন : 'কে বলে স্বর্গ, কে বলে নরক, কে বলে তা বহু দূর ? মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক মানুষেতে সুরাসুর'। মানুষ যখন মানুষকে ভালবাসে, মানুষের দুঃখে কাঁদে, 'বিদ্বেষ-বিষ' নাশ করে পরস্পর মৈত্রীর বন্ধনে আবদ্ধ হয় তখনই ধুলোমাটির এই পৃথিবীর উপর স্বর্গ রচিত হয়। এই স্বর্গ লাভের জন্যে সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী সাজতে হয় না। স্বর্গ-স্বাদ পেতে হলে কেবল ভালোবাসতে হয়, বিদ্বেষ-বুদ্ধি ত্যাগ করে মানুষের কল্যাণে মনপ্রাণ ঢেলে দিতে হয়।

স্বর্গ-সৌধের মূলভিত্তি হল বিদ্বেষবুদ্ধিহীন শুদ্ধ অন্তর। তাই ঈশ্বরের দূত বার বার এই সংসারসীমান্তে এসে ঘোষণা করে গেছেন : 'ভালোবাসো—অন্তর হতে বিদ্বেষবিষ নাশো'। অন্তরে বিদ্বেষ-বিষ থাকলে স্বর্গও নরকে পরিণত হয়। আবার অন্তর থেকে এই বিদ্বেষ-বিষ দূর করলে নরকের বুকেও নেমে আসে মানুষের বহু-আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গ। তখন অনন্ত ভালবাসার আলোয় নরকের অন্ধকার দূর হয়ে ফুটে ওঠে স্বর্গীয় সুষমা।

৩৪। **যে নদী হারায়ে স্রোত চলিতে না পারে**
সহস্র শৈবালদাম বাঁধে আসি তারে
যে জাতি জীবনহারা অচল অসাড়
পদে পদে বাঁধে তারে জীর্ণ লোকাচার।—চৈতালি : রবীন্দ্রনাথ

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

নদীর প্রবাহ নদীকে সজীব রাখে। প্রবাহই নদীর জীবন। এই প্রবহমানতা নষ্ট হলে নদী হয় মৃত, তখন চারদিক থেকে শেওলা এসে নদীকে আরও ক্লেদাক্ত করে তোলে। কিন্তু নদী সজীব থাকলে তার প্রবাহে এই সব জঞ্জাল ভেসে যায়।

নদীর মতো এই প্রবহমানতা মানুষের জীবনেও এক মূল্যবান সম্পদ। গতি সমাজের স্বাস্থ্যরক্ষা করে। যে-সমাজ গতিশীল তার সমৃদ্ধির পথ থাকে উন্মুক্ত। কিন্তু সমাজের এই গতির ছন্দ যখন কেটে যায়, গতির স্থান দখল করে স্থিতি। বিশ্বের সঙ্গে নাড়ির যোগ ছিন্ন হওয়ায় আলোবাতাসের মতো জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রবেশদ্বার যায় রুদ্ধ হয়ে। রুদ্ধধারা নদীকে যেমন শেওলা এসে ঘেরে, মানুষের সমাজকেও ঠিক তেমনি ঘিরে ফেলে কুসংস্কার, ক্ষুদ্র লোকাচার আর দেশাচারের নাগপাশগুলি। বিশ্বদেবতার পুজা বন্ধ হয়ে সমাজে শুরু হয় লোকাচারের পুজা। মানুষ তখন মহৎ দর্শনের কথা ভুলে

গিয়ে অষ্টমীতে লাউ খেতে আছে কিনা অথবা শনিবারে বেগুন পোড়াতে আছে কিনা এই সব অসার চিন্তায় কাল কাটাতে থাকে। আমরা মধ্যযুগের ভারতবর্ষের দিকে তাকালে দেখব গতিহীন কর্মহীন সমাজের বুকে নেমে এসেছিল এমনই এক সর্বনাশের অমারাত্রি। সমাজ তখন এগিয়ে যেতে বলে নি, পায়ে পায়ে পরিয়েছে নিষেধের বেড়ি। সমাজের চলার ধারা অব্যাহত রাখার জন্যে সংস্কারমুক্ত মানুষের চিন্তার অন্ত নেই। তাঁরা নানাভাবে সমাজকে গতিশীল করতে চান।

৩৫। **কে লইবে মোর কার্য, কহে সন্ধ্যারবি।**
শুনিয়া জগৎ রহে নিরুত্তর ছবি।
মাটির প্রদীপ ছিল, সে কহিল, স্বামী,
আমার যেটুকু সাধ্য করিব তা আমি। [কণিকা : রবীন্দ্রনাথ]

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই আসে মহৎ কর্মের আহ্বান। মানুষ কর্মী, তার কর্মসাধনায় হয়েছে সভ্যতার বিকাশ। এই কর্মী মানুষ মহৎ কর্মের আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারে না, শক্তি তাদের যতই সীমাবদ্ধ হোক, যতই ক্ষুদ্র হোক। কাঠবিড়ালীর মতো ক্ষুদ্র প্রাণীর সাগরবন্ধনে রামচন্দ্রকে সহায়তা করার কাহিনী সর্বজনবিদিত। কর্মী মানুষ হল রামায়ণবর্ণিত সেই কাঠবিড়ালীদের মতো। কর্তব্যবোধ তাদের কর্মজীবনে টেনে আনে। নিজের শক্তিসামর্থ্য বা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের কথা তারা ভাবে না। এইভাবে কালে কালে কর্মের মহান ব্রত এক পুরুষের কাছ থেকে অন্য পুরুষে সঞ্চারিত হয়। কর্মের ধারা রুদ্ধ হলে মানুষের চলার গতি পথের মাঝেই থেমে থাকত। কিন্তু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ কখনই এত বড়ো সর্বনাশকে প্রশ্রয় দেবে না। তারা পূর্বসূরীদের আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত করবার জন্যে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। ক্ষুদ্র হলেও, মহৎ কর্মের দ্বারা তারা লাভ করবে মহত্ত্ব।

৩৬। **'নদীর এপার কহে ছাড়িয়া নিশ্বাস,**
ওপারেতে সর্ব সুখ আমার বিশ্বাস।
নদীর ওপার বসি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে,
কহে, যাহা কিছু সুখ সকলি ওপারে॥ [কণিকা : রবীন্দ্রনাথ]

মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে প্রাপ্তির সমন্বয় কোনো দিন সাধিত হয় না। অন্তহীন আশার আগুন বুকে নিয়ে দিকবিদিকে ঘুরে বেড়ায় মানুষ, কিন্তু আশানুরূপ ফল লাভ করতে পারে না। এটাই মানুষের জীবনের ট্র্যাজেডি। আসল কথা হল নিজেকেই বোঝে না মানুষ, বোঝে না কী পেলে তার আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটবে। তাই আমরা যা চাই তাতে মন ভরে না, যা পাই না তাকে পাবার জন্যে আকুল আগ্রহে প্রহর গুণতে থাকি। চিরকালের মানবহৃদয়ের এই দ্বন্দ্বকেই রবীন্দ্রনাথ সুন্দরভাবে প্রকাশ করে বলেছেন : 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'। এই দ্বন্দ্ব মানুষের অনাদি-অনন্ত কালের দ্বন্দ্ব। এই দ্বন্দ্বের আঘাত-সংঘাতের মধ্যে দিয়েই মানবজীবনের ধারা প্রবাহিত হয়ে চলেছে যুগ থেকে যুগান্তরে, কাল থেকে

কালান্তরে। এই-খোঁজা, এই-যে আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার প্রবণতা, এর মধ্যেই কিন্তু মানুষের শক্তির পরিচয় প্রকাশিত।

৩৭। যার খুশি রুদ্ধচক্ষে করো বসি ধ্যান,
বিশ্ব সত্য কিংবা ফাঁকি লভো সেই জ্ঞান।
আমি ততক্ষণ বসি তৃপ্তিহীন চোখে
বিশ্বরে দেখিয়া লই দিনের আলোকে॥ [চৈতালী : রবীন্দ্রনাথ]

যাঁরা দার্শনিক, যাঁরা তত্ত্বজ্ঞানী, যাঁরা নীরস সত্যের অনুসন্ধানী তাঁরা প্রকৃতির রূপলাবণ্যের দিকে, চিরসৌন্দর্য-সুষমার দিকে ফিরে তাকায় না। 'তত্ত্বজ্ঞানী জপ করছেন নিশ্বাসে প্রশ্বাসে, না, না, না, না-পান্না, না-চুনি, না-আলো, না-গোলাপ।' —রূপময় এই বিশ্বসৃষ্টির দিকে ফিরে তাকাবার সময় তাঁদের কোথায়? তাঁরা দু'চোখের পাতা বন্ধ করে সমাধানহীন নীরস তর্কের কচকচিতে জীবন অতিবাহিত করেন। কিন্তু এই বিশ্বপ্রকৃতির রূপের পাঠশালায় প্রকৃতিদেবী তাঁর ভক্ত পাঠকদের যে-শিক্ষা দেন তার মূল্য নিতান্ত কম নয়। প্রকৃতিপূজারীর দৃষ্টিতে প্রকৃতি তাঁর নিজের ভক্তদের যা দেন তা অতি অমূল্য দান। এই দান, এই শিক্ষা, ছড়ানো আছে ফুলের গন্ধে, পাখির কলকূজনে, তটিনীর কলতানে, সমুদ্রের তরঙ্গভঙ্গে, আকাশের মেঘের গায়ে, রামধনুর বর্ণবৈচিত্র্যে, প্রজাপতির ডানায় আর ময়ূরের কলাপবিস্তারে। কেবল এই পাঠ পড়তে জানা চাই, আর চাই প্রকৃতির জন্যে হৃদয়ভরা দরদ। প্রকৃতির লীলাভূমি থেকে যে-শিক্ষা পাওয়া যায় সে শিক্ষা হল রসের শিক্ষা। রসহীন সাধনায় মানুষকে শুকনো সন্ন্যাসী করে, প্রকৃত সাধকের যা কাম্য নয়। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলতেন, 'আমাকে রসে-বশে রাখিস মা, শুকনো সন্ন্যাসী করিস নে।'

৩৮। তৃষিত গর্দভ গেল সরোবরতীরে,
ছি-ছি কালো জল! বলি চলে এল ফিরে।
জল কহে, 'জল কালো জানে সব গাধা,
যে জন অধিক জানে বলে জল সাদা।' [কণিকা : রবীন্দ্রনাথ]

সত্য হল ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নি। সত্য উপলব্ধির জন্যে সাধনার প্রয়োজন। বিনা সাধনায় সত্য লাভ করা যায় না। যত্নবানই রত্নলাভের অধিকারী। বিধাতার রাজ্যে এই নিয়ম যদি না থাকত তা হলে বিনা পরিশ্রমে মানুষ পরম সম্পদের অধিকারী হত। ফলে মানুষের গৌরব হত ক্ষুণ্ণ। ভারতচন্দ্র বলেছেন : 'পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে হীরার ধার।' হীরা অমূল্য সম্পদ কিন্তু সেই সম্পদের মূল্য রত্নবিদ ছাড়া অন্য কেউ উপলব্ধি করতে পারে না। তাই ভারতীয় সাধনায় 'অধিকারী' বলে একটা কথা আছে। সত্য উপলব্ধির জন্যে বহু সাধনা করে তবেই অধিকার অর্জন করতে হয়। যিনি তত্ত্বদর্শী, ভস্মের আচ্ছাদন সরিয়ে তিনি সত্যের অগ্নিকে আবিষ্কার করতে পারেন।

৩৯। কেরোসিন-শিখা বলে মাটির প্রদীপে—
'ভাই ব'লে ডাক যদি দেব গলা টিপে।'
হেনকালে গগনেতে উঠিলেন চাঁদা,
কেরোসিন বলি উঠে, 'এসো মোর দাদা'! [কণিকা : রবীন্দ্রনাথ]

এ পৃথিবীতে কাঞ্চনকৌলীন্য, বর্ণকৌলীন্য আর আভিজাত্যের মোহ মানুষে মানুষে রচনা করেছে বিভেদের প্রাচীর। মানবতা, স্নেহ, প্রীতি, প্রেম আজ সমাজ থেকে যেন অন্তর্হিত। তাই আত্মীয় যদি দরিদ্র হয় তা হলে বিত্তবান আত্মীয় তাদের সঙ্গে কোনোরকম সম্বন্ধ স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করে।

এই কৌলীন্যের মোহ এনেছে মানুষে মানুষে কৃত্রিম বিচ্ছেদ। সাধারণ মানুষের দিকে পিঠ ফিরিয়ে আমরা তথাকথিত 'বড়ো'র সঙ্গে সম্পর্কিত হতে চেষ্টা করছি, আত্মপ্রসাদ লাভ করছি সেই সম্পর্কের সূত্রে। এতে বড়ো না হয়ে আমরা যে নিজেরাই ছোটো হয়ে যাই সে বোধ আমাদের আচ্ছন্ন।

৪০। শৈবাল দিঘিরে বলে উচ্চ করি শির—
লিখে রাখো, এক ফোঁটা দিলেম শিশির। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

পরোপকার মানুষের ধর্ম। কেউ পরের উপকার করে প্রাণধর্মের তাগিদে, মানবতার খাতিরে, আবার এমন মানুষও পৃথিবীতে আছে যারা উপকার করে কেবল যশের মোহে, পরোপকারী বলে সমাজে নাম হবে তার আশায়। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর মানুষ সাধারণত উপকার করেই নিশ্চেষ্ট থাকে না, চারদিকে ঢাক পিটিয়ে বেড়ায়, আর উপকৃত ব্যক্তির কাছে সেই উপকারের কথাটি সদম্ভে ঘোষণা করে। হাতে হাতে উপকারের বিনিময়ে কিছু না পেলে ভাবে নিজের কৃত উপকার বুঝি ব্যর্থ হয়ে গেল। তাই দানের কথা স্মরণ করিয়ে রাখবার জন্যে তাদের হাস্যকর প্রয়াসের অন্ত নেই।

কিন্তু যে-সব মানুষ প্রকৃত মহৎ তাঁরা উপকার করে কোনোদিন গর্ববোধ করেন না। মনুষ্যত্ববোধের প্রেরণাতেই তাঁদের এই কল্যাণসাধনের প্রয়াস। তাঁদের কাছে দান গর্বের বস্তু নয়, তাঁরা দানকে মনে করেন সেবাব্রতের পুণ্য কর্ম। তাই উপনিষদ বলেছেন : শ্রিয়া দেয়ম্, হ্রিয়া দেয়ম্, সংবিদা দেয়ম্। অর্থাৎ সমস্ত অন্তর দিয়ে দানগ্রহীতার কল্যাণ কামনা করে দান করবে, সমস্ত অহংকারকে চূর্ণ করে শালীনতা-মণ্ডিত হয়ে দান করবে। সেই প্রসন্নতার দীপ্তি ও কান্তিতে তোমার মুখ অপূর্ব শ্রীমণ্ডিত হয়ে উঠবে।

৪১। দ্বার রুদ্ধ করে দিয়ে ভ্রমটারে রুখি
সত্য বলে, আমি তবে কোথা দিয়ে ঢুকি। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

মানুষের সাধনা সত্য-শিব-সুন্দরের সাধনা। এই সত্যলাভের জন্যে মানুষ বহুযুগ ধরে সাধনা করে এসেছে। তাকে অতিক্রম করতে হয়েছে কৃচ্ছ্রসাধনের কত দুর্গম পথ। আর এই সাধনার পথ কুসুম ছড়ানো নয়, এ পথে আছে সহস্র কাঁটা, আছে মিথ্যা, আছে অন্ধকার, আছে প্রতারণা। অনেক সময় ভুল করে মিথ্যাকে সে সত্য বলে গ্রহণ করে। কিন্তু তাই বলে কি সে সত্য-অনুসন্ধানের পথ থেকে সরে আসবে? নিজের

চারদিকে রক্ষাকবচের মতো রচনা করে রাখবে দুর্লঙ্ঘ্য প্রাচীর? তাই যদি সে করে, তা হলে সে এক ভুলের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে আর-এক ভুলের অচলায়তন রচনা করবে। তখন সে বিশ্বের চলমান জীবনপ্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে। সমাজের অগ্রগতির পথ যাবে বন্ধ হয়ে।

যৌবনকে সম্বোধন করে কবি বলেছেন: 'ভুলগুলো সব আনরে বাছা বাছা, আয় প্রমত্ত আয় রে আমার কাঁচা'। যে-যৌবন সত্যান্বেষী, ভুলের মধ্যে দিয়েই হবে তার পথ-রচনা। সে ভুল করবে, অগাধ জলে ঝাঁপ দিয়ে কুল পাবে না, তবু জীবন-মরণ-ঝড়ে যেখানেই তার ডাক পড়বে সেখানেই সে এগিয়ে যাবে। এই এগিয়ে যাওয়ার প্রবণতায় সে সত্য-মিথ্যার আলো-আঁধারির মধ্যে দাঁড়িয়ে উদগ্র জিজ্ঞাসায় সত্যকে আবিষ্কার করবে, তাকে প্রতিষ্ঠিত করবে জীবনে।

৪২। প্রাচীরের ছিদ্রে এক নামগোত্রহীন
ফুটিয়াছে ছোট ফুল অতিশয় দীন।
ধিক্ ধিক্ বলে তারে, কাননে সবাই,
সূর্য উঠি বলে তারে, 'ভালো আছ ভাই?' [কণিকা : রবীন্দ্রনাথ]

যে উদার তাঁর কাছে উচ্চনীচ ভেদ নেই, বিশ্বের সকলেই তাঁর আত্মীয়। উদার ব্যক্তি বিত্তবৈভব বা আভিজাত্য বিচার করে মানুষের মূল্য নির্ধারণ করেন না। তাঁদের অকৃপণ প্রীতি সূর্যের আলো আর বাতাসের মতো সকলকে স্পর্শ করে।

অন্যদিকে আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে যারা শক্তি, আভিজাত্য আর ঐশ্বর্যের দম্ভে ধরাকে সরা জ্ঞান করে। তাদের হাতে পদে পদে শক্তিহীন বিত্তহীন মানুষের লাঞ্ছনার অন্ত নেই। সেখানে প্রতিকারহীন শক্তের অপরাধে বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। কিন্তু প্রকৃত মানবপ্রেমিক এইসব লাঞ্ছিত অসহায় মানুষকে ধুলিশয্যা থেকে তুলে এনে সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁরা জাতি বা কুলের বিচার করেন না; দেখেন না আভিজাত্য, দেখেন না অর্থবৈভব। তাঁরা কেবল মানুষকে মানুষ হিসাবেই দেখেন। কারণ তাঁরা জানেন: সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।

৪৩। আম্র কহে, একদিন হে মাকাল ভাই—
আছিনু বনের মধ্যে সমান সবাই;
মানুষ লইয়া এল আপনার রুচি
মূল্যভেদ শুরু হল, সাম্য গেল ঘুচি। [কণিকা : রবীন্দ্রনাথ]

মানুষ ঈশ্বরের সন্তান, তাই মানুষে মানুষে কোনো ভেদ থাকতে পারে না। একই পরিবারে ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের যে-সম্পর্ক, বিশ্বের প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রতিটি মানুষের ঠিক সেই নিবিড় সম্পর্ক বিদ্যমান। মানুষে মানুষে এই সাম্যভাব, প্রীতি বা মৈত্রী আদিযুগে বিদ্যমান ছিল। কিন্তু সভ্যতাবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের অন্তরেও দেখা দিল লালসা, ঘৃণা, স্বার্থপরতা আর কপটতা। সরল-সুন্দর মানুষের জীবনের উপর নেমে এল কুটিলতার কালো পর্দা। প্রীতিপূর্ণ ভ্রাতৃত্বের মধুর সম্পর্কের

জায়গায় দেখা দিল জাতিভেদ, বর্ণভেদ ইত্যাদি ভ্রান্ত সংস্কার। এই ভেদজ্ঞানের মূলে আছে সভ্যতাবিকাশের এক অবাঞ্ছিত পরিণতি। একটা ভ্রান্তবুদ্ধি সহজ সুন্দর জীবন থেকে মানুষকে চুলচেরা হিসাবের রাজ্যে টেনে এনেছে। এর ফলেই এসেছে বৈষম্যবোধ। যার আছে আর যার নেই তারা-যে সহোদরস্থানীয়—এই অনুভূতিটাই হয়েছে অন্তর্হিত। ভ্রান্ত মূল্যবোধের ফলে এসেছে মিথ্যা অসাম্য-বোধ।

৪৪। **আকর্ষণগুণে প্রেম এক করে তোলে,**
শক্তি শুধু বেঁধে রাখে শিকলে শিকলে। [লেখন : রবীন্দ্রনাথ]

প্রেম যেমন বাঁধে শক্তিও তেমনি বাঁধে। কিন্তু দুয়ের বাঁধন সম্পূর্ণ ভিন্ন-প্রকৃতির। প্রেম কাছে টানে তার মাধুর্যে আর কোমলতায়। বিনা-বাঁধনে বাঁধবার অদ্ভুত দক্ষতা প্রেমের স্বভাবজ। বহুকে এক করে প্রেমিক প্রসন্ন হাসিতে চেয়ে থাকে। আর শক্তিমান ভয় দেখিয়ে বহুকে বশ করে দম্ভের পতাকা তোলে আকাশে। 'সমস্ত প্রজা আমার সন্তান' এই ভালবাসার মন্ত্র যে জানে সে সকলের মনের রাজা। 'আর আমি প্রভু তোমরা দাস' এই শক্তির দম্ভ নিয়ে যে রাজদণ্ড হাতে নিয়েছে সে হয় প্রজা-অসন্তোষের বলি। ইতিহাস এ কথার সাক্ষ্য দেবে। কোশলরাজকে নির্বাসনে পাঠিয়ে কাশীরাজ উপলব্ধি করেন ভালবাসাই সর্বজয়ী। লৌহ-শৃঙ্খল যে-শৃঙ্খলা আনে তা কৃত্রিম, ক্ষণস্থায়ী; কিন্তু প্রেম-শৃঙ্খল যে-শৃঙ্খলা আনে তা শাশ্বত, চিরকল্যাণময়।

৪৫। **বুদ্বুদ সে তো বদ্ধ আপন ঘেরে**
শূন্যে মিলায়, জানে না সমুদ্রেরে। [লেখন : রবীন্দ্রনাথ]

যারা ছোটো, যারা গণ্ডিটানা জীবনের সীমানার মধ্যে বাস করে, তাদের হৃদয় কোনোদিন মহৎ বা বৃহতের ধারণা করতে পারে না। বৃহতের ধারণার জন্যে প্রয়োজন বৃহৎ আধার, নদীখাদ কোনোদিন সমুদ্রের জল ধারণ করতে পারে না, তার জন্যে চাই বৃহৎ আধার। পৃথিবীতে কূপমণ্ডুক শ্রেণীর এক ধরনের মানুষ আছে যাদের ধ্যানধারণা অতি ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সেই অতিপরিচিত গণ্ডিটুকুই হল তাদের পৃথিবী। তার বাইরে যে বৃহৎ জগৎ কত মূল্যবান সম্পদ নিয়ে মানুষের জন্যে প্রতিনিয়ত আমন্ত্রণ লিপি পাঠায় সে লিপির ভাষা ক্ষুদ্রচেতা মানুষ পাঠ করতে পারে না। তারা বলতে পারে না, 'আমি চঞ্চল হে, আমি সুদূরের পিয়াসী'। ক্ষুদ্রচেতার মনে বৃহৎ বিশ্বের ধারণা থাকে না বলেই সুদূরের ব্যাকুল বাঁশির সুর তাদের হৃদয়ের দ্বারে আমন্ত্রণ জানিয়ে ব্যর্থ হয়।

৪৬। **অন্নের লাগি মাঠে**
লাঙলে মানুষ মাটিতে আঁচড় কাটে।
কলমের মুখে আঁচড় কাটিয়া
খাতার পাতার তলে
মনের অন্ন ফলে। [স্ফুলিঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ]

জীবিকার্জনের জন্যে মানুষ উদয়াস্ত পরিশ্রম করে। চাষী মাঠে চাষ করে, ফসল ফলায়। সেই ফসলে মানুষের ক্ষুধা মেটে। চাষীর সফলতা নিহিত ফসলের

সমারোহে। নতুন ধান্তে যখন নবান্ন হয় তখন মেহনতী চাষীর কর্মগৌরবই ঘোষিত হয় সেই উৎসবের লগ্নে। মাটির বুক চিরে চাষী শস্য ছিনিয়ে আনে, মানুষের মুখে অন্ন যোগায়, এটাই তো চাষীর জীবনের পরম গৌরব। 'বিশ্বপিতার মহাকারবারে' চাষী একজন কর্মী। তাই যেদিন বীজ থেকে চারার উদয় হয় সেদিন চাষীর আনন্দ জাগে বুকে। আর যেদিন সোনালী ফসল হাওয়ায় দোলে সেদিন চাষীর স্বপ্ন আন্দোলিত হতে থাকে সেই সঙ্গে। কিন্তু শুধু তো অন্ন নয়, অন্য চিন্তাও করতে হয় মানুষকে। কৃষিজীবীর গর্ব তার শস্যোৎপাদনে। আর বুদ্ধিজীবীর গৌরব বিদ্যাবুদ্ধির চর্চায়। তার কলমের মুখ থেকে কত বিচিত্র ভাবধারা ভাষায় অক্ষরে ঝরে পড়ে, সৃষ্টি হয় সংস্কৃতির। এই সংস্কৃতি মানুষের মনের ক্ষুধা মেটায়, মানুষকে সভ্য করে, উন্নত করে।

কিন্তু Agriculture ও culture অর্থাৎ কৃষি ও সংস্কৃতি দুটিরই প্রয়োজন আছে। এই দুটি সম্পদের যথার্থ মিলনেই আমাদের সভ্যতার জয়যাত্রা অব্যাহত থাকে। অনেকে culture-এর প্রতিশব্দ হিসাবে কৃষ্টি কথাটি প্রয়োগ করে থাকেন। 'কৃষি' ও 'কৃষ্টি' দুটি শব্দের ব্যুৎপত্তি কিন্তু এক। দুটি শব্দই সৃষ্টির অর্থ প্রকাশ করে। সৃষ্টির একটা বিশেষ আনন্দ আছে। চাষী ফসলের স্রষ্টা আর বুদ্ধিজীবী নতুন চিন্তাধারার স্রষ্টা। দুজনেরই স্বতন্ত্র আনন্দবোধ আছে, আর অন্তত এদিক থেকেই বোধ হয় দুজনের ঐক্য।

৪৭। স্বর্গ আমাদের এত কাছে যে হাত বাড়ালে হাতে ঠেকে, কেবল হাত বাড়ানোটাই শক্ত। [পথে প্রবাসে]

স্বর্গ অথবা নরক মানুষের এই ধুলোমাটির পৃথিবী থেকে বহুদূরে নয়। কবি বলেন—"কে বলে স্বর্গ, কে বলে নরক, কে বলে তা বহুদূর, মানুষের মাঝে স্বর্গনরক মানুষেতে সুরাসুর।"

মানুষ যখন মানুষকে ভালবাসে, অন্যের দুঃখে কাঁদে, পরস্পর মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হয়, তখনই ধুলোমাটির বুকে স্বর্গ নেমে আসে। এই স্বর্গ লাভের জন্যে কোনো কঠিন তপস্যা করতে হয় না বা সংসার ত্যাগ করে সন্ন্যাসী সাজতেও হয় না। এ স্বর্গের স্বাদ পেতে হলে মানুষকে ভালবাসতে হয়, মানুষের কল্যাণ কামনা করতে হয়। স্বর্গ লাভের এই পথ অত্যন্ত সহজ বলেই বোধ হয় মানুষের কাছে এই পথে চলা অত্যন্ত দুরূহ। যা সহজ তাকে আমরা কঠিন করে পেতে চাই, তা না হলে আমাদের মনের কাছে তার বুঝি কোনো মূল্যই থাকে না। আমাদের ঘরের পাশেই হয়তো বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্য আমাদের দৃষ্টির অপেক্ষায় অবহেলিত, তবু "দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া, ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া, একটি ধানের শিষের উপরে একটি শিশির বিন্দু।"

স্বর্গ হল ঠিক তেমনি। কত সহজে তাকে আমরা ধুলোমাটির পৃথিবীর বুকে নামিয়ে আনতে পারি, কেবল একটু ভালবাসা একটু স্নেহ, দুফোঁটা চোখের জল দেখে দুফোঁটা চোখের জল ফেলা! কিন্তু হায় রে মানুষ, এত সহজ বলেই বুঝি স্বর্গ তার কাছে এত দুর্লভ!

৪৮। বিধাতা যেখানে শিল্পী সাজেন না মানুষকে সেখানে শিল্পী সাজতে হয়। [পথে প্রবাসে]

সৃষ্টির মূলে এক অদৃশ্য শক্তির লীলাকে প্রত্যক্ষ করেছেন ভারতীয় ঋষি। এই শক্তির অন্য নাম বিধাতা। তুচ্ছ একটি তৃণ থেকে বিশাল পর্বত, অসীম সমুদ্র, দিগন্তহারা তপ্ত মরুভূমি সবই সেই শক্তিমান শিল্পীর ক্যানভাসে আঁকা ছবি।

এই বিশাল সৃষ্টির মধ্যে মানুষের স্থান কোথায়, তার ভূমিকাই বা কী? মানুষের একমাত্র পরিচয় হল সে শিল্পী। শিল্পীর ভূমিকায় তাকে যেমন মানায় অন্য কিছুতেই আর মানায় না। তাই পৃথিবীতে মানুষ হল দ্বিতীয় বিধাতা। তাই শিল্পী বিধাতার কোনো কোনো শূন্যতা মানুষ ভরিয়ে তোলে, তার প্রাণের ঐশ্বর্য দিয়ে, শিল্পচেতনা দিয়ে। মরুভূমির বিবর্ণতা সেখানকার মানুষ পরিহিত পোশাকের রঙ দিয়ে ঢেকে দেয়। প্রকৃতির মধ্যে যা নেই বাইরে থেকে তাকে আমদানি করতে হয়। এই সামঞ্জস্য বিধান করতে গিয়েই মানুষ নিজের শিল্পপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছে, হয়েছে শিল্পী।

৪৯। মুক্ত আকাশের মধ্যে মানবাত্মার যে মুক্তি সে মুক্তি আর কিছুর মধ্যে নেই। [পথে প্রবাসে]

প্রকৃতি মানুষকে অনেক কিছু দিয়েছে। তার সবচেয়ে বড়ো দান হল মুক্তি। আমাদের চারদিকে ঘিরে যে জগৎ প্রাত্যহিক ব্যবহারে জীর্ণ রূপ-রসহীন, সেই অতিপরিচিত বন্দীশালা থেকে মনপাখিটা মাঝে মাঝেই মুক্তি চায়। তখন প্রকৃতি নিমন্ত্রণের খোলা চিঠি নিয়ে আমাদের আমন্ত্রণ জানায় তার উদার প্রাঙ্গণে। কবির মতোই আমাদের বলতে ইচ্ছে করে 'আমার মুক্তি আলোয় আলোয় এই আকাশে, আমার মুক্তি ধুলোয় ধুলোয় ঘাসে ঘাসে'।

প্রকৃতির প্রতি মানুষের এই আকর্ষণ আকাশে নয়। এই আকর্ষণ রহস্যের সন্ধান করতে হলে আমাদের নিয়ে যেতে হবে হাজার হাজার বছর আগেকার পুরনো পৃথিবীতে। ইতিহাস-পূর্ব মানুষ ছিল প্রকৃতির সন্তান। উদার আকাশের নীচে তারা পেত অনন্ত মুক্তির স্বাদ। সেদিনও প্রকৃতি ছিল ব্যথিত ক্লান্ত মানুষের মুক্তিদাতা। আজও সে সম্পর্কে ফাটল ধরে নি। উদার আকাশের তলায় গিয়ে দাঁড়ালে আমাদের মন এই সুদীর্ঘ কালের ব্যবধান অতিক্রম করে চলে যায়। চলে যায় সেই সংস্কারহীন বন্ধনহীন মুক্তজীবনের দিনগুলিতে। আমাদের রক্তে রক্তে বেজে ওঠে অতীত দিনের এক মধুর রাগিণী। তাই তো প্রকৃতি আমাদের এত প্রিয়। কোনো পার্থিব সম্পদের ক্ষমতা নেই মানুষকে এই মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। বরং তারা সহস্র বন্ধনে অকটোপাশের মত মানুষকে জড়িয়ে ধরে, বস্তুভারে মনকে করে পীড়িত।

প্রাচীন কালের ঋষিরাও মুক্তির জন্যে বেছে নিয়েছিলেন প্রকৃতির এই উদার পরিবেশ। সেখানে ছিল তাঁদের অধ্যাত্ম সাধনার তপোবন। রাজারা আসতেন রাজ্য ছেড়ে জন কোলাহল এড়িয়ে। বানপ্রস্থ ছিল প্রকৃতির কোলে তপোবনের

মধ্যে। এর কারণ কেবল মানসিক মুক্তি নয়, আধ্যাত্মিক মুক্তিরও প্রথম সোপান হল এই উদার প্রকৃতি।

৫০। মানব হৃদয়ই প্রকৃত মন্দির, সেইখানে খড়্গ শাণিত হয় এবং সেখানেই শত সহস্র নরবলি হয়। দেবমন্দিরে তাহার সামান্য অভিনয় হয় মাত্র।
[রাজর্ষি : রবীন্দ্রনাথ]

দেবতার উদ্দেশ্যে কোনো বস্তু উৎসর্গ করার নাম বলি। বলির মূল উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন, দেবতার মন্দিরে পশুবলি একটি হিংসাত্মক কাজ। এই হিংসার মূল প্রোথিত আছে মানুষের অন্তরে। আমাদের মনের কোণে হিংসার বীজ আছে বলেই আমরা মনে করি, মন্দিরের দেবীও বুঝি রক্তপিপাসু। সেই দেবীকে খুশি করবার জন্যে মানুষ পশুবলি ও নরবলির মতো হিংসাত্মক কাজ করে থাকে।

হিংসার মূল উৎস মানুষের অন্তর। সেখানে অহরহ স্বার্থবুদ্ধির যে-স্রোত প্রবাহিত হচ্ছে তারই বহিঃপ্রকাশ ঘটে মন্দিরপ্রাঙ্গণে। স্বার্থের খাতিরেই মানুষ নানারকম আচার-বিচারের সৃষ্টি করেছে। সৃষ্টি করেছে সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় অনুষ্ঠানের। এই স্বার্থবুদ্ধিকে জয় করতে পারলেই হৃদয় তখন সত্যসুন্দরের আলোয় পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাই মহামানবের হৃদয়কেই বলা হয়েছে মন্দির, যে-মন্দির কখনও স্বার্থবুদ্ধিতে কলঙ্কিত, আবার কখনও প্রেমের আলোয় পবিত্র। বাইরের দিক থেকে হিংসার কণ্ঠরোধ করলে হিংসাকে সমূলে ধ্বংস করা যাবে না। হিংসাকে দূর করতে হলে হৃদয়ের পরিবর্তন দরকার, কারণ এই হৃদয়ই হল হিংসার জন্মস্থান।

৫১। অধিকাংশ সময়েই আরম্ভ আমাদের আয়ত্তে শেষ আমাদের আয়ত্তে নহে।
[রাজর্ষি : রবীন্দ্রনাথ]

বিশাল বৃক্ষ ক্ষুদ্র বীজের কারাগারে বন্দী থাকে। ক্রমে সেই বন্দী দশা কাটিয়ে সেই ক্ষুদ্র বীজ মহীরূহে পরিণত হয়। কাজের আরম্ভ আর সমাপ্তির সঙ্গে বৃক্ষের অঙ্কুর আর পরিণতি তুলনীয়। একটি কর্মধারা একজন অথবা কয়েকজনের সমবেত চেষ্টায় জন্মলাভ করে, পরিশেষে বহুজনের মধ্যে বিস্তার লাভ করে। সেই কর্মধারা তখন দুর্বার গতিতে এক মানুষ থেকে অন্য মানুষে, এক কাল থেকে কালান্তরে প্রসারিত হয়। মনে পড়ে রক্তকরবীর রাজার কথা। রাজা যন্ত্রসভ্যতার প্রতীক। সে চারদিকে যন্ত্রের জাল বিস্তার করেছে। তারপর এমন একদিন এল যেদিন রাজার নিজের হাতে গড়া যন্ত্র তার আদেশ মানতে চাইল না। কাজের আরম্ভ ছিল রাজার হাতে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারই হাতে গড়া যন্ত্র তার শক্তিকে অতিক্রম করে গেল।

৫২। আমার দেশমাতৃকার মূর্তির মধ্যে আমার ভগবানও জাগ্রত।
[অভিভাষণ : চিত্তরঞ্জন দাশ]

ভগবান অসীম অনন্ত। কিন্তু ভক্তের কাছে এই অসীম সীমার মধ্যে ধরা দেয়। এই সীমার অন্য নাম মূর্তি। মূর্তির মধ্যে বিভিন্ন দেবতার কত বিচিত্র

রূপ কল্পনা করা হয়। কিন্তু দেশপ্রেমিকের ঈশ্বর তাঁর স্বদেশ। স্বদেশরূপী ভগবান ছাড়া অন্য কোন দেবতার অস্তিত্বে তাঁরা বিশ্বাস করেন না।

মাটি, জল, আলো, বাতাস, আর অগণিত মানুষ নিয়ে যে দেশ—এই হল দেশভক্তের কাছে জাগ্রত দেবতা। এদের সেবাই ঈশ্বরসেবা। যে-দেবতার চরণে মাথা রেখে বিশ্বকবি বলেছেন 'ও আমার দেশের মাটি তোমার 'পরে ঠেকাই মাথা', সেই দেবতা দেশপ্রেমিকের দেবতা। এ দেবতা কোনো মন্দিরে মসজিদে থাকেন না, থাকেন সারা দেশ জুড়ে। দেশবাসীর সেবাকেই তাঁরা দেবতার পূজা বলে মনে করেন। পূজার জন্যে দেশভক্তের অন্য কোনো মূর্তির প্রয়োজন হয় না। দেশমাতৃকার ভাবমূর্তিই তাঁদের কাছে ঈশ্বরস্বরূপ। এই ঈশ্বর জাগ্রত: ওরা চিরকাল টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল; ওরা মাঠে বীজ বোনে পাকা ধান কাটে। ওরা কাজ করে নগরে প্রান্তরে।' এদের সেবাই দেশপ্রেমিকের কাছে ঈশ্বরসেবা।

৫৩। পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে পীড়া দেবে তোমাকেই।

[সাম্যবাদী : নজরুল]

ঋতুচক্রের আবর্তের মতো এ বিশ্বের সব কিছুই একটা নিয়মের চাকায় বাঁধা। এখানে জীবনের পর মৃত্যু, আলোর পর অন্ধকার হাতে হাত মিলিয়ে চলেছে। আজ যে-জাতি অন্য জাতিকে শাসন আর শোষণে জর্জরিত করে শক্তির দম্ভে স্ফীত হয়ে উঠছে, দুদিন পরেই দেখা যাবে তার সে শক্তি হয়েছে অবলুপ্ত। দীপ্ত গৌরবের পরিবর্তে অগৌরবের কালিমায় জাতীয় ইতিহাস হয়েছে আচ্ছন্ন। ইতিহাসের অসংখ্য ঘটনা এ সত্যের সাক্ষ্য দান করে। মনীষীরা তাই শক্তির দম্ভে উদ্ধত মানুষকে অন্যায় বিচার থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়ে গেছেন। 'যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে, পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে। এ হল সত্যদ্রষ্টা ঋষিকবির বাণী।

আমাদের দৃষ্টি বর্তমানের সীমায় আবদ্ধ। তাই অত্যাচারীর অত্যাচার আর শক্তির দম্ভকেই আমরা চিরস্থায়ী এক অচলায়তন বলে মনে করি। কিন্তু ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করে যে-দ্রষ্টা পরিণতির পরিপূর্ণ রূপ উপলব্ধি করতে পারেন তিনিই জানেন: 'তার পণ্যবাহী সেনা জ্যোতিষ্কলোকের পথে রেখামাত্র চিহ্ন রাখিবে না।' উপরন্তু অত্যাচারিত মানুষ তার অত্যাচারের প্রতিশোধ কড়ায়-গণ্ডায় শোধ করে নেবে। তাই অত্যাচার নয় প্রেম, পীড়ন নয় প্রীতি—এই বাণীই মানুষের কল্যাণ আনবে।

৫৪। আমরা রচি ভালোবাসার আশার ভবিষ্যৎ
মোদের স্বর্গপথের আভাস দেখায় আকাশ ছায়াপথ।

[ছাত্রদলের গান : নজরুল]

আজ যারা তরুণ কাল তারা দেশের দায়িত্বশীল নাগরিক। আজকের তরুণদলের উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভরশীল। এই তরুণেরাই উজ্জ্বল দিনের সূচনা করবে, নতুন দিনের আলো পৌঁছে দেবে সবার কাছে। এদের বুকে কত আশা সঞ্চিত ,এদের

চোখে কত রঙিন স্বপ্নের হাতছানি। এদের সজীব তরুণ মনে সবুজের আহ্বান। তরুণ হৃদয়ে অথৈ ভালবাসার পারাবার। এই ভালোবাসাই তাদের পরস্পরকে কাছে টানবে, অনুপ্রাণিত করবে নিত্যনূতন প্রচেষ্টায়। ভালোবাসাই তাদের সৃষ্টিশীল মহৎ কর্মে নিযুক্ত রাখবে। যে-কোনো আশা-উদ্দীপনার উৎসই হল ভালোবাসা। তরুণের স্বপ্ন তরুণেরই সার্থক কর্মে বাস্তব রূপ পাবে একদিন। এ প্রতিশ্রুতি তাদের বর্তমান উদ্যোগের মধ্যেই নিহিত। তরুণের জীবনের লক্ষ্য হল মহত্তম জীবনে উত্তরণ। তাদের কর্মে ও বচন-মননে এই অঙ্গীকারই আভাসিত। মনুষ্যত্ববোধের উৎসারণে ধন্য হয় মানবজীবন। আর এই মনুষ্যত্বই রূপায়িত হয় প্রতি পদক্ষেপে। একটি তরুণের ক্ষুদ্র পদক্ষেপ তাই সমগ্র মানবজাতির বিরাট অগ্রগতি। এ গতি প্রগতি, এ গতি আদর্শের আলোকিত মোহনায় পৌঁছবার দুর্বার গতি। এ পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করার দুশ্চর তপস্যাই তরুণের তপস্যা, চলমান জীবনের ছন্দে সিদ্ধিলাভের নিশ্চিন্ত ইঙ্গিত। স্বর্গ থেকে বিশ্বাসের ছবি এনে এ পৃথিবীকে সুন্দর করে গড়ে তোলার সাধনা কেবল স্বপ্নে নয়, বাস্তবেও মূর্ত হবে। আকাশের ছায়াপথ স্বর্গরাজ্যের দৌত্য করে, স্বর্গের নিশানা বলে দেয়। আজকের তরুণেরা যে-স্বর্গরচনার প্রয়াসেই তাদের সংহত রূপে উদ্বুদ্ধ সেটা তাদের বর্তমান কর্মের ধারাতেই স্পন্দিত। তাদের আরব্ধ সাধনাই ইঙ্গিতে ব্যক্ত করে এরা জয়লক্ষ্মীর বরমাল্য একদিন লাভ করবেই।

৫৫। হিংসা যেদিন যাইবে দুনিয়া ছাড়ি।
সব তরবারি হইবে সেদিন কাষ্ঠের তরবারি।

[গাথাঞ্জলি : কালিদাস রায়]

ইতিহাস-পূর্ব কাল থেকে শুরু করে বর্তমানের এই পারমাণবিক যুগ পর্যন্ত মানুষের ইতিহাস হল এক রক্তাক্ত সংগ্রামের ইতিহাস। প্রাচীন কালে সংগ্রামের প্রয়োজন ছিল, সংগ্রাম না করলে মানুষ সেদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে পারত না। সেই বাঁচার সংগ্রাম আজ লোভের সংগ্রামে পরিণত হয়েছে। আজ মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হল লোভ। লালসা চরিতার্থ করার জন্য, স্বার্থসিদ্ধির জন্য, আজ মানুষে মানুষে সংগ্রাম। মানুষ একদিন জীবন সংগ্রামে জয়যুক্ত হবার জন্যেই অস্ত্র নির্মাণ করত। প্রস্তরযুগ থেকে শুরু করে এই পারমাণবিক যুগ অবধি মানুষের ইতিহাস হল অস্ত্রসংগ্রহের ইতিহাস। এই ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখব মানুষ যত সভ্য হচ্ছে ততই নিষ্ঠুর হচ্ছে। আর ততই তার অস্ত্র হচ্ছে শাণিত। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধূমায়িত সম্ভাবনার দিকে তাকিয়ে আজ মানুষ স্থায়ী শান্তির কথা ভাবছে। চিন্তা করছে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিবর্তে নিরস্ত্রীকরণ আন্দোলনের কথা। মানুষ আজ একথা বুঝতে পেরেছে মুষ্টিমেয় স্বার্থপর মানুষের ক্ষুদ্র স্বার্থ ছাড়া যুদ্ধ কারও ভাগ্যেই শুভ ফলদান করে না। তাই মানুষ যুদ্ধ চায় না, চায় শান্তি। দিগন্তরেখার পাড়ে যে শান্তির সিংহদ্বার আজ মানুষের চোখে পড়েছে। হিংসাকে মানুষ যেদিন জয় করতে পারবে সেদিন আর মানুষ মারার অস্ত্রের প্রয়োজন হবে না। অস্ত্র তখন শোভা পাবে শিশুদের খেলাঘরে, অথবা যাদুঘরে।

৫৬। ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়। [ছাড়পত্র : সুকান্ত ভট্টাচার্য]
[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন, 'অন্নচিন্তা চমৎকার।' কিংবা 'খালি পেটে ধর্ম হয় না।' এখানে ধর্ম কথাটাকে একটু ব্যাপক অর্থে নেওয়া যেতে পারে। ধর্ম বলতে কাব্যচর্চা, শিল্পচর্চা প্রভৃতিকেও বোঝানো যায়। মানবজীবনের প্রথম প্রত্যূষ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের প্রাথমিক ও প্রধান চাহিদাই হল খাদ্য। জীবনধারণের প্রয়োজনে, অর্থাৎ বাঁচতে হলে খাবার চাই। মানবসভ্যতার বিকাশে তাই উদরপূর্তির সংগ্রামই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। দুমুঠো খাদ্যের জন্যেই তো মানুষের এত বড়ো কর্মযজ্ঞ, এত বড়ো জমজমাট মানবসভ্যতা সবই খাদ্যের জন্যে। প্রয়োজনমতো খাদ্যোৎপাদনে মানুষ সফল হয়েছিল বলেই, এবং উদরপূর্তির একটা মোটামুটি ব্যবস্থা মানুষ করতে পেরেছিল বলেই সে অন্নচিন্তা ছেড়ে অন্য চিন্তা করবার সুযোগ পেয়েছিল। আর এই অন্য চিন্তার ফসলই ছিল, জ্ঞান-বিজ্ঞান দর্শন-সাহিত্য শিল্পকলা যা বিচিত্র বৈভবে ঐশ্বর্যমণ্ডিত করেছে মানুষেরই গড়া সভ্যতাকে। Man cannot live by bread alone—সত্যি কথা। কিন্তু Man cannot live without bread too. খাদ্য না হলে চলে না। আগে পেটের খাদ্য, তারপর মনের। কবির মতে, একটি পয়সা জুটলে ক্ষুধাশান্তির জন্যে খাদ্য কিনবে, দুটি পয়সা জুটলে তবেই মানুষ ফুল কিনবে।

পেটের জ্বালা জুড়ালে তবেই মনে জাগবে কাব্যপ্রেরণা, শিল্পচেতনা। তা না হলে ক্ষুধার্ত মানুষের কাছে সারা পৃথিবীই বিস্বাদ ঠেকবে। মনে হবে এ জগৎ এক নিষ্ঠুর জ্বালাময় বাস্তব। ক্ষুধার্ত অসহায় মানুষের চোখে এই পৃথিবীর কোনো রসই ধরা পড়বে না, তার চোখের সামনে খেলা করবে নিঃস্বতার সর্পিল অন্ধকার।

৫৭। অদৃষ্টেরে শুধালেম, চিরদিন পিছে
অমোঘ নিষ্ঠুর বলে কে মোরে ঠেলিছে?
সে কহিল, ফিরে দেখো! দেখিলাম থামি,
সম্মুখে ঠেলিছে মোরে পশ্চাতের আমি॥ [কণিকা : রবীন্দ্রনাথ]

আমাদের জীবনধারা কোনো এক অদৃশ্য শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, অনেক সময় এই ধারণার বশবর্তী হয়ে আমরা ভবিতব্যের উপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করে থাকি। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, বিশ্বের যাবতীয় ঘটনা কার্যকারণ-সম্বন্ধযুক্ত। মানুষের জীবনপরিণতির পিছনেও রয়েছে তার কৃতকর্মপ্রবাহের প্রভাব। অতীতের কর্মধারাই গড়ে তুলছে বর্তমান জীবনের পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে, আবার বর্তমানের কর্মধারাই সৃষ্টি করবে অনাগত ভবিষ্যৎকে। আসলে মানুষ নিজের কর্মের দ্বারাই সৃষ্টি করে চলেছে তার জীবনের যতকিছু সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, ভালো-মন্দ, লাভ-ক্ষতি ইত্যাদি; অমোঘ নিয়তি বা কোনো দৈবশক্তি প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে না। অতীতের সঞ্চিত কর্ম বর্তমান জীবনকে রূপায়িত করছে, আবার বর্তমানের যতকিছু কর্ম অনাগত ভবিষ্যৎ-জীবনের নিয়ন্তারূপে প্রভাবিত করছে মানুষকে। সুতরাং অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এক কর্মসূত্রের দ্বারাই

গ্রথিত, কার্যকারণের সুনির্দিষ্ট নিয়ম-শৃঙ্খলায় সুনিয়ন্ত্রিত। মানুষই তার অতীতের কর্ম-অনুযায়ী সৃষ্টি করছে নিজের বর্তমান অবস্থাকে, আবার বর্তমানের কর্মাবলীর ফলে গড়ে উঠছে তার ভবিষ্যৎ-জীবন। কাজেই মানুষ নিজেই তার জীবনের রূপকার ; কোনো অমোঘ নিয়তি বা অদৃশ্য দৈবশক্তির দ্বারা মানবজীবনধারা নিয়ন্ত্রিত নয়।

৫৮। **ধ্বনিটিরে প্রতিধ্বনি সদা ব্যঙ্গ করে,**
ধ্বনি-কাছে ঋণী সে যে পাছে ধরা পড়ে। [নমুনা : প্রশ্ন, ১৯৭৯]

প্রতিধ্বনির স্রষ্টা ধ্বনি। কিন্তু পাছে এই সত্য শ্রোতার কাছে ধরা পড়ে যায়, অর্থাৎ প্রতিধ্বনি আসলে ধ্বনিরই সৃষ্টি এই সত্য উদ্ঘাটিত হয়, সেই কারণে সত্য গোপন করার জন্য প্রতিধ্বনি নিখুঁতভাবে ধ্বনির অনুকরণ করে নিজের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করতে চায় শ্রোতার কাছে। আসলকে ব্যঙ্গ করে নকলের আসল সাজার প্রয়াসের মতোই প্রতিধ্বনির এই আচরণ উপহাসের বিষয়।

পৃথিবীতে একশ্রেণীর মানুষ আছে, যারা সদাশয় ব্যক্তির দাক্ষিণ্য ও উপকারের উপর নির্ভর করেই বেড়ে ওঠে। যতকিছু সাফল্য, গৌরব অর্জন করে তারা জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয় তার মূলে পরোপকারীর দয়া-দাক্ষিণ্যই সর্বতোভাবে দায়ী। কিন্তু অকৃতজ্ঞ মানুষ সেই মহৎ ঋণ স্বীকার করতে চায় না, বরং একদিন-যে সে নানাভাবে উপকৃত হয়েছিল সেই মহৎ উপকার যেন একটা অসহ্য অপমানের ক্ষতরূপে চিরদিন তার নীচ-মনকে পীড়া দিতে থাকে। এর ফলে সে ভুলে যায় তার পরম সুহৃদকে, উপকারীর মহৎ অবদানকে। নিজের দুর্বলতাকে ঢাকতে গিয়ে সে অনেক সময় অকৃতজ্ঞের মতো ব্যবহার করে, এমন কি কৃতঘ্নও হয়ে ওঠে। উপকারীর মহৎ চরিত্রেও কলঙ্ক লেপন করতে কুণ্ঠিত হয় না। আসলে সে নানা ছলনার দ্বারা উপকারীর অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করে কৃতঘ্নের মতো আত্মপ্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে। জীবনে সে যা-কিছু খ্যাতি-প্রতিপত্তি ধন-মান অর্জন করেছে তা সে নিজের ক্ষমতাবলেই পেয়েছে, অন্যের সাহায্য সে নেয় নি—এ কথা প্রমাণ করার জন্যেই সে উপকারীর ঋণ স্বীকার করতে চায় না।

৫৯। **বোলতা কহিল, এ যে ক্ষুদ্র মৌচাক,**
এরি তরে মধুকর এত করে জাঁক!
মধুকর কহে তারে, তুমি এসো ভাই,
আরো-ক্ষুদ্র মৌচাক রচো দেখে যাই। [কণিকা : রবীন্দ্রনাথ]

আয়তনের দ্বারা বস্তুর সৌন্দর্য বা মাধুর্য নির্ধারিত হয় না। মৌচাক আর বোলতার চাক—এই উভয়ের প্রস্তুতির মধ্যেই আয়োজন ও কর্মব্যস্ততা আছে ; অক্লান্ত পরিশ্রম ও অধ্যবসায় উভয় ক্ষেত্রেই প্রয়োজন। কিন্তু প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে মৌচাক আর বোলতার চাক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রশ্রেণীর। মৌচাক যত ক্ষুদ্রই হোক তার মধ্যে সঞ্চিত থাকে ফুলের মধু। কিন্তু বোলতার চাক শুধু বোলতার বাসস্থান হিসাবেই বোলতার নিজেরই প্রয়োজনীয়তা মেটায়। বাইরের দিক থেকে উভয় চাকই সুন্দর, কিন্তু বোলতার চাকের মধ্যে অন্যের প্রয়োজন মেটানোর কোনো বস্তু নেই। অথচ

মৌচাকে সঞ্চিত থাকে ফুলের সারাংশ মধু—যে মধু পরিতৃপ্ত করে অপরকে। বাইরের রূপের দিক থেকে প্রায় একরকম দেখে বোলতা সমকক্ষ হতে চায় মৌমাছির। যদি কখনও বোলতা মৌচাকের চেয়ে আয়তনে বড়ো চাক প্রস্তুত করে তা হলে তার আর অহঙ্কারের সীমা থাকে না। আয়তনে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র মৌচাক দেখে মৌমাছিকে বিদ্রূপ করতেও বোলতা দ্বিধা করে না। কিন্তু মৌমাছি জানে তার সঞ্চয়ের মাধুর্যের কথা, বোলতার চাকের অন্তঃসারশূন্য দৈন্যের কথাও তার সুপরিজ্ঞাত। তাই বোলতার হাস্যকর স্পর্ধার উত্তরে মৌমাছি তাকে তার মতন ক্ষুদ্র মৌচাক রচনা করার জন্যে শক্তি নিয়োগ করতে বলছে। মানুষের মধ্যেও কেউ কেউ বাইরের রূপ ও আয়তন দেখেই এক বস্তুর সঙ্গে অন্য বস্তুর তুলনামূলক বিচার করে, কিন্তু বাইরের রূপ দেখেই সব সময়ে বস্তুর মূল্য নিরূপণ করা যায় না, অন্তরের ঐশ্বর্যেই বস্তু বা মানুষের প্রকৃত মূল্য নির্ণীত হয়।

৬০। **ফুল কহে ফুকারিয়া, ফল, ওরে ফল,**
কতদূরে রয়েছিস্ বল্ মোরে বল্।
ফল কহে, মহাশয়, কেন হাঁকাহাঁকি—
তোমারি অন্তরে আমি নিরন্তর থাকি। [কণিকা : রবীন্দ্রনাথ]

ফুলের পরিণতি ফল। কিন্তু ফুল তা বুঝতে পারে না বলেই ব্যাকুল হয়ে ফলকে খুঁজে বেড়ায়। ফুল জানে না যে, ফুলের শোভা-সৌন্দর্য ও রসের উৎপত্তিস্থান সে স্বয়ং। একদিন যখন প্রকৃতির নিয়মে ফুল থেকে বেরিয়ে আসে ফল, তখন ফুলের সমস্ত ব্যাকুল অনুসন্ধানের সমাপ্তি ঘটে।

মানুষের মধ্যেও পরমবস্তুটি লুকিয়ে আছে, নিহিত আছে পরম সত্য ও মনুষ্যত্বরূপ মহাসম্পদ। কিন্তু মানুষ তার অন্তরের নিহিত সত্যকে, মহাসম্পদকে খুঁজে বেড়ায় অন্যত্র। তার জন্যে জিজ্ঞাসা, জল্পনাকল্পনা, অনুসন্ধানের অন্ত নেই। জীবনের সার্থকতা লাভ করার জন্যে অলীক সুখস্বপ্ন দেখে মানুষ, দুরূহ প্রশ্নে কণ্টকিত করে সহজ জীবন-পথকে। জ্ঞানবিজ্ঞানের দুর্গম পথ পরিক্রমা করে সে খুঁজে বেড়ায় সত্যকে, যে সত্য তারই অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে বিরাজমান। ঐশ্বর্যের গগনচুম্বী স্তূপ রচনা করে মানুষ আবিষ্কার করতে চায় নিজের শক্তিকে, যুদ্ধ-বিগ্রহের মধ্যে দিয়ে সে প্রতিষ্ঠিত করতে চায় শ্রেষ্ঠত্বকে। কিন্তু মানুষ বোঝে না যে, তার জীবনসাধনার সাধ্য সম্পদ তার নিজের মধ্যেই নিহিত আছে,—প্রজ্ঞার উদ্বোধনে, জ্ঞানের প্রকৃত উন্মেষেই সেই সত্যবস্তুকে লাভ করা যায়, তা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

৬১। **দিনান্তের মুখ চুম্বি রাত্রি ধীরে কয়—**
আমি মৃত্যু তোর মাতা নাহি মোরে ভয়।
নব নব জন্ম দানে পুরাতন দিন
আমি তোরে করে দিই প্রত্যহ নবীন। [কণিকা : রবীন্দ্রনাথ]

দিনের পর রাত্রি, আবার রাত্রির অবসানে দিনের সূচনা, একটানা এই ভাবে চলেছে দিন-রাত্রির আবর্তন,—আসা-যাওয়া। রাত্রির আগমনে দিনের হয় অবসান;

কিন্তু দিন একেবারে নিঃশেষিত হয়ে যায় না, দিনের বর্তমান রূপটি রাত্রির মধ্যে সুপ্ত থাকে, আবৃত হয়ে থাকে মাত্র, পুনরাবির্ভাবের সম্ভাবনা নিয়ে। ঠিক তেমনি, মৃত্যুর অর্থ জীবনের পরিসমাপ্তি নয়; মৃত্যুতে জীবন হারিয়ে যায় না। মৃত্যুকে অবলম্বন করে বর্তমান রূপ পরিবর্তিত হয় মাত্র। মৃত্যুর মধ্য দিয়েই সূচিত হয় নব জন্ম। মা সন্তানের প্রাণকে গর্ভে ধারণ করে দশ মাস দশ দিন দেহ ও প্রাণের তিল-তিল রসের দ্বারা জীবন সঞ্চার করে মূর্তি দান করেন, তারপর গর্ভস্থ প্রাণীকে তিনি প্রসব করেন—সেই প্রাণী নিজের রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয় বিশ্বের কাছে। অনুরূপভাবে দিন আশ্রয় লাভ করে রাত্রির গর্ভে। দিনের সাময়িক অনুপস্থিতিকে কবি মাতৃরূপী রাত্রির গর্ভে অবস্থান বলে কল্পনা করেছেন। কয়েক প্রহর রাত্রির মধ্যে লীন হয়ে থাকার পর দিন আবার রাত্রির আশ্রয়নীড় থেকে বেরিয়ে আসে—আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে দিন। এইভাবে প্রত্যহ দিনের হচ্ছে অবসান, আবার আশ্রয়দাত্রী রাত্রির মাতৃবক্ষে কিছুকাল লীন হয়ে থেকে বিশ্রাম নেওয়ার পর পুনরায় প্রকাশিত হচ্ছে নবজন্মের আনন্দে উজ্জ্বলতায় পরিপূর্ণ হয়ে।

৬২। আমার এ ধূপ না পোড়ালে গন্ধ কিছুই নাহি ঢালে,
আমার এ দীপ না জ্বালালে দেয় না কিছু আলো।

[গীতাঞ্জলি : রবীন্দ্রনাথ]

দুঃখ-বেদনার মধ্যে আছে জ্বালা; মানুষ সেই জ্বালাকে পরিহার করে চলতে চায়। সুখের জন্যে লালায়িত মানুষ দুঃখের দহনে যে জ্বালা অনুভব করে তার জন্যে বিধাতার বিরুদ্ধে তার অভিযোগের অন্ত নেই। দুঃখের তাপে বেদনার দাহে জর্জরিত মানুষ বিধাতা বা ভগবানকে নিষ্ঠুর মনে করে। কিন্তু কবি সাধারণ মানুষের মতো দুঃখ-তাপে, ব্যথিত-হৃদয়ে জর্জরিত হয়েও ভগবানের দরবারে প্রতিবাদ জানান না। তিনি জানেন, ধূপ পুড়লেই তার অন্তরের সম্পদ গন্ধকে বিতরণ করতে সমর্থ হয়, দীপের অন্তর্নিহিত সুপ্ত আলোর শক্তি অগ্নিসংযোগেই প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে মানুষের অন্তর্নিহিত মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের জন্যেও দুঃখ-বেদনা, আঘাত-সংঘাতের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। অন্তরস্থিত সুপ্ত মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বকে জাগিয়ে তোলার জন্যে দুঃখের দাবদাহের প্রয়োজন আছে। এই দুঃখদহনের জন্যে যে-প্রস্তুতির প্রয়োজন তার মধ্যে নিজেকে নিঃস্বার্থভাবে পরহিতব্রতে সর্বস্ব উজাড় করে দেওয়ার বাসনা থাকে। নিঃশেষে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়ে চারদিক গন্ধে আমোদিত করে তোলার মধ্যেই ধূপের অস্তিত্বের সার্থকতা, প্রজ্বলিত শিখায় আলো বিতরণের মধ্যেই দীপের চরিতার্থতা; ঠিক তেমনি ত্যাগের মধ্য দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে বিলিয়ে দেওয়ার মধ্যেই মানবজীবনের চরম সার্থকতা। স্বার্থত্যাগ করে পরার্থে নিজের অস্তিত্বকে পর্যন্ত বিসর্জন করার মধ্যে আছে অসহ্য বেদনা—কিন্তু সেই দুঃখ-জ্বালা, বেদনার তীব্রতাই প্রতিষ্ঠিত করে মানুষকে তার মনুষ্যত্বের মহিমান্বিত উচ্চ সিংহাসনে, বিকশিত করে জীবনকে, মৃত্যুর মধ্য দিয়ে গড়ে তোলে অমৃতের অম্লান মূর্তি।

৬৩। প্রকৃতি তাঁর নিজের ভক্তদের যা দেন তা অতি অমূল্য দান। অনেকদিন ধরিয়া প্রকৃতির সেবা না করিলে কিন্তু সে দান মেলে না।
[আরণ্যক]

ভারতীয় দর্শনে প্রকৃতিকে মানুষের থেকে আলাদা করে দেখা হয় নি। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মিলন ঘটিয়ে ভারতীয় ঋষি সৃষ্টির পূর্ণতার কল্পনা করেছেন। বর্তমান যুগের মহাকবি রবীন্দ্রনাথও মানুষ ও প্রকৃতির মিলনে যে জগৎ তাকেই বলেছেন বিশ্ব। এ বিশ্বকে জানতে হলে যেমন মানুষকে জানতে হয় তেমনি জানতে হয় প্রকৃতির সংসারকে। কবি বলেছেন—'কত নদী গিরি সিন্ধু মরু, কত না অজানা জীব, কত না অপরিচিত তরু রয়ে গেল অগোচরে।'—বিশ্বকে জানতে হলে প্রকৃতিকে বাদ দেওয়া যায় না, তাই কবি বলেন—সেই লোভে পড়ি গ্রন্থ ভ্রমণবৃত্তান্ত আছে যাহে অক্ষয় উৎসাহে—'।

কেবল প্রকৃতিকে জানা নয়, আমাদের কর্তব্য হল প্রকৃতির অমূল্য সম্পদ সংগ্রহ করা। প্রকৃতি মানুষকে দেয় শান্তি স্নেহ ভালোবাসার মন্ত্র। এই মন্ত্র দূরে বসে লাভ করা যায় না। দীর্ঘদিন প্রকৃতির সংস্পর্শে না এলে অভিমানী প্রকৃতি তার শ্রেষ্ঠ সম্পদ-গুলি মানুষের হাতে তুলে দেয় না। প্রত্যেক দেশের মহাপুরুষ তাই প্রকৃতির মধ্যেই জীবন কাটাতে বলেছেন, বলেছেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর'। নগর সভ্যতার দুর্বিষহ যন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হল প্রকৃতির রাজ্যে ফিরে যাওয়া, প্রকৃতির সেবা করা। বিনিময়ে প্রকৃতি মানুষকে দেবে ব্যথা-ভোলার অভয় মন্ত্র।

৬৪। যে জিনিস যত দুষ্প্রাপ্য মানুষের মনের কাছে তার মূল্য তত বেশী।
[আরণ্যক]

মানুষ যা সহজে পায় তা চায় না আর যা চায় তা পায় না। এ হল জীবনের সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজেডি। জীবনের সবক্ষেত্রে চাওয়া-পাওয়ার এই অসমতা আমরা লক্ষ্য করেছি। যে জিনিস পাওয়া যায় না অর্থাৎ দুষ্প্রাপ্য তার দিকেই মানুষের আকাঙ্ক্ষিত হস্ত হয় প্রসারিত। কিন্তু যা সহজলভ্য, না চাইতেই পাওয়া যায়, তার দিকে আমরা দৃষ্টি ফেরাই না। দুষ্প্রাপ্য নয় এই অপরাধে অনেক সময় কত মূল্যবান সম্পদ অবহেলায় নষ্ট হয়ে যায়। কত অর্থ ব্যয় করে সারা পৃথিবী ঘুরে আমরা দুষ্প্রাপ্য দৃশ্য দেখার জন্যে জীবনপাত করছি কিন্তু আমাদের ঘরের কাছে যে প্রকৃতি আমাদের মুখের দিকে একটু করুণার আশায় তাকিয়ে আছে, তার দিকে আমরা ফিরেও তাকাই না। আসল কথা হল কোনো কিছু সহজে পেলে তার দিকে মানুষের আকর্ষণ থাকে না। যাকে পাওয়া যায় না তাকে পাওয়ার অর্থ হল, তাকে জয় করা। মানুষ সবকিছুকেই জয় করতে চায় তাই দুষ্প্রাপ্যের দিকেই তার আকর্ষণ। জয়ের আনন্দ নেই বলে যা আমাদের হাতের মুঠোয় বন্দী তার প্রতি আমাদের প্রবল অনীহা।

৬৫। **জগৎ জুড়িয়া এক জাতি শুধু,**
সে জাতির নাম মানুষ জাতি
এক পৃথিবীর স্তন্যে লালিত,
একই রবিশশী মোদের সাথী। [উ. মা. ১৯৭৮]

মানুষের মধ্যে ভেদ সৃষ্টির চেষ্টা এক মহাভ্রান্তি। সমস্ত মানুষই এই পৃথিবীর সন্তান। পৃথিবীর অন্নজলে তার পরিপুষ্টি। একই সূর্য তার জীবনধারক, একই চন্দ্র তাকে আলোয় অবগাহিত করছে। আকাশভরা সূর্যতারার নিচে সমস্ত মানুষ মিলে এক বৃহৎ পরিবারের মতো। তাদের দেহবর্ণে, তাদের ভাষায়, তাদের পরিচ্ছদে পার্থক্য স্বাভাবিক কিন্তু তাদের জীবনধারণের মৌলিক বিষয়গুলি এক এবং অভিন্ন। এই ঐক্যবুদ্ধিতেই সমস্ত মানুষের কল্যাণ। জাতিগত বৈষম্যবোধ দেখা দিলে জাতীয়-সংহতিই হবে বিনষ্ট, জাতির অগ্রগতিই হবে তাতে ব্যাহত। সবার উপরে মানুষ সত্য, এ বোধটি যেন আমাদের হৃদয়ে সদাজাগ্রত থাকে।

৬৬। **রাতে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা**
সূর্য নাহি ফেরে শুধু ব্যর্থ হয় তারা। [ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৭৮]

আশ্চর্য এই বিধাতার সৃষ্টিকৌশল। দিনে সূর্য, রাতে চন্দ্রতারকা। যেখানে যা মানায় ঠিক সেখানেই তাকে স্থাপন করেছেন বিধাতা। সমগ্র সৌন্দর্যই দুচোখ ভরে দেখবার। কিন্তু দিনের সৌন্দর্য যদি কেউ রাতে দেখতে চায় তা হবে মহাভ্রান্তি। রাতে যদি সূর্যের শোকে কেউ কাঁদে সূর্য ফেরে না, কিন্তু যে অগণিত তারকা রাতের আকাশ উদ্ভাসিত করে তার সৌন্দর্য আমাদের কাছে ব্যর্থ হয়। প্রকৃতির ক্ষেত্রে যেমন, মানবসমাজের যে-কোনো ক্ষেত্রেও এইরকম। অতীতের বিশেষ দিনগুলিকে স্মরণ করে কেউ যদি 'তেহি নো দিবসা গতা' বলে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে, অতীত তো ফেরেই না, শুধু সম্ভাবনাময় বর্তমানটাই তার কাছে ব্যর্থ হয়ে যায়।

৬৭। **বহুদিন ধ'রে বহুক্রোশ দূরে**
বহু ব্যয় করি বহুদেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু,
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শীষের উপর
একটি শিশিরবিন্দু। [উ. মা. ১৯৭৯]

আমরা রম্য-বীক্ষণে উৎসুক। তাই দূরদেশে ভ্রমণে বের হই। পর্বতের শোভা ও সমুদ্রের মাধুর্য আমাদের মুগ্ধ করে। এই সৌন্দর্য-দর্শনের নেশায় আমরা দূর-দূরান্তরে পাড়ি দিই। এজন্যে প্রচুর অর্থব্যয় করতেও আমরা কুণ্ঠিত নই। কিন্তু ভাববার বিষয় এই যে, আমাদের ঘরের কাছেই বহু সৌন্দর্য উপেক্ষিত হয়ে পড়ে থাকে। ধানের শীষের উপর শিশিরবিন্দুর যে অপূর্ব সৌন্দর্য সে দিকে কি আমাদের

চোখ পড়ে? ঐ শিশিরবিন্দুতেই তো বিশ্বসৌন্দর্যের এক আশ্চর্য প্রতিফলন। আসল কথা, সময় ও অর্থব্যয় করে দূরে না গিয়েও ঘরের কাছেই বহু সৌন্দর্য দেখে আমরা মুগ্ধ ও বিস্মিত হতে পারি। সৌন্দর্য দেখার মন ও চোখ যদি আমাদের থাকে তাহলে অতি সাধারণ জিনিসও আমাদের কাছে অসাধারণ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত বলে মনে হবে।

৬৮। স্বার্থমগ্ন যে-জন বিমুখ
বৃহৎ জগৎ হতে, সে কখনো শেখে নি বাঁচিতে।

[ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৭৯]

মানুষের প্রধান পরিচয় এককে নয়, একত্বে। সে 'এক' কিন্তু 'বহু'র মধ্যেই তার চরিতার্থতা। যে শম্বুকনীতিতে নিজের স্বার্থের খোলসে আত্মগোপন করে, সে জীবনের স্বাদ পায় না। শুধু নিজের সুখের জন্যে বাঁচা জীবনের লক্ষণ নয়, জীবনে জীবন যোগ করাই মানুষের জীবিতত্বের প্রধান লক্ষণ। যে বিচ্ছিন্ন সে রিক্ত, যে যুক্ত সে পরিপূর্ণ। 'আমি' 'আমার' এই বোধ থেকে 'আমরা' 'আমাদের' এই চেতনায় উত্তরণেই মানুষের জীবনানন্দ। এই জীবনানন্দই মানুষের মর্ত্যের অমৃত। সে অমৃত স্বার্থসর্বস্ব মানুষের আস্বাদনের জন্যে নয়।

৬৯। তেলা মাথায় তেল দেওয়া মনুষ্যজাতির রোগ। [উ. মা. ১৯৮১]

মানুষের সমাজ 'আছে' আর 'নেই' নিয়ে গড়া। সেটা অনেকটা স্বাভাবিক। কিন্তু যার 'আছে' তার খুব বেশি আছে, আর যার 'নেই' তার একেবারেই নেই এ কেমন কথা? কিন্তু অন্যকে দোষ দিয়ে তো লাভ নেই, সমাজ তো মানুষের নিজের হাতেই গড়া। এই অসমদৃষ্টিটাই মানুষের রোগ। সে দিচ্ছে তাকেই যার অনেক আছে। কেউ ক্ষিদেয় ধুঁকছে, কেউ বাড়তি খাদ্য ফেলে দিচ্ছে। ধনতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থায় এই তো স্বাভাবিক। মুষ্টিমেয়ের হাতে পুঁজি গিয়ে জমছে, শ্রমের যোগান যারা দিচ্ছে তারা শুকিয়ে মরছে। মানুষের হাতে মানুষের এই পীড়ন দেখে মনে হয় মানুষের দৃষ্টিটাই রুগ্ন, সমতা আর সমবণ্টনের দিকে তার ঝোঁক নেই। অথচ এ রোগমুক্তি না ঘটলে মানুষের কোনো সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ নেই। সমাজতন্ত্র মানুষকে এই দৃষ্টিবিভ্রম থেকে মুক্ত করে নতুন সমাজের স্বপ্ন দেখে, যেখানে মানুষ ভাগ করে ভোগ করতে শিখবে।

৭০। বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

সুন্দর তার পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন হলে সৌন্দর্য ম্লান হয়। অনেক সময় অতি পরিচিত সাধারণও পরিবেশের গুণে লাভ করে অসাধারণত্ব। অর্থাৎ পরিবেশ সৃষ্টির ওপরে নির্ভর করে সৌন্দর্যের প্রকাশ। আসলে হয়তো জগৎ-সংসারের সমস্ত বস্তুর মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে নিতল সৌন্দর্য। জীবনের বিবিক্ত পরিবেশে তাকে আমরা খুঁজে পাই না। হঠাৎ কোনো বিশেষ পরিপ্রেক্ষিতে তাকে দেখে মুগ্ধ হই,—সেই অতি সাধারণ তুচ্ছের ওপর থেকে সরে যায় অভ্যস্ততার ধূলি-আবরণ,—সে প্রকাশ পায় কোনো অনাদিকালের অরূপলোকের দূত হয়ে। কিন্তু বস্তুজগতের এ ব্যাপারে

গৃহিণীপনায় অভাব আছে। প্রকৃতির যে-বস্তুটি যেখানে থাকলে সুন্দরতম, তাকে সে থাকতে দেয় না সেখানে, ফলে সৌন্দর্য হারায় তার ঔজ্জ্বল্য।

বন্য পরিবেশের ভয়ঙ্কর সুন্দর তান-লয়ে মানানসই কষ্টিপাথরে খোদাই-করা চলমান মূর্তিকে নগর সভ্যতার দর্পণে নিঃসন্দেহে বেমানান লাগবে। শিশুর অমল সৌন্দর্য সর্বাধিক রমণীয় মাতৃস্নেহের নন্দন-ছায়ায়। কিন্তু সর্বদা কি এমনটি বজায় থাকে? বোধ হয় না। যদি হত তা হলে পৃথিবীটাই হত 'দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্'।

৭১। **অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে।**
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণ সম দহে॥

[নমুনা প্রশ্ন, '৭৯ ত্রিপুরা উ. মা. '৮০]

মনুষ্যজীবন ন্যায়াধীশ বিধাতার প্রতিনিধিত্ব। চেতনা এবং বিবেকবোধ বিধাতাদত্ত ন্যায়দণ্ড। অন্যায়ের দণ্ডদান তথা প্রতিবিধান এবং অন্যায়-বিরত জীবনযাপন সেই ন্যায়দণ্ডের মর্যাদা রক্ষা করে। কোমলতা-দুর্বলতা মিশ্রিত এই যে সদাকম্পমান পার্থিবজীবন তাকে সুন্দরতর করে তোলার দায়িত্ববদ্ধ মানবজীবন এই পথেই লাভ করে সার্থকতা। এই মহান কর্মসাধনে কখনও কঠোর নিষ্ঠুরতাও কাম্য। নির্ভীক সত্যের আলোয় উজ্জ্বল পথে সুখ-দুঃখের রোদ-বৃষ্টি-ঝড় উপেক্ষা করে অটল সঙ্কল্পে অগ্রসর হতে অন্যায়কারী এ পথের বাধা। অতএব ঘৃণার তীব্র দাবদাহে দগ্ধ হোক সে। অন্যায়ের প্রতি সহনশীলতাও অপ্রত্যক্ষভাবে পৃথিবীতে বপন করে চলে অন্যায়ের বীজ। এ ক্ষেত্রেও সমভাবে বর্ষিত হোক আমাদের তীব্র ঘৃণা সেই ক্ষীণ, দুর্বল মনুষ্যত্বের অবমাননাকারী সহনশীলের প্রতি।

৭২। **পুষ্প আপনার জন্য ফুটে না।** [নমুনা প্রশ্ন ও ত্রিপুরা উ মা. ১৯৭৯]

সুখ নামে এক সোনার হরিণ ; মানুষব্যাধ শরযোজন করে তার সন্ধানে তোলপাড় করছে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতাল।—এ গল্প আদ্যিকালের। কিন্তু আজও কি সেই সুখ 'নাগাল ফেলে পালায় ছেড়ে' ?—না। মানুষের অভিজ্ঞতা মানুষকে শিখিয়েছে এক অবিসংবাদী সত্য,—'পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন স্থায়ী সুখের অন্য কোনো মূল দেখি না'। সুখের ঠিকানা রূপ নয়, কারণ রূপ অস্থায়ী। যশ নয়, কারণ যশ এক সোনার খাঁচা। জ্ঞান নয়, কারণ জ্ঞান কেবলমাত্র জ্ঞানতৃষ্ণা বাড়ায়। বিত্তে নয় কারণ বিত্ত দুশ্চিন্তার আকর। সুখের বাসা মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে, আত্মবিসর্জনে, পরার্থে জীবনদানে। কারণ সামগ্রিক অর্থে সার্থকতাই সুখের উৎস আর মানবজীবনের চরমতম সার্থকতা আত্মদানে, আত্মোৎসর্গে। মানবচেতনার সুবিশাল ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষুদ্র সীমানায় বদ্ধ থাকতে পারে না,—সে ছড়িয়ে যেতে চায় সমগ্র মানবজাতির মধ্যে। এ ক্ষেত্রে ব্যাপ্তি যত বাড়ে সুখ তত গভীর হয়। ফুল ফোটে,—আবার ঝরেও যায়। কিন্তু সে তার এই ক্ষণকালের জীবন সার্থক করে তার বর্ণোজ্জ্বলতায় অন্যের দৃষ্টিনন্দন হয়ে, সুগন্ধ বিস্তারে মনোহারী হয়ে, ভবিষ্যৎ উদ্ভিদের সূচনা করে। সেই অর্থে ফুল যেন মানবজীবনের সার্থকতারই রূপক।

৭৩। পেঁচা রাষ্ট্র করে দেয় পেলে কোন ছুতা।
জানো না সূর্যের সাথে আমার শত্রুতা॥ [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

বনস্পতি তার পারিপার্শ্বিকের ক্ষুদ্রতাকে অনায়াসে তুচ্ছ করে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে থাকে আপন মহত্ত্বগরিমায়। বাদলবাতাসের মত্ততা তাকে নত করতে পারে না,—তার শত্রু মহাশক্তিধর কালবৈশাখী। অর্থাৎ মহতের শত্রুতালাভ গৌরব—শর্তসাপেক্ষ, সে শর্ত শক্তির। সুতরাং ক্ষুদ্রচেতা যে-সব মানুষ মহতের নাগাল পায় না, তারা মহতের শত্রু হিসাবে আত্মঘোষণা করে মর্যাদালাভের মিথ্যা এবং হাস্যকর প্রয়াস করে। পেঁচা অন্ধকারের জীব, সে আলোর অধিকারে বঞ্চিত। যে আলো জীবন-সঞ্চালক সেই আলোর উৎস সূর্য তাই তার চক্ষুশূল। কিন্তু তার নাগাল পাওয়া পেঁচার সাধ্যাতীত। অতএব চলতে থাকে তার আত্মম্ভরী ঘোষণা,—সূর্যের শত্রু সে। যে সূর্য সারা জগতে আলো দান করে, সমগ্র জীব-জগতের প্রাণের উৎস,—সেই সূর্যের শত্রু সে। এ কি ভক্ত না হয়ে বৈরী ভাবে ইষ্টলাভেচ্ছা ?—না, তা নয়। এ ধরনের আত্মঘোষণা আপন অক্ষমতা ঢাকা দেওয়ার এবং গুণীর গৌরবের অংশীদার হওয়ার অক্ষম প্রচেষ্টা মাত্র।

৭৪। অন্ধকারে লুকিয়ে আপন মনে
কাহারে তুই পূজিস্ সংগোপনে।
নয়ন মেলে দেখ দেখি তুই চেয়ে,
দেবতা নাই ঘরে। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

পারিপার্শ্বিকে প্রতিনিয়ত বিকাশমান যে-প্রাণপুঞ্জ, প্রবহমান যে-জীবনস্রোত তার সঙ্গে আত্মসংযুক্তিই জীবনধর্ম। জগৎসংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে রুদ্ধদ্বার দেবালয়ের অন্ধকার কোণে নিষ্প্রাণ দেবমূর্তিকে বিবিধ উপচারে পূজা নিবেদনের মধ্যে রয়েছে স্বার্থপর মুক্তিচিন্তা,—যা একান্তভাবেই অবাস্তব। কারণ বিশ্বস্রষ্টা স্বয়ং আপন সৃষ্টির বন্ধনে-আবদ্ধ। জগৎসংসারের মঙ্গল কামনায় তিনি নিজেই জাগতিক কর্মযজ্ঞের সক্রিয় অংশীদার। ফলে তাঁকে পাওয়া একমাত্র কর্মসংযুক্তির মাধ্যমেই সম্ভব। যেখানে সাধারণ মানুষ যুগযুগান্তর ধরে আপন দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে সৃষ্টির উদ্দেশ্যকে সার্থক করে তুলছে সেখানেই রয়েছেন ঘর্মাক্তকলেবর বিশ্বনিয়ন্তা। তাই কর্মযোগই সিদ্ধির পথ,—জীবনবিচ্ছিন্ন অন্ধ সাধনা নয়।

৭৫। আলো বলে, অন্ধকার তুই বড় কালো,
অন্ধকার বলে ভাই তাই তুমি আলো। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

পরস্পর বিরোধিতাই সৃষ্টির ছন্দ রক্ষা করে। একের অস্তিত্ব অপরকে মূল্যবান করে তোলে ; সুন্দর অসুন্দরের কাছে কৃতজ্ঞ, কারণ সুন্দরের মর্যাদা অসুন্দরের দান। আলোর মূল্যকে সত্যতা দান করেছে অসুন্দরের অবস্থিতি। কিন্তু বড়ো করুণ এই অসুন্দরের বা অন্ধকারের আত্মদান,—এরা জগৎ-সংসারের ছবিকে উজ্জ্বলতর করে তোলার কাজে পারিপার্শ্বিক রচনা করে দ্রষ্টার প্রসন্ন দৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়। অথচ আঁধার নিজেকে আলোর পায়ে একেবারে বিকিয়ে দিয়েছে বলেই আলো হয়েছে আলোকিত।

৭৬। সে লড়াই ঈশ্বরের বিরুদ্ধে লড়াই,
যে যুদ্ধে ভাইকে মারে ভাই। [পশ্চিমবঙ্গ **উ.** মা. ১৯৮৪]

জীবন যুদ্ধে প্রত্যেক মানুষ সৈনিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সভ্যতার আদি যুগ থেকে মানুষকে যুদ্ধ করেই অগ্রসর হতে হয়েছে। পদে পদে দমন করতে হয়েছে বিরুদ্ধ শক্তি আর প্রতিকূল পরিবেশকে। তাই সংগ্রাম অন্যায় নয়, সংগ্রাম হল মানব শক্তির বহিঃপ্রকাশ। যার মাধ্যমে মানুষের সামগ্রিক শক্তির জাগরণ হয়। অন্যায়, অবিচার, দুঃখ-দারিদ্র্য মানুষের চিরশত্রু। এদের সঙ্গেই মানুষ আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে এতদিন উড়িয়ে এসেছে মানবতার বিজয় কেতন।

কিন্তু এই যুদ্ধেরও একটা সংকীর্ণ দিক আছে। যুদ্ধ যেখানে কেবল মাত্র স্বার্থ-সিদ্ধির উপায়, মহৎ কোন আদর্শের প্রেরণায় যে সংগ্রাম পরিচালিত নয়, সে সংগ্রামে মানুষের কল্যাণ সাধিত হয় না, উপরন্তু তা এনে দেয় মানুষের জীবনে অভিশাপ। মানুষ ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। তাই মানবতা বিরোধী যে কোন কাজ ঈশ্বরের বিরুদ্ধাচারণ ছাড়া আর কিছুই নয়। স্নেহ-প্রীতি-মায়া-মমতা মানুষের হৃদয় ধর্মের পরিচায়ক। মানুষ যখন ব্যক্তি স্বার্থে অন্ধ হয়ে এই সব মহৎ গুণকেই হত্যা করে পশুর স্তরে নেমে আসে তখন সে ঈশ্বরকেই আঘাত করে। কারণ স্নেহ, প্রীতি, কল্যাণ, আর সত্যসুন্দরই হল ঈশ্বরের জীবন্ত বিগ্রহ।

৭৭। শুনহ মানুষ ভাই
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই। [ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৮৪]

[**উত্তরের জন্য পৃ. ৩, ৪নং দ্রষ্টব্য**]

অনুশীলনী

ক. ভাবসম্প্রসারণ কর :

১. আপন শোভার মূল্য
পুষ্প নাহি বোঝে,
সহজে পেয়েছে যাহা
দেয় তা সহজে। —স্ফুলিঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ

২. আপনার রুদ্ধ দ্বার মাঝে
অন্ধকার নিয়ত বিরাজে।
আপন-বাহিরে মেলো চোখ
সেইখানে অনন্ত আলোক। —স্ফুলিঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ

৩. কহিল তারা, 'জ্বালিব আলোখানি।
আঁধার দূর হবে না হবে
সে আমি নাহি জানি।' —স্ফুলিঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ

৪. সুন্দরী ছায়ার পানে তরু চেয়ে থাকে ;
সে তার আপন, তবু পায় না তাহাকে। —লেখন : রবীন্দ্রনাথ

৫. মেঘের দল বিলাপ করে—
আঁধার হল দেখে।
ভুলেছে বুঝি নিজেই তারা
সূর্য দিল ঢেকে। —লেখন : রবীন্দ্রনাথ

৬. শিক্ষা জিনিসটা যথাসম্ভব আহার ব্যাপারের মতো হওয়া উচিত। খাদ্যদ্রব্যে প্রথম কামড়টা দিবামাত্রেই তাহার স্বাদের সুখ আরম্ভ হয়, পেট ভরিবার পূর্ব হইতেই পেটটি খুশি হইয়া জাগিয়া উঠে। —জীবনস্মৃতি : রবীন্দ্রনাথ

৭. অশ্রুজল প্রেমের নীরব গীত। অশ্রুজল : কালীপ্রসন্ন ঘোষ

৮. জীবের অহংকারই মায়া। এই অহংকার সব আবরণ করে রেখেছে।
—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ

৯. উচ্চাভিলাষই মহত্ত্বের ভিত্তিভূমি।
—মধুসূদনের জীবনচরিত : যোগীন্দ্রনাথ বসু

১০. চরিত্রই বাধা-বিঘ্নরূপ বজ্রদৃঢ় প্রাচীরের মধ্য দিয়া পথ করিয়া লইতে পারে। —স্বামী বিবেকানন্দ

১১. মত এবং কর্ম দুই-ই বাইরের জিনিষ। মনটাই সত্য।
—শেষপ্রশ্ন : শরৎচন্দ্র

১২. কহিল কঞ্চির বেড়া, ওগো পিতামহ
বাঁশবন, নুয়ে কেন পড় অহরহ ?
আমরা তোমারি বংশে ছোট ছোট ডাল,
তবু মাথা উঁচু করে থাকি চিরকাল।
বাঁশ কহে, ভেদ তাই ছোটতে বড়োতে,
নত হই, ছোট নহি হই কোনমতে। —কণিকা : রবীন্দ্রনাথ

১৩. আগা বলে, আমি বড়ো, তুমি ছোটো লোক।
গোড়া হেসে বলে, ভাই, ভালো তাই হোক।
তুমি উচ্চে আছ বলে গর্বে আছ ভোর,
তোমারে করেছি উচ্চ এই গর্ব মোর। —কণিকা : রবীন্দ্রনাথ

১৪. দয়া বলে, কে গো তুমি মুখে নাই কথা ?
অশ্রুভরা আঁখি বলে, আমি কৃতজ্ঞতা। কণিকা : রবীন্দ্রনাথ

১৫. ধুলা, করো কলঙ্কিত সবার শুভ্রতা
সেটা কি তোমারি নয় কলঙ্কের কথা ? —কণিকা : রবীন্দ্রনাথ

১৬. উত্তম নিশ্চিন্তে চলে অধমের সাথে,
তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে ॥ কণিকা : রবীন্দ্রনাথ

১৭. কাল বলে, আমি সৃষ্টি করি এই ভব।
ঘড়ি বলে, তা হলে আমি স্রষ্টা তব। —রবীন্দ্রনাথ

১৮. হে সমুদ্র, চিরকাল কী তোমার ভাষা।
সমুদ্র কহিল, মোর অনন্ত জিজ্ঞাসা ॥
কিসের স্তব্ধতা তব ওগো গিরিবর।
হিমাদ্রি কহিল, মোর চির-নিরুত্তর। কণিকা : রবীন্দ্রনাথ

১৯. বাঁশি বলে, মোর কিছু নাহিকো গৌরব,
কেবল ফুঁয়ের জোরে মোর কলরব।
ফুঁ কহিল, আমি ফাঁকি, শুধু হাওয়াখানি—
যে জন বাজায় তারে কেহ নাহি জানি। কণিকা : রবীন্দ্রনাথ

২০. জন্ম মৃত্যু দোঁহে মিলে জীবনের খেলা,
যেমন চলার সঙ্গে পা-তোলা পা-ফেলা। —কণিকা : রবীন্দ্রনাথ

২১. শেষ কহে, একদিন সব শেষ হবে,
হে আরম্ভ, বৃথা তব অহংকার তবে।
আরম্ভ কহিল, ভাই, যেথা শেষ হয়
সেইখানে পুনরায় আরম্ভ-উদয়। —কণিকা : রবীন্দ্রনাথ

২২. নাই ভগবান, নাইক ধর্ম যাদের শিক্ষামূলে,
ছিন্নমস্তা শিক্ষা সে শুধু শয়তানী ইস্কুলে।
—কাব্যমঞ্জুষা : মোহিতলাল মজুমদার

২৩. বিশ্বপিতার মহা-কারবার এই দিন দুনিয়াটা,
মানুষই তাহার মহা মূলধন কার্য তাহার খাটা।
—কাব্যমঞ্জুষা : মোহিতলাল মজুমদার

২৪. মুকুট পরা শক্ত, কিন্তু মুকুট ত্যাগ করা আরও কঠিন।
—রাজর্ষি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৫. নীর বর্জন করিয়া ক্ষীর গ্রহণের ক্ষমতা একা রাজহংসেরই আছে।
—চরিতকথা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী

২৬. তুমি অধম, তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন ?
—কপালকুণ্ডলা : বঙ্কিমচন্দ্র

২৭. দুঃখের মধ্যেই সুখের অজ্ঞাত বাস। —অশ্রুজল : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৮. 'রস' জিনিসটা রসিকের অপেক্ষা রাখে, কেবল মাত্র নিজেকে সে সপ্রমাণ করতে পারে না। —বাস্তব : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২৯. রূপ রূপবানে নাই, দর্শকের মনে। নইলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান দেখে না কেন? —রজনী : বঙ্কিমচন্দ্র

৩০. স্বার্থই স্বার্থত্যাগের শিক্ষক। —স্বামী বিবেকানন্দ

৩১.
সবে মত্ত আপনায়
জানাতে জগতিতলে
হতাশই কেবল চায়
লুকাতে নয়ন জলে। —ভুল : অক্ষয়কুমার বড়াল

৩২. অনেক পাপ, পুণ্যের বেশ ধরিয়া আইসে; শয়তান গরদের ধুতি পরিয়া তিলক কাটিয়া উপস্থিত হইয়া আমাদিগকে কুমন্ত্রণা দেয়।
—লোকভয় : অশ্বিনীকুমার দত্ত

৩৩. সকল অসৎকর্মের মূল দুর্বলতা। —স্বামী বিবেকানন্দ

৩৪.
আপনার হেলা করি' করি মোরা
ভগবানে অপমান। —সত্যকাম : নজরুল

৩৫.
সকল কালের সকল দেশের সকল
মানুষ আসি
এক মোহনায় দাঁড়াইয়া শোনো
এক মিলনের বাঁশী। —সাম্যবাদী : নজরুল

৩৬.
এই হৃদয়ের চেয়ে বড় আর
কোনো মন্দির কাবা নাই। —সাম্যবাদী : নজরুল

৩৭.
আকাশে ছড়ায়ে বাণী
অজানার বাঁশি বাজে বুঝি।
শুনিতে পায় না জন্তু,
মানুষ চলেছে স্বর খুঁজি। স্ফুলিঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ

৩৮.
আকাশে সোনার মেঘ
কত ছবি আঁকে,
আপনার নাম তবু
লিখে নাহি রাখে। স্ফুলিঙ্গ : রবীন্দ্রনাথ

৩৯.
অশ্রু ঘুচাতে, ব্যথিতের সাথে।
অশ্রু মিশাতে হয়। —দুর্দিনে : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত

৪০.
কালো বলে পাছে হেলা করে কেউ
তাই তো আমার পিতা
সকলের সেরা দিলেন আমায়
নামটি অপরাজিতা

আমি গুণহীন গন্ধবিহীন
ফুলের মধ্যে কালো
পিতার আদরে আদরিণী, তবু
আমিই কালের আলো। —অপরাজিতা : সত্যেন্দ্রনাথ

৪১. যত্ন জিনিসটায় মিষ্টি আছে সত্যি, তার ভান করাটায় না আছে মধু, না আছে স্বাদ। —দেনাপাওনা : শরৎচন্দ্র।

৪২. দুনিয়ার ভয়ানক চালাক লোকও মাঝে মাঝে মারাত্মক ভুল করে বসে. নইলে সংসার একেবারে মরুভূমি হয়ে দাঁড়াত, কোথাও রসের বাষ্পটুকুও জমবার ঠাঁই পেত না। —দেনাপাওনা : শরৎচন্দ্র

৪৩. যতদিন মানুষের আশা থাকে, ততদিন কিছুই ফুরায় না! আশা ফুরাইলে সব ফুরাইল। —বিষবৃক্ষ : বঙ্কিমচন্দ্র

৪৪. ঈশ্বরতত্ত্ব যদি খোঁজ মানুষে খুঁজবে। মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ২য় ভাগ

৪৫। মায়ার স্বভাব কেমন জান? যেমন জলের পানা। ঢেইয়ে দিলে সব পানা সরে গেল। আবার একটু পরেই আপনা আপনি ঘুরে এল। —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

৪৬। মিথ্যার অস্তিত্ব যদি কোথাও থাকে, তবে সে মনুষ্যের মন ছাড়া আর কোথাও নাই। —শ্রীকান্ত : শরৎচন্দ্র

৪৭। রহস্য বিশ্বের প্রাণ,
রহস্যই স্ফূর্তিমান্
রহস্যে বিরাজমান ভব। —সাধের আসন : বিহারীলাল চক্রবর্তী

৪৮। যেখানে সকলের জন্যে সকলে কাঁদে সেইখানেই স্বর্গ। —সাধারণী : অক্ষয়চন্দ্র সরকার

৪৯। নির্লিপ্তভাবে সংসার করা কি রকম জান? পাঁকাল মাছের মতন। —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

৫০। জলে নৌকা থাকে ক্ষতি নেই, কিন্তু নৌকার ভেতর যেন জল না ঢোকে, তা হলে ডুবে যাবে। —শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

৫১। কাঁচা মাটিতে গড়ন হয়, পোড়া মাটিতে আর গড়ন চলে না। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

৫২। যে না সয়, সে নাশ হয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

৫৩। যেমন আলু-বেগুন সিদ্ধ হলে নরম হয় তেমনি সিদ্ধপুরুষের স্বভাব নরম হয়ে থাকে। তার সব অভিমান চলে যায়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

খ। নিম্নলিখিত প্রবাদগুলির ভাবসম্প্রসারণ কর :

১। অতিদর্পে হতা লঙ্কা।

২। অতিলোভে তাঁতি নষ্ট।

৩। আনারস বলে কাঁঠাল ভাই তুমি বড় খসখসে।
৪। কত হাতি গেল তল মশা বলে কত জল?
৫। হাতি ঘোড়া গেল তল, ব্যাঙ বলে কত জল?
৬। কষ্ট বিনা কেষ্ট মেলে না।
৭। কারো পৌষমাস কারো সর্বনাশ।
৮। গাছে কাঁঠাল গোঁফে তেল।
৯। গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না।
১০। চক চক করলেই সোনা হয় না।
১১। চোরা না শোনে ধর্মের কাহিনী।
১২। জোর যার মুলুক তার।
১৩। ঢিলটি মারলে পাটকেলটি খেতে হয়।
১৪। বজ্র আঁটুনি ফস্কা গেরো।
১৫। বামুন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর।
১৬। ভাগের মা গঙ্গা পায় না।
১৭। নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা।
১৮। যেমন কর্ম তেমনি ফল।
১৯। রাই কুড়িয়ে বেল।

ভাবার্থ

কোনো কবিতা, কবিতাংশ বা প্রবন্ধাংশ উদ্ধৃত করে তার ভাবার্থ লিখতে বলা হলে বুঝতে হবে উদ্ধৃত অংশের মূল ভাবটিকে অল্প পরিসরে পরিস্ফুট করতে হবে। এই পরিস্ফুটনও একটি বিশেষ রচনা। এক রচনা থেকে আর-এক রচনা। 'ভাবার্থ' ইংরেজি Substance কথাটিরই প্রতিশব্দ। মর্মকথা, মর্মার্থ, মর্মসত্য, ভাবসত্য, তাৎপর্যার্থ ইত্যাদি শব্দও এই অর্থে প্রযোজ্য।

॥ ভাবার্থ লেখার নিয়ম ॥

● বারবার পড়তে পড়তে মূল ভাবটিকে বুঝতে হবে।

● প্রতিটি শব্দ-প্রয়োগের সার্থকতা উপলব্ধি করতে হবে। ভাবটি ভালো করে না ধরতে পারলে লেখার মধ্যেও অস্পষ্টতা এসে যাবে।

● ভাবার্থের কলেবর-সম্পর্কে ধরা-বাঁধা কোনো নিয়ম নেই। মূলের পরিসর থেকে কমও হতে পারে, তার সমানও হতে পারে।

● পুনরুক্তি অবশ্যই পরিহার্য।

● মূলে প্রত্যক্ষ উক্তি থাকলে তাকে পরোক্ষ উক্তিতে আনতে হবে।

● ভাষা অলঙ্কারবর্জিত ও প্রাঞ্জল হওয়া বাঞ্ছনীয়।

● মূল উদ্ধৃতিতে নেই এমন অবান্তর কোনো বিষয়ের উপস্থাপন করা চলবে না।

● ভাবার্থের ভাষা শিল্পসম্মত হবে।

॥ ভাবার্থ ও সারসংক্ষেপের পার্থক্য ॥

ভাবার্থ ও সারসংক্ষেপ দুই-ই মূলত মূল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ। তবে সারসংক্ষেপের মতো ভাবার্থে আয়তনের কোনো বাঁধাধরা নিয়ম নেই। এমন কি ভাবার্থ কোনো কোনো জায়গায় মূল রচনার চেয়ে বড়োও হতে পারে।

সারসংক্ষেপে সহজ কথায় সংক্ষেপণটিই মুখ্য। কিন্তু ভাবার্থে ভাষাসৌষ্ঠব থাকা বাঞ্ছনীয়। একথার অর্থ অবশ্য এই নয় যে, সারসংক্ষেপে যেমন তেমন করে লিখলেই হল। আসল কথা ভাবার্থে ভাষা যতটা শিল্পসম্মত হওয়া দরকার সারসংক্ষেপে ততটা নয়।

সারসংক্ষেপের মতো ভাবার্থে কোনো শিরোনাম দেবার প্রয়োজন নেই।

॥ উদাহরণ ॥

১। শ্যামল সুন্দর সৌম্য, হে অরণ্যভূমি,
মানবের পুরাতন বাসগৃহ তুমি।
নিশ্চল নির্জীব নহ সৌধের মতন—
তোমার মুখশ্রীখানি নিত্যই নূতন
প্রাণে প্রেমে ভাবে অর্থে সজীব সচল।
তুমি দাও ছায়াখানি, দাও ফুল ফল,

দাও বস্ত্র, দাও শয্যা, দাও স্বাধীনতা,
নিশিদিন মর্মরিয়া কহ কত কথা
অজানা ভাষার মন্ত্র ; বিচিত্র সংগীতে
গাও জাগরণগাথা ; গভীর নিশীথে
পাতি দাও নিস্তব্ধতা অঞ্চলের মতো
জননী-বক্ষের ; বিচিত্র হিল্লোলে কত
খেলা কর শিশু-সনে ; বৃদ্ধের সহিত
কহ সনাতন বাণী বচন-অতীত।

[ত্রিপুরা উ. মা. পরীক্ষা, ১৯৭৮]

ভাবার্থঃ অরণ্যই মানুষের আদি বাসগৃহ। অরণ্য জড়পদার্থ নয়, তা সজীব এবং শক্তি-সম্পদের আকর। মানুষের কাছে তার দান অনেক। শুধু জীবনের উপকরণ নয়, মন ও মননের উপকরণও মেলে এই অরণ্যে। অরণ্য মানুষের কাছে মায়ের মতো অফুরন্ত স্নেহের উৎস। অরণ্য বয়সনির্বিশেষে সকলের বন্ধু ও শুভাকাঙ্ক্ষী।

২। ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,
হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা
তোমার আদেশে। যেন রসনায় মম
সত্যবাক্য ঝলি ওঠে খর খড়্গসম
তোমার ইঙ্গিতে। যেন রাখি তব মান
তোমার বিচারাসনে লয়ে নিজস্থান।
অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে
তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।

[উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, সংসদ, ১৯৭৮]

ভাবার্থঃ দুর্বলতা দূর করাই আমাদের কাম্য। প্রয়োজনে দুর্বলতার বিরুদ্ধে নিষ্ঠুরতা বা কঠোরতা প্রয়োগ করতে হবে। সত্য বড়ো কঠিন। তাই মিথ্যার বিরুদ্ধে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে আমাদের কঠিন হতে হবে। যে কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে হবে। সত্য আর ন্যায়বোধ আমাদের পাথেয়। ঈশ্বরের অনুমোদন ও নির্দেশ আমাদের সহায়।

৩। আমি ভয় করব না ভয় করব না ;
দুবেলা মরার আগে মরব না ভাই মরব না ;
তরীখানা বাইতে গেলে
মাঝে মাঝে তুফান মেলে
তাই বলে হাল ছেড়ে দিয়ে কান্নাকাটি করব না।

[নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

ভাবার্থঃ মৃত্যু জীবনের পরিণতি নয় বরং জীবনের পরিপূর্ণতা। মৃত্যুভীত মানুষ যখন মৃত্যুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করতে চায়,—সে বোঝে না যে জীবন তার

কাছে 'অধরা' হয়ে থাকছে। মৃত্যুভয় মানুষকে করে তোলে জীবন্মৃত,—যা মৃত্যুর চেয়েও বড়ো অভিশাপ। বরং সর্বদা সজীব থেকে জীবনের বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করার মধ্যেই রয়েছে মানুষের প্রকৃত গৌরব। যে পথ কণ্টকসমাবেশে দুর্গম, সে পথই মনুষ্যত্বলাভের প্রকৃষ্ট সহায়ক।

৪। কবি এই বিশ্বজগতে তাঁহার হৃদয়ের দৃষ্টি দিয়া একটি অপরূপকে দেখিতে পান, তাহাকেই তিনি রূপের মধ্যে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন। অন্যের দেখা যেখানে ফুরাইয়া যায় সেখানেও তাঁহার ভাবের দৃষ্টি অবরুদ্ধ হয় না। সেই অপরূপ দেশের বার্তা তাঁহার কাব্যের ছন্দে ছন্দে নানা আভাসে বাজিয়া উঠিতে থাকে। বৈজ্ঞানিকের পন্থা স্বতন্ত্র হইতে পারে; কিন্তু কবিত্বসাধনার সহিত তাঁহারও সাধনার ঐক্য আছে। দৃষ্টির আলোক যেখানে শেষ হইয়া যায় সেখানেও তিনি আলোকের অনুসরণ করিতে থাকেন। শ্রুতির শক্তি যেখানে সুরের শেষ সীমায় সেখান হইতেও কম্পমান বাণী আহরণ করিয়া আনেন। প্রকাশের অতীত যে রহস্য প্রকাশের আড়ালে বসিয়া দিবারাত্র কাজ করিতেছে, বৈজ্ঞানিক তাহাকেই প্রশ্ন করিয়া উত্তর বাহির করিতেছেন এবং সেই উত্তরকেই মানবভাষায় যথাযথ করিয়া ব্যক্ত করিতে নিযুক্ত আছেন। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

ভাবার্থঃ হৃদয়ানুভূতি মানুষের অন্তরের দৃষ্টিকে জাগ্রত করে। যাঁর এই দৃষ্টি জাগ্রত হয়,—তিনিই কবি। কবি তাঁর এই দৃষ্টি দিয়ে দেখতে পান রূপ, রস, বর্ণ, গন্ধ, স্পর্শের অতীত সত্যকে। সাধারণ মানুষের দৃষ্টি যেখানে অবরুদ্ধ হয় কবির দৃষ্টি সেখানে থেমে থাকে না। তিনি দেখেন অন্তর্নিহিত সত্যকে। রূপের মধ্যে যে অরূপকে তিনি প্রত্যক্ষ করেন, তারই সুর ঝঙ্কৃত হয় তাঁর কাব্যে।

বৈজ্ঞানিকেরও লক্ষ্য একই, তবে পথ ভিন্ন। আলো যেখানে শেষ, ধ্বনি যেখানে লুপ্ত—সেখানে তিনি খুঁজে পান আলোকতরঙ্গ, ধ্বনিকম্পন। সাধারণের দৃষ্টি বা শ্রুতি সেখানে পৌঁছয় না। একাগ্র সত্যসন্ধান জাগ্রত করে সেই দৃষ্টি। প্রকাশাতীতের রহস্য-অবগুণ্ঠন উন্মুক্ত করে তাকে যথার্থভাবে জানেন বৈজ্ঞানিক এবং তাকে সাধারণের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করেন তিনি। কবি এবং বৈজ্ঞানিক এই ভাবেই মানুষের সত্যোপলব্ধি ঘটান।

৫। নানা দুঃখে চিত্তের বিক্ষেপে
যাহাদের জীবনের ভিত্তি যায়
বার বার কেঁপে,
যারা অন্যমনা, তারা শোনো—
আপনারে ভুল না কখনো।
মৃত্যুঞ্জয় যাহাদের প্রাণ
সব তুচ্ছতার উর্ধ্বে দীপ যারা
জ্বালে অনির্বাণ
তাহাদের মাঝে যেন হয়

তোমাদের নিত্য পরিচয়,
তাহাদের খর্ব কর যদি
খর্বতার অপমানে বন্দী হয়ে
রবে নিরবধি,
তাদের সম্মানে মান নিয়ো
বিশ্বে যারা চিরস্মরণীয়।

[নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

ভাবার্থঃ জীবনের চলার পথে সুখ যেমন আছে তেমনি আছে দুঃখ। এই দুঃখের আঘাত সহ্য করে মানুষকে মাথা তুলে দাঁড়াতে হবে। আর সেই চলার শক্তি বা পাথেয় আমরা গ্রহণ করব আদর্শ মহামানবের জীবন থেকে। যাঁদের জীবন উজ্জ্বল দীপশিখার মতো আমাদের আলো দেখায়, তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে আমরা নিজেরাই গৌরবান্বিত হই।

৬। তোমার কাছে আরাম চেয়ে পেলেম শুধু লজ্জা,
এবার সকল অঙ্গ ছেয়ে পরাও রণসজ্জা।
ব্যাঘাত আসুক নব নব আঘাত পেয়ে অচল রব।
বক্ষে আমার দুঃখে তব বাজবে জয়ডঙ্ক,
দেব সকল শক্তি, লব অভয় তব শঙ্খ।

[উ. মা. পরীক্ষা, সংসদ, ১৯৭৯]

ভাবার্থঃ আরাম আর বিলাসের জীবন মানুষকে দুর্বল করে জীবনসংগ্রাম থেকে বিমুখ করে। দুঃখ ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করেই মানুষ সার্থক হয়ে ওঠে, কারণ সেই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তার মনুষ্যত্ব ও অন্তর্নিহিত শক্তি হয় বিকশিত। তাই কবি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছেন, তিনি যেন কবিকে দুঃখের আঘাতে মনুষ্যত্বে উন্নীত করেন, কারণ দুঃখ তাঁরই কল্যাণময়ী ইচ্ছার বাহরূপ মাত্র।

৭। চিত্ত যেথা ভয়শূন্য উচ্চ যেথা শির
জ্ঞান যেথা মুক্ত, যেথা গৃহের প্রাচীর
আপন প্রাঙ্গণতলে দিবসশর্বরী
বসুধারে রাখে নাই খণ্ড ক্ষুদ্র করি,
যেথা বাক্য হৃদয়ের উৎসমুখ হ'তে
উচ্ছ্বসিয়া ওঠে, যেথা নির্বারিত স্রোতে
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়,
যেথা তুচ্ছ আচারের মরু-বালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি—
পৌরুষেরে করে নি শতধা ; নিত্য যেথা
তুমি সর্ব কর্ম-চিন্তা আনন্দের নেতা,

নিজ হস্তে নির্দয় আঘাত করি পিতঃ
ভারতেরে সেই স্বর্গে করো জাগরিত।

[ত্রিপুরা উ. মা. পরীক্ষা, ১৯৭৯]

ভাবার্থঃ ভারত যেন নিদ্রাচ্ছন্ন হয়ে আছে। ভয়, কুসংস্কার, সঙ্কীর্ণতা—এ সবই হল সেই নিদ্রার প্রতীক। কবি প্রার্থনা করছেন—ঈশ্বর ভারতের নিদ্রাভঙ্গ করে তাকে এমন এক স্বর্গে জাগ্রত করুন যেখানে মানুষ সর্ববিষয়ে নির্ভীক, সমস্ত সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্ত, বিচারবুদ্ধিতে আশ্রিত, পৌরুষনিষ্ঠ এবং ঈশ্বরমুখী।

৮। বিপদে মোরে রক্ষা করো, এ নহে মোর প্রার্থনা—
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।
দুঃখ-তাপে ব্যথিত চিতে নাই-বা দিলে সান্ত্বনা,
দুঃখে যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে নিজের বল না যেন টুটে—
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি, লভিলে শুধু বঞ্চনা,
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়। [ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৮১]

ভাবার্থঃ দুর্বলের মতো নিজেকে রক্ষা করাই পরমেশ্বরের কাছে আমাদের প্রার্থনা নয়। আমরা সেই শক্তি চাইব যে-শক্তির বলে দুর্বলতা, কাপুরুষতা জয় করে আমরা বীরের ধর্ম পালন করতে পারব ; আর দুঃখ-দারিদ্র্য, ক্ষয়-ক্ষতিকে তুচ্ছ করে জাগ্রত করতে পারব আত্মমর্যাদাবোধ।

৯। নমি আমি প্রতিজনে—আদ্বিজ-চণ্ডাল,
প্রভু-ক্রীতদাস।
সিন্ধুমূলে জলবিন্দু, বিশ্বমূলে অণু
সমগ্রে প্রকাশ।
নমি কৃষি-তন্তু-জীবী, স্থপতি তক্ষণ
চর্ম-কর্মকার।
অদ্রিতলে শিলাখণ্ড—দৃষ্টি-অগোচরে
বহ অদ্রিভার।
কত রাজ্য, কত রাজা গড়িছ নীরবে
হে পূজ্য, হে প্রিয়।
একত্বে বরেণ্য তুমি, শরণ্য এককে
আত্মার আত্মীয়। [ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৮১]

ভাবার্থঃ এ বিশ্বে কেউ তুচ্ছ নয়। ছোটো-বড়ো সকল মানবের সমবেত চেষ্টার ফলেই আজ মানব-সভ্যতা গড়ে উঠেছে। এককভাবে যে ক্ষুদ্র দুর্বল, সমবেতভাবে সেই আবার মহা শক্তিধর—দুর্জয়। মহৎ কার্য সম্পাদনের জন্যে তাই ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হওয়া দরকার।

১০। পরের মুখে শেখা বুলি পাখির মত কেন বলিস ?
পরের ভঙ্গি নকল করে নটের মত কেন চলিস ?
তোর নিজত্ব সর্বাঙ্গে তোর দিলেন ধাতা আপন হাতে ;
মুছে সেটুক বাজে হলি, গৌরব কি বাড়ল তাতে ?
আপনারে যে ভেঙেচুরে গড়তে চায় পরের ছাঁচে,
অলীক ফাঁকি, মেকি সে জন, নামটা তার কদিন বাঁচে ?
পরের চুরি ছেড়ে দিয়ে আপন মাঝে ডুবে যা রে,
খাঁটি ধন যা সেথায় পাবি, আর কোথাও পাবি নারে। [উ. মা. ১৯৮১]

ভাবার্থ : পরানুকরণের মতো অভিশাপ মানুষের জীবনে আর নেই। সব মানুষের মধ্যেই বিধাতার দেওয়া শক্তি বা স্বকীয়তা আছে, মানুষ সে-কথা ভুলে গিয়ে পরানুকরণরূপ অগৌরবের মধ্যে নিমগ্ন হয়। কিন্তু অশেষ দুঃখ-বেদনার মধ্য দিয়ে একদিন পরানুকরণ যে মিথ্যা-আত্মবঞ্চনা তা উপলব্ধ হয়। তখনই সেই আত্মশক্তির জাগরণের মধ্য দিয়ে স্থাপিত হয় অক্ষয় কীর্তি।

১১। হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি/ত্যজিতে মুকুট-দণ্ড সিংহাসন-ভূমি,
ধরিতে দরিদ্রবেশ ; শিখায়েছ বীরে/ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয়-পরাজয় শর সংহরিতে।/কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্ত চিতে
সর্বকর্মফল-স্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার/গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে। [উ. মা. ১৯৮০]

ভাবার্থ : ত্যাগ ও বৈরাগ্য ছিল প্রাচীন ভারতের আদর্শ। সে আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতীয় রাজারা ভোগাসক্তি ত্যাগ করেছেন। বীরের ভূষণ ছিল ক্ষমা। কর্মীর কর্ম-ফলের প্রতি ছিল না আকাঙ্ক্ষা, গৃহজীবন ছিল মহত্বে ও ঔদার্যে ভরা।

১২। "বসুমতী কেন তুমি এতই কৃপণা ?
কত খোঁড়াখুঁড়ি করি, পাই শস্যকণা।
দিতে যদি হয় দে-মা, প্রসন্ন সহাস।
কেন এ মাথার ঘাম পায়েতে বহাস ?
বিনা চাষে শস্য দিলে কি তাহাতে ক্ষতি ?"
শুনিয়া ঈষৎ হাসি কন বসুমতী—
"আমার গৌরব তাহে সামান্যই বাড়ে ;
তোমার গৌরব তাহে নিতান্তই ছাড়ে।" [উ. মা. ১৯৮২]

ভাবার্থ : কর্ম মানুষের ধর্ম। এই কর্মের মাধ্যমেই মানুষের মানবতা এবং প্রতিভার বিকাশ ঘটে। দুঃখ, বেদনা এবং বিরুদ্ধ শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করেই মানুষ সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর জয়মাল্য কণ্ঠে ধারণ করে। অন্যদিকে সংগ্রামহীন আলস্য মানুষের ব্যর্থতার স্মৃতিচিহ্ন।

১৩। বনের পাখি বলে, 'আকাশ ঘননীল
কোথাও বাধা নাহি তার'

খাঁচার পাখি বলে, 'খাঁচাটি পরিপাটি
কেমন ঢাকা চারি ধার।'
বনের পাখি বলে, 'আপনা ছাড়ি দাও
মেঘের মাঝে একেবারে।'
খাঁচার পাখি বলে 'নিরালা সুখকোণে
বাঁধিয়া রাখো আপনারে।'
বনের পাখি বলে 'না,
সেথা কোথায় উড়িবারে পাই।'
খাঁচার পাখি, বলে 'হায়
মেঘে কোথায় বসিবার ঠাঁই।'

ভাবার্থ ঃ সীমা ও অসীমের মধ্যে চিরবিরোধ, যে-বিরোধ আবদ্ধ ও মুক্ত জীবনের মধ্যে। সীমা বা বন্ধনের মধ্যে নিরুদ্বেগ জীবনের সুখ আছে কিন্তু নেই মুক্তির অনাবিল আনন্দ। এই অনাবিল আনন্দই মানুষের পরম কামনার ধন। মুক্তির আনন্দের কাছে সংকীর্ণ জীবনের বিবর্ণ সুখ অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়।

১৪ 'কিসের তরে অশ্রু ঝরে, কিসের লাগি দীর্ঘশ্বাস
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস।
রিক্ত যারা সর্বহারা সর্বজয়ী বিশ্বে তারা,
গর্বময়ী ভাগ্যদেবীর নয়কো তারা ক্রীতদাস।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥
আমরা সুখের স্ফীত বুকের ছায়ার তলে নাহি চরি।
আমরা দুখের বক্রমুখের চক্র দেখে ভয় না করি।
ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য বাজিয়ে যাব জয়বাদ্য,
ছিন্ন আশার ধ্বজা তুলে ভিন্ন করব নীলাকাশ।
হাস্যমুখে অদৃষ্টেরে করব মোরা পরিহাস॥

ভাবার্থ ঃ মানবজীবন সুখদুঃখের সমবায়ে সৃষ্ট। কাপুরুষের কাছে নিরুদ্বেগ সুখের জীবন কাম্য হলেও সংগ্রামী মানুষ সুখের ললিত ক্রোড়ে বন্দী থাকতে চান না। তাঁরা দুঃখবেদনার মধ্যেই আপন অন্তর্নিহিত শক্তির পরম ঐশ্বর্যকে আবিষ্কার করেন। এই শক্তির মহামন্ত্রে দীক্ষিত মানুষ হাসিমুখে দুঃখজয়ের সাধনায় ব্রতী হন।

১৫। মানুষ অতি দুর্বল জীব, সকল শত্রুর নিকট আত্মরক্ষার জন্য সে আর একটা কৌশল আশ্রয় করিয়াছে। মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে, সেই দলের নাম সমাজ। দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে, স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হয়, নতুবা দল ভাঙিয়া যায়। যে পাশব প্রবৃত্তি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে কেবল আত্মরক্ষার দিকে প্রেরিত করে, দলের কল্যাণার্থে মানুষ সে পাশব প্রবৃত্তির সংযমে বাধ্য হয়। এই জন্য যে বুদ্ধি আবশ্যক তাহার নাম 'ধর্মবুদ্ধি'। ইহা সমাজ-রক্ষার অনুকূল—ইহা

লোকস্থিতির সহায়। মানুষের পশুজীবনই ত দুই টানাটানির ব্যাপার, উহার উপর এই সামজিক জীবন আর একটা নতুন টানাটানির সৃষ্টি করে। আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার যে সকল প্রবৃত্তি তাহা মানুষকে একপথে প্রেরণ করে, সামাজিক মানুষকে এই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য কেবলই চেষ্টা করিতে হয়।

এই সামঞ্জস্য-স্থাপনের নিরন্তর চেষ্টাই নৈতিক জীবন। প্রবৃত্তি তাহাকে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঠেলে, আর ধর্মবুদ্ধি তাহাকে নিবৃত্তিমার্গে চালাইতে চেষ্টা করে—এই দুইটি টানাটানির মধ্যে পড়িয়া মনুষ্য কৃপার পাত্র। মানবহৃদয় জীবনব্যাপী মহাভারতের কুরুক্ষেত্র—ধর্মের সহিত অধর্মের মহাযুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে।

ভাবার্থঃ জীবন এক রণক্ষেত্র। এখানে মানুষের ভূমিকা সংগ্রামী সৈনিকের ভূমিকা। সংগ্রাম, ধর্মের সঙ্গে অধর্মের। প্রবৃত্তি মানুষকে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের দিকে আকর্ষণ করে, আর মানুষের ধর্মবুদ্ধি তাকে রক্ষা করে এই সর্বনাশের হাত থেকে। মানুষের যুদ্ধজয়ের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র হল যে সমাজ সেই সমাজ-জীবনের সঙ্গেও মানুষের চলে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম। সেখানে এক দিকে স্বার্থপরতা, অন্যদিকে ধর্মবুদ্ধির সংগ্রাম। সমস্ত সংগ্রামে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টাই হল জীবনের উদ্দেশ্য।

১৬। সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে
সময়ের হাত
সৌন্দর্যেরে করে না আঘাত ;
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য জন্ম লয়—শুক্‌নো পাতার মতো ঝরে নাক' বনে।
ঝরে নাক বনে
নক্ষত্রও নিবে যায় মুছে যায় পৃথিবীর পুরাতন পথ
শেষ হয় কমলার ফুলবন বনের পর্বত ;
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য জন্ম লয় শুকনো পাতার মত ঝরে নাক' বনে।

ভাবার্থঃ মহাকাল জীবন ও জগতের সবকিছুই হরণ করে। মানুষের কীর্তি, শক্তির দম্ভ, সবকিছুই কালের আঘাতে একদিন পরাভূত হয়। এ পৃথিবীতে একমাত্র মানুষের মনে সৌন্দর্যচেতনাই অমরতার দাবি করতে পারে, যা কালের আঘাতে পুরাতন জড়পিণ্ডের মতো কোনদিন লুপ্ত হয় না।

১৭। 'কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই·আকাশ পাতাল জুড়ে,
কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড় চূড়ে ?
হায় ঋষি দরবেশ
বুকের মাণিক বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুজে,
ইচ্ছা অন্ধ, আঁখি খোল, দেখ দর্পণে নিজ কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাহার ছায়া।

শিহরি উঠো না শাস্ত্রবিদেরে করো নাকো বীর ভয়,
তাহারা খোদার খোদ প্রাইভেট সেক্রেটারী তো নয়,
সকলের মাঝে প্রকাশ তাহার, সকলের মাঝে তিনি,
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি' ॥

ভাবার্থঃ মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজিত। ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে অথবা তীর্থ-ভ্রমণের মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। তিনি আছেন আমাদের হৃদয় জুড়ে, সেখানে অনুসন্ধান করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে। তাই ঈশ্বরলাভের উপায় হল নিজেকে জানার চেষ্টা করা।

১৮। সবার চেয়ে মিষ্টি কি সুর
বলতে পারিস আমি জানি।
তোরা ভাবিস বাসর-ঘরে
বধূর কানে বরের বাণী।
কি বলিলি? চৈত্রে যখন
কোকিল ডাকে তাহার মতন
এমন আওয়াজ নেই ভুবনে?
থামারে তোর বকবকানি।
আধো আধো শিশুর ভাষা
সবার চেয়ে মিষ্টি লাগে?
অনেক রাতে একলা বাঁশি
কাঁদে যখন অনুরাগে।
ভুবনে তার নেই তুলনা?
ওরে বাতুল সব ছলনা।
সবার চেয়ে মধুর আওয়াজ
নগদ টাকার ঝনঝনানি।

ভাবার্থঃ পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে মধুর বা শ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু কী, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছেন কবি। প্রথমে প্রেম-মধুর অনুভূতি ও বিষণ্ণ করুণ সৌন্দর্যের মধ্যে কবি অনুসন্ধান করেছেন আমাদের প্রেয় কে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন, অন্য কিছু নয়, অর্থই জীবনের মধুরতম বস্তু।

১৯। মাধব, হাম পরিণাম-নিরাশা
তুহুঁ জগতারণ —দীন-দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমানা ॥

লোকস্থিতির সহায়। মানুষের পশুজীবনই ত দুই টানাটানির ব্যাপার, উহার উপর এই সামজিক জীবন আর একটা নতুন টানাটানির সৃষ্টি করে। আত্মরক্ষা ও বংশরক্ষার যে সকল প্রবৃত্তি তাহা মানুষকে একপথে প্রেরণ করে, সামাজিক মানুষকে এই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া সামঞ্জস্য-বিধানের জন্য কেবলই চেষ্টা করিতে হয়।

এই সামঞ্জস্য-স্থাপনের নিরন্তর চেষ্টাই নৈতিক জীবন। প্রবৃত্তি তাহাকে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের দিকে ঠেলে, আর ধর্মবুদ্ধি তাহাকে নিবৃত্তিমার্গে চালাইতে চেষ্টা করে—এই দুইটি টানাটানির মধ্যে পড়িয়া মনুষ্য কৃপার পাত্র। মানবহৃদয় জীবনব্যাপী মহাভারতের কুরুক্ষেত্র—ধর্মের সহিত অধর্মের মহাযুদ্ধ সেখানে নিরন্তর চলিতেছে।

ভাবার্থঃ জীবন এক রণক্ষেত্র। এখানে মানুষের ভূমিকা সংগ্রামী সৈনিকের ভূমিকা। সংগ্রাম, ধর্মের সঙ্গে অধর্মের। প্রবৃত্তি মানুষকে উদ্দাম স্বাতন্ত্র্যের দিকে আকর্ষণ করে, আর মানুষের ধর্মবুদ্ধি তাকে রক্ষা করে এই সর্বনাশের হাত থেকে। মানুষের যুদ্ধজয়ের সবচেয়ে বড়ো অস্ত্র হল যে সমাজ সেই সমাজ-জীবনের সঙ্গেও মানুষের চলে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম। সেখানে এক দিকে স্বার্থপরতা, অন্যদিকে ধর্মবুদ্ধির সংগ্রাম। সমস্ত সংগ্রামে সামঞ্জস্য-বিধানের চেষ্টাই হল জীবনের উদ্দেশ্য।

১৬। সময় মুছিয়া ফেলে সব এসে
সময়ের হাত
সৌন্দর্যেরে করে না আঘাত ;
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য জন্ম লয়—শুকনো পাতার মতো ঝরে নাক' বনে।
ঝরে নাক বনে
নক্ষত্রও নিবে যায় মুছে যায় পৃথিবীর পুরাতন পথ
শেষ হয় কমলার ফুলবন বনের পর্বত ;
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য জন্ম লয় শুকনো পাতার মত ঝরে নাক' বনে।

ভাবার্থঃ মহাকাল জীবন ও জগতের সবকিছুই হরণ করে। মানুষের কীর্তি, শক্তির দম্ভ, সবকিছুই কালের আঘাতে একদিন পরাভূত হয়। এ পৃথিবীতে একমাত্র মানুষের মনে সৌন্দর্যচেতনাই অমরতার দাবি করতে পারে, যা কালের আঘাতে পুরাতন জড়পিণ্ডের মতো কোনদিন লুপ্ত হয় না।

১৭। 'কে তুমি খুঁজিছ জগদীশে ভাই-আকাশ পাতাল জুড়ে,
কে তুমি ফিরিছ বনে জঙ্গলে, কে তুমি পাহাড় চূড়ে ?
হায় ঋষি দরবেশ
বুকের মাণিক বুকে ধরে তুমি খোঁজ তারে দেশ দেশ।
সৃষ্টি রয়েছে তোমা পানে চেয়ে তুমি আছ চোখ বুজে,
ইচ্ছা অন্ধ, আঁখি খোল, দেখ দর্পণে নিজ কায়া,
দেখিবে, তোমারি সব অবয়বে পড়েছে তাহার ছায়া।

শিহরি উঠো না শাস্ত্রবিদেরে করো নাকো বীর ভয়,
তাহারা খোদার খোদ প্রাইভেট সেক্রেটারী তো নয়,
সকলের মাঝে প্রকাশ তাহার, সকলের মাঝে তিনি,
আমারে দেখিয়া আমার অদেখা জন্মদাতারে চিনি' ॥

ভাবার্থঃ মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজিত। ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে অথবা তীর্থ-ভ্রমণের মাধ্যমে ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না। তিনি আছেন আমাদের হৃদয় জুড়ে, সেখানে অনুসন্ধান করলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যাবে। তাই ঈশ্বরলাভের উপায় হল নিজেকে জানার চেষ্টা করা।

১৮। সবার চেয়ে মিষ্টি কি সুর
বলতে পারিস আমি জানি।
তোরা ভাবিস বাসর-ঘরে
বধূর কানে বরের বাণী।
কি বলিলি? চৈত্রে যখন
কোকিল ডাকে তাহার মতন
এমন আওয়াজ নেই ভুবনে?
থামারে তোর বকবকানি।
আধো আধো শিশুর ভাষা
সবার চেয়ে মিষ্টি লাগে?
অনেক রাতে একলা বাঁশি
কাঁদে যখন অনুরাগে।
ভুবনে তার নেই তুলনা?
ওরে বাতুল সব ছলনা।
সবার চেয়ে মধুর আওয়াজ
নগদ টাকার ঝনঝনানি।

ভাবার্থঃ পৃথিবীতে মানুষের সবচেয়ে মধুর বা শ্রেষ্ঠ কাম্যবস্তু কী, এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছেন কবি। প্রথমে প্রেম-মধুর অনুভূতি ও বিষণ্ণ করুণ সৌন্দর্যের মধ্যে কবি অনুসন্ধান করেছেন আমাদের প্রেয় কে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি এই সিদ্ধান্তেই এসেছেন, অন্য কিছু নয়, অর্থই জীবনের মধুরতম বস্তু।

১৯। মাধব, হাম পরিণাম-নিরাশা
তুহুঁ জগতারণ —দীন-দয়াময়
অতয়ে তোহারি বিশোয়াসা ॥
কত চতুরানন মরি মরি যাওত
ন তুয়া আদি অবসানা।
তোহে জনমি পুন তোহে সমাওত
সাগরলহরী সমানা ॥

ভণয়ে বিদ্যাপতি শেষ শমন-ভয়ে
তুয়া বিনা, গতি নাহি আরা।
আদি-অনাদিক— নাথ কহায়সি
ভবতারণ-ভার তোহারা॥

[কৃতাঞ্জলি : বিদ্যাপতি]

ভাবার্থ : ভক্তের কাছে ভগবান্ সীমাহীন সমুদ্রস্বরূপ। আর মানুষ হল বিশাল সমুদ্রের তরঙ্গ। তরঙ্গভঙ্গের মতোই ঈশ্বর-সমুদ্রে মানুষের সৃষ্টি-স্থিতি আর লয়। অগতির গতি ঈশ্বর জীবের একমাত্র ভরসা। তাই বিষয়-বাসনা পরিত্যাগ করে পরম পুরুষের চরণে আত্মসমর্পণ করাই ভক্তের একান্ত ঈপ্সিত।

২০। লক্ষ্মীছাড়া হও যদি খেয়ে আর দিয়ে।
কিছুমাত্র সুখ নাই হেন লক্ষ্মী নিয়ে॥
যতক্ষণ থাকে ধন তোমার আগারে।
নিজে খাও, খেতে দাও সাধ্য অনুসারে॥
ইথে যদি কমলার মন নাহি সরে।
পেঁচা নিয়ে যান মাতা কৃপণের ঘরে॥

[ধনসুখ—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত]

ভাবার্থ : পরিমিত ব্যবহারেই ঐশ্বর্যের সার্থকতা। অর্থ আছে বলেই ধনী যদি অমিতব্যয়ী হয়, প্রকৃত ধনসুখ সে পাবে না। নিজের জন্যে এবং সাধ্যমতো পরের জন্যেও বুঝেসুঝে ব্যয় করলে ধনীর ঐশ্বর্যভোগ সার্থক হবে। কৃপণ অপরের জন্যে কিছু করা দূরে থাকুক নিজের জন্যেও ব্যয় করতে কুণ্ঠিত। উপভোগহীন কৃপণের এই ধন একান্ত মূল্যহীন।

২১। সুবর্ণ-দেউল আমি দেখিনু স্বপনে
অতি-তুঙ্গ শৃঙ্গ শিরে ; সে শৃঙ্গের তলে,
বড় অপ্রশস্ত সিঁড়ি গড়া মায়া-বলে
বহুবিধ রোধে রুদ্ধ ঊর্ধ্বগামী জনে।
তবুও উঠিতে তথা সে দুর্গম স্থলে—
করিছে কঠোর চেষ্টা কষ্ট সহি মনে
বহুপ্রাণী, বহুপ্রাণী কাঁদিছে বিফলে,
না পারি লভিতে যত্নে যে রত্ন ভবনে।
ব্যথিত হৃদয় মোর দেখি তা সবারে
শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী
মৃদু হাসি,—"ওরে বাছা! না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে?

যশের মন্দির ওই ; ওথা যার গতি,
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতে রে তারে।”

[যশের মন্দির : মাইকেল মধুসূদন দত্ত]

ভাবার্থঃ মানুষ যশের কাঙাল। কিন্তু যশ সহজলভ্য নয়, এর জন্যে চাই কঠিন-কঠোর তপস্যা। যশোলোভী মানুষ সেই পরম সম্পদের আশায় দুরন্ত সাধনায় জীবন অতিবাহিত করে। কিন্তু এ সাধনায় সিদ্ধিলাভ সকলের ভাগ্যে ঘটে না। তবে একবার সেই দুর্লভ যশের মুকুট মাথায় পরতে পারলে মানুষ অমরতা লাভ করে।

২২। তুমি বসন্তের কোকিল, বেশ লোক। যখন ফুল ফোটে, দক্ষিণ বাতাস বহে, এ সংসার সুখের স্পর্শে শিহরিয়া উঠে, তখন তুমি আসিয়া রসিকতা আরম্ভ কর। আর যখন দারুণ শীতে জীবলোকে থরহরি কম্পমান, তখন কোথায় থাক বাপু? যখন শ্রাবণের ধারায় আমার চালাঘরে নদী বহে, যখন বৃষ্টির চোটে কাক-চিল ভিজিয়া গোময় হয়, তখন তোমার মাজামাজা কালো কালো দুলালি ধরনের শরীরখানি কোথায় থাকে? তুমি বসন্তের কোকিল, শীত-বর্ষার কেহ নও।

রাগ করিও না, তোমার মত আমাদের মাঝখানে অনেক আছেন। যখন নসীবাবুর তালুকের খাজনা আসে, তখন মানুষ-কোকিলে তাঁহার গৃহকুঞ্জ পুরিয়া যায়। কত টিকি ফোঁটা তেড়ি চশমার হাট বসিয়া যায়। যখন তাঁহার বাড়িতে নাচ গান যাত্রা পর্ব উপস্থিত হয়, তখন দলে দলে মানুষ-কোকিল আসিয়া তাঁহার ঘরবাড়ি আঁধার করিয়া তুলে—কেহ খায়, কেহ গায়, কেহ হাসে, কেহ কাশে, কেহ তামাক পোড়ায়, কেহ হাসিয়া বেড়ায়, কেহ মাত্রা চড়ায়, কেহ টেবিলের নীচে গড়ায়। যখন নসীবাবু বাগানে যান, তখন মানুষ-কোকিল তাঁহার সঙ্গে পিঁপীড়ার সারি দেয়। আর যে রাত্রে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল আর নসীবাবুর পুত্রটির অকালমৃত্যু হইল তখন তিনি একটি লোক পাইলেন না। কাহারও অসুখ, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কাহারও বড় সুখ—একটি নাতি হইয়াছে, এজন্য আসিতে পারিলেন না, কাহারও সমস্ত রাত্রি নিদ্রা হয় নাই, এজন্য আসিতে পারিলেন না; কেহ সমস্ত রাত্রি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত, এজন্য আসিতে পারিলেন না; আসল কথা, সেদিন বর্ষা, বসন্ত নহে। বসন্তের কোকিল সেদিন আসিবে কেন?

[কমলাকান্তের দপ্তর : বঙ্কিমচন্দ্র]

ভাবার্থঃ বসন্তের সঙ্গে কোকিলের সম্পর্ক। প্রকৃতির মনোরম পরিবেশেই তাদের দর্শন পাওয়া যায়। শীত ও বর্ষার প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিনে বসন্তের কোকিল থাকে অনুপস্থিত। আমাদের সমাজেও কোকিলের মতো, একদল সুখসন্ধানী মানুষের দেখা পাই। তারা সুখের পায়রা, আনন্দের সাথী। কিন্তু বিপদ-আপদে তাদের দেখা মেলে না, ব্যথার ব্যথী হয়ে পাশে এসে দাঁড়ায় না তারা। দুঃখ হল বন্ধুত্ব যাচাই করার কষ্টিপাথর।

২৩। সে প্রফুল্লতা, সে সুখ আর নাই কেন? সুখের সামগ্রী কি কমিয়াছে? অর্জন এবং ক্ষতি, উভয়ই সংসারের নিয়ম। কিন্তু ক্ষতি অপেক্ষা অর্জন অধিক, ইহাও

নিয়ম। তুমি জীবনের পথ যতই অতিবাহিত করিবে, ততই সুখদ সামগ্রী সঞ্চয় করিবে। তবে বয়সে স্ফূর্তি কমে কেন? পৃথিবীকে আর তেমন সুন্দরী দেখা যায় না কেন? আকাশের তারা আর তেমন জ্বলে না কেন? আকাশের নীলিমায় আর সে উজ্জ্বলতা থাকে না কেন? যাহা তৃণপল্লবময়, কুসুমসুবাসিত, স্বচ্ছ কল্লোলিনী-শীকর-সিক্ত, বসন্তপবনবিধূত বলিয়া বোধ হইত, এখন তাহা বালুকাময়ী মরুভূমি বলিয়া বোধ হয় কেন? কেবল রঙ্গিল কাচ নাই বলিয়া। আশা সেই রঙ্গিল কাচ। যৌবনে অর্জ্জিত সুখ অল্প, কিন্তু সুখের আশা অপরিমিতা। এখন অর্জ্জিত সুখ অধিক, কিন্তু সেই ব্রহ্মাণ্ডব্যাপিনী আশা কোথায়? তখন জানিতাম না, কিসে কি হয়, অনেক আশা করিতাম। এখন জানিয়াছি, এই সংসারচক্রে আরোহণ করিয়া, যেখানকার আবার সেইখানে ফিরিয়া আসিতে হইবে; যখন মনে ভাবিতেছি, এই অগ্রসর হইলাম, তখন কেবল আবর্ত্তন করিতেছি মাত্র! এখন বুঝিয়াছি যে, সংসার-সমুদ্রে সন্তরণ আরম্ভ করিলে, তরঙ্গে তরঙ্গে আমাকে প্রহত করিয়া আবার আমাকে কূলে ফেলিয়া যাইবে। এখন জানিয়াছি যে, এ অরণ্যে পথ নাই; এ প্রান্তরে জলাশয় নাই, এ নদীর পার নাই, এ সাগরে দ্বীপ নাই, এ অন্ধকারে নক্ষত্র নাই। এখন জানিয়াছি যে কুসুমে কীট আছে, কোমল পল্লবে কণ্টক আছে, আকাশে মেঘ আছে, নির্ম্মলা নদীতে আবর্ত্ত আছে, ফলে বিষ আছে, উদ্যানে সর্প আছে; মনুষ্য-হৃদয়ে কেবল আত্মাদর আছে। এখন জানিয়াছি যে বৃক্ষে বৃক্ষে ফল ধরে না, ফুলে ফুলে গন্ধ নাই, মেঘে মেঘে বৃষ্টি নাই, বনে বনে চন্দন নাই, গজে গজে মৌক্তিক নাই। এখন বুঝিতে পারিয়াছি যে, কাচও হীরকের ন্যায় উজ্জ্বল, পিত্তলও সুবর্ণের ন্যায় ভাস্বর, পঙ্কও চন্দনের ন্যায় স্নিগ্ধ, কাংস্যও রজতের ন্যায় মধুরনাদী।

[কমলাকান্তের দপ্তর: কে গায় ওই?: বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ভাবার্থ: যৌবনে আমাদের মন কল্পনার রঙে অনুরঞ্জিত থাকে, তাই আমাদের চোখে সবকিছুই সুন্দর বলে মনে হয়। কিন্তু এই ক্ষণস্থায়ী যৌবন যখন ধীরে ধীরে অপসারিত হয় তখন বার্ধক্য এসে আমাদের তরুণ মনকে অধিকার করে বসে। বার্ধক্যের ছায়ায় মনের নব রঙ মুছে যায়, তখনই আমরা বাস্তবের রূঢ় সত্য রূপটিকে প্রত্যক্ষ করে ব্যথিত হই। আমরা দেখি জীবনে আলোর পশ্চাতে অন্ধকার এবং সুন্দরের পশ্চাতে অসুন্দরের লীলা।

২৪। আমার চমক হইল—চাহিয়া দেখিলাম—বুঝি বড় ঢুলিয়া পড়িয়াছিলাম। কিন্তু চাহিয়া দেখিয়া নসীরামকে চিনিতে পারিলাম না—দেখিলাম, মনে হইল, একটা বৃহৎ পতঙ্গ বালিশ ঠেসান দিয়া তামাকু টানিতেছে। সে কথা কহিতে লাগিল—আমার বোধ হইতে লাগিল যে, সে চোঁ বোঁ করিয়া কি বলিতেছে। এখন হইতে আমার বোধ হইতে লাগিল যে, মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে—সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে, সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে, কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপ-বহ্নি, ধর্ম্ম-বহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়।

আবার সংসার কাচময়। যে আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এত দিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয়জন বাঁচিত। অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মান-বহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞান-বহ্নিজাত দাহের গীত—"Paradise Lost।" ধর্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেণ্ট পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ—"আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা।" রূপ-বহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েত"। ঈর্ষা-বহ্নির "ওথেলো।" গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতাপতঙ্গের দাহ-জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এসকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে, বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না, তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

[কমলাকান্তের দপ্তর : পতঙ্গ (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)]

ভাবার্থ: জগতে প্রত্যেক মানুষের একটি আকাঙ্ক্ষার বস্তু আছে। সেই বস্তুর দিকে ছুটে চলাই হল তার জীবনের লক্ষ্য। কেউ জ্ঞান, কেউ রূপ, কেউ ধর্মের আশায় জীবনের পথে ছুটে চলেছে। এই পরম সম্পদ অন্বেষণের পথে কারও জীবনান্ত হয়, কেউ ব্যর্থতার বোঝা মাথায় নিয়ে ফিরে আসে। কিন্তু যার অন্বেষণে মানুষ এইভাবে প্রমত্ত হয়ে ছুটে চলে তার স্বরূপ সম্বন্ধে কেউ সচেতন নয়, এটাই পরম আশ্চর্যের বিষয়।

২৫। ওরে তুই ওঠ্ আজি।

আগুন লেগেছে কোথা? কার শঙ্খ উঠিয়াছে বাজি
জাগাতে জগৎ-জনে? কোথা হতে ধ্বনিছে ক্রন্দনে
শূন্যতল। কোন্ অন্ধ কারা-মাঝে জর্জর বন্ধনে
অনাথিনী মাগিছে সহায়? স্ফীতকায় অপমান
অক্ষমের বক্ষ হতে রক্ত শুষি করিতেছে পান
লক্ষ মুখ দিয়া। বেদনারে করিতেছে পরিহাস
স্বার্থোদ্ধত অবিচার, সংকুচিত ভীত ক্রীতদাস
লুকাইছে ছদ্মবেশে। ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির
মূক সবে, ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর
বেদনার করুণ কাহিনী; স্কন্ধে যত চাপে ভার
বহি চলে মন্দগতি যতক্ষণ থাকে প্রাণ তার—

তার পরে সন্তানেরে দিয়ে যায় বংশ বংশ ধরি'
নাহি ভৎ'সে অদৃষ্টেরে, নাহি নিন্দে দেবতারে স্মরি'
মানবেরে নাহি দেয় দোষ, নাহি জানে অভিমান,
শুধু দুটি অন্ন খুঁটি কোনোমতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ
রেখে দেয় বাঁচাইয়া। সে অন্ন যখন কেহ কাড়ে,
সে প্রাণে আঘাত দেয় গর্বান্ধ নিষ্ঠুর অত্যাচারে,
নাহি জানে কার দ্বারে দাঁড়াইবে বিচারের আশে
দরিদ্রের ভগবানে বারেক ডাকিয়া দীর্ঘশ্বাসে
মরে সে নীরবে। এই সব মূঢ়-ম্লান মূক-মুখে
দিতে হবে ভাষা—এই সব শ্রান্ত শুষ্ক ভগ্ন বুকে
ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা ; ডাকিয়া বলিতে হবে—
মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে ;
যার ভয়ে তুমি ভীত সে-অন্যায় ভীরু তোমা-চেয়ে ;

[এবার ফিরাও মোরে ঃ রবীন্দ্রনাথ]

ভাবার্থ ঃ কবি কল্পলোকের অধিবাসী। কিন্তু বাস্তবের দাবিকে পদদলিত করে তিনি চিরকাল কল্পলোকবাসী হতে পারেন না। অসহায়-দুর্বল মানুষের ওপর সবলের নিষ্ঠুর অত্যাচার দেখে মানবদরদী কবির অন্তর বেদনায় আর্তনাদ করে ওঠে। কবি তখন কল্পলোক ত্যাগ করে অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। যে মানুষ অনাদি কাল ধরে মুখ বুজে অন্যায় অত্যাচার সহ্য করে এসেছে, সেই মৃতপ্রায় মানুষকেই কবি নবমন্ত্রে দীক্ষিত করেন। অসহায় ভীত মানুষের চোখের সামনে তখন অত্যাচারীর দুর্বলতা আর গোপন থাকে না ; এই সত্য-উপলব্ধিই তাদের প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধি করে।

২৬। দেবতামন্দির-মাঝে ভকত প্রবীণ
জপিতেছে জপমালা বসি নিশিদিন।
হেনকালে সন্ধ্যাবেলা ধুলিমাখা দেহে
বস্ত্রহীন জীর্ণ দীন পশিল সে গেহে।
কহিল কাতরকণ্ঠে, "গৃহ মোর নাই,
এক পাশে দয়া ক'রে দেহো মোরে ঠাঁই।"
সসংকোচে ভক্তবর কহিলেন তারে,
"আরে আরে অপবিত্র,দূর হয়ে যা রে।"
সে কহিল, "চলিলাম"—চক্ষের নিমেষে
ভিখারী ধরিল মূর্তি দেবতার বেশে।
ভক্ত কহে, "প্রভু, মোরে কী ছল ছলিলে!"
দেবতা কহিল, "মোরে দূর করি দিলে।

জগতে দরিদ্ররূপে ফিরি দয়া-তরে,
গৃহহীনে গৃহ দিলে আমি থাকি ঘরে।"

[চৈতালি : রবীন্দ্রনাথ]

ভাবার্থ: ধূলিমলিন এই জগৎসংসার থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে রুদ্ধদ্বার দেবালয়ে বসে শাস্ত্রীয় আচার-আচরণ বা মন্ত্রপাঠের দ্বারা ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করা যায় না। জীবসেবাই হল দেবসেবার মন্ত্র। কারণ মানুষের ভগবান্ জগতের প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ছদ্মবেশে বিরাজ করছেন। দীনদরিদ্রের বেশে তিনি মানুষের কৃপা-প্রার্থনার জন্যে আগ্রহী। তাই দরিদ্র-সেবা ঈশ্বর-সেবা।

২৭। দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর—
লহো যত লৌহ লোষ্ট্র কাষ্ঠ ও প্রস্তর
হে নব্যসভ্যতা। হে নিষ্ঠুর সর্বগ্রাসী,
দাও সেই তপোবন, পুণ্যচ্ছায়ারাশি
গ্লানিহীন দিনগুলি, সেই সন্ধ্যাস্নান,
সেই গোচারণ, সেই শান্ত সামগান,
নীবারধান্যের মুষ্টি, বল্কলবসন,
মগ্ন হয়ে আত্ম-মাঝে নিত্য আলোচন
মহাতত্ত্বগুলি। পাষাণপিঞ্জরে তব
নাহি চাহি নিরাপদে রাজভোগ নব,
চাই স্বাধীনতা, চাই পক্ষের বিস্তার,
বক্ষে ফিরে পেতে চাই শক্তি আপনার—
পরাণে স্পর্শিতে চাই ছিঁড়িয়া বন্ধন
অনন্ত এ জগতের হৃদয়-স্পন্দন। [চৈতালি : রবীন্দ্রনাথ]

ভাবার্থ: আধুনিক যুগের রুদ্ধশ্বাস সভ্যতা চারিদিক থেকে মানুষকে পাষাণ-কারায় আবদ্ধ করে তার আত্মিক মৃত্যু ঘটিয়েছে। প্রাচীন ভারতের সেই মুক্ত অরণ্যের আদিম সভ্যতায় ফিরে যাবার জন্যে ক্রীতদাস মন আজ তাই সদা ব্যাকুল। সেটাই হল ভোগপঙ্কিল বস্তুতান্ত্রিক জীবন থেকে মুক্তির উপায়। তাই নাগরিক সভ্যতার উপর প্রকৃতির স্নেহের নীড় রচনার জন্যে প্রকৃতিপ্রেমিক সমুৎসুক।

২৮। আঘাতসংঘাত-মাঝে দাঁড়াইনু আসি।
অঙ্গদ কুণ্ডল-কণ্ঠী অলংকাররাশি
খুলিয়া ফেলেছি দূরে। দাও হস্তে তুলি
নিজ হাতে তোমার অক্ষয় শরগুলি,
তোমার অক্ষয় তূণ। অস্ত্রে দীক্ষা দেহো,
রণগুরু। তোমার প্রবল পিতৃস্নেহ
ধ্বনিয়া উঠুক আজি কঠিন আদেশে।
করো মোরে সম্মানিত নব-বীরবেশে,

দুরূহ কর্তব্যভারে, দুঃসহ কঠোর
বেদনায়। পরাইয়া দাও অঙ্গে মোর
ক্ষতচিহ্ন-অলংকার। ধন্য করো দাসে
সফল চেষ্টায় আর নিষ্ফল প্রয়াসে।
ভাবের ললিত ক্রোড়ে না রাখি নিলীন
কর্মক্ষেত্রে করি দাও সক্ষম স্বাধীন॥ [নৈবেদ্য : রবীন্দ্রনাথ]

ভাবার্থ : ভোগসর্বস্ব বিলাসিতা-কলুষ জীবন পরিত্যাগ করে মানুষকে সংঘাতময় কর্মজীবনের মাঝখানে এসে দাঁড়াতে হয়। এই আঘাত-সংঘাতের মধ্যেই আছে দুঃখজয়ের মন্ত্র। সাফল্য বা ব্যর্থতা মানুষের জীবনের বড়ো পরিচয় নয়। স্বার্থসুখের গণ্ডি অতিক্রম করে বৃহৎ ও মহৎ কর্মজীবনে ঝাঁপিয়ে পড়ার মধ্যেই আছে মানুষের গৌরবময় জীবনের পরিচয়।

২৯। আমরা মানুষকে সত্য করে কখন দেখিনে? কখন তাকে ছোট করে দেখি? যখন আমার দিক থেকে তাকে দেখি, তার দিক থেকে তাকে দেখিনে। আমার পক্ষে সে কতখানি এইটে দিয়েই আমরা মানুষকে ওজন করি। আমার পক্ষে তার কী প্রয়োজন, আমি তার কাছ থেকে কতটা আশা করতে পারি, আমার সঙ্গে তার ব্যবহারিক সম্বন্ধ কতখানি, এই বিচারের দ্বারাই আমরা মানুষকে সীমাবদ্ধ করে জানি। যেমন আমরা পৃথিবীতে অধিকাংশ সময়ে এই ভাবেই বাস করি যে, কেবল আমার বিষয়-সম্পত্তিকে, আমার ঘরবাড়িকে ধারণ করবার জন্যই বিশ্বজগৎটা রয়েছে, তার অস্তিত্বের স্বতন্ত্র কোনো মূল্য নেই—তেমনি আমরা মনে করি, আমার প্রয়োজন এবং আমার ভালোলাগা মন্দলাগার সম্বন্ধকে বহন করবার জন্যেই মানুষ আছে। আমাকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও সে যে কতখানি তা আমরা দেখি নে।

জগৎকে অহরহ ছোটো করে দেখলে যেমন নিজেকেই ছোটো করে ফেলা হয়, তেমনি মানুষকে কেবলই নিজের ব্যবহারিক সম্বন্ধে ছোটো করে দেখলে নিজেকেই আমরা ছোটো করি। তাতে আমাদের শক্তি ছোটো হয়ে যায়, আমাদের প্রীতি ছোটো হয়ে যায়। জগতে যাঁরা মহাত্মা লোক তাঁরা মানুষকে মানুষ বলে দেখেছেন, নিজের সংস্কার বা নিজের প্রয়োজনের দ্বারা তাকে টুকরো করে দেখেন নি। এতে করে তাঁদের নিজেদের মনুষ্যত্বের মহত্ত্ব প্রকাশ পেয়েছে। মানুষকে তাঁরা দেখেছেন বলেই নিজেকে মানুষের জন্য দান করতে পেরেছেন।

[সত্যবোধ, শান্তিনিকেতন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

ভাবার্থ : ব্যবহারিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে মানুষ ও জগতের বিচার করলে কখনই সুবিচার করা হয় না। সংকীর্ণ প্রয়োজনের গণ্ডিতে জগৎকে ছোটো করে দেখলে জগৎ ছোটো হয় না, ছোটো হয় নিজেরই-আত্মা। কারণ সেখানে সংকীর্ণ মনেরই প্রতিফলন ঘটে। তেমনি মানুষকে যখন আমরা নিজেদের প্রয়োজনের ছোটো জানালা দিয়ে দেখতে যাই তখন মানুষকে ছোটো বলে মনে হয়, কারণ তাদের আসল রূপটা থাকে আমাদের চোখের আড়ালে। মানবপ্রেমিকের চোখে কোনো মানুষই

ছোটো নয়। কারণ তাঁরা মানুষকে খণ্ডিত করে দেখেন না, দেখেন সম্পূর্ণ মানুষটাকে। তাই মানুষ তাঁদের চোখে ছোটো নয়—মহৎ।

৩০। যশ মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য নহে, মনুষ্য-জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইলে তাহার পরিমাপক মাত্র। যাহাদের সমস্ত জীবন" কেবল কিসে লোকে ভালো বলিবে সেই ভাবনায় অস্থির, কেবল লোককে খুশি করিবার চেষ্টায় ফিরে, তাহাদের যদি সার না থাকে, তাহা হইলে তাহাদের সমস্ত উদ্যম বৃথা, তাহারা কেবল লোকের হাস্যাস্পদ হয় মাত্র। যাহাদের সার আছে, তাঁহাদের যশ সুখ্যাতি বাঁধা। যাহারা যশকে জীবনের উদ্দেশ্য মনে করে, তাহারা সের-বাটখারাকে মাপ বলিয়া কিনিয়া লয়।

[জীবনের উদ্দেশ্য : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

ভাবার্থঃ অন্তঃসারশূন্য মানুষই কর্মে আত্মসমর্পণ না করে স্তুতি-আহরণে সচেষ্ট হয়। এমন লোকের ভাগ্যে খ্যাতির বদলে জোটে উপহাস। সের-বাটখারা ওজন নয়, ওজনের পরিমাপ মাত্র। যশও জীবনের উদ্দেশ্য নয়, উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পরিমাপক মাত্র।

৩১। কর্মের জগতে মানুষের ব্যবহারের মিলটাই বড়, হৃদয় নয়। হৃদয় থাকে থাক, অন্তরের বিচার অন্তর্যামী করুন, আমাদের ব্যবহারিক ঐক্য নইলে চলে না। ওই আমাদের কষ্টিপাথর, ঐ দিয়ে যাচাই করে নিই। কই, দুজনের মনের মিল দিয়ে তো সঙ্গীত সৃষ্টি হয় না। বাইরে তাদের সুরের মিল না যদি থাকে, সে শুধু কোলাহল। রাজার যে সৈন্যদল যুদ্ধ করে, তাদের বাইরের শক্তিটাই রাজার শক্তি, হৃদয় নিয়ে তাঁর গরজ নেই। নিয়মের শাসন সংযম—এই আমাদের নীতি। একে খাট করলে হৃদয়ের নেশার খোরাক যোগান হয়। সে উচ্ছৃঙ্খলতারই নামান্তর।

[শেষপ্রশ্ন : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ভাবার্থঃ বাস্তবের ক্ষেত্রে ব্যবহারিক জীবনে ঐক্যের প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি। অন্তরের মিলটা হল ভাবলোকের ঐশ্বর্য, কিন্তু বাস্তব জগতে বাইরের শক্তিকে সংহত এবং সুনিয়ন্ত্রিত করতে না পারলে কর্মযজ্ঞ থাকে অসমাপ্ত, দেশ ও জাতি হয় দুর্বল। তাই হৃদয়ের প্রয়োজন না থাকলেও কাজের তাগিদে বাহ্যিক মিলনের প্রয়োজন আছে।

৩২। সতর্ক এবং অভিজ্ঞ লোকদিগের স্বভাব এই যে, তাহারা চক্ষুর নিমেষে কোন দ্রব্যের দোষগুণ-সম্বন্ধে দৃঢ় মতামত প্রকাশ করে না—সবটুকুর বিচার না করিয়া, সবটুকুর ধারণা করিয়া লয় না ; দুটো দিক দেখিয়া চারিদিকের কথা কহে না। কিন্তু আর এক রকমের লোক আছে, যাহারা ঠিক ইহার উল্টো। কোন জিনিস বেশীক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করার ধৈর্য ইহাদের নাই ; কোন-কিছু হাতে পড়িবামাত্র স্থির করিয়া ফেলে—ইহা ভাল কিংবা মন্দ ; তলাইয়া দেখিবার পরিশ্রমটুকু ইহারা বিশ্বাসের জোরে চালাইয়া লয়। এ সকল লোক যে জগতে কাজ করিতে পারে না তাহা নহে, বরঞ্চ অনেক সময়ে বেশি কাজ করে। অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন হইলে ইহাদিগকে উন্নতির সর্বোচ্চ শিখরে দেখিতে পাওয়া যায়। আর না হইলে, অবনতির গভীর কন্দরে চিরদিনের জন্য শুইয়া পড়ে ;

আর উঠিতে পারে না, আর বসিতে পারে না, আর আলোকের পানে চাহিয়া দেখে না ; নিশ্চল, মৃত জড়পিণ্ডের মত পড়িয়া থাকে। [দেবদাস : শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

ভাবার্থ : হিসাবী লোক সাবধানী। ধৈর্যের সঙ্গে তারা সব দিক বিবেচনা ক'রে তবেই নিজস্ব মতামত প্রকাশ করে। কিন্তু পৃথিবীতে একশ্রেণীর মানুষ আছে যাদের কোনো জিনিস নিয়ে দীর্ঘ সময় চিন্তা করার ধৈর্য নেই, তারা বিশ্বাসের জোরে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। এরকম মানুষ সংসারে কিছুটা দৈব-দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। হয় চরম উন্নতি অথবা দুঃসহ ব্যর্থতাই তাদের ভাগ্যলিপি হয়ে দাঁড়ায়।

৩৩। অণুবীক্ষণ নামে একরকম যন্ত্র আছে যাহাতে ছোটো জিনিসকে বড়ো করিয়া দেখায়। বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যাশাস্ত্রে নির্দিষ্ট থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে যাহারা খুব বড়ো বলিয়া আমাদের নিকট পরিচিত ঐ যন্ত্রখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতিমাত্র ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন এবং এই যে বাঙালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শ্বস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান—কাহারো সাধ্য নাই যে, সেই উচ্চচূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

[চরিতকথা : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]

ভাবার্থ : আমরা যখন বিদ্যাসাগরের মহৎ ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের দিকে তাকাই তখন তাঁর পাশে আমাদের দেশের অনেক তথাকথিত খ্যাতিমান্ ব্যক্তির জীবনকে একান্ত নগণ্য বলে মনে হয়। তাঁর জীবনে আমরা দেখেছি ঔদার্যের বিস্ময়কর প্রকাশ। ঈশ্বরচন্দ্রের সেই উন্নতশীর্ষ মহিমাকে অতিক্রম করবার ক্ষমতা কারো নেই। তাঁর মহিমা হিমগিরির উচ্চ শিখরের সঙ্গে তুলনীয়।

৩৪। কেন ফুল কাঁদে হিয়া তোরে নিরখিয়া ?
কিছুতেই লুকাবারে পারি না রে শোক ?
সহসা মরম জ্বলে স্মৃতির অনলে,—
অশোক কেন রে তোরে বলে তবে লোক ?
বিপুল বিশ্বের কথা যাই ফুল, ভুলে,—
একটি শোকের মূর্ত্তি জাগে অনিবার !
জনম-দুঃখিনী মাতা অশোকের মূলে ?
একাকিনী ফেলিছেন নয়ন-আসার ?
ললাটে সিঁন্দুর নাই, ঝরিয়া ঝরিয়া
তাই কি পড়িছে গিয়া সীতার সুকেশে ?
"প্রকৃতি", ভাবিত সীতা, "এ ছল করিয়া,
জুড়াইল দুঃখিনীরে নাথের সন্দেশে।"
কৃতজ্ঞ জানকীদেবী চরণ-পরশে ;

ফুটাতেন ওগো ফুল, স্বমুখ তোমার ?
দেখি সে বিকাল তব ক্ষণেক হরষে,
করিতেন সংবরণ নয়ন-আসার !
সেই দুঃখকাহিনীর সাক্ষী তুমি ছিলে,
তাই ফুল হেরি' তোমা উপজিছে শোক !
সহসা মরম জ্বলে স্মৃতির অনলে—
অশোক কেন রে তোকে বলে তবে লোক ?

[অশোক : দেবেন্দ্রনাথ সেন]

ভাবার্থঃ জগতে কোনো কোনো বস্তুর সঙ্গে সুখ-দুঃখের স্মৃতি জড়িত থাকে। বস্তুর নিজস্ব গুণ যাই থাক না কেন, তারা হয়ে দাঁড়ায় সুখ-দুঃখের প্রতীক। ফুল হিসাবে অশোকের রূপলাবণ্যের তুলনা নেই, কিন্তু অশোক আমাদের চোখের সামনে বন্দিনী সীতার এক সকরুণ ছবি ফুটিয়ে তোলে। সেইজন্যে ফুলের সৌন্দর্যের পরিবর্তে মনের পর্দায় ভেসে ওঠে অতীত-বেদনার ছবি। তখন সে হয় দুঃখের প্রতীক।

৩৫। মহত্ত্ব সকলে সহিতে পারে না। মহত্ত্বের সম্মুখে আপনার ক্ষুদ্রত্ব অনুভব করিয়া অনেকে তাহার উপর রাগিয়া থাকে—মহত্ত্বকে অবিশ্বাস করিয়া তৃপ্ত হইতে চায়। মহত্ত্ব কিছু বলে না, সারাক্ষণ তাহাদেরই পানে তাকাইয়া থাকে না, এইজন্য মহত্ত্বের প্রতি তাহারা আরও বিরক্ত হয়। মহত্ত্বের খুঁৎ ধরিবার জন্য তাহারা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়ে। মহত্ত্বের নিন্দা করিতে পারিলে আপনাদের ভাগ্যবান্ বিবেচনা করে। মহত্ত্বের উদার ভাবের মধ্যে আপনাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয় দিয়া তাহার সঙ্কীর্ণ স্বার্থসাধন উদ্দেশ্য দেখিতে পায়, এবং প্রতিপক্ষকে তাহার পদস্খলন আশা করিয়া অনিমেষনেত্রে চাহিয়া থাকে। পদস্খলন হওয়া মানবের পক্ষে কোনোকালেই অসম্ভব নয়, সুতরাং মহত্ত্বের সামান্য পদস্খলন হইলে মহত্ত্ব-অসহিষ্ণুদিগের সুখের সীমা থাকে না। দৈবাৎ যদি তাহার পদস্খলন না দেখিতে পায়, আড়াল হইতে মহত্ত্বের দেহে পঙ্ক নিক্ষেপ করে।

মহত্ত্ব আপনার কর্তব্যে রাজপথ দিয়া সাহস করিয়া চলিয়া যায়, কাতর সমালোচক-বর্গের বিবর্ণ বদনমণ্ডল সম্মুখে রাখিয়া চলা তাহার পোষায় না ; এইজন্য তাহার নামে ছড়া বাঁধিয়া গল্প রটাইয়া তাহারা তৃপ্তিলাভ করে। তাহার দেখায়, মহত্ত্বকে তাহারা পরম আয়ত্ত করিয়াছে, অপরে তেমন পারে নাই ; সুতরাং তাহাদের মহত্ত্বের দোষ না দেখিলে চলে না।

[মহত্ত্ব : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

ভাবার্থঃ যারা সংকীর্ণচেতা ঈর্ষা তাদের ধর্ম। তারা মহত্ত্বকে সহ্য করতে পারে না, নানাভাবে মহতের দোষ ধরবার চেষ্টা করে। আপাতত কোনো দোষ তাদের চোখে না পড়লে অপেক্ষা করে থাকে তাদের ভবিষ্যৎ পদস্খলনের জন্যে। যিনি মহৎ তিনি কিন্তু কোনো দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে কর্তব্যের পথে এগিয়ে চলেন। সমালোচকেরা তাঁদের ব্যঙ্গ করে আত্মপ্রসাদ লাভ করে। এমন ভাব দেখায় যেন আসলে মহৎ তারাই।

৩৬। হারিয়ে গেছে,—হারিয়ে গেছে, ওরে !
হারিয়ে গেছে, বোল্‌-বলা সেই বাঁশি,
হারিয়ে গেছে কচি মুখখানি,
দুধে-ধোওয়া কচি দাঁতের হাসি !
আঁচল খুলে হঠাৎ স্রোতের জলে
ভেসে গেছে শিউলি ফুলের রাশি ;
ঢুকেছে হায় শ্মশান-ঘরের মাঝে,
ঘর ছেড়ে তাই হৃদয়-শ্মশানবাসী !
সবচেয়ে যে ছোট কাপড়গুলি,
সেগুলি কেউ দেয় না মেলে ছাদে।
যে শয্যাটি সবার চেয়ে ছোটো
আজকে সেটি শূন্য প'ড়ে কাঁদে।
সবচেয়ে যে শেষে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে সরে,
ছোট্ট যে জন ছিল রে সব-চেয়ে
সেই দিয়েছে সকল শূন্য ক'রে !

[ছিন্ন মুকুল : সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত]

ভাবার্থ : শিশু ছোটো হলেও মনের অনেকটা জায়গা তারা দখল করে থাকে। ছোটোর স্মৃতি-যে মনের মধ্যে কত গভীর ও ব্যাপক রেখাপাত করে আমরা সহজে তা উপলব্ধি করতে পারি না। পৃথিবীর খেলা শেষ করে যখন কোনো শিশু অকালে ঝরে যায় তখনই সহস্র স্মৃতির দর্পণে বেদনার আসল চেহারাটা ধরা পড়ে। সংসারে অসংখ্য ছোটো ছোটো স্মৃতিচিহ্ন অনেক বড়ো ব্যথার উৎস হয়ে দেখা দেয়। তখনই এ সত্য উপলব্ধি করি—শিশু ছোটো হলেও তাদের বিয়োগ-ব্যথা ছোটো বা সামান্য নয়।

৩৭। অমরার অমৃত সাধনা
এ দুঃখের পৃথিবীতে তোর ব্রত নহে,
তুই নাগ, জন্ম তোর বেদনার দহে !
কাঁটা-কুঞ্জে বসি' তুই গাঁথিবি মালিকা,
দিয়ে গেনু ভালে তোর বেদনার টীকা।
মৃত্যু-পথ-যাত্রীদল তোমার ইঙ্গিতে
গলায় পরিছে ফাঁসি হাসিতে হাসিতে !
নিত্য অভাবের কুণ্ড জ্বালাইয়া বুকে
সাধিতেছে মৃত্যু-যজ্ঞ পৈশাচিক সুখে !
লক্ষ্মীর কিরীট ধরি' ফেলিতেছে টানি'
ধূলিতলে। বীণা-তারে করাঘাত হানি'

ওরে মোর সর্বনাশা দারিদ্র্য অসহ !—
পুত্র হ'য়ে, জায়া হয়ে, কাঁদে অহরহ
আমার দুয়ার ধরি'। কে বাজাবে বাঁশি ?
কোথা পাব আনন্দিত সুন্দরের হাসি ?
আজো শুনি আগমনী গাহিছে সানাই,
ও যেন কাঁদিছে শুধু—নাই, কিছু নাই।
[দারিদ্র্য : কাজী নজরুল ইসলাম]

ভাবার্থঃ দারিদ্র্য অসহ দুঃখ বয়ে আনে। যে দারিদ্র্যহত বেদনা তার বিধিলিপি। অশ্রুমুখী প্রিয়জন তার চোখে যেন দারিদ্র্যের প্রতিমূর্তি। জগতের আনন্দযজ্ঞে সে অবাঞ্ছিত অতিথি। আগমনীগান তাই তার কানে বিচ্ছেদদুঃখ হয়ে বাজে। অমৃতের স্বাদ সে পায় না। জীবন তার কাছে যেন জহর-ব্রত।

৩৮। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ; অন্ধকারে জেগে ওঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে ব'সে আছে
ভোরের দয়েল পাখি—চারিদিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
জাম—বট—কাঁঠালের—হিজলের —অশথের ক'রে আছে চুপ ;
ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
দেখেছিলো ; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশথ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।
[রূপসী বাংলা : জীবনানন্দ দাশ]

ভাবার্থঃ বাংলার শ্যামল শোভায় কবিমন মুগ্ধ। অজস্র হিজল বট তমালের নীল ছায়া, কৃষ্ণাদ্বাদশীর জ্যোৎস্না, দিগন্তপ্রসারী সোনালী ধানের ক্ষেত আর পাখির গান—প্রকৃতির এইসব অসংখ্য ছবির মধ্যে কবি পৃথিবীর রূপকেই প্রত্যক্ষ করেন। কোন্ স্মরণাতীত কালে মধুকর ডিঙায় বণিক চাঁদসদাগর আর ভেলায় ভাসমান বেহুলা বাংলার এই চিরদিনের রূপকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। প্রকৃতির এই রূপ সুদূর অতীতের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সৃষ্টি করেছে এক বেদনামধুর ভাবানুষঙ্গ, ফলে সেই রূপ কবির কাছে হয়ে উঠেছে আরও হৃদয়গ্রাহী।

৩৯। জীবন্ত ফুলের ঘ্রাণে
দুপুরের মিহি-স্বপ্ন ছিঁড়ে খুঁড়ে গেল ঃ
জেগে দেখি আমি,
এসেছে আমার ঘরে ছোটো এক বুনো মৌমাছি,
ডানায় ডানায় যার অরণ্য ফুলের কাঁচা ঘ্রাণ,
পাঁশুটে শরীরে যার সোঁদা গন্ধ অজানা বনের।
কেমন সুন্দর এই উড়ন্ত মৌমাছি !
অশ্রান্ত করুণ ওর গুনগুনানিতে
কেঁপে ওঠে মাটির মসৃণতম গান,
আর দূর পাহাড়ের বন্ধুর বিষণ্ণ প্রতিধ্বনি !
যেন আজ বাহিরের সমস্ত পৃথিবী আর সমস্ত আকাশ।
আমার ঘরের মাঝে তুলে নিয়ে এল
কোথাকার ছোট্ট এক বুনো মৌমাছি !

[মৌমাছি ঃ দিনেশ দাস]

ভাবার্থ ঃ প্রকৃতিবিষয়ে কবির অনুভূতি সুতীব্র। হঠাৎ জীবন্ত ফুলের গন্ধে তাঁর তন্দ্রা ভাঙে। ঘরে এসেছে এক বুনো মৌমাছি। কবির মনে হয়, মৌমাছিটি যেন সমস্ত প্রকৃতি আর বাইরের পৃথিবীটাকে ঘরের মধ্যে নিয়ে এল। বন-পাহাড়-মাটির নিত্যসহচর এই মৌমাছি। তাই তার পাখায় ফুলের গন্ধ, গুন্ গুন্ শব্দে মাটির গানের সুর আর পাহাড়ী প্রতিধ্বনি। প্রকৃতির ক্ষুদ্রতম একটি অঙ্গে সমস্ত প্রকৃতির স্বাদ, বিন্দুতে সিন্ধু যেন।

৪০। শিল্পী কেন শিল্প সৃষ্টি করেন, সঙ্গীতকার কেন সুরের জাল বোনেন, লেখক কেন সাহিত্য রচনা করেন, এ প্রশ্নের উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন, 'আমাদের এই শুকনো পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম বর্ষার প্লাবন বুক পেতে নিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে বললে—রসিক, সবই তোমার কাছ থেকে আসবে, আমার কাছ থেকে তোমার দিকে কি কিছুই যাবে না ?···তারপর একদিন মানুষ এল ; সে বললে—কেবলই নেব ? কিছু দেব না ? দেব এমন জিনিস যা নিয়তির নিয়মেরও বাইরের সামগ্রী ঃ তোমার রস আমার শিল্প এই দুই ফুলে গাঁথা নবরসের নির্মিত নির্মাল্য ধর—এই বলে মানুষ নিয়মের বাইরে যে, তার পাশে দাঁড়িয়ে শিল্পের জয় ঘোষণা করলে।···পৃথিবীতে মানুষ যা কিছু দিতে পেরেছে সে তার এই নির্মিতি—যেটা পরিমিতির মধ্যে ধরা ছিল তাকে অপরিমিতি দিয়ে ছেড়ে দিল অপরিমিত রসের তরঙ্গে।'

[শিল্পী ও সাহিত্যিক ঃ অবনীন্দ্রনাথ ঃ লীলা মজুমদার]

ভাবার্থ ঃ আমরা স্রষ্টার কাছে যা পাই তা সীমার কারাগারে নিয়মের মধ্যে ধরা থাকে। তাকে আমরা বাঁধন থেকে মুক্তি দিয়ে মিলিত করি অসীমের সঙ্গে। এই রূপ থেকে অরূপে, সীমা থেকে অসীমে রূপান্তরের নাম শিল্প। বিশ্ব-প্রকৃতি রসের

উৎস। সেই রসকে কাব্যে গানে চিত্রে রঞ্জিত করে মানুষ নতুন সৃষ্টিতে মাতে। মানুষের এই সৃজনশিল্প আসলে প্রকৃতির ঋণশোধ।

৪১। হে মহাজীবন, আর এ কাব্য নয়
এবার কঠিন, কঠোর গদ্য আনো,
পদ-লালিত্য-ঝঙ্কার মুছে যাক
গদ্যের কড়া হাতুড়িকে আজ হানো!
প্রয়োজন নেই, কবিতার স্নিগ্ধতা—
কবিতা তোমায় দিলাম আজকে ছুটি,
ক্ষুধার রাজ্যে পৃথিবী গদ্যময়:
পূর্ণিমা-চাঁদ যেন ঝল্‌সানো রুটি॥

[হে মহাজীবন: সুকান্ত ভট্টাচার্য]

ভাবার্থঃ কবি ব্যথাবেদনার গীতিকার। বাস্তব প্রয়োজনের তাগিদে কবিকেও বিলাসের সুখশয্যা আর ভাবলোক পরিত্যাগ করে কঠিনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। জীবনের ন্যূনতম প্রয়োজন—দু'বেলা দু'মুঠো অন্নের সংস্থান। এই বাস্তব প্রয়োজনটুকু যেখানে কল্পনার অতীত, সেখানে কাব্য-সাহিত্যে কল্পনার বিলাস নিরর্থক।

৪২। পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে।
হে স্নেহার্ত বঙ্গভূমি—তব গৃহক্রোড়ে
চিরশিশু ক'রে আর রাখিয়ো না ধ'রে।
দেশ-দেশান্তর মাঝে যার যেথা স্থান
খুঁজিয়া লইতে দাও করিয়া সন্ধান।
পদে পদে ছোট ছোট নিষেধের ডোরে
বেঁধে বেঁধে রাখিয়ো না ভালো ছেলে ক'রে।
প্রাণ দিয়ে দুঃখ সয়ে, আপনার হাতে
সংগ্রাম করিতে দাও ভালো মন্দ সাথে।
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধ'রে
দাও মোরে গৃহছাড়া লক্ষ্মীছাড়া ক'রে।
সাত কোটি সন্তানেরে হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালী ক'রে মানুষ করো নি।

[পশ্চিমবঙ্গ উঃ মাঃ ১৯৮৪]

ভাবার্থঃ দেশ ও কালের সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকে সংস্কার এবং অন্ধ স্নেহের দ্বারা প্রতিপালিত মানুষ কখনই সম্পূর্ণ মানুষ হয়ে উঠতে পারে না। জগৎ-জীবনকে উপলব্ধি করার জন্যে মানুষকে বাস্তব জীবনের আঘাত সংঘাতের সম্মুখীন হতে হবে, কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা পরিত্যাগ করে বিভিন্ন পরিবেশ আর পরিস্থিতির মধ্যে

মানুষকে করে নিতে হবে নিজের স্থান। তবেই আসবে জীবনের পূর্ণতা, তা না হলে মানুষ হবে অসম্পূর্ণ-খণ্ডিত।

৪৩। নির্জন শয়ন—মাঝে কালি রাত্রিবেলা
ভাবিতে ছিলাম আমি বসিয়া একেলা
গতজীবনের কত কথা ; হেন ক্ষণে
শুনিলাম তুমি কহিতেছ মোর মনে—
'ওরে মত্ত, ওরে মুগ্ধ, ওরে আত্মভোলা
রেখেছিলি আপনার সব দ্বার খোলা ;
চঞ্চল এ সংসারের যত ছায়ালোক,
যত ভুল, যত ধূলি, যত দুঃখশোক,
যত ভালোমন্দ, যত গীতগন্ধ লয়ে
বিশ্ব পশেছিল তোর অবাধ আলয়ে।
সেই সাথে তোর মুক্ত বাতায়নে আমি
অজ্ঞাতে অসংখ্যবার এসেছিনু নামি।
দ্বার বুধি জপিতিস যদি মোর নাম
কোন পথ দিয়ে তোর চিত্তে পশিতাম।

[ত্রিপুরা উঃ মাঃ ১৯৮৪]

ভাবার্থঃ সত্য-মিথ্যা, আলো-অন্ধকার, উত্থান-পতন সব নিয়েই মানুষের জীবন, মানুষের পূর্ণতা। এই পরিপূর্ণ জীবনবোধ ঈশ্বর লাভের মতই মানুষের পরম কামনার বস্তু। কর্মচঞ্চল সংসারের সহস্র কর্মে আবদ্ধ থেকেই আমরা লাভ করতে পারি ঈশ্বর সান্নিধ্যের মত সেই পূর্ণ জীবন, যা কখনই জীবন বিমুখ সংকীর্ণ মানসিকতার দ্বারা লাভ করা যায় না।

অনুশীলনী

১. কে কবি—কবে কে মোরে ? ঘটকালি করি,
শবদে শবদে বিয়া দেয় যেই জন,
সেই কি সে যম-দমী ? তার শিরোপরি
শোভে কি অক্ষয় শোভা যশের রতন ?
সেই কবি মোর মতে, কল্পনা সুন্দরী
যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন,
অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি
ভাবের সংসারে তার স্বর্ণ-কিরণ !
আনন্দ, আক্ষেপ, ক্রোধ, যার আজ্ঞা মানে ঃ
অরণ্যে কুসুম ফোটে যায় ইচ্ছা-বলে ;

নন্দন-কানন হতে যে সুজন আনে
পারিজাত-কুসুমের রম্য পরিমলে ;
মরুভূমে—তুষ্ট হয়ে যাহার ধেয়ানে
বহে জলবতী নদী মৃদু কলকলে।

[চতুর্দশপদী কবিতাবলী : মধুসূদন]

২. আমি, হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না-অভিমান,
তার, মলিন মুখে অশ্রুটুকু দেখতে জুড়ায় প্রাণ।
জলের ভারে চক্ষু নত,
বদ্ধ মুক্তাস্রোতের মত,
পদ্মভাঙা মন্থরাঙা কাজল-মাখা বান।
কখন পড়ে ফোঁটা ফোঁটা
ছিঁড়ে ছিঁড়ে কোমল বোঁটা,
পৌষ-মাসের পাতার আগে শিশির লম্বমান।
আমি হাসির চেয়ে ভালবাসি কান্না-অভিমান।

[কান্না-অভিমান : গোবিন্দচন্দ্র দাস]

৩. হে ভারত, নৃপতিরে শিখায়েছ তুমি
ত্যজিতে মুকুট, দণ্ড, সিংহাসন ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র বেশ, শিখায়েছ বীরে
ধর্মযুদ্ধে পদে পদে ক্ষমিতে অরিরে,
ভুলি জয় পরাজয় শর সংহরিতে।
কর্মীরে শিখালে তুমি যোগযুক্তচিতে
সর্বফলস্পৃহা ব্রহ্মে দিতে উপহার
গৃহীরে শিখালে গৃহ করিতে বিস্তার
প্রতিবেশী আত্মবন্ধু অতিথি অনাথে ;
ভোগেরে বেঁধেছ তুমি সংযমের সাথে,
নির্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল,
সম্পদের পুণ্যকর্মে করেছ মঙ্গল।
শিখায়েছ স্বার্থ ত্যজি সর্বদুঃখে সুখে
সংসার রাখিতে নিত্য ব্রহ্মের সম্মুখে :

[ভারতের শিক্ষা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৪. আজি হেমন্তের শান্তি ব্যাপ্ত চরাচরে
জনশূন্য ক্ষেত্র-মাঝে দীপ্ত দ্বিপ্রহরে
শব্দহীন গতিহীন স্তব্ধতা উদার
রয়েছে পড়িয়া শ্রান্ত দিগন্তপ্রসার

স্বর্ণশ্যাম ডানা মেলি। ক্ষীণ নদীরেখা
নাহি করে গান আজি, নাহি লেখে লেখা
বালুকার তটে। দূরে দূরে পল্লী যত
মুদ্রিত নয়নে রৌদ্র পোহাইতে রত,
নিদ্রায় অলস, ক্লান্ত।
এই স্তব্ধতায়
শুনিতেছি তৃণে তৃণে ধুলায় ধুলায়,
মোর প্রতি রোমে রোমে, লোকে লোকান্তরে
গ্রহে সূর্যে তারকায় নিত্যকাল ধ'রে
অণুপরমাণুদের নৃত্যকলরোল—
তোমার আসন ঘেরি অনন্ত কল্লোল ॥ [নৈবেদ্য : রবীন্দ্রনাথ]

৫. আমারই চেতনার রঙে পান্না হলো সবুজ,
চুনি উঠল রাঙা হয়ে।
আমি চোখ মেললুম আকাশে—
জ্বলে উঠল আলো।
পূবে পশ্চিমে।
গোলাপের দিকে চেয়ে বললুম, 'সুন্দর'—
সুন্দর হল সে।
তুমি বলবে, এ যে তত্ত্বকথা,
এ কবির বাণী নয়।
আমি বলব, এ সত্য,
তাই এ কাব্য।
এ আমার অহংকার,
অহংকার সমস্ত মানুষের হয়ে।
মানুষের অহংকারপটেই
বিশ্বকর্মার বিশ্বশিল্প ॥

[শ্যামলী : রবীন্দ্রনাথ]

৬. ওরা কাজ করে
দেশে দেশান্তরে,
অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গের সমুদ্র-নদীর ঘাটে ঘাটে,
পাঞ্জাব বোম্বাই—গুজরাটে।
গুরু গুরু গর্জন—গুন্ গুন্ স্বর—
দিনরাত্রে গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর।

দুঃখ সুখ দিবসরজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-'পরে
ওরা কাজ করে ॥ [আরোগ্য : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৭. ডান হাতে পূর্ণ কর সুধা
বাম হাতে চূর্ণ কর পাত্র,
তোমার লীলাক্ষেত্র মুখরিত কর অট্টবিদ্রূপে ;
দুঃসাধ্য কর বীরের জীবনকে, মহৎ জীবনে যার অধিকার।
শ্রেয়কে কর দুর্মূল্য,
কৃপা কর না কৃপাপাত্রকে।
তোমার গাছে গাছে প্রচ্ছন্ন রেখেছ প্রতিমুহূর্তের সংগ্রাম,
ফলে শস্যে তার জয়মাল্য হয় সার্থক।
জলে স্থলে তোমার ক্ষমাহীন রণরঙ্গভূমি,
সেখানে মৃত্যুর মুখে ঘোষিত হয় বিজয়ী প্রাণের জয়বার্তা
তোমার নির্দয়তার ভিত্তিতে উঠেছে সভ্যতার জয়তোরণ,
ত্রুটি ঘটলে তার পূর্ণমূল্য শোধ হয় বিনাশে ॥
[পত্রপুট : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৮. হে ভারত, এই পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা, এই দাসসুলভ দুর্বলতা, এই ঘৃণিত জঘন্য নিষ্ঠুরতা—এইমাত্র সম্বলে তুমি উচ্চাধিকার লাভ করিবে? এই লজ্জাকর কাপুরুষতা-সহায়ে তুমি বীরভোগ্যা স্বাধীনতা লাভ করিবে? হে ভারত, ভুলিও না—তোমার নারীজাতির আদর্শ সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী ; ভুলিও না—তোমার বিবাহ, তোমার ধন, তোমার জীবন ইন্দ্রিয়সুখের, নিজের ব্যক্তিগত সুখের জন্যে নহে ; ভুলিও না—তুমি জন্ম হইতেই 'মায়ের' জন্য বলিপ্রদত্ত ; ভুলিও না—তোমার সমাজ সে বিরাট মহামায়ার ছায়ামাত্র ; ভুলিও না—নীচজাতি, মূর্খ, দরিদ্র, অজ্ঞ, মুচি, মেথর তোমার রক্ত, তোমার ভাই! হে বীর সাহস অবলম্বন কর, সদর্পে বল—মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী আমার ভাই ; তুমিও কটিমাত্র-বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশুশয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিনরাত, হে গৌরীনাথ, হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।'
[স্বদেশমন্ত্র : স্বামী বিবেকানন্দ]

৯. বাঙ্গালী আর্যাবর্তের আর্যগণ হইতে একটা সম্পূর্ণ পৃথক জাতি। বৈদিক যুগের সময় হইতে বাংলায় এক স্বতন্ত্র সভ্যতা ও মনুষ্যসমাজ বিদ্যমান ছিল। বাংলার বৈদিক ধর্ম, সভ্যতা, আচার-ব্যবহার কিছুই শিকড় গাড়িয়া বসিতে পারে নাই। যুগে

যুগে পশ্চিম দেশ হইতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় আমদানি করিয়াও তেমন প্রচলন হয় নাই। বাঙ্গালী স্বীয় বিশিষ্টতা রক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

[বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব : পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়]

১০. দুঃখী বলে, 'বিধি নাই, নাইক বিধাতা ;
চক্রসম অন্ধ ধরা চলে।'
সুখী বলে, 'কোথা দুঃখ, অদৃষ্ট কোথায় ?
ধরণী নরের পদতলে।'
জ্ঞানী বলে,—'কার্য্য আছে, কারণ দুজ্ঞেয়
এ জীবন প্রতীক্ষা-কাতর।'
ভক্ত বলে—'ধরণীর মহারাসে সদা
ক্রীড়ামত্ত রসিক-শেখর।'
ঋষি বলে,—'ধ্রুব তুমি, বরেণ্য ভূমান্।'
কবি বলে, 'তুমি শোভাময়!'
গৃহী আমি, জীবযুদ্ধে ডাকি হে কাতরে,—
'দয়াময় হও হে সদয়!'

[প্রার্থনা : অক্ষয়কুমার বড়াল]

১১. বয়সের সম্মান-জ্ঞানটা যেমন পুরুষের মধ্যে আছে স্ত্রীলোকের মধ্যে তেমন নাই। পুরুষের মধ্যে অনেকগুলি পর্যায় আছে—যেমন দশ, কুড়ি, ত্রিশ, চল্লিশ, পঞ্চাশ, ষাট প্রভৃতি। ত্রিশবর্ষীয় একজন যুবা বিশ বছরের একজন যুবার প্রতি মুরুব্বিয়ানার চোখে চাহিয়া দেখিতে পারে। কিন্তু মেয়ে-মহলে এটা খাটে না। তাহারা বিবাহ-কালটা পর্যন্ত বড় ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া, জননী, পিসীমা অথবা ঠাকুরমাতার নিকট অল্প-স্বল্প উমেদারী করে নারী-জীবনে যাহা-কিছু অল্প-বিস্তর শিখিবার আছে, শিখিয়া লয় ; তাহার পরই একেবারে প্রথম শ্রেণীতে চড়িয়া বসে, তখন ষোল হইতে ছাপান্ন পর্যন্ত তাহারা সমবয়সী! স্থান-ভেদে হয়তো বা কোথাও এ নিয়মের সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায়, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই এমনি।

[চন্দ্রনাথ : শরৎচন্দ্র]

১২. কাব্যের স্থূলতঃ দুই রকম উপভোগ আছে। এক, জড়িত উপভোগ আর এক প্রবুদ্ধ উপভোগ। জড়িত উপভোগ আমি তাকেই বলছি, যে উপভোগ কাব্যের ভাবটা ধরবার জন্য উৎসুক নয়, একটা আনন্দ পেলেই হোল। সে আনন্দের উৎপত্তি কোথায়—বা সে কি প্রকারের আনন্দ তাও সে জানে না। সে এক রকমের নিশ্চেষ্ট, তন্দ্রাবিজড়িত উপভোগ। ইংরাজিতে যাকে Passive Enjoyment বলে। প্রবুদ্ধ উপভোগ হচ্ছে কাব্যের অর্থ বুঝে উপভোগ। সেই কাব্যের ভাব বুঝে ; সেটাকে অনুমোদন ক'রে, সেই কাব্যের মধ্যে আপনাকে অনুভব ক'রে, তার মধ্যে আনন্দের উৎস কোথায় তা আবিষ্কার ক'রে যে উপভোগ (যাকে ইংরাজিতে Active Enjoyment) বলা যেতে পারে। তাকেই আমি প্রবুদ্ধ উপভোগ বলছি। এই দ্বিতীয় রকম উপভোগে সমালোচনার সৃষ্টি।

Shakespeare-এর নাটকাবলী যখন প্রথম ইংলণ্ডের রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল, শ্রোতৃবর্গ একরকম মোটা ধরনের আনন্দ পেয়েছিল। কিন্তু জার্মান সমালোচকরা যখন বুঝিয়ে দিলেন যে Shakespeare-এর নাটকাবলী কি অপূর্ব সৌন্দর্য্যে উদ্ভাসিত, তখন ইংলণ্ডে একটা প্রবুদ্ধ উপভোগ (Intelligent Appreciation) এলো।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ পড়তে অনেকের বেশ ভালো লাগে। পাঠক 'ললিত-লবঙ্গলতা' কি 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি' ইত্যাদি পড়েই তার ছন্দোমাধুর্য্যে এত অভিভূত হন, যে তার অর্থ-পরিগ্রহ-সম্বন্ধে একরকম উদাসীন হয়েন। এই উপভোগ প্রথমোক্ত শ্রেণীর উপভোগ। দ্বিতীয়োক্ত শ্রেণীর পাঠক, অর্থাৎ প্রবুদ্ধ পাঠক তার অর্থ খুঁজবেন ও তাতে উচ্চ বা মধুর অর্থের অভাব অনুভব ক'রে হতাশায় একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলবেন।

[কাব্যের উপভোগ : দ্বিজেন্দ্রলাল রায়]

১৩. দেবীর প্রতিমাটিরে বিসর্জি' দীঘির নীরে
অশ্রু মুছি সবে ফিরে যায়।
প্রতিমার মাটি গলে দীঘির গভীর জলে
পঙ্ক হয়ে পঙ্কজ ফুটায়।
সে পঙ্কজবন-মাঝে দেবী রাজে নব সাজে
কবি তাই হেরে বারো মাস।
অলি নিত্য পূজা করে গুঞ্জনের মন্ত্র পড়ে
উড়ে আসে ধূপের সুবাস।

[দেবীর পূজা : শ্রীকালিদাস রায়]

১৪. সূক্ষ্ম বা গভীর মানবীয় চেতনার অন্যতম প্রকাশ শিল্পকলা। এই চেতনা-সম্বন্ধে যে কোনো ভাবেই হোক মানুষ সচেতন থেকেছে। তাই শিল্পের প্রভাববর্জিত সমাজ কোথাও দেখা যায় না। জীবনধারণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত বা সূক্ষ্ম অনুভূতির প্রকাশ-সম্বন্ধে চেতনা কখনো নিষ্প্রভ কখনো উজ্জ্বল, কিন্তু সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় নি।.........

শিল্পের প্রধান তাৎপর্য অভিব্যক্তির দিক দিয়ে। হৃদয়হীন মানুষ শক্তিশালী হলেও যেমন তার বর্বরতা ঘোচে না তেমনি শিল্পাশ্রিত অভিব্যক্তির অবর্তমানে সমাজে বিশেষ রকমের বর্বরতার লক্ষণ দেখা দিতে বাধ্য।

এক সময়ে শিল্পকলার সৃষ্টির ক্ষমতাকে ঐশী শক্তির অন্যতম প্রকাশ বলে ধরা হত। ক্রমে শিল্পসৃষ্টি ব্যক্তিগত প্রতিভার অবদানরূপেই গৃহীত হয়। বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার যতই বেড়েছে ততই শিল্পসৃষ্টির সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি অপেক্ষা নানা তথ্য জটিল হয়ে দেখা দিয়েছে। এই মুহূর্তে যে শিল্পরূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি তার লক্ষ্য প্রধানত উদ্দীপনা সৃষ্টি করা।

শিল্পের উদ্দেশ্য আদর্শ যেমন পরিবর্তিত হয়েছে তেমনি শিল্পের শিক্ষা-সংক্রান্ত বিধিব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার সংস্পর্শে ভারতবর্ষের জীবনে

যে অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটেছে তারই অন্যতম প্রকাশ আধুনিক শিল্প ও শিল্পশিক্ষা-পদ্ধতি। [শিক্ষা ও শিল্প—আধুনিক শিল্পশিক্ষা : শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়]

১৫. আহা পিঁপড়ে! ছোটো পিঁপড়ে ঘুরুক দেখুক থাকুক
কেমন যেন চেনা লাগে ব্যস্ত মধুর চলা—
স্তব্ধ শুধু চলায় কথা বলা—
আলোয় গন্ধ ছুঁয়ে তার ওই ভুবন ভরে রাখুক,
আহা পিঁপড়ে! ছোটো পিঁপড়ে ধুলোর রেণু মাখুক।
ভয় করে তাই আজ সরিয়ে দিতে
কাউকে, ওকে চাই নে দুঃখ দিতে।
কে জানে প্রাণ আনলো কেন ওর পরিচয় কিছু,
আহা পিঁপড়ে! ছোটো পিঁপড়ে সেই অতলে ডাকুক।
মাটির বুকে যারাই আছি এই দু-দিনের ঘরে
তার স্মরণে সবাইকে আজ ঘিরেছে আদরে।
[পিঁপড়ে : অমিয় চক্রবর্তী]

১৬. তোমারে স্মরণ করি আজ এই দারুণ দুর্দিনে
হে বন্ধু, হে প্রিয়তম, সভ্যতার শ্মশান-শয্যায়
সংক্রমিত মহামারী মানুষের মর্মে ও মজ্জায়।
প্রাণলক্ষ্মী নির্বাসিতা। রক্তপায়ী উদ্ধত সঙিনে
সুন্দরেরে বিদ্ধ ক'রে মৃত্যুবহ পুষ্পকে উড্ডীন
বর্বর রাক্ষস হাঁকে, 'আমি শ্রেষ্ঠ, সবচেয়ে বড়ো।'
দেশে দেশে, সমুদ্রের তীরে তীরে কাঁপে থরোথরো
উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ।
প্রাণ রুদ্ধ, গান স্তব্ধ, ভারতের স্নিগ্ধ উপকূলে
লুব্ধতার লালা ঝরে। এত দুঃখ, এ-দুঃসহ ঘৃণা—
এ নরক সহিতে কি পারিতাম, হে বন্ধু, যদি না
লিপ্ত হত রক্তে মোর, বিদ্ধ হত গূঢ় মর্মস্থলে
তোমার অক্ষয় মন্ত্র! অন্তরে লভেছি তব বাণী,
তাই তো মানি না ভয়, জীবনেরই জয় হবে, জানি।
[রবীন্দ্রনাথের প্রতি : বুদ্ধদেব বসু]

১৭. বিশ্বজগতের মর্মে যে অনাদি চাঞ্চল্য, অস্তিত্বের যে অসীম আবেগ, তাই মিলল এসে পাখির দেহের ছন্দে, মিলল তার মনের চাঞ্চল্যে, মিলল তার প্রাণের আবেগে—বনরঙ্গভূমিতে তার থেকে দেখা দিল নাচ। আদিমকালে মানুষের অপরিণত মনের প্রকাশ-চেষ্টা ভাষার আঙ্গিক তখনো গড়ে তুলতে পারে নি, বিশ্বপ্রকৃতির থেকে আদিম চাঞ্চল্যের প্রেরণা পেয়েছে আপনা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে। পাখির ভাষার সঙ্গে মিল

করে মানুষের এই প্রথম ভাষা। ছন্দের স্বাভাবিক আনন্দ মানুষ পেয়েছে বিশ্বজগতের দোলা খেয়ে, তার সঙ্গে মিলেছে সুখ-দুঃখ-বিরাগ-অনুরাগে হৃদয়ের দোলা, এই আন্দোলনে সাহিত্যের পূর্বেই নৃত্য হয়ে উঠেছে ভাষার বাহন। এখনো আফ্রিকার বহু অসভ্যজাতির মধ্যে নৃত্যের উৎকর্ষ-পরীক্ষা দ্বারা বিবাহের জন্য কন্যা-নির্বাচন-প্রথা বর্তমান আছে। এর থেকে বোঝা যায় মানবসমাজে আত্মপ্রকাশের গৌরব ছিল নৃত্যে। ক্রমে তার আঙ্গিক ও ব্যবহার বিচিত্র হয়ে উঠল। দেখা দিতে লাগল ধর্মানুষ্ঠানের নৃত্য, সম্মোহনবিদ্যার নৃত্য, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহের ঘোষণাসূচক নৃত্য, যুদ্ধ-অভিযানের নৃত্য। পরযুগে যেমন বাণীবদ্ধ মন্ত্রের নানা গূঢ়শক্তি কল্পনা করা হয়েছে, আদিম মানুষও ভয়ে ভক্তিতে আনন্দে সেই রকমই গূঢ় রহস্য কল্পনা করেছে বিবিধ নৃত্যের বিচিত্র ভঙ্গীতে। [নৃত্যরস—নৃত্য : প্রতিমা দেবী]

১৮. জড় নই, মৃত নই, নই অন্ধকারের খনিজ
আমি তো জীবন্ত প্রাণ, আমি এক অঙ্কুরিত বীজ।
মাটিতে লালিত, ভীরু, শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ, স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।
যদিও নগণ্য আমি তুচ্ছ বটবৃক্ষের সমাজে
তবু ক্ষুদ্র এ শরীরে গোপনে মর্মর ধ্বনি বাজে!
আজ শুধু অঙ্কুরিত, জানি কাল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাতা
উদ্দাম হাওয়ার তালে তাল রেখে নেড়ে যাবে মাথা
তারপর দৃপ্ত শাখা মেলে দেবো সবার সম্মুখে।
ফোটাবো বিস্মিত ফুল প্রতিবেশী গাছেদের মুখে।
সংহত কঠিন ঝড়ে, দৃঢ়প্রাণ প্রত্যেক শিকড়,
শাখায় শাখায় বাধা, প্রত্যাহত জানি হবে ঝড়।
অঙ্কুরিত বন্ধু যতো মাথা তুলে আমারই আহ্বানে
জানি তারা মুখরিত হবে নব অরণ্যের গানে।
আগামি বসন্তে জেনো মিশে যাবো বৃহতের দলে
জয়ধ্বনি কিশলয়ে, সম্বর্ধনা জানাবে সকলে।
[আগামী (সংক্ষেপিত) : সুকান্ত ভট্টাচার্য]

১৯. জলহারা মেঘখানি বরষার শেষে
পড়ে আছে গগণের এক কোণ ঘেঁষে।
বর্ষাপূর্ণ সরোবর তারি দশা দেখে
সারাদিন ঝিকিমিকি হাসে থেকে থেকে।
কহে, ওটা লক্ষ্মী ছাড়া, চাল চুলাহীন,
নিজেরে নিঃশেষ করি, কোথায় বিলীন।

আমি দেখো চিরকাল থাকি জলভরা,
সরোবর সুগম্ভীর নাই নড়াচড়া।
মেঘ কহে, ওহে বাপু কোরো না গরব,
তোমার পূর্ণতা সে যে আমারই গৌরব।

২০. পৃথিবীতে কত দ্বন্দ্ব, কত সর্বনাশ,
নূতন নূতন কত গড়ে ইতিহাস—
রক্ত প্রবাহের মাঝে ফেনাইয়া উঠে
সোনার মুকুট কত ফুটে আর টুটে!
সভ্যতার নব নব কত তৃষ্ণা ক্ষুধা—
উঠে কত হলাহল, উঠে কত সুধা
দোঁহাপানে চেয়ে আছে দুইখানি গ্রাম।
এই খেয়া চিরদিন চলে নদী স্রোতে—
কেহ যায় ঘরে, কেহ আসে ঘর হতে।

২১. দেখিনু সেদিন রেলে,
কুলি ব'লে এক বাবু সা'ব তারে ঠেলে দিল নীচে ফেলে —
চোখ ফেটে এল জল,
এমনি ক'রে কি জগৎ জুড়িয়া মার খাবে দুর্বল।
যে দধিচীদের হাড় দিয়ে ঐ বাষ্প-শকট চলে,
বাবু সা'ব এসে চড়িল তাহাতে কুলিরা পড়িল তলে —
বেতন দিয়াছ?—চুপ রও যত মিথ্যাবাদীর দল!
কত পাই দিয়ে কুলিদের তুই কত ক্রোড় পেলি বল?
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাগরে জাহাজ চলে,
রেলপথে চলে বাষ্প-শকট, দেশ ছেয়ে গেল কলে,
বলো তো এসব কাহাদের দান? তোমার অট্টালিকা
কার খুনে রাঙা?—ঠুলি খুলে দেখ, প্রতি ইটে আছে লিখা!
তুমি জাননাক' কিন্তু পথের প্রতি ধূলিকণা জানে,
ঐ পথ, ঐ জাহাজ শকট অট্টালিকার মানে।

———

সারসংক্ষেপ

গদ্য বা কবিতা উদ্ধৃত করে তার সারসংক্ষেপ করতে বললে বুঝতে হবে অল্প পরিসরে তার বিষয় নির্দেশ করতে হবে। সারসংক্ষেপ ইংরেজি Pre´cis-শব্দের সমার্থক। Pre´cis-কথাটির (মূলত ফরাসী) ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল precise writing অর্থাৎ বাহুল্য বর্জন করে খাঁটি বা মূল বিষয়টির প্রকাশ। ইংরেজিতে Summary, Substance, Pre´cis, gist সবই যথাক্রমে স্বল্প থেকে স্বল্পতর আয়তনে সারসংক্ষেপণ। তবে ইংরেজিতে Pre´cis বলতে যা বুঝি বাংলায় সারসংক্ষেপ কথাটি সাধারণত সেই অর্থেই ব্যবহৃত। সারসংক্ষেপ রচনার একটি উৎকৃষ্ট অনুশীলন, কারণ সারসংক্ষেপ করতে গেলে ভাসাভাসাভাবে পড়লে চলবে না। খুব মন দিয়ে পড়তে হবে মূল অনুচ্ছেদ বা মূল বিষয়বস্তুটি। কোনো কিছু পড়বার পর মনে মনে তার সারসংক্ষেপ করতে গেলেই আমরা দেখি অনেক জিনিস ঠিক মনে পড়ছে না অথবা বক্তব্য বিষয়টি ধারাবাহিকভাবে বা শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে মনে পড়ছে না। তখন আমরা আরও মনোযোগ দিয়ে পড়ি। এই একাগ্রতা বিষয়-সংক্ষেপে সাফল্য আনে। এই অনুশীলনে মনটা বিচারকুশলী হয়ে ওঠে। কারণ সারসংক্ষেপ করতে গেলে মূল রচনাটিতে চিন্তাশৃঙ্খলা যথাযথ কিনা তা ধরে পড়ে। অনেক সময় আপাতদৃষ্টিতে যা ভালো রচনা বলে মনে হয় সারসংক্ষেপ করতে গেলে তার রচনাশৈথিল্য প্রকট হয়ে পড়ে।

আধুনিক ব্যস্ততার জগতে ব্যবসায়, ওকালতি বা সরকারি বা বেসরকারি নানা-ধরনের কাজেই সারসংক্ষেপের প্রয়োজন খুব বেশি। বিভিন্ন বৃত্তির ক্ষেত্রে নির্বাচনী পরীক্ষায় এই বিষয়টি তাই বিশেষ গুরুত্ব পায়।

সারসংক্ষেপের পদ্ধতি

- প্রথমে অনুচ্ছেদটি একবার পড়ো, অর্থবোধে অসুবিধা থাকলে দুবার বা তিনবার পড়ো।
- অনুচ্ছেদটির বিষয় (Subject) কী—তা ধরবার চেষ্টা করো।
- তারপর দেখো বিষয়টি সম্বন্ধে লেখকের বক্তব্য কী।
- এবারে ঐ বক্তব্যগুলোর প্রধান প্রধান বা গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো চিহ্নিত করো অথবা পৃথক্‌ভাবে লিখে রাখো।
- এই অংশগুলোকে অবলম্বন করে এবারে সহজ কথায় সংক্ষিপ্ত বক্তব্য প্রস্তুত করো। গুরুত্বপূর্ণ বাক্য বা বাক্যাংশকে আমরা বলতে পারি প্রধান বাক্‌-সূত্র।
- প্রত্যক্ষ উক্তি থাকলে তাকে পরোক্ষ উক্তিতে প্রকাশ করো।
- লেখায় যুক্তিক্রম বা পারম্পর্য বজায় থাকল কিনা দেখো।
- শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট থাকলে তা অতিক্রম না করাই ভালো। শব্দসংখ্যা নির্দিষ্ট না থাকলে সারসংক্ষেপ মূলরচনার এক-তৃতীয়াংশ মতো হবে।

- এবারে সংক্ষেপিত অংশের একটি শিরোনাম দাও। শিরোনামটি দিতে পূর্বচিহ্নিত গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো কাজে আসবে। মূলরচনার প্রথম বাক্য বা শেষবাক্যে নামকরণের ইঙ্গিত পেতে পার।
- সংক্ষেপিত অংশ সাধারণত একটি অনুচ্ছেদেই (paragraph) লেখা হয়, তবে মূল রচনায় একাধিক বিষয় একাধিক অনুচ্ছেদে আলোচিত হয়ে থাকলে সংক্ষেপিত অংশে একাধিক অনুচ্ছেদ ব্যবহার করা যেতে পারে।
- পুনরুক্তি না ঘটে সে বিষয়ে সতর্ক থাকতে হবে।
- সারসংক্ষেপের ভাষা অত্যন্ত সহজ-সরল ও অলংকারবর্জিত হওয়া দরকার।

পদ্যাংশের সারসংক্ষেপ-সম্বন্ধে এমন-কোনো নিয়ম করা মুশকিল, কারণ, পদ্যে ভাব থাকে অত্যন্ত সংহত আকারে। তবু যতটা অল্প পরিসরে মূল বক্তব্যগুলো তুলে ধরা যায় ততই ভালো।

উত্তরে মূল অনুচ্ছেদের শব্দসংখ্যা এবং সংক্ষেপিত অংশের শব্দসংখ্যা উল্লেখ করতে পার।

আমরা উদাহরণে প্রধান প্রধান বাক্-সূত্র ব্যবহার করলাম। মূল রচনায় শুদ্ধ বা চলিত যে ভাষায় আছে বাক্‌সূত্রগুলো সেই ভাষায় রাখা হল। সংক্ষেপণে সাধু বা চলিত যে-কোনো ভাষাই চলতে পারে। আমরা চলিতভাষাই ব্যবহার করলাম।

উদাহরণ

১। মনুষ্যমাত্রেই পতঙ্গ। সকলেরই এক একটি বহ্নি আছে, সকলেই সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে চাহে, সকলেই মনে করে সেই বহ্নিতে পুড়িয়া মরিতে তাহার অধিকার আছে—কেহ মরে, কেহ কাচে বাধিয়া ফিরিয়া আসে। জ্ঞান-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নি, রূপবহ্নি, ইন্দ্রিয়-বহ্নি, সংসার বহ্নিময়। আবার সংসার কাচময়। যে-আলো দেখিয়া মোহিত হই—মোহিত হইয়া যাহাতে ঝাঁপ দিতে যাই—কই, তাহা ত পাই না—আবার ফিরিয়া বোঁ করিয়া চলিয়া যাই—আবার আসিয়া ফিরিয়া বেড়াই। কাচ না থাকিলে, সংসার এত দিন পুড়িয়া যাইত। যদি সকল ধর্মবিৎ চৈতন্যদেবের ন্যায় ধর্ম মানস-প্রত্যক্ষে দেখিতে পাইত, তবে কয় জন বাঁচিত। অনেকে জ্ঞান-বহ্নির আবরণ-কাচে ঠেকিয়া রক্ষা পায়, সক্রেতিস্, গেলিলিও তাহাতে পুড়িয়া মরিল। রূপ-বহ্নি, ধন-বহ্নি, মান-বহ্নিতে নিত্য নিত্য সহস্র পতঙ্গ পুড়িয়া মরিতেছে,—আমরা স্বচক্ষে দেখিতেছি। এই বহ্নির দাহ যাহাতে বর্ণিত হয়, তাহাকে কাব্য বলি। মহাভারতকার মানবহ্নি সৃজন করিয়া দুর্যোধন-পতঙ্গকে পোড়াইলেন :—জগতে অতুল্য কাব্যগ্রন্থের সৃষ্টি হইল। জ্ঞানবহ্নিজাত দাহের গীত "Paradise Lost." ধর্ম-বহ্নির অদ্বিতীয় কবি সেন্ট পল। ভোগবহ্নির পতঙ্গ "আণ্টনি, ক্লিওপেত্রা", রূপ-বহ্নির "রোমিও ও জুলিয়েট", ঈর্ষা-বহ্নির "ওথেলো।" গীতগোবিন্দ ও বিদ্যাসুন্দরে ইন্দ্রিয়-বহ্নি জ্বলিতেছে। স্নেহ-বহ্নিতে সীতা-পতঙ্গের দাহ-জন্য রামায়ণের সৃষ্টি। বহ্নি কি, আমরা জানি না। রূপ, তেজ, তাপ, ক্রিয়া, গতি, এ সকল কথার অর্থ নাই। এখানে দর্শন হারি মানে,

বিজ্ঞান হারি মানে। ধর্মপুস্তক হারি মানে, কাব্যগ্রন্থ হারি মানে। ঈশ্বর কি, ধর্ম কি, জ্ঞান কি, স্নেহ কি? তাহা কি, কিছু জানি না। তবু সেই অলৌকিক, অপরিজ্ঞাত পদার্থ বেড়িয়া বেড়িয়া ফিরি। আমরা পতঙ্গ না ত কি?

[কমলাকান্তের দপ্তর : পতঙ্গ—বঙ্কিমচন্দ্র]

[প্রধান বাক্সূত্র : মনুষ্য মাত্রেই পতঙ্গ—সংসার বহ্নিময় জ্ঞানবহ্নি, ধনবহ্নি ইত্যাদি—উদাহরণ।]

মনুষ্য পতঙ্গ

পতঙ্গের মতোই মানুষ আগুনের দিকে ধাবিত হয়। জ্ঞান-ধন-মান-ধর্ম সবকিছুই মানুষের কাছে আগুনের মতো। এই আগুনে পুড়ে মরবার জন্যে মানুষ-পতঙ্গ সদাসচেষ্ট। এই আকাঙ্ক্ষার আগুনে আত্মোৎসর্গের কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে কত শ্রেষ্ঠ কাব্য। মহাভারত, প্যারাডাইস লস্ট, গীতগোবিন্দ, রোমিও জুলিয়েট, বা ওথেলো যথাক্রমে, মান-জ্ঞান-ইন্দ্রিয়-রূপ ও ঈর্ষা-বহ্নির দহনজাত কাব্য।

২। পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন। অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিবার শক্তি এবং অন্যকে সম্পূর্ণ আপনার করিয়া লইবার ইন্দ্রজাল, ইহাই প্রতিভার নিজস্ব। ভারতবর্ষের মধ্যে সে প্রতিভার বিকাশ আমরা দেখিতে পাই। ভারতবর্ষ অসঙ্কোচে অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে এবং অনায়াসে অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষ পুলিন্দ, শবর, ব্যাধ প্রভৃতির নিকট হইতে বীভৎস সামগ্রী গ্রহণ করিয়া তাহার মধ্যে নিজের ভাব বিস্তার করিয়াছে—তাহার মধ্য দিয়াও নিজের আধ্যাত্মিকতাকে অভিব্যক্ত করিয়াছে। ভারতবর্ষ কিছুই ত্যাগ করে নাই এবং গ্রহণ করিয়া সকলকেই আপনার করিয়াছে।

এই ঐক্যবিস্তার ও শৃঙ্খলা-স্থাপন কেবল সমাজ-ব্যবস্থায় নয়, ধর্মনীতিতেও দেখি। গীতায় জ্ঞান, প্রেম ও কর্মের মধ্যে যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য-স্থাপনের চেষ্টা দেখি, তাহা বিশেষ-রূপে ভারতবর্ষের।

পৃথিবীর সভ্যসমাজের মধ্যে ভারতবর্ষ নানাকে এক করিবার আদর্শরূপে বিরাজ করিতেছে, তাহার ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইবে।

[উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, সংসদ, ১৯৭৮]

[প্রধান বাক্সূত্র : পরকে আপন করিতে প্রতিভার প্রয়োজন—ভারতবর্ষ অন্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে—অন্যের সামগ্রী নিজের করিয়া লইয়াছে—ইতিহাস হইতে ইহাই প্রতিপন্ন হইয়াছে।]

পরকে আপন করা

অন্যের মধ্যে প্রবেশ করে তাকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা এক আশ্চর্য প্রতিভা। ভারতবর্ষ এই প্রতিভার অধিকারী। সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন বিষয়ে ভারতবর্ষ অন্যের কাছ থেকে ভাবাদি উপকরণ গ্রহণ করে তাকে একান্ত নিজস্ব করে নিয়েছে।

ধর্মের ক্ষেত্রেও এই সমন্বয়-সাধনা প্রত্যক্ষ। ভারতের ইতিহাসের দিকে তাকালেই এ কথার সত্যতা প্রতিপন্ন হবে।

৩। আমাদের চাষী বলে, মাটি হইতে বাপ-দাদার আমল ধরিয়া যাহা পাইয়া আসিতেছি, তাহার বেশি পাইব কি করিয়া? এ কথা চাষীর মুখে শোভা পায়, পূর্বপ্রথা অনুসরণ করিয়া চলাই তাহাদের শিক্ষা। কিন্তু এমন কথা বলিয়া আমরা নিষ্কৃতি পাইব না। এই মাটিকে এখনকার প্রয়োজন অনুসারে বেশি করিয়া ফলাইতে হইবে—নইলে আধপেটা খাইয়া জ্বরে অজীর্ণরোগে মরিতে কিংবা জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে।

এই মাটির উপরে মন এবং বুদ্ধি খরচ করিলে এই মাটি হইতে যে আমাদের দেশের মোট চাষের ফসলের চেয়ে অনেক বেশি আদায় করা যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজকাল চাষকে মূর্খের কাজ বলা চলে না, চাষের বিদ্যা এখন মস্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে। [ত্রিপুরা উঃ মাঃ পরীক্ষা, ১৯৭৮]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : চাষীর পূর্বপ্রথা অনুসরণ—মাটিকে বেশি করিয়া ফলাইতে হইবে—মন ও বুদ্ধি খরচ—চাষের বিদ্যা এখন মস্ত বিদ্যা।]

কৃষিবিদ্যা

চাষ করে বেশি ফসল ফলাবার আধুনিক শিক্ষা চাষীর নেই। পুরনো প্রথায় চাষ করাটাই তার শিক্ষা। কিন্তু বর্তমান যুগে জীবনধারণ করতে গেলে এই মাটিতেই প্রয়োজন অনুসারে বেশি ফসল ফলাতে হবে। বুদ্ধি খাটিয়ে চাষ করলে অনেক বেশি ফসল পাওয়া যায়। আজকাল কৃষি একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিদ্যা।

৪। বর্তমান সভ্যতায় দেখি, এক জায়গায় একদল মানুষ অন্ন উৎপাদনের চেষ্টায় নিজের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেছে, আর এক জায়গায় আর একদল মানুষ স্বতন্ত্র থেকে সেই অন্নে প্রাণধারণ করে। চাঁদের যেমন এক পিঠে অন্ধকার, অন্য পিঠে আলো, এ সেই রকম। একদিকে দৈন্য মানুষকে পঙ্গু করে রেখেছে—অন্য দিকে ধনের সন্ধা[ন] ধনের অভিমান, ভোগবিলাস-সাধনের প্রয়াসে মানুষ উন্মত্ত। অন্নের উৎপা[দন] হয় পল্লীতে, আর অর্থের সংগ্রহ চলে নগরে। অর্থ উপার্জনের সুযোগ ও উপক[রণ] যেখানেই কেন্দ্রীভূত, স্বভাবত সেখানেই আরাম, আরোগ্য, আমোদ ও শিক্ষার [ব্য]বস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প-সংখ্যক লোককে ঐশ্বর্যের আশ্রয় দান ক[রে]। পল্লীতে সেই ভোগের উচ্ছিষ্ট যা কিছু পৌছয় তা যৎকিঞ্চিৎ।

[ত্রিপুরা উচ্চ মাধ্য[মিক] পরীক্ষা, ১৯৭৯, '৮১]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : বর্তমান সভ্যতায় একদিকে দৈ[ন্য] অন্যদিকে ভোগবিলাস—পল্লীতে ভোগের উচ্ছিষ্ট।]

শহর ও গ্রামে স্ফীতি ... রিক্ততা

আমাদের বর্তমান সভ্যতায় একটা বিপ... সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। একদল অন্ন যোগায় আর একদল সেই অন্ন ভো...। যারা উৎপাদন বা শ্রমদান করে—

তারা রিক্ত হয়ে পড়ে, যারা সেই উৎপাদনের ভোক্তা তারা হয় স্ফীত। তাই পল্লীতে দেখি রিক্ততা, আর শহরে দেখি স্ফীতি। শহরের সুযোগ-সুবিধার অতি নগণ্য অংশই পল্লীবাসীদের ভাগ্যে জোটে।

৫। সুখ প্রতিদিনের সামগ্রী, আনন্দ প্রত্যহের অতীত। সুখ শরীরের কোথাও পাছে ধুলা লাগে বলিয়া সংকুচিত, আনন্দ ধুলায় গড়াগড়ি দিয়া নিখিলের সঙ্গে আপনার ব্যবধান ভাঙিয়া চুরমার করিয়া দেয়। এই জন্য সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ধুলা ভূষণ। সুখ কিছু হারায় বলিয়া ভীত। আনন্দ যথাসর্বস্ব বিতরণ করিয়া পরিতৃপ্ত। এই জন্য সুখের পক্ষে দারিদ্র্য রিক্ততা, আনন্দের পক্ষে দারিদ্র্যই ঐশ্বর্য। সুখ ব্যবস্থার বন্ধনের মধ্যে আপনার শ্রীটুকুকে সতর্কভাবে রক্ষা করে, আনন্দ সংসারের মুক্তির মধ্যে আপন সৌন্দর্যকে উদারভাবে প্রকাশ করে। এই জন্য সুখ বাহিরের নিয়মের মধ্যে বদ্ধ, আনন্দ সে বন্ধন ছিন্ন করিয়া আপনার নিয়ম আপনি সৃষ্টি করে। সুখ সুধাটুকুর জন্য তাকাইয়া থাকে, আনন্দ দুঃখের বিষয়কে অনায়াসে পরিপাক করিয়া ফেলে। এই জন্য কেবল ভালোটুকুর দিকেই সুখের পক্ষপাত—আর আনন্দের পক্ষে ভালো-মন্দ দুই-ই সমান।

[উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, সংসদ, ১৯৭৯]

[প্রধান বাক্সূত্র : সুখের পক্ষে ধুলা হেয়, আনন্দের পক্ষে ভূষণ—সুখ বদ্ধ, আনন্দ মুক্ত—আনন্দের পক্ষে ভালোমন্দ দুই-ই সমান।]

সুখ ও আনন্দ

সুখ আর আনন্দের স্বরূপ সম্পূর্ণ পৃথক্। সুখ ভোগবিলাস-সর্বস্ব, কিন্তু আনন্দ ভোগবিলাসকে অতিক্রম করে নন্দনলোকের দিকে হাত বাড়ায়। রিক্ততার মধ্যেও তাই সে পূর্ণ, বদ্ধতার মধ্যেও তাই সে মুক্ত। সুখ দুঃখের দিকে মুখ ফিরিয়ে চলে, কিন্তু আনন্দ সুখ-দুঃখের দোলনায় দুলে চলে।

৬। বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার সামান্যতা বা উচ্চতা নির্ধারিত হওয়া উচিত। রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা এবং স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবামাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থগৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা। তাহার পর ভাষার সৌন্দর্য। সরলতা এবং স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে। অনেক রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য সৌন্দর্য,—সে স্থলে সৌন্দর্যের অনুরোধে শব্দের একটু অসাধারণতা সহ্য করিতে হয়। প্রথমে দেখিবে তুমি যাহা বলিতে চাও, কোন্ ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা পরিষ্কাররূপে ব্যক্ত হয়। যদি সরল প্রচলিত কথাবার্তার ভাষায় তাহা সর্বাপেক্ষা সুস্পষ্ট ও সুন্দর হয়, তবে কেন উচ্চ ভাষার আশ্রয় লইবে? যদি সে পক্ষে টেকচাঁদী বা হুতোমী ভাষায় সকলের অপেক্ষা কার্য সুসিদ্ধ হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিবে। যদি তদপেক্ষা বিদ্যাসাগর বা ভূদেববাবু-প্রদর্শিত সংস্কৃত-বহুল ভাষায় ভাবের অধিক স্পষ্টতা ও সৌন্দর্য হয়, তবে সামান্য ভাষা ছাড়িয়া সেই

ভাষার আশ্রয় লইবে। যদি তাহাতেও কার্য সিদ্ধ না হয়, আরও উপরে উঠিবে, প্রয়োজন হইলে তাহাতেও আপত্তি নাই, নিষ্প্রয়োজনে আপত্তি। [উ. মা. ১৯৮১]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : বিষয় অনুসারে ভাষা—সরলতা ও সার্থকতার সহিত সৌন্দর্যই আদর্শ।]

ভাষাদর্শ

বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে রচনার ভাষা নির্ধারণ করতে হয়। প্রয়োজনে রচনার ভাষা হবে টেকচাঁদী হুতোমী ভাষার মত, আবার কখনও তা হবে সংস্কৃত-বহুল গুরুগম্ভীর। তবে সরলতার সঙ্গে সৌন্দর্যের মিশ্রণই হবে আদর্শ।

৭। জ্ঞান মানুষের মধ্যে সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য। বাংলাদেশের এক কোণে যে ছেলে পড়াশুনা করিয়াছে তার সঙ্গে য়ুরোপ-প্রান্তের শিক্ষিত মানুষের মিল অনেক বেশি সত্য, তার দুয়ারের পাশের মূর্খ প্রতিবেশীর চেয়ে।

জ্ঞানে মানুষের সঙ্গে মানুষের এই যে জগৎজোড়া মিল বাহির হইয়া পড়ে, যে মিল দেশভেদ ও কালভেদকে ছাড়াইয়া যায়—সেই মিলের পরম প্রয়োজনের কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক, কিন্তু সেই মিলের যে পরম আনন্দ তাহা হইতে কোনো মানুষকেই কোন কারণেই বঞ্চিত করিবার কথা মনেই করা যায় না।

সেই জ্ঞানের প্রদীপ এই ভারতবর্ষে কত বহু দূরে দূরে এবং কত মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে, সে কথা ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি ভারতবাসীর পক্ষে সেই পরমযোগের পথ কত সঙ্কীর্ণ—যে যোগ জ্ঞানের যোগ, যে যোগে সমস্ত পৃথিবীর লোক আজ মিলিত হইবার সাধনা করিতেছে। [ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৮০]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : জ্ঞান মানুষের সকলের চেয়ে বড়ো ঐক্য—এই ঐক্য দেশ ও কালের ভেদকে ছাড়াইয়া যায়—ভারতের পক্ষে এই পরমযোগের পথ কত সংকীর্ণ।]

জ্ঞানই মিলন-সেতু

জ্ঞানের আলো দেশ ও কালের সীমা অতিক্রম করে মানুষে মানুষে মিলনের সেতু রচনা করে। আর অজ্ঞানতার অন্ধকার রচনা করে বিভেদের প্রাচীর। জ্ঞানালোকে বিশ্বের মানুষ আজ বিভেদ ঘুচিয়ে ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ হতে চলেছে। সে মিলনের আয়োজন ভারতবর্ষে প্রয়োজনের তুলনায় নগণ্য।

৮। অনেকেই বলিবেন, ইংরেজের প্রাধান্য এবং ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের প্রাধান্যে সাদৃশ্য কল্পনা সুকল্পনা নহে ; ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় শূদ্রপীড়ক হইলেও স্বজাতি—ইংরেজরা ভিন্ন জাতি। ইহার এইরূপ উত্তর দিতে ইচ্ছা করে যে, যে পীড়িত হয়, তাহার পক্ষে স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্নজাতির পীড়ন, উভয়ই সমান। স্বজাতির হস্তে পীড়া কিছু মিষ্ট, পরজাতীয়ের কৃত পীড়া কিছু তিক্ত লাগে, এমত বোধ হয় না। কিন্তু আমরা সে উত্তর দিতে চাহি না। যদি স্বজাতীয়ের কৃত পীড়ায় কাহারও প্রীতি থাকে তাহাতে আমাদিগের আপত্তি নাই। আমাদিগের এই মাত্র বলিবার উদ্দেশ্য যে, আধুনিক ভারতের জাতি-প্রাধান্যের স্থানে ভারতে বর্ণ-প্রাধান্য ছিল। অধিকাংশ লোকের পক্ষে উভয়ই সমান।

তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, পরাধীন ভারতবর্ষে উচ্চশ্রেণীস্থ লোকে স্বীয় বুদ্ধি, শিক্ষা, বংশ এবং মর্যাদানুসারে প্রাধান্য লাভ করিতে পারেন না। যাহার বিদ্যা এবং বুদ্ধি আছে, তাহাকে যদি বুদ্ধি-সঞ্চালনের এবং বিদ্যার ফলোৎপত্তির স্থল না দেওয়া যায়, তবে তাহার প্রতি গুরুতর অত্যাচার করা হয়। আধুনিক ভারতবর্ষে এরূপ ঘটিতেছে। প্রাচীন ভারতবর্ষে, বর্ণবৈষম্যগুণে তাহাও ছিল, কিন্তু এ পরিমাণে ছিল না। [উ. মা. ১৯৮০]

[প্রধান বাক্সূত্র : স্বজাতির পীড়ন ও ভিন্ন জাতির পীড়ন, উভয়ই সমান—পরাধীন ভারতবর্ষে মর্যাদা অনুসারে প্রাধান্য—ধর্মবৈষম্যেও তাহা ছিল, কিন্তু এত পরিমাণে নহে।]

সব পীড়নই সগোত্র

আধুনিক ভারতের জাতি-প্রাধান্যের স্থানে প্রাচীন ভারতে ছিল বর্ণ-প্রাধান্য। সমাজে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় প্রাধান্য লাভ করে শূদ্র-পীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। উভয় পীড়নই পীড়কের কাছে সমান বেদনাদায়ক। পরাধীন ভারতে মানুষ নিজের প্রতিভা অনুসারে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। বর্ণ-বৈষম্য-নীতির প্রয়োগের দ্বারা প্রাচীন ভারত মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করলেও এতটা করে নি।

৯। অতি কাছে এসেছেন আজ বাংলার কবি এই প্রতিদিনের মানুষের সংসারে। সারাজীবনের ঐশ্বর্য তিনি যাদের উদ্দেশ্যে দিচ্ছেন তারা অতি বুদ্ধিমান্ জ্ঞানের ব্যবসায়ী নয়। তারা শ্যামল দিগন্তে ঘেরা প্রাত্যহিক মানুষ। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অধিকারী-ভেদ নেই ; এখানে সকলেরই নিমন্ত্রণ। মাঝি এল তার পাল-তোলা নৌকা নিয়ে, গঞ্জের হাট থেকে লোক এল বিবিধ পসরা হাতে করে—কেউ হালে বলদ জুড়েছে, কেউ বা শহরে কাজ করে দোকানে বা আপিসে। কত ঘরের নিভৃত কাহিনী জীবনের ধ্যানমালায় গ্রথিত হল তাঁর আজকের কবিতায়। অথচ এই সংবেদনশীল দৃষ্টিতে সত্যদর্শিতার সাহস আরো প্রদীপ্ত হয়েছে, তার পরিচয় পেয়েছি তাঁর এই নববর্ষের অভিভাষণে। ভয়হীন তাঁর দৃষ্টি, কেন না সেখানে প্রেমের অপরাজেয় শক্তি রয়েছে—মানুষকে ভালবাসেন বলেই তিনি মানুষের ভ্রষ্টতাকে এমন করে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে দেখতে পারেন। [উ. মা. ১৯৮২]

[প্রধান বাক্সূত্র : রবীন্দ্রনাথের কাব্যে অধিকারী-ভেদ নেই—প্রেমের শক্তিতে ভয়হীন তাঁর দৃষ্টি—মানুষের ভ্রষ্টতাকে মোহমুক্ত দৃষ্টিতে দেখার শক্তি।]

রবীন্দ্রকাব্যের উদার পটভূমি

রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উদার পটভূমি মাঝিমাল্লা, দোকানী-কেরানী প্রভৃতি সাধারণ মানুষ অনায়াসে এসেছে কবির সার্বিক অনুভূতির প্রভাবে। অথচ এরই মধ্যে পরিস্ফুট

হয়েছে তাঁর সত্যদর্শনের নির্ভীকতা। ভালোবাসার শক্তি থেকেই এসেছে তাঁর এই নির্ভীকতা। এই জন্যেই মানুষের ভ্রষ্টতাকে বিচার করতে পেরেছেন নির্মোহ দৃষ্টিতে।

১০। আমার বিশ্বাস, শিক্ষা কেউ কাউকে দিতে পারে না। সুশিক্ষিত লোক মাত্রেই স্বশিক্ষিত। আজকের বাজারে বিদ্যার দাতার অভাব নেই, এমন কি এ ক্ষেত্রে দাতা-কর্ণেরও অভাব নেই, এবং আমরা আমাদের ছেলেদের তাঁদের দ্বারস্থ করেই নিশ্চিন্ত থাকি, এই বিশ্বাসে যে, সেখান থেকে তারা এতটা বিদ্যার ধন লাভ করে ফিরে আসবে, যার সুদে তারা বাকি জীবন আরামে কাটিয়ে দিতে পারবে। কিন্তু এ বিশ্বাস নিতান্ত অমূলক। মনোরাজ্যেও দান গ্রহণসাপেক্ষ, অথচ আমরা দাতার মুখ চেয়ে গ্রহীতার কথাটা একেবারেই ভুলে যাই। এ সত্য ভুলে না গেলে আমরা বুঝতুম যে, শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, কিন্তু ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়। শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন, মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন, তার কৌতূহল উদ্রেক করতে পারেন, তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন, তার জ্ঞানপিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন, এর বেশি আর-কিছু পারেন না। যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বোধিত করেন এবং তার অন্তর্নিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে মুক্ত এবং ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে সে নিজের মন নিজে গড়ে তোলে, নিজের অভিমত বিদ্যা অর্জন করে। বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়। গুরু উত্তরসাধক মাত্র। [ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৮২]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : সুশিক্ষিত লোকমাত্রই স্বশিক্ষিত—শিক্ষকের সার্থকতা শিক্ষা দান করায় নয়, ছাত্রকে তা অর্জন করতে সক্ষম করায়—বিদ্যার সাধনা শিষ্যকে নিজে করতে হয়।]

স্বনির্ভরতার শিক্ষাই আসল শিক্ষা

বিদ্যার ক্ষেত্রে দাতা ও গ্রহীতা দুইই আছে তা আমরা ভুলে যাই। শিক্ষা শুধু দিলেই হবে না, ছাত্রকে গ্রহণে উপযোগী করে তুলতে হবে। ছাত্রকে শিক্ষা অর্জনে সক্ষম করে তোলাই আসল শিক্ষকতা। শিক্ষক ছাত্রের জ্ঞানপিপাসাকে জাগ্রত করবেন এবং তাদের বুদ্ধিবৃত্তিকে বিকশিত করবেন। ব্যক্তির অন্তর্নিহিত শক্তিকে উদ্বোধিত করতে পারাই শিক্ষকের আসল কর্তব্য। শিক্ষার্থী নিজেই যাতে বিদ্যার সাধনা করতে পারে গুরু সেইভাবেই তাকে গড়ে তুলবেন।

১১। পাপীকে সাধু করা বড় সহজ কথা নয়। ইহাতে অনেক যত্ন, অনেক সতর্কতা, মানব-প্রকৃতির অনেক জ্ঞান থাকা চাই। এমন কি কিছুকালের নিমিত্ত আপনার স্বার্থ পর্যন্ত বিস্মৃত হইতে হয়। এ সংসারে প্রেমই হৃদয়-রাজ্যের অদ্বিতীয় ঈশ্বর। কি শিশু, কি যুবা, কি প্রবীণ, কি বৃদ্ধ, কি ধনী, কি নির্ধন, কি পাপী, কি সাধু সকলেই একবাক্যে ভালবাসার দাস। অন্যের অন্তঃকরণে প্রভুত্ব করিতে হইলে, প্রথমতঃ ভালবাসা দ্বারাই তাহার পথ প্রস্তুত করিতে হয়। এই রূপ পরোক্ষ শিক্ষাদানেরও উদ্দেশ্য ভালবাসা দ্বারা

কার্যকরী হয়। বস্তুত সহৃদয়তা ছাড়া যে পরের উপকার করা যায় না, এবং সর্বময় স্নেহের অভাবে যে সর্বপ্রকার সদ্‌গুণও থাকা না থাকা সমান তাহাতে আর সন্দেহ কী।

[প্রধান বাক্‌সূত্র : সকলেই ভালবাসার দাস—অন্যের অন্তঃকরণে প্রভুত্ব—স্নেহের অভাবে সদ্‌গুণও থাকা না থাকা সমান।]

ভালোবাসার জয়

সকলেই ভালবাসার অধীন। ভালবাসার দ্বারা হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর। যা বাহুবলে কখনই সম্ভবপর হয় না, তা প্রেমের দ্বারা সম্ভবপর হয়। মানুষের হৃদয়-রাজ্য জয় করতে হলে প্রথমেই ভালবাসা দিয়ে ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হয়। ভালবাসার অভাবে সদ্‌গুণও নিরর্থক।

১২। ভদ্রতার মূল পরহিতৈষণা এবং সংযম। উপস্থিতমত পরের যাতে কষ্ট না হয়,—আমার বাড়ী এসে বা আমার সম্পর্কে থেকে ক্ষণকাল যাতে অন্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করে,—ভদ্রলোকের স্বভাবতই এই ইচ্ছা কার্যে পরিণত করতে হলে অনেক সময়ে তৎকালীন প্রতিকূল ইচ্ছা দমন করতে হয়, নিজের আপাত-সুবিধা বিসর্জন দিতে হয়।

আমার যে সময় জরুরী কাজ আছে সে সময় হয়তো একজন দেখা করতে এলেন; ভদ্রতার নিয়মানুসারে আমার সব কাজ ফেলে রেখে তাঁর আতিথ্যে মনোনিবেশ করতে হবে। কিংবা হয়তো কোনও মাননীয় ব্যক্তি আমার মুখের সামনে হয়কে নয়, সাদাকে কালো বলছেন, আমার কথা জিহ্বাগ্রে এলেও মুখে বলবার সাধ্য নেই যে, "ওগো, তুমি মিথ্যা কথা বলছ", কিংবা আর একজনকে অন্যের নিন্দা করার আগে একবার নিজের দিকে চেয়ে দেখলে ভাল হয় না ?

[প্রধান বাক্‌সূত্র : ভদ্রতার মূল পরহিতৈষণা ও সংযম—উদাহরণ—নিজের দিকে চাওয়া।]

ভদ্রতার ধর্ম

ভদ্রতার মূলমন্ত্র হল সংযম ও পরের মঙ্গল-কামনা। নিজের সামান্য ক্ষতি করেও অন্যকে আনন্দ দেওয়া ভদ্রলোকেরই ধর্ম। ব্যস্ততার মধ্যেও অন্যকে সঙ্গ দান করা এবং সম্মানীয় ব্যক্তির সম্মান রক্ষা করাও এই ধর্মের অন্তর্গত। অন্যের ত্রুটি না দেখে নিজের ত্রুটি দেখাই ভদ্রতার ধর্ম।

১৩। আমাদের সকলের জীবনে কি কোন না কোন দিন এমন এক অভূতপূর্ব নতুন প্রেম ও নতুন স্বাধীনতার প্রভাব উদিত হয় নাই যেদিন সহসা হাস্যক্রন্দনময় জগৎকে এক সুকোমল নবকুমারের মত এক অপূর্ব সৌন্দর্য, প্রেম ও মঙ্গলের ক্রোড়ে বিকশিত দেখিয়াছি ? যেদিন কেহ আমাদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে পারে না, কেহ আমা-দিগকে কোন সুখ হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না, কেহ আমাদিগকে কোন প্রাচীরের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না সেদিন এক অপূর্ব বাঁশি বাজিয়া ওঠে, এক অপূর্ব

বসন্ত জাগিয়া উঠে, চরাচর চির-যৌবনের আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, সেদিন সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য-বিপদকে কিছুই মনে হয় না।

[প্রধান বাক্‌সূত্র : কোনো কোনো দিন এক অভূতপূর্ব নতুন প্রেম ও নতুন স্বাধীনতার প্রভাব—সেদিন সমস্ত দুঃখ-দারিদ্র্য-বিপদকে কিছুই মনে হয় না।]

শুভক্ষণ

প্রত্যেক মানুষের জীবনেই এমন এক মুহূর্ত আসে যখন পুরনো পৃথিবী আমাদের চোখে অপরূপ হয়ে ওঠে। এই শুভ মুহূর্ত এনে দেয় প্রেম, প্রীতি আর স্বাধীনতার আনন্দ। বাইরের প্রতিকূলতা এই মানসিক আনন্দ হরণ করতে পারে না।

১৪। এবার বুঝেছি চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার
শোন রে শ্রমিক শোন ভাই চাষা,
আমাদের বুকে যত ভালবাসা
ঢালিব বিলাব তোদের দুয়ারে অকাতরে অনিবার।
তোদের দুঃখে হায়
পাষাণ হ'লেও চক্ষের জলে বক্ষ ভাসিয়া যায়।
ক'রো নাকো ভাই হীন আশঙ্কা,
এবার নয়নে ঘষি নি লঙ্কা ;
সত্য সত্য ত্রিসত্য করি হৃদয় তোদেরই চায়।
ওরে চির পরাধীন !
তোরা না জানিস মোরা জানি তোর কী কষ্টে কাটে দিন।
নানা পুঁথি প'ড়ে পেয়েছি প্রমাণ
তোরাই দেশের তেরো আনা প্রাণ ;
বৎসরে হায় বিশ টাকা আয়, তবু তোরা ভাষাহীন।

(প্রধান বাক্‌সূত্র : চাষা ছাড়া কভু হবে না দেশোদ্ধার—মোরা জানি তোর কী কষ্টে কাটে দিন—তোরাই দেশের তেরো আনা প্রাণ)

শ্রমিক-কৃষক প্রীতি

কৃষক-শ্রমিক দেশের প্রকৃত বন্ধু। বহু যুগ ধরে তারা অসহনীয় দুঃখ-দারিদ্র্য সহ্য করেও নীরবে সেবা করে চলেছে। এই শ্রমিক কৃষকের উন্নতির সঙ্গে দেশের প্রকৃত মঙ্গলামঙ্গল জড়িত। আমরা শিক্ষিতেরা একথা তত্ত্বগতভাবে মানেলও এ বিষয়ে যেন আমাদের প্রকৃত উপলব্ধি নেই।

১৫। অণুবীক্ষণ নামে একপ্রকার যন্ত্র আছে, তাহাতে ছোটো জিনিসকে বড়ো দেখায়। বড় জিনিসকে ছোটো দেখাইবার নিমিত্ত উপায় পদার্থবিদ্যা-শাস্ত্রে থাকিলেও ঐ উদ্দেশ্যে নির্মিত কোন যন্ত্র আমাদের মধ্যে সর্বদা ব্যবহৃত হয় না। কিন্তু বিদ্যাসাগরের জীবন-চরিত বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ। আমাদের দেশের মধ্যে

যাহারা খুব বড়ো বলিয়া পরিচিত, ঐ গ্রন্থ একখানি সম্মুখে ধরিবামাত্র তাঁহারা সহসা অতি ক্ষুদ্র হইয়া পড়েন, এবং এই যে বাঙালীত্ব লইয়া আমরা অহোরাত্র আস্ফালন করিয়া থাকি তাহাও অতি ক্ষুদ্র ও শীর্ণ কলেবর ধারণ করে। এই চতুষ্পার্শস্থ ক্ষুদ্রতার মধ্যস্থলে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায় শীর্ষ তুলিয়া দণ্ডায়মান থাকে; কাহারও সাধ্য নাই যে সেই উচ্চ চূড়া অতিক্রম করে বা স্পর্শ করে।

[প্রধান বাক্‌সূত্র : বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত বড়ো জিনিসকে ছোটো দেখাইবার জন্য নির্মিত যন্ত্রস্বরূপ—বিদ্যাসাগরের মূর্তি ধবলগিরির ন্যায়।]

বিদ্যাসাগর-চরিত

অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছোটো জিনিসকে বড়ো করে তোলে। বিদ্যাসাগরের সুমহান্ চরিত্র যেন ঠিক এর বিপরীত যন্ত্র। অর্থাৎ তাঁর সুমহান্ চরিত্রের পাশে তথাকথিত বিখ্যাত ব্যক্তিরাও ক্ষুদ্র বলে প্রতিভাত হয়। বিদ্যাসাগর-চরিত্র একমাত্র হিমগিরির সঙ্গেই তুলনীয়।

১৬। Art-এর একটা লক্ষণ আড়ম্বর-শূন্যতা—Simplicity। অনাবশ্যক রঙ-তুলির কল-কারখানা, দোয়াত-কলম, বাজনা-বাদ্যি সে মোটেই সয় না। এক তুলি এক কাগজ একটু জল একটি কাজললতা—এই আয়োজন করেই পূর্বের বড়ো বড়ো চিত্রকর অমর হয়ে গেলেন। কবীর এর চেয়ে কমে চলে গেলেন। কাগজ আর কলম কিংবা তাও নয়—একতারা কি বাঁশি অথবা তাও থাক, শুধু সুর। সহজকে ধরার সহজ ফাঁদ। এই ফাঁদ নিয়েই সবাই তারা চললেন—কেউ সোনার মৃগ কেউ সোনার পদ্মের সন্ধানে। এ যেন রূপকথার রাজপুত্রের যাত্রা স্বপ্নপুরীর রাজকুমারীর দিকে; সাজ নেই সরঞ্জাম নেই সাথী-সহচর কেউ নেই। একা গিয়ে দাঁড়ালেন অপরিমিত রস-সাগরের ধারে, মনের পাল সুবাতাসে ভরে উঠলো তো ঠিকানা পেয়ে গেলাম! মাটির ঢেলা-পাথরের টুকরো—সিঁদুর কাজল এরাই হয়ে উঠলো অসীম রস আর রহস্যের আধার।

[প্রধান বাক্‌সূত্র : Art-এর প্রধান লক্ষণ আড়ম্বর শূন্যতা—মাটির ঢেলা-পাথরের টুকরো—সিঁদুর কাজল এরাই হয়ে উঠল অসীম রস আর রহস্যের আধার।]

রূপ থেকে রূপাতীতের সন্ধানে

শিল্পের মূল কথা আড়ম্বরহীনতা। সাধারণ বস্তুর মধ্যে দিয়ে অসাধারণকে লাভ করার প্রয়াস প্রাচ্যের শিল্পীদের মধ্যে দেখা যায়। শিল্পী থেকে সাধক সকলেই সাধারণ থেকে অরূপরতনের সন্ধানে যাত্রা করেছেন। তাই তাঁদের ধ্যানদৃষ্টিতে সাধারণ হয়ে উঠেছে অসাধারণ।

১৭। জীবনের সুখ-দুঃখের স্মৃতিতে মুখ লুকাইয়া একবারও কাঁদে নাই, সংসারে এরূপ লোক দেখা যায় না। সকল মনুষ্যেরই হৃদয়-তন্ত্রীতে এক একটি সুর কেমন লাগিয়া থাকে; সেই সুরে যেদিন আঘাত পড়ে, সেই দিন সহসা যেন তাহার জীবনে

কি পরিবর্তন সাধিত হয়, তাহার হৃদয়ে মর্মে কি যেন তড়িৎ-স্রোত ছুটিয়া বেড়ায়; আপনাকে কোথাও যেন ধরিতে পাইয়া সে একবার পশ্চাতে ফিরিয়া দেখে, তাহার নয়ন বাহিয়া অশ্রু ঝরিতে থাকে। কিন্তু কোন খানে কবে কি আঘাত লাগিয়া তাহার হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠে সে কি তাহা বুঝিতে পারে? সে আপনার মনে কাঁদিয়া যায়, না কাঁদিয়া সে থাকিতে পারে না।

[প্রধান বাক্‌সূত্র : সুখদুঃখের স্মৃতি—হৃদয়তন্ত্রীতে এক-একটি সুর—হৃদয়চাঞ্চল্য—আপনার মনে কান্না।]

স্মৃতি-বেদনা

আমাদের হৃদয়-বীণার তারে অতীতের কত বিচিত্র সুর বাঁধা থাকে। সেই তারের উপর যখন আঘাত পড়ে তখন অতীতের আনন্দ-বেদনার স্মৃতি-অনুষঙ্গে মন ভরে ওঠে। এমন মুহূর্ত প্রত্যেক মানুষের জীবনেই আসে, অতীত-চারিতা চোখের জল হয়ে দেখা দেয়। ঠিক কোন্ কারণে এই বেদনা তা থাকে অনির্দেশ্য।

১৮। আমার মন কোথায় গেল? কে লইল? কই, যেখানে আমার মন ছিল সেখানে ত নাই। যেখানে রাখিয়াছিলাম সেখানে নাই। কে চুরি করিল? কই, সাত পৃথিবী খুঁজিয়াও আমার 'মনচোর' কাহাকে পাইলাম না। তবে কে চুরি করিল?

একজন বন্ধু বলিলেন, দেখ, পাকশালা খুঁজিয়া দেখ, সেখানে তোমার মন পড়িয়া থাকিতে পারে। মানি পাকের ঘরে আমার মন পড়িয়া থাকিত। যেখানে পোলাও, কাবাব, কোফতার সুগন্ধ, যেখানে ডেক্‌চী-সমারূঢ় অন্নপূর্ণার মৃদুমৃদু ফুট ফুট বুট বুট—টকবকোধ্বনি, সেইখানে আমার মন পড়িয়া থাকিত! যেখানে ইলিস মৎস্য, সতৈল অভিষেকের পর ঝোলগঙ্গায় স্নান করিয়া, মৃন্ময়, কাংস্যময়, কাচময় বা রজতময় সিংহাসনে উপবেশন করেন, সেইখানেই আমার মন প্রণত হইয়া পড়িয়া থাকে, ভক্তি-রসে অভিভূত হইয়া, সেই তীর্থস্থান আর ছাড়িতে চায় না। যেখানে ছাগনন্দন, দ্বিতীয় দধীচির ন্যায় পরোপকারার্থ আপন অস্থি সমর্পণ করেন, যেখানে মাংসসংযুক্ত সেই অস্থিতে কোরমা-রূপ বজ্র নির্মিত হইয়া, ক্ষুধারূপ বৃত্রাসুর-বধের জন্য প্রস্তুত থাকে, আমার মন সেইখানেই ইন্দ্রত্বলাভের জন্য বসিয়া থাকে। যেখানে পাচকরূপী বিষ্ণুকর্তৃক, লুচিরূপ সুদর্শন চক্র পরিত্যক্ত হয়, আমার মন সেইখানেই গিয়া বিষ্ণুভক্ত হইয়া দাঁড়ায়। অথবা যে আকাশে লুচি-চন্দ্রের উদয় হয়, সেইখানেই আমার মন-রাহু গিয়া তাহাকে গ্রাস করিতে চায়। অন্যে যাহা বলে বলুক, আমি লুচিকেই অখণ্ড মণ্ডলাকার বলিয়া থাকি। যেইখানে সন্দেশরূপ শালগ্রামের বিরাজ আমার মন সেইখানেই পূজক। হালদারদিগের বাড়ীর রামমণি দেখিতে অতি কুৎসিতা, এবং তাহার বয়ঃক্রম ষাট্ বৎসর, কিন্তু রাঁধে ভাল এবং পরিবেশনে মুক্তহস্তা বলিয়া, আমার মন তাহার সঙ্গে প্রসক্তি করিতে চাহিয়াছিল। কেবল রামমণির সজ্ঞানে গঙ্গালাভ হওয়ায় এটি ঘটে নাই।

সুহৃদের প্রবর্তনায় পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, সেখানে পাইলাম না।

পলান্ন, কোফ্‌তা প্রভৃতি অধিষ্ঠাতৃদেবগণ জিজ্ঞাসায় বলিলেন, তাঁহারা কেহ আমার মন চুরি করেন নাই। [কমলাকান্তের দপ্তর : আমার মন—বঙ্কিমচন্দ্র]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : মন কোথা গেল—পাকের ঘরে মন পড়িয়া থাকিত—সুহৃদের প্রবর্তনায় পাকশালায় মনের সন্ধান করিলাম, পাইলাম না।]

হারানো মনের খোঁজে

মনহারানো মানুষটি মুশকিলে পড়লেন। কোথায় গেল মন। মানুষটি ভোজন-রসিক তাই মনের খোঁজ পড়ল রান্নাঘরে। কারণ সেখানে নানা সুখাদ্য রসনাতৃপ্তির জন্যে অপেক্ষা করে থাকে, তাই সময়ে সময়ে তাঁর মন ছুটে যেত। ভালো রাঁধে বলে কুৎসিতা রামমণিকেও তাঁর অপূর্ব সুন্দরী মনে হত। কিন্তু ভোজনরসিক হলেও আজ তিনি অনুভব করলেন মন রান্নাঘরে যায় নি। তার জন্যে অন্যত্র অনুসন্ধান চালাতে হবে।

১৯। দেখিলাম অকস্মাৎ কালের স্রোত, দিগন্ত ব্যাপিয়া প্রবল বেগে ছুটিতেছে—আমি ভেলায় চড়িয়া যাইতেছিলাম—দেখিলাম অনন্ত, অকূল, অন্ধকারে, বাত্যাবিক্ষুব্ধ তরঙ্গ-সঙ্কুল সেই স্রোত—মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল নক্ষত্রগণ উদয় হইতেছে, নিবিতেছে—আবার উঠিতেছে। আমি নিতান্ত একা-একা বলিয়া ভয় করিতে লাগিল—নিতান্ত একা—মাতৃ-হীন—মা! মা! করিয়া ডাকিতেছি। আমি এই কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা। কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্‌মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে, দূর-প্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা। জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে! এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃন্ময়ী—মৃত্তিকারূপিণী—অনন্তরত্ন ভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিদ্রিতা। রত্নমণ্ডিত দশ ভুজ—দশ দিক্—দশ দিকে প্রসারিত, তাহাতে নানা আয়ুধরূপে নানা শক্তি শোভিত, পদতলে শত্রু-বিমর্দিত বীরজন-কেশরী শত্রু-নিষ্পীড়নে নিযুক্ত! এ মূর্তি এখন দেখিব না—আজি দেখিব না, কাল দেখিব না—কালস্রোত পার না হইলে দেখিব না—কিন্তু এক দিন দেখিব—দিগ্‌-ভুজা, প্রহরণ-প্রহারিণী, শত্রুমর্দিনী, বীরেন্দ্রপৃষ্ঠবিহারিণী—দক্ষিণে লক্ষ্মী ভাগ্যরূপিণী, বামে বিদ্যাবিজ্ঞানমূর্তিময়ী, সঙ্গে বলরূপী কার্তিকেয়, কার্যসিদ্ধিরূপী গণেশ, আমি সেই কালস্রোতোমধ্যে দেখিলাম, এই সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা!

[কমলাকান্তের দপ্তর : আমার দুর্গোৎসব—বঙ্কিমচন্দ্র]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : আমি কালসমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা—চিনিলাম এই আমার জননী জন্মভূমি—একদিন দেখিব দিগ্‌ভুজা সুবর্ণময়ী বঙ্গপ্রতিমা]

জন্মভূমির ভাবমূর্তি

লেখক মানসনেত্রে মাতৃমূর্তি অবলোকন করলেন। এই মা হলেন তাঁর জন্মভূমি। চারিদিকে বাদ্যধ্বনির মধ্যে প্রভাতসূর্যের মত দিব্যজ্যোতি বিকীর্ণ করে কালসমুদ্রের জলরাশির উপর ভাসমান শারদীয়া প্রতিমা তিনি দেখতে পেলেন। লেখকের মানস-লোকের জননী জন্মভূমি। তাঁর বিশ্বাস এই জননীমূর্তিই একদিন বাস্তবে দেখা দেবেন।

২০। অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত, কিন্তু অন্যকারণে তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ নয়। ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করিব না, কিন্তু আমি ভাল থাকিব, আমারগুলি ভাল থাকিবে, এই বাসনা তাঁহাদের মনে বড় প্রবল! আমার ধন হউক, আমার মান হউক, আমার সম্পদ হউক, আমার যশ হউক, আমার সৌভাগ্য হউক, আমি বড় হই আর সবাই আমার অপেক্ষা ছোট হউক, তাঁহারা এইরূপ কামনা করেন। এই সকল অভীষ্ট যাহাতে সিদ্ধ হয়, চিরকালের অনুদিন সেই চেষ্টায়, সেই উদ্যোগে ব্যস্ত থাকেন। সে জন্য না করেন এমন কাজ নাই, তদ্ভিন্ন মন দেন, এমন বিষয় নাই। যাহারা ইন্দ্রিয়াসক্ত, তাহাদের অপেক্ষাও ইহারা নিকৃষ্ট। ইহাদের নিকট ধর্ম কিছুই নহে, জ্ঞান কিছুই নহে, ভক্তি কিছুই নহে। তাঁহারা ঈশ্বর জানিলেও কার্যতঃ তাঁহাদের কাছে ঈশ্বর নাই, জগৎ থাকিলেও, তাঁহাদের কাছে জগৎ নাই, কেবল আপনিই আছেন, আপনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। ইন্দ্রিয়াসক্তির অপেক্ষাও এই আত্মার, এই স্বার্থপরতা, চিত্তশুদ্ধির গুরুতর বিঘ্ন। পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই। যখন আপনি যেমন, পর তেমন এই কথা বুঝিব, যখন আপনার সুখ যেমন খুঁজিব, পরের সুখ তেমনি খুঁজিব, যখন আপনা হইতে পরকে ভিন্ন ভাবিব না, যখন আপনার অপেক্ষাও পরকে আপনার ভাবিব, যখন ক্রমশঃ আপনাকে ভুলিয়া গিয়া, পরকে সর্বস্ব জ্ঞান করিতে পারিব, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি হইবে। [চিত্তশুদ্ধি, বিবিধ প্রবন্ধ : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : অনেকের ইন্দ্রিয় সংযত কিন্তু চিত্ত শুদ্ধ নয়। পরার্থপরতা ভিন্ন চিত্তশুদ্ধি নাই, যখন আমার আত্মা এই বিশ্বব্যাপী বিশ্বময় হইবে, তখনই চিত্তশুদ্ধি ঘটবে।]

পরার্থপরতাই চিত্তশুদ্ধির পথ

যশ-মান-সৌভাগ্যের কামনায় যদি মন আচ্ছন্ন থাকে তা হলে কেবল ইন্দ্রিয় জয় করেই চিত্তশুদ্ধি ঘটে না। অন্যকে ছোটো করে যারা বড়ো হবার চেষ্টায় ব্যস্ত তারা ইন্দ্রিয়াসক্ত মানুষ অপেক্ষা নিম্নস্তরের। তাদের কাছে ধর্ম, কর্ম, জ্ঞান, ভক্তি—সবই মূল্যহীন। এই স্বার্থপরতা চিত্তশুদ্ধির অন্তরায়। মানুষ যেদিন পরকে আপন করতে পারবে, পরের সুখ-দুঃখকে পারবে নিজের করতে, তখনই হবে চিত্তের শুদ্ধি। চিত্তশুদ্ধির জন্যে সংসারবৈরাগ্যের প্রয়োজন নেই, কেবল পরের সুখ-দুঃখকে নিজের করে নিতে পারলেই চরম ভোগের মধ্যেও ঘটে চিত্তশুদ্ধি।

২১। প্রতিদিন আলোক এবং অন্ধকার, নিদ্রা এবং জাগরণ, সংকোচন এবং প্রসারণের মধ্য দিয়ে আমাদের জীবন চলেছে—একবার তার জোয়ার, একবার তার ভাঁটা। রাত্রে নিদ্রার সময় আমাদের সমস্ত ইন্দ্রিয়মনের শক্তি আমাদের নিজের মধ্যেই সংহৃত হয়ে আসে। সকালবেলায় সমস্ত জগতের দিকে ধাবিত হয়।

শক্তি যখন কেবল আমাদের নিজের মধ্যে সমাহৃত হয় সেই সময়েই কি আমরা নিজেকে বেশি করে জানি, বেশি করে পাই? আর সকালে যখন আমাদের শক্তি অন্যের দিকে নানাপথে বিকীর্ণ হতে থাকে তখনই কি আমরা নিজেকে হারাই?

ঠিক তার উল্টো। কেবল নিজের মধ্যে যখন আমরা আসি তখন আমরা অচেতন, যখন সকলের দিকে যাই তখন আমরা জাগ্রত, তখনই আমরা নিজেকে জানি। যখন আমরা একা তখন আমরা কেউ নই।

আমাদের যথার্থ তাৎপর্য আমাদের নিজেদের মধ্যে নেই, তা জগতের সমস্তের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। সেইজন্যে আমরা বুদ্ধি দিয়ে, হৃদয় দিয়ে, কর্ম দিয়ে কেবলই সমস্তকে খুঁজছি; কেবলই সমস্তের সঙ্গে যুক্ত হতে চাচ্ছি; নইলে যে নিজেকে পাই নে। আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করব, এই হচ্ছে আত্মার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা।

আপেল ফলের পতনশক্তিকে যখন জ্ঞানী বিশ্বের সকল বস্তুর মধ্যেই দর্শন করলেন তখন তাঁর বুদ্ধি অত্যন্ত পরিতৃপ্ত হল। কারণ, সত্যকে সর্বত্র দেখলেই তার সত্যমূর্তি প্রকাশ পায় এবং সেই মূর্তিই আমাদের আনন্দ দান করে। তেমনি আমরা আমাদের নিজেকে সর্বত্র ব্যাপ্ত দেখব এই হলেই নিজেকে সত্যরূপে দেখা হয়। নিজের এই সত্যকে যতই ব্যাপক করে জানব ততই আমাদের আনন্দ হবে। যে কেউ আমাদের আপনাকে তার নিজের ভিতর থেকে বাইরের দিকে টেনে নিয়ে তাকে আমাদের কাছে সত্যতররূপে প্রকাশ করে তাকেই আমরা আত্মীয় বলি, সেই আমাদের আনন্দ দেয়।

[দিন : শান্তিনিকেতন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : নিজের মধ্যে যখন আসি তখন আমরা অচেতন, যখন সকলের দিকে যাই তখন জাগ্রত—আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করি—(এই উপলব্ধিই) আমাদের আনন্দ দেয়।]

সর্বত্র আত্মোপলব্ধি

মনে হতে পারে শক্তির সংকোচনটাই সঞ্চয় আর বিস্তারটাই অপচয়। কিন্তু ব্যাপারটা ঠিক উল্টো। জাগরণে আমরা সকলের সঙ্গে যুক্ত, নিদ্রায় সবকিছু থেকে বিযুক্ত। সকলের সঙ্গে যুক্ত হয়েই আমরা আত্মাকে সর্বত্র উপলব্ধি করি। কোনো বিশেষ শক্তিকে প্রকৃতির সর্বত্র কার্যকর দেখে বিজ্ঞানীর যে আনন্দ, নিজেকে সর্বত্র উপলব্ধি করেও মানুষের তেমনি আনন্দ। আর এই আত্ম-দর্শনই সত্য-উপলব্ধি।

২২। বৌদ্ধযুগ ভারত-ইতিহাসের একটি প্রধান যুগ। ইহা আর্য-ভারতবর্ষ হিন্দু-ভারতবর্ষের মাঝখানকার যুগ। আর্যযুগে ভারতের আগন্তুক ও আদিম অধিবাসীদের

মধ্যে বিরোধ চলিতেছিল। বৌদ্ধযুগে সেই-সকল বিরুদ্ধ জাতিদের মাঝখানকার বেড়াগুলি এক ধর্মবন্যায় ভাঙিয়াছিল—শুধু তাই নয়, বাহিরের নানা জাতি এই ধর্মের আহ্বানে ভারতবাসীদের সঙ্গে মিশিয়াছিল। তার পরে এই মিশ্রণকে যথাসম্ভব স্বীকার করিয়া এবং ইহাকে লইয়া একটা ব্যবস্থা খাড়া করিয়া আধুনিক হিন্দুযুগ মাথা তুলিয়াছে। বৈদিক যুগ এবং হিন্দু যুগের মধ্যে আচারে ও পূজাতন্ত্রে যে গুরুতর পার্থক্য আছে তাহার মাঝখানের সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ। এই যুগে আর্য ও অনার্য এক গণ্ডির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। ইহার ফলে উভয়ের মানসপ্রকৃতি ও বাহ্য আচারের মধ্যে আদানপ্রদান ও রফানিষ্পত্তির চেষ্টা হইতে থাকে। কাজটা অত্যন্ত কঠিন; তাই সকল দিকেই বেশ সুসংগত রকমে রফা হইয়া গিয়াছে তাহাও বলিতে পারি না। আভ্যন্তরিক নানা অসংগতির জন্য আমরা অন্তরে বাহিরে দুর্বল রহিয়াছি; সামাজিক ব্যবহারে এবং ধর্মবিশ্বাসে পদে পদেই বিচারবুদ্ধিকে অন্ধ করিয়া আমাদিগকে চলিতে হয়—যাহা কিছু আছে তাহাকে বুদ্ধির দ্বারা মিশাইয়া লওয়া নহে, অভ্যাসের দ্বারা মানিয়া লওয়াই আমরা প্রধানত আশ্রয় করিয়াছি।

[ভারত-ইতিহাস-চর্চা : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : বৈদিকযুগ এবং হিন্দুযুগের সন্ধিস্থল বৌদ্ধযুগ—উভয়ের মানস-গ্রহণ ও বাহ্য আচারের আদানপ্রদান—নানা অসংগতির জন্য অন্তরে বাহিরে দুর্বল রহিয়াছি—বুদ্ধির দ্বারা নহে, অভ্যাসের দ্বারা মানিয়া লওয়াই আশ্রয় করিয়াছি।]

সংস্কৃতিসমন্বয়ে বিচারবুদ্ধির প্রয়োগ

আর্য এবং হিন্দুযুগের মাঝখানে এক সমন্বয়ের যুগ হল বৌদ্ধযুগ। এক ধর্মের আহ্বানে যেমন জাতিভেদ দূর হয়েছে, তেমনি বিশ্বের নানাজাতি এসে মিলেছে ভারতের সঙ্গে। এই মিলনের বেদীর উপরেই হিন্দু যুগের জন্ম। বৈদিক সংস্কৃতির সঙ্গে হিন্দু সংস্কারের এবং আর্যের সঙ্গে অনার্যের মিলন-সেতু—বৌদ্ধ যুগ। এই দুরূহ মিলনের মধ্যে নানা ত্রুটি বর্তমান। ফলে ভিতরের অসংগতি আমাদের করেছে দুর্বল। বুদ্ধির দ্বারা চালিত না হয়ে অনেক সময় আমরা চলেছি অন্ধ সংস্কারবশে। তাই বিশ্লেষণী ক্ষমতা হারিয়ে আমরা চিরাচরিত প্রথার দাসত্ব করে এসেছি।

২৩। যাহাতে প্রাণে ভাল হইবার জন্য প্রগাঢ় আবেগ জন্মে, তজ্জন্য চেষ্টা করা কর্তব্য। ভাল হইতে যাঁহার বলবতী ইচ্ছা আছে, ঈর্ষা তাঁহার ভিতরে কার্য করিবার অবকাশ পায়-না। ভাল হইবার জন্য যাঁহার হৃদয় ব্যাকুল হয়, তিনি সর্বদা পরের গুণকাহিনী শুনিয়া পরের ভাল দেখিয়া দেখিয়া আপনাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন। পরের দিকে কুদৃষ্টিতে তাকাইবার তাঁহার সময় থাকে না, পরের মন্দচিন্তা যে নিজের ভাল হইবার পথে কণ্টক, তাহা তিনি বিশেষভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। যে অপর কোন ব্যক্তির প্রতি ঈর্ষান্বিত, তাহার মন সর্ব্বদা সেই ব্যক্তির অনিষ্ট করিবার জন্য ধাবিত হয়, তাহার আর ভাল হইবার অবসর থাকে কোথায়? যাহার হৃদয়ে ভাল হইবার ইচ্ছা প্রবল, তিনি পরের ভাল দেখিলে অমনি সেই ভালটুকু নিজের জীবনে

আয়ত্ত করিতে সচেষ্ট হন। তাঁহার মনে অপরকে অবনত করিয়া আপনার সমান না করিয়া, নিজে উন্নত হইয়া অপরের সমান হইবার জন্য যত্ন হয়। যে ব্যক্তি মাৎসর্যের দাস, সে নিজের উন্নতি ভুলিয়া পরের অবনতি কামনা করে। যাঁহার প্রাণে মাৎসর্য নাই, তিনি মনে করেন, 'অন্যকে নামাইয়া আমার সমান না করিয়া আমি কেন উঠিয়া তাঁহার সমান না হই ?' তাঁহার ঈর্ষার নাম শুনিতেও লজ্জা হয়।

[ভক্তিযোগ : অশ্বিনীকুমার দত্ত]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : ভালো হইবার জন্য যাহাদের হৃদয় ব্যাকুল তিনি—আপনাকে উন্নত করিবার চেষ্টা করেন।—যাহার প্রাণে মাৎসর্য নাই, তাঁহার ঈর্ষার নাম নিতেও লজ্জা।]

ঈর্ষাজয়ে আত্মোৎকর্ষবাসনা

ভালো হবার ইচ্ছা প্রবল হলে ঈর্ষা এসে মনের মধ্যে বাসা বাঁধতে পারে না। মহৎ গুণগুলি জীবনে গ্রহণ করতে গিয়েই পরের অমঙ্গল চিন্তা করার সময় থাকে না, কিন্তু অন্যের ক্ষতি করার চিন্তা মনে থাকলে ফল হয় ঠিক তার বিপরীত। যাদের মনে মাৎসর্য প্রবল তারাই নিজের উন্নতির কথা ভুলে গিয়ে অপরের ক্ষতি করার চিন্তায় বিভোর হয়ে থাকে। আর মাৎসর্যহীন মানুষ নিজের উন্নতির জন্য সচেষ্ট থাকেন বলে অপরের উন্নতি দেখে ঈর্ষান্বিত হন না।

২৪। অভ্যাস কার্যসমষ্টিজাত। একটি কার্য বারংবার সম্পাদন করিলে তৎসম্পাদন পূর্বাপেক্ষা অল্পায়াসসাধ্য হয় এবং তৎপক্ষে প্রবল প্রবৃত্তি ও দক্ষতা জন্মে। যে বারংবার অনুষ্টুপ লিখে, সে সহজে অনুষ্টুপ্ লিখিতে পারিবে, কিন্তু বাল্মীকি হইতে পারিবে না।

অভ্যস্ত বিদ্যা পুরাতনাতিরিক্ত হইতে পারে না। লোকে যাহা করিয়াছে, অভ্যাস দ্বারা তাহাতেই পারদর্শী হওয়া যায়। কিন্তু যে 'নূতন সৃষ্টি' প্রতিভার অন্তরাত্মাস্বরূপ তাহা অভ্যাস কোথা পাইবে ? আমি ভাস্করাচার্যের সিদ্ধান্তশিরোমণি বা নিউটনের প্রিন্সিপিয়া অভ্যাস করিতে পারি ; কিন্তু তাদৃশ অভ্যাস-দ্বারা তাঁহাদিগের নিরূপিত তত্ত্বগুলিই জানিতে পারিব, অভিনব তত্ত্বের আবিষ্কার করিতে পারিব না।

যাঁহারা বিবেচনা করেন প্রতিভা মনোযোগমাত্র, তাঁহাদিগেরও বিষম ভ্রম। যে বিষয়ে যে পরিমাণে মনোনিবেশ করা যায়, সে বিষয়ের সেই পরিমাণে স্মরণ থাকে। কিন্তু স্মরণ দ্বারা পূর্বপরিচিত তত্ত্বের পুনরুদ্ধার হয়, নূতন তত্ত্বের আবিষ্কার হয় না। সুতরাং প্রতিভার যেটি প্রধান লক্ষণ, মনোযোগে সেটি নাই। কাজে কাজেই প্রতিভাকে মনোযোগমাত্র বলা যাইতে পারে না।

যদিও মনোযোগ বা অভ্যাস প্রতিভার অঙ্গস্বরূপ নহে তথাপি তাহার প্রয়োজনীয় সহকারী। যিনি কোনো বিষয়ে নূতন তত্ত্ব প্রকাশ করিতে চাহেন, তাঁহার তদ্‌বিষয়ক পুরাতন তত্ত্বগুলি জানা আবশ্যক। পুরাতন-তত্ত্ব-সংগ্রহের জন্যে মনোযোগ ও অভ্যাসের প্রয়োজন।

[প্রতিভা—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : অভ্যাস কার্যসমষ্টিজাত—স্মরণদ্বারা পূর্বপরিচিত তত্ত্বের পুনরুদ্ধার হয়—মনোযোগ বা অভ্যাস প্রতিভার অঙ্গস্বরূপ নহে—তথাপি তাহার সহকারী।]

প্রতিভার স্বরূপ

প্রতিভাকে অভ্যাস বলা যায় না, কারণ বার বার এক কাজ করলে দক্ষতা আসে, কিন্তু নতুন স্থষ্টির ক্ষমতা তাতে আসে না। প্রতিভার লক্ষণই হচ্ছে নতুন স্থষ্টি। অন্যের উদ্ভাবিত তত্ত্ব অভ্যাসে আয়ত্ত হতে পারে কিন্তু নতুন তত্ত্ব উদ্ভাবনের ক্ষমতা জন্মায় না। ঠিক একই কারণে মনোযোগকে অভ্যাস বলা যায় না। মনোযোগ যে-কোন বিষয়ের অবধারণে প্রয়োজন সন্দেহ নাই, কিন্তু তাতে বিষয়দক্ষতা এলেও নতুন স্থষ্টির ক্ষমতা আসে না। তবে অভ্যাস ও মনোযোগ প্রতিভা না হলেও প্রতিভা বিকাশের সহায়ক, কারণ নূতন উদ্ভাবনের জন্যে পুরাতন তত্ত্বকে জানা চাই।

২৫। সমাজের দেনা কিরূপে শোধ দেওয়া যাইতে পারে ? তাহার উত্তর এই সমাজের উপকার কর।

কিন্তু মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্যসাধন শুধু এই হইলেই হইবে না, বৃদ্ধ অবস্থায় খতাইয়া দেখ, যদি তোমার দেনা থাকে, তুমি মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য সাধন করিতে পার নাই। যদি ঠিক ঠিক হয়, তুমি আপনার কর্তব্য কর্ম করিয়াছ মাত্র ; কিন্তু যদি তোমার হিসাবে বেশী থাকে; তবে তোমার জীবন সার্থক। যত বেশী থাকিবে, ততই তোমার বাহবা। নিজ বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা পার, পরিশ্রমের দ্বারা পার, ধন দ্বারা পার, কর্তব্য যাহা আছে তাহার অপেক্ষা সমাজের অধিক উপকার করিলেই তোমার মনুষ্য জীবন সার্থক।

সেকালে এক গল্প শুনিয়াছি, এক রাজার এক মন্ত্রী ছিল। তাহার বেতন লক্ষ টাকা। তাহাকে রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন 'মন্ত্রিবর, তোমার এত টাকার কি দরকার ?' সে বলিল, "মহারাজ, ইহার চৌথ শোধ দিতে হয়, চৌথ ধার দিতে হয়, চৌথ আহার করা যায়, আর চৌথ অসময়ের জন্য সংগ্রহ করি।" মন্ত্রিবর ঠিক বলিয়াছিলেন। যে লোক ধার শোধ দিয়া ও ধার দিয়া যাইতে পারে, সে-ই ধন্য। মনুষ্য জীবনের দেনা যাহার নিকট হইতে লইয়াছি, তাহাকেই শোধ দিতে হইবে, তাহা নহে।

লইলাম সমাজের নিকট, দিলাম সমাজকে, পিতামাতার খাইয়া মানুষ হইলাম, মানুষ করিলাম সন্তানকে। দাতার খাইয়া মানুষ হইলাম, দিলাম অনাথকে। দরিদ্রালয় হইতে মানুষ হইলাম, স্থাপন করিলাম বিদ্যালয়। গুরুর নিকট উপদেশ পাইলাম, শিক্ষা দিলাম ছাত্রকে। গ্রন্থকারের নিকট উপদেশ পাইলাম, নিজে গ্রন্থ পাঠ করিয়া রচনা করিয়া তাহার ঋণ শোধ দিলাম। কিন্তু সর্বত্র চেষ্টা করা উচিত, যাহা পাইয়াছি তাহা অপেক্ষা অধিক দেওয়া। [সমাজের ঋণ : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : সমাজের দেনা শোধ সমাজের উপকারে—যদি তোমার হিসাবে বেশি থাকে জীবন সার্থক—যাহার নিকট লইয়াছি তাহাকেই শোধ দিতে হইবে তাহা নহে—উদাহরণ।]

সমাজের ঋণশোধ

সমাজের কাছে আমরা নানাভাবে ঋণী। এই ঋণ শুধু শোধ করা নয়, যতটা নিয়েছি তার চেয়ে বেশি দিয়ে যেতে পারলে তবেই আমাদের গৌরব। যে ধার দিয়ে যেতে পারে তার জীবনই সার্থক। সমাজের ঋন কি-ভাবে শোধ দেব তা নিয়েও ভাবনার কিছু নেই। যার কাছ থেকে নিয়েছি তাকে না দিয়ে অন্যকে দিলেও চলবে। বাপ-মায়ের ঋণশোধ হবে নিজের সন্তান মানুষ করে, দাতার ঋণ শোধ করব দুঃখী মানুষের উপকার করে। গুরুর ঋণ শোধ করব ছাত্রকে বিদ্যাদান করে। গ্রন্থপ্রণেতার ঋণ শোধ হবে গ্রন্থপাঠ আর সদ্‌গ্রন্থরচনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই মন্ত্র হবে: যা নিয়েছি তার চেয়ে বেশি দেব।

২৬। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ ইস্পাত, মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে কে সেই, একচোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা—সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল—ঐ এক চাল নকল করে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায়,—লক্ষণ।

যদি বল ও কথা বেশ; তবে বাঙ্গালাদেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ ক'রব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম যে দিক্‌ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্‌ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে, তত পূর্ব পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম হতে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কোন্‌ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশী নিকট, সে কথা হচ্ছে না—কোন্‌ ভাষা জিতেছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালাদেশের ভাষা হয়ে যাবে তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে কথা কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান অবশ্যই কলকেতার ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে।

[বাঙ্গালা ভাষা : স্বামী বিবেকানন্দ]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : ভাষা যেমন সাফ ইস্পাত—সংস্কৃতর গদাই লস্করী চাল অনুকরণে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে—রকমারি ভাষা—যেটি বলবান সেইটিই নিতে হবে—ঈর্ষাটি ভাসান দিতে হবে।]

বাঙালীর ভাষা

ভাষা হবে ইস্পাতের মত ধারে ভারে কার্যক্ষম। কিন্তু সংস্কৃতের অন্ধ অনুকরণ করতে গিয়ে আমাদের ভাষার স্বাভাবিকতা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। হয়তো প্রশ্ন জাগতে পারে অঞ্চলভেদে বিভিন্ন ভাষার মধ্যে কোন্‌টিকে বাঙালী গ্রহণ করবে? উত্তরে বলা চলে

প্রকৃতির নিয়মে যে-ভাষা জয়লাভ করেছে, সেই কলকাতার ভাষাই একদিন বাঙালীর লেখ্য আর কথ্য ভাষায় পরিণত হবে। আঞ্চলিক স্বার্থকে বৃহৎ স্বার্থের কাছে বিসর্জন দিতে হবে।

২৭। মহান হিন্দু সংস্কারক রাজা রামমোহন রায় নিস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর সমুদয় জীবনটা ভারতের সাহায্যকল্পে অর্পণ করেছিলেন। তিনিই সতীদাহ-প্রথা বন্ধ করেন। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস, এই সংস্কারকার্য সম্পূর্ণরূপে ইংরেজদের দ্বারা সাধিত, কিন্তু-প্রকৃতপক্ষে তা নয়। রাজা রামমোহন রায় এই প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করেন এবং একে রহিত করবার জন্য গভর্ণমেণ্টের সহায়তালাভে কৃতকার্য হন। যতদিন না তিনি আন্দোলন আরম্ভ করেছিলেন, ততদিন ইংরেজরা কিছুই করে নি। তিনি 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে বিখ্যাত ধর্মসমাজও স্থাপন করেন, আর একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ৩ লক্ষ টাকা চাঁদা দেন। তিনি তারপর সরে এলেন এবং বললেন, 'আমাকে ছেড়ে তোমরা নিজেরাই এগিয়ে যাও।' তিনি নাম যশ একদম চাইতেন না, নিজের জন্য কোনরূপ ফলাকাঙ্ক্ষা করতেন না।

[দেববাণী : স্বামী বিবেকানন্দ]

[প্রধান বাক্যসূত্র : রামমোহন নিঃস্বার্থ কর্মের অদ্ভুত দৃষ্টান্ত—সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেন—ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন—একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ৩ লক্ষ টাকা চাঁদা দেন—ফলাকাঙ্ক্ষা ছিল না।]

নিঃস্বার্থ রামমোহন

রামমোহন রায় দেশের কাজে জীবন অতিবাহিত করে নিঃস্বার্থ কর্মের দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনিই প্রথম সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করে ইংরেজ গভর্ণমেণ্টের সহায়তায় এই প্রথার বিলোপ করেন; ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা, একটি বিশ্ববিদ্যালয় নির্মাণকল্পে তিন লক্ষ টাকা চাঁদা দান তাঁর অন্যতম কর্ম। কিন্তু যশ-লাভের আকাঙ্ক্ষা বা ফললাভের আকাঙ্ক্ষা তার ছিল না।

২৮। রাত্রির যে একটা রূপ আছে, তাহাকে পৃথিবীর গাছপালা, পাহাড়-পর্বত, জল-মাটি, বন-জঙ্গল প্রভৃতি জাতীয় দৃশ্যমান বস্তু হইতে পৃথক করিয়া, একান্ত করিয়া দেখা যায়, ইহা যেন আজ প্রথম চোখে পড়িল। চাহিয়া দেখি, অন্তহীন কালো আকাশ-তলে পৃথিবী-জোড়া আসন করিয়া গভীর রাত্রি নিমীলিত-চক্ষে ধ্যানে বসিয়াছে, আর সমস্ত বিশ্ব চরাচর মুখ বুঁজিয়া নিশ্বাস রুদ্ধ করিয়া অত্যন্ত সাবধানে স্তব্ধ হইয়া সেই অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে। হঠাৎ চোখের উপরে যেন সৌন্দর্যের তরঙ্গ খেলিয়া গেল। মনে হইল, কোন মিথ্যাবাদী প্রচার করিয়াছে—আলোই রূপ, আঁধারের রূপ নাই? এতবড় ফাঁকি মানুষে কেমন করিয়া নীরবে মানিয়া লইয়াছে! এই যে আকাশ বাতাস স্বর্গ-মর্ত্য পরিব্যাপ্ত করিয়া দৃষ্টির অন্তরে-বাহিরে প্লাবন বহিয়া যাইতেছে, মরি! মরি! এমন অপরূপ রূপের প্রস্রবণ আর কবে দেখিয়াছি! এ

ব্রহ্মাণ্ডে যাহা যত গভীর, যত অচিন্ত্য, যত সীমাহীন—তাহা ত ততই অন্ধকার। অগাধ বারিধি মসী-কৃষ্ণ; অগম্য গহন অরণ্যানী ভীষণ আঁধার; সর্বলোকাশ্রয়, আলোর আলো, গতির গতি, জীবনের জীবন, সকল সৌন্দর্যের প্রাণপুরুষও মানুষের চোখে নিবিড় আঁধার। কিন্তু সে কি রূপের অভাবে? যাহাকে বুঝি না, জানি না, যাহার অন্তরে প্রবেশের পথ দেখি না—তাহাই তত অন্ধকার। মৃত্যু তাই মানুষের চোখে এত কালো, তাই তার পরলোকের পথ এমন আঁধারে মগ্ন!

[শ্রীকান্ত : ১ম পর্ব—শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : রাত্রির একটা রূপ আছে—অন্তহীন কালো আকাশ ধ্যানে বসিয়াছে। বিশ্বচরাচর অটল শান্তি রক্ষা করিতেছে।—যাহা যত গভীর তাহা তত অন্ধকার—মৃত্যু তাই মানুষের চোখে কালো।]

আঁধারের রূপ

বিশ্বপ্রকৃতি থেকে আলাদা করে দেখবার মত রাত্রির-যে একটা বিশেষ রূপ আছে লেখক তা এই প্রথম উপলব্ধি করলেন। অন্ধকার রাত যেন গভীর ধ্যানে মগ্ন, আর বিশ্বচরাচর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তার জন্যে অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছে। লেখকের মনে হল—অন্ধকারের রূপ নেই আলোরই রূপ আছে, এটা মিথ্যাবাদীর প্রচার মাত্র। যা যত গভীর গহন, যার অন্তরে প্রবেশের পথ খুঁজে পাই না, যা থাকে অজানার অন্ধকারে ঢাকা—তাই তো আমাদের চোখে কালো অন্ধকার। এইজন্যে মৃত্যুর রঙ মানুষের চোখে কালো।

২৯। রামায়ণ এবং উত্তরচরিত অবলম্বন করিয়া বিদ্যাসাগর 'সীতার বনবাস' রচনা করিয়াছিলেন। রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়কের একটা অপবাদ জনসমাজে প্রসিদ্ধ আছে। কোনো একটা-কিছু ছল পাইলেই রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন। বিদ্যাসাগরের জীবনচরিত গ্রন্থের প্রায় প্রতি পাতাতেই দেখিতে পাওয়া যায়, বিদ্যাসাগর কাঁদিতেছেন। বিদ্যাসাগরের এই রোদনপ্রবণতা তাঁহার চরিত্রের একটা বিশেষ লক্ষণ। কোনো দীনদুঃখী আসিয়া দুঃখের কথা আরম্ভ করিতেই বিদ্যাসাগর কাঁদিয়া আকুল; বালিকা বিধবার মলিন মুখ দর্শনমাত্রেই বিদ্যাসাগরের বক্ষঃস্থলে গঙ্গা বহমানা, ভ্রাতার অথবা মাতার মৃত্যু-সংবাদ পাইবামাত্র বিদ্যাসাগর বালকের মতো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে থাকেন।

বিদ্যাসাগরের বাহিরটাই বজ্রের মতো কঠিন, ভিতরটা পুষ্পের অপেক্ষাও কোমল। রোদন-ব্যাপার বড়োই গর্হিত কর্ম, বিজ্ঞের নিকট ও বিরাগীর নিকট অতীব নিন্দিত। কিন্তু এইখানেই বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব, এইখানেই তাঁহার প্রাচ্যত্ব। প্রতীচ্য দেশের কথা বলিতে পারি না; কিন্তু প্রাচ্য দেশের রোদনপ্রবণতা মনুষ্যচরিত্রের যেন একটা প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরের অসাধারণত্ব এই যে, তিনি আপনার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে তৃণের অপেক্ষাও তুচ্ছ গণনা করিতেন, কিন্তু পরের জন্য রোদন না করিয়া তিনি থাকিতে

পারিতেন না। দরিদ্রের দুঃখ-দর্শনে তাঁহার হৃদয় টলিত, বান্ধবের মরণশোকে তাঁহার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিত। জ্ঞানের উপদেশ ও বৈরাগ্যের উপদেশ তাঁহার নিকট এ সময়ে ঘেঁষিতে পারিত না।

[ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : রামচন্দ্র কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইয়া ফেলেন, বিদ্যাসাগরও রোদন-প্রবণ—রোদন বিজ্ঞের নিকট নিন্দিত—কিন্তু এইখানেই তাহার প্রাচ্যত্ব—দুঃখদর্শনে ধৈর্যচ্যুতি—জ্ঞান বা বৈরাগ্যের উপদেশ নিরর্থক।]

বিদ্যাসাগরচরিত্রের প্রধান লক্ষণ

রামায়ণ ও উত্তরচরিতের নায়ক রামচন্দ্র বীর তবু তাঁর চোখে অশ্রুর বন্যা। সরল-চরিত্র ঈশ্বরচন্দ্রের চোখদুটিও সর্বদাই অশ্রুসিক্ত। পরের দুঃখ তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করত। কান্নাটাকে জ্ঞানীরা অনেক সময় দুর্বলতার লক্ষণ বলেই চিহ্নিত করেন। কিন্তু এই রোদনপ্রবণতাই বিদ্যাসাগরচরিত্রের বড়ো লক্ষণ। এইখানেই তিনি প্রাচ্যের প্রতিনিধিস্থানীয়। রোদন প্রাচ্য দেশের মানুষের স্বভাবের প্রধান অঙ্গ। বিদ্যাসাগরও নিজের দুঃখ ছাড়া, অন্য সকলের দুঃখে কান্নায় ভেঙে পড়তেন। জ্ঞান বা বৈরাগ্যের কোন উপদেশই তাঁর কান্না থামাতে পারত না

৩০। সাধারণত লোকের একটা বিশ্বাস আছে যে, বই-জিনিসটে পড়া সহজ কিন্তু লেখা কঠিন। অপর দেশে যাই হোক, এ দেশে কিন্তু নিজে বই লেখার চাইতে অপরকে পড়ানো ঢের বেশি শক্ত। শুনতে পাই যে, কোনো বইয়ের এক হাজার কপি ছাপালে এক বৎসরে তার একশোও বিক্রি হয় না। সাধারণ লেখকের কথা ছেড়ে দিলেও, নামজাদা লেখকদেরও বই বাজারে কাটে কম, কাটে বেশি পোকায়। বাংলা-দেশে লেখকের সংখ্যা বেশি কিংবা পাঠকের সংখ্যা বেশি, বলা কঠিন। এবিষয়ে যখন কোনো স্ট্যাটিস্‌টিক্‌স পাওয়া যায় না, তখন ধরে নেওয়া যেতে পারে যে, মোটা-মুটি দুই সমান। কেউ কেউ এমন কথাও বলে থাকেন যে, লেখা ও পড়া এ দুটি কাজ অনেক স্থলে একই লোকে করে থাকেন। এ কথা যদি সত্য হয়, তা হলে অধিকাংশ লেখকের পক্ষে নিজের বই পড়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। কেননা, পরের বই কিনতে পয়সা লাগে, কিন্তু নিজের বই বিনে-পয়সায় পাওয়া যায় অবশ্যই। কখনো-কখনো কোনো-কোনো বই উপহারস্বরূপে পাওয়া যায়, কিন্তু সেসব বই প্রায়ই অপাঠ্য। এরূপ অবস্থায় বঙ্গসাহিত্যের স্ফূর্তি হওয়া প্রায় একরূপ অসম্ভব। কারণ সাহিত্য-পদার্থটি যাই-হোক না কেন, বই হচ্ছে শুধু বেচাকেনার জিনিস, একেবারে কাঁচামাল। ও মাল ধরে রাখা চলে না। গাছের পাতার মতো বইয়ের পাতাও বেশিদিন টেকে না, এবং একবার ঝরে গেলে উনুন-ধরানো ছাড়া অন্য কাজে লাগে না।

[বইয়ের ব্যবসা—বীরবলের হালখাতা : প্রমথ চৌধুরী]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : নামজাদা লেখকের বইও বাজারে কাটে কম—বছরে একশো

কপিও বিক্রি হয় না—নিজের বই নিজে পড়া—সাহিত্য যাই হোক না কেন, বই কেনা-বেচার জিনিস।]

সাহিত্য ও পাঠানুরাগ

বিদেশে লেখকের তুলনায় পাঠকের সংখ্যা অনেক বেশি। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষ বই পড়ে না, তাই বছরে কোনো বইয়ের একশো কপিও বিক্রি হয় না। কেবল সাধারণ লেখক নয়, নামজাদা লেখকের অবস্থাও তাই। বাংলাদেশে লেখক আর পাঠকের সংখ্যা প্রায় সমান বলেই অনুমিত হয়। স্থানবিশেষে লেখকই হন পাঠক, বিশেষ করে নিজের বইয়ের। অন্যের বই পয়সা দিয়ে কিনতে হয় বলে প্রায়ই পড়া হয় না। এমন অবস্থায় সাহিত্যের বিকাশ অসম্ভব। কারণ সাহিত্য যাই হোক না কেন, বই হল কাঁচা মাল, তাই কেনা-বেচার সমতা বজায় থাকা প্রয়োজন।

৩১। বর্তমান হইতে আমরা প্রতিদিন যত নূতন নূতন বর্তমানে উপস্থিত হই—দূর যত ক্রোড়ের নিকট অল্পে সরিয়া আসে, আমাদের পশ্চাতে ততই অতীতের ছায়া পড়িতে থাকে। আমাদের পশ্চাতে স্তরবিন্যস্ত মেঘমালার হৃদয়ে রামধনু ফুটিয়া ওঠে—সেই রামধনুর বিচিত্র লাবণ্যে জীবনের শুভ মুহূর্তগুলি জ্বলিতে থাকে, অন্ধকার-আলোক—বিস্মৃতি-স্মৃতি মিলিয়া সন্ধ্যার পুষ্পবন রচনা করে—জীবনের সহস্র কুসুম সেই পুষ্পবনে প্রতিদিন ঝরিয়া পড়ে। কত লোকে তাহা দলিত করিয়া যায়, কেহ বা একটি ঝরা ফুল কুড়াইয়া লইয়া হৃদয়ে রাখিয়া দেয়—জীবনজ্বালার মধ্যে এক এক বার ঝরা ফুলের সৌরভে চমকিয়া উঠে। কিন্তু বর্তমান থাকে না। মুহূর্ত হইতে মুহূর্তে সে যতই লুকাইয়া বেড়ায়, অতীতের দ্রুত অনুসরণ হইতে কিছুতেই রক্ষা পায় না। আশ্রয় লইবার জন্য সে ভবিষ্যতের ক্রোড়ে ছুটিয়া যায়, অতীত আসিয়া বর্তমানকে ধরিবার ছলে ভবিষ্যতের খানিকটা জমি দখল করিয়া বসে। এইরূপে দিনে দিনে অতীতের দখল বাড়িতে থাকে : কিন্তু লোকে বলে, অতীত বড় উদাসীন। কে জানে, অতীতের' পরে আমাদের এত টান কেন? অতীতের ছলনায় আমরা চিরদিনই কেন ভুলিয়া থাকিতে চাই বর্তমানকে কঠোর বলিয়া, ভবিষ্যৎ অন্ধকার স্থির ছায়া বৈ কিছুই দেখি না—অতীতের বিবাদবিসম্বাদের মধ্যে প্রেমের চুম্বক আকর্ষণ, জ্বালা-যন্ত্রণার মধ্যে আনন্দের পবিত্র স্পর্শ, অতীতের যেন সকলই সুখ—যত দুঃখ বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে। কে জানে, অতীতের উপর আমাদের একি মায়া!

[অতীত : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

(প্রধান বাক্‌সূত্র : বর্তমান হইতে প্রতিদিন নূতন নূতন বর্তমান—তবু অতীতের টান—অতীতের যেন সকলই সুখ—যত দুঃখ বর্তমানে এবং ভবিষ্যতে)

অতীতের মায়া

আমরা এক কাল থেকে অন্যকালে এগিয়ে চলেছি। এই চলার পথে অতীত হল মানুষের মোহময় স্মৃতি, যে স্মৃতির পটে অক্ষয় হয়ে থাকে এক-একটি মুহূর্ত। অতীত

বর্তমান আর ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন করে রাখে। আমরা অতীতের জাদুমন্ত্রে মুগ্ধ, তাই আমাদের মন অতীতাচারী, আমরা ভাবি যা-কিছু ভালো, যা-কিছু সুখশান্তি সবই অতীতের। বর্তমান আর ভবিষ্যতের জন্যে আমাদের কোনো মোহ নেই। বর্তমান আমাদের চোখে কঠোর, ভবিষ্যৎ আমাদের চোখে অন্ধকার।

৩২। সমস্ত বাংলাদেশে কি ভারতের অন্যত্র যেখানেই দেখি কোথাও দর্শন ছাড়া ধর্ম নেই, ধর্ম ছাড়া দর্শন নেই। বাইরে যা সত্যের বীজ তাই জীবনের ক্ষেত্রে বসিয়ে দিলে দাঁড়ায় জীবন্ত ধর্ম। বীজ যে জীবন্ত তার প্রমাণ তো ক্ষেত্র ছাড়া হবার জো নেই। জীবনের সঙ্গেই সত্যের নিত্যযোগ। তাই সত্যকে জীবনের ক্ষেত্রে ধর্মরূপে গ্রহণ করে অতি সাবধানে পরখ করে নিতে হয়। এই পরখ করার পদ্ধতি এবং পরখ করে পাওয়া সত্যই হল দর্শন। জীবনের সত্য স্বচক্ষে দেখে পরখ না করে নিলে চলবে কেন? কাজেই ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে কোনো বিরোধ নেই।

'দর্শন' কথাটি খাসা, কিন্তু চোখে দেখাকেই সেরা পরখ মনে করলে চলবে না। যিনি পরখ করবেন তিনি তো বাইরের ইন্দ্রিয় নন। চোখ কান প্রভৃতি বাইরের ইন্দ্রিয় তার দাসদাসী। দাসদাসীর কাছে খবর নিয়ে কি নিশ্চিন্ত হওয়া যায়? প্রত্যক্ষও হল অক্ষিতে দেখা অর্থাৎ ইন্দ্রিয় বা দাসের কাছে খবর পাওয়া। তাই দর্শনের প্রধান কথা 'প্রত্যক্ষ' নয়। তাঁদের সেরা পরখ হল 'অপরোক্ষানুভূতি' অর্থাৎ পরোক্ষময় সোজা-সুজি দেখনেওয়ালার এমন এক অপরোক্ষ অনুভূতি। একে ইংরাজীতে Immediate বললেও যেন যথেষ্ট বলা হয় না। ভারতের দর্শন কথাটাকে তাই ইংরেজী করতে গিয়ে soul sight বলা হয়েছে। [ধর্ম ও দর্শন—বাংলার সাধনা : ক্ষিতিমোহন সেন]

(প্রধান বাক্সূত্র : বাংলাদেশে কি ভারতের সর্বত্র দর্শন ছাড়া ধর্ম নেই। ধর্ম ছাড়া দর্শন নেই—শস্যের বীজ জীবনের ক্ষেত্র, জীবন ধর্ম—দর্শনের প্রধান অংশ প্রত্যক্ষ নয়।)

ধর্ম ও দর্শন

আমাদের দেশে ধর্ম আর দর্শন হাত ধরাধরি করে চলে। বীজকে পরখ করতে ক্ষেত্র চাই। সত্যকে তেমনি পরখ করতে হয় জীবনে। এই জীবনে যাচাই করা সত্যই হচ্ছে দর্শন, যার মানে শুধু ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখা নয়, অন্তর দিয়ে দেখা। কারণ ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি হল বাহ্য প্রত্যক্ষ, দর্শন হচ্ছে আন্তর প্রত্যক্ষ, আত্মার দৃষ্টিপাত।

৩৩। আজকে পৃথিবীতে যে দুর্দৈব দেখা দিয়েছে তার কারণ মানুষের দেহবুদ্ধির ও স্বার্থবুদ্ধির প্রবলতা। অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক উপায়ে তার সাময়িক যে প্রতি-কারই সম্ভব হোক, স্থায়ী ও গভীর প্রতিকার হল—কেবল প্রাণধারণ ও স্বার্থসাধন এই উভয়ের অতীত যদি কোনো প্রেরণা মানুষের থাকে তারই অনুশীলন, তারই সাধনা।

সাহিত্য ও শিল্প সেই জাতের জিনিস। মানুষের চিত্তবৃত্তির সংস্কার এতে হয়: ব্যষ্টির ও সমষ্টির জীবনে ছন্দ সুর ও সামঞ্জস্য তার দান।

আজকের দিনেই সাহিত্য ও শিল্প বিষয়ে আমাদের বিশেষ মনোযোগ দেওয়া

প্রয়োজন। অনেকে মনে করেন, দেশব্যাপী যখন এত দুঃখ, পৃথিবীব্যাপী যখন এত পাপ, সাহিত্য বা শিল্পচর্চার সময় কোথা—তার ঔচিত্যই বা কোনখানে? এ কথা ভুল। কারণ, সাহিত্য ও শিল্পের অনুশীলন তো বিলাস নয়, স্বপ্নপ্রয়াণ নয়, পলায়নপর মনোবৃত্তির ছল নয়। অবশ্য, সত্যদৃষ্টি নিয়ে আমরা যদি সাহিত্য ও শিল্পকে দেখি, তার চর্চা করি।

স্বার্থের ও অজ্ঞানের ঘনীভূত অন্ধকারেও আমরা অন্তঃকরণে যে আলোক দেখতে পাই সাহিত্য বা শিল্প তারই ছটা ও তাতে বাইরের অন্ধকারও দূর হতে পারে; দুঃখ দূর না হোক, দুঃখের কারণ দূর হতে পারে। আমাদের কেবল সচেতন সাধনোচিত মনোভাব প্রয়োজন, একাগ্রতা ও সত্যনিষ্ঠা প্রয়োজন। ঠিকভাবে স্বধর্মের অনুসরণ করলেই সাহিত্যিক ও শিল্পীর পক্ষে সমাজের প্রতি তাঁদের যা কর্তব্য তা পালন করা হবে।

[শিল্পকথা : শ্রীনন্দলাল বসু]

[প্রধান বাক্‌সূত্র : দুর্দৈবের দেহবুদ্ধি ও স্বার্থবুদ্ধির প্রবণতা—সাহিত্য ও শিল্পে চিত্তবৃত্তির সংসার—অন্ধকারের বিদূরণ।]

সাহিত্য ও শিল্পচর্চার প্রয়োজন

মানুষ একান্তভাবে স্বার্থবুদ্ধিচালিত বলেই পৃথিবীতে যত অশান্তি। সাহিত্য ও শিল্প মানুষকে এই স্বার্থবুদ্ধির উর্ধ্বে থাকতে সাহায্য করে, কারণ সাহিত্য-শিল্প মানুষের মনকে সুসংস্কৃত করে তোলে। তাই এ দুটো জিনিস আজ আমাদের বড়ো বেশি করে দরকার। সাহিত্য ও শিল্পকে বিলাস, স্বপ্ন বা বাস্তব সমস্যা থেকে পালাবার উপায় আখ্যা দিলে ভুল করা হবে। কারণ যথার্থ সাহিত্য ও শিল্প মানুষকে সত্যনিষ্ঠ করে তোলে, তাকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনে। সামাজিক দুঃখের মূলীভূত কারণগুলি সংস্কৃতিচর্চার মধ্য দিয়ে দূর হতে পারে।

অনুশীলনী

সার-সংক্ষেপ করো :

১। তৎপরে রাজমহল হইতে মহানন্দা-পদ্মা নদীদ্বয়ের সঙ্গমস্থলাভিমুখে গমন করি। এই পথে জলদস্যুর ভয় থাকাতে আমরা রাত্রিতে ষ্টিমারের ডেকের উপর ভাল করিয়া পাহারা দিতাম। যখন আমরা মহানন্দার ভিতরে প্রবেশ করিলাম, তখন তাহার পুষ্করিণীর জলের ন্যায় আকাশবর্ণ জল ও তীরস্থ শ্যামল বর্ণ উপবন দর্শন করিয়া মনে মহানন্দ উপস্থিত হইল। যখন মহানন্দা নদীর ভিতর ষ্টীমার অগ্রসর হইতে লাগিল তখন গ্রাম্য লোকেরা 'ধোঁয়া কলের না এয়েছে রে' বলিয়া তীরে আসিয়া বাষ্পীয়পোত দর্শন করিতে লাগিল। ইহার পূর্বে বাষ্পীয়পোত কখনও মহানন্দার ভিতরে প্রবেশ করে নাই। লোকে তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইল এবং আমাদিগকে কোন শ্রেষ্ঠতর লোকসমাগত অদ্ভুত জীব মনে করিল। ষ্টীমার হইতে যখন গ্রামে কেহ দুধ কিনিতে যাইত, তখন সে গিয়া দেখিত যে, গ্রামের সমস্ত লোক পলায়ন করিয়াছে,

গ্রাম শূন্য পড়িয়া আছে। একি ব্যাপার! আমরা ইহা দেখিয়া মনে করিলাম যে, আমরা কলম্বাস ও তাহার সঙ্গীর ন্যায় কোন একটা নূতন আমেরিকা আবিষ্কার করিয়াছি; ও সেই আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ানগণ আমাদিগের সম্মুখ হইতে পলায়ন করিতেছে।

[চল্লিশ বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশের ভ্রমণবৃত্তান্ত—রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৯০০)]

২। বাঙ্গালীর পূর্ববীরত্ব, পূর্বগৌরবের কি জানা আছে? কেবল ইহাই জানি যে, যখন পশ্চিমভারতে বেদ সৃষ্টি ও অধীত হইতেছিল, উপনিষদ্‌সকল প্রণীত হইতেছিল, অযোধ্যার ন্যায় সর্বসম্পদ্‌শালিনী নগরীসকল স্থাপিতা এবং অলঙ্কৃতা হইতেছিল—বাঙ্গালা তখন অনার্যভূমি, আর্যগণের বাসের অযোগ্য বলিয়া পরিত্যক্ত। কেবল ইহাই জানি যে, যখন উত্তরভারতে, সমস্ত আর্য্য বীরগণ একত্রিত হইয়া কুরুক্ষেত্র-জিত রাজ্যখণ্ডসকল বিভাগ করিতেছিলেন, যখন পশ্চিমে মন্বাদি অমর অক্ষয় ধর্মশাস্ত্র-সকল প্রণীত হইতেছিল, তখন বঙ্গদেশে পৌণ্ড্র প্রভৃতি অনার্যজাতির বাস। প্রাচীন কাল দূরে থাকুক, যখন মধ্যকালে চৈনিক পরিব্রাজক হোয়েন্স সাঙ্‌ বঙ্গদেশপর্য্যটনে আসেন, তখন দেখিয়াছিলেন যে, এই প্রদেশ গৌরবশূন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত। বঙ্গদেশের পূর্বগৌরব কোথায়?

তবে, ইহার পরে শুনা যায় যে, পালবংশীয় ও সেনবংশীয় রাজগণ বৃহৎ রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন এবং গৌড়নগরী বড় সমৃদ্ধিশালিনী হইয়াছিল। কিন্তু এমন কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না যে, তাঁহারা এই বাহুবলশূন্য বাঙ্গালী জাতি এবং তাহাদিগের প্রতিবাসী তদ্রূপ দুর্বল অনার্য জাতিগণ ভিন্ন অন্য কাহাকে আপন অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন। এই মাত্র প্রমাণ আছে বটে যে, মুঙ্গের পর্যন্ত তাঁহাদিগের অধিকারভুক্ত ছিল।

[বাঙ্গালীর বাহুবল : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

৩। এদেশে এক এক ভাষায় খান দশ পোনের সংবাদপত্র; কোনখানির গ্রাহক দুই শত, কোনখানির গ্রাহক পাঁচ শত, পড়ে পাঁচ সাত হাজার লোক। ইউরোপে এক এক দেশে সংবাদপত্র শত শত, সহস্র সহস্র। এক একখানির গ্রাহক সহস্র সহস্র, লক্ষ লক্ষ। পড়ে লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি লোক। তারপর নগরে সভা, গ্রামে গ্রামে বক্তৃতা। যাহার কিছু বলিবার আছে, সেই প্রতিবাসী সকলকে সমবেত করিয়া সে কথা বলিয়া শিখাইয়া দেয়। সেই কথা আবার শত শত সংবাদপত্রে প্রচারিত হইয়া শত শত ভিন্ন গ্রামে, ভিন্ন নগরে প্রচারিত বিচারিত এবং অধীত হয়; লক্ষ লক্ষ লোকে সে কথায় শিক্ষিত হয়। এক একটা ভোজের নিমন্ত্রণেই স্বাদু খাদ্য চর্বণ করিতে করিতে ইউরোপীয় লোকে যে শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, আমাদের তাহার কোন অনুভবই নাই। আমাদিগের দেশের যে সংবাদপত্রসকল আছে, তাহার দুর্দশার কথা ত পূর্বেই বলিয়াছি; বক্তৃতাসকল ত লোকশিক্ষার দিক্‌ দিয়াও যায় না। তাহার বহু কারণের মধ্যে একটি প্রধান কারণ এই যে, তাহা কখনও দেশীয় ভাষায় উক্ত হয় না। অতি অল্প লোকে শুনে অতি অল্প

লোকে পড়ে, আর অল্প লোকে বুঝে; আর বক্তৃতাগুলি অসার বলিয়া আরও অল্প লোকে তাহা হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়।

[লোকশিক্ষা : বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

৪। ধর্ম ও নীতি বিষয়েই ভারতবর্ষ মনুষ্যসমাজের মহদুপকার করিয়াছেন। খ্রীস্ট জন্মিবার প্রায় ছয় শত বৎসর পূর্বে এতদ্দেশে বুদ্ধদেব জন্মগ্রহণ করিয়া জগন্মণ্ডলে প্রেমপূর্ণ সার্বভৌম ধর্ম প্রথম প্রচার করেন। তিনি রাজার পুত্র ও রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হইয়া রাজভোগে ছিলেন। ক্ষমতাশালী পিতা, স্নেহময়ী মাতা, পতিপ্রাণা পত্নী, সুন্দর সুত, আজ্ঞাবহ দাসদাসী, অপরিমেয় অর্থ, এ সকল তাঁহার ছিল; কিন্তু এ সকলে তাঁহার মনস্তুষ্টি ছিল না। তিনি মানবজাতির দুঃখে কাতর হইয়া রাজভোগ পরিত্যাগ পূর্বক মোক্ষপথের অনুসন্ধানের বহির্গত হইলেন। ক্রমে তাঁহার জ্ঞানচক্ষু খুলিল; জাতিভেদ ও অবস্থাভেদ তাঁহার আর দৃষ্টিরোধ করিল না। তিনি দেখিতে পাইলেন যে মুক্তিপথে প্রবেশ করিতে সকলেরই সমান অধিকার। যিনি লোকের যন্ত্রণা অবলোকন করিয়া ব্যাকুল, তিনি পরপীড়ন দেখিতে পারিবেন কেন? তাঁহার হৃদয় হইতে এই মহাকাব্য নিঃসৃত হইল, "অহিংসাই পরম ধর্ম; মনুষ্য হউক কাহাকেও কষ্ট দিবে না, সকলকে সুখে রাখিবার চেষ্টা করিবে।" ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং বহুসংখ্যক সঙ্কর জাতির বিবাদ-ভূমিতে একতার বীজ রোপিত হইল।

[ভারতমহিমা : রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (১৮৪৫-১৮৮৬)]

৫। গানে মুগ্ধ কে নয়? যখন সামান্য মনুষ্যগায়ক তান ছাড়িয়া গায়, কে না মুগ্ধ হয়? তাহা অপেক্ষা যখন অন্তরের উল্লাসে প্রাণ খুলিয়া গিয়া গান বাহির হয়, তখন আরও মধুর হয়, যে গীত বুঝে সে আরও মুগ্ধ, যে গীতের ভাব বুঝে সে আরও মুগ্ধ হয়, গীতে যদি শুধু কান না ভরিয়া মনও ভরাইতে পারে, তাহা হইলে সে গীতে লোকে উন্মত্ত হয়। আজি ঋতুগণ গায়ক, জন্মভূমিদর্শনে পুলকে পূরিত হইয়া গাহিতেছেন, হৃদয় উল্লাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা আবার বহুকাল পরে সেই চতুরুদধি-তরঙ্গ-বাহু-ক্ষালিত চরণা চির-নীহার-ধবলোন্নত-প্রাচীনা সুজলা সুফলা জননী জন্মভূমির দর্শন পাইয়াছেন; বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র ও বাল্মীকি শ্রোতা, তাঁহারা শুনিতেছেন, বুঝিতেছেন, ভাবগ্রহ করিতেছেন। কান, মন, প্রাণ ভরিয়া উঠিতেছে। বাহির ইন্দ্রিয় কানে প্রবেশ করিয়াছে। মন ও প্রাণ কানে উঠিয়াছে। জ্ঞান, চৈতন্য হত। তাঁহারা গায়কে মুগ্ধ, গায়কের ভাবে মুগ্ধ, গানে মুগ্ধ, সুরে মুগ্ধ, আর সুরের ভাবে আরও মুগ্ধ।

সুর যত জমিতেছে, কেবল যেন বলিতেছে ভাই ভাই ভাই। ঋতুরা যেন বাহু প্রসারণ করিয়া স্থাবর, জঙ্গম, ভূচর, খেচর,জলচর, সকলকে ডাকিতেছে—এস ভাই ভাই, এস ভাই ভাই, এস ভাই ভাই। সবাই ভাই। সুর জমিতেছে, যেন আরও ডাকিতেছে ভাই ভাই ভাই। আমরা সবাই ভাই।

[ত্রয়ী : হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)]

৬। মাতৃভাষা বাংলা বলিয়াই কি বাঙালিকে দণ্ড দিতেই হইবে? এই অজ্ঞানকৃত অপরাধের জন্য সে চিরকাল অজ্ঞান হইয়াই থাক্—সমস্ত বাঙালির প্রতি কয়জন শিক্ষিত বাঙালির এই রায়ই কি বহাল রহিল? যে বেচারা বাংলা বলে সেই কি আধুনিক মনুসংহিতার শূদ্র? তার কানে উচ্চ শিক্ষার মন্ত্র চলিবে না? মাতৃভাষা হইতে ইংরেজি ভাষার মধ্যে জন্ম লইয়া তবে আমরা দ্বিজ হই?

বলা বাহুল্য ইংরেজি আমাদের শেখা চাইই—শুধু পেটের জন্য নয়। কেবল ইংরেজি কেন? ফরাসী জার্মান শিখিলে আরও ভালো। সেইসঙ্গে এ কথা বলাও বাহুল্য, অধিকাংশ বাঙালি ইংরেজি শিখিবে না। সেই লক্ষ লক্ষ বাংলাভাষীদের জন্য বিদ্যার অনশন কিংবা অর্ধাশনই ব্যবস্থা, এ কথা কোন মুখে বলা যায়?

দেশে বিদ্যাশিক্ষার যে বড়ো কারখানা আছে তার কলের চাকার অল্পমাত্র বদল করিতে গেলেই বিস্তর হাতুড়ি-পেটাপেটি করিতে হয়—সে খুব শক্ত হাতের কর্ম। আশুমুখুয্যে মশাই ওরই মধ্যে এক-এক জায়গায় একটুখানি বাংলা হাতল জুড়িয়া দিয়াছেন।

তিনি যেটুকু করিয়াছেন তার ভিতরকার কথা এই—বাঙালির ছেলে ইংরেজি-বিদ্যায় যতই পাকা হোক্ বাংলা না শিখিলে তার শিক্ষা পুরা হইবে না। কিন্তু এ তো গেল যারা ইংরেজি জানে তাদেরই বিদ্যাকে চৌকশ করিবার ব্যবস্থা। আর, যারা বাংলা জানে ইংরেজি জানে না, বাংলার বিশ্ববিদ্যালয় কি তাদের মুখে তাকাইবে না? এতবড়ো অস্বাভাবিক নির্মমতা ভারতবর্ষের বাহিরে আর কোথাও আছে?

[শিক্ষার বাহন : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৭। দ্রুতগতি রঘুপতির নিকটে গিয়াই জয়সিংহ কাতর অথচ দৃঢ় স্বরে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "গুরুদেব, মায়ের আদেশ গ্রহণ করিবার জন্য আজ প্রভাতে আমি যখন মাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনি কেন তাহার উত্তর দিলেন?"

রঘুপতি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলেন, "মা তো আমার দ্বারাই তাঁহার আদেশ প্রচার করিয়া থাকেন, তিনি নিজমুখে কিছু বলেন না।"

জয়সিংহ কহিলেন, "আপনি সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিলেন না কেন? অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া আমাকে ছলনা করিলেন কেন?"

রঘুপতি ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "চুপ করো। আমি কী ভাবিয়া কী করি তুমি তাহার কী বুঝিবে? বাচালের মতো যাহা মুখে আসে তাহাই বলিয়ো না। আমি যাহা আদেশ করিব তুমিও কেবল তাহাই পালন করিবে, কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়ো না।"

জয়সিংহ চুপ করিয়া রহিলেন। তাঁহার সংশয় বাড়িল বৈ কমিল না। কিছুক্ষণ পরে বলিলেন, "আজ প্রাতে আমি মায়ের কাছে বলিয়াছিলাম যে, তিনি যদি মুখে আমাকে আদেশ না করেন তবে আমি কখনোই রাজহত্যা ঘটিতে দিব না,

তাহার ব্যাঘাত করিব। যখন স্থির বুঝিলাম মা আদেশ করেন নাই, তখন মহারাজের নিকট নক্ষত্ররায়ের সংকল্প প্রকাশ করিয়া দিতে হইল, তাঁহাকে সতর্ক করিয়া দিলাম।"

রঘুপতি কিয়ৎক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। উদ্‌বেল ক্রোধ দমন করিয়া বলিলেন, "মন্দিরে প্রবেশ করো।"

উভয়ে মন্দিরে প্রবেশ করিলেন।

রঘুপতি কহিলেন, "মায়ের চরণ স্পর্শ করিয়া শপথ করো, বলো যে ২৯শে আষাঢ়ের মধ্যে আমি রাজরক্ত আনিয়া এই চরণে উপহার দিব।"

[রাজর্ষি : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৮। ভাগ্যচক্রের পরিবর্তন দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পথে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-একদিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎ-মর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।

[সভ্যতার সঙ্কট : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

৯। পথের বর্ণনা করিতে কালিদাস বড় ভালবাসেন। তাহার কারণ, পথের দুই পার্শ্বে খণ্ড খণ্ড চিত্র পরে পরে চক্ষের সমক্ষে উপনীত হয়; একটার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার পরেই আর একটার প্রতি চক্ষু পড়ে। একটা সমগ্র সম্পূর্ণ বৃহৎ চিত্র রচনা করিতে হয় না। সমস্ত রঘুবংশ যেন ইক্ষাকুবংশের একটি দীর্ঘ প্রাচীন রাজপথ, কবি রথে চড়িয়া বর্ণনা করিতে করিতে চলিয়াছেন। দিলীপের প্রথম চিত্র রথযাত্রা। রঘুর দিগ্বিজয়ও এই ভাবের; দেশ হইতে দেশান্তরে, দৃশ্য হইতে দৃশ্যান্তরে গমন। ইন্দুমতীর স্বয়র সভাতেও কবির প্রতিভা দুই পার্শ্বের শ্রেণীবদ্ধ রাজগণকে অবলম্বন করিয়া এক একটি দৃশ্যকে পরে পরে স্পর্শ করিয়া গিয়াছে। রামের রথযাত্রাতেও কবি-প্রতিভার সেই গতিলীলা প্রকাশ পায়। অগ্নিবর্ণের সেই বিলাসসম্ভোগও সেইরূপ:

প্রমোদ হইতে প্রমোদান্তরে অপরিতৃপ্ত চপল হৃদয়ের ভ্রমণচাঞ্চল্য। মেঘদূত কাব্য মেঘচ্ছায়াস্নিগ্ধ দুই পার্শ্বের ছবি তুলিতে তুলিতে ভ্রমণ। ঋতুসংহার সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। অমনতর নিতান্তই বর্ণনাকাব্য সংস্কৃত সাহিত্যে বিরল। ঠিক পথবর্ণনা নহে বটে—কিন্তু ইহাও চলিতে চলিতে বর্ণনা। বিক্রমোর্বশী যদিও নাটক, কিন্তু কবি নাট্যরীতি পরিহার করিয়া নায়ককে অরণ্যে অরণ্যে বিলাপপূর্বক ভ্রমণ করাইয়াছেন। কখনও পাখি, কখনও মেঘ, কখনও লতা, কখনও পর্বতের প্রতি খণ্ড খণ্ড উচ্ছ্বাস।

[কালিদাসের চিত্রাঙ্কনী প্রতিভা : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৭০-১৮৯৯]

১০। বাংলার নদ-নদী, ঝোপ-ঝাড়, পল্লী-কুটিরের ঘুঁটের সুমিষ্ট ধোঁয়া, পানা পুকুর হইতে উত্থিত জুঁই ফুলের গন্ধ—এ সব অতি স্নিগ্ধ জিনিস। কিন্তু এই দারুণ শরৎকালে মন চায় ধরিত্রীর বুক বিদীর্ণ করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া যাইতে। পাঞ্জাবমেল সন্ সন্ ছুটিতেছে, বড় বড় মাঠ, সারি সারি তালগাছ, ছোট ছোট পাহাড় নিমেষে পট পরিবর্তন। মাঝে মাঝে বিরাম—পান-বিড়ি-সিগ্রেট, চা-গ্রাম পুরী কচৌড়ি, রোটি-কাবাব, dinner Sir at Shikohabad ? তারপর আবার প্রবল বেগ, টেলিগ্রাফের খুঁটি ছুটিয়া পলাইতেছে, দু পাশে আকের ক্ষেত স্রোতের মতো বহিয়া যাইতেছে, ছোট ছোট নদী কুণ্ডলী পাকাইয়া অদৃশ্য হইতেছে, দূরে প্রকাণ্ড প্রান্তর অতিদূরের শ্যামায়মান বনানীকে ধীরে প্রদক্ষিণ করিতেছে। কয়লার ধোঁয়ার গন্ধ, চুরুটের গন্ধ, হঠাৎ জানালা দিয়া এক ঝলক উগ্র-মধুর ছাতিম ফুলের গন্ধ। তারপর সন্ধ্যা—পশ্চিম আকাশে ওই বড় তারাটা গাড়ীর সঙ্গে পাল্লা দিয়া চলিতেছে। ওদিকের বেঞ্চে স্থূলোদর লালাজী এর মধ্যেই নাক ডাকাইতেছেন। মাথার উপর ফিরিঙ্গিটা বোতল হইতে কি খাইতেছে। এদিকের বেঞ্চে দুই কম্বল পাতা, তার উপর আরো দুই কম্বল, তারমধ্যে আমি, আমার মধ্যে ভর পেট ভাল ভাল খাদ্য সামগ্রী—তাছাড়া—বেতের বাক্সে আরো অনেক আছে। গাড়ীর অঙ্গে অঙ্গে লোহা লক্কড়ে চাকর ঠোক্করে জিঞ্জির ডাণ্ডার ঝঞ্চনার মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতেছে—আমি চিৎপাত হইয়া তাণ্ডব নাচিতেছি। হমীন্ অস্ত, ওয়া হমীন্ অস্ত্।

[ট্রেনে : রাজশেখর বসু]

১১। আমাদের চাষী বলে, মাটি হইতে বাপদাদার আমল ধরিয়া যাহা পাইয়া আসিতেছি তাহার বেশী পাইব কি করিয়া ? একথা চাষীর মুখে শোভা পায়, পূর্বপ্রথা অনুসরণ করিয়া চলাই তাহাদের শিক্ষা। কিন্তু এমন কথা বলিয়া আমরা নিষ্কৃতি পাইব না। এই মাটিকে এখনকার প্রয়োজন অনুসারে বেশী করিয়া ফলাইতে হইবে—নইলে আধপেটা খাইয়া, জ্বরে অজীর্ণ রোগে মরিতে কিংবা জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হইবে।

এই মাটির উপরে মন এবং বুদ্ধি খরচ করিলে এই মাটি হইতে যে আমাদের দেশের মোট চাষের ফসলের চেয়ে অনেক বেশী আদায় করা যায় তাহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে। আজকাল চাষকে মুখের কাজ বলা চলে না, চাষের বিদ্যা এখন মস্ত বিদ্যা হইয়া উঠিয়াছে।

১২। এ কথা মানতে হবে যে, মৌখিক আলাপে আমরা ঢিলেভাবে কথাবার্তা কই, সাহিত্যে কথার বাঁধুনি থাকা চাই। সাহিত্যের বিষয় অনেক সময় বাক্যালাপের বিষয়ের মতো যা তা যেমন-তেমন নয়। তাকে ঠিকমত বোঝাতে গেলে চলতি ভাষার শব্দ দিয়ে কাজ চলে না ; কাজ চালাতে হয় সংস্কৃত অভিধান থেকে শব্দ নিয়ে, কিংবা নতুন কথা বানাতে হয় সংস্কৃত ব্যাকরণের কথা-বানানো নিয়মগুলি দিয়ে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। যে জীব বা যে বস্তুকে বের করে দেওয়া হয় তার বিশেষণ সহজ বাংলায় মেলে না। তাড়িয়ে-দেওয়া, খেদিয়ে-দেওয়া, ঝেঁটিয়ে দেওয়া জিনিস বা জীব শব্দটা সব জায়গায় খাটবার মতো নয়। এখানে বহিষ্কৃত বললে তখনই মানেটা স্পষ্ট হয়ে যায়। এ কথা শুনে যদি কেউ বলে বসেন তবেই তো মেনে নিচ্ছ সাধুভাষা ; নইলে সাহিত্য চলতে পারে না, কথাটা ঠিক নয়। আজকাল আমরা সুখের কথাতেই হ'ক, সাহিত্যেই হ'ক, যে নানা বিষয় আলোচনা করি তার প্রয়োজনে সংস্কৃত শব্দ বা পারিভাষিক শব্দের সহয়তা না নিলে নয়। আমাদের শিক্ষার উন্নতিতে আমাদের মুখের ভাষার উন্নতি আপনিই ঘটছে। পঞ্চাশ বছর পূর্বে চলতি ভাষায় যে সব কথা বললে লোকে পূর্বে পণ্ডিতিয়ানা ব'লে হেসে উঠত এখন তা আমরা অনায়াসে বলে থাকি। এমনি করেই কথার ভাষা সাহিত্যের ভাষা হয়ে উঠেছে, সাহিত্যের ভাষা মিলে যাচ্ছে কথার ভাষায়।

[ভাষার কথা—বাংলা সাহিত্যের কথা : শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী]

১৩। ধন্য রে দেশাচার। তোর কি অনির্বচনীয় ! তুই তোর অনুগত ভক্তদিগকে দুর্ভেদ্য দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ রাখিয়া কি একাধিপত্য করিতেছিস ! তুই, ক্রমে ক্রমে আপন আধিপত্য বিস্তার করিয়া, শাস্ত্রের মস্তকে পদার্পণ করিয়াছিস, ধর্মের মর্ম ভেদ করিয়াছিস হিতাহিতবোধের গতিরোধ করিয়াছিস। ন্যায় অন্যায় বিচারের পথ রুদ্ধ করিয়াছিস। তোর প্রভাবে শাস্ত্রও অশাস্ত্র বলিয়া গণ্য হইতেছে, অধর্মও ধর্ম বলিয়া মান্য হইতেছে। সর্বধর্মবহিষ্কৃত যথেচ্ছাচারী দুরাচারেরাও তোর অনুগত থাকিয়া, কেবল লৌকিক রক্ষা-গুণে, সর্বত্র সাধু বলিয়া গণনীয় ও আদরণীয় হইতেছে। আর দোষস্পর্শশূন্য প্রকৃত সাধুপুরুষেরাও, তোর অনুগত না হইয়া, কেবল লৌকিকরক্ষায় অযত্ন প্রকাশ ও অনাদর প্রদর্শন করিলেই সর্বত্র নাস্তিকের শেষ, অধার্মিকের শেষ, সর্বদোষে দোষীর শেষ বলিয়া গণনীয় ও নিন্দনীয় হইতেছেন। তোর অধিকারে যাহারা সতত জাতিভ্রংশকর, ধর্ম-লোপকর কর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়া, কালাতিপাত করে, কিন্তু লৌকিক রক্ষায় যত্নশীল হয়, তাহাদের সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি করিলে ধর্মলোপ হয় না। কিন্তু যদি কেহ সতত সৎকর্মের অনুষ্ঠানে রত হইয়াও, কেবল লৌকিকরক্ষায় তাদৃশ যত্নবান না হয়, তাহার সহিত আহার ব্যবহার ও আদান প্রদানাদি দূরে থাকুক, সম্ভাষণ মাত্র করিলেও, এককালে ধর্মলোপ হইয়া যায়। [বিধবাবিবাহ : ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর]

১৪। যে বঙ্গবাসীর গৃহে আতিথ্য স্বীকার করিতে যাইতেছিলাম, তাহার উদ্যানে গাড়ী প্রবেশ করিলে তাহা কোন ধনবান্ ইংরেজের হইবে বলিয়া আমার প্রথমে ভ্রম

হইল। পরক্ষণেই সেই ভ্রম গেল। বারান্দায় গুটিকতক বাঙ্গালী বসিয়া আমার গাড়ী নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, তাঁহাদের নিকটে গিয়া গাড়ী থামিলে আমি গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। আমাকে দেখিয়া তাঁহারা সকলেই সাদরে অগ্রসর হইলেন। না চিনিয়া যাহার অভিবাদন আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম, তিনিই বাটীর কর্তা। তিনি শতলোক সমভিব্যাহারে থাকিলেও আমার দৃষ্টি বোধ হয় প্রথমেই তাঁহার মুখের প্রতি পড়িত। সেরূপ প্রসন্নতাব্যঞ্জক ওষ্ঠ আমি অল্প দেখিয়াছি। তখন তাঁহার বয়ঃক্রম বোধহয় পঞ্চাশ অতীত হইয়াছিল, বৃদ্ধের তালিকায় তাঁহার নাম উঠিয়াছিল, তথাপি তাঁহাকে বড় সুন্দর দেখিয়াছিলাম। বোধ হয়, সেই প্রথম আমি বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি।

যে সময়ের কথা বলিতেছি, আমি তখন নিজে যুবা ; অতএব সে বয়সে বৃদ্ধকে সুন্দর দেখা ধর্মসঙ্গত নহে। কিন্তু সে দিবস এরূপ ধর্মবিরুদ্ধ কার্য্য ঘটিয়াছিল ; এক্ষণে আমি নিজে বৃদ্ধ, কাজেই প্রায় বৃদ্ধকে সুন্দর দেখি। একজন মহানুভব বলিয়াছিলেন যে, মনুষ্য বৃদ্ধ না হইলে সুন্দর হয় না, এক্ষণে আমি তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা করি।

[পালামৌ : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

১৫। আমরা সকলেই শিক্ষার্থী, কার্য্যক্ষেত্রে প্রত্যহই শিখিতেছি। দিন দিন অগ্রসর হইতেছি, এবং বাড়িতেছি।

জীবন সম্বন্ধে একটি মহাসত্য এই, যেদিন হইতে আমাদের বাড়িবার ইচ্ছা স্থগিত হয় সেইদিন হইতেই জীবনের উপর মৃত্যুর ছায়া পড়ে। জাতীয় জীবন সম্বন্ধে একই কথা। যেদিন হইতে আমাদের বড় হইবার ইচ্ছা থামিয়াছে সেদিন হইতেই আমাদের পতনের সূত্রপাত হইয়াছে। আমাদিগকে বাঁচিতে হইবে; সঞ্চয় করিতে হইবে, এবং বাড়িতে হইবে। তাহার জন্য কি করিয়া প্রকৃত ঐশ্বর্য্য লাভ হইতে পারে একাগ্রচিত্তে সেইদিকে লক্ষ্য রাখিবে।

দ্রোণাচার্য্য শিষ্যগণের পরীক্ষার্থ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'গাছের উপর যে পাখীটি বসিয়া আছে তাহাই লক্ষ্য, পাখী কি দেখিতে পাইতেছ ?' অর্জ্জুন উত্তর করিলেন, 'না দেখিতে পাইতেছি না, কেবল তাহার চক্ষু মাত্র দেখিতেছি।' এইরূপ একাগ্রচিত্ত হইলেই বাহিরের বিঘ্ন বাধার মধ্যেও অবিচলিত থাকিয়া লক্ষ্য ভেদ করিতে সমর্থ হইবে

তবে সেই লক্ষ্য কি ? লক্ষ্য,শক্তি সঞ্চয় করা, যাহা দ্বারা অসাধ্যও সাধিত হয়।

জীবন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে শক্তি সঞ্চয় দ্বারাই জীবন পরিস্ফুটিত হয়। তাহা কেবল নিজের একাগ্র চেষ্টা দ্বারাই সাধিত হইয়া থাকে। যে কোনরূপ সঞ্চয় করে না, সে পরমুখাপেক্ষী, সে ভিক্ষুক, সে জীবিত হইয়াও মরিয়া আছে।

যে সঞ্চয় করিয়াছে সেইই শক্তিমান, সেইই তাহার সঞ্চিত ধন বিতরণ করিয়া পৃথিবীকে সমৃদ্ধশালী করিবে। কে এই সাধনার পথ ধরিবে ?

[অব্যক্ত (দীক্ষা) : জগদীশচন্দ্র বসু]

১৬। চিরবিচিত্রতাময়ী রহস্যাবগুণ্ঠিতা প্রকৃতির সুগভীর হৃদয়ের মধ্যে ডুবিয়া মানব

যখন তাহার প্রবহমান আনন্দস্রোত আপন অন্তরে অনুভব করিতে পায়, তখন প্রকৃতির ভাষা ব্যক্ত করিবার জন্য সহজেই সে ব্যগ্র হইয়া ওঠে। তাহার হৃদয়ের শিরায় উপ-শিরায় সেই সৌম্য সৌন্দর্য্য যতই মুদ্রিত হইতে থাকে, সে তাহা না ব্যক্ত করিয়া থাকিতে পরে না। প্রকৃতিদীপ্ত হৃদয়কে জগতে বিকশিত করিয়া তুলাই তখন তাহার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা—মানবশিশুর নিকট সেই দীপ্ত রহস্যশ্রী ফুটাইয়া তুলিতে হইবে। এই রহস্যানন্দের প্রকাশেই সাহিত্য রচিত হয়। এইজন্যই সাহিত্যের আদি অন্ত কেবলই আনন্দ, যে সাহিত্যে আনন্দের যত স্ফূর্তি, সেই সাহিত্যই তত উন্নত গভীর।

প্রকৃতির আনন্দ তাহার গভীর জীবনে। প্রকৃতি প্রাণে ওতপ্রোত। সেই প্রাণ আমরা যতই উপভোগ করিতে থাকিব, আমাদের হৃদয়ে আনন্দ ততই বদ্ধমূল হইবে। প্রকৃতির জ্যোৎস্নায়, রৌদ্রে, শ্যামলতায়, সর্বত্রই প্রাণ প্রস্ফুটিত। ছায়াময় শারদীয় নিশীথে শুভ্র-নীল গগনপ্রান্ত হইতে পূর্ণ হৃদয়চন্দ্রমা যখন শ্রান্ত সুপ্ত জগৎকে জ্যোৎস্না-বরণে ছায়য়া ফেলেন, তখন আমাদের হৃদয় পুলকে শিহরিয়া উঠে কেন? ধীরে ধীরে আমাদের অন্তরে কত ভাবের সঞ্চয় হয়, কত স্মৃতি বিস্মৃতির নীরব ব্যাকুলিতে হৃদয় অভিভূত হইয়া পড়ে। শতশুভ্র তাড়িতালোকেও কৈ, হৃদয় সেরূপ উঠে না। কারণ আর কিছুই নহে, প্রাণ নীল। আকাশের দিকে তাকাইয়া, দূর অস্পষ্ট তরঙ্গায়িত ছায়া-বৃক্ষাবলীর শ্যামলতার পানে চাহিয়া যুগ যুগ কাটান যায়, কিন্তু সযতনে সজ্জিত কড়ি এবং জানালাবর্গের শুভ্র ও সবুজ রঙের উপরে দুই দণ্ড দৃষ্টি স্থির রাখা যায় কি না সন্দেহ। কারণ কি আর বলিতে হইবে? কেবলই এই প্রাণ। প্রাণের যেখানে যেরূপ অভিব্যক্তি, সেখানেই সেরূপ আনন্দ।

[স্বভাব ও সাহিত্য : বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১৭। আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর!
যে মোরে করিল পথের বিবাগী
পথে পথে ফিরি আমি তার লাগি,'
দীঘল রজনী তার তরে জাগি' ঘুম যে হরেছে মোর;
আমার এ ঘর ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।
আমার এ কূল ভাঙ্গিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি!
যে মোরে দিয়েছে বিষে-ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
মোর বুকে যেবা করব বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি,'
রঙ্গীন ফুলের সোহাগজড়ান ফুল মালঞ্চ ধরি।

যে মুখে সে কহে নিঠুরিয়া বাণী
আমি লয়ে করে তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কি যে আনি সাজাই নিরন্তর—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

[প্রতিদান : জসীম উদ্দীন]

১৮। বিদ্যাসাগর বাংলাভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্বে বাংলায় গদ্যসাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সবপ্রথমে বাংলাগদ্যে কল্যাণনৈপুণ্যের অবতারণা করেন। ভাষা যে কেবল ভাবের একটা আধারমাত্র নহে, তাহার মধ্যে যেনতেনপ্রকারেণ কতকগুলো বক্তব্য বিষয় পুরিয়া দিলেই যে কর্তব্য সমাধান হয় না, বিদ্যাসাগর দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহাই প্রমাণ করিয়াছিলেন। তিনি দেখাইয়াছিলেন যে, যতটুকু বক্তব্য, তাহা সরল করিয়া, সুন্দর করিয়া এবং সুশৃঙ্খল করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে। আজিকার দিনে এ কাজটিকে তেমন বৃহৎ বলিয়া মনে হইবে না, কিন্তু সমাজ-বন্ধন যেমন মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে অত্যাবশ্যক তেমনি ভাষাকে কলাবন্ধনের দ্বারা সুন্দররূপে সংযমিত না করিলে সে ভাষা হইতে কদাচ প্রকৃত সাহিত্যের উদ্ভব হইতে পারে না। সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে; জনতা নিজেকেই নিজে খণ্ডিত প্রতিহত করিতে থাকে, তাহাকে চালনা করাই কঠিন। বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি—ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধাসকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন—কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকৃত, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্বপ্রথমে তাঁহাকেই দিতে হয়।

[বিদ্যাসাগর চরিত : রবীন্দ্রনাথ]

১৯। কোন্ মূঢ় চিত্রকরে পদ্ম-দেহ চিত্র করে ?
করিলে কি বাড়ে তার শোভা ?
কিংবা সেই কোকনদে মাখাইলে মৃগমদে,
অতি-সুখ লভে মধুলোভা।
কসিত কাঞ্চন-কায় কিবা কার্য সোহাগায়
কিবা কার্য রসানের ছটা ?
হেন মূর্খ আছে কে হে, দিবে ইন্দ্রধনু দেহে,
অভিনব রূপরঙ্গ ঘটা ?
জ্বালিয়ে ঘৃতের বাতি প্রখর ভাস্কর-ভাতি
বৃদ্ধি করা দুরাশা কেবল।
কি কাজ সিন্দুরে সাজি গজমুক্তাফলরাজি ?
সাজিলে কি হয় সমুজ্জ্বল ?

[ব্যর্থপ্রয়াস : রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়]

২০। পালামৌ প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, নদী, গ্রাম, সকলই আছে, দূর হইতে তাহা কিছুই দেখা যায় নাই। পালামৌ পরগণায় পাহাড় অসংখ্য, পাহাড়ের পর পাহাড়, তাহার পর পাহাড়, আবার পাহাড়; যেন বিচলিত নদীর সংখ্যাতীত তরঙ্গ। আবার বোধ হয় যেন, অবনীর অন্তরাগ্নি একদিনেই সেই সেই তরঙ্গ তুলিয়াছিল। এখন আমার ঠিক স্মরণ হয় না, কিন্তু বোধ হয় যেন দেখিয়াছিলাম, সকল তরঙ্গগুলি পূর্বদিক্ হইতে উঠিয়াছিল, কোন কোনটি পূর্বদিক্ হইতে উঠিয়া পশ্চিম দিকে নামে নাই। এইরূপ অর্দ্ধপাহাড় লাতেহার গ্রাম পার্শ্বে একটি আছে, আমি প্রায় নিত্য তথায় গিয়া বসিয়া থাকিতাম। এই পাহাড়ের পশ্চিমভাগে মৃত্তিকা নাই, সুতরাং তাহার অন্তরস্থ সকল স্তর দেখা যায়, এক স্তরে নুড়ি, আর এক স্তরে কাল পাথর, ইত্যাদি। কিন্তু কোন স্তরই সমসূত্র নহে, প্রত্যেকটি কোথাও উঠিয়াছে, কোথাও নামিয়াছে। আমি তাহা পূর্বে লক্ষ্য করি নাই, লক্ষ্য করিবার কারণ পরে ঘটিয়াছিল। একদিন অপরাহ্নে এই পাহাড়ের মূলে দাঁড়াইয়া আছি, এমত সময় আমার একটা নেমোকহারাম ফরাসিস কুক্কুর (Poodle) আপন ইচ্ছামত তাঁবুতে চলিয়া গেল, আমি রাগত হইয়া চীৎকার করিয়া তাহাকে ডাকিলাম। আমার পশ্চাতে সেই চীৎকার অত্যাশ্চর্যরূপে প্রতিধ্বনিতে হইল। পশ্চাৎ পাহাড়ের প্রতি চাহিয়া আবার চীৎকার করিলাম, প্রতিধ্বনি আবার পূর্বমত হ্রস্ব দীর্ঘ হইতে হইতে পাহাড়ের অপর প্রান্তে চলিয়া গেল। আবার চীৎকার করিলাম, শব্দ কোন একটি বিশেষ স্তর অবলম্বন করিয়া যায়। সেই স্তর যেখানে উঠিয়াছে বা নামিয়াছে, শব্দও সেইখানে উঠিতে নামিতে থাকে।

[পালামৌ : সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

২১। মনুষ্যের মন যথার্থ অভিমানে অলংকৃত হইলে, উহার আশা এবং আকাঙ্ক্ষা ক্রমেই উর্দ্ধদিকে আরোহণ করে। তখন পর-শ্রীতে তাহার কাতরতা হয় না। হৃদয় পরের সৌভাগ্যে খিন্ন হইলে, অভিমানী আপনার নিকট আপনি অপরাধী হয়, এবং ঐ ক্ষুদ্রতা অনুভব করিয়া লজ্জায় মরিয়া যায়। যে আপনাকে অপদার্থ, অকর্মণ্য এবং সর্বতোভাবে সারশূন্য বিবেচনা না করে, সে অন্যদীয় সম্পদে কদাপি বিষণ্ণ হইতে পারে না। অভিমানী কাপুরুষের মত, অগোচরে আক্রমণ করে না, অন্ধকারে আঘাত করতে জানে না, এবং একবারের পরিবর্তে শতবার মরিতে হইলেও অযোগ্যস্থলে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে দণ্ডায়মান হয় না। কবির কল্পনা বল আর ইতিহাস বল, 'মহাবাহু ভীষ্ম, শিখণ্ডীর দুর্বল -কর-নিক্ষিপ্ত শর-নিকরে রোমে রোমে বিদ্ধ হইয়াও, তাঁহাকে ফিরিয়া আঘাত করিতে পারেন নাই। যে জাতীয় লোকেরা নীচ প্রকৃতি ও স্বার্থপর তাহাদিগের মধ্যে সম্মুখ সংগ্রাম অপেক্ষা উপাংশু হত্যা অধিক প্রচলিত, বীরাচার অপেক্ষা ছদ্ম ব্যবহার ও ছলনারই অধিক আদর, এবং প্রকৃত বীরপুরুষ অপেক্ষা কপট-কুশল কার্য্যসাধকেরই অধিক সম্মান। তাহারা সাধনের প্রণালীর প্রতি দৃষ্টি করে না, সিদ্ধিই তাহাদিগের সর্বস্ব। পক্ষান্তরে, যে জাতীয়দিগের অন্তরে অভিমানের অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে, তাহাদের রীতি-নীতি সর্বাংশে ইহার বিপরীত। তাহারা যাহা কিছু করে, মধ্যাহ্নমার্তণ্ডও তাহার সাক্ষী

থাকেন। সিদ্ধি হউক, কি না হউক, তাহারা ব্যস্ত হয় না ; সাধনপদ্ধতিতে কোনরূপে কলঙ্কস্পর্শ না হয়, ইহাই তাহাদিগের মুখ্য চিন্তা। [অভিমান : কালীপ্রসন্ন ঘোষ]

২২। আমাদের কর্তব্য প্রধানতঃ আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা নির্ধারিত হয়। কর্তব্যের ভিতর কিছু বড়-ছোট থাকিতে পারে না। সকাম কর্মীই—তাহার অদৃষ্টে যে কর্তব্য পড়িয়াছে, তাহাতে বিরক্তি প্রকাশ করে। অনাসক্ত কর্মীর পক্ষে সকল কর্তব্যই সমান এবং ঐগুলিই অমোঘ অস্ত্র হইয়া তাহার স্বার্থপরতা ও ইন্দ্রিয়পরতা বিনষ্ট করে এবং সাধক মুক্তির পথে অগ্রসর হয়। আমরা যে কার্যে বিরক্তি প্রকাশ করি, তাহার কারণ—আমরা সকলেই নিজেদের খুব ভাবিয়া থাকি, কিন্তু আন্তরিকতার সহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলেই আমরা নিম্ন-অবস্থানির্দিষ্ট অতি ক্ষুদ্র কর্তব্যগুলিরও ঠিকঠিক সম্পাদনে স্বীয় অক্ষমতা বুঝিতে পারি এবং তাহাতে আমরা নিজেদের সম্বন্ধে যে সকল উচ্চ ধারণা পোষণ করিতাম, তাহা স্বপ্নের ন্যায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।···প্রকৃতিই সর্বদা কঠোরভাবে প্রত্যেকের কর্মানুযায়ী ন্যায়সঙ্গত ফলবিধান করিয়া থাকে—তাহার একচুলও এদিক ওদিক হইবার নয়। সেইজন্য আমরা স্বীকার করিতে ইচ্ছুক না হইলেও প্রকৃত-পক্ষে আমাদের কর্মফল অনুসারেই আমাদের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। আমাদের অতি নিকটেই যে কর্তব্য রহিয়াছে—যাহা আমাদের হাতের গোড়ায় রহিয়াছে তাহা উত্তমরূপে নির্বাহ করিয়াই আমরা ক্রমশঃ শক্তি বাড়াইতে বাড়াইতে ক্রমে আমরা এমন অবস্থায় পৌছিতে পারি, যে সময়ে আমরা সমাজে সর্বাপেক্ষা সম্মানজনক কর্তব্যপালন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিব। [কর্তব্য কি : বিবেকানন্দ]

২৩। ওহে দেব, ভেঙ্গে দাও ভীতির শৃঙ্খল
ছিঁড়ে দাও লাজের বন্ধন,
সমুদয় আপনারে দিই একেবারে
জগতের পায়ে বিসর্জন।
স্বামিন্ নির্দেশ তব হৃদয়ে ধরিয়া
তোমারি নির্দিষ্ট কাজ,—
ছোট হোক, বড় হোক, পরের নয়নে,
পড়ুক বা না পড়ুক, তাহে কেন লাজ ?
তুমি জীবনের প্রভু, তব ভৃত্য হয়ে
বিলাইব বিভব তোমার ;
আমার কি লাজ, আমি ততটুকু দিব,
তুমি দেছ যে-টুকুর ভার।
ভুলে যাই আপনারে, যশ অপবাদ
কভু যেন স্মরণ না আসে,
প্রেমের আলোক দাও, নির্ভয়ের বল,
তোমাতেই তৃপ্ত কর দাসে।

[কামনা : কামিনী রায়]

২৪। বৈজ্ঞানিক ও কবি উভয়েরই অনুভূতি, অনির্বচনীয় একের সন্ধানে বাহির হইয়াছে। প্রভেদ এই, কবি পথের কথা ভাবেন না, বৈজ্ঞানিক পথটাকে উপেক্ষা করেন না। কবিকে সর্বদা আত্মহারা হইতে হয়, আত্মসম্বরণ করা তাঁহার পক্ষে অসাধ্য। কিন্তু কবির কবিত্ব নিজের আবেগের মধ্য হইতে তা প্রমাণ বাহির করিতে পারে না; এজন্য তাঁহাকে উপমার ভাষা ব্যবহার করিতে হয়। সকল কথায় তাঁহাকে 'যেন' যোগ করিয়া দিতে হয়।

বৈজ্ঞানিককে যে পথ অনুসরণ করিতে হয় তাহা একান্ত বন্ধুর, এবং পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের কঠোর পথে তাহাকে সর্বদা আত্মসম্বরণ করিয়া চলিতে হয়। সর্বদা তাঁহার ভাবনা পাছে নিজের মন নিজেকে ফাঁকি দেয়। এজন্য পদে পদে মনের কথাটা বাহিরের সঙ্গে মিলাইয়া চলিতে হয়। দুই দিক হইতে যেখানে না মিলে সেখানে তিনি এক দিকের কথা কোনমতেই গ্রহণ করিতে পারেন না।

ইহার পুরস্কার এই যে তিনি যেটুকু পান তাহার চেয়ে কিছুমাত্র বেশী দাবী করিতে পারেন না বটে, কিন্তু সেটুকু তিনি নিশ্চিতরূপেই পান, এবং ভাবী পাওয়ায় সম্ভাবনাকে তিনি কখন কোন অংশে দুর্বল করিয়া রাখেন না।

কিন্তু এমন যে কঠিন নিশ্চিতের পথ, এই পথ দিয়াও বৈজ্ঞানিক সেই অপরিসীম রহস্যের অভিমুখেই চলিয়াছেন। এমন বিস্ময়ের রাজ্যের মধ্যে গিয়া উত্তীর্ণ হইতেছেন যেখানে অদৃশ্য আলোকরশ্মির পথের সম্মুখে স্থূল পদার্থের বাধা একেবারেই শূন্য হইয়া যাইতেছে, এবং যেখানে বস্তু ও শক্তি এক হইয়া দাঁড়াইতেছে। এইরূপ হঠাৎ চক্ষুর আবরণ অপসারিত হইয়া এক অচিন্তনীয় রাজ্যের দৃশ্য যখন বৈজ্ঞানিককে অভিভূত করে, তখন মুহূর্তের জন্য তিনিও আপনার স্বাভাবিক আত্মসম্বরণ করিতে বিস্মৃত হন, এবং বলিয়া উঠেন 'যেন নহে—এই সেই'।

[অব্যক্ত : বিজ্ঞানে সাহিত্য : জগদীশচন্দ্র বসু]

২৫। আত্মরক্ষণ ও বংশরক্ষণ—জীবনরক্ষার এই দুই উপায় ছাড়া মানুষের আরো একটু বৈশিষ্ট্য আছে। মানুষ অতি দুর্বল, পঙ্গু, সবল শত্রুর নিকট আত্মরক্ষার জন্য সে আর একটা কৌশল আশ্রয় করিয়াছে। মানুষ দল বাঁধিয়া বাস করে, সেই দলের নাম সমাজ। দল বাঁধিয়া থাকিতে হইলে স্বাধীনতাকে ও স্বাতন্ত্র্যকে সংযত করিতে হয়—নতুবা দল ভাঙিয়া যায়। যে পাশব প্রবৃত্তি সমাজকে তুচ্ছ করিয়া মানুষকে কেবল আত্মরক্ষার দিকে প্রেরিত করে, দশের কল্যাণার্থ মানুষ সেই পাশবিক প্রবৃত্তির সংযমে বাধ্য হয়। এই জন্য যে বুদ্ধি আবশ্যক, তাহার নাম ধর্মবুদ্ধি। ইহা বিশিষ্টরূপে মানবধর্ম। ইহা সমাজ রক্ষার অনুকূল, ইহা লোকস্থিতির সহায়। আত্মরক্ষার ও বংশরক্ষার অভিমুখে যে সকল প্রবৃত্তি তাহা মানুষকে এক পথে প্রেরণ করে আর মানুষের ধর্মবুদ্ধি যাহা মুখ্যতঃ সমাজরক্ষার অর্থাৎ লোকস্থিতির অনুকূল, গৌণতঃ আত্মরক্ষার অনুকূল মাত্র, তাহা মানুষকে অন্যদিকে প্রেরণ করে। সামাজিক মানুষকে

এই দুই টানাটানির মধ্যে পড়িয়া সামঞ্জস্যবিধানের জন্য চেষ্টা করিতে হয়। এই সামঞ্জস্য স্থাপনের নিরন্তর চেষ্টাই মানুষের নৈতিক জীবন।

[পশ্চিমবঙ্গ উঃ মাঃ ১৯৮৪]

২৬। বিধাতা ভারতবর্ষের মধ্যে বিচিত্র জাতিকে টানিয়া আনিয়াছেন ভারতবর্ষীয় আর্য যে শক্তি পাইয়াছে সেই শক্তিচর্চা করিবার অবসর ভারতবর্ষ অতি প্রাচীনকাল হইতেই পাইয়াছে। ঐক্যমূলক যে সভ্যতা মানবজাতির চরম সভ্যতা, ভারতবর্ষ চিরদিন ধরিয়া বিচিত্র উপকরণে তাহার ভিত্তিনির্মাণ করিয়া আসিয়াছে। পর বলিয়া সে কাহাকেও দূর কার নাই, অনার্য বলিয়া সে কাহাকেও বহিষ্কৃত করে নাই, অসঙ্গত বলিয়া সে কিছুকেই উপহাস করে নাই। ভারতবর্ষ সমস্তই গ্রহণ করিয়াছে। সমস্তই স্বীকার করিয়াছে। এত গ্রহণ করিয়াও আত্মরক্ষা করিতে হইলে এই পুঞ্জীভূত সামগ্রীর মধ্যে নিজের ব্যবস্থা নিজের শৃঙ্খলা স্থাপন করিতে হয়—পশু-যুদ্ধ ভূমিতে পশুদলের মতো ইহাদিগকে পরস্পরের উপর ছাড়িয়া দিলে চলে না। ইহাদিগকে বিহিত নিয়মে বিভক্ত স্বতন্ত্র করিয়া একটি মূল ভাবের দ্বারা বধ করিতে হয়। উপকরণ সেখানকার হউক সেই শৃঙ্খলা ভারতবর্ষের, সেই মূল ভাবটি ভারতবর্ষের।

[ত্রিপুরা উঃ মাঃ ১৯৮৪]

সংলাপ বা কথোপকথন

সেই আদিযুগে মানুষ যখন সত্যিই ছেলেমানুষ তখন পরস্পর ভাববিনিময় করেছে ইঙ্গিতে-ইশারায়। তারপর তার মুখে ফুটল ভাষা। এই ভাষা মানুষকে বাঁধল একসূত্রে। দৈনন্দিন জীবনে কথার মালা গেঁথে চলি আমরা। সমাজ-জীবনের ভিত্তিই হল কথোপকথন।

সাহিত্যে এই সংলাপ বা কথোপকথনের উৎস-সন্ধানে আমাদের যেতে হবে ঋগ্‌বেদের সূক্ত-জগতে। সেখানে সংবাদ বা আখ্যান-সূক্তগুলোতে আমরা পাচ্ছি যম ও যমী (১০.১০), সরমা ও পণি (১০.১০৮), পুরূরবা ও উর্বশীর (১০.৯৫) কথোপকথন।

পণি-দস্যুদের সঙ্গে বাদানুবাদ করছে সরমা :

পণি। কেন এসেছ তুমি ?

সরমা। ইন্দ্রের দূতী হয়ে এসেছি। তোমরা যে গোধন সংগ্রহ করেছ, তা নেব বলেই এসেছি।

পণি। ইন্দ্রই বরং আসুন, যদি পারেন তিনিই আমাদের গোধনের অধিকারী হোন।

সরমা। ইন্দ্রকে পরাজিত করতে পারে এমন কেউ নেই।

পণি। আমাদের গাভী থেকে কয়েকটি তবে তুমি নাও। বিনা যুদ্ধে কে তোমাকে এই গাভী দিত ?

সরমা। তোমরা যেন ইন্দ্রের বাণের লক্ষ্য হয়ো না।

ম্যাক্‌সমুলার, লেভি, হার্টেল প্রমুখ মনীষীরা মনে করেন, ঋগ্‌বেদের এই ধরনের কথোপকথন থেকেই আমরা নাটকের ধারণা পেয়েছি।

ব্রাহ্মণ ও উপনিষদেও নাট্যধর্মী সংলাপ আছে। পুরাণে ও মহাকাব্যেও সংলাপের প্রয়োগ বক্তব্যবিষয়কে সরস করে তুলেছে। কালিদাসের কুমারসম্ভব ও রঘুবংশের সংলাপ-অংশ সাহিত্যের বিশেষ সম্পদ।

বাংলা সাহিত্যে সংলাপ যে কেবল নাটকেরই প্রকাশমাধ্যম তা নয়, উপন্যাসেও এই সংলাপ চরিত্রচিত্রণের সহায়ক। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—সকলেই উপন্যাসে নাট্যধর্মী সংলাপ ব্যবহার করেছেন। চার অধ্যায়ের অতীন আর এলার একটু সংলাপ শুনি আমরা—

'এককালে আমি ছিলুম নিখুঁত ভদ্রলোক, খোলসটা তুমিই দিয়েছ ঘুচিয়ে।
বর্তমান বেশভূষাটা দেখছ কী রকম ?'

'অভিধানে ওকে 'বেশভূষা' বলে না।'

'কী বলে তবে ?'

'শব্দ পাচ্ছিনে খুঁজে। বোধ হয় নেই। জামার সামনেটাতেই ঐ যে বাঁকাচোরা ছেঁড়ার দাগ, ও কি তোমার স্বকৃত সেলাইয়ের লম্বা বিজ্ঞাপন ?'

'ভাগ্যের আঘাত দারুণ হলেও বুক পেতেই নিয়ে থাকি—ওটা তারই পরিচয়। এ জামা দরজিকে দিতে সাহস হয় না, তার তো আত্মসম্মানবোধ আছে।'

'আমাকে দিলে না কেন ?'

'নবযুগের সংস্কারভার নিয়েছ, তার উপরে পুরোনো জামার সংস্কার ?'

'ওটাকে সহ্য করার এমন কী দরকার ছিল ?'

'যে দরকারে ভদ্রলোক তার স্ত্রীকে সহ্য করে।'

'তার অর্থ ?'

'তার অর্থ, একটার বেশি নেই বলে।'

'কী বল তুমি অন্তু। বিশ্বসংসারে তোমার ওই একটি জামা বই আর নেই ?'

'বাড়িয়ে বলা অন্যায়, তাই কমিয়েই বললুম। পূর্ব আশ্রমে শ্রীযুক্ত অতীন্দ্রবাবুর জামা ছিল বহুসংখ্যক ও বহুবিধ। এমন সময়ে দেশে এল বন্যা। তুমি বক্তৃতায় বললে, যে অশ্রুপ্লাবিত দুর্দিনে (মনে আছে অশ্রুপ্লাবিত বিশেষণটা ?) বহু নরনারীর লজ্জা রক্ষার মতো কাপড় জুটছে না, সে সময়ে আবশ্যকের অতিরিক্ত যার কাপড় আছে লজ্জা তারই।...'

এই বুদ্ধিদীপ্ত সকৌতুক সংলাপে পাত্রপাত্রীকে যেন দর্পণের মতো দেখা গেল, এ দুজনের অতীত আর বর্তমানের তফাতটি এ লঘুসংলাপে আশ্চর্যসুন্দর ভাবে ফুটে উঠল। এসব নাটকের সংলাপ, কিন্তু দৈনন্দিন জীবননাট্যেও তো সংলাপ রচনা করে চলেছি অহোরাত্র। দুজনে বা কয়েকজনে যখনই এক সঙ্গে যাচ্ছি, তখনই শুরু হচ্ছে আলাপচারী, আর এই আলাপচারী যখন সহজ সরল বা জীবন্ত হয়ে ওঠে, তখন কিন্তু আমরা অজ্ঞাতেই সংলাপের কিছু শিল্প-গত নিয়ম মেনে চলি। লিখিত সংলাপে আমরা কথ্য সংলাপেরই অনুকরণ করি।

ভাষাচর্চায় এই সংলাপরচনা একটি চিত্তাকর্ষক অনুশীলন। লক্ষ্য রাখতে হবে :

১. সংলাপের ভাষা হবে সহজ, সরল ও স্বাভাবিক।

২. কথোপকথন হবে বাগ্‌বিধি-সম্মত।

৩. কথোপকথন হবে সজীব, সেজন্যে কৌতুক বা হাস্যরসের স্পর্শটুকু কাজে আসবে।

৪. সংলাপ হবে চরিত্রানুগ।

৫. কথোপকথনে প্রতি-চরিত্রই প্রায় সমান সমান অংশ নেবে। একজন অনেক কথা বলে গেলেন আর একজন চুপ করে রইলেন, এমন হলে সংলাপ জমে না। কথার পৃষ্ঠে কথা এলেই কথার চকমকিতে আসে বৈচিত্র্য ও সরসতা।

৬. যুক্তিক্রম সংলাপে অবশ্যই থাকবে।

৭. সংলাপে প্রথমে বিষয়-উপস্থাপনের পর তারই ব্যাপ্তি ঘটবে ক্রমশ, শেষের দিকে থাকবে উপসংহৃতি, কথা যে শেষ হল এমন একটা ভাব থাকা চাই।

৮. লেখা হয়ে গেলে একবার নিজেই শ্রোতা হয়ে শুনতে হবে, নাট্যরসের আস্বাদ পাওয়া যাচ্ছে কিনা।

৯. কোনো নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের নির্দেশ না থাকলেও সংলাপগুলো ২০০ শব্দের মধ্যে হলেই ভালো।

সংলাপ-সম্বন্ধে কয়েকটি বিশিষ্ট উক্তি

The first ingredient to conversation is truth; the next, good sense; the third, good humour; and the fourth, wit.

—Sir W. Temple (1628-99), English Statesman.

In conversation, humour is more than wit, and easiness more than knowledge. —Sir W. Temple

The tone of good conversation is brilliant and natural.—It is neither tedious nor frivolous.

—Rousseau. J. J. (1712-78), French Philosopher.

Good talk is like good scenery—continuous, yet constantly varying and full of the charm of novelty and surprise.

—Randolph S. Bourne (1886-1918), American Author.

॥ সংলাপের উদাহরণ ॥

১। নামে কী আসে যায়? (দুই ভাইয়ের মধ্যে আলোচনা)

ধ্রুব। বুবাইটার ভাল নাম কী রাখা যায় বল তো?

উদয়। তাতে তোর এত চিন্তা কেন বল্ তো ধ্রুব?

ধ্রুব। ভাবনা কি আর সাধে? কাকা যদি সেকেলে নামটাম কিছু একটা রেখে বসেন তা হলেই তো চিত্তির!

উদয়। রাখলই বা, নামে কী এসে যায়?

ধ্রুব। নামই সব। মানুষের সমস্ত সত্তার সঙ্গে নামটা থাকে জড়িয়ে। 'What's in a name?' একথা আমি মানি না। কারো খারাপ নাম রাখা আর তার সর্বনাশ করা আমার কাছে সমার্থক।

উদয়। আচ্ছা, ঠিক আছে। ভাবাই যাক ভাল দেখে কিছু নাম। আচ্ছা, 'দীপক' নামটা কেমন লাগে তোর?

ধ্রুব। একেবারে বস্তাপচা। দশ জন এক জায়গায় থাকলে এক জনের নাম 'দীপক' হবেই।

উদয়। তবে 'তন্ময়'?

ধ্রুব। ও একই গোত্রের।

উদয়। দ্যুতিমান্?

ধ্রুব। নামটা ভালো শোনাচ্ছে বটে। তবে আরও দু-চারটে ভাবো দেখি।

উদয়। না, এবার তুই বল্ কতগুলো।

ধ্রুব। আমি গুচ্ছের নাম ভাবছি আর cancel করছি—অরূপ, অভীক, আর্য, কাঞ্চন, কুশল, কৌশিক, গগন—

উদয়। তুই যে নামের অভিধান বানিয়ে ফেলবি দেখছি। দেখ্, গগন নামটা আমার ভালো লাগছে। তবে শুধু 'গগন', তার সঙ্গে ইন্দু বা ইন্দ্রটিন্দ্র কিছু না!

ধ্রুব। বলছ?

উদয়। হ্যাঁ রে!

ধ্রুব। আচ্ছা, আপাতত ওটাকে cancel না-ই করলাম, তবে ভাবতে হবে আরও। তুমিও ভেবো।

উদয়। আমি আর ভাবব না, ডাকনাম বলিস্ তো সহস্র নাম বলে দিতে পারি। টুকুন, টুটুন, টুম্বা, টিংকু, বুম্বা, বুবুন।

ধ্রুব। থাক্ থাক্, আর বলতে হবে না। ওসব অনার্য নাম দিয়ে আপাতত আমার দরকার নেই। চল্লাম দাদা, টোটন ডাকছে। আজ আমাদের ফাইন্যাল ম্যাচ।

২। পুজো-প্যাণ্ডেলে মাইক (দুই নাগরিকের মধ্যে)

— আর বলবেন না মশাই। পুজো-টুজো কিছু নয়, ঐ মাইকই দেবতা। কান ঝালাপালা হয়ে গেল একেবারে।

— ও, আপনার একটু-আধটু সহ্য করতে হবে বই কি! পুজো করছে কারা দেখবেন তো। কাঁচা বয়সের ছেলেপিলে সব। একটু উৎসবের আবহাওয়া আনতে চায়, তাই মাইকে গান বাজায়।

— তাই বলে রুচির কোন বালাই নেই! রাদ্দিন ঐ হিন্দী সিনেমার গান?

— হ্যাঁ, সে কথা বলতে পারেন। হিন্দী গান না বাজিয়ে সানাই বা অন্য ভক্তিমূলক গান কিংবা রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ বা নজরুলের গান—এসব বাজাতে পারে। কিন্তু মাইক তো রইলই।

— তবু সে কানে সহ্য হবে, এ যে একেবারে অসহ্য। আইন করে বন্ধ করা উচিত এসব।

— দেখুন, ওদের দোষ কী? অপসংস্কৃতির হাওয়াটা দেশ জুড়ে। একটু লঘু আনন্দের দিকে যদি ওদের ঝোঁক হয় তাতে আর অবাক হবার কি আছে?

— কিন্তু এর কি কোন প্রতিকার নেই!

— আমার মনে হয় কি জানেন, আমরা যদি পিছনে সমালোচনা না করে

ওদের সঙ্গে এ ব্যাপারে আলোচনা করি, ওদের বুঝিয়ে বলি, তাতে কাজ হতে পারে। আসলে আমরাই ওদের থেকে আমাদের দূরত্ব ক্রমশ বাড়িয়েই চলেছি, কমাতে চেষ্টা করি নি।

— আপনি কি বলতে চান ওরা আমাদের কথা শুনবে। কথা তো শুনবেই না উল্টে আমাদের যাচ্ছেতাই করে বিদ্রূপ করবে।

— দেখুন, approach-টাই সব। সেভাবে ওদের মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালে ওরা আমাদের অবজ্ঞা করবে না। অনেক ভাল element এদের মধ্যে আছে বলে আমি মনে করি। ঠিক জায়গায় ঠিকভাবে আবেদনটা গিয়ে পৌঁছলে সাড়া পাওয়া যাবেই।

— মাফ করবেন, অতটা আশাবাদী হতে আমি পারব না।

— কিছু মনে করবেন না, ঐখানেই তো গলদ।

৩। Objective type বনাম Essay type প্রশ্ন (দুই বন্ধুর মধ্যে)

পার্থ। মাধ্যমিক পরীক্ষার objective type প্রশ্নের সঙ্গে আমাদের ভালরকমই পরিচয় হয়েছে। অল্পস্বল্প কলমের আঁচড়েই নম্বরের মিটারটা হুহু করে বেড়েছে।

পবিত্র। কারণ উত্তরগুলো সব এক-আধ কথার। আগেকার প্রশ্নের ধরন ছিল আলাদা। উত্তরগুলো ছিল essay type বা রচনাধর্মী। ওতে ব্যক্তিবিশেষের মনের প্রতিফলন হত এক-একরকম ভাবে। এর মূল্যায়নও হত ব্যক্তিবিশেষে এক-এক রকম। কিন্তু objective type টেস্ট-এ একটাই উত্তর শুধু। দ্বিমতের অবকাশ নেই। তাই নম্বরের বেলাতে uniformity বজায় থাকবে।

পার্থ। বুঝলাম, কিন্তু সাহিত্যে শুধু objective type test কি চলে? ভাষা অনুশীলনের দিকটাতেই তো ভাটা পড়ে এতে।

পবিত্র। ঠিক তাই। আর এই জন্যেই objective type-এর সঙ্গে short-answer type প্রশ্নের চল হয়েছে। যখন জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে কবিতাটির নাম 'মধ্যাহ্ন' না হয়ে 'মধ্যাহ্নে' হল কেন? তখন কবিতাপাঠের যা মূল লক্ষ্য সেই appreciation বা উপলব্ধির মধ্যেই আমরা গিয়ে পড়ছি।

পার্থ। আমার মনে হয় রচনাধর্মী প্রশ্নই সাহিত্যে থাকা উচিত, কারণ সাহিত্য-উপলব্ধি যাচাই করতে হলে ঐরকম প্রশ্নই হবে মাপকাঠি। Objective type-এ এক-আধটা শব্দের ফুলকি তুলে কবিতার প্রাণের সঙ্গে পাঠকের যোগের পরিচয়টা তো পাওয়া সম্ভবপর নয়।

পবিত্র। হ্যাঁ, সেই জন্যেই আমরা চাই objective type প্রশ্নের সঙ্গে সাহিত্যবোধ-মূলক এমন কিছু প্রশ্ন যুক্ত হোক যাতে সাহিত্য-আস্বাদন বিঘ্নিত না হয়।

পার্থ। আসলে প্রশ্ন করাটাই একটা বড় আর্ট।

পবিত্র। হ্যাঁ, আমারও সেই কথা। ও আর্ট যাঁর রপ্ত, objective type question

এর মধ্যে দিয়েও তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের সাহিত্যমুখিতা যাচাই করে নিতে পারেন।

৪। **পুরানো বইয়ের দোকান-সম্বন্ধে** (দুই বন্ধুর মধ্যে)

অরূপ। শেলফে একটা নতুন বই দেখছি ?

চন্দন। হ্যাঁ, নতুন বটে, তবে পুরনো।

অরূপ। মানে ?

চন্দন। কলেজ স্ট্রীটের পুরানো বইয়ের দোকান থেকে কিনেছি।

(শেল্‌ফ্‌ থেকে নিয়ে)

অরূপ। দেখি, Advanced Learners' Dictionary ! কত নিল রে ?

চন্দন। অনেক দরাদরি করে শেষ পর্যন্ত কুড়ি টাকায় পেয়েছি। নতুন দাম এখন বোধ হয় ৬০ টাকায় মত হবে।

অরূপ। সত্যি, পুরনো বইয়ের দোকান উঠে যাবে শুনে মনটা কি খারাপই না হয়েছিল !

চন্দন। কলকাতার ঐতিহ্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত এই পুরনো বইয়ের দোকান।

অরূপ। হ্যাঁ, ঠিক দোকান বললে এর পরিচয়টা ফোটে না, বই-মেলা বলাই ভাল।

চন্দন। হ্যাঁ, ঠিক বলেছিস্‌, বই-মেলাই বটে। আর কী বিচিত্র এই মেলা। খনার বচনের পাশেই হয়তো 'Uncle Tom's Cabin' আর তার পাশেই হয়তো কালিদাসের গ্রন্থাবলীর একটা দুষ্প্রাপ্য খণ্ড।

অরূপ। কলকাতার পড়ুয়া এবং গবেষকদের তো ঐ একটা মাত্রই rendezvous।

চন্দন। বইয়ের সঙ্গে অনেক সময়ে পুরনো দিনের কোন মানুষের ডায়েরিও মিলে যায়।

অরূপ। হ্যাঁ, এমনি-একটা ডায়েরী পাওয়ার গল্প পড়েছিলাম মনে হচ্ছে, কোন পুজোসংখ্যায়। সেটা ছিল এক শিক্ষকের ডায়েরি, তাতে মাইকেল মধুসূদনের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাতের ইন্টারেষ্টিং বর্ণনা ছিল।

চন্দন। আমার মামা শব্দকল্পদ্রুমের একটা সেট পেয়েছিলেন কিছুদিন আগে। সেটা বাংলা হরফে ছাপা প্রথম সংস্করণ।

অরূপ। এই রকম দুর্লভ কিছু পেলে মনে হয়—বেঁচে থাক কলেজ স্ট্রীটের পাড়ায় পুরনো বইয়ের দোকান।

৫। **এবারে কলকাতার 'বই-মেলা'-সম্পর্কে** (দুই বন্ধুর মধ্যে)

অসিত। দেখি, দেখি, কী বই ? (প্রদীপ বইটা অসিতের হাতে দিল) 'Birds of India'। বাঃ, চমৎকার বইটা তো! বই-মেলা থেকে কিনলি নাকি ?

প্রদীপ। তুই গিয়েছিলি নাকি ?

অসিত। হ্যাঁরে, গিয়েছিলাম। তবে আর সেদিন কেনা হয় নি। আবার যাব একদিন। তুই আর কী কী বই কিনলি ?

প্রদীপ। না রে, আর কিছু কিনি নি, তবে দেখেছি দুচোখ ভরে। সত্যি এরকম 'বই-মেলা' যদি মাঝে মাঝেই হয়, কী ভালোই না হয়। বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখা যায়। জানা যায় অনেক কিছুই। হ্যাঁ, বই-সম্বন্ধে আগ্রহ জাগাতে এ ধরনের মেলার খুব প্রয়োজন।

অসিত। সত্যি, বিজ্ঞাপন থেকে তো বইয়ের সবটা বোঝা যায় না। বই-মেলায় বইটা দেখে, contents দেখে যে যার প্রয়োজনমত বই কিনতে পারে। তখন না কিনলেও ক্ষতি নেই। জানা তো রইল, প্রকাশকের নাম-ঠিকানাও টুকে রাখলাম। পরে সুবিধেমত কিনতে পারব।

প্রদীপ। সত্যি, এ ধরনের মেলার তুলনা নেই। এ যেন লক্ষ মাণিকের মেলা !

অসিত। তবে ভাই, মেলার উদ্যোক্তাদের সহস্র ধন্যবাদ দিতে দিতে শুধু একটা কথা বলব। কমিশনের হার বাড়ালে ক্ষতি কী ছিল ? আর্থিকতাকে না হয় উৎসবের আবেষ্টনীতে আর একটু খাটোই করা হত।

প্রদীপ। হ্যাঁ, তাতে বরং লাভই হত বেশি। লোকে অনেক বেশি বই কিনত।

অসিত। আমরা আশা করব পরের বার উদ্যোক্তারা এ বিষয়ে আর-একটু উদার হবেন।

প্রদীপ। আর মেলাটার আয়োজন গরমের দিনে না করে শীতের দিনে করবেন। ঝড়বৃষ্টিতে বইয়েরও তো ক্ষতি হতে পারে।

অসিত। ঠিক বলেছিস।

৬। সাধু বনাম চলিত ভাষা। (দুই বন্ধুর মধ্যে)

অলক। কেমন হ'ল রে তোর বাংলা পরীক্ষা ?

অর্ঘ্য। হয়েছে ভালই, তবে সময় নিয়ে একটু টানাটানি হয়েছে।

অলক। রচনাটা কোন্ ভাষায় লিখেছিস্। সাধু না চলিত ?

অর্ঘ্য। আমি সব উত্তরই সাধু ভাষায় লিখি, তুই ?

অলক। ঠিক উল্টোটা। মানে, সব চলিত ভাষায়। সাধু ভাষা আমার আসেই না। আর মনে হয় যে-ভাষায় আমরা কথা বলি সেই ভাষায় লিখলেই লেখাটা হয় জীবন্ত। না হলে কেমন যেন কৃত্রিমতা থেকে যায়।

অর্ঘ্য। তোর কথাটা ঠিক মানতে পারছি না, অলক। রামমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র—এঁদের সাহিত্যধারায় সাধু ভাষার এমন একটি মার্জিত ও পরিশীলিত রূপ আমাদের মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে আছে, তাকে কৃত্রিম বলতে বাধে। আর কথ্য ভাষার নানান রূপ হতে পারে। এ ভাষাকে বেশি প্রশ্রয় দিলে ভাষায় নানা রকম আঞ্চলিকতার সৃষ্টি হতে পারে।

অলক। আঞ্চলিকতার প্রশ্নই ওঠে না। চলিত ভাষা রবীন্দ্রনাথের কলমেই একটা সর্বসম্মত রূপ পেয়েছে। শেষের দিকে যে তিনি সাধুভাষা সম্পূর্ণভাবে বর্জন করলেন, তাতেই প্রমাণ হয় চলিত ভাষার শক্তির পরিচয় তিনি নিশ্চয়ই পেয়েছিলেন॥ তারপর থেকে সমস্ত সাহিত্যে ও সংবাদপত্রাদিতে চলিত ভাষারই রাজত্ব। রেডিও-টেলিভিশনে সাধু ভাষার কথা তো ভাবাই যায় না।

অর্ঘ্য। কিন্তু তৎসম শব্দ বর্জন করতে করতে চলিত ভাষার অবস্থাটা কী দাঁড়াবে একবার ভেবেছিস? নতুন শব্দ গড়ার ক্ষমতা সংস্কৃতের ধাতু-প্রত্যয়েই আছে, চলিত শব্দে সে সম্ভাবনা নেই বললেই চলে।

অলক। আদর্শ চলিত ভাষায় তৎসম বর্জন করা হয় না মোটেই। আধুনিক কবিতা পড়লেই সেটা টের পাবি। আসল কথা যা সহজ স্বাভাবিক তা চলাই তো ভালো।

অর্ঘ্য। তোর কথা মেনে নিয়েও একথা বলব, সাধু চলিত দুটোই চলুক—যে রচনায় যা মানায়।

অলক। হ্যাঁ, একথা আমিও মানতে রাজী।

৭। অনেকদিন পরে দুই বন্ধুর সাক্ষাৎ

সুদীপ্ত। (এক ট্রেনযাত্রীকে) একটা কলম দেখবেন? আমাদের স্বদেশী প্রতিষ্ঠানের তৈরি পলিথিনের কলম। একবার হাতে নিয়ে দেখুন না।

প্রদোষ। (কলমটা হাতে নিয়ে) আরে, তুই সুদীপ্ত না?

সুদীপ্ত। হ্যাঁ—কিন্তু—।

প্রদোষ। চিনলি না তো, আমি প্রদোষ—

সুদীপ্ত। প্রদোষ! মাই গড্! একদম চিনতে পারি নি। কত বদলে গেছিস! তা কী করছিস এখন?

প্রদোষ। আগে বোস। হ্যাঁ, কী করছি? কী আর করব ভাই, একটা মার্চেন্ট ফার্মে চাকরি করি। 'সদাগরি অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী।'

সুদীপ্ত। যাক তবু তো চাকরি, আমি দেখ না, বছর তিনেক অফিস-পাড়ায় বেকার ঘুরে এই কলমের ব্যবসায়ে নেমে পড়লাম।

প্রদোষ। খুবই ভালই করেছিস। আচ্ছা তোর শ্যামলেন্দুর কথা মনে আছে? সেই যে স্কুল-টিমের ক্যাপ্টেন ছিল।

সুদীপ্ত। কী যে বলিস, শ্যামলেন্দুকে ভুলব? স্কুল-টেস্টে দু-দুবার সেঞ্চুরি-করা ছেলে—শ্যামলেন্দু বোস।

প্রদোষ। অনেকদিন কোন খবর পাইনি ওর, কী করছে বল তো?

সুদীপ্ত। এখন কী করছে জানি না, তবে বছর দুই আগে ওর মেজদার সঙ্গে এই ট্রেনেই দেখা হয়েছিল। তাঁর মুখে শুনেছি ও নাকি নেভিতে চাকরি নিয়ে

বিশ্বভ্রমণ করে বেড়াচ্ছে। মনে নেই? স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দিয়ে ও প্রায়ই বলত যদি একবার বাইরে যাবার সুযোগ পাই তাহলে পৃথিবীটাকে তোলপাড় করে ছাড়ব।

প্রদোষ। হ্যাঁ, হ্যাঁ বলত বটে। অদ্ভুত ছেলে। আর সব খবর কী বল্। স্কুলের দিকে যাস্?

সুদীপ্ত। যাই মাঝে মাঝে, স্কুলের চিপ্ স্টোরে কলম দিতে।

প্রদোষ। বলিস কী, স্কুলে আজকাল চিপ্ স্টোরস হয়েছে নাকি?

সুদীপ্ত। শুধু কি তাই? ক্যানটিন, কমন রুম, আছো কোথায়? তবে একটা দুঃসংবাদ আছে।

প্রদোষ। সে কী?

সুদীপ্ত। আমাদের বাংলার বনমালীবাবু মারা গেছেন।

প্রদোষ। সে কি!

সুদীপ্ত। হ্যাঁ—পড়াচ্ছিলেন ক্লাসে, হঠাৎ বললেন বুকের ভেতরটা কেমন করছে। বলতে বলতেই টেবিলে মাথা রেখে—সব শেষ!

প্রদোষ। ইস! শুনে খুব খারাপ লাগছে, ভারি সুন্দর পড়াতেন। আজও চোখ বন্ধ করলে তাঁর ক্লাসের ছবিটা ভেসে ওঠে। ওঁকে ভুলব না কোন দিন।

সুদীপ্ত। ওপাশে দুটো কলম দিয়েছি, টাকা নেওয়া হয় নি,—এখন চলি। তুই সেই পুরনো বাড়িতেই আছিস তো?

প্রদোষ। হ্যাঁ।

সুদীপ্ত। একদিন দুম্ করে চলে যাব।

প্রদোষ। যাস্, চুটিয়ে গল্প করা যাবে। এই, তোর কলমটা—

সুদীপ্ত। ওটা এখন তোর, লিখিস ওটা দিয়ে। তোর তো কবিতায় হাত ভাল। আমাকে নিয়েই না হয় লিখিস্ একটা কবিতা।

[পলিথিনের কলম, পলিথিনের······আওয়াজটা ক্রমে ম্লান হয়ে আসে।]

৮। কার কোন্‌টি প্রিয় ঋতু (দুই বান্ধবীর মধ্যে)

রমা। এই যা, আবার ঝম্‌ঝম্ করে বৃষ্টি এল। শিগ্‌গির থামবার লক্ষণ নেই দেখছি। কী বিচ্ছিরি এই বর্ষার দিনগুলো।

দীপা। ওমা! বলিস কী রমা! আমার যে এটাই প্রিয় ঋতু—My dearest season. কী ভালোই না লাগে যখন আকাশ কালো হয়ে আসে, সাজো সাজো রব। তারপর 'ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে।'

রমা। শুধু আবৃত্তি কেন? গানটাই গেয়ে ফেল্ না।

দীপা। তুই আবার রেগে যাবি, বর্ষা তো তোর দু' চক্ষের বিষ।

রমা। তাই বলে গানটাও?

দীপা। সত্যি! দেখ, বর্ষা আর রবীন্দ্রনাথের বর্ষার গান কেমন যেন—এক হয়ে গেছে। মানে, আমি ঠিক বোঝাতে পারছি না, কেমন একটা মাখামাখি—

রমা। বুঝেছি বাবা, বুঝেছি। আর আমি বলি, 'কালোর এবার যাওয়াই ভালো।'

দীপা। ও, তোর প্রিয় ঋতু নিশ্চয় শরৎ।

রমা। শরৎ, শরৎ, শরৎ—একশো বার। শরতের তুলনা নেই। বর্ষার পর প্রথম শরতের রোদটা যখন গাছের পাতায় দেখা দেয় তখন—

দীপা। তখন 'আমার নয়ন ভুলানো এলে আমি কী হেরিলাম নয়ন মেলে।'

রমা। হ্যাঁ, ঠিক তাই। অরুণ-রাঙা চরণ ফেলে যখন শরৎ আসে, তখন, সত্যি বলছি, মনটার মধ্যে কেমন করে আনচান করে ওঠে। ও রোদের তুলনা নেই। ও রূপের তুলনা নেই।

দীপা। বর্ষায় আবার শরতের কথা কেন বাপু! খ্যাপা শ্রাবণ আশ্বিনের আঙিনায় ছুটে আসতে পারে, কিন্তু বর্ষার আঙিনায় শরতের আগমন নৈব নৈব চ।

রমা। আচ্ছা, বৃষ্টিটা ধরে গেছে, আজ চলি ভাই।

দীপা। আর একটু বোস না।

রমা। হ্যাঁ বসি, আর সমস্ত পৃথিবীটা আবার জলকলস্বরে কথা কইতে থাকুক, তাই না?

দীপা। তোর কথা থেকে কিন্তু একটা জিনিস ধরা পড়ছে। মুখে যতই বর্ষার নিন্দে করিস না কেন, বর্ষার ওপর তোর দুর্বলতা কিন্তু আছেই।

রমা। কী জানি ভাই! যদি থেকেও থাকে, আমাদের বাড়ির গলিটার সুয়েজখাল পার হতে হতে তা উবে যাবে। না, আর না। এবারে কিন্তু সত্যি উঠছি।

[দীপা গুন্‌গুনিয়ে ওঠে: আজি ঝর ঝর মুখর বাদল দিনে……বাদল দিনে।]

৯। সংস্কৃত-শেখার প্রয়োজনীয়তা (শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে)

শিক্ষক। তোমার সংস্কৃতের মার্কস্ কিন্তু ভালো হয় নি, অসিত।

অসিত। সংস্কৃত, স্যার, আমার পড়তেই তেমন ইচ্ছে করে না। তা ছাড়া, সংস্কৃত পড়েও তো আমাদের লাভ নেই কিছু। তার চেয়ে অন্য বিষয়গুলো—

শিক্ষক। দেখো, অসিত, ঐ যে বললে লাভ কিছু নেই, ও কথাটা একটু ভেবে দেখো। সংস্কৃতভাষায় আমাদের দেশের সমস্ত চিন্তার সম্পদ্ সঞ্চিত। সে সম্পদের কথা তো ভুললে চলবে না।

অসিত। ভাষান্তরের মধ্য দিয়েও আমরা সে সম্পদের সঙ্গে পরিচিত হতে পারি, স্যার। সংস্কৃতের বহু বিষয়ই ইংরাজীতে অনূদিত হয়েছে। বাংলাতেও এই অনুবাদের দিকে জোর দিয়েও আমরা সংস্কৃতের বিষয়গুলোকে সকলে কাছে তুলে ধরতে পারি।

শিক্ষক। তোমার কথাটা ঠিকই অসিত। অনুবাদ আরও বেশি করে হওয়া

দরকার। কিন্তু অমৃতক্ষরা এই ভাষার সঙ্গে আমাদের পরিচয়টা থাকবে না এ ভাবতেই পারা যায় না।

অসিত। অমৃতক্ষরা ভাষা হলেও কেন ছাত্ররা সংস্কৃতের দিকে আকৃষ্ট হচ্ছে না তা তো ভেবে দেখা দরকার, স্যার। আমার মনে হয় text-গুলো তেমন interesting হচ্ছে না। আর ব্যাকরণের বোঝা হয়ে পড়ছে ভারি।

শিক্ষক। হ্যাঁ, এ বিষয়ে ভাববার আছে বৈকি! পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে বৈচিত্র্য আনতেই হবে, আর ব্যাকরণকেও যাতে বোঝা বলে না মনে হয় তার জন্যে নতুনভাবে বই লেখার পরিকল্পনাও নেওয়া দরকার। তবে একটা জিনিস কি জানো অসিত, শ্রদ্ধা নিয়ে পড়লে অনেক কঠিন জিনিসও ক্রমে সহজ হয়ে আসে।

অসিত। হ্যাঁ, স্যার।

শিক্ষক। দেশের ঐতিহ্যের সঙ্গে যে-ভাষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সে ভাষাকে শুধু পরীক্ষাপাশের প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে নয়, এমনিতেও শিখতে হবে। আমাদের জাতীয় সংহতির স্বর্ণসূত্র এই সংস্কৃত।

অসিত। আমার মনে হয়, স্যার, এই ভাবগুলো ছাত্রদের মনে সঞ্চারিত করে দেবার জন্যে সুপরিকল্পিত আয়োজন চাই, আর চাই ভালো পাঠ্যবই, আর কঠিনকে সহজ করার বিজ্ঞানসম্মত উদ্যম।

শিক্ষক। এ বিষয়ে সত্যিই কোনো দ্বিমতের অবকাশ নেই, অসিত।

১০। ফুটবলে দলত্যাগ নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে

অভিজিৎ। খবর শুনেছিস তো?

সুমিত। কোন্ খবরের কথা বলছিস?

অভিজিৎ। আর কোন্ খবর? আমাদের টিম তো এবার কানা।

সুমিত। তা, মাঠের শক্ত একটা খুঁটি নড়ল বটে।

অভিজিৎ। এই দল-ভাঙাভাঙির খেলা অবিলম্বে বন্ধ হওয়া দরকার। এ তো খেলাভাঙার খেলা!

সুমিত। তা যা বলেছিস! কলকাতার প্রথম ডিভিসনে ফুটবল ক্লাবগুলোতে দলত্যাগের ব্যাপারটা আমি বুঝেই উঠতে পারি না।

অভিজিৎ। আমিও। খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত মুনাফা কী হয় জানি না। কিন্তু সত্যিকারের খেলাটা হয় মাটি। দলত্যাগী খেলোয়াড়দের খেলার মানও অনেক সময়ে নেমে যায়।

সুমিত। ঠিক বলেছিস। তা ছাড়া, প্রায়ই দেখা যায় অনেক উঠতি খেলোয়াড় গ্ল্যামারের ফাঁদে পড়ে বড় ক্লাবে গেল, কিন্তু খেলবার সুযোগ না পেয়ে বসে রইল। ফলে তার career হল নষ্ট। তা ছাড়া, এতে ছোটোছোটো ক্লাবগুলোও ক্ষতিগ্রস্ত হয় প্রতিশ্রুতিপূর্ণ খেলোয়াড় পেয়েও হারায় বলে।

অভিজিৎ। শুধু কি গ্ল্যামারের মোহ? টাকার টোপও রয়েছে যে! কিন্তু এটা ঠিক যে, টাকা দিয়ে হয়তো খেলোয়াড় কেনা যায় কিন্তু খেলা কেনা যায় না। ভালো খেলোয়াড় হয়তো নতুন টিমে এল, কিন্তু সে তো জলের মাছ ডাঙায়। নতুন দলে এসে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিতে নিতেই সিজন চলে যায়, টিম-স্পিরিট খুঁজে পায় না। হতাশায় ভুগতে থাকে।

স্মিত। সত্যি, টিম স্পিরিটটা বড়ো জিনিস। ক্লাবের প্রতি ভালোবাসাই খেলোয়াড়কে আদর্শ খেলোয়াড় করে তোলে।

অভিজিৎ। খেলোয়াড়দের প্রতি ক্লাবেরও সহৃদয় এবং সস্নেহ মনোভাব থাকা দরকার। যথার্থ স্নেহের বন্ধনে খেলোয়াড়দের বেঁধে রাখবার চেষ্টা ক্লাব-কর্তৃপক্ষকে করতে হবে বৈকি!

স্মিত। একশো বার। ক্লাব ও সংশ্লিষ্ট খেলোয়াড়দের পারস্পরিক সৌহার্দ্যে ও শুভেচ্ছায় ঘটবে দলের উন্নতি, খেলা ও খেলোয়াড়ের উন্নতি এবং তবেই বন্ধ হবে খেলার নামে ছেলেখেলা।

১১। মৌখিক পরীক্ষার অভিজ্ঞতা

(দুই বন্ধুর কথোপকথন)

পিনাকী। যাক্, একটা ঝামেলা মিটল। এবার ক'টা দিন একটু নিশ্চিন্তে ঘুমোব।

সুদাম। ঘুমোবি কী রে! কয়েক সপ্তাহ বাদেই তো আবার লিখিত পরীক্ষা। একটু হাঁফ ছাড়বার উপায় আছে?

পিনাকী। লিখিত পরীক্ষায় 'ভীত নয় এ বীর হৃদয়'। মৌখিক পরীক্ষাটা নিয়েই আমার যত ভয় ছিল। মাস্টার মশায়ের সামনে দাঁড়িয়ে বাছা বাছা প্রশ্নের উত্তর করা! ওঃ, যেন অভিমন্যুর অবস্থা।

সুদাম। তোর কথা আংশিক মেনে নিয়েও বলব মৌখিক পরীক্ষাটাই সুবিধেজনক। শাস্ত্রে বলে, 'শতং বদ মা লিখ', লিখতে গেলেই ভাষার প্রশ্ন, ব্যাকরণের সমস্যা, বানানের উৎপাত। তার উপর আবার ভাবের অভাব। দুম-দাম দু' কথা বলা যায়, কিন্তু অত সহজে কি লেখা যায়? কলমের স্খলনে নর্মদা হয় নর্দমা।

পিনাকী। আচ্ছা, তোদের কি বিকল্প প্রশ্ন জিজ্ঞেস করা হয়েছে?

সুদাম। হ্যাঁ, একটা প্রশ্নের উত্তর না পারলে স্যার বিকল্প হিসেবে আর একটা প্রশ্ন করেছেন। আমি ভূগোলে প্রথম প্রশ্নের উত্তরই দিতে পারি নি। তার বিকল্প হিসেবে স্যার যেটা জিজ্ঞেস করলেন সেটা পারলাম।

পিনাকী। আমি কিন্তু ভাই ইতিহাসে দু-তিনটে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি নি। কেমন যেন ঘাবড়ে গেলাম। কিন্তু হল থেকে বেরোবার পর, সবকটার উত্তরই মনে পড়ে গেল। মৌখিক পরীক্ষায় এটাও একটা অসুবিধে, চিন্তা করার সময় পাওয়া যায় না।

সুদাম। ওটাও তো একটা পরীক্ষা। কে কত চটপট্ জবাব দিতে পারে সেটাও পরীক্ষকের দ্রষ্টব্য।

পিনাকী। তার মানে মৌখিক পরীক্ষায় আদবকায়দা থেকে শুরু করে উপস্থিতবুদ্ধি, সব কিছুরই প্রয়োজন। কিন্তু যারা লাজুক-প্রকৃতির, নার্ভাস—

সুদাম। তাদের জন্যে লিখিত পরীক্ষা তো আছেই। সেটাতে পুষিয়ে নিতে হবে।

পিনাকী। তা বটে! ফার্স্ট ইনিংসে জিরো, সেকেণ্ড ইনিংসে হিরো আর কি!
(দুজনের হাসি।)

১২। 'লৌকিকতা' নিয়ে দুই বান্ধবীর আলোচনা

মিতা। কাল তা হলে কখন আসছিস আমাদের বাড়ি?

কলি। না ভাই, কাল আসতে পারছি না।

মিতা। কেন রে?

কলি। আর বলিস না, যেতে হবে এক আত্মীয়ের বাড়ি, বৌ-ভাতের নেমন্তন্ন। সেই নিউ আলিপুরে।

মিতা। কী দিচ্ছিস, শাড়ি নাকি?

কলি। তা আর বলতে? মিনিমাম ধর, ৫০ টাকা আর যাতায়াত অন্তত ১৫, ৬৫ টাকার ধাক্কা আর কি। মানে লৌকিকতার 'প্রত্যক্ষ' কর!

মিতা। অমন করে বলছিস কেন? লৌকিকতাটাকেই বড়ো করে দেখছিস কেন? ওর মধ্যে অন্তরের স্পর্শও তো আছে।

কলি। ওসব sentiment আমার নেই। তারপর ধর, যাব, কোন্ ব্যাচে যে ডাক পড়বে ঠিক নেই। ফিরতে সেই রাত এগারোটা, সময়েরও তো একটা দাম আছে। আমার মনে হয় এই লৌকিকতা জিনিসটা national wastage.

মিতা। তোর কথা আমি ঠিক মানতে পারলাম না ভাই। লৌকিকতাটুকু আছে বলেই আমাদের সমাজবাঁধুনিটা আছে, এখনও যার-যার তার-তার ভাবটা এত প্রকট হয় নি।

কলি। ওসব বুঝি না বাবা। আজ বিয়ে, কাল অন্নপ্রাশন, পরশু কারো জন্মদিন, উঃ, একেবারে—

মিতা। আমি আতিশয্যটাকে সমর্থন করি না, কিন্তু আহ্বানটাকে মানি, শ্রদ্ধা করি। যার সঙ্গতি কম শুধু চায়ের ব্যবস্থাই না হয় করলেন, আমার সামর্থ্য নেই শাড়ি কেনবার, আমি না হয় একটা বই দিলাম, তাও যদি না পারি—

কলি। একটা ফুলটুল কিছু, তাই না? দেখ, ঐ লৌকিকতার সঙ্গে আতিশয্যের গাঁটছড়া বাঁধা। সবচেয়ে অসহ্য মনে হয় যখন দেখি চিঠিতে 'লৌকিকতার পরিবর্তে আশীর্বাদ প্রার্থনীয়।'

মিতা। হ্যাঁ, এ বিষয়ে আমি তোর সঙ্গে একমত, ওটা একেবারে অসহ্য। একেবারে অসৌজন্যমূলক।

কলি। না, আর কথা নয়, ন'টার বাসটা আসছে মনে হয়, এটাই ধরব। চলি ভাই, পরশু দেখা হবে।

১৩। উড়াল পুল নিয়ে দুই বন্ধুর সংলাপ

কমল। কী রে অরুণ, তুই ? কোত্থেকে ?

অরুণ। এইমাত্র বনগাঁ লোকাল থেকে নামলাম। তুই এখানে ?

কমল। কাটিহারের টিকিট রিজার্ভেশনের জন্যে এসেছিলাম।

অরুণ। পেয়েছিস ? কে যাবেন ?

কমল। না, পাই নি। কিন্তু ওদিকে হা করে চেয়ে কী দেখছিস ?

অরুণ। উড়াল পুল। কাগজে পড়েছি, বেতারে শুনেছি। আজ স্বচক্ষে দেখলাম। সত্যি, শেয়ালদাকে যেন আর চেনাই যায় না। যেন বিদেশের কোনো শহরে হঠাৎ এসে পড়েছি। কিংবা স্বপ্ন দেখছি! স্বপ্ন নু মায়ানু মতি—

কমল। যা বলেছিস। মনে হচ্ছে সত্যি এবার কল্লোলিনী কোলকাতা তিলোত্তমা হবে। ব্রাবোর্ণ রোডের উড়াল পুলের চেয়েও এ যেন আরো সুন্দর। গাড়িগুলো যেন সত্যি উড়ে চলেছে। মনে হচ্ছে ছ'কোটি টাকা সার্থক হয়েছে।

অরুণ। ট্র্যাফিক জ্যাম নেই, ঠেলাঠেলি নেই, হকার নেই। এ যেন বিশ্বাসই হয় না। লোকে কেমন স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করছে, রাস্তা পার হচ্ছে। চলার ছন্দ, গতি যেন আরো বদলে গেছে। নিচের দোকানঘরগুলো কেমন সুন্দর। পরিপাটি।

কমল। পুলের নিচের ঘরগুলোতে হকারদের একটা ব্যবস্থা হবে বলে মনে হচ্ছে। ওপর দিয়ে ছুটে চলবে দ্রুতগতির যানবাহন। পদাতিক বাহিনীর প্রবেশ নিষেধ। ওপরে গাড়ি থামারও কোন ব্যবস্থা নেই।

অরুণ। ব্যবস্থা তো সবই ভালো কিন্তু এর রক্ষণাবেক্ষণ ? এমন শৃঙ্খলা, সুব্যবস্থা কদিন থাকবে, তাই ভাবছি।

কমল। এটা নির্ভর করছে কর্তৃপক্ষের কঠোর নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থার ওপরে। কড়া প্রহরা চাই আর চাই আন্তরিক প্রচেষ্টা। একটু শিথিলতা ঘটলেই ব্রাবোর্ণ রোডের পুলের মতো মানুষ চলতে থাকবে, এমন কি সব্জিওয়ালারা ঝিঙে-পটল বিছিয়ে বসে গেলেও আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

অরুণ। কিন্তু জনসাধারণেরও এ-ব্যাপারে ভূমিকা আছে। সকলের শুভ প্রচেষ্টার ওপরেই যে-কোনো কল্যাণকর কাজের সফলতা নির্ভর করে। চাই সততা, শৃঙ্খলা, নীতিবোধ। শুধু 'সমস্যা' করে চেঁচালেই চলবে না।

কমল। তুই খাঁটি কথা বলেছিস। চল্ ভালো করে পুলটা দেখবি চল্।

১৪। সাম্প্রদায়িক মৈত্রী-সম্বন্ধে দুই ভিন্নধর্মী বন্ধুর মধ্যে কথোপকথন

সালেহা। সরস্বতী, রোববার বিকেলে মা তোকে আমাদের বাড়ি যেতে বলেছে, মনে আছে তো ? নাকি ভুলে গেছিস্ ?

সরস্বতী। ভুলব কী রে? মাসীমার হাতের সিমুই-এর পায়েস মিস করব, তা কি হয়? আমার ঠিকই মনে আছে।

সালেহা। অঞ্জলিকেও যেতে বলেছি। কিন্তু ও যাবে বলে মনে হয় না। ওর মা-বাবা বোধ হয় ঠিক পছন্দ—

সরস্বতী। আমি তোদের বাড়ি যাব, তুই আমাদের বাড়ি আসবি—এতে পছন্দ অপছন্দের কী আছে রে?

সালেহা। না, ঠিক তা নয়, তবে ঐ খাবার ব্যাপারে—

সরস্বতী। আমি কিছুতেই বুঝতে পারি না, কেন আমাদের এই সংস্কার, সাম্প্রদায়িক মনোভাব। এদিকে আমরা সভ্যতা, শিক্ষার বড়াই করি। মুখে বড়ো বড়ো কথা বলি। অথচ দেখ, দেশের বাড়িতে আমরা কত কাছাকাছি ছিলাম, এখনো থাকি।

সালেহা। হ্যাঁ, দুর্গাপুজোর উৎসব, ঈদ—একাকার হয়ে যায়। এদিক দিয়ে আমাদের গ্রামের তুলনাই হয় না। মনে আছে আমাদের স্কুলে সরস্বতী পুজোয় আমি, রাবেয়া লুচি বেলেছি আর তুই, দেবযানী ভেজেছিস। কী যে আনন্দ করেছি ভাবাই যায় না।

সরস্বতী। বলরামবাটিতে তোদের পরবে একবার গিয়ে কী মজাটাই না করেছি। দেবযানী তো আর আসতেই চায় না।

সালেহা। কেন, কালীপুজোয় বারোয়ারীতলায় সবাই একসঙ্গে বাজিপোড়ানো? তুবড়ি-প্রতিযোগিতার বিচারক থাকতেন জয়নাল চাচা। তোর মনে আছে?

সরস্বতী। এই তো আমাদের সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর আদর্শ রূপায়ণ। এ তো হৃদয়ের জিনিস, ভালোবাসার সম্পদ। আইন করে বক্তৃতা দিয়ে সাম্প্রদায়িক মৈত্রী আনা যায় না।

সালেহা। তুই ঠিক বলেছিস। যখন দেখি কোনো প্রদেশের কোনো অঞ্চলে এখনো সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বাধে তখন বড়ো লজ্জা করে। আমাদের শিক্ষা-সভ্যতা সব যেন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। মানুষ সবার ওপরে শ্রেষ্ঠ হয়েও এত নির্বোধ আচরণ করতে পারে?

সরস্বতী। এ ব্যথা আমার মনেও বাজে রে। তবে দেখ মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ। আমার মনে হয়, এ ভুল আমরা শোধরাবই।

১৫। সামাজিক দুর্নীতি-সম্বন্ধে দুই বন্ধুর কথোপকথন

অভিজিৎ। নাঃ, এভাবে আর চলে না। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ দুর্নীতি। সমাজের এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় যেন হাঁপিয়ে উঠছি। পালাতে পারলে বাঁচি।

পরমার্থ। হঠাৎ তোর হল কী বল তো? এ কি শ্মশান-বৈরাগ্য, নাকি অন্য কোনো ব্যাপার? তা পালাবিটা কোথায়? আমাকে সঙ্গে নিস, ভাই।

অভিজিৎ। না রে, ইয়ারকি নয়। এই মাত্র বাজার থেকে ছ কিলো চাল নিয়ে এলাম। চোখের সামনে ওজন করে দিল। বিশ্বাস করে নিয়ে এলাম। হঠাৎ কেমন যেন সন্দেহ হল, কাপুরের দোকানে ওজন করিয়ে দেখি পাঁচ কিলো। বুঝে দেখ। একেবারে পুকুরচুরি।

পরমার্থ। রাস্তার ধার থেকে কিনেছিস বুঝি? দোষ তো তোরই। এখন বোঝো।

অভিজিৎ। বড়ো বড়ো রথী-মহারথীরা যেখানে চুরি করছে, ভেজাল দিচ্ছে, জাল ওষুধের কারখানা খুলেছে, জাল নোট ছাপাচ্ছে, তখন এরা তো চুনোপুঁটি। যাবি কোন্ দিকে!

পরমার্থ। সিনেমা থেকে হাসপাতাল, অফিস, আদালত, রেলওয়ে বুকিং সর্বত্র চলেছে দুর্নীতি, কালোবাজার। দুর্নীতির জোরে কালো পথ বেয়ে কত মানুষ আজ ধনকুবের হয়ে উঠছে। সমাজকে এরা ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। তুই কল্পনা করতে পারিস, একটা সভ্য দেশে মানুষ শিশুর খাদ্য—পাউডার-দুধে ভেজাল দিতে পারে? ভেজাল ইনজেকশনে লোক মরে?

অভিজিৎ। আর বলিস না। রক্ত গরম হয়ে ওঠে এসব শুনলে। মনে হয় বোমা মেরে সব গুঁড়িয়ে দিই। চুলোয় যাক সমাজ।

পরমার্থ। ও তো তোর রাগের কথা। এতে কি সমস্যার সমাধান হবে? এর মূল অনেক গভীরে।

অভিজিৎ। অনেক গভীরে তা জানি। আর সমস্যার সমাধানের ভার যাদের ওপরে তাদের স্বরূপও আজ অজানা নয়। সরষের মধ্যে ভূত। সাধে কি আর উত্তেজিত হচ্ছি?

পরমার্থ। আমরা কিন্তু মুখে 'দুর্নীতি' 'দুর্নীতি' করে চেঁচালেও অনেকেই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিচ্ছি। ব্ল্যাকারদের কাছ থেকে সিনেমার টিকিটও আমরাই কিনি। দালালদের কাছ থেকে কিনি রেলের বার্থ। দুর্নীতি তবে রুখবে কে?

অভিজিৎ। সে কথা অবশ্য ঠিক। নিজেদের দিকে তাকানো উচিত আগে।

১৬। কোনো আবৃত্তি-প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠানে বিচারকমণ্ডলীর মধ্যে দুইজনের অভিমত-বিনিময়-সম্পর্কে একটি কাল্পনিক কথোপকথন রচনা কর। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

[আবৃত্তি-প্রতিযোগিতা শুরু হতে চলেছে। দুজন বিচারক বিচারের নিরিখ-সম্বন্ধে আলোচনায় রত]

বিপুলবাবু। আচ্ছা সমীরবাবু, নম্বরের বিভাগটা তাহলে আমরা করে ফেলি।

সমীরবাবু। আপনিই করুন না।

বিপুলবাবু। আমি তো ভাবছি কণ্ঠস্বরে থাক ১০, স্মৃতিতে থাক ১০, উচ্চারণে ২০, ছন্দ ও যতি তে ১০, আর প্রকাশভঙ্গীতে ৫০।

সমীরবাবু। ঠিক আছে। আমিও প্রকাশভঙ্গীতেই অর্ধেক নম্বর রাখতে চেয়েছিলাম।

বিপুলবাবু। আচ্ছা, বলতে বলতে ভুলে গেলে আমরা ধরিয়ে দেব তো?

সমীরবাবু। হ্যাঁ তা দেব, তবে নম্বরটা কাটা যাবে।

বিপুলবাবু। তা তো নিশ্চয়। আচ্ছা প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে আমরা ব্যক্তিত্বও ধরব তো?

সমীরবাবু। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। যে-কোনো শিল্পীর পক্ষেই তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

বিপুলবাবু। সত্যি তাই।

সমীরবাবু। বেশি অঙ্গভঙ্গী কিন্তু আমি পছন্দ করি না।

বিপুলবাবু। আমিও না, ঐ প্রকাশের প্রয়োজনে সামান্য যতটুকু দরকার ততটুকুই।

সমীরবাবু। হ্যাঁ।

বিপুলবাবু। আর কী আলোচ্য আছে?

সমীরবাবু। এই তো মোটামুটি।

বিপুলবাবু। ঠিক আছে। তা হলে ওঁদের বলি প্রথম প্রতিযোগীকে পাঠাতে।

সমীরবাবু। হ্যাঁ, শুরু করে দেওয়া যাক।

১৭। জীবনের আদর্শ-সম্বন্ধে আলেকজাণ্ডার ও বুদ্ধদেবের মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

আলেকজাণ্ডার। নমস্কার।

বুদ্ধদেব। নমস্কার।

আলেকজাণ্ডার। পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতি-সম্বন্ধে আপনার কী অভিমত জানতে ইচ্ছা করছে।

বুদ্ধদেব। দেখুন, আমার জীবনাদর্শ তো আপনি জানেনই। আমি সেই দৃষ্টিতেই পৃথিবীকে দেখছি। এখনও হিংসা বা উন্মত্ততায় এ পৃথিবী মত্ত। এ দেখে আমি ব্যথিত হই। যুদ্ধের সম্ভাবনা পৃথিবী এখনও এড়াতে পারল না।

আলেকজাণ্ডার। দেখুন, যুদ্ধ তো সবসময়ে খারাপ নয়। যুদ্ধের মধ্য দিয়েও অনেক অন্যায় ও অপরাধ প্রশমিত হতে পারে।

বুদ্ধদেব। আপনি বীর। আপনার বীরত্ব ও রণকৌশল প্রবাদবাক্যে পরিণত, যুদ্ধের অকল্যাণকর দিকটা আপনার চোখে পড়বে না। এক যুদ্ধ অপর যুদ্ধকে আহ্বান করে আনে। হিংসা হিংসারই জন্ম দেয়। মন থেকে হিংসার জড় উন্মূলিত না করতে পারলে মানুষের কল্যাণ নেই।

আলেকজাণ্ডার। দেখুন, কল্যাণের আদর্শ তো সবার এক নয়।

বুদ্ধদেব। একথা আমি মানি না। যা সত্য, যা ন্যায্য, মানুষের কল্যাণ তারই অবলম্বনে।

আলেকজাণ্ডার। আপনার কথা যখন শুনি আমারও মনে একটা পরিবর্তন বোধ করি। হয়তো আমরাই ভ্রান্ত।

বুদ্ধদেব। মানুষকে গভীরভাবে চিন্তা করতে হবে কল্যাণের পথ-সম্পর্কে। এ বিষয়ে তাকে অন্য কেউ সাহায্য করবে না, নিজের প্রজ্ঞার আলোকেই তাকে পথ চিনে নিতে হবে। তাই তো বলি—আত্মদীপো ভব।

১৮। লোডশেডিং সম্বন্ধে ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে একটি কথোপকথন রচনা কর। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

শিক্ষক। পড়াশুনা ঠিক মতো করছ না কিন্তু। এদিকে পরীক্ষা তো এসে গেল।

অরুণ। হ্যাঁ স্যর, কিন্তু রাত্তিরের দিকে তো পড়তেই পারছি না। দুটো লণ্ঠন নিয়ে চলে টানাটানি। লণ্ঠন বাড়াবারও উপায় নেই, মা বলেন, কেরোসিন পাব কোথায় ?

শিক্ষক। সত্যি, এ যে আরও কতদিন চলবে !

অরুণ। আজ তো স্যর রেকর্ড লোডশেডিং।

শিক্ষক। হ্যাঁ, সেই সকালে কারেণ্ট গিয়েছে, আর এখনও আসার নামগন্ধ নেই।

অরুণ। শুধু তো পড়াশুনা নয় স্যর, কল-কারখানা, হাসপাতাল সবখানেই তো অচল অবস্থা।

শিক্ষক। তা আর বলতে ? চেষ্টা তো চলছে, কিন্তু সুরাহার পথ তো চোখে পড়ছে না।

অরুণ। হ্যাঁ, আজ এটা খারাপ, কাল সেটা খারাপ, এই ভাবেই তো চলছে। সব বিদ্যুৎ-উৎপাদন কেন্দ্রগুলো চালু থাকলে তো এ অবস্থা হয় না।

শিক্ষক। আসল কথা কি জানো, কল-কারখানা তো আর মানুষকে চালায় না, মানুষই চালায় সেগুলো। সময়ের কাজ সময়ে করলে, মানুষজনের কষ্টের কথা আন্তরিক ভাবে ভাবলে অনেক অসুবিধাই কাটিয়ে ওঠা যায়। লোডশেডিং আসলে শহরে-গ্রামেই নয়, লোডশেডিং মানুষের অন্তরের মধ্যে।

অরুণ। সত্যি স্যর ! অন্ধকার তাই এত জমাটবাঁধা।

১৯। দুই বন্ধুর সংলাপ : বিষয়—পাতাল রেল

[নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

রঞ্জন। কি রে ! এই তোর আটটায় আসা হল ?

শ্যামল। দেখ, রাগ বাড়িয়ে দিস না। কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছি জানিস ?—সাড়ে ছ'টায় ! অর্থাৎ এই তিন মাইল পথ আসতে সময় লাগল দেড় ঘণ্টা।

রঞ্জন। কেন ?

শ্যামল। কেন জানিস না! কলকাতা শহরটায় এখন যেরকম প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চলছে তাতে একমাত্র নারদের ঢেঁকিতে চড়ে ছাড়া সময় রেখে যাতায়াত করা সম্ভবপর নয়।

রঞ্জন। ও, তুই পাতাল রেলের কথা বলছিস ?

শ্যামল। আবার কী! কলকাতার শরীরে নাকি এমন এক ডানা জোড়া হচ্ছে যার আর এক নাম গতি। তদ্দিনে তো সারা শহরটা স্থবির হয়ে যাবে।

রঞ্জন। আজকের দুঃখের মধ্যে দিয়েই তো জন্ম নেবে কালকের আনন্দময় ভবিষ্যৎ।

শ্যামল। আমি তো কলকাতা শহরে গতিরও অভাব দেখি না, আনন্দেরও না।

রঞ্জন। ঠিকই, সেটা কলকাতার প্রাণবন্ত চরিত্রের জন্যে। কিন্তু শহরটার যে প্রাণান্ত ঘটছে একথা মানিস তো ?

শ্যামল। হাড়ে হাড়ে বুঝছি সে কথা। তিন-মানুষ গভীর গর্তে পড়েছ কি প্রাণান্ত, আর তাতে পড়ার জন্যে সাহায্য করছে লোডশেডিং।

রঞ্জন। না, না, অমি সে কথা বলছি না। ট্রাম-বাসে এই-ভাবে ঝোলার অবসান নিশ্চয়ই দরকার আর সে ক্ষেত্রে পাতাল রেলের আর বিকল্প কী ?

শ্যামল। সত্যি কথা বল্‌তো একটা। তুই কি ওদের প্রচার-বিভাগে চাকরি পেয়েছিস ? আর তা যদি না হয় তাহলে আমি তোকে অনুরোধ করব একবার আমাদের পাড়াটা ঘুরে আসতে,—তারপর শুনব তোর বক্তৃতা।

রঞ্জন। (হেসে)। বেশ তাই হবে। কিন্তু পাতাল রেলে চড়েই যাব তোদের পাড়ায়, কারণ কাগজে দেখছিস বোধ হয় ট্রায়াল রানিং শুরু হল বলে।

২০। ইতিহাস-পাঠের প্রয়োজনীয়তা-সম্বন্ধে ছাত্রী ও শিক্ষক

[নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

শিক্ষক। ইতিহাস-পরীক্ষা কেমন হল ?

ছাত্রী। ভালো না। অত সাল-তারিখ মনে রাখা যায় নাকি!

শিক্ষক। ইতিহাসকে শুধু সাল-তারিখের সালতামামি ভাবলে নীরস লাগবেই। কিন্তু ইতিহাস তো তা নয়। ইতিহাস মানুষের সভ্যতার যাবতীয় সম্পদের শৈশব থেকে আজ পর্যন্ত এগোনোর কাহিনী শোনায়। সাল-তারিখ সেখানে মুখ্য নয়।

ছাত্রী। কিন্তু আমরা তো পড়ি কোন্ রাজা কোন্ সালে কোন্ যুদ্ধ জয় করলেন তার বিবরণ।

শিক্ষক। সেটা আমাদের দুর্ভাগ্য। আমরা ভাবি না যে, রাজা ইতিহাস সৃষ্টি করে না, ইতিহাস সৃষ্টি করে মানুষ। মানুষের স্বার্থবিরোধী রাজাকে মানুষই পরাস্ত করে। আবার প্রয়োজনে যোগ্য মানুষকে সে রাজাসনে বসায়।

ছাত্রী। এ ভাবে ইতিহাসকে কখনও ভাবি নি, স্যর।

শিক্ষক। ভাব নি কারণ আমাদের সমস্ত শেখাটাই হয় পরীক্ষার মুখ চেয়ে,—তাই

ইতিহাসে বড়ো হয়ে ওঠে সাল-তারিখ। তা ছাড়া, রাজার কথাই কি ইতিহাসে সব! ধর্মনীতি, সংস্কৃতি, শিল্প সাহিত্য—এগুলোও কি ইতিহাসে সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়?

ছাত্রী। হ্যাঁ, স্যর এখন বুঝেছি—আকবর যেমন সত্যি,—একই সময়ে তেমনি নানক, কবীর, তানসেনও সত্যি।

শিক্ষক। ইতিহাস আমাদের সবচেয়ে বড়ো প্রেরণা, যখন দেখি মানুষের অগ্রগমনের পথের সমস্ত বাধা মানুষই চিরকাল দূর করছে, যখন দেখি সভ্যতার পথে কোনো আবর্জনা জমতে দেয় নি মানুষ,—তখন কি আমরা মানুষের ভবিষ্যতে আস্থাবান্ হই না?

ছাত্রী। হ্যাঁ স্যর,—আর এ ক্ষেত্রে ইতিহাস হতে পারে আমাদের ভবিষ্যৎ-সৃষ্টির পথ-নির্দেশক।

শিক্ষক। ঠিক তাই। ইতিহাসকে এবার থেকে এই দৃষ্টি নিয়ে দেখো,—দেখবে তোমার ভালো লাগছে।

২১। আসন্ন পরীক্ষার বিষয়ে দুই ছাত্রীর মধ্যে সংলাপ

[নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

কুমকুম। কোথায় যাচ্ছ?

মৈত্রেয়ী। ইস্কুলে। অ্যাডমিট কার্ড এসেছে কিনা জানতে যাচ্ছি। তোমরা পেয়ে গেছ অ্যাডমিট কার্ড?

কুমকুম। না, এখনও পাইনি। তোমার পড়াশুনা কেমন হল?

মৈত্রেয়ী। যথাসাধ্য পড়েছি। তবে আমাদের এই পরীক্ষার সময়টা এত বিশ্রী। মে মাসের এই প্রচণ্ড গরমে কি পড়াশুনা করা যায় ঠিকমত,—না কি পরীক্ষা দেওয়া যায়?

কুমকুম। যা বলেছ,—তার ওপর আবার আছে লোডশেডিং। তুমি নমুনা প্রশ্নগুলো দেখেছ?

মৈত্রেয়ী। হ্যাঁ, দেখলাম। কোন্‌টা যে দেখব বুঝতে পারি না। দিন দিন পরীক্ষা দেওয়াটা যেন একটা টেকনিক্যাল স্কিলের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াচ্ছে!

কুমকুম। তা ঠিকই। ইংরেজি বা বাংলার কম্পোজিশন অংশে কিছু সম্ভাব্য প্রশ্ন পেয়েছ নাকি?

মৈত্রেয়ী। আমি এ ব্যাপারে গুজবে কান দিই না। একবার যা ঠকেছিলাম। সতেরটা রচনা পড়ে গেলাম,—একটাও এল না,—সেই হলে বসেই লিখতে হল। সেই থেকেই ঠিক করেছি কম্পোজিশন নিয়ে ভাবব না। হলে বসেই যথাসাধ্য লেখার চেষ্টা করব। তুমি টেস্ট পেপার ক'বার শেষ করলে?

কুমকুম। ক'বার! কত দেরিতে টেস্ট পেপার বেরোল বলো তো। তার ওপর আবার এর মধ্যেই ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজগুলোতে ভর্তির পরীক্ষা দিতে হল,—

তার জন্যে আলাদা প্রস্তুতির দরকার। সেই নিয়েও ব্যস্ত থাকতে হল কিছুদিন।

মৈত্রেয়ী। ঐ পরীক্ষাগুলো কেমন হল তোমার?

কুমকুম। মন্দ নয়। এখন আসল পরীক্ষাটা ভালো হলেই হয়।

মৈত্রেয়ী। যা বলেছ। কিন্তু আর না। ঐ যে ২-বি বাসটা আসছে, ওটাই ধরব,—চলি।

২২। সাম্প্রতিক ভাষাসংস্কার-সম্বন্ধে দুই বন্ধুর সংলাপ

[নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৮০]

মানিক। আচ্ছা, সত্যি বল তো স্বপন, ইংরেজি তুলে দেওয়াটা কি ঠিক হল?

স্বপন। ইংরেজি তুলে দেওয়া হল! এ তুই কি বলছিস? ইংরেজি তো আছেই বহালতবিয়তে, শুধু প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি রইল না।

মানিক। কিন্তু প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি তুলে দেওয়াটাও তো ভালো মনে হচ্ছে না। পরে গিয়ে অসুবিধে হবে না?

স্বপন। আমার তো মনে হয় অসুবিধে তেমন হবে না। দশ বছর ইংরেজি পড়েও কেউ কেউ এক লাইন শুদ্ধ লিখতে পারে না। আবার দু'বছর পড়েও ভালো ইংরেজি শেখে অনেকে।

মানিক। তা অবশ্য ঠিক।

স্বপন। তবে আমার মনে হয়, ইংরেজি শেখানোর ব্যাপারে আরও কার্যকর কোনো পদ্ধতির কথা ভাবা দরকার।

মানিক। অবশ্যই। তবে আমি বলব মাতৃভাষা শেখানোর ব্যাপারেও উন্নততর পদ্ধতির দরকার।

স্বপন। সে প্রয়োজনীয়তা আমিও অনুভব করি।

মানিক। আর সংস্কৃত তুলে দেওয়ায় তোর মতটা শুনি?

স্বপন। আবার ভুল করছিস। সংস্কৃতকে ঐচ্ছিক করা হয়েছে, আবশ্যিক আর নেই।

মানিক। কিন্তু সংস্কৃত না জানলে বাংলা ঠিক শেখা যায় কি?

স্বপন। আমার কী মনে হয় জানিস, বাংলা শেখার কোনো অসুবিধেই হয় না, তবে কোনো কোনো বিষয়ে সংস্কৃতের জ্ঞান যে প্রয়োজনীয় সেটা আমি অস্বীকার করি না।

মানিক। সেই জন্যেই বলছিলাম সংস্কৃত থাকলেই ভালো হত। তা ছাড়া, আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তো সংস্কৃতেরই স্বর্ণসূত্রে গাঁথা।

স্বপন। আমার মনে হয় ত্রি-ভাষার চাপ কমাতেই সংস্কৃতকে ঐচ্ছিক করা হয়েছে।

মানিক। আমার মনে হয় কী জানিস?

স্বপন। কী বল্।

মানিক। বাংলা তো দুশো নম্বরের পরীক্ষা?

স্বপন। হ্যাঁ।

মানিক। এর মধ্যে ৫০ নম্বর সংস্কৃতের জন্যে রাখলে কেমন হত?

স্বপন। এ মত আমিও সমর্থন করি। আসল কথা কী জানিস, পড়াশোনা বা ভাষাশিক্ষাকে শুধু স্কুলের চার দেওয়ালের মধ্যে বেঁধে রেখে লাভ নেই। Career-এর দিকে তাকিয়ে শুধু ইংরেজি বা সংস্কৃত কেন, বিদেশী ভাষাও শিখতে পারি।

মানিক। সে কথা অবশ্য ঠিক।

২৩। নাগরিক কর্তব্য-সম্পর্কে ছাত্র-শিক্ষকের সংলাপ রচনা কর।
[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

ছাত্র। স্যর, স্কুলের 'Drive Slow' board টা খুলে পড়েছিল। আমি প্রাচীরে উঠে ওটা টাঙিয়ে দিয়েছি।

শিক্ষক। খুব খুশি হলাম শুনে। একেই তো বলে civic sense. পুঁথির পাতায় 'সুনাগরিকের কর্তব্য' মুখস্থ করে নম্বর পাওয়াটা কিছু নয়, তা পালন করার মনোভাবটাই আসল।

ছাত্র। সত্যি স্যর। আমরা 'পড়া'র সঙ্গে 'করা'টাকে ভুলেই যাই।

শিক্ষক। সেই জন্যেই তো সমাজের এই হাল। সকলে যদি সমাজ-সচেতন হত, সকলে যদি নাগরিকের কর্তব্যগুলো করত তা হলে তো কথাই ছিল না।

ছাত্র। একটা কথা বলব, স্যর?

শিক্ষক। বলো বলো, কিছু সঙ্কোচ কোরো না।

ছাত্র। আমি একজন 'নাগরিক' এই অনুভূতিইটাই আমার কাছে রোমাঞ্চকর মনে হয়।

শিক্ষক। তোমার কথা শুনে সত্যি আনন্দ হচ্ছে। এই রোমাঞ্চবোধটাই আসল কথা।

ছাত্র। ভাবতে অবাক লাগে স্যর, আমরা নাগরিকের কর্তব্য সম্বন্ধে কী উদাসীন!

শিক্ষক। মনে হচ্ছে কোনো বিশেষ ঘটনার কথা মনে করেই একথা বলছ।

ছাত্র। হ্যাঁ স্যর, সেদিন রাস্তায় এক অন্ধ কলার খোসায় পা পিছলে গুরুতর ভাবে আহত হল। ঐভাবে কেউ কলার খোসা ফেলে?

শিক্ষক। আর দেখেও কেউ সরায় নি। আশ্চর্য! এসব সামান্য সামান্য-ব্যাপারেই যদি এত উদাসীন হই, বড়ো বড়ো ব্যাপারে আর কোন্ ভূমিকা নিতে পারব আমরা?

ছাত্র। স্যর, আমার মনে হয় নগরজীবনের নানা সমস্যা এবং সে-বিষয়ে নাগরিকের কর্তব্য-সম্বন্ধে স্কুলে seminar বা debate হওয়া উচিত। এর মধ্য দিয়ে আমাদের সমজে-সচেতনতা বাড়বে।

শিক্ষক। ঠিক বলেছ। আমরা সব কিছু ভুলতে ওস্তাদ। অবশ্য করণীয় যা তাও

আমরা ভুলে যেতে পারলে বেঁচে যাই। ভোট দেওয়া যে নাগরিকের অবশ্যকর্তব্য, আমরা সে খেয়ালও রাখি না। ওয়েদারটা একটু খারাপ। ব্যস, অজুহাত পাওয়া গেল। চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়্লাম, কে যায় ভোট দিতে। এই তো আমাদের civic sense. যাই হোক তুমি নিজে যেমন যথেষ্ট কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছ, আশা করব তোমার সহপাঠীদেরও এসব বিষয়ে নিশ্চয় উদ্‌বুদ্ধ করতে চেষ্টা করবে।

ছাত্র। নিশ্চয় চেষ্টা করব, স্যর।

২৪। প্রাদেশিক বিরোধ-সম্পর্কে দুই ভাষাভাষী বন্ধুর সংলাপ

[নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৮০-৮১]

উর্মিলা। পুজোর সময়ে আয় না পাটনায় আমাদের বাড়িতে।

দীপক। ভাবতে খুব ভালো লাগছে। কিন্তু সম্ভব হয়ে উঠবে কিনা জানি না।

উর্মিলা। চেষ্টা করবি কিন্তু।

দীপক। নিশ্চয় করব।

উর্মিলা। দেখিস, তোর খুব ভালো লাগবে।

দীপক। একটা কথা ভাবছিলাম উর্মিলা।

উর্মিলা। কী রে?

দীপক। ভাবছিলাম এই ধর, তুই তো আলাদা প্রদেশের মেয়ে, তোর ভাষাও আলাদা, এখানে থাকতে থাকতে বাংলাও তোর মাতৃভাষা হয়ে গিয়েছে।

উর্মিলা। তা হবে না কেন? আমার বাবাকে তো সবাই বাঙালী ভাবে।

দীপক। ভাবছিলাম প্রদেশে প্রদেশে এত বিরোধ আর ভুল বোঝাবুঝি হয় কেন?

উর্মিলা। আমিও ভাই বুঝি না। আমরা সবাই ভারতের মানুষ, ব্যস। আর কী! আমি তো আগে ভারতীয়, তারপর বিহারী।

দীপক। আমিও তো আগে ভারতীয়, তারপর বাঙালী।

উর্মিলা। একটা পরিবারে অনেক লোক হয়ে গেলে, দূরে দূরে আলাদা আলাদা বাড়িতে থাকে, আমরাও তাই আছি।

দীপক। সত্যি, এক-একটা প্রদেশ আমাদেরই এক-একটা বাড়ি।

উর্মিলা। আসলে আমরা এক ঘরেরই ভাইবোন।

দীপক। সত্যি, এই ভাবে ভাবলে বিরোধ হবে কেন?

উর্মিলা। আর, আমরা তো একে অন্যের উপর নির্ভর করে আছি। এর দরকারে আমি হাত বাড়াবো, আমার দরকারে ও হাত বাড়বে, ব্যস। আমি তো ভাই এভাবে বুঝি।

দীপক। ইস্! তোর মতো সবাই যদি ভাবত—

উর্মিলা। তা হলে কী হত?

দীপক। তা হলে ভারত যে সোনা হয়ে যেত।

২৫। সি. এম. ডি. এ.-র নগর উন্নয়ন-প্রকল্প সম্বন্ধে পৌরমন্ত্রী ও নাগরিকের সংলাপ। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮১]

পৌরমন্ত্রী। বলুন, আপনার কী অভিযোগ ?

নাগরিক। আজ্ঞে না, ঠিক অভিযোগ নিয়ে আসি নি। তবে আমাদের এলাকার একটা অসুবিধার কথা আপনাকে জানাতে এসেছি।

পৌরমন্ত্রী। কী, বলুন।

নাগরিক। সি. এম. ডি. এ.-র কাজ চলছে আমাদের এলাকায়। জলের পাইপে কিছু গণ্ডগোল হয়েছে সম্ভবত। Flow খুব কমে গিয়েছে।

পৌরমন্ত্রী। আপনি দরখাস্তটা রেখে যান। আমি দেখছি কী ব্যাপার। আচ্ছা, প্রসঙ্গত জিজ্ঞেস করছি সি. এম. ডি. এ-র কাজ-সম্বন্ধে আপনাদের কী ধারণা ?

নাগরিক। সি. এম. ডি. এ. সত্যি অসাধ্য সাধন করে চলেছে।

পৌরমন্ত্রী। কেন একথা বলছেন ?

নাগরিক। দেখুন, আমরা একটু অসুবিধে হলেই চিৎকার চেঁচামেচি করি বটে, কিন্তু এটুকু বুঝি সি. এম. ডি. এ.-র কাজ কত শক্ত।

পৌরমন্ত্রী। শক্ত কেন ?

নাগরিক। সেই জোব চারনকের কোলকাতায় মানুষ বেড়েছে হু হু করে। এত মানুষের ভার সহ্য করার ক্ষমতা এ নগরীর নেই। সি. এম. ডি. এ. রাস্তা চওড়া করে, জলসরবরাহের উন্নততর ব্যবস্থা করে, নতুন ব্রিজ, উড়ালপুল ইত্যাদি তৈরি করে নগরজীবনে যে স্বাচ্ছন্দ্য আনার চেষ্টা করছে তা সত্যিই অভিনন্দনযোগ্য। সবচেয়ে বড়ো কথা এই নির্মিতি পর্বে সব অঞ্চলেই নগরজীবন অব্যাহত ধারায় বয়ে চলেছে।

পৌরমন্ত্রী। আপনার বিশ্লেষণ শুনে সত্যি আনন্দিত হলাম।

নাগরিক। আমাদের এই অভিনন্দনটুকু তা হলে সি. এম. ডি. এ.-র কর্তৃপক্ষকে আপনিই পৌঁছে দেবেন।

পৌরমন্ত্রী। নিশ্চয়ই দেব।

নাগরিক। দেখুন, আমরা হাজার সমস্যায় হয়রান, মাঝে মাঝে একটু অধৈর্য হয়ে পড়ি ঠিকই, তবু ভালো কাজের মর্যাদা আমরা দিতে জানি।

পৌরমন্ত্রী। আমরাও সেইটেই আশা করি। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া সি. এম. ডি. এ.-র উন্নয়নের কাজ এতটা এগোতে পারতো না।

নাগরিক। এই সহযোগিতা আমরা সর্বদাই করতে প্রস্তুত।

২৬। চিকিৎসা-প্রসঙ্গে রোগী ও চিকিৎসকের সংলাপ

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

ডাক্তার। বলুন, কেমন আছেন ?

রোগী। ভালো আর কোথায়, ডাক্তারবাবু ?

ডাক্তার। কেন, আবার কী হল ?
রোগী। বুকের ব্যথাটা আবার হচ্ছে।
ডাক্তার। হোক না একটু-আধটু।
রোগী। বলেন কী ডাক্তারবাবু? ভয়ে আমার—
ডাক্তার। ঐ ভাবাই আপনার রোগ। ই-সি-জি রিপোর্টে তো তেমন কোনো দোষ নেই, তা তো আপনাকে বলেইছি।
রোগী। তবে ব্যথাটা কেন ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার। দেখুন, ও একটা অদ্ভুত ব্যাপার। আপনাকে তো সব বুঝিয়ে বলা যাবে না। শুধু এইটুকু বলছি—ব্যাপারটা অনেকটাই মানসিক।
রোগী। তার মানে আসলে ব্যথা হচ্ছে না, কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে ব্যথা ?
ডাক্তার। অনেকটা তাই। দেখুন, একটু বুকের ব্যথা সবারই হতে পারে, ওতে বিচলিত হবার কিছু নেই। আপনাকে যে ভাবে চলতে বলেছি সেই ভাবে চলুন, মাঝে মাঝে pressure-টা একটু চেক করাবেন। চিন্তা করেছেন কি প্রেসার বাড়বে, বুকের ব্যথাও বাড়বে।
রোগী। চেষ্টা তো করি চিন্তা না করতে, কিন্তু চিন্তা যে পেয়ে বসেছে।
ডাক্তার। একটু বেড়ান, আড্ডা মারুন, সিনেমা-টিনেমা দেখুন। ব্যথাটা সেরে যাবে।
রোগী। সত্যি বলছেন, ডাক্তারবাবু?
ডাক্তার। হ্যাঁ সত্যি বলছি। ভাবলেই এ ব্যামোর বৃদ্ধি, না-ভাবলেই হ্রাস এ কথাটা ভুলবেন না, এটাই প্রেসক্রিপশন।
রোগী। আজ তা হলে চলি ডাক্তারবাবু, একটু সাহস পেয়ে গেলাম।
ডাক্তার। ঠিক আছে। কোনো ভয় নেই আপনার। মাঝে মাঝে এমনি একটু বেড়িয়ে যাবেন। কেমন ?
রোগী। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

২৭। জীবন-দর্শন সম্বন্ধে হিটলার ও রবীন্দ্রনাথের কথোপকথন

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

হিটলার। নমস্কার।
রবীন্দ্রনাথ। নমস্কার !
হিটলার। আপনি তো আমাকে ঘৃণা করেন, তাই না।
রবীন্দ্রনাথ। দেখুন, ঘৃণা আমি কাউকে করি না। মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ—এ আমার আন্তরিক উপলব্ধি। তবে প্রভুত্বের নীতিতে আমি বিশ্বাসী নই।
হিটলার। কিন্তু জীবনে সকলেই প্রতিষ্ঠা চায়—এ কথা তো আপনি মানেন। এই 'প্রতিষ্ঠা'র স্বপ্নই আমি দেখেছিলাম। আমি কী অন্যায় করেছি ?

রবীন্দ্রনাথ। নিখিলের বিধান একের স্পর্ধাকে কখনও স্থান দেয় না। তাই ইতিহাস আপনাকে ক্ষমা করে নি।

হিটলার। আপনি তো ঈশ্বর মানেন।

রবীন্দ্রনাথ। তিনি আমার সর্বস্ব।

হিটলার। ঈশ্বরকে সর্বশক্তিমান্-রূপে দেখা কি অন্যায় ?

রবীন্দ্রনাথ। না।

হিটলার। তবে মানুষ যদি সপ্তর্ষিমণ্ডল পর্যন্ত মাথা তুলতে চায় তবে অন্যায় হবে কেন ?

রবীন্দ্রনাথ। মানুষ ঈশ্বরের শক্তি। তার মহত্ব অনস্বীকার্য, কিন্তু সে যখন অন্যকে ক্ষুদ্র করে মাথা তুলতে চায় তখন সে নিজেও ক্ষুদ্র—দেবতা নয়, শয়তান।

হিটলার। আপনি তা হলে প্রকারান্তরে আমাকে শয়তান বলছেন !

রবীন্দ্রনাথ। যে ঈশ্বরের নিয়মকে পদদলিত করে সে-ই শয়তান।

হিটলার। ঈশ্বরের নিয়মটি কী ?

রবীন্দ্রনাথ। সর্বত্র মিত্রভাব। সর্বত্র ঈশ্বর-উপলব্ধি। সর্বত্র সমশক্তি। সর্বত্র আনন্দ আর কল্যাণ।

হিটলার। আপনার কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারি না, তবু ভেবে দেখব।

রবীন্দ্রনাথ। তাই দেখবেন। সত্য-উপলব্ধির পথ একটাই, তা হল অনুচিন্তন।

২৮। সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে অশ্লীলতা-সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

প্রতুল। মলাটটা দেখেছিস বইটার !

সৌগত। ছিঃ। আর্টিস্টেরও তো একটা দায়িত্ব আছে। কী দরকার ছিল ঐ অশোভন ভঙ্গীটা আনার।

প্রতুল। এ তো 'যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি'। বণিকেরা মানুষের নিম্নচেতনাকে exploit করতে চায়, এ তো সোজা কথা।

সৌগত। 'যথা নিযুক্তোঽস্মি' কথাটা হয়তো অর্ধসত্য। সাহিত্যিকদের কেউ কেউ একটা গড্ডলিকায় গা ভাসিয়েছেন মনে হয়।

প্রতুল। সত্যি তাই। এঁরা তো স্বক্ষেত্রে অধীশ্বর। বণিকদের এঁরাও তো direct করতে পারেন।

সৌগত। তা করবেন কেন ? তাতে তো তাঁদের রয়্যালটিতেই টান ধরবে।

প্রতুল। আমি এ কথা মানি না। সুস্থ রুচিসম্মত বিষয় মানুষকে কম আকর্ষণ করে না।

সৌগত। শুধু সাহিত্যে না, নাটক-সিনেমাতেও আজকাল ছলে বলে কৌশলে ক্যাবারে বা ঐ ধরনের নৃত্য না দেখালেই নয়।

প্রতুল। কারণ তো একই।

সৌগত। সাহিত্যিকেরা অবশ্য কেউ কেউ তর্ক তুলবেন,—বলবেন art for art's sake.

প্রতুল। কিন্তু 'আর্ট' তো শ্রী-ভ্রষ্ট হতে পারে না। 'অশ্লীল' কথাটার মানে, যা শ্রী-ভ্রষ্ট।

সৌগত। কী করে ?

প্রতুল। 'শ্রী' আর 'শ্লী' একই। শ্রী আছে যার 'সে শ্রীল'; যা শ্রী-ভ্রষ্ট তা অশ্রীল, বা অশ্লীল।

সৌগত। সত্যি, এভাবে ভাবি নি। কোনো সাহিত্য ও শিল্পই শ্রী-ভ্রষ্ট হতে পারে না।

প্রতুল। হ্যাঁ, সংযম আর শ্রী হল সব শিল্পের প্রাণ। সমস্ত সাহিত্য ও শিল্পের আদর্শ হল এই যে, তা মানুষকে স্মরণ করিয়ে দেবে যে সে মানুষ, সে অমানুষ নয়, সে পশু নয়।

২৯। পরীক্ষায় অসদুপায়-অবলম্বন-সম্পর্কে শিক্ষক ও ছাত্রীর মধ্যে একটি কাল্পনিক কথোপকথন রচনা কর। [উ. মা. ১৯৭৮]

অথবা, **পরীক্ষায় টোকাটুকি-সম্পর্কে ছাত্রী ও শিক্ষকের সংলাপ।**

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

অথবা, **পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন-সম্পর্কে দুই বন্ধুর কাল্পনিক কথোপকথন।** [ত্রিপুরা উ. মা., ১৯৮১]

ছাত্রী। ভালো আছেন মাস্টারমশাই ?

শিক্ষক। আরে তুমি! তুমি তো এ বছর পরীক্ষা দিচ্ছ,—তাই না ?

ছাত্রী। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

শিক্ষক। কেমন হচ্ছে তোমার পরীক্ষা ?

ছাত্রী। পরীক্ষা আর হ'ল কই। গতকাল তো ভণ্ডুল হয়ে গেল পরীক্ষা।

শিক্ষক। সে কী! কী কারণে ভণ্ডুল হল পরীক্ষা ?

ছাত্রী। টোকাটুকি। কয়েকটি ছাত্র-ছাত্রীকে টোকার অপরাধে বার করে দেওয়া হয়—ব্যস, তারপরেই শুরু হয়ে গেল দক্ষযজ্ঞ।

শিক্ষক। আচ্ছা! তবে মুস্কিল কী জান—এ যজ্ঞে শিব নেই—আছে কেবল তার চ্যালাচামুণ্ডারা। তোমাদের কি ওরাই তুলে দিল পরীক্ষার হল থেকে ?

ছাত্রী। আজ্ঞে হ্যাঁ। আমাদের খাতাপত্র ছিঁড়ে ফেলে ওরা আমাদের চলে যেতে বাধ্য করে। আমাদের কী হবে, মাস্টারমশাই ?

শিক্ষক। ভেবো না, নিশ্চয়ই, আবার পরীক্ষা নেওয়া হবে। তবে সময়ে পরীক্ষাটা হতে পারল না—এই যা। জানি না, এইসব ছেলেমেয়েরা কী চায়। এরা কি বোঝে না যে, শিক্ষা-সরস্বতীকে বন্দুক দেখিয়ে ধরে আনা যায় না। আদর্শ, মূল্যবোধ কিছুই কি রইল না ?

ছাত্রী। না, মাস্টারমশাই আছে, অধিকাংশেরই আছে।

শিক্ষক। সেটুকুই ভরসা। পরীক্ষায় দুর্নীতি ছাত্রদের মনটাকেই নষ্ট করে দেয়। যে-কোনও অবস্থায় দুর্নীতির আশ্রয় নেবার প্রবণতা গড়ে ওঠে।

ছাত্রী। নিজের উপর আস্থাই যায় কমে।

শিক্ষক। ঠিক বলেছ। নিজের উপর আস্থাই তো মানুষের বড়ো অবলম্বন।

ছাত্রী। আমার তো মনে হয়, মাস্টারমশাই, শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ছাত্রদেরই উচিত দুর্নীতি-বিরোধী কোন কার্যের পরিকল্পনা গ্রহণ করা।

শিক্ষক। হ্যাঁ, সকলেরই তাতে সমর্থন থাকবে। ছাত্রছাত্রীরাই ভবিষ্যৎ গড়বে, তাই তাদের উঠতে হবেসমস্ত ক্ষুদ্রতার উর্ধ্বে, তারাই হবে সকলের আদর্শ।

৩০। ছাত্রদের রাজনীতি করা উচিত কিনা এ নিয়ে দুই বন্ধুর কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর। [ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৭৮]

পরাগ। তোর অন্য আর একটা রূপ দেখলাম সেদিন।

হিমাদ্রি। কী দেখলি বল্ তো।

পরাগ। দেখলাম, তুই মিছিলে, মুখে শ্লোগান দিচ্ছিস। তুই রাজনীতি করিস নাকি ?

হিমাদ্রি। কেন ? তাতে দোষ কী ?

পরাগ। আমার তো মনে হয় ছাত্রদের ও পথে না যাওয়াই ভালো।

হিমাদ্রি। তার মানে 'ছাত্রাণামধ্যয়নং তপঃ' ইত্যাদি।

পরাগ। হাঁ। তা তো বটেই। ছাত্রজীবনটা হল নিজেকে গড়ে তোলবার। রাজনীতি হতে পারে অনেক পরের পদক্ষেপ।

হিমাদ্রি। অথচ গুণীরা বলেন, যা পরে করবে তার অভ্যাস আগে থেকেই করা উচিত।

পরাগ। অন্তত রাজনীতির ক্ষেত্রে এ কথা খাটে না।

হিমাদ্রি। কেন, রাজনীতি কী জীবন থেকে আলাদা কিছু ?

পরাগ। না, তা নয়, তবে রাজনীতিতে অনেক পরিণত চিন্তার প্রয়োজন, যা অনেক অভিজ্ঞতায় আসতে পারে।

হিমাদ্রি। সেই অভিজ্ঞতা যখন একদিনে আসে না, আগে থেকেই তা তিল তিল ক'রে সঞ্চয় করতে হয়, ছাত্রজীবনেই সঞ্চয় করতে হয়, ছাত্রজীবনই সে সঞ্চয়ের প্রশস্ত সময়।

পরাগ। দেখ, রাজনীতি ছাত্রদের সমস্ত সময়টা কেড়ে নেয়, তাকে অধ্যয়ন থেকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে আনে।

হিমাদ্রি। তুই অতীতের পৃষ্ঠার দিকে তাকিয়ে দেখ না। ভারতের মুক্তিযুদ্ধে এবং মুক্তির রাজনীতিতে কারা এগিয়ে এসেছিল, দলে দলে তারা কি সব অজ্ঞমূর্খ হয়েই ছিল ?

পরাগ। দেখ্, তোর কথায় যুক্তি নেই তা নয়, তবে ও সর্বনেশে খেলা।

হিমাদ্রি। দেখ্, জীবনটাকে অমন খণ্ড খণ্ড করে দেখতে নেই। রাজনীতিও মনুষ্যনীতির অঙ্গ। প্রয়োজনে ছাত্ররাও এদিকে এগিয়ে আসবে, ন্যায়নীতির তাগিদেই। তবে সামঞ্জস্য করে চলতে হবে তাকে, একটা করতে গিয়ে আর সব কিছুকে জলাঞ্জলি দিলে চলবে না।

পরাগ। তোর এ কথাটা আমার ভালো লাগল। এই সামঞ্জস্যটাই বড়ো কথা।

৩১। স্কুলে ইংরাজী ভাষা শেখার প্রয়োজনীয়তা আছে কিনা—এ নিয়ে দুই বন্ধুর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর।

[ত্রিপুরা উ. মা. পরীক্ষা, ১৯৭৯]

কনক। এ তুই বলছিস কী! স্কুলে ইংরেজি শেখার দরকার নেই?

রূপক। হ্যাঁ, তাই বলছি। ইংরেজদের সঙ্গে সঙ্গে ইংরেজিকেও বিসর্জন দেওয়াই উচিত।

কনক। কেন বল্ তো?

রূপক। ও হচ্ছে গোলামির চিহ্ন, কুকুরের গলায় বকলেসের দাগের মতো।

কনক। তোর কথাটা 'ইমোশনাল' বটে কিন্তু—

রূপক। 'র‍্যাশনাল' নয় এই বলবি তো?

কনক। না, ভেবে দেখ, এই ইংরেজি ভাষা আমাদের কতটা দিয়েছে।

রূপক। সে কথা মানি, কিন্তু ও যারা ঘরে বসে পড়তে চায় পড়ুক, ইস্কুলে কেন?

কনক। স্কুলের বাধ্যবাধকতার মধ্যে না থাকলে ভাষাটা শেখাই হবে না। স্কুলে যতটা শেখা যাবে পরে তাকে আরও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে।

রূপক। কিন্তু তাতে লাভ কী?

কনক। হায়ার স্টাডিজ ইংরেজি ছাড়া সম্ভবপরই নয়।

রূপক। কেন, অনুবাদ-গ্রন্থ চালু হোক না কেন?

কনক। দেখ, যা অবাস্তব তা বলে তো লাভ নেই।

রূপক। অবাস্তবকে বাস্তব করে তোলা যায় ঐকান্তিকতায়।

কনক। সে কথা ঠিক। কিন্তু চলমান পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগের স্বর্ণসূত্র যে ঐ ইংরেজি, তা কি তুই মানিস না?

রূপক। না। ইংরেজি না জেনে এগিয়ে যাওয়া সম্ভবপর।

কনক। যে-কোনো এগিয়ে যাওয়াতেই প্রথম দরকার সংস্কার-মুক্তি। ইংরেজির বিরুদ্ধে এই যে মনোভাব, একে আমার কুসংস্কার বলতেই ইচ্ছে করে।

রূপক। আমি যা বলতে চাই তা ঠিক ধরতে পারছিস না। একটা ছেলে ইংরেজিতে ফেল হলে সে ফেল হয়ে যাবে এ আমি মানতে রাজি নই।

কনক। দেখ, এ বিষয়ে কোনো শৈথিল্যকে প্রশ্রয় দিলে তা হবে ভাষাশিক্ষার প্রতিবন্ধক।

রূপক। আমি তা মনে করি না।
কনক। তুই দেখছি, একেবারে সূচাগ্র মেদিনীও ছাড়বি না।
রূপক। ছাড়তে পারি যদি চা খাওয়াস্।
কনক। তাই চল তা হলে।

৩২। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর জীবনের ভবিষ্যৎকে কোন্ পথে কী ভাবে চালিত করবে, সে সম্পর্কে দুজন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর। [উ. মা. পশ্চিমবঙ্গ ১৯৮০]

সৌমা। পরীক্ষা তো শেষ হল, এখন রেজাল্টের জন্যে দিন গুনতে হবে।
সুকান্ত। কবে বেরোবে বলে মনে হয়?
সৌমা। লিখিত পরীক্ষা শেষ হবার পর মাস আড়াই লাগবে শুনছি।
সুকান্ত। তুই কী নিয়ে পড়বি?
সৌমা। দেখি, জয়েন্ট এন্ট্রান্স তো দিয়েছি। চান্স পেলে ইঞ্জিনিয়ারিং-এই ভর্তি হব। তুই তো জানিস, আমার বাবা-কাকারা সবাই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র।
সুকান্ত। হ্যাঁ, তা তো জানি। তোর বাবা তো জার্মানিতেও ছিলেন কিছুদিন।
সৌমা। হ্যাঁ।
সুকান্ত। তুই বিদেশে যাবি নাকি?
সৌমা। কী যে বলিস! তবে স্বপ্ন দেখতে দোষ কী?
সুকান্ত। ঠিক বলেছিস্।
সৌমা। এবারে তোর কথা শুনি।
সুকান্ত। দেখ, আমি তো কমার্সের ছাত্র। ভাবছি Accountancy-তে অনার্স নিয়ে কোনো ভালো কলেজে ভর্তি হব।
সৌমা। তারপর?
সুকান্ত। Costing-পড়ার ইচ্ছে আছে।
সৌমা। এ লাইনটাও কিন্তু এখন খারাপ নয়। ভালো career এতেও তৈরি করতে পারবি।
সুকান্ত। আমি সেই জন্যে Mathematics-এর দুর্বলতা কাটাতে চেষ্টা করছি। খুব করে অঙ্ক করব ভাবছি, যদ্দিন result না বের হয়।
সৌমা। আমাকেও এই সময়টা কাজে লাগাতে হবে।
সুকান্ত। সত্যি, পরীক্ষার যেন শেষ নেই।
সৌমা। হ্যাঁ, পরীক্ষা দিয়েই পরবর্তী পরীক্ষার চিন্তা।
সুকান্ত। আমরা জল্পনাকল্পনা করছি আর 'ভবিষ্যৎ' হাসছে, তাই না?

[দুজনের হাস্য]

৩৩। ফুটবল খেলার মাঠে শান্তি-প্রতিষ্ঠার উপায় নিয়ে দু-বন্ধুর কথোপকথন। [উ. মা. পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৮১]

সুদীপ। কী রে? আজ তোর প্রিয় দলের খেলা। আর তুই মুখ গোমড়া করে বসে আছিস। কী হল তোর?

সুমন্ত। মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। খেলা ধরে গেল।

সুদীপ। সে কি! অমৃতে অরুচি! এ কি কথা শুনি আজ—

সুমন্ত। না, আমি ঠাট্টা করছি না। আমি সিরিয়াস। কোনো সভ্য মানুষের খেলার মাঠে যাওয়া উচিত নয়। খেলা নিয়ে অশান্তি, মারামারি, দাঙ্গাবাজি—এই কি খেলা? এ খেলাভাঙার খেলা বয়কট করেছি। দর্শকে দর্শকে মারামারি, খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে হাতাহাতি। রেফারি-ঠেঙানো—এ তো লেগেই আছে। ছিঃ! আমরা কি সভ্য?

সুদীপ। অনেক দুঃখে মাঠে যাওয়া ছেড়েছি ভাই। কিন্তু ভাবছি, আমরা যদি সবাই এভাবে খেলা বয়কট করি, মাঠে না যাই তবেই কি সমস্যার সমাধান হবে? মাঠে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে? সমাজবিরোধীরা তা হলে আরো পেয়ে বসবে। এর একটা উপায় আমাদেরই বার করতে হবে এবং অবিলম্বে।

সুমন্ত। কী উপায়? পুলিশ দিয়ে শান্তি রক্ষা? আমি ও পন্থায় বিশ্বাসী নই। মাথাপিছু একজন করে পুলিশ নিয়োগ করলেও শান্তি ফিরে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। সি. আর. পি., মিলিটারি দিয়েও হবে না। পুলিশের সামনেও কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

সুদীপ। আমি তা বলছি না। আমার মনে হয় কি জানিস? বেশির ভাগ দর্শকেই চায় শান্তিতে খেলা দেখতে। কারণ, তারা অনেক কষ্টে লাইনে দাঁড়িয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে খেলা দেখতেই যায় না কি? আমার মতে, বিরাট-সংখ্যক শান্তিকামী মানুষ যদি ঠিক থাকে তবে অল্পসংখ্যক অশান্তি-কামী মানুষ কিছু করতে পারে না। আমাদের শুভবুদ্ধির ওপরেই মাঠের শান্তি-শৃঙ্খলা নির্ভর করে।

সুমন্ত। কবে আমাদের শুভবুদ্ধি জাগবে তার জন্যে বসে থাকতে হবে?

সুদীপ। সরকার, কর্তৃপক্ষ, সবাইকে এ নিয়ে ভাবতে হবে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। তবে সুখের কথা, ব্যাপারটা নিয়ে বিধানসভাতেও তোলপাড় হয়েছে। দেখা যাক, কী হয় শেষ পর্যন্ত।

৩৪। কোন জনপ্রিয় নাটকের অভিনয় দেখে বাড়ি ফেরবার পথে সেই নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে দুই বন্ধুর সংলাপ। [ত্রিপুরা উ. মা, ১৯৮১]

পথিক। কী রে? নাটক দেখে বোবা হয়ে গেলি?

কুশল। সত্যি রে, একদম বোবা করে দেওয়া নাটক। এতদিন কেন দেখি নি তাই ভাবছি।

রূপক। আমি তা মনে করি না।

কনক। তুই দেখছি, একেবারে সূচ্যগ্র মেদিনীও ছাড়বি না।

রূপক। ছাড়তে পারি যদি চা খাওয়াস্।

কনক। তাই চল তা হলে।

৩২। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার পর জীবনের ভবিষ্যৎকে কোন্ পথে কী ভাবে চালিত করবে, সে সম্পর্কে দুজন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর কাল্পনিক সংলাপ রচনা কর। [উ. মা. পশ্চিমবঙ্গ ১৯৮০]

সৌম্য। পরীক্ষা তো শেষ হল, এখন রেজাল্টের জন্যে দিন গুণতে হবে।

সুকান্ত। কবে বেরোবে বলে মনে হয়?

সৌম্য। লিখিত পরীক্ষা শেষ হবার পর মাস আড়াই লাগবে শুনছি।

সুকান্ত। তুই কী নিয়ে পড়বি?

সৌম্য। দেখি, জয়েণ্ট এণ্ট্রান্স তো দিয়েছি। চান্স পেলে ইঞ্জিনিয়ারিং-এই ভর্তি হব। তুই তো জানিস, আমার বাবা-কাকারা সবাই ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র।

সুকান্ত। হ্যাঁ, তা তো জানি। তোর বাবা তো জার্মানিতেও ছিলেন কিছুদিন।

সৌম্য। হ্যাঁ।

সুকান্ত। তুই বিদেশে যাবি নাকি?

সৌম্য। কী যে বলিস! তবে স্বপ্ন দেখতে দোষ কী?

সুকান্ত। ঠিক বলেছিস্।

সৌম্য। এবারে তোর কথা শুনি।

সুকান্ত। দেখ, আমি তো কমার্সের ছাত্র। ভাবছি Accountancy-তে অনার্স নিয়ে কোনো ভালো কলেজে ভর্তি হব।

সৌম্য। তারপর?

সুকান্ত। Costing-পড়ার ইচ্ছে আছে।

সৌম্য। এ লাইনটাও কিন্তু এখন খারাপ নয়। ভালো career এতেও তৈরি করতে পারবি।

সুকান্ত। আমি সেই জন্যে Mathematics-এর দুর্বলতা কাটাতে চেষ্টা করছি। খুব করে অঙ্ক করব ভাবছি, যদ্দিন result না বের হয়।

সৌম্য। আমাকেও এই সময়টা কাজে লাগাতে হবে।

সুকান্ত। সত্যি, পরীক্ষার যেন শেষ নেই।

সৌম্য। হ্যাঁ, পরীক্ষা দিয়েই পরবর্তী পরীক্ষার চিন্তা।

সুকান্ত। আমরা জল্পনাকল্পনা করছি আর 'ভবিষ্যৎ' হাসছে, তাই না?

[দুজনের হাস্য]

৩৩। ফুটবল খেলার মাঠে শান্তি-প্রতিষ্ঠার উপায় নিয়ে দু-বন্ধুর কথোপকথন। [উ. মা. পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৮১]

সুদীপ। কী রে? আজ তোর প্রিয় দলের খেলা। আর তুই মুখ গোমড়া করে বসে আছিস। কী হল তোর?

সুমন্ত্র। মাঠে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছি। ঘেন্না ধরে গেল।

সুদীপ। সে কি! অমৃতে অরুচি! এ কি কথা শুনি আজ—

সুমন্ত্র। না, আমি ঠাট্টা করছি না। আমি সিরিয়াস। কোনো সভ্য মানুষের খেলার মাঠে যাওয়া উচিত নয়। খেলা নিয়ে অশান্তি, মারামারি, দাঙ্গাবাজি—এই কি খেলা? এ খেলাভাঙার খেলা বয়কট করেছি। দর্শকে দর্শকে মারামারি, খেলোয়াড়ে খেলোয়াড়ে হাতাহাতি। রেফারি-ঠেঙানো—এ তো লেগেই আছে। ছিঃ! আমরা কি সভ্য?

সুদীপ। অনেক দুঃখে মাঠে যাওয়া ছেড়েছি ভাই। কিন্তু ভাবছি, আমরা যদি সবাই এভাবে খেলা বয়কট করি, মাঠে না যাই তবেই কি সমস্যার সমাধান হবে? মাঠে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে? সমাজবিরোধীরা তা হলে আরো পেয়ে বসবে। এর একটা উপায় আমাদেরই বার করতে হবে এবং অবিলম্বে।

সুমন্ত্র। কী উপায়? পুলিশ দিয়ে শান্তি রক্ষা? আমি ও পন্থায় বিশ্বাসী নই। মাথাপিছু একজন করে পুলিশ নিয়োগ করলেও শান্তি ফিরে আসবে বলে আমি বিশ্বাস করি না। সি. আর. পি., মিলিটারি দিয়েও হবে না। পুলিশের সামনেও কত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে।

সুদীপ। আমি তা বলছি না। আমার মনে হয় কি জানিস? বেশির ভাগ দর্শকেই চায় শান্তিতে খেলা দেখতে। কারণ, তারা অনেক কষ্টে লাইনে দাঁড়িয়ে গাঁটের পয়সা খরচ করে খেলা দেখতেই যায় না কি? আমার মতে, বিরাট-সংখ্যক শান্তিকামী মানুষ যদি ঠিক থাকে তবে অল্পসংখ্যক অশান্তি-কামী মানুষ কিছু করতে পারে না। আমাদের শুভবুদ্ধির ওপরেই মাঠের শান্তি-শৃঙ্খলা নির্ভর করে।

সুমন্ত্র। কবে আমাদের শুভবুদ্ধি জাগবে তার জন্যে বসে থাকতে হবে?

সুদীপ। সরকার, কর্তৃপক্ষ, সবাইকে এ নিয়ে ভাবতে হবে এবং দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে। হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না। তবে সুখের কথা, ব্যাপারটা নিয়ে বিধানসভাতেও তোলপাড় হয়েছে। দেখা যাক, কী হয় শেষ পর্যন্ত।

৩৪। কোন জনপ্রিয় নাটকের অভিনয় দেখে বাড়ি ফেরবার পথে সেই নাটক ও অভিনয় সম্বন্ধে দুই বন্ধুর সংলাপ। [ত্রিপুরা উ. মা, ১৯৮১]

পথিক। কী রে? নাটক দেখে বোবা হয়ে গেলি?

কুশল। সত্যি রে, একদম বোবা করে দেওয়া নাটক। এতদিন কেন দেখি নি তাই ভাবছি।

পথিক। তোমাকে তো অনেকবার বলেছি থিয়েটার ওয়ার্কসপের 'চাকভাঙা মধু' দেখে আয়। এবার বুঝলি তো কেন দেখতে বলতাম? আমি তো জানি তুই সিরিয়াস নাটক দেখতে কত ভালবাসিস।

কুশল। সত্যি রে আমার আবার একটু সিরিয়াস না হলে ভালো লাগে না। বেশ একটা জোরালো বক্তব্য থাকবে, আদর্শ থাকবে, সংগ্রাম থাকবে। তা না, কেবল প্রেমের প্যানপ্যানানি আমি একদম সহ্য করতে পারি না।

পথিক। তোর ভালো লাগল কাকে?

কুশল। কাকে বাদ দেব বল? এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ। তবে মাতলা আর মাতলার কাকা বেদে-বুড়োকে ভোলা যায় না।

পথিক। মানে তুই মাতলা অর্থাৎ অশোক মুখার্জী, আর বুড়ো মানে বিভাস চক্রবর্তীর কথা বলছিস তো?

কুশল। হ্যাঁ। বিভাস চক্রবর্তীই তো পরিচালক, তাই না?

পথিক। হ্যাঁ।

কুশল। সত্যি, অনবদ্য অভিনয়, ডিরেকশনও বটে। কার লেখা রে নাটকটা?

পথিক। মনোজ মিত্রের।

কুশল। আচ্ছা, যার লেখা 'সাজানো বাগান' তপনবাবুর ফিল্ম হয়েছে?

পথিক। ঠিক তাই, এটা কিন্তু অনুবাদ নাটক নয়। মৌলিক রচনা।

কুশল। সত্যি রে, আমাদের মৌলিক নাটকের বড়োই অভাব। সবই তো অনুবাদের অনুবাদ, তস্য অনুবাদ। সেইচর্বিত চর্বণ।

পথিক। অনুবাদ হোক মন্দ নয়, 'দেবে আর নেবে মিলাবে মিলিবে' কিন্তু অরিজিনাল নাটক লেখার ইচ্ছেটা যেন নষ্ট না হয়।

কুশল। ঠিক বলেছিস, নাটক হল হাতিয়ার, মানে অস্ত্র। পথ তৈরি করতে হলে অস্ত্র চাই। কোনো অস্ত্র দেশী, কোনো অস্ত্র বিদেশী। দুটোকেই আমাদের কাজে লাগাতে হবে। কিরে, এবার তুই ভাবছিস কেন? খুব তো আমাকে বলছিলি।

পথিক। ভাবনাটা যে ছোঁয়াচে জানিস না? আমি ভাবছি 'চাকভাঙা মধু'র ওই মানুষগুলোর কথা, নাট্যকার যাদের ধরে এনেছেন আমাদের চোখের সামনে। আচ্ছা, বল তো, দেশের সব মানুষের জন্যে আমরা মোটা ভাত মোটা কাপড়ের ব্যবস্থা করতে আজও পারি নি, আমাদের বিলাসিতা সাজে? না আজে-বাজে নাটক বা ফিল্ম দেখার ইচ্ছে হয়?

কুশল। নিশ্চয়ই হয়, তা না হলে ওগুলো চলছে কেন?

পথিক। তোকে বলে রাখলাম, দেশের মানুষ যত বেশি নাটক দেখবে, ভালো ছবি দেখবে, ততই দেশের রুচির বদল হবে।

কুশল। সেই আশা নিয়ে বাসে ওঠা যাক। এটাই বোধ হয় শেষ বাস।

৩৫। দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি-প্রসঙ্গে দুই বন্ধুর মধ্যে সংলাপ রচনা করো।
[উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮২]

সুসীম। এ খাতাটা কত দিয়ে কিনলি রে?
সঞ্জয়। দু টাকা কুড়ি পয়সা নিল।
সুসীম। সে কী রে! সপ্তাহদুয়েক আগেও তো এক টাকা আশি পয়সা দাম ছিল।
সঞ্জয়। ও আর বলে লাভ কী ভাই! সব জিনিসের দামই তো ক্রমাগত বাড়ছে।
সুসীম। সত্যি, সেদিন দাগুর শরীর খারাপ ছিল, আমিই গিয়েছিলাম বাজারে। মনে হল বাজারে আগুন লেগেছে। সব্জী, মাছ সবই সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে।
সঞ্জয়। আচ্ছা, এর কি কোনো প্রতিকার নেই?
সুসীম। দেখ, এই মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে মুদ্রাস্ফীতির প্রশ্ন জড়িয়ে আছে।
সঞ্জয়। তা তো আছেই, তবু বলব বেশি মুনাফার লোভই এর জন্যে দায়ী।
সুসীম। ঠিক বলেছিস, বেবিফুড বাজার থেকে মাঝে মাঝে উধাও হয়। তারপর গুটিগুটি করে যখন দেখা দেয় তখন দামের বহর দেখে কে?
সঞ্জয়। সত্যি, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসগুলো যাতে ব্যবসায়ীরা অবৈধভাবে মজুত করে কৃত্রিম চাহিদা সৃষ্টি না করতে পারে কর্তৃপক্ষের সেদিকে কড়া নজর দেওয়া দরকার।
সুসীম। অবশ্য জনসাধারণের সহযোগিতাও এ বিষয়ে খুব দরকার।
সঞ্জয়। নিশ্চয়। আর একটা কথা। ক্রেতাদের তরফ থেকে কোনো প্রতিরোধ-সংস্থাও গড়ে ওঠা চাই, যার যেমন খুশি দাম বাড়বে তা তো চলতে পারে না।
সুসীম। মুশকিল হচ্ছে, বেড়ালের গলায় ঘণ্টা বাঁধে কে?
সঞ্জয়। ঠিক বলেছিস।
সুসীম। আসলে জীবনে মূল্যবোধ বলে আর কিছু নেই, তাই মূল্যবৃদ্ধিও অন্যান্য অনর্থের সঙ্গে যুক্ত হবে এতে আর আশ্চর্য হবার কী আছে!
সঞ্জয়। সত্যি, এই মূল্যবোধের সমস্যাই বোধ হয় সবচেয়ে বড়ো সমস্যা।

৩৬। মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষালাভের সুবিধা ও অসুবিধা-সম্পর্কে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা করো।

কুশল। তোর হাতে ওটা কী বই রে পথিক—অভিধান নাকি?
পথিক। ঠিক ধরেছিস—তবে সাধারণ অভিধান নয়—পরিভাষার অভিধান। আজকাল পদার্থ কিংবা রসায়ন বইয়ে যা দাঁতভাঙা বাংলা শব্দের ব্যবহার হচ্ছে—অভিধান না দেখলে চলছে না। সত্যি কুশল, বাংলায় ফিজিক্স-কেমিস্ট্রি পড়বার কী দরকার ছিল বল তো?
কুশল। কেন, মাতৃভাষার মাধ্যমটাই তো সবচেয়ে সহজ মাধ্যম। যেমন মাতৃদুগ্ধ—

সহজে হজম হয়। তাই তো সর্বস্তরে এখন মাতৃভাষাকেই শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

পথিক। আরে বাবা, আমাদের বাপকাকারাও তো লেখাপড়া করেছেন, নাকি? কই, ইংরেজি ভাষায় পড়াশোনা করতে গিয়ে তো তাঁদের কোনো অসুবিধে হয় নি?

কুশল। তা অবশ্য হয় নি। কিন্তু ধর, আমাদের পল্লীগ্রামের হাজার হাজার মানুষকে যে এই ইংরেজিভাষার প্রাচীর টপকাতেনা পারার ফলে লেখাপড়া ছেড়েই দিতে হয়েছে।

পথিক। সে কথা ঠিক। মাতৃভাষায় উচ্চশিক্ষা প্রসারিত হবে এ কথাও মেনে নিচ্ছি। কিন্তু উপযুক্ত পরিভাষা তৈরি না হলে বাঙ্‌লায় ভাল বই লেখা হবে কেমন করে?

কুশল। রাতারাতি কিছু হবে না, ধীরে ধীরে পথ করে চলতে হবে। তুই কী সব দাঁতভাঙার কথা বলছিলি না? দ্যাখ, গোড়ার দিকে যেটাকে মনে হবে দাঁতভাঙা, সেটাই অনুশীলনের ফলে অনেকটা সহজ ও গা-সওয়া হয়ে আসবে।

পথিক। কিন্তু ছোটোরাও কি এই-সব শব্দ মুখস্থ করবে?

কুশল। নিশ্চয়ই। শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষা চলবে মাতৃভাষায়। এতে অদ্ভুত কিছু নেই—'Play ground' না বলে 'খেলার মাঠ' বলবে এই আর কি! এখন অদ্ভুত মনে হবে, অভ্যস্ত হয়ে গেলে আর অদ্ভুত লাগবে না। সকলের আলোচনার মধ্য দিয়ে যে-শব্দটা সহজ এবং গ্রহণযোগ্য তাই থেকে যাবে—অন্যগুলো যাবে হারিয়ে।

৩৭। সাংসারিক অভাব-অভিযোগকে কেন্দ্র করে ভাই ও বোনের মধ্যে সংলাপ। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

ভাই। বাবা এই সাত সকালেই এত রাগারাগি করছেন কেন রে, দিদি? আমি তো কিছু করি নি।

দিদি। কর নি আবার? পড়ার ঘর থেকে চলে এসেছ, অথচ পাখাটা শুধু শুধু ঘুরেই যাচ্ছে। ওটা বন্ধ করে আসা যায় না? এদিকে ইলেকট্রিক বিল কত উঠেচে জানিস? সত্তর টাকা! সব দিকেই খরচা বাড়ছে। হিসেব করে না চললে সংসার চলবে কী করে? বাবা একা মানুষ, এত সামলাতে পারেন কখনো? খরচ বাড়ছে, অভাব-অভিযোগও বাড়ছে।

ভাই। ঠিকই বলেছিস। তারপর জিনিসের যা দাম বাড়ছে—সব একেবারে আকাশ-ছোঁয়া। বাজারে যেন আগুন লেগেছে।

দিদি। সংসারে অভাব-অনটন। এদিকে খরচ বেড়েই চলেছে। স্কুলের মাইনে না লাগলেও লেখাপড়ার অন্যান্য খরচও ক্রমশ বেড়েই চলেছে। এ-অবস্থায়

বাবার মেজাজ তো খারাপ হতেই পারে। তার ওপর অফিসেও খাটুনি বেড়েছে।

ভাই। ভাবছিলাম, কোনো মাস্টারমশাই-এর কাছে সায়েন্স সাবজেক্টগুলো পড়ব। কিন্তু ভেবে দেখলাম, আর খরচ বাড়াব না। ওগুলো নিজেই পড়ে নেব।

দিদি। আমিও গান শেখা ছেড়ে দেব। শুধু শুধু প্রতি মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে।

ভাই। না রে, দিদি। গান ছাড়িস না। ওটা তোর শখের জিনিস।

দিদি। আর শখ! এত অভাবের মধ্যে শখের স্থান নেই। আমি সামনের মাস থেকে একটা ট্যুইশন ধরছি। লেখাপড়ার খরচটা নিজেই চালিয়ে নিতে পারব।

ভাই। তোর পরিকল্পনাটা মন্দ নয়। বাবার এতে কিছুটা সাহায্য হবে। আমাকেও একটা টু, থি্র ছাত্র জোগাড় করে দিবি, দিদি ?

দিদি। অত পাকামো করতে হবে না। তুমি মন দিয়ে লেখাপড়া করো, তা হলেই বাবাকে সাহায্য করা হবে।

ভাই। পড়াশোনা তো করছিই কিন্তু বাবার জন্যে কষ্ট হয় যে।

দিদি। সব ব্যাপারেই আমাদের সামলে চলতে হবে। খাওয়া-দাওয়া, জামা-কাপড় —সব দিক দিয়েই হিসেব করে চলতে হবে। দেখতে হবে অপচয় যেন না হয়। অযথা খরচও যেন বন্ধ হয়।

ভাই। তুই ঠিক বলেছিস দিদি। হিসেব করে চললে অভাব আর অত চোখ রাঙাতে পারবে না।

দিদি। যাই তোর চা-টা নিয়ে আসি।

ভাই। না রে দিদি, ভাবছি চা খাওয়া ছেড়ে দেব।

দিদি। ফের, পাকামো!

৩৮। দেশভ্রমণের উপযোগিতা সম্বন্ধে দুই বন্ধুর মধ্যে একটি কাল্পনিক সংলাপ রচনা করো। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

পথিক। অত মন দিয়ে কিসের বিজ্ঞাপন পড়ছিস রে সপ্তর্ষি ?

সপ্তর্ষি। একটা ভ্রমণসংস্থার বিজ্ঞাপন দেখছিলাম। জানিস পথিক, আজকাল কো-অপারেটিভ সোসাইটির মাধ্যমেও ভ্রমণসংস্থা তৈরি হচ্ছে।

পথিক। যতসব বড়োলোকী ব্যাপার! সমুদ্র, ঝর্না, পাহাড় এসব তো আমাদের মতো সাধারণ মানুষের ধরা-ছোঁয়ার বাইরের জিনিস।

সপ্তর্ষি। আমি তোর সঙ্গে একমত হতে পারছি না পথিক। ভ্রমণটাকে তুই বিলাসিতা বলে মনে করছিস কেন ?

পথিক। বিলাসিতা ছাড়া আর কী বল ?

সপ্তর্ষি। আমার মতে ভ্রমণ হল শিক্ষার অঙ্গ। দেশভ্রমণ ছাড়া কোনো শিক্ষাই সম্পূর্ণ হয় না। ধর, তুই ইতিহাসে পলাশীর যুদ্ধ পড়লি, সিরাজদৌল্লার কাহিনী পড়লি, কিম্বা সাজাহান এবং তাজমহল সম্পর্কে পাতার পর পাতা

নোট নিলি। কিন্তু এই-সব দর্শনীয় স্থান যদি নিজের চোখে দেখতে না পাস তা হলে ইতিহাস পড়াটাই যে ব্যর্থ। ধর, পলাশীর আমবাগান আজও আছে। সেখানে গিয়ে বসলেই তো তোর কানে কানে ইতিহাস কথা বলবে রে—

পথিক। বাব্বাঃ! তুই যে আজকাল ইতিহাসের স্যরের মতো কথা বলছিস রে সপ্তর্ষি! তা একটা ভ্রমণসংস্থা খুললেই তো পারিস। তোর সঙ্গে আমিও না হয় হিল্লী-দিল্লী ঘুরে আসব।

সপ্তর্ষি। তোকে নেব না, কারণ ভ্রমণের ওপর তোর শ্রদ্ধা নেই। আজও ভ্রমণ হল তোর কাছে হিল্লী-দিল্লী ঘোরা। জানিস—এই ভ্রমণের মধ্য দিয়েই মানুষে মানুষে প্রীতির প্রসার হয়, গড়ে ওঠে ভ্রাতৃত্ববোধ। আমরা যে একজাতি এক-প্রাণ, সেটা পথে না বেরুলে বুঝতে পারবি না।

পথিক। তার মানে—"দেশে দেশে মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর লব খুঁজিয়া"—এই তো?

সপ্তর্ষি। এই তো ঠিক ধরেছিস, তাহলে মানুষের জীবনে ভ্রমণের কত বড়ো প্রয়োজন তা মানিস তো?

পথিক। মানি মানি, হাজার বার মানি। তোর পাল্লায় পড়েছি না মেনে উপায় আছে?

৩৯। একজন রেলের টিকিটচেকার ও বিনাটিকিটের যাত্রীর মধ্যে কাল্পনিক সংলাপ।

চেকার। আপনার টিকিটটা দয়া করে দেখাবেন। শুনছেন? আপনাকে বলছি।

যাত্রী। আমাকে বলছেন? ইয়ে মানে খুব তাড়া ছিল তাই টিকিট করতে পারি নি।

চেকার। করতে পারেন নি, এখন করে নিন। আপনি কোথায় উঠেছেন, যাবেন কতদূর?

যাত্রী। সত্যি বিশ্বাস করুন, আমার কাছে পয়সা নেই, তাই টিকিট করতে পারি নি।

চেকার। কোন্‌টা সত্যি—সময় নেই বলে টিকিট করেন নি, না পয়সা নেই বলে টিকিট করেন নি?

যাত্রী। পরেরটাই সত্যি, অর্থাৎ ট্যাঁক খালি।

চেকার। আমি বল্‌ব কোন্‌টা সত্যি? আসল কথা হল পয়সা থাকতেও টিকিট কাটেন না এটাই অনেকের স্বভাব। আচ্ছা মশাই, দেশ তো আপনার নিজের, লজ্জা করে না নিজের দেশের মানুষকে ফাঁকি দিতে?

যাত্রী। ফাঁকি তো আমি একা দিচ্ছি নে, অনেকেই দিচ্ছি।

চেকার। অনেকের কথা আপনি কেন বলবেন, আপনি বলবেন আপনার নিজের কথা। জানেন বিনাটিকিটের কী সাজা?

যাত্রী। খুব তো বড়ো বড়ো কথা বলছেন, আপনারা নিজেরাও কি নিজেদের দায়িত্ব পালন করেন?

চেকার। অবশ্যই করি।

যাত্রী। তাহলে ট্রেন কেন লেটে আসে? পাঁচটার ট্রেন রাত নটায় হাজির হয় কেন? বলুন, একবার জবাব দিন?

চেকার। ট্রেন লেট হবার নানান কারণ থাকতে পারে, যান্ত্রিক গোলযোগ, অ্যাক্সিডেন্ট, রেকের অভাব, তার চুরি, লোডশেডিং—এইসব নানান্ কারণ থাকতে পারে। কিন্তু তা বলে ট্রেনে চড়ব কিন্তু টিকিট কাটব না এটা কোনো যুক্তি নয়।

যাত্রী। তারপর এই যে মাথার ওপর পাখা আছে কিন্তু ঘুরছে না, এর জন্যে আপনারা কী ব্যবস্থা করেছেন?

চেকার। অভিযোগ করুন, সে অধিকার প্রত্যেকের আছে। প্রত্যেক স্টেশনে অভিযোগ করার বই আছে, কিন্তু বিনা টিকিটের যাত্রীর কাছে তো কোনো অভিযোগ শুনব না, অভিযোগ শুনব যাঁরা আইনত যাত্রী অর্থাৎ টিকিট কেটেছেন, তাঁদের কাছে। অতএব হয় টিকিটের পয়সা বের করুন নতুবা আমার সঙ্গে চলুন।

যাত্রী। চলুন যাচ্ছি, পয়সা যে সত্যি নেই সেটা প্রমাণ করব।

৪০। সমাজে চলচ্চিত্রের প্রভাব সম্বন্ধে দুই বন্ধুর সংলাপ।

[নমুনা প্রশ্ন, সংসদ ১৯৭৯]

সমর। (দূরে অন্য একটি ছেলের জামার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে) দেখেছিস, ব্রতীন, ঐ চটকদার জামার designটা !

ব্রতীন। হ্যাঁ, দেখেছি, কোনো সিনেমার নায়কের অনুকরণ হয়তো।

সমর। (সহাস্যে) আমিও ঠিক তাই ভাবছিলাম।

ব্রতীন। সত্যি, সিনেমার প্রভাব সমাজজীবনে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে।

সমর। হ্যাঁ, পোশাক-পরিচ্ছদ, চলন-বলন, কেশবিন্যাস সবকিছুতেই সিনেমার প্রভাব লক্ষ করা যাচ্ছে।

ব্রতীন। আর ব্যবসায়ীরা তরুণ-তরুণীদের এই মনোভাবকে মূলধন করে মুনাফা লুটছে।

সমর। ঠিক বলেছিস। আর প্রভাবটা শুধু বাইরে নয়, মানসিকতার উপরেও লক্ষ করা যাচ্ছে।

ব্রতীন। হ্যাঁ। বোম্বেমার্কা ব্যবসায়ী ছবিগুলোই অবশ্য এই ধরনের প্রভাবের জন্য দায়ী।

সমর। সত্যি তাই। ভালো ছবির প্রভাব ভালো হতে বাধ্য।

ব্রতীন। নিশ্চয়। আমাদের জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে ভালো ভালো ছবি।

সমর। সে-রকম ছবি হচ্ছে না তা নয়, তবে প্রয়োজনের তুলনায় সংখ্যায় খুবই কম।

ব্রতীন। সম্প্রতি কিছু তরুণ পরিচালক সিনেমা জগতে বিপ্লব আনছে, নতুন চিন্তার জোয়ার আসছে।

সমর। এটা খুবই আনন্দের কথা।

ব্রতীন। সেদিন একজন প্রখ্যাত চিত্রপরিচালক বলছিলেন, আমাদের জাতীয় সংহতিবোধ জোরালো করে তুলতে পারে চলচ্চিত্র।

সমর। তিনি বোধ হয় বলতে চেয়েছিলেন এমন সব ছবি তৈরি হতে পারে যা ভারতের মূলগত ঐক্যের ছবিটাই ফুটিয়ে তুলবে।

ব্রতীন। হ্যাঁ, ঠিক তাই। তাঁর ধারণা হলিউড মার্কা ছবিগুলোর সঙ্গে আমাদের দেশের মাটির কোনো যোগ নাই। এগুলো তরুণচিত্তকে কেমন আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

সমর। কোনো কোনো বিশেষজ্ঞ বলছেন আপরাধমূলক ছবি সমাজে অপরাধ-প্রবণতায় ইন্ধন যোগাচ্ছে।

ব্রতীন। অথচ, সিনেমা এমন-একটা জোরালো মাধ্যম যা ঠিকমতো ব্যবহৃত হলে জনচিত্তকে কল্যাণের দিকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

সমর। বাংলা চলচ্চিত্রই আশা করি সে পথ দেখাবে।

৪১। কোনো গ্রামের একটি ছেলে কলকাতায় নতুন এসেছে, অপরিচিত এক ভদ্রলোকের সাহায্যে কিছু দর্শনীয় বস্তু পরিদর্শনকে কেন্দ্র করে একটি সার্থক কথোপকথন রচনা করো।

গ্রামের ছেলে। ও মশাই, বলতে পারেন, জোড়াসাঁকোটা কোন্ দিকে ?

ভদ্রলোক। জোড়াসাঁকো, তুমি তো জোড়াসাঁকোতেই দাঁড়িয়ে আছো ভাই।

গ্রামের ছেলে। ও, এটাই জোড়াসাঁকো ?

ভদ্রলোক। তুমি যাবে কোথায়, কত নম্বর বাড়ি খুঁজছ ?

গ্রামের ছেলে। আমি গ্রাম থেকে রবীন্দ্রনাথের বাড়ি দেখতে এসেছি। অবশ্যি এর আগে দু'টো জায়গা ঘুরে এসেছি। একটা মিউজিয়ম, অন্যটা ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল।

ভদ্রলোক। তিন নম্বর, মানে তোমার দর্শনীয় স্থান রবীন্দ্রনাথের বাড়ির ঠিক পাশেই আমি থাকি। চলো না, তোমার সঙ্গে গল্প করতে করতে ওদিকে যাই।

গ্রামের ছেলে। সে তো আমার সৌভাগ্য, চলুন।

ভদ্রলোক। তুমি কোথা থেকে আসছ এখনও কিন্তু জানা হয় নি।

গ্রামের ছেলে। আমি বর্ধমানের নলহাটা থেকে আসছি। কখনো কলকাতায় আসি নি তো, তাই সব চিনে চিনে যেতে একটু অসুবিধে হচ্ছে। সবাই তো আর সমান নয়। এই তো খানিক আগে কটা ছেলে আমাকে ঠিক উল্টো দিকের পথ দেখিয়ে বলল 'সোজা জোড়াসাঁকো চলে যাও'। কিছু দূর যেতেই আর একজন ভুল ভাঙিয়ে এদিকে পাঠিয়ে দিলেন।

ভদ্রলোক। কিছু মনে কোরো না ভাই, আজকালকার ছেলে তো সব।

গ্রামের ছেলে। না-না আমি কিছু মনে করি নি। ভালো মন্দ দুটো দিয়ে ঠিক একটা সমতা তৈরি হয়ে যায়।

ভদ্রলোক। বাঃ তুমি তো খুব ভালো কথা বলেছ। কী পড় ?

গ্রামের ছেলে। উচ্চ মাধ্যমিক। সামনের বার পরীক্ষা দেব। অনেক দিনের ইচ্ছে কলকাতা দেখব। তা কলকাতা মানে তো বিশাল বিশাল বাড়ি নয়, বা ট্রামবাস উড়ালপুল নয়। অবশ্যি এসবও দেখবার, কিন্তু যার জন্যে কলকাতা সেগুলোই আগে দেখব।

ভদ্রলোক। তুমি কি আজকেই বর্ধমানে ফিরবে নাকি ?

গ্রামের ছেলে। না, আরও দুদিন থাকব হাওড়ায়, এক পিসির কাছে। পিসির ছেলেটার জ্বর নইলে সে-ই সঙ্গে আসত।

ভদ্রলোক। এই দেখো, তোমার সামনেই রবীন্দ্রনাথের বাড়ি। এর একটা অংশে এখন বিশ্ববিদ্যালয় হয়েছে।

ছেলে। জানি, রবীন্দ্রভারতী। সবই পড়া, কিছুই দেখি নি। এবার দেখব। অবশ্যি দু-একদিনে যতটা পারি। আচ্ছা, আপনাকে একটা প্রশ্ন করব ?

ভদ্রোলোক। একটা কেন, যত ইচ্ছে প্রশ্ন কর না কেন।

ছেলে। আপনার বাড়ি তো এই পাড়ায়, মানে রবীন্দ্রনাথের পাড়ায়, আপনি রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন ?

ভদ্রলোক। না ভাই, আমার কপাল খারাপ, আরও দু-চার বছর আগে জন্মালে হয়তো দেখতুম। আমার দাদা দেখেছেন—। মাঝে মাঝে বলেন, একদিন ছোটোবেলায় সূর্য ওঠার আগে ছাদে গেছি, দেখি ছাদের ওপর ঠাকুরবাড়ির রবি ঠাকুর, আর আকাশের ওপর রবি ঠাকুর দুই ঠাকুরকে ঠিক একরকম মনে হল।

ছেলে। বাঃ, বেশ সুন্দর বলেছেন আপনার দাদা ! কথাটা মনে থাকবে। আচ্ছা চলি।

ভদ্রলোক। যাও, তীর্থ দর্শনে চলেছ, আর আটকাব না।

৪২। তোমার পাঠ্যসূচী বা সিলেবাসের গুণাগুণের দিকে নজর রেখে দুই বন্ধুর সংলাপ রচনা কর। [উ. মা. ১৯৮৪]

কুশল। কিরে পথিক এই সাত সকালে চললি কোথায় ?

পথিক। আর বলিস না ভাই, শ্যামবাজারে এক প্রফেসরের বাড়ি যাচ্ছি।

কুশল। বাবাঃ এই গোল পার্ক থেকে শ্যামবাজার ?

পথিক। কি করব বল, এদিকে বায়লজি পড়বার অন্য ব্যবস্থা করা গেল না। জানিস তো আমার ডাক্তারী পড়বার ইচ্ছে আছে, তাই উচ্চ মাধ্যমিক থেকে জয়েণ্ট সব জায়গায় বায়লজিতে ভাল রেজাল্ট করতে হবে।

কুশল। তোদের বিজ্ঞানের ব্যাপার ঠিক বুঝব না, তবে আমাদের আর্টস্ এর পাঠ্যসূচী সম্পর্কে আমার কিছু বক্তব্য আছে।

পথিক। অর্থাৎ সমালোচনা ?

কুশল। না ঠিক সমালোচনা নয়, আর সে ক্ষমতা বা অধিকারও আমার নেই।

তবে আমার মনে হয় উচ্চ মাধ্যমিকের পাঠ্যসূচী নিয়ে আরও কিছু চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আছে।

পথিক। আরও একটু পরিষ্কার করে বল।

কুশল। দেখ, মাধ্যমিকের পর উচ্চ মাধ্যমিকের সিলেবাস হল ঠিক যেন নালা থেকে সমুদ্র। মানে ছেলেরা নালা থেকে হঠাৎ সমুদ্রে এসে পড়ে।

পথিক। তাইতো পড়া উচিত। নালা থেকে সমুদ্রে গিয়ে পড়াই তো আমাদের উদ্দেশ্য।

কুশল। হ্যা উচিত ঠিকই, কিন্তু হঠাৎ গিয়ে পড়াটা তো কাজের কথা নয়। ধীরে ধীরে এগুতে হবে। বাংলার পাঠ্যক্রমের কথাই ধরা যাক্ না কেন। মাধ্যমিকে ছিল কি, কিছুটা পদ্য কিছু গদ্য। আর এখানে পদ্য গদ্য ছাড়াও আছে নাটক, সাহিত্যের ইতিহাস, তার সঙ্গে উপপাঠ্য নাম করে কি শক্ত শক্ত সব বই। আরণ্যক, চারিত্রপূজা, দেবী চৌধুরানী, পথে প্রবাসে। আচ্ছা বলতে পারিস এই সব পড়ে—খানিকটা আনন্দ পাওয়া যায় কিন্তু জীবনের কোন কাজে এরা লাগবে?

পথিক। অর্থাৎ তুই বলতে চাস, পাঠ্যসূচীকে জীবনমুখী করতে হবে। অর্থাৎ যা পড়বি তাকেই জীবনের কাজে ব্যবহার করবি।

কুশল। ঠিক ধরেছিস। পড়ছি আরণ্যক, কিন্তু আমি কোনদিন গ্রাম দেখিনি, অরণ্য দেখিনি। এতে শিক্ষায় পূর্ণতা আসবে, না আসতে পারে? তারপর ধর মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য। বলতো কোন কাজে লাগবে পড়ে, যে ছেলেটা দুদিন বাদেই কোন এক মার্চেন্ট অফিসের কনিষ্ঠ কেরানী হবে।

পথিক। তার মানে তুই বলতে চাস আমাদের পাঠ্যসূচী তৈরী হবে চাকরীর দিকে দিকে তাকিয়ে? যেমন আজকাল পথেঘাটে কমার্সিয়াল কলেজগুলো তৈরী হয়েছে? তোর কথা মানতে পারলাম না। তাহলে তো দেশে জ্ঞান বিজ্ঞানের, শিল্প সাহিত্যের চর্চা বন্ধ হয়ে যাবে।

কুশল। আমি ঠিক তা বলতে চাই না। কেবল বলতে চাই যা জীবনের কোন কাজেই কোনদিন আর লাগবে না সেগুলো একটু কমকম পড়িয়ে যা জীবনের কাজে লাগবে সেগুলো বেশি করে পড়লে হয় না।

পথিক। তাইতো করা হচ্ছে। তুমি আর্টস পড়তে গেছো সাহিত্যের কিছু তো তোমাকে পড়তেই হবে। আমরা যেমন বিজ্ঞান পড়তে গেছি, সবাই যে ডাক্তার হবে, ইঞ্জিনিয়ার হবে, এমন কোন কথা নেই, কিন্তু সবাইকেই কিছুটা ডাক্তারী বা ইঞ্জিনিয়ারিং-এর বিষয় তো পড়তেই হবে।

কুশল। তা হবে, কিন্তু অধ্যাপকের বাড়িতে পড়তে যাচ্ছিস কেন? নিশ্চয়ই উচ্চ মাধ্যমিকের তুলনায় তোদের পাঠ্যসূচী কঠিন করে তৈরী করা। তা যদি হয় তো বলবো এটা ঠিক নয়। সকলেই তো তোর মত অধ্যাপকের

কাছে পড়তে যাবার সুযোগ পায় না। গরিব মা-বাবর সন্তান যারা, তারা তো প্রফেসর রেখে ছেলেকে পড়াতে পারবে না, তারা কি করবে ?

পথিক। কলেজে যদি ভালোভাবে পড়ানো হয় তাহলে যা পাঠ্যসূচী আছে তা আঠারো মাসের মধ্যেই শেষ করা যায়, তবে কি জানিস কলেজে তো ঠিক ক্লাস হয় না। ছুটি, হরতাল আরও নানা ব্যপার। তবে এটা ঠিক পাঠ্য সূচী নিয়ে মাঝে মাঝেই শিক্ষাবিদ চিন্তানায়করা ভাবেন। তাই দেখবি আগামী বছরে পাঠ্যসূচীর আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। কিন্তু আজকের মত আলোচনাটা এখানেই শেষ করি ভাই, আমার বাস এসে গেছে এটা ছাড়লে চলবে না।

কুশল। আয়, পরে এ নিয়ে আলোচনা করা যাবে, তবে একটা কথা কি জানিস সিলেবাস কমিটিতে দু একজন ছাত্রকেও রাখা দরকার।

পথিক। ছাত্র কেন ?

কুশল। আমাদের বক্তব্য রাখবার একটু সুযোগ পাওয়া যাবে।

পথিক। সে সুযোগ তুই এমনিতেই পাবি। যদি কোন সাজেশন থাকে কাউনশিলের ঠিকানায় লিখে পাঠিয়ে দে। আচ্ছা চলি।

৪৩। বাংলা ভাষায় সরকারী কাজ কর্ম ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনা বিষয়ে দুই ব্যক্তির কল্পনা নির্ভর সংলাপ রচনা কর।

[ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৮৪]

চাটুজ্যেমশাই। এই সাত সকালে কোথায় চলেছেন গাজী সাহেব ?

গাজীসাহেব। চলেছি একটা ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ফর্ম আনতে। ছেলেটাকে একটা ভাল স্কুলে তো ভর্তি করতে হবে। গতবছর চেষ্টা করেছি কোথাও সুবিধে করতে পারিনি, এবছরেও যদি না পারি তো ওর ভবিষ্যৎ একেবারে অনিশ্চিৎ হয়ে পড়বে।

চাটুজ্যেমশাই। ভালোস্কুলে ভর্তিকরা অবশ্যই দরকার কিন্তু ওই যে ইংরাজি মিডিয়ম স্কুলের কথা বললেন ওটার কি সত্যিই খুব প্রয়োজন আছে ?

গাজীসাহেব। নেই আবার কি যে বলেন ! ইংরেজি ছাড়া এক পা চলবার শক্তি আছে ? সরকারী কাজ থেকে শুরু করে ব্যবসা-বাণিজ্য, কোথায় ইংরেজি নেই বলুন।

চাটুজ্যেমশাই। ছেলেকে ইংরেজি শেখান ক্ষতিনেই, কিন্তু স্বাধীনতা লাভের এতদিন পরেও সরকারী কাজকর্ম পরিচালনায় এখনও আমাদের মাতৃভাষা বাংলা চালু হলনা এটা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। আর বাণিজ্যের কথা বলছেন, ইংরেজি না জানার দেশের মানুষ কি ব্যবসা-বাণিজ্য করে না ?

গাজীসাহেব। মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাবিস্তারের কথাটা না হয় মানলাম, কিন্তু না মশাই সরকারী কাজকর্ম ইংরেজি ছাড়া চলে ? বিভিন্ন টার্মের পরিভাষা

কোথায়? বাংলায় সর্টহ্যাণ্ড হবে? দেখছেন তো বাংলা টাইপের অবস্থা। এর চেয়ে আমার আপনার হাতের লেখা অনেক স্পষ্ট মশাই।

চাটুজ্যেমশাই। একদিনেই তো সব কিছু ওলটানো যায় না। পরিভাষা তৈরী হচ্ছে, আরও হবে। আমাদের দেশের সাহিত্যিক-কবি-শিল্পীদের সচেতন করে তুলুন। সর্টহ্যাণ্ড আর টাইপরাইটারের কথা বলছেন, চেষ্টা করতে করতে একদিন ঠিকই কাজের উপযুক্ত হয়ে উঠবে। সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্দেশ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়া। কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে—হচ্ছে, তবে ইংরেজির রাজত্ব এখনও অব্যাহত। আমরা নিজেদের মাতৃভাষায় কাজ করতে পারব না, এ'ভাবাই যায় না।

গাজীসাহেব। কি জানি মশাই আমিতো ঠিক ভরসা করতে পারি না। অবিশ্যি একথা ঠিক বাংলায় কাজকর্ম চালু হলে আমাদেরই উপকার, কারণ ইংরেজিতো ভাল জানিনা।

চাটুজ্যেমশাই। সেটাই তো স্বাভাবিক, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা, মাতৃভাষার মত বিদেশী কোন ভাষায় দক্ষতা লাভ করা শক্ত। তবে একটা কথা আপনি ঠিকই বলেছেন, 'আমরা ভরসা করিতে পারি না।' একবার ভরসা করে চালু করে দিলে ঠিকই চলবে। এদেশে ইংরেজরা আসবার আগেও তো সরকারী কাজকর্ম হত, বাণিজ্য হত। একবার ভাবুন না মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ যে ভাষার মেরুদণ্ড তার শক্তি কতখানি।

গাজী সাহেব। অর্থাৎ আপনি বলতে চাইছেন ভাষার শক্তিকে কাজে লাগানো দরকার, তারপর বাকিটা ধীরে ধীরেই গড়ে উঠবে, সেই যে কথায় বলে, 'নেসেসিটি ইজ দি মাদার অফ ইনভেন্শন'।

চাটুজ্যেমশাই। ঠিক বলেছেন, "জলে না নামিলে কেহ শেখে না সাঁতার"।

অনুশীলনী

ক· যথানির্দেশ কথোপকথন রচনা করো ঃ

(১) খাঁচার পাখি আর বনের পাখির মধ্যে। (রবীন্দ্রনাথের 'খাঁচার পাখি ছিল সোনার খাঁচাটিতে, বনের পাখি ছিল বনে', কবিতাটি পড়ে নিতে পারো।)

(২) কোন আধুনিক আবিষ্কার নিয়ে (ছাত্র-শিক্ষকে)

(৩) একটা বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ডের আলোচনা (কয়েকজন প্রতিবেশীর মধ্যে)

(৪) লটারি খেলার ঔচিত্য নিয়ে (দুই নাগরিকের মধ্যে)

(৫) গ্রামে ও শহরে বাসের সুবিধা-অসুবিধা নিয়ে (গ্রামবাসী ও শহরবাসীর মধ্যে)

(৬) জাতীয় পোশাক বনাম বিদেশী পোশাক (দুই বন্ধুর মধ্যে)

(৭) জাতীয় জীবনে সাহিত্যিক ও বিজ্ঞানীর অবদান নিয়ে
(ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে)

(৮) ক্ষুদ্রশিল্প ও বৃহৎশিল্পের গুণাগুণ নিয়ে (দুই বন্ধুর মধ্যে)

(৯) মঞ্চ ও পর্দা—এ দুটির মধ্যে কার আকর্ষণ বেশি (দুই বন্ধুর মধ্যে)

(১০) কাজের ভালোলাগা ও মন্দলাগা নিয়ে (কৃষক ও শ্রমিকের মধ্যে)

(১১) বাংলায় কী করে বেশি নম্বর পাওয়া যাবে তা নিয়ে (ছাত্র ও শিক্ষকের মধ্যে)

(১২) বিদ্যালয়ে এন. সি. সি. ট্রেনিং আবশ্যিক করার সপক্ষে ও বিপক্ষে
(দুই ছাত্রের মধ্যে)

(১৩) U. N. O. তার আদর্শ রক্ষায় সফল হয়েছে কিনা তা নিয়ে
(দুই জনের বিতর্ক)

(১৪) লটারিতে মোটা টাকা পেলে কী করবে (দুই বন্ধুর মধ্যে)

(১৫) ভবিষ্যতে উচ্চশিক্ষা সম্বন্ধে (পিতা-পুত্রের মধ্যে)

(১৬) আমার প্রিয় ক্রিকেট খেলোয়াড় (দুজন ক্রিকেট-অনুরাগী ছাত্রের মধ্যে)

(১৭) ফোনের ঝকমারি নিয়ে (দুই গ্রাহকের মধ্যে)

(১৮) খাঁচায়-বন্দী পুরানো বাঘের সঙ্গে নবাগত বাঘের কথোপকথন

(১৯) একটি বৃদ্ধ রিক্সাচালকের দৈনন্দিন জীবন (রিক্সাচালক ও আরোহীর মধ্যে)

(২০) কোনো প্রতিবেশীর সৌহার্দ্যপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে (অন্য দুই প্রতিবেশীর মধ্যে)

(২১) এ বছরের পুজোর গান সম্বন্ধে (দুই তরুণের মধ্যে)

(২২) কোনো নৌকাভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে (দুই বন্ধুর মধ্যে আলোচনা)

(২৩) মাঝির জীবনের অভিজ্ঞতা (মাঝি ও নৌকারোহীর মধ্যে)

(২৪) কম্পার্টমেন্টের কোনো অসুবিধা সম্পর্কে (যাত্রী ও রেলওয়ে কর্মচারীর মধ্যে)

(২৫) রবীন্দ্রসঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে (কয়েকজন রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীর মধ্যে)

(২৬) কোনো ছোটোখাটো ব্যবসায়ের সম্পর্কে (কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের মধ্যে)

(২৭) শিশুশিক্ষায় মাতৃভাষার ভূমিকা সম্পর্কে (দুই বন্ধুর মধ্যে)

(২৮) সুদূর পল্লী-অঞ্চলে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উদ্বোধন প্রসঙ্গে
(একজন প্রবীণ ও নবীন গ্রামবাসীদের মধ্যে)

(২৯) ভারতের জনসংখ্যার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে (দুই বন্ধুর মধ্যে) [নমুনা প্রশ্ন '৭৮]

(৩০) একজন সৈনিক ও একজন শান্তিকামী ব্যক্তির মধ্যে [নমুনা প্রশ্ন '৭৮]

(৩১) চলচ্চিত্র দর্শনের কুফল সম্বন্ধে (দুই বান্ধবীর মধ্যে) [নমুনা প্রশ্ন '৭৯]

(৩২) টেলিভিশনে প্রদর্শিত কোনো একদিনের কর্মসূচী সম্বন্ধে
(মাতা ও কন্যার মধ্যে) [নমুনা প্রশ্ন '৭৯]

(৩৩) সামাজেতিহাস পাঠের প্রয়োজনীয়তা
(ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে) [নমুনা প্রশ্ন '৮০]

(৩৪) (i) জীবনের লক্ষ্য, (ii) ছাত্র-বিশৃঙ্খলা, (iii) সিনেমার উপকারিতা,

অপকারিতা, (iv) অভাব ও দারিদ্র্যের মধ্যে পড়াশুনা ইত্যাদি বিষয়ের যে-কোনো একটি সম্পর্কে বন্ধু/বাবা/শিক্ষক/ছাত্র [নমুনা প্রশ্ন ১৯৮০]

৩৫। ইনস্যাট—২ সম্পর্কে (দুই বন্ধুর মধ্যে)

৩৬। একদিনের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ভারতের মানোন্নয়ন নিয়ে (দুই বন্ধুর মধ্যে)

৩৭। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিয়ে (ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে)

৩৮। লোডশেডিং নিয়ে (দুই পরীক্ষার্থীর মধ্যে)

৩৯। পূজা স্পেশালে চড়ার করুণ অভিজ্ঞতা নিয়ে (দুই বন্ধুর মধ্যে)

৪০। জীবনের লক্ষ্য নিয়ে (শিক্ষক ও ছাত্রের মধ্যে)

৪১। ভাষা সমস্যা নিয়ে (দুই ভিন্ন সম্প্রদায়ের দুই জনের মধ্যে)

৪২। তুমি কোন খেলা কেন ভালবাসো (তোমার বন্ধুর সঙ্গে)

৪৩। জনসেবার আদর্শ নিয়ে (দুই বন্ধুর মধ্যে)

৪৪। গ্রামে ও শহরে জলকষ্ট সম্পর্কে (গ্রামবাসী ও শহরে বাসীর মধ্যে)

খ· নিম্নলিখিত প্রচলিত আখ্যানগুলিকে কথোপকথনে রূপ দাও ঃ

(১) উদর ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গ। (২) শিয়াল ও সারসের গল্প। (৩) সোনার বালা হাতে বাঘ ও পথিক। (৪) সিংহ মেষশাবক।

গ· নির্দেশমত ঐতিহাসিক-পৌরাণিক পটভূমিতে কাল্পনিক কথোপকথন লিখ ঃ

(১) আলেকজাণ্ডার ও পুরু (পুরুর উত্তরে গ্রীকবীরের সন্তোষ ও রাজ্যপ্রত্যর্পণ)

(২) অশোকের রাজত্বকালে দুই নাগরিক (অশোকের ধর্মনীতি-সম্পর্কে)

(৩) আকবরের সময়ের দুই নাগরিকের মধ্যে (আকবরের ধর্মনীতি-সম্পর্কে)

(৪) দুই ভারতীয় সিপাহীর মধ্যে (সিপাহী-বিদ্রোহের বিস্তার-সম্পর্কে)

পত্ররচনা

কত চিঠি লেখে লোকে—
কত সুখে, প্রেমে, আবেগে, স্মৃতিতে, কত দুঃখে ও শোকে।

সত্যি, 'চিঠি' এই ছোট্ট কথাটা আমাদের মনের মধ্যে ঢেউ তোলে। চিঠি আসে, অমনি যে লেখে আর যে পায় দু'জনে হয় মুখোমুখি। বর্তমান ব্যবস্থার জগতে চিঠিই সহজতম যোগাযোগের মাধ্যম। তাই চিঠির গুরুত্ব এত বেশি।

গল্প-কবিতা-নাটকের যেমন রস আছে, চিঠিরও তেমনি বিশেষ একটি রস আছে, এ রস অন্তরঙ্গতার। তাই চিঠি লেখায় সবচেয়ে বড়ো কথা, 'যাকে লিখছি তার সঙ্গে যেন মুখোমুখি কথা বলছি—এ কথাটা মনে রাখা।

সুন্দর মুখের মতো সুন্দর চিঠিরও জয় সর্বত্র। কিন্তু চিঠি লেখা অভ্যাস না করলে সে চিঠি মন জয় করবে কী করে? চিঠি লিখতে তো আমাদের অনেকেরই গায়ে জ্বর আসে।

এ. জি. গার্ডিনার তাঁর 'অন্ লেটার রাইটিং' নিবন্ধে দু-ভাইয়ের গল্প শুনিয়েছেন আমাদের। বিল্‌কে ট্রেনে তুলে দিতে স্টেশনে এসেছে স্যাম্।

—চিঠি দিস কিন্তু।

—ক্যাম্পে গিয়েই লিখব। কিন্তু এই চিঠি লেখার ব্যাপারটা কী ঝামেলার বল্ তো।

—সত্যি তাই।

—'আমি ভালো আছি, আশা করি তুমি ভালো আছ' লেখবার পরই কথা ফুরোয়, লেখবার আর কী আছে বল্?

—কিস্সু না, কিস্সু না। আমি তো সাদা কাগজটা নিয়ে মাথা চুলকোতে থাকি। একটা বর্ণও মাথায় আসে না, মনে হয় মাথা যেন ঢাকের মতো ফাঁপা।

ওরা দুভাই সৈনিক, অনেক বড়ো বড়ো যুদ্ধ করেছে, কিন্তু চিঠি লিখতে বসলেই ওদের কান্না পায়। এমন কান্না তো আমাদেরও অনেকেরই পায়। এ বিষয়ে গার্ডিনারের পরামর্শটা নেওয়া মন্দ না: চিঠি-লেখা ব্যাপারটা হালকা ভাবে নাও, তোমার নিজের ব্যাপার, পরিবেশ বা কোনো অভিজ্ঞতার কথা খুঁটিয়ে লিখে চলো, কোন্‌টা আগে লিখব, কোন্‌টা পরে লিখব তা ভাবার দরকার নেই, যখন যা মনে আসছে তা লিখে ফেলো। ব্যক্তিগত চিঠিতে কোনো কিছুই তুচ্ছ নয়, জুতোর সুকতালি খুলে পড়াটাও সেখানে গুরুত্বপূর্ণ। গার্ডিনার পত্রকুশলী কার্লাইলের উদাহরণ দিয়েছেন। স্কট্‌সব্রিগ থেকে কানাডায় ভাই অ্যালেক-কে লিখতে গিয়ে মায়ের কথা দিয়ে শুরু করলেন:

'আমাদের বৃদ্ধা মা, তিনি এই মুহূর্তে আমার পেছনে বসে আর-একটা টেবিলে তোমাকে ছোট্ট গল্প নিজের হাতে লিখতে চেষ্টা করছেন। গত একবছরে এই প্রথম

তিনি একাজ করছেন। আজ শনিবারের রাত। অন্ধকার হয়ে গেছে। শুষ্ক ও নীরস সন্ধ্যায় আমরা বাড়ির পুব দিকের কামরায় বসে। ঘরের আর-এক দিকে জেনি বাসন ধুচ্ছে। সিঁড়ির নিচে খামারের কাজ চলছে, শান্ত ভাবে। দৃশ্যটা নিশ্চয় কল্পনার চোখে দেখতে পাচ্ছ।'

আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না অ্যালেক সুদূরে বসে চিঠি পড়ছে আর মায়ের ছবি কল্পনা করে অশ্রুসজল হয়ে উঠছে।

কবি বা সাহিত্যিকের ব্যক্তিগত চিঠিপত্র তোমরা নিশ্চয় দেখেছ কোনো বই বা পত্রিকায়। এসব চিঠি ব্যক্তিগত প্রসঙ্গকে ছাপিয়ে একটা সর্বজনীন রূপ পায়। সে চিঠি পড়ে আমরা সাহিত্য-স্বাদ হয়তো পুরোপুরি পাই, কিন্তু মানুষটাকে তেমন করে পাই না। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ ছিন্ন করে যে-পত্রগুলো ছাপবার অনুমতি দিলেন রবীন্দ্রনাথ তাই হল ছিন্নপত্র। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ একেবারে যে নেই তা নয়, তবে সেটা গৌণ। মুখ্য হচ্ছে, তাঁর মনন, তাঁর দর্শন, তাঁর গভীর মর্ত্যমমতা।

মনীষীদের কিছু চিঠির নমুনা আমরা পরে দেব। আপাতত চিঠির শ্রেণীভেদ ও আঙ্গিক নিয়ে আলোচনা করা যাক। প্রাপক ও প্রয়োজন-ভেদে পত্রকে আমরা প্রধানত চারটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি—

(ক) পারিবারিক বা ব্যক্তিগত পত্র (Personal letters)

পরিবারের লোকেরা নিজেদের মধ্যে যে-সব পত্র বিনিময় করে সেগুলো পারিবারিক পত্র। বন্ধুতে বন্ধুতে যে পত্র-বিনিময় তা হল ব্যক্তিগত পত্র। পারিবারিক পত্রকেও ব্যক্তিগত পত্র বলা যেতে পারে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন, স্বামী-স্ত্রীর ক্ষেত্রে) তা একান্ত ব্যক্তিগত।

(খ) সামাজিক পত্র (Social letters)

এ পত্র প্রধানত বিভিন্ন উৎসব বা অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণলিপি।

(গ) ব্যবহারিক পত্র (Official বা Demi-official letters)

ছুটির আবেদন, কোনো বিষয়ে সংবাদপত্রের দৃষ্টি আকর্ষণ ইত্যাদি এই-জাতীয় পত্রের বিষয়।

(ঘ) বাণিজ্যিক পত্র (Commercial letters)

ব্যবসায়-বাণিজ্য-সংক্রান্ত আবেদন, অনুরোধ, অনুসন্ধান, অভিযোগ ইত্যাদি এই জাতীয় পত্রের বিষয়।

বিষয়বিভাগগুলো বাঁধাধরা নয়, যেমন চাকরির জন্যে আবেদনকে ব্যবহারিক পত্রেরও অন্তর্ভুক্ত করা চলে। ব্যবসায়-সংক্রান্ত চিঠিপত্রও কোনো কোনো ক্ষেত্রে একান্ত ব্যক্তিগত হতে পারে। তবে সাধারণভাবে উপরে-লেখা বিভাগগুলোই স্বীকৃত।

আঙ্গিক

আমাদের ব্যক্তিগত বা পারিবারিক পত্ররচনা আঙ্গিকে সংস্কৃতের প্রভাব স্পষ্ট।

১. গুরুজনকে চিঠি লেখবার সময় আমরা লিখি শ্রীচরণেষু বা শ্রীচরণকমলেষু।

২. কনিষ্ঠকে পত্র লেখবার সময় আমরা লিখি স্নেহাস্পদেষু বা কল্যাণীয়েষু (স্ত্রীলিঙ্গে কল্যাণীয়াসু)। এখন অবশ্য 'স্নেহের অমল', 'স্নেহের অতসী'—এরকমও লেখা হয়। এখানে ইংরেজির প্রভাব লক্ষণীয়; 'স্নেহের' এই কথাটি dear বা my beloved কথার অনুকৃতি বলেই মনে হয়।

৩. বন্ধুর ক্ষেত্রে লিখি সুহৃদ্বরেষু বা প্রীতিভাজনেষু; এখন ইংরেজীর অনুকরণে লিখি প্রিয় বীরেশ, প্রিয় মালতী ইত্যাদি।

বক্তব্যের শেষে প্রণাম, স্নেহ ইত্যাদি জানিয়ে 'ইতি' লেখার রীতিও সংস্কৃত পত্র-রীতি থেকেই এসেছে। সংস্কৃতে পাঠ ও বক্তব্য মিলিয়ে যে রীতি প্রচলিত ছিল তা হল:

"যথাবিহিত-সম্মান-পুরঃসর-নিবেদনমেতৎ" দিয়ে শুরু, তারপর বক্তব্যশেষে 'ইতি', তারপর ষষ্ঠীবিভক্তিযুক্ত লেখকের নাম 'অমুক-শর্মণঃ'।

অর্থাৎ এই বক্তব্যটি অমুক শর্মার।

'ইতি' কথাটি বক্তব্যসমাপ্তিসূচক।

এখন ষষ্ঠীবিভক্তির জায়গায় প্রথমাবিভক্ত্যন্ত লেখকের নামই লেখা হয়। এও ইংরেজির প্রভাবেই।

আগে কার্ড বা খামের উপর প্রাপকের ঠিকানা লিখতে সংস্কৃতরীতি অনুসৃত হত। নামের আগে বিশেষণ ও যথোচিত পাঠ যুক্ত হত। তার আগে থাকত ঠিকানা:

২নং বহুবাজার কলিকাতাস্থ পরমারাধ্য পিতৃদেব শ্রীপ্রিয়নাথ মজুমদার সকাশে পৌঁছে।

ইংরেজি পত্রবিধির প্রভাবে এখন ঠিকানা নিরাভরণ হয়েছে:

শ্রীপ্রিয়নাথ মজুমদার
২নং বহুবাজার স্ট্রীট

চিঠির বক্তব্যের উপরে ডান পাশে ঠিকানা লেখাটিও ইংরেজির প্রভাবে বদলে গিয়েছে।

আগে লেখা হত অমুক-স্থানতঃ চলিতেয়ং পত্রী, অমুকবাসরীয়া। এখন ঠিকানা আর তারিখ থাকে পৃথক্ ভাবে:

৪নং বকুলবাগান রোড
কলিকাতা-৭০০ ০২১
২-৫-৮৪

সম্পর্কভেদে বিভিন্ন পাঠ ও সমাপ্তিবচন

বড়োর কাছে ছোটো (আত্মীয়স্বজন)

পাঠ : শ্রীচরণেষু, শ্রীচরণকমলেষু, পূজনীয়েষু (পূজনীয়াসু)

সমাপ্তিবচন : প্রণত, স্নেহধন্য, সেবক, তোমার বা আপনার (তোমার অতুল, আপনার বাবুন)

বড়োর কাছে ছোটো (অনাত্মীয়)

পাঠ : পূজনীয়েষু (পূজনীয়াসু), শ্রদ্ধাস্পদেষু, মান্যবরেষু (—বরাসু), মাননীয়েষু (—নীয়াসু), শ্রীচরণেষু (সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতায়)

সমাপ্তিবচন : বিনীত

ছোটোর কাছে বড়ো (আত্মীয়স্বজন)

পাঠ : কল্যাণীয়েষু (—ণীয়াসু), কল্যাণবরেষু, কল্যাণীয়, (কল্যাণীয় অসিত) স্নেহাস্পদেষু, স্নেহের (স্নেহের খোকন)

প্রাণাধিকেষু (—কাসু), প্রাণাধিক (প্রাণাধিক খোকন, প্রাণাধিকা মা অনীতা)

[সাধারণত বাবা-মা ছেলেমেয়েদের এইভাবে লেখেন]

সমাপ্তিবচন : আশীর্বাদক (—র্বাদিকা), মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, শুভার্থী (—র্থিনী)

ছোটোর কাছে বড়ো (অনাত্মীয়)

পাঠ : কল্যাণবরেষু, কল্যাণীয়েষু (—য়াসু)

সমাপ্তিবচন : শুভার্থী

অপরিচিত বা স্বল্পপরিচিতদের মধ্যে

পাঠ : শ্রদ্ধাস্পদেষু, প্রীতিভাজনেষু (সমবয়সীদের মধ্যে), প্রীতিনমস্কারান্তে নিবেদন, সবিনয় নিবেদন

সমাপ্তিবচন : বিনীত, ভবদীয়

সামাজিক ও ব্যবহারিক পত্রে

নাম বা উপাধির (designation) পর সমীপেষু এবং তার পর

পাঠ : সবিনয় নিবেদন

সমাপ্তিবচন : বিনীত, ভবদীয়

বন্ধুর কাছে বন্ধু

পাঠ : সুহৃদ্‌বরেষু, বন্ধুবরেষু, প্রীতিভাজনেষু, অভিন্নহৃদয়েষু, ভাই (ভাই অমল, ভাই রবিনবাবু), প্রিয় (প্রিয় পীযূষ, পীযূষবাবু)

সমাপ্তিবচন : শুভার্থী, প্রীত্যর্থী, প্রীতিবদ্ধ, গুণমুগ্ধ, তোর (তোদের), তোমার (তোমাদের), আপনার (আপনাদের)

বড়োর কাছে ছোটোর চিঠিতে

মুসলিম পারিবারিক পত্রে

পাঠ : পাকজনাবেষু (যেমন, পাকজনাবেষু, আব্বাজান) ।

ঠিকানায় : আরজদস্ত বখেদমতে জনাব আফজল হোসেন সাহেব পাকজনাবেষু

সমাপ্তিবচন : খাকসার, খাদিম বা খিদমদগার (আবদুল রহিম) (শব্দগুলির অর্থ : খাকসার = বিনীত, খাদিম বা খিদমদগার = সেবক)

ছোটোর কাছে বড়োর চিঠিতে

পাঠ : অজিজলকদর দোয়া বহুৎ বহুৎ পর [বাপজান হবীব,] বা শুধু বাপজান বা অনুরূপ স্নেহ-সম্বোধন

সমাপ্তিবচন : খয়েরতালেব বা দোয়াবর, বা দোয়া গো (খয়েরতালেব ফজলে রবিব) (খয়েরতালেব = মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ; দোয়াবর, দোয়া গো = আশীর্বাদক)

সংস্কৃত প্রাচীন পত্রাদির মতো মুসলিম পত্রাদিতে ফার্সী ও আরবী ভাষার প্রভাবে নানারকম দীর্ঘ পাঠ প্রচলিত ছিল। এখন পাঠ ও সমাপ্তিবচন সর্বত্রই সহজ সরল।

অন্তরঙ্গ বন্ধুর কাছে চিঠি লিখতে পাঠ, সম্বোধন ও সমাপ্তিবচনে নানা বৈচিত্র্য আনা যায়, যা কখনও হয় কৌতুকময় কখনও বা মাধুর্যমণ্ডিত। প্রখ্যাত এক সাহিত্যিক বন্ধুদের চিঠি লিখতে ফার্সী কায়দায় পাঠ দিতেন বেরাদর বা বেরাদর-ই-মন (=ভাই আমার)। অথবা ফরাসী কায়দায় মনামি (monami = বন্ধু আমার)।

বন্ধু দীর্ঘদিন চিঠি লেখে নি তাই সকৌতুক অভিমানে একজন পাঠ দিলেন—'বন্ধুবিস্মরণশীলেষু'। চিঠি দেরিতে পেয়ে আর একজন বন্ধুকে অনুযোগের সুরে পাঠ দিলেন 'পত্রলিখন-কুণ্ঠিতেষু' আর একজন লিখলেন 'গোঁফ-খেজুরেষু'।

বোঝা যাচ্ছে অন্তরঙ্গদের কাছে চিঠি লিখতে উদ্ভাবিত বিচিত্র পাঠে অনেক বক্তব্য-সংকেত ধরে নেওয়া যায়।

সমাপ্তিবচনেও তেমনি সাহিত্যিকদের নানারকম বচনবিন্যাস চোখে পড়ে। প্রাচীন কায়দায় কেউ কেউ কোনো নাম না দিয়ে লেখেন কস্যচিৎ বন্ধুজনস্য বা কস্যচিৎ একান্ত-বিস্মৃতস্য অর্থাৎ চিঠিটা এমন একজনের যাকে তুমি বেমালুম ভুলে গেছ।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। শুধু এ বিষয়ে একটা কথা : এ রকমের পাঠ বা সমাপ্তিবচনে হাস্যকৌতুক বা কটাক্ষ, সবই থাকুক কিন্তু কোনোক্রমেই তা যেন বন্ধু-জনকে সত্যিকারের আঘাত না দেয়, বা কোথাও কোনো অশালীনতা প্রকাশ না পায়।

আলোচনার উপসংহারে **পত্রের অঙ্গগুলি** কী কী তা এইবারে একসঙ্গে লিখি :

১. পত্রলেখকের ঠিকানা ও পত্রলেখবার তারিখ (ডান দিকে উপরে লেখা)।

২. পাঠ ও সম্বোধন (মূল বক্তব্যের শুরুতে বাঁ দিকে)।

৩. বক্তব্য (পত্রের প্রধান অঙ্গ)।

৪. সমাপ্তি ও স্বাক্ষর (চিঠির শেষে ডান দিকে)।
৫. প্রাপকের নাম ও ঠিকানা (কার্ড বা খামের উপরে)।

পত্রের বিধিসম্মত ছক

পত্রলেখকের
ঠিকানা
তারিখ

পাঠ ও সম্বোধন

........................বক্তব্য........................
....
....

সমাপ্তি ও স্বাক্ষর

একটি সংস্কৃত পত্র (অপেক্ষাকৃত আধুনিক) তার আঙ্গিকের বাংলা রূপান্তর

স্বস্তি। পঞ্চবটীতো গোবিন্দশর্মা পুণ্যপত্তনে পুত্রম্ আয়ুষ্মন্তং বিশ্বনাথং সস্নেহং নির্ভরমালিঙ্গ্য কুশলং বার্তয়তি যথা। কার্যং চ অদ্যৈব ভবদর্থে অস্মন্মিত্রস্য পরশুরামস্য হস্তে অর্থো দত্তঃ। তস্য ব্যয়ঃ কথং কৃত ইতি যথাবসরং নিবেদনীয়মিতি।

শকে ১৮০৭ মার্গশীর্ষবতি ভৌমেঽহনি।

বঙ্গানুবাদ : স্বস্তি। পঞ্চবটী থেকে গোবিন্দশর্মা পুণ্যপত্তনস্থ আয়ুষ্মান্ পুত্র বিশ্বনাথকে সস্নেহে গভীরভাবে আলিঙ্গন করে কুশল জানাচ্ছে এবং কাজের কথাও (জানাচ্ছে)। আজই তোমার জন্যে আমাদের বন্ধু পরশুরামের হাতে অর্থ দিলাম। এই অর্থ কীভাবে ব্যয় করলে তা অবসরমতো জানিও। ইতি—

১৮০৭ শকাব্দের অগ্রহায়ণ মাসের মঙ্গলবারের ১৪ই।

লক্ষ্য কর : (ক) চিঠি লেখা হচ্ছে পঞ্চবটী থেকে।
(খ) লিখছেন গোবিন্দশর্মা।
(গ) চিঠি যাচ্ছে পুণ্যপত্তনে
(ঘ) প্রাপক বিশ্বনাথ

এগুলোকে এখনকার আঙ্গিকে রূপান্তর করলে দাঁড়াবে :

পঞ্চবটী
১৪ই অগ্রহায়ণ, মঙ্গলবার, ১৮০৭ শকাব্দ

স্নেহের বিশ্বনাথ

..................বক্তব্য..................
....
....

ইতি
তোমার বাবা
গোবিন্দ শর্মা

পত্ররচনার আদর্শ

১. ব্যক্তিগত পত্র হবে সহজ-সরল, মুখোমুখি কথা বলার মতো। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণীয়: "যারা ভালো চিঠি লেখে তারা মনের জানালার ধারে বসে লেখে—আলাপ করে যে—তার কোনো ভার নেই, বেগও নেই, স্রোত আছে।"

২. সামাজিক, ব্যবহারিক ও বাণিজ্যিক পত্রের ভাষা হবে একেবারেই কাজের ভাষা—পরিচ্ছন্ন, যথাযথ ও সংক্ষিপ্ত। সৌজন্য ও শিষ্টাচারের মর্যাদা এ ধরনের চিঠি অবশ্যই মেনে চলবে, তবে আতিশয্য একেবারেই অচল।

পত্র-সম্পর্কে কয়েকটি বিশিষ্ট উক্তি

Letters are those winged messengers that can fly from east to west on embassies of love,—Howell, J B. (1772-1822), American Senator.

স্রোতের জলের যে ধ্বনি সেটা তার চলারই ধ্বনি, উড়ে চলা মৌমাছির পাখার যেমন গুঞ্জন। আমরা যেটাকে বকুনি বলি সেটাও সেই মানসিক চলে যাওয়ারই শব্দ। চিঠি হচ্ছে লেখার অক্ষরে বকে যাওয়া। এই বকে যাওয়াটাই মনের জীবনের লীলা। —রবীন্দ্রনাথ (যাত্রী। জাভাযাত্রীর পত্র-২)

A letter shows the man it is written to as well as the man it is written by.—Chesterfield G. K. (1874-1936) Eng Humorist, essayist & artist.

Letters should be easy and natural, and convey to the persons to whom we send just what we should say if we were with them. —Chesterfield, G K.

।। পারিবারিক বা ব্যক্তিগত পত্র ।।

১। প্রথম সমুদ্র দেখার উচ্ছ্বাস জানিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি

৪ শম্ভুনাথ পণ্ডিত স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০২০
১-৭-৮৪

ভাই পুলক,

আজ সত্যি সমুদ্র-উচ্ছ্বাস বুকে নিয়ে তোকে চিঠি লিখছি। প্রথম সমুদ্র দেখার আনন্দ কোনো বর্ণনাতেই ধরা দেবে না। ঐ নবকুমারের মতোই শুধু বলতে হয়—'আহা, কী দেখিলাম, জন্মজন্মান্তরেও ভুলিব না।' বিরাট যতক্ষণ নিরাকার ততক্ষণ তাকে কল্পনাই করা যায় না। সমুদ্র-আধারে প্রকাশিত বিরাটকে প্রত্যক্ষ করে যেন বিশ্বশক্তিনিয়ন্তারই আভাস পাওয়া গেল।

যত দূর চোখ যায় শুধু নীল আর নীল, কিন্তু এ তো আকাশের মতো স্তব্ধ নীলিমা নয়, চঞ্চল, বিক্ষুব্ধ নীলিমা। কখনও মনে হল সমুদ্র যেন সন্ধানী—'কী যেন বৃথাই খুঁজিতেছে কূলে কূলে।' কখনও মনে হল আমাদের অতৃপ্ত আর অশান্ত মনেরই প্রতিচ্ছবি—'এক জ্বালা এক ব্যথা যেন।'

নিজেকে মনে হল তুচ্ছ। মানুষের সমস্ত গর্বকে চূর্ণ করে দেবার জন্যেই যেন সমুদ্ররূপ ধরেছে প্রকৃতি।

প্রথম যখন সমুদ্র দেখি তখন তা যেন সেই কলধৌতপ্রবাহবৎ, সূর্য ছিল আকাশে। তার পর দেখেছি চন্দ্রালোকে সমুদ্রমাধুরী। কিন্তু প্রথম সমুদ্র দেখার বিস্ময় সমুদ্রের মতোই অপরিমেয়—ঈদৃক্‌তয়া বা ইয়ত্তয়া বা।

ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি—

তোর
আনন্দকুমার

শ্রীপুলক আচার্য
২৫ ফার্ন রোড
কলিকাতা-৭০০ ০২৯

২। ঈপ্সিত বৃত্তি কী তা জানিয়ে বন্ধুর কাছে চিঠি

গড়িয়া, কলিকাতা-৮৪
২৩ ৬. ৮৪.

প্রিয় রঞ্জন,

জিজ্ঞেস করেছিস আমার ঈপ্সিত বৃত্তি কী। জবাব দিতে গিয়ে মনে হচ্ছে 'যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই, যাহা পাই তাহা চাই না'। হয়তো কবির কথাই ঠিক, তবু পূর্ণ হোক আর না হোক, ইচ্ছেটা তোকে জানাতে বাধা নেই।

কোনো একটা স্কুল বা কলেজে শিক্ষকতা করাই আমার ইচ্ছে। আমার মনে হয় এটাই হয়তো একমাত্র কাজ যাকে ঠিক বৃত্তি বলা যায় না। বৃত্তিকে ছাপিয়ে আনন্দ আর জ্ঞানের যে-পরিমণ্ডল গড়ে ওঠে শিক্ষকতার কাজে, আমি তা-ই চাই। প্রতি মুহূর্তই এখানে জীবনময়। ছাত্রদের উষ্ণ সান্নিধ্য, তাদের জিজ্ঞাসু চোখ, তাদের ভালবাসা—এর চেয়ে বড়ো পাথেয় কী, আমি তো ভেবে পাই না। শিক্ষকতা করতে গিয়ে প্রতি মুহূর্তেই মনে হবে আমি ছাত্র। প্রতিদিন নতুন কিছু জেনে নতুন হয়ে ছাত্রদের কাছে দাঁড়াতে হয়। আর এই তো জীবন—'স জীবতি মনো যস্য মননেন হি জীবতি'। শিক্ষকতা আমাকে সেই সুযোগ দেবে। 'এ জীবন ভেঙে গড়ে শ্যামল সরস করে ছাত্রধারা বয়ে চলে যায়।' শিক্ষককবির এ পঙ্‌ক্তিটি আমি ভুলব না। ছাত্রদের ভালোবাসার মধ্যেই আছে জীবনের শ্যামলিমা ও সরসতা।

রবীন্দ্রনাথের 'আশ্রমের রূপ ও বিকাশ' রচনাটির কথা তোর নিশ্চয় মনে আছে। ঐ রচনাটি আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে। সতীশচন্দ্র রায়, জগদানন্দ রায়, অজিতকুমার চক্রবর্তী, মোহিতচন্দ্র সেন প্রমুখ শিক্ষকদের যে-ছবি এঁকেছেন রবীন্দ্রনাথ তাতে এঁদের সাধকমূর্তিটি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। ঐ রকম সাধকশিক্ষক যদি হতে পারি জীবনটাকে ধন্য মনে করব।

বৃত্তিগত ব্যাপারে তোর ইচ্ছেটা এবারে জানতে চাই। ভালবাসা নিস। ইতি—

তোর
রজত

রঞ্জন মুখার্জি
বাবুপাড়া, গোবরডাঙা
২৪-পরগণা

৩। বন্ধুর আরোগ্যলাভে আনন্দ-প্রকাশ

৩১/১০ গল্‌ফ্‌ ক্লাব রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৩৩
২৮. ৭. ৮৪

ভাই অসিত,

এপেণ্ডিক্‌স্‌ অপারেশনের পর তুই এখন সম্পূর্ণ সুস্থ জেনে আমরা সবাই নিশ্চিন্ত হলাম। জয়দীপ, সুপ্রকাশ আর সুমন্তকে তোর আরোগ্যের সংবাদ ইতিমধ্যেই দিয়েছি। ওরা তো আনন্দে লাফিয়ে উঠল। আবার তোকে আমাদের মধ্যে পাব ভাবতে যে কী ভালোই লাগছে! আমাদের পুজোর ছুটির প্ল্যানটা কিন্তু এবারে ঠিক করে ফেলা চাই। তবে এখন কিছুদিন তোকে একটু সাবধানে চলাফেরা করতে হবে নিশ্চয়ই। অনিয়ম করবি না কিন্তু এতটুকু।

সবচেয়ে ভালো লাগছে তোর বাবা-মার দুশ্চিন্তা কেটেছে দেখে। কী উদ্বেগেই ওঁরা ছিলেন! গভীর রাতে তোর হঠাৎ অসুস্থতা, হাসপাতালে দৌড়োদৌড়ি—সে-সব ভাবলে এখনও কেমন নার্ভাস হয়ে পড়ি। যাই হোক, ওসব চিন্তা মন থেকে একেবারে বিদেয় করে দিচ্ছি, তোর সানন্দ সহাস্য মুখটা এখন এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছি।

একটু-আধটু বই পড়ছিস্‌ জানিয়েছিস। কী বই পড়ছিস্‌? আমার হাতে এখন সত্যজিৎ রায়ের 'বিষয় চলচ্চিত্র'। দু-একদিন বাদেই তোর সঙ্গে দেখা করছি। তখন নিয়ে যাব বইটা, সেই সঙ্গে নিয়ে যাব আর একটা জিনিস—। কী জিনিস এখন কিন্তু বলব না, দেখতেই পাবি, আর দেখে দারুণ খুশি হবি। না, বলেই ফেলি, নিয়ে যাব একটা অ্যালবাম, তার মধ্যে আছে—। এবারে সত্যিই বলব না, তখন দেখবি। ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি—

তোর
অপূর্ব

অসিত সেন
পোঃ বারুইপুর, ২৪-পরগণা

৪। আমার 'হবি' (বন্ধুকে লেখা)

প্রতাপপুর, পাঁশকুড়া
মেদিনীপুর
২. ৩. ৮৪

প্রিয় কাজল,

তুই হয়তো হাসবি আমার অদ্ভুত একটা 'হবি'র কথা শুনে। আমার 'হবি' হচ্ছে বৃদ্ধদের সান্নিধ্যে আসা এবং তাদের কাছ থেকে দু-চার কথা শোনা।

গুণিজনদের মধ্যে যাঁদের বয়স হয়েছে তাঁদের সঙ্গেও যেমন আমি সাক্ষাতের সুযোগ খুঁজি, তেমনি পথের বুড়ো রিক্সাওয়ালা দেখলে বা বুড়ো ফলওয়ালা দেখলে তাদের সঙ্গেও দু-কথা বলার চেষ্টা করি। তাদের ব্যক্তিগত জীবনের নানা অভিজ্ঞতা এবং এখনকার দিন-সম্বন্ধে তাঁরা কত কথাই বলেন! শুনতে শুনতে চোখে জল আসে অনেক সময়। বাড়িতে এসে সেগুলো লিখে ফেলি। তোকে একদিন দেখাব।

এপর্যন্ত সমাজের বিভিন্ন স্তরের প্রায় পঞ্চাশ জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছি। আমাদের অনেক ভ্রান্তি নজরে আসে এঁদের কথা শোনবার পর। সত্যি বলতে কি, চলার পথের আলোই যেন এঁরা তুলে দেন আমাদের চোখে। একজন বৃদ্ধ মৌলানা বললেন, 'বাবা, একটা গল্প বলি শোনো। এক বৃদ্ধ চুলে কলপ দিত বলে এক তরুণ তাকে ঠাট্টা করেছিল। তিনি বললেন—কলপ কেন দিই জানো? পাকা চুল দেখে আমাকে জ্ঞানবৃদ্ধ ভেবে লোকে যদি পরামর্শ চায়। অথচ আমি দুনিয়ার কিছুই জানি না, একেবারে মুখ্যু মানুষ।' মৌলানা গল্প শেষ করে বললেন, 'আমারও ঐ কথা বাবা। বলবার কিছুই নেই।' বুঝলাম বৃদ্ধটি হচ্ছেন আসল জ্ঞানীর দলে। ভালবাসা জানাচ্ছি। ইতি।

কাজলকুমার দে
৪ ডাক্তার লেন
কলিকাতা-৭০০ ০১৪

তোর
সঞ্জীব

৫। প্রথম মোটর-ড্রাইভিং-এর অভিজ্ঞতা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি

২৩ সূর্য সেন স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯
১. ৭. ৮৪

ভাই জয়দীপ,

তুই শুনে খুশি হবি, আমি ড্রাইভিং লাইসেন্স পেয়ে গেছি। আগের কয়েকদিন স্বপ্নের মধ্যেও সেই ক্লাচ্, গীয়ার, ব্রেক আর ঐ অ্যাক্সিলেটার। এই সুইচ অন করলাম, ক্লাচ চেপে ফার্স্ট গীয়ার দিলাম, ডান পায়ে অ্যাক্সিলেটর দাবিয়ে রাখছি আর বাঁ পা-টা ক্লাচ থেকে ওঠাচ্ছি...... !!

না, আর স্বপ্ন নয়। একেবারে চেতলার মোটর ভিহিকল্‌স-এ গিয়ে হাতে-কলমে পরীক্ষা দেওয়া। ইন্সপেক্টার পাশে, মনের মধ্যে অজানা ভয়। গাড়ি স্টার্ট করলাম। কলকাতার রাজপথে আমার প্রথম ড্রাইভ। নির্দিষ্ট জায়গায় থামাতে হল। এরপর সিগনালিং সম্বন্ধেও নানা পরীক্ষা। এ যেন অগ্নিপরীক্ষা। পাশ করে গেছি ভাই, বেশ ভালোভাবেই।

এক বুড়ো ড্রাইভার বলেছিলেন, 'বাবু, গাড়ি পাঁও সে চলতী, হাথ সে নহী।' এখন বুঝছি অভিজ্ঞ ড্রাইভারের কথা কত সত্যি।

আয় না চলে একদিন। আমার পাশে বসে শহর দেখবি। আর সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে অবাক চোখে আমার দিকেও তাকাবি। কী হিংসে হচ্ছে? তা হোক। ভালোবাসার সঙ্গে একটু হিংসে না মিশলে ব্যাপারটা কেমন আলুনি ঠেকে তাই না? চিঠি দিস। ইতি—

জয়দীপ মুখার্জি
প্রতাপবাগান
বাঁকুড়া

তোর
দেবাশিস্

৬। আসন্ন পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে তোমার কোনো বন্ধুকে চিঠি লেখ।

১ শকুন্তলা পার্ক, বেহালা
১৫. ৩. ৮৪

ভাই অনিরুদ্ধ,

পরীক্ষা তো এসে গেল। আমার তো খুব ভয় করছে। যা পড়া উচিত তা তো পড়েছি কিন্তু মনে হচ্ছে সব ভুলে যাচ্ছি। বাবা বলেন, ও কিছু নয়, অমন সবারই হয় পরীক্ষার আগে।

বিজ্ঞানের বিষয়ে গুরুত্ব দিতে গিয়ে ইংরেজি-বাংলার প্রস্তুতিটা তেমন মনের মতো হয় নি। এখন মূল রচনাগুলো আর একবার পড়ে নিচ্ছি। পাঠ্যগত ব্যাকরণে তো অনেক নম্বর। ও বিষয়ে আমার দুর্বলতা আছে তা তো জানিসই। তবু চেষ্টা করছি সে দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে। তবে বাংলায় শব্দের শ্রেণীবিভাগটা কিছুতেই ঠিক হচ্ছে না। তোকে কাছে পেলে একসঙ্গে বেশ পরামর্শ করে পড়া যেত। সব বিষয়েই টেস্ট পেপারের প্রশ্নগুলো মোটামুটি উত্তর করেছি, ও-গুলোই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখছি। শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না, কেমন একটা জ্বর-জ্বর ভাব। বাবা বলেন, ও কিছু না, ওটা examination fever, ওর কোনো ওষুধ নেই!

তোর preparation আশা করি ভালো হয়েছে। বিস্তারিত জানাস। তোদের স্কুলে suggestions কিছু দিয়ে থাকলে আমাকে অবশ্যই পাঠাস। ও ভালো কথা, 'পরিবেশ দূষণ' সম্বন্ধে তুই যদি নতুন তথ্য কিছু পেয়ে থাকিস অবশ্যই পাঠাস। এ বিষয়টা এখন সত্যিই গুরুত্বপূর্ণ।

আজ অন্য কোনো কথাই হল না। ভালোবাসা জানাচ্ছি। ইতি—

অনিরুদ্ধ বিশ্বাস
মহানন্দা এম্বার্কমেন্ট ডিভিশন,
গ্রীনপার্ক, মালদা

সৌম্যেন

৭। তোমার বন্ধুর কোনো সাফল্যের জন্যে তাকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লেখ।

৪/এ/১২ বীরেন রায় রোড
কলকাতা-৭০০ ০০৮
১. ১. ৮৪

প্রিয়বরেষু,

ভাই অরবিন্দ,

শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হলাম, তুই টেস্ট পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিস। তোর এই কৃতিত্বের জন্যে তোকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অবশ্য এ কৃতিত্ব তোর অধ্যবসায় ও একাগ্রতারই ফল। ভাবতে ভালো লাগে তুই খেলাধুলা বজায়

রেখেও পড়ায় কখনও অমনোযোগী হোস নি। তোর পড়ার পদ্ধতির মধ্যেও আমি একটা শৃঙ্খলার ভাব লক্ষ্য করেছিলাম। আমরা কেমন যেন এলোমেলোভাবে পড়ি। কোন্‌টা পড়েছি, কোন্‌টা পড়ব কিছুই ঠিক থাকে না। তোর এ বিষয়ে কোনো শৈথিল্য ছিল না। একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেই তুই পড়াশোনা করেছিস, তার ফলও পেয়েছিস হাতে হাতে।

ফাইন্যাল পরীক্ষায় তুই টেস্ট পরীক্ষার চেয়েও অনেক ভালো রেজাল্ট করতে পারবি এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তোকে আবার অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি। ইতি—

অরবিন্দ মিত্র — তোর
প্যারাডাইস চৌমোহনী — অনন্ত
হসপিটাল রোড, আগরতলা

৮। তোমার বন্ধুর পিতৃবিয়োগে সান্ত্বনা জানিয়ে তাকে চিঠি দাও।

১১।২৩ ঝিল রোড
কলকাতা-৭০০ ০৩১
২. ৭. ৮৪

ভাই প্রদীপ্ত,

তোর চিঠিতে তোর পিতৃবিয়োগের সংবাদ পেয়ে স্তম্ভিত হলাম। ওঁর স্বাস্থ্যও তো তেমন খারাপ ছিল না, বয়েসও বেশি হয় নি। হঠাৎ যে কেন এমন হল ভাবতেই পারছি না। তোদের মনের অবস্থা কেমন মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি। আমি তোদের গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। ভগবান্ এ দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা দিন তোকে।

তোর বাবাকে আমি মাত্র একবারই দেখেছি। মনে হয়েছে খুব খোলা মনের দরদী মানুষ। আমাকে অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই আপন করে নিয়েছিলেন। আমার মনে হচ্ছে আমি ব্যক্তিগতভাবে একজন প্রিয়জনকে হারালাম।

তোর ওপর এখন অনেক দায়িত্ব এসে গেল। বিধির বিধান কিছু বোঝবার উপায় নেই রে। অনেক কিছুই আমাদের মাথা পেতে নিতে হয়। আমি শিগ্‌গিরই তোর কাছে যেতে চেষ্টা করছি। ভালোবাসা জানাচ্ছি। ইতি—

শ্রীপ্রদীপ্ত রায়
কোঃ নং বি ৩২, আই আই টি — তোর
হিজলী, খড়্গপুর — প্রিয় তনু

৯। কোনো দুর্ঘটনার বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুর কাছে একটি চিঠি দাও।

৪৪এ গর্চা রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৯
২. ৬. ৮৪

ভাই তপন,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব ভালো লাগল। মনটা খুব খারাপ হয়ে ছিল। এখনও মনে করলে গা শিউরে ওঠে। চোখের ওপর একটা নিদারুণ দুর্ঘটনা ঘটে গেল। ঘুড়ি ধরবার সময় ওদের কিছু খেয়াল থাকে না। একটা লগি নিয়ে দৌড়োচ্ছিল একটা ছেলে, রাস্তা পার হবার সময় যে এদিকে ওদিকে দেখতে হবে সে হুঁশ ওর নেই। 'ভো কাট্টা' 'ভো কাট্টা' করতে করতে ছুটে চলেছে। একটা গাড়ি আসছিল ফুলস্পীডে। লোকেরা চিৎকার করে উঠল—গাড়ি! গাড়ি! কিন্তু কে কার কথা শোনে। গাড়িটা ব্রেক কষেছিল সজোরে। কিন্তু তার আগেই ধাক্কা লেগে ছেলেটা মুখ থুবড়ে পড়ল রাস্তায়। তারপর—আর বলতে পারছি না। তার জীবন-সুতোও ঘুড়ির সুতোর মতোই ছিন্ন হয়ে গেল মুহূর্তে।

দুর্ঘটনার স্মৃতিটা মন থেকে কিছুতেই যাচ্ছে না রে। খবর পেলাম ছেলেটি ছিল বিধবার সর্বস্বধন। আজ এখানেই থামছি। ভালোবাসা নিস। —ইতি

তোর
মানিক

তপন ঘোষ
প্রযত্নে শ্রীবিমান ঘোষ
নন্দকুমার পল্লী
নৈহাটি, ২৪-পরগণা

১০। কোনো পার্বত্য শহরে ভ্রমণের বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখ।

১৯৫/১, আর. বি. অ্যাভিন্যু
কলিকাতা-৭০০ ০১৯
৭. ৬. ৮৪

ভাই টুকু,

তুই তো জানিস, পাহাড় আমাকে টানে। তবে এবার আর দার্জিলিং যাই নি, গিয়েছিলাম মুসৌরী। হরিদ্বারে সপ্তাহখানেক থেকে ওখান থেকে দেরাদুন হয়ে মুসৌরী গেলাম বাসে। এবারে আমার সঙ্গী আমার রাঙা কাকু। ভ্রমণের নামে ওঁর মনের মধ্যে বাঁশি বাজে। সুন্দর সঙ্গী। সবসময় খুশি, সবসময় প্রস্তুত। সত্যি, মনের মতো সঙ্গী না হলে ভ্রমণের আনন্দটা টেরই পাওয়া যায় না।

আশ্চর্য শহর মুসৌরী। মুসৌরীকে বলা হয় 'পাহাড়িয়া রানী'। কথাটা মানতে ইচ্ছে করে। যে-দিকে তাকাও শুধু ছবি আর আর ছবি—নয়নলোভন সব

দৃশ্য। আর চোখে পড়বে গায়ে গায়ে লাগানো হোটেলের সারি—নানান্ গড়ন, নানান ধরন। আমরা উঠেছিলাম এভারেস্ট হোটেলে। রিকসাগুলো অদ্ভুত। দু-দিকে লোক—দুজন টানে, দুজন পিছন থেকে ঠেলে দেয়। রিকসায় চড়েই বেড়িয়েছি আমরা। রিক্সা-চালকেরা বেশ হাসিখুশি—ওরাই কোন্‌টা কী দেখিয়ে দেয়, গাইডের কাজ করে, চলতে চলতে থামে—দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাহাড়-চূড়ায় যেখানে পাহাড়ের একটা অংশ ঠিক উটের মতো। ঐ যে বদ্রীনাথ দেখা যাচ্ছে বরফে ঢাকা। আর ঐ যে লালটিব্বা। অনেকটা পথ।

ক্ষিদে পেত খুব—সব সময় খাই খাই। রাঙা কাকু তো এ ব্যাপারে খুবই অগ্রণী। উলের-তৈরি জিনিস বেশ সস্তাই মনে হল। মায়ের জন্যে একটা স্কার্ফ কিনেছি। দোকানগুলো সুন্দর করে সাজানো—সবই যেন ছবি। ঠাণ্ডা বেশ। আমাদের তো কষ্টই হল। দিন তিনেক ছিলাম। তারপর আবার হরিদ্বার হয়ে কলকাতা।

মুসৌরীর স্বপ্ন এখনও দেখি। ভালোবাসা নিস। ইতি—

তোর
অমিত

টুকু
প্রযত্নে শ্রীসুধীরচন্দ্র মাইতি
নয়াবস্তী, জলপাইগুড়ি

১১। পরীক্ষার পর মাস দুই কীভাবে কাটাবে তার বিবরণ দিয়ে কোনো বন্ধুকে একটি চিঠি দাও।

বাহারগ্রাম
গ্রাম প্রতাপপুর, মেদিনীপুর
১. ৫. ৮৪

ভাই সুরঞ্জন,

পরীক্ষা তো শেষ হল। রেজাণ্ট বেরোতে তো অনেক দেরি—প্রায় আড়াই মাস ধরা যেতে পারে। এই সময়টা কী করে কাটাব তাই ভাবছি। একটু বেড়িয়ে আসব প্রথমে, খুব দূরে নয়, পুরুলিয়া যাব মামার কাছে। তারপর কলকাতায় ফিরে ভাবছি টাইপরাইটিং শিখব। একটা বিদেশীভাষা শেখার ইচ্ছেও আছে, বিশেষ করে জার্মান। দেখি হয়ে ওঠে কিনা। তুই তো জানিস, আমি ফিজিক্স-এ অনার্স নিয়ে পড়তে চাই। এই সময়টায় যদি এ-বিষয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতে পারি তার চেষ্টা করব—এতে ক্লাস ফলো করতেও সুবিধে হবে, তাই না?

ভাবছিস, ভালো ছেলে হয়ে গিয়েছি—শুধু পড়া-শোনার চিন্তা। না, তা মোটেই না। সিনেমা আর নাটক দেখাও সেই সঙ্গে চলবে বৈ কি। আর তারই সঙ্গে চলবে চুটিয়ে আড্ডা। আমাদের আড্ডাস্থানটি তো তোর জানাই আছে—অমিতদের বাড়ির বাইরের বাগানটা। চমৎকার জায়গাটা। আর অমিতের মায়ের হাতের নানারকম মুখরোচক খাবার তো সেই সঙ্গে আছেই।

তুই কীভাবে কাটাবি সময়টা জানাস। ওঃ ভুলে গিয়েছি বলতে, তোর

কাছে একসময় নিশ্চয় যাব। হৈ হৈ করে কাটাব কদিন। কী, খুশি তো? ভালবাসা নিস। ইতি—

স্বরঞ্জন নন্দী
২/১ ডাফ লেন, কলি-৬

তোরই একান্ত
জয়দীপ

১২। কোনো ত্রাণ-কার্যে তোমার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে কোনো বন্ধুকে চিঠি দাও।

৫০এ কে. এম. নস্কর রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৪০
৭. ৭. ৮৪

সুপ্রিয় অরুণ,

বন্যার আগে তোর চিঠি পেয়েছিলাম। উত্তর দিতে পারি নি বলে কিছু মনে করিস না।

এই বন্যায় নানা অভিজ্ঞতা হল। আজ তোকে তার কথা বলব। আমাদের পাড়ার 'গোল্ডেন ক্লাব'-এর কথা তোকে আগেই বলেছিলাম। পুজো-পার্বণ ছাড়াও আমরা চেষ্টা করি জনহিতকর নানা কাজে অংশ নিতে। এবার ঠিক হল বন্যার্তদের জন্যে কিছু করা যায় কিনা। সিদ্ধান্ত হল, বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-ডাল, কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করতে হবে। আশাতীত সাড়া পাওয়া গেল। আমাদের ভিক্ষাপাত্র উপচে পড়ল। এবার আমাদের লক্ষ্য, সংগৃহীত সামগ্রী নিয়ে গ্রামের বন্যার্তদের কাছে যাওয়া। বর্ধমান লাইনে পালসিট স্টেশনে নেমে গ্রামের কাঁচা সড়ক ধরে একটু এগোতেই দেখি সমুদ্র। আমাদের যেতে হবে সোনাইচণ্ডী গ্রামে। সেখানকার মানুষ এখনো জলবন্দী। কলাগাছের কয়েকটি ভেলায় শুরু হল অভিযান। যত দূরে চোখ যায় কূল-কিনারা নেই। জলে ভাসছে মৃত পশু—এমন কি মানুষও। ওঃ, সে কী দৃশ্য! হঠাৎ দেখা গেল জলের ওপরে একটা খড়ের দোচালা। বাখারি আঁকড়ে ঝুলছে একজন বিপন্ন মানুষ। অনেক কষ্টে তাকে ভেলায় তোলা গেল। ভেলায় বসে লোকটা তিনদিন পর উপবাস ভঙ্গ করল। তারপর পৌঁছলাম সোনাইচণ্ডী গ্রামের স্কুলবাড়িতে। সেখানে কয়েক শ' বিপন্ন মানুষ। সঙ্গে কিছু গরু, ছাগল। আমাদের দেখে তাদের কী উল্লাস! খাবার আর জামা-কাপড়, আর ওষুধ পেয়ে তাদের যে কী আনন্দ তা বোঝানো যায় না। কিন্তু মনে হল, এদের প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের সাহায্য অতি সামান্য। একজন বৃদ্ধ কাঁপা গলায় বলেছিল: ভগবান্ তোমাদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু এই বৃদ্ধটি আর বাঁচল না। চোখের সামনে তাকে মরতে দেখলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, তার মৃত মুখে এক চিল্‌তে হাসি। এর পর ফিরে এলাম। সে আর এক ইতিহাস। দেখা হলে মুখে বলব সব। ভালোবাসা নিস। ইতি—

রেলওয়ে কোঃ ৮১
পাসপুতলা
আসানসোল, বর্ধমান

তোর
সুদীপ

দৃশ্য। আর চোখে পড়বে গায়ে গায়ে লাগানো হোটেলের সারি—নানান্ গড়ন, নানান ধরন। আমরা উঠেছিলাম এভারেস্ট হোটেলে। রিকসাগুলো অদ্ভুত। দু-দিকে লোক—দুজন টানে, দুজন পিছন থেকে ঠেলে দেয়। রিকসায় চড়েই বেড়িয়েছি আমরা। রিক্সা-চালকেরা বেশ হাসিখুশি—ওরাই কোন্‌টা কী দেখিয়ে দেয়, গাইডের কাজ করে, চলতে চলতে থামে—দৃষ্টি আকর্ষণ করে পাহাড়-চূড়ায় যেখানে পাহাড়ের একটা অংশ ঠিক উটের মতো। ঐ যে বদ্রীনাথ দেখা যাচ্ছে বরফে ঢাকা। আর ঐ যে লালটিব্বা। অনেকটা পথ।

ক্ষিদে পেত খুব—সব সময় খাই খাই। রাঙা কাকু তো এ ব্যাপারে খুবই অগ্রণী। উলের-তৈরি জিনিস বেশ সস্তাই মনে হল। মায়ের জন্যে একটা স্কার্ফ কিনেছি। দোকানগুলো সুন্দর করে সাজানো—সবই যেন ছবি। ঠাণ্ডা বেশ। আমাদের তো কষ্টই হল। দিন তিনেক ছিলাম। তারপর আবার হরিদ্বার হয়ে কলকাতা।

মুসৌরীর স্বপ্ন এখনও দেখি। ভালোবাসা নিস। ইতি—

টুকু
প্রযত্নে শ্রীসুধীরচন্দ্র মাইতি
নয়াবস্তী, জলপাইগুড়ি

তোর
অমিত

১১। পরীক্ষার পর মাস দুই কীভাবে কাটাবে তার বিবরণ দিয়ে কোনো বন্ধুকে একটি চিঠি দাও।

বাহারগ্রাম
গ্রাম প্রতাপপুর, মেদিনীপুর
১. ৫. ৮৪

ভাই সুরঞ্জন,

পরীক্ষা তো শেষ হল। রেজাল্ট বেরোতে তো অনেক দেরি—প্রায় আড়াই মাস ধরা যেতে পারে। এই সময়টা কী করে কাটাব তাই ভাবছি। একটু বেড়িয়ে আসব প্রথমে, খুব দূরে নয়, পুরুলিয়া যাব মামার কাছে। তারপর কলকাতায় ফিরে ভাবছি টাইপরাইটিং শিখব। একটা বিদেশীভাষা শেখার ইচ্ছেও আছে, বিশেষ করে জার্মান। দেখি হয়ে ওঠে কিনা। তুই তো জানিস, আমি ফিজিক্স-এ অনার্স নিয়ে পড়তে চাই। এই সময়টায় যদি এ-বিষয়ে কিছুটা এগিয়ে যেতে পারি তার চেষ্টা করব—এতে ক্লাস ফলো করতেও সুবিধে হবে, তাই না?

ভাবছিস, ভালো ছেলে হয়ে গিয়েছি—শুধু পড়া-শোনার চিন্তা। না, তা মোটেই না। সিনেমা আর নাটক দেখাও সেই সঙ্গে চলবে বৈ কি। আর তারই সঙ্গে চলবে চুটিয়ে আড্ডা। আমাদের আড্ডাস্থানটি তো তোর জানাই আছে—অমিতদের বাড়ির বাইরের বাগানটা। চমৎকার জায়গাটা। আর অমিতের মায়ের হাতের নানারকম মুখরোচক খাবার তো সেই সঙ্গে আছেই।

তুই কীভাবে কাটাবি সময়টা জানাস। ওঃ ভুলে গিয়েছি বলতে, তোর

কাছে একসময় নিশ্চয় যাব। হৈ হৈ করে কাটাব কদিন। কী, খুশি তো? ভালবাসা নিস। ইতি—

স্বরঞ্জন নন্দী
২/১ ডাফ লেন, কলি-৬

তোরই একান্ত
জয়দীপ

১২। কোনো ত্রাণ-কার্যে তোমার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে কোনো বন্ধুকে চিঠি দাও।

৫০এ কে. এম. নস্কর রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৪০
৭. ৭. ৮৪

সুপ্রিয় অরুণ,

বন্যার আগে তোর চিঠি পেয়েছিলাম। উত্তর দিতে পারি নি বলে কিছু মনে করিস না।

এই বন্যায় নানা অভিজ্ঞতা হল। আজ তোকে তার কথা বলব। আমাদের পাড়ার 'গোল্ডেন ক্লাব'-এর কথা তোকে আগেই বলেছিলাম। পুজো-পার্বণ ছাড়াও আমরা চেষ্টা করি জনহিতকর নানা কাজে অংশ নিতে। এবার ঠিক হল বন্যার্তদের জন্যে কিছু করা যায় কিনা। সিদ্ধান্ত হল, বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-ডাল, কাপড়-চোপড় সংগ্রহ করতে হবে। আশাতীত সাড়া পাওয়া গেল। আমাদের ভিক্ষাপাত্র উপচে পড়ল। এবার আমাদের লক্ষ্য, সংগৃহীত সামগ্রী নিয়ে গ্রামের বন্যার্তদের কাছে যাওয়া। বর্ধমান লাইনে পালসিট স্টেশনে নেমে গ্রামের কাঁচা সড়ক ধরে একটু এগোতেই দেখি সমুদ্র। আমাদের যেতে হবে সোনাইচণ্ডী গ্রামে। সেখানকার মানুষ এখনো জলবন্দী। কলাগাছের কয়েকটি ভেলায় শুরু হল অভিযান। যত দূরে চোখ যায় কূল-কিনারা নেই। জলে ভাসছে মৃত পশু—এমন কি মানুষও। ওঃ, সে কী দৃশ্য! হঠাৎ দেখা গেল জলের ওপরে একটা খড়ের দোচালা। বাখারি আঁকড়ে ঝুলছে একজন বিপন্ন মানুষ। অনেক কষ্টে তাকে ভেলায় তোলা গেল। ভেলায় বসে লোকটা তিনদিন পর উপবাস ভঙ্গ করল। তারপর পৌঁছলাম সোনাইচণ্ডী গ্রামের স্কুলবাড়িতে। সেখানে কয়েক শ' বিপন্ন মানুষ। সঙ্গে কিছু গরু, ছাগল। আমাদের দেখে তাদের কী উল্লাস! খাবার আর জামা-কাপড়, আর ওষুধ পেয়ে তাদের যে কী আনন্দ তা বোঝানো যায় না। কিন্তু মনে হল, এদের প্রয়োজনের তুলনায় আমাদের সাহায্য অতি সামান্য। একজন বৃদ্ধ কাঁপা গলায় বলেছিল: ভগবান্ তোমাদের পাঠিয়েছেন। কিন্তু এই বৃদ্ধটি আর বাঁচল না। চোখের সামনে তাকে মরতে দেখলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য, তার মৃত মুখে এক চিল্‌তে হাসি। এর পর ফিরে এলাম। সে আর এক ইতিহাস। দেখা হলে মুখে বলব সব। ভালোবাসা নিস। ইতি—

রেলওয়ে কো: ৮১
পাসপুতলা
আসানসোল, বর্ধমান

তোর
সুদীপ

১৩। সাম্প্রতিককালের বন্যায় মানবিক বেদনার কথা জানিয়ে বন্ধুকে চিঠি। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

আমলকীতলা,
রাণাঘাট, নদীয়া
২৭-এ জুন, ১৯৮৪

ভাই পার্থ,

রাক্ষসী বন্যা সরে গেছে। যে-জলের নাম জীবন তার সর্বধ্বংসী চেহারা দেখলাম। এমন অভিজ্ঞতা যেন আর কখনও না ঘটে। এমনিতেই বর্ষায় আমাদের চূর্ণী কূলে কূলে ভরা, তারপর শুরু হল অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। বুড়ো-শিবতলা ডুবল, ভাঙনের ধারে যে বৈরাগীর আখড়া তা-ও জল গ্রাস করল। তারপর হঠাৎ এক রাতে দেখি জল আমাদের উঠোনে। হাজার হাজার মানুষ আশ্রয় হারাল, ঘরেপোষা জীবজন্তু কোথায় ভেসে গেল কে জানে! খাদ্য, পানীয় সবই অনিশ্চিত। মৃত শিশু ভেসে আসতে থাকল মায়ের বুক খালি করে।

ভেবে দেখ তো—এই দৃশ্য সারা দেশ জুড়ে। রিলিফের কাজে আমাদের ছেলেরা যেভাবে জীবন বিপন্ন করে এগিয়ে গেছে, তাতে সত্যিই মুগ্ধ হয়েছি, শ্রদ্ধাবনত হয়েছি। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় তা-ই বা কতটুকু! অসহায়ের মতো কেবল ধ্বংসের খবর পেয়েছি। আর ত্রাণ-তহবিলে যথাসাধ্য জমা দিয়েছি,—কিন্তু তাতে কি আমাদের সমস্ত দায়িত্ব-পালনের সান্ত্বনা বা তৃপ্তি ছিল? কখনই না। শুধু ভাবছি, যে-প্রকৃতি আলো দেয়, ফুল ফোটায়, মধুময় বাতাস দিয়ে আমাদের ক্লান্তি দূর করে, তার এমন নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার শক্তি আমরা কবে পাব?

শ্রীপার্থ মুখোপাধ্যায় শুভেচ্ছান্তে,
৪/২ ফার্ন রোড, উৎপল
কলিকাতা-৭০০ ০১৯

১৪। কোনো একটি উপন্যাস পড়ে ভালো লেগেছে,—সে বিষয়ে বন্ধুকে চিঠি। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

১১১ কে. এন. সেন রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৪২
১২. ৭. ৮৪

প্রিয় পলাশ,

জানি, আজকের চিঠিটা পেয়েই তুমি চমকে উঠবে।—'কী ব্যাপার, পর পর দু'দিন চিঠি কেন!' —এই কথাই ভাবছ তো? না, কোনো দুঃসংবাদ নয়। আজই 'আরণ্যক' পড়া শেষ করলাম। মনটা এমন কানা ছাপিয়ে উদ্বেল হয়ে উঠেছে যে, খানিকটা হাল্কা না করে দিয়ে পারছি না! বইটা আক্ষরিক অর্থেই অতুলনীয়। প্রকৃতি-যে কোনো উপন্যাসে এমন-এক চরিত্র হতে পারে, পারিপার্শ্বিকের প্রতি

এমন বিচিত্রভাবে ক্রিয়াশীল হতে পারে,—এ আমার কল্পনাতীত ছিল। অরণ্যের জমিতে যেমন করে ঘন পাতার রাশিতে বাধাপ্রাপ্ত সূর্যালোক আলোছায়ার জাফরি কেটে দেয়,—এখানে চরিত্রগুলো ঠিক তেমনিভাবে আরণ্যক পরিবেশে দুঃখ-সুখের আলপনা এঁকেছে। আর সত্যচরণ যেন পরিণত-মন অপু। সে 'নববিস্ময়ের' আশ্চর্য দৃষ্টিতে দেখছে এ চল্‌তি ছবি।

তুমি কি বইটা পড়েছ ? না পড়ে থাকলে অবশ্যই পড়ে নিও। তখন এ-বিষয়ে আরও কথা বলা যাবে। পত্রপাঠ কে কেমন আছ সে খবর জানিও। গুরুজনদের প্রণাম জানিও, আর তুমি আমার শুভেচ্ছা জেনো।

ইতি—
সুমিত্র

শ্রীপলাশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৬/৩, ফ্যামিলি কোয়ার্টার্স,
পোঃ বাটানগর,
জেলা ২৪-পরগণা।

১৫। তুমি পছন্দ কর না এমন কিছু ঃ বন্ধুকে

৪১২/ডি/৪, নেতাজী সুভাষ রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৪৭
২. ৭. ৮৪

ভাই তাপস,

সত্যি বলতে কি, রতনকে আমি সহ্যই করতে পারছি না। বক্‌বক্‌ করা লোক আমি দু চোখে দেখতে পারি না। কথা শুরু হল তো আর শেষ নেই, এ কী রে বাবা! অন্যের তো কাজকর্ম থাকতে পারে, একই কথা ইনিয়ে-বিনিয়ে বলায় অন্যের বিরক্তি হতে পারে এসব কথা এরা ভাবেই না। একসঙ্গে তিন-চার জন মিললে যদি একজনই কথা বলে যায়, অন্যকে সুযোগ না দেয়, তা হলে তার চেয়ে জলো আড্ডা আর কী হতে পারে বল্‌ ? এ বলবে ও বলবে এইভাবেই তো মজাটা জমে ওঠে আড্ডায়। কিন্তু একজন সবজান্তার ভূমিকা নিয়ে যদি তারই বক্তব্য অম্লান বদনে বলেই চলে তা সহ্য করবার মতো বীরত্ব আমার নেই। এমন একের আসর থেকে যঃ পলায়তি—। বহু লোকই ভুলে যায় it takes two to speak. আমি হোল্ডিং-এর এক ওভারে ছয়-ছয়টি বাম্পারও সহ্য করতে পারি কিন্তু এমন বক্‌বকম্‌ element, নৈব চ নৈব চ। ইতি—

তোর চন্দন

শ্রীতাপসকুমার মৈত্র
ডাণ্টাল
পোঃ নিউ বেঙ্গাইগাঁও
গোয়ালপাড়া, আসাম

১৬। বিদ্যালয়ের নতুন পরিবেশে তোমার মনে যে-অনুভূতি হইয়াছিল তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া তোমার বন্ধুকে একটি পত্র লেখ। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

কামরাবাদ
পোঃ সোনারপুর, ২৪-পরগণা
১২ই জুন, '৮৩

প্রীতিভাজনেষু,
ভাই বরুণ,

তোকে সানন্দে জানাচ্ছি শেষপর্যন্ত বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইন্‌স্টিটিউশনে ভর্তি হতে পেরেছি। সুন্দর স্কুলটা। বিরাট বিল্ডিং-এর সামনে ফুলের বাগান। বাগানের মধ্যে একটা শহীদবেদী। এই স্কুলের দুটি ছাত্র প্রাণ দিয়েছিলেন স্বাধীনতা-সংগ্রামের অগ্নিযুগে। আর ঐ বাগানের পাশেই স্যার আশুতোষের মর্মরমূর্তি। দেখলেই মনে সম্ভ্রম জাগে। তিনিই এই স্কুলটির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন। প্রতিষ্ঠাতার মর্মরমূর্তিও শহীদ বেদিটির কাছেই। মূল অট্টালিকার পিছনে অনেকটা ফাঁকা জায়গা। তারই দুদিকে নতুন বিল্ডিং সংযোজিত। আমাদের ক্লাস হয় এইখানে।

স্কুলের পরিবেশটি সত্যিই মনোরম। কিন্তু পরিবেশ বলতে তো শুধু বিল্ডিং আর বাগানই বোঝায় না, শিক্ষক ও ছাত্রদের নিয়েই আসল পরিবেশটি রচিত হয়। সেদিক দিয়ে বলব, সত্যিই আশ্চর্য এই পরিবেশটি। মাস্টারমশাইরা দুদিনেই আমাদের অত্যন্ত আপনজন হয়েছেন এবং ছাত্ররা আমাদের ভ্রাতৃত্বে বরণ করেছে। স্কুলে নিয়ম-শৃঙ্খলা সর্বত্র রক্ষিত, কিন্তু তা জোর করে চাপানো বলে মনে হয় না। মিউজিয়ম, লেবরেটরি, ওয়ার্কশপ, হলঘর সব মিলিয়ে এ এক আনন্দলোক। তোকে সত্যি বলছি, এই নতুন পরিবেশে আমি অভিভূত।

তোর চিঠির আশায় থাকলাম। ইতি—

তোর সুমিত

শ্রীবরুণ বোস
প্রযত্নে শ্রীযুক্ত সুনীল বোস
কলেজ রোড, নবগ্রাম, হুগলী

১৭। একটি বই পড়িয়া তোমার ভাল লাগিয়াছে; সেইজন্য বইখানির প্রশংসা করিয়া তোমার বন্ধুর নিকট একটি পত্র লিখ।

[উঃ মাঃ পরীক্ষা, ১৯৭৯]

১৬ আচার্য জগদীশ বসু রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৭
৭. ৭. ৮৪

প্রিয় সমন্বয়,

তুই পরীক্ষায় প্রথম হয়ে অনেক ভালো ভালো বই পুরস্কার পেয়েছিস জেনে আনন্দিত হলাম। সত্যি, ভালো বই-ই আমাদের যথার্থ বন্ধু।

আমি সম্প্রতি বুদ্ধদেব বসুর 'আমার যৌবন' বইটা পড়েছি। খুব ভালো লাগল বইটা। ঢাকায় ছাত্রজীবনের দিনগুলো কী সুন্দর করে লিখেছেন—রূপকথার মতো। তারপর কলকাতার জীবনসংগ্রামের ইতিহাস—ট্যুইশন, কাব্যচর্চা আর আড্ডার রোমাঞ্চকর দিনগুলোর কথা। ওঁর ব্যক্তিগত জীবনের কথা হলেও ব্যক্তিকে ছাপিয়ে একটা সাধারণ কোনো যুবকের আশা-নিরাশা দ্বিধা-দ্বন্দ্বই যেন ফুটে উঠেছে। কী সহজ অথচ সরস ভাষা! বার বার পড়তে ইচ্ছে করে। কলকাতার অনেক কবি-সাহিত্যিকের কথাও জানা যায় বইটা থেকে। সেই সঙ্গে বড়ো লাভ—সেই সময়কার কলকাতাকে সুন্দর করে পাওয়া যায় এই বইটার মধ্যে।

বইটা পড়ে দেখিস ভাই, আমার বিশ্বাস তোরও খুব ভালো লাগবে। ইতি—

তোর নিরু

শ্রীসমন্বয় চ্যাটার্জী
ভট্টাচার্যপাড়া
গোবরডাঙা, ২৪-পরগণা

(এই প্রসঙ্গে ১৪নং পত্রটিও দেখতে পার)

১৮। কয়েকদিন আগে তোমরা কয়েকজন মিলে বনভোজন করেছ। তার বিবরণ দিয়ে বন্ধুকে চিঠি লেখ। (চিঠিতে কোথাও তোমার নাম বা স্কুলের নাম লিখবে না। নামের পরিবর্তে ক, খ, গ ব্যবহার করা যেতে পারে)। [ত্রিপুরা উঃ মাঃ পরীক্ষা, ১৯৭৯]

কলেজ টিলা, আগরতলা
ত্রিপুরা
২১. ৭. ৮৪

প্রীতিভাজনেষু,

খাম খুলে প্রথমে হয়তো ফোটোটাই তোর চোখে পড়বে, তার পরে চিঠিটা। ছবিতেই বুঝতে পারছিস আমরা বনভোজন করছি। আমার পাচক-মূর্তিটা দেখে তুই হয়তো হাসছিস। সত্যি ভাই, সেদিনটা বড়ো আনন্দে কাটল। গিয়েছিলাম কলেজ টিলা থেকে বিশ্রামগঞ্জ বলে একটা জায়গায়। এখানে আমার এক মামা থাকেন, তাঁর বাগানবাড়িতেই আমরা বনভোজন করেছি গত রোববারে। আমরা ৫-৫৫ মিনিটের বাস ধরেছিলাম। ভয় ছিল বৃষ্টি হবে বলে, কী আশ্চর্য, এক ফোঁটা বৃষ্টিও পড়ে নি। সুন্দর আবহাওয়া ছিল সেদিন। বাগানের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যেই আমরা সুন্দর একটা জায়গা বেছে নিয়েছিলাম। চায়ের পাট মিটতেই দশটা বেজে গেল। তারপর রান্নার যোগাড়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গল্পগুজব গানবাজনা—সবই চলতে লাগল।

আইটেম আমরা বেশি করি নি, মাংস-ভাত আর একটা চাট্‌নি। রান্নাটা প্রধানত আমিই করেছিলাম, তবে সহকারীরা অতি উৎসাহে লেগে পড়েছিল। আমি বললাম, ট্যু মেনি কুক্‌স্ স্পয়েল্ দি ব্রথ্, তা তো জানিস? কে কার কথা শোনে? বেলা তিনটেয় আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় যা নামল তাকে ঠিক সুভোজ্য বা সুপথ্য বলা

চলে না, তবে আনন্দের মসলাটা প্রচুর ছিল বলেই তা অমৃত বলে মনে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সেই লাইনটা মনে পড়ছে—

অমৃত জিনিসটা রসের মধ্যে নাই, রসবোধের মধ্যেই আছে।

তোর কথা খুব মনে হচ্ছিল। ইস্, তুই যদি সঙ্গে থাকতিস, কী মজাই না হত? ভালোবাসা নিস। ইতি—

তোর প্রিয় বন্ধু
'ক'

১৯। কোনো ঐতিহাসিক স্থানে ভ্রমণের বর্ণনা দিয়ে তোমার বন্ধুকে চিঠি দাও।

৮১ কাঁকুলিয়া রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০২৯
৮. ১১. ৮৩

প্রিয় পথিক,

এবার পুজোয় মামার সঙ্গে নালন্দায় বেড়াতে গিয়েছিলাম, সে কথা তোকে আগেই জানিয়েছি। ফিরে এসে মনে হল জগদ্বিখ্যাত এই ঐতিহাসিক স্থানের ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তোকে জানাতে না পারলে আমার আনন্দ সম্পূর্ণ হবে না। তাই লিখতে বসেছি। রাজগীর থেকে নালন্দা প্রায় চার ঘণ্টার বাস-ভ্রমণ। খুব ভোরে আমরা রাজগীর থেকে বেরুলাম; আমরা মানে আমি মামা আর মামাতো ভাই টুবলু। তোকে বাস-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বা পথের বর্ণনা দিয়ে চিঠির কলেবর বাড়াতে চাই না। তাই নালন্দা থেকে শুরু করছি।

ইতিহাসে হিউয়েন সাঙ্-এর বিবরণের মধ্যেই আমরা নালন্দা মহাবিহার বা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা শুনেছি; ইতিহাসের পাতায় ভাঙা ইঁটের বিশাল স্তূপের ছবিও দেখেছি। সেখানে একদিন এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে প্রায় দশ হাজার ছাত্র পড়তে আসতেন। এটা ছিল বৌদ্ধ শিক্ষাকেন্দ্র। এক বিশাল উদ্যানের মধ্যে চারতলা বাড়ি, খান ছয়েক—এখানেই থাকতেন ছাত্ররা।

নালন্দার বিশাল দেউড়ির কাছে আসতেই হঠাৎ বিগত দিনের ইতিহাস যেন জীবন্ত হয়ে উঠল। কল্পনায় যেন শুনতে পেলাম বৌদ্ধশাস্ত্র-অধ্যয়নরত ছাত্রদের কণ্ঠস্বর। যেন দেখতে পেলাম বাঙালী মনীষী শীলভদ্রকে। সেই মুণ্ডিত মস্তক, সেই গৈরিক বাস, সেই পবিত্র মুখমণ্ডল।

কিছুক্ষণ অতীতের স্বপ্নে মগ্ন ছিলাম, হঠাৎ কানের কাছে কে যেন বলে উঠল, 'বাবু, গাইড চাই'? বললুম, 'চাই'।

অতীত থেকে ফিরে এলাম বর্তমানে। বিশাল চত্বরের চারদিকে সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালো। কখন উপরে কখনও আবার সিঁড়ি ভেঙে নিচে এলাম আমরা।

ছাত্রদের বাসগৃহ দেখলাম। পাথরের চৌকি, প্রদীপ রাখার কুলঙ্গী, পুঁথি রাখার তাক, সবই আছে সেই ছাত্রদের। বিশাল হলঘরের ভগ্নস্তূপ দেখিয়ে

গাইড বললেন, এটা ছিল পাঠদান-কক্ষ অর্থাৎ ক্লাস-রুম। এমন কক্ষ অনেক আছে নালন্দায়। এর পর আমরা গিয়ে উঠলাম একটা উঁচু টিলায়। থাকে থাকে সিঁড়ি চলে গেছে উপর পর্যন্ত। শুনলাম, এটা ছিল প্রাচীন নালন্দার মানমন্দির। এখানে বসে প্রাচীন জ্যোতির্বিদেরা আকাশ-বিষয়ক গবেষণা করতেন।

প্রাচীন ইতিহাসের কিছু কিছু ধ্বংসাবশেষ নিয়ে কিছুদূরেই একটা সংগ্রহশালা তৈরি করা হয়েছে। নাম, নালন্দা মিউজিয়াম। এখানে এলে তুই নালন্দার অনেক কিছুই দেখতে পাবি। ছাত্রদের ব্যবহৃত পাথরের পাত্র, প্রায় পাথরে-রূপান্তরিত সে যুগের চাল, আরও কত কী।

এখানে তোকে চুপি চুপি একটা কথা বলে রাখি, নালন্দার ছাত্রদের খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে একদম বাবুগিরি ছিল না। সেটা জেনেছি মোটা মোটা চালগুলো দেখে। তুই হয়তো বলবি, মন্তব্যটা ফেলুদার মতো হল, তাই না ?

তার ফিরতে ফিরতে সেই বিকেল। সুযোগ পেলেই আসিস নালন্দায়। তবে একটা কথা, রাজগীর হয়ে এসে ভালো লাঞ্চ-প্যাকেট আনিস, কারণ এখানে ও জিনিসটার কিঞ্চিৎ অভাব। মানে, ভালো হোটেলের কথা বলছি। ইতি—

শ্রীপথিক বন্দ্যোপাধ্যায়
৮ শরৎ ব্যানার্জী রোড কুশল
কলিকাতা-৭০০ ০২৯

২০। গ্রামের কোনো উৎসবের বর্ণনা করে বন্ধুকে চিঠি।

গ্রাম + পোঃ প্রতিহারপুর
হুগলী
৪-৪-৮৪

ভাই অয়ন,

আশা করি সর্বাঙ্গীণ কুশল। সম্পূর্ণ এক নতুন পরিবেশে বসে তোকে লিখছি। হয়তো এ চিঠি পেয়ে অবাক হবি। গতকাল দুপুরে বিনা নোটিশে হুগলীর এক গণ্ডগ্রাম প্রতিহারপুরে এসে পড়েছি আমার এক আত্মীয়ের বাড়িতে।

আজ সকাল থেকে এখানে শুরু হয়েছে গাজনের উৎসব। বুড়ো শিবতলার প্রাঙ্গণ জুড়ে মেলা বসেছে। প্রায় সকাল থেকেই ছেলে-বুড়োর ভিড় জমে উঠেছে। আশ-পাশের গ্রাম থেকে পসারীরা এসেছে নানান পণ্য নিয়ে। তেলেভাজা পাঁপড়-ভাজা থেকে শুরু করে মনোহারী জিনিস। রঙবেরঙের পুতুল, ধামা-কাঠা-কুলো সব কিছুরই বিপুল আয়োজন। এখানকার বিশিষ্ট শিল্পনিদর্শন বলতে তেমন কিছুই নেই। কিন্তু গ্রাম্য-মেলার সব কিছু আকর্ষণ এখানে খুঁজে পাওয়া যায়।

মেলাটা আয়তনে ছোটো হলেও আকর্ষণে অনেকখানি। এ তো গেল মেলার কথা। এখানকার গাজনের উৎসব দীর্ঘ দিনের। বুড়ো শিবতলার শিবঠাকুরের বয়স অনেক। এখানকার জমিদারের পূর্বপুরুষ অনেককাল আগে নাকি স্বপ্নাদেশে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকে এই মন্দির ঘিরে পুজো-পার্বণের ট্র্যাডিশন সমানে চলে

আসছে। বিশেষ করে গাজনের উৎসব উল্লেখযোগ্য। গতকাল রাত্রিতে শিবের বিয়ের দিন ছিল। সেই উপলক্ষে মন্দির-চত্বরে প্রচুর বাজি পুড়েছে। গাজনের সঙের আবির্ভাবও ঘটেছিল। বিশেষ রীতির গানও শোনা গেল। শত শত পুণ্যার্থী মানুষ সমবেত হয়েছিল পুজো দেখবার জন্যে। নীলঠাকুরের উদ্দেশ্যে উপবাসী স্ত্রীলোকেরা পুজো দিয়েছেন মন্দিরে। অনেক সন্ন্যাসীর সমাবেশ হয়েছিল। সারা রাত ধুনি জ্বলেছে। "ব্যোম ভোলানাথ" ধ্বনিতে কম্পিত হয়েছে বাতাস। আজ দুপুরে মেলায় কয়েকটি লোমহর্ষক খেলা দেখা গেল। কাঁটা, বাণ, আগুন ইত্যাদি নিয়ে কয়েকজন খেলল। রুদ্ধনিঃশ্বাসে অগণিত দর্শক উপভোগ করল এই অনুষ্ঠান। মাচায় বসে তোকে এই চিঠি লিখছি। ক্রমশ ভিড় বাড়ছে। রাতে নাকি যাত্রার আসর বসবে। অন্যান্য অভিজ্ঞতা পরে জানাব।

প্রীতি ও ভালোবাসা জানিস। ইতি—

অয়ন বর্মণ তোর প্রসূন

শ্রীপীযূষকুমার বর্মণ
১০-বি পার্ক স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০১৭

২১। খেলার মাঠে উচ্ছৃঙ্খলতা সম্বন্ধে বন্ধুকে চিঠি।

৫৯ যতীন দাস রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০২৯
৫-৬-৮৪

ভাই পার্থ,

কালকের খেলাটার কথাই ভাবছি। কীভাবে ভণ্ডুল হল খেলাটা! খেলা তো নয়, যেন রেষারেষি। রেফারির দোষ কী, ওভাবে ফাউল করলে মাঠ থেকে বের করে দেওয়া ছাড়া উপায় কী? কিন্তু রেফারির আদেশ অমান্য করার মধ্যে কি কোনো পৌরুষ আছে? আছে খেলোয়াড়োচিত মনোভাব? একদিকে মাঠের ভেতরে এই, আর অন্যদিকে দর্শকদের বাড়াবাড়ি। একটা ইঁটের টুকরো তো আমার কানের কাছ দিয়ে চলে গেল। ভাবছি যত বড়ো খেলাই হোক, মাঠে যাব না।

'এ তো কাজিয়া নয় আপোসে খেলা।'

—লগিঠেলা মানুষ ঈশ্বর পাটনির এই সাধারণ কথাটা কি আমরা বুঝব না?

ফুটবল-মাঠেও যেমন ক্রিকেট-মাঠেও তেমনি—জয়ং দেহি—তা ছলে হোক, বলে হোক বা কৌশলে হোক—মারি অরি পারি যে কৌশলে। দাও ট্রানজিস্টারের আওয়াজ বাড়িয়ে, ফেলো আয়নার আলো প্লেয়ারদের মুখে। জয় আমাদের চাই।

ইজ্. দিস ক্রিকেট? যে-খেলায় খেলার শেষে প্লেয়ারদের এস্‌কর্ট করতে সৈন্য-বাহিনী তলব করতে হয় সেটা কোন্ খেলা? ইতি—

পার্থ বাগচী, তোর বিজন
৬-বি ঘোষ লেন, কলি-৬

২২। রবীন্দ্র নামে কলিকাতাবাসী একজন ছাত্র তাহার ১. ৫. ৮২ ত্রিপুরা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা দিল্লীবাসী বন্ধুকে জানাইতেছে—এই মর্মে একটি পত্র রচনা কর। [ত্রিপুরা, উ. মা. ১৯৮২]

৩৬ শিবতলা স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৭
১৯. ৬. ৮৪

ভাই অনিন্দ্য,

আগরতলা থেকে এসে তোর চিঠিটা পেলাম। আগরতলা গিয়েছিলাম আমার মামার কাছে, তিনি ওখানেই কাজ করেন। ছিলাম জেল-আশ্রম রোডে। খুব বেড়িয়েছি, একটা জীপে করে। প্রাসাদের পরিবেশে এম. বি. বি. কলেজটা সত্যিই সুন্দর। মিউজিয়মটাও দেখেছি। ত্রিপুরা থেক পাওয়া শিলামূর্তিগুলো সত্যিই দেখবার মতো। ধর্মনগরের কাজে গুণকোটি পাহাড়ে গিয়াছিলাম, সেখানে ভাস্কর্যে দেবদেবীর মূর্তি দেখলাম, এগুলো সম্ভবত ষষ্ঠ শতকের। গোমতীর ধারে দেবতামুড়া পাহাড়ও দেখলাম। এখানে একসঙ্গে অনেকগুলো দেবমূর্তি আছে।

আমাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করেছে উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির। রবীন্দ্রনাথের 'রাজর্ষি' নাকি এরই পটভূমিতে লেখা। আর ভালো লেগেছে বিচিত্র আরণ্য-সৌন্দর্যের জন্যে বিখ্যাত সিপাহীজলা ফরেস্ট। আর একটি জিনিস আমাকে মুগ্ধ করেছে। এটি হল আগেকার রাজাদের তৈরি নীরমহল। এ হল প্রকাণ্ড দীঘির মধ্যে বিশেষ কৌশলে নির্মিত একটি প্রাসাদ। ফেরবার আগের দিন আঠারোমুড়ায় পেট্রল ও গ্যাসপ্ল্যান্টটাও দেখে এসেছি। এটি ও-এন্‌-জি-সির উদ্যোগে তৈরি।

এক নিশ্বাসে বলে গেলাম ত্রিপুরাভ্রমণের অভিজ্ঞতা। এ হল প্রথম উচ্ছ্বাসের প্রকাশ। পরে আরও বিস্তারিতভাবে লিখব।

এক কথায় ত্রিপুরা আমার খুব ভালো লেগেছে। এর পরের বার তুই যদি আমার সঙ্গী হোস……। বাক্যটা আর শেষ করলাম না। কারণ সে আনন্দ কীভাবে প্রকাশ করব জানি না। ইতি—

শ্রীঅনিন্দ্য ভট্টাচার্য — তোর রবীন্দ্র
সি ৪৮ মেফেয়ার গার্ডেনস্‌
নিউ দিল্লী-১১০ ০১৬

২৩। তোমার পল্লীতে কবি সুকান্তের জন্মোৎসব পালিত হইয়াছে। ইহার বিবরণ দিয়া তোমার বন্ধুকে পত্র লেখ।

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৩এ জগমোহন মল্লিক লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৭
৩।৯।৮৩

ভাই সুকল্যাণ,

তুই শুনে সুখী হবি, গত ৩১-এ শ্রাবণ আমাদের পল্লীতে আমরা সুকান্ত জন্মোৎসব

পালন করেছি। অনুষ্ঠানের প্রথমেই গাওয়া হয়েছিল 'অবাক পৃথিবী' গানটি। গানটির একাংশ ছিল একক কণ্ঠে, অন্য-অংশ ছিল সমবেত কণ্ঠে। তার পর কবির অভিযান, ঘুম নেই, ছাড়পত্র, পূর্বাভাস ইত্যাদি প্রত্যেকটি কাব্যগ্রন্থ থেকে নির্বাচিত কবিতা আবৃত্তি করা হয়েছে। আমি আবৃত্তি করেছিলাম 'ছাড়পত্র' কবিতাটা। 'একটি মোরগের কাহিনী'-কে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন আমাদের অরূপ-দা, আমাদের সংস্কৃতি সংস্থার সম্পাদক। সুন্দর হয়েছিল এই নাট্যরূপ। নৃত্যের একটি অনুষ্ঠানও আমরা রেখেছিলাম। 'রানার' কবিতার সঙ্গে নেচেছে পোটোপাড়ার রাঘব পাল। সুন্দর সুগঠিত দেহ রাঘব পালের। ওর অঙ্গভঙ্গী সত্যি দেখবার মতো হয়েছিল। গানটা কখনও সমবেত কণ্ঠে, কখনও বা একক কণ্ঠে গাওয়া হয়েছে। কিছু effect music-ও সঙ্গে ছিল।

সবচেয়ে বড়ো কথা, যে-জন্যে কবি সুকান্তকে আমরা ভালোবাসি তা হচ্ছে ওঁর আদর্শ, দেশের প্রতি ভালোবাসা, সেদিকটা সুন্দর ভাবে আলোচনা করেছিলেন আমাদের প্রধান অতিথি ডঃ বিজন সরকার।

অনুষ্ঠানটি সত্যিই অনেক দিন মনে রাখার মতো। ভালোবাসা জানাচ্ছি। ইতি—

তোর সুমন্ত

শ্রীসুকল্যাণ ঘোষ
ছোটো বটতলা
৫০ নেতাজী সুভাষ বসু রোড
নিউ ব্যারাকপুর, ২৪-পরগণা

২৪। আসন্ন পরীক্ষা সম্বন্ধে মানসিক অবস্থার বিবরণ দিয়ে কোন বন্ধুকে পত্র লেখ। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৩০-কে রামকৃষ্ণ সমাধি রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪
২-১-৮৪

প্রিয় নীলাদ্রি,

পরীক্ষা তো এসে গেল। আমার তো ভাই যতই পরীক্ষা কাছে আসছে ততই হৃৎকম্প বাড়ছে। যা পড়েছি তা-ও যেন ভুলে যাচ্ছি। স্বপ্নে তো রোজই দেখছি তিন ঘণ্টা শেষ হয়ে গেল অথচ কিছুই লেখা হল না—লিখছি আর কাটছি, কখনও মনে হচ্ছে হাত অবশ, কলম সরছেই না। রাঙাকাকু বলছেন—তুই অত ঘাবড়ে যাচ্ছিস কেন—take it easy. নিজেও বুঝছি, প্রস্তুতি যতটুকু আছে, তাতে ঘাবড়াবার কোনো কারণ নেই। কিন্তু একটা nervousness যেন পেয়ে বসেছে।

মা কত ভালো ভালো খাবার তৈরি করছেন রোজই, কিন্তু ভাই খেতেও তেমন ইচ্ছে করছে না, কেমন একটা অরুচি! পড়তে পড়তে ঘুমিয়ে পড়ি, আবার হঠাৎ ধড়মড় করে উঠে বসি। চারদিকে সবাই ঘুমোচ্ছে। নিজেকে তখন কেমন বিচ্ছিন্ন মনে হয়। যে-hobby-গুলো ছিল তাদের আপাতত শিকেয় তুলে রেখেছি।

পড়তে তো খারাপ লাগে না, পড়াশোনায় একটা আলাদা আনন্দ আছে, কিন্তু পরীক্ষার নামে যে কেন গায়ে জ্বর আসে বুঝি না।

তোর মনের অবস্থা কেমন জানাস। অন্তত, একজন সমব্যথী পেলে বেঁচে যাই।

ভালোবাসা নিস।

তোর টুটুন

নীলাদ্রি রায়
২৩ রাষ্ট্রগুরু এভেনিউ
কলিকাতা-৭০০ ০২৮

২৫। পড়াশোনার কাজে গ্রন্থাগারের উপযোগিতা কি, এ বিষয়ে তোমার অভিমত দিয়া বন্ধুকে একটি চিঠি লেখ। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-'৮১]

পি-৬০ নিউ আলিপুর
কলিকাতা-৭০০ ০৫৩
৬-৭-৮৪

ভাই প্রশান্ত,

তোদের বাড়ির কাছেই তোরা একটা লাইব্রেরি গড়ে তুলেছিস জেনে আনন্দিত হলাম। এবারে তোর পড়াশোনার খুব সুবিধে হবে। আমাদের বাড়ির কাছেই রামকৃষ্ণ মিশন কালচারাল ইন্‌স্টিটিউটের লাইব্রেরি। কাছাকাছি এই সুন্দর লাইব্রেরিটা না থাকলে যে কী অসুবিধাই হত তাই ভাবি। সত্যি, বই-ই আমাদের বন্ধু। আর সেই বই নিয়েই যে লাইব্রেরি তা আমাদের পরম সম্পদ। টেক্সট্ বই শুধু কতগুলো জিজ্ঞাসা জাগায়, সেই জিজ্ঞাসাই আমাদের নিয়ে যায় লাইব্রেরিতে, সংশ্লিষ্ট বিষয়ের নানা বই দেখে আমরা আমাদের কৌতূহল চরিতার্থ করি।

লাইব্রেরির আবহাওয়াই পড়ার প্রেরণা দেয়, জানবার একটা প্রেরণা আপনা থেকে আসে। লাইব্রেরিয়ান আমাদের মস্ত বড়ো বন্ধু। পড়ার ব্যাপারে আমাদের তিনিই প্রচলিত নির্দেশ দিতে পারেন। লাইব্রেরিই বলতে গেলে আমাদের প্রকৃত বিশ্বালয়। শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের কাছে আমরা যে-সব ভালো টেক্সট্ বই বা রেফারেন্স বই দেখবার নির্দেশ পাই, লাইব্রেরিতেই তা পাওয়া সম্ভব, ক'জন আর সব বই কিনে পড়তে পারে? তোদের লাইব্রেরিটা খুব দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। যাব একদিন।

প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। ইতি—

তোর সন্দীপ

শ্রীপ্রশান্ত চৌধুরী
৩৩-এ সুধীর চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

২৬। আত্মচিন্তার পরিবর্তে পরার্থচিন্তা প্রত্যেকটি যুবকের লক্ষ্য হওয়া উচিত কেন, সে-বিষয়ে তোমার মতামত প্রকাশ করিয়া তোমার বন্ধুকে চিঠি লেখ। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

১১২ দেবী চৌধুরী রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০২৩
৯-৬-৮৪

প্রীতিভাজনেষু,

রাকেশ,

তোর চিঠি পেয়ে আনন্দিত হলাম। বরুণের ফী-দাখিলের ব্যাপারে সুবোধ যা করল তার তুলনা নেই। বছরের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে ও একসঙ্গে যে-স্মারকবৃত্তির টাকাটা পেয়েছিল তা ওর নিজেরও খুবই প্রয়োজন ছিল, কিন্তু কোনো দিকে না তাকিয়ে ও-যে সবটাই বরুণের ফী হিসেবে দিয়েছে এ কথা ভাবতে বুক ভরে যাচ্ছে। বরুণ একেবারেই অসহায় হয়ে পড়েছে, বিশেষ করে ওর বাবা মারা যাবার পর থেকে।

সুবোধ যে-আদর্শ স্থাপন করল তা আমাদের সকলেরই অনুকরণীয়। নিজের জন্যে চিন্তা তো আমাদের করতেই হবে, কিন্তু সেটাই সব নয়, পরের জন্যে কিছু করার প্রেরণা যেন আমাদের সবারই থাকে। এতে যে গভীর পরিতৃপ্তি তার তুলনা নেই। আমি যেমন আমার, তেমনি অন্যেরও—এই মনোভাবই আমাদের দেশের শাশ্বত আদর্শ। আমাদের দেশের সমস্ত মনীষীই আমাদের এই শিক্ষাই দিয়েছেন।

সুবোধকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। ইতি—

তোর স্বপন

শ্রীরাকেশ মৈত্র
২০০ দক্ষিণদ্বারী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৪৮

২৭। খাওয়াদাওয়ায় ছোটো ভাইয়ের খুব বাছবিচার—এ কথা জানতে পেরে চিঠি লেখ।

৭২/২, আর. কে. চ্যাটার্জী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০৪২
৩-৬-৮৪

স্নেহের বুবুল,

তোর চিঠিটা পড়ে খুব ভালো লাগল। নানা বিষয়ে তোর আগ্রহের কথা বাবার চিঠিতেও জেনেছি। কিন্তু মার চিঠিতে একটা কথা জানতে পেয়ে তোকে চিঠি লেখবার জন্যে উসখুস করছিলাম। তুই নাকি ভালো করে কিছুই খাস না। 'এটা খাব না ওটা খাব না' করে নেড়েচেড়ে উঠে পড়িস। তাই নাকি রে? এটা

কিন্তু খারাপ অভ্যাস। তুই হয়তো বলবি 'আপ রুচি খানা'। তাই না? কিন্তু আমি বলি ঐ রুচিটা অভ্যাসেই গড়ে ওঠে। আমার নিজের কথাই বলি। তেলাপিয়া মাছটা আমার খেতেই ইচ্ছে করত না, কিন্তু এখন তেলাপিয়া পেলে আমার আর কিছু চাই না। খেতে খেতে অভ্যাস হয়ে গিয়েছে। আর তুই নিজেই তো ক্লাসে বিজ্ঞানের হাইয়েস্ট স্কোরার। মুখরোচক জিনিসমাত্রই যে ফুড-ভ্যালু বেশি তা তো নয়। সবরকম খাবার খাওয়া অভ্যাস না করলে বিদেশ-বিভূঁয়ে গিয়ে কষ্ট পেতে হয়:

বিলেতে গিয়েও ছেলে শুধু তোলে হেঁচকি
হোটেলে মেলে না হায় চচ্চড়ি-ছেঁচকি।
বিলেতে গিয়েও ছেলে শুধু তোলে হাই:
মোচার-ঘণ্ট-রাঁধা পিসিমাটি নাই।

অলমতি বিস্তরেণ।
স্নেহাশীষ নে
েতার দাদা

বুবুল মিত্র
প্রযত্নে শ্রীজীবেন্দ্র মিত্র
৫৪২-বি, সাহেবপাড়া
পোঃ+জিঃ কাটিহার

২৮। তোমার স্কুলে তোমরা কিভাবে শরৎ জন্মশতবার্ষিকী পালন করেছ জানিয়ে তোমার ছোট বোনকে চিঠি লেখ।

অথবা, **তোমার স্কুলে বা কলেজের কোন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখ।** [উ. মা ১৯৮২]

৮১ কাঁকুলিয়া রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৯
২১-৮-৮৩

স্নেহের বনানী,

রাগ করিস না। চিঠির উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল। আমাদের স্কুলে শরৎ-জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হল গতকাল। অনুষ্ঠান নিয়ে খুব ব্যস্ত ছিলাম বলে তোকে লিখতে পারি নি। কীভাবে আমরা এই উৎসব পালন করলাম শুনতে ইচ্ছে হচ্ছে নিশ্চয়? দাঁড়া বলছি।

প্রথমে আমরা সংস্কৃত স্তোত্র দিয়ে উৎসব শুরু করি। এটি এই উপলক্ষে লিখেছিলেন আমাদের সংস্কৃত শিক্ষক। এর অর্থ মূলত এই রকম ছিল—যে-বাণী অন্ধকারকে চমকে দিয়েছে সেই শরৎ-বাণীর জয় হোক। স্তোত্রগানের পর ছেলেরা স্বরচিত কবিতা আর সঙ্গীতের অর্ঘ্য নিবেদন করে। এর পর অনুষ্ঠিত হয় একটি বিতর্ক অনুষ্ঠান। এর বিষয় ছিল: " 'বিন্দুর ছেলে'র সাহিত্যিক মূল্য 'রামের সুমতি'র চেয়ে বেশি।" নবম শ্রেণীর ছাত্ররা এই প্রস্তাবের বিরোধিতা ক'রে একাদশ শ্রেণীকে পরাজিত করে। এর পর 'শরৎচন্দ্রের ছেলেবেলা' এই পর্যায়ে শরৎচন্দ্রের দেবানন্দপুর আর ভাগলপুরের শৈশবের দিনগুলো নিয়ে একটি আলেখ্য পরিবেশন করা হয়।

খুব ছোটো ছেলেরা এতে অংশ নিয়েছিল—আর 'অমৃতং বালভাষিতম্'। 'মেজদা'-গল্পটিকে নাট্যরূপ দিয়েছিলাম আমি। এইটে অভিনয় করা হয় সবশেষে। ছিনাথ সেজেছিল সম্বিৎ নামে ছেলেটা। ল্যাজটা এখনও আছে।

এই অনুষ্ঠানে আগে 'বসে লেখো' আর 'বসে আঁকো' এই দুই পর্যায়ে যথাক্রমে শরৎপ্রতিকৃতি অঙ্কন এবং শরৎচন্দ্রের মানবিকতা বিষয়ে প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয়। শরৎচন্দ্রের বাণীতে সেদিন বিদ্যালয়ের হল-ঘরটি ছিল সুসজ্জিত।

তোদের স্কুলে তোরা কিছু করিস নি? স্নেহাশিস্ নিস। ইতি—

তোর দাদা

বনানী ঘোষ
প্রযত্নে শ্রীকৃষ্ণগোপাল ঘোষ
নরঘাট, ব্রজলাল চক
মেদিনীপুর

২৯। কোনো বিদেশী ভাষা শেখার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়ে ছোটো ভাইকে চিঠি।

ব্রহ্মপুর, গড়িয়া
চব্বিশ পরগণা
১. ৭. ৮৪

স্নেহের কুশল,

তোর চিঠিতে একটা বিদেশী ভাষা শিক্ষার ব্যাপারে তোর আগ্রহ হয়েছে দেখে সত্যি খুব খুশি হলাম। তোর চিঠি পড়ে মনে হচ্ছে তোর ফরাসী ভাষা শেখবার ইচ্ছে। বেশ তো তাই শেখ না। ফরাসী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা, সাহিত্য সম্পদে এর জুড়ি মেলা ভার।

তুই লিখেছিস উচ্চারণ নাকি কঠিন, অনুনাসিকতা ঠিকমতো বজায় রাখতে নাকি হিমসিম খেতে হয়। না রে, ব্যাপারটা মোটেই শক্ত নয়, একটু অভ্যাস করলেই ঠিক হয়ে যায়। 'Kankulia' লেখা থাকলে তুই কী উচ্চারণ করিস? 'কাঁকুলিয়া।' তাই না? ফরাসীতেও ঐ রকমই। Mon = মঁ কিন্তু স্বরবর্ণ পরে থাকলে সন্ধি হবে যেমন mon + ami = মনামি। আর verb-এর irregularity-র কথা লিখেছিস। ও তো ইউরোপীয় সব ভাষাতেই আছে। তুই তো সংস্কৃত পড়েছিস, ভ্বাদি-অদাদি-দিবাদি ইত্যাদি দশ-দশটা গণ যখন আয়ত্ত করেছিস তখন সামান্য irregularity-তে মা ভৈঃ। পড়তে শুরু করে দে।

রামকৃষ্ণ মিশনে বোধ হয় সেশন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তুই Dondo, Collins, Cortina বা Hugo যে-কোনো একটা System অনুসরণ কর। বই বাবাকে বলে আজকেই কিনে নে। কিছুটা অগ্রসর হলেই bi-lingual series পড়বি, বাঁ-পাশে ফরাসী আর ডান-পাশে ইংরেজি। মিলিয়ে মিলিয়ে পড়লে ভাষাবোধ খুব তাড়াতাড়ি

আসবে। আর, একটা ফরাসী-ইংরেজি অভিধান অবশ্যই সঙ্গে রাখতে হবে। অসুবিধে হলে আমাকে জানাস। স্নেহ নে। ইতি—

শ্রীমান কুশলকুমার সরকার — শুভার্থী
প্রযত্নে শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সরকার — দাদা
২২ গোপী বসু লেন
কলিকাতা-৭০০০১২

৩০। সংবাদপত্রপাঠের উপযোগিতার বিষয়ে ছোটো ভাইকে একটি চিঠি লেখ।

৯৩।৪বি বিডন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬
২-৬-৮৪

স্নেহের কুনু,

তুই আমার কাছে যে-তথ্য চেয়েছিস গতকাল সে-সম্বন্ধেই ক্রোড়পত্র বেরিয়েছিল 'যুগান্তরে'। এইজন্যেই তোকে আমি খবরের কাগজ পড়তে বলি ভালো করে। খবর জানা তো দরকারই, তবে কোন্ খবর কেন বড়ো, আমাদের সমাজজীবনে তার গুরুত্ব কী এসব বিষয়ও সেই সঙ্গে ভাবতে হবে।

আজকের খবরের কাগজ নিছক খবরই সরবরাহ করে না, আমাদের জ্ঞাতব্য নানা বিষয়ই থাকে তাতে। তোদের পাঠ্যের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নানান্ তথ্য খবরের কাগজ থেকে পেতে পারিস তুই। তা ছাড়া সাহিত্য বিভাগেও অনেক মূল্যবান রচনা বেরোয় যা পড়লে নানা বিষয়ে জানতে পারবি। আজকের খবরের কাগজ সমাজের ভাবনাচিন্তার দর্পণের মতো। তাই সংবাদপত্র ভালো করে পড়া আমাদের সবারই উচিত। রোজকার কাগজ থেকে প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো কেটে রেখে যদি একটা অ্যালবাম করিস খুব ভালো হয়। স্নেহ নে। ইতি—

শ্রীমান তরুণ বসু — তোর মেজদা
১৫৪-এ বঙ্কিমচন্দ্র অ্যাভিন্যু
বি-জোন, দুর্গাপুর-৫

৩১। প্রিয় পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে : কাকাকে

৩৭ বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা-৭০০০৩৭
১. ৬. ৮৪

শ্রীচরণেষু,

কাকু,

তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দ হচ্ছে—সে আনন্দ এইমাত্র একটা কঠিন অঙ্ক ঠিকমতো করতে পারার আনন্দকেও ছাড়িয়ে গেল। সত্যি, আমাকে অঙ্কে পেয়েছে

যেন। পাঠ্যবিষয়গুলোর মধ্যে এইটেই এখন আমার সবচেয়ে প্রিয়—সবচেয়ে আপনার। বাবার কথামতো আমি additional subject হিসেবে অঙ্ক নিয়েছি। ভয়-ভয় করছিল। একেবারে নতুন subject ; সেট-থিওরি, ট্রান্স্ফরমেসন জিওমেট্রি—আরও কত কী। করতে গিয়ে ভয়টা ভেঙে গেল, অসম্ভব আনন্দ হচ্ছে এক-একটা সমাধান করতে পেরে।

Compulsory Math.-এ আমার সব চেয়ে ভালো লাগে পরিমিতি। Inequation-এর graph করতে আমার ভারি মজা লাগে। অন্যান্য অঙ্কে data যত কম হয় ততই বুদ্ধির খেলা খেলতে আনন্দ বেশি। যারা এইসব নিয়মপদ্ধতি বা প্রোবলেমগুলো উদ্ভাবন করেছেন তাঁদের কথা ভেবে শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে।

বাবা অঙ্কেরই অধ্যাপক কিন্তু আমি খুব না ঠেকলে তাঁর কাছে যাই না। গেলে বুঝি অঙ্কে বাবার কী অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। Test-এ first হওয়ায় উনি আমাকে Magic of Math. বলে একট বই উপহার দিয়েছেন। এখন সেইটে পড়ছি আর আঁক কষছি। আমার ভালোলাগা বিষয়টা জানালাম। ছোটবেলায় তোমার প্রিয় পাঠ্যবিষয় কী ছিল জানাবে কিন্তু। প্রণাম নিও।

শ্রীঅলক সরকার
পোঃ শিমুলিয়া
জিলা নদীয়া

স্নেহধন্য
টুনু

৩২। সাম্প্রতিক কোনো ঘটনা নিয়ে বাবার কাছে চিঠি।

[নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

১০১ সি বালিগঞ্জ প্লেস,
কলিকাতা-৭০০ ০১৯
২১-এ জুন, ১৯৮৪

পূজনীয় বাবা,

গতকাল বুঝলাম, তুমি এক সময়ের নামজাদা খেলোয়াড় হয়েও কেন মাঠে যেতে আর উৎসাহ বোধ কর না।

খেলার বয়স তখন বড়োজোর কুড়ি মিনিট। রেফারি একজনের বিরুদ্ধে অফ-সাইডের নির্দেশ দিলেন। ব্যস্,—শুরু হয়ে গেল বিশ শতকের কুরুক্ষেত্র-সমর। দুই তথাকথিত ভারতবিখ্যাত দলের রথী-মহারথীরা নেমে পড়লেন হাতাহাতি লড়াই-এ। ছি, ছি! সে বর্ণনা শুনলে তোমরা, যারা খেলার জগতের সত্যিকারের ক্ষত্রিয় ছিলে, 'রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়'।

কোথায় তলিয়ে গেল খেলার মাঠের সেই প্রাথমিক নীতি—"দ্য এসেনশিয়াল ইজ নট টু হ্যাভ ওন, বাট টু হ্যাভ ফট ওয়েল,"—বড়ো হয়ে উঠল দু'-পয়েন্টের লোভ! মনে হল, ভারতীয় স্পোর্টসের শত্রু দুই দল খেলার মাঠকে কলঙ্কিত করছে। না, চাই

না—আমার প্রিয় দলের এমন রক্তে-ভেজা জয় চাই না। আমিও ঠিক করেছি, আর এমন খেলা দেখতে যাব না।

যাই হোক, তোমরা কেমন আছ? তুমি ও মা আমার প্রণাম নিও, মণ্টুকে জানাবে আমার স্নেহ। ইতি—

প্রণত—
টুটু

শ্রীদেবব্রত দে
কামডহরি, গড়িয়া
২৪-পরগণা

৩৩। কলিকাতায় পাঠরত কমল নামে একজন ছাত্র উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য কিভাবে প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা তাহার দিল্লীবাসী পিতাকে জানাইতেছে—এই মর্মে একটি পত্র রচনা কর। [ত্রিপুরা, ১৯৮০]

ব্রহ্মপুর, গড়িয়া,
কলিকাতা-৭০০০৮৪
১২. ৩. ৮৪

শ্রীচরণেষু,

বাবা, তোমার চিঠি পেয়ে খুব আনন্দ হল। পরীক্ষা প্রস্তুতি বিষয়ে তুমি যে-সব উপদেশ দিয়েছে সেগুলো মনে রাখব। আমার preparation মোটামুটি ভালোই হয়েছে। ফিজিক্সের অপটিক্স, গ্র্যাভিটেশন আর ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক্সে যে অসুবিধের কথা তোমাকে আগে জানিয়েছিলাম তা কাটিয়ে উঠেছি। অর্গানিক কেমেস্ট্রির দুর্বলতারও অনেকটা কেটেছে। অঙ্কের প্রতিটি নিয়মেই প্রচুর অনুশীলন করেছি। বায়োলজির শুধু জেনেটিক্স্ বাদে অন্যান্য পরিচ্ছেদ ভালোই করেছি। জেনেটিক্স্-এর ব্যাপারে একজন মাস্টার মশাইয়ের সাহায্য নিচ্ছি।

ইংরেজি-বাংলার ব্যাকরণের অনুশীলন আর-একটু বেশি করে করা দরকার। আশা করি এর মধ্যে তা করে ফেলতে পারব। টেস্টের রেজাল্ট তো তোমাকে আগেই জানিয়েছি—৭২·৩% ছিল। আশা করি তোমার আশীর্বাদে স্টার পাবই ফাইন্যালে।

তুমি লিখেছ, দিল্লীতে ইতিমধ্যেই খুব গরম পড়েছে। গরম তো তোমার একেবারে সহ্য হয় না। একটু সাবধানে থেকো। আমাদের জন্যে চিন্তা কোরো না, আমরা মোটামুটি ভালোই আছি। পরীক্ষার মুখোমুখি তোমার কাছ থেকে আর-একটা চিঠি পাব আশা করি। ঐ চিঠি হবে আমার প্রেরণা। প্রণাম নাও।

স্নেহধন্য
কমল

শ্রীভূদেব বন্দ্যোপাধ্যায়
১২১ গল্ফ লিঙ্ক
নিউ দিল্লী-১০০ ০১২

সামাজিক পত্র

৩৪। সরস্বতী পূজার আমন্ত্রণপত্র

শ্রীশ্রীসরস্বত্যৈ নমঃ

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ২৩-এ মাঘ বৃহস্পতিবার, শ্রীপঞ্চমীতে আমরা আমাদের বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বাগ্‌দেবীর আরাধনা করব। আপনার সবান্ধব উপস্থিতিতে সার্থক হোক আমাদের বাণীবন্দনা।

বিনীত

বাহিরখণ্ড, হুগলী
১৮ই মাঘ, ১৩৯০

গিরীশ ইন্‌স্টিটিউশনের
ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

অনুষ্ঠানপঞ্জী

২৩-এ মাঘ (বৃহস্পতিবার) পূজারম্ভ : সকাল ৮টা। পুষ্পাঞ্জলিদান : ৯টা। প্রসাদ বিতরণ : ১১টা। সন্ধ্যা-আরতি : সন্ধ্যা ৭টা।

২৪-এ মাঘ (শুক্রবার) দধিকর্ম : সকাল ৯টা। শোভাযাত্রা বৈকাল ৫টা। প্রতিমানিরঞ্জন : সন্ধ্যা ৬টা।

৩৫। বিবাহের নিমন্ত্রণপত্র

অথবা, **আগামী মাসে তোমার দাদার বিবাহ। এই উপলক্ষে তুমি তোমার পিতার পক্ষ হইতে একটি নিমন্ত্রণ লিপির খসড়া প্রস্তুত কর।**

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

শ্রীশ্রীপ্রজাপতয়ে নমঃ

সবিনয় নিবেদন, (যথাবিহিত-সম্মানপুরঃসর-নিবেদনমেতৎ লেখাই ছিল সাবেক রীতি)

মহাশয়, আগামী ২৮-এ আষাঢ়, ১৩৯১ শুক্রবার (ইং ১৩-ই জুলাই, ১৯৮৪) আমার মধ্যমপুত্র কল্যাণীয় শ্রীমান মোহনের সহিত কুমারটুলি নিবাসী শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের কন্যা কল্যাণীয়া শ্রীমতী প্রণতির শুভ-পরিণয় সুসম্পন্ন হইবে।

তদুপলক্ষে আগামী ৩০-এ আষাঢ় (ইং ১৫ই জুলাই, ১৯৮৪), রবিবার সন্ধ্যায় আপনি সবান্ধবে এই প্রীতিভোজে যোগদান ও নবদম্পতিকে আশীর্বাদ করিয়া বাধিত করিবেন। পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি মার্জনীয়। ইতি—

২২।৩০ রাজা মণীন্দ্র রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

বিনীত
শ্রীহরিপদ ঘোষ

স্মারক-লিপি

বিবাহ-বাসর : ১৯ কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯
বিবাহলগ্ন : সন্ধ্যা ৭টা-৯টা
প্রীতিভোজ : ২২।৩০ রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০৭
পথ-নির্দেশ : বাস ৭৯বি, ৪৭, ৫০, ৩০ডি, ৩বি

ব্যবস্থা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অতিথি নিয়ন্ত্রণ আইনানুগ

৩৬। ঈদল্‌ফিত্‌র্‌ উৎসবে তোমার কোন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি পত্র লেখ। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

এলাহী ভরসা

১১-এ নাসিরুদ্দীন রোড
কলিকাতা-৭০০ ০১৭
২৯-৬-৮২

ভাই সুনীল,

আমাদের ঈদ-অল-ফিত্‌র্‌ উৎসব পড়ছে আগামী পরশু। জানিস নিশ্চয়, রমজান মাসের উপবাসান্তে আমরা এই উৎসব পালন করি। হিজরি সনের শওয়াল মাসের প্রথম দিন এই উৎসব পালিত হয়। ঐ দিন ভোরে আমরা সুসজ্জিত হয়ে মসজিদে বা ময়দানে সমবেত হই প্রার্থনার জন্যে। প্রার্থনায় যাবার আগে আমরা সাধারণত মিষ্টান্ন দিয়ে প্রাতরাশ করি। প্রার্থনার পর আমরা পরস্পরকে শুভেচ্ছা জানাই এবং উপহারও দিই। প্রত্যেক ঘরেই এইদিন সাধ্য অনুসারে সুখাদ্য প্রস্তুত করে। গরিবদের দান করা হয় এই দিনে। এই দানকে বলে ফিত্‌রা। এই উৎসবের নাম হয়েছে এই শব্দটি থেকে।

আমাদের এই দিনটি বড়ো আনন্দের। তোকে আমাদের মধ্যে পেলে আমার বাবা-মা-ও খুব খুশি হবেন। তুই আমাদের অনুষ্ঠানগুলো দেখবি, তোর নিশ্চয় ভালো লাগবে, নতুন অভিজ্ঞতাও হবে। আশা করি নিশ্চয় আসবি। ইতি—

তোর আলতাফ

সুনীল বিশ্বাস
১২৯।২১ এস. এন. রায় রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৩৮

৩৭। দুর্গোৎসবে তোমার কোনো বন্ধুকে নিমন্ত্রণ করিয়া একটি পত্র লেখ। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

কালশ্বর, দেহাটী
মেদিনীপুর
২৪-৭-৮৪

ভাই রাজীব,

শহরের পুজো তো অনেক দেখেছিস, এবারে আয় না আমাদের গ্রামে—গ্রামের পুজো দেখবি। চেহারাটা একেবারে আলাদা। কোনো কৃত্রিমতা নেই, সর্বত্র প্রাণের স্পন্দন। প্রতিমা তৈরি যেদিন থেকে শুরু হয় সেদিন থেকে উৎসবের শুরু। ছেলেমেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে প্রতিমা তৈরি দেখে, তাই নিয়ে আলোচনা করে, অধীর আগ্রহে পুজোর দিন গোণে। আমাদের বাড়ির পুজোটা এখন সার্বজনীন হয়ে উঠেছে। সাজো সাজো রব পড়ে যায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে দুর্গাপুজোর একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। দুর্গা তো আসলে ফসলেরই দেবী। 'মাঠে মাঠে

ধান ধরে নাকো আর'—এই পরিবেশেই 'ফসলের দেবী' কালক্রমে দশভূজায় পরিণত হয়েছেন। না, বক্তৃতা দিচ্ছি না, পণ্ডিতদের এ বক্তব্য আমার মনের সঙ্গে মেলে, তাই বললাম। আর যাত্রা। ও যাত্রা তুই দেখিস নি। গ্রামের খেটে-খাওয়া মানুষরাই এ যাত্রা করে দেবদেবীর পালা নিয়ে, এক আশ্চর্য সহজ আঙ্গিক।

লোভ দেখিয়ে লাভ নেই। তবু বলছি, রাজীব, একটু ভেবে দেখিস। ইস্, কী মজা হবে তুই যদি আসিস। বাড়ির সকলে খুব খুশি হবে। আয় আয় আয়।

ইতি—

তোর মনীশ

শ্রীরাজীব বসু
৬ উমাকান্ত সেন লেন
কলিকাতা-৭০০ ০৩০

ব্যবহারিক পত্র

৩৮। পুস্তক বিক্রেতার নিকট পত্র।

(বই পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া)

শ্রদ্ধেয় কর্মাধ্যক্ষ,
নাথ ব্রাদার্স,
৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

মহাশয়,

আমাদের উদয়ন ক্লাবের পাঠাগারের জন্য নিম্নলিখিত বইগুলি সত্বর ভি. পি. ডাকে পাঠাইবেন।

অনুগ্রহ করিয়া পাঠাগারকে দেয় কমিশন বাদ দিয়া ভি. পি. চার্জ করিবেন। নমস্কারান্তে ইতি—

২৮-এ জুন, ১৯৮৪
উদয়ন ক্লাব,
লোকনাথ, হুগলী

ভবদীয়
কনকবরণ দাশ
সম্পাদক, উদয়ন ক্লাব

প্রেরিতব্য পুস্তকের নাম—

১। সাহিত্যকোষ—ডঃ জিতেন্দ্রকুমার ঘোষ ও তরুণ সান্যাল
(পরিবেশক : মধুময়,
১০ শিবদাস ভাদুড়ী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৪)
২। বাংলা ভাষার আধুনিক তত্ত্ব ও ইতিকথা--ডঃ দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু (পুথিপত্র)
৩। Cricket : Vijay Merchant (National Book Trust)
৪। উপনিষদ পরিচয় ও শ্রুতিসংগ্রহ—ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক (ফার্মা কে. এল. এম.)

৩৯। পুস্তক প্রকাশকের নিকট পত্র।

(একটি বইয়ের পুনর্মুদ্রণের আবেদন)

শ্রদ্ধেয় কর্মাধ্যক্ষ,
বিশ্বভারতী মুদ্রণ বিভাগ,
১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০১

সবিনয় নিবেদন,

'বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ' সিরিজে অবনীন্দ্রনাথের 'বাংলার ব্রতকথা' বইটি বেশ কিছুদিন যাবৎ ছাপা নেই। বাঙালী পাঠকের কাছে এই বইটি পরম আদৃত। এত অল্প-পরিসরে বাংলা ব্রতের এমন প্রামাণ্য বই আর কী হতে পারে আমাদের জানা নেই। আমাদের সনির্বন্ধ অনুরোধ, এই বহুপঠিত বইটি যত শিগ্‌গির সম্ভব প্রকাশের ব্যবস্থা করুন। এতে সংস্কৃতিসেবী সকলেই আনন্দিত হবেন। ইতি—

২৮-এ জুন, ১৯৮৪ বিনীত
৫-বি ড্রাইভারটোলা, কাটিহার অসিত সেন

৪০। প্রধান শিক্ষকের নিকট ছুটির আবেদন।

বালিগঞ্জ জগদ্বন্ধু ইন্‌স্টিটিউশনের
মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয় সমীপেষু,

সশ্রদ্ধ নিবেদন,

আমি আপনার বিদ্যালয়ের একাদশ শ্রেণীর ছাত্র। আমার ভগিনীর বিবাহ উপলক্ষে আমাকে নানারূপ আনুষ্ঠানিক কর্মে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। এইজন্য ১১ই জুলাই হইতে ১৪ই জুলাই পর্যন্ত আমার পক্ষে বিদ্যালয়ে উপস্থিত হওয়া সম্ভব হইতেছে না।

অনুগ্রহ করিয়া উক্ত চারি দিবস অনুপস্থিতির জন্য ছুটি মঞ্জুর করিবেন ইহাই প্রার্থনা।

৪. ৭. ৮৪ বিনীত
৩১/১ গলফ ক্লাব রোড, প্রমিতকুমার ঘোষ
কলিকাতা-৭০০ ০৩৩ একাদশ শ্রেণী

৪১। বিদ্যালয়ের লাইব্রেরির বার্ষিক অনুষ্ঠানের একটি আমন্ত্রণ-লিপি রচনা কর। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ২৯-এ জুলাই, রবিবার বেলা ৪ ঘটিকায় আমাদের বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারটির প্রতিষ্ঠা-দিবস-উৎসব অনুষ্ঠিত হবে। এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য কববেন রবীন্দ্রভারতী বিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই উপলক্ষে আমরা একটি গ্রন্থপ্রদর্শনীর আয়োজন করেছি। ডঃ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করবেন।

এই অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি একান্তভাবে কামনা করি। ইতি—

বিনীত

২০. ৭. ৮৪ কামরাবাদ হাইস্কুলের ছাত্রবৃন্দ

৪২। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়ের কর্ম হইতে অবসর-গ্রহণ উপলক্ষে একখানি বিদায় সংবর্ধনা পত্র রচনা কর। [উঃ মাঃ, '৭৯]

শ্রদ্ধেয় !

আজ আপনাকে বিদায়-অভিনন্দন জানাতে এসে আমাদের মন ভারাক্রান্ত। এ বিদ্যালয়ের সঙ্গে আপনার সম্পর্ক দীর্ঘদিনের, এ বিদ্যালয়ই ছিল আপনার ধ্যান ও জ্ঞান। এই বিদ্যালয়ের কাছ থেকে বিদায়-গ্রহণে আপনার মনের অবস্থা কেমন তা আমরা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করছি।

আমাদের কাছে আপনি কতখানি তা সম্মুখে দাঁড়িয়ে বলবার বিষয় নয়, অন্তরে উপলব্ধির বিষয়। কোনো বিশেষণ-প্রয়োগে বা অলঙ্কৃত ভাষায় তা প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। কারণ, আমাদের সম্পর্কটা ছিল ভালোবাসা আর আন্তরিকতার।

বহুবিষয়ে আপনার যে মনীষা তার পরিচয় আমরা পাঠগ্রহণের সময়েই পেয়েছি, কিন্তু সেই মনীষারা ঊর্ধ্বে যে 'মন' তার স্পর্শে আমরা হয়েছি বিমুগ্ধ। আপনি আমাদের অন্তরের একজন।

বিদ্যালয়ের জীবনে আপনি ছিলেন প্রধান কিন্তু আপনার এই প্রাধান্য কখনও জানান দিয়ে চলে নি। ছাত্র, শিক্ষক, কর্মী—সকলের কাছেই আপনি ছিলেন অন্তরঙ্গ, অতি আপনজন। আপনার মধুর ব্যক্তিত্ব সর্বত্র শৃঙ্খলা এনেছে, কাউকে শৃঙ্খল পরায় নি—একথা আমরা অনেক সময়ে নিজেদের মধ্যে বলাবলি করেছি।

বিদ্যালয়ের যথার্থ সেবক ছিলেন আপনি, তাই সেবার আদর্শ আপনি প্রতিষ্ঠিত করে যেতে পারছেন।

আমরা আপনার আচার্য-মূর্তি কখনই ভুলব না। যথার্থ শিক্ষক-যে নিত্যবিদ্যার্থী, আপনাকে দেখেই এ উপলব্ধি আমাদের হয়েছে। বিদায় নয়, আপনাকে চির-স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের সকলের অন্তরে।

বিনীত

বক্সীরহাট হাই স্কুলের ছাত্রবৃন্দ

৪৩। প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলার আমন্ত্রণ জানাইয়া চিঠি।

সম্পাদক,

চণ্ডী মেমোরিয়াল ফুটবল ক্লাব,

হরিশ্চন্দ্রপুর, মালদহ

সবিনয় নিবেদন,

আমি আমাদের ফুটবল ক্লাবের তরফ থেকে আপনাদের ক্লাবকে আগামী ৪ঠা আগস্ট একটি প্রীতি ফুটবল ম্যাচ খেলবার সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

আশা করি আপনি আমাদের এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। তারিখ সম্বন্ধে আপনাদের কোন অসুবিধা থাকলে অবশ্যই জানাবেন, আমরা তদনুযায়ী তারিখ পরিবর্তন করব। যদি বৃষ্টি-বাদলের জন্যে আপনাদের রাত্রিটা আমাদের গ্রামেই থেকে যেতে হয়, তাতেও কোন অসুবিধা হবে না। আপনাদের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে আমরা সব রকম ব্যবস্থা করব।

আপনার সম্মতিসূচক প্রত্যুত্তরের অপেক্ষায় রইলাম। ইতি—

ভবদীয়

৩০. ৬. ৮৪ অতনু মিত্র

ভালুকা রোড, মালদহ সম্পাদক, অলস্টার ক্লাব

ক. চাকুরির আবেদনপত্র

৪৪। বিজ্ঞাপন: কোন প্রতিষ্ঠানে [বক্স নং ১২৭৪ ; যুগান্তর পত্রিকা, কলিকাতা] একজন হিসাবরক্ষক প্রয়োজন। শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা, বয়স এবং ন্যূনতম বেতন ইত্যাদি জানিয়ে একটি আবেদনপত্র লেখ।

ডি-১০১ রামগড়,
কলিকাতা-৭০০ ০৪৭
৭. ৭. ৮৪

বিজ্ঞাপনদাতা,
বক্স নং ১২৭৪,
যুগান্তর পত্রিকা,
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

সবিনয় নিবেদন,

গত ৩০-এ মে, ১৯৮৪ তারিখে রবিবারের যুগান্তরে প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারলাম আপনাদের প্রতিষ্ঠানে একজন হিসাবরক্ষক প্রয়োজন। আমি উক্ত পদের জন্য আবেদন করছি।

১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে আমি উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বাণিজ্য-বিজ্ঞান শাখায় দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে উচ্চশিক্ষার আশা ত্যাগ করে গত জানুয়ারি মাস থেকে কলিকাতা কলেজ স্ট্রীটের (১১ নং সূর্য সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-১২) বুক ফোরাম নামে এক প্রকাশকের অধীনে অস্থায়ী হিসাবরক্ষকের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। যদিও দু'মাসের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাই আমার মূলধন তবু সুযোগ পেলে যে-কোন প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষকের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতে পারব বলে বিশ্বাস রাখি।

বর্তমানে আমার বয়স উনিশ বছর এক মাস। আমি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। কঠোর পরিশ্রম করে উন্নতি করাই আমার জীবনের ব্রত। এই পদের জন্যে আমার ন্যূনতম প্রত্যাশা পাঁচ-শ টাকা।

এই সঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষার অভিজ্ঞান-পত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি ও প্রশংসাপত্রের অনুলিপি পাঠাচ্ছি। অনুগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিলে বাধিত হব।

নমস্কারান্তে ইতি—

নিবেদক
শ্রীসত্যচরণ বক্সী

৪৫। একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানে কতিপয় শিক্ষানবীশ লওয়া হইবে। উক্ত পদের জন্য তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া একটি আবেদনপত্র রচনা কর।

[উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৮]

অথবা, **কোন সরকারী প্রতিষ্ঠানে কয়েকজন অস্থায়ী কর্মচারী নেওয়া হবে। জনৈক শিক্ষিত বেকার যুবক পদপ্রার্থীরূপে যে আবেদন-পত্র লিখবে তার নমুনা দাও।** [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

৩৯বি উপেন্দ্র ব্যানার্জী রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৫৪
১।৭।৮৪

মুখ্য সচিব
তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-৭০০ ০০১

সবিনয় নিবেদন,

গত ২৪।৬।৮৪ তারিখের আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারলাম যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের জন্য কয়েকজন করণিক প্রয়োজন। তদানুযায়ী আমি জনৈক প্রার্থীরূপে আমার আবেদন-পত্র পেশ করছি।

১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে আমি কলিকাতার পাঠভবন স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বাণিজ্য-বিজ্ঞান শাখায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েছি। আর্থিক অসচ্ছলতার জন্যে উচ্চশিক্ষার আশা ত্যাগ করে গত ২।১।৮৪ তারিখ থেকে ২।৫।৮৪ পর্যন্ত কলিকাতার দি নিউ বুক স্টল নামে এক প্রকাশকের অধীনে অস্থায়ী করণিকের কাজে নিযুক্ত ছিলাম। যদিও মাত্র চার মাসের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতাই আমার মূলধন, তবু সুযোগ পেলে নিষ্ঠার সঙ্গে আমার দায়িত্ব পালন করতে পারব বলে বিশ্বাস রাখি।

বর্তমানে আমার বয়স কুড়ি বছর তিন মাস। আমি অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী। কঠোর পরিশ্রম করে উন্নতি করাই আমার জীবনের ব্রত।

আমি এখন কর্মহীন। এবং আমার কর্মবিনিময় কেন্দ্রের নিবন্ধকরণ সংখ্যা হল খ/২০৩৮।

এই আবেদনপত্রের সঙ্গে একটি অভিজ্ঞানপত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি এবং দুটি প্রশংসাপত্রের অনুলিপি পাঠাচ্ছি।

অনুগ্রহ করে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিলে বাধিত হব। নমস্কারান্তে। ইতি—

নিবেদক

তরুণ বসু

১। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার অভিজ্ঞানপত্রের প্রত্যয়িত অনুলিপি।

২। পাঠভবন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকার প্রশংসাপত্র।

৩। দি নিউ বুক স্টলের কর্মকর্তার প্রশংসাপত্র।

৪৬। ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের কাছে যোগ্যতার উল্লেখসহ চাকুরীর জন্য আবেদনপত্র। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

কর্মাধ্যক্ষ,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া, (প্রধান শাখা),
১ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-৭০০ ০০১

মহাশয়,

গত ৫ই মে, ১৯৮৪ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জানতে পারলাম যে, আপনারা কিছুসংখ্যক করণিক নিয়োগ করবেন। আমি উক্ত পদের অন্যতম প্রার্থী হতে ইচ্ছুক। প্রার্থী হিসাবে আমার যোগ্যতাবলী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্যাদি আপনার সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনার জন্য নীচে প্রদত্ত হল।

১। নাম: অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

২। ঠিকানা: বৈদ্যপাড়া, সোনারপুর, ২৪ পরগণা।

৩। বয়স: ১৮ বছর ৩ মাস

৪। শিক্ষাগত যোগ্যতাবলী: (ক) ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা-পর্ষদের অধীন মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হই।
(খ) বর্তমানে কলিকাতার একটি সুখ্যাত বিদ্যালয়ের দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র।

৫। সহ-পাঠ্যক্রমিক যোগ্যতাবলী: (ক) কলিকাতার প্রথম বিভাগের একটি দলের নিয়মিত খেলোয়াড়।
(খ) বিদ্যালয়ের ফুটবল ও ক্রিকেট দলের নিয়মিত খেলোয়াড়।

৬। অভিজ্ঞতা: (গ) কর্মজীবনের কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই।

আশা করি, আমার আবেদনপত্র সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

বৈদ্যপাড়া, ধন্যবাদান্তে,
পোঃ সোনারপুর, জেলা ২৪-পরগণা ভবদীয়
৬ই মে, ১৯৮৪ অনিন্দ্য ভট্টাচার্য

৪৭। সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপন দেখে শিক্ষক-পদের জন্য দরখাস্ত।

[নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

সম্পাদক,
খিদিরপুর একাডেমি,
৩৫ রামকমল স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০২৬

মহাশয়,

গত ৭ই এপ্রিল, '৮৪ তারিখে আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন থেকে জ্ঞাত হলাম যে, আপনাদের বিদ্যালয়ে ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যের একজন শিক্ষক নিয়োগ করা হবে।

আমি উক্ত পদের অন্যতম প্রার্থী হিসাবে বিবেচিত হওয়ার আশায় আমার সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য নীচে সন্নিবিষ্ট করলাম:

(১) নাম: ধীমান চৌধুরী
(২) ঠিকানা: ৭ মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৭
(৩) বয়স: ২১ বছর
(৪) শিক্ষাগত যোগ্যতাবলী:
  (ক) ১৯৭৮ খ্রীস্টাব্দে মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ।
  (খ) ১৯৮০ খ্রীস্টাব্দে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ।
  (গ) ১৯৮৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজিতে অনার্স সহ স্নাতক।
(৫) সহ-পাঠ্যক্রমিক যোগ্যতাবলী: রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিশ্বভারতী-কর্তৃক অনুমোদিত একটি সঙ্গীত-প্রতিষ্ঠানের ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত।
(৬) অভিজ্ঞতা: কলকাতার একটি বিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষার সহকারী শিক্ষক হিসাবে গত ছ'মাস যাবৎ কর্মরত।

আশা করি, আমার আবেদনপত্র সহানুভূতিপূর্ণ বিবেচনা লাভ করবে।

মনোহরপুকুর রোড, ধন্যবাদান্তে
কলিকাতা-৭০০ ০২৭ ভবদীয়
৯ই এপ্রিল, ১৯৮৪ ধীমান চৌধুরী

খ. স্কুল বা কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট পত্র

৪৮। তোমার স্কুলে/কলেজে খেলাধুলা, লাইব্রেরি, পাঠকক্ষ ইত্যাদির সুবন্দোবস্তের অনুরোধ জানিয়ে প্রধান শিক্ষক/অধ্যক্ষের কাছে একটি আবেদনপত্র লেখ। [পশ্চিমবঙ্গ উ. মা., ১৯৮০]

মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয়,
গিরীশ ইন্‌স্টিটিউশন,
বাহিরখণ্ড, হুগলী

পরমশ্রদ্ধাস্পদেষু,

আমাদের স্কুলের খেলাধুলা, লাইব্রেরি ইত্যাদি কয়েকটি বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে আমাদের এই আবেদনপত্র।

খেলাধুলায় বিশেষ করে ক্রিকেট ও ফুটবলে আমরা বিভিন্ন অন্তর্বিদ্যালয় প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে থাকি, কিন্তু এর জন্যে যে-অনুশীলনের প্রয়োজন তার অবকাশ বর্তমানে বিদ্যালয়ে নেই। বিশেষ করে ক্রিকেট অনুশীলনের জন্যে প্রয়োজনীয় উপকরণের বড়োই অভাব। একটা টেব্‌ল্ টেনিস বোর্ডের কথাও আমরা অনেকদিন থেকে বলে আসছি।

লাইব্রেরিতে রেফারেন্স বইয়ের সংখ্যা খুবই কম। তার ফলে আমাদের ভালো উত্তর তৈরি করার খুব অসুবিধা হচ্ছে। লাইব্রেরির ঘরটি খুব ছোটো। আলাদা পড়ার ঘরের খুব দরকার। শুনেছি বছর দশেক আগে আমাদের ক্লাস-লাইব্রেরি ছিল। ঐ ব্যবস্থা যদি চালু করা সম্ভবপর হত তাহলে আমরা খুবই উপকৃত হতাম।

আর একটি কথা, গরমের দিনে আমরা জলপিপাসায় বড়ো কষ্ট পাই। জলের আধার আরও কিছু বাড়ালে ভালো হয়। আর-একটা টিউবওয়েল বসানো সম্ভবপর কিনা সেটাও আপনাকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

বিদ্যালয়কে আমরা ভালোবাসি, বিদ্যালয় আমাদের প্রাণ। এই বিদ্যালয়ের উন্নয়ন বা উৎকর্ষ সাধনে যে-কোনো প্রচেষ্টায় আমরা প্রাণপণ সহযোগিতা করব।

২. ৭. ৮৪ বিনীত
গিরীশ ইন্‌স্টিটিউশনের ছাত্রছাত্রীবৃন্দ

৪৯। তোমার কলেজ লাইব্রেরির উন্নতির জন্য তোমার নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা জানিয়ে অধ্যক্ষের কাছে আবেদন কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,
আনন্দমোহন কলেজ,
১০২ রামমোহন সরণি,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

মাননীয় মহাশয়,

আমাদের কলেজ-গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্যে আমি একটি পরিকল্পনা তৈরি করেছি। বিশ্বাস করি এই পরিকল্পনা কার্যকর হলে ছাত্রবন্ধুরা উপকৃত হবে।

প্রথমেই বলি, আমাদের নৈশ কলেজে গ্রন্থাগার-ব্যবহারের সময়সীমা অত্যন্ত সীমিত। ছাত্রদের স্বার্থে সময়সীমাকে চার ঘণ্টা থেকে বাড়িয়ে ছয় ঘণ্টা করা দরকার।

আমাদের গ্রন্থাগারের গ্রন্থের তালিকা অর্থাৎ ক্যাটালগ্ দু'টি মাত্র খাতায় লেখা আছে। ফলে একত্রে দু'জনের বেশি ছাত্র ক্যাটালগ্ দেখার সুযোগ পায় না। আমাদের কার্ড ক্যাটালগ তৈরি করা দরকার, এবং ছাত্ররা যাতে বুঝতে পারে এমনভাবে তা সাজিয়ে রাখতে হবে।

বইয়ের সঙ্গে ছাত্রদের সরাসরি পরিচয় করিয়ে দিলেই ভাল হয়। সেই কারণে বইগুলি আলমারিতে তালাবন্ধ না রেখে 'ওপেন অ্যাক্সেস' অর্থাৎ ছাত্ররা যাতে বই নিজের হাতে বেছে নিতে পারে সে ব্যবস্থা করা দরকার।

এর পর চাই প্রয়োজনীয় আলো এবং বসে বই পড়ার ব্যবস্থা। পুরনো নড়বড়ে টেবিল বেঞ্চ সরিয়ে নতুন চেয়ার-টেবিলের ব্যবস্থা করা দরকার। তার সঙ্গে চাই গ্রন্থাগারের জন্যে ফুলটাইম স্টাফ্। সারাদিন অন্য কোথাও চাকরি করে যারা ক্লান্ত তাদের দিয়ে আর যাই হোক, গ্রন্থাগারের কাজ চলে না। বইয়ের রিকুইজিশন স্লিপগুলি একদিন আগে জমা দেবার ব্যবস্থা করতে পারলে ভালো হয়। কারণ, তাহলে একটা বই পেতে ছাত্রদের ঘণ্টাখানেক সময় ব্যয় করতে হয় না। গ্রন্থাগার-কর্মী আগে থেকেই স্লিপ দেখে বই বেছে ছাত্রদের সময় বাঁচাতে পারেন।

সবশেষে বলব, প্রত্যেক দিন অন্তত একজন করে অধ্যাপক যদি কিছু সময় গ্রন্থাগারে এসে বসেন এবং ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন গ্রন্থের পরিচয় করিয়ে দেন তাহলে ছাত্রদের বই পড়ার প্রবণতাও বেশ বাড়তে পারে। ইতি—

২৬. ৬. ৮৪

আপনার একান্ত অনুগত
প্রথম বর্ষ কলাবিভাগের ছাত্র
অমিতাভ দত্ত

গ. সরকারী দপ্তরে চিঠি

৫০। পল্লীকে পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন রাখিবার অভিপ্রায়ে একটি আবেদনপত্র রচনা কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

মাননীয় চেয়ারম্যান,
গারুলিয়া মিউনিসিপ্যালিটি,
গারুলিয়া, ২৪-পরগণা

সবিনয় নিবেদন,

আমি নোয়াপাড়া বাই লেনের বাসিন্দা। আমাদের এলাকায় রাস্তাঘাটের বড়োই দুরবস্থা। তবু যা আছে তাও অপরিচ্ছন্ন হয়ে পড়ে থাকে, নিয়মিত পরিষ্করণের ব্যবস্থা নেই। অনেক সময়ে টালিগঞ্জ খাল থেকে তোলা আবর্জনা খালের দু'পাশে জমে থাকে এবং দুর্গন্ধ ছড়ায়। সমস্ত আবহাওয়া এইভাবে দূষিত হয়।

আমি এ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আশা করি আপনি শিগ্‌গিরই পরিদর্শক পাঠিয়ে এই এলাকার অবস্থা অবগত হয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করবেন। নমস্কারান্তে

বিনীত

১২. ৭. ৮২

মৌসুমী ঘোষ

আনন্দময়ী কুটির

নোয়াপাড়া বাই লেন, ২৪-পরগণা

৫১। গ্রামের উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প প্রস্তুত করিয়া পঞ্চায়েত প্রধানের নিকট উপস্থাপিত কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

মাননীয় পঞ্চায়েত-প্রধান,

গ্রাম বিষ্ণুপুর, ২৪-পরগণা

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সহিত আমাদের গ্রামের কয়েকজন কিছুদিন পূর্বে সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। আমাদের গ্রামের উন্নয়নই ছিল আমাদের আলোচ্য বিষয়। আপনি বলিয়াছিলেন আমাদের পরিকল্পনাগুলি লিখিতভাবে পেশ করিতে। অদ্য আমাদের পরিকল্পনার একটি খসড়া আপনার নিকট উপস্থাপিত করিতেছি।

(১) আমাদের গ্রামে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নিতান্ত প্রয়োজন। ইহার অভাবের জন্য গ্রামের বালক-বালিকাদিগকে বহুদূরে পলাশপুরে যাইতে হয়। আমাদের বারোয়ারী-তলায় এই স্কুল স্থাপন করা যাইতে পারে। এই অঞ্চলের জমি যাঁহার, তাঁহার সহিত আমরা প্রাথমিক কথাবার্তা বলিয়াছি। মনে হইতেছে তিনি সুলভে জমি বিক্রয় করিতে পারেন।

(২) একটি পাঠাগারও এই অঞ্চলে দরকার। পাঠাগারের প্রয়োজনের কথা আপনি নিজেও বলিয়াছিলেন। প্রথমদিকে আমরা বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়া কিছু বই দান হিসাবে সংগ্রহ করিতে পারি। সরকারও নিশ্চয় কিছু অনুদান দিবেন।

(৩) গ্রীষ্মের জলকষ্ট নিবারণের জন্য গভীর নলকূপের পরিকল্পনা পূর্বেই গৃহীত হইয়াছে। এ ব্যাপারটিকে আরও ত্বরান্বিত করা দরকার।

(৪) স্টেশনে যাইবার পথটি এখনও কাঁচা। বর্ষায় এই পথে চলা খুব কঠিন হইয়া দাঁড়ায়। এই পথটিকে পাকা করা নিতান্ত দরকার।

(৫) গ্রামে সমবায় পদ্ধতিতে কুটিরশিল্প-প্রকল্প প্রচলিত হউক। ইহার জন্য ঋণদানের ব্যবস্থাও চালু হউক।

(৬) নারায়ণপুরের মাঠটিতে খেলাধুলা চলিতেছে বটে, কিন্তু উহার সংস্কার দরকার।

(৭) গ্রামে কোন চিকিৎসাকেন্দ্র নাই। একটি গৃহ বহু পূর্বে এজন্য নির্মিত হইতেছিল, কিন্তু কাজটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। উক্ত গৃহটিকে সম্পূর্ণ করিয়া যতশীঘ্র সম্ভব একটি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপন করা একান্ত দরকার। গ্রামোন্নয়নের বিভিন্ন প্রকল্প ইতিমধ্যেই গৃহীত হইয়াছে। বিভিন্ন কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার আমরা শীঘ্রই

করিতে পারিব আশা করি। উপরে কয়েকটি পরিকল্পনা উল্লিখিত হইল। আশা করি এইগুলির রূপায়ণে আপনারা নিশ্চয় সচেষ্ট হইবেন।

বিনীত

বিষ্ণুপুর

২. ৭. ৮৩

অধীরকুমার পাল

বিষ্ণুপুর গ্রামবাসীর পক্ষে

৫২। গ্রামে একটি ডাকঘর স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিষয় উল্লেখ করে ডাকঘরের কর্তৃপক্ষের নিকট একটি আবেদনপত্র রচনা কর।

[উঃ মাঃ পরীক্ষা, ১৯৭৯]

মাননীয় পোস্টমাস্টার জেনারেল,
কলিকাতা-৭০০ ০০১

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের গ্রামের নাম হরিদাসপুর। হুগলী জেলার লোকনাথ স্টেশন হতে মাইল দুই ভিতরে। আমাদের গ্রামে কোন ডাকঘর নেই। ডাকটিকিট বা খাম পোস্টকার্ড কিনতে, চিঠিপত্র পোস্ট করতে, বা মনিঅর্ডার করতে আমাদের দেড় মাইল পথ পাড়ি দিতে হয়, অথচ আমাদের গ্রাম বর্ধিষ্ণু, এখানে বহু লোকের বাস। দীর্ঘ দিন ধরে এই গ্রামে একটি ডাকঘরের প্রয়োজন অনুভূত হচ্ছে।

আধুনিক কর্মব্যস্ত নগরজীবনের সঙ্গে পল্লীজীবনের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ করে তুলতে ডাকঘরের ভূমিকা যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা বলাই বাহুল্য।

আপনার নিকট আমাদের মিলিত অনুরোধ, যত শীঘ্র সম্ভব এই গ্রামে একটি ডাকঘর-স্থাপনের ব্যবস্থা করে দিন। ইতি—

বিনীত

অপূর্বকুমার মজুমদার

(গ্রামবাসীদের পক্ষে)

৫৩। তুমি লক্ষ্ণৌ যাবার জন্যে ২৫ দিন পূর্বে টিকিট কেটেছিলে, কিন্তু অনিবার্য কারণে যাত্রা স্থগিত রাখতে হল। এরূপ অবস্থায় টিকিটের মূল্য ফেরত পাবার জন্যে রেলকর্তৃপক্ষের কাছে একটি পত্র লেখ।

[নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

৭/১/১ নফর কুণ্ডু রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০২৬

মুখ্য অধীক্ষক,
পূর্ব রেলপথ,
৩ কয়লাঘাট স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০১

বিষয়ঃ টিকিটের মূল্য ফেরত

সবিনয় নিবেদন,

আমি গত ১।৬।৮৪ তারিখে আপনাদের এসপ্ল্যানেড টিকিট ঘর থেকে লক্ষ্ণৌ যাবার একটি টিকিট ক্রয় করেছিলাম। আজ ২৫।৬।৮৪ তারিখ আমার হাওড়া থেকে

৯নং আপ দুন্ এক্সপ্রেসে লক্ষ্ণৌ যাবার কথা ছিল। কিন্তু আজ দুপুরের ডাকেই এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের একটি চিঠি পেয়ে জানতে পারলাম যে, আগামী কাল বেলা ১২টার সময়ে ন্যাশনাল লাইব্রেরির রেফারেন্স এ্যাসিস্ট্যাণ্ট পদের জন্য আমাকে গ্রন্থাগারে ইণ্টারভিউ দিতে হবে। সেই কারণে আমার লক্ষ্ণৌ-যাত্রা স্থগিত রাখতে হল।

মহাশয়ের কাছে অনুরোধ, এই অনিচ্ছাকৃত লক্ষ্ণৌ-যাত্রা বাতিলের কারণ বিবেচনায় আমার টিকিটের মূল্য ফেরত দেবার ব্যবস্থা করে বাধিত করবেন। ইতি—

নমস্কারান্তে

ক্রোড়পত্র : নিবেদক

টিকিট নম্বর : সি/এম ৩১০৫ অনিন্দিতা চক্রবর্তী

৫৪। রেলের টিকিট-পরীক্ষকের দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে রেল-কর্তৃপক্ষকে একটি পত্র লেখ। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

পত্রসংখ্যা : ক/৭১৬/৭৯

২১/১ গড়িয়াহাট রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০২৯

মুখ্য প্রশাসনিক অধিকর্তা,
পূর্ব রেলপথ,
৩ কয়লাঘাট স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০১

বিষয় : অভিযোগপত্র

সবিনয় নিবেদন,

গত ৬ই জুন, ১৯৮৪ তারিখে আমি এবং আমার ছোটো দু'ভাই আপার ইণ্ডিয়া এক্সপ্রেসে বোলপুর থেকে কলকাতায় আসি। এই যাত্রাপথে আমরা এক রেলের টিকিট-পরীক্ষকের যে-ব্যবহার প্রত্যক্ষ করেছি তা কর্তৃপক্ষকে না জানিয়ে পারছি না। এই চেকার ভদ্রলোক বর্ধমান স্টেশনে আমাদের কামরায় ওঠেন এবং টিকিট চেক করতে থাকেন। আমরা তিন ভাই জানালার ধারে বসেছিলাম তাই আমাদের টিকিট দেখবার পালা এল সবার শেষে। তার আগে এক অপ্রিয় ঘটনা ঘটল। আমাদের কামরায় এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ছিলেন বিনা-টিকিটের যাত্রী। টিকিট-পরীক্ষক তাঁর কাছে টিকিট না পেয়ে দুটি টাকা দাবি করেন। বলেন, গোটা দুই টাকা পেলে তিনি তাঁকে শেয়ালদা স্টেশন পার করে দেবেন। সোজা কথায়, চেকার ঘুষ চাইলেন। চোখের সামনে এই দুর্নীতি দেখে আমি প্রতিবাদ না করে থাকতে পারি নি। ফলে আমি পড়লাম তাঁর বিষনজরে। চেকার বললেন, "আপনাদের টিকিট ?"

দেখালাম। আমার ছোট দু'ভাইয়ের হাফ-টিকিট দেখে ভদ্রলোক চোখ কপালে তুলে বললেন, এতবড়ো ছেলেদের হাফ টিকিট করেছেন কেন ? ফাইন লাগবে।

বললাম, ওদের কারো বয়সই এগারো বছরের বেশি নয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা। কী একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই বললেন, এখানে নামতে হবে। ফাইন না দিলে আপনাদের পুলিশে দেব।

এখানে বলে রাখি, আমাদের বিতর্কের মধ্যেই সেই বৃদ্ধ লোকটি চেকারের হাতে ছুটি টাকা তুলে দেন। যা তাঁর শেয়ালদা যাবার ঘুষ। কামরার অন্য যাত্রীরা দেখলাম এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামালেন না। কারণ, এসব ব্যাপার দেখতে তাঁরা অভ্যস্ত।

যাক্, শেষ অবধি ছু'জন যাত্রীর প্রবল প্রতিরোধে চেকার ভদ্রলোকের শেষ ইচ্ছা সফল হয় নি। অর্থাৎ আমাদের নামিয়ে সঙ্গে নিতে পারেন নি।

আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, এই ব্যাপারের তদন্ত হোক এবং এ রকম ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটতে পারে তার জন্যেও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হোক। এই ঘটনার সাক্ষী হিসাবে ছু'জন প্রত্যক্ষদর্শী সহযাত্রীর নাম ও ঠিকানা দিলাম। নমস্কারান্তে ইতি—

নিবেদক
শঙ্করপ্রসাদ দত্ত

সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানা :

(১) সুধীর দত্ত
১৮বি গোপাল বসু লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯

(২) প্রণবকুমার সাহা
মধ্যমগ্রাম, উত্তরায়ণ,
২৪-পরগণা

৫৫। ভেজাল ওষুধ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি লেখ।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়,
স্বাস্থ্যদপ্তর,
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-৭০০ ০০১

সবিনয় নিবেদন,

একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভেজাল ওষুধ খেয়ে বিপত্তির নানা সংবাদ সংবাদপত্রে দেখে আমরা খুবই বিচলিত বোধ করছি। রুগ্‌ণ-ভগ্ন মানুষেরা মুনাফাবাজদের শিকার হবে এ ভাবাই যায় না। ওষুধে যারা ভেজাল দেয় তারা সমস্ত মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। কঠোর হাতে তাদের দমন করা উচিত। এ বিষয়ে আপনি এবং আপনার দপ্তর নিশ্চয় সজাগ আছেন। তবু বলছি কার্যকর এমন কিছু ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করুন যাতে জনসাধারণ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে। ওষুধে ভেজাল প্রতিরোধে সরকারী যে-কোন ব্যবস্থার সঙ্গে জনসাধারণ সহযোগিতা করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৫এ ওল্ড মেয়র কোর্ট
কলিকাতা-৭০০ ০০৫

বিনীত
সুধীরচন্দ্র প্রামাণিক

৫৬। গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জল, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সমস্যার কথা জানিয়ে পঞ্চায়েত-প্রধানের কাছে একটি আবেদনপত্র রচনা কর। [উঃ মাঃ ১৯৮১]

মাননীয় পঞ্চায়েত-প্রধান মহাশয়
নারায়ণপুর অঞ্চল, জিলা : হুগলী

মহাশয়,

আমি নারায়ণপুর অঞ্চলের অন্তর্গত তুল্যা গ্রামের একজন অধিবাসী। আমাদের গ্রামের কয়েকটি সমস্যার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এই পত্রের অবতারণা করছি।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আমাদের গ্রামের প্রধান সড়কটি কাঁচা। বর্ষাকালে এই রাস্তাটি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। গাড়িঘোড়া দূরের কথা, মানুষ চলবার পক্ষেও অতীব দুর্গম হয়ে পড়ে। রাস্তায় অসংখ্য খানা-খন্দ। অতএব এই রাস্তাটির আশু সংস্কারবিধান অত্যন্ত জরুরী।

দ্বিতীয়ত, আমাদের গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত। টিউবওয়েল কয়েকটি আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই বিকল। বিশেষত, গ্রীষ্মকালে গ্রামে প্রচণ্ড জলকষ্ট দেখা দেয়। এমন কি প্রাইমারি বিদ্যালয়ের কাছে যে-টিউবওয়েলটি ছিল তা-ও বর্তমানে ভগ্ন। বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের প্রায় অর্ধ মাইল দূরে জঙ্গলপাড়ায় গিয়ে জল খেয়ে আসতে হয়। এমতাবস্থায় টিউবওয়েলগুলির সংস্কার এবং কোথাও কোথাও নতুন টিউবওয়েল স্থাপন করা একান্ত দরকার।

তৃতীয়ত, গ্রামের কাছাকাছি কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। ফলে এতদঞ্চলের অধিবাসীদের প্রয়োজনে হরিপাল কিংবা বালিগড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হয়। এ-বিষয়েও কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন। আশা করি, এই আবেদনপত্রটি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

তুল্যা — বিনীত
৩০-এ চৈত্র, ১৩৯০ — নেপালচন্দ্র সাঁতরা

ছ. পত্রিকার সম্পাদকের নিকট চিঠি

৫৭। বাংলা পল্লী-অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন জলসমস্যা সম্পর্কে দৈনিক-পত্রিকায় একটি চিঠি লেখ। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

গ্রাম : কলোড়
পোঃ সেকেন্দারী
জেলা : মেদিনীপুর

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০১

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের বহুল-প্রচারিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমি মেদিনীপুর জেলার

বললাম, ওদের কারো বয়সই এগারো বছরের বেশি নয়। কিন্তু কে শোনে কার কথা। কী একটা স্টেশনে গাড়ি দাঁড়াতেই বললেন, এখানে নামতে হবে। ফাইন না দিলে আপনাদের পুলিশে দেব।

এখানে বলে রাখি, আমাদের বিতর্কের মধ্যেই সেই বৃদ্ধ লোকটি চেকারের হাতে দুটি টাকা তুলে দেন। যা তাঁর শেয়ালদা যাবার ঘুষ। কামরার অন্য যাত্রীরা দেখলাম এ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামালেন না। কারণ, এসব ব্যাপার দেখতে তাঁরা অভ্যস্ত।

যাক্, শেষ অবধি দু'জন যাত্রীর প্রবল প্রতিরোধে চেকার ভদ্রলোকের শেষ ইচ্ছা সফল হয় নি। অর্থাৎ আমাদের নামিয়ে সঙ্গে নিতে পারেন নি।

আপনার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ, এই ব্যাপারের তদন্ত হোক এবং এ রকম ঘটনা যাতে ভবিষ্যতে আর না ঘটতে পারে তার জন্যেও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গৃহীত হোক। এই ঘটনার সাক্ষী হিসাবে দু'জন প্রত্যক্ষদর্শী সহযাত্রীর নাম ও ঠিকানা দিলাম। নমস্কারান্তে ইতি—

নিবেদক
শঙ্করপ্রসাদ দত্ত

সাক্ষীদের নাম ও ঠিকানা :

(১) সুধীর দত্ত	(২) প্রণবকুমার সাহা
১৮বি গোপাল বসু লেন,	মধ্যমগ্রাম, উত্তরায়ণ,
কলিকাতা-৭০০ ০০৯	২৪-পরগণা

৫৫। ভেজাল ওষুধ সম্বন্ধে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর কাছে একটি চিঠি লেখ।

মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়,
স্বাস্থ্যদপ্তর,
রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-৭০০ ০০১

সবিনয় নিবেদন,

একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

ভেজাল ওষুধ খেয়ে বিপত্তির নানা সংবাদ সংবাদপত্রে দেখে আমরা খুবই বিচলিত বোধ করছি। রুগ্ণ-ভগ্ন মানুষেরা মুনাফাবাজদের শিকার হবে এ ভাবাই যায় না। ওষুধে যারা ভেজাল দেয় তারা সমস্ত মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। কঠোর হাতে তাদের দমন করা উচিত। এ বিষয়ে আপনি এবং আপনার দপ্তর নিশ্চয় সজাগ আছেন। তবু বলছি কার্যকর এমন কিছু ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করুন যাতে জনসাধারণ এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারে। ওষুধে ভেজাল প্রতিরোধে সরকারী যে-কোন ব্যবস্থার সঙ্গে জনসাধারণ সহযোগিতা করবে এ বিষয়ে সন্দেহ নেই।

৫এ ওল্ড মেয়র কোর্ট
কলিকাতা-৭০০ ০০৫

বিনীত
সুধীরচন্দ্র প্রামাণিক

৫৬। গ্রামের রাস্তাঘাট, পানীয় জল, জনস্বাস্থ্য প্রভৃতি সমস্যার কথা জানিয়ে পঞ্চায়েত-প্রধানের কাছে একটি আবেদনপত্র রচনা কর। [উঃ মাঃ ১৯৮১]

মাননীয় পঞ্চায়েত-প্রধান মহাশয়
নারায়ণপুর অঞ্চল, জিলা : হুগলী

মহাশয়,

আমি নারায়ণপুর অঞ্চলের অন্তর্গত ডুল্যা গ্রামের একজন অধিবাসী। আমাদের গ্রামের কয়েকটি সমস্যার প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে এই পত্রের অবতারণা করছি।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে আমাদের গ্রামের প্রধান সড়কটি কাঁচা। বর্ষাকালে এই রাস্তাটি ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। গাড়িঘোড়া দূরের কথা, মানুষ চলবার পক্ষেও অতীব দুর্গম হয়ে পড়ে। রাস্তায় অসংখ্য খানা-খন্দ। অতএব এই রাস্তাটির আশু সংস্কারবিধান অত্যন্ত জরুরী।

দ্বিতীয়ত, আমাদের গ্রামে পানীয় জলের ব্যবস্থাও বিপর্যস্ত। টিউবওয়েল কয়েকটি আছে বটে, কিন্তু অধিকাংশই বিকল। বিশেষত, গ্রীষ্মকালে গ্রামে প্রচণ্ড জলকষ্ট দেখা দেয়। এমন কি প্রাইমারি বিদ্যালয়ের কাছে যে-টিউবওয়েলটি ছিল তা-ও বর্তমানে ভগ্ন। বিদ্যালয়ের বালক-বালিকাদের প্রায় অর্ধ মাইল দূরে জঙ্গলপাড়ায় গিয়ে জল খেয়ে আসতে হয়। এমতাবস্থায় টিউবওয়েলগুলির সংস্কার এবং কোথাও কোথাও নতুন টিউবওয়েল স্থাপন করা একান্ত দরকার।

তৃতীয়ত, গ্রামের কাছাকাছি কোন স্বাস্থ্যকেন্দ্র নেই। ফলে এতদঞ্চলের অধিবাসীদের প্রয়োজনে হরিপাল কিংবা বালিগড়ি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে যেতে হয়। এ-বিষয়েও কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণের প্রয়োজন। আশা করি, এই আবেদনপত্রটি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন।

ডুল্যা — বিনীত
৩০-এ চৈত্র, ১৩৯০ — নেপালচন্দ্র সাঁতরা

ছ. পত্রিকার সম্পাদকের নিকট চিঠি

৫৭। বাংলা পল্লী-অঞ্চলের গ্রীষ্মকালীন জলসমস্যা সম্পর্কে দৈনিক-পত্রিকায় একটি চিঠি লেখ। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

গ্রাম : কলোড়
পোঃ সেকেন্দারী
জেলা : মেদিনীপুর

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০১

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের বহুল-প্রচারিত সংবাদপত্রের মাধ্যমে আমি মেদিনীপুর জেলার

ঘাটাল মহকুমার দাসপুর থানার অন্তর্গত চার নম্বর ব্লক অঞ্চলের এক চিরস্থায়ী সমস্যার ছবি তুলে ধরতে চাই।

উক্ত অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে কী নিদারুণ জলকষ্ট দেখা দেয় তা ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। এই অঞ্চলের পাশ দিয়ে প্রবাহিত ক্ষীণস্রোতা কংসাবতীর শাখানদী খরার দিনে শুকিয়ে যায়। বড়ো বড়ো পুকুরেও জল থাকে না। ফলে, কি মানুষ কি গবাদি পশু উভয়েরই পানীয় জলের অভাব দেখা দেয়।

ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের তৈরি করা নলকূপ প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। তার ওপর প্রয়োজনের সময়ে সেগুলি অকেজো হলে কষ্টের আর সীমা থাকে না। নলকূপ অকেজো হয় অত্যধিক ব্যবহারে কিন্তু সেগুলি পুনরায় নির্মাণের দ্রুত ব্যবস্থা নেই। ফলে আধুনিক যুগেও মানুষের তৃষ্ণানিবারণের একমাত্র উপায় পুকুরের অপরিষ্কার জল, যে জলে থাকে আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগের জীবাণু।

আমাদের অনুরোধ, পোস্ট অফিস, স্কুল, মেলাপ্রাঙ্গণ এবং হাট, যেখানে লোক-সমাগম হয়, সেইসব স্থানে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-কর্তৃক একটি করে নলকূপ নির্মাণ করা হোক। আর গবাদি পশুর পানীয় জলের জন্য সংস্কার ও খনন করা হোক বড়ো বড়ো পুকুর ও দীঘি।

আমাদের এই সমস্যার কথা বিবেচনা করে আশা করি কর্তৃপক্ষ সচেতন হবেন এবং সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসবেন। নমস্কারান্তে ইতি—

নিবেদক
কৃষ্ণকিশোর চক্রবর্তী

৫৮। জিনিসপত্রের অস্বাভাবিক দরবৃদ্ধির বিষয়ে কোনো সংবাদ-পত্রের সম্পাদকীয় দপ্তরে লেখ। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

২৯/১/৩ রাজা সুবোধ মল্লিক রোড,
যাদবপুর, কলিকাতা-৭০০ ০৩২

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়
যুগান্তর পত্রিকা
১৪এ আনন্দ চ্যাটার্জী লেন
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

সবিনয় নিবেদন,

আমি মনে-প্রাণে বিশ্বাস করি দেশের সরকার এবং জনসাধারণের কাছে আমাদের মতো সাধারণ মানুষের বক্তব্য বা অভাব-অভিযোগ তুলে ধরার একটা বড়ো হাতিয়ার হল সংবাদপত্র। তাই বর্তমানের এক গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার প্রতি সরকার এবং জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আপনাদের পত্রিকার মাধ্যমে আমি দু'চারটি কথা বলতে চাই।

সাম্প্রতিক কালে প্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্যবৃদ্ধির জন্যে জনজীবন বিপর্যস্ত হতে বসেছে। সাধারণ মানুষ মূল্যবৃদ্ধির জন্য দাবি করে মাগ্‌গিভাতা, এবং তা পেয়েও থাকে। কিন্তু যে-হারে এই জিনিসের দাম বাড়ে ঠিক সেই হারে মাগ্‌গিভাতা বাড়ে না। বিশ টাকা মাইনে বাড়ল তো গড়ে জিনিসের দাম বাড়ল পঞ্চাশ টাকা। ফলে আমাদের নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মত অবস্থা হয়েছে। মানুষের তো কেবল পেটের জ্বালা মিটলেই চলে না। বাঁচার জন্যে মানুষের আরও অনেক জিনিস চাই। তাই চাল-ডাল-নুন-তেল কেনার পর চাই আমাদের যাতে মনের খিদে মিটতে পারে এমন জিনিস। ভুলেই গেছি কবে কতদিন আগে একটা ভালো বই কিনেছি। কিনব কী করে, অন্নচিন্তা চমৎকারা !

তাই আমার নিবেদন, মাইনে না বাড়িয়ে বাজার-দরকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা হোক। সৎ ব্যবসাদারদের নিয়ে গঠিত হোক কমিটি। সেখানে সরকারী-বেসরকারী লোকও থাকবে। এই কমিটি বাজার দর বেঁধে দেবে। যারা সেই নির্দেশ মানবে না তাদের দেওয়া হোক কঠোর শাস্তি। এর জন্যে চাই সরকারী ও বেসরকারী প্রয়াস। এ ছাড়া সাধারণ মানুষের বাঁচার অন্য পথ নেই। কেবল মাইনে বাড়িয়ে বাজারদরের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া যাবে না। নমস্কারান্তে ইতি—

নিবেদক
কুশল চক্রবর্তী

৫৯। গ্রামের কোনো অসুবিধা জানিয়ে সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে চিঠি।

ঘোষপাড়া,
পোঃ বাহিরখণ্ড, হুগলী
৭. ২. ৮২

মাননীয় সম্পাদক,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০১

মাননীয়েষু,

আমি আমার গ্রামবাসীর পক্ষ থেকে আপনার প্রখ্যাত পত্রিকার মারফত আমাদের গ্রাম সম্পর্কিত একটি জরুরী বিষয়ের প্রতি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

আমাদের গ্রামের নাম তুল্যা। হাওড়া-তারকেশ্বর লাইনের বাহিরখণ্ড স্টেশনে নেমে এই গ্রামে যেতে হয়। গ্রামে বহু লোকের বাস।

অনেক দিন থেকে শুনছি আমাদের গ্রামে বিদ্যুৎ আসবে। গ্রাম থেকে মাইল-খানেক দূরে কিছু পোস্টও বসানো হয়েছিল বছরখানেক আগে, কিন্তু তারপর কাজ আর অগ্রসর হয় নি। গ্রামে বিদ্যুতের প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্তারিতভাবে বলবার কোনো দরকার নেই। শুধু এইটুকু বলব, আমাদের গ্রামে ছোটোখাটো শিল্প গড়ে

ওঠার যে-সম্ভাবনা আছে তা বিলম্বিত হচ্ছে এই বিদ্যুৎ এখনও আসে নি বলে। গ্রামোন্নয়নের সঙ্গে বিদ্যুতের সম্পর্ক আজ অবিচ্ছেদ্য এ কথা বলা বাহুল্য।

আশা করি, সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে দৃষ্টি দেবেন এবং আমাদের গ্রামে অবিলম্বে যাতে বিদ্যুৎ এসে পৌঁছয় তার ব্যবস্থা করবেন। ইতি—

বিনীত
পরেশচন্দ্র ঘোষ

৬০। রেলভ্রমণে নিরাপত্তার বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে সংবাদপত্রের সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি দাও।

মাননীয় সম্পাদক,
আনন্দবাজার পত্রিকা,
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০০১

সবিনয় নিবেদন,

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। আজকাল রেলভ্রমণ সত্যিই এক বিড়ম্বনা। স্বাচ্ছন্দ্যের কথা ছেড়েই দিলাম, প্রাণের ভয়েই আমরা আধমরা। রেলডাকাতির খবর এত ব্যাপক যে, রেলে দূরে কোথাও যেতে লোকে রীতিমত আতঙ্কিত হচ্ছে। মনে হচ্ছে ডাকাতির সবচেয়ে নিরাপদ স্থান বোধ হয় ট্রেনের কামরা। অথচ রেলরক্ষী আছে, আছে রেলপুলিশ। বিষয়টি ক্রমেই আয়ত্তের বাইরে চলে যাচ্ছে। এখনই কিছু জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া দরকার হয়ে পড়েছে। মনে রাখতে হবে, জাতীয় জীবনে যোগাযোগ একটা বিশিষ্ট স্থান নিয়ে আছে, এবং এই যোগাযোগে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হলে জাতীয় জীবনেই নেমে আসবে পঙ্গুতা।

আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ এই, আপনি সম্পাদকীয় অথবা বিশেষ প্রবন্ধে তথ্যাদিসহ এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন, যাতে তাঁরা এই মুহূর্তে উপযুক্ত ব্যবস্থাদি গ্রহণ করেন। ইতি—

৩৮ লেক স্কোয়ার,
গোল মার্কেট, নিউ দিল্লী-১

বিনীত
অনিলমাধব বিশ্বাস

৬১। ভোজ-বাড়িতে বহুবিধ অপচয়-সম্পর্কে তোমার মন্তব্যসহ কোনো পত্রিকার সম্পাদকের কাছে চিঠি লেখ।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
'আজকাল'
রাজা রামমোহন সরণী, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

সবিনয় নিবেদন,

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সেদিন এক বিয়েবাড়ি গিয়েছিলাম। বাদলা দিন ছিল। নিমন্ত্রিতদের অনেকেই আসতে পারলেন না।

প্রচুর জিনিস নষ্ট হল। এটা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, ভালো আবহাওয়াতেও ভোজ-বাড়িতে যথেষ্ট অপচয় প্রায়ই চোখে পড়ে। অপচয় আলোক-সজ্জায়, অপচয় ভোজ্য প্রভৃতিতে। লৌকিকতার নামে ক্ষমতার অতিরিক্ত করতে কেউ পিছপা নন। কী দরকার এত খরচপত্তর করবার? পাতা পেতে ব্যয়বহুল খাবারের ব্যবস্থা কি না করলেই নয়? সামান্য চা, আর চায়ের সঙ্গে একটু 'টা' আন্তরিকতার স্পর্শে মূল্যবান্ হয়ে উঠতে পারে। নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে আমাদের চলতে হচ্ছে, সঞ্চয় সকলের জীবনেই অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। এ অবস্থায় ভোজ-বাড়ির এলাহী আয়োজন বন্ধ করাই কি ভালো নয়? একে জাতীয় অপচয়ই আখ্যা দেওয়া যেতে পারে।

আশা করি, আপনিও এ বিষয়ে ভিন্নমত পোষণ করেন না। তাই, একান্ত অনুরোধ, এমন সব বিশেষ রচনা ও সমীক্ষা আপনার কাগজে প্রকাশ করুন যাতে আমাদের সম্বিত ফেরে।

রেলওয়ে কোয়ার্টার্স, বিনীত
২৬-এ বেস্টক্যাম্প কলোনী, নৈহাটী জগন্নাথ মণ্ডল

৬২। পশ্চিমবঙ্গে বাংলাভাষার মাধ্যমে সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার সপক্ষে কোনো একটি দৈনিক পত্রের সম্পাদকের কাছে চিঠি লেখ।

মাননীয় সম্পাদক মহাশয়,
যুগান্তর
১৪এ আনন্দ চ্যাটার্জী লেন,
কলিকাতা-৭০০ ০০৩

সবিনয় নিবেদন,

শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলাভাষাকে স্থান দিলেও পশ্চিমবঙ্গে সরকারী কাজকর্ম পরিচালনায় এখনও বাংলাভাষা চালু হল না এটা নিতান্ত পরিতাপের বিষয়। ইংরেজি থেকে বাংলায় হঠাৎ আসা সম্ভবপর নয় জানি, কিন্তু স্বাধীনতা-লাভের পর তো দীর্ঘদিন কেটে গেল। একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী উদ্দেশ্যের দিকে এগোলে এতদিন সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রচলন করা অসম্ভব হত না। কিছু কিছু প্রচেষ্টা যে হয় নি বা হচ্ছে না তা নয়, তবে ইংরেজির রাজত্ব এখনও অব্যাহত। আমরা নিজেদের প্রদেশে নিজেদের মাতৃভাষায় কাজকর্ম করতে পারব না এ ভাবাই যায় না। সাধারণ বা স্বল্পশিক্ষিত মানুষের পক্ষে এতে যে অনেক সুবিধে হবে একথা বলাই বাহুল্য।

আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ, আপনি আপনার বিশিষ্ট সংবাদপত্রটিতে এ বিষয়ে জনমত জাগ্রত করুন এবং কর্তৃপক্ষকে এবিষয়ে উদ্বুদ্ধ করে তুলুন। ইতি—

পি ৬ রুবি পার্ক বিনীত
কলিকাতা-৭০০ ০৪১ অসিতরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

বাণিজ্যিক পত্র

ক. অভিযোগ-পত্র

৬৩। তুমি যে-পণ্যের ফরমাস দিয়েছিলে বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান তার চেয়ে নিম্নমানের পণ্য প্রেরণ করেছে, সে বিষয়ে অভিযোগ করে একটি পত্র লেখ।

"চা-ঘর"
(উৎকৃষ্ট চা-প্রেরক প্রতিষ্ঠান)
৭৮ নিউ আলিপুর, কলিকাতা-৭০০ ০৫৩

ফোন : ৪৫-৪৯৪৪

পত্রসংখ্যা : খ/৬০৭/৮২ ৩০. ৫. ৮৪

নিউ ভ্যালি টি কোং লিঃ
২৪/১, ম্যাডান স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

বিষয় : অভিযোগ

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৪ তারিখের ফরমাস অনুসারে আপনাদের নিউ ভ্যালির চল্লিশ টাকা কেজি মূল্যের এক হাজার কেজি চা পাঠাবার অনুরোধ করেছিলাম। কিন্তু আপনাদের দার্জিলিং অফিস থেকে ভুলক্রমে এক হাজার কেজি নিম্নমানের চা পাঠানো হয়েছে। এই চায়ের দাম কেজি প্রতি পনেরো টাকার অধিক নয়। আমরা আগেই চল্লিশ টাকা হিসাবে মোট মূল্যের অর্ধেক টাকা আপনাদের কলকাতা অফিসে জমা দিয়েছি।

আপনাদের কাছে বিশেষ অনুরোধ, দার্জিলিং অফিসের পাঠানো চায়ের দাম যদি পনের টাকা হিসাবে নির্ধারিত হয় তবেই আমরা এই চা গ্রহণ করতে পারি। আশা করি আপনাদের ভুল সংশোধন করে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবেন এবং উদ্বৃত্ত টাকা ফেরত দেবেন।

নমস্কারান্তে। ইতি

নিবেদক
শ্রীঅভয়াপদ চট্টোপাধ্যায়
[চা-ঘরের পক্ষে]

খ. ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত পত্র

৬৪। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে তুমি স্বয়ং-নিযুক্ত পরিচালনায় বিশেষ কোন একটি কুটিরশিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে চাও। মূলধনের জন্য টাকার প্রয়োজন। কোন ব্যাঙ্কের নিকটে অর্থ-ঋণের আবেদনপত্র পেশ কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০ '৮১]

মাননীয় কর্মাধ্যক্ষ,
ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক, বালিগঞ্জ শাখা
১৫/১ গড়িয়াহাটা রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০১৯

সবিনয় নিবেদন,

আমি বালিগঞ্জ অঞ্চলে একটি বোর্ড-বক্স মেকিং এবং বুক বাইণ্ডিং কারখানা খুলিতে চাই। এ ব্যাপারে আমি প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছি এবং বিশেষজ্ঞদের মতামত লইয়া একটি পরিকল্পনার খসড়াও প্রস্তুত করিয়াছি। আমার নিয়োজ্য মূলধনের পরিমাণ ৩০,০০০ হাজার টাকা। আমি ১০, ০০০ টাকা সংগ্রহ করিয়াছি, বাকি অর্থের জন্য অর্থাৎ ২০,০০০ বিশ হাজার টাকার ঋণের জন্য আপনার নিকট আবেদন করিতেছি।

আপনাদের ঋণদান-প্রকল্পে যোগ্য প্রার্থীরা নানাভাবেই উপকৃত হইতেছে। আশা করি, আমার আবেদনও আপনারা সহানুভূতির সহিত বিচার করিবেন।

আপনার নিকট হইতে সাক্ষাতের নির্দেশ পাইলে যথাসময়ে আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিব।

২০ গরচা সেকেণ্ড লেন, বিনীত
কলিকাতা-৭০০ ০১৯ সুধীন বিশ্বাস
১২. ৭. ৮৩

গ. সুপারিশপত্র

চাকরি ও বাণিজ্যিক ব্যাপারে সুপারিশপত্রের প্রয়োজন। পারস্পরিক সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা এই পত্রের ভিত্তি।

৬৫। তোমার ব্যবসায়ী বন্ধু কুটিরশিল্পের বাজার তৈরীর জন্য বোম্বে যাচ্ছেন। বোম্বের কোন ব্যবসায়ীর কাছে উক্ত বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য সুপারিশপত্র লেখ।

বেঙ্গল কটেজ হোম
(কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যের বিক্রেতা)
৩০ দেবেন্দ্র ঘোষ রোড, কলিকাতা-৭০০ ০২৫

ফোন: ৪৭-৪৪৫৮
৩. ৬. ৮৩

মাননীয় কর্মসচিব
বোম্বে ইণ্ডাস্ট্রিজ প্রাঃ লিঃ
৬/৭২ গৌতমবুদ্ধ মার্গ
বান্দ্রা: বোম্বে-৫০

সবিনয় নিবেদন,

'কলকাতা কুটিরশিল্প' প্রতিষ্ঠানের শ্রীসত্যচরণ হালদার তাঁদের তৈরি কিছু

কুটিরশিল্পের নমুনা নিয়ে আগামী ১০ই জুন, ১৯৮৩ তারিখে বোম্বে যাচ্ছেন। এঁদের তৈরি করা সাবান, মাদুর কলকাতা বাজারে বেশ সাড়া জাগিয়েছে। দামেও সস্তা।

আপনারা আমাদের প্রতিষ্ঠানের দীর্ঘকালের বন্ধু ও বোম্বাইয়ের প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। শ্রীহালদারকে চিঠি দিয়ে আপনাদের কাছে পাঠাচ্ছি, কারণ তিনি প্রথম বোম্বে যাচ্ছেন। 'কলকাতা কুটিরশিল্পের' শ্রীহালদার আপনাদের মতোই আমাদের প্রতিষ্ঠানের বন্ধু। অনুরোধ, আপনাদের পরিচিত কুটিরশিল্প ব্যবসায়ীদের নাম-ঠিকানা দিয়ে শ্রীহালদারের সঙ্গে তাঁদের আলাপ করিয়ে দেবেন। এ ছাড়াও অন্য যে-কোন প্রকার সাহায্য শ্রীহালদার চাইবেন, আমাদের স্বার্থেই তা করেছেন মনে করবেন।

নিবেদক

শ্রীসমরজিৎ সেন

[বেঙ্গল কটেজ হোমের পক্ষে]

ঘ. যোগ্যতা অনুসন্ধানপত্র

পত্রে কোন ব্যবসায়ীর অথবা কোন কর্মপ্রার্থীর যোগ্যতা অনুসন্ধান করা হয়। তাই এই যোগ্যতা অনুসন্ধানপত্র দু'রকমের। কর্মপ্রার্থীর ক্ষেত্রে স্বভাবতই নিয়োগ-কর্তার মনে নানা প্রশ্ন দেখা দেয়, তাই অনুসন্ধানের প্রয়োজন। আর অপরিচিত ব্যবসায়ীর সঙ্গে নতুন কারবার করতে গেলে পরিচিত কোনো ব্যবসায়ী বা ব্যাঙ্কের কাছ থেকে গোপনে তার সম্পর্কে নানা তথ্য জেনে নিতে হয়। তাই বাণিজ্যিক অনুসন্ধানপত্রও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সব অনুসন্ধানপত্রের উত্তর হয় দু'রকমের, (১) অনুকূল, (২) প্রতিকূল।

৬৬। কোন প্রতিষ্ঠান ব্যাঙ্কের কাছে ঋণ চায়। অনুসন্ধানের জন্য সেই প্রতিষ্ঠান তোমাদের প্রতিষ্ঠানের নাম উল্লেখ করেছে। ব্যাঙ্ক তোমাদের কাছে অনুসন্ধান করে চিঠি দিয়েছে। উত্তরে একটি অনুকূল পত্র লেখ।

নবলক্ষ্মী সমবায় মিলস

[রকমারি সুতা-প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান]

১৪ ম্যাডান স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৩

পত্রসংখ্যা : ক/৭০০/৮২

ফোন : ২৭-৮৮৬৮

৯-৬-৮৩

মাননীয় কর্মকর্তা,
ইউনাইটেড ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া,
৩৯ লেনিন সরণী,
কলিকাতা-৭০০ ০১৩

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ১০-৫-৮৩ তারিখের গ/১০৭/৮২ সংখ্যক পত্র পেয়েছি। ১০৭নং

গনেশচন্দ্র এভিন্যু, কলিকাতা-৭০০ ০১২, এই ঠিকানায় অবস্থিত উৎপল হোসিয়ারী সম্বন্ধে আপনাদের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য চিঠিতে জানাচ্ছি।

উৎপল হোসিয়ারীর সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক দীর্ঘ পনেরো বছরের। বর্তমানে এই সম্পর্ক আরও নিবিড় হয়েছে, কারণ আমাদের মিলে প্রস্তুত সুতোর একটা বড়ো অংশ উক্ত হোসিয়ারী ক্রয় করার চুক্তিতে আবদ্ধ।

উৎপল হোসিয়ারীর সঙ্গতি—চলতি ও স্থায়ী মূলধন হিসাবে প্রায় লক্ষ টাকার মতো। বর্তমানে ওঁরা কলিকাতার উপকণ্ঠে বিরাটী অঞ্চলে নতুন জমি ক্রয় করে হোসিয়ারীর সম্প্রসারণের পরিকল্পনা করেছেন।

বাজারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুনাম আছে। আমাদের সঙ্গে লেনদেনের ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানকে কখনই অনিয়মিত হতে দেখি নি।

এ অবস্থায় উক্ত প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দেবার কথা আপনারা বিবেচনা করতে পারেন। বিশ্বাস করি, এই প্রতিষ্ঠান চিরকাল আপনাদের বিশ্বাসভাজন হয়ে থাকবে। ধন্যবাদান্তে।

নিবেদক
শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়
[নবলক্ষ্মী সমবায় মিলস-এর পক্ষে]

৬৭। তোমাদের প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মচারী অন্য একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মপ্রার্থী। উক্ত প্রতিষ্ঠান সেই ব্যক্তি-সম্পর্কে তোমার কাছে একটি অনুসন্ধানপত্র লিখেছে। উত্তরে একটি অনুকূল পত্র লেখ।

[এই পত্র অনুকূল অথবা প্রতিকূল দু'রকমের হতে পারে]

অশোক ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ
৩ প্রিন্স আনোয়ার শা রোড,
কলিকাতা-৭০০ ০৩২

পত্রসংখ্যা : জ/১০১/৮৪ ফোন : ৩৪-৫৩৬৪
পূর্বসূত্র : ক/১০৬৮/৮৪ ১৯-৫-৮৪

কলিকাতা লাইব্রেরী
১৫/৩ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের ২-৫-৮৪ তারিখে লেখা ক/১০৬৮/৮৪ সংখ্যক পত্র পেয়েছি। আপনারা আমাদের হিসাবরক্ষক শ্রীঅরুণ রায় সম্পর্কে কিছু জানতে চেয়েছেন। উত্তরে আমরা তাঁর সম্পর্কে নিম্নলিখিত তথ্য জানাচ্ছি :

শ্রীঅরুণ রায়ের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ১৯৬৮ সাল থেকে। তাঁর কর্মদক্ষতা ও সততা-সম্বন্ধে আমরা অনুকূল অভিমত পোষণ করি।

তিনি আমাদের প্রতিষ্ঠানে হিসাবরক্ষকের পদে নিযুক্ত আছেন। এই কাজে তিনি সত্যই নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। আমাদের প্রতিষ্ঠানে শ্রীরায় ভাতাসহ মোট চার শত টাকা মাইনে পান।

শ্রীরায়ের ব্যবহারে এবং নিয়মানুবর্তিতায় আমাদের প্রতিষ্ঠান সন্তুষ্ট।

আমাদের চার শত টাকার বেশি মাইনে দেবার ক্ষমতা নেই। মনে হয়, আপনাদের প্রতিষ্ঠানে বেশি মাইনের জন্যেই তিনি যেতে চাইছেন।

এই উৎসাহী তরুণ আপনাদের প্রতিষ্ঠানে নিযুক্ত হয়ে উন্নতি করুন এটাই কামনা করি।

ধন্যবাদান্তে ইতি—

নিবেদক
শ্রীঅশোক গুপ্ত
[অশোক ইঞ্জিনিয়ারিং কোং লিঃ-এর পক্ষে]

৬৮। ক্রিকেটে বিশ্বকাপ জয়ে তোমার মানসিক উত্তেজনা ও আনন্দের কথা জানিয়ে তোমার বন্ধুকে একটি চিঠি লেখ। [উ. মা. ১৯৮৪]

৪/এ/১২ বীরেন রায় রোড
কলিকাতা-৭০০০০৮
১৯।৬।৮৩

প্রিয় অরবিন্দ,

গতকাল তোর চিঠি পেলাম। চিঠিতে তুই লিখেছিস ভারতের বিশ্বকাপ জয়ের আনন্দে তুই নাকি সেদিন সারারাত ঘুমোতেই পারিস নি। সেই সঙ্গে কিছুটা দুঃখও প্রকাশ করেছিস এই জন্যে যে, তোদের গ্রামে কোনো টেলিভিশন নেই বলে তুই খেলা দেখার পূর্ণ আনন্দ থেকে বঞ্চিত! লিখেছিস, "আকাশবাণীর ধারাবিবরণী শুনেই আমাকে দুধের স্বাদ ঘোলে মেটাতে হয়েছে।"

ভাই অরবিন্দ, তোর চিঠি পড়ে সত্যিই আমার কষ্ট হল। তুই কেন খেলার আগের দিন আমাদের বাড়িতে চলে এলি না। সেই যেমন এশিয়াডের আগে এসেছিলি। নাকি ভাবতেই পারিসনি খেলাটা এমন জমে উঠবে?

যাক গতস্য শোচনা নাস্তি। তুই ধারাবিবরণী শুনেই ঘুমোতে পরিস নি, তাহলে আমার অবস্থা একবার কল্পনা কর। সে-রাত্রে 'লর্ডস্'-এর ক্রিকেট উদ্যান আমার একমুঠো ঘরের মধ্যে উঠে এসেছে কালার্ড টি. ভি.-র কল্যাণে।

মসৃণ-সবুজ মাঠ, ওপর দিয়ে লাফিয়ে ছুটে চলেছে আমাদের হৃৎপিণ্ড, কখনও বাউণ্ডারির কাছে বরাবর কখনও ওধারে।

ভারতের পক্ষে দ্রুত রান তুলে শ্রীকান্তই প্রথম জয়ের আশা জাগিয়ে তোলে। তারপর থেকে দিগ্বিজয়ী বীরের মতো এল মহীন্দার অমরনাথ, অধিনায়ক কপিল দেব, সন্দীপ পাতিল, যশপাল শর্মা। তখনও অবিশ্যি ঠিক জয়ের কথা ভাবতে পারি নি। কিন্তু যখন দেখলাম ওয়েস্ট ইণ্ডিজের দ্রুত হারে রাণ তোলার বদলে

পড়তে আরম্ভ করেছে উইকেটের পর উইকেট, তখন থেকেই শুরু হল উত্তেজনা আর উত্তেজনা। সর্বদাই কী হয় কী হয় ভাব। এটাই মনে হয় প্রত্যেক ক্রিকেট-প্রেমিকেরই মনের কথা।

আর নতুন করে তোর সামনে খেলার লিপিচিত্র তুলে ধরব না। আমার মানসিক উত্তেজনার আর অসম্ভব বিজয়ের আনন্দের কথাই বলি। তোকে বলতে বাধা নেই, ঘুম তো দূরের কথা, উত্তেজনায় আমি সেদিন রাতের খাবার খেতেই ভুলে গেছলাম।

খেলা শেষ হল, জিতল ভারত। রাত, কিন্তু রাতকে দিন করতে কতক্ষণ লাগে। ছুটে গেলাম পাড়ার বাজির দোকানে। শুনে নিশ্চই ভাবছিস, এতরাতে বাজির দোকান খোলা ছিল? কেবল বাজির দোকান কেন, মিষ্টির দোকানেও সেরাত্রে ঝাঁপবন্ধ হয় নি। জয়ের আনন্দে পাড়ার ছেলেরা মশাল জ্বালিয়ে ব্যাণ্ড আর তাসা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। রাতের অন্ধকারের মুখে ছাই দিয়ে পুড়ল কত বাজি। এই বিশাল আনন্দ যজ্ঞে আমিও অংশ নিয়েছিলাম।

উত্তেজনা আর আনন্দের রেশ কাটতে ভোর হয়ে গেল। তখন পেট চিঁচিঁ করছে। হঠাৎ খেয়াল হল, রাতের খাবার রান্নাঘরেই ঢাকা দেওয়া আছে, খাওয়া হয় নি। একেই বলে জয়ের আনন্দ। তোর কথা খুব মনে হচ্ছিল। ইস্, তুই যদি সঙ্গে থাকতিস, কী মজাই না হত! ভালবাসা নিস।

ইতি
তোর কুশল

অরবিন্দ বর্মণ
পোঃ সেকেন্দারী
জেলা: মেদিনীপুর

৬৯। তোমার কোনও বন্ধু খেলাধুলায় বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছে। এজন্য তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়া একটি পত্র রচনা কর।

[ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৮৪]

৩-এ, জে. বি. রোড
ত্রিপুরা

ভাই পথিক,

সেদিন কাগজে দেখলাম তুই এবছর মোহনবাগানে খেলার সুযোগ পেয়েছিস। ছোটোবেলা থেকেই জানি তোর স্বপ্ন ছিল মোহনবাগানে খেলার। আজ তোর সেই স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হয়েছে। কাগজে পড়ে এই কৃতিত্বের জন্যে তোকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। অবশ্য এ কৃতিত্ব তোর অধ্যবসায় আর একাগ্রতার ফল। মনে পড়ে ত্রিপুরায় থাকার সময় প্রতিদিন ভোরে উঠে তোর সেই সাধনার কথা। ময়নাপাড়ার মাঠে গিয়ে একা একা দৌড়ানো, অথবা বিভিন্ন এঙ্গেল থেকে গোলে

বল মারার চেষ্টা—তখন তো আমরা সবাই বিছানায় শুয়ে। সেদিন কে জানত আমাদের স্কুলের পথিক রায় একাগ্র সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে তার স্বপ্নকে সার্থক করে তুলবে। কেউ না জানলেও আমাদের গেম্‌টিচার পরেশবাবু বলতেন, "দেখিস, পথিক একদিন ঠিক নাম করবে।"

পরেশবাবু আজ বেঁচে নেই, থাকলে তোকে বুকে জড়িয়ে ধরতে কলকাতায় ছুটে যেতেন। কেবল মোহনবাগানে খেলার সুযোগ পেয়েই তোর সাধনা শেষ হবে না জানি। তুই আরও ভাল খেলবি, অনেক রেকর্ড করবি এই শুভেচ্ছা জানাই। তোর ঘরেই দেখেছিলাম বিশ্ববিখ্যাত পেলের ছবি। তেমনি আগামী দিনের তরুণদের ঘরে ঘরে তোর ছবিও জীবন্ত প্রেরণা হয়ে থাকবে এই শুভেচ্ছা জানিয়ে আজকের মতো এখানেই শেষ করছি।

তোর
কুশল

পথিক রায়
২ ডাঃ দেওদার রহমন রোড
কলিকাতা-৭০০০ ৩৩

কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির ব্যক্তিগত পত্র

বিদ্যাসাগরের পত্র

[তাঁর দেশের বাড়ির অন্যতম পরিচালক গদাধর পালকে লিখিত]

নানাগুণালঙ্কৃত শ্রীযুত গদাধর পাল ভাইটি কল্যাণভাজনেষু
শুভাশীর্বাদপূর্বকমাবেদনমিদম্

নানা কারণবশতঃ স্থির করিয়াছি আমি আর বীরসিংহায় যাইব না। তুমি গ্রামের প্রধান, এজন্য তোমা দ্বারা গ্রামস্থ সর্বসাধারণ লোকের নিকট এজন্মের মত বিদায় লইতেছি এবং সকলকে যথাযোগ্য প্রণাম, নমস্কার ও আশীর্বাদ জানাইয়া বিনয়বাক্যে এই প্রার্থনা করিতেছি, যদি কখনও কোনও দোষ করিয়া থাকি, সকলে দয়া করিয়া আমায় ক্ষমা করিবে। সাধারণের হিতার্থে গ্রামে যে বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপিত আছে এবং গ্রামস্থ নিরুপায় লোকদিগের মাস মাস যে কিছু কিছু আনুকূল্য করিয়া থাকি, আমার শক্তি থাকিতে ঐ সকল বিষয় রহিত হইবে না। কিছুকাল হইল আমার মনের ও শরীরের অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। সুতরাং অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না। যতদিন বাঁচিব, যদি শুনিতে পাই, তোমরা সকলে স্বচ্ছন্দে কালযাপন করিতেছ, তাহা হইলে যার পর নাই সুখী হইব। ইতি ১২ অগ্রহায়ণ, ১২৭৬ সাল।

ইতি
শুভাকাঙ্ক্ষিণঃ
শ্রীঈশ্বরচন্দ্র শর্মণঃ।

রবীন্দ্রনাথের পত্র

(ছিন্নপত্র থেকে)

কালিগ্রাম

জানুয়ারি, ১৮৯১

ঐ-যে মস্ত পৃথিবীটা চুপ করে পড়ে রয়েছে ওটাকে এমন ভালোবাসি—ওর এই গাছপালা নদী মাঠ কোলাহল নিস্তব্ধতা প্রভাত সন্ধ্যা সমস্তটা-সুদ্ধ দু হাতে আঁকড়ে ধরতে ইচ্ছে করে। মনে হয় পৃথিবীর কাছ থেকে আমরা যে-সব পৃথিবীর ধন পেয়েছি এমন-কি কোনো স্বর্গ থেকে পেতুম ? স্বর্গ আর কী দিত জানি নে, কিন্তু এমন কোমলতা দুর্বলতা-ময়, এমন সকরুণ আশঙ্কা-ভরা, অপরিণত এই মানুষগুলির মতো এমন আপনার ধন কোথা থেকে দিত ! আমাদের এই মাটির মা, আমাদের এই আপনাদের পৃথিবী, এর সোনার শস্যক্ষেত্রে, এর স্নেহশালিনী নদীগুলির ধারে, এর সুখদুঃখময় ভালোবাসার লোকালয়ের মধ্যে এই-সমস্ত দরিদ্র মর্তহৃদয়ের অশ্রুর ধনগুলিকে কোলে করে এনে দিয়েছে। আমরা হতভাগ্যরা তাদের ধরে রাখতে পারি নে, বাঁচাতে পারি নে, নানা অদৃশ্য প্রবল শক্তি এসে বুকের কাছ থেকে তাদের ছিঁড়ে ছিঁড়ে নিয়ে যায়, কিন্তু বেচারা পৃথিবীর যতদূর সাধ্য তা সে করেছে। আমি এই পৃথিবীকে ভারী ভালোবাসি। এর মুখে একটা সুদূরব্যাপী বিষাদ লেগে আছে—যেন এর মনে মনে আছে, আমি দেবতার মেয়ে, কিন্তু দেবতার ক্ষমতা আমার নেই। আমি ভালোবাসি, কিন্তু রক্ষা করতে পারি নে। আরম্ভ করি, সম্পূর্ণ করতে পারি নে। জন্ম দিই, মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচাতে পারি নে। এই জন্যে স্বর্গের উপর আড়ি করে আমি আমার দরিদ্র মায়ের ঘর আরো বেশি ভালোবাসি—এত অসহায়, অসমর্থ, অসম্পূর্ণ, ভালোবাসার সহস্র আশঙ্কায় সর্বদা চিন্তাকাতর ব'লেই।*

বিবেকানন্দের পত্র

(স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিত পত্রের অংশবিশেষ)

আলমোরা

১৫ই জুন, ১৮৯৭

কল্যাণবরেষু,

তোমার সবিশেষ সংবাদ পাইতেছি ও উত্তরোত্তর আনন্দিত হইতেছি। ঐরূপ কার্যের দ্বারাই জগৎ কিনিতে পারা যায়। মতমতান্তরে আসে যায় কি ? সাবাস্—তুমি আমার লক্ষ লক্ষ আলিঙ্গন আশীর্বাদাদি জানিবে। কর্ম কর্ম কর্ম, হাম আওর কুছ নহি মাঙ্গতে হৈঁ—কর্ম কর্ম কর্ম—ইভেন আনটো ডেথ (মৃত্যু পর্যন্ত)। দুর্বলগুলোর কর্মবীর মহাবীর হতে হবে—টাকার জন্য ভয় নাই, টাকা উড়ে আসবে।

---

* বলা বাহুল্য পত্রচ্ছলে এটি কবির স্বগত মনন—একটি গভীর অনুভূতির প্রকাশ। মর্ত্যমমতা আশ্চর্য প্রাণময়তায় রূপ পেয়েছে এই পত্রটিতে।

টাকা যাদের লইবে, তারা নিজের নামে দিক, হানি কি ? কার নাম—কিসের নাম ? কে নাম চায় ? দূর কর নামে। ক্ষুধিতের পেটে অন্ন পৌছাতে যদি নাম ধাম সব রসাতলেও যায়, অহো ভাগ্য—মহাভাগ্যম্। ভ্যালা মোর ভাইরে, অ্যায়সাই চলো। (হৃদয়, শুধু হৃদয়ই জয়ী হয়ে থাকে—মস্তিষ্ক নয়)। পুঁথিপাতড়া বিদ্যেসিদ্যে, যোগ ধ্যান জ্ঞান—প্রেমের কাছে সব মূল সমান—প্রেমেই অণিমাদি সিদ্ধি, প্রেমেই ভক্তি, প্রেমেই জ্ঞান—প্রেমেই মুক্তি। এই তো পুজো, নরনারী-শরীরধারী প্রভুর পুজো, আর যা কিছু "নেদং যদিদমুপাসতে"। এই তো আরম্ভ, ঐরূপে আমরা ভারতবর্ষ—পৃথিবীটা ছেয়ে ফেলবো না ? তবে কি প্রভুর মাহাত্ম্য !

লোকে দেখুক, আমাদের প্রভুর পাদস্পর্শে লোকে দেবত্ব পায় কিনা ! এই নাম জীবন্মুক্তি, যখন সমস্ত "আমি"—স্বার্থ চলে গেছে।

তোমাদের চিরপ্রেমবদ্ধ
বিবেকানন্দ

কাজী নজরুল ইসলামের পত্র

(আজিজুল হাকিমকে লিখিত)

১১, ওয়েলেসলি স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০ ০১৩
৫. ১০. ২৯

কল্যাণীয়েষু,

এইমাত্র তোমার চিঠি ও কবিতা পেলাম। কবিতাটি "সওগাতে" দিলাম।

আমি চিঠির উত্তর দিই নে কারোর, এ বদনামটা কায়েম হয়ে গেছে। সময়ের অভাব বলেই দিতে পারি নে। পলিটিক্স, কাব্য, গান, আড্ডা ইত্যাদির চাপে আমার ভদ্রতার ভাদ্র-বধূ বহুদিন হল ঘোমটা টেনে ঘরের কোণ নিয়েছে।

তোমার কবিতা মাঝে মাঝে দেখছি 'মোহাম্মদী'তে, দু-একটা খুবই ভাল লেগেছে। ছন্দ ও ভাষা দুই ঘোড়াকেই তুমি বেশ আয়ত্ত করেছ। ভাবের নীহারিকা-লোক তোমার উজ্জ্বল গ্রহ হয়ে দেখা দেয় নি বলে অধৈর্য হয়ো না। ও দানা বাঁধতে একটু সময় লাগবে হয়তো।

তোমার সামনে আজও বিপুল ভবিষ্যৎ পড়ে রয়েছে, অসীম শূন্য তোমার চার পাশে, তোমার স্বপ্নলোকের নীহারিকা-পুঞ্জ আজো ব্যথাতুর। ওই ভাল, আমি হয়ে ওঠার চেয়ে সম্ভাবনাকে বেশি ভালোবাসি।

আমি এসেছি হঠাৎ ধূমকেতুর মত, হয়তো চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছি। কিন্তু এ বিস্ময় থাকবে না বেশি দিন। ধূমকেতু যেমন সহসা আসে, তেমনি সহসা চলে যায়। তোমরা আমাদের আকাশের অনাগত জ্যোতিষ্ক, গ্রহপুঞ্জ। তোমরা যেদিন রূপ ধরে উঠবে, সেদিন তোমাদের আড়াল করে থাকার কোন প্রয়োজন হবে না এ ধূমকেতুর। আমার সমস্ত লেখার কামনায় শুধু এই প্রার্থনাই ধ্বনিত হয়ে

উঠেছে—তোমরা এস অনাগত কবির দল, আমি ঘুম ভাঙ্গিয়ে দিয়ে গেলাম, তোমরা ভোরের পাখি, তাদের গান শুনাও।

জসীম, কাদির প্রভৃতিকে আমি ভালোবাসি আমার চেয়েও বেশী। আজ হতে তুমি তাদেরই একজন হলে যাদের আমি ভালোবাসি। সব সময়ে খবর যদি নাই দিতে পারি, মনে রাখব। আমার আন্তরিক শুভাশীষ ও স্নেহ গ্রহণ করো। ইতি—

শুভার্থী
নজরুল ইসলাম

সুভাষচন্দ্রের পত্র

লাহোরের পথে
২৪/১২/ ২৯

শ্রীচরণেষু,

মাগো, কিছুকাল যাবৎ······নানা প্রকার অশান্তি ও সংগ্রামের ভিতর দিয়া চলিতেছি। প্রত্যহ ইচ্ছা হয় একবার আপনার কাছে যাই—এবং আপনার স্নেহাশীর্বাদ লইয়া আসি। কিন্তু তাহা বুঝি হইবার নয়। কর্মের বন্ধন ছিন্ন করা কত কঠিন। তবে আপনার স্নেহাশীষ আমাকে ঘিরিয়া আছে—এই অনুভূতি আমাকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছে। যখন মনটা খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়ে তখন আপনার স্নেহাশীষ আবার আমায় সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। সত্যি সত্যি, আমার জীবনে আর কোন সম্পদ বা ভরসা নাই। যাহা করিতেছি—তাহা ঠিক করিতেছি কিনা জানি না—আপনি আমায় পথ দেখাইয়া সত্যের পথে রাখিবেন। আমার শত দোষ ত্রুটি ও অযোগ্যতা যেন আপনার আশীর্বাদের বলে আমি ত্যাগ করিতে পারি। আর কি লিখিব—লাহোরের পথে চলিতেছি। সেখানে কি হইবে জানি না।

বার বার আমায় পরাভূত করিবার জন্য শত্রুপক্ষেরা দল বাঁধিয়াছে—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছে। অদৃশ্য শক্তির বলে আমিও বার বার তাদের ব্যর্থ করিতে পারিয়াছি। শেষ পর্যন্ত কি হইবে তাহা অবশ্য বলিতে পারি না। তবে মনে রাখিবেন, সন্তানের জয় মানে মায়ের জয় ; সন্তানের পরাজয় মানে মায়ের পরাজয়।

আপনার অযোগ্য সন্তান
সুভাষ

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিষয় অবলম্বনে বন্ধুর কাছে চিঠি লেখ :

বিষয় : (ক) তোমার ভাললাগা মানুষটা।

(খ) আগামী ক্রিকেট মরশুমে বিদেশী খেলোয়াড়দের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য ভারতের কোন্ কোন্ খেলোয়াড় নিয়ে টিম গড়লে ভাল হয় ?

(গ) সাম্প্রতিক বাংলা আধুনিক গান কোন্ পথে ?
(ঘ) পরীক্ষায় অসাধুতা সম্পর্কে।
(ঙ) তোমার প্রিয় ক্রিকেট খেলোয়াড়।
(চ) তোমার প্রিয় ফুটবল খেলোয়াড়।
(ছ) একটি আনন্দোজ্জ্বল মুহূর্ত।
(জ) তোমার প্রিয় কোন্ গ্রন্থ।
(ঝ) বিদ্যালয়ের কোন অনুষ্ঠান।
(ঞ) ক্লাসের ছাত্ররা মিলে কোন উৎসব উপলক্ষে শখের বাজার বসানো।
(ট) ভালো ছেলে কাকে বলব।
(ঠ) বড়দের কাগজে ছোটোদের বিভাগ থাকা উচিত কিনা ?
(ড) তোমার চোখে একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর স্কুলের পরিকল্পনা।
(ঢ) বিদ্যালয়ে বিতর্ক সভার প্রয়োজনীয়তা।
(ণ) সাম্প্রতিক টেলিভিশন প্রোগ্রাম সম্বন্ধে তোমার বক্তব্য।
(ত) উচ্চ শিক্ষার্থে বিদেশ যাবার বাসনা সম্পর্কে। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]
(থ) ভ্রমণের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-১৯৮১]
(দ) মানবসভ্যতার বিকাশে বিজ্ঞানের ভূমিকা সম্পর্কে।
[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

২। ছোটো ভাইয়ের কাছে চিঠি লেখো :

বিষয় : (ক) ভোরবেলা ওঠার অভ্যাস।
(খ) গান শেখা।
(গ) 'হবি' থেকে ভবিষ্যতে কীভাবে উপকৃত হওয়া যায়।
(ঘ) সাঁতার শেখার প্রয়োজনীয়তা।
(ঙ) কর্মমুখী শিক্ষা সম্বন্ধে তোমার ধারণা।
(চ) ডিটেক্‌টিভ বই পড়া সম্বন্ধে তোমার অভিমত।
(ছ) পরীক্ষায় অসাধুতা।
(জ) অভিধান দেখার অভ্যাস।
(ঝ) বাড়ির লাইব্রেরি কীভাবে গড়ে উঠতে পারে।
(ঞ) রবিবারটা কীভাবে কাজে লাগানো যায়।

৩। তোমার মায়ের কাছে চিঠি লেখো :

বিষয় : হস্টেলে তোমার জীবন।
(খ) মায়ের অসুস্থতায় উদ্বেগ প্রকাশ করে।

৪। বাবার কাছে চিঠি লেখো :

বিষয় : (ক) তোমার ঈপ্সিত বৃত্তি।
(খ) বন্ধুদের সঙ্গে ভ্রমণে যাবার অনুমতি প্রার্থনা।
(গ) ছোটো ভাইয়ের পড়াশোনা সম্বন্ধে।

(ঘ) বোনকে নাচের স্কুলে ভর্তি হবার জন্যে।

(ঙ) তোমার পড়াশোনা সম্পর্কে।

(চ) ছাত্রজীবনে তুমি কেন রাজনীতিতে উৎসাহী হলে সে বিষয়ে তোমার অভিমত প্রকাশ করে। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৫। কোনো বিদেশী কলম বন্ধুকে :

বিষয় : (ক) এদেশের কোন ব্রত বা পার্বণ সম্বন্ধে।

(খ) শিক্ষা সাধনায় দেশের প্রগতি সম্পর্কে।

(গ) সাম্প্রতিক নাট্যপ্রচেষ্টা সম্পর্কে।

৬। তোমার বোনের কাছে :

বিষয় : (ক) পরীক্ষায় প্রথম হওয়ার সংবাদে আনন্দ প্রকাশ।

(খ) নতুন হার্মোনিয়ম কেনা সম্বন্ধে।

(গ) কোনো বিশেষ মাসিক পত্রিকার গ্রাহক হবার পরামর্শ দিয়ে।

৭। তোমার শিক্ষকের কাছে :

বিষয় : (ক) পরীক্ষা-প্রস্তুতিতে কোনো বিষয়ে অসুবিধার কথা জানিয়ে।

(খ) বাংলা ভাষায় কোন্ কোন্ অভিধান কিনলে ভালো হয় সে সম্পর্কে পরামর্শ চেয়ে।

(গ) দীর্ঘ অসুস্থতার পর শিক্ষকের আরোগ্যলাভের সংবাদে আনন্দ প্রকাশ করে।

(ঘ) পরীক্ষার পর রেজাল্ট বেরুনো অবধি প্রায় তিন মাস কীভাবে কাটাবে।

(ঙ) তোমার কলেজ লাইব্রেরির উন্নতির জন্য তোমার নিজস্ব কিছু পরিকল্পনা জানিয়ে অধ্যক্ষের নিকট আবেদন। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

(চ) কোনো অধ্যাপকের নিকট পড়াশুনার জন্য সাহায্যের আবেদন। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৮। অনুষ্ঠানপত্র রচনা কর :

বিষয় : (ক) তোমার স্কুলের সরস্বতী পূজা।

(খ) তোমাদের শ্রেণীকক্ষের কোনো সমস্যা।

(গ) তোমাদের সাংস্কৃতিক সংস্থার পক্ষ থেকে কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানে যোগ।

(ঘ) বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সভাপতি হবার অনুরোধ জানিয়ে।

(ঙ) তোমাদের সঙ্ঘে আয়োজিত একটি সাংস্কৃতিক উৎসবের আমন্ত্রণ-লিপি। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৯। প্রধান শিক্ষকের নিকট পত্র :

বিষয় : (ক) বিদ্যালয় কক্ষে অনুপস্থিতি মার্জনা করার অনুরোধ।

(খ) তোমাদের শ্রেণীকক্ষের কোনো সমস্যা।

(গ) একাদশ শ্রেণীতে ভর্তির সময় তোমার পূর্বনির্ধারিত কোনো বিষয় তুমি এখন পরিবর্তন করতে চাও সে সম্বন্ধে আবেদন।

১০। চাকুরির আবেদনপত্র :

বিষয় : (ক) কোনো বৃহৎ আমদানি-রপ্তানি আপিসে সেক্রেটারির পদ খালি আছে। সংবাদপত্রে তাহার বিজ্ঞাপন দেখিয়া দরখাস্ত লেখো।

(খ) কোনো কয়লাখনির মালিক কোম্পানির খনি-ম্যানেজার নিযুক্ত করিবে বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছে। তুমি নিজের যোগ্যতার পরিচয় দিয়া, নির্দিষ্ট মাহিনা এবং অন্যান্য সুবিধা-অসুবিধার কথা জানাইয়া দরখাস্ত রচনা করো।

(গ) কোনোও ব্যাঙ্কের কলিকাতাস্থ শাখার ম্যানেজার পদের জন্য দরখাস্ত করো।

(ঘ) তোমার অঞ্চলের পৌরসভায় স্থায়ী পদে করণিক ও কর আদায়কারী নিয়োগের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হইয়াছে। তোমার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্যান্য যোগ্যতাবলীর বিবরণসহ আবেদনপত্র পেশ কর।

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

১১। বাণিজ্যিক পত্র :

(ক) তোমার পণ্যের বাজার সৃষ্টি করিবার জন্য এক বিশেষ বিক্রয় প্রতিনিধিকে নয়াদিল্লীতে প্রেরণ করিতেছ। তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য নয়াদিল্লীর এক ব্যবসায়ী বন্ধুকে একখানি পত্র লিখ।

(খ) তোমার প্রতিষ্ঠানে কর্মপ্রার্থী জনৈক ব্যক্তির যোগ্যতা অনুসন্ধান করে কোনো ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানের কাছে একটি অনুসন্ধান-পত্র লেখ।

(গ) জাহাজডুবি হইয়া বিদেশ হইতে আমদানি করা মাল নষ্ট হইয়া গিয়াছে। উপযুক্ত স্থানে খেসারত দাবি করিয়া পত্রের মুসাবিদা করো।

(ঘ) তোমার চালানী মালের ক্ষতিপূরণ দাবি করিয়া রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে পত্র লেখো।

(ঙ) ক্রেতা প্রেরিত মালের সহিত চালান এবং বিল পাইয়াও এক মাসের মধ্যে টাকা শোধ করেন নাই। এক মাসের মধ্যে টাকা শোধ করিলেই ১২% কমিশন দিবার ব্যবস্থা আছে সে কথা স্মরণ করাইয়া আরও ১৫ দিন সেই সুযোগের মেয়াদ বর্ধিত করিয়া একখানি তাগাদা-পত্র রচনা করো।

(চ) উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার পরে তুমি স্বয়ংনিযুক্তি পরিচালনায় বিশেষ কোনো একটি কুটিরশিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠা করতে চাও। মূলধনের জন্য টাকার প্রয়োজন। কোনো ব্যাঙ্কের নিকট অর্থ ঋণের জন্যে আবেদনপত্র পেশ করো। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

(ছ) একটি নূতন ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে একটি প্রচারপত্র রচনা করো।

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

(জ) বিশেষ কারণে কোনো একটি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের কাছে প্রদত্ত ফরমাস বাতিল করিতে তুমি বাধ্য হইতেছ—ইহার কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত ব্যবসায়ীর উদ্দেশ্যে একটি পত্র লেখো।

গল্পরচনা

"নদী যেমন জলস্রোতের ধারা, মানুষ তেমনি গল্পের প্রবাহ। তাই পরস্পরের সঙ্গে দেখা হতেই প্রশ্ন এই,—'কী হল হে, কী খবর, তার পরে?' এই 'তার পরের' সঙ্গে 'তার পরে' বোনা হয়ে পৃথিবী জুড়ে মানুষের গল্প গাঁথা হচ্ছে।"—রবীন্দ্রনাথের এই উক্তিতে গল্পের সঙ্গে মানুষের নাড়ির যোগটি আশ্চর্য সুন্দর ভাবে ফুটেছে। গল্প আর গল্প—সারা পৃথিবীই গল্প বলে চলেছে। তবু বলতে ইচ্ছে করে—আমাদের দেশ গল্পের দেশ—শোলোক-বলা কাজলাদিদির দেশ। উপকথা রূপকথা—কত কথা। মায়ের সুধাঝরা কণ্ঠের গল্প কি এখনও তোমাদের মনে পড়ে না? 'ঠাকুরমার ঝুলি' আর 'ঠাকুর্দার ঝুলি' এখনও তোমরা ছোট্ট-ভাইবোনের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে পড় না? সত্যি, সে সুখস্মৃতি কোনো দিন মন থেকে মুছে যাবার নয়।

আমাদের জাতক, পঞ্চতন্ত্র, হিতোপদেশ, কথাসরিৎসাগর, বৃহৎকথামঞ্জরী, শুকসপ্ততি একদিন সারা পৃথিবীতে গল্প ছড়িয়েছে, আমাদেরই গল্প বিদেশ ঘুরে একটু ভিন্‌দেশীয় বেশে আমাদের দুয়ারে এসে বলে, 'দেখো তো আমাকে চিনতে পার কিনা!'

এই যে মুখে মুখে লোকপ্রবাদের ঘোরাফেরা, এদের পিছনেও তো কত গল্প, কত কল্পনা।

আমাদের কথকঠাকুরেরা কত গল্পই বলেছেন গল্পচ্ছলে। আর সেই দক্ষিণেশ্বরের পাগলা ঠাকুর গল্প করে করেই এমন কথা বললেন যা পৃথিবীর মানুষের কাছে কথামৃত।

এখন তো তোমরা বিখ্যাত লেখকদের কত আধুনিক গল্পই পড়ছ। যে-সব গল্পের কথা বললাম সেই ধরনের ছোট্ট গল্প রচনার অনুশীলনটা আগে কিছু করেই দেখো না। সূত্র থেকে গল্প লেখার অনুশীলন নিশ্চয় তোমরা এর আগে করেছ, তবু নিয়মগুলো একটু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

সংকেত-সূত্রের সম্প্রসারণ

১। সংকেত-সূত্রগুলো পর পর পড়ে তাদের যোগসূত্রটা বুঝে নাও।
২। প্রত্যেকটা অংশকেই দু-চারটে বাক্যে সম্প্রসারিত করতে হবে।
৩। সংকেতের মধ্যে অনুল্লিখিত অংশ কল্পনা করে নিতে হবে।
৪। সম্প্রসারিত অংশগুলো জুড়ে দেবার সময়ে স্পষ্ট বোঝা যায় এইভাবে তা করতে হবে।
৫। গল্পটাকে সজীব করবার জন্যে প্রত্যক্ষ উক্তি ব্যবহার করতে পার।
৬। অযথা অবান্তর বিষয়ের অবতারণা করে গল্পের কলেবর বৃদ্ধি করবে না।
৭। সম্পূর্ণ বিন্যাসটি এমন হবে যাতে পূর্ণাঙ্গ গল্পের আস্বাদ পাওয়া যায়।
৮। কোন নির্দিষ্ট সীমা না থাকলে এরকম গল্প ২০০ শব্দের অনধিক হবে।
৯। সম্প্রসারিত গল্পটির একটা নাম দিতে হবে। নাম দেওয়ার মধ্যে তোমার রসিক মনের পরিচয়টা ফুটে উঠবে।

ছোটোগল্প

এইভাবে যে-সব গল্প লিখবে কলেবরে ছোটো হলেও এর কোনোটিই কিন্তু পারিভাষিক অর্থে 'ছোটোগল্প' (Short story) নয়, তা তোমাদের না বললেও চলে।

রবীন্দ্রনাথের 'ছুটি', 'পোষ্টমাষ্টার' বা 'কাবুলিওয়ালা', শরৎচন্দ্রের 'মহেশ', প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ডাকহরকরা' তোমরা নিশ্চয় পড়েছ। পারিভাষিক অর্থে এই ধরনের গল্পকেই আমরা ছোটোগল্প বলি।

এই সব ছোটোগল্প কলেবরে ছোটো কিনা সে প্রশ্নই ওঠে না। বিশেষ এক প্রকাশভঙ্গি বা আঙ্গিকের জন্যেই এরা 'ছোটোগল্প'। ছোটোগল্পের শারীর লক্ষণটা বড়ো নয়, বড়ো এর আন্তর লক্ষণ—তা হল এর ব্যঞ্জনা। সেদিক থেকে একে কবিতাধর্মী বলা চলে। কান্নাহাসির দোল-দোলানো বিচিত্র এই জীবনের কোনো বিশিষ্ট একটি মুহূর্তকে চকিত বিদ্যুৎস্ফুরণে আলোকিত করে তোলাই ছোটোগল্পের কাজ। লেখকের ভাবকল্পনা বা ইম্প্রেশনের ক্ষণমুহূর্তকে অবলম্বন করেই ছোটোগল্প উদ্ভূত হয়ে দ্রুত পরিণতির দিকে ধাবমান হয়।

বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথই ছোটোগল্পের প্রবর্তক এবং শ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প-লেখক। তাঁরই লেখা ছোটোগল্পের লক্ষণ—কবিতাটি তাই উদ্ধৃত করি—

'ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারই দু'চারটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।'

ছোটোগল্পের লিখনপদ্ধতির আভাস এই কবিতার মধ্যেই আছে। ছোটোগল্প কীভাবে লিখতে হয়, বলে বোঝানো যায় না। অসংখ্য ছোটোগল্প বার বার পড়ে দেখলে তার আভাস পাওয়া যেতে পারে। হাতে ধরে আর যাই হোক ছোটোগল্প লেখা শেখানো যাবে না। তবু অনুশীলনের সুবিধার জন্যে কিছু নিয়ম লিপিবদ্ধ করা গেল :

কোনো দৃশ্য, ঘটনা, স্মৃতি বা মূর্তি তোমার মনে যে ছাপ ফেলবে সেই 'ছাপ'টাকেই অবয়ব দিতে হবে পরিবেশ আর চরিত্র সৃষ্টি করে।

অনেক আগে থেকে, 'এক-যে ছিল রাজা'র কায়দায় গল্প শুরু হয় না ছোটোগল্পে, গল্প হঠাৎই আরম্ভ হবে, হঠাৎই শেষ হবে।

আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত বজায় থাকবে প্রবহমাণতা বা দ্রুতগতি। অবান্তর বিষয় ছোটোগল্পে বর্জনীয়। শুধু স্থির উপসংহারে পৌঁছনোর জন্যে যতটুকু দরকার তার বেশি একটুও নয়। এই পরিমিতিবোধই ছোটোগল্পের প্রাণ।

সমাপ্তিতেই ছোটোগল্পের শুরু। অর্থাৎ কবিতার ব্যঞ্জনার মতোই ছোটোগল্পের ব্যঞ্জনা—'শেষ হয়ে হইল না শেষ।' মনের মধ্যে বাজতে থাকবে ছোটোগল্পের রেশ।

বিশেষ জীবন ছোটোগল্পে সর্বজনীন জীবনের প্রতিভাস হবে।

আয়তন আলোচ্যই নয়। ১ পৃষ্ঠা থেকে ২৫ পৃষ্ঠা বা তারও বেশি আয়তনেও ছোটোগল্প লেখা যেতে পারে।

পারিভাষিক অর্থে ছোটোগল্পের একটি উদাহরণ আমরা পরে দেব।

এখন সংকেত-সূত্র থেকে যে-ধরনের গল্প দ্বিতীয় পর্বে লিখতে দেওয়া হবে তার কিছু নিদর্শন দেওয়া যাক।

'গল্প'-সম্বন্ধে কয়েকটি বিশিষ্ট উক্তি

A story should, to please, at least seem true, be apropos, well told, concise, and new ; and whensoever it deviates from these rules, the wise will sleep and leave applause to fools.

— Edward Stilling Fleet (1635-99), Eng. Prelate.

No story is the same to us after the lapse of time ; or rather we who read it are no longer the same interpreters.

—George Eliot. (1819-80), Eng. Novelist

বড়ো গল্প··· মালবোঝাইওয়ালা·······ছোটো গল্প······বোঝা বইবার জন্যে নয়, একেবারে সে মার লাগায় মর্মে লঘু লম্ফে।—রবীন্দ্রনাথ

শুধু শিশু-বয়সের নয়, সকল দেশের মানুষই হল গল্পপোষ্য জীব।—রবীন্দ্রনাথ।

সংকেত-সূত্র থেকে স্বল্পদৈর্ঘ্যের গল্পরচনা

॥ ১ ॥

[**সংকেত :** ভগবান্ এলেন ভিখারীর রূপ ধরে—মানুষের কাছে কিছুই না পেয়ে এলেন বনে—তিন বন্ধু বানর, শেয়াল আর খরগোশের কাছে। বানর দিল ফল, শেয়াল দিল মাছ—খরগোশ কিছু না দিতে পেরে আগুন জ্বালতে বলল—সেই আগুনে ঝাঁপ দিল—ঝলসানো দেহটা অতিথির ভোগ্য হোক।]

ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই

সে অনেককাল আগেকার কথা। এক গভীর বনে থাকত এক বানর, এক শেয়াল আর এক খরগোশ। অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল তারা।

একদিন ভগবান্ এক ভিখিরির বেশ ধরে পৃথিবীতে এলেন। গ্রাম-শহর সবখানে ঘুরলেন, কিন্তু মানুষের কাছ থেকে পেলেন না কিছুই ; দয়া হল না কারো। এক ভিখিরির কাছ থেকে শুনলেন সেই বনের বানর, শেয়াল আর খরগোশের কথা। চললেন তাদের খোঁজে। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় কাতর হয়ে একটা পাথরের উপর বসে পড়লেন

বনের মধ্যে। সঙ্গে সঙ্গে কাছে এল সেই তিন বন্ধু। তাদের বললেন, 'কিছু খাই নি আমি। দোহাই তোমাদের, কিছু খেতে দাও আমাকে।' বানর দৌড়ে গিয়ে কিছু বুনো ফল যোগাড় করে আনল। শেয়াল দৌড়ে গেল নদীর ধারে, ধরে আনল কিছু মাছ। খরগোশ শুকনো মুখে ফিরে এল, কিছুই যোগাড় করতে না পেরে। ভিখিরি বললেন, 'তুমি দেবে না কিছু?' মুখ নিচু করে রইল খরগোশ, বলল, 'ওদের মতো আমার বুদ্ধি নেই যে।' তারপর হঠাৎ কী ভেবে খরগোশ যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠল। বন্ধুদের বলল, 'শুকনো পাতা আর খড়কুটো যোগাড় করে আগুন জ্বালো দেখি।' গনগনে আগুন জ্বালল বানর আর শেয়াল। কিন্তু কেন এই আগুন বুঝল না ওরা। হঠাৎ সেই লকলকে আগুনের শিখায় ঝাঁপিয়ে পড়ল খরগোশ, ভিখিরিকে বলল, 'একটু অপেক্ষা করো, আমার ঝলসানো দেহটা খেয়েই তুমি খিদে মিটিয়ো।'

ঝলসানো দেহটাকে আগুন থেকে তুলে বুকে চেপে ধরলেন ভগবান্ ভিখিরি। খরগোশ চিরদিনের জন্য ঠাঁই পেল চন্দ্রলোকে।

॥ ২ ॥

[**সংকেত:** বিষাক্ত বাণ গাছে বিঁধে গাছটা বিষিয়ে গেল—কোটরের পাখিটা তাকে ছেড়ে গেল না—ইন্দ্র এলেন, পাখিটাকে অন্যত্র যেতে বললেন—সুখ-দুঃখের সাথীকে ছেড়ে তবু যাবে না পাখিটা—ইন্দ্রের বরে সজীব হয়ে ওঠে গাছটা।]

সুখ-দুঃখের সাথী

ব্যাধ বিষাক্ত বাণ ছুঁড়লো হরিণের দিকে।

লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। বাণ বিঁধল গিয়ে বড়ো একটা গাছে। সমস্ত গাছটাই ক্রমে বিষিয়ে উঠল। পাতা পড়ল খসে, শুকিয়ে গেল গাছটা। গাছটার কোটরে থাকত এক টিয়াপাখি। গাছটাকে সে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসত। কোটরেই রয়ে গেল সে; গাছটাকে ছেড়ে গেল না। কোটর থেকে সে বেরোতই না, খেত না কিছুই। ক্রমে সেও গেল শুকিয়ে। তবু মনে মনে বলল, 'মরতে হয় একই সঙ্গে মরব দুজন।'

স্বর্গের রাজা ইন্দ্র এলেন পাখিটার কাছে, বললেন, 'এ গাছটা ছেড়ে না গেলে যে তুমি বাঁচবে না।'

টিয়া বলল, 'দেবরাজ, আমি এ গাছেই জন্মেছি, এ গাছেই বড়ো হয়েছি, আমাকে সন্তানের মতো বুকে করে রেখেছে এই গাছ। আমার সুখ-দুঃখের সাথী এই গাছটিকে এ অবস্থায় ফেলে রেখে আমি স্বর্গেও যেতে চাই না।'

ইন্দ্র বললেন, 'তোমাকে আমি বর দিতে চাই, পাখি।' টিয়া বলল, 'তা হলে এই বর দাও দেবরাজ, এ গাছটা যেন আবার আগের মতো সজীব সতেজ হয়ে ওঠে।' ইন্দ্র সুধা ছড়িয়ে দিলেন গাছটার গায়ে। গাছটা আবার ফিরে পেল তার ফুল-ফল-পাতা, হাওয়ায় দুলতে লাগল তার শাখা-প্রশাখা। পাখিরা এসে বসল তার ডালে। টিয়ার আনন্দ আর ধরে না। টিয়ার মৃত্যুর পর স্বর্গের কোন্ দুর্লভ স্থানটিতে তাকে রাখবেন ইন্দ্র আগে থেকেই ভেবে রাখলেন।

॥ ৩ ॥

[**সংকেত :** ছেলের কাপড়ে রক্তের দাগ দেখে মা চিন্তিত। ছেলে বলে—কুড়োল দিয়ে পা চেঁছে পরখ করছিলাম কেমন লাগে, পলাশ গাছটারও তাহলে এমনি লেগেছে। মা লজ্জিত হলেন, তিনিই পলাশের ছাল চেয়েছিলেন। ছেলেটি হয়েছিল বিখ্যাত ঋষি নামদেব।)

নিজেকে দিয়ে

—বাছা, তোর কাপড়ে রক্তের দাগ কেন?

—আমি কুড়ুল দিয়ে পায়ে আঁচড় কেটেছিলাম, মা।

—বলিস কী?

বালক নামদেব মাকে দেখালো। কুড়ুল দিয়ে সত্যিই সে পায়ের অনেকটা জখম করেছে।

—এ তুই করেছিস কী, বল তো? নিজের পায়ে কি কেউ কুড়ুল দেয়? পা যদি পেকে ফুলে ওঠে, জন্মের মতো খোঁড়া হয়ে যাবি যে!

—তা হলে মা, গাছও তো একইভাবে ঘায়েল হয় কুড়ুলের আঘাতে। সেদিন তুমি পলাশ গাছের ছাল আনতে বললে। আমি কুড়ুল দিয়ে পলাশের ছাল ছাড়িয়ে আনলাম। আমার মনে হল কুড়ুল দিয়ে পায়ের ছাল ছাড়িয়ে একটু দেখি আমার কেমন লাগে। পলাশ গাছটার কেমন লেগেছে সেটা বোঝবার জন্যেই আমি এমন করেছি।

মায়ের মনে পড়ল, সত্যি তিনি ছেলেকে পলাশের ছাল ছাড়িয়ে আনতে বলে-ছিলেন। মা কেঁদে বললেন, তুই বড়ো হলে একজন মহৎ প্রাণের মানুষ হবি, নামু।

মানুষের মতো গাছপালারও বেদনাবোধ আছে এই কথাই সেদিন বুঝেছিল বালক নামু।

এই নামুই একদিন হলেন প্রখ্যাত সাধক নামদেব।

॥ ৪ ॥

[**সংকেত :** আলো ঝলমল আকাশে তাকিয়ে উজীর বললেন, 'বাঃ, কী সুন্দর তারা, দেখছ তো?' সবাই বলল, দেখছি বৈকি?—একজন শুধু বলল, 'দিনে তারা যারা দেখছে হয় তাদের চোখ খারাপ, না হয় আমার নিজের।']

দিনের আলোয় তারা

দিনটা ছিল রোদে ঝলমল। সূর্য তখন মাঝ আকাশে। উজীর তাঁর কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন। হঠাৎ তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখতে পাচ্ছো, অজস্র তারা ঝিকমিক করছে আকাশে? কী অপূর্ব দৃশ্য!' কর্মচারীরা তৎক্ষণাৎ বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দেখতে পাচ্ছি বৈ কি? অজস্র তারা ঝিকমিক করছে আকাশে।'

কর্মচারীদের মধ্যে একজন চুপ করে রইল। উজীর তাকে বললেন, 'তুমি চুপ করে রইলে যে? দেখতে পাচ্ছো না তারা?' কর্মচারীটি বিরক্ত হয়ে বলল, 'চোখ-ধাঁধানো সূর্যের আলোয় আমি তো ছাই কিছুই দেখছি না, প্রখর সূর্যের আলোয় তাকিয়ে চোখ জলে ভরে যাচ্ছে। হয় আমার চোখ খারাপ, না হলে আপনাদের।'

উজীর এই স্পষ্ট জবাব শুনে রেগে না গিয়ে বরং খুশি হলেন। তাকে সৎসাহসের জন্যে পুরস্কৃত করলেন। আর মোসাহেবির জন্যে অন্য কর্মচারীদের তিরস্কার করলেন।

(হিমাচল প্রদেশের লোককথা)

॥ ৫ ॥

[**সংকেত :** রাজা উদয়গিরি মৃগয়ায় বেরিয়ে সুন্দর একটা গ্রামে এসে চাইলেন গ্রামটাকে নিজের রাজ্যে জুড়ে নিতে—ওটা জেলেদের গাঁ—প্রচণ্ড যুদ্ধ, হার মানছে না জেলেরা—রাজা নিজেই এলেন যুদ্ধ-পরিচালনায়—এই সময়ে এক বৃদ্ধ এসে একটা ছোট্ট কাঁটার মাপে সোনা চাইল—সব সোনা উজাড় করেও ঐ এক রত্তি কাঁটার ওজন হয় না—বৃদ্ধ বলে ওটা হল লোভের কাঁটা, অনেক রাজ্য গ্রাস করলেও তার ওজন ঐ লোভের কাঁটার সমান হবে না। রাজা তাঁর ভুল বুঝলেন।]

লোভের কাঁটা

রাজা উদয়গিরির লোভ গেল না একটার পর একটা অন্যের রাজ্য গ্রাস করেও। একদিন মৃগয়ায় বেরিয়ে তিনি সুন্দর এক গ্রামে এসে পড়লেন। সেখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশ তাঁর মন কেড়ে নিল। মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রশ্ন করে জানলেন গ্রামটি তাঁর রাজ্যের মধ্যে নয়। এটি জেলেদের গ্রাম। উদয়গিরি গ্রাম দখলের জন্যে সৈন্য পাঠালেন। জেলেরা জীবনপণ লড়াই করল, রক্তের নদী বইল শুধু। কেবল লাঠি সম্বল করে জেলেরা রাজার সৈন্যদের সঙ্গে লড়বে কী করে? কিন্তু অসম্ভব তাদের মনোবল। প্রাণ দিয়েও তারা গ্রাম বাঁচাতে প্রস্তুত। শেষে রাজা নিজেই এলেন যুদ্ধ পরিচালনা করতে। এমন সময়ে এক বৃদ্ধ তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন একটি মাছের কাঁটা নিয়ে। বললেন, 'এই কাঁটার ওজনের সোনা পেলেই চলে যাব, রাজামশাই। ব্যস্ততার মধ্যে আর আপনাকে বিরক্ত করব না।' রাজা হুকুম দিলেন ঐ কাঁটার মাপের সোনা দিয়ে বুড়োটাকে বিদেয় করতে। ভাবলেন, এক রত্তি সোনা বৈ তো নয়। কিন্তু ওজন করতে গিয়ে দেখা গেল ভরি ভরি সোনাও কাঁটার ওজনের সমান হচ্ছে না। রাজার কেমন জেদ চেপে গেল, রাজকোষ শূন্য করেও মান রাখবেন তিনি। যত সোনা লাগে, ওজন করো। কিন্তু রাজার তাল তাল সোনার চেয়েও যে ঐ একরত্তি কাঁটার ভার বেশি। ব্যাপার কী?

বৃদ্ধ বিস্মিত রাজাকে বললেন, এটা হল আপনার লোভের কাঁটা। অনেক রাজ্য গ্রাস করেছেন, করবেন আরও, কিন্তু ঐ লোভের কাঁটার ওজনের সমান আর কিছুতেই হবে না। কাঁটাটা আপনার কাছেই থাক।

লজ্জিত হলেন রাজা। মুহূর্তে নিজের হিংস্র লোভী চেহারাটা যেন দেখতে পেলেন তিনি। প্রতিজ্ঞা করলেন, অন্যের রাজ্য আর তিনি দখল করবেন না। বৃদ্ধের চরণ বন্দনা করতে চাইলেন তিনি। কিন্তু কোথায় বৃদ্ধ! নিমেষে অন্তর্হিত হয়েছেন তিনি।

(হিমাচল প্রদেশের লোককথা)

॥ ৬ ॥

[**সংকেত :** ছেলে শ্বশুরবাড়ি যাবে। মা তালিম দিলেন—উঁচু আসনে বসবি, হাল্কা কথা বলবি না মোটে—ছেলে বুঝে গেল—শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে খড়ের গাদায় বসল—শাশুড়ীর জিজ্ঞাসার জবাবে শুধু ভারি ভারি কথা বলল—বলল হাতুড়ি, কুড়ুলের মাথা, জাঁতা।]

উঁচু আসন যথা, ভার-ভারিক্কি কথা

গরিব ঘরের ছেলের বিয়ে হল বড়োলোকের ঘরে। শ্বশুরবাড়িতে এই প্রথম যাবে

সে। মা একটু তালিম দিতে চাইলেন ছেলেকে, বড়োঘরের আদবকায়দা তো ছেলে জানে না। মা বললেন, দেখ বাছা, নিচুতে বসিস নে। একটু উঁচু জায়গা দেখে বসিস। আর হাল্কা কথা বলিস না, ওজনদার কথা বলিস। ছেলে বলল, কিচ্ছু ভেবো না, মা। মা নিশ্চিন্ত হলেন।

শ্বশুরবাড়িতে পৌঁছুতেই হৈচৈ পড়ে গেল। তাকে বসবার জন্যে মাদুর দেওয়া হল। কিন্তু মাতৃভক্ত ছেলে উঁচু খড়ের গাদায় বসল।

শাশুড়ী ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'ও কী বাবা? নিচে এসে মাদুরে বসো।'

জামাই বলল, 'হাতুড়ি'।

—'হাতুড়ি? হাতুড়ি দিয়ে কী হবে বাবা?'

—'কুড়ুলের মাথা।'

—'সে কী বাবা, কুড়ুলের মাথা দিয়ে কী করবে?'

—'জাঁতা।'

শাশুড়ী এমন জবাব পেয়ে হাসবেন না কাঁদবেন ঠিক করতে পারলেন না। তিনি তো বুঝলেন না যে, জামাই তাঁর হাল্কা কথা বলতে চান না, যে কথাই বলবেন তা হবে ওজনদার।

শাশুড়ী হাঁ করে না থাকলে জাঁতার পর ঢেঁকি, হাতি আরও কী বেরুতো জামাইয়ের মুখ থেকে তার ঠিকঠিকানা নেই। (কেরালার লোককথা)

॥ ৭ ॥

[**সংকেত :** আয়না কুড়িয়ে পেয়ে চাষী নিজের মুখ দেখে ভাবে বাপের মুখ, স্বামী বাইরে গেলে বৌ তা নিয়ে দেখে এক স্ত্রীলোকের মুখ—তাই নিয়ে ঝগড়া—দুজনের মুখ পাশাপাশি হওয়ায় ওরা দেখে বাপও বটে স্ত্রীলোকও বটে—ভুল ভাঙে, বৌয়ের রাগ পড়ে।]

আয়না

তখন আয়না জিনিসটা কী, কেউ জানতো না। এক চাষী তো একটা আয়না কুড়িয়ে পেল। আয়নাটা চোখের সামনে ধরতেই সে দেখল অবিকল তার বাবার মতো একজন, বাবাই নিশ্চয়। সে যে তার নিজের মুখই দেখছে এ কথা তার মনে হল না। তার মুখের সঙ্গে বাবার মুখের মিল ছিল খুবই, তাই সে ভাবল আয়নায় তার বাবার মুখই দেখছে। বাবা মারা গিয়েছে কিছুদিন হল। আয়নাটাকে সে যত্ন করে একটা বাক্সের মধ্যে রেখে দিল। মাঝে মাঝে লুকিয়ে লুকিয়ে আয়নায় বাবার মুখ দেখত। চাষী-বৌ দেখে ফেলল একদিন—স্বামী বাক্স থেকে কী একটা চক্‌চকে জিনিস বের করে অনেকক্ষণ ধরে দেখে, আবার রেখে দেয়। চাষী কাজে বেরিয়ে গেলে, চাষী-বৌ জিনিসটা বের করে চোখের সামনে ধরতেই তার পিত্তি জ্বলে গেল—এ কোন্ মেয়ে গো? স্বামীর উপর দারুণ চটল সে। আসলে সে তো তারই মুখ দেখল আয়নায়। কিন্তু নিজের মুখ আয়নায় তো দেখে নি কোনো দিন, তার মনে হল অন্য এক স্ত্রীলোক নিশ্চয়। চাষী বাড়ি এলে সে খাবার দিল না।

—'খাবার দাও গো।'

ঐ বাক্সের কন্যা দিক, আমি দিতে পারব না।

চাষী বোকার মতো চেয়ে রইল। বৌ ঝাঁজিয়ে উঠল, 'আ মরণ আমার! কিছু জানেন না, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানেন না।' এই বলে বাক্স থেকে সেই আয়না বের করে বলল, 'বলো, কে এই কন্যে?

চাষী বলল, 'কন্যে কী? আমার বাবা'।

—'কন্যে।'

—'বাবা।'

দুজনের মাথা কাছে আসতেই সামনে ধরা আয়নায় দুজনেরই মূর্তি ধরা দিল। হয়ে গেল বাবা-কন্যে। অর্থাৎ চাষীর মুখ, চাষী-বৌ-এর মুখ দুই-ই দেখা গেল।

দুজনেই অবাক হল। অনেক চিন্তা করে শেষে বুঝল, আসলে তারা নিজেরদের মুখই দেখেছে। চাষী-বৌ লজ্জা পেয়ে খাবার আনতে ছুটল স্বামীর জন্যে।

(কেরালার লোককথা)

॥ ৮ ॥

[**সংকেত :** সাতটা পিঠের কে বেশির ভাগ খাবে তাই নিয়ে কর্তা-গিন্নীর ঝগড়া—অনশন—রফা : যে আগে কথা বলবে সে তিনটে খাবে, আর যে পরে বলবে সে চারটা—কেউ কথা বলে না—পড়শীরা দরজা ভেঙে ঢোকে—তবু চুপচাপ—শ্মশান-যাত্রা...মাটিতে রাখতেই গিন্নী বলল, আমি তিনটে খাব, তুই চারটে। পড়শীরা ছিল সাতজন...ভাবল ভূত হয়ে খাবে আমাদের। চম্পট...সারা শহর উজাড়---প্রাসাদ ছেড়ে ভয়ে পালায় রাজা...কর্তা-গিন্নির শূন্য প্রাসাদে নতুন ঘর-কন্না।]

তিন-চার চার-তিন

কর্তাগিন্নিতে তুমুল ঝগড়া। পিঠে তৈরি হয়েছে সাতটা। গিন্নি বলে, 'আমি তৈরি করেছি, আমি বেশি খাব। আমি চারটে, তুমি তিনটে।'

কর্তা বলে, 'আমার পয়সার জিনিস। তাই আমি খাব চারটে, আর তুমি তিনটে।'

ঝগড়ার নিষ্পত্তি হল না। দুজনেই ক্লান্ত হয়ে না খেয়েই শুয়ে পড়ল। মাঝরাতে কর্তা বলল, 'যে আগে কথা বলবে সে পাবে তিনটে, আর যে চুপ করে থাকতে পারবে সেই পাবে চারটে।' গিন্নি রাজী হল।

ভোর হল। দিন গেল, রাত হল। এইভাবে দুদিন কাটল। পড়শীরা ভাবল 'ব্যাপার কী? ও বাড়ির কর্তা-গিন্নির হল কী?' তারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখল দুজনে মাটিতে চুপচাপ মরার মতো পড়ে আছে। তারা সমস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?' কেউ জবাব দিল না। তারা ভাবল মরেই গিয়েছে নিশ্চয়। তারপর সাতজন মিলে তাদের বয়ে নিয়ে চলল শ্মশানে। মাটিতে রাখতেই গিন্নি বলল, 'ঠিক আছে, আমি তিনটে খাব, তুমি চারটে খাবে।' শববাহক সাতজন শিউরে উঠল। ওরা ভাবল কর্তা-গিন্নি মরে ভূত হয়েছে। তাদের ভাগাভাগি করে খেতে চায়। ওরা কালবিলম্ব না করে দৌড়ুতে শুরু করল। কর্তা-গিন্নিও ওদের পিছনে পিছনে ছুটল। ওদের

ভয় তাতে আরও বেড়ে গেল। গোটা শহরের মানুষকে ওরা বোঝালো আসলে ওরা ভূত। শেষ পর্যন্ত শহর ফাঁকা হয়ে গেল। রাজপ্রাসাদ শূন্য! কর্তা-গিন্নি ক্লান্ত হয়ে রাজপ্রাসাদে ঠাঁই নিল। সুখেই দিন কাটাতে লাগল। পৃথিবীতে ভূতের ভয়ের সূত্রপাত নাকি এ থেকেই।

॥ ৯ ॥

[**সংকেত :** খরিদ্দারেরা পরম বৈষ্ণব জেনে স্যাঁকরার কাছে টাকা দিল। সেখানে শুধু রব, ...কেশব, গোপাল, হরি, হর।..."এত ভক্ত যে কারো সন্দেহ হবার জো নেই,...কেশব, গোপাল, হরি, হর" যে প্রশ্নোত্তরে খরিদ্দার ঠকানোর সংকেত-ভাষা তা কে জানতো?]

কেশব-গোপাল-হরি-হর

এক জায়গায় একটি স্যাঁকরার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, তিলকসেবা, হাতে হরিনামের ঝুলি, আর মুখে সর্বদাই হরিনাম। সাধু বললেই হয়, তবে পেটের দায়ে স্যাঁকরার কর্ম করা। ছেলেমেয়েদের তো খাওয়াতে হবে। পরম বৈষ্ণব, এ কথা শুনে অনেক খরিদ্দার তাদেরই দোকানে আসে। কেননা, তারা জানে যে, এদের দোকানে সোনারূপার গোলমাল হবে না। খরিদ্দার দোকানে গিয়ে দেখে যে, মুখে হরিনাম করছে, আর বসে বসে কাজকর্ম করছে। খরিদ্দার যেই গিয়ে বসল, একজন বলে উঠল, 'কেশব! কেশব!' খানিকক্ষণ পরে আর একজন বলে উঠল, 'গোপাল! গোপাল! গোপাল!' আবার একটু কথাবার্তা হতে না হতেই আর একজন বলে উঠল—'হরি! হরি! হরি'! গয়না গড়াবার কথা যখন একরকম ফুরিয়ে এল, তখন আর একজন বলে উঠল—'হর! হর ! হর!' কাজে কাজেই এত ভক্তি-প্রেম দেখে তারা স্যাঁকরাদের কাছে টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হল, জানে যে এরা কখনও ঠকাবে না।

কিন্তু কথা কী জানো? খরিদ্দার আসবার পর যে বলছিল, 'কেশব! কেশব!' তার মানে এই, এরা কারা? অর্থাৎ যে খরিদ্দারেরা এল এরা সব কে? যে বলল, 'গোপাল! গোপাল!' তার মানে এই, এরা দেখছি গোরুর পাল, গোরুর পাল। যে বললে, 'হরি! হরি!' তার মানে এই, যেকালে দেখছি গোরুর পাল, সে স্থলে হরি অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বললে, 'হর! হর!' তার মানে এই, যেকালে গোরুর পাল দেখছ, সেকালে সর্বস্ব হরণ করো। এই তারা পরম ভক্ত সাধু।

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৫ম : পরিশিষ্ট)

॥ ১০ ॥

[**সংকেত :** অনাবৃষ্টি...এক চাষার রোখ...মাটি খুঁড়ে খানা আর নদী এক ক'রে দেব...খুঁড়ে চলছে সে...মেয়ে এল ডাকতে, শেষে এল বৌ...চাষী তাড়িয়ে দিল ওদের...যে কথা সেই কাজ, খানা-নদী এক হল, হু হু করে জল এল মাঠে...এবার চাষীও খেয়েদেয়ে ঘুমোল।]

খানা-নদী এক

এক দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষীরা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে।

—'খাবার দাও গো।'

ঐ বাক্সের কন্যা দিক, আমি দিতে পারব না।

চাষী বোকার মতো চেয়ে রইল। বৌ ঝাঁজিয়ে উঠল, 'আ মরণ আমার! কিছু জানেন না, ভাজা মাছ উল্টে খেতে জানেন না।' এই বলে বাক্স থেকে সেই আয়না বের করে বলল, 'বলো, কে এই কন্যে?

চাষী বলল, 'কন্যে কী? আমার বাবা'।

—'কন্যে।'

—'বাবা।'

দুজনের মাথা কাছে আসতেই সামনে ধরা আয়নায় দুজনেরই মূর্তি ধরা দিল। হয়ে গেল বাবা-কন্যে। অর্থাৎ চাষীর মুখ, চাষী-বৌ-এর মুখ দুই-ই দেখা গেল।

দুজনেই অবাক হল। অনেক চিন্তা করে শেষে বুঝল, আসলে তারা নিজেরদের মুখই দেখেছে। চাষী-বৌ লজ্জা পেয়ে খাবার আনতে ছুটল স্বামীর জন্যে।

(কেরালার লোককথা)

॥ ৮ ॥

[**সংকেত :** সাতটা পিঠের কে বেশির ভাগ খাবে তাই নিয়ে কর্তা-গিন্নীর ঝগড়া—অনশন—রফা : যে আগে কথা বলবে সে তিনটে খাবে, আর যে পরে বলবে সে চারটা—কেউ কথা বলে না—পড়শীরা দরজা ভেঙে ঢোকে—তবু চুপচাপ—শ্মশান-যাত্রা...মাটিতে রাখতেই গিন্নী বলল, আমি তিনটে খাব, তুই চারটে। পড়শীরা ছিল সাতজন...ভাবল ভূত হয়ে খাবে আমাদের। চম্পট...সারা শহর উজাড়---প্রাসাদ ছেড়ে ভয়ে পালায় রাজা...কর্তা-গিন্নির শূন্য প্রাসাদে নতুন ঘর-কন্না।]

তিন-চার চার-তিন

কর্তাগিন্নিতে তুমুল ঝগড়া। পিঠে তৈরি হয়েছে সাতটা। গিন্নি বলে, 'আমি তৈরি করেছি, আমি বেশি খাব। আমি চারটে, তুমি তিনটে।'

কর্তা বলে, 'আমার পয়সার জিনিস। তাই আমি খাব চারটে, আর তুমি তিনটে।'

ঝগড়ার নিষ্পত্তি হল না। দুজনেই ক্লান্ত হয়ে না খেয়েই শুয়ে পড়ল। মাঝরাতে কর্তা বলল, 'যে আগে কথা বলবে সে পাবে তিনটে, আর যে চুপ করে থাকতে পারবে সেই পাবে চারটে।' গিন্নি রাজী হল।

ভোর হল। দিন গেল, রাত হল। এইভাবে দুদিন কাটল। পড়শীরা ভাবল 'ব্যাপার কী? ও বাড়ির কর্তা-গিন্নির হল কী?' তারা দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকে দেখল দুজনে মাটিতে চুপচাপ মরার মতো পড়ে আছে। তারা সমস্বরে জিজ্ঞেস করল, 'কী হয়েছে?' কেউ জবাব দিল না। তারা ভাবল মরেই গিয়েছে নিশ্চয়। তারপর সাতজন মিলে তাদের বয়ে নিয়ে চলল শ্মশানে। মাটিতে রাখতেই গিন্নি বলল, 'ঠিক আছে, আমি তিনটে খাব, তুমি চারটে খাবে।' শববাহক সাতজন শিউরে উঠল। ওরা ভাবল কর্তা-গিন্নি মরে ভূত হয়েছে। তাদের ভাগাভাগি করে খেতে চায়। ওরা কালবিলম্ব না করে দৌড়ুতে শুরু করল। কর্তা-গিন্নিও ওদের পিছনে পিছনে ছুটল। ওদের

ভয় তাতে আরও বেড়ে গেল। গোটা শহরের মানুষকে ওরা বোঝালো আসলে ওরা ভূত। শেষ পর্যন্ত শহর ফাঁকা হয়ে গেল। রাজপ্রাসাদ শূন্য! কর্তা-গিন্নি ক্লান্ত হয়ে রাজপ্রাসাদে ঠাঁই নিল। সুখেই দিন কাটাতে লাগল। পৃথিবীতে ভূতের ভয়ের সূত্রপাত নাকি এ থেকেই।

॥ ৯ ॥

[**সংকেত:** খরিদ্দারেরা পরম বৈষ্ণব জেনে স্যাঁকরার কাছে টাকা দিল। সেখানে শুধু রব, ...কেশব, গোপাল, হরি, হর।..."এত ভক্ত যে কারো সন্দেহ হবার জো নেই,...কেশব, গোপাল, হরি, হর" যে প্রশ্নোত্তরে খরিদ্দার ঠকানোর সংকেত-ভাষা তা কে জানতো?]

কেশব-গোপাল-হরি-হর

এক জায়গায় একটি স্যাঁকরার দোকান আছে। তারা পরম বৈষ্ণব, গলায় মালা, তিলকসেবা, হাতে হরিনামের ঝুলি, আর মুখে সর্বদাই হরিনাম। সাধু বললেই হয়, তবে পেটের দায়ে স্যাঁকরার কর্ম করা। ছেলেমেয়েদের তো খাওয়াতে হবে। পরম বৈষ্ণব, এ কথা শুনে অনেক খরিদ্দার তাদেরই দোকানে আসে। কেননা, তারা জানে যে, এদের দোকানে সোনারূপার গোলমাল হবে না। খরিদ্দার দোকানে গিয়ে দেখে যে, মুখে হরিনাম করছে, আর বসে বসে কাজকর্ম করছে। খরিদ্দার যেই গিয়ে বসল, একজন বলে উঠল, 'কেশব! কেশব!' খানিকক্ষণ পরে আর একজন বলে উঠল, 'গোপাল! গোপাল! গোপাল!' আবার একটু কথাবার্তা হতে না হতেই আর একজন বলে উঠল—'হরি! হরি! হরি'! গয়না গড়াবার কথা যখন একরকম ফুরিয়ে এল, তখন আর একজন বলে উঠল—'হর! হর ! হর!' কাজে কাজেই এত ভক্তি-প্রেম দেখে তারা স্যাঁকরাদের কাছে টাকাকড়ি দিয়ে নিশ্চিন্ত হল, জানে যে এরা কখনও ঠকাবে না।

কিন্তু কথা কী জানো? খরিদ্দার আসবার পর যে বলছিল, 'কেশব! কেশব!' তার মানে এই, এরা কারা? অর্থাৎ যে খরিদ্দারেরা এল এরা সব কে? যে বলল, 'গোপাল! গোপাল!' তার মানে এই, এরা দেখছি গোরুর পাল, গোরুর পাল। যে বললে, 'হরি! হরি!' তার মানে এই, যেকালে দেখছি গোরুর পাল, সে স্থলে হরি অর্থাৎ হরণ করি। আর যে বললে, 'হর! হর!' তার মানে এই, যেকালে গোরুর পাল দেখছ, সেকালে সর্বস্ব হরণ করো। এই তারা পরম ভক্ত সাধু।

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত ৫ম: পরিশিষ্ট)

॥ ১০ ॥

[**সংকেত:** অনাবৃষ্টি...এক চাষার রোখ...মাটি খুঁড়ে খানা আর নদী এক ক'রে দেব...খুঁড়ে চলছে সে...মেয়ে এল ডাকতে, শেষে এল বৌ...চাষী তাড়িয়ে দিল ওদের...যে কথা সেই কাজ, খানা-নদী এক হল, হু হু করে জল এল মাঠে...এবার চাষীও খেয়েদেয়ে ঘুমোল।]

খানা-নদী এক

এক দেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষীরা সব খানা কেটে দূর থেকে জল আনছে।

একজন চাষার খুব রোখ আছে; সে একদিন প্রতিজ্ঞা করলে, যতক্ষণ না জল আসে, খানা নদীর সঙ্গে এক না হয়, ততক্ষণ খুঁড়ে যাবে।

এদিকে স্নান করবার বেলা হল। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিল। মেয়ে বললে—'বাবা! বেলা হয়েছে, তেল মেখে নেয়ে ফেল।' সে বললে, 'তুই যা, আমার এখন কাজ আছে।' বেলা দুই প্রহর হল, তখনও চাষা মাঠে কাজ করছে। স্নান করার নামটি নেই। তার স্ত্রী তখন মাঠে এসে বললে, 'এখনও নাও নাই কেন? ভাত জুড়িয়ে গেল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি। না হয় কাল করবে, কি খেয়েদেয়েই করবে।' গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে তাড়া করলে; আর বললে, 'তোর আক্কেল নেই? না খেয়ে সব মারা যাবি! আমি প্রতিজ্ঞা করেছি, মাঠে আজ জল আনব তবে নাওয়া-খাওয়ার কথা কব।' স্ত্রী গতিক দেখে দৌড়ে পালিয়ে গেল। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে খানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। তখন এক ধারে বসে দেখতে লাগল যে, নদীর জল মাঠে কুলকুল করে আসছে। তার মন তখন শান্ত আর আনন্দে পূর্ণ হল। বাড়ি গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বললে, 'নে, এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ।' তারপর নিশ্চিন্ত হয়ে নেয়ে-খেয়ে সুখে ভোঁস ভোঁস করে নিদ্রা যেতে লাগল!

(শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত, ১ম খণ্ড: ১৮৮২ সালে ১৪ই ডিসেম্বরে কথিত)

॥ ১১ ॥

[**সংকেত:** শিষ্য গেল বনে কাঠ কাটতে...হাতি তাড়া করল...মাহুতের চিৎকারেও শিষ্য পালালো না...হাতি শুঁড় দিয়ে তাকে তুলে এক ধারে ছুঁড়ে ফেলে দিল...গুরু ও অন্য শিষ্যেরা তাকে ধরাধরি করে আশ্রমে আনলেন...গুরু: 'পালালে না কেন মাহুতের কথায়?'...শিষ্য: 'আজ্ঞে, হাতি যে নারায়ণ'... গুরু: 'তা মাহুত নারায়ণের কথাও তো শুনতে হয়।']

হাতি-নারায়ণ বনাম মাহুত-নারায়ণ

একদিন এক শিষ্য হোমের জন্য কাঠ আনতে বনে গিয়েছিল। এমন সময়ে একটা রব উঠল, 'কে কোথায় আছ পালাও—একটা পাগলা হাতি যাচ্ছে।' সবাই পালিয়ে গেল। কিন্তু শিষ্যটি পালাল না। সে জানে যে, হাতিও নারায়ণ, তবে কেন পালাব? এই বলে দাঁড়িয়ে রইল। নমস্কার করে স্তবস্তুতি করতে লাগল। এদিকে মাহুত চেঁচিয়ে বলছে, 'পালাও পালাও'। শিষ্যটি তবুও নড়ল না। শেষে হাতিটা শুঁড়ে করে তুলে নিয়ে তাকে একধারে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে গেল। শিষ্য ক্ষতবিক্ষত ও অচৈতন্য হয়ে পড়ে রইল।

এই সংবাদ পেয়ে গুরু ও অন্য শিষ্যেরা তাকে আশ্রমে ধরাধরি করে নিয়ে গিয়ে, ওষুধপত্র দিয়ে সুস্থ করে তুলতে চেষ্টা করতে থাকল। খানিকক্ষণ পর চেতনা হলে ওকে কেউ জিজ্ঞাসা করলে, 'তুমি কেন হাতি আসছে শুনে চলে গেলে না?' সে বললে, 'গুরুদেব আমায় বলেছিলেন যে, নারায়ণই মানুষ জীবজন্তু সব হয়েছেন। তাই আমি হাতি-নারায়ণ আসছে দেখে সেখান থেকে সরে যাই নি।' গুরু তখন বললেন, 'বাবা,

হাতি-নারায়ণ আসছিলেন বটে, তা সত্য, কিন্তু বাবা, মাহুত-নারায়ণ তো তোমায় বারণ করেছিলেন। যদি সবই নারায়ণ তবে তার কথা বিশ্বাস করলে না কেন? মাহুত-নারায়ণের কথাও শুনতে হয়।' (শ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত)

॥ ১২ ॥

[**সংকেত :** ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব পর্নিককুলে জন্ম নেন...একটা কোদাল দিয়ে জমি চাষ করে কোনোমতে তার চলত...কোদালটার মায়ায় বাঁধা পড়লেন তিনি..প্রব্রজ্যায় বেরোন আবার ঘুরে আসেন...শেষে নদীতে ফেললেন কোদালটা, কোথায় ফেললেন দেখলেন না ইচ্ছে করেই...ফেলেই চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি জিতেছি'...রাজা ব্রহ্মদত্ত রাজ্য জয় করে ফিরছিলেন...তাঁর প্রশ্ন : কাকে জয় করেছেন... উত্তর : রিপুকে ...রাজা রিপুজয়ী মানুষটির সঙ্গ নিলেন সব ছেড়ে।]

কুদ্দালজাতক

ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব পর্ণিককুলে জন্মগ্রহণ করে ক্রমে বড়ো হন এবং নানা বিষয়ে বিচক্ষণতা লাভ করেন। তাঁর নাম হয় কুদ্দাল পণ্ডিত। তিনি কোদাল (<কুদ্দাল) দিয়ে এক খণ্ড জমি আবাদ করে তাতে ফসল ফলাতেন এবং তাই বিক্রি করে অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতেন। ঘরে ঐ কোদালখানা ছাড়া তাঁর আর কোনো সম্বল ছিল না। একদিন তিনি ভাবলেন, 'ঘরে থেকে কী পাব আমি? বরং প্রব্রাজক হব।' এই সংকল্প করে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। কোদালটা লুকিয়ে রাখলেন একজায়গায়। কিন্তু ঐ ভোঁতা কোদালের টানেই একদিন ঘরে ফিরে এলেন। ছয়-ছয়বার একইরকম ঘটল। প্রব্রজ্যায় বেরোন আবার ফিরে আসেন কোদালের মায়ায়। শেষে ভাবলেন এই কোদালের মায়াই যখন আমাকে বার বার ঘরে টেনে আনছে তখন এই কোদালটাকেই নদীতে বিসর্জন দেব। কোন্ জায়গায় কোদালটা গিয়ে পড়ল তা যাতে তাঁর চোখে না পড়ে এই জন্যে চোখ বুজে নদীতে কোদালটা ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে বলে উঠলেন, 'আমি জিতেছি, জিতেছি, জিতেছি।'

এদিকে রাজা ব্রহ্মদত্ত প্রত্যন্তবাসী প্রজাদের বিদ্রোহ দমন করে ফিরছিলেন সেই পথ দিয়ে। তিনি কৌতূহলী হয়ে বললেন, 'লোকটা কাকে জিতল? আমার কাছে নিয়ে এসো ওকে।' বোধিসত্ত্ব কাছে এলে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি যুদ্ধে জিতে ফিরছি, কিন্তু তুমি কাকে জয় করলে?'

বোধিসত্ত্ব বললেন, 'মহারাজ, আপনি লক্ষ লক্ষ সংগ্রামে জয়ী হলেও দুর্জয় রিপুকে তো জয় করতে পারেন নি, আমি ঐ রিপুকে জয় করেছি।' মুহূর্তে রাজার মনে পরিবর্তন এল। তিনিও প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে বোধিসত্ত্বের সঙ্গে হিমাচল যাত্রা করলেন।

(কুদ্দালজাতক)

॥ ১৩ ॥

[**সংকেত :** কৃপণের বাড়ির এক কোণে ঠাঁই পেয়েছিল চাকর আর তার বৌ...মনিব নিরামিষাশী বলে ওরা মাছ ভাজতো মনিব বেরিয়ে গেলে...একদিন হঠাৎ আগে ফিরে মাছ ভাজার গন্ধ পেয়ে মনিব বললেন, আমার খাবার সময়ে মাছ ভাজবি রোজ...কয়েকদিন তাই হল...চাকর বলল, রোজকার মাছের

পয়সা পাই কোথায়...মনিব ঘরে ঢুকে দরজা দিয়ে টাকার ঝনঝনানি শোনালেন শুধু...বাইরে এসে বললেন ...ঐ আওয়াজে তোর গন্ধের ঋণ শোধ।]

শোধবোধ

এক গাঁয়ে মস্ত এক ধনী লোক বাস করতেন। ফসল বেচে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা তো তিনি পেতেনই, চড়া সুদে ধার দিয়েও তাঁর অনেক টাকা আসত। কিন্তু ভয়ানক কৃপণ ছিলেন তিনি। বাড়িতে একটা চাকর ছিল বটে, কিন্তু তাকে এক পয়সাও দিতেন না। শুধু বাড়ির এক কোণে মাথা গোঁজবার মতো একটা খুপরি পেয়েছিল সে। মনিব ছিলেন নিরামিষাশী, কিন্তু ভাতের সঙ্গে মাছ না হলে চাকরটির খাওয়াই হত না। তাই মনিব যখন টাকা আদায়ে বেরুতেন সেই ফাঁকে চাকরটা আর তার বৌ মিলে রান্না সেরে রাখত। একদিন মনিব নির্দিষ্ট সময়ের বেশ কিছুটা আগেই বাড়িতে ফিরলেন। ওদিকে চাকরটার ঘরে তখন মাছ ভাজা হচ্ছে। সেই গন্ধ গেল মনিবের নাকে।

খাওয়া-দাওয়া সেরে মনিব ডাকলেন চাকরটাকে। জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘরে কী ভাজছিলে গো ?' চাকর ভয়ে আধমরা হয়ে বলল, 'আজ্ঞে, আমার বৌ মাছ ভাজছিল।' মনিব বললেন, 'ঠিক আছে, আগে রাঁধতে মানা করো তাকে। আমি যখন দুপুরে খেতে বসব, তখন যেন সে মাছ ভাজে।'

চাকর আর তার বৌ ভাবল বাবুর হল কী ? কিন্তু তারা পর পর ক'দিন মনিবের খাবার সময়েই মাছ ভাজতে বসল।

একদিন সন্ধ্যায় তারা মনিবের কাছে এসে হাতজোড় করে বলল, 'বাবু মাছ কেনবার পয়সা তো আমাদের রোজ জোটে না। তাই রোজ তো আমরা আপনার খাবার সময়ে মাছ ভাজতে পারব না।'

মনিব ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। ঝন্ ঝন্ করে মেঝেতে টাকা পড়ার শব্দ হল। চাকর আর তার বৌ ভাবল মনিব নিশ্চয় তাদের রোজ রোজ মাছ ভাজবার টাকা দেবেন। আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠল তারা।

মনিব বেরিয়ে এসে বললেন, 'তোমরা আমাকে ক'দিন শুকনো মাছ ভাজার গন্ধ শুঁকিয়েছ। তাই না ?'

—'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

—'আমিও তোমাদের টাকার আওয়াজ শোনালাম। মাছের গন্ধের দেনা আমি টাকার আওয়াজ দিয়ে শোধ দিলাম। ঋণের শেষ রাখি না আমি।'

(কর্ণাটকের লোককথা)

॥ ১৪ ॥

[**সংকেত :** দয়ালু রাজা শ্বেতকেতুর আদেশে মন্ত্রী ঘণ্টা টাঙিয়ে দিলেন তেমাথায়...যার কিছু অভিযোগ থাকবে সেই বাজাবে ঘণ্টা, প্রতিকার করা হবে সঙ্গে সঙ্গে...ঘণ্টার পুরনো বাঁধুনিটা যাতে ছিঁড়ে পড়তে না পারে সেজন্যে একজন লতা জুড়ে দিল...একটা পরিত্যক্ত বুড়ো ঘোড়া ঐ লতায় মুখ দিতে বেজে উঠল ঘণ্টা!...খোঁজা হল কার ঘোড়া। খেতে পায় না কেন ?...মালিককে ঘোড়ার দায়িত্ব নিতে বলা হল।]

ন্যায়বিচার

রাজা শ্বেতকেতু তাঁর মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'তেমাথায় একটা ঘণ্টা টাঙিয়ে দিন।' রাজার আদেশে তৎক্ষণাৎ তাই করা হল।

রাজা নিজেই বেরুলেন নগরভ্রমণে। সবাইকে বললেন, 'কেউ যদি কোনোরকম অন্যায় করে কারো উপর, সে যেন ঐ তেমাথায় ঘণ্টাটা বাজায়। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবিধান করা হবে।'

সেই নগরে এক সৈনিকের এক বুড়ো ঘোড়া ছিল। হাড়-বেরকরা বুড়ো ঘোড়াটা আর কোনো কাজেই আসে না, তাই সৈনিকটি তাকে বাড়ি থেকে দূর করে দিয়েছে। খাবারের সন্ধানে সারা শহর সে ঘুরে বেড়ায়।

তেমাথার ঘণ্টার বাঁধুনিটা একটু পুরনো হয়ে যাওয়ায় এক পথিক তাতে কিছু লতা জুড়ে একটু মজবুত করে দিয়েছিল যাতে ঘণ্টাটা বাঁধুনি ছিঁড়ে না পড়ে যায়। সৈনিকের বুড়ো ঘোড়াটা ঘুরতে ঘুরতে এসে ঐ সবুজ লতা মুখে বাড়িয়ে টেনে খেতে গেল। তাতে ঘণ্টাটা উঠল বেজে। ঘোড়াটার কি কোনো নালিশ আছে রাজামশায়ের কাছে? খোঁজ-খবর শুরু করল রাজপুরুষেরা। শেষে ঐ সৈনিককে তলব করা হল। তাকে বলা হল, 'একদিন যে তোমার সেবা করেছে, বুড়ো হয়েছে বলে তাকে তাড়িয়ে দিয়ে তুমি অন্যায় করেছ, এর ভার তোমাকেই নিতে হবে। দেখো, কখনও যেন এর অনাদর না হয়। যে-ক'টা দিন বাঁচবে ও যেন খেতে পায় পেট ভরে।' সৈনিক অনুতপ্ত হয়ে তার এতদিনকার আদরের ঘোড়াটাকে ঘরে নিয়ে গেল। (অন্ধ্রপ্রদেশ)

॥ ১৫ ॥

[**সংকেত :** এক বন্ধু : 'নিজে চেষ্টা না করলে ভগবান্ কিছু দেন না।' আর এক বন্ধু : 'চেষ্টা না করলেও দেন।'

দ্বিতীয় বন্ধু কথার সত্যতা প্রমাণ করতে এক সরাইখানায় বসে রইল দীর্ঘ সময়—কেউ দিল না, ফিরেও চাইল না—শেষে দুজন লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে তাকে একটু কাশতে হল—দু টুকরো রুটি ছুঁড়ে দিল তারা খাবার থেকে—বন্ধু বুঝল, ঐ কাশিটাই হল 'একটু চেষ্টা'।]

কাশি

দুই বন্ধুর মধ্যে তুমুল তর্ক। একজন বলছে, 'ভগবান্ সবই দেন বটে, তবে মানুষকে চেষ্টা করতেই হয়।' আর একজন বলছে, 'ভগবান্ যখন দেন, হাতে ধরেই দেন, কাউকে চেষ্টা করতে হয় না।' দ্বিতীয় বন্ধু হলফ করে বলল, হাতেকলমে সে এর প্রমাণ দেবে। সে বন্ধুকে নিয়ে একটা সরাইখানায় গেল এবং এক কোণে বসে বলল, 'দেখো, আমি কারো কাছে কিছু চাইব না, কিন্তু খাবার আমার জুটে যাবেই। তার জন্যে কোনো চেষ্টাই আমাকে করতে হবে না'। সে সত্যিই সকাল থেকে বসে রইল সেখানে। সন্ধ্যে হল, কিন্তু তার দিকে কেউ ফিরেও চাইল না। দীর্ঘ সময় কেটে গেল। ক্ষিদেয় তখন সে ধুঁকছে। দুজন তখন সামনে প্রচুর খাবার নিয়ে খেতে যাবে, এমন সময়ে সে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যে একটু কাশল।

লোক দুটো তার দিকে চেয়ে বলল, 'তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে খুব ক্ষুধার্ত তুমি, কিছু খাবে ?' এই বলে তখন তারা দু-টুকরো রুটি তাকে খেতে দিল।

দু বন্ধুর দেখা হলে দ্বিতীয় বন্ধু প্রথম বন্ধুকে বলল, 'ভাই, তোমার কথাই ঠিক। ভগবান্ দেন ঠিকই, তবে চেষ্টা মানুষকে করতেই হয়। রুটির টুকরো-দুটো আমি পেয়েছিলাম ঠিকই, তবে আমাকে তো তার জন্যে একটু কাশতে হয়েছিল।'

প্রথম বন্ধু হেসে বলল, 'চেষ্টা একটু চাই-ই, অন্তত একটু কাশি।' (পাঞ্জাব)

॥ ১৬ ॥

[**সংকেত :** ভোর হয়েছে দেখে চোরাই বাসনপত্র নিয়ে মুশকিলে পড়ল চার চোর—এক আস্তাবলে ঢুকে খাটিয়ায় ওগুলো রেখে চাদর চাপা দিয়ে মাথায় নিয়ে চলল—পথে এক পাকা চোর বলল, নল দেখা যায় যে—গাড়ুর নলটা ভালো করে ঢাকা দেওয়া হল—চার চোর এবারে পাকা চোরকে কাঁধ দিতে বলল—পাকা চোর ভাগ পাবে বলে কাঁধ দিল—আওয়াজ উঠল : বল হরি হরি বোল।]

চোরে চোরে

একদিন চার চোর এক গৃহস্থবাড়ি থেকে গৃহস্থালির বেশ কিছু জিনিস চুরি করল। তখন সবে ভোর হয়েছে। চোরের দল একটু চিন্তিতই হয়ে পড়ল। রাতের অন্ধকারে গা ঢাকা দেওয়া সহজ, কিন্তু ভোরের আলোয় যে ধরা পড়তে দেরি হবে না। হঠাৎ তাদের মাথায় এক বুদ্ধি এল। কাছেই এক আস্তাবল ছিল। সেখানকার সইসের এক খাটিয়া নিয়ে তার উপর চোরাই মাল রেখে চাদর ঢাকা দিল এবং চারজন খাটিয়া কাঁধে করে যেতে লাগল। আওয়াজ তুলল : 'বল হরি হরি বোল'—যেন মড়া পোড়াতে চলেছে।

পথে এক পাকা চোরের সঙ্গে দেখা। সে বলল, 'ঐ যে নল দেখা যায়।' চোরেরা দেখল, একটা গাড়ুর নল বের হয়ে পড়েছে। ধরা পড়বার ভয়ে তারা নলের উপর চাদর ঢাকা দিয়ে চোরকে বলল, 'ভাগ নেবে তো এসো।' কথাটা দুটো অর্থেই ধরা যায়—চোরাই মালের ভাগ নেবে তো এসো, আর মড়া বইতে কাঁধ দেবে তো এসো। পাকা চোর খুশি হয়ে বললে, 'কবে মরেছে মেসো ?' এই বলে সে এগিয়ে এসে কাঁধ দিল। সমস্বরে আওয়াজ তুলল—'বল হরি, হরি বোল।' (প্রবাদ-গল্প)

॥ ১৭ ॥

[**সংকেত :** শোনা যায়, দাশরথি রায় একবার এক গরিবের বাড়িতে গৃহস্বামীর নিজের হাতে পরিবেশন করা শাকান্ন খেয়ে পরিতৃপ্ত হয়ে খুব প্রশংসা করেছিলেন রান্নাবান্নার—সেখানে এক ধনী ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন, তিনি নিমন্ত্রণ করলেন দাশুবাবুকে—বিরাট আয়োজন, কিন্তু সবই পাচক পরিবেশিত, গৃহস্বামীও সগর্বে তামাক টানায় রত—দাশুবাবু বললেন, 'আন্তরিকতার ময়ান নেই আপনার ঘি-ময়দায়, তাই সবই অভোজ্য।]

আদরে ভোজন, কী করে ব্যঞ্জন

শোনা যায় একবার এক গরিবের ঘরে অতিথি হলেন দাশরথি রায়। আয়োজন খুব সামান্য—শাকান্ন মাত্র। তবে সুখাদ্যের অভাবটা গৃহস্থ আন্তরিকতা দিয়ে পূরণ করেছিলেন। তাঁর গৃহিণী নিজে রাঁধলেন, তিনি নিজে পরিবেশন করলেন এবং আয়োজনের ত্রুটির জন্যে বার বার ক্ষমাপ্রার্থনা করলেন। দাশরথি রায়ও বার বার

রান্নার প্রশংসা করলেন এবং খেয়ে যে তিনি খুবই তৃপ্তি পেয়েছেন সে কথা নানাভাবে প্রকাশ করলেন।

এক ধনী ব্যক্তি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভাবলেন, এই সামান্য জিনিস খেয়েই তিনি এত প্রশংসা করলেন, ভালো জিনিস বোধ হয় তিনি কখনও খান নি। ভালো ভালো জিনিস খেতে পেলে তিনি নিশ্চয় আরও অনেক প্রশংসা করবেন, এই ভেবে তিনি তাঁকে তাঁর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করলেন। নির্ধারিত দিনে দাশরথি রায় ঐ ভদ্রলোকের বাড়িতে আহারে বসলেন। গৃহস্বামী এক চেয়ারে বসে আলবোলা টানতে লাগলেন। পাচক পরিবেশন করতে লাগল। আহার শেষ করে দাশরথি রায় বললেন, 'আপনি যে-সব খাবার সংগ্রহ করেছেন সবই অতি মূল্যবান্ সন্দেহ নেই, তবে ময়ান না দিলে কি লুচি খাওয়া যায়? আপনার ঘি-ময়দার তুলনা নেই, কিন্তু আন্তরিকতার ময়ান নেই বলে সবই অখাদ্য।' (প্রবাদ-গল্প)

॥ ১৮ ॥

[**সংকেত :** এক ধূর্ত লোক এক গৃহস্থ-বাড়ি এসে বলল, 'আমার লেবুটেবু সব আছে, শুধু একটু জায়গা—গৃহস্থ জায়গা দিলেন—লোকটি ক্রমে ক্রমে চাল-ডাল তরকারি সবই চেয়ে নিল—রান্নার পর খাবার সময়ে গৃহস্থ বললেন, 'তুমি যে বললে লেবুটুকু সব আছে?' লোকটি ঝুলি থেকে একটি লেবু বের করে দেখালো।]

লেবুটেবু সব আছে

একটি ধূর্ত লোক বিদেশে যাচ্ছিল। পথে পড়ল এক গৃহস্থবাড়ি। সে ভাবল ডানহাতের ব্যাপারটা এই বাড়িতে সেরে নিলে মন্দ হত না। গৃহস্থকে অপ্রসন্ন দেখে সে একগাল হেসে বলল, 'আজ্ঞে, লেবুটেবু সব আছে আমার, শুধু দরকার একটু জায়গা।' গৃহস্থ ভাবল, তা জিনিসপত্তর যখন সবই এনেছে, শুধু একটু রাঁধবার জায়গা দিতে আর আপত্তি কী। গৃহস্থ পথিককে ঢেঁকিশালে পাঠিয়ে দিল। আশ্রয় পেয়ে পথিক বলল, 'লেবুটেবু সব আছে আমার, কেবল একটু চালডাল।' গৃহস্থ তাকে চালডাল এনে দিল।

—'আর একটু তরকারি আর তেলনুন। লেবুটেবু সব আমার আছে।'

চালডাল, তরকারি, তেলনুন সবই জোগাতে হল গৃহস্থকে। খাবার সময়ে পথিককে সে জিজ্ঞেস করল, 'বাপু হে, তুমি যে বললে লেবুটেবু সব আছে, তবে—'

—'আজ্ঞে মিথ্যে বলি নি কর্তা।' এই বলে সে পুঁটুলি থেকে একটা লেবু বের করে দেখালো এবং আবার একগাল হেসে খেতে বসল। (প্রবাদ-গল্প)

॥ ১৯ ॥

[**সংকেত :** শকটাল নন্দরাজের মন্ত্রী ছিলেন—খুব বুদ্ধিমান্ ও কল্যাণকামী ছিলেন তিনি—রাজার কিছু অন্যায় কাজের বিরোধিতা করায় তিনি শকটালকে সপুত্র মাটির নিচে এক গুপ্ত গর্তে রাখেন---রটে যায় শকটাল মৃত---বঙ্গদেশের রাজা নন্দরাজের কাছে দুটি ঘোটকী পাঠিয়ে জানতে চান কে মা আর কে কন্যা---নন্দরাজ নিরুপায় হয়ে উদ্ধার করে আনলে শকটালকে---শকটাল দুটি ঘোটকীকে ছুটিয়ে যেই ক্লান্ত করে ছেড়ে দিলেন অমনি যে মা সে কন্যার গা চাটতে লাগল।

শকটাল-কথা

পাটলিপুত্রনগরে নন্দ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর মন্ত্রীর নাম ছিল শকটাল। মন্ত্রী অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিলেন। রাজ্যের মঙ্গলের জন্যেও সর্বদা চেষ্টা করতেন তিনি। কিন্তু রাজার কতকগুলো অন্যায় কাজ মন্ত্রী সমর্থন না করায় রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে মন্ত্রী এবং তাঁর পুত্রদের মাটির নিচে এক গর্তে নির্বাসিত করলেন। রাজ্যে রটে গেল মন্ত্রী আর বেঁচে নেই।

বঙ্গদেশের রাজা এই জনশ্রুতিতে সন্দেহ পোষণ করলেন। তিনি এই ঘটনার সত্যাসত্য নির্ণয় করার জন্যে এক কৌশল অবলম্বন করলেন। তিনি একজোড়া ঘোটকী রাজার কাছে পাঠিয়ে কে মা আর কে কন্যা তা নির্ধারণ করবার অনুরোধ জানালেন। নন্দরাজ প্রমাদ গণলেন—কী করে প্রভেদ নির্ণয় করবেন তিনি, দুটোই যে দেখতে একই রকম। একমাত্র মন্ত্রীই এই বিপদ থেকে তাঁকে ত্রাণ করতে পারেন। তিনি আদেশ দিলেন শকটাল ও তাঁর ছেলেদের ভূগর্ভ থেকে তুলে আনতে। শকটালকে তিনি তাঁর প্রয়োজনের কথা বললেন।

শকটাল ঘোটকী দুটিকে গাড়িতে জুড়ে খুব ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ালেন। তারপর খুব ক্লান্ত করে নিয়ে তাদের মুক্ত করলেন জাঙাল থেকে। এবারে ঘোটকী দুটির মধ্যে যে মা সে কন্যার গা চাটতে লাগল। প্রভেদ ধরা পড়ল। রাজার সম্মান রক্ষা হল শকটালের বুদ্ধির দৌলতে। রাজা প্রভূত পুরস্কারে সম্মানিত করলেন মন্ত্রীকে। বলা বাহুল্য, এ ঘটনার পরে আর তাঁকে ভূগর্ভবাস করতে হয় নি। (শুকসপ্ততি)

॥ ২০ ॥

[**সংকেত :** হাতেম তাঈ একদিন এক বৃদ্ধ কাঠুরের কষ্ট দেখে তাকে হাতেমের আতিথ্য নিতে বললেন—বৃদ্ধ জবাব দেয়, যে নিজে খেটে খেতে জানে সে হাতেমের আতিথ্য নেয় না—সেই মুহূর্তে হাতেমের মনে হল এই বৃদ্ধ তাঁর চেয়ে অনেক বড়ো শ্রমবীর।]

শ্রমবীর

দানবীর হাতেম তাঈয়ের সাহস ও বীরত্বের খ্যাতি ছিল দেশজোড়া। তাঁর চেয়েও সাহসী ও বীর-যে কেউ হতে পারে এ ছিল সকলের কল্পনার বাইরে। হাতেমকেই প্রশ্ন করলেন সভাসদ্‌রা, তেমন কাউকে কি আপনি নিজে দেখেছেন? হাতেম বললেন, 'হাঁ, দেখেছি। একদিন চল্লিশটা উট দান করে আমি ফিরছি। পথে পড়ল এক বন। দেখলাম এক বৃদ্ধ কাঠুরে কাঠ জড়ো করে বোঝা বেঁধেছে। সেটা মাথায় ক'রে বওয়া তার পক্ষে অসম্ভব। তবু সে প্রাণপণে সেই বোঝা মাথায় তোলার চেষ্টা করছে। আমি বললাম, 'হাতেমের নাম শুনেছ? কাঠুরে বলল, 'হাঁ, শুনেছি, মস্ত দাতা তিনি। তাঁর কাছে চেয়ে কেউ পায় নি এমন এখনও হয় নি।' আমি বললাম, 'তুমি তাঁকে জ'নই দেখছি। তাহলে তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে এত খাটুনি করার দরকারটা কী বাপু, তুমি হাতেমের অন্নসত্রে যাও না কেন?' বৃদ্ধ বলল, 'যে নিজে পরিশ্রম করে খেতে জানে সে কখনও হাতেমের অন্নসত্রে যায় না। বৃদ্ধের কথায় আমার সমস্ত অহঙ্কার চূর্ণ হল। সেই মুহূর্তে সেই কাঠের ভারে নুয়ে পড়া বৃদ্ধকে আমার চেয়ে অনেক অনেক বড়ো শ্রমবীর বলে মনে হল।' (গুলিস্তাঁ : শেখ সাদী)

॥ ২১ ॥

[**সংকেত :** দুই চোর কাপড়ের দোকানে ঢুকে কাপড় চুরি করল। একজন নিয়ে আর একজনকে দিল—দোকানী খোঁজ করায় যে নিয়েছিল সে বলল, 'আমার কাছে নেই'—আর যার কাছে ছিল সে বলল, 'আমি নিই নি।']

সত্যবাদী

এক কাপড়ের দোকানে দুই চোর গিয়ে ঢুকল। দোকানী খুব ব্যস্ত। এক চোর একটা কাপড় সটকে আর এক চোরের কাছে চালান করে দিল। সে নিয়েই থলেয় পুরল। দোকানী কাপড়টা দেখতে না পেয়ে যে-চোর কাপড়টা নিয়েছিল তাকে জিজ্ঞেস করল, 'কাপড়টা কি আপনার কাছে?' সে বলল, 'না, আমার কাছে নেই।' এবারে যার থলেয় কাপড়টা ছিল তাকে জিজ্ঞেস করল, 'আপনি উঠিয়েছেন কাপড়টা?' সে বলল, 'না, আমি উঠাই নি।'

এরপর ওরা যেতে যেতে নিজেদের মধ্যে যে আলাপ করল তা এই :

প্রথম চোর : কী ভাগ্যি, আমাকে মিথ্যে' কথা বলতে হল না।

দ্বিতীয় চোর : হ্যাঁ, আমরা সত্যাশ্রয়ী সেই জন্যেই তো বেঁচে গেলাম।

প্রথম চোর : আমি বললাম, 'আমার কাছে নেই', সত্যিই তো ছিল না। নিয়েই তো তোর কাছে চালান করেছিলাম।

দ্বিতীয় চোর : আমি বললাম, 'আমি উঠাই নি।' সত্যিই তো তাই। আমি তো আর উঠাই নি। তুই তো আমাকে দিয়েছিস। সত্যবাদীর বিপদ নেই। কথাটা খাঁটি।' (মুন্তাখাব-উল-হিয়াকৎ)

॥ ২২ ॥

[**সংকেত :** শীত আর বৃষ্টির মধ্যে একজন লোকের গাধা পাঁকে পড়ে যাওয়ায় সে প্রথমে গাধাটাকে এবং ক্রমশ রাজাসুদ্ধ সকলকেই গালাগালি শুরু করল—শিকারে বেরিয়ে বাদশা লোকজন নিয়ে সেখানেই এসে পড়লেন—বাদশার লোকজন লোকটাকে কোতল করতে চাইল—বাদশা বললেন, ওর গাধাটাকে তুলে দাও, শীতে বৃষ্টিতে ওর মাথার ঠিক নেই, তাই বকছে।]

তিরস্কারের বদলে পুরস্কার

একজনের গাধা পাঁকে পড়ে গিয়েছিল। কিছুতেই সে তাকে তুলতে পারছিল না। দারুণ শীত আর বৃষ্টির মধ্যে প্রাণপণ চেষ্টাতেও গাধাটাকে তুলতে না পেরে সে রাগে অধৈর্য হয়ে গাধাটাকে গাল দিতে লাগল। তারপর রাগ যতই বাড়তে লাগল গালাগালির লক্ষ্য ততই বিস্তৃত হতে থাকল—রাজা প্রজা আমীর ওমরাহ সকলেরই পিণ্ডি চটকাতে লাগল লোকটা।

ঘটনাচক্রে বাদশা শিকারে বেরিয়ে লোকজন নিয়ে সেখানে এসে পড়েছেন। লোকটার ভ্রূক্ষেপ নেই, সে বকেই চলেছে। বাদশার লোকেরা যখন শুনল বাদশাকেও সে যা তা বলে গাল দিচ্ছে, তখন তারা বলল, 'হুজুরের হুকুম হলে গর্দানটা উড়িয়ে দিই বেয়াদপের।' বাদশা বললেন, 'আপাতত নিজেদের গর্দানটা কাজে

লাগাও, ওর গাধাটাকে পাঁকের থেকে টেনে তোলো। কন্‌কনে শীত আর বৃষ্টিতে বেচারার মাথার ঠিক নেই, তাই অমন বকছে।' বাদশার হুকুমে গাধাটাকে ওরা পাঁক থেকে তুলে দিল। বাদশা গরিব লোকটিকে কাপড় আর কিছু অর্থও দিলেন। বাদশার লোকেরা বলল, 'যা, খুব বেঁচে গেলি।' লোকটা বলল, 'বেঁচে গিয়ে এটুকু বুঝলাম, মন্দের সঙ্গে যিনি ভালো ব্যবহার করেন তিনি যথার্থ মহৎ।'

বুস্তাঁ : শেখ শাদী)

॥ ২৩ ॥

[**সংকেত :** এক সিংহী নদীর ওপার থেকে এপারে লাফিয়ে এল ভেড়ার পালকে আক্রমণ করার জন্যে—গর্ভবতী সিংহী বাচ্চা প্রসব করেই মারা গেল—বাচ্চাটি ভেড়ার সঙ্গে প্রতিপালিত হয়ে ভেড়ার মতোই ভ্যা ভ্যা করত—এক সিংহ তাকে বলল আসলে 'তুইও যে আমিও সে'—প্রথমে না বুঝলেও নদীতে যখন নিজের ছায়া দেখল তখন সে নিজেকে সিংহ বলেই চিনতে পারল।]

তুইও যে আমিও সে

পাহাড়ের কোলে তৃণভূমি। সেখানে বাস করত এক মেষপালক। একদিন দুপুরে সেই তৃণভূমিতে চরে বেড়াচ্ছিল ভেড়াগুলো। পাশেই নদী। নদীর ওপারে হঠাৎ এক সিংহী এসে দাঁড়াল। প্রমাদ গুণল মেষপালক। যদি লাফিয়ে আসে এপারে। হ্যাঁ, তাই হল। সিংহী একলাফে এপারে এল। কিন্তু আসন্নপ্রসবা ছিল সে। বাচ্চা প্রসব করেই সে মারা গেল। সিংহশিশু ভেড়াদের সঙ্গেই প্রতিপালিত হতে লাগল। ভেড়ার মতোই ঘাস খেতে শিখল।

একদিন এক সিংহ তাড়া করল ভেড়াদের। সিংহশিশুটিও পালাচ্ছে দেখে তার কৌতূহল হল। সে তাকে বলল, 'তুইও যা আমিও তা। আমাকে দেখে ভয় কী? তুই ভ্যা ভ্যা করিস নে। আমার মতো গর্জন কর।'

সিংহশিশুটি কিছুই করল না। আড়ষ্ট হয়ে রইল ভয়ে। সিংহ এবার তাকে নদীর তীরে টেনে নিয়ে গিয়ে ছায়া দেখিয়ে বলল, ঐ দেখ, তুইও যা আমিও তা। এবারে গর্জন কর দেখি।' বাচ্চাটি দেখল, সত্যিই তো। সিংহ এবারে কিছুটা মাংস এনে তাকে খাওয়ালো। মাংসের স্বাদ পেল সে। ভুল ভাঙল তার। এবারে সে নিজেকে সিংহ বলে চিনেছে। আর ভয় কী? সিংহের মতোই গর্জন করে উঠল সে। আর ভেড়ার দলে নয়, একেবারে সিংহের সঙ্গে গহন বনে।

(ভারতীয় দর্শন-উপাখ্যান)

॥ ২৪ ॥

[**সংকেত :** শেষ বয়সে ছেলে হওয়ায় ছেলে অন্ত-প্রাণ ছিল চাষী—ছেলেটা মারা গেল—চাষীবৌ-এর কান্না থামে না—চাষী নির্বিকার—স্বপ্ন দেখছে সে, রাজা হয়েছে সে, আটটা ছেলে তার—স্বপ্ন ভাঙতে দেখে একটাও নেই। কোন্ ছেলের জন্যে কাঁদবে সে, ঐ আট ছেলের জন্যে, না এই এক ছেলের জন্যে?]

স্বপ্ন থেকে সত্যে

এক গ্রামে এক চাষী থাকত। জমি-জায়গা ভালোই ছিল তার। শুধু দুঃখ ছিল এটাই, নিঃসন্তান সে। শেষে শেষ-বয়সে একটি ছেলে হল তার। ছেলে হল বাপ-মার নয়নের মণি। ছেলেই জপ, ছেলেই তপ। কিন্তু রোগে ভুগে মারা গেল ছেলেটি। চাষী আর চাষীবৌ-এর চোখে সব অন্ধকার হয়ে গেল।

কিন্তু দুদিন বাদেই চাষীর একটা পরিবর্তন দেখা গেল। আবার দৈনন্দিন কাজকর্মের মধ্যে সে নিজেকে সঁপে দিল। চাষীবৌ তখনও শোকে অধীর।

প্রতিবেশীরা সবাই অবাক। ব্যাপার কী? চাষী এরই মধ্যে পুত্রশোক ভুলে গেল? এ কী করে হয়? পুত্রশোক যে শেলের মত বিঁধে থাকে বুকে। চাষীবৌও অবাক; এমন নিষ্ঠুর বাপও হয়। একটুকু চোখের জলও ফেললে না!

চাষী বলল, 'কাঁদব কেন বল? একটা স্বপ্ন দেখেছি যে? দেখলাম রাজা হয়েছি, আর সেই সঙ্গে আট ছেলের বাপ হয়েছি। সুখ আর ধরে না। যেই ঘুম ভাঙল দেখলাম আটটা ছেলের একটাও নেই। এখন কাঁদব কোন্ ছেলের জন্যে বল তো? ওই আট ছেলের জন্যে, না এই এক ছেলের জন্যে? এটাও স্বপ্ন ওটাও স্বপ্ন—এ আমি বুঝে গেছি। (ভারতীয় দর্শন-উপাখ্যান)

॥ ২৫ ॥

[**সংকেত :** রেলের কামরায় পরিচয় হয়ে গেল দু'জনের। অনেক কথাবার্তা হাসিঠাট্টায় খুব জমে গেল দু'জন। স্টেশনে গাড়ি থামে, ওরা খাবার কেনে, খায়, নানারকম দৃশ্য দেখে। একজনের নামবার সময় হয়ে গেল। বিদায়ের মুহূর্তে মনটা হয়ে গেল বড়ো বিষণ্ন।]

[ত্রিপুরা, উঃ মাঃ পরীক্ষা, ১৯৭৮]

গাড়িটা দুলকি চালে চলেছে। দু'পাশের দৃশ্যগুলো বিপরীত দিকে ছুটছে। অমলের একটু তন্দ্রামতো এসেছিল। তার মাথাটা ঢলে পড়ল ঠিক তার পাশে বসা এক তরুণের কাঁধে। তরুণটি বিরক্ত হল না। অপরিচিতের মাথাটা কাঁধ থেকে সরিয়ে দিয়ে ধমকের সুরে বলল না, 'ঠিক হয়ে বসুন'। অনেকক্ষণ এমনি করে কাটল। অমল নিজে থেকে জেগে উঠেই লজ্জিত হয়ে পড়ল মনে মনে—ছি, কতক্ষণ যে এইভাবে ছিলাম কে জানে? অমল বলল, 'Sorry, কতক্ষণ যে আপনাকে কষ্ট দিয়েছি।' তরুণটি হেসে বলল,—'না না, কষ্ট আর কী। উল্টোটাও তো হতে পারত, তার মানে আমিই হয়তো ঐভাবে ঘুমিয়ে পড়ে আপনার কষ্টের কারণ হতে পারতাম।

—'তবু।'

—'তবুটবু নয়। আপনি সম্বোধনটিও ছাড়ো, ভাই। আমরা এখন বন্ধু। আমার নাম চন্দন।'

অমল সানন্দে বলে ওঠে—'চন্দন আমার ভায়ের নাম।'

—'তাহলে তো আরও ভালো। আমরা বন্ধুও বটে, ভাইও বটে।'

কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। তারপর একসঙ্গে নানা কথার মালা

গেঁথে চলল। ট্রেন সবেগে ছুটে চলেছে। বাহিরের দৃশ্য দেখে দু'জনেই উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, ট্রেন থামলে খাবার কিনে খায় একসঙ্গে। কিন্তু দু'জনের গন্তব্য তো এক নয়। অমল নামবে নৈহাটিতে আর চন্দন আসবে কোলকাতায়। তারপর সেখান থেকে যাবে বনগাঁ।

নৈহাটি আসতে আর দেরি নেই। অমল তার জিনিসপত্র গুছিয়ে নেয়, চন্দন তাকে সাহায্য করে।

নৈহাটিতে গাড়ি থামে।

—'চলি ভাই। বোলপুরে বেড়াতে এসো আমাদের বাড়ি, কেমন?'

—'নিশ্চয় আসব।'

—'এ শুধু কথার কথা ভাই। আমাকে কি তোমার মনে থাকবে?'

—'নিশ্চয় থাকবে।'

অমল নেমে পড়ে।

তার চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে যায়। কথা বলতে পারে না সে। তবু হাত দুটো নাড়িয়ে চন্দনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

গাড়িটা শব্দ তুলে ছেড়ে দেয়। চন্দন বাইরে দৃষ্টি মেলে ভাবে, আবার কি কোনো দিন দেখা হবে অমলের সঙ্গে? ক্ষণিকের পরিচয়, কিন্তু মনে হচ্ছে কতদিনের যেন!

॥ ২৬ ॥

[**সংকেত :** একজন শ্রমিক বা সাধারণ মানুষ নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বহু লোককে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়া সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল এমন ঘটনা অবলম্বন করিয়া একটি গল্প রচনা কর।]

[উঃ মাঃ পরীক্ষা, ১৯৭৮]

মুনিরপুরের লেভেল ক্রশিং-এর একেবারে কাছেই থাকত ছেদিলাল। স্ত্রী আর একটি শিশুসন্তানকে নিয়ে তার ছোট্ট পরিবার। সেদিন ছিল রোববার। ছেদিলাল ভোরবেলা উঠে দাঁতন করছিল। হঠাৎ সে লক্ষ করল বিদ্যুদ্‌গতিতে একটা ট্রেন আসছে। আর আড়াআড়িভাবে আসছে আর একটি যাত্রী-বোঝাই বাস। লেভেল-ক্রশিংটা খোলা, কোন গেট নেই তাতে। সাধারণত এই খোলা ক্রশিং-এর কাছে এসে বাসগুলো গতি মন্থর ক'রে দেয়, তারপর ট্রেন আসছে কিনা লক্ষ ক'রে ক্রশিং পার হয়। কিন্তু এই বাসটা যে স্পিড না কমিয়ে প্রচণ্ড গতিতে আসছে। ছেদিলাল মুহূর্তের মধ্যে ছুটে বেরিয়ে গেল চিৎকার করতে করতে। সে লেভেল ক্রশিংটা দৌড়ে পার হতে না হতেই ট্রেনটা বেরিয়ে গেল। বাসের সামনে ছুটে এসে ইতিমধ্যে সে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছে ড্রাইভারের। ড্রাইভার ব্রেক কষল জোরে। কিন্তু ধাক্কা লাগল ছেদিলালের গায়ে। ধাক্কায় বেশ জোর ছিল। ছেদিলাল মাটিতে পড়ে গেল। ড্রাইভার ও যাত্রীরা সবাই ইতিমধ্যে বুঝেছে, ছেদিলাল অনিবার্য দুর্ঘটনার হাত থেকে তাদের বাঁচিয়েছে নিজের জীবন বিপন্ন করে। সে ট্রেনেও চাপা পড়তে পারত। অথবা বাসের ধাক্কা আরও বিপজ্জনক হতে পারত। যাত্রীদের সকলেই বাস থেকে নেমে ছেদিলালের

মাটিতে লুটানো দেহটার কাছে গেল। ছেদিলালের জ্ঞান আছে তখনও। অস্পষ্ট স্বরে সে বলছে—'একটু জল, বাবু। ভগবান্ আছে বাবু, তাই'—

সকলের শুশ্রূষায় ছেদিলাল অনেকটা সুস্থ হল। তাকে বাসায় পৌঁছে দিল সকলে। ছেদিলালের স্ত্রী কান্নায় ভেঙে পড়ল, তবু স্বামীর এই মানবিক কাজে সে হল গর্বিতা। বহুলোকের প্রাণ বাঁচিয়েছে তার স্বামী ছেদিলাল। ছেদিলাল তখন তার শিশু সন্তানটিকে দু'হাতে আঁকড়ে ধরেছে। এইবার তার চোখে জল এল।

॥ ২৭ ॥

[**সংকেত :** দক্ষিণা হিসাবে একটা গরু পেয়ে এক ব্রাহ্মণ বাড়ি ফিরছিল···পথে লাঠি হাতে একজন লোক এসে গরুটা চাইল···নিরুপায় ব্রাহ্মণ গরুটা দিয়ে দিল, বিনিময়ে লোকটার লাঠিটা চাইল··· লাঠি নিয়ে ব্রাহ্মণ লোকটাকে পিটিয়ে তাড়াল।]

শঠে শাঠ্যম্

এক ব্রাহ্মণ এক ধনী পরিবারে শ্রাদ্ধের কাজ সেরে বাড়ি ফিরছিল। দক্ষিণা হিসেবে একটা গরু পেয়েছিল সে। গরুটা নিয়ে সে বাড়ির দিকে রওনা হল। সন্ধ্যে হয়ে গিয়েছে। পথ নির্জন। ব্রাহ্মণের কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। এমন সময়ে একটা ষণ্ডামার্কা লোক প্রকাণ্ড একটা লাঠি নিয়ে তার পথ আগলে দাঁড়াল। ব্রাহ্মণ ভয়ে ভয়ে বলল, 'কী চাও বাবা?' লোকটা বলল—'আমার গরুটা নিয়ে যাচ্ছ কোথায়?'

ব্রাহ্মণ কাঁদো কাঁদো হয়ে বলল, 'কী বলছ বাবা, তোমার গরু? সে কী? এ যে আমি শ্রাদ্ধবাড়িতে দক্ষিণা পেয়েছি?' লোকটা খেঁকিয়ে উঠল—'এঁঃ, দক্ষিণা পেয়েছি। যত সব বাজে কথা। আমার গরু আমি চিনি না। দিয়ে দাও বলছি, না হলে এই লাঠি দিয়ে ঠেঙিয়ে তোমাকে ঠাণ্ডা করব।' ব্রাহ্মণ ভাবল, গরুটা দামী বটে কিন্তু পৈতৃক প্রাণটা তার চেয়েও দামী। ভয়ে ভয়ে সে গরুটা তাকে দিয়ে দিল। হঠাৎ একটা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়। বলল—'গরুটা তুমি নাও, বাবা, তবে আমি বামুন মানুষ, এই গরুর বদলে দক্ষিণা তো কিছু দিতে হবে আমাকে।'

—'একটা পয়সাও নেই আমার সঙ্গে।'

—'তা বাবা, তোমার লাঠিগাছাটাই না হয় দাও।'

লোকটা দেরি না করে লাঠিগাছটা ব্রাহ্মণের হাতে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মণ উগ্রমূর্তি ধরে সেই লাঠি দিয়ে লোকটাকে ঠেঙাতে লাগল। ঠেঙানির চোটে লোকটা পালাল। ইতিমধ্যে লোকজন এসে গেল সেখানে।

ব্রাহ্মণ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

যা হোক, 'গরু'-দক্ষিণা তাকে আর দিতে হল না ঐ ডাকাতে লোকটাকে।

২৮। **একটি ভৌতিক গল্প।** [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

সেই আংটি পরা-হাত

আমাদের গল্পের আসরে ডাক্তারবাবুটি নতুন আগন্তুক। সেদিন ভূতের গল্প হচ্ছিল। শুনে ডাক্তারবাবু বললেন, 'আমি একটা ভূতের গল্প জানি, যদিও সেটা ঠিক গল্প নয়, আমাদের কলেজ-জীবনে খুব কাছে থেকে দেখা একটা ব্যাপার।'

শুনে আমরা ঘরের মধ্যে ক'জনা উৎসাহে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলাম। বললাম, 'আরম্ভ করুন ডাক্তারবাবু।'

ডাক্তারবাবু আরম্ভ করেন। 'আমরা তখন পাটনা মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। থাকি কলেজ হোস্টেলে। আমাদের সঙ্গে পড়ত অজিত নাগ বলে একটি ছেলে। বেশ জমাটিয়া ছেলে ছিল সে। খেলায়, গানে, গায়ের জোরে, দুষ্টুমিতে সে ছিল নাম্বার ওয়ান।'

সেবার গরমের ছুটিতে অজিত ঠিক করল বাড়ি না গিয়ে একাই হোস্টেলে থাকবে, আর সারা বছর পড়ায় ফাঁকি দেবার প্রায়শ্চিত্ত করবে। অর্থাৎ চুটিয়ে পড়বে।

আমরা অনেক করে বোঝালুম। একা একা এতবড়ো হোস্টেলে তুই থাকতে পারবি না। ভূত না মানিস অন্তত নির্জনে একা একা খারাপ লাগার কথাটা তো মানবি। কে শোনে কার কথা। ওর যা গোঁ। যাব না তো যাবই না।

নিজে বাড়ি না গেলেও আমাদের সঙ্গে কিন্তু স্টেশন অবধি এল সি অফ করতে। রাত্রের গাড়ি। ওকে বললাম, তুই এবার হোস্টেলে ফিরে যা অজিত। একা একা ফিরতে খারাপ লাগবে, বিশেষত রাত্রে।

ও বলল, 'আমার জন্যে তোদের ভাবতে হবে না। ভাটায় এখন গঙ্গার জল সরে গেছে, তোদের গাড়ি ছেড়ে গেলে আমি সোজা রিভার বেডে নেমে—শর্টকাট করে নেব।'

'বলিস কী রে, এই রাতে তুই নদীর মধ্য দিয়ে শর্টকাট করবি?' ওর কথা শুনে আমরা অবাক হলাম। কিন্তু যে গোঁয়ার ছেলে, ওকে তো নিবৃত্ত করা যাবে না। কেবল বললাম, 'একটু সাবধানে যাস।'

এর পর আমাদের গাড়ি ছাড়ল। অজিত যথারীতি প্ল্যাটফর্মের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে রুমাল ওড়ালো। কিন্তু সেই-ই অজিতের সঙ্গে আমাদের শেষ দেখা। আর কোনদিন ওকে দেখিনি।

আমরা যারা শ্রোতার দলে বসে ছিলাম সবাই সমস্বরে বলে উঠলাম, 'কেন কেন,' কী হল অজিতের?

ডাক্তারবাবু বললেন, 'পরে আমি এর-ওর মুখে যা শুনেছি তার থেকেই অজিতের বাকি গল্পটা বলছি, শুনুন।'

আমাদের বিদায় জানিয়ে অজিত সোজা গঙ্গার মধ্যে দিয়ে শর্টকাট করতে গেল। আমরা অনেক সময়েই সেটা করতাম।

সেদিন অজিত সে ভাবেই চলেছে। অনেক রাত, ফুট ফুট করছে জ্যোৎস্না। হঠাৎ ওর চোখে পড়ল একটা কাটা হাত। কে যেন দা দিয়ে জীবন্ত মানুষের একটা হাত কেটে ফেলে গেছে। অসমসাহসী ছেলে অজিত। ভয় পাবার বদলে ওর মাথায় গোয়েন্দাগিরি করার সাধ জাগল। ও সেখানে নীচু হয়ে বসে কাটা হাতটা পরীক্ষা করতে গেল। প্রথমেই চোখে পড়ল কাটা হাতের অনামিকায় একটা মস্তবড়ো হীরের আংটি জলজল করছে।

দেখেই ও মনে মনে বলল, 'খুন। আর এ খুনের কিনারা করতে হলে কাটা হাতটাকে স্পর্শ না করে পুলিশে খবর দিতে হবে।'

অজিত গঙ্গার খাল ছেড়ে উপরে উঠল। এত রাত্রে কোথাও কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। হঠাৎ দেখতে পেল, কিছু দূরে মোড়ের মাথায় একটা ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে লাল বাতি নীল বাতি ঘোরাচ্ছে। পুলিশ দেখে ছুটে গিয়ে অজিত বললে, 'পুলিশজী, একটা খুন হয়েছে।'

অজিত তাকে আগাগোড়া কাটা হাতের বিবরণ বলতে লাগল। খানিকটা শুনেই সেই ট্রাফিক পুলিশ বলল, 'আর বলতে হবে না, আমি জানি।'

অবাক হল অজিত। বললে, 'কী বলছেন পুলিশজী—আপনি এই খুনের সংবাদ জানতেন ?'

পুলিশ বলল, 'জানতাম মানে, দেখবে ?' এই বলে যে কাঠের বাক্সের উপর দাঁড়িয়ে সে নীল বাতি লাল বাতি ঘোরায় তার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কী একটা বের করল, তারপর বলল, 'দেখুন তো ভাই, এই হাত কিনা।'

অজিত অবাক হয়ে দেখল—ঠিক সেই হাত। খানিক আগে সে যেটাকে গঙ্গার খালের মধ্যে দেখে এসেছে। তেমনি একটি উজ্জ্বল হীরের আংটি অনামিকায় জ্বলছে যেন।

কাটা হাত দেখেই ভয়ে দৌড় দিল অজিত। এই তার জীবনে প্রথম ভয়ের সঞ্চার হল।

জনমানবহীন নির্জন পথ। অজিত প্রায় দৌড়েই চলেছে। সর্বাঙ্গে বইছে ঘামের ধারা। হঠাৎ চোখে পড়ল ঠুনুর-টুন করে চলেছে এক রিকশাওয়ালা। রিকশাওয়া-লাকে দেখে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল অজিতের। ইঙ্গিতে রিকশা দাঁড় করিয়ে বলল সে, 'ভাই. আমাকে একবার থানায় নিয়ে যাবে ?' এতরাত্রে থানায় কেন ? জানতে চাইল লোকটা। অজিত বলল, 'সে বড়ো অদ্ভুত ব্যাপার। গঙ্গার খালে দেখি একটা কাটা হাত, আঙুলে হীরের আংটি, ওই মোড়ের ট্রাফিক পুলিশকে কথাটা বলতেই সে তার বাক্সের ভেতর থেকে ঠিক তেমনি একটা কাটা হাত বের করে দেখালে—'

এই অবধি শুনে রিক্শাওয়ালা বলল, 'তুমি এতেই ঘাবড়ে গেলে বাবু, এই দেখো। বলে সেই লোকটা রিক্শার বসার সিটের ভেতর থেকে কী একটা জিনিস রের করে অজিতের দিকে বাড়িয়ে ধরল। বললে, 'এই দেখো।' অজিত দেখলে ঠিক তেমনি একটা কাটা হাত, অনামিকায় জলজল করছে একটা হীরের আংটি।

এই দেখে অজিত দৌড়তে আরম্ভ করল। সাহসী ছেলে, তাই রক্ষে। অন্য কেউ হলে সেখানেই দাঁতকপাটি লেগে যত। যেতে যেতে পথে পড়ল এক পানের দোকান। একটা ঠাণ্ডা কিছু খাবার জন্যে দাঁড়াল অজিত। তা ছাড়া, এই মুহূর্তে একটা আশ্রয়, একজন মানুষের সঙ্গ তার চাই।

অজিতকে হাঁপাতে দেখে পানওয়ালা বলল, 'কী হল বাবু, এত রাত্রে দৌড়চ্ছেন কেন?'

অজিত বলল, 'বলছি, তার আগে একটা ঠাণ্ডা কিছু খাওয়াবে ভাই?'

পানওয়ালা বলল, 'দোকান তো বন্ধ করে দিয়েছি বাবু। এত রাত্রে আর খুলব না—আপনি দৌড়চ্ছেন কেন তাই বলুন।'

অজিত তাকে সব কথা বলে গেল। শুনে পানওয়ালা বলল, 'তা হলে দোকান খুলতেই হল একবার। এই বলে দোকানের ঝাঁপ তুলে দোকানদার কী যেন বের করল। বললে, 'এই দেখুন।' অজিত ভেবেছিল হয়তো ঠাণ্ডা কিছু তার দিকে বাড়িয়েছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই চমকে উঠল সে। দেখল একটা কাটা হাত। হাতে জ্বলজ্বল করছে হীরের আংটি।

এরপর সেখানেই জ্ঞান হারিয়ে পড়ে যায় অজিত। পরদিন সকালবেলা পথের লোকজন দেখতে পেয়ে চিনতে পেরে তাকে হোস্টেলে আনে। সেখান থেকে হসপিটালে।

আমাদের প্রফেসর ডক্টর বর্মন অনেক রাত অবধি রোগীর ঘরে ছিলেন। তখনও অজিত অজ্ঞান। যাবার সময়ে প্রফেসর নাকি বলেছিলেন, 'কেসটা খুব ইন্টারেস্টিং সিসটার, আমি ছাড়া আর কাউকেই রোগীর ঘরে ঢুকতে দিয়ো না। আমি আবার সকালে এসে দেখব।'

যথারীতি সকাল ন'টায় ডক্টর বর্মন এসে জানতে চাইলেন 'কেউ এসেছিল সিসটার?' উত্তরে সিসটার জানায়, 'কে আবার আসবে, আপনি ছাড়া আর কেউ আসে নি।'

'আমি!' চমকে ওঠেন ডাক্তার। 'আমি তো এই আসছি।'

সিসটার বলল, 'ঠিক আটটায় আপনি এসে অজিতের কেবিনে ঢোকেন নি? কেবিনের দরজা বন্ধ করেন নি?'

ডক্টর বর্মন বললেন, 'না।' বলেই দৌড়ে গেলেন অজিতের কেবিনের দিকে। দেখলেন বিছানায় পড়ে আছে অজিত। কিন্তু দেহে তার প্রাণ নেই।

আর একটা জিনিস দেখে চমকে উঠলেন ডাক্তার বর্মন—সেটা হল মৃত অজিতের ডান হাতের অনামিকায় একটা হীরের আংটি জ্বলজ্বল করছে।

এই অবধি গল্প বলা হয়েছে, এমন সময়ে সহসা চারদিক অন্ধকার। কে যেন বলল, 'লোডশেডিং।' হঠাৎ আমি অন্ধকারে আবিষ্কার করি ডাক্তারের অনামিকায় একটি উজ্জ্বল আংটি। কে জানে সেটা গল্পের সেই হীরের আংটি কিনা!

॥ ২৯ ॥

চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা দেবার বছরেই শঙ্করের বাবা মারা গেলেন। বাবা চাকরি করতেন রতন সাহার আড়তে, বড় গঞ্জের বাজারে। সামান্য মাইনের চাকরি, হাজার খানেক টাকা ঋণ ছাড়া বিশেষ কিছু রেখে যেতে পারেন নি তিনি।

বাবার মৃত্যুর পর শঙ্কর পড়ল অথৈ জলে। পরীক্ষা দেওয়ার কথা সে ভাবতেই পারল না আর। পড়াশুনা ছেড়ে সে খুঁজতে লাগল চাকরি। কিন্তু এই সামান্য বিদ্যেয় কে তাকে চাকরি দেবে! যেখানে বি. এ. এম. এ. সব বেকারের দল বসে আছে।

শঙ্করের এক বন্ধুর জামাইবাবু চাকরি করতেন বোম্বেতে। পূজোর ছুটিতে সেই বন্ধুর জামাইবাবু এলেন শ্বশুরবাড়িতে বেড়াতে। শঙ্কর গিয়ে ভদ্রলোককে ধরল।

হেসে জামাইবাবু বললেন, 'তুমি কী কাজ করবে ভাই! লেখাপড়া তো বেশিদূর কর নি।'

শুনে শঙ্করের মনে আশার সঞ্চার হল। কারণ লেখাপড়া বেশিদূর না করলেও তার অন্য অনেক গুণ ছিল। খেলাধুলায় ও সাঁতারে তার জুড়ি ছিল না। গায়ের জোরও ছিল খুব। কব্জির জোরে দু'চার মিনিটেই জোয়ান ছেলেদের কাত করে দেয়। এ ছাড়াও মনে ছিল তার অসীম সাহস।

শঙ্করের এসব গুণের কথা বলল তার বন্ধু। সব শুনে জামাইবাবু বললেন, 'আচ্ছা, চল দেখি, কী করতে পারি।'

বোম্বে গেল শঙ্কর। আর মাসখানেক ঘোরাঘুরির পর চাকরি একটা পেল। কারখানার চাকরি। তাই বা কজন পায়!

চাকরি পেয়ে একটা কুঁড়েঘর ভাড়া নিয়ে স্বাধীনভাবে সংসার পাতল সে। এইসব কুঁড়েঘরকে স্থানীয় লোক বলে ঝোবরী।

আগেই বলেছি, শঙ্কর পরিশ্রমী ছেলে। একমাত্র কারখানার কাজেই সে আটকে থাকল না। কারখানায় কাজের ফাঁকে ফাঁকে বান্দ্রা স্টেশনে বসে সে কলম ফেরি করতে লাগল। তাতেও কিছু রোজগার হত।

এইভাবে কাটল পাঁচ-সাত বছর। ওদিকে ছোটো ভাই কিংকর স্কুলে ভর্তি হয়েছে। দেশে বাপের দেনা শোধ হয়েছে, বন্ধকী জমিও প্রায় এসেছে উদ্ধার হয়ে। এমন সময়ে তিন দিনের অসুখে ভুগে চলে গেলেন শঙ্করের মা। সংসারে ভাই ছাড়া তার আর কেউ রইল না। এই ভাইকেই মানুষ করবে, তাকে বি. এ. এম. এ. পাশ করাবে, তারপর দেশে পাকাবাড়ি করবে, পুকুর কাটাবে, মন্দির তৈরি করবে— এসব ছিল শঙ্করের স্বপ্ন।

এক এক করে তার স্বপ্ন বুঝি বাস্তবে পরিণত হতে চলেছে। কারণ গত মাসেই কিংকরের চিঠি থেকে জেনেছে সে, কিংকর নাকি ভালভাবে বি. এ. পাশ করেছে।

এখন চাই বাড়ি তৈরির টাকা। সে অনেক টাকা। কারণ শঙ্করের বাড়ি হবে পাকা। সে ব্যবস্থাও করল শঙ্কর। নাইট সিফ্‌টে একটা কারখানায় চাকরি নিল। ঠিকার কাজ। এক কথায় অমানুষিক পরিশ্রম করে চলল সে। তার স্বপ্নকে সার্থক করতেই হবে।

মাসে মাসে দেশের ঠিকানায় কিংকরের কাছে কখনও পাঁচশো, কখনও হাজার করে টাকা যেতে লাগলো। এ টাকায় তৈরি হবে বাড়ি, কাটানো হবে পুকুর যে-পুকুরের কাকচক্ষু জলে রূপোলী মাছের দল সাঁতার কাটবে। গ্রামের বধূ জল নিতে আসবে ভিন গাঁ থেকে।

এইভাবে আরও কাটল বছর পাঁচেক। তবু পাকা বাড়িটা তৈরি হয় না কেন? মাস খানেকের ছুটি নিয়ে শঙ্কর এল দেশে।

বাড়ির কাছে গিয়ে অবাক। তাদের মাটির ঘরটা সংস্কারের অভাবে একদিকে কাত হয়ে হেলে পড়ে আছে। ধারে-কাছে পাকাবাড়ির চিহ্ন নেই। শঙ্করকে দেখে এগিয়ে এল পরান কাকা, বললে, 'কে বটে?'

'আমি গো পরান কাকা, অনেকদিন পর দেশে এলাম। কিংকর কোথায় বলতে পার?'

'তোমার আদুরে ভাই কোথায় কখন থাকে আমি কী করে বলব বাবা। হয়তো কলকাতায় গেছে সিনেমা দেখতে।'

'কী দেখতে?' শঙ্করের দুচোখে বিস্ময়।

'সিনেমা, সিনেমা গো, আমরা বলতাম টকি, এখন হয়েছে সিনেমা।'

'কিংকর সিনেমা গেছে?'

'একি নতুন কথা বাবা, তুমি নাকি তাকে ফুর্তি করতে টাকা পাঠাও? সেই টাকা নিয়ে সে বাবুগিরি করে বন্ধুদের ফিসটি খাওয়ায়।'

'তুমি কী বলছ পরান কাকা, আমার পাকা বাড়ি?'

পরান কাকা আঙুল তুলে শঙ্করদের ভাঙা মাটির ঘরটা দেখিয়ে বলে, 'এই যে, দেখতে পাচ্ছ না!'

'হায় হায়! তা হলে কিংকর আমাকে ঠকিয়েছে কাকা। আচ্ছা, বলতে পার, ও কি বি. এ. পাশ করেছে!'

এবার শব্দ করেই হেসে ওঠে পরান কাকা। বললে, 'স্কুলের গণ্ডি পেরোয় নি বাবা।'

নিজের মাথায় নিজের হাতেই কুড়ুল মারতে ইচ্ছে হল শঙ্করের। বললে, 'হায় হায়, কেন তোমাকে একটা চিঠি দিয়ে সব সংবাদ যাচাই করি নি পরান কাকা। তা হলে তো এতবড় সর্বনাশ হত না।'

পরান কাকা মৃদু হেসে বলল, 'দুঃখ কোরো না বাবা। তুমি আর কী করবে বলো, একেই বলে 'চোর পালালে বুদ্ধি বাড়ে।'

॥ ৩০ ॥

দুর্জনের ছলের অভাব হয় না [প্রবাদ গল্প] (নমুনা প্রশ্ন, সংসদ ১৯৭৯)

তপন আজ বিকেল থেকেই চাটুজ্যেদের রোয়াকে বসে আছে। ওর দু বন্ধু শ্যামল আর অমিতাভের এখনও দেখা নেই। ওদের এই তিন বন্ধুকে পাড়ায় সবাই বলে 'থ্রি মাসকেটিয়ার্স'। এরা যা করে তিন জনে মিলে করে। দুষ্টুমি করার সময়ে এই তিনজন, আবার ভালো কাজ, যেমন, রোগীর সেবা বা মড়া পোড়ানো, সেখানেও থাকে পাড়ার এই থ্রি মাসকেটিয়ার্স।

তপন একবার ঘড়ির দিকে তাকাল। তার মানে সে কিঞ্চিৎ অধৈর্য। শ্যামল গেছে ইণ্টারভিউ দিতে একটা মার্চেণ্ট অফিসে। ওর আসতে দেরি হবে, কিন্তু অমিতাভের তো দেরি করার কথা নয়।

এমন সময়ে দেখা গেল অমিতাভ আসছে। ওর হাতে একটা বেলফুলের মালা প্যাঁচানো। এটা ওর অনেক দিনের অভ্যেস, ফুল দেখলে মাথার ঠিক থাকে না।

অমিতাভকে দেখে তপন গম্ভীর হবার চেষ্টা করে। অমিতাভ বলে, 'কী রে? মুখটা অমন প্যাঁচার মতো কেন?'

এবার তপন উত্তর দেয়, 'আমার মুখটাই প্যাঁচার মতো, আমি কী করব?'

'বাবাঃ, খুব রাগ করেছিস দেখছি। একটু দেরি হল কী করব বল? ঠিক বেরুবার মুখেই ধরা পড়ে গেলাম, মা বলল 'অমি, রেশনটা এনে দিয়ে যা।' অবশ্যি রেশন আনলাম বলেই না বেলফুল কেনার পয়সা হাতে এল।'

'তবে যা, বেলফুল ধুয়ে ধুয়ে জল খা। এই পয়সা কটা থাকলে এটা ডবল হাফ্ হয়ে যেত।'

'তার জন্যে ভাবিস না তপন, আজ রেশনের লাইনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যা একখানা প্ল্যান এঁটেছি না, কী বলব! প্ল্যানটা সাক্সেসফুল হলে কেবল ডবল হাফ নয়, তিনজনের ভাগ্যে তিনটে করে কাটলেট অবধি হতে পারে, কিন্তু শ্যামলটা কী করছে বল তো?'

বলতে বলতেই শ্যামল এসে পড়ল। অমিতাভ বলল, 'এসো বাবা, ইণ্টারভিউ কেমন দিলে তো জানি, এবার ঝাঁকের কই ঝাঁকে এসো।'

শ্যামল বলল, 'নে, দুটো দশ পয়সা ছাড়—বাদাম আনি। বড্ড খিদে পেয়েছে। আচ্ছা, 'ইণ্টারভিউ,-এ খাওয়ায় না কেন বলতো? লাঞ্চ ব্রেক বলে নিজেরা তো দিব্বি ভোজ দেয়।'

অমিতাভ বলে, 'নে-নে, চল! আমার কথা-মতো চললে আজ আর শুকনো বাদাম চিবুতে হবে না, চপ-কাটলেট ওড়াবি।'

তপনের মুখের দিকে তাকিয়ে শ্যামল প্রশ্ন করে, 'কী ব্যাপার রে তপন? অমিতাভ বুঝি বুড়ি ঠাকুরমার থলিতে হাত দিয়েছে?'

তপন মুখের ভঙ্গি করে বলল, 'জানি না।'

এরপর অমিতাভ তাড়া দিল, 'চল চল, দেরি হলে কিন্তু পস্তাতে হবে।'

ওরা থ্রি মাসকেটিয়ার্স চলেছে। কোথায় চলেছে কে জানে। যেতে যেতে শ্যামবাজারের কাছে হঠাৎ একটা বাড়ির দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়াল অমিতাভ, পিছনে ওরা দু বন্ধু।

কড়া নাড়তেই দরজা খুলে সামনে এলেন এক ভদ্রমহিলা। অমিতাভকে দেখে তার মুখে হাসি ফুটল। বললেন, আমার কী ভাগ্যি রে, আজ বুঝি পশ্চিমে স্থয্যি উঠেছে!

অমিতাভ খপ করে মহিলার পায়ের ধুলো নিয়ে বলল, 'কখন আসি, বলুন মাসিমা?'

'কেন রে, তোর আবার কাজ কী?'

'কাজ নেই, কী যে বলেন মাসীমা, আমার তো ঘরে বাইরে কাজ।'

'বাইরের কাজ তো জানি, স্রেফ্ আড্ডা। তা ঘরের কাজটা কী শুনি?'

কেন, আপনি কিছু শোনেন নি?

চোখ বড়ো বড়ো করে ভদ্রমহিলা বলেন, 'কী শুনব?'

'কেন, শোনেন নি? বাবার খুব শরীর খারাপ। আজ অনেকদিন ধরে শয্যাশায়ী।'

মহিলার কণ্ঠে করুণা। বললেন, কী করে জানব বল, সেই তোদের পাড়া ছেড়ে এসেছি তারপর থেকে তো ও পাড়ায় আর যাই না। তা কী হয়েছে তোর বাবার?'

'সে অনেক কথা, আর একদিন না হয় এসে বলব'খন, আজ একটা বিশেষ দরকারে এসেছি, হাতে সময় নেই।'

অমিতাভের বন্ধুদের দিকে এবার বুঝি চোখ পড়ল মহিলার। বললেন, 'এরা বুঝি তোমার বন্ধু। তা বন্ধুদের নিয়ে একটু বসবে না?'

অমিতাভ বলল, 'না মাসিমা, আর একদিন হবে। আজ একটা জরুরী কাজে এসেছি।'

'কী কাজ বলোই না।'

অমিতাভ বলল, 'বাবার ওষুধ কিনতে বেরিয়েছি—ওষুধটা আমাদের পাড়ার দিকে কোথাও পাওয়া গেল না,—যদিও আপনাদের এই মোড়ের দোকানে পেলাম কিন্তু দাম বলছে অনেক। প্রায় পাঁচ টাকা বেশি।'

মহিলা তো শুনে অবাক। বললেন, 'কী ওষুধ যে পাঁচ টাকা দামের ফারাক?'

'কী ওষুধ'—অমিতাভের এবার তো-তো করার পালা।

বললে সে, 'এই যা, নামটাতো ভুলে গেছি!'

'তবে ওষুধ কিনবি কেমন ক'রে?'

'কেন? প্রেসক্রিপশনটাতো আছে।'

'প্রেসক্রিপ্শন দেখি। আমি ছোট্টুকে দোকানে পাঠাচ্ছি। তুমি নতুন লোক বলে বোধ হয় বেশি দাম চাইছে? ছোট্টু গেলে আর চাইবে না।'

ছোট্টু এই মহিলার বড়ো ছেলে।

অমিতাভ পকেটে হাত দিয়ে বলল, এই যা, সেটা বোধ করি দোকানেই ফেলে এসেছি—আয় তো একবার দোকান থেকে সেটা চেয়ে আনি।

মহিলা বললেন, 'বন্ধুদের আবার টানছ কেন, এরা বরং বসে একটু চা খাক, তুমি যাও।'

অমিতাভ শুনে হা-হা করে উঠল। 'কে চা খাবে? শ্যামল-তপন চা খাবে? আপনি ওদের জানেন না মাসিমা। চা না, কোন নেশাই নেই ওদের। তা ছাড়া, ওরা সঙ্গে সঙ্গে না থাকলে দোকানদার হয়তো প্রেসক্রিপ্‌শ্‌নটা দিতেই চাইবে না?

ভদ্রমহিলা প্রশ্ন করেন, 'কেন দেবে না?'

'বা রে, সেটা দেবার সময়ে আমরা তিনজন ছিলাম। তাই চাইবার সময়েও তিন-জনকে থাকতে হবে, নইলে বুঝবে কেমন করে আমরা সেই লোক, যারা প্রেসক্রিপশ্‌ন ফেলে গেছল।'

ভদ্রমহিলা কিছু বলবার আগেই অমিতাভ ওর বন্ধুদের জোর করেই বাড়ির বাইরে টেনে আনল।

তপন আর থাকতে না পেরে চুপিচুপি বলল, কথায় বলে না, 'দুর্জনের ছলের অভাব হয় না' আজ সেটা প্রত্যক্ষ করলাম। আমাদের বিনি পয়সার চা-টা মাটি করলি।'

॥ ৩১ ॥

সংকেত : এক ভদ্রলোক রোজ কুকুর নিয়ে বেড়াতে যান। একদিন কুকুরটির মুখের সামনে গাছ থেকে পড়ে একটি পাখির ছানা। ভদ্রলোক থমকে তাকান। কুকুরটি প্রথমটা দাঁড়িয়ে গিয়ে পরে ধীরে ধীরে পাখির ছানাটিকে ধরতে এগোয়। ঠিক সেই মুহূর্তে গাছের ওপর থেকে ছানাটির মা ঝাঁপিয়ে পড়ে কুকুরটির সামনে। মা-র সাহস দেখে ভদ্রলোক তো স্তম্ভিত।]

[পঃ বঃ উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা, ১৯৮২]

ভদ্রলোকটিকে একটু সৌখিনই বলতে হয়, অন্তত কুকুরটার পরিপাটি চেহারা দেখে। কুকুর ছাড়া ওঁকে দেখাই যায় না। ওঁর কুকুর, না কুকুরের উনি সে প্রশ্নই মনে জাগে।

সেদিন রোববার। কুকুরটিকে নিয়ে যথারীতি লেকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন তিনি। সকালের রোদটা গাছপালার ফাঁক দিয়ে এসে পড়ছে মাটিতে—একটা আলোআঁধারের সুন্দর আল্‌পনা যেন।

হঠাৎ খস করে একটা শব্দ হল। কী যেন পড়ল গাছ থেকে। ভদ্রলোক বুঝলেন ওটি একটি পাখির ছানা। কী সর্বনাশ কুকুরটা যে এখুনি—। কিন্তু না। কুকুরটা হঠাৎ হকচকিয়ে গেল, কারণ ইতিমধ্যেই মা-পাখিটা ঝাঁপিয়ে পড়েছে ছানাটিকে তুলে নিতে। হ্যাঁ, তুলে নিয়ে মুহূর্তের মধ্যেই উড়ে গিয়েছে পাখিটা। ভদ্রলোক স্তম্ভিত। কী সাহস পাখিটার। একেবারে কুকুরের মুখের সামনে এসে পড়তেও তার বুক কাঁপল না। কাঁপবে কেন? সন্তানের জীবন যে মায়ের কাছে নিজের জীবনের চেয়ে অনেক দামি। পশু-পাখিদের সন্তানবাৎসল্য মানুষের চেয়ে কিছু কম নয়।

॥ ৩২ ॥

[**সংকেত ঃ** কোন শ্রমবিমুখ ব্যক্তি অপরিচিত বিদ্যাসাগরকে কুলি মনে করে, এবং শেষ পর্যন্ত কুলির প্রকৃত পরিচয় জেনে যে লজ্জা, গ্লানি এবং শিক্ষা পেয়েছিল, সেই ঘটনাটি অবলম্বন করে একটি গল্প রচনা কর।]

[উ. মা. ১৯৮০]

ছোট্ট স্টেশন, নাম বারুইপুর। সন্ধ্যা সাতটা পাঁচের ট্রেন থেকে নামলেন নতুনদা। হাতে একটা ছোট্ট ব্যাগ আর ছাতা। দেখতে দেখতে দুচার মিনিটেই প্লাটফর্ম-ফাঁকা। ফাঁকা স্টেশনের চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নতুনদার মন-মেজাজ গেল বিগড়ে। এ কী স্টেশন রে বাবা, কুলি কই, টিকিট চেকার কই? হঠাৎ কুলিগোছের একজন কাকে যেন দেখতে পেলেন নতুনদা। সঙ্গে সঙ্গে হাঁক দিলেন, 'এই কুলি, ইধার আও'।

সময় সময় হিন্দী না বললে ঠিক ভাবটা ফোটে না। মনে মনে বললেন নতুনদা।

নতুনদার বাজখাঁই গলা শুনে লোকটা সামনে এসে দাঁড়াল। হাঁটুর ওপর কাপড়, গায়ে চাদর, মাথায় টিকি। নির্ঘাত কুলি। নতুনদা মনে মনে ভাবেন।

লাও, সামান উঠাও।

কিন্তু সামান কোথায়?

এই তো আমার হাতে, এই ব্যাগ আর ছাতা। নাও নাও ধর। যাব বাজার-পাড়া, চেনো তো?

ঠিক চিনি না। তবে আপনি আগে আগে চলুন আমি পিছনে যাচ্ছি।

যেতে যেতে নতুনদা বললেন, আমার ব্যাগটা কিন্তু খুব ভারি না বুঝলে?

না, তা অবশ্যই নয়।

আর ছাতাটা তো একদম হালকা।

ঠিক তাই।

তাই বলছিলাম কী, বোঝাটা হালকা বলে তোমার পাওনাটাও একটু হালকা হবে।

আপনার যা অভিরুচি তাই দেবেন।

'অভিরুচি'—বা বেশ বাংলা বলেছ তো—তুমি নিশ্চয়ই বিদ্যাসাগরের প্রথম ভাগ পড়েছ।

তা অবশ্যই পড়েছি।

বা-বা, বেশ, শুনে খুশি হলুম। তা দ্বিতীয় ভাগটাও পড়লে না কেন বাপু?

আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি ওটাও আমার পড়া।

বাঃ, তুমি তো বেশ শিক্ষিত কুলি হে; এই যে এসে পড়েছি, সামনেই আমার শ্বশুরবাড়ি।

নতুনদার গলা শুনে বেরিয়ে আসেন শ্বশুরমশাই। তার পর লণ্ঠনের আলোয় জামাইকে দেখে ভদ্রলোক প্রায় আর্তনাদ করে ওঠেন। কে-কে, এ আমি কাকে দেখছি।

নতুনদা মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বলেন, আমি—আমি আপনার জামাই—ভবেশ।

না, তা বলছি নে, তোমার সঙ্গে এ কাকে দেখছি!

কেন কুলি, স্টেশন থেকে এনেছি।

কুলি, হাঁা সত্যি কুলি—বলতে বলতে শ্বশুর ভদ্রলোক তো কুলির পায়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েন।

সমস্ত জাতির পাপের বোঝা আপনি নিজের মাথায় তুলে নিয়েছেন, আপনি তো সত্যি কুলি—এক অভিনব কুলি।

নতুনদার মুখটা তখন দেখবার মতো। শ্বশুরমশাই যে কুলিকে প্রণাম করতে পারেন সে কুলি কে? সে কুলি তো সাধারণ কুলি নয়!

জামাইয়ের মনের কথা বুঝতে পেরে শ্বশুরমশাই বলেন, প্রণাম কর ভবেশ, তোমার ঠুনকো লোকভয় দূর করবার জন্যে আমার ঘরে আজ পায়ের ধুলো দিতে এসেছেন স্বয়ং বিদ্যাসাগর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

কে, বিদ্যাসাগর!

নতুনদা যেন ভেঙে পড়লেন। তারপর বিদ্যাসাগরের পায়ের কাছে বসে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বললেন, আমাকে ক্ষমা করুন, প্রতিজ্ঞা করছি আজ থেকে ঠুনকো লোকভয় ত্যাগ করব।

॥ ৩৩ ॥

[**সংকেত :** একজন ছাত্র একটি সাঁতার না জানা শিশুকে জল হইতে উদ্ধার করিয়া সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া একটি গল্প রচনা কর।]

[উ. মা. ত্রিপুরা, ১৯৮০]

নদীর নাম শীলাবতী। চৈত্র-বৈশাখ মাসে শীলাবতীর নীল জলে রূপসী মাছেরা খেলা করে, আয়নার মতো স্থির জলে গাছের ছায়া পড়ে, পূর্ণিমার চাঁদ দোল খায়। কিন্তু বর্ষায় এ নদীর রূপ ভিন্ন। বৈশাখের নীলজল তখন সোনার বর্ণ ধারণ করে চঞ্চল বালিকার মতো ছুটে যায়।

সেদিনটা ছিল বর্ষার দিন।—স্কুলের পর ফটিক শীলাবতীর তীর দিয়ে বাড়ির পথে চলেছে। এক একবার আকাশের দিকে তাকায় আর পথ চলে ফটিক। কারণ আজ ছাতা আনতে ভুলে গেছে সে। তাই বার বার তার আকাশ দেখা আর পথ চলা। হঠাৎ বৃষ্টি এলে ভেজা ছাড়া গতি নেই।

ফটিকের ডান দিকে বন, ঘন বন। বাঁ দিকে শীলাবতী। শীলাবতী কল কল খল খল করে অসংখ্য কথা বলে ছুটে চলেছে আপন মনে। নদীর ভাষা কেউ বোঝে না। কিন্তু ফটিক বোঝে। সে জানে শীলাবতী বলছে, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?" ফটিক মনে মনে বলল, 'বাড়ি যাচ্ছি'। নদী আবার প্রশ্ন করে, 'সেখানে কে কে আছে তোমার?' 'আমার মা, বাবা, ভাই, দু বোন। একটা পোষা টিয়া—আর ভুলো।'

'ভুলো কে?'—নদীর প্রশ্ন।

'ওমা, ভুলো কে, চেনো না, ভুলো হল গিয়ে'—

উত্তর শেষ করতে পারে না ফটিক, সহসা কাদের সমবেত আর্তনাদে তার চিন্তার জাল ছিঁড়ে যায়। একটা মোড় ঘুরতেই ফটিক দেখল নদীর তীর ধরে একদল লোক ওর দিকে ছুটে আসছে,—তাদের দৃষ্টি খরস্রোতা শীলাবতীর স্রোতের দিকে নিবদ্ধ।

'কী হয়েছে ?'

জানতে চায় ফটিক।

কে যেন বলল ভিড় থেকে, আমাদের মনাপিসির ছেলেটা জলে পড়ে গেছে ভাই। কিন্তু কেউ সাহস করে তুলতে পারছে না। সবাই ছুটছে স্রোতের টানে ভেসে যাওয়া ছেলেটাকে অনুসরণ করে। ব্যাপারটা এক মুহূর্তে বুঝে নিল ফটিক।

মনাপিসির ছেলেটাকে যে-করেই হোক বাঁচাতে হবে তার, কারণ মনাপিসির আর কেউ নেই।

বইপত্র মাটিতে ফেলে ফটিক ওর কর্তব্য স্থির করে ফেলল। ছুটে আসা লোকগুলির মতো সে কিন্তু আধা ডুবন্ত ছেলেটাকে অনুসরণ করল না। ফটিক প্রাণপণে দৌড়তে লাগল যেদিকে স্রোতের টানে ভেসে যাবে মনাপিসির ছেলে, সেই দিকে। তারপর এক সময় তাল বুঝে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে, ঠিক যখন ছেলেটা তার কাছাকাছি এসে যাবে তখনই।

ছুটে আসা লোকগুলি বুঝতে পারছিল না, কী করে ছেলেটাকে উদ্ধার করবে। কেউ কেউ জলেও নেমেছিল, কিন্তু সকলেই জলে-পড়া ছেলেটাকে অনুসরণ করে। তাই সব সময় সমান ব্যবধানই থেকে গেছে তাদের মধ্যে।

সুকৌশলে ফটিক জাপটে ধরল ছেলেটাকে, তারপর বহু কষ্টে বহু সাধনায় টেনে তুলল ডাঙায়। সবার আগে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল মনাপিসি, ছেলেকে। সঙ্গে সঙ্গে ফটিককেও। বলল, মা শীলাবতীর বুকে ভেসেছিল আমার এক ছেলে, কিন্তু পেলুম দুজনকেই।

॥ ৩৪ ॥

[**সংকেত :** একটি ছোট মেয়ে বাবার কাছে কাচের চুড়ির আবদার করিল—বাবা প্রতিশ্রুতি দিয়াও আনিতে ভুলিয়া গেল—সেই রাতে ছাদ হইতে মেয়েটি পড়িয়া মারা গেল—বাবার দুঃখ।]

[নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৭৯]

মা বললেন, টুম্পা ঘুমাবি নে, রাত হল। টুম্পার আজ চোখে ঘুম নেই। কারণ আজ মাসের প্রথম শনিবার। প্রতি শনিবার বাবা কলকাতা থেকে দেশে বাড়ি আসেন, টুম্পা সে কথা জানে। আজ অবশ্য জেগে থাকার অন্য আর একটা কারণ আছে।

আজ টুম্পার চুড়ি আসছে, কাচের চুড়ি। বাবা বলেছেন, মাইনে পেলেই তোমার জন্যে চুড়ি আনব মা—।

মাইনে কবে পাবে বাবা ?

মাইনে পাব পয়লা, শনিবার।

তার মানে তুমি যেদিন বাড়ি আসবে ?

হ্যাঁ।

কী মজা, আমি কাচের চুড়ি পরে আগে খুকুকে দেখিয়ে আসব।

এর আগে অবিশ্যি বার দুয়েক আনব আনব করেও টুম্পার বাবা চুড়ি আনতে পারেন নি। কলকাতায় গিয়ে নানান কাজের চাপে ঘরের কথা ভুলে যান ভদ্রলোক। এবার যাবার সময় টুম্পা খুব করে বলে দিয়েছে চুড়ি আনবার কথা। উপরন্তু বাবার রুমালে একটা গিঁটও বেধে দিয়েছে।

টুম্পার মা বললেন, তুমি এখন ঘুমিয়ে পড় সোনা ; উনি এলে আমি তোমাকে তুলে দেব। ট্রেন থেকে নেমে বাস, তারপর আবার নৌকো, তারপর আমাদের গ্রাম —কলকাতা তো কমদূর নয়।

টুম্পা কিন্তু ঘুমুতে রাজি হয় না। ঠায় জেগে বসে থাকে। এক সময় ঘড়ির কাঁটা যখন ন'টার ঘর ছুঁই ছুঁই ঠিক তখনই টুম্পার বাবার গলা শোনা গেল।

সবার আগেই ছুটে এল টুম্পা। মেয়েকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বাবা বললেন, "একটা মস্ত দোষ করে ফেলেছি মা--তোমার চুড়ি কিনেছি, কিন্তু ফেলে এসেছি মেসে। ট্রেনে উঠেই মনে পড়ল।"

অভিমানে টুম্পা তখন গালফোলা গোবিন্দর মা। বলে, চাই নে তোমার চুড়ি, তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না। খুকুর বাবা খুকুকে কত ভালবাসে। এই এত এত চুড়ি এনে দেয়।

মেয়ের অভিমানভরা মুখের দিকে তাকিয়ে কষ্ট হয় বাবার।—বলেন, আমার যে বড়ো ভুলো মন মা, কী করব বল, বুড়ো হয়েছি তো। আচ্ছা দেখ, আর ভুল হবে না।

সেদিন বাবার আনা লজেন্স হাতেই করল না টুম্পা। না খেয়েই ঘুমুতে গেল। খাওয়া দাওয়ার পর খোলা ছাদের ওপর মাদুর পেতে বসলেন টুম্পার বাবা। একথা সে কথার পর স্ত্রীকে বললেন, ভাবছি সামনের মাসেই ছাদের পাঁচিলটা গেঁথে ফেলব। নেড়া ছাদ রাখা ঠিক নয়। যা দুরন্ত মেয়ে।

টুম্পার মা বললেন, তার আগে মেয়ের কাচের চুড়ি এনো মনে করে।

আনব আনব, দেখো, আর ভুল হবে না। এবার কলকাতায় গিয়েই ব্যাগের মধ্যে ভরে ফেলব।

এই ঘটনার পর মাত্র সাতটি দিন পার হয়েছে। আবার এসেছে একটি শনিবার। সেদিনও অনেক রাত্রে বাবা বাড়ি এলেন ব্যাগের মধ্যে কাচের চুড়ি। ঘরে পা দিয়েই টুম্পার বাবা ডাক দিলেন, টুম্পা-টুম্পু—তোমার জন্যে কী এনেছি, দেখে যাও। কিন্তু তার ডাকে কেউ ছুটে এল না।

ধীরে ধীরে বিষণ্ন মুখে সামনে এসে দাঁড়ালেন টুম্পার মা।

টুম্পা কোথায় ? ওর জন্যে চুড়ি এনেছি, ডাকো।

টুম্পার মা আর নিজেকে ধরে রাখতে পারেন না। ডুকরে কেঁদে ওঠেন।

'কী হয়েছে'। বাবার কণ্ঠে আর্তনাদ।

কাল সন্ধ্যেবেলায় চাঁদ দেখতে দেখতে ছাদ থেকে পড়ে যায়—তার পরেই—

টুম্পা—টুম্পা নেই।

ব্যাগ থেকে চুড়িগুলি বের করে টুম্পার বাবা মাটিতে বসে পড়েন। তাঁর কানের কাছে টুম্পার অভিমান-ভরা কণ্ঠ বেজে ওঠে 'চাই নে তোমার চুড়ি, তুমি আমাকে একটুও ভালবাস না।' কিন্তু মেয়েকে তিনি কত যে ভালবাসেন তা প্রমাণ করার জন্যে টুম্পা আর অপেক্ষা করে নেই।

॥ ৩৫ ॥

নদীর ঘাটের কাছে নাসরুদ্দিন দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ দেখল নয়জন অন্ধমানুষ নদী পার হবার জন্য এসে দাঁড়িয়েছে। নাসরুদ্দিন তাদের কাছে গিয়ে বললে, একটা করে পয়সা দিলে সে প্রত্যেককে এক এক করে নদী পার করে দেবে। অন্ধরা রাজি হল। কিন্তু শেষ লোকটি নাসরুদ্দিনের হাত ছেড়ে স্রোতে ভেসে গেল। ওপর থেকে নটি অন্ধলোক জিজ্ঞেস করলে কী হয়েছে? নাসরুদ্দিন বললে, কিছু না। তোমাদের কেবল এক পয়সা কম দিতে হবে।

[উ. মা. ১৯৮৪]

দাসপুর গ্রামে থাকত নয় বন্ধু। তারা সবাই ছিল অন্ধ। অন্ধ হলে কী হবে তাদের গানের গলা ছিল অসম্ভব সুন্দর। সবাই যে গাইতে পারত তা নয়। কেউ গাইত, কেউ বাজাত, কেউ নাচত। এই ভাবে, নয় বন্ধু মিলে 'দৃষ্টিহীন সাংস্কৃতিক সংস্থা' গড়ে তুলেছিল।

একবার আষাঢ় মাসে ওরা নাড়াজোল রাজবাড়িতে গানবাজনার বায়না নিয়ে অনুষ্ঠান করতে গেল। নাড়াজোলে সেবার ছিল রথের মেলা আর উৎসব। গান গেয়ে আর নেচে "দৃষ্টিহীন সাংস্কৃতিক সংস্থা" সেবার রাজবাহাদুর নরেন্দ্রলাল গনের মন জয় করে ফেলল। রাজাবাবু তাদের দিলেন প্রত্যেককে একটি করে ধুতি চাদর আর একটি করে টাকা।

ধুতি চাদর আর টাকা উপহার নিয়ে নয় অন্ধ বাড়ি ফিরে চলেছে। যাবে দাসপুরে। হাঁটা পথ, তখনও বাসের রাস্তা তৈরি হয়নি। যেতে যেতে পথেই দিন শেষ হল। রাত কাটল এক শিবমন্দিরে। মন্দিরের পূজারী অন্ধদের জন্যে খাওয়া ও থাকার ব্যবস্থা করলেন। সেখানে ধর্মীয় অনুষ্ঠান হল রাতভর। সকালে উঠেই আবার গ্রামের পথ ধরল তারা। যেতে যেতে একসময় এসে দাঁড়াল কংসাবতীর তীরে। আষাঢ় মাসের কংসাবতী কূলে কূলে ভরা। নদীর ঘোলা জল গর্জন করে ছুটে চলেছে। ফেরিঘাট কোথায় কতদূরে তা কে জানে। অন্ধ নয় বন্ধু তার কোন সংবাদই পেল না।

নদীর তীরে দাঁড়িয়ে তারা ভাবতে লাগল পারে যাবার উপায় কী হবে। হঠাৎ শুনল কে যেন বলছে, "তোমরা পারে যাবে নাকি কর্তা।"

অন্ধদের দলপতি শিবদাস বলল, "হাঁ ভাই, পারে যেতেই চাই, কে তুমি?" লোকটা বলল, "আমার নাম পাগলা, ভাল নাম নাসরুদ্দিন, এই গ্রামেরই লোক। তোমাদের ঘর কোথায়?"

শিবদাস বলল, "আমরা দাসপুরের লোক, গান বাজনা করতে গেছলুম নাড়জোল রাজবাড়িতে। আমাদের নদীটা পার করে দাও না ভাই ঘরে চলে যাই।"

নাসরুদ্দিন বলল, "রাজবাড়ি থেকে যখন আসছ তখন নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে পয়সা আছে।"

শিবদাস বলল, তা আছে ভাই।

"তা হলে আমিই তোমাদের একে একে পার করে দেব কিন্তু এক একজনকে পার করার খরচ পড়বে এক এক পয়সা, পারবে দিতে?"

শিবদাস বলল, "পারব'।

নাসরুদ্দিন বলল, বেশ তবে এসো একে একে পারে নিয়ে যাই।

সবার আগেই এগিয়ে গেল শিবদাস। নাসরুদ্দিন তার হাত ধরে নামল জলে। গভীর জল, কিন্তু অদ্ভুত কৌশলে তাকে নিয়ে সাঁতার কেটে কেটে ও পারে নিয়ে গিয়ে হাজির করল। এই ভাবে একে একে আটজনকে ও পারে নিয়ে গিয়ে নাসরুদ্দিন বলল, 'যাক আজ সকালেই আমার আট আটটা পয়সা রোজগার হল। এখন শেষের লোকটিকে এনেই আমার প্রাপ্য বুঝে নেব।'

দলপতি শিবদাস বলল, "বেশ তাই হবে, শেষের লোকটিই হল আমাদের মূল গায়েন নাম শ্যামল গায়েন, তাকে এনেই নটি পয়সা গুনে নাও।"

নাসরুদ্দিন গেল শ্যামল গায়েনকে আনতে। কিন্তু শ্যামল গায়েন ছিল একটু ভীতু প্রকৃতির মানুষ। নদী পার হতে গিয়ে নাসরুদ্দিনকে জাপটে ধরতে গেল, ফলে নাসরুদ্দিনও তাকে কায়দা করে ধরতে পারল না। ফলে, শ্যামল গায়েন গেল ভেসে কংসাবতীর খরস্রোতে।

শ্যামলের আর্তনাদ শুনে ওপার থেকে শিবদাস জানতে চাইল, "কী হল ভাই, বাঁচাও বাঁচাও বলে চীৎকার করছে কে? আমাদের শ্যামল গায়েনের কণ্ঠস্বর বলেই মনে হচ্ছে?"

উত্তরে নাসরুদ্দিন বলল, "ও কিছু নয়, তোমাদের কেবল একটি পয়সা কম দিতে হবে। কারণ আমি আটজনকেই পার করেছি ন-জনকে নয়।"

নাসরুদ্দিনের কাছে মানুষ মানুষ ছিল না, ছিল একটা মাত্র সংখ্যা। তাই সে পয়সা দিয়েই হিসাব করেছে মানুষকে।

॥ ৩৬ ॥

[**সংকেত :** বার বার যুদ্ধে পরাস্ত স্কটল্যাণ্ডের রবার্ট ব্রুস—গুহার আশ্রয় গ্রহণ—শত্রুর নিকট আত্মসমর্পণের চিন্তা—মাকড়সার জালবোনার চেষ্টা ও পরে সাফল্য দেখিয়া প্রেরণা লাভ—যুদ্ধে জয়।]

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

পাহাড়ের ছোট্ট একটি গুহা—অন্ধকার স্যাঁতসেতে। অনেক আগেই ঘুম ভেঙেছে রবার্টের, কিন্তু বহু যুদ্ধের রণক্লান্ত সৈনিক আরও কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে পড়ে থাকে।

চোখ বন্ধ থাকলেও মনের দরজা থাকে খোলা। সেখানে হাজারো চিন্তা আসে যায়। চোখের পাতা বন্ধ করে একটা যুদ্ধের স্বপ্ন দেখতে থাকে রবার্ট। যে-যুদ্ধের সেনাপতি ছিল সে নিজে। আর যে-যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সম্প্রতি সে আশ্রয় নিয়েছে অন্ধকার এই নির্জন গুহার মধ্যে।

সহসা কিসের শব্দ শুনে রবার্ট সজাগ হয়ে উঠে বসল। অশ্বখুরধ্বনি ! না মনের ভুল। সর্বদাই মনে হয় রবার্টের শক্ররা বুঝি তাকে চারদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

না, আর সহ্য হয় না। ধৈর্য-সংযম এসবের তো একটা সীমা আছে। দেশের স্বাধীনতার জন্যে বার বার ছ'বার যুদ্ধ করেছে সে ইংরেজদের সঙ্গে। কিন্তু প্রতিবারই দুর্ভাগ্য এসে তার কপালে এঁকে দিয়েছে পরাজয়ের কলঙ্ক রেখা।

না, আর নয়, এবার ইংরেজদের কাছে আত্মসমর্পণ করা ভিন্ন গতি নেই। যার সৈন্য নেই, অর্থ নেই, নেই বাসস্থান আর খাদ্য সে যুদ্ধ করবে প্রবল ইংরেজদের সঙ্গে ?

মনঃস্থির করে উঠে দাঁড়ায় রবার্ট—বহুযুদ্ধের পরাজিত রণক্লান্ত সেনাপতি রবার্ট ব্রুস। ঠিক তখনই একটা জিনিসের দিকে চোখ পড়ল তার। একটা মাকড়সা ক'দিন ধরে মসৃণ পাথরের দেওয়াল বেয়ে বেয়ে উপরে ওঠবার চেষ্টা করছিল জাল বোনবার আশায়। মাকড়সাটা বার বার চেষ্টা করে কিন্তু পাথরের দেওয়ালের মসৃণতার জন্যে কিছুতেই উপরে উঠতে পারে না, তবুও চেষ্টার বিরাম নেই।

আজ ক'দিন ধরে মাকড়সার এই খেলাটা দেখে আসছে রবার্ট। আজ আত্মসমর্পণের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে মাকড়সার চেষ্টা দেখে থমকে দাঁড়াল রবার্ট। ভাবল, দেখি না কী হয়।

সেবার কিন্তু মাকড়সা আর ব্যর্থ হল না ; জাল বুনে ঠিক বিজয়ী বীরের মত নেমে এল। খুব সাধারণ ব্যাপার। কিন্তু রবার্ট ব্রুসের কাছে এই সাধারণ ব্যাপার আর সাধারণ থাকল না। তিনি এর ভেতর থেকে এক অসাধারণ শিক্ষা গ্রহণ করলেন। ফিরে পেলেন মনোবল। ভাবলেন কিছুতেই ইংরেজদের কাছে বশ্যতা স্বীকার করবেন না। আবার সৈন্য সংগ্রহ করে নব উৎসাহে যুদ্ধ করবেন।

সামান্য একটা মাকড়সাও বিশ্ববিখ্যাত বীরকে শিক্ষা দিতে পারে। অবশ্য শিক্ষা গ্রহণের মতো মন থাকা চাই। শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েছিলেন রবার্ট ব্রুস। স্বাধীন হয়েছিল স্কটল্যাণ্ড। ভাগ্যিস মাকড়সার জালবোনার দিকে চোখ পড়েছিল রবার্ট ব্রুসের ; নইলে ঐ মনোবল কি তিনি ফিরে পেতেন।

॥ ৩৭ ॥

[**সংকেত :** কোনো মহাপুরুষের জীবনের কোন ঘটনা অবলম্বনে গল্প লেখ।
অথবা, শীর্ষনাম নির্দেশপূর্বক কোনো মনীষীর জীবনের ঘটনা অবলম্বনে গল্প। তোমার কোট আমার জুতো আনতে গেছে। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

ট্রেনের প্রথম শ্রেণীর কামরা। কামরার গদি আঁটা বেঞ্চে ঘুমিয়ে আছেন এক বাঙালী ভদ্রলোক। চেহারায় পোশাকে-আশাকে একেবারে যাকে বলে খাঁটি বাঙালী, তাই।

স্টেশনের পর স্টেশন পার হয়ে যায় কিন্তু তাঁর ঘুম ভাঙে না। এক সময় সেই কামরায় দ্বিতীয় আর-এক ব্যক্তি উঠলেন। দ্বিতীয় যাত্রীটি হলেন খাঁটি ইংরেজ। বুঝি কোনো উচ্চপদস্থ অফিসার হবেন।

কামরায় উঠেই ইংরেজ ভদ্রলোকটি একবার ভ্রূকুটি করে ঘুমন্ত ব্যক্তির দিকে তাকালেন—মনের ভাবটা যেন এই—কালা আদমি আবার প্রথম শ্রেণীতে কেন ?

যাই হোক, কিছুক্ষণ গোমড়া মুখে বসে থেকে ইংরেজটি এক হাভানা চুরুট ধরিয়ে টানতে লাগলেন। কিন্তু এক সময় চুরুটের ছাই ফেলতে গিয়ে কামরার মেঝের দিকে চোখ পড়ল তাঁর। 'মাই গড, চটি'—প্রথম শ্রেণীর কামরায় এই বিশ্রী জুতো?

তারপর দরজা খুলে পর পর দুটো কিক, জুতো জোড়া সোজা দরজার বাইরে। এতক্ষণ বাদে ভদ্রলোকের মুখে একটা পৈশাচিক জয়ের উল্লাস দেখা গেল। যাক, একটা কাজের মতো কাজ হল। হয়তো মনে মনে ভাবলেন এই ইংরেজ অফিসার। তারপর পরম প্রশান্তিতে মনটা ভরে যেতেই ঘুমে চোখের পাতা ভারি হয়ে এল। বিপরীত বেঞ্চে গিয়ে গায়ের কোট খুলে ঘুমিয়ে পড়লেন।

ব্রিজের ওপর দিয়ে যাবার সময় ট্রেনে গুম্ গুম্ শব্দ হয়। সেই শব্দে বাঙালী ভদ্র-লোকের ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতেই প্রথম চোখ পড়ল ঘুমন্ত ইংরেজ ভদ্রলোকের দিকে। তারপর বেঞ্চের তলায় জুতোর জন্যে পা বাড়ালেন। কিন্তু জুতো কোথাও খুঁজে পেলেন না।

মুহূর্তে বুঝে ফেললেন ব্যাপারটা। অহঙ্কেরে ইংরেজকে শিক্ষা দেবার জন্যে তিনি তাঁর খুলে রাখা কোটটা জানলা গলিয়ে বাইরে ছুঁড়ে দিলেন।

খানিক বাদে ঘুম ভাঙল সেই ইংরেজের। ঘুমভাঙা চোখে কোট খুঁজতে লাগলেন। কোটের পকেটে চুরুট আছে তাঁর। হাভানা চুরুট নইলে গা ম্যাজ ম্যাজ ভাবটা কাটবে না।

কিন্তু কোথায় কোট? অনেক খুঁজে শেষে বাঙালী ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে ইংরেজ বললে—আমার কোটটা কোথায় গেল? সঙ্গে সঙ্গে সেই বাঙালী ভদ্রলোক ব্যাঘ্র বিক্রমে বলে উঠলেন "Your coat has gone to bring my shoe"।

অর্থাৎ তোমার কোট আমার জুতো আনতে গেছে। এমন মানুষ কোনোদিন দেখে নি সেই ইংরেজ অফিসার।

আমরাও কি খুব বেশি দেখেছি? কারণ, বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ তো একজনই ছিলেন।

॥ ৩৮ ॥

[**সংকেত**: বনপথে দুই বন্ধুর ভ্রমণ—আত্মত্যাগের অঙ্গীকার—আকস্মিক ভালুকের আগমন—এক বন্ধুর বৃক্ষে আরোহণ অপর বন্ধু বৃক্ষে অরোহণে অক্ষম।] [ত্রিপুরা, উ. মা. ১৯৮১]

কনিষ্ক আর পরাশর দুই বন্ধু। ছোটোবেলা থেকে দু'জনে এক পাড়ায় মানুষ হয়েছে। এক স্কুলে পড়েছে দু'জনে, খেলাধূলো করেছে একই মাঠে।

দিন যায়, দু'জনে বড়ো হয়। বন্ধুত্ব হয় আরও নিবিড়। কিন্তু, সব দিন মানুষের সমান যায় না। একদিন পরাশরের বাবা বাঁকুড়ায় বদলী হলেন। অগত্যা ছাড়াছাড়ি হল দুই বন্ধুর মধ্যে। পরাশর বাবা-মার সঙ্গে চলে গেল বাঁকুড়ায়। সেখানে ভর্তি হল নতুন স্কুলে। আর কনিষ্ক থাকল কলকাতায় তার পুরানো স্কুলে। বন্ধুর স্মৃতি বুকে নিয়ে তার দিন কাটে।

এই ভাবে পাঁচ বছর পার হল। পাঁচ বছরে দু'বন্ধুর মধ্যে পাঁচশো চিঠি লেখালেখি হল, কিন্তু চোখের দেখা হল না একবারও।

শেষে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে কনিষ্ক ঠিক করল পরাশরের সঙ্গে দেখা করতে যাবে বাঁকুড়ায়। বাবা-মার অনুমতিও পাওয়া গেল। ফলে দু'বন্ধুর মিলন ঘটতে বিলম্ব হল না।

অনেকদিন পরে কনিষ্ককে পেয়ে পরাশর তো আত্মহারা। ক'দিন ধরে দু'জনের কেবল কথা আর কথা। বহুদিনের জমানো কথা শেষ হতেই চায় না।

একদিন কনিষ্ক বলল, চল না পরাশর, তোদের বাঁকুড়ার জঙ্গল দেখে আসি। পরাশর তো সঙ্গে সঙ্গেই রাজি। মা সাবধান করে দিলেন, সন্ধ্যের আগেই ফিরে এসো কিন্তু, এখন মহুয়ার সময় বনে ভালুক বেরুতে পারে।

সন্ধ্যের আগেই ফিরবে কথা দিয়ে দু'বন্ধুতে জঙ্গল দেখতে বের হল।

জঙ্গলের প্রথমটায় তেমন গভীর নয়। শাল-পিয়াল-মহুয়া-তমালের সারি। এখানে ওখানে জারুল-হিজল আর দেওদার বন।

গল্প করতে করতে দু'বন্ধুতে একসময় গভীর বনে ঢুকে পড়ল। ছোটোবেলার কথা উঠলেই ওদের মন ছুটে যায় সেই ফেলে আসা দিনগুলোর দিকে। যখন ওরা দু'বন্ধুতে এক থালায় ভাত খেত, ঘুমতো এক বিছানায়।

পরাশর বলল, বেশ ছিল সেই দিনগুলো, না রে ?

ঠিক বলেছিস। বলল কনিষ্ক।

আমার কিন্তু মনে হয় দিন বদল হলেও আমরা সেই এক জায়গায় আছি।

অর্থাৎ আমাদের বন্ধুত্বে একটুও চিড় ধরে নি, এই তো ?

পরাশর বলল, 'ঠিক তাই'। 'আমি তোর জন্যে প্রাণ দিতে পারি।'

'আমিও,' বলল কনিষ্ক।

সহসা ওটা কী !

কনিষ্ক কিছু বোঝবার আগেই পরাশর গাছের ডাল ধরে অদ্ভুত কায়দায় গাছে উঠে পড়ল। মুখে কেবল বলল, আমাকে অনুসরণ কর কনিষ্ক। তোর সামনে ভালুক।

কিন্তু কনিষ্ক যে গাছে উঠতে পারে না। কোনো দিন ওঠে নি, সে কথা কি পরাশর জানে না ?

ওপর থেকে পরাশরের আর্তনাদ ভেসে আসে, 'দেরি করিস নে কনিষ্ক, মারা পড়বি, গাছে উঠে আয়।'

সহসা কনিষ্কের মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে যায়, সে মরার মতো শুয়ে পড়ে মাটিতে। তারপর নিশ্বাস বন্ধ করে ভালুকের আগমন প্রতীক্ষা করতে থাকে। আর ভাবতে থাকে পরাশরের কথা—খানিক আগেই পরাশর বলেছে 'আমি তোর জন্যে প্রাণ দিতে পারি কনিষ্ক।'

॥ ৩৯ ॥

[**সংকেত ঃ** এক ফুলওয়ালীর জীবন। তার শিশুভ্রাতাকে পালনের সমস্যা। স্থানীয় মহাজনের নিকট ঋণ। মহাজন-কর্তৃক ফুলওয়ালীর বসতবাটীর জমিখণ্ড দাবি। পরিশেষে ফুলওয়ালীর নগরে গমন ও ভিক্ষা।] [উ. মা. ১৯৮১]

বাবা চোখ বোজবার পর থেকেই রজনী ফুল বেচে সংসার চালাত। সংসার বলতে সে নিজে আর ছোটো ভাই গোকুল। যাকে জন্ম দিয়ে মাও এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেছেন।

ছোট্ট সংসার তাও ফুল বেচার পয়সায় যেন চলতে চায় না। ভাগ্য ভালো, মরার আগে রজনীর বাবা সোনারপুরের শীতলার কাছে বিঘেখানেক জমি আর দু'কামরার একটা ছোট্ট মাটির ঘর করে গেছেন। সেই জমিতেই যে ফুল ফোটে তাই নিয়ে রজনী কলকাতায় যায়। পথে পথে ফুল বেচে। বেচে যে পয়সা পায় তাই দিয়ে বাজার থেকে কিনে আনে চাল, ডাল, তেল, নুন, সংসারের টুকিটাকি জিনিস। তার পরেও আছে ভাই গোকুলের সহস্র আবদার। এটা চাই ওটা চাই। এইতো সেদিন ফুল নিয়ে বেরুবার সময় গোকুল বলল, 'আমার জন্যে একটা লাটাই কিনে আনবি দিদি, ঘুড়ি ওড়াব।'

লাটাই ? সে-যে-অনেক দাম রে।

ছাই দাম, এই তো সেদিন আমাদের অমূল্যর বাবা শেয়ালদা থেকে এনেছে, সেটা দুটাকা দাম।

দুটাকা! আচ্ছা আনব।

এই ভাবে ভাইয়ের অজস্র আবদার শুনতে শুনতে রজনী তো জেরবার। কিন্তু আদরে আদরে বাঁদর বানালে তো চলবে না। ভাইটাকে মানুষ করবে রজনী, এই তার জীবনের ব্রত। কঠিন ব্রত।

তাই একে তাকে ধরে ডায়মণ্ড হারবার হাইস্কুলে গোকুলকে ভর্তি করল রজনী। রাখল হোস্টেলে। —তার কেমন করে যেন ধারণা হয়েছিল স্থানীয় স্কুলটা ভালো নয়, তাই সোনারপুরে না রেখে ভাইকে সে রেখে এল ডায়মণ্ড হারবারে।

এর জন্যে স্থানীয় মহাজন ভূতনাথ কুণ্ডুর কাছে কিছু ঋণ হল রজনীর। তা হোক, মৃত্যুশয্যায় বাবাকে সে কথা দিয়েছে, যে করেই হোক, ভাইকে মানুষ করবে।

বছর খানেক ভালই কাটল। রজনী দ্বিগুণ পরিশ্রম করে। সঙ্গে সঙ্গে কৃচ্ছ্র-সাধনের মাত্রাও থাকে বাড়তে। একদিন ভূতনাথবাবু এলেন রজনীর বাড়ি। রজনী তখন ফুলগাছে জল দিচ্ছে। মহাজনকে দেখে রজনী কী করবে, কোথায় বসাবে বুঝতে পারে না।

ভূতনাথবাবু অমায়িক হেসে বললেন, 'আরে আমার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছ কেন রজনী। আমি তো তোমাদের পর নই।'

এরপর আসল কথা পাড়লেন কুণ্ডুমশাই, 'তা অনেক দিন তো হল রজনী, আসলটা না হয় রইল, সুদের কিছুটাতো দেবে।'

'আর কদিন সবুর করুন বাবু—সামনের মাসেই—'

এই সামনের মাস সামনের মাস করে করে তো দু'বছর পার করলে।

কী করব বাবু ভাইটাকে—

ভাই ভাই করেই তুমি গেলে রজনী। আরে বাবা, নিজে বাঁচলে তবেই ভাই।

তার পর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খেয়ে মাথা চুলকে কুণ্ডু মশাই বলেন, বলছিলুম কি রজনী, আমার কার্তিক-গণেশের মা তো আজ দু'বছর গত হয়েছেন, তা আমাকে যদি বিয়ে কর তাহলে তোমার ঋণটিন সব মকুব করে দেব আর ভাইটিও তোমার—

আপনি এখন আসুন কুণ্ডুমশাই, আপনার এ প্রস্তাব শোনা পাপ।

পাপ, আচ্ছা তাহলে সুদের টাকাটা পাচ্ছি কবে তারিখটা শোনাও।

সামনের মাসেই পাবেন।

না পেলে?

না পেলে যা করতে হয় করবেন।

কথাটা যেন মনে থাকে রজনী।

না, রজনী সুদ কিম্বা আসল কোনোটাই শোধ করতে পারে নি। এক মাস নয়, পর পর আরও মাস ছয়েক পার হল।

শেষে এল উকিলের চিঠি। কোর্ট-কাচারী-আদালত সে যেন এক দুঃস্বপ্ন। শেষের সেদিনেও কুণ্ডুমশাই বলেছেন, 'এখনও বলছি একবার ভেবে দেখ রজনী। আমি বুড়ো হয়েছি কিন্তু অনেক টাকা, মরলে তুমিই সব পাবে।'

না-না, রজনীর মুখে সেই এক কথা।

তবে মর।

রজনীর বাস্তভিটা ফলের জমি সবই নিলামে বিক্রি হল। পথে নামল রজনী। মনে তার এক চিন্তা, ভাইকে মানুষ করবে সে কেমন করে। ভাবতে ভাবতে সহসা মুখ চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্ধকারেও যেন সে পথনির্দেশ পেল।

শেয়ালদা স্টেশনের কাছে যে কলেজটা সে দেখেছে এতদিন ফুল বেচতে যাবার পথে সেই কলেজের সামনে কাপড় পেতে বসল রজনী। এক টুকরো কাগজে লিখল নিজের দুর্ভাগ্যের কাহিনী।

না, চিরকাল ভিক্ষে করবে না রজনী, কেবল ফুলকেনার মূলধন চাই তার। যে টাকায় আবার সে ফুল কিনবে আর পথে পথে সে ফুল বেচবে—ফুল চাই, ফুল, বেলফুল।

॥ ৪০ ॥

[**সংকেত :** পিপাসার্ত মাহুত—নারিকেল হস্তীর মাথায় ভাঙ্গিয়া উহার জল পান করিল—তারপর একদিন হস্তী কর্তৃক মাহুতের অনুকরণ—মাহুতের মৃত্যু—উপসংহার।]

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

হাতির নাম বনমায়া। রাজাবাবুর প্রাণ এই বনমায়া। জমিদারি গেছে, গেছে

প্রাচীন বৈভব, কিন্তু সেই সব পুরনো দিনগুলি যেন বনমায়ার মধ্যে মিশে আছে। তাই বনমায়ার দিকে তাকালে রাজাবাবু তাঁর অতীতটাকে দেখতে পান।

বনমায়ার সেবাযত্নের ত্রুটি সহ্য হয় না রাজাবাবুর। নিজের সময় মতো স্নান না হলেও চলে, ভোজনং যত্র তত্র কিন্তু বনমায়ার জন্যে এই দুর্মূল্যের বাজারেও একজন মাহুত রেখেছেন রাজাবাবু।

একদিন রাজাবাবুর মাহুত জীবনলাল বনমায়াকে নদীতে স্নান করাতে নিয়ে চলেছে। এমন সময় রাজাবাবু জীবনকে ডেকে বললেন, 'জীবন, ফেরার পথে গঞ্জ থেকে গোটা আষ্টেক ভালো নারকেল এনো তো।'

আচ্ছা বাবু—আনব।

ধীরে ধীরে চোখের আড়াল হল জীবন। রাজাবাবুর বাড়ি থেকে শীলাবতী আধঘণ্টার পথ। বনমায়া এই পথটা প্রায় দশমিনিটে পার হল। তার পরেই শীলাবতীর শীতল জল। জল ছাড়া বনমায়া যেন কিছুই চায় না। সাঁতার কেটে, জলের ফোয়ারা সৃষ্টি করে বনমায়া মেতে গেল কিছুক্ষণ।

সময় যায়, জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। তাকে আবার গঞ্জে যেতে হবে নারকেল আনতে। বনমায়াকে জল থেকে ওঠবার জন্যে তাড়া দেয় জীবন। বনমায়া তার সঙ্গে রসিকতা করে গায়ে জল ছিটিয়ে দেয়। অবশেষে পেটন দিয়ে তবে বনমায়াকে জল থেকে তোলা গেল।

সেখান থেকে গঞ্জ। নারকেল কেনা কি সহজ ব্যাপার? এ দোকান ও দোকান ঘুরে ঘুরে জীবন তো ক্লান্ত। তার ওপরে বনমায়াকে দেখে একদল ছেলেমেয়ে ছড়া কেটে বিরক্ত করতে লাগল—

'ও হাতি তোর গোদা পায়ের নাতি'—

শেষে জীবন একটা দোকানে গিয়ে সস্তায় পেয়ে গেল নারকেল কটা—সঙ্গে একটা ফাউ।

নারকেল কিনে ফিরতে দেরি হয়ে গেল জীবনের। চৈত্র-বৈশাখ মাসের রোদের তাপ সহ্য করা যাচ্ছে না। সেই সঙ্গে অসহ্য তৃষ্ণায় জীবনের কণ্ঠ-তালু শুকিয়ে আসছে।

সহসা ফাউ নারকেলটার কথা মনে পড়ল তার। কিন্তু ঝুনো সে নারকেল ভাঙবে কেমন করে? তখনই নজর পড়ল বনমায়ার বিশাল পাথরের মতো মাথাটার দিকে। জীবন একটা নারকেল বের করে বনমায়ার মাথায় ঠুকে ঠুকে ভাঙল; জল খেল, শাঁস খেল, তারপর মনে মনে বলল—'ওরা তো হাতি, ওদের এটুকুতে লাগে না'।

এ ঘটনার পর প্রায় ন-দশ মাস পার হয়ে গেছে।—সেদিনও বনমায়াকে নিয়ে জীবন চলেছে শীলাবতীর ঘাটে স্নান করাতে। সহসা রাজাবাবু তাকে ডেকে বললেন—সরকারের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাও জীবন, গোটা বিশেক নারকেল আনতে হবে। পিঠে হবে।

তারপর সেই পুরনো ছবি। বনমায়ার স্নানপর্ব, ছোটো ছেলেমেয়ের ছড়াকাটা, আর নারকেল কেনা। আজ একটা নারকেলও ফাউ মেলে নি। তাই জীবনের মনটা বেজায় খারাপ। গঞ্জ ছাড়িয়ে কিছু দূর আসতেই বনমায়া সহসা তার পিঠের ঝোলা থেকে একটা নারকেল বের করে নিল, তারপর ঠিক জীবনের অনুকরণেই তার মাথায় ঠুকে ভাঙল সেই নারকেল।

ঝুনো নারকেলের বাড়ি খেয়ে জীবন মাটিতে পড়ে গেল। আর উঠল না। ন-দশ মাস আগে যে জায়গায় জীবন বনমায়ার মাথায় নারকেল ভেঙে জল খেয়েছিল সেখানকার মাটিতেই জীবন পড়ে থাকল। আর উঠল না।

॥ ৪১ ॥

[**সংকেত :** দুঃখী বৃদ্ধ বনে কাঠ কাটিতে যায়—রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া সে মাটিতে বোঝা রাখে—যমকে ডাকিতে থাকে—যম উপস্থিত হয়—বৃদ্ধ বুদ্ধি স্থির করে—যমকে তাহার বোঝাটি মাথায় তুলিয়া দিতে বলে।]

বুড়ো ভরত দাসের সংসারে কেউ নেই। একটা নাতি ছিল। কিন্তু গেল সনের বন্যায় সে নাতিটাও কোথায় ভেসে গেছে কে জানে। কিন্তু লোকে বলে—'বুড়ো, তোর নাতি আছে। আমি নিজের চোখে দেখেছি ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করছে—দেখিস ঠিক একদিন আসবে।'

লোকে যাই বলুক না কেন বুড়ো ভরত দাস জানে তার নাতি বেঁচে নেই। যেমন নেই বউ, ছেলে, ছেলের-বউ, মেয়েরা সব।

সংসারে কেউ না থাকলেও একটা জিনিস কিন্তু নির্ঘাত আছে, সেটা হল পেটের খিদে। বুড়োকে সেই খিদের জ্বালায় বনে বনে ঘুরতে হয় কাঠের সন্ধানে, সকাল থেকে সন্ধ্যে। সারাদিন কাঠ কেটে সেই কাঠ বেচে তবে ভরত-বুড়ো নুন-তেল কিনে ঘরে আসে। তারপর রান্না।

এত কষ্ট ভরতের তবু সে ভিক্ষে করতে চায় না। বলে—"ভগবান মানুষকে হাত পা দিয়েছে, বুদ্ধি দিয়েছে, পরের দোরে হাত পাতবার জন্যে নয়।"

সেদিন ছিল বৈশাখের এক আগুনঝরা দিন। ভরত বুড়ো সকালে ঘুম থেকে উঠেই তার ভোঁতা কুড়ুল হাতে বেরিয়ে পড়ল কাঠের সন্ধানে। বয়েস হয়েছে চার কুড়ি, তার ওপর গেছে চোখের দৃষ্টি। তাই আজকাল গভীর জঙ্গলে ঢুকতে পারে না সে। সেখানে অনেক কাঁটা, অনেক ভয়। ভয় সাপ থেকে বাঘ ভালুকের। তাই বনের বাইরে ঘুরে ঘুরেই ভরত ছোট ছোট গাছ কাটে, সেই গাছের গুঁড়ি বয়ে নিয়ে গিয়ে চেরাই করে, তারপর বিক্রি।

সেদিন রোদে পাথুরে মাটি তেতে উঠেছে। সেই আগুনে মাটির ওপর ঘুরতে ঘুরতে বুড়োর পায়ের তলায় ফোস্কা।

অনেক খুঁজে একটা ভাল গাছের সন্ধান পেল ভরত কিন্তু গাছটা এত বড়ো যে

একা একা সেটা কাটা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু সেই অসাধ্য সাধন করার ব্রত নিয়ে যারা পৃথিবীতে আসে তাদের তো দমলে চলবে না।

ভরত সে কথা জানে, তাই মরীয়া হয়ে গাছ কাটার কাজে মন দেয়। তারপর অনেক বেলায় গাছ কেটে কাঠের গুঁড়িগুলো মাথায় নিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়ায়। সব কাঠ একবারে আনতে পারে না ভরত, একটু একটু করে খেপে খেপে ঘরে আনবে। তারপর কেটেকুটে বিক্রির চেষ্টা।

কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে চলেছে ভরত। সারা দিন পেটে তার ভাত নেই, তার ওপর অগ্নিবর্ষী রোদের তাপ। বুড়োর আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না। জীবনে এই প্রথম সে নিজের মৃত্যু কামনা করে মনে মনে যমকে ডাকে, বলে— 'যমরাজ, তুমি আমার সকলকেই নিলে, কেবল আমাকেই ভুলে গেলে? একবার এসো'।

বুড়োর আকুল আহ্বান শুনে যমরাজ আর স্থির থাকতে পারলেন না। ছুটে এলেন বুড়োর কাছে। বুড়ো তখন কাঠের বোঝাটা মাটিতে নামিয়ে গাছের ছায়ায় বসে বিশ্রাম করছে।

যমরাজ এসে বললেন, 'বুড়ো, আমি তোমার ডাক শুনে এসেছি। বল কী চাও'।

বুড়ো বলল, 'তুমি কে বাপ'।

যমরাজ বললেন, 'আমি যম, তুমি কাতর হয়ে ডাকছিলে কিনা তাই ছুটে এসেছি, বল কি করব।'

বুড়ো অনেক ভেবে নিয়ে বলল, 'যদি দয়া করে এসেছো, তখন আমার মাথায় এই কাঠের বোঝাটাই তুলে দাও বাপ। একা একা বোঝা তুলতে বড় কষ্ট হয়। বোঝা তোলার সাহায্য করবার জন্যে কাউকেই তো রাখলে না, কী করি বল, এখন তুমিই ভরসা।'

॥ ৪২ ॥

[**সংকেত :** একটি জ্বলন্ত গৃহ থেকে একজন এক শিশুকে রক্ষা করে। কিন্তু সে নিজে আহত হয়। তার সাহস ও ত্যাগের বিষয়টি অবলম্বন করে গল্প লেখ।]

অথবা,

[**সংকেত :** বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড—জ্বলন্ত বাড়ি হইতে এক সাহসী যুবা-কর্তৃক শিশু উদ্ধার।]

অথবা,

[**সংকেত :** কোন সমাজসমস্যামূলক একটি গল্প লেখ।]

উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করে আর পড়া হল না রতনের। ইচ্ছে থাকলেই যে উপায় হয় কথাটা যে কত বড় মিথ্যে রতন তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। মনে মনে বলে old proverbs made new-এর মত বাংলা প্রবাদগুলিকেও নতুন করে লেখা দরকার।

কারণ এত চেষ্টা করেও উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই সে করতে পারে নি। তা ছাড়া, একটা চাকরিও কি পেয়েছে? চাকরি পেলেও না হয় নৈশ কলেজে ভর্তি হয়ে বি. কম.-টা পড়তে পারত।

অভাবের সংসার। বাবা বছর দুই হল চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। একমাত্র রতনের দাদা সনাতনের চাকরিটাই যা ভরসা। ওর মেজদাও চাকরী করত কিন্তু আজ প্রায় বছর খানেক হল সে বিছানায় পড়ে আছে।

রতন ভাবে, চায়ের দোকানে বসে, খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ভাবে, অনেক রাত্রে বাড়িতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে ভাবে ছাদে গিয়ে একা একা, কী করবে সে। কিন্তু কোথাও আশার আলো দেখতে পায় না। অথচ বাড়িতে কেউ ওকে বিশ্বাস করে না।

একদিন অফিস যাবার সময় ওর দাদা সনাতন তো বলেই ফেলল, তোমাকে বসিয়ে খাওয়াতে পারব না, চাকরির চেষ্টা কর। তাও না হয় সত্য হল, কিন্তু মেজদার অপারেশন! ডাক্তার বলেছেন একটা অপারেশন করলেই মেজদা নাকি ভাল হয়ে যাবে, কিন্তু টাকা! একশো নয় দুশো নয়, পাঁচশো টাকা চাই।

সকাল থেকে মা তাই কাঁদছেন। বাবা গম্ভীর—বড়দার অফিস থেকে ধার মেলে নি। অথচ অপারেশনের টাকা দু-একদিনের মধ্যেই যোগাড় করতে হবে।

রতন শুনল মা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছেন, 'ওটারও যদি একটা কিছু হত ভগবান, তুমি তো আর মুখ তুলে চাইবে না।' অর্থাৎ রতনের চাকরির কথাই হচ্ছে।

উত্তরে বাবার কথা শুনতে পেল রতন। কার কথা বলছ—রতন। ওকি, চাকরি খোঁজে বলে মনে কর, আড্ডা স্রেফ আড্ডা, নইলে এত ছেলে চাকরি পায় আর—এসব কথা শুনে কষ্ট পায় রতন। কারণ সে তো চেষ্টার ত্রুটি করে নি। রামের বোনের নাম জানলেও চাকরি হবে না, চাঁদের ওজন জানলেও চাকরি হবে না। হবে কী করে? কাজ একটা, প্রার্থী এক লাখ! তার পর আছে ছাঁটাই, লক আউট, লে অফ—নানান পরিভাষার অভিধান।

আজ আর ঘরে বসে থাকতে পারে না রতন। বেরিয়ে পড়ল। চুলটা আঁচড়াতেও ভুলে গেল আজ। চাকরি চাই, কাজ চাই, যে কোন একটা কাজ, সং-পথে সং ভাবে। নইলে মেজদার অপারেশন হবে না, মেজদা বাঁচবে না, মেজদা না বাঁচলে সংসার বাঁচবে না, কারণ মেজদার ফ্যাক্টরীর চাকরিটা এখনও আছে। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে চায়ের দোকানের দিকেই যাচ্ছিল রতন, হঠাৎ সকলকে একটা বিশেষ দিকে দৌড়তে দেখে সে প্রশ্ন করে কী হয়েছে?

আগুন লেগেছে?

কোথায়?

ওই মোড়ের একটা বাড়িতে। নিচেই প্লাসটিকের কারখানা সেখান থেকে বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কথাটা শুনে চায়ের দোকানে না ঢুকে রতনও সে দিকে ছুটল।

রতন ছুটে গিয়ে দেখল প্লাসটিকের কারখানা সমেত গোটা বাড়িটাই জ্বলছে। সারা বাড়ি ঘিরে আগুনের মৃত্যুবলয়। সবকিছু ছাপিয়ে খাঁচায় পোষা একটা টিয়া পাখির তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাক শোনা যাচ্ছে। দমকল তখনও পৌঁছতে পারে নি।

আগুন দেখে ও বাড়ির গিন্নীমা ঠাকুরঘরে ঢুকেছিল নাড়ুগোপালকে বের করতে। বের হতে পারে নি। রতন সর্বাঙ্গে একটা ভিজে চাদর জড়িয়ে নিয়ে ভদ্রমহিলাকে বের করে আনল। আগুনের বাইরে আসতেই ভদ্রমহিলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল—আমার ছোট নাতিটা বোধ হয় বেরুতে পারে নি।

তার কথা শেষ হতে না হতেই তিনতলার একটা ঘর থেকে বালকের কণ্ঠ শোনা গেল, 'বাঁচাও, আগুন'।

রতন ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করতেই সকলে ওকে চেপে ধরল। কে যেন বলল, দেখছ না, তেতলার কাঠের সিঁড়িখানাও ধরে গেছে।

সারা বাড়ি লেহন করে অগ্নিদেবের শত শত লকলকে জিব বেরিয়ে এসেছে। আবার শোনা গেল বালকের সেই বুকফাটা আর্তনাদ।

হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল রতন। সকলে অবাক হয়ে দেখল জলের পাইপ বেয়ে রতন বলে সেই বেকার ছেলেটা তিনতলায় উঠে যাচ্ছে। কোলাহল মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। বিমূঢ় জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রতনের আলোকদীপ্ত মূর্তির দিকে কেবল তাকিয়ে থাকল।

দুহাতে তেতে ওঠা জলের পাইপ ধরে রতন বহু সাধা-সাধনায় তিনতলায় উঠে গেল, তারপর ছেলেটাকে পিঠে করে কাঠবিড়ালীর মত আবার পাইপ বেয়েই নিচে নেমে এল।

মা-মরা নাতির জন্যে বৃদ্ধা দুচোখ বন্ধ করে রুদ্ধনিঃশ্বাসে ঠাকুরের নাম জপ করছেন—এমন সময় রতন ছেলেটাকে এনে বৃদ্ধার কোলে ফেলে দিয়ে বলল—'এই নিন, ধরুন আপনার নাতি।'

'কেবল একটি নয়, তুমিও, আজ থেকে আমার দুটি নাতি'। বৃদ্ধা বলে ওঠে। ঠিক এই মুহূর্তে যদি কেউ রতনকে প্রশ্ন করত—কী পুরস্কার চাও রতন? রতন নির্ঘাৎ বলত, 'একটা চাকরি চাই—আর কিছু নয়'।

॥ ৪৩ ॥

[**সংকেত :** ছেলে বিদেশে গিয়াছে। দেশে ফিরবে—সকলের আনন্দ। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনায় ছেলের মৃত্যু—শোকে মূহ্যমান সকলে।] [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

আজ পরাশর বিশ্বাসের বাইরের ঘরে রীতিমত চায়ের আসর জমে উঠেছে। বিশ্বাস মশাই আমুদে লোক, এমন আড্ডা তাদের বাড়িতে প্রত্যেক ছুটির দিনে হামেশাই বসে থাকে। কিন্তু আজকের আসরের রূপটা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ আলাদা।

পরাশরের ছোট ছেলে তিলক আজ দেশে ফিরবে। আজকের চায়ের আসর বসেছে সেই আনন্দঘন মুহূর্তকে উপলক্ষ করে।

কারণ এত চেষ্টা করেও উচ্চশিক্ষার কোন ব্যবস্থাই সে করতে পারে নি। তা ছাড়া, একটা চাকরিও কি পেয়েছে? চাকরি পেলেও না হয় নৈশ কলেজে ভর্তি হয়ে বি. কম.-টা পড়তে পারত।

অভাবের সংসার! বাবা বছর দুই হল চাকরি থেকে অবসর নিয়েছেন। একমাত্র রতনের দাদা সনাতনের চাকরিটাই যা ভরসা। ওর মেজদাও চাকরী করত কিন্তু আজ প্রায় বছর খানেক হল সে বিছানায় পড়ে আছে।

রতন ভাবে, চায়ের দোকানে বসে, খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ভাবে, অনেক রাত্রে বাড়িতে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে ভাবে ছাদে গিয়ে একা একা, কী করবে সে। কিন্তু কোথাও আশার আলো দেখতে পায় না। অথচ বাড়িতে কেউ ওকে বিশ্বাস করে না।

একদিন অফিস যাবার সময় ওর দাদা সনাতন তো বলেই ফেলল, তোমাকে বসিয়ে খাওয়াতে পারব না, চাকরির চেষ্টা কর। তাও না হয় সত্য হল, কিন্তু মেজদার অপারেশন! ডাক্তার বলেছেন একটা অপারেশন করলেই মেজদা নাকি ভাল হয়ে যাবে, কিন্তু টাকা! একশো নয় দুশো নয়, পাঁচশো টাকা চাই।

সকাল থেকে মা তাই কাঁদছেন। বাবা গম্ভীর—বড়দার অফিস থেকে ধার মেলে নি। অথচ অপারেশনের টাকা দু-একদিনের মধ্যেই যোগাড় করতে হবে।

রতন শুনল মা বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছেন, 'ওটারও যদি একটা কিছু হত ভগবান, তুমি তো আর মুখ তুলে চাইবে না।' অর্থাৎ রতনের চাকরির কথাই হচ্ছে।

উত্তরে বাবার কথা শুনতে পেল রতন। কার কথা বলছ—রতন। ওকি, চাকরি খোঁজে বলে মনে কর, আড্ডা স্রেফ আড্ডা, নইলে এত ছেলে চাকরি পায় আর—এসব কথা শুনে কষ্ট পায় রতন। কারণ সে তো চেষ্টার ত্রুটি করে নি। রামের বোনের নাম জানলেও চাকরি হবে না, চাঁদের ওজন জানলেও চাকরি হবে না। হবে কী করে? কাজ একটা, প্রার্থী এক লাখ! তার পর আছে ছাঁটাই, লক আউট, লে অফ—নানান পরিভাষার অভিধান।

আজ আর ঘরে বসে থাকতে পারে না রতন। বেরিয়ে পড়ল। চুলটা আঁচড়াতেও ভুলে গেল আজ। চাকরি চাই, কাজ চাই, যে কোন একটা কাজ, সৎ-পথে সৎ ভাবে। নইলে মেজদার অপারেশন হবে না, মেজদা বাঁচবে না, মেজদা না বাঁচলে সংসার বাঁচবে না, কারণ মেজদার ফ্যাক্টরীর চাকরিটা এখনও আছে। সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে চায়ের দোকানের দিকেই যাচ্ছিল রতন, হঠাৎ সকলকে একটা বিশেষ দিকে দৌড়তে দেখে সে প্রশ্ন করে কী হয়েছে?

আগুন লেগেছে?

কোথায়?

ওই মোড়ের একটা বাড়িতে। নিচেই প্লাসটিকের কারখানা সেখান থেকে বাড়িতে আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। কথাটা শুনে চায়ের দোকানে না ঢুকে রতনও সে দিকে ছুটল।

রতন ছুটে গিয়ে দেখল প্লাসটিকের কারখানা সমেত গোটা বাড়িটাই জ্বলছে। সারা বাড়ি ঘিরে আগুনের মৃত্যুবলয়। সবকিছু ছাপিয়ে খাঁচায় পোষা একটা টিয়া পাখির তীক্ষ্ণ কণ্ঠের ডাক শোনা যাচ্ছে। দমকল তখনও পৌঁছতে পারে নি।

আগুন দেখে ও বাড়ির গিন্নীমা ঠাকুরঘরে ঢুকেছিল নাড়ুগোপালকে বের করতে। বের হতে পারে নি। রতন সর্বাঙ্গে একটা ভিজে চাদর জড়িয়ে নিয়ে ভদ্রমহিলাকে বের করে আনল। আগুনের বাইরে আসতেই ভদ্রমহিলার তীক্ষ্ণ কণ্ঠ শোনা গেল—আমার ছোট নাতিটা বোধ হয় বেরুতে পারে নি।

তার কথা শেষ হতে না হতেই তিনতলার একটা ঘর থেকে বালকের কণ্ঠ শোনা গেল, 'বাঁচাও, আগুন'।

রতন ভেতরে ঢোকবার চেষ্টা করতেই সকলে ওকে চেপে ধরল। কে যেন বলল, দেখছ না, তেতলার কাঠের সিঁড়িখানাও ধরে গেছে।

সারা বাড়ি লেহন করে অগ্নিদেবের শত শত লকলকে জিব বেরিয়ে এসেছে। আবার শোনা গেল বালকের সেই বুকফাটা আর্তনাদ।

হঠাৎ একটা কাণ্ড করে বসল রতন। সকলে অবাক হয়ে দেখল জলের পাইপ বেয়ে রতন বলে সেই বেকার ছেলেটা তিনতলায় উঠে যাচ্ছে। কোলাহল মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল। বিমূঢ় জনতা রুদ্ধ নিঃশ্বাসে রতনের আলোকদীপ্ত মূর্তির দিকে কেবল তাকিয়ে থাকল।

দুহাতে তেতে ওঠা জলের পাইপ ধরে রতন বহু সাধ্য-সাধনায় তিনতলায় উঠে গেল, তারপর ছেলেটাকে পিঠে করে কাঠবিড়ালীর মত আবার পাইপ বেয়েই নিচে নেমে এল।

মা-মরা নাতির জন্যে বৃদ্ধা দুচোখ বন্ধ করে রুদ্ধনিঃশ্বাসে ঠাকুরের নাম জপ করছেন—এমন সময় রতন ছেলেটাকে এনে বৃদ্ধার কোলে ফেলে দিয়ে বলল—'এই নিন, ধরুন আপনার নাতি।'

'কেবল একটি নয়, তুমিও, আজ থেকে আমার দুটি নাতি'। বৃদ্ধা বলে ওঠে। ঠিক এই মুহূর্তে যদি কেউ রতনকে প্রশ্ন করত—কী পুরস্কার চাও রতন? রতন নির্ঘাৎ বলত, 'একটা চাকরি চাই—আর কিছু নয়'।

॥ ৪৩ ॥

[**সংকেত :** ছেলে বিদেশে গিয়াছে। দেশে ফিরবে—সকলের আনন্দ। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনায় ছেলের মৃত্যু—শোকে মুহ্যমান সকলে।] [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

আজ পরাশর বিশ্বাসের বাইরের ঘরে রীতিমত চায়ের আসর জমে উঠেছে। বিশ্বাস মশাই আমুদে লোক, এমন আড্ডা তাদের বাড়িতে প্রত্যেক ছুটির দিনে হামেশাই বসে থাকে। কিন্তু আজকের আসরের রূপটা তার চেয়ে কিঞ্চিৎ আলাদা।

পরাশরের ছোট ছেলে তিলক আজ দেশে ফিরবে। আজকের চায়ের আসর বসেছে সেই আনন্দঘন মুহূর্তকে উপলক্ষ করে।

তাকে আনতে এয়ারপোর্টে গেছে তিলকের বড় ভাই, তার স্ত্রী, আর দুই ছেলে। পরাশর নিজের ড্রইংরুমে বসে থাকলেও মনটা তার ছুটে গেছে এয়ারপোর্টের উদ্দেশ্যে। মা-মরা ছেলে, কতদিন পরে দেশে আসছে, বাপের মন তো আকুপাকু করবেই।

চায়ের আসরে তিলকের বন্ধুরা তো আছেই সেই সঙ্গে আছে পরাশরবাবুর বন্ধু, আত্মীয়ের দল, যাকে বলে হৈ-হৈ রৈ-রৈ ব্যাপার।

পরাশরবাবুর বন্ধু ঘনশ্যামবাবুর প্রশ্ন—তিলক যেন কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হয়েছে বললে?

পাপুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের।

সেটা কোথায়?

নিউগিনিতে।

বাঃ বেশ। এবার দেশে এলে ছেলের একটা বিয়ে দাও পরাশর।

দেব দেব, তোমরা সবাই একটা ভাল পাত্রীর খোঁজ কর। আজ ওর মা নেই, তিনি থাকলে কি খুশিই না হতেন। বলতে বলতে পরাশরবাবুর চোখে জল এল।

কিন্তু পুলকের ফিরতে এত দেরি হচ্ছে কেন। বার বার ঘড়ি দেখছেন পরাশর-বাবু। বন্ধুরা বোঝায় আজকাল কি সময় বলে কোন কথা আছে? এই তো গতকাল সাতটা তিনের ট্রেন এল দশটায়।

গল্প হচ্ছে এমন সময় ঘরের টেলিফোন বেজে উঠল। পরাশরবাবু রিসিভার তুলে নিলেন। ওদিক থেকে পুলকের কণ্ঠ ভেসে আসে। কিন্তু কী বলছে পুলক? তার কথার এক বর্ণও বুঝতে পারেন না পরাশরবাবু।

কেবল রিসিভার-ধরা হাতটা কাঁপছে থর থর করে। পড়েই যেতেন মাটিতে, বন্ধুরা অবস্থা বুঝে ধরে ফেললেন।

সকলের মুখেই তখন এক প্রশ্ন কী হয়েছে? কোন দুঃসংবাদ?

জ্ঞান হারাবার আগে শেষ কথা উচ্চারণ করলেন পরাশরবাবু, তিলক নেই—বিমান দুর্ঘটনায়—

যদিও অসমাপ্ত কথা কিন্তু এর অর্থ বুঝতে কারোই অসুবিধে হল না।

দুটি ছোট গল্পের উদাহরণ

[**সংকেত :** হারাণের স্ত্রী পুষ্প গ্রামের মেয়ে, নতুন শহরে এসেছে। হারাণের মুখে অফিসের গল্প শুনে শুনে পুষ্প তাকে উচ্চ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। কিন্তু এক দিন স্বামীর অফিসের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে হারাণের ঘন ঘন সেলাম ঠোকা দেখে পুষ্প বুঝতে পারে তার স্বামী অফিসে সকলের চেয়ে মর্যাদায় ছোট। ফলে প্রদর্শনী দেখার আনন্দ নষ্ট হয়ে যায়, পুষ্প স্বামীকে বার বার ঘরে ফেরার তাড়া দিতে থাকে। এই সময় আকস্মিক এক অঘটন ঘটে যায় আর সেই মুহূর্তে অফিসের সর্বকনিষ্ঠ কর্মচারী হারাণ জনতার চোখে হয়ে ওঠে শ্রদ্ধাভাজন। স্বামীর লুপ্ত মর্যাদা পুনরুদ্ধারে স্ত্রীর চোখে আবার প্রদর্শনী হয় চিত্তাকর্ষক।]

মর্যাদা

পুষ্প হারাণের দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বলল, এবার জুতোটা খুলে ফেলি, কি বল?

না।

চাপা গলায় হারাণ ধমক দেয়।

দেখ না, সব মেয়েরা কেমন জুতো পায়ে হেঁটে বেড়াচ্ছে।

সেই বেলেঘাটার বাসা থেকে বেরিয়ে কখনও হেঁটে, কখনও বাসে করে এতদূর আসতে নতুন জুতোর দাক্ষিণ্যে পুষ্পর পায়ে গোটা চারেক ফোস্কা পড়েছে! কিন্তু হারাণের কড়া হুকুমে বেচারা কিছুতেই জুতোটা খুলতে পারছে না।

—এই যে হারাণ এগজিবিশন দেখতে নাকি?

বিল সেকসনের কমলবাবু।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

দুহাত এক করে নমস্কারের ভঙ্গিতে হারাণ উত্তর দেয়।

—সঙ্গে কে, স্ত্রী?

আজ্ঞে।

লজ্জায় মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করে পুষ্পর। বউকে একা পেয়ে ধমকে ওঠে হারাণ। অমন করে এক হাতে ঘোমটা টানতে গেলি কেন? গেঁয়ো ভূত কোথাকার।

—বা রে……

হারাণ বলে, অমন করে ঘোমটা টানবি না বুঝলি? চল পান খাবি?

পানের খিলিটা মুখে দিতেই হারাণের ছেলে পিটকী নাকি সুরে আর্জি পেশ করে, আমি নেচুন খাব। পানকে সে লজেন্স ভেবেছে। পুষ্প হাঁ করে মুখের পান দেখিয়ে বলে নেচুন নয় রে পান, পান। কে শোনে কার কথা। পিটকীর গলা সপ্তমে চড়তে থাকে, আমি নেচুন খাব রে।

হারাণ রেগে বলে, এক আছাড় দেব। চুপ কর, চুপ কর বলছি। কোন ফল হল না তাতে। শেষে বিরক্ত হয়েই হারাণ দোকানদারকে বলে, দাও তো ভাই ঐ লেবেনচুষ একটা।

হাঁটতে হাঁটতে এক সময় পুষ্প হারাণকে বলে, হ্যাঁ গো, এই তোমাদের মেলা আমি ভাবি কী না কী। সারকেস নেই, নাগরদোলা নেই এ কেমন ধারা মেলা গো? আমাদের ওখানে লঙ্কাগড়ের মাঠে ··

আস্তে আস্তে, অত চেঁচাচ্ছিস কেন? চাপা গলায় হারাণ বৌকে সাবধান করে দেয়।

বলে, এর নাম কিশি মেলা, একি তোর গেঁয়ো মেলা পেয়েছিস যে সারকেস পাটি বসবে?

পুষ্পকে কলকাতায় এনে বাসা করার পর থেকে হারাণ বলে এসেছে, নিয়ে যাব আমাদের কিশি মেলায়, দেখবি। কিশি মেলা দেখেছিস কখনও?

পুষ্প বলে হ্যাঁগো, এ যে দেখছি কেবল কুমড়ো, বেগুন, আলু, পটল। ঘটা করে এত সব আনাজপাতি দেখাবার মানেটা কি?

মানে যে কি, সে কথা হারাণও জানত না ঠিক মত। কিন্তু স্ত্রীর কাছে জানি না কথাটা তার মুখে সহজে আসতে চায় না! তাই বলল, কিশি মেলায় এসব আনাজপাতি সাজাতে হয়, নিয়ম!

—হারাণ যে, সঙ্গে কে, বউ নাকি?

সমর্থনের ভঙ্গিতে মাথা নাড়ে হারাণ। টাইপিস্ট সুলেখা দেবীর কণ্ঠ। পুষ্প বড় বড় চোখে সুলেখা দেবীর দিকে তাকিয়ে থাকে।

বাঃ, ছেলেটি তো বেশ ফুটফুটে। কি নাম তোমার খোকা? সারা মুখে চোখে লজেন্সমাখা পিটকী কোন জবাব দেয় না, সেও তার মায়ের মতো বড়ো বড়ো চোখে কেবল তাকিয়ে থাকে।

সুলেখা দেবী চলে গেলে পুষ্প হারাণকে জিগ্যেস করে, হ্যঁা গা, তোমাদের এখানে মেয়েরাও কাজ করে?

সংক্ষিপ্ত জবাব দেয় হারাণ, হ্যাঁ।

হ্যাঁ গা, কি খেয়ে অমন ঠোঁট রাঙা করেছে বল তো, পান তো খায় নি? পরম বিজ্ঞের মত হারাণ উত্তর দেয়, কিছু খেয়ে নয়, ওরা ঠোঁটে আলতা মাখে।

আলতা! আলতা তো পায়ে পরে।

হারাণ ধমক দেয়, আঃ আস্তে, অত চেঁচাচ্ছিস কেন?

পুষ্পকে খোঁড়াতে দেখে কে যেন ফিরে তাকাল। আরে হারাণ যে। সঙ্গে বৌ নাকি?

পুষ্প এবার মাথার কাপড় টানতে গিয়েই থেমে যায়। অগত্যা মাটির দিকে তাকিয়ে কোন প্রকারে লজ্জা লজ্জা ভাবটা কাটিয়ে উঠতে থাকে।

আজ্ঞে, পরিবার।

বেশ—বেশ।

বড়বাবু চলে যেতে পুষ্প হারাণকে প্রশ্ন করে, এরা কি সবাই তোমার ওপরওয়ালা নাকি গো?

হ্যাঁ।

আর সেই ঠোঁটে আলতা মাখা মেয়েটা, সে?

কথাটা চাপা দেবার জন্যে হারাণ তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, দেখ, দেখ, কত বড়ো বেগুন! দেখেছিস কোনোদিন?

ঠোঁট উল্টে পুষ্প বলে, ওঃ ভারি বেগুন দেখাচ্ছে আমাকে, আমাদের ওলাইডাঙার বেগুন যদি দেখতে। সে বছর দাদা কোথা থেকে উত্তুরে বেগুনের চারা এনেছিল। বেগুন ধরল এক একটি ঠিক লাউয়ের মত।

চুপ চুপ অত চেঁচাচ্ছিস কেন?

এমন সময় পিটকী নাকি স্বরে চীৎকার করে ওঠে, নেচুন ধুপ। মানে লজেন্স পড়ে গেছে। এর পরেই স্বরটা সপ্তমে চড়িয়ে পিটকী আদেশ করে—নেচুন ধুপ, কুয়ি। মানে কুড়িয়ে দাও।

স্টলের সবাই ওদের দিকে ফিরে তাকাল। ফলে আরো তিনটি অফিসের মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যায় হারাণের। প্রথমা দ্বিতীয়াকে বলে, হারাণের বৌ দেখেছেন নিলিদি ?

কোথায় ?

ওই তো।

হারাণ বিগলিত ভঙ্গিতে ঘাড় হেঁট করে দাঁড়িয়ে থাকে।

মেয়েদের দলটা এগিয়ে যেতেই পুষ্প বলে, হ্যাঁ গা, এরা সবাই কি তোমার অফিসের ?

হ্যাঁ।

এরা সবাই তোমার ওপরওয়ালা ?

হ্যাঁ। বেশ বিরক্তির সঙ্গেই হারাণ বলল।

ওকি! পুষ্পকে এবার বসে পড়তে দেখে হারাণ প্রশ্ন করে।

জুতোটা আর পরতে পারছি না, খুলে ফেলি, কী বল ?

ওঃ, তোর জ্বালায় আমার মানসম্মান আর রইল না, ওঠ ওঠ বলছি।

রাগের মাথায় পুষ্পর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিল, সবাই তো তোমার ওপরওয়ালা, তোমার আবার মানসম্মান কী! কিন্তু মনের কথাটা চেপেই বলল, তবে এই বসলুম আমি, আর জুতো পায়ে চলতে পারছি না।

সহসা একটা পরিচিত গাড়ির হর্ন শুনতে পেল হারাণ। বড় সাহেব! ছুটে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দিয়ে হারাণ সেলাম ঠুকে দাঁড়াল। সাহেব কিন্তু হারাণকে দেখেও যেন দেখল না।

পুষ্প বলে, লোকটা কে গো ?

আমাদের বড়ো সাহেব, সকলের ওপরওয়ালা।

সাহেব কী গো! ও তো আমার চেয়েও কালো, সাহেব তো ফর্সা হয়।

হারাণ তার উত্তর না দিয়ে বলে, চল, এবার ফিরতে হবে। কাল আবার অফিস।

আগে অপিসের নামে পুষ্প কেমন একটা গর্ববোধ করত। পিটকীর বাপ অপিসে যায় একি কম কথা! টগরীদির বর ট্রেনে ফেরি করে, গৌরীর বর বিড়ি বাঁধে, আর তার বর যায় অপিসে! গর্বের কথা বইকি। কিন্তু আজ মেলা দেখতে এসে পুষ্পর মনটা ভীষণ দমে গেছে। পিটকীর বাপ সকলের চেয়ে ছোট, সবাই তার ওপরওয়ালা, এমনকি ঠোঁটে আলতা পরা মেয়েগুলো অবদি। লজ্জায় দুঃখে পুষ্পর চোখে জল আসতে চায়।

হঠাৎ কী হল মেলার মাঝে! সবাই অমন হল্লা করে দৌড়চ্ছে কেন ?

হারাণ বউকে বলে, তুই দাঁড়া কী হল দেখে আসি। ওকে বেশি দূরে যেতে হল না। কয়েক পা যেতেই হারাণ দেখল একটা খ্যাপা গোরু সিং উচিয়ে সবাইকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। যে যেদিকে পারে গোরুটার তাড়া খেয়ে দৌড়ে পালাতে লাগল। একসময় স্বলেখা দেবীর লাল ভ্যানিটি ব্যাগটা চোখে পড়ায় গর্জন করে গোরুটা ছুটে যায়। এক মুহূর্তে হারাণও তার কর্তব্য স্থির করে ফেলে।

দৌড়ে গিয়ে গোরুর সিং দুটো সে প্রাণপণে চেপে ধরল। তারপর কিছুক্ষণ ধরে বিচিত্র উপায়ে গোরুটার প্রচণ্ড শক্তিকে প্রতিহত করে চলল। দরদর করে সারা গায়ে ঘাম ছুটছে হারাণের। পেশীবহুল হাতের শিরাগুলো চিতি সাপের মতো ফুলে ফুলে উঠছে।

পুষ্প দেখছে, দেখছে পলকহীন চোখে।

কিছুক্ষণ পরে দমকলের লোক এসে গোরুটাকে ধরে নিয়ে গেল। হারাণকে ঘিরে তখন অজস্র লোকের ভীড়। ওকে বাহবা দিচ্ছে সবাই।

অপলক চোখে পুষ্প তাকিয়ে আছে ওর দিকে। সেই কোট-প্যান্টপরা বড়ো সাহেব এগিয়ে এসে হারাণের পিঠটা একটু চাপড়ে দিলেন। ঠিক এই মুহূর্তে হারাণের পাশে লোকটাকে আর ওপরওয়ালা বলে মনে হল না।

ভীড় থেকে বেরিয়ে হারাণ বৌকে বলল, চল, এবার ফেরা যাক।

পুষ্প বলল, কেন, এত তাড়া কিসের? চল না ওদিক থেকে একটু ঘুরে আসি, ওদিকটা দেখা হয় নি।

তোর পায়ে লাগছে না? কষ্ট হবে।

হোক, দেখ না, সবাই কেমন তোমার দিকে তাকিয়ে আছে।

॥ ২ ॥

লোকটার ছবি

[**সংকেত :** লোকটা শহরতলীর এক পানওয়ালা। ওর জীবনে একমাত্র শখ একটা ভাল ছবি তোলে। সিনেমার বিখ্যাত এক ক্যামেরাম্যান স্থানীয় লোক। লোকটা তাকে দেখলেই ছবি তোলার অনুরোধ করে। এইভাবে অনেক দিন কেটে যায়। কিন্তু দিচ্ছি দেব করে কোন দিনই আর ছবি তোলার সময় পেলেন না ভদ্রলোক। শেষে একদিন সময় হল। কিন্তু কবে? টগর ফুলের মালা পরে যেদিন সেই লোকটা শ্মশানে যাবার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।]

সাজির হাটে যাবার আগে একটা ছবি উঠান বাবু, নিজেকে দেখতে বড় সাধ যায় গো। ঘড়ঘড়ে গলায় সেই পুরোনো আবেদন, যা একটানা দেড় বছর শুনে আসছি।

আজকাল লোকটাকে সাধ্যমতো এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি। কিন্তু মনে করলেই তো এড়িয়ে চলা যায় না। স্টেশনের ধারেই ছোট্ট পানবিড়ির দোকান ওর। তাই আসা যাওয়ার পথে অন্তত একবার লোকটার সামনে পড়তে হয়। আর তখনই কালচে পানখাওয়া তেঁতুলবিচিমার্কা দাঁত বের করে বলবে, একটা পান খান বাবু।

পান আমি খাই না সে-কথা ভাল করেই জানে, তবু আজ বছর দেড়েক ধরে একই অনুরোধ করে আসছে লোকটা। এ কথা সে কথার পরেই আসে ছবিতোলার আবেদন। অথচ আজ অবধি ওর আবেদন রাখতে পারি নি। তার জন্যে অবিশ্যি মনে ওর রাগতাপ নেই, আছে একটা চাপা অভিমান। মাঝে মাঝেই তা প্রকাশ পায়।

বলে, বাবু কত বড়ো বড়ো ফিল্মিস্টারের ছবি তোলেন, আমার ছবি উঠাবেন কেন! কবে শুনবেন সাজির হাটে চলে গেছি, সেদিন বুঝবেন!

সাজির হাট গ্রামের শ্মশান। ওর অভিমানের উত্তরে আমাকেও বলতে হয়, এমন আর কী বয়েস তোমার যে কথায় কথায় সাজির হাটে যেতে হবে।

উত্তরে লোকটা তেঁতুলবিচিমার্কা দাঁত বের করে বলত, বয়স হয় নি, কী বলছেন বাবু? আমার বড়ো ছেলেটা বেঁচে থাকলে আপনার চেয়ে বড়ো হত গো।

এরপর অবশ্যই আমাকে কথা দিতে হয় সামনের মাসেই তোমার ছবি তুলে দেব—নির্ঘাত দেব।

সারামুখে আত্মপ্রসাদের ভাব ফুটিয়ে লোকটা বলত, দিন বাবু একটা ছবি তুলে, নিজেকে দেখতে বড়ো সাধ যায়।

একদিন ওকে প্রশ্ন করি, আচ্ছা, তুমি কোনোদিন ছবিটবি তোল নি? উত্তরে ও বলল, তুলি নি বললে মিথ্যে বলা হবে, তুলেছিলুম সে অনেক বছর আগে। একজন কলেজের ছেলেকে বলে কয়ে একটা ছবি উঠিয়েছিলুম কিন্তু এমনি আমার কপাল বাবু সে ছবি উঠল না। সব সাদা হয়ে গেল। কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া ভাব। সবই আমার কপাল, নইলে ছেলেটা অনেক আটফাট দিয়ে হাতে একটা বই ধরিয়ে ছবি উঠাল আর সে ছবি কিনা সাদা ধোঁয়া হয়ে গেল!

ওর সঙ্গে আলাপের শুরু বছর দেড়েক আগে। ফিলিম লাইনে ক্যামেরার কাজ করি। সেবার সাদা-কালো ছবির জন্যে সেরা ক্যামেরাম্যানের পুরস্কার পেয়েছি। কাগজে সংবাদ পড়ে স্থানীয় বন্ধুরা ধরে বসল ওরা আমাকে সংবর্ধনা দেবে। সেই সংবর্ধনাই হল আমার কাল।

ফুলের-তোড়া-হাতে আসর থেকে বেরিয়ে আসতেই ঘড়ঘড়ে গলায় কে যেন পিছন থেকে ডেকে বলল—শুনুন বাবু।

তাকাতে চোখে পড়ল আধবুড়ো সিটকে চেহারার এই লোকটা। যার তোবড়ানো মুখে কদিনের না-কামানো দাড়ি আর নাকের ডগায় একটা আঁচিল। যেটাকে মস্ত একটা মাছি বলে মনে হচ্ছিল।

লোকটা আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল, শুনলুম বাবু নাকি মস্ত বড় ক্যামেরাম্যান, বড় বড় ফিলিমস্টারের ছবি তোলেন?

উত্তরে বললুম, মস্ত বড় ক্যামেরাম্যান নই, তবে বড় বড় ফিলিমস্টারের ছবি তুলি।

লোকটা বলল, আমার একটা ছবি উঠাবেন বাবু, নিজেকে ছবির মধ্যে দেখতে বড়ো সাধ যায়।

আচ্ছা, তুলে দেব—বলে সেদিনের মতো রেহাই পেতে গিয়ে এই শপথের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসেছি।

সব শুনে বন্ধুরা বলল, দেখ সুনীল, একেই বলে জাতশিল্পী? পান বিক্রি করলে কী হবে, মেজাজটা কিন্তু খানদানী। ও যার-তার হাতে ছবি তুলবে না। তুলবে প্রাইজপাওয়া ক্যামেরাম্যানের হাতে।

কথায় কথায় লোকটার এই ছবি তোলার বাতিক নিয়ে এক নির্মম রসিকতার গল্পও শোনা গেল। অনেক দিন আগের ঘটনা। কলকাতা থেকে পিকনিক করতে এসেছিল একদল ছেলেমেয়ে। তাদের একজনের হাতে ক্যামেরা দেখে লোকটা নাকি ধরে বসল একটা ছবি উঠান দাদাবাবু।

পিকনিকের সেই দলটা প্রস্তাব শুনে ওকে নিয়ে মেতে উঠল। লোকটাকে নানা পোজে দাঁড় করিয়ে হাসিয়ে কাঁদিয়ে কবার ফল্‌স্ সাটার টিপে ছবি তোলার অভিনয় করে বলল আজই যাবার সময় তোমার ছবি পেয়ে যাবে।

ছবি অবশ্যই পেয়েছিল লোকটা। তবে সে ছবি তার নিজের নয়। কোনও বিলিতি জার্নালের পাতা থেকে কেটে আনা এক গরিলার ছবি।

এহেন লোকের একটা সত্যি সত্যি ছবি তোলার নৈতিক দায়িত্ব অনুভব করেছি মনে মনে। কিন্তু দিচ্ছি দেব করে এই দেড় বছরেও আর সময় হল না।

একটা ছবির কাজে মাসছয়েক বাইরে কাটিয়ে সদ্য ফিরেছি। ক'রাত ট্রেনে ভাল ঘুম হয় নি তাই সেদিন অনেক বেলা অবধি কুমিরের মত বিছানায় পড়েছিলাম। সকালের দ্বিতীয় দফা চা নিয়ে মা ঘরে এল, বললে ওঠ, আর কত ঘুমুবি।

আমার ওঠবার লক্ষণ না দেখে মা তাড়াতাড়ি বললে—ওঠ, চা খা, তোকে আবার একটু কাজে পাঠাব।

বললুম, কোথায় পাঠাবে ?

তা জানি নে, কলোনীর ভেতরে কোথাও হবে।

কী কাজ আগে শুনি ?

কী আবার, তোর যা কাজ তাই—ছবি তুলতে হবে। ওরা আজ মাসখানেক ধরে ঘুরছে, লোকটার ব্যামোর শুরু থেকে—যদি দুটো দিন আগেও ফিরতিস। নে বাবা আর দেরি করিস নে, সেই ভোর থেকে মেয়েটা বসে আছে।

বলে দাও পরে একদিন তুলে দেব, আজ বড়ো টায়ার্ড লাগছে।

আমার কথা শুনে মায়ের চোখ কপালে ওঠে। বলে পরে কী বলছিস রে ? তাকে যে সাজির হাটে নেবার জন্যে সাজিয়ে রেখেছে। তুই অমত করিস নে বাবা, আমি ওদের কথা দিয়েছি।

এর পর নিছক মায়ের কথা রাখতে গিয়েই ক্যামেরা কাঁধে অনেক নোংরা ডোবা উঠোন আর পিছল পথ পেরিয়ে মেয়েটার সঙ্গে ওদের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালাম।

সেখানে কোমরে-গামছা-জড়ানো একদল ছেলেবুড়ো, আমারই অপেক্ষায়—কিছু অধৈর্য।

আমার হাতের ক্যামেরা কেঁপে গেল। ক্যামেরা কেঁপেছিল টগর ফুলের মালা পরে তুলসী তলায় শুয়ে আছে যে লোকটা তাকে দেখে।

লোকটাকে আমি চিনি, কারণ নাকের ডগায় মাছির মত অতবড় আঁচিল দেখেও ভুল হবার কথা নয়। সাটার টিপতে গিয়ে হঠাৎ মনে হল লোকটা বুঝি এখনি বলে

উঠবে, 'সাজির হাটে যাবার আগে একটা ছবি উঠান বাবু, নিজেকে দেখতে বড়ো সাধ যায় গো।'

অনুশীলনী

১। সংকেত সূত্রগুলির সাহায্যে গল্প রচনা কর :

(ক) কর্তা গিন্নি দুজনেই কৃপণ। কর্তা কাজে গিয়েও ফিরে এলেন প্রদীপ নেভানো হয় নি মনে পড়ে যাওয়ায়—বাড়তি যাতায়াতে চটিজুতো বেশি ক্ষয় হল বলে গিন্নীর ধমকানি—কর্তা বলেন, চটি বগলে করে এনেছেন, ক্ষয় হতে দেন নি।

(খ) প্রদীপের আলোয় বই পড়ছিল লোকটা—বইটাতে আছে 'ছোটমাথা লম্বাদাড়ি লোক আহম্মক—মাথাটা বড়ো করা যাবে না, তাই লম্বা দাড়িটাই সে ধরে প্রদীপে।

(গ) এক ভদ্রলোকের কুকুর চুরি গেল—কিছুদিন বাদে তিনি দেখলেন একটা দোকানে তা বিক্রীর জন্যে বাঁধা রয়েছে—তিনি কুকুরটা নিজের বলে দাবি করলেন—অসাধু দোকানী প্রমাণ চাইল—ভদ্রলোক বললেন ছেড়ে দিলে কোন্ বাসায় যায় দেখুন—ছাড়া পেয়ে কুকুর সোজা সেই ভদ্রলোকের বাসায় গেল।

(ঘ) এক সঙ্গীতরসিক রাজা ঘোষণা করলেন—গানের মজলিসে কেউ সপ্রশংস উক্তি, মাথা-নাড়ানো, তালঠোকা এসব কিছুই করতে পারবে না। করলে মৃত্যুদণ্ড—তবু একজন নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলেন—রাজা তাঁকে পুরস্কৃত করলেন।

(ঙ) প্রচণ্ড দুর্যোগ—ঘরে জ্বালানিকাঠ নেই—মারাঠী সাধু ঘরের একমাত্র খাট কেটেই অতিথি সৎকার করলেন।

(চ) একটি ঘোড়া আর একটা মোষের মধ্যে তৃণভূমির স্বত্ব নিয়ে ঝগড়া বাঁধল—হেরে গিয়ে ঘোড়া এক মানুষের শরণাপন্ন হল—মানুষটা ঘোড়ার মুখে লাগাম চেপে চড়ে বসল, মোষটাকে তাড়ালো—কিন্তু ঘোড়ার মুখের ঐ লাগাম আর খসল না।

(ছ) উইলিয়ম টেল ধনুর্বিদ ছিলেন—কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে তাঁকে শাস্তির জন্যে রাজার কাছে যেতে হল—রাজার আদেশ হল নিজের ছেলের মাথায় একটি আপেল রেখে দুটুকরো করতে হবে—টেল দ্বিধাগ্রস্ত হলেন—ছেলেই সাহস দিল—কৃতকর্ম হলেন টেল।

(জ) কলকাতার বাস রাস্তা—বাস চলার ফাঁকে ফাঁকে পাড়ার ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে নানান রকম খেলায় ব্যস্ত থাকে—খেলা শেষে যে যার ঘরে ফিরে যায়—ফেলে রেখে যায় খেলার সামগ্রী ইট পাটকেল পাথর। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে ফুটপাথের ধারে রাস্তার আলো মেরামত করছে মিস্ত্রি বিজয়—হঠাৎ এসে পড়া একখানা দোতলা বাসের চাকার ধাক্কায় এক টুকরা পাথর লাফিয়ে উঠে বিজয়ের বুকের উপরে ছিটকে এসে আঘাত করে। সংজ্ঞাহীন বিজয়কে হাসপাতালে পাঠানো হয়—মাঝরাতে মারা যায় বিজয়—ঘরে তার নতুন বিয়ে করা বৌ মাথায় সিঁথিরসিন্দুর চিরতরে মুছে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে প্রশ্ন করে—এই মৃত্যু কার পাপে?

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

(ঝ) মহিনুদ্দীন গ্রামের ভূমিহীন কৃষক—সংসারে তার ছোট মেয়ে আমিনা—সারাদিন পরের জমিতে কাজ করে সে যা রোজগার করে তাতে তার কায়ক্লেশে দিন চলে—বৎসরের অধিকাংশ দিনেই তার কাজ থাকে না—অনাহারে অর্ধাহারে মেয়েকে নিয়ে সে দিন যাপন করে—একমাত্র ভিটেটুকু ছাড়া তার আর কিছু সম্বল নাই—ঋণের দায়ে মহাজনের কাছে ভিটে বাঁধা—মহাজনের ঋণ শোধের ক্ষমতা তার নেই বরং দিনের পর দিন তার ঋণ বেড়েই যায়—আমিনা মহিনুদ্দীনের চোখের মণি—হঠাৎ সে জ্বরে আক্রান্ত হয়। কয়েকদিন পর জ্বর বাঁকা পথ ধরে—মহিনুদ্দীনের পয়সা নেই—সে ডাক্তার ডাকতে পারে না, আমিনাকে দিতে পারে না ওষুধ-পথ্য—ছুটে যায় সে মহাজনের কাছে—মহাজন ঋণ দিতে অস্বীকার করে পূর্বের ঋণ শোধ করতে অথবা ভিটেটুকু ছেড়ে দিতে বলে—মহিনুদ্দীনের মাথায় বাজ ভেঙে পড়ে। মেয়ের কাছে ছুটে আসে সে—চিকিৎসার অভাবে কয়েকদিনের মধ্যে মেয়ে ক্রমেই মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়—মহাজনও অপেক্ষা করে না—লেঠেল নিয়ে সে মহিনুদ্দীনকে ভিটে থেকে উচ্ছেদ করতে আসে—আমিনার মৃতদেহ নিয়ে ভিটের মায়া ত্যাগ করে মহিনুদ্দীন বেরিয়ে পড়ে বৃহৎ জগতের উদ্দেশ্যে—সর্বহারায় পরিণত হয় সে। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০]

(ঞ) সবাই প্রজাবৎসল রাজা ধর্মনারায়ণ ও তার স্ত্রী কমলার গুণগান করত—ইন্দ্র তাদের পরীক্ষা করবার জন্যে জলাভাব ঘটালেন—পুকুর কেটে জল আনার জন্যে রানীর সব চেষ্টা ব্যর্থ হল—রাজা স্বপ্নাদেশ পেলেন—রানী কমলা আগে পুকুরে আত্মোৎসর্গ করলে জল উঠবে—রানী তাই করলেন।

(ট) বিদ্যাসাগর কাজে যাবার পথে একটি বাড়িতে কান্নাকাটি শুনে খোঁজ নিয়ে জানলেন গৃহকর্তার মৃত্যুতে তার গৃহিণী অসহায় হয়ে পড়েছে—তিনি বাড়িতে ঢুকে জানালেন মৃতব্যক্তির কাছে তিনি টাকা ধার করেছিলেন. এখন তা শোধ দিতে চান।

(ঠ) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে পঞ্চপাণ্ডব এক যজ্ঞের আয়োজন করে প্রচুর দান করলেন—একটা বেজী কিন্তু একে যজ্ঞই বলতে চাইল না—সে একটি গরীব ব্রাহ্মণের অতিথিসেবার গল্প বলল—নিজেরা নিদারুণ ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করেও অনেক কষ্ট করে জোগাড় করা ছাতু অতিথিকে ধরে দিলেন—মাটিতে পড়া ছাতুর উপর গড়াগড়ি দেওয়া মাত্র বেজীর দেহের অর্ধেকটা স্বর্ণময় হয়েছে, এখানে গড়াগড়ি দেওয়ার পর বাকি অর্ধেক তো স্বর্ণময় হল না ?

(ড) দর্জির কাছে জাদুকরের বড়াই সে অনেক কৌশল জানে—দুঃখের সময় দর্জিকে সাহায্যদানের অঙ্গীকার—দুর্ভিক্ষের হাহাকার—জাদুকরের জাদু কেউ দেখে না কিন্তু দর্জির কোন মতে চলে—দর্জির কাছেই জাদুকরের সাহায্য ভিক্ষা।

(ঢ) জ্যোতিষীর ভাগ্যগণনায় রাজার অসন্তোষ—মৃত্যুদণ্ড দান—রাজার বিদ্রূপাত্মক প্রশ্ন : জ্যোতিষীর মৃত্যু কবে ?—জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্বাণী : 'রাজার মৃত্যুর দুইদিন পূর্বে'—জ্যোতিষী ছাড়া পেলেন।

(ণ) এক বৃদ্ধ তার অলস ও কলহপ্রিয় পুত্রদিগকে মৃত্যুকালে বলল, আমাদের জমিতে গুপ্তধন আছে। ছেলেরা জমি খুঁড়িয়ে কিছুই পেল না, কিন্তু ফসল ফলল।

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৮]

(ত) এক বিখ্যাত বিদ্বান—রাজার নিমন্ত্রণ—নিমন্ত্রণের আগে বিদ্বানকে সতর্ক করা হয়। আপন ভোলা মানুষ তিনি যেন পরিচ্ছন্ন পোশাক পরে আসেন—বিদ্বান ব্যক্তির উপযুক্ত সাজে গমন—খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ না করে পোশাক দিয়ে স্পর্শ।

(থ) মুখে রুটির টুকরোওয়ালা এক কাক—এক খেঁকশিয়ালী তাহাকে গান গাহিতে বলিল—রুটি লইয়া শেয়ালী পলাইয়া যায়। [নমুনা প্রশ্ন, ১১৭৯]

(দ) এক প্রভু শিকারে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন—প্রভুর কুকুর ঘেউ ঘেউ করিয়া প্রভুর ঘুম ভাঙাইল—প্রভু রাগিয়া গুলি করিয়া কুকুরটাকে মারিয়া ফেলিলেন—পরে দেখিলেন একটি সাপ গাছের ডালে ঝুলিতেছে—প্রভু কুকুরের জন্য কাঁদিতে লাগিলেন। [নমুনা প্রশ্ন, ১১৭৯]

(ধ) অতি সাধারণ একজন মানুষ। প্রথম দর্শনে দুর্বৃত্ত বলে মনে হয়। সুযোগ পেয়েও প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করল না। প্রকৃত মালিককে ফিরিয়ে দিয়ে মহানুভবতার পরিচয় দিল।

(ন) এক বৃদ্ধা তাঁহার দৃষ্টিশক্তির পুনরুদ্ধারের বিনিময়ে চক্ষু চিকিৎসককে পুরস্কার দিতে প্রতিশ্রুতি দেন। চিকিৎসক প্রকৃত ঔষধ না দিয়া বৃদ্ধার দৃষ্টিহীনতার সুযোগে তাঁহার গৃহের মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী অপসারিত করেন। প্রকৃত ঔষধ প্রয়োগে বৃদ্ধা দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়া চিকিৎসককে প্রতিশ্রুতি মতো পুরস্কার দিলেন না। চিকিৎসক আদালতে মামলা করেন। বৃদ্ধ আদালতে বলেন যে, তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইয়াছেন কিনা বুঝিতে পারেন না। কারণ, দৃষ্টিশক্তি যখন ছিল, তখন তিনি তাঁহার বাড়ির দামী জিনিসগুলি দেখিতে পাইতেন। এখন তিনি তাহার কিছুই দেখিতে পান না।

(প) এক ভদ্রলোক—কয়েকজন বন্ধুকে নিমন্ত্রণ—নির্দিষ্ট সময়ে বন্ধুরা অনুপস্থিত—ভদ্রলোক দুঃখিত এবং চিন্তিত—লেখার টেবিলে গিয়ে ড্রয়ার টানলেন—ভদ্রলোক অবাক—নিমন্ত্রণের চিঠিগুলি বিলি করা হয় নি।

(ফ) কেষ্টা নামে এক নির্বোধ নির্লজ্জ পুরাতন ভৃত্য গৃহকর্তার সঙ্গে তীর্থযাত্রা করিয়া তীর্থস্থানে হঠাৎ বসন্তরোগে আক্রান্ত কর্তাকে প্রাণপণ সেবাযত্নে বাঁচাইয়া তুলিয়া পরে ঐ নিদারুণ রোগে নিজেই মৃত্যুবরণ করিল। এমন একটি বিষয় অবলম্বন করিয়া একটি গল্প রচনা কর।

(ব) সন্ন্যাসী মন্দিরে পূজা করিতেছিলেন। ভিখারী বার বার ভিক্ষা চাহিল। সন্ন্যাসী বিরক্ত হইলেন। তাহাকে তাড়াইয়া দিলেন। ভিখারী দেবতার মূর্তি ধারণ করিয়া বলিলেন, আমাকে দূর করিয়া দিলে ?

(ভ) একজন শ্রমিক বা সাধারণ মানুষ নিজের জীবন বিপন্ন করিয়া বহু লোককে মৃত্যুর হাত হইতে বাঁচাইয়া সাহস ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের পরিচয় দিয়াছিল এমন ঘটনা অবলম্বন করিয়া একটি গল্প রচনা কর।

২। ইংরাজীতে Pied Piper of Hameline, The Diverting History of john Gilpin. The Town Mouse and the Country Mouse—এই

তিনটি গল্প তোমরা নিশ্চয় শুনেছ। যথাক্রমে 'হেমেলিনের বাঁশিওয়ালা', জনগিল-পিনের মজার ইতিকথা' এবং 'শহরের ইঁদুর আর গাঁয়ের ইঁদুর' নামে এই তিনটি গল্পকে বাংলায় রূপ দাও। (এক একটি গল্প ২০০ শব্দের মধ্যে হবে)

৩। নিচে লেখা সংলাপগুলোকে গল্পে রূপ দাও :

(ক) চাষী—হুজুর, আমার কুকুর আপনার মুরগি খেয়েছে।

জজসাহেব—তা অমন কুকুর মেরে ফেল, আর আমার কুকুর দিয়ে তোর মুরগি খাওয়া।

চাষী—হুজুর, মিছে বলে আপনার রায়টা জেনে নিলাম, আসলে আপনার কুকুর-টাই আমার মুরগি খেয়েচে।

(খ) জেলে—বাবু, মাছের দাম চাই না।

বাবু—তবে কী দেব তোকে ?

জেলে—১০০ ঘা বেত।

বাবু—তবে তাই নে (বেত মারতে লাগলেন)

জেলে—৫০ ঘা হয়েছে, এবার থামুন। বাকী ৫০ ঘা ঐ দ্বাররক্ষীকে দিন। যা পাব তার অর্ধেক তার চাহিদা।

৪। নিচে লেখা প্রবাদগুলোর ইঙ্গিতে গল্প লেখ :

(ক) ঈশ্বর যা করেন মঙ্গলের জন্যে।

(খ) উড়ো খৈ গোবিন্দায় নমঃ।

(গ) তাঁতিকুলও গেল বৈষ্ণবকুলও গেল।

(ঘ) নিরানব্বইয়ের ধাক্কা।

(ঙ) ঢেঁকি সগ্গে গেলেও ধান ভানে।

৫। Walter De La Mare-এর 'Listeners' কবিতায় ঘোড়ায় চড়ে পথিক এল গহন বনে, একটি পরিত্যক্ত পুরানো বাড়িতে। দুয়োরে করাঘাত করে কোন ফল হল না, কারণ কেউ নেই সে বাড়িতে। শুধু কতকগুলো অশরীরী সত্তার উপলব্ধি হল পথিকের। তাদের সম্বোধন করে সে বলল, 'তাদের বলে দিও আমি এসেছিলাম'। ঐ বাড়ির সঙ্গে পথিকের আগেকার সম্পর্ক এবং তার 'আসবই একদিন' বলে প্রতিশ্রুতি—এই নিয়ে গল্প লেখো।

৬। নিজের জীবন বিপন্ন করে কোন বন্ধুকে বিপদ থেকে বাঁচাতে গিয়ে হারিয়েছে তাঁর মূল্যবান অঙ্গ—এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে একটি গল্প রচনা করো।

৭। একটি দরিদ্র চরিত্রবান্ যুবকের স্বনির্ভরতার প্রয়াস সার্থক হয়েছিল এমন ঘটনা অবলম্বনে একটি গল্প লিখ।

৮। 'অসময়ের বন্ধু প্রকৃত বন্ধু' এই নীতিবাক্যটি নিয়ে একটি গল্প রচনা কর।

৯। অসমাপ্ত গল্পগুলি পড়ো। গল্পের পরিণতিটা ভেবে নাও, তারপর একটি ছোটো গল্পে রূপ দাও। সুন্দর নাম দাও একটা।

১

শ্মশানের গা ছুঁয়ে রেললাইনটা বরাবর পূব-পশ্চিমে চলে গেছে। আধা-জঙ্গলের শীর্ণ পথ ছেড়ে মদন দাস এবার লাইনের পাড়ে উঠল। সে যাবে মাকালপুরের হাটে ভিক্ষে করতে। পৌষের শেষ এখন। তবে কুয়াশার আস্তরণের জন্যে শীতের দাপট তেমন নেই। মদনের পরনে এক চিলতে ন্যাকড়া। গায়ে একটা ছেঁড়া চট জড়ানো। ভাগ্যগুণে এবার শীতের শুরুতেই সে এই চট্‌টা জীবন মণ্ডলের দোকানের পেছনে কুড়িয়ে পেয়েছিল। চটে এখনো গুড়ের গন্ধ ছড়িয়ে আছে। আজ তিন দিন হল একটা গোটা রুটিও জোটে নি। গাঁয়ের মধ্যে ভিক্ষে মেলে না। ভিক্ষে চাইলে সবাই খেটে খাওয়ার পরামর্শ দেয়। অথচ মদনের সর্বাঙ্গে বিষাক্ত ঘা, গতরে জোর নেই।

কুলি-ট্রেনটা আসছে। দূরে সিটির শব্দ। তার মানে সাড়ে ছটা বেজে গেছে। কুয়াশার জন্যে কোথাও রোদের ছিটে-ফোঁটা নেই। মদন দাস পা টেনে টেনে চলেছে। সকাল থেকেই হাটে বসতে চায় সে। এখনও মাইল দেড়েক পথ হাঁটতে হবে।

হঠাৎ মদনের দৃষ্টি পড়ল লাইনের ধার ঘেঁষে একটা কংক্রীটের থামের গোড়ায়। চাদর মুড়ি দেওয়া একজন লাইনের ওপর ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। এদিকে কুলি-ট্রেনটা তীব্র গতিতে ধেয়ে আসছে। কালভার্টের নীচের জলে শিহরণ। কয়েকটা শালিক জাতীয় পাখি মাটি থেকে উড়ে গিয়ে বাব্‌লা গাছগুলোর ডালে বসল।

মুহূর্তে লোকটার উদ্দেশ্য মদনের কাছে জলের মত পরিষ্কার হয়। দুর্বল পায়ে সে চীৎকার করতে করতে ছুটে যায় লোকটার দিকে। মদনের গা থেকে খসে পড়ে চটের টুকরো। শীর্ণ দুটো হাত বাড়িয়ে সে একটা আসন্ন মৃত্যুর সঙ্গে পাল্লা দিতে ছোটে।

অতি ভগ্ন কণ্ঠে কতকগুলো শব্দের টুকরো বাতাসে ছড়ায়—হুঁসিয়ার হুঁশিয়ার…

[শুধুই কি জীবন রক্ষা, না দুজনের গড়ে-ওঠা বন্ধুত্বের সূত্রে নূতন জীবনের দিকে হাত বাড়ানো? গল্পটা কোন্ দিকে মোড় নিতে পারে ভেবে দেখো]

২

অনেক দিন পর কলকাতায় এসেছে শুভেন্দু। ছুটই মেলে না। অথচ কলকাতার হাতছানিতে সাড়া দিতে সে সবসময় প্রস্তুত। সুদূর বিলাসপুরের নিঃসঙ্গ জীবন থেকে অন্তত এক সপ্তাহের জন্যে ছাড়া পেয়ে শুভেন্দুর মনটা আজ মুক্ত বিহঙ্গের মত।

কলেজ স্ট্রীটের ফুটপাতে দাঁড়িয়ে পুরানো দিনগুলোর কথা তার মনে পড়ল। সেই ইউনিভারসিটি, কফি হাউস, পুরানো বইয়ের দোকান। বন্ধুরা কে কোথা ছিটকে পড়েছে, অনেকের খবরই জানে না শুভেন্দু। স্মৃতিমন্থনের জন্যেই সে এসেছে কলেজ স্ট্রীটে, কিন্তু বড্ড একা লাগছে। ভাবল, একটু চা খেলে হত। থাক। তার চেয়ে পুরানো বইয়ের দোকানগুলোই একবার দেখা যাক।

এই বই সে বই একটু-আধটু পাতা উল্টিয়ে দেখছিল শুভেন্দু। একটা বইয়ের মলাট উল্টে থমকে উঠল সে, একি? এ কবিতার বইটা যে সে উপহার দিয়েছিল তার প্রিয় বন্ধু তপনকে। মনে পড়ল সেই বিশেষ দিনটির কথা। সেদিন বন্ধুত্বের একটি আবেগ-

মধুর মুহূর্তে কবিতা-প্রিয় তপনকে সে এই বইটি উপহার দিয়েছিল। শুভেন্দুর নামটা এখনও সম্পূর্ণ মুছে যায় নি।

বইটা হাতে নিয়ে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে শুভেন্দু। তপন কি তাকে মনে রাখতে চায় না? বন্ধুর স্মৃতিকে সে তাহলে ধরে রাখতে চায় নি কেন?

কিংবা এমনও হতে পারে অন্য কাউকে সে পড়তে দিয়েছিল বইটা। তার কাছ থেকেই হারিয়ে গিয়েছে। তারপর এসেছে এই পুরানো বইয়ের ভিড়ের মধ্যে।

—নেবেন বাবু?

দোকানীর কাছে একটু অপ্রস্তুত হয়ে—শুভেন্দু বলে, কত দাম?

[এবারে ভাবো বইটা শুভেন্দু কিনবে কিনা, তপনের সাম্প্রতিক জীবনকে জানার আগ্রহ তার হবে কিনা, সবশেষে এই বইটিই দ্বিতীয়বার উপহার হিসেবে সে তপনের হাতে তুলে দেবে কিনা। মনস্তত্ত্বের দিক থেকে অন্য কোনো পরিণতির কথাও ভাবতে পারো]

———

তাৎক্ষণিক বক্তৃতা বা ভাষণ

মানুষের মুখে যেদিন ভাষা জাগল সেদিন সে সবচেয়ে বড়ো হাতিয়ার পেল হাতে। জীবনে জীবন যোগ করা এবারে সম্ভব হল তার পক্ষে। একের অভিজ্ঞতা সে অন্যকে সঞ্চারিত করতে পারল। মানুষে মানুষে যোগাযোগ হল ঘনিষ্ঠ। ভাষার জন্যেই মানুষ সত্যিই মানুষের কাছে এল, তাদের ব্যবধান ঘুচল। ভালো করে কথা বলবার প্রয়োজন মানুষ বেশি করে উপলব্ধি করল। ক্রমশ ভাষণ একটি বিশিষ্ট আঙ্গিক হয়ে উঠল মানুষের জীবনসাধনায়।

ভাষণ কথাটির আক্ষরিক অর্থ কথা বলা, কিন্তু শব্দটি আমরা বিশেষ একটি অর্থেই ব্যবহার করি। সে অর্থ হল কোনো বিষয়ে সাজিয়ে-গুছিয়ে বক্তব্যকে অন্যের কাছে প্রকাশ করা। বক্তৃতা বা ভাষণের আগে তাৎক্ষণিক বিশেষণটি প্রযুক্ত হলে তার মানে হবে—যে বক্তৃত বা ভাষণটি পূর্ব-প্রস্তুতি ছাড়াই দিতে হবে অর্থাৎ তখন তখনই যে বক্তৃতা দিতে হবে। ইংরেজিতে এই তাৎক্ষণিক বক্তৃতাকে বলা হয় Extempore speech.

'তাৎক্ষণিক বক্তৃতা' কথাটি ইংরেজি থেকে এসেছে বলে মনে হয়।

আজকের জনজীবনে এই তাৎক্ষণিক বক্তৃতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। এ বিষয়ে দক্ষতা অর্জনের জন্যে বিশেষ অনুশীলন প্রয়োজন। যে-কোনো একটা বিষয় নিয়ে আগে ভাবনা চিন্তা না করে তৎক্ষণাৎ বলা অভ্যাস করতে হবে, মনে করতে হবে সামনে শ্রোতা আছে। একা একাই অবসর মতো এ বিষয়ে অনুশীলন করা প্রয়োজন।

১. **সম্বোধন**ঃ প্রথমে উপস্থিত শ্রোতাদের সম্বোধন করতে হবে। এই সম্বোধন শ্রোতা অনুযায়ী ঠিক করতে হবে। আমরা সবাই জানি শিকাগো বক্তৃতায় বিবেকানন্দ শুধু সম্বোধনেই (আমার আমেরিকার ভাইবোনেরা) কীভাবে শ্রোতাদের মন জয় করেছিলেন। সম্বোধনের গুরুত্ব কতখানি এ থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

২. **উপস্থাপন বা অবতরণিকা**ঃ যে-বিষয়ে বলতে হবে সেই বিষয়ে উল্লেখ ও বিষয়ব্যাখ্যা এই অংশে করণীয়।

৩. **মূল বক্তব্য**ঃ বিষয় সম্বন্ধে বক্তার বক্তব্য, উপলব্ধি, পরামর্শ ইত্যাদি সবই এই অংশে আলোচ্য।

৪. **উপসংহার**ঃ আলোচনা যে সমাপ্ত হতে চলেছে সেই ধরনের অংশ, এবং কোনো আবেদন বা সিদ্ধান্ত ঘোষণা এই অংশে থাকবে।

এ চারটি অংশ হবে একসূত্রে গ্রথিত।

ভালো বক্তার জয় সর্বত্র। বক্তৃতা কলা ও বিজ্ঞান দুই-ই। শ্রোতার মনস্তত্ত্বও যেমন বক্তাকে জানতে হবে তেমনি প্রসঙ্গ-অনুযায়ী বক্তব্যকে হৃদয়গ্রাহী ভাষায় প্রকাশ করার কৌশলও তাঁকে আয়ত্ত করতে হবে। ভাষণ সম্পর্কে কতকগুলো বিষয় বিশেষ-ভাবে মনে রাখা দরকার ঃ

১। প্রধানত, শ্রোতা কে বা কারা তা খেয়াল রাখতে হবে। শিশুরাই যেখানে উদ্দিষ্ট সেখানে বড়ো বড়ো কথা বলে তো লাভ নেই।

২। বক্তৃতা কোনোক্ষেত্রেই যেন প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে না যায়। ধান ভানতে শিবের গীত ভাষণে নৈব নৈব চ।

৩। বক্তৃতায় কৃত্রিমতা বর্জনীয়। যথাসম্ভব সহজ ও স্বাভাবিক বক্তৃতা মন আকর্ষণ করে।

৪। সভা বা অনুষ্ঠানের চরিত্র অনুযায়ী বক্তৃতাকে সংযত, গম্ভীর বা হাস্যপরিহাসময় হতে হবে। পুনরুক্তি যেন আদৌ না হয় সে বিষয়ে সজাগ থাকতে হবে।

৫। বক্তৃতায় নিজেকে কখনও বড়ো করতে নেই। বক্তব্যে প্রত্যয় ও ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠবে কিন্তু নিজের প্রশংসা বা শক্তির বিজ্ঞাপন ভাষণে পরিত্যাজ্য।

৬। বক্তৃতা শ্রোতার সঙ্গে বক্তা যতটা একাত্ম হতে পারবেন ভাষণের সাফল্য ততই বৃদ্ধি পাবে। বেতার, দূরদর্শনে বক্তৃতার সময় মনে রাখতে হবে শ্রোতারা যেন চোখের সামনেই রয়েছেন।

৭। বক্তৃতা সংক্ষিপ্ত ও সারবান হবে। শ্রোতার ধৈর্যের উপর চাপ না পড়ে বক্তাকে সে বিষয়ে বিশেষ সজাগ থাকতে হবে।

৮। বক্তৃতা অনর্থক উদ্ধৃতিকণ্টকিত না করাই ভালো।

৯। বক্তৃতায় আরম্ভ আর সমাপ্তিটুকু বিশেষত্বমণ্ডিত হওয়া চাই।

১০। বক্তৃতা একটা পরিভাষা বৈ তো নয়। আসলে বক্তৃতা তো কথা বলা, তাকে সেই সহজ স্বচ্ছন্দভাবেই নিতে হবে। অনেকে প্রথমেই বলেন 'আমি বক্তা নই', বা 'আমার বক্তৃতা দেবার অভ্যাস নেই'। এরকম কথা না বলাই ভালো, কারণ ও-ভাবে বললে 'বক্তৃতা' যেন কথা ছাড়া অন্য কিছু এমন বোঝায়। ইংরেজি 'talk' শব্দটি এদিক থেকে খুবই সুন্দর। বক্তৃতা যে আলাপচারী 'talk' কথায় আছে সেই ইঙ্গিত।

বিশেষ কথা

তাৎক্ষণিক বক্তৃতা অনেক ক্ষেত্রেই আক্ষরিক অর্থে তাৎক্ষণিক নয়। মনে করো সভাপতি কোনো মনীষীর স্মরণসভায় ভাষণ দেবেন। তিনি আসন গ্রহণ করলেন। সভার কাজ শুরু হতে চলেছে। তিনি দেখে নিলেন কী ধরনের শ্রোতা, তদনুযায়ী তিনি বক্তব্যকে ছকে নিচ্ছেন। মাল্যদান হল ইতিমধ্যে। এবারে উদ্বোধন সঙ্গীত। হয়তো উদ্বোধন সঙ্গীতের বাণীই তাঁকে বিশেষ বক্তব্যের প্রেরণা দেবে। মনে করা যাক যে গানটি উদ্বোধন সঙ্গীত হিসেবে গাওয়া হল সেটি রবীন্দ্রসঙ্গীত—'কোন্ আলোতে প্রাণের প্রদীপ জ্বালিয়ে তুমি ধরায় আস।' সভাপতিমশাই ঐ গানেরই সূত্র নিয়ে চমৎকারভাবে শুরু করতে পারেন বক্তৃতা। এককথায় বক্তাকে খুব সজাগ থাকতে হবে, চোখ কান খোলা রাখতে হবে, তাহলে পরিবেশ, শ্রোতা, তাঁর বক্তৃতার আগের কোনো অনুষ্ঠান বা ভাষণ থেকে তিনি ভাববার অনেক-কিছু পাবেন। তিনি ভাবছেন, মনে মনে বদলে নিচ্ছেন বক্তব্যকে, হয়তো জোরালো কোনো উপকরণ পেয়ে গেলেন

বক্তৃতার পূর্ব মুহূর্তে। তাছাড়া, বক্তৃতা দিতে দিতেও কিন্তু ভাবা চলে। শ্রোতারা বক্তার কথা খুব মন দিয়ে শুনছেন, উপভোগ করছেন বুঝলে তিনি অনুপ্রাণিতও হন, আর অনুপ্রাণিত হলে আপনা থেকেই সুন্দর কথা তাঁর মুখে আসে।

বক্তৃতার সময় কোনো বিশেষ অঙ্গভঙ্গী বা মুদ্রাদোষ (mannerism) বর্জন করতে হবে। তবে যে-সব মুদ্রা (gestures) বক্তব্যকে জোরালো করে (supporting gestures) এবং অজ্ঞাতেই কথার সহচর হয়ে পড়ে সে-সব মুদ্রায় দোষ নেই। আসল কথা স্বাভাবিকতাই সবচেয়ে বড়ো শিল্প।

ভাষণ ও বাগ্মিতা সম্পর্কে কয়েকটি বিশিষ্ট উক্তি

Eloquence is vehement simplicity.—Richard Cecil (1748-1810), English Clergyman.

Those who would make us feel must feel themselves.—Charles Churchill (1731-1764), English Poet and Satirist

Brevety is a great charm of eloquence.—Cicero (106-43 BC). Roman Orator & Philosopher.

Never rise to speak till you have something to say, and when you have said it cease.—John Wetherspoon (1723-1794), American Clergyman.

An orator or author is never successful till he has learned to make his word smaller than his idea.—Ralph Waldo Emerson (1903-82), American Poet and Essayist

In oratory the greatest art is to conceal art.—Jonathan Swift (1667-1745), Irish Satirist.

Speak that I may see thee.—Ben Jonson (1573-1637), English Dramatist.

কয়েকটি উদাহরণ

১। অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সুস্থ জীবন-চেতনার অভিযান চালাবার উদ্দেশ্যে তোমার পল্লীতে সভা আহ্বান করা হয়েছে। এই বিষয়ে বক্তৃতা ঃ [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

প্রিয় ভাইবোনেরা,

আমরা আবহাওয়া দূষণের কথা বলি, সে-জন্যে সম্ভাব্য ব্যবস্থাও গ্রহণ করি, কিন্তু অপসংস্কৃতি যে ধীরে ধীরে দেশের সমস্ত আবহাওয়াকে বিষিয়ে দিচ্ছে তা আমরা উপলব্ধি করি না।

সাহিত্যে ও চলচ্চিত্রে ব্যাপকভাবে প্রধান মূলধন করা হচ্ছে যৌনচেতনাকে। ব্যতিক্রম এত কম যে, তা অনুল্লেখনীয়। বিজ্ঞাপনে ক্রেতা প্রলুব্ধ করতেও ব্যবহার করা হচ্ছে যৌনচেতনাকে। ফুটপাথে বিক্রি হচ্ছে অভিনেত্রীদের ছবি। রেলিঙের গায়ে ক্যালেণ্ডারের দিকেও তাকানো যায় না। আকাশে-বাতাসে তরল সঙ্গীতের মাতামাতি।

এগুলো যেন নেশা ধরিয়ে মানুষের, বিশেষ করে অল্প বয়সের ছেলেমেয়েদের, আচ্ছন্ন এক অবস্থায় আনছে। এ যেন অসুন্দরের হাতে সুন্দরের বন্ধন। মুনাফালোভীরা নীতিজ্ঞানের দিকে তাকিয়ে কিছু করে না, তারা অশ্লীল অশোভনকেই টোপ হিসেবে ব্যবহার করতে কুণ্ঠিত হয় না। কিন্তু আমরা কি রামমোহন, বিদ্যাসাগর, রবীন্দ্রনাথের দেশের মাটিতে অসুন্দরের দিকে এই গড্ডলিকা প্রবাহে ভেসে যাব? না। আমরা সম্মিলিতভাবে এর বিরুদ্ধে জনমত জাগ্রত করতে চেষ্টা করব। এবং এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। সেই সঙ্গে সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলব। মন্দের প্রভাব যেমন আছে, ভালোর প্রভাবও তেমনি আছে। এই ভালোর প্রবাহকে আমরা বেগবান করে তুলব। তাহলে মন্দ আপনা থেকেই মাথা নত করবে।

২। সাম্প্রদায়িক মৈত্রীর সভায় তোমাকে প্রধান বক্তারূপে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। এই সভায় বক্তৃতা দিতে হবে তোমাকে।

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

আমার প্রিয় হিন্দু-মুসলিম ভাইবোনেরা,

আজকের এই মৈত্রীসভায় কিছু বলবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে কৃতার্থ মনে করছি। এক তরীর যাত্রী আমরা। সবাই মিলে এই তরী রক্ষা করে চলতে হবে দুর্যোগে, তবেই আমরা বাঞ্ছিত কূলে পৌঁছতে পারব; আমাদের ঐতিহ্য সাম্প্রদায়িক ঐক্যের। দীর্ঘকাল ধরে বহু সম্প্রদায় ও ভিন্নধর্মাবলম্বী মানুষ ভারতে পাশাপাশি ভ্রাতৃভাবে বাস করে আসছে। সবাইকে আপন করার জন্যেই ভারতীয় মনীষীরা শুনিয়েছেন—

মিত্রস্যাহং চক্ষুষা সর্বাণি ভূতানি সমীক্ষে।

মুসলিম সংস্কৃতিতেও আছে এই মিলনমন্ত্র—

আল্‌ইন্‌সান আখুন্নাসা।

অর্থাৎ মানুষ মানুষের ভাই।

কিন্তু আমাদের এই ঐক্যবোধ ভাঙতে চেষ্টা করেছে সাম্রাজ্যবাদী শাসকেরা, কারণ তাদের নীতিই হল 'Divide and rule.' আমরা সেই ভুলের ফাঁদে পা দিয়ে তাদেরই উদ্দেশ্য সিদ্ধি করছি। যে ভেদের বীজ তারা রোপণ করে গিয়েছে তা এখনও মরে নি। কখনও কোথাও হয়তো তা থেকে অঙ্কুর দেখা দিতে পারে। কিন্তু আমাদের উচিত হবে তা অঙ্কুরেই বিনাশ করা, বাড়তে না দেওয়া। আমাদের মনে রাখতে হবে সাম্প্রদায়িক ঐক্যই আমাদের সমস্ত উন্নতির মূলে। আমরা জাতিকেই বড়ো করে যেন

দেখি, জাতকে নয়। আমার সবচেয়ে বড়ো পরিচয় আমি ভারতীয়, তারপরে হিন্দু বা মুসলিম বা শিখ। এই অনুভবেই আমাদের পরম কল্যাণ। আসুন, আমরা হাতে হাত মিলিয়ে এক নতুন দিগন্তের দিকে এগিয়ে যাই যেখানে মানবতার মন্দির প্রতিষ্ঠিত।

৩। অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে একটি যুক্তিসমৃদ্ধ অভিভাষণ রচনা কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১

সমবেত ভাইবোনেরা,

অত্যন্ত দুঃখের কথা, উন্নত চেতনার যুগেও আমরা অনেক কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারি নি। এখনও অস্পৃশ্যতা ও জাতিভেদ আমাদের সমাজ-জীবনের কলঙ্ক হয়ে আছে। অথচ 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' এ তো আমাদেরই দেশের মন্ত্র। সর্বভূতে ঈশ্বর—এই অনুভূতি যদি আমাদের থাকে তা হলে উচ্চ-নীচ ভেদবোধ আসবে কেন? তা ছাড়া, সমাজবোধের গোড়ার কথাই হল ঐক্যবোধ। সকলে সকলের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মতো—এই বোধ না থাকলে সমাজ সবল হতে পারে না। বিবেকানন্দ নতুন ভারত গড়ার জন্যে আদ্বিজচণ্ডাল সকলকেই হাত মেলাতে বলেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থনীরে'ই ভারতজননীর অভিষেকের উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। ভেদবুদ্ধি যে সর্বনাশ ডেকে আনবে, এ সম্পর্কে সাবধানবাণীও তিনি উচ্চারণ করেছেন,

যারে তুমি নিচে ফেল সে তোমারে
বাঁধিবে যে নিচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে
পশ্চাতে টানিছে।

এর চেয়ে বড়ো যুক্তি কিছু হতে পারে না। নিজেদের সর্বনাশ নিজেরা ডেকে এনে, নিজেদের কবর নিজেরা খুঁড়ে আমরা নিজেদের বুদ্ধিমান বলে মনে করছি, এর চেয়ে দুঃখের আর কী হতে পারে?

আসুন, আজ আমরা সংকল্প গ্রহণ করি, সমস্ত সঙ্কীর্ণতাকে ভুলে জাতিধর্মনির্বিশেষে একমন একপ্রাণ হয়ে সোনার ভারত গড়ে তুলি; গড়ে তুলি সেই স্বর্গ—

'যেথা তুচ্ছ আচারের মরুবালুরাশি
বিচারের স্রোতঃপথ ফেলে নাই গ্রাসি,
দেশে দেশে দিশে দিশে কর্মধারা ধায়
অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায়।

৪। ১লা মে শ্রমিক সংহতি দিবস উপলক্ষে শোষিত শ্রেণীর প্রতি আহ্বান জানিয়ে একটি অভিভাষণ। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১

প্রিয় শ্রমিক ভাইবোনেরা,

আজ শ্রমিক সংহতি দিবস। সারা বিশ্বের শ্রমিকদের আজ সংহতির শপথ গ্রহণের দিন। শ্রমিকশোষণের সেই ভয়াবহ দিনগুলোকে পিছে ফেলে আমরা যে এগিয়ে চলেছি

তা শ্রমিকদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনেরই ফল। এখনও কায়েমী স্বার্থের কাছে শ্রমিকদের ন্যায্য দাবি অবহেলিত। শ্রমিকস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় শ্রমিকদের একতাকে তাই লৌহদৃঢ় করে গড়ে তুলতে হবে। বন্ধুগণ, আমাদের মনে রাখতে হবে, নগরে-বন্দরে কলে-কারখানায় নিরন্তর পরিশ্রম করে আমরাই সভ্যতাকে ধরে রেখেছি। তাই আমাদের শ্রমের ন্যায্য মূল্য আমরা সঙ্গত কারণেই দাবি করতে পারি। শ্রমপরিচালনায় শ্রমিকের প্রতিনিধিত্বও আমাদের ন্যায্য দাবি।

এই সব দাবি আদায়ের জন্যে আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে কিন্তু নিজেদের কর্তব্যের কথাও আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না। আমরা দেশের সেবক এবং জাতির সেবক। জাতির অগ্রগতির জন্যে আমাদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করতে হবে। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যে যে-সব উদ্যম নেওয়া হচ্ছে তার সঙ্গে আমাদেরও সহযোগিতা করতে হবে। আমাদের দাবির পিছনে তা হলে পূর্ণ জনসমর্থন পাব আমরা।

শ্রমিক সংহতির জয় হোক।
শ্রমিক আন্দোলনের জয় হোক।

৫। আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত সভায় বক্তৃতা।

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

সমবেত সুধিবৃন্দ,

আন্তর্জাতিক শিশুবর্ষ উপলক্ষে 'কল্যাণ-পরিষদে' আয়োজিত এই সভায় আমন্ত্রিত হয়ে আমি আনন্দিত। আপনারা যে শিশুকল্যাণের জন্যে সর্বদাই সচেষ্ট তা আমি জানি। আশা করি শিশুকল্যাণের জন্যে বিশেষভাবে চিহ্নিত এই বর্ষে আপনারা এ বিষয়ে আপনাদের কর্মধারাকে আরও বিস্তারিত করবেন।

আমরা মুখে বলি বটে শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ কিন্তু শিশুর ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার ব্যাপক আয়োজন আমাদের নেই। আমাদের দেশে শিশুমৃত্যুর হার এখনও আতঙ্কর। যারা বাঁচে তারাও অপুষ্টিজনিত নানা রোগে ভোগে, বহু শিশু অন্ধ হয়ে যায়। বহু শিশু নিদারুণ দারিদ্র্যের শিকার হয়ে সমাজবিরোধীদের কবলে গিয়ে পড়ে। শিশু-অপরাধীর সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। হাজার হাজার শিশুকে শ্রমসাধ্য কাজে নিযুক্ত করা হচ্ছে। অথচ এটি আমাদের সংবিধানবিরোধী।

শিশুবর্ষে এই সব সমস্যার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে, কার্যকর কিছু করতে হবে। সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে বেসরকারী প্রচেষ্টাকে যুক্ত করতে হবে। সকলে হাতে হাত মিলিয়ে না চেষ্টা করলে এই বিপুল সমস্যার সমাধান সহজ হবে না। আজ আমাদের শপথ হোক—

যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য করে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

৬। ছাত্রজীবনের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করবার জন্য তোমার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছাত্র-সংসদের উদ্যোগে ছাত্র-সভা আহ্বান করা হয়েছে। এই বিষয়ে বক্তৃতা। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা,

ছাত্রসংসদের পক্ষ থেকে আমি তোমাদের কাছে কিছু বলতে পেরে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি। আমি ভালো বলতে পারি না, তবু চেষ্টা করব, আমার প্রাণের আকুতিটুকু পৌঁছে দিতে।

বন্ধুগণ, আজ আমরা একটা সংকটের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। ছাত্রজীবনেও এসেছে নানা সমস্যা। আর সমস্যা যত জটিল হবে সংহতির প্রয়োজন তত বেশি। মতের পার্থক্য তো হতেই পারে, কিন্তু যে-সব ক্ষেত্রে ছাত্রকল্যাণ জড়িত সে ক্ষেত্রে আমরা যেন এক হতে পারি।

বন্ধুগণ, ছাত্রভর্তির ব্যাপার আজ একটি জটিল সমস্যা। খুব ভালো রেজাল্ট না করলে নিজের স্কুলেই ঠাঁই মেলে না। ভর্তির ব্যাপারে কর্তৃপক্ষ একটা গাণিতিক হিসেব করে সন্তুষ্ট না থেকে যাতে আসল সমস্যাটা উপলব্ধি করেন তার জন্যে আমাদের চেষ্টা করতে হবে।

আর একটি সমস্যার কথা আমি বলব। পরীক্ষার ফল বেরোবার পর বহু ফল incomplete থাকে। এর ফলে বহু বিষয়ে অসুবিধার সৃষ্টি হয়। Incomplete রেজাল্ট যাতে অতি দ্রুত প্রকাশ করা সম্ভব হয় সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে আমাদের।

এবারে আমি আর একটি বিষয়ের কথা বলছি। মাধ্যমিক বা উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলে টিফিনের ব্যবস্থা নাই। আমাদের প্রস্তাব, স্কুল বা কলেজ ক্যান্টিনগুলোকে subsidy দেওয়া হোক যাতে আমরা সস্তায় খাবার পেতে পারি।

বহু ছেলেমেয়েই বই কিনতে পারে না, এ জন্যে স্কুল-কলেজে পৃথক করে Text Book Library করা সম্ভব কিনা সে বিষয়েও কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে।

আমি বিশ্বাস করি, আমাদের ইচ্ছা যদি আন্তরিক হয় এবং ঐক্য যদি দৃঢ় হয় তা হলে আমরা অনেক সমস্যারই সমাধান করতে পারব। ধন্যবাদ।

৭। বর্তমান ভারতে বৃত্তিমুখী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে একটি অভিভাষণ। [ত্রিপুরা উ. মা., ১৯৮০]

সমবেত ভাইবোনেরা,

এই বৃত্তিমূলক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশই বেশি করে অনুভব করা যাচ্ছে। আমাদের দেশে বেকার সমস্যা যে ভয়াবহ রূপ নিয়েছে তাতে বৃত্তিমূলক শিক্ষাক্ষেত্র যত বেশি প্রতিষ্ঠিত হয় ততই মঙ্গল। যারা উচ্চতর বিদ্যাশিক্ষায় যেতে পারল না তারাই যে শুধু বৃত্তিমুখী শিক্ষা নেবে তা নয়। সাধারণ শিক্ষায় শিক্ষিতদেরও কোন বৃত্তিমূলক শিক্ষা গ্রহণ করা প্রয়োজন। এতে আমরা যেমন স্বাবলম্বী হতে পারি, তেমনি পারি

দেশের উৎপাদনবৃদ্ধিতে অংশ নিতে। আমাদের শিক্ষাবিদেরাও সাধারণ শিক্ষার সঙ্গে বৃত্তিমূলক শিক্ষার যোগ ঘটাতে চেয়েছেন। হাতের কাজ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি-উন্মেষেও সহায়ক হয়। সম্প্রতি মাধ্যমিক স্তরে কর্মশিক্ষা প্রকল্প চালু হয়েছে। এই কর্মশিক্ষাকে বৃত্তিমূলক শিক্ষার যোগান বলা যেতে পারে।

ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা ছাড়াও বৃত্তিমূলকশিক্ষায় আনন্দও আছে। মানুষের মধ্যে একটা শিল্পী-সত্তা আছে। সে কিছু গড়ে বা কিছু গড়তে সাহায্য করে আনন্দ পায়।

তাই বলছিলাম, এ শিক্ষাগ্রহণে তরুণদের আগ্রহ যত বাড়বে ততই মঙ্গল। সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে বেসরকারী উদ্যোগ মিলিত হয়ে এ শিক্ষার ক্ষেত্র আরও বিস্তারিত হবে আশা করি।

আমি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটির সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি কামনা করে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

৮। স্বাধীনতাদিবস অনুষ্ঠানে বক্তা হিসেবে একটি ভাষণ।

[ত্রিপুরা, উ. মা., ১৯৮২]

সমবেত সুধীজন ও আমার ছাত্রবন্ধুরা,

আজ স্বাধীনতা দিবসের পুণ্যলগ্নে এই পতাকা উত্তোলন করবার জন্যে আমন্ত্রিত হয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। এই জাতীয় পতাকা আমাদের জাতীয় জীবনের আদর্শ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। আমি সর্বপ্রথমে এই পতাকাকে প্রণাম জানাই।

স্বাধীনতা দিবসের পুণ্য দিনটি আত্মজিজ্ঞাসার দিন। আমরা স্বাধীনতালাভের পর বাঞ্ছিত সিদ্ধির পথে কতটা এগোতে পেরেছি আজ তার হিসেবের দিন এবং সেই সঙ্গে শপথ বা সংকল্প গ্রহণের দিন। বন্দেমাতরম্ বা জয়হিন্দ ধ্বনি আসলে আমাদের সমস্ত উদ্যম ও শ্রমকে দেশমাতৃকার চরণে উৎসর্গ করার সংকল্পেরই প্রতীক। আত্ম-সমালোচনা করলে দেখব আমাদের ঔদাসীন্য, অনুদারতা ও স্বার্থবুদ্ধির জন্যে দেশের কল্যাণ অনেক ক্ষেত্রে বিঘ্নিত হয়েছে। জাতীয় কল্যাণের মূলে আছে জাতীয় সংহতি। এই সংহতিকে সুদৃঢ় করে এগিয়ে চলার ব্রত আমাদের গ্রহণ করতে হবে। স্বাধীনতা-দিবস সেই ব্রত উদ্‌যাপনেরই স্মারক দিবস।

এই দিনটিতে আমরা বিশেষ করে স্মরণ করব সেই অমর শহীদদের যাঁরা ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে বলি—

বন্দীরে দিয়ে গেছ মুক্তির সুধা।
সত্যের বরমাল্যে সাজালে বসুধা।
তোমাদের স্মরি।
মরণসাগরপারে তোমরা অমর
তোমাদের স্মরি।

সেই শহীদস্মরণ আমাদের প্রেরণা দিক, ঐক্যবদ্ধ করুক এবং শুভকর্মে অতন্দ্র করে তুলুক, এই প্রার্থনা।

বন্দেমাতরম্। জয়হিন্দ্।

৯। নূতন প্রধান শিক্ষকের আগমনে সংবর্ধনামূলক অভিভাষণ।
[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

মাননীয় প্রধান শিক্ষক মহাশয়,

আপনাকে আমাদের মধ্যে পেয়ে আমরা আনন্দিত। আপনাকে আমরা সশ্রদ্ধ স্বাগত জানাচ্ছি।

আমাদের বিদ্যালয়টি প্রাচীন। এই বিদ্যালয়ের একটি ঐতিহ্য আছে। স্বনামধন্য অনেকেই এই বিদ্যালয়ে ছাত্র ছিলেন। আমরাও এই বিদ্যালয়ের ছাত্র বলে গর্বিত। আমরা জানি, আপনি, আপনার প্রজ্ঞা, অভিজ্ঞতা ও শ্রম এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে উৎসর্গ করবেন। এ ব্যাপারে আমরা সবসময়ে সম্মিলিতভাবে আপনার আদেশ পালনে তৎপর থাকব। আমরা আপনাকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আপনার সফল কর্মময়জীবন কামনা করছি।

আশীর্বাদ করুন আমরা সকলেই যেন এই বিদ্যালয়ের সুনাম অব্যাহত রাখতে পারি।

১০। আর্তের সেবায় ব্রতী হবার মন্ত্রে তরুণ সম্প্রদায়কে উদ্দীপিত করে আবেগ-মুখর নাতিদীর্ঘ একটি ভাষণ। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা,

তোমাদের এই 'কল্যাণসঙ্ঘে'র প্রতিষ্ঠাদিবসে আমন্ত্রিত হয়ে আমি আনন্দিত। তোমরা পড়ো, তোমরা গড়ো—তোমরা অনেক কিছু করো। কিন্তু ভুলো না, আর্তেরা তোমাদের দিকেই তাকিয়ে আছে, তোমরাই তাদের ভরসা। আর্তদের সেবার মধ্যে দিয়েই তোমরা ঈশ্বরের কর্ম করতে পারবে। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর অজস্র বাণীতে তোমাদের এই আহ্বানই জানিয়ে গিয়েছেন। তোমাদের কাছেই এই আহ্বান বিশেষ করে জানানোর একটা তাৎপর্য আছে। আর সবাই হিসেব করে চলে, সবকিছুতেই আগে লাভের অঙ্ক কষে, শুধু তোমরাই কোনো স্বার্থ বা লোভের দিকে না তাকিয়ে কাজ করতে পার। আর্তের সেবা বড়ো সহজ কাজ নয়, অনেক দিতে হয় সে কাজে, আর কঠিন কাজেই তো তোমাদের রক্ত নাচে। তাই আর্তেরা তোমাদের মুখের দিকেই চেয়ে আছে একথা তোমরা ভুলো না। কী পাবে? বস্তুগতভাবে কিছুই পাবে না, পাবে নিরাবয়ব একটি দুর্লভ বস্তু, যার নাম ভালোবাসা। তোমরা ভালোবেসে তাদের সেবা করবে, প্রতিদানে তারাও দেবে ভালোবাসা। সেই ভালোবাসার স্বর্গে আমি তোমাদের আহ্বান করছি।

১১। তোমরা নিরক্ষরতা-দূরীকরণ-অভিযানে কোন পল্লীতে গিয়েছ। সেখানে দলনেতারূপে সাক্ষরতার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে পল্লীবাসীদের কাছে প্রদেয় তোমার ভাষণ। [ত্রিপুরা উ. মা., ১৯৭৯, নমুনা প্রশ্ন, '৮০-৮১]

পল্লীবাসী ভাই-বোনেরা,

আমরা 'আলোকস্তম্ভ'-সংস্থার পক্ষ থেকে আজ আপনাদের মধ্যে এসেছি সাক্ষরতা

অভিযানের কর্মসূচী নিয়ে। সাক্ষরতার প্রয়োজন বিষয়ে আপনাদের বুঝিয়ে বলবার কিছু নেই, তবু বলব—নিরক্ষরতা যেন জমাটবাঁধা অন্ধকারের মতো। অন্ধকার আমাদের দেখতে দেয় না, নিরক্ষরতাও তাই। আমাদের মঙ্গল কিসে, নিরক্ষরতার জন্যে আমরা ভালো করে বুঝতে পারি না, বন্ধুকেও শত্রু ভেবে ফেলি। আজকের পৃথিবীতে আমাদের সকলের সঙ্গে যুক্ত হতে হবে, সমস্ত সংকীর্ণতাকে দূরে রেখে। সাক্ষরতাই আমাদের সমাজের সহায় হতে পারে। গ্রামের লোকেরা লেখাপড়া শিখে তাদের জ্ঞানের পরিধিকে বাড়িয়ে তুলতে পারবে। কোনো স্বার্থসন্ধানী লোক তাদের অজ্ঞতার সুযোগ নিতে পারবে না। দেশকে গড়ার কাজেও তারা অনেক সক্রিয় অংশ নিতে পারবে। সবচেয়ে বড়ো কথা, জানবার একটা আনন্দ আছে, লেখাপড়া শিখলে জ্ঞানের আনন্দ-নিকেতন তাদের কাছে উন্মুক্ত হবে। আমরা এই গ্রামের লোকদের মধ্যে কিছুদিন থেকে আপনাদের অত্যন্ত আপনজনের মতো আপনাদের সেবা করতে চাই, নিরক্ষরতা-দূরীকরণে আপনাদের সাধ্যমতো সাহায্য করতে চাই। আশা করি আপনারা আমাদের সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবেন। নমস্কার।

১২। তোমাদের বিদ্যালয়ে আন্তঃস্কুল-বিতর্ক-প্রতিযোগিতার উদ্বোধন উপলক্ষে ছাত্রদের পক্ষ থেকে ভাষণ। [ত্রিপুরা উ. মা., ১৯৭৮]

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী, সুধীজন ও ছাত্রবন্ধুরা,

আমাদের আন্তঃস্কুল-বিতর্ক-প্রতিযোগিতার আজ প্রথম দিন। আজ আমাদের আনন্দের দিন। এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের আজ আমাদের মধ্যে পেয়েছি। এই প্রতিযোগিতাকে কেন্দ্র করে একটি মিলনোৎসব গড়ে তোলাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য। বিতর্ক প্রতিযোগিতা আমাদের স্কুলের একটি বিশেষ অঙ্গ। প্রতি বছরে অনুষ্ঠিত আমাদের আন্তঃশ্রেণী-প্রতিযোগিতা ছাত্রদের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সৃষ্টি করে। আমরা অনেক দিন থেকেই ভাবছিলাম আমাদের বিদ্যালয়ে একটি আন্তর্বিদ্যালয়-বিতর্ক-প্রতিযোগিতার আয়োজন করব। এ বছর আমাদের আশা পূর্ণ হল। বিতর্ক-প্রতিযোগিতা আমাদের জ্ঞানচর্চায় অত্যন্ত সহায়ক বলেই আমরা মনে করি। আজ আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যেসব ছাত্র আমাদের এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন তাঁদের আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যে আন্তর্বিদ্যালয় প্রীতি ও সৌভ্রাত্রবোধ জেগে উঠবে তাই হবে আমাদের পরম পুরস্কার।

যাঁরা আমাদের উৎসাহ দেবার জন্য অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছেন তাঁদের আমরা আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। নমস্কার।

১৩। তোমার পল্লীকে হিংসা ও দলাদলি হতে মুক্ত করে শান্তি স্থাপনের প্রয়াসে তুমি বদ্ধপরিকর। —এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য জন-মানসে রেখাপাত করে এমন একটি ভাষণ।

[নমুনা প্রশ্ন, সংসদ ১৯৭৯, উ. মা. '৮১]

আমার পল্লীবাসী ভাই-বোনেরা,

পল্লী যুব-সংঘের পক্ষ থেকে আপনাদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবার সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। আমাদের এই পল্লীতে একদিন বারো মাসে তেরো পার্বণ হত। এঘর ওঘর ছিল এক সুরে বাঁধা। একের বিষাদে অন্যে আসত এগিয়ে। একের আনন্দের শরিক হত সবাই। কিন্তু আজ? বন্ধুগণ, আজ এমন কী হল যাতে আমরা আর একসঙ্গে মিলিত হতে পারছি না, সামান্য ব্যাপারে নিজেদের মধ্যে ভেদের প্রাচীর গড়ে তুলছি। আমাদের পল্লী-জননীর আজ এ কী হাল!

জল নেই, আলো নেই, নেই চিকিৎসার ব্যবস্থা। শিল্প লোপ পেতে বসেছে। এসবের কারণ যাই হোক আমাদের মিলিত প্রয়াসের অভাব যে প্রধান কারণ তা বুঝতে হবে। পল্লীর স্বার্থে আমাদের সমস্ত সংকীর্ণতা ও দ্বেষকে বিসর্জন দিতে হবে। টিউবওয়েল বসানো নিয়ে দুই পাড়ার মধ্যে যে অবাঞ্ছিত দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হল তাতে লাভ হল এই, টিউবওয়েল বসানোর ব্যাপারটাই হল সুদূর-পরাহত। যা হবার তা হয়েছে, সকলকে হাত মেলাতে হবে এবার। আমাদের সম্মিলিত ন্যায্য দাবি কোনো কর্তৃপক্ষই অগ্রাহ্য করতে পারবে না। অনেক সমস্যা আছে আমাদের, একে একে সব কিছুরই সমাধান করতে পারব আমরা, তার জন্যে আমাদের প্রধান মূলধন হবে ঐক্য। ঐ ঐক্যে যেন কেউ ভাঙন ধরাতে না পারে। আমাদের পল্লীমায়ের চোখের জল আমরা মিলিত হাতে মুছিয়ে দেব। আমাদের পল্লীমায়ের মুখে হাসি ফোটাব আমরা।

আজ এই সভায় যেন এই পবিত্র সংকল্প নিতে পারি আমরা। নমস্কার।

১৪। স্কুল বা কলেজের নবীনবরণ উৎসবে নবাগত ছাত্রীদের পক্ষ থেকে ভাষণ। [নমুনা প্রশ্ন, সংসদ, ১৯৮০-৮১]

প্রিয় বোনেরা,

আমরা নবাগতা। আমাদের স্বাগত অভিনন্দন জানাতে তোমরা যে এই উৎসবের আয়োজন করেছ তাতে আমরা অভিভূত। আনন্দ-প্রকাশের কোনো ভাষাই আমাদের নেই, আমরা সমস্ত অন্তর দিয়ে এই আন্তরিকতাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি।

'পাঠশালা—যেন পান্থশালা' শিক্ষককবি কালিদাস রায়ের এই উক্তিটি সত্যই স্মরণীয়। আজ আমরা নতুন, আবার কিছুদিন বাদে আমরাই পুরনো হব। ছেড়ে যাব এই বিদ্যাঙ্গন, আবার নতুনদের হবে আগমন। এই ভাবেই বর্ষে বর্ষে দলে দলে ছাত্রীরা আসবে আবার নির্দিষ্ট সময়ান্তে চলে যাবে, নতুনদের জন্যে স্থান করে দিয়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ের স্মৃতিটুকু তারা সঙ্গে নিয়ে যাবে।

এই দিনটির স্মৃতিও অমর হয়ে থাক আমাদের মনের মণিকোঠায়। এই বরণ-উৎসবে আমরা বুঝলাম আমরা একই গৃহের একটি বড়ো পরিবার। আমাদের সংকোচ মুহূর্তে কেটে গেল। এক সূত্রে বাঁধা পড়লাম আমরা। এই দিনটি তাই আমাদের কাছে নিত্য স্মরণীয়।

এখানে আছেন আমাদের অগ্রজারা, আছেন অনুজারা। আমরা নবাগতা ছাত্রীদের মঞ্চ থেকে সকলকে আমাদের হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসা জানাচ্ছি।

১৫। তোমার পারিপার্শ্বিক গ্রামীণ ও নাগরিক পরিবেশ কীভাবে পরিচ্ছন্ন রাখা উচিত সে বিষয়ে একটি ভাষণ প্রস্তুত কর।

[উ. মা. ১৯৮৪]

মাননীয় সভাপতি, প্রধান অতিথি, সমবেত সুধিবৃন্দ এবং ছোটো ছোটো ভাই-বোনেরা,—

আজ বিশ্বপরিবেশ দিবস উদ্‌যাপন উপলক্ষে আমাদের নবপল্লীর 'মিলন সমিতি' এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে। নবপল্লীর তরুণদের পক্ষ থেকে এই সভায় আমাকে পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার বিষয়ে কিছু বলতে বলায় আমি গর্বিত। আজকের এই দিনটিতেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মানুষ পরিবেশদূষণের হাত থেকে বর্তমান এবং ভবিষ্যতের মানুষকে বাঁচাবার কথা চিন্তা করছে। আমরাও সেই চিন্তায় অংশ গ্রহণ করতে পেরে গর্বিত, আনন্দিত।

পরিবেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক প্রতিদিনের প্রতিক্ষণের। পরিবেশ থেকেই আমরা জীবনধারণের উপকরণ সংগ্রহ করি। জীবনের জন্যে প্রয়োজনীয় খাদ্য এবং অক্সিজেন এ দুটোই পরিবেশের দান। কিন্তু বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেভাবে পরিবেশের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছি এর ফলে প্রকৃতিই তার প্রতিশোধ গ্রহণ করে একদিন মানুষের ধ্বংস এনে দেবে।

কলকারখানার ধোঁয়া, মোটর-ট্রাক-লরির গ্যাস শহর আর পল্লীর বাতাসকে কলুষিত করে চলেছে। সেই সঙ্গে কলকারখানার তেলকালি আর শহরের আবর্জনা নিয়োগের ফলে পল্লী অঞ্চলের নদীনালাও বিষিয়ে উঠছে। ব্যাপকভাবে আজ যে আন্ত্রিক রোগ হার্ট আর লাংসের অসুখ দেখা দিচ্ছে তার কারণও এই পরিবেশদূষণ। এর সঙ্গে আছে শব্দজনিত দূষণ, অর্থাৎ যানবাহনের শব্দ, উচ্চগ্রাম রেকর্ডের গান, মাইক্রোফোনের শব্দ।

অথচ চেষ্টা করলেই আমরা এই পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে পারি। শহর এবং পল্লী অঞ্চলের গাছ কাটা চলবে না। কারণ এরা যে কার্বন গ্রহণ করে আর অক্সিজেন ত্যাগ করে তা আমাদের একান্ত দরকার। পরিত্যক্ত গ্যাস বা আবর্জনার এমন কোনো রূপান্তর দরকার যাতে তা ক্ষতিকারক না হয়। যানবাহন এমন ভাবে তৈরি করতে হবে যাতে শব্দ নিয়ন্ত্রিত হয়। বৃক্ষরোপণকে আরও ব্যাপক ও সুপরিকল্পিত করে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে প্রয়োজন বর্ষায় বাড়তি জল নিকাশের সুব্যবস্থা। একটা কথা মনে রাখতে হবে, প্রকৃতিপীড়ন করা চলবে না, কারণ—

"পীড়ন করিলে সে পীড়ন এসে
পীড়া দেবে তোমাকেই।"

আসুন এই শুভদিনে আমরা পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখার অঙ্গীকার গ্রহণ করি।

১৬। স্কুল বা কলেজের গৃহ ও প্রাঙ্গণ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব

সম্পর্কে ছাত্র, শিক্ষক ও কর্মচারীদের মিলিত সভায় ছাত্রদের পক্ষ থেকে প্রদত্ত একটি ভাষণ রচনা করো। [উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৮২]

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ, বিদ্যালয়ের কর্মিবৃন্দ এবং আমার ছাত্রবন্ধুরা,

আজ আমরা মিলিত হয়েছি বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধির নানা বিষয়ে আলোচনার জন্যে। আমি ছাত্রদের পক্ষ থেকে আমার বিনীত বক্তব্য নিবেদন করছি। আমরা এই বিদ্যালয়ের ছাত্র, এজন্যে আমরা গর্বিত। এই বিদ্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিতে পরিচালক, শিক্ষক, কর্মীদের সঙ্গে আমাদেরও একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আছে তা যেন আমরা বিস্মৃত না হই।

আমি ছাত্রদের পক্ষ থেকে আজ বিশেষ একটি প্রস্তাব করছি। এখন থেকে বিদ্যালয়ের গৃহ ও প্রাঙ্গণ পরিচ্ছন্ন রাখার দায়িত্ব আমরা নিজেরাই গ্রহণ করব। আমাদের বিদ্যালয়ের অনেক কক্ষ এবং প্রাঙ্গণও বহুবিস্তৃত। কিন্তু সবাই মিলে একাজে নামলে অতি সহজে আমরা এ কর্তব্য পালন করতে পারব। প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্ররা নিজেদের শ্রেণীকক্ষ পরিচ্ছন্ন রাখবে, আর বিদ্যালয়-প্রাঙ্গণ ও অলিন্দ আমরা পর্যায়ক্রমে পরিষ্কার রাখার দায়িত্ব নেব। এই বিদ্যালয় আমাদের মন্দিরের মতো। আমরা হলাম পূজারী। এ মন্দির পরিচ্ছন্ন রাখা আমাদেরই পবিত্র দায়িত্ব। আশা করি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও বিদ্যালয়ের কর্মিবৃন্দ আমাদের এই প্রস্তাবে সানন্দ সম্মতি দেবেন এবং আমাদের অন্যান্য কাজের সঙ্গে এই প্রস্তাবিত কাজটিতেও উৎসাহিত করবেন।

আমার পূজনীয়দের প্রণাম ও আমার বন্ধুদের শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি।

১৭। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসবে জনৈক সাহিত্যিকের ভাষণ।

শ্রীরামকৃষ্ণের মূর্তি কল্পনা করতেই মনে পড়ে তাঁর অমৃতকল্প কথাগুলি। সত্যি, কথা নয়, অমৃত। মাটি-জল-মানুষকে গভীরভাবে জেনে, ঈশ্বরকে গভীরভাবে জেনে তিনি যে-সব কথা বললেন তাতে জ্ঞানের সঙ্গে রইল ভালোবাসার উষ্ণ আস্বাদ। চমকে উঠে ভাবতে হয়, এমন করে ভাবি নি তো! সরল বলেই তা সহজ। আর সহজ বলেই মর্মকে স্পর্শ করে। কী উপমা! কী বাগ্‌বৈচিত্র্য! 'সংসার কেমন? যেমন আমড়া—শাঁসের সঙ্গে খোঁজ নেই, কেবল আঁটি আর চামড়া'। 'বাসনাহীন মন কেমন জানো? যেন শুকনো দেশলাই, একবার ঘষলে দপ করে জ্বলে ওঠে।' সত্যি, উপমা শ্রীরামকৃষ্ণস্য। ছাতের উপর উঠতে হলে মই, বাঁশ, সিঁড়ি ইত্যাদি নানা উপায়ে যেমন ওঠা যায়, তেমনি এক ঈশ্বরের কাছে যাবার অনেক উপায় আছে। প্রত্যেক ধর্মই এক-একটি উপায়। কঠিন কথাকে এমন সহজ করে যিনি মনের মধ্যে বাজিয়েছেন তাঁর চেয়ে বড় কথাশিল্পী আর কে?

কথামৃত সত্যিই বাংলা প্রবাদের অন্তর্গত। "আমরা মাটি শুকিয়ে কাঠ হলে তবে পুতুল গড়ি। আমরা দই-পাতা হাঁড়িতে দুধ রাখি। 'আমরা রামনাম করি, আবার

কাপড় সামলাই। খবর পাবার জন্যে উস্‌খুস্‌ করি কিন্তু টেলিগ্রাফের তারের ফুটোটা সারাতে ভুলে যাই। আমরা যে ঘরে রোগী সেই ঘরেই তেঁতুলের আচার রাখি।"

যেমন উপমা, তেমনি প্রবচন, তেমনি আখ্যান।

একজন পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে। তার ফাতনা যখন নড়ছে সে তখন টান মারবার উদ্যোগ করছে।

—মশাই বাড়ুজ্যেদের বাড়ি কোন্ দিকে বলে দিতে পারেন?

কোন উত্তর নেই। হাত কাঁপছে, শুধু ফাতনার দিকে দৃষ্টি। পথিক তখন বিরক্ত হয়ে চলে যাচ্ছে—মাছটাকে টান মেরে ডাঙায় তুলে 'ও মশাই, শুনুন শুনুন' চীৎকার করে পথিককে ডাকতে লাগল।

পথিক তো চটে আগুন। তখন অতবার করে জিগগেস করলুম—আর এখন বলছেন, কী বলছিলেন?

—ভাই, তখন যে ফাতনা ডুবছিল।

ঈশ্বর-তন্ময়তা এর চেয়ে ভালোভাবে বোঝাবে কোন্ কথাশিল্পী।

আজ সেই মহাশিল্পীর উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

১৮। কোনো সভায় শরৎ-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে সভাপতির ভাষণ।

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

সমবেত সুধীজন,

শরৎচন্দ্র সভাভীরু ছিলেন। সভায় দাঁড়িয়ে কিছু বলতে চাইতেন না। শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও তেমনি সভায় দাঁড়িয়ে কিছু বলতেও ইচ্ছে হয় না। একটা গভীর বেদনার্ত ভালোবাসা বুকে নিয়ে স্তব্ধ বিস্ময়ে ভাবতে হয় এই মানুষটির কথা।

দেখলেন, শুনলেন, অনুভব করলেন। অনুভূতির মধ্যে এল উত্তাপ, সেই উত্তাপ রূপ নিল তপ্ত অশ্রুতে। এই তো শরৎচন্দ্র। গৃহবধূ কাজের শেষে শরতে ডুব দেন, অপিস-কাচারিতে ব্যাগের মধ্যে শরৎ থাকে অনেক হরিপদকেরানীর। আর যাঁরা ইন্টালেকচুয়াল তাঁরা শরৎকে নিমেষে নস্যাৎ করলেও কলাকৌশলের জন্যে ধর্ণা দেন ঐ শরৎ-কথাশিল্পের দুয়ারে। আঙ্গিকটা দেখতে অজ্ঞাতেই যান ভিতরে ঢুকে। আচমকা লুকিয়ে ফেলেন বইখানা হঠাৎ—আগন্তুকের দৃষ্টি বাঁচাতে। শরৎ যে আজও আমাদের কত আদরের, কত অপরিহার্য তা কি বুঝিয়ে বলবার অপেক্ষা রাখে? তা হলে এমন কিছু নিশ্চয়ই আছে তার মধ্যে, যা পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই কর্পূরের মত উবে যায় না, মনের গভীরে অলক্ষে চরণ ফেলে চলে।

'তুমি কি তাদের ক্ষমা করিয়াছ তুমি কি বেসেছ ভালো' এই প্রশ্নই তো সমস্ত শরৎ-সাহিত্যের দিগন্তে রক্তচিহ্ন হয়ে ফুটে ওঠে।

আমার মনে হয় শরৎ-সাহিত্য থেকে পাবার অনেক কিছু আছে, শুধু পাঠকদের

নয়, লেখকদেরও। রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশে শরৎচন্দ্র যা লিখেছিলেন শরৎচন্দ্র সম্বন্ধেও সে কথা সমানভাবে প্রযোজ্য :

জগতের নিকট হাত পাতিয়া লইয়াছি অনেক, আবার তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক।

১৯। একটি ভাষণ প্রতিযোগিতায় কোনো ছাত্রের ভাষণ
বিষয় : বিবেকানন্দ জয়ন্তী উপলক্ষে একটি ভাষণ

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী ও আমার প্রিয় ছাত্রবন্ধুরা,

স্বামী বিবেকানন্দের তেজোদৃপ্ত মূর্তিটি আমার মনের মধ্যে অঙ্কিত। মনে হয় কোনো রক্তমাংসে গড়া নয় সে দেহ, যেন তা কান্তি, দীপ্তি আর শক্তির জীবন্ত প্রতীক।

আমাকে অভিভূত করে তাঁর অসঙ্কোচ জিজ্ঞাসু মন। শ্রীরামকৃষ্ণকে তিনি সরাসরি প্রশ্ন করেছিলেন, 'আপনি কি ঈশ্বর দেখেছেন?' শ্রীরামকৃষ্ণও এই খাঁটি হীরেটিকে মুহূর্তেই চিনেছিলেন। আমাকে আকর্ষণ করে তাঁর বিজ্ঞানী মন। বিচার-বিশ্লেষণ দিয়ে যাচাই না করে তিনি কোনো কিছু মানতে রাজী ছিলেন না। এইজন্যেই সমস্ত যুবচিত্ত তাঁর আহ্বানে অমন করে সাড়া দিয়েছিল। যুবশক্তির উদ্বোধন-যে দেশের পক্ষে সর্বাগ্রে প্রয়োজন সে কথা তিনি সমস্ত অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করেছিলেন।

যথার্থ ব্রহ্মবোধ তাঁর ছিল বলেই অমন করে বলতে পেরেছিলেন : 'বল ভাই, মূর্খ ভারতবাসী, দরিদ্র ভারতবাসী, ব্রাহ্মণ ভারতবাসী, চণ্ডাল ভারতবাসী—আমার ভাই।' ঠিক সেই কারণেই 'Brothers and Sisters' সম্বোধনটি তাঁরই মুখে ছিল অত্যন্ত স্বাভাবিক।

আমার চোখে ভাসে তাঁর পরিব্রাজক মূর্তিটি। দেশকে ভালো করে জানবার জন্যেই দরকার এই প্রব্রজ্যা। দেশ আর দেশের মানুষ তা না হলে সমার্থক হয়ে ওঠে না। নতুন ভারত যে খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষের শ্রম থেকেই জন্ম নেবে এ প্রত্যয় ছিল তাঁর অত্যন্ত গভীর—'বেরুক লাঙ্গল ধরে, চাষীর কুটির ভেদ করে, জোলা-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপরির মধ্য থেকে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে।'

'সন্ন্যাসী' শব্দের অর্থ সর্বস্বত্যাগী। সর্বস্ব ত্যাগ করে যথার্থ সন্ন্যাসীরা সর্বস্ব লাভ করেন। সে সর্বস্ব হচ্ছে ঈশ্বরানুভূতি। বিবেকানন্দ এই দিক দিয়ে যথার্থ সন্ন্যাসী। সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে 'ঈশা বাস্যম্'। আর এই ঈশ্বরানুভূতি যার আছে আত্মবিশ্বাস তার আপনা থেকেই আসে। অন্যকেও তিনি আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপিত করতে পারেন : 'বিশ্বাস, বিশ্বাস, বিশ্বাস—নিজের উপরে বিশ্বাস—ঈশ্বরে বিশ্বাস ইহাই উন্নতির একমাত্র উপায়'।

বিবেকানন্দের মূর্তিটি মনে করা মাত্রই এই বিশ্বাস আমাকে উদ্দীপিত করে। মনে পড়ে তাঁর নতুন ধর্মের বাণী—যে নিজেকে বিশ্বাস করে না, সেই নাস্তিক।

২০। নজরুল জয়ন্তী উপলক্ষে ভাষণ রচনা করো। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

সমবেত সুধীবৃন্দ,

আজ ১১ই জ্যৈষ্ঠ—কবি নজরুল ইসলামের জন্মদিন। শৈশবে দারিদ্র্যের আগুনে-পোড়া সেই দুখু মিঞা একদিন হয়ে উঠলেন বিদ্রোহী কবি। হ্যাঁ, বিদ্রোহী নামটিতেই তাঁর আসল পরিচয়। ধূমকেতুর মতোই তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন বাংলার কাব্যাকাশে। রবি তখন মধ্যগগনে ভাস্বর। কিন্তু এই আগন্তুক কবিকে সেদিন স্বাগত জানিয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ—

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু।

'ধূমকেতু' অবশ্য ছিল বিদ্রোহাত্মক একটি পত্রিকা। নজরুল ঐ কাগজের নামের সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গিয়েছিলেন।

নজরুল বিদ্রোহী কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে? অন্যায়ের বিরুদ্ধে, শোষণের বিরুদ্ধে, সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে।

নিপীড়িত জনগণের বেদনা মর্মে মর্মে অনুভব করে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়েছিলেন, তাঁর এই অশ্রুই রূপ নিয়েছিল বজ্রগর্ভ কবিতায়—

বন্ধু গো, আর বলিতে পারি না, বড়ো বিষজ্বালা এই বুকে,
দেখিয়া শুনিয়া ক্ষেপিয়া গিয়াছি, তাই যাহা আসে কই মুখে।
রক্ত ঝরাতে পারি না তো একা, তাই লিখে যাই এ রক্ত লেখা,
বড়ো কথা বড়ো ভাব আসেনাক' মাথায়, বন্ধু, বড়ো দুখে!
অমর কাব্য তোমরা লিখিও, বন্ধু যাহারা আছ সুখে!

আজ সেই অগ্নিবীণা স্তব্ধ। কিন্তু তার ঝঙ্কার সকলের মনে-প্রাণে। এই উৎসবের দিনে আমরা প্রণাম নিবেদন করি সেই দরদী কবির উদ্দেশ্যে, দেশের মাটি ও দেশের মানুষ ছিল যাঁর প্রাণের চেয়ে প্রিয়। নমস্কার।

২১। সুকান্ত-জয়ন্তী উপলক্ষে ভাষণ রচনা করো।

সমবেত সুধীজন,

আজ ৩১-এ শ্রাবণ। কবি সুকান্তের জন্মদিন।

'সব চেয়ে যে পরে এসেছিল
সেই গিয়েছে সবার আগে সরে'

—আমাদের দুর্ভাগ্য এই প্রতিভাবান কবি কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনের দ্বার-প্রান্তে এসেই লোকান্তরিত হলেন। স্বল্প সময়ে এবং অতি অল্প বয়সে তিনি যা লিখেছেন তা বাংলাকাব্যের সম্পদ হয়ে থাকবে। বিদ্রোহাত্মক মনের সঙ্গে রোমান্টিক মনের এক অদ্ভুত মিলনে তাঁর কবিতা অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। অবিস্মরণীয় তাঁর 'রানার', অবিস্মরণীয় তাঁর 'একটি মোরগের কাহিনী', অবিস্মরণীয় তাঁর 'রাস্তার ধারের উলঙ্গ ছেলেটির জন্যে শীতের সূর্যের কাছে আলোর প্রার্থনা।'

অবাক পৃথিবী অবাক করলে তুমি
জন্মেই দেখি ক্ষুব্ধ স্বদেশভূমি।

—এই বিক্ষুব্ধ চেতনাই কবিকে অঙ্গীকারে সুদৃঢ় করেছে—

যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল।
এ বিশ্বকে এ শিশুর
বাসযোগ্য করে যাব আমি।
নবজাতকের কাছে
এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।

আজ সুকান্তের জন্মদিনে এই হোক আমাদেরও অঙ্গীকার। নমস্কার।

২২। গান্ধী-জয়ন্তী উপলক্ষে একটি ভাষণ রচনা করো।

সমবেত সুধীবৃন্দ,

আজ ২রা অক্টোবর। মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিন।

মহাত্মা বিশেষণটি রবীন্দ্রনাথই গান্ধীর নামের আগে যুক্ত করেছিলেন। সত্যি, এই বিশেষণটিতেই তাঁর পরিচয় বিধৃত। সমগ্র জাতিকে এক মহামন্ত্রে দীক্ষিত করে অহিংসা ও সত্যাগ্রহের অস্ত্র নিয়ে তিনি অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি সত্যিই দুর্গম গিরি কান্তার মরু লঙ্ঘন করে জাতিকে স্বাধীনতার তোরণদ্বারে পৌঁছে দিয়েছিলেন। মত ও পথের বিভিন্নতা থাকতে পারে কিন্তু তিনি যা সত্য বলে মনে জেনেছিলেন তাঁকে আমরণ আঁকড়ে ছিলেন। সমাজে যারা উপেক্ষিত অবহেলিত তাদের জন্যে এমন গভীর অনুভূতি এবং কর্মোদ্যোগ কজন নিয়েছেন?

জীবনে দ্বন্দ্ব ও ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে তিনি যে মূল্যবোধগুলি লাভ করেছিলেন সেইগুলিই তিনি জনগণের মধ্যে জাগিয়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। আসলে তাঁর হাতিয়ার ছিল এই মূল্যবোধগুলি। কোনো রাজনৈতিক নেতা শুধু তাঁর কূটনৈতিক সাফল্যের জন্যে 'মহাত্মা' আখ্যা পেতে পারেন না, যদি কোনো মহৎ জীবনাদর্শ তিনি না তুলে ধরতে পারেন। গান্ধীজীর নীতি ছিল তাঁর জীবনসত্যের সঙ্গে অভিন্ন। তিনি আমাদের জাতীয় সত্তাকে মানবতার পতাকা হিসেবেই প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন, সেইখানেই তাঁর সবচেয়ে বড়ো সাফল্য।

আজ সেই মহাত্মার উদ্দেশ্যে নিবেদন করি আমাদের মিলিত শ্রদ্ধাঞ্জলি।

২৩। রবীন্দ্র-জয়ন্তী-উৎসব উপলক্ষে ছাত্রদের পঠিত একটি ভাষণ।

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১ ; ত্রিপুরা ১৯৮১]

সমবেত সুধীবৃন্দ,

চির নূতনেরে দিল ডাক
পঁচিশে বৈশাখ।

কবি কোন্ গূঢ় অর্থে 'চির নূতন' কথাটি ব্যবহার করেছেন জানি না, আমরা

রবীন্দ্রনাথকেই 'চির নূতন' বলি, তিনি নিত্য-উদ্দীপক বলে। তাঁর মূর্তিটি মনে হলেই পাই প্রেরণা, তাঁর বাণী আনে নতুন উদ্দীপনা। যে-গান যে-বাণী তিনি দিয়ে গেছেন তা হল মন্ত্র। এই মন্ত্রে আমরা জগৎকে নতুন চোখে দেখি, এই মন্ত্রে আমরা সমস্ত জড়তাকে দূর করে সম্মুখ পানে চলি। ধূপধূনার মেদুর পরিবেশে প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করে রবীন্দ্র-উপাসনা না করলেও ক্ষতি নেই। তাঁর গান কণ্ঠে নিয়ে পথে পথে বেরুতে পারে নতুন মিছিল, যে গানে আছে অন্ধকার থেকে আলোকের পথে যাবার ইশারা।

যুবচিত্তে রবীন্দ্রনাথ চির অম্লান।

'চির যুবা তুই যে চিরজীবী প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি'।

এই অফুরান প্রাণ ছড়াবার আহ্বান যাঁর, তিনিও চিরযুবা, তিনিও চিরজীবী। সেই চিরজীবী রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যে আমাদের মিলিত প্রণাম নিবেদন করে আজ আমরা শপথ নেব অজস্র সহস্রবিধ চরিতার্থতায় উৎসারিত হতে।

২৪। ডেভিড হেয়ারের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে কোনো বিদ্যালয়ে আয়োজিত অনুষ্ঠানে কোনো শিক্ষাব্রতীর ভাষণ।

সমবেত সুধীজন,

আজ যে মহাত্মার স্মরণে আমরা মিলিত হয়েছি প্রথমে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রণাম নিবেদন করি।

একটি সংস্কৃত শ্লোকে এদেশীয় কোনো পণ্ডিত যে-পাঁচজন বিদেশীকে নিত্য স্মরণীয় বলে বর্ণনা করেছিলেন তার মধ্যে হেয়ার সাহেবের নাম ছিল সর্বাগ্রে। সত্যি, তিনি নিত্য স্মরণীয়।

সুদূর স্কটল্যাণ্ড থেকে এদেশে ঘড়ির ব্যবসা করতে এলেন, ব্যবসায়ে লক্ষ লক্ষ টাকা অর্জন করলেন। কিন্তু অর্থের কোনো প্রলোভনই তাঁকে বাঁধতে পারল না। সারাজীবন এদেশেই কাটিয়ে সমস্ত অর্থ আর সমস্ত শক্তি তিনি এদেশের মানুষের জন্যেই উৎসর্গ করে গেলেন।

সেই পুরনো দিনের কলকাতার দিনগুলিতে ফিরে যাই আমরা। হেয়ার সাহেবের গাড়ি চলছে। আর তার পিছনে পিছনে ছুটছে ছোটো ছোটো ছেলেরা : 'সাহেব, আমাদের ইস্কুলে ভর্তি করে দাও। সাহেব, আমাদের ক্ষিদে লেগেছে।' হেয়ার সাহেব নিজে হাতে খাওয়াচ্ছেন গরিব ছেলেদের, এ দৃশ্য তখনকার কলকাতায় কে না দেখেছে? হেয়ার সাহেব গরিব ছেলেদের পড়ার ব্যবস্থা করেই শুধু ক্ষান্ত হন নি, পড়ার অসুবিধেগুলি দূর করতেও এগিয়ে গিয়েছেন। কোনো ছেলে কোনো আপত্তিকর আমোদপ্রমোদে মশগুল হয়েছে দেখলে হেয়ারসাহেব তাকে পাঁজাকোলা করে সেখান থেকে নিয়ে গেছেন। দরিদ্র বিধবার দুয়ারে দাঁড়িয়ে ছেলের পড়াশোনার খোঁজ নিয়েছেন। এসব ছিল প্রতিদিনের কর্মব্রত। তাঁর চেষ্টাতেই তাঁর নিজের দেওয়া জমিতে হিন্দু কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অসংখ্য বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে সেগুলির আর্থিক দায়িত্ব তিনিই বহন করেছিলেন।

যে দুয়ারে নেই আলো
সেথা দীপ কে জ্বালালো
কে এল কঠিন পথে বিধাতার বরে ?

আমাদের বন্ধু মহাপ্রাণ ডেভিড হেয়ার। ঘড়ির কাঁটার গতির ইঙ্গিতটি তাঁকে ভারতের অগ্রগতির কথাই ভাবিয়ে তুলেছিল। তাই শেষপর্যন্ত ঘড়ির ব্যবসা তুলে দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গিত করেছিলেন এ দেশের শিক্ষাবিস্তারের কাজে।

আমাদের জন্যে তিনি আলোয় বাণী রেখে গেছেন। আমরা শিক্ষার আলো দীনতম কুটীরেও পৌঁছে দেব—আজ ডেভিড হেয়ারের দ্বিশত জন্ম-জয়ন্তীতে এই হোক আমাদের মিলিত সঙ্কল্প।

২৫। বিদায় অভিনন্দন—কোনো শিক্ষককে

শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও উপস্থিত সহকর্মিবৃন্দ,

আজ আমরা সুমন্তবাবুর বিদায় অভিনন্দনকে কেন্দ্র করে সবাই আপন-আপন ভবিষ্যতের মুখোমুখি হয়েছি। একদিন, ব্যক্তিবিশেষে অবশ্যই ভিন্ন দিন আসছে যেদিন এতদিনের চেনামুখগুলিকে ছেড়ে যেতে হবে। হঠাৎ যখন বাঁধন কাটার সময় আসে, তখন বুঝি, বাঁধনটা ছিল নাড়ীর।

'তবু যেতে দিতে হয়।'

অবকাশ মূল্যবান,—অবসর মধুর,—কিন্তু তা শর্তসাপেক্ষ। আজীবন যিনি শিক্ষক, তিনি অবসরকেও সাধারণত নিজের করে পান না।

তবু অনেক সময়েই জীবনের শ্রেষ্ঠ ফসল ফলে অবকাশ বা অবসরের ক্ষেত্রে। সূর্যের বিদায়কালীন বর্ণচ্ছটার মনোহারিত্ব সর্বাধিক।

যাই হোক, সুমন্তবাবু যাচ্ছেন ; চল্লিশ বছরের শিক্ষকজীবনে এই ভূগোলশিক্ষক ছেলেমেয়েদের পৃথিবীর ঠিকানা দিয়েছেন, নদ-নদী, পাহাড়-পর্বত চিনিয়েছেন, ঘুরিয়েছেন তাদের ভুবনের ঘাটে ঘাটে। তাদের অনেকেই আজ কৃতী, সুপ্রতিষ্ঠিত—এবং অবশ্যই তাঁর অদৃশ্য প্রভাবে প্রভাবান্বিত। শিক্ষক, বিশেষত সুমন্তবাবুর মতো জাত শিক্ষক, তাঁর প্রভাব-যে কোথায়, কীভাবে ছড়িয়ে রাখেন, তা আমরা নিজেদের দিকে তাকালেই বুঝতে পারব।

নিজের বিষয়ে তাঁর দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য সুবিদিত। ছেলেদের দিকে চোখ রেখে বোর্ডে পৃথিবীর যে-কোন অংশকে ফুটিয়ে তোলা,—চোখে না দেখলে ভাবতাম কল্পকাহিনী। অন্যান্য বিষয়েও তাঁর পাণ্ডিত্যের বিনয়মণ্ডিত প্রকাশ প্রায়শই চোখে পড়েছে। সর্বাধিক অনুসরণযোগ্য মনে হয়েছে তাঁর জ্ঞানস্পৃহা। উনি বোধ হয় আজও বিদ্যালয়-পাঠাগারের বই সঙ্গে এনেছেন জমা দিতে। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা গুণাবলীর কথা অন্যান্য বক্তারা, যাঁরা তাঁকে সময়ের কষ্টিপাথরে যাচাই করার সুযোগ পেয়ে জেনেছেন যে তিনি নিখাদ সোনা—তাঁরা বলুন। আমি শুধু তাঁর একটি বিরলদৃষ্ট বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করব। বয়স তাঁর বেড়েছে,—এখন তিনি পৃথিবীকে আমাদের দ্বিগুণ সময় ধরে

দেখার দাবিদার,—সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে তাঁর অভিজ্ঞতা,—তবু কিমাশ্চর্যম্,—আমরাও তাঁর বন্ধু!

না, শুধুমাত্র সহকর্মীর প্রাপ্য সমমর্যাদা নয়,—আক্ষরিক অর্থে বন্ধুত্ব! বয়সের, অভিজ্ঞতার দুস্তর ব্যবধান তাঁর কাছে কোনো বাধা নয়। ঐ রকম মানসিক সামঞ্জস্যবিধান সত্যিই সচরাচর দেখা যায় না।

তাঁর সুমধুর, কর্মময় অবসর-জীবন কামনা বাহুল্যমাত্র—কারণ তাঁর চোখে বিস্ময় ফুরোয় নি,—সেদিন পর্যন্ত তিনি ভারতবর্ষের দুর্গমতম অঞ্চলে ছুটে বেড়িয়েছেন 'বিস্মিত' হতে। সুতরাং পৃথিবী তাঁর চোখে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সুন্দর, সুমধুর থাকবেই।
ধন্যবাদ।

২৬। বিদায় অভিনন্দন সভা—শিক্ষকের প্রতিভাষণ

শ্রদ্ধেয় সভাপতি ও সহকর্মিবৃন্দ,

জীবনের একরঙা সময়ে কেউ কেউ হঠাৎ রঙীন নক্সা এঁকে দেন,—বেঁচে থাকাটা হয়ে ওঠে দামী; আজকের অনুষ্ঠান তারই শেষতম সংযোজন।

ভাবতে অবাক লাগছে, যে ছকেবাঁধা দিনগুলো সময়বিশেষে ক্লান্তিকর মনে হয়েছে,—সকাল থেকে বারবার ঘড়ি দেখে ভেবেছি সময় শত্রুতা করছে। তার থেকে,—সেই বহমান ধারা থেকে কত নিঃশব্দে সরে গেলাম।

সময় অবশ্য তার শত্রুর ভূমিকা বদলায় নি,—সে এবার চেষ্টা করবে বোঝা হতে; তবে ভরসা এই যে সে মহৎ শত্রু,—সদ্ব্যবহারে নতি স্বীকার করে। আমাকে সেই চেষ্টা করতে হবে।

চল্লিশ বছর কাটালাম এখানে। এই দীর্ঘ সময়ের হিসেব-নিকেশ করতে অনেক সময় লাগার কথা; তা সত্ত্বেও এটুকু নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পাওয়ার পাল্লাটাই ভারী। বহু মহৎ প্রাণসম্পদের সান্নিধ্যে ধন্য হয়েছি, নিজের অনেক অপূর্ণতা দূর হয়েছে। এই সুদীর্ঘ সময়ে হয়তো কিছু কিছু অবাঞ্ছিত ঘটনাও ঘটেছে,—সে ক্ষেত্রে যদি অনুচিত কিছু আমার দ্বারা ঘটে থাকে,—তার জন্যে আজ আমি আপনাদের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।

যাই হোক, স্কুলে আমার ছুটির ঘণ্টা বেজে গেছে। আপনারা রইলেন, নবীন কেউ যোগ দেবেন আপনাদের সঙ্গে। আর যে-ক'দিন আছি আমিও রইলাম আপনাদের সঙ্গে; যত দূরেই থাকি না কেন, ঠিক সময়ে ঘণ্টা শুনব স্কুলবাড়ির—ঢং ঢং ঢং।

আমার আজকের দিনের আর-একটি উপলব্ধির কথা শোনাই আপনাদের,—আমার বারবার মনে হচ্ছে, এ জীবনটায় দুঃখ নেই; বরং তৃপ্তি আছে। জীবনটা মরা ফাইল ঘেঁটে না কাটিয়ে জীবন্ত মানুষ নিয়ে কাটানোর ফলে প্রতিদিন বাঁচার স্বাদ,—তা হয়তো কখনও মধুর, কখনও তিক্ত,—তবু তা পেয়েছি তীব্রতর ভাবে।

আরও কিছুদিন হয়তো থাকব বেঁচে, কেমন ভাবে—ভাবি না ; তবে চেনা জীবনটা আর রইল না,—নতুন জীবনের কাছে এই মুহূর্তে খুব বেশি প্রত্যাশা রাখি না,—মা ফলেষু। আমার আজকের পরিতৃপ্তি, বিষণ্ণতা, আবেগ—কোনো কিছুই আমি ঠিকমতো প্রকাশ করতে পারছি না,—নিজেকে এ জন্যে বড়ো দীন মনে হচ্ছে—অথচ এ কথাও আমিও অত্যন্ত স্পষ্ট করে বুঝেছি যে, আপনারা আপনাদের হৃদয়ের উষ্ণতা দিয়ে আজ আমাকে অনেক দৈন্য থেকে চিরজীবনের মতো মুক্তি দিয়েছেন।

আমি অভিভূত।

আপনারা আমার নমস্কার গ্রহণ করুন।

২৭। তোমাদের বিদ্যায়তনের জনৈক শিক্ষক মহাশয় তাঁর সাহিত্যকর্মের স্বীকৃতি-স্বরূপ সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করেছেন। তাঁর সংবর্ধনা উপলক্ষে একটি অভিভাষণ। [উ. মা. ১৯৮০]

শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী ও আমার ছাত্রবন্ধুরা,

আজ আমাদের আনন্দের দিন,—ঐতিহাসিক দিনই বলব। আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষক অমলেন্দু বসু তাঁর সাহিত্যকৃতির জন্যে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন। এই পুরস্কার অমলেন্দুবাবুর অধ্যয়ন, ও নিরন্তর অনুশীলনের ফল। পুরস্কার আসলে স্বীকৃতি। অমলেন্দুবাবু আমাদের বিদ্যালয়ের শিক্ষক। তাঁর এই দুর্লভ সম্মানে আমাদের বিদ্যালয়ের সকলেই সম্মানিত।

অমলেন্দুবাবু আমাদের যে পাঠ দেন, তা পাঠ্য ছাড়িয়ে আমাদের অনেক দূরে নিয়ে যায়, নিয়ে যায় এক আনন্দ-অঙ্গনে। তাঁর পাঠদান থেকে আমরা জ্ঞানের সঙ্গে পাই আনন্দ ও প্রেরণা। আমাদের সর্বদাই মনে হত অমলেন্দুবাবু বৃহত্তর ক্ষেত্রের মানুষ। আমাদের সেই উপলব্ধি আজ সত্য বলে প্রমাণিত হল এজন্যেও আমরা আনন্দিত।

অমলেন্দুবাবুকে সম্মান জানানোর উপযোগী ভাষা আমাদের নেই। তা ছাড়া, উদ্বেলিত আনন্দের ধর্মই এই যে ভাষাকে স্তব্ধ করে দেয়।

আমরা, ছাত্ররা, অমলেন্দুবাবুকে অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং আমাদের প্রণাম নিবেদন করছি।

২৮। পল্লীঅঞ্চলে পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় প্রধান অতিথির ভাষণ।

মাননীয় সভাপতি ও উপস্থিত সুধীমণ্ডলী,

অনাদি কালের জ্ঞানসাধনার যে মহান উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা জন্মেছি,—তার উন্নতিবিধান যাঁরা করেছেন,—তাঁরা ক্ষণজন্মা,—আর আমরা আর কিছু না পারি তাঁদের জানার এবং জানানোর চেষ্টাটুকু যদি করি,—তবু সাধ্যানুযায়ী দায়িত্ব পালনের সান্ত্বনা থাকে।

এই সুদূর গ্রামাঞ্চলে যাঁরা এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করলেন, তাঁরা নিশ্চয়ই দায়িত্বপালনের তাগিদ অনুভব করেছেন,—এ জন্যে তাঁরা ধন্যবাদার্হ ; তাঁদের প্রচেষ্টার বাস্তব রূপায়ণ এই পাঠাগারে,—এর শ্রীবৃদ্ধি হোক।

আমাদের দেশে, বিশেষত, পল্লীঅঞ্চলে, সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাধি অশিক্ষা। সাক্ষরের সংখ্যা এ দেশে আজও শতকরা সাতাশ জনের ওপরে নয়। উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন যে, এই সংখ্যার প্রায় সবটাই শহরবাসী। ফলে গ্রামাঞ্চলে পাঠাগার স্থাপনের সঙ্গে অনেক সম্পর্কিত দায়িত্ব এসে পড়ে। তার প্রথম দায়িত্ব পাঠক গড়ে তোলা।

কথাটি দুটি অর্থে প্রযোজ্য—প্রথমত, যাঁরা পঠনক্ষম তাঁদের পাঠ্যবিষয় নির্বাচনে রুচি গড়ে তোলা, আবার যাঁরা নিরক্ষর, তাঁদের সাক্ষর করা, পঠনক্ষম করে তোলা এবং শেষ পর্যন্ত যথার্থ পাঠকে পরিণত করা। এই গুরু দায়িত্ব পাঠাগারকে বহন করতে হবে। এ জন্যে যাবতীয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ,—যেমন, ধরা যাক, সান্ধ্য বিদ্যালয় স্থাপন, আলোচনা সভা ইত্যাদি করতে হবে।

গ্রামবাসীদের জীবিকা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন সংক্রান্ত পড়াশোনার অভ্যাস গড়ে দিয়ে তাদের উন্নতির বাস্তব পথ উন্মুক্ত করে দেওয়াও পাঠাগারের পক্ষে সম্ভব।

প্রাচীন ভারতে লোকশিক্ষার বিবিধ পন্থা ছিল ; তার প্রমাণ বুদ্ধদেব, শঙ্করাচার্যের শিক্ষা ও প্রভাবের দেশব্যাপী বিস্তার। পরবর্তী কালেও রামায়ণ গান, কথকতা, কবির লড়াই ইত্যাদি লোকশিক্ষার কাজ করেছে। কিন্তু আধুনিক সভ্যতা ও শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষার এই মাধ্যমগুলি ক্রমশ লুপ্ত হতে থাকে এবং শিক্ষা ক্রমশই সঙ্কীর্ণ সীমায় আবদ্ধ হয়ে পড়ে।

শিক্ষার বিকিরণপরিকল্পনায় পল্লী অঞ্চলের গুরুত্ব ক্রমশ বাড়ছে। পাঠাগার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এ ব্যাপারে আমরা অনেক এগিয়ে যেতে পারব। আপনাদের এ নবপ্রতিষ্ঠিত পাঠাগারটি অন্ধকারে প্রদীপের মতো জ্বলুক এই প্রার্থনা। —নমস্কার

২৯। পুরস্কার বিতরণীসভায় সভাপতির ভাষণ

মাননীয় প্রধান অতিথি, শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী ও উপস্থিত ছাত্রবৃন্দ !

এ ধরনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার আন্তরিক ইচ্ছা আমার সব সময়েই থাকে। কারণ জীবনের সবটাই যে তামাদি হয়ে যায় নি, বিপুল সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ যে আছে—ছাত্রদের মাঝখানে এলে তা অনুভব করা যায়। তাই আজ এখানে উপস্থিত হতে পেরে আমি আনন্দিত।

ছাত্রদের অনুষ্ঠান খুবই উপভোগ্য হয়েছে,—তবে এ কথারও আমি সপ্রশংস উল্লেখ করতে চাই যে, এই অনুষ্ঠান বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়েছে সুশৃঙ্খল পরিচালনায়। ছাত্রদের এই কৃতিত্ব সত্যি বিরল। পুরস্কার এদিক থেকে বিদ্যালয়ের সকলেরই প্রাপ্য। অবশ্য সাফল্যই তো পুরস্কার। আর সফল তোমরা হয়েছ। তবু কৃতিত্বের নিরিখে আজ কেউ পুরস্কার পাবে,—কেউ পাবে না। দায়িত্ব কিন্তু দু' তরফেই থেকে যাবে,—যারা পুরস্কার পেলে তাদের দায়িত্ব হবে সে পুরস্কার অর্থাৎ সেই অর্জিত কৃতিত্বকে বজায় রাখা আর যারা এ বছর পেলে না তাদের দায়িত্ব হবে পুরস্কার-লাভের জন্যে প্রয়োজনীয় কৃতিত্ব অর্জন করা। প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে ?—শুধু লক্ষ্য রাখতে হবে, এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা যেন কখনই অস্বাস্থ্যকর হয়ে না ওঠে।

গড়ে ওঠার জন্যে কাজ করছ তোমরা, শুধু নিজে গড়ে ওঠা নয়, সবাই মিলে গড়ে ওঠা ; সুতরাং প্রচেষ্টা, কাজ, সবই হবে সহযোগিতামূলক, যৌথ,—শুধু শ্রেষ্ঠ ফসলের জন্যে সঠিক, সর্বাধিক ক্ষমতা যথাযোগ্য ক্ষেত্রে নিয়োগ করার দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। তবেই সুসমঞ্জস বৃদ্ধি সম্ভব।

আর বৃদ্ধি, উন্নতি যদি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়,—তবে তা কখনই স্বাভাবিক, শোভন বা কাম্য নয়। তোমরা বড়ো হচ্ছ এক আশ্চর্য সময়ে—একদিকে গ্রহগ্রহান্তরে পাড়ি দেবার প্রতিশ্রুতি,—দারিদ্র্যজয়ের সুদৃঢ় সঙ্কল্প,—অন্য দিকে সভ্যতা ধ্বংসের পরোয়ানা। মনে রেখো, এ সময়ে কল্যাণের এবং সুন্দরের শাশ্বত দীপ জ্বালার ভার তোমাদের হাতেই রয়েছে। মানুষের জন্যে অন্তহীন মঙ্গলের পথ উন্মুক্ত করবে তোমরাই।

সেদিন তোমাদের সকলের জন্যে অপেক্ষা করবে আজকের থেকে অনেক বড়ো পুরস্কার, —তা' হল মানুষের আশীর্বাদ,—তাকে নতমস্তকে গ্রহণ করার যোগ্য হয়ে ওঠ তোমরা—এই আমাদের আকুল প্রার্থনা।

৩০। বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্রদের অভিনন্দন

[প্রধান শিক্ষকের ভাষণ]

উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ আমাদের বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রকে অভিনন্দন জানাতে আমরা আজ সমবেত হয়েছি। এদের মধ্যে দু'জন যথাক্রমে প্রথম ও তৃতীয় হয়েছে এবং বাকি সাতজন স্টারমার্ক্‌স্ পেয়েছে। এদের গৌরবে আমরা ছাত্র-শিক্ষক সকলেই গৌরবান্বিত বোধ করছি।

কৃতী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বলছি, তোমাদের কৃতিত্ব তোমাদেরই অনুসন্ধিৎসা, অনুশীলন আর অধ্যবসায়ের মিলিত ফল। শিক্ষকেরা তোমাদের ভিতরের শক্তিটুকুকে উদ্বোধিত করতে সাহায্য করেছেন। সেই উদ্বোধিত শক্তির সঙ্গে শ্রমের যথাযথ মিলনেই আজ তোমাদের এই কৃতিত্ব। তোমাদের বিদ্যানুশীলনের যথার্থ আবেষ্টনী হয়তো আমরা গড়ে তুলতে পারি নি। পাঠের বিঘ্ন নানা সূত্রেই ঘটেছে। পৃথকভাবে তোমাদের জন্যে যতটা দৃষ্টি দেওয়া উচিত ছিল, নানা কারণে আমরা হয়তো তা দিতে পারি নি। তাই বলব, অনেক প্রতিবন্ধকতার মধ্যে যেটুকু সাফল্য তোমরা অর্জন করেছ তার অনেকটাই তোমাদের স্বোপার্জিত।

আমরা আশা করব, উচ্চতর শিক্ষায় তোমরা উজ্জ্বলতর সাফল্য অর্জন করবে। তোমরা যেখানেই থাকো যত বড়োই হও, আশা করি জননীস্থানীয় এই বিদ্যালয়কে তোমরা কখনো ভুলবে না। শুধু বিদ্যালয়ের পুনর্মিলন উৎসবেই নয়, সময়-সুযোগ পেলেই তোমরা স্কুলে আসবে, মাস্টারমশাইদের সঙ্গে দেখা করবে, বিদ্যালয়ের উন্নতিবিধানে তোমরাই সুপরামর্শ দেবে। বিদ্যালয়ের সঙ্গে তোমাদের সম্পর্ক যেন হয় অবিচ্ছেদ্য।

শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।

৩১। অভিনন্দিত কৃতী ছাত্রদের পক্ষ থেকে একজনের প্রতিভাষণ

মাননীয় প্রধানশিক্ষক, শিক্ষকমণ্ডলী ও ছাত্রবন্ধুগণ,

আমি প্রথমেই পূজনীয় শিক্ষকবৃন্দকে প্রণাম জানাই এবং ছাত্রবন্ধুদের জানাই প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আমাদের বিশেষভাবে আহ্বান করা হয়েছে বলে সত্যি বলছি, আমরা অত্যন্ত সঙ্কোচ বোধ করছি। আমরা সাধারণ ছাত্র মাত্র, অন্যান্যদের সঙ্গে আমাদের কোনোই তফাৎ নেই। ভাগ্যক্রমে পরীক্ষার ফলটুকু আমাদের কিছুটা ভালো হয়েছে। এর সমস্ত কৃতিত্ব আমাদের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দের। তাঁরাই আমাদের পরীক্ষার জন্যে তৈরি করেছেন। তাঁরাই যন্ত্রী, আমরা যন্ত্র মাত্র। আজ তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নাই। আমরা জানি, আমাদের সাফল্যে আমাদের বাবা-মা-ভাই-বোনেরা যতটা আনন্দিত, মাস্টারমশাইরা এবং আমার ছাত্রবন্ধুরাও ঠিক ততটাই আনন্দিত। আমরা একই পরিবারভুক্ত বলে নিজেদের মনে করি। আমরা যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারি তাহলে তার পিছনে আমাদের শিক্ষকদের অবদানকেই আমরা বড়ো বলে মনে করব। আমরা কেউ মাতৃসম এই বিদ্যালয়কে ভুলব না। এই বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্যে ভবিষ্যৎ-জীবনে আমাদের যতটা সাধ্য তা করব। এই বিদ্যালয়ের ছাত্র বলে পরিচয় দিয়ে যদি কেউ কোনোদিন আমাদের সামনে দাঁড়ায় তখনই তাকে ভাইয়ের মতোই দেখব এবং তার জন্যে প্রয়োজনীয় সব কিছুই করব। মাস্টারমশাইরা তাঁদের যে-কোনো প্রয়োজনে আমাদের ডাকলেই আমরা সাড়া দেব। তাঁদের আশীর্বাদই আমাদের পাথেয়। আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে আমাদের বিদ্যালয়-সঙ্গীতটির বাণী :

আমাদের হৃদয় ভরে
আলোর গানে
মোদের বিদ্যালয়।
এই আমাদের নন্দনলোক
এই তো দেবালয়।

৩২। পল্লী অঞ্চলে ক্রীড়া-প্রতিযোগিতায় পুরস্কার-বিতরণী সভায় প্রধান অতিথির (কোনো কৃতী খেলোয়াড়ের) ভাষণ

মাননীয় সভাপতি, সমবেত ভদ্রমহোদয়গণ ও আমার ভাইবোনেরা,

ভাষণ দিতে গেলেই আমি নার্ভাস বোধ করি। সত্যি বলতে কি, প্রথম বার শীল্ড ফাইনাল খেলার আগেও বোধহয় এভাবে পা কাঁপে নি,—দুরূহ কোণ থেকে গোল দেওয়া আমার পক্ষে এর চেয়ে সহজ।

যাই হোক, বলা যখন শুরু হয়ে গেছে, তখন খেলা দেখতে দেখতে যা মনে হয়েছে বলেই ফেলি। খেলোয়াড়দের উদ্দেশেই বলছি। দু'দলই খেলেছ ভালো, খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল। এমন কি, কয়েকজনের খেলায় বিশেষ দক্ষতার ছাপ ছিল। এই স্বাভাবিক দক্ষতাকে পরিপূর্ণ বিকশিত করে তোলার সুযোগ তোমরা পাবে এবং

এই আঞ্চলিক গণ্ডী পেরিয়ে অনেক বড়ো আসরে খেলবে এ আশা আমরা নিশ্চয় করব। তোমরা এর জন্যে নিজেদের সংগঠিত করে তোলো, প্রশিক্ষকদের অনুরোধ জানাও মাঝে মাঝে এসে তোমাদের তালিম দিয়ে যেতে ; সরকারী সাহায্যের আবেদন জানাও,— আমি এ বয়সেও তোমাদের সঙ্গে আছি। ভরসা করি, তোমরা পারবে, কারণ এ বিষয়ে তোমাদের উৎসাহ আজ আমি দেখেছি, আর খেলার মাঠে খেলোয়াড়ী স্বভাবের পরিচয়ও পেয়েছি। এইটি বাঁচিয়ে রেখো সারাজীবন।

হার-জিতকে আজ তোমরা যেভাবে গ্রহণ করেছ, যে সুস্থ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পরিবেশকে উজ্জীবিত করেছ, সর্বত্র যদি এমন করা যেত, তা হলে জোর দিয়ে বলা যায় যে, পৃথিবী আরও বাসযোগ্য হয়ে উঠত। মন্ত্রসাধন বড়ো কঠিন কাজ, পদে পদে বাধা-বিপত্তি আসবে, এর বিরুদ্ধে জয়ী তোমাদের হতেই হবে। অনুশীলনী, প্রচেষ্টা আর সঙ্কল্প এ তিনটি থেকে তোমরা কোনোদিন বিচ্যুত হোয়ো না, এই কামনা জানাই।

৩৩। কোনো বিত্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে অন্য কোনো বিত্যালয়ের আমন্ত্রিত জনৈক শিক্ষকের ভাষণ।

সমবেত সুধীজন ও ছাত্রবৃন্দ,

আজ এই বিত্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে আমন্ত্রিত হয়ে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি। কোনো বিত্যালয়ের একশো বছরে পা দেওয়ার সংবাদে সকলেই আনন্দিত হন। কত প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে যুদ্ধ করে বিত্যালয়ের এই দীর্ঘ জীবনযাত্রা। ঝড়ের কত ঝাপটায় নিবু নিবু হয়েছে প্রদীপটি। যাঁরা তাকে দু'হাতে আড়াল করে রেখেছেন তাঁদের আজ সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করি। এই বিত্যালয়ের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীতে পুরনো দলিলপত্রের মধ্যে বিত্যাসাগরের মাসিক দানের উল্লেখ আছে দেখলাম। বিত্যাসাগরের আশীর্বাদেই অনেক বাধার দামোদর পেরিয়ে আজ এই বিত্যালয়টি সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। বিত্যালয়ের সেই মূর্তিটিকে প্রণাম করি।

আমি-যে অন্য বিত্যালয়ের শিক্ষক তা আজ মনেই হচ্ছে না। আজকের এই আনন্দযজ্ঞে সবার সঙ্গে আহুতি দেবার জন্যে আমিও এক ঋত্বিক—একথা মনে হতে আনন্দমিশ্রিত গর্ব অনুভব করছি। আমি প্রার্থনা করি, এই বিত্যালয়ের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি হোক, এবং বিত্যার্থীদের অধ্যয়ন তেজোময় হোক :

ওঁ সহনাববতু
সহনৌ ভুনক্তু
সহবীর্যং করবাবহৈ
তেজস্বি নাবধীতমস্তু
মা বিদ্বিষাবহৈ।—

আমাদের বিত্যার্থী ও গুরুকে সমকরুণায় রক্ষা করো, সমশক্তিতে শক্তিমান করো। আমাদের উভয়ের অধ্যয়ন তেজোময় হোক, আমরা যেন পরস্পর কখনই প্রীতিবিমুখ না হই।

৩৪। কোনো বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতীর সংবর্ধনা উপলক্ষে একটি অভিভাষণ।

[উচ্চ মাধ্যমিক, ১৯৭৮]

শ্রদ্ধেয়,

আজ আপনাকে সংবর্ধনা দিতে এসে আমরা নিজেদেরই গৌরবান্বিত মনে করছি। আপনার গবেষণাগ্রন্থটি যে দেশে-বিদেশে প্রভূত সমাদর লাভ করবে এ ছিল সম্পূর্ণ প্রত্যাশিত। গানের সাধনায় আপনি নিত্য-অতন্দ্রিত। শিক্ষাব্রতী হিসেবে আপনি অগণিত ছাত্রের সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত। আপনার বিদ্যার্থী মূর্তিটি প্রতিটি ছাত্রের মনে অঙ্কিত। আজ বিদেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় সংস্কৃতিচেতনা বিষয়ে বক্তৃতা দেবার জন্যে আপনি যে-আমন্ত্রণ পেয়েছেন তাতে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত। আমরা প্রার্থনা করি আপনার বিদেশ-যাত্রা নির্বিঘ্ন ও সার্থক হোক। এদেশ ও ওদেশে সাংস্কৃতিক সেতু গড়ায় আপনি একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারবেন এ আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

আজ আপনার শুভ যাত্রার প্রাক্কালে আমাদের সকলের মিলিত শুভেচ্ছা, শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা আপনাকে নিবেদন করছি। ইতি

সাংস্কৃতিক সমন্বয় সংস্থার
ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ

৩৫। কোনো গুণী শিল্পীর বিদেশ সফরান্তে সংবর্ধনা-উৎসবে সভাপতির ভাষণ।

সমবেত গুণগ্রাহী গুণিজনমণ্ডলী,

আজকে আমাদের জীবনের এ এক পরম লগ্ন। একজন অনন্য প্রতিভার অধিকারী বিশিষ্ট গুণী শিল্পীকে সংবর্ধনা জানাবার জন্যে মিলিত হয়েছি আমরা। এই বহুপ্রার্থিত সুযোগ পাওয়ার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে আমি নিজেকে ধন্য মনে করছি।

আজকের এই সভার যিনি মধ্যমণি সেই কীর্তিমান শিল্পীর গৌরব আজ দেশ-বিদেশে পরিব্যাপ্ত। ভারতীর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মহান্ ঐতিহ্যের আলোকবর্তিকা নিয়ে তিনি বিদেশে গিয়েছিলেন; বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন ইউরোপের নানান দেশে; সেখানকার অগণিত শ্রোতা মুগ্ধ হয়েছেন তাঁর অপূর্ব সঙ্গীতে। প্রশংসায় শতমুখ হয়েছেন সেখানকার শ্রোতৃমণ্ডলী ও রসিক সমালোচকবৃন্দ। তাঁদের মুগ্ধতার স্বীকৃতি হিসেবে তাঁরা শিল্পীকে দিয়েছেন মানপত্র এবং অন্যান্য উপহার। টেলিভিশনে প্রচারিত হয়েছে শিল্পীর ছবি ও কণ্ঠস্বর। অথচ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সঙ্গীতের মধ্যে পার্থক্য আকাশপাতাল। হারমনি পশ্চিমী সঙ্গীতের প্রাণ আর ভারতীয় সঙ্গীতের প্রধান অবলম্বন মেলডি। রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্যের সঙ্গীতকে দিনের সঙ্গে এবং আমাদের সঙ্গীতকে তুলনা করেছেন রাতের সঙ্গে। কিন্তু এই শিল্পীর অসাধারণ নিপুণতায় ভারতীয় মার্গসঙ্গীত দেশ ও কালের গণ্ডী অতিক্রম করে বিদেশের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছে। আসলে পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গীতই একটি বিন্দুতে এসে মিশে যায়। সেই বিন্দুটি যে-শিল্পী ধ্যানদৃষ্টিতে দর্শন করতে সক্ষম হন সেই শিল্পীই পারেন পূর্ব-পশ্চিমকে মেলাতে, দিন ও রাতকে একই সুতোয় গাঁথতে। আমাদের এই শিল্পী তা পেরেছেন

বলেই আমি মনে করি। শিল্পী বিদেশে বিভিন্ন আসরে সুপণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্মেলনে ভারতীয় সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও রীতিগত বিষয় নিয়ে যে-সব আলোচনা করেছেন সেগুলির গুরুত্বও অপরিসীম। বিদেশপ্রত্যাগত এই শিল্পী এক অসাধ্য সাধন করেছেন, এ জন্যে আমরা অর্থাৎ আমাদের স্বদেশের সকলেই গর্ব বোধ করছি। শিল্পীর প্রতি জানাই আমার অন্তরের অভিনন্দন। এ প্রসঙ্গে কবিগুরুর দুটি পঙ্‌ক্তির উল্লেখ করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি—

'তোমার সুরে ভরিয়ে নিয়ে চিত্ত
যাব যেথায় বেসুর বাজে নিত্য।'

৩৬। একটি চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধনী ভাষণ

সমবেত সুধীবৃন্দ,

আজ শ্রীরায়ের একক চিত্রপ্রদর্শনী উদ্বোধন করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। শিল্পচর্চায় নিজে দীর্ঘদিন কাটালেও আমি নিজেকে বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় কল্পনাই করতে পারি না। যতই দিন যাচ্ছে শিল্পচর্চার ক্ষেত্রে নবনব দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। আমরা অবাকবিস্ময়ে চেয়ে আছি। ভ্রম-প্রমাদ বা অপসৃষ্টি-যে হচ্ছে না তা নয়, কিন্তু এসবই প্রাণবত্তার লক্ষণ, প্রচেষ্টায় কিছু ভ্রান্তি থাকবেই। ভ্রান্তিই সাফল্যের তোরণ। শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে দ্রুত রুচিবদলের ব্যাপারটাও খানিকটা জটিলতার সৃষ্টি করেছে। এই ফ্যাশান প্যারেডের মধ্যে যথার্থ শিল্পী নিজেকে না হারিয়ে ফেলে নিজেকে আবিষ্কার করতেই চেষ্টা করেন। শ্রীরায় এমনই একজন শিল্পী। প্রচলিত ধারায় তিনি চিত্রবিদ্যার পাঠ নেন নি বটে, কিন্তু এ বিদ্যা তাঁর সহজাত। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তিনি বাংলার পট ও আলপনাধর্মী চিত্রকলাকে প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে নিয়েছেন। এ বিষয়ে প্রখ্যাত শিল্পী যামিনী রায়ের প্রভাব অনস্বীকার্য। শ্রীরায়ের চিত্রপ্রদর্শনীকে এক কথায় বলা যেতে পারে বাংলার মাটি আর মানুষের চিরন্তন সত্তাটির এক মমতাময় রূপায়ণ। পত্রিকাদিতে বিশেষ একদিনের সমালোচনায় শিল্পীর ঠিক পরিচয়টি সবসময় ধরা পড়ে না। দর্শকেরা আগ্রহ নিয়ে ছবি দেখবেন, শিল্পীর সঙ্গে আলোচনা করবেন, তবেই গড়ে উঠবে শিল্পচর্চার পরিমণ্ডল, যার মধ্যে দিয়ে শিল্পী যেমন নতুন পথের ইঙ্গিত পাবেন, দর্শকেরাও পাবেন ছবি উপভোগের নানা দৃষ্টিকোণ। আমি আশা করব শ্রীরায়ের চিত্রপ্রদর্শনীটি বহু দর্শককে আকর্ষণ করবে এবং শিল্পীও তাঁর সাধনায় প্রেরণা পাবেন।

৩৭। সঙ্গীতপ্রতিষ্ঠানে উপাধিবিতরণ উৎসবে আমন্ত্রিত অতিথির ভাষণ

শ্রদ্ধেয় সভাপতি মহাশয় এবং পরম প্রীতিভাজন ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ,

আজকে এই স্বনামধন্য সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের এক বিশেষ অনুষ্ঠান দিবসে উপস্থিত থাকতে পেরে আমি নিজেকে গর্বিত মনে করছি। সঙ্গীতের বিভিন্ন শাখায় যাঁরা নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন তাঁদের সেই কৃতিত্বের স্বীকৃতি হিসেবে আজ তাঁদের গীতভারতী, নৃত্যভারতী, বাদ্যভারতী প্রভৃতি উপাধিদানে বিভূষিত করা হল।

অবশ্য কেবল উপাধির বা বিশেষ মানপত্রের মধ্যে কোনো গুণী শিল্পীরই কুশলতার সমগ্র পরিচয় নিহিত থাকতে পারে না। কোনো উপাধিই শিল্পীর নিপুণতার চেয়ে বড়ো হতে পারে না, কোনো মানপত্র দিয়ে শিল্পীর প্রতিভাকে মাপা যায় না। তাই আমার মনে হয়, উপাধি বা কোনো মানপত্র দিয়ে শিল্পীকে সম্মানিত করবার যে-প্রচেষ্টা তা প্রধানত আমাদের দিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। শিল্পীকে পুরস্কার দিতে গিয়ে আমরা নিজেরাই পুরস্কৃত হই। তবে একটা কথা না বললে চলে না; তা হল এই যে, এই সব উপাধিপ্রাপ্তিতে শিল্পীর দায়িত্ব কিন্তু বেড়ে যায়। উপাধির প্রতি সুবিচার করবার জন্যে শিল্পীকে প্রতিনিয়ত সচেষ্ট থাকতে হয়। তাঁর সাধনার পথ আরো কঠিন হয়ে ওঠে। অবশ্য সাধন-পথের এই কাঠিন্যের প্রয়োজনীয়তা আছে। কাঠিন্য জয় করে সিদ্ধির পথে উত্তরণই শিল্পী-জীবনের মূল মন্ত্র। আর সঙ্গীত-যে সাধনার সামগ্রী এ তো সকলেরই জানা কথা।

আমি আশা রাখি, আজ যাঁরা উপাধি পেলেন তাঁরা নিশ্চয়ই সাধনায় উত্তীর্ণ হবেন। এই উপাধি তাঁদের প্রেরণা হোক। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তাঁরা যেন এই উপাধির দায়িত্ববহনের শক্তি লাভ করেন। এঁদের জীবনে হয়তো আরো বড়ো উপাধি, মানপত্র ও বরমাল্য অপেক্ষা করছে ভবিষ্যতে, কিন্তু এদের শিল্পিসত্তার পূর্ণ বিকাশ যেন ঘটে যথার্থ সাধনার প্রসাদে।

৩৮। একটি বিতর্ক প্রতিযোগিতায় সভাপতির ভাষণ

'দৈব বনাম পুরুষকার'—এ-বিষয়ে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক আজকের এই বিতর্ক প্রতিযোগিতায় উপস্থিত না হতে পারলে আমি সত্যিকার আনন্দের কিছু মুহূর্তকে হারাতাম।

বিজেতা এবং বিজিত উভয়কেই আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। একপক্ষ জয়ী তো হবেই, কিন্তু জয়ের আনন্দ সেখানেই বেশি প্রতিপক্ষ যেখানে প্রবল। আজকের প্রতিযোগিতায় দৈববাদী প্রবল প্রতিপক্ষকে হারিয়ে পুরুষকারবাদীদের জয় ঘোষিত হল বটে, কিন্তু উল্টোটাও অনায়াসে হতে পারত। মাত্র দু' নম্বরের জন্যে যে-পরাজয় তাকে পরাজয় বলব না। আশ্চর্য দক্ষতায় আজ দু'দলের বক্তারা বিতর্কটি প্রাণবন্ত করে তুলেছে। বিতর্কের বিচারে উপবিভাগ যতই থাকুক প্রধান দুটি বিভাগ হল বচন ও বাচন। অর্থাৎ বক্তব্য ও বলবার ভঙ্গী। এই দুই বিষয়েই প্রতিটি বক্তা প্রশংসার দাবি করতে পারে। বিশেষভাবে উল্লেখ করার বিষয় হল এই যে, বিতর্কটিতে আগাগোড়া কোনো পুনরুক্তি ঘটে নি।

বিতর্ক-অনুষ্ঠান সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অপরিহার্য। এতে যেমন প্রকাশের জড়তা দূর হয়, তেমনি হয় বুদ্ধির অনুশীলন। শ্রেণীর পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যেও যদি তর্কসাপেক্ষ কোনো বক্তব্য থাকে তাকে প্রস্তাবের মতো রেখে তার স্বপক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি আহ্বান করে বিদ্যার্থীদের বিচারবোধকে উদ্দীপিত করা যেতে পারে।

আন্তঃশ্রেণী বিতর্ক প্রতিযোগিতা, আন্তর্বিদ্যালয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা বা আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিতর্কপ্রতিযোগিতাকে সম্প্রসারিত করলে সারা দেশে যুক্তিনির্ভর মননের আবহাওয়া গড়ে উঠবে। গণতন্ত্রের সাফল্য এই মননের উপরই।

আমি আশা করব আজকের এই আন্তর্বিদ্যালয় বিতর্কের চূড়ান্ত প্রতিযোগিতায় যারা উচ্চমানের বিতর্কদক্ষতা দেখিয়েছে তারা ভবিষ্যতে দেশের বুদ্ধি ও চিন্তার ক্ষেত্রে স্থায়ী অবদান রাখতে পারবে।

৩৯। অনুরূপ আর একটি ভাষণ

সাহিত্য আর বিজ্ঞান নিয়ে তোমাদের দু'পক্ষের বক্তব্য শুনলাম। সাহিত্যের সপক্ষে আর বিজ্ঞানের সপক্ষে মূল বক্তব্য যা হতে পারে তা তোমাদের কথায় মোটামুটি প্রকাশ পেয়েছে।

সাহিত্য বনাম বিজ্ঞান—এ নিয়ে আমরা হয়তো বিতর্কের অবতারণা করতে পারি। কিন্তু আসল কথা সাহিত্য ও বিজ্ঞান দুই-ই আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। 'আমাদের পক্ষে অপরিহার্য' না বলে বলি এ দুটিই আমাদের 'অপরিহার্য পক্ষ', আকাশপর্যটনে পাখির যেমন দু'টি পক্ষ, তেমনি।

দেহ ও মন দুটি নিয়েই মানুষ। একটাকে বাদ দিয়ে আর একটাকে ভাবা যায় না। নিত্যনতুন উপকরণে আমাদের বাস্তব জীবনে নানা স্বাচ্ছন্দ্য যেমন যুগিয়ে চলেছে বিজ্ঞান, তেমনি ভাবজগতে নিত্যনূতন উপকরণ যুগিয়ে মনের তুষ্টি-ও পুষ্টিবিধান করে চলেছে সাহিত্য। এর কোন্‌টাকে বাদ দেবে বলো ?

তোমাদের একজন বলছ সাহিত্য এক-কে অন্যের সঙ্গে যুক্ত করে দেয়। ঠিক কথা। হৃদয়ে হৃদয়ে সেতু রচনা করে চলে সাহিত্য। কিন্তু বলো, বিজ্ঞানও কি ঠিক তা-ই করে চলছে না? সমস্ত পৃথিবীটাকে কি ঘরের কোণে ধরে দিচ্ছে না বিজ্ঞান ? আমরা যে আজ এক মানব-পরিবারের স্বজন, এই বোধ এনে দিতে বিজ্ঞান কি নিরন্তর সাধনা করে চলছে না ? দূরভাষণে, বেতারে, টেলিভিশনে, যন্ত্রযানে কত আশ্চর্য উপকরণে মানুষে-মানুষে যোগ-সাধন করে চলেছে বিজ্ঞান।

সাহিত্য আর বিজ্ঞানের মধ্যে এই ঐক্যের দিকটা দেখাই ঠিক দেখা। একজন বলেছ : বিশেষ জ্ঞান—বিজ্ঞান। ঠিকই। বিশেষভাবে জানে বিজ্ঞান, আবিষ্কার করে বিজ্ঞান ; ঠিক তেমনিই বিশেষভাবে জানে সাহিত্য, আবিষ্কারও করে সাহিত্য ; সাধারণের অদেখা জিনিস বা অদেখা সৌন্দর্যকে আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে সাহিত্য। অননুভূত কত দিকই-যে সাহিত্য আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটন করে তা বলে শেষ করা যায় না। অজানাকে জানা, রহস্যের সাগরে ডুব দেওয়া সাহিত্য ও বিজ্ঞান দুইয়েরই কাজ। দুইয়ের পথ অবশ্য ভিন্ন। কী রকম জানো ?

মনে করো সাহিত্যিক আর বিজ্ঞানী দু'জন দু'পথ ধরলেন। পথ কঠিন দু'জনেরই। উপকরণ ভিন্ন ভিন্ন। বিজ্ঞানী চলেছেন নিরীক্ষণ আর পরীক্ষণের মধ্যে দিয়ে যাচাই করে করে, নানা অব্যর্থ অভ্রান্ত যন্ত্র তাঁর হাতে, আর সাহিত্যিক চলেছেন অন্য উপকরণ নিয়ে,

তাঁর দূরবীক্ষণ নেই বটে, আছে দূরদৃষ্টি, ভাব আর কল্পনা ; তিনিও দেখছেন, ভাবছেন, মনের ছাঁকনিতে ছেঁকে নিচ্ছেন। কল্পনার রং বুলিয়ে ভাবের ভাপ দিয়ে শুকিয়ে নিচ্ছেন। দূরদৃষ্টি দিয়ে সত্যকে অনাবৃত করছেন। চলেছেন তো চলেছেনই দু'জনে। দীর্ঘ পথপরিক্রমার পর এক জায়গাতেই এসে পড়লেন দু'জন।

—এ কী ? আপনি এখানে ?

—এ কী ? আপনি ?

দু'জনে নানা জিজ্ঞাসার পর অবাক হলেন আরও। একই জিনিস নিয়ে দু'জনের জিজ্ঞাসা, দু'জনের ভাবনা। তা হল, সত্য শিব আর সুন্দর। হাতে হাত রাখলেন দুজন।

আমরাও বলি, সাহিত্য আর বিজ্ঞান হচ্ছে আমাদের দুই হাত। দুই হাতে অঞ্জলি রচিত না হলে, আমরা অমৃতরস পান করব কী করে ?

৪০। আলিপুর চিড়িয়াখানা শতবার্ষিকী উপলক্ষে একটি ছাত্রদলকে বিশেষ পরিদর্শনে নিয়ে যাবার আগে তাদের উদ্দেশে জীববিদ্যা শিক্ষকের ভাষণ।

আমাদের আলিপুর চিড়িয়াখানা আজ একশো বছরে পড়ল। এই চিড়িয়াখানার সুদীর্ঘ ইতিহাস উপন্যাসের মতোই রোমাঞ্চকর। আমি শুধু গোড়ার কথাটা বলছি। ১৮৭০ খ্রীস্টাব্দে বাংলার তদানীন্তন গভর্নর টেম্পল্-এর ব্যক্তিগত উদ্যোগে ব্যারাকপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি পশুশালা। এটি ছিল পক্ষিপ্রধান, তাই চিড়িয়াখানা নামেই তা পরিচিত ছিল। ১৮৭৫ খ্রীস্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গলের উদ্যোগে আলিপুরে একটি পশুশালা স্থাপিত হল। টেম্পল্ সাহেব অনুরুদ্ধ হয়ে ব্যারাকপুরের পশুশালাটিকে এখানে স্থানান্তরিত করলেন। নতুন পশুশালাটি গড়ে তোলার ব্যাপারে সাগ্রহ সহযোগিতা করলেন বর্ধমান ও কাশিমবাজারের মহারাজা এবং কলকাতার প্রখ্যাত লালা ও মল্লিক পরিবার। আরও অনেক পশু-প্রেমিকের সাহায্যও পাওয়া গেল। আলিপুরের বেলভিডিয়ার অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ৩৩ একর জমিতে এই নতুন পশুশালার পত্তন হল। ইংলণ্ডের তদানীন্তন যুবরাজ ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১লা জানুয়ারি আনুষ্ঠানিক ভাবে এই পশুশালার উদ্বোধন করলেন। পশুজগৎ এক বিচিত্র জগৎ। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই মানুষ এ জগতের রহস্য জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব। আরণ্যক পশুদের ঠিকমতো জানতে হলে অরণ্য অঞ্চলেই যেতে হবে। কিন্তু তার বাধা তো অনেক। তাই পশুদের ধরে এনে একত্র করে তাদের চরিত্র ও অভ্যাস পর্যবেক্ষণ করবার জন্যেই সারা পৃথিবীতে বড়ো বড়ো পাঁচশো পশুশালা গড়ে উঠেছে। কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানা তারই অন্যতম।

এ এক বৃহৎ পশুপরিবার। ভোর বেলা থেকেই সাজো সাজো রব। এক-এক প্রাণির এক-এক রকম খাবার। কেউ খাবে ঘাসের বীজ, কেউ বাদাম, কেউ কেঁচো বা সাপ, কেউ মাংস, কেউ বা দুধ-রুটি। ঘড়ি ধরে খাওয়াবার ব্যাপার। একটু

এদিক ওদিক হলেই ওদের হবে রাগ বা অভিমান। অনিয়ম হলেই আবার অসুখ করবে। তখন পশু-চিকিৎকদের ডাকতে হবে। কাউকে বা পাঠাতে হবে হাসপাতালে। খাঁচায় বাঁধা থাকা তো আর এদের স্বভাব নয়, তাই এমনিতেই কতগুলো রোগ দেখা দেয়। খুব সতর্ক থাকতে হয় সেইজন্যে।

চিড়িয়াখানায় গিয়ে তোমরা শুধু পিকনিক-মুডেই থেকো না, যতটুকু সময় থাকবে পশুপাখিদের আচরণ বা অভ্যাস লক্ষ করবে। স্কেচ করেও নিতে পারো প্রয়োজনমতো। যে-সব প্রশ্ন মনে জাগবে সেগুলোও লিখে রাখবে। পরে জেনে নেবার চেষ্টা করবে। এই চিড়িয়াখানার গণ্ডি কিন্তু দেয়াল ছাড়িয়ে সারা বিশ্বে। ঐ ঝিলটার দিকে চেয়ে দেখবে, ঝাঁকে ঝাঁকে পাখিরা এসেছে সাইবেরিয়া থেকে, মানস সরোবর থেকে, হিন্দুকুশ পর্বতমালা থেকে।

আর এ শুধু পশুশালা নয়, উদ্ভিদশালাও বটে। স্বদেশী-বিদেশী নানা গাছপালা এখানে প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ে তুলতে সাহায্য করছে।

শুধু এইটুকু বলে শেষ করছি। এই পশুশালা প্রকৃতির এক বিরাট পাঠশালা। এখানে তোমাদের নিত্যপাঠের আমন্ত্রণ।

গুণিজনের ভাষণ

৪১। ছাত্রদের প্রতি সম্ভাষণ (অংশ)

—রবীন্দ্রনাথ

আজ তোমাদের তারুণ্যের মধ্যে আমার অবারিত প্রবেশাধিকার নাই, তোমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা আদর্শ-যে কী তাহা স্পষ্টরূপে অনুভব করা আজ আমার পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু নিজেদের নবীন কৈশোরের স্মৃতিটুকুও তো ভস্মাবৃত অগ্নিকণার মতো পক্ককেশের নিচে এখনও প্রচ্ছন্ন হইয়া আছে। সেই স্মৃতির বলে ইহা নিশ্চয় জানিতেছি যে, মহৎ আকাঙ্ক্ষার রাগিণী মনে যে তারে সহজে বাজিয়া উঠে তোমাদের অন্তরের সেই সূক্ষ্ম, সেই তীক্ষ্ণ, সেই প্রভাতসূর্যরশ্মি নির্মিত তন্তুর ন্যায় উজ্জ্বল তন্ত্রীগুলিতে এখনো অব্যবহারের মরিচা পড়িয়া যায় নাই, উদার উদ্দেশ্যের প্রতি নির্বিচারে আত্মবিসর্জন করিবার দিকে মানুষের মনের যে একটা স্বাভাবিক ও সুগভীর প্রেরণা আছে তোমাদের অন্তঃকরণে এখনো তাহা ক্ষুদ্র বাধার দ্বারা বারংবার প্রতিহত হইয়া নিস্তেজ হয় নাই; আমি জানি, স্বদেশ যখন অপমানিত হয়, আহত অগ্নির ন্যায় তোমাদের হৃদয় উদ্দীপিত হইয়া উঠে; নিজের ব্যবসায়ের সংকীর্ণতা ও স্বার্থসাধনের চেষ্টা তোমাদের সমস্ত মনকে গ্রাস করে নাই। দেশের অভাব ও অগৌরব-যে কেমন করিয়া দূর হইতে পারে সেই চিন্তা নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে তোমাদের রজনীর বিনিদ্র প্রহর ও দিবসের নিভৃত অবকাশকে আক্রমণ করে; আমি জানি, ইতিহাসবিশ্রুত যে-সকল মহাপুরুষ দেশহিতের জন্য লোকহিতের জন্য আপনাকে উৎসর্গ করিয়া মৃত্যুকে পরাস্ত, স্বার্থকে লজ্জিত ও দুঃখ-ক্লেশকে অমর মহিমায় সমুজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত তোমাদিগকে যখন আহ্বান করে তখন তাহাকে আজও তোমরা বিজ্ঞ বিষয়ীর মত বিদ্রূপের সহিত প্রত্যাখ্যান করিতে চাও

না—তোমাদের সেই অনাঘ্রাত পুষ্প অখণ্ড পুণ্যের ন্যায় নবীন হৃদয়ের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে আমি আজ তোমাদের দেশের সারস্বতবর্গের নামে আহ্বান করিতেছি, ভোগের পথে নহে, ভিক্ষার পথে নহে, কর্মের পথে। কর্মশালার প্রবেশদ্বার অতিক্ষুদ্র, রাজপ্রাসাদের সিংহদ্বারের ন্যায় ইহা অভ্রভেদী নহে, কিন্তু গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে নিজের শক্তি সম্বল করিয়া প্রবেশ করিতে হয়, ভিক্ষাপাত্র লইয়া নহে। গৌরবের বিষয় এই যে, এখানে প্রবেশের জন্য দ্বারীর অনুমতির অপমান স্বীকার করিতে হয় না ; ঈশ্বরের আদেশ শিরোধার্য করিয়া আসিতে হয়। এখানে প্রবেশ করিতে গেলে মাথা নত করিতে হয় বটে ; কিন্তু সে কেবল নিজের উচ্চ আদর্শের নিকট, দেশের নিকট, যিনি নত ব্যক্তিকে উন্নত করিয়া দেন সেই মঙ্গলবিধাতার নিকট। তোমাদিগকে আহ্বান করিয়া এ পর্যন্ত কেহ তো সম্পূর্ণ নিরাশ হন নাই ; দেশ যখন বিলাতি পিনাক বাজাইয়া ভিক্ষা করিতে বাহির হইয়াছিল তখন তোমরা পশ্চাৎপদ হও নাই, প্রাচীন শ্লোকে যে-স্থানটিকে শ্মশানের ঠিক পূর্বেই বসাইয়াছেন সেই রাজদ্বারে তোমরা যাত্রা করিয়া আপনাকে সার্থক জ্ঞান করিয়াছ। আর আজ সাহিত্য পরিষদ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছেন, তাহার ভাষা মাতৃভাষা ও তাহার কার্য মাতার অন্তঃপুরের কার্য বলিয়াই কি তাহা ব্যর্থ হইবে—দেশের কাব্যে গানে ছড়ায়, প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নাবশেষে, কীটদষ্ট পুঁথির জীর্ণ পত্রে, গ্রাম্য পার্বণে, ব্রতকথায়, পল্লীর কৃষি-কুটিরে পরিষদ যেখানে স্বদেশকে সন্ধান করিবার জন্য উদ্যত হইয়াছেন সেখানে বিদেশী লোক কোনদিন বিস্ময় দৃষ্টিপাত করে না, সেখান হইতে সংবাদপত্র বাহন খ্যাতি সমুদ্রপারে জয় ঘোষণা করিতে যায় না, সেখানে তোমাদের কোন প্রলোভন নাই। কিন্তু তোমাদের মধ্যে কেহ মাতার নিঃশব্দ আশিস্‌মাত্রকে যদি রাজমহিষীর ভোজ্যাবশেষের চেয়ে অধিক মনে করিতে পার তবে মাতার নিভৃত অন্তঃপুরচারী এই সকল মাতৃসেবকের পাশে আসিয়া দণ্ডায়মান হও এবং দিনের পর দিন বিনা বেতনে, বিনা পুরস্কারে, খ্যাতিবিহীন কর্মে স্বদেশপ্রেমকে সার্থক করো।

৪২। কাজী নজরুল ইসলামের একটি ভাষণ

প্রীতি-নমস্কার

[১৯২৯ খ্রীস্টাব্দের গোড়ার দিকে চট্টগ্রাম বুলবুল সোসাইটির পক্ষ থেকে কবি নজরুল ইসলামকে যে-মানপত্র দেওয়া হয় তার উত্তরে কবি এই প্রতিভাষণ প্রদান করেন।]

ওগো বুলবুলিস্তানের নব বৈজ্ঞানিক দল !

তোমরা আমার সাদরূপ প্রীতি-নমস্কার গ্রহণ কর।

তরবারি গ্রহণ করিতে হয় উচ্চশিরে—উদ্ধত হস্ত তুলে, মালা গ্রহণ করতে হয় উচ্চশির অবনমিত ক'রে—উদ্ধত হস্ত যুক্ত ক'রে ললাটে ঠেকিয়ে।

তোমাদের যুক্ত করের অঞ্জলির বিনিময়ে আমার যুক্ত-করের রিক্ত নমস্কার গ্রহণ কর।

তোমাদের এই দানের বিনিময়ে আমি যেন আমার গানের পাত্র পূর্ণ ক'রে তোমাদের ভেট দিতে পারি।

তোমরা নতুন বাগিচার নতুন বুলবুলি, তোমরা চাও শুধু রসের মধু, রূপের কুসুম, প্রাণের গুলবাগিচা। তত্ত্ব-কথার ঢিল ছুঁড়ে আমি তোমাদের গীত-লোকে, ধেয়ানকুঞ্জে উৎপাতের সৃষ্টি করব না। তোমাদের রূপের হাটে রসের বাজারে আমি ক'রে যাব আমার পরিপূর্ণ হৃদয়ের স্তবগান।

এই ক্ষণিকের অতিথি গানের পাখিকে তোমরা যে ফুলের সওগাত দিলে, ওগো বাহার-গুলিস্তানের উদাসী শিশুর দল, তার প্রত্যুত্তরে আমার একমাত্র সম্বল গান ছাড়া তো দেবার কিছুই নেই। আমার গানে যদি তোমাদের বনের কুসুম মুঞ্জরিত হয়ে ওঠে, সেই তো আমার শ্রেষ্ঠ অভিবন্দনা।

যেদিন আমার কণ্ঠে হলাহলের তিক্ততা উঠেছিল, সেই সুরাসুরে সাগরমন্থনের প্রখর মধ্যাহ্নেও তোমরা নির্ভীক শিশুর দল আমার নীলকণ্ঠের কণ্ঠহার রচনা করেছিলে। আবার আজ যখন মৃতের শ্মশানচারী আমি অমৃতের সুর-লোকে যাত্রা শুরু করেছি, সেদিনও তোমাদের অর্ঘ্যের নির্মাল্য নিয়ে।

হে ভয়ে নির্ভীক, আনন্দে শান্ত, দেবশিশুর দল, তোমরা আমার প্রণম্য। আমার অভিবাদন গ্রহণ কর।

অনুশীলনী

১। বিষয়: একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীর উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা
বক্তা: জনৈক শিক্ষা-বিশেষজ্ঞ

২। বিষয়: বিদ্যালয়ে শারীরশিক্ষা প্রবর্তন
বক্তা: বিশিষ্ট কোনো ব্যায়ামবীর

৩। উপলক্ষ: একটি শিল্পসংস্থার উদ্বোধন
বক্তা: কোনো শিল্পবিশেষজ্ঞ বা শিল্পপতি

৪। বিষয়: 'নগর পরিচ্ছন্ন রাখুন'
বক্তা: কোনো বিশিষ্ট নাগরিক

৫। উপলক্ষ: রেলওয়ে সৌজন্য সপ্তাহ
বক্তা: বিশিষ্ট রেলওয়ে কর্মী

৬। বিষয়: বেকার সমস্যা সমাধানে সমবায় প্রকল্প
বক্তা: সমবায় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কোনো সমাজসেবক

৭। উপলক্ষ: কোনো ক্রীড়াসংস্থার উদ্বোধন
বক্তা: কোনো বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ

৮। বিষয়: শরৎ-সাহিত্যে সমাজ-চেতনা
বক্তা: কোনো বিশিষ্ট সাহিত্যিক

৯। উপলক্ষ : স্মরণীয় কবির জন্মোৎসব (নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১)
বক্তা : কোনো ছাত্র

১০। উপলক্ষ : বিদ্যালয়ের কোন প্রদর্শনীর উদ্বোধন
বক্তা : জনৈক শিক্ষাবিদ

১১। উপলক্ষ : বিদ্যালয়ে সায়েন্স হবি সেণ্টারের উদ্বোধন
ভাষণ : প্রধান শিক্ষক

১২। উপলক্ষ : আন্তঃশ্রেণী বিতর্ক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন
বক্তা : বিতর্কে পারদর্শী কোনো প্রাক্তন ছাত্র

১৩। বিষয় : আধুনিক কবিতার গতি-প্রকৃতি
বক্তা : কোনো তরুণ কবি

১৪। উপলক্ষ : বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠেয় বিবেকানন্দ জন্ম-জয়ন্তী
বক্তা : একাদশ শ্রেণীর কোনো ছাত্র

১৫। উপলক্ষ : ক্রিকেটারদের বিদেশ সফর
বক্তা : ক্রিকেট কোচ

১৬। বিষয় : সাম্প্রতিক শিশু-সাহিত্য
বক্তা : বিশিষ্ট কোনো সাহিত্যিক

প্রস্তুত ভাষণ বা অভিভাষণ রচনা করো :

১৭। বস্তী-উন্নয়নের জন্য আয়োজিত সভায় বক্তৃতা দিবার উদ্দেশ্যে ভাষণ (নমুনা প্রশ্ন, '৮০-৮১)

১৮। কোনো উৎসবে প্রধান অতিথির অভিভাষণ (নমুনা প্রশ্ন '৭৯)

১৯। কোনো মহাপুরুষের জন্মোৎসবে ছাত্র প্রতিনিধির অভিভাষণ (নমুনা প্রশ্ন '৭৯)

২০। যুব-উৎসবে যুব প্রতিনিধিরূপে অভিভাষণ (নমুনা প্রশ্ন '৭৯)

২১। বনমহোৎসবের উপর সভাপতির ভাষণ (নমুনা প্রশ্ন '৭৯)

২২। উচ্চ মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তৃতা (নমুনা প্রশ্ন '৭৮)

২৩। বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রধান অতিথির ভাষণ (নমুনা প্রশ্ন '৭৮)

২৪। বিদ্যালয়ের প্রার্থনাসভায় পাঠ করার জন্যে ভাষণ (নমুনা প্রশ্ন '৭৮)

২৫। শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যার প্রতিবিধানকল্পে আয়োজিত শিক্ষক-ছাত্রের সম্মিলিত অধিবেশনে প্রধান বক্তার ভাষণ

২৬। শিক্ষার সর্বস্তরে মাতৃভাষা মাধ্যম হওয়া উচিত এ বিষয়ে ভাষণ

২৭। সমাজবিরোধীদের উৎপাত বন্ধের জন্য আহূত জনসভার জন্য ভাষণ

২৮। খেলার মাঠে শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনের উদ্দেশ্যে আহূত জনসভার জন্য ভাষণ

২৯। সার্বজনীন কোনো উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে একটি অভিভাষণ

৩০। সমাজসেবায় ছাত্রদের দায়িত্ব-বিষয়ে ভাষণ

৩১। পরিবেশদূষণ বিষয়ে একটি অভিভাষণ

সাহিত্যের ইতিহাস
সহায়ক পাঠ
ব্যাকরণ

সাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম অধ্যায়

আদি ও মধ্যযুগ

বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভব—বাংলা সাহিত্যের গোড়া-পত্তন এবং যুগবিভাগ

প্রাচীন গ্রন্থাদিতে বঙ্গদেশ গৌড়-বঙ্গ নামে পরিচিত ছিল। পরে মুসলমান যুগ থেকে এদেশের একটি অংশ 'বঙ্গের' নাম অনুসারে সারা দেশের নাম হয়েছে বাংলাদেশ। পাশ্চাত্ত্য বণিকদের কাছেও রাঢ়-বরেন্দ্র-বঙ্গ কেবল বাংলা নামেই পরিচিত ছিল।

আর্যরা গৌড়-বঙ্গ-সুহ্ম সমতটের উপর অধিকার বিস্তার করবার আগে এদেশে দ্রাবিড়-অস্ট্রিক প্রভৃতি আর্যেতর গোষ্ঠীর মানুষ বাস করত। এদের ভাষা ও সভ্যতার সঙ্গে আর্যদের ভাষা ও সভ্যতার মিল ছিল না বলে প্রাচীন আর্য গ্রন্থে বঙ্গদেশ সম্পর্কে সশ্রদ্ধ উল্লেখ নেই।

বিভিন্ন যুগে বাংলার সীমানা পরিবর্তিত হলেও একটি বিশেষ ভূখণ্ডকে বাংলার সীমারূপে চিহ্নিত করা যায়। এই ভূখণ্ডের উত্তরে হিমালয় থেকে নেপাল, উত্তর-পূর্বে ব্রহ্মপুত্র নদ, পূর্বপ্রান্তে ত্রিপুরা, চট্টগ্রাম, পশ্চিমে রাজমহল, সাঁওতাল পরগণা, ছোটনাগপুর মানভূম ধলভূম কেওঞ্জর ময়ূরভঞ্জের শৈলময় মালভূমি এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর। ঐতিহাসিক ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন, "এই ভূখণ্ডই ঐতিহাসিক কালের বাঙালীর কর্মকৃতির উৎস এবং ধর্ম-কর্ম-নর্মভূমি।"

গুপ্ত শাসনকালে খ্রীস্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে এদেশে আর্য অধিকার বিস্তৃত হয় এবং পরবর্তী দুশ বছরের মধ্যে আর্যদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিশেষভাবে এদেশের মাটিতে প্রভাব বিস্তার করে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন বৈদিক আর্যভাষার কথ্যরূপের বিবর্তনে বাংলা প্রভৃতি নব্য ভারতীয় আর্যভাষার জন্ম। এদেশে আর্য অধিকারের পূর্বে অস্ট্রিক জাতির বাস ছিল। কালক্রমে আর্যভাষা অর্থাৎ সংস্কৃত ভাষা এবং পরবর্তী কালে প্রাকৃত অপভ্রংশ এদেশে প্রচলিত হল। বাংলাভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ অন্যান্য ভাষার মতোই নদীপ্রবাহের সঙ্গে তুলনীয়। নদীপ্রবাহের মতো যতই ভাষা অগ্রসর হয়েছে ততই এর আকার ও আয়তন বৃদ্ধি পেয়েছে। ভাষাতাত্ত্বিকগণ মনে করেন, প্রাকৃত অপভ্রংশের খোলস ছেড়ে খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে বাংলাভাষার জন্ম হয়।

বাংলাভাষা যে মূল ভাষা থকে জন্মগ্রহণ করেছে তাকে ভাষার ইতিহাসে বলে ইন্দোয়ুরোপীয় ভাষা বা আদি ভারতীয় আর্যভাষা। বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা এর অন্তর্ভুক্ত। এর ব্যাপ্তিকাল খ্রীঃ পূঃ ১৫০০ অব্দ থেকে ৬০০ অব্দ পর্যন্ত।

সাধারণ মানুষের উচ্চারণের ফলে এই ভাষার নিয়মকানুন শিথিল হয়ে প্রাকৃত ভাষায় পরিণত হল। অঞ্চলভেদে প্রাকৃতের কয়েকটি স্তর ছিল। সৌরসেনী প্রাকৃত, মহারাষ্ট্রী প্রাকৃত, মাগধী প্রাকৃত এবং অর্ধমাগধী প্রাকৃত এদের মধ্যে অন্যতম।

এর পরের যুগে ভাষায় পরিবর্তনের নিয়ম অনুসারে প্রাকৃত ভাষার নিয়মকানুন আরও শিথিল হল, এই পর্যায়ের নাম অপভ্রংশ ভাষা। এর কাল পরিমাণ খ্রীস্টীয় ৬০০ অব্দ পর্যন্ত। প্রত্যেক প্রাকৃতেরই একটি অপভ্রংশ স্তর ছিল। আমাদের বাংলাভাষা মাগধী অপভ্রংশের সন্তান। মাগধী অপভ্রংশের পূর্বীশাখা থেকে খ্রীঃ দশম শতাব্দীতে বাংলাভাষার জন্ম হয়েছে।

প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা থেকে বাংলাভাষার উদ্ভবের বিভিন্ন পর্যায়ঃ

- প্রাচীন ভারতীয় আর্য (O. I. A)
  - প্রাকৃত বা মধ্যভারতীয় আর্য (M. I. A)
    - পালি
    - প্রাচ্য প্রাকৃত
      - পূর্বী প্রাচ্য
      - মাগধী প্রাকৃত
        - বাংলা
      - পশ্চিমা প্রাচ্য
    - সংস্কৃত

দশম শতাব্দী থেকে শুরু করে আধুনিক কাল পর্যন্ত নানা পরিবর্তনের মধ্যে দিয়ে বাংলাভাষা প্রবাহিত হয়ে চলেছে। এ ভাষার বয়েস প্রায় হাজার বছর। ভাষাগত বিবর্তনের ধারা অনুসারে বাংলাভাষাকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যেতে পারে। আদি যুগের বাংলা, মধ্যযুগের বাংলা এবং আধুনিক যুগের বাংলা।

আদি যুগের বাংলাঃ এই ভাষার সীমা খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত। চর্যাচর্য বিনিশ্চয়ের মধ্যে এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়।

এর পরের স্তর মধ্যযুগের বাংলাভাষা। দ্বাদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত এর কালসীমা। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলা কাব্যে যে-ভাষা ব্যবহৃত হয়েছে তাকে মধ্যযুগীয় বাংলাভাষার প্রথম পর্যায় নামে অভিহিত করা হয়। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য এই যুগের প্রথম গ্রন্থ। খ্রীঃ ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মধ্যযুগীয় বাংলাভাষার অন্ত্য পর্যায় নামে পরিচিত। বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্য, বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য এই যুগের সাহিত্যের ফসল।

এর পরবর্তী যুগকে আধুনিক যুগ বলে। এই সময় থেকেই ইংরেজ আমলের শুরু। ইংরেজি, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষার শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে এবং সাহিত্যের বাহন হয়েছে বাংলা গদ্য। বাংলা গদ্যের জন্ম আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো সংবাদ।

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগ

চর্যাপদ ঃ সমাজচিত্র ও সাহিত্যসম্পদ

বাংলা সাহিত্যের আদি যুগকে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'হিন্দু-বৌদ্ধ যুগ' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে আদি যুগে ধর্মকলহের মাধ্যমেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের সমালোচকগণ মনে করেন, প্রাচীন বঙ্গদেশে ধর্মমতের বৈচিত্র্য থাকলেও বিরোধ ছিল না। এ প্রসঙ্গে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি বলেছেন "এ দেশে ধর্মমত লইয়া কোনো ঝগড়া ছিল না,—না রাষ্ট্রে না সমাজে না গ্রামে না গোষ্ঠীতে না পরিবারে।"

অবশ্য একথা ঠিক, প্রথম যুগের বাংলা সাহিত্য ধর্মাশ্রিত ছিল এবং সমাজে ধর্ম-বিশ্বাসের মধ্যে বৈচিত্র্যও ছিল। প্রাচীন বাংলায় মুখ্য আচরিত ধর্ম ছিল হিন্দু ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ও অন্যান্য তান্ত্রিক ধর্ম। এই সব ধর্মচেতনার অভিব্যক্তি আমাদের সাহিত্যে প্রকট। এই অর্থে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের আলোচ্য যুগের নামকরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

বাংলার ধর্মভাবনার উপর লোকধর্মের প্রভাবের কথা ঐতিহাসিকেরা স্বীকার করেছেন। কিন্তু আজ এই সব আদিমতম ধর্মাচরণের পৃথক পরিচয় নেই। সব রকমের আর্যধর্মের গভীরে আর্যেতর ধর্মাচরণের অনুপ্রবেশের মধ্যে দিয়েই এদেশে ধর্মীয় মিলনের ঐতিহ্য গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন বঙ্গদেশে একই সঙ্গে তিনটি ধর্মের প্রভাব দেখা যায়—জৈন ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্ম। জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের অনুচিন্তন বাংলার লোকসমাজকে অবলম্বন করেই আবর্তিত হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য ভাবনা ছিল সমাজের উচ্চস্তরে সীমাবদ্ধ। যদিও আর্যধর্মের মধ্যে লোক-ধর্মের উপাদান প্রবেশ করেছিল এবং অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল।

খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে যে-বাংলা ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল তার পরিচয় পাই 'চর্যাচর্যবিনিশ্চয়' নামে একটি প্রাচীন পুথিতে। এই পদাবলীকে সংক্ষেপে বলা হয় চর্যাপদ। চর্যাপদ হল বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লেখা ধর্মাচরণ-বিষয়ক সংগীত।

খ্রীস্টীয় দশম শতাব্দীতে সিদ্ধাচার্যগণ শিষ্যবর্গকে সাধন প্রণালী সম্পর্কে উপদেশ দেবার জন্যে অপেক্ষাকৃত সহজবোধ্য এবং সদ্যোজাত বাংলাকেই বেছে নিয়েছেন। বক্তব্য বিষয়কে তাঁরা পদ্যে রচনা করলেন এবং সেগুলিকে রাগ-রাগিণী সহকারে গাইবার ব্যবস্থাও করলেন। মনে হয় সাধনপদ্ধতির প্রচারের দিকে লক্ষ্য রেখেই চর্যাপদ গানের আকারে লেখা হয়েছিল।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল থেকে চর্যাপদের পুথি আবিষ্কার করে (১৯০৭) বাংলা সাহিত্যের নষ্টকোষ্ঠী উদ্ধার করেছেন। প্রায় দশ বছর পরে তাঁর সম্পাদনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে চর্যাপদের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় (১৯১৬)।

চর্যাপদ 'সন্ধ্যা-ভাষা' অর্থাৎ সাঙ্কেতিক ভাষায় লেখা। অদীক্ষিত বা

অনধিকারীর কাছে তাঁদের ধর্মসাধনার তত্ত্ব গোপন রাখাই চর্যাপ্রণেতার অভিপ্রেত ছিল বলে মনে হয়।

সিদ্ধাচার্যগণ সাধনভজনের তত্ত্বকথা বললেও অল্পবিস্তর কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। ভাষা, ছন্দ ও কাব্যরূপ নির্মাণে এঁদের যে দক্ষতার পরিচয় ছিল তা অস্বীকার করা যায় না। রহস্যময় ধর্মীয় আচার-আচরণকে তাঁরা কাব্যলোকে উন্নীত করেছেন। বাঙালীর প্রতিদিনের ধূলিমলিন জীবনের ছবি, সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্না এই সব পদে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

সাধক কবি বিবিধ অলঙ্কারসজ্জায় তাঁদের উপলব্ধির আনন্দকে প্রকাশ করেছেন: একটি পদে কবি বলেছেন,

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী॥

(আমার চিত্তরূপ নৌকো সোনার অর্থাৎ সর্বশূন্যতায় পূর্ণ। যেখানে রূপ-বেদনাদি বস্তুজগতের স্থান নেই।)

চর্যার একটি পদে হরিণ শিকারের বর্ণনাও আছে,

কাহেরে ঘেণি মেলি আচ্ছহু কীস।
বেঢ়িল হাক পড়অ চৌদীস॥
আপণা মাংসে হরিণা বৈরী।
খনহ ন ছাড়অ ভুসুকু আহেরি॥

(শিকারীরা চারদিক বেষ্টন করে হরিণকে মারবার চেষ্টা করছে। কালরূপ শিকারী চারদিক থেকে যে মার মার শব্দ করেছিল তা চিত্তহরিণের কানে গেল। হরিণ নিজের মাংসের জন্যে নিজের শত্রু হয়েছে। তা জেনে কবি ভুসুকু সদ্‌গুরুর বচনরূপ বাণ দ্বারা তাকে সর্বদা প্রহার করে।)

আর একটি পদে শবরবালিকাদের সাজসজ্জার বর্ণনা আছে,

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই শবরী বালী।
মোরাঙ্গী পীচ্ছ পরহিণ শবরী গিবত গুঞ্জরী মালী॥

(উচ্চ পর্বতে শবর বালিকারা বসবাস করে। তারা ময়ূরের পুচ্ছ পরিধান করে এবং কণ্ঠে পরে গুঞ্জার মালা।)

চর্যাপদের সমাজচিত্র ও সাহিত্যসম্পদ

সাহিত্য হল সমাজের দর্পণ। সাহিত্যের মাধ্যমে একটা যুগের ধ্যান-ধারণা এবং বিশেষ বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে। সেই কারণেই চর্যাপদাবলীর মধ্যে হাজার বছর আগেকার বঙ্গদেশের সমাজের ছবি ধরা পড়েছে। অনেকগুলি পদেই আছে নদীমাতৃক বঙ্গদেশের ছবি:

ভবণই গহণ গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল, মাঝে ন থাহী।

(এই পৃথিবী বেগবান নদীর মতো। এতে বিষয় তরঙ্গ উত্থিত হয় বলে এই নদী ভয়ংকর। নদীর দুই তীর দোষরূপ পাঁকে ঢাকা এবং মাঝেও থৈ পাওয়া যায় না।) আর একটি পদে পাই,

গঙ্গা জউনা মাঝেরেঁ বহই নাই।
তঁহি বুড়িলী মাতঙ্গী জোইআ লীলে পার করেই ॥

(গঙ্গাযমুনার মাঝে নৌকো ভেসে যায়, মাতঙ্গী নামে এক ডোমনী যোগীকে অক্লেশে নদী পার করে।)

বঙ্গদেশের সমাজ ও সংস্কৃতিতে নদনদীর প্রভাব অপরিসীম। তাই চর্যাপদে সাধনার গোপন কথা বলতে গিয়ে বারবার রূপক হিসেবে নদ-নদী, খাল-বিলের কথা এসেছে। ডোম্বীরা নদী পারাপার করত এবং জেলেরা উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল নদীতে জাল ফেলে অপেক্ষা করে থাকত। কোনো কোনো পদে নৌকো করে বাণিজ্যযাত্রার ইঙ্গিত রয়েছে। একটি পদে নৌকোযাত্রার বর্ণনায় বলা হয়েছে,

সোনে ভরিতী করুণা নাবী।
রূপা থোই নাহিক ঠাবী ॥

মনে হয় সমাজে সোনা-রূপোর ব্যবসা ছিল, এবং জলপথেই এইসব বাণিজ্য চলত।

সমাজে চুরি-ডাকাতিও বড়ো কম ছিল না। কুক্কুরী পাদের একটি পদে বধূর কর্ণভূষণ চুরির কথা আছে। বউটি ঘরের মধ্যে কর্ণভূষণ পরে শুয়েছিল, গভীর রাতে চোর এসে নিয়ে গেল সেই অলঙ্কার। অসতর্কতার জন্যে কর্ণভূষণ চুরি যাওয়ায় শ্বশুর-শাশুড়ীর গঞ্জনার ভয়ে সারা রাত বউটির চোখে আর ঘুম এল না। কোনো কোনো পদে দেখা যায় চুরিডাকাতির হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সে যুগের বাসগৃহে পাহারার ব্যবস্থা ছিল, এমন কি ঘরে তালা লাগাবার কথাও জানা যায়।

ধুমধামের সঙ্গে বিবাহ উৎসব অনুষ্ঠিত হত, বিবাহে যৌতুক প্রথাও প্রচলিত ছিল। কাহ্ন পাদের একটি পদে তার উল্লেখ আছে—

ডোম্বী বিবাহি আ অহারিউ জাম।
জউতুকে কিঅ আনুতু ধাম ॥"

ভাল যৌতুক পেলে নিম্নবর্ণের পাত্রীকে ঘরে আনতেও আপত্তি ছিল না।

বঙ্গদেশে তখন যৌথ পরিবার প্রথা চালু ছিল। দারিদ্র্যের নির্মম কশাঘাতে সে যুগের সমাজজীবন ছিল জর্জরিত। লাঞ্ছিত জীবনের করুণ আর্তনাদ ফুটেছে একটি পদে—

টালত মোর ঘর নাহি পড়বেষী।
হাঁড়ীত ভাত নাহি নিতি আবেশী ॥

অর্থাৎ টিলার ওপর ঘর, ধারে কাছে আপনজন কেউ নেই, হাঁড়িতে নেই ভাত, তবু বেঁচে থাকতে হবে। এ যেন বঞ্চিত জীবনের করুণ আর্তনাদ।

শ্রেণীবৈষম্য ছিল অত্যন্ত প্রকট। নিম্নবর্ণের মানুষের উপর উচ্চশ্রেণীর মানুষের অত্যাচার ও অবিচারের সীমা ছিল না। 'নগর বাহিরিরে ডোম্বী তোহারি

কুড়ি আ', অথবা 'উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই শবরী বালী', এই সব পদ থেকে জানা যায় আর্যেতর অন্ত্যজ শ্রেণীর মানুষ সভ্য নাগরিক জীবন থেকে বহু দূরে সরে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এদের জীবিকা ছিল তাঁত বোনা, নৌকা চালানো, হরিণ শিকার, অথবা মদ বিক্রী করা।

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ তাঁদের ধর্ম ও তত্ত্বকে চর্যাপদে প্রকাশ করতে গিয়ে যেমন উপস্থিত করেছেন সমাজের ছবি, তেমনি আমাদের রসের অমৃতসাগরে পৌঁছে দিয়েছেন। একটি পদে রোমান্টিক পরিবেশ সৃষ্টি করে শবর-শবরীর উদ্দাম প্রণয়-লীলা ব্যক্ত করা হয়েছে। পর্বতের চূড়ায় ময়ূরের পুচ্ছ পরিধান করে গলায় গুঞ্জর ফুলের মালা ঢুলিয়ে শবরী শবরকে আকর্ষণ করত। শবরপাদের একটি পদে শবর-শবরীর প্রেমের ছবি ধরা পড়েছে।

উঁচা উঁচা পাবত তহিঁ বসই শরবী বালী
মোরঙ্গী পীচ্ছ পরহিন শবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।

তত্ত্ব ছাড়াও কাব্য হিসেবে এই পদগুলি উপভোগ্য। এখানে পাই নরনারীর চিরন্তন প্রেমলীলার মধুর আস্বাদ।

জ্যোৎস্নাধোয়া উঁচু পাহাড়ের টিলায় কার্পাস ফুল ফুটেছে, তারই মাঝে শবর-শবরীদের গৃহ। ধান পাকলে তারা আনন্দে মেতে উঠত এবং কঞ্চি হাতে পাকা ফসলের মাঠে বসে পাহারা দিত। সে যুগের দারিদ্র্য-লাঞ্ছিত জীবনের বেদনাময় অসংখ্য ছবিও উপহার দিয়েছেন চর্যাকারগণ।

চর্যাপদে ধর্মীয় তত্ত্বকথা বলতে গিয়ে কবিরা বাস্তব জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেছেন। এঁকেছেন সুখ-দুঃখ দিয়ে গড়া মানবিক আবেদনের অসংখ্য ছবি। জীবনের গভীর বাণী তাঁরাও শোনাতে চেয়েছেন, চেয়েছেন জীবনের প্রান্তে মুক্তির গান গাইতে। এখানেই চর্যাপদের সাহিত্যিক মূল্য বা মানবিক আবেদন।

অনুশীলনী

১। বাঙালী জাতি ও বঙ্গদেশের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। সংক্ষেপে বাংলাভাষার ইতিহাস বর্ণনা কর।

৩। বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ কীভাবে করা হয়েছে আলোচনা কর।

৪। চর্যাপদ কাকে বলে? সংক্ষেপে চর্যাপদের সাহিত্যগুণ বিচার কর।

৫। চর্যাপদে বঙ্গদেশের যে-সামাজিক অবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

৬। আদি বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন কী? কতদিন আগে এটি রচিত হয়? কে, কবে, কোথা থেকে এই সাহিত্যিক নিদর্শন আবিষ্কার করেন?

৭। চর্যাপদের মাধ্যমে সে যুগের বঙ্গদেশের যে-সামাজিক ছবি ফুটে উঠেছে তার বর্ণনা দাও।

১০। টীকা লেখ: চর্যাপদ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

দ্বিতীয় অধ্যায়

মধ্যযুগ

তুর্কীবিজয় ও তার ফলশ্রুতি—সামাজিক অবস্থা

বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন (১১৫৮ খ্রীঃ অব্দে) বঙ্গদেশে সেন বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্য, বৈদিক যাগযজ্ঞ দ্বারা বৌদ্ধ-বাঙালীকে ব্রাহ্মণ্য মতাশ্রয়ী করবার চেষ্টা করেন। কিন্তু তার আগেই ঘটে তুর্কী আক্রমণ। তুর্কী অধিনায়ক বখ্‌তিয়ার খিল্‌জী লক্ষ্মণসেনের রাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। অতর্কিত আক্রমণে লক্ষ্মণসেন রাজধানী ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে পালিয়ে যান (১১৯৯ বা ১২০২ খ্রীঃ অঃ)। কিছুদিনের মধ্যে গৌড়ভূমিতে ইসলাম-ধর্ম ও তুর্কী শাসন প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু সেনযুগে বাংলার সংস্কৃতির ওপর যে ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শ ও সংস্কৃত সাহিত্যের প্রভাব পড়েছিল তারই ফসল ফলেছিল পরবর্তী চৈতন্যযুগে।

বিদেশী আক্রমণ জাতির জীবনে যে অধঃপতন ও অবক্ষয় আনে বাংলার তুর্কী আক্রমণেও তাই হয়েছিল। বাংলার সমাজ ও ধর্মজীবনে এই আক্রমণের গুরুতর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। বিজিত দেশের মন্দির, মঠ, বিহার প্রভৃতি ধ্বংসের এক ব্যাপক অভিযান চলে। সেই কারণে তুর্কী বিজয়ের পর প্রায় দুশো বছর ধরে বাংলা সাহিত্য রচনার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি। মঠ-মন্দিরে সংরক্ষিত গ্রন্থগুলি এইসব ধ্বংসযজ্ঞে বিনষ্ট হয়। তাই চর্যাপদের পর বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে এক বিশাল শূন্যতার যুগ।

বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন পাওয়া না গেলেও এই যুগে লেখা সংস্কৃত অভিধান, স্মৃতি, পুরাণ প্রভৃতি বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে।

১২০৩ খ্রীঃ অব্দে বখ্‌তিয়ার খিলজী নিহত হলেও খিলজি ওমরাহগণ বঙ্গদেশে তাঁদের প্রাধান্য বজায় রেখেছিলেন। এরপর কিছুদিন চলে দিল্লীর সুলতানী শাসন।

দিল্লীর পাঠান সুলতানদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগে বঙ্গদেশে ইলিয়াসশাহী বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। মাঝখানে হিন্দু রাজা গণেশ কিছুকাল বাংলার সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। কিন্তু তাঁর পুত্র যদু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়ে হিন্দুদের ওপর প্রবল অত্যাচার করেন। এর পর আবার ইলিয়াসশাহী বংশের রাজত্ব এবং হাবসী সুলতানের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই হাবসী সুলতানকে হত্যা করে হুসেন শাহ বঙ্গদেশে হুসেনশাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত করেন।

তুর্কী আক্রমণের সময় থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাঙালীর সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবন আলোচনা করলে দেখা যাবে, প্রথম দিকে নিষ্ঠুর বিদেশী শাসন বাঙালী হিন্দুর মনে ভীতি ও ঘৃণার কারণ হয়েছিল। ইলিয়াসশাহী আমলে এই তিক্ত সম্পর্ক অনেকটা হ্রাস পায়। অনেক হিন্দু বাঙালী রাজসভায় সম্মানের আসন

লাভ করেন এবং অনেক বাঙালী কবি সুলতানের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে কাব্য রচনায় ব্রতী হন।

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকে সামাজিক অবস্থার আরও পরিবর্তন হয়। প্রাক্-চৈতন্য যুগেই সমাজে ও ধর্মাচরণে বৈষ্ণবধর্মের আচার-অনুষ্ঠান জনপ্রিয় হয়। পুরাণের অনুশীলন সমাজে আবার প্রাধান্য লাভ করে। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ আরম্ভ হয়।

তুর্কী আক্রমণের দ্বারাই প্রমাণিত হল, বাঙালীর রাজনৈতিক চেতনা অপেক্ষা ধর্মের প্রতি আগ্রহ ছিল বেশি। তাই সেদিনের বাঙালী রাজনৈতিক প্রতিরোধের চেয়ে ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারে আগ্রহী হয়েছিল। নিজের ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি যাতে প্রতিকূল অবস্থায় টিকে থাকতে পারে সেদিকেই তাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

বিভিন্ন আর্য দেবদেবী এমন কি মনসা, চণ্ডী, ধর্ম প্রভৃতি অনার্য দেবদেবীকেও হিন্দু ধর্মের অন্তর্ভুক্ত করে তাঁদের হিন্দু দেবদেবীর মর্যাদায় ভূষিত করা হল। এই সব কাজের মধ্যে রাজনৈতিক প্রতিরোধ নেই, আছে সমাজ ও ধর্ম সংগঠনের প্রয়াস। মুসলমান বিজয় আমাদের পৌরাণিক চেতনার উন্মেষ এবং সমাজ সংস্কারে সাহায্য করেছে।

প্রাক্-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবসাহিত্য

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তুর্কী-আক্রমণ বাংলার সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে এক স্মরণীয় ঘটনা। বিদেশী শক্তির কাছে পরাজিত বাঙালী সেদিন ধনপ্রাণ নিয়ে বিব্রত। তাই প্রায় দেড়শ বছরের সাহিত্য-ভাগীরথীর বুকে চলেছিল ভাঁটার টান। অবশেষে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইলিয়াসশাহী আমলে বিদেশী শাসনের প্রবল বেগ মন্দীভূত হয়ে এলে আবার সাহিত্য রচনা ও অনুশীলন-পর্ব শুরু হল। ১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দে শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাব। সূর্য ওঠার আগে যেমন ব্রাহ্ম মুহূর্ত, শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগে তেমনি প্রাক্-চৈতন্য পর্ব। চৈতন্যযুগের সাহিত্যের লক্ষণগুলি তাঁর পূর্বযুগের সাহিত্যে অস্পষ্ট আকারে ফুটে উঠতে শুরু করেছিল। বাঙালীর ধর্মাচরণে বৈষ্ণব প্রভাব আর পুরাণাদির চর্চা চতুর্দশ শতাব্দীতেই সমাজে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। রামায়ণ-মহাভারত আর ভাগবতের অনুবাদও এযুগে শুরু হয়েছিল।

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ

"মুছিআঁ পেলায়িবোঁ [মো] য়ে সিসের সিন্দুর
বাহুর বলয় মো করিবোঁ শংখচুর।"

প্রাক্-চৈতন্য-যুগের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাব্য হল বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। প্রাচীন এই কাব্যটি সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়ে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। মুদ্রণের পর থেকে এই কাব্যকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যার সৃষ্টি

হয়েছে, তর্কের ঝড় উঠেছে পণ্ডিত-সমাজে। তবু তর্কের অবসান হয় নি, হয় নি সমস্যার সমাধান।

চণ্ডীদাসের নাম ভক্ত বাঙালীর হৃদয়ে চিরকাল মুদ্রিত হয়ে আছে। স্বয়ং চৈতন্যদেব চণ্ডীদাসের পদাবলীর রসাস্বাদন করতেন। বিংশ শতাব্দীর আগেও পণ্ডিত-সমাজ চণ্ডীদাসকে এক ও অদ্বিতীয় বলে মনে করতেন।

অবশেষে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় বাঁকুড়া জেলার কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামে একখানি পুঁথি আবিষ্কার করেন। কবির নাম বড়ু চণ্ডীদাস। কাব্যটি ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যের প্রাচীনতা আর চণ্ডীদাস-সমস্যা নিয়ে উঠল প্রচণ্ড তর্কের ঝড়। তবে এ কথা অস্বীকার করা যায় না, চর্যাপদ যেমন প্রাচীন বাংলার নিদর্শন, তেমনি শ্রীকৃষ্ণকীর্তনও মধ্যযুগীয় বাংলার সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন। ভাষার উদাহরণ-স্বরূপ কয়েকটি পদ পরিবেশিত হল :

"সুসর বাঁশীর নাদ শুনিআঁ বড়ায়ি
রান্ধিলোঁ যে সুনহ কাহিনী।
অম্বল ব্যঞ্জনে মো বেশোআর দিলোঁ।
সাকে দিলোঁ কানাসোআঁ পাণী ॥"

অথবা "কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে ॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা ॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পায়ে বড়ায়ি মো কৈলোঁ কোন দোষে ॥

সম্পাদক মহাশয় এই কাব্যের নাম দিয়েছেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।[১] কাব্যের বিষয় রাধাকৃষ্ণের লীলা। কাব্যের মধ্যে কবি নিজেকে শক্তিদেবী বাশুলীর সেবক বলে উল্লেখ করেছেন আর নিজের নামোল্লেখ করেছেন বড়ু চণ্ডীদাস বলে। এ ছাড়া বড়ু চণ্ডীদাস আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কোনো ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায় না।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটি তেরটি খণ্ডে বিভক্ত। জন্মখণ্ডে বলা হয়েছে কংসের অত্যাচার থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করবার জন্যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর 'পদুমার উদরে' স্বর্গের লক্ষ্মীদেবী রাধারূপে জন্মগ্রহণ করেন। কাব্যারম্ভের এই প্রাথমিক অংশটুকু ছাড়া আর কোথাও ঈশ্বরপ্রসঙ্গ এসে মানুষের স্থান দখল করে বসে নি। আগাগোড়া কাব্যটি আলোচনা করলে দেখা যাবে, কেবল

১ কিন্তু এই কাব্যের মূল নাম যে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' ছিল তা সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-নাম এত প্রতিষ্ঠিত যে নামকরণ-সম্পর্কে এখন আর প্রশ্ন তোলা বৃথা।

রূপেই নয়, স্বরূপের দিক থেকেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পদাবলী-সাহিত্য থেকে ভিন্ন। এই কারণে পদাবলী-সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচ্য গ্রন্থের স্থান ও মর্যাদা নিয়ে নানা বিতর্কের ঝড় উঠেছে।

মধ্যযুগীয় কাব্যে চণ্ডীদাসের প্রাধান্যের মূল কারণ ছিল শ্রীচৈতন্যদেব-কর্তৃক তাঁর রসাস্বাদন। 'চৈতন্যচরিতামৃত'-গ্রন্থে বলা হয়েছে :

"বিদ্যাপতি জয়দেব চণ্ডীদাসের গীত।
আস্বাদয়ে রামানন্দ-স্বরূপ-সহিত॥"

চৈতন্যদেবের স্বীকৃতিকে কেন্দ্র করেই চণ্ডীদাস-নামের এই প্রতিষ্ঠা। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন আবিষ্কারের পর রসিক-সমাজের মনে দুটি প্রশ্ন জেগেছে—(১) পদকর্তা চণ্ডীদাস ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের চণ্ডীদাস কি একই ব্যক্তি? (২) যদি তাঁরা পৃথক্ ব্যক্তি হয়ে থাকেন, তা হলে শ্রীচৈতন্যের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি কোন্ চণ্ডীদাস পেয়েছিলেন? এ সমস্যার মীমাংসা এবং তর্কের অবসান আজও হয় নি।

ভাগবত-পুরাণকে কিছুটা অনুসরণ করে আর জয়দেব গোস্বামীর গীতগোবিন্দের প্রভাব শিরোধার্য করে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন রচিত। এতে জন্ম-খণ্ড থেকে রাধা-বিরহ পর্যন্ত মোট তেরটি খণ্ড বা অধ্যায় আছে। প্রথমে আছে কৃষ্ণের প্রতি রাধার বিরূপতা, কিন্তু নানা অবস্থার মধ্য দিয়ে রাধার মোহ অপগত হল এবং তিনি নিজের ও কৃষ্ণের স্বরূপ বুঝতে পারলেন, তখন হল উভয়ের মিলন। কিন্তু কংসবধের জন্যে কৃষ্ণ মথুরায় চলে গেলেন। বিরহব্যাকুল রাধার কণ্ঠে শেষ বারের মতো শুনতে পেলাম :

'যবে কাহ্নে না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে॥"

আবার কোথাও প্রেম-ব্যথিত বিরহী হৃদয়ের স্পন্দন ধ্বনিত হয়েছে—

"দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপণ সুন তোঁ বসী
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মার হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কাহ্নে করিল কোলে
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে॥"

এই বিলাপের মাঝখানেই পুঁথির শেষের কয়েকটি পাতা নষ্ট হয়ে গেছে। যেহেতু ভারতীয় কাব্যাদর্শে বিরহের মধ্যে কাব্য শেষ হত না, তাই মনে হয় পরে কবি রাধা-কৃষ্ণের মিলন ঘটিয়েছিলেন। এই কাব্যের নাট্যগুণ ও চরিত্র-চিত্রণ অতি সুন্দর। একমাত্র কৃষ্ণচরিত্রটি বাদ দিলে কবি অন্যান্য চরিত্রাঙ্কনে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে মূল চরিত্র তিনটি। কৃষ্ণ, রাধা এবং বড়াই। কৃষ্ণের প্রতি রাধার বিরাগ কীভাবে দূর হল এবং কীভাবে রাধা-চন্দ্রাবলী কৃষ্ণকে সর্বস্ব সমর্পণ করলেন দক্ষতার সঙ্গে আলোচ্য কাব্যে সে কথাই বর্ণিত হয়েছে। বড়াই-চরিত্র নতুনত্বের দাবি রাখে। তবে কৃষ্ণ-চরিত্রে সামঞ্জস্য রক্ষিত হয় নি। কৃষ্ণের

আচরণ অত্যন্ত গ্রাম্য। ছলে-বলে-কৌশলে রাধাকে হস্তগত করাই যেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু এই কাব্যের নানাস্থানে কবি অদ্ভুত দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। জীবন-সম্বন্ধে কবির বাস্তবনিষ্ঠ অভিজ্ঞতা ছিল। কাব্যের ভাষা কখনও তির্যক্, কখনও বা স্নিগ্ধ। রচনার নানা স্থানে অলঙ্কার-প্রয়োগে শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। বাংলা পয়ার ত্রিপদী ও লৌকিক ছন্দের প্রথম যথার্থ শিল্পী বড়ু চণ্ডীদাস।

নাট্যধর্মী সংলাপ-রচনায় কবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যেমন,

কৃষ্ণ॥ "কি বহিব ভার তোর বোলে নাহিঁ ভাষ।
লোকেতেঁ আহ্মার করাইলেঁ উপহাস॥"

রাধা॥ "লোক কেহ্নে উপহাস করিব তোমারে।
কোন গোয়াল সে নাহি বহে ভারে॥"

সংস্কৃত পুরাণ আর লৌকিক কাহিনী মিলিয়ে কবি যে-বিচিত্র কাব্যমূর্তি নির্মাণ করেছেন, মধ্যযুগে এর দৃষ্টান্ত বিরল। কেউ কেউ বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যে অশ্লীলতা এবং গ্রাম্য স্থূলরুচির নিন্দা করেন, কিন্তু সে দোষ একমাত্র কবির ঘাড়ে চাপালেই চলবে না। সংস্কৃত বা অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যে আদিরসাত্মক বর্ণনায় অশ্লীলতার বাঁধ না মানাই ছিল সাধারণ রীতি। তা ছাড়া, সেযুগের সমাজ ও সমালোচক হয়তো তাদের স্থূলরুচির জন্যে এ সাহিত্য পাঠ করতে সঙ্কোচ বোধ করত না। যুগভেদে শিক্ষাদীক্ষার ভেদে রুচির বদল হয়। সুতরাং অশ্লীলতার অপরাধ থেকে আমরা বড়ু চণ্ডীদাসকে অব্যাহতি দিতে পারি।

বিদ্যাপতির পদাবলী ঃ

"অব মথুরাপুর মাধব গেল।
গোকুল মাণিক কো হরি লেল॥
গোকুলে উছলল করুণাক রোল।
নয়নক জলে দেখ বহএ হিল্লোল॥"

শ্রীচৈতন্যদেবের (১৪৮৬-১৫৩৩ খ্রীঃ) আবির্ভাবের পূর্বে উত্তর ভারতের যে-সব বৈষ্ণব কবি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদাবলী রচনা করেছিলেন তাঁদের মধ্যে মিথিলার বিদ্যাপতি সর্বশ্রেষ্ঠ। প্রাচীন মৈথিলীতে কবিতা লিখলেও বিদ্যাপতি ছিলেন বাংলার প্রাণের কবি।

বিদ্যাপতির ওপর আমাদের এই দাবি যে কতখানি সঙ্গত পণ্ডিতপ্রবর রামগতি ন্যায়রত্নের উক্তি থেকে তা বোঝা যায়। তিনি বলেছেন, "বিদ্যাপতি মিথিলাবাসী হইলেও তাঁহাকে আমরা বাংলার প্রাচীন কবিশ্রেণীভুক্ত বলিয়া দাবি করিতে ছাড়িব না; যেহেতু বিদ্যাপতির সময়ে মিথিলা ও বঙ্গদেশে এখনকার অপেক্ষা অধিকতর ঘনিষ্ঠতা ছিল।……অনেকের মতে বাংলার সেনবংশীয় রাজাদিগের সময়ে বঙ্গদেশ ও মিথিলা অভিন্ন রাজ্য ছিল এবং সম্ভবতঃ উভয় দেশের ভাষাও অনেকাংশে একবিধ ছিল, …অতএব যখন বঙ্গদেশ ও মিথিলার এতদূর ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ পাইতেছে তখন যে-কবি কবি জয়দেবের প্রণীত 'গীতগোবিন্দে'র অনুকরণে রাধাকৃষ্ণের

লীলাবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন,—যে সকল সঙ্গীত বঙ্গদেশের ধর্মপ্রবর্তয়িতা চৈতন্যদেব পাঠ করিয়া মোহিত হইয়াছিলেন, যাহা 'বঙ্গদেশীয় প্রাচীন কবির প্রণীত' এই বোধেই পরম ভক্তিভরে বঙ্গদেশীয় গায়কগণ বহুকাল হইতে সংকীর্তন করিয়া আসিতেছেন এবং যে-সকল সঙ্গীতের অনুকরণেই বঙ্গদেশীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায় শতশত গীত রচনা করিয়াছেন, আজি আমরা সেই কবিকে মিথিলাবাসী বলিয়া বঙ্গদেশীয় কবির আসন হইতে সরিয়া বসিতে বলিতে পারিব না।" বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিদ্যাপতির প্রতিষ্ঠাভূমি এই উক্তির মধ্যে সার্থকভাবে আভাসিত হয়েছে।

চৈতন্যদেব-কর্তৃক আস্বাদিত হওয়ার ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করেই তাঁর কাব্য বঙ্গদেশে এক অপূর্ব রসমর্যাদা লাভ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে বাংলা বৈষ্ণব-পদাবলীর ইতিহাসেও এসেছিল এক নতুন ভাবের জোয়ার। তাঁর কাব্যের ঐতিহ্যে এবং ভাষার অনুকরণে বাঙালী কবিরা কাব্য রচনা করতেন। চৈতন্য-পরযুগের বিখ্যাত কবি গোবিন্দদাস কবিরাজ তাঁরই প্রেরণায় কাব্য রচনা করে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' অভিধায় ভূষিত হয়েছিলেন। ফলকথা, বাংলা পদাবলী-সাহিত্যের আলোচনা বিদ্যাপতি ছাড়া অপূর্ণ ও অসার্থক।

বিদ্যাপতি কোন্ ভাষাতে কাব্য রচনা করেছিলেন তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ আছে। তাঁর ভণিতায় কতগুলি বাংলা পদও পাওয়া যায়, বলা বাহুল্য, মিথিলায় বসে বিদ্যাপতি বাংলা পদ লিখেছেন বলে মনে হয় না। পরে দেখা গিয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীতে ছোটো বিদ্যাপতি নামে একজন কবি বিদ্যাপতির অনুকরণে কিছু বৈষ্ণব-কাব্য রচনা করেছিলেন। বিদ্যাপতির ভণিতাযুক্ত বাংলা পদ তাঁর রচনা বলে মনে হয়। এ ছাড়াও বিদ্যাপতির নিজের পদাবলীর মধ্যে অনেক বাংলা শব্দ প্রবেশ করায় এক অভিনব ভাষার জন্ম হয়েছে। এই অভিনব মিশ্রভাষার নাম 'ব্রজবুলি'। পরবর্তী কালে এই শ্রুতিমধুর কৃত্রিম ব্রজবুলি-ভাষায় বৈষ্ণব-পদকর্তারা কাব্য রচনা করেছেন। এমন কি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত এই ব্রজবুলির শ্রুতিমাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে রচনা করেছিলেন 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'—

"শাঙন গগনে ঘোর ঘনঘটা
নিশীথ যামিনী রে।
কুঞ্জপথে সখি, কৈসে যাওব
অবলা কামিনীরে।"

ব্রজবুলি যতই শ্রুতিমধুর হোক না কেন, একটা কথা মনে রাখতে হবে, এ ভাষার স্রষ্টা বিদ্যাপতি নন এবং এই ভাষাতেও বৃন্দাবনের গোপ-গোপীরা কথা বলতেন না। ব্রজবুলি সম্পূর্ণ এক কৃত্রিম ভাষা। প্রাচীন মৈথিল ভাষা অবহট্টার সঙ্গে তৎকালীন বাংলা ভাষার মিলনে যে-কৃত্রিম ভাষার সৃষ্টি হয়েছে তার নাম 'ব্রজবুলি'। বিদ্যাপতির বিখ্যাত একটি পদের অংশবিশেষ উদাহরণ-হিসেবে উপস্থিত করছি:

"সখি কি পুছসি অনুভব মোয়।
সোই পিরীতি অনুরাগ বখানিতে
তিলে তিলে নূতন হোয়॥

জনম অবধি হম রূপ নেহারলুঁ
নয়ন না তিরপিত ভেল।
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তব হিয়ে জুড়ন না গেল।"

মিথিলায় বিদ্যাপতি 'মৈথিল কোকিল' নামে পরিচিত ছিলেন। রাজা শিবসিংহ তাঁর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে কবি তাঁর রচিত অনেক পদে শিবসিংহের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন।

আনুমানিক চতুর্দশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (অর্থাৎ ১৩৬০ থেকে ১৩৮০ খ্রীঃ মধ্যে) মিথিলার বিসফী গ্রামে এক শৈব ব্রাহ্মণ-বংশে বিদ্যাপতির জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম গণপতি ঠাকুর। সম্ভবত পঞ্চদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে (১৪৬০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি) তাঁর মৃত্যু হয়।

বিদ্যাপতি ছিলেন পণ্ডিত-বংশের সন্তান। তিনি নিজেও সংস্কৃত-ভাষা-সাহিত্য ও স্মৃতি-সংহিতায় বিশেষ সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু তাঁর পাণ্ডিত্য তাঁকে অমরতা দান করে নি, তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে তাঁর পদাবলী-সাহিত্য। ঐগুলিই তাঁর প্রতিভার প্রধান পরিচয়। অবশ্য তিনি হরপার্বতী ও অন্য বিষয় অবলম্বন করে আরও অনেক কাব্য রচনা করেছিলেন, কিন্তু সেগুলিতে কবিত্বশক্তির চেয়ে পাণ্ডিত্যের প্রকাশ ঘটেছে বেশি। এই পাণ্ডিত্য আর কাব্যপ্রতিভার মিলনে সৃষ্টি হয়েছে তাঁর বৈষ্ণব-পদাবলী-সাহিত্য। সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্র অনুসরণ করে তাঁর কাব্যে নায়ক-নায়িকার পূর্বরাগ, মিলন, অভিসার, বিরহ প্রভৃতির চিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

পুরাণের প্রভাব ছাড়াও জয়দেবের গীতগোবিন্দের দ্বারা বিদ্যাপতি বেশি প্রভাবিত হয়েছেন। জয়দেবের আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার জন্যে মিথিলায় তিনি 'অভিনব জয়দেব' নামে খ্যাত।

জয়দেবের রাধার সঙ্গে বিদ্যাপতির রাধারও কোথায় যেন মিল আছে। তাঁরা দু'জনেই মর্ত্যজীবনের ভোগবিলাসকে অবলম্বন করে জীবন শুরু করেছেন। প্রেমঘন চাঞ্চল্য আর দেহজ কামনার বিকাশ ঘটেছে পূর্বরাগ বা মিলনের মধ্যে। অন্যদিকে বিরহে এই রাধা আবার বেদনাবিষণ্ণ। ভরা ভাদ্রের বর্ষার রাতে তাঁর অন্তর বিলাপে ভেঙে পড়ে :

"সখি হমারি দুখক নাহি ওর।
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।"

তাঁর কাব্যে আদিরসকে ভিত্তি করেই এক উচ্চতর মার্গে উত্তরণের ইঙ্গিত আছে। প্রার্থনাবিষয়ক পদের মধ্যে হৃদয়ের যে-আকুতি প্রকাশ পেয়েছে তাতে কবির বৈষ্ণব ভক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করা যায় :

"মাধব বহুত মিনতি করি তোয়।
দেই তুলসী তিল দেহ সমর্পিলুঁ
দয়া জনি ছোড়বি মোয়।"

শ্রীচৈতন্য-যুগের আদর্শে হয়তো বিদ্যাপতিকে বৈষ্ণব বলা চলে না, কিন্তু তাঁর মধ্যে বৈষ্ণবীয় ভক্তিকে অস্বীকার করা যায় না। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব কাব্যের ওপর বিদ্যাপতির প্রভাব থেকেই তাঁর স্বরূপ বোঝা যায়। বহু বৈষ্ণব-কবি তাঁরই ভাষা, ছন্দ, অলঙ্কার ও গীতিধর্মিতার পথ ধরে অগ্রসর হয়েছেন।

চণ্ডীদাসের পদাবলী ঃ

"গুরুজন আগে দাঁড়াইতে নারি
সদা ছলছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিক নেহারিতে
সব শ্যামময় দেখি॥"

চণ্ডীদাস-সমস্যা বাংলা সাহিত্যের এক জটিল সমস্যা। চণ্ডীদাস ক'জন, কে কার পরে পদাবলী রচনা করেছেন, চৈতন্যদেব কোন্ চণ্ডীদাসের পদাবলীর রস আস্বাদন করতেন, এসব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় নি। তবে এ কথা ঠিক, আমাদের পূর্ব আলোচিত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তন কাব্যখানি শ্রীচৈতন্য আস্বাদন করতেন না। কারণ এখানে প্রেমের জৈবিক আকুতি ও কাব্যের অন্তর্নিহিত স্থূলতা শ্রীচৈতন্যের রুচিবিরুদ্ধ। সুতরাং তিনি যে পদকর্তার পদ আস্বাদন করতেন তিনি হলেন পদাবলীর চণ্ডীদাস। যিনি প্রায় চার-পাঁচশ বছর ধরে বাঙালীর হৃদয়-মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছেন, যাঁর কাব্য বাঙালীর কানের ভিতর দিয়ে মরমে প্রবেশ করে হৃদয়-রাধাকে আকুল করে তুলেছে, সেই চণ্ডীদাস।

চণ্ডীদাসের এই জনপ্রিয়তার জন্যেই যুগে যুগে 'কবি চণ্ডীদাসের' আবির্ভাব ঘটেছে। তাঁরা সকলেই চণ্ডীদাসের ভণিতার আড়ালে বসে কাব্যের সোনার তরীতে নিজেদের ক্ষেতের ফসল তুলে অমরত্ব লাভের পথ পরিষ্কার করেছেন। এই প্রবণতা থেকেই একাধিক চণ্ডীদাসের উদ্ভব। চণ্ডীদাস, বড়ু চণ্ডীদাস, দীন চণ্ডীদাস, দ্বিজ চণ্ডীদাস, দীনহীন চণ্ডীদাস, তরুণীরমণ চণ্ডীদাস—নামের আর অন্ত নেই। শ্রীচৈতন্য যে-কবির গানে মুগ্ধ হতেন তিনি অবশ্যই তাঁর পূর্বকালের কবি। কিন্তু এই কবির পদের সঙ্গে বহু তৃতীয়-চতুর্থ শ্রেণীর পদ যুক্ত হয়ে চণ্ডীদাস সমস্যাকে আরও জটিল, আরও উৎকট করে তুলেছে।

মহাপ্রভু যে-চণ্ডীদাসের পদ আস্বাদন করতেন তাঁর বিস্তারিত কোনো পরিচয় পাওয়া যায় না। এখন দেখা যাক পদাবলীর এই বিখ্যাত চণ্ডীদাস কোন্ গুণে মহাপ্রভুর মন-প্রাণ আচ্ছন্ন করেছিলেন এবং কোন্ জাদুস্পর্শেই বা চার-পাঁচ শতাব্দী ধরে বাঙালী পাঠকের চোখের জলে এনেছেন ভক্তির বন্যা। এর মূলে আছে চণ্ডীদাসের রাধা-চরিত্র। এই রাধা ও তাঁর প্রেমকে তিনি সমস্ত স্থূলতা থেকে

মুক্ত করে এক অধ্যাত্মতীর্থে স্থাপন করেছেন। এ-রাধার কৃষ্ণব্যাকুলতার মধ্যে দেহের আকাঙ্ক্ষা নেই, নেই ভোগের বাসনা। আছে হৃদয়ের সেই আকুলতা, যার টানে ভক্ত ছুটে যায় তার ভগবানের কাছে, জীবাত্মা-পরমাত্মার মিলনের জন্যে প্রহর গোণে।

চণ্ডীদাসের রাধা তাই কৃষ্ণের চরণে নিজেকে নিবেদন করে বলেন :

"বঁধু, কি আর বলিব আমি।
জীবনে মরণে জনমে জনমে
প্রাণনাথ হৈও তুমি॥
তোমার চরণে আমার পরাণে
বাঁধল প্রেমের ফাঁসি॥
সব সমর্পিয়া একমন হইয়া
নিশ্চয় হইলাম দাসী॥"

রাধার প্রেমের সাধনা এবং অধ্যাত্ম-সাধনা দুই মিলে এক হয়ে গেছে। এ তাঁর জীবন-উপলব্ধির সাধনা, 'কামগন্ধ নাহি তায়।'

চণ্ডীদাস সহজ সরল কথায়, পয়ার ও ত্রিপদী ছন্দে, অতি সাধারণ অলঙ্কার ব্যবহার করে রাধার যে অন্তর-বেদনাকে মূর্ত করে তুলেছেন, তা আমাদের কানের ভেতর দিয়ে প্রবেশ করে অন্তরকে আকুল করে তুলেছে।

বিশ্ব-সাহিত্যে চণ্ডীদাসের রাধা-চরিত্রের সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া দুর্লভ। এ চরিত্রের বড়ো বৈশিষ্ট্য হল এর ব্যঞ্জনা। কয়েকটি আভাসে ইঙ্গিতে কবি রাধার সূক্ষ্ম ভাবাবেগটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এই ভাবব্যাকুলতাই তাঁর কাব্যের সার্থকতা। চণ্ডীদাসের ভাষা-ছন্দ-বাক্যরীতি বড়ো সাদাসিধে, সামান্য তুলসীমঞ্জরীর গন্ধবাসিতমাত্র। তাই বলা হয়—চণ্ডীদাস যতবড়ো দ্রষ্টা ছিলেন ততবড়ো স্রষ্টা ছিলেন না। তিনি ছিলেন সহজ কথার সহজ রসের কবি। বিনা অলঙ্কারে বা সামান্য অলঙ্কারেই তিনি তাঁর কাব্য-সরস্বতীকে সাজিয়ে তুলেছেন।

কেউ কেউ কবিত্বের দিক্ থেকে বিদ্যাপতির প্রশংসা করেন বেশি। একথা ঠিক, রোমান্টিক ঐশ্বর্যে, ভাষায় ও অলঙ্কারে বিদ্যাপতি তুলনাহীন। সেই তুলনায় চণ্ডীদাস সরল-প্রাঞ্জল। কিন্তু ব্যঞ্জনার শক্তিতে চণ্ডীদাস বিদ্যাপতির চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী। চণ্ডীদাস যখন বলেন : 'আমার পরাণ যেমতি করিছে তেমতি হউক সে!' তখন মনে হয় এ ভাবের প্রকাশ কেবল ভাষা ও অলঙ্কারের দ্বারা সম্ভবপর নয়। রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্র-সম্পর্কে যা বলেছেন বিদ্যাপতির সম্পর্কেও সেকথা বলা চলে—তাঁর কাব্য যেন 'রাজকণ্ঠের মণিমালা—যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনই তাহার কারুকার্য।' কিন্তু চণ্ডীদাসের কাব্য যেন 'কৃষ্ণকণ্ঠের বনমালা'।

ভাষায় যাই থাক দুই কবিই প্রেমসাধনায় সমান,—দুজনেই রসতীর্থ-পথের পথিক।

চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতি :

চণ্ডীদাস ছিলেন ভাবের কবি। সাধারণ আটপৌরে ভাষায় সামান্যতম অলঙ্কার ব্যবহার করে অথবা বিনা অলঙ্কারেই তিনি তাঁর কাব্য-সরস্বতীকে সাজিয়ে তুলেছেন। মনের গভীর তারে আঘাত হেনে তিনি রাধার অন্তরবাসী বেদনাকে প্রকাশ করেছেন। যখন তিনি বলেন—

"সোই কেবা শুনাইল শ্যাম নাম—
কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিল গো
আকুল করিল মোর প্রাণ।"

তখন দেখি এই পদের আবেদন কেবল কানের দরবারেই নয়, আরও গভীরে, ভক্ত পাঠকের মনোরাজ্যে। অলঙ্কার-বর্জিত সহজ সরল ভাষায় লেখা আর একটি পদে চণ্ডীদাস প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করেছেন—

"চণ্ডিদাস-বাণী শুন বিনোদিনি,
পিরীতি না কহে কথা—
পিরীতি লাগিয়ে পরাণ ছাড়িলে
পিরীতি মিলয়ে তথা।"

অথবা, "পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর
এ তিন ভুবন-সার
এই মোর মনে হয় রাতিদিনে
ইহা বই নাহি আর!"

অন্যদিকে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞ বিদ্যাপতি ছিলেন মিথিলার রাজসভার কবি। রাজসভার বিদগ্ধ শ্রোতার কথা ভেবেই তাঁকে কাব্যে অনুসরণ করতে হয়েছে সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র। সংস্কৃত আদিরসাত্মক কাব্যের প্রভাবও তাঁর কোনো কোনো পদে লক্ষ করা যায়।

"যব গোধূলি-সময় বেলি
তব মন্দির-বাহির ভেলি।
নবজলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব বাঢ়াইয়া গেলি॥
সে যে অলপ বয়স বালা
জনু গাঁথনি পুহপ মালা।
থোরি দরশনে আশ না পূরল বাঢ়ল মদনজ্বালা॥"

এখানে প্রেমের চেয়ে বড়ো হয়ে উঠেছে দেহ, রূপাতীত চাপা পড়েছে রূপের ভারে। কিন্তু কেবল রূপ নয় রূপাতীত, দেহ নয় দেহাতীত প্রেম বিদ্যাপতির কাব্যেও প্রতিফলিত হয়েছে—

"কত মধু যামিনী রভসে গোঁয়ায়লু
না বুঝনু কৈছন কেল,
লাখ লাখ যুগ হিয়ে হিয়ে রাখলুঁ
তবু হিয়ে জুড়ন না গেল।

যত যত রসিকজন রস অনুমগন—
অনুভব কহে, না পেখে !
বিদ্যাপতি কহে প্রাণ জুড়াইতে
লাখে না মিলল একে ।"

অবশ্য এই ধরনের পদ বিদ্যাপতির খুব বেশি নেই, যা চণ্ডীদাসের রচনায় সহজলভ্য। কারণ রাজসভার কবি বলে মণ্ডনকলার বৈদগ্ধ্য, মার্জিত ভাষা, ছন্দের বিচিত্র ঐশ্বর্য, আদিরসের আতিশয্য বিদ্যাপতির কাব্যের বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছে। তাই চণ্ডীদাসের পদ আমাদের ব্যাকুল করে তোলে, কিন্তু বিদ্যাপতির পদে সেই উতরোল ভাব নেই। চণ্ডীদাস দুঃখের কথায় বড়ো, অন্যদিকে বিদ্যাপতি প্রেম ও মিলনের রহস্যে মাতিয়ে তোলেন। বিদ্যাপতির মধ্যে দেহের ভোগ বেশি, সুখের উল্লাস বড়ো। কিন্তু চণ্ডীদাসের মধ্যে বড়ো হয়ে উঠেছে দুঃখের অনুভূতি, যে অনুভূতি মনের গভীরে কোনো এক গোপন তারে আঘাত হানে। এক কথায় বিদ্যাপতি প্রত্যক্ষ, চণ্ডীদাস ব্যঞ্জনাধর্মী।

রবীন্দ্রনাথ বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের তুলনামূলক আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন— "বিদ্যাপতি সুখের কবি, চণ্ডীদাস দুঃখের কবি। বিদ্যাপতি বিরহে কাতর হইয়া পড়েন, চণ্ডীদাসের মিলনেও সুখ নাই। বিদ্যাপতি জগতের মধ্যে প্রেমকে সার বলিয়া জানিয়াছেন, চণ্ডীদাস প্রেমকেই জগৎ বলিয়া জানিয়াছেন। বিদ্যাপতি ভোগ করিবার, চণ্ডীদাস সহ্য করিবার কবি।

চণ্ডীদাস সুখের মধ্যে দুঃখ ও দুঃখের মধ্যে সুখ দেখিতে পাইয়াছেন। তাঁহার সুখের মধ্যেও ভয় এবং দুঃখের প্রতিও অনুরাগ। বিদ্যাপতি কেবল জানেন যে, মিলনে সুখ ও বিরহে দুঃখ, কিন্তু চণ্ডীদাসের হৃদয় আরো গভীর, তিনি উহা অপেক্ষা আরো অধিক জানেন।"

আবার 'আধুনিক সাহিত্যে' 'বিদ্যাপতির রাধিকা'-নামক প্রবন্ধে কবি রবীন্দ্রনাথ এই দুই বৈষ্ণব কবির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন— "বিদ্যাপতির কবিতায় প্রেমের ভঙ্গী, প্রেমের নৃত্য, প্রেমের চাঞ্চল্য ; চণ্ডীদাসের কবিতায় প্রেমের তীব্রতা, প্রেমের আলোক। এইজন্যে ছন্দ, সংগীত এবং বিচিত্র রঙে বিদ্যাপতির পদ এমন পরিপূর্ণ, এইজন্যে তাহাতে সৌন্দর্যসুখসম্ভোগের এমন তরঙ্গলীলা। ইহা কেবল যৌবনের প্রথম আরম্ভের আনন্দোচ্ছ্বাস। কেবল অবিমিশ্র সুখ এবং অব্যাহত সংগীতধ্বনি। দুঃখ নাই যে তাহা নহে, কিন্তু সুখ-দুঃখের মাঝখানে একটা অন্তরাল ব্যবধান আছে। হয় সুখ নয় দুঃখ, হয় মিলন নয় বিরহ—এইরূপ পরিষ্কার শ্রেণীবিভাগ। চণ্ডীদাসের মতো সুখে-দুঃখে-বিরহে-মিলনে জড়িত হইয়া যায় নাই। সেইজন্যে বিদ্যাপতির প্রেমে যৌবনের নবীনতা এবং চণ্ডীদাসের প্রেমে অধিক বয়সের প্রগাঢ়তা আছে।"

যাই হোক, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস এই দুই শ্রেষ্ঠ

কবির কথা ভক্ত পাঠক একই সঙ্গে স্মরণ করে থাকেন এবং কাব্যস্বরূপের দিক থেকে এই দুই কবি দুই বিপরীত ভাবলোকের অধিবাসী হলেও রসিক পাঠক স্বীকার করেন যে, প্রেমসাধনায় দুজনেই সমান, দুজনেই রসতীর্থ পথের পথিক।

অনুশীলনী

১। তুর্কী আক্রমণ বাংলার সমাজ ও সাহিত্যের উপর কি প্রভাব বিস্তার করেছে আলোচনা কর।

২। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য কে কোথায় আবিষ্কার করেন? এই কাব্যের রচয়িতা কে? কাব্যটি কবে প্রকাশিত হয়? কাব্যটি আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে কোন্ সমস্যা দেখা দেয়? [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৩। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্য কার রচনা? এই কাব্যে কয়টি চরিত্র আছে? কাব্যটি কয়টি খণ্ডে বিভক্ত? খণ্ডগুলির নাম কি? [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৪। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পরিচয় দিয়ে এর কাব্যোৎকর্ষ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৫। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যখানা কার লেখা? কাব্যখানির বিশেষ মূল্য আছে কেন? কাব্যখানির অন্য কোন নাম ছিল কি? [উ. মা. ১৯৮১]

৬। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' ও তার লেখক সম্বন্ধে আলোচনা কর। [ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৮১]

৭। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কবি কে? কবির জীবন ও কাব্য সম্বন্ধে যা জান লেখ।

৮। পদাবলী কাকে বলে? বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের পদাবলী রচনার বৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর। [উ. মা. ১৯৮১-৮২, নমুনা প্রশ্ন ১৯৮০-৮১]

৯। বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যে চণ্ডীদাসের অবদান আলোচনা কর। [উ. মা. ১৯৮০]

১০। চণ্ডীদাসের পদাবলীর রচনাবৈশিষ্ট্য নির্ণয় কর। [উ. মা. ১৯৮২]

১১। টীকা লেখ: কাঁকিল্যাগ্রাম, বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, বড়াই।

তৃতীয় অধ্যায়

অনুবাদ-সাহিত্য

সাহিত্য-গঠনের ব্যাপারে অনুবাদ-কর্মের সফলতা হল সুদূরপ্রসারী। যে-কোনো সাহিত্যের সমৃদ্ধির জন্যে অন্য ভাষা থেকে সাহিত্যিক অনুবাদ অপরিহার্য। যে-ভাষায় অনুবাদ-সাহিত্য যত সমৃদ্ধ সেই ভাষা তত বলিষ্ঠ। চর্যাপদের দুর্বল বাংলা ভাষা অনুবাদ-সাহিত্যের মাধ্যমেই অনেকটা শক্তি সঞ্চয় করেছিল—এ কথা বলতে বাধা নেই। অনুবাদকে আশ্রয় করেই বৃহত্তর বাঙালী জীবন অভিজাত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সান্নিধ্য লাভ করেছিল। তাই বলা চলে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মিলনাত্মক জীবনবাণীর উদ্‌গাতা এই অনুবাদ-সাহিত্য।

সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ও অন্যান্য পুরাণ-গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ এই সব অনুবাদ-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। খ্রীস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে রামায়ণ-মহাভারত ও ভাগবতের অনুবাদ বঙ্গদেশে অত্যন্ত জনপ্রিয়তা লাভ করে। এই সব অনুবাদ একদিকে সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করেছে, অন্যদিকে বাঙালী জীবনকে নতুন ভাবের আদর্শে গড়ে তুলছে।

অবশ্য বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যে আক্ষরিক অনুবাদের রীতি বড়ো একটা গৃহীত হয় নি। কবিরা সংস্কৃত মূল বিষয়কে নিজের ভাষায় পয়ার-ত্রিপদীতে সাজিয়ে সাধারণ মানুষের জন্যে পরিবেশন করেছেন। ফলে পাঠকসমাজও সহজেই পৌরাণিক ঐতিহ্য ও তার ভাবাদর্শের-সঙ্গে পরিচিত হতে পেরেছে। তাই বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পূর্ণ পরিণতির জন্যে অনুবাদ-সাহিত্যের অবদান অনস্বীকার্য।

কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণ

> “কারো কিছু নাহি লই করি পরিহার।
> যথা যাই তথায় গৌরব মাত্র সার॥”

মহাকবি মধুসূদন কবি কৃত্তিবাসের কাব্যের মূল্যায়ন করতে গিয়ে চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে বলেছেন :

> “পবন-নন্দন হনু, লঙ্ঘি ভীমবলে
> সাগর, ঢালিলা যথা রাঘবের কানে
> সীতার বারতা-রূপ সঙ্গীত-লহরী ;—
> তেমনি, যশস্বি, তুমি সুবঙ্গ-মণ্ডলে
> গাও গো রামের নাম সুমধুর তানে,
> কবি-পিতা বাল্মীকিকে তপে তুষ্ট করি।”

বঙ্গদেশে কবি কৃত্তিবাস সত্যি যশস্বী। যে ভাবে বাঙালী জীবন তাঁর রামায়ণ-কাব্যের দ্বারা প্রভাবিত, একমাত্র কাশীরাম দাসের মহাভারতকে বাদ দিলে আর-কোনো গ্রন্থের সঙ্গে এর তুলনা চলে না।

বিদেশী রাজশক্তির আক্রমণে বিশৃঙ্খল বাঙালীর ঐক্যসাধন ও সংস্কৃতি-রক্ষণে এই রামায়ণ-কাব্যের মূল্য অপরিসীম। ভারতীয় আদর্শের ধারক-হিসেবে ভারতবর্ষে ও ভারতীয় সাহিত্যে বাল্মীকি-রামায়ণের যে-স্থান, বঙ্গদেশে ও সাহিত্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের স্থান তার চেয়ে কিছু কম নয়।

প্রাচীন বাংলার কবিদের আত্মপরিচয় তাঁদের কাব্যে প্রায় দুর্লভ। কৃত্তিবাসের কাব্যে প্রথম দেখা গেল এর ব্যতিক্রম। তিনি রামায়ণের ভূমিকায় যে-আত্মপরিচয় দান করেছেন তা থেকে কবির জন্মকাল ও শিক্ষাদীক্ষা-সম্বন্ধে বহু মূল্যবান্ তথ্য অবগত হওয়া যায়। তিনি বলেছেন :

"পূর্বেতে আছিল বেদানুজ মহারাজা।
তাহার পাত্র আছিল নরসিংহ ওঝা॥
দেশের উপান্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভোগ ভুঞ্জিলেক সংসারের সার॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ পড়িল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইল গঙ্গাতীর॥"

কৃত্তিবাসের পূর্বপুরুষ নরসিংহ ওঝা অরাজকতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে বঙ্গদেশ (বর্তমানে বাংলাদেশ) ত্যাগ করে গঙ্গাতীরের ফুলিয়া গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। কৃত্তিবাসের পিতা বনমালী আর মাতার নাম মালিনী। কোনো এক মাঘমাসের শ্রীপঞ্চমী-তিথিতে রবিবারে তাঁর জন্ম। তিনি বলেছেন,

"আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘমাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস॥"

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন তাঁর জন্মসাল ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দ এবং গ্রন্থরচনার কাল ১৪২৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়।

বারো বছর বয়সে তিনি বিদ্যালাভের জন্যে পদ্মা পার হয়ে উত্তরবঙ্গে যান। সেখানে নানা ভাষা ও বিদ্যায় সুপণ্ডিত হয়ে সে যুগের রাজধানী গৌড় নগরে গমন করেন। কারণ তিনি জানতেন, 'গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা'। কৃত্তিবাস রাজবাড়িতে উপস্থিত হয়ে সাতটি শ্লোক রচনা করে রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। কিছুক্ষণ পরে রাজার দূত এসে বলল—

"কাহার নাম ফুলিয়ার পণ্ডিত কৃত্তিবাস
রাজার আদেশ হইল করহ সম্ভাষ।"

দূতের সঙ্গে কবি ন'টি দেউড়ি পেরিয়ে রাজসভায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। সভার কাজ শেষ করে গৌড়েশ্বর তখন তাঁর পাত্রমিত্রদের নিয়ে মাঘ-মাসের রোদে বসে ছিলেন। রাজার আদেশে কৃত্তিবাস এগিয়ে গিয়ে স্বরচিত সাতটি প্রশস্তি-শ্লোক আবৃত্তি করে শোনালেন। কবির প্রতিভায় মুগ্ধ রাজা তাঁকে নানা ঐশ্বর্য দিয়ে পুরস্কৃত করতে চাইলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যাভিমানী কৃত্তিবাস জানালেন—গৌরবকেই তিনি শ্রেষ্ঠ ধন বলে মনে করেন, ঐশ্বর্যকে নয়। কবির এই অসামান্য নিঃস্পৃহতায়

সন্তুষ্ট হয়ে গৌড়েশ্বর তাঁকে রামায়ণ কাব্যের অনুবাদ করতে বললেন। এই হল কৃত্তিবাসের আত্মকথা।

কৃত্তিবাসী রামায়ণ পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে (১৪২৫ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে) রচিত হলেও রামায়ণের কোনো পুঁথিতেই সে যুগের ভাষার সন্ধান পাওয়া যায় না, এর সবচেয়ে বড়ো কারণ হল রামায়ণ-কাহিনী যাতে সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ও অপ্রচলিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই গায়কের দল যুগে যুগে এ কাব্যের ভাষাকে বদলে দিয়েছেন। ইতিহাস বা পুরাতত্ত্বের দিক থেকে এই পাঠান্তর শোচনীয় হলেও কৃত্তিবাসের রামায়ণ-কাব্য পরিবর্তনের মাধ্যমেই পাঠকসমাজে সজীব হয়েছিল এ কথা অস্বীকার করা যায় না।

প্রথমে দেখা দরকার, কবি কৃত্তিবাস রামায়ণকে পাঁচালী বলেছেন কেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে পাঁচালী নামে একপ্রকার সাহিত্যধারা জনপ্রিয় হয়েছিল। পঞ্চালিকা নামে এক ধরনের সঙ্গীতকলার প্রভাবেই এই পাঁচালীর উদ্ভব। প্রাচীন বাংলায় ছিল দুটি সাহিত্যধারা। একটি পদাবলী, অন্যটি পাঁচালী। পাঁচালীতে কাহিনী বিবৃত হত। পদাবলী ছিল সম্পূর্ণ গান। রামায়ণ, মহাভারত, মঙ্গলকাব্য—এগুলি পাঁচালী-শ্রেণীর রচনা। কবি কৃত্তিবাস বাল্মীকির মতো কেবল মহাকাব্য রচনা করতে চান নি। তাঁর 'রামায়ণ পাঁচালী' গীত হোক এই ছিল কবির মনোগত অভিপ্রায়। কারণ এ কাব্য অশিক্ষিত-অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের জন্যে রচিত হয়েছিল। তাই মহাকাব্য নয়, জনসাধারণের জন্যে তিনি রচনা করেছিলেন 'রামায়ণ পাঁচালী'।

কারও কারও ধারণা, কৃত্তিবাসের রামায়ণের সঙ্গে বাল্মীকির রামায়ণের সম্বন্ধ খুব অল্প, কথক-ঠাকুরদের মুখে মুখে রামায়ণ-গান শুনে কৃত্তিবাস নাকি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই ধারণা ঠিক নয়। কারণ কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণ থেকেই জানা যায়, তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে ছিলেন সুপণ্ডিত। এরূপ ব্যক্তির পক্ষে কথক-ঠাকুরের মুখে শোনা রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করা প্রায় অসম্ভব। তবে একথা ঠিক, তাঁর কাব্য বাল্মীকির রামায়ণের হুবহু অনুবাদ নয়। সে যুগের শ্রোতাদের রুচি ও রসবোধের কথা বিবেচনা করে তিনি বাল্মীকির কোনো কোনো অংশ বর্জন করেছেন, আবার বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া রাম-সীতার কাহিনীকেও নিজের কাব্যে স্থান দিয়েছেন। বাল্মীকির রামায়ণ থেকে যে-সব কাহিনী তিনি বর্জন করেছেন তা হল—কার্তিকের জন্ম-বিবরণ, বশিষ্ঠ-বিশ্বামিত্রের বিরোধ, বিশ্বামিত্রের তপোবল, অম্বরীষের যজ্ঞ ইত্যাদি। আর যে-সব নতুন কাহিনী তিনি সংযোজিত করেছেন তা হল—রঘুরাজার দানশীলতা, অজরাজার বিবাহ ও ইন্দুমতীর মৃত্যু, জনক-রাজার ধনুক তুলতে না পেরে রাবণরাজার পলায়ন, শ্রীরামের মায়ামুণ্ড-প্রদর্শন, লব-কুশের যুদ্ধ প্রভৃতি।

সংস্কৃত কাব্য, নাটক ও পুরাণ থেকে কৃত্তিবাস এই সব কাহিনী-রচনার মালমশলা সংগ্রহ করেছেন। কিন্তু কোথাও সংস্কৃত ভাষা ও অলংকারের ভারে তাঁর কাব্যের

সহজ-সরল ভাব চাপা পড়ে নি। এটাই কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তার সবচেয়ে বড়ো কারণ।

কৃত্তিবাস ভালো করেই জানতেন সাহিত্যরস উপলব্ধির জন্যে জীবনের সঙ্গে বর্ণিত বিষয়ের নিবিড় যোগের প্রয়োজন হয়।

বাল্মীকির রাম-সীতা ছিলেন এক অজ্ঞাত কালের ক্ষত্রিয় রাজকুমার ও রাজবধূ, যাদের জীবনযাত্রার কথা বাঙালী পাঠকের কাছে অপরিচিত ছিল। কিন্তু কৃত্তিবাস বাঙালীর হৃদয়-অমৃত মন্থন করে রাম-সীতার মূর্তি রচনা করলেন। যাদের মধ্যে বাঙালী পাঠক-শ্রোতা দেখতে পেল নিজের ঘরের ছবি। ফলে তারা হলেন বাঙালীর পরম আত্মীয়, পুত্র-কন্যা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃবধূ।

পুরোপুরি বাঙালী বলেই বাঙালী বধূর মতো সীতাদেবী রান্না করতে ভালবাসেন, আর পরিবেশন—তাও নিজের হাতে :

"প্রথমেতে শাক দিয়া ভোজন আরম্ভ
তারপর সূপ আদি দিলেন সানন্দ ॥
ভাজা ঝোল আদি করি পঞ্চাশ ব্যঞ্জন।
ক্রমে ক্রমে সবাকারে কৈল বিতরণ ॥"

কেবল বর্ণিত চরিত্রে বাঙালীত্বের জন্যেই নয়, বিবাহাদির ব্যাপার ও বিচিত্র রসের সমাবেশে কৃত্তিবাসের রচনা বাঙালী জনগণের প্রিয় হয়ে উঠেছে।

কাব্যের প্রথমেই তিনি বলেছেন :

"মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে বাখানি কৃত্তিবাস গুণী ॥
বাপমার আশীর্বাদ গুরুর কল্যাণ।
বাল্মীকিপ্রসাদে রচে রামায়ণ-গান ॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাইতে কৈল কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥"

এই প্রতিশ্রুতি কৃত্তিবাস অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির ভেতর থেকে অমৃত সংগ্রহ করে তিনি সর্বকালের জনসাধারণকে উপহার দিয়েছেন।

কবি যেমন সংস্কৃত অলঙ্কার প্রয়োগে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তেমন পল্লীবাংলার সহস্র ছবি তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে যায় নি। কেবল রচনার বহিরঙ্গে নয়, রচনার অন্তরেও একটি বিশেষ ভাবের সমাবেশ ঘটেছিল। একে ভক্তিবাদ বলা যায়। কেবল রাম-নাম-উচ্চারণে মানুষ পাপ-তাপ থেকে মুক্তি পায় এ কথা কবি নিষ্ঠার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন। তাই তাঁর কণ্ঠে শুনতে পেলাম "রাম নাম লইতে ভাই না করিও হেলা।"

মালাধর বসুর (গুণরাজ খাঁ) শ্রীকৃষ্ণবিজয়

"আজি হেন বুঝি মোরে বিধি বিড়ম্বিল।
মথুরা যাইবে কৃষ্ণ এখনি শুনিল ॥

অনেক ভাগ্য করি সখি জন্মিলাম গোকুলে।
তেকারণে সঙ্গে পাইলাম নন্দের গোপালে ॥"

উত্তর-বৌদ্ধযুগে রচিত একজাতীয় সংস্কৃত গ্রন্থকে পুরাণ-নামে অভিহিত করা হয়েছে। সাধারণ মানুষ বৈদিক ভাবধারা ভুলে গেলেও পৌরাণিক ঐতিহ্যকে কোনোদিন ভুলতে পারে নি। বর্তমান যুগের উপরেও পৌরাণিক যুগ ও আদর্শের বিশেষ প্রভাব লক্ষ করা যায়।

পুরাণে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি প্রচারের জন্যে রাজবংশ, মুনিবংশ ও ব্রাহ্মণবংশের কাহিনী আছে, আছে নীতি, উপদেশ, দার্শনিক প্রত্যয় ও নানা গল্পকথা। তাই পুরাণকে বিশুদ্ধ সাহিত্য বলা চলে না। কাব্যের আকারে স্মৃতি-সংহিতা, ধর্মাচার আর আখ্যানের বর্ণনাও পুরাণে আছে। অবশ্য প্রচ্ছন্নভাবে ঐতিহাসিক ও সামাজিক উপাদানও পুরাণের মধ্যে ছড়ানো আছে।

পুরাণের সংখ্যা হল আঠারো। এ ছাড়াও আছে আঠারোটি উপপুরাণ। প্রত্যেকটি পুরাণের সঙ্গে মহাভারত-কার বেদব্যাসের নাম জড়িত হয়ে আছে। কিন্তু পুরাণ কে কবে রচনা করেছেন সে কথা বলা যায় না। বহু মানুষের সমবেত চেষ্টায় সংগৃহীত হয়েছে পুরাণ-গ্রন্থ। ভাগবত এমনই একটি পুরাণ-গ্রন্থ।

শ্রীমদ্ভাগবত কেবলমাত্র কৃষ্ণলীলা বা কৃষ্ণজীবনী-গ্রন্থ নয়, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের মূল আদর্শকে সূত্রাকারে কৃষ্ণ-জীবনের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করা হয়েছে। সেই কারণেই ভাগবতের গ্রন্থ-কাহিনী বহুবিস্তৃত এবং পল্লবিত। কিন্তু মালাধর বসু তাঁর রচনায় ব্রাহ্মণ্যতত্ত্বের সূক্ষ্ম আলোচনার চেয়ে কৃষ্ণ-জীবনের স্বরূপ-বর্ণনায় মুখর। তিনি একাধিক বার গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য বর্ণনা করে বলেছেন:

"ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বাঁধিয়া।
লোক নিস্তারিতে করি পাঁচালী রচিয়া ॥"

আবার কোথাও বলেছেন:

"ভাগবত কথা যত লোক বুঝাইতে
লৌকিক করিয়া কহি লৌকিকের মতে।"

খুব সম্ভব পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মালাধর বসু বর্ধমান জেলার অন্তর্গত কুলীন গ্রামের কায়স্থ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কুলীন গ্রাম বহুকাল থেকেই বৈষ্ণবকেন্দ্ররূপে পরিচিত ছিল। মালাধর বসু এই গ্রামে বসেই শ্রীকৃষ্ণবিজয়-কাব্য (বা গোবিন্দমঙ্গল কাব্য) রচনা করে গ্রামটিকে আরও বিখ্যাত করে গেছেন। তিনি নিজের সম্পর্কে বিশেষ কিছুই লিখে যান নি। সামান্য তথ্য থেকে কেবল এইটুকু পরিচয় জানা যায় যে, মালাধর বসুর পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী। গৌড়েশ্বর তাঁকে 'গুণরাজ খাঁ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। ১৪৭৩ থেকে ১৪৮০ খ্রীস্টাব্দের (১৩৯৫-১৪০২ শক) মধ্যে গ্রন্থটি রচিত হয়। তাঁর গ্রন্থের রচনাকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে:

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন॥"

এই সময়ে গৌড়ের সুলতান ছিলেন বিদ্যোৎসাহী রুকনুদ্দিন বরবক শাহ্। বোধ হয় তিনিই কবিকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দিয়ে থাকবেন।

মালাধরের কাব্য বৈষ্ণব-সমাজের বাইরে বিশেষ প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের মত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুঁথির সংখ্যা খুব বেশি নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে শ্রীচৈতন্যদেব এই কাব্যের খুব প্রশংসা করতেন!

মহাপ্রভু মালাধরের গ্রামবাসীদের পুরস্কৃত করে বলেছিলেন:

"কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া;
প্রত্যহ আসিবে যাত্রায় পট্ট ডুরি লইয়া॥
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য আছে মহা প্রেমময়॥
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।
এই বাক্যে বিকাইলাম তার বংশের হাথ॥"

—মালাধর বসুই প্রথম শ্রীকৃষ্ণকে 'প্রাণনাথ' বলে উল্লেখ করেছেন।

মালাধর বসু ভাগবতের শুধু দশম ও একাদশ স্কন্ধের সরল অনুবাদ করেছিলেন। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণজন্ম থেকে দ্বারকালীলা, আর একাদশ স্কন্ধে যদুবংশ-ধ্বংসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কবি জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যে কাহিনীকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাগবতের তত্ত্বাংশকে কিছুটা খর্ব করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বিচক্ষণতা প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু সরল পয়ার ত্রিপদীতে ঘটনাবস্তু বিবৃত করা ভিন্ন তাঁর কাব্যের বিশেষ গুণ চোখে পড়ে না। অনুবাদ শ্রেণীর কাব্য বলে এতে নিজস্ব কবিত্বশক্তি দেখাবার বিশেষ কোনো অবকাশ ছিল না। কেবল বৃন্দাবনলীলার বর্ণনায় কবি কিছুটা প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। মথুরা বা দ্বারকালীলার বর্ণনা ততটা প্রাণবন্ত হয় নি। কোথাও কোথাও আন্তরিকতার সঙ্গে করুণরস বর্ণিত। কৃষ্ণ-বিরহে গোপীদের বিলাপ ও শোকপ্রকাশ প্রায় বৈষ্ণব পদাবলীর মতই মর্মস্পর্শী:

"আর না যাইব সখি চিন্তামণি ঘরে॥
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে॥
আর না দেখিব সখি, সে চাঁদ বদন।
আর না করিব সখি, সে মুখ চুম্বন॥

কেউ কেউ মনে করতেন মালাধর বসু সংস্কৃত জানতেন না, তিনি পণ্ডিতদের মুখে ভাগবত-কাহিনী শুনে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁদের যুক্তি মালাধরের একটি উক্তি:

"ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিক কহিল লোক শুন মহাসুখে॥"

কিন্তু মূল ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সম্পর্ক বিচার করলে বোঝা যায় মালাধর বসু নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভাগবতের অনুবাদ হলেও আক্ষরিক অনুবাদ নয়। কৃত্তিবাস যেমন মূল রামায়ণের আদর্শ সামনে রেখে স্বাধীনভাবে রামচরিত রচনা করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণবিজয়-কাব্যের কবিও ঠিক তেমনি ভাগবতকে সামনে রেখেই স্বাধীনভাবে কৃষ্ণকথা রচনা করে গিয়েছেন। তিনিও কৃত্তিবাসের মত গ্রহণ-বর্জন বা কাহিনীকে কোথাও সংক্ষিপ্ত করে কৃষ্ণচরিত্রকে বৈচিত্র্য দান করেছেন। তাঁর কাব্যে রাধার উল্লেখ আছে। এটা প্রক্ষিপ্ত, না জনসাধারণের প্রীতির জন্যে তিনি নিজেই রাধা-প্রসঙ্গ সংযোজিত করেছেন,—এ বিষয়ে সন্দেহের নিরাকরণ করা যায় নি।

সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হলেও বাঙালীর ঘরের কথাকে তিনি ভাগবতে ঠাঁই দিয়ে গিয়েছেন। তাই বৃন্দাবনেও সুপারি (=গুয়া), কামরাঙা-গাছের শোভা, আর সখাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষ্ণকে ভাত খেতে দেখা যায়। চৈতন্য-যুগে বঙ্গদেশে সমাজ ও সাহিত্যে যে-নবজাগরণ শুরু হয় তার পূর্বাভাস আছে এই কাব্যে। কৃষ্ণকে 'প্রাণনাথ' বলার মধ্যে পরবর্তী কালের রাগানুগা সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সবশেষে বলব, মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য হিসেবে খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও বাংলা বৈষ্ণব-ঐতিহ্যের এটা যে প্রবেশক গ্রন্থ তাতে সন্দেহ নেই। কারণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেই তিনি ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন। যদিও এই ভক্তি শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেম-ভক্তি নয়, ভাগবতের ভক্তিকেই কবি সরল ভাষায় বিবৃত করেছেন। অবশ্য কোথাও কোথাও প্রেমভক্তির ইঙ্গিত আছে বলে শ্রীচৈতন্যদেব মালাধর বসুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। শেষ কথায় বলব, তাঁর কাব্য এবং জীবনসাধনার মাধ্যমেই চৈতন্যযুগের সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল। "তিনি বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের যুগস্রষ্টা না হলেও যুগসন্ধি-সংযোগকারী যুগন্ধর মহাকবি।"

অনুশীলনী

১। বাংলা রামায়ণ কাব্যের আদি অনুবাদক কে? তাঁর কাব্য ও জীবন সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার প্রেরণা কি? কৃত্তিবাসের রামায়ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [ত্রিপুরা উঃ মাঃ ১৯৮১]

৩। কৃত্তিবাস কার কোন্ কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন? কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্ষেপে বল। [উঃ মাঃ ১৯৮২]

৪। কৃত্তিবাস কে ছিলেন? বঙ্গদেশে তাঁর রামায়ণের অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ নির্ণয় কর। [উঃ মাঃ ১৯৭৮]

৫। কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়ে বাঙালী জীবনের উপর তাঁর রামায়ণের কিরূপ প্রভাব পড়েছিল বুঝিয়ে দাও। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

"তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দশ দুই শকে হইল সমাপন ॥"

এই সময়ে গৌড়ের সুলতান ছিলেন বিদ্যোৎসাহী রুকনুদ্দিন বরবক শাহ্। বোধ হয় তিনিই কবিকে গুণরাজ খাঁ উপাধি দিয়ে থাকবেন।

মালাধরের কাব্য বৈষ্ণব-সমাজের বাইরে বিশেষ প্রচলিত ছিল বলে মনে হয় না। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারতের মত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুঁথির সংখ্যা খুব বেশি নয়। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃতে বলা হয়েছে শ্রীচৈতন্যদেব এই কাব্যের খুব প্রশংসা করতেন!

মহাপ্রভু মালাধরের গ্রামবাসীদের পুরস্কৃত করে বলেছিলেন :

"কুলীন গ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া ;
প্রত্যহ আসিবে যাত্রায় পট্ট ডুরি লইয়া ॥
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য আছে মহা প্রেমময় ॥
'নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ'।
এই বাক্যে বিকাইলাম তার বংশের হাথ ॥"

—মালাধর বসুই প্রথম শ্রীকৃষ্ণকে 'প্রাণনাথ' বলে উল্লেখ করেছেন।

মালাধর বসু ভাগবতের শুধু দশম ও একাদশ স্কন্ধের সরল অনুবাদ করেছিলেন। দশম স্কন্ধে কৃষ্ণজন্ম থেকে দ্বারকালীলা, আর একাদশ স্কন্ধে যদুবংশ-ধ্বংসের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। কবি জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্যে কাহিনীকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে ভাগবতের তত্ত্বাংশকে কিছুটা খর্ব করেছেন। এ বিষয়ে তাঁর বিচক্ষণতা প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু সরল পয়ার ত্রিপদীতে ঘটনাবস্তু বিবৃত করা ভিন্ন তাঁর কাব্যের বিশেষ গুণ চোখে পড়ে না। অনুবাদ শ্রেণীর কাব্য বলে এতে নিজস্ব কবিত্বশক্তি দেখাবার বিশেষ কোনো অবকাশ ছিল না। কেবল বৃন্দাবনলীলার বর্ণনায় কবি কিছুটা প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। মথুরা বা দ্বারকালীলার বর্ণনা ততটা প্রাণবন্ত হয় নি। কোথাও কোথাও আন্তরিকতার সঙ্গে করুণরস বর্ণিত। কৃষ্ণ-বিরহে গোপীদের বিলাপ ও শোকপ্রকাশ প্রায় বৈষ্ণব পদাবলীর মতই মর্মস্পর্শী :

"আর না যাইব সখি চিন্তামণি ঘরে ॥
আলিঙ্গন না করিব দেব গদাধরে ॥
আর না দেখিব সখি, সে চাঁদ বদন।
আর না করিব সখি, সে মুখ চুম্বন ॥

কেউ কেউ মনে করতেন মালাধর বসু সংস্কৃত জানতেন না, তিনি পণ্ডিতদের মুখে ভাগবত-কাহিনী শুনে শ্রীকৃষ্ণবিজয় রচনা করেছিলেন। এ বিষয়ে তাঁদের যুক্তি মালাধরের একটি উক্তি :

"ভাগবত শুনি আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিক কহিল লোক শুন মহাসুখে ॥"

কিন্তু মূল ভাগবতের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সম্পর্ক বিচার করলে বোঝা যায় মালাধর বসু নানা শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন।

'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' ভাগবতের অনুবাদ হলেও আক্ষরিক অনুবাদ নয়। কৃত্তিবাস যেমন মূল রামায়ণের আদর্শ সামনে রেখে স্বাধীনভাবে রামচরিত রচনা করেছিলেন, শ্রীকৃষ্ণবিজয়-কাব্যের কবিও ঠিক তেমনি ভাগবতকে সামনে রেখেই স্বাধীনভাবে কৃষ্ণকথা রচনা করে গিয়েছেন। তিনিও কৃত্তিবাসের মত গ্রহণ-বর্জন বা কাহিনীকে কোথাও সংক্ষিপ্ত করে কৃষ্ণচরিত্রকে বৈচিত্র্য দান করেছেন। তাঁর কাব্যে রাধার উল্লেখ আছে। এটা প্রক্ষিপ্ত, না জনসাধারণের প্রীতির জন্যে তিনি নিজেই রাধা-প্রসঙ্গ সংযোজিত করেছেন,—এ বিষয়ে সন্দেহের নিরাকরণ করা যায় নি।

সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ হলেও বাঙালীর ঘরের কথাকে তিনি ভাগবতে ঠাঁই দিয়ে গিয়েছেন। তাই বৃন্দাবনেও সুপারি (=গুয়া), কামরাঙা-গাছের শোভা, আর সখাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে কৃষ্ণকে ভাত খেতে দেখা যায়। চৈতন্য-যুগে বঙ্গদেশে সমাজ ও সাহিত্যে যে-নবজাগরণ শুরু হয় তার পূর্বাভাস আছে এই কাব্যে। কৃষ্ণকে 'প্রাণনাথ' বলার মধ্যে পরবর্তী কালের রাগানুগা সাধনার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। সবশেষে বলব, মালাধরের শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য হিসেবে খুব উচ্চাঙ্গের না হলেও বাংলা বৈষ্ণব-ঐতিহ্যের এটা যে প্রবেশক গ্রন্থ তাতে সন্দেহ নেই। কারণ চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের আগেই তিনি ভক্তির প্রদীপ জ্বালিয়েছিলেন। যদিও এই ভক্তি শ্রীচৈতন্য-প্রবর্তিত প্রেম-ভক্তি নয়, ভাগবতের ভক্তিকেই কবি সরল ভাষায় বিবৃত করেছেন। অবশ্য কোথাও কোথাও প্রেমভক্তির ইঙ্গিত আছে বলে শ্রীচৈতন্যদেব মালাধর বসুকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। শেষ কথায় বলব, তাঁর কাব্য এবং জীবনসাধনার মাধ্যমেই চৈতন্যযুগের সম্ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল। "তিনি বাংলা সাহিত্য-ইতিহাসের যুগস্রষ্টা না হলেও যুগসন্ধি-সংযোগকারী যুগন্ধর মহাকবি।"

অনুশীলনী

১। বাংলা রামায়ণ কাব্যের আদি অনুবাদক কে? তাঁর কাব্য ও জীবন সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। কৃত্তিবাসের রামায়ণ রচনার প্রেরণা কি? কৃত্তিবাসের রামায়ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [ত্রিপুরা উঃ মাঃ ১৯৮১]

৩। কৃত্তিবাস কার কোন্ কাব্যের অনুবাদ করেছিলেন? কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত পরিচয় সংক্ষেপে বল। [উঃ মাঃ ১৯৮২]

৪। কৃত্তিবাস কে ছিলেন? বঙ্গদেশে তাঁর রামায়ণের অসামান্য জনপ্রিয়তার কারণ নির্ণয় কর। [উঃ মাঃ ১৯৭৮]

৫। কৃত্তিবাসের ব্যক্তিগত পরিচয় দিয়ে বাঙালী জীবনের উপর তাঁর রামায়ণের কিরূপ প্রভাব পড়েছিল বুঝিয়ে দাও। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

৬। কবি কৃত্তিবাসের জীবনী সংক্ষেপে লেখ ও তাঁর কাব্যের জনপ্রিয়তার কারণ নির্ণয় কর। [ত্রিপুরা, উঃ মাঃ ১৯৮০ ; নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৭। কৃত্তিবাসের রামায়ণকে বাঙালীর রামায়ণ বলবার কারণ ব্যাখ্যা কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৮। কৃত্তিবাস অনূদিত রামায়ণ কথার নাম কি? এই গ্রন্থখানি বাঙালীর ঘরে ঘরে সমাদৃত কেন? এই গ্রন্থ রচনায় কবি বাল্মীকিকে কতদূর অনুসরণ করেছেন এবং কতখানি মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়েছেন তা বল। [ত্রিপুরা, উঃ মাঃ ১৯৮০]

৯। বাংলা রামায়ণের আদি কবি কে? কবির পরিচয় এবং কাব্য রচনা-কাল সম্পর্কে যে-সব উল্লেখ ঐ রামায়ণে রয়েছে, তা বিবৃত কর। বাঙালী-জীবনে এ কাব্যের প্রভাব কতখানি, নির্ণয় কর। [উঃ মাঃ ১৯৮০]

১০। ভাগবত কি? বাংলা ভাষায় প্রথম ভাগবতের অনুবাদক কে? তাঁর সম্বন্ধে যা জান লেখ।

১১। ভাগবত পুরাণের প্রথম বাংলা অনুবাদ কে করেছিলেন তার উল্লেখ কর। তাঁর জীবন ও কাব্য সম্পর্কে যা জান লেখ। [উঃ মাঃ ১৯৭৯]

১২। 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' অবলম্বনে মালাধর বসুর কাব্যকৃতির পরিচয় দাও। [ত্রিপুরা উঃ মাঃ ১৯৭৮]

১৩। গুণরাজ খান কে এবং তাঁর সম্বন্ধে কি জান লেখ। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

১৪। মালাধর বসু ও তাঁর কাব্য 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' সম্বন্ধে একটি নিবন্ধ রচনা কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

চতুর্থ অধ্যায়

মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ ও মঙ্গলকাব্যে তৎকালীন সমাজজীবন

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে লক্ষ্মণসেনের রাজত্বকালে বাংলাদেশে তুর্কী আক্রমণ হয়। সেনরাজারা এই লঘু আক্রমণও প্রতিহত করতে পারে নি। কারণ রাজশক্তির পিছনে জনসমর্থন ছিল না। রাজশক্তির সঙ্গে প্রজাসাধারণের মৈত্রী সম্বন্ধ না থাকলে রাজশক্তি কখনই শক্তিশালী হতে পারে না, তুর্কী আক্রমণ এই সত্যই উদ্ঘাটিত করল।

মনে হয় ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক সেনরাজারা উচ্চবর্ণের আনুগত্য লাভ করলেও নিম্নশ্রেণীর উৎপীড়িত সাধারণ মানুষ তুর্কী আক্রমণের সময় রাজবিরোধী বা উদাসীন ছিল।

বাংলা অনার্যপ্রধান দেশ। আর্য সভ্যতার কাছে বাঙালী প্রায় হাজার বছরের প্রচণ্ড চাপে বশ্যতা স্বীকার করে আর্য সংস্কৃতি গ্রহণ করেছিল। যদিও নিম্নবর্ণের সাধারণ মানুষ কোনোদিনই মনে প্রাণে এই আর্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা গ্রহণ করে নি। সেই কারণে তারা নিজেদের লৌকিক দেবতার সঙ্গে পৌরাণিক দেবদেবীর মিলন ঘটিয়ে নতুন দেবদেবীর সৃষ্টি করেছিল।

এইসব দেবদেবী একদিকে ছিলেন ভক্তবৎসল, অন্যদিকে ভয়ঙ্কর বা ভয়ঙ্করী। ক্রুদ্ধ হলে তাঁরা মানুষের সর্বনাশ সাধনে পশ্চাদ্‌পদ হতেন না। মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর মধ্যে এই বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট।

এখন আলোচনা করতে হবে 'মঙ্গলকাব্য' রচনার পিছনে কোন্ সামাজিক কারণ এবং কবিমনের কোন্ প্রেরণা কার্যকর ছিল।

ঐতিহাসিক সমালোচকগণ মনে করেন তুর্কী আক্রমণে পরাভূত হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষামূলক মিলিত সাধনার নিদর্শন হল মঙ্গলকাব্য। মুসলমান আক্রমণে দেশে ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে বাঙ্গালী হিন্দু অত্যাচারিত হতে থাকে। এই অত্যাচারের সামনে দাঁড়িয়ে সেদিনের মানুষ বুঝেছিল যে, আর্য-অনার্যের নিবিড় মিলন ছাড়া বৈদেশিক শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সৃষ্টি অসম্ভব। এই রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদেই মঙ্গলকাব্য রচয়িতাদের মুখে ধ্বনিত হয়েছে মিলনের বাণী। এক কথায় বলা চলে উচ্চবর্ণের হিন্দুরা অনন্যোপায় হয়ে নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হল। এই সুযোগেই কিছু ভয়ঙ্কর-ভয়ঙ্করী দেবদেবীও ব্রাহ্মণ্য অনুমোদন লাভ করল। এইভাবে বাংলাদেশে নতুন দেবদেবীর পূজা এবং তাদের মহিমা প্রচার করে মঙ্গলকাব্য রচনার সূত্রপাত হয়। পরাজিত জাতির মনে যে-বিপর্যয় এবং হীনমন্যতাবোধ দেখা দিয়েছিল তারই প্রকাশ দেবশক্তির কাছে মানুষের এই অসহায় আত্মসমর্পণ। রাজনৈতিক পরাভব একদিকে যেমন অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লৌকিক দেবদেবীর আশ্রয় গ্রহণে

প্রণোদিত করেছিল, অন্যদিকে বাঙালীকে দিয়েছিল দৃঢ়তর সমাজ গড়ার প্রেরণা। মঙ্গলকাব্যের গবেষক ঐতিহাসিক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, "মধ্যযুগের বাংলা সমাজ এই নূতন ও পুরাতনের মধ্যে সুন্দর সামঞ্জস্য বিধান করিয়া পরস্পর বিপরীতমুখী দুইটি সংস্কারকে একসূত্রে গাঁথিয়া দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বাংলার জলবায়ুতে দেশীয় লৌকিক সংস্কারের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার যে কিভাবে এক দেহে লীন হইয়া আছে, মঙ্গলকাব্যগুলি তাহারই পরিচয়।"

বঙ্গদেশে প্রায় চারশ বছর ধরে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য রচিত হয়েছে। চৈতন্য আবির্ভাবের পূর্বে মঙ্গলকাব্যের সূচনা এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এর সমাপ্তি। এই চারশ বছরে বাংলার সমাজ ও রাজনৈতিক জীবনে নানান পরিবর্তন ঘটেছে। পাঠান শাসনের অবসান হয়েছে, প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মোগল আমল। কিন্তু কখনই পল্লীপ্রাণ বাংলার সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনের ওপর বড়ো রকমের আঘাত এসে পড়ে নি। ফলে স্বাভাবিক ভাবেই শান্তধারায় প্রবাহিত হয়েছে বাঙালীর জীবন নদীর স্রোত। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে এই ধীরপ্রবাহী বাঙালী জীবনের ছায়া পড়েছে। ফুটেছে অতীতানুসারী সমাজ জীবনের ছবি।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাঙালী জীবনে প্রথম সার্বিক পরিবর্তন সূচিত করেছে। কেবল ধর্মজীবনে নয় সমাজজীবনেও এসেছে গতির প্রাবল্য, এসেছে বিপ্লব।

চৈতন্যযুগের পূর্বে বাংলা শিল্প সাহিত্য রাজা-মহারাজা বা নবাব-বাদশার পৃষ্ঠপোষকতায় সৃষ্ট ও বর্ধিত হয়। চৈতন্যযুগেই প্রথম বাংলা সাহিত্য ব্যাপকভাবে জনগণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং সাহিত্যে সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের মতো বেশভূষা ও অলঙ্কারেও রুচির পরিচয় উদ্ভাসিত হয়। মেয়েরা কাঁচুলি পরত, নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক পরত 'খুঞার বসন'। শাঁখা-সোনার গয়না, সেই সঙ্গে ফুলের গয়নার প্রতিও নারীদের আগ্রহ ছিল। পুরুষের হাতে অঙ্গদ, কানে কুণ্ডল ছিল। বড়ো বড়ো চুল রাখার রীতি পুরুষদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল।

প্রত্যেক মঙ্গলকাব্যেই বীরত্বে বাঙালী, ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং সামাজিক ও পারিবারিক জীবনে সেযুগের বাঙালীর বিশ্বস্ত ছবি ধরা পড়েছে। সেদিন রাজার নির্দেশে 'নবলক্ষ সেনা' রণসাজে সজ্জিত হত, বেজে উঠত বিয়াল্লিশ রকমের রণবাদ্য। মঙ্গলকাব্যে যে-যুদ্ধ-বর্ণনা পাই তার অনেকটাই কৃত্রিম, প্রকৃত বীরত্ব তার মধ্যে নেই। সেদিন বাঙালী বণিক 'চৌদ্দ ডিঙ্গা মধুকর' সাজিয়ে সমুদ্র যাত্রা করত, আর বিদেশ থেকে সোনায়-প্রবালে-মুক্তোয় ডিঙা-বোঝাই করে ঘরে ফিরত। দেশে বণিকদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। বিদ্যাচর্চা উচ্চশ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ টোলের অধ্যাপক হতেন। দেশে স্ত্রী-শিক্ষার প্রচলন বিশেষ ছিল না।

দেশে দ্রব্যবিনিময় ব্যবস্থা ছিল, সেই সঙ্গে কড়ি দিয়ে কেনাবেচার রীতি ছিল পণ্যমূল্যের তালিকা দেখে দেশে জিনিসপত্রের দাম সুলভ ছিল বলেই মনে হয়।

মুসলমান ডিহিদার এবং স্বেচ্ছাচারী নবাব ক্ষেত্রবিশেষে বিধর্মীদের ওপর

অত্যাচার করতেন। বিজয়গুপ্তের 'মনসামঙ্গল' এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের মধ্যে তার আভাস আছে। মুকুন্দরাম বলেছেন :

"সে মানসিংহের কালে প্রজার পাপের ফলে
ডিহিদার মাসুদ সরিপ।
উজির হ'লো রায়জাদা, বেপারিরে দেয় খেদা,
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হল্য অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া পনর কাঠায় কুড়া
নাহি শুনে প্রজার গোহারি॥"

মানুষ অত্যাচারী শাসকের উৎপীড়নে অসহায় পশুর মতোই জন্মভূমি ত্যাগ করে পথে পথে ঘুরেছে। মুকুন্দরামের কাব্যে পশুদের কান্না সর্বস্তরের মানুষের কান্নার রূপক মাত্র। মুকুন্দরামের 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে কালকেতুর নগর পত্তনের যে-বর্ণনা আছে তাতে এক নতুন সমাজ গঠনের ছবি আছে, এই-ছবি সামাজিক সমন্বয়ের ছবি। কেউ কেউ আবার কালকেতুর নগর পত্তনের অন্তরালে ইতিহাসের উত্থান পতন এবং রাজ্য ভাঙাগড়ার কাহিনী প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে করেন।

সমাজে অসংযম এবং অমিতাচার কম ছিল না। ধনপতির পায়রা ওড়ানো আর শ্রীমন্তের বহুবিবাহ তার প্রমাণ। সমাজের নৈতিক অধঃপতনের ছবি উপস্থিত করেছে মুরারি শীল আর ভাড়ু দত্তরা। বহু বিবাহের ফলে পারিবারিক কলহ ছিল নিত্য-নৈমিত্তিক ঘটনা। নারীর ওপর অত্যাচার বড়ো কম হত না। নারীর অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্ঠুরতম পদ্ধতি সমাজে প্রচলিত ছিল। পুরুষশাসিত সমাজের একদিকে ছিল পুরুষের ভোগবিলাস, অন্যদিকে অকথ্য নারীনিগ্রহ। নিম্নবর্ণের নারীর অবরোধ প্রথা কিছুটা শিথিল ছিল। এই যুগে নারী স্বাধীনতা ছিল অত্যন্ত সীমিত। নারীর স্বতন্ত্র বিশ্বাসকে সমাজ মেনে নিতে পারে নি। নারীজাতির এই সব লাঞ্ছনার ছবি মঙ্গলকাব্যগুলির মধ্যে অশ্রুর অক্ষরে লেখা আছে।

ভারতচন্দ্রের কালে এসে গ্রাম্য জীবনের সরলতাকে নগর জীবনের বিলাসিতা ও রুচির দ্বারা প্রভাবিত হতে দেখা যায়। অন্য মঙ্গলকাব্য থেকে তাই ভারতচন্দ্রের কাব্য অনেকটা অভিজাত।

মঙ্গলকাব্য :

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ হল এই মঙ্গলকাব্য। পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন মঙ্গলকাব্য রচিত হয়ে জনমানসে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। একটি বিশেষ যুগের সাহিত্য-সাধনা হলেও এই কাব্য-সৃষ্টির প্রেরণা বিশেষ একটি সাম্প্রদায়িক ধর্মবিশ্বাস থেকে আসে নি। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন অবস্থার সম্মুখীন হয়ে বঙ্গদেশের লৌকিক ও বহিরাগত ধর্মমতের যে অপূর্ব সমন্বয় সাধিত হয়েছিল মঙ্গলকাব্যের মধ্যে তারই পরিচয় আছে। বিভিন্ন যুগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের আচার-আচরণ, সংস্কার-সংস্কৃতি

ও ধর্মবিশ্বাসের ভিত্তির উপরেই তাদের প্রতিষ্ঠা। এক সময়ে যে-উদ্দেশ্যে সংস্কৃত পুরাণ ও উপপুরাণগুলি রচিত হয়েছিল, বাংলা মঙ্গলকাব্যগুলিও সর্বপ্রথম সেই উদ্দেশ্যে রচিত হয়।

বাংলা মঙ্গলকাব্যের বিস্তৃতি যেমন দীর্ঘ তেমনি তার বৈচিত্র্যও বিস্ময়কর। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল, অভয়ামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, রায়মঙ্গল প্রভৃতি নানা শাখা-প্রশাখায় এই কাব্যধারা প্রবাহিত। এর মধ্যে মনসা, চণ্ডী এবং ধর্মমঙ্গল শাখাই প্রধান।

বাংলার মঙ্গলকাব্যগুলিকে বাংলার মাটির সম্পদ্ বলা চলে। এই শ্রেণীর কাব্যের উদ্ভব ও বিকাশ বাংলার লোকজীবনের বিবর্তন-ধারার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। অনার্য-পরিকল্পনা-সূত্রে উদ্ভূত এই সব দেব-দেবী তুর্কী আক্রমণে জাতির দুর্বলতার সুযোগে আর্য-সমাজে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন।

সেদিন বাঙালী-জীবনকে আচ্ছন্ন করেছিল অমঙ্গল আর বিভীষিকার ঘোর অন্ধকার। এই সর্বনাশা বিভীষিকার হাত থেকে উদ্ধার এবং সমাজের সর্বসাধারণের মঙ্গল-বিধানের জন্যেই প্রয়োজন ছিল ভয়ঙ্কর দেব-দেবীর আশীর্বাদ। এই আকাঙ্ক্ষার সূত্র ধরেই এলেন মনসা-চণ্ডী-ধর্ম প্রভৃতি মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা। পূজা-প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে রচিত হল তাঁদের মাহাত্ম্যকাহিনী।

'মঙ্গল'-নামকরণের অন্য নানাবিধ কারণ আছে বলে মনে হয়। এক মঙ্গলবার থেকে অন্য মঙ্গলবার পর্যন্ত কাব্যের পালা গান করা হত; কোথাও কোথাও মঙ্গলাসুরবধের কাহিনীও আছে। আর আছে প্রগাঢ় বিশ্বাস যে—কাব্য পাঠ করলে বা শুনলে মঙ্গল হয়। এসব কারণ থেকেই কাব্যের নাম মঙ্গলকাব্য হতে পারে।

মানুষ বিপদে পড়লে দেব-দেবীর শরণ নেয়। বাংলার মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীর উৎপত্তির মূলে এই ধরনের আধিভৌতিক প্রভাব আছে। সাপের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে মনসা-দেবীর পরিকল্পনা, হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে রক্ষার জন্যে চণ্ডীদেবীর উৎপত্তি। এসব দেবদেবী মেয়েলী ব্রতকথায় ছড়ায় পাঁচালীতে বহু আগে থেকেই নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিলেন। আর পঞ্চদশ শতাব্দীতে তাঁদের দেখা গেল সাহিত্যের আসরে। সাহিত্যের দরবারে আসার আগে মঙ্গল-কাব্যের দেব-দেবীরা জাতে উঠলেন। অর্থাৎ অনার্যপ্রভাব পরিত্যাগ করে তাঁরা সকলেই আর্য দেব-দেবীতে রূপান্তরিত হলেন। অনার্য দেবী মনসা আর্যদেবতা শিবের মানসকন্যায় পরিণত হলেন। এভাবে দেবী চণ্ডী তাঁর অনার্য পরিচয় মুছে ফেলে হলেন শিবের গৃহিণী। পার্বতীর সঙ্গে তাঁর কোনো প্রভেদ থাকল না।

মধ্যযুগে মঙ্গলকাব্যগুলির গঠনবিন্যাস প্রায় একই রকম। গঠনবিন্যাসের দিক থেকে বিচার করলে মঙ্গলকাব্যকে চার খণ্ডে ভাগ করা যায়। এক ॥ বন্দনা। এখানে দেবদেবীর বন্দনা করা হয়েছে। দুই ॥ গ্রন্থরচনার কারণ-বর্ণনা। কবির আত্মপরিচয় এই অংশের বর্ণিত বিষয়। তিন ॥ দেবখণ্ড। এই অংশে পৌরাণিক

এবং লৌকিক দেবদেবীর সমন্বয় সাধিত হয়েছে। চার ॥ নরখণ্ড। এই খণ্ডে লৌকিক কাহিনী বর্ণিত। কোনো অভিশপ্ত দেবতা পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে অবহেলিত দেব-দেবীর পূজা প্রচার করে আবার স্বর্গে ফিরে গেছেন। নরখণ্ডের মধ্যেই বারমাস্যা, নায়িকার সাজসজ্জা, রন্ধন-পদ্ধতি, নারীদের পতিনিন্দা ইত্যাদি বর্ণিত। এই গতানুগতিকতার মধ্যেও প্রতিভাবান্ কবিরা স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখে গেছেন।

মনসামঙ্গল কাব্যের দেবী ও মনসামঙ্গল-কাহিনী

মনসামঙ্গলের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর নাম মনসা বা পদ্মাবতী। তাই এই কাব্যকে মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ বলা হয়। মনসা সাপের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। সর্পসঙ্কুল বঙ্গদেশে সর্পভয়ে ভীত মানুষ তাই দেবী মনসার আরাধনা করেছে।

কোনো কোনো অর্বাচীন পুরাণে মনসাকে শিবকন্যা বলা হয়েছে। কিন্তু কোনো প্রামাণিক প্রাচীন পুরাণে শিবের কোন মানসকন্যার কথা নেই।

মনসামঙ্গল-কাব্যে দেবীর যথার্থ স্বরূপটি ধরা পড়েছে। সাপের দেবী বলেই তিনি কিছুটা উগ্রস্বভাবের। মনসামঙ্গল-কাব্যে যে-কাহিনী আছে তা থেকে জানা যায় তিনি শিবের মানসকন্যা। বিমাতা চণ্ডীর সঙ্গে কলহের ফলে তাঁর একটি চোখ নষ্ট হয়। এই চোখের জন্যে তিনি চাঁদসদাগরের কাছে 'কানী' বলে নিন্দিত হয়েছিলেন।

প্রথমে নিম্নসমাজের কাছে মনসার পূজা প্রচলিত হল। কিন্তু উচ্চ সমাজের মানুষ মনসা-পূজা করত না। তাই চাঁদসদাগরের কাছে পূজা আদায় তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল। চাঁদ ছিলেন পরম শৈব, বণিক্-সমাজের মধ্যমণি। তিনি মনসা-পূজা করলে বণিক্-সমাজে মনসার পূজা প্রচলিত হবে এই আশায় দেবী মনসা চাঁদের শরণাপন্ন হলেন। কিন্তু শিবের ভক্ত চাঁদসদাগর কিছুতেই মনসা-পূজা করতে চাইলেন না। মনসাও রেগে গিয়ে প্রতিশোধ নেবার সঙ্কল্প করলেন। নন্দন-কানন-সদৃশ চাঁদের গুয়াবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে গেল। রাজ্যের নরনারী সাপের কামড়ে প্রাণ হারাতে লাগল। কিন্তু চাঁদ ছিলেন মহাজ্ঞানের অধিকারী। তিনি গুয়াবাড়িকে বাঁচিয়ে তুললেন। চাঁদের বন্ধু শঙ্কর গাড়রী ছিলেন সাপের ওঝা। তিনি সর্পদংশনে মৃত মানুষকে বাঁচিয়ে তুলতেন।

দেবী মনসা কৌশলে বধ করলেন শঙ্কর গাড়রীকে, চুরি করলেন চাঁদের মহাজ্ঞান। এরপর তাঁরই চক্রান্তে চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু হল। তবু চাঁদ রইলেন অটল অচল। চাঁদসদাগর চৌদ্দ ডিঙা সাজিয়ে বাণিজ্য-যাত্রা করলেন। পথে মনসা-দেবী দেখা দিয়ে বললেন, 'মোর তরে ফুলজল দেও একবার'। উত্তরে চাঁদ ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন ;

> "যে হস্তে পূজি আমি শিব শূলপাণি।
> সেই হস্তে না পূজিব চেঙ্‌মুড়ী কানী ॥"

দেবী নিলেন এর প্রতিশোধ। তাঁর আদেশে মাঝ-সমুদ্রে বান ডাকল। একে

একে চাঁদের চৌদ্দ ডিঙা ডুবে গেল গভীর সমুদ্রে। চাঁদ কোনোক্রমে তীরে উঠে প্রাণ বাঁচালেন। তারপর দীর্ঘ বার বছর নানা দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে ভিক্ষুকের বেশে ফিরে এলেন নিজের দেশে।

তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র লখিন্দর তখন পূর্ণ যুবক। নতুন আশায় বুক বেঁধে ছেলের বিয়ের জন্যে উদ্যোগী হলেন সদাগর। উজানীনগরের সায়বেনের কন্যা বেহুলার সঙ্গে তার বিয়ে ঠিক হল। বিয়ের রাত্রে লখিন্দরের সর্পদংশনে মৃত্যু লেখা আছে জেনে চাঁদ এক নিশ্ছিদ্র লোহার বাসর-ঘর নির্মাণ করলেন। কিন্তু নির্মম নিয়তিকে রোধ করা গেল না। বিয়ের রাত্রেই প্রাণ হারাল লখিন্দর।

সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে নদীর জলে ভাসিয়ে দেবার প্রথা ছিল। লখিন্দরকেও তাই করা হল। লখিন্দর-পত্নী বেহুলা বলল, সেও মৃত স্বামীর সঙ্গে যাবে এবং স্বর্গলোকে দেবতাদের কাছ থেকে স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনবে। আত্মীয়-স্বজন তাকে প্রতিনিবৃত্ত করতে পারলেন না। মৃত স্বামীকে কোলে নিয়ে গাঙুড়ের জলে ভেলা ভাসাল বেহুলা :

"যাইব মনসাপুরী দড়াইয়াছি মন।
মরা স্বামী জীয়াইব ভাসুর ছয়জন॥"

ধীরে ধীরে লখিন্দরের নধরকান্তি সুঠামদেহ গলিত পূতি-গন্ধময় হল, ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে বেহুলার। সেই অস্থিকঙ্কালের মধ্যেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠবে নবকলেবরে তার লখিন্দর—এই দুরাকাঙ্ক্ষা বুকে নিয়ে বেহুলা দিনের পর দিন রাতের পর রাত নিরুদ্দেশ-যাত্রায় এগিয়ে চলল। ঘাটে ঘাটে হাজার প্রলোভন, নদীর পথে পথে মোহনায় মোহনায় প্রচণ্ড বিভীষিকা। ভয় পেল না বেহুলা, কোনো সন্ত্রাস এসে তার গতিপথ রুদ্ধ করতে পারল না; কোনো প্রলোভন টলাতে পারল না তাকে অপরাজেয় সঙ্কল্প থেকে। অবশেষে দেব-রজকিনী নেতার সাহায্যে সতী বেহুলা এসে উপস্থিত হল স্বর্গরাজ্যে।

দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় দেবদেবী সকলে সমাগত। সেই সভায় গিয়ে নৃত্য প্রদর্শন করল নৃত্য-পটীয়সী সতী বেহুলা। স্তম্ভিত হলেন দেবগণ। মহাদেব তাকে ডেকে বললেন, "কী বর চাও'? বেহুলা স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চাইল। মহাদেব লখিন্দরের প্রাণ ফিরিয়ে দেবার জন্যে মনসাকে আদেশ করলেন।

মনসা বললেন, প্রাণ দিতে পারি কিন্তু চাঁদ আমার পূজা করবে এই শর্তে। তাঁর কথায় রাজি হল বেহুলা। দেবীর কৃপায় বেঁচে উঠল লখিন্দর, ভেসে উঠল তার শ্বশুরের চৌদ্দ ডিঙা। হৃত ঐশ্বর্যের অধিকারিণী বেহুলা এবার পুনর্যাত্রা করল স্বামীগৃহের উদ্দেশে।

"নগর নিকটে আইল আপনার দেশ।
স্বর্গের কিন্নরী হেন বেহুলার বেশ॥
লখার দ্বিগুণ রূপ দেবীর কৃপায়।
বেহুলা সাবিত্রী যারে মনসা সহায়॥"

চাঁদের সাত পুত্র সহ চৌদ্দ ডিঙা এসে ভিড়ল গাঙুড়ের ঘাটে। উন্মাদের মতো ছুটে গেলেন চাঁদসদাগর। কিন্তু যেই শুনলেন তাঁকে মনসা-পূজা করতে হবে সেই মুহূর্তে তিনি ফিরে গেলেন নিজের গৃহে।

বেহুলা গিয়ে চাঁদের পায়ে ধরে বলল, আমার দিকে একবার তাকান। তিনি পারলেন না পুত্রবধূর দিকে তাকাতে। অভ্রভেদী শালতরু এবার বুঝি স্নেহ-কোমল দক্ষিণ বাতাসের স্পর্শে ধরাশায়ী হল। বেহুলা বলল, 'আপনি বাম হাতে মনসাকে একটি ফুল দিন, তাহলেই মনসা খুশি হবেন।" পুত্রবধূর অনুরোধে চাঁদ মুখ ফিরিয়ে বাম হাতে মনসার উদ্দেশ্যে একটি ফুল ফেলে দিলেন। এতেই মনসা খুশি। মর্ত্যে তাঁর পূজার প্রচার হল।

মনসামঙ্গলের কবি

বিজয় গুপ্ত ঃ

"বাসরের দ্বারে গিয়া দাঁড়াইয়া চায়।
কোলে আয় রে লক্ষীন্দর তোর মায়ের প্রাণ যায়॥
গা তোল গা তোল গা তোল সত্বরে।
বিয়ার বরণ করিতে আসিলাম তোরে॥"

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ থেকে বঙ্গদেশে মনসামঙ্গল-কাব্য রচিত হতে থাকে। এই সময়ে মনসামঙ্গলের কয়েকজন শক্তিশালী কবির আবির্ভাব ঘটে। তাঁরা হলেন বিজয় গুপ্ত, নারায়ণদেব আর বিপ্রদাস পিপ্‌লাই।

বিজয় গুপ্তই মনসামঙ্গল-কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। তিনি বর্তমান বাংলাদেশের বরিশাল জেলার ফুল্লশ্রী (গৈলার পার্শ্ববর্তী) গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন ১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে দেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করে বিজয় গুপ্ত কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কোনো কোনো পুঁথিতে 'নৃপতি হুসেন শাহ'র উল্লেখ আছে। হুসেন শাহ ১৪৯৩-৯৪ খ্রীস্টাব্দে বাংলার সিংহাসনে বসেন। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই বিজয় গুপ্ত তাঁর কাব্য রচনা করেছিলেন বলে মনে হয়।

মনসামঙ্গল করুণরসের কাব্য, এই কাব্য-সৃষ্টিতে সার্থকতা লাভ করতে হলে যে সুগভীর ভাবপ্রবণতার প্রয়োজন হয় বিজয় গুপ্তের মধ্যে ছিল তার অভাব। ভাবপ্রবণতা অপেক্ষা তাঁর মধ্যে বস্তু-বিশ্লেষণের প্রবণতা ছিল প্রবল। ফলে সে যুগের বিচ্ছিন্ন সমাজচিত্র তাঁর কাব্যে সুন্দরভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এদিক থেকে বিচার করলে বিজয় গুপ্তের কাব্যকে মধ্যযুগের সামাজিক, রাজনৈতিক এবং ঐতিহাসিক দলিল বলা চলে। যদিও কাহিনী ও চরিত্র-সৃষ্টিতে বিজয় গুপ্ত বিশেষ কোন প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নি। কেবল উপকূল বাণিজ্য, বেহুলার কলার ভেলায় যাত্রা প্রভৃতি অংশে কবির রচনা-শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়।

তাঁর কাব্যে নিরবচ্ছিন্ন করুণ রস না থাকলেও মাঝে মাঝে দু-একটি পদে গভীর

বেদনার অনুভূতি ফুটে উঠতে দেখা যায়। লোহার বাসরঘরে লখিন্দরের মৃত্যুর পর সনকার যে শোকব্যাকুল চিত্র তিনি এঁকেছেন তাতে কবির দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

"কবাট করিয়া দূর বাসরে সামায়।
দেখিল সোনার তনু ধূলায় লুটায় ॥
দুই হস্তে ধরি রাণী লখাই নিল কোলে।
চুম্বন করিল রাণী বদন-কমলে।"

মনসার ঈর্ষাকুটিল চরিত্রটি কবি সুন্দর ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু চাঁদের প্রচণ্ড পৌরুষের সঙ্গে স্থূলতার সমাবেশ ঘটিয়ে কবি এই চরিত্রের মহিমাকে কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ করেছেন। তবে সমস্ত মাধুর্য আর পবিত্রতা ঢেলে দিয়ে তিনি রচনা করেছেন বেহুলার চরিত্র যা মনসামঙ্গল-কাব্যে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। বিজয় গুপ্ত মঙ্গলকাব্য রচনা করলেও তাঁর অন্তরে বৈষ্ণব ভাব প্রচ্ছন্ন ছিল। "জনমে জনমে হই রাধা কানুর দাস"—কাব্যের স্থানে স্থানে এই উক্তি পাওয়া যায়।

নারায়ণ দেব ঃ

"পিতামহ উদ্ধব নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা ॥
পূর্ব পুরুষ মোর অতি শুদ্ধমতি।
রাঢ় ত্যজিয়া মোর বোর গ্রামে বসতি ॥"

মনসামঙ্গল-কাব্যের কবিদের মধ্যে নারায়ণ দেব একজন বিশিষ্ট কবি। তাঁর রচিত কাব্যে কোথাও তাঁর আবির্ভাবকাল-সম্বন্ধে উল্লেখ পাওয়া যায় না। কিন্তু কতগুলি পারিপার্শ্বিক কারণে প্রাচীনতার দিক থেকে হরিদত্তের পরেই তাঁর নাম করতে হয়। নিজের পরিচয় সম্বন্ধে কবি কোন সংশয়ের অবকাশ রাখেন নি। জানা যায় মৌদ্‌গোলা গোত্রের কায়স্থ বংশে তাঁর জন্ম হয়েছিল। পিতার নাম নরসিংহ, মায়ের নাম রুক্মিণী। কবির পূর্ব পুরুষের আদিবাস ছিল রাঢ়ভূমি। পরে বোরগ্রামে বসতি হয়। এই গ্রাম এখন ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত। গ্রন্থ-রচনা-সম্পর্কে কবি নিজে বলেছেনঃ

"পদ্মপুরাণের কথা শ্লোক করা আছে।
নারয়ণ দেবে তারে পাঁচালী রচিছে ॥"

তিনি-যে শক্তিশালী কবি ছিলেন তার প্রমাণ মেলে বাংলা-আসামের ব্যাপক অঞ্চলে তাঁর পুঁথির প্রচলন থেকে। পুঁথির বিশালতাও তাঁর শক্তির পরিচয় বহন করে। মনসার লৌকিক কাহিনীর চেয়ে পুরাণের দেবদেবীর লীলা-বর্ণনায় তিনি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এই দেবখণ্ডের কাহিনী পুষ্ট হয়েছে মহাভারত, পুরাণ আর কালিদাসের 'কুমারসম্ভবে'র নানা উপাদানে। তাই মনে হয়, নারায়ণ দেব ছিলেন সংস্কৃতসাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ।

চরিত্রসৃষ্টি, রসবৈচিত্র্য আর কাহিনীগ্রন্থনে নারায়ণ দেব বিশেষ প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য তাঁর অনুভূতি-সজাগ কবিহৃদয়ের উপর দুর্ভার বোঝার মত চেপে বসে নি। তাঁর কাব্যের ভাষায় সূক্ষ্ম কারুকার্য ছিল না, কিন্তু স্থূল-রুক্ষ বাচনভঙ্গির মধ্যে ফুটে উঠেছে মহাকাব্যোচিত ওজস্বিতা।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ :

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ পশ্চিমবঙ্গের মনসামঙ্গল রচয়িতাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গের কবি হলেও সমগ্র বঙ্গদেশে তাঁর লেখা পুঁথি প্রচারিত হয়েছিল। কাব্যে কবির বিস্তৃত কুল-পরিচয় জানা যায় না, তবে রচনার মধ্যে তিনি কায়স্থ সমাজের জন্য দেবীর কৃপা প্রার্থনা করেছেন বলে মনে হয় কবি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কবি বলেছেন—

কেতকার বাণী রক্ষ ঠাকুরাণী,
কায়স্থ যতেক আছে।

তাঁর কাব্যে যে আত্মবিবরণী আছে তা থেকে কবির ব্যক্তিগত জীবন ও সে যুগের নানা তথ্য জানা যায়।

ক্ষেমানন্দ বর্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। নানা অশান্তির জন্য কবি দেশত্যাগ করেন। অবশেষে রাজা বিষ্ণুদাসের ভ্রাতা ভারামল্লের কাছ থেকে তিনটি গ্রাম উপহার পান এবং সেখানেই বসবাস করেন।

"রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাঁহারে ভেটিতে যাই
নাম তাঁর ভারামল্ল।
তিনি দিলেন ফুল পান আর তিনখানি গ্রাম
লিখাপড়া বসতির স্থান॥

ক্ষেমানন্দ তাঁর মনসামঙ্গলে মনসাদেবীকে 'কেতকা' বলে অভিহিত করেছেন। কবি ছিলেন মনসা অর্থাৎ, 'কেতকার দাস', তাই কবির নাম 'কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ।' গ্রন্থ রচনার সময় জানা না গেলেও মনে হয় কেতকাদাস সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাব্য রচনা করেন।

ক্ষেমানন্দের কাব্যে উচ্চাঙ্গের কবিত্ব শক্তির সঙ্গে পাণ্ডিত্য যুক্ত হয়ে কাব্যকে চমকপ্রদ করে তুলেছে। তাঁর ভাষা ছিল সহজ সরল ও সুপরিচ্ছন্ন, পূর্ববর্তী যুগের গ্রাম্যতা থেকে মুক্ত। এই সুপরিচ্ছন্ন ভাষায় তিনি বেহুলার দুঃখ-বেদনা বর্ণনা করে রস সৃষ্টি করেছেন।

মনসামঙ্গলের অধিকাংশ কবিই বেহুলার স্বর্গপুরী যাত্রাপথের পরিচয় দিতে গিয়ে কল্পনার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু ক্ষেমানন্দের কাব্যে যে-সব ঘাট বা গ্রামের নাম আছে তাদের মধ্যে চোদ্দটি ঘাট বা গ্রাম এখনও আছে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও রামায়ণ কাহিনীর প্রভাব তাঁর কাব্যে অত্যন্ত স্পষ্ট। এই দুই উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্য রচনা করেন।

অনুশীলনী

১। মঙ্গলকাব্য কাকে বলে? মনসামঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্য কি? এই কাব্যধারার যে-কোন দুজন কবি ও তাঁদের কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা কর।
[ত্রিপুরা উঃ মাঃ ১৯৮০, নমুনা প্রশ্ন ১৯৭৯, '৮০, '৮১]

২। 'মঙ্গলকাব্যগুলি বাংলার তৎকালীন সমাজ জীবনের ঐতিহাসিক দলিল' —আলোচনা কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৩। মঙ্গল শব্দের অর্থ কি? এই কাব্যের বৈশিষ্ট্য কি? এর উদ্ভব কিভাবে ঘটল? [উঃ মাঃ ১৯৮২, নমুনা প্রশ্ন ১৯৮০-৮১]

৪। মনসামঙ্গল-কাব্যের কাহিনীটি তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

৫। মনসামঙ্গল-কাব্যের কবিদের সম্পর্কে আলোচনা কর। তোমার মতে এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

৬। মনসামঙ্গল-কাব্যে মধ্য-যুগের যে-সমাজ-চিত্র ফুটে উঠেছে তা সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৭। মনসামঙ্গল-কাব্য মঙ্গল-কাব্যের মধ্যে কোন্ কোন্ গুণে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়? এই কাব্যে চাঁদ সদাগরের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য কিভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা বিবৃত কর। [উঃ মাঃ ১৯৭৯]

৮। মনসামঙ্গলের আদি কবি কে? এই কাব্যের জনপ্রিয় কবিদের নামোল্লেখ সহ একজন কবির কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৯। মনসামঙ্গল কাব্যধারার ইতিহাস সংক্ষেপে লিখে এই কাব্যের যে-কোন একজন শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যের পরিচয় দাও। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

১০। মঙ্গলকাব্যের বৈশিষ্ট্য কি কি? মনসামঙ্গল কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবির জীবন ও কাব্য-প্রতিভার পরিচয় দাও। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

১১। নারায়ণ দেব ও বিজয়গুপ্তের কাব্যকৃতি সম্বন্ধে যা জান লিখ।
[ত্রিপুরা উঃ মাঃ পরীক্ষা, ১৯৭৮]

পঞ্চম অধ্যায়

সাহিত্যে ও সমাজজীবনে চৈতন্যদেব

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাংলার সমাজ ও জাতীয় জীবনের নানা দিকে যেমন পরিবর্তন ঘটেছে তেমনি বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা দিয়েছে পালা বদল। সমাজ সাহিত্যের এই পরিবর্তন ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা।

শ্রীচৈতন্য কেবল একজন ভক্তমাত্র ছিলেন না। তাঁর আবির্ভাবে বাঙ্গালীর সাধনা ও সদাচার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছিল।

চৈতন্য-পূর্ব যুগে বাংলার সমাজ ও ধর্মজীবন ছিল নানাভাবে কুলষিত। অনাচার এবং দুর্নীতি সমাজের সর্বস্তরে পরিব্যপ্ত ছিল। তুর্কী আক্রমণ বাঙ্গালীর জীবনে প্রথম বৈদেশিক আক্রমণ। ফলে দিশাহারা বাঙ্গালী সেদিন ধর্ম ও সমাজ রক্ষার জন্যে স্মৃতি সংহিতার বিধি-বিধানকেই আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা করেছে। ফলশ্রুতি হিসাবে জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণাশ্রমধর্ম সমাজজীবনে শিকড় গেড়ে বসেছে। সঙ্গে সঙ্গে ধনী দরিদ্রের মধ্যে রচিত হয়েছে বিশাল ব্যবধান। সেদিনের ধনী পায়রা উড়িয়ে পাশা খেলে দিন কাটাত, ধর্মের নামে বাইরের আড়ম্বর বড় হয়ে উঠেছিল। শ্রীচৈতন্য যে ধর্ম আন্দোলন শুরু করেছিলেন তা কখনই একটি বিশেষ ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁর প্রচারিত ধর্মের মূলমন্ত্র ছিল 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠো হরিভক্তিপরায়ণঃ'। তাঁর এই মতাদর্শ বাংলার সমাজ ও ধর্মজীবনের একটা বিপ্লব এনেছিল। নাম সংকীর্তন তাঁর প্রচারিত ধর্মমতের অঙ্গ হওয়ায় ধনী-নির্ধন সকলে একত্রে মিলিত হয়ে সংকীর্তনের মাধ্যমে ধর্মচর্চায় প্রবৃত্ত হয়েছিল। এইভাবে সমাজের ভেদনীতি কিছুটা বিদূরিত হয়েছিল। বলা যায় জাতিভেদ প্রথার মূলেই শ্রীচৈতন্য কুঠারাঘাত করেছিলেন। ফলে কেবল হিন্দু সমাজে নয় মুসলমান সমাজেও তিনি শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছিলেন। শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত ধর্মনীতির মূল কথা মনুষ্যত্বের উদ্বোধন। অধ্যাপক যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য বলেছেন—"কানু ছাড়া গীত নাই কানু ছাড়া উপমা নাই"—প্রভৃতি প্রবাদের দ্বারা যে প্রেমিক কানুর কথা বলা হইয়াছে, প্রেমের কথা বলিতে যাইয়া সেই কানুর নাম মুসলমান কবিরাও গ্রহণ করিয়াছেন। লালনের একটি পদে পাই—

"আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা।
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপিন ধরা॥

বাংলা সমাজ ও ধর্মজীবনের মত বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উপরেও চৈতন্য-ভাবনার প্রভাব পড়েছিল।

তাই ষোড়শ, সপ্তদশ, এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তাঁর প্রভাবে প্রভাবিত। কেবল বৈষ্ণব সাহিত্য নয় মঙ্গলকাব্য, রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের অনুবাদ চৈতন্য জীবনাদর্শের দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে মঙ্গলকাব্য জাতীয় কিছু কিছু আখ্যান কাব্য,

অনুবাদ সাহিত্য ও বৈষ্ণব পদাবলী বাংলা ভাষায় রচিত হয়েছিল। এই যুগের বাংলা ভাষা (শব্দ, ছন্দ, অলঙ্কার) বিশেষ মার্জিত ছিল না। চৈতন্যযুগেই বাংলা ভাষার উপর প্রথম সংস্কৃতের প্রভাব সঞ্চারিত হল। ফলে অমার্জিত বাংলা সাহিত্যের ভাষা ও প্রকাশ রীতি পরিশীলিত হয়ে শিষ্টজনের উপভোগ্য হয়ে উঠল। চৈতন্য অনুচরগণ সকলেই সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং বাংলা ভাষায় নানান গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন। তাদের মাধ্যমেই বাংলা ভাষার শব্দ ভাণ্ডারে বহু তৎসম শব্দ প্রবেশ করেছিল। তৎসম শব্দের শক্তিতেই আজ বাংলা ভাষার লাবণ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

পূর্ব-চৈতন্য যুগেও বাংলাদেশে বৈষ্ণব ধর্ম ও সাহিত্যের চর্চা ছিল। বড়ুচণ্ডী-দাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', মালাধর বসুর 'শ্রীকৃষ্ণ বিজয়' এবং চণ্ডীদাসের পদাবলী তার প্রমাণ। এই যুগের বৈষ্ণব সাধনার বৈশিষ্ট্য ছিল 'বৈধীভক্তি'। কৃষ্ণকে সর্বশক্তি-মান ঈশ্বর জেনে তাঁর প্রতি ভক্তি নিবেদনের নাম 'বৈধী ভক্তি'। কিন্তু শ্রীচৈতন্য বৈষ্ণব সাধনার ক্ষেত্রে আনলেন নতুন পরিবর্তন। তিনি প্রচার করলেন 'রাগানুগা ভক্তি'। কৃষ্ণকে প্রেমিক রূপে কামনা করাই এই রাগানুগা ভক্তির মূল কথা। এই প্রেম-প্রীতি সম্বন্ধে কৃষ্ণ কখনও আমাদের পুত্র-সখা-প্রেমিক। রাধাকৃষ্ণের প্রেমই ছিল রাগানুগা ভক্তির মূল বিষয়। শ্রীচৈতন্য রাধা ভাবে ভাবিত ছিলেন, অর্থাৎ তাঁর সাধনা ছিল রাধা ভাবের সাধনা। তাঁর জীবনের মধ্যে এই অপার্থিব রাধাকৃষ্ণ লীলাকে প্রত্যক্ষ করার অভিজ্ঞতা সে যুগের কবিদের মানসিকতাকে নানাভাবে প্রভাবিত করেছে। ফলে উত্তর-চৈতন্য যুগের বৈষ্ণব সাহিত্য রাগানুগা ভক্তির আধ্যাত্মিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত হল। তাছাড়া রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণনার উপর পড়ল চৈতন্য জীবনের ছায়া। ফলে শ্রীচৈতন্যের জীবনলীলা অবলম্বনে 'গৌরচন্দ্রিকা' নামে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক এক বিশেষ শ্রেণীর পদ রচিত হল।

চৈতন্য জীবনকে অবলম্বন করে বাংলা ভাষায় প্রথম জীবনী কাব্য রচিত হয়েছিল। শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ও অনুচরদের জীবনকথাও একাধিক কাব্যে বর্ণিত হয়েছে। মানুষের জীবন-কাহিনীকে অবলম্বন করেও-যে উচ্চশ্রেণীর কাব্য, সাহিত্য, দর্শন লেখা যায় এ যুগের জীবনী কাব্যগুলিই তার প্রমাণ।

বৈষ্ণব সাহিত্য অতিক্রম করে চৈতন্য প্রভাব পড়েছিল বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায়। চৈতন্যযুগের পূর্বে বাংলায় মঙ্গলকাব্য নামে এক শ্রেণীর শাক্ত সাহিত্য রচিত হয়েছিল। মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা সকলেই ছিলেন ভয়ঙ্কর বা ভয়ঙ্করী। তাদের সন্তোষে ভক্তের মঙ্গল, আর অসন্তোষে ঘটত ভক্তের সর্বনাশ। চৈতন্য-পরবর্তী কালে মঙ্গলকাব্যের দেব-দেবীরা তাদের কোপন স্বভাব পরিত্যাগ করে কিছুটা কোমল স্বভাবের হয়ে উঠেছিলেন। মঙ্গলকাব্যে যে পরধর্ম-সহিষ্ণুতার ভাবটি পরবর্তী কালে দেখা যায় তাও চৈতন্যদেবের অসাম্প্রদায়িক ব্যক্তিত্বের প্রভাবজাত। সেই কারণে চৈতন্য-পূর্ব কালের শৈব চাঁদসদাগর বা ধনপতি সদাগর

যতটা মনসা- বা চণ্ডী-বিরোধী ছিলেন উত্তর-চৈতন্য যুগের মঙ্গলকাব্যে তাঁদের সেই মারমুখী বিরোধী মনোভাব কিছুটা প্রশমিত হতে দেখা যায়। তাছাড়া বহু শাক্ত কবির কাব্যে 'বিষ্ণুপদ' পাওয়া যায়। এগুলিও চৈতন্যযুগের অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রত্যক্ষ ফল। কবিদের ধর্মচেতনা অসাম্প্রদায়িক না হলে শাক্তকাব্যে অর্থাৎ মঙ্গলকাব্যে বিষ্ণুপদের মত বৈষ্ণব প্রসঙ্গের অবতারণা করতেন না। তাছাড়া অনেক মঙ্গলকাব্যে দেব-দেবীর বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় চৈতন্য বন্দনা। এটাও চৈতন্য-ব্যক্তিত্বের প্রভাবজাত সন্দেহ নেই। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে শ্রীচৈতন্য ও তাঁর অনুচরদের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা প্রকাশিত হয়েছে। কবির ব্যক্তিগত বৈষ্ণব ধর্মানুরক্তি অনেক জায়গায় প্রকাশ্যেই ব্যক্ত হয়েছে।

চৈতন্য-পূর্ব যুগেই রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের অনুবাদ কর্মের সূচনা হয়। চৈতন্য-পরবর্তী কালেও এই অনুবাদের ধারা অব্যাহত ছিল। পরবর্তী কালের বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল চৈতন্য প্রভাব।

এ যুগের 'অনুবাদ সাহিত্য মূলের আক্ষরিক অনুবাদ না হয়ে হয়ে উঠেছে ভাবানুবাদ। কোথাও কোথাও মূলের অতিরিক্ত লৌকিক বা স্বরচিত কাহিনী যুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ অনুবাদের ব্যাপারে কবিরা কিছুটা স্বাধীনতা গ্রহণ করেছেন এবং সেই সব অনুবাদ কর্মের উপর পড়েছে শ্রীচৈতন্যদেবের স্পষ্ট প্রভাব। চৈতন্য-পূর্ব যুগের অনুবাদকারদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃত ভাষায় লেখা মহাকাব্য ও পুরাণের সঙ্গে অসংস্কৃতজ্ঞ জনগণকে পরিচিত করা। সেই কারণে তাঁরা সর্বদাই মূলের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করে চলেছেন। পক্ষান্তরে চৈতন্য-পরযুগের অনুবাদ কাব্যে মূলের আনুগত্য রক্ষা করা হয় নি। কবিদের দৃষ্টি ছিল চৈতন্য প্রভাবে আচ্ছন্ন, তাই অনুবাদ করতে গিয়েও তাঁরা চৈতন্যদৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। রামায়ণের আর্যবীর রামচন্দ্র নদীয়ার অমিয় নিমাই চরিত্রের প্রভাবেই কোমল বাঙ্গালী চরিত্রে পরিণত হয়েছেন। রামচন্দ্র যেমন কানু কল্পনার দ্বারা প্রভাবিত তেমনি রাম-জননী কৌশল্যা হয়েছেন কানু-জননী যশোদার বা শচীদেবীর আলোয় আলোকিত। কৌশল্যার মধ্যে অকারণ স্নেহের আতুর জননী মূর্তি চৈতন্য-প্রভাবিত বৈষ্ণব ধর্মাদর্শের পরোক্ষ ফল। কাশীরামের মহাভারতের কৃষ্ণ ও অর্জুন উভয়েই বাঙ্গালী-সুলভ কোমলস্বভাবের মানুষ। চরিত্র এবং ঘটনা পরিবর্তনের ফলেই বাঙ্গালী সমাজে মহাভারত এত আদরণীয় হয়ে উঠেছে। উত্তর-চৈতন্য যুগের ভাগবতের অনুবাদ সম্পর্কেও এই কথাই বলা যায়। ভাগবতের বৈধী-ভক্তির স্থানে চৈতন্য-প্রবর্তিত রাগানুগা ভক্তিধারা অনুসৃত হওয়ায় কবিরা ভাগবত বহির্ভূত কৃষ্ণের বিচিত্র লীলা বর্ণনা করে গৌড়বাসীর অমৃত তৃষ্ণা দূর করেছেন। সেই কারণে বলা চলে যে, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শ্রীচৈতন্যের দ্বারা প্রভাবিত। কেবল সাহিত্য নয় বাংলার সমাজ ও ধর্ম জীবন শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে প্রভাবিত বলে এই যুগকে চৈতন্য চেতনার যুগ বলা হয়।

অনুশীলনী

১। খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেব ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মমতের কি প্রভাব অনুভব করা যায় তা আলোচনা কর। [উঃ মাঃ ১৯৭৯]

২। বাংলার কোন্ সামাজিক পটভূমিকায় শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্মের সূচনা হয়েছিল তা বিশ্লেষণ করে বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব নিরূপণ কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

৩। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যের প্রভাব-সম্পর্কে আলোচনা কর। [ত্রিপুরা উঃ মাঃ ১৯৮০, '৮২]

৪। একটা বিশেষ যুগকে 'চৈতন্যযুগ' বলা হয় কেন? এই যুগের বিশিষ্টতা নির্ণয় কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৫। বাংলা সাহিত্যে সমাজ ও ধর্মবোধে শ্রীচৈতন্যদেবের প্রভাব আলোচনা কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

৬। ষোড়শ শতাব্দীকে কেন সুবর্ণ যুগ বলা হয় আলোচনা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

চণ্ডীমঙ্গলের কাহিনী

চণ্ডীমঙ্গলের দুটি কাহিনী প্রচলিত আছে। প্রথমটি আখেটিক খণ্ড বা ফুল্লরা-কালকেতুর কাহিনী, অন্যটি বণিক্-খণ্ড বা ধনপতি-সদাগরের কাহিনী।

কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী ঃ

দেবরাজ ইন্দ্র শিবপূজার ফুল তোলার ভার দিয়েছিলেন পুত্র নীলাম্বরের উপর। একদিন চণ্ডীদেবীর ইচ্ছে হল পৃথিবীর মানুষের কাছে পূজা আদায় করার। কাকে দেবেন এই কাজের ভার? ভাবতে ভাবতে মনে পড়ল ইন্দ্রের ছেলে নীলাম্বরের কথা। তাকেই পৃথিবীতে পাঠিয়ে পূজা-প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে।

একদিন চণ্ডীর মায়ায় স্বর্গরাজ্য ফুলহীন হল। বাধ্য হয়ে নীলাম্বর ফুল আনতে গেলেন পৃথিবীতে। এক বনের ধারে ফুল তুলতে গিয়ে নীলাম্বরের চোখে পড়ল স্বাধীন ব্যাধ-জীবনের ছবি। হয়তো মনে মনে ভাবলেন এর চেয়ে যদি ব্যাধ হয়ে জন্মাতাম!

ওদিকে বেলা বেড়ে যায়। নীলাম্বর হাতের কাছে যা ফুল পেলেন তাই তুলে নিয়ে ছুটে গেলেন স্বর্গে। এদিকে দেবী চণ্ডী সেই ফুলের মধ্যে একটি ছোট্ট কীট হয়ে রইলেন লুকিয়ে। নীলাম্বর সে-কথা জানতে পারলেন না। পূজার সময়ে শিবের মাথায় কীট দংশন করল। মহাদেব নীলাম্বরকে শাপ দিলেন। মহাদেব বললেন ঃ

"মোর সেবা ছাড়ি তুমি অন্য কর সাধ।
বসুমতী চল ঝাট হও গিয়া ব্যাধ ॥"

পৃথিবীতে গিয়ে নীলাম্বর ধর্মকেতু ব্যাধের ঘরে জন্ম নিলেন, নাম হল কালকেতু। নীলাম্বরের স্ত্রী ছায়া গিয়ে জন্মালেন সঞ্জয়কেতু ব্যাধের মেয়ে হয়ে, নাম হল তার ফুল্লরা।

'দিনে দিনে বাড়ে কালকেতু'। ব্যাধ-জীবনের ভবিষ্যৎ সার্থকতার চিহ্ন ছোট বেলাতেই ফুটে উঠল তার খেলায় আর নানা কাজের মধ্যে। যথাসময়ে কালকেতুর সঙ্গে ফুল্লরার বিয়ে দিয়ে বাবা-মা কাশীবাসী হলেন। এদিকে অতিকষ্টে দিন কাটে কালকেতুর। শিকার করে যা পায় তাই দিয়ে কোন রকমে দিন চলে। কালকেতুর অত্যাচারে বনের পশুকুল আকুল হয়ে দেবী চণ্ডীর কাছে তাদের রক্ষার জন্যে প্রার্থনা জানায়। অভয় দিলেন দেবী।

পরদিন কালকেতু শিকারে চলেছে। চোখে পড়ল এক স্বর্ণগোধিকা। গোধিকা যাত্রার পথে অশুভ, তাই কালকেতু সেটাকে ধনুকের গুণে বেঁধে নিল, ভাবল আজ অন্য কোন শিকার না পেলে গোধিকা পুড়িয়ে খাবে।

সেদিন দেবী চণ্ডীর মায়ায় কোন শিকার পেল না কালকেতু। গোধিকা নিয়ে ফিরে এল কুটীরে। ঘরে সেদিন চাল-ডাল-নুন-তেল সবই বাড়ন্ত। স্বামীর

পরামর্শে সই বিমলার বাড়ি ক্ষুদ ধার করতে গেল ফুল্লরা, আর কালকেতু বাসি মাংসের পশরা নিয়ে হাটের পথে পা বাড়াল।

স্বয়ং দেবী চণ্ডী এসেছিলেন স্বর্ণগোধিকার রূপ ধরে। ব্যাধ-দম্পতী কুটীরের বাইরে যেতেই দেবী এক সুন্দরী যুবতীর রূপ ধরলেন :

"হুঙ্কারে ছিঁড়িয়া দড়ি পরিয়া পাটের শাড়ী
ষোল বৎসরের হৈল বামা।
খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি অকলঙ্ক শশিমুখী।
কেবা দিতে পারে রূপসীমা ॥"

বিমলার ঘর থেকে ফুল্লরা ফিরে এসে দেখেন এক সুন্দরী যুবতী তাঁর কুটীরের আঙিনায় দাঁড়িয়ে আছে। ফুল্লরা তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে সুন্দরী উত্তর দিলেন :

"এতক্ষণে পরিচয় করি।
আমার করম দুষী বসি গুপ্ত বারাণসী
স্বামী মোর জনম-ভিখারী ॥
কি কব দুঃখের কথা গঙ্গা-নামে মোর সতা
স্বামী তারে বন্দয়ে মস্তকে।
বরঞ্চ গরল খায় আমা পানে নাহি চায়
ভবন তেজিনু এই পাকে ॥"

আরও বললেন সেই সুন্দরী, কালকেতু তাঁকে নিজগুণে বেঁধে এনেছে তাই তিনি ব্যাধের ঘরেই থাকতে চান।

ফুল্লরার দুঃখের সংসারে একমাত্র স্বামী-প্রেমই ছিল সম্বল। তাই সুন্দরীর কথা শুনে তার বুক কেঁপে উঠল, মুখ গেল শুকিয়ে। ফুল্লরা তখন সীতা-সাবিত্রীর দৃষ্টান্ত দেখিয়ে অনেক নীতি-উপদেশ দিল। আর শোনাল তার বারমাসের দুঃখের কাহিনী। কিন্তু কিছুতেই তাকে নিবৃত্ত করা গেল না। অবশেষে কাঁদতে কাঁদতে ফুল্লরা গেল স্বামীর খোঁজে। পথেই কালকেতুর সঙ্গে তার দেখা। স্বামীকে দেখে ফুল্লরার রাগ আর অভিমান সপ্তমে উঠল। বলল সে :

"পিঁপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।
কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে ॥
বামন হইয়া হাত বাড়াইলে শশী।
আখেটির ঘরে শোভা পাইবে উর্বশী ॥"

ফুল্লরার তিরস্কারে কালকেতুর রাগ হল। একটা বিহিত করবার জন্যে সে দ্রুত ঘরে ফিরে এল। ঘরে এসে চণ্ডীর অপূর্ব লাবণ্যময়ী মূর্তি দেখে সেও প্রথমে অবাক্ হল। ফুল্লরার মত সেও তাকে পরগৃহবাস থেকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল। কিন্তু দেবী নিরুত্তর। তখন রাগে অধীর হয়ে কালকেতু ধনুকে শর জুড়ল। কিন্তু ধনুকের শর নিক্ষিপ্ত হল না, কালকেতুর সারা শরীর কাঁপতে লাগল, অজানা আশঙ্কায়, হতবাক্ হল সে :

"এতেক বচনে যদি না দিলা উত্তর।
ভানু সাক্ষী করি বীর যুড়িলেক শর॥
ছাড়িতে ছাড়িতে বাণ নাহি ছাড়ে বীর।
পুলকে পূরিত তনু চক্ষে বহে নীর॥"

দেবী তখন নিজের মূর্তি ধরে আত্মপ্রকাশ করলেন। তাঁর অপূর্ব মূর্তি দেখে কালকেতু ও ফুল্লরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। চণ্ডী তখন কালকেতুকে সাতঘড়া ধন ও একটি আংটি দিয়ে নগর পত্তন করতে আদেশ দিলেন। দেবীর আদেশে কালকেতু গুজরাটে বন কেটে নগর পত্তন করল।

কালকেতু এখন গুজরাট-নগরের রাজা। সেই দেশে ভাঁড়ু দত্ত ছিল ধূর্তের শিরোমণি। সে কালকেতুর কাছে মন্ত্রীর পদ প্রার্থনা করে অপমানিত হল। অপমানিত ভাঁড়ু গিয়ে কলিঙ্গরাজকে কালকেতুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। কলিঙ্গরাজ আক্রমণ করলেন কালকেতুর গুজরাটনগর। যুদ্ধে কালকেতু হল পরাস্ত। বন্দী কালকেতু কারাগারে গিয়ে আরম্ভ করল চণ্ডীর স্তব।

কলিঙ্গরাজ চণ্ডীর স্বপ্নাদেশ পেলেন। তাঁর আদেশে মুক্তি পেল কালকেতু, ফিরে পেল গুজরাট-নগর। কালকেতু যার চক্রান্তে বন্দী হয়েছিল সেই ভাঁড়ু দত্ত এসে কালকেতুকে বলল :

"খুড়া তুমি হৈলে বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি,
বহু তোমার নাহি খায় ভাত।"

কিন্তু ভাঁড়ুকে আর ক্ষমা করা হল না। তার মাথা মুড়িয়ে মুখে চুনকালি মাখিয়ে দেশ থেকে বিতাড়িত করা হল।

ওদিকে পুত্র নীলাম্বরের জন্যে ইন্দ্রের মনে সুখ নেই। তিনি চণ্ডীর কাছে নীলাম্বরকে ফিরিয়ে দেবার জন্য প্রার্থনা করলেন। দেবী চণ্ডী স্বপ্নে আদেশ দিলেন কালকেতুকে। কালকেতু তার পুত্র পুষ্পকেতুর হাতে রাজ্য দিয়ে স্বর্গে ফিরে গেল।

ধনপতি-সদাগরের কাহিনী (বণিক্-খণ্ড) :

উজানী-নগরে এক বিলাসী সদাগর ছিল। নাম তার ধনপতি। একদিন ধনপতি পায়রা ওড়াচ্ছিলেন, এমন সময়ে এক বাজপাখির তাড়া খেয়ে তাঁর প্রিয় পায়রা গিয়ে আশ্রয় নিল সুন্দরী খুল্লনার কোলে। খুল্লনা সম্পর্কে ছিলেন তাঁর শ্যালিকা।

পায়রা চাইতে গিয়ে খুল্লনাকে দেখলেন ধনপতি। দেখে মুগ্ধ হলেন তার রূপে। রূপমুগ্ধ ধনপতি খুল্লনাকে বিয়ে করার প্রস্তাব পাঠালেন। কুলে-মানে শ্রেষ্ঠ ধনপতি সহজেই সম্মতি লাভ করলেন। কিন্তু বড়-বৌ লহনা বিয়ের কথা শুনে অভিমান করে বসল। শেষে পাটের শাড়ি আর চুড়ির সঙ্গে পাঁচতোলা সোনা দিয়ে ধনপতি তার মত আদায় করলেন।

বিয়ের পর রাজার আদেশে ধনপতি সোনার খাঁচা আনতে গৌড় গেলেন।

যাবার সময়ে তিনি খুল্লনাকে বড় বৌয়ের হাতে দিয়ে গেলেন। লহনাও স্বামীর কথায় খুল্লনাকে স্নেহের চোখে দেখতে লাগল।

দুই সতীনের ভাব দেখে দাসী দুর্বলার মনে হিংসা হল। সে চাইল ওদের স্নেহে ফাটল ধরাতে। তাই নানাভাবে লহনাকে সে খুল্লনার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করে তুলল। কিছুদিন চলল নানা ওষুধ-বিষুদ তুক-তাক, তার পর স্বামীর এক জাল-চিঠি এনে লহনা খুল্লনার হাতে দিয়ে বলল—"আজ থেকে এগুলো মেনে চলতে হবে।"

চিঠিতে লেখা ছিল—আজ থেকে তুমি ছাগল চরাবে, ঢেঁকিশালে শোবে, একবেলা আধপেটা খাবে। বুদ্ধিমতী খুল্লনা বুঝল এ পত্র জাল, তাই সে চিঠির নির্দেশ মানতে চাইল না। কিন্তু লহনা জোর করে তাকে বাধ্য করাল।

"খুল্লনার বচনে লহনা উঠিল জ্বলিয়া।
লড় দিয়া চুলের মুঠ ধরিল চাপিয়া॥
চুলেত ধরিয়া গালেত দিল চড়।
চাপিয়া বসিল খুলনাইর বুকের উপর॥
কাড়িয়া লইল তার অষ্ট আভরণ।
পরিবার আজ্ঞা দিল খুঞিএার বসন॥"

বাধ্য হয়ে ছাগল চরায় খুল্লনা, ঢেঁকিশালে শোয়। পরিধানে তার জীর্ণ বস্ত্র। ধনী সদাগর গৃহিণীর এ এক চরম দুরবস্থা।

সারাদিন ছাগল নিয়ে খুল্লনা শ্যামল বনপ্রান্তরেই আশ্রয় গ্রহণ করে। বসন্তকাল আসে। পত্রপুষ্পে পল্লবিত বসন্তের শোভা, কোকিলের ডাক—তাকে স্বামীর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। ক্লান্ত খুল্লনা একদিন বনের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। হঠাৎ স্বপ্ন দেখে ঘুম ভাঙল তার, দেখল পাঁচজন দেবকন্যা। দেবকন্যারা চণ্ডী-পূজা করছেন। তাঁদের কাছে পূজা শিখে নিয়ে খুল্লনাও চণ্ডী-পূজা করল। দেবী আবির্ভূতা হয়ে তাকে স্বামী-পুত্র লাভের বর দিলেন।

দেবীর কৃপায় লহনাও বোনের সঙ্গে সেদিন থেকে সদয় ব্যবহার করতে লাগল। ওদিকে গৌড়ের বিলাসব্যসনে মত্ত ধনপতিকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে দেবী চণ্ডী খুল্লনার প্রতি লহনার দুর্ব্যবহারের কথা জানালেন। ধনপতির মনে পড়ল ঘরের কথা।

তিনি আর কালবিলম্ব না করে ঘরে ফিরলেন। ফিরেই সেদিন খুল্লনাকে রান্না করার অনুরোধ করলেন। লহনা ক্ষুব্ধ হয়ে ছোট বউয়ের রান্নায় অপটুতার কথা উল্লেখ করল। কিন্তু দেবী চণ্ডীর কৃপায় খুল্লনার রান্না সেদিন খুব ভাল হল, নিমন্ত্রিত অতিথিরাও সুখ্যাতি করলেন।

কিন্তু গোল বাধল ধনপতির পিতৃশ্রাদ্ধের দিন। খুল্লনা বনে ছাগল চরাত, সেই অজুহাতে তার সতীত্ব-সম্বন্ধে সন্দেহ করে নিমন্ত্রণ-গ্রহণে আপত্তি করলেন সমাজ-পতিরা। তারা জানাল—হয় খুল্লনা সতীত্বের পরীক্ষা দেবে, নইলে ধনপতিকে একলক্ষ টাকা জরিমানা দিতে হবে। তবেই তারা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন।

ধনপতি লক্ষ টাকা দিতে সম্মত ছিলেন, কিন্তু সতীত্বের পরীক্ষা দিতে মনস্থ

করলেন খুল্লনা। তাকে জলে ডোবানো হল। বিষধর সাপ দিয়ে দংশন করানো হল, জ্বলন্ত লৌহদণ্ডে বিদ্ধ করা হল। শেষে তাকে জতুগৃহে রেখে অগ্নিসংযোগ করা হল। কিন্তু খুল্লনা সব পরীক্ষাতেই জয়লাভ করল।

এর পর কিছুদিন বেশ সুখে-শান্তিতে কাটল। তারপর একসময়ে রাজভাণ্ডারে চন্দনের অভাব ঘটায় ধনপতির উপর সিংহল যাবার ভার পড়ল। খুল্লনা তখন গর্ভবতী। তবু রাজ-আদেশে ধনপতি চললেন সিংহলে।

যাত্রাকালে খুল্লনা স্বামীর মঙ্গলকামনায় চণ্ডীপূজায় বসলেন। ধনপতি ছিলেন পরম শৈব। তাই লহনা গিয়ে ধনপতির কানে মন্ত্র দিল :

"তোমার মোহিনী বালা শিখিয়া ডাইনিকলা
নিত্য পূজে ডাকিনী দেবতা ॥"

শুনে ধনপতি রেগে আগুন। ছুটে গিয়ে বললেন, এমন পাপ বধূ কারো ঘরে নেই।

"এতেক বলিয়া সাধু জলে কোপানলে।
লঙ্ঘিয়া দেবীর ঘট ধরে তার চুলে ॥
ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায় ॥

এইভাবে দেবী চণ্ডীকে অবজ্ঞা করে সপ্ত-ডিঙা নিয়ে সিংহল যাত্রা করলেন ধনপতি-সদাগর। পথে চণ্ডী নিলেন প্রতিশোধ। তাঁর ছটি ডিঙা দিলেন ডুবিয়ে। একমাত্র মধুকর-ডিঙা নিয়ে তিনি সিংহলে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সিংহলের পথে দেবী চণ্ডী তাঁকে কমলে-কামিনী মূর্তি দেখালেন।

সিংহলরাজ ধনপতির পরিচয় পেয়ে তাঁকে খুব আদরযত্ন করলেন। কিন্তু তাঁর মুখে কমলে-কামিনীর অদ্ভুত কাহিনী শুনে সিংহলরাজ বিশ্বাস করলেন না।

ধনপতি নিজের বিশ্বাসে অটল, বার-বার তিনি সেই কমলে-কামিনীর কথা বলতে লাগলেন। অবশেষে সিংহলরাজ বাজী রেখে দেখতে গেলেন সেই দৃশ্য। কথা ছিল—কমলে-কামিনী দেখাতে পারলে তাঁকে তিনি অর্ধেক রাজত্ব দেবেন, নতুবা ধনপতিকে সারাজীবন কারারুদ্ধ থাকতে হবে। ধনপতি এই শর্তেই রাজী হয়ে সিংহলরাজকে কমলে-কামিনী দেখাতে আনলেন। কিন্তু চণ্ডী তাঁকে করলেন ছলনা। ধনপতি সিংহলরাজকে কমলে-কামিনী মূর্তি দেখাতে পারলেন না। অঙ্গীকার অনুসারে ধনপতিকে কারাগারে যেতে হল।

এদিকে খুল্লনার এক পুত্র হল, নাম তার শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত ক্রমে বড় হয়ে পাঠশালায় পড়তে গেল। একদিন রাগের মাথায় গুরুমশাই তার জন্ম-সম্বন্ধে কটাক্ষ করলেন। সেইদিনই তরুণ শ্রীমন্ত মায়ের অপমান সহ্য করতে না পেরে পিতার সন্ধানে সিংহল-যাত্রার ইচ্ছা প্রকাশ করল। রাজার অনুরোধ, মায়ের চোখের জল তাকে ধরে রাখতে পারল না। শ্রীমন্ত সপ্ত-ডিঙা সাজিয়ে সিংহল যাত্রা করল।

সিংহলের পথে শ্রীমন্তও কমলে-কামিনী দেখতে পেল। কিন্তু সিংহলরাজ আগের মত এবারেও বিশ্বাস করলেন না কমলে-কামিনীর অদ্ভুত কাহিনী। রাজা

বললেন, যদি তুমি আমাকে কমলে-কামিনী দেখাতে পার তাহলে অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দেব, না হলে দক্ষিণ মশানে তোমার শিরচ্ছেদ হবে। সেই শর্তেই রাজি হয়ে বাজী ধরেছিলেন শ্রীমন্ত, কিন্তু তাকেও দেবী প্রথমে ছলনা করলেন। রাজাকে সে কমলে-কামিনী দেখাতে পারল না।

শর্ত অনুসারে তাই শ্রীমন্তকে বধ করার জন্যে মশানে আনা হল। শ্রীমন্ত ছিল চণ্ডীর সেবক। আসন্ন কালে মশানে দাঁড়িয়ে সে চণ্ডীর স্তব শুরু করল। ভক্তের ডাকে দেবী চণ্ডী মশানে এসে উপস্থিত হলেন। রাজার সৈন্যরা চণ্ডীর অনুচরদের হাতে পরাজিত হল। দেবী শ্রীমন্তকে কোলে নিয়ে বসলেন। চণ্ডীর কৃপায় অবশেষে সিংহলরাজ কমলে-কামিনী মূর্তি দেখতে পেলেন। তিনি খুশি হয়ে মুক্তি দিলেন শ্রীমন্তকে, আর নিজের মেয়ে সুশীলার সঙ্গে দিলেন তার বিয়ে। দীর্ঘকাল পরে ধনপতিও মুক্তি পেলেন কারাগার থেকে। মিলন হল পিতাপুত্রের।

এরপর ঘরে ফেরার পালা। পথে চণ্ডীর কৃপায় ধনপতি তাঁর ছ'টি ডিঙা ফিরে পেলেন। সপ্তডিঙা নিয়ে গেলেন উজানী-নগরে। উজানী-নগরের রাজাকে কমলে-কামিনী দেখিয়ে তাঁর কন্যা জয়াবতীকে বিয়ে করল শ্রীমন্ত। এরপর মহা আড়ম্বরে ধনপতি-সদাগর দেবী চণ্ডীর পূজা করলেন।

দ্বিজমাধব বা মাধব আচার্য ঃ

“বাঁটুল বাঁশ লৈয়া করে পশু বধিবার তরে,
তার ঘাও বৃথা নাহি যায়।
কুঞ্চিত করিয়া আঁখি ডাকিয়া পড়য়ে পাখী,
ঘুরিয়া ঘুরিয়া পড়য়ে তথায় ॥”

সন-তারিখ-যুক্ত চণ্ডীমঙ্গলের সর্বপ্রথম যাঁর পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে তাঁর নাম দ্বিজ মাধব। তাঁর রচনায় পাওয়া যায় ঃ

“ইন্দু-বিন্দু-বাণ-ধাতা শক নিয়োজিত।
দ্বিজ মাধব গায় সারদা-চরিত ॥”

এই পদ অনুসারে হিসাব করে পাওয়া যায় ১৫০১ শকে বা ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে তিনি কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি কোথাও 'সারদা-চরিত' কোথাও বা 'সারদামঙ্গল' নামে অভিহিত করা হয়েছে। তাঁর কাব্য উত্তরবাংলা এবং চট্টগ্রাম অঞ্চলে সুপরিচিত হলেও পশ্চিম বাংলায় এ কাব্য বিশেষ পরিচিত হয় নি।

কবির ব্যক্তিপরিচয় নিয়েও কিছু গোলমাল আছে। কবির আত্মপরিচয় থেকে মনে হয় তিনি পশ্চিম বাংলার অধিবাসী ছিলেন। সপ্তগ্রাম বা নবদ্বীপে তাঁর জন্ম। পরে মোগল-পাঠান-বিরোধের সময়ে তাঁরা হয়তো চট্টগ্রাম-অঞ্চলে চলে যান। তাঁর সব পুঁথিগুলোই ওই সব অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। কিন্তু রচনায় ওই সব অঞ্চলের নাম নেই। তার উপর মাধব আচার্য নামে আর একজন কবির 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল', 'গঙ্গামঙ্গল' আবিষ্কৃত হয়ে 'মাধব আচার্য' সমস্যাকে জটিল করে তুলেছে।

তাঁর চণ্ডীমঙ্গল চট্টগ্রামে 'জাগরণ' নামে পরিচিত। আট দিন ধরে লোকে রাত জেগে পালা শুনত বলে 'জাগরণ' নাম হয়েছে। চণ্ডীর দ্বারা মঙ্গলাসুর-বধ এই কাব্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। খুব সংক্ষেপে তিনি কাহিনী বর্ণনা করেছেন।

তাঁর কাহিনী ছিল মুকুন্দরামের তুলনায় নিকৃষ্ট ধরনের। তাই মুকুন্দরামের পূর্ববর্তী কবি হলেও মুকুন্দরাম তাঁর কাব্যকে আদর্শ না করে আদর্শ করেছেন মাণিক দত্তের কাব্যকে।

ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাসের দ্বিজ মাধবের কাব্য-বৈশিষ্ট্য-সম্পর্কে বলেছেন, "দ্বিজ মাধবের অন্যতম প্রধান গুণ, যতই সংক্ষিপ্ত হউক, তিনি প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট বাঙালী জীবনের বিচিত্র বাস্তব পটভূমির উপর একটি গার্হস্থ্য চিত্র বাঙালী পাঠককে উপহার দিয়াছেন। এই চিত্রটি বর্ণনার মধ্যে তাঁহার যে বস্তুনিষ্ঠা ও সহজ সাবলীলত্বের ভাব সর্বত্র প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা সেই যুগে বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম বিস্ময়।" বাস্তববোধ এবং সহানুভূতি-সজাগ দৃষ্টি নিয়ে তিনি কাহিনীর মধ্যে প্রবেশ করেছেন। এই কাব্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাহিনী হল দেবী চণ্ডিকার মঙ্গলাসুর-বধ, তাই এই কাব্যের দেবীকে মঙ্গলচণ্ডী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। 'মঙ্গলদৈত্য বধি মাতা হইলা মঙ্গলচণ্ডী।' কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড ধনপতি-সদাগরের কাহিনী মুকুন্দরামের চেয়ে সংক্ষেপে বর্ণিত। তবে চরিত্রের মধ্যে দু' একটি প্রশংসনীয় ইঙ্গিত লক্ষ করা যায়।

অবশ্য এ কথা ঠিক তাঁর কাব্য অনেক সময়ে ব্রত-পাঁচালীর স্তর থেকে কাব্যের সীমায় উঠতে পারে নি। কাব্যের শেষে তন্ত্রের আলোচনাও কাব্যের দিক থেকে অপ্রাসঙ্গিক হয়েছে, তবে তাঁর কাব্যের মধ্যে যে বিষ্ণু-পদগুলি যুক্ত হয়েছে সেগুলি কাব্যের দিক থেকে কিছু প্রশংসার দাবি করতে পারে। দ্বিজ মাধবের রচিত বিষ্ণুপদের নিদর্শন :

কহ কহ কলাবতী কাহারে পয়ান।
ও রূপ বাজল যেন পঞ্চবাণ ॥
রূপে ডগমগ গোরিয় গাতে।
অঙ্গের সৌরভ গগনে সুজাতে ॥

কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী ঃ

নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর
উপনীত কুচট্যা নগরে।
তৈল বিনা কৈলুঁ স্নান করিলুঁ উদক-পান,
শিশু কান্দে ওদনের তরে ॥

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। বৈষ্ণব-পদাবলী ও চৈতন্য-জীবনী-কাব্যকে বাদ দিলে মধ্যযুগের মৌলিক প্রতিভার গৌরব একমাত্র তিনিই দাবি করতে পারেন। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্য রচনা করলেও মর্তমানবের দুঃখ-

সুখের যে-চিত্র তাঁর কাব্যে ধরা পড়েছে সে যুগে তা একান্তই বিরল। কোন কোন দিক থেকে আধুনিক মনের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সম্পর্ক খুবই প্রকট।

তাঁর কাব্য সাধারণত 'অভয়া-মঙ্গল' নামে পরিচিত। কাব্যের প্রথমে তিনি যে-আত্মপরিচয় দান করেছেন তা যেমন তথ্যবহ তেমনি বাস্তবধর্মী। এর ঐতিহাসিক মূল্যও কিছু কম নয়। এই কাহিনীতে কবি মুঘল-পাঠান সংঘর্ষের সময় বাংলার গ্রাম ও সমাজ জীবনের একটি নিখুঁত চিত্র বর্ণিত করেছেন। বর্ধমান জেলার অন্তর্গত দামুন্যা গ্রামে কবির পৈতৃক বাসভূমি। সাতপুরুষের বাস্তুভিটা দামুন্যা গ্রামে কবি কৃষিকাজের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতেন। একসময় মুঘল-পাঠান সংঘর্ষে বাংলায় অরাজকতার সৃষ্টি হল। ফলে গ্রামাঞ্চলের শাসন একেবারে ভেঙে পড়ল। অরাজকতার সুযোগে রাজকর্মচারীরা নিরীহ গ্রামবাসীদের উপর জোরজুলুম চালাতে লাগল। ডিহিদার মামুদ সরিপ ছিলেন এমনি একজন অত্যাচারী কর্মচারী। বাধ্য হয়ে মুকুন্দরাম সপরিবারে চললেন নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে। পথে তাঁকে অনেক কষ্ট সহ্য করতে হল। নিজেরা জঠরের জ্বালা ভুলে থাকতে পারেন কিন্তু কোলের শিশু ভাতের জন্য কান্না জুড়ে দেয়—'শিশু কাঁদে ওদনের তরে।' একদিন ক্ষুধার্ত-ক্লান্ত কবি এক পুকুরের পাড়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন, এমন সময় দেবী চণ্ডী কবিকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, তাঁর মহিমাবিষয়ক কাব্যরচনা করতে হবে। পরে কবি মেদিনীপুরের আড়রা গ্রামের ব্রাহ্মণ জমিদার বাঁকুড়া রায়ের আশ্রয় লাভ করেন।

বিদ্যোৎসাহী রাজা বাঁকুড়া রায় কবিকে নিজের পুত্র রঘুনাথের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করেন। বাঁকুড়া রায়ের মৃত্যুর পর রঘুনাথ রাজা হলেন। মুকুন্দরাম ছিলেন এই রঘুনাথের সভাসদ আর তাঁরই অনুরোধে তিনি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। মুকুন্দরাম বলেছেন :

রাজা রঘুনাথ, গুণে অবদাত,—
রসিক মাঝে সুজান।
তার সভাসদ, রচি চারুপদ,
শ্রী কবিকঙ্কণ গান ॥

মুকুন্দরাম তাঁর নিজের পরিচয় সম্বন্ধে লিখেছেন :

মহামিশ্র জগন্নাথ হৃদয় মিশ্রের তাত,
কবিচন্দ্র হৃদয়-নন্দন।
তাঁহার অনুজ ভাই, চণ্ডীর আদেশ পাই
বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ ॥

এখন দেখা যাক, মুকুন্দরামের আবির্ভাব-কাল এবং তাঁর গ্রন্থরচনার সময়-সম্পর্কে কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় কিনা। মানসিংহের প্রশংসাবাচক তাঁর উক্তি 'গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধিপ' থেকে অনুমান করা যায় মানসিংহের কালে ১৫৭৫ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময়ে তিনি দামুন্যা পরিত্যাগ করে আশ্রয়ের সন্ধানে বের হয়ে

ছিলেন। ১৫৯৪ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৬০৬ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মানসিংহ বাংলার সুবাদার ছিলেন। তাই মনে হয় ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকেই মুকুন্দরাম তাঁর কাব্য রচনা শেষ করেন। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের প্রচলিত কাহিনীই মুকুন্দরামের কাব্যে উপজীব্য। কিন্তু এই গতানুগতিক কাহিনীকে অবলম্বন করেই মুকুন্দরাম অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিলেন যা মধ্যযুগীয় সাহিত্যে বিরল। কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী-রচনায় তাঁর নিপুণ হাতের স্পর্শ পাওয়া যায়। সেই তুলনায় ধনপতি-সদাগরের কাহিনী অনাবশ্যক বর্ণনার ভারে পীড়িত, কোথাও কোথাও শিথিল।

বাস্তব অভিজ্ঞতা আর জীবনের প্রতি প্রসন্নতা তাঁকে চরিত্র-সৃষ্টিতে শক্তিমান্ করেছে। ডাঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'য় বলেছেন: "দক্ষ ঔপন্যাসিকের অধিকাংশ গুণই তাঁহার মধ্যে বর্তমান ছিল। এ যুগে জন্মগ্রহণ করিলে তিনি যে কবি না হইয়া একজন ঔপন্যাসিক হইতেন, তাহাতে সংশয় মাত্র নাই।"

তাঁর কাব্যে বাস্তবচিত্রে, দক্ষ চরিত্রাঙ্কণে, কুশল ঘটনা সন্নিবেশে এবং কাহিনী ও চরিত্রের মধ্যে একটা জীবন্ত-সম্বন্ধ-স্থাপনে আমরা আধুনিক সাহিত্যের পদধ্বনি শুনতে পেয়েছি।

মুকুন্দরামের চরিত্রগুলি জীবন্ত হয়েছে তাদের মুখের কথায়। যাকে আমরা বলি সংলাপ। চরিত্র যেমন বিচিত্র তেমনি তাদের মুখের ভাষার মধ্যেও বৈচিত্র্য এনেছেন কবি। মঙ্গলকাব্যের ভিলেন ভাঁড়ু দত্তের কুম্ভীরাশ্রু-বিসর্জনের ছবিটি কী সুন্দর ফুটেছে যখন সে বলে:

খুড়া তুমি হইলে বন্দী
অনুক্ষণ আমি কান্দি,
বহু তোমার নাহি খায় ভাত

অথবা বাংলার শাইলক মুরারি শীলের শান্ত সংযত মৃদু তিরস্কারের ভাষার কথাই ধরা যাক:

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিত্তল।
ঘষিয়া মাজিয়া বাপু কর্যাছ উজ্জ্বল॥

* * * *

ধর্মকেতু দাদাসনে কৈলুঁ লেনাদেনা।
তাহা হৈতে ভাইপো হয়্যাছ সিয়ানা॥

সব শেষে বলা যায় মুকুন্দরাম মানসিক ঔদার্যে আধুনিক যুগেরই কবি। দেব-দেবীদের নিয়ে মঙ্গলকাব্য রচনা করলেও তিনি এক হিসাবে মানবমঙ্গলের পালাগান রচনা করে গেছেন। তাই বাঙালী পাঠকের মনে তাঁর যে স্থান অঙ্কিত হয়েছে তা কোনদিন ম্লান হবার নয়। তবে এ কথা স্বীকার করতে হবে, মুকুন্দরামের রচনারীতি ছিল সহজ-সরল, অলঙ্কারের দিক থেকে কোন অভূতপূর্ব ঐশ্বর্য তাঁর রচনায় ফুটে

ওঠে নি। এদিক থেকে বিচার করলে পরবর্তী কালের কবি ভারতচন্দ্র অনেক বেশি কৃতিত্বের অধিকারী।

অনুশীলনী

১। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনীটি তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

২। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যের কবিদের সম্পর্কে আলোচনা কর। এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

৩। চণ্ডীমঙ্গল-কাব্যে মধ্যযুগের যে-সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তা তোমার নিজের ভাষায় বর্ণনা কর।

৪। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের আদি কবি কে? এর আখ্যান কয়টি ভাগে বিভক্ত? যে-কোন একটি আখ্যানের সংক্ষিপ্ত কাহিনীসহ মুকুন্দরামের কবিপ্রতিভার মূল্য নিরূপণ কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৫। মঙ্গলকাব্য কাকে বলে? চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়ে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের শ্রেষ্ঠত্ব কোথায় তা দেখাও। [উঃ মাঃ পরীক্ষা, ১৯৭৮]

৬। মুকুন্দরাম কে ছিলেন? তাঁর কাব্যের নাম কি? তাঁর পিতৃভূমি কোথায় ছিল? তিনি কেন তা ত্যাগ করেছিলেন? কোথায় ও কার কাছে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন? পিতৃভূমি ত্যাগ থেকে নতুন স্থলে আশ্রয় গ্রহণ পর্যন্ত ঘটনাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দাও। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৭। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর দুঃখপূর্ণ ব্যক্তিজীবনের পরিচয় দাও। চরিত্রাঙ্কণে ও করুণরস সৃষ্টিতে তাঁর দক্ষতা সংক্ষেপে আলোচনা কর। [উঃ মাঃ ১৯৮১]

৮। মুকুন্দরাম ও দ্বিজমাধবের কাব্যকৃতি সম্বন্ধে যা জান লিখ। [ত্রিপুরা উ. মা. ১৯৭৮]

সপ্তম অধ্যায়

চৈতন্যজীবনীকাব্য

ষোড়শ শতাব্দীতে গৌরসুন্দর চৈতন্যদেবের জীবনকে অবলম্বন করে এক অভিনব কাব্য রচিত হয়েছিল। এই কাব্যকে চৈতন্য-কাব্য বলা হয়। বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম জীবনীকাব্য রচিত হল। এর আগে রাজামহারাজাদের কৃপাপুষ্ট কবির দল সংস্কৃত বা প্রাকৃত ভাষায় পৃষ্ঠপোষকদের গুণকীর্তন করে বড় বড় কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু রাজ্য নেই, মাথায় নেই রাজ-মুকুট, আছে কেবল বুকভরা কৃষ্ণপ্রেম, আর চোখভরা জল, এমন একজন দেবকল্প মহামানবকে নিয়ে প্রথম বাংলা জীবনীসাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হয়েছিল।

বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ রচনার আগে সংস্কৃতভাষায় চৈতন্যজীবনীকাব্য ও নাটক রচিত হয়েছিল। বলা বাহুল্য এইসব সংস্কৃত গ্রন্থ বাংলা জীবনীকাব্যকে অল্প-বিস্তর প্রভাবিত করেছিল।

মহাপ্রভুর জীবনকে অবলম্বন করে বাংলায় ও বাংলার বাইরে কয়েকজন ভক্ত কবি একাধিক নাটক ও জীবনীকাব্য রচনা করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে মুরারি গুপ্তের 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত', পরমানন্দ সেনের 'চৈতন্যচরিতামৃত', 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়', প্রবোধানন্দ সরস্বতীর 'চৈতন্যচন্দ্রামৃত' আর স্বরূপ-দামোদরের কড়চার উল্লেখ করা যায়।

মুরারি গুপ্ত ছিলেন শ্রীচৈতন্যের সহপাঠী—পরে ভক্ত হয়েছিলেন। তাঁর 'শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃতম্' ৭৮টি সর্গে বিভক্ত। এটি সংস্কৃত ভাষায় রচিত আদি চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ।

পরমানন্দ সেন ছিলেন মহাপ্রভুর স্নেহভাজন। চৈতন্যদেব আদর করে তাঁকে 'কবিকর্ণপুর' নামে ডাকতেন। তার 'চৈতন্যচরিতামৃতম্' গ্রন্থে দু'হাজার শ্লোক আছে। এই কাব্যে পাণ্ডিত্যের পরিচয় থাকলেও কাব্যগুণ বিশেষ নেই। তাঁর 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়ম্' নাটকটিতে দশটি অঙ্ক আছে। চৈতন্যজীবনের প্রায় সব ঘটনাই এতে সন্নিবেশিত হয়েছে বলে নাট্যগুণ প্রায় নেই বললেই চলে। কাশীধামের প্রবোধানন্দ সরস্বতী ১৪৩টি শ্লোকে রচনা করেন 'চৈতন্যচন্দ্রামৃতম্'। এইসব সংস্কৃত কাব্য-নাটকের নানাদিক্ থেকে মূল্য আছে। প্রথমত, চৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ দ্বারা এইসব গ্রন্থ রচিত বলে মূল্যবান্ তথ্যে এগুলি সমৃদ্ধ। দ্বিতীয়ত, অবাঙালী ভক্ত-সমাজে এইসব গ্রন্থদ্বারা চৈতন্য-মহিমার প্রচার হয়েছিল।

বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য ভাগবত ঃ

"চন্দ্রাবতী রাত্রি বহে দক্ষিণ পবন।
বৈসেন সমুদ্রকূলে শ্রীশচীনন্দন॥
মালায় পূর্ণিত বক্ষ অতি মনোহর।
চতুর্দিকে বেড়িয়া আছয়ে অনুচর॥"

'চৈতন্যভাগবত' হল বাংলা ভাষায় লেখা প্রথম চৈতন্যজীবনী-সাহিত্য। এটি হল চৈতন্যজীবনী-সাহিত্যের আকর-গ্রন্থ। আনুমানিক ১৫১০-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দে বৃন্দাবন দাস নবদ্বীপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শিষ্য। শ্রীচৈতন্যকে সেবা করার সৌভাগ্য হয়েছিল কবির। তাই তিনি লিখেছেন :

'সর্বশেষ ভৃত্য তান বৃন্দাবন দাস।' চৈতন্য অনুচর নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর নির্দেশেই বৃন্দাবন দাস গ্রন্থ রচনায় হাত দেন। গুরু নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর কাছেই তিনি পেয়েছিলেন চৈতন্য-জীবনের নানা উপাদান।

পরিণত বয়সে বৈষ্ণব সমাজে তিনি 'চৈতন্যলীলার ব্যাস' নামে খ্যাতিলাভ করেন। চৈতন্য ভাগবতের নাম প্রথমে ছিল চৈতন্যমঙ্গল। কিন্তু এই সময় লোচনদাস চৈতন্যমঙ্গল নামে আর একটি কাব্য রচনা করেন। ফলে মাতা নারায়ণীর উপদেশে কবি তাঁর কাব্যের নাম দেন চৈতন্যভাগবত। অবশ্য পণ্ডিতগণ মনে করেন ভাগবতের লীলা পর্যায় এই কাব্যে অনুসৃত হয়েছে বলে বৃন্দাবনের গোস্বামিগণ চৈতন্যমঙ্গল নাম পাল্টে নাম রাখেন 'চৈতন্যভাগবত'।

'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল নিয়ে মতান্তর আছে। তবে মনে হয় ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দের পর কাব্য-রচনা সম্পূর্ণ হয়। ভাগবতের মত বৃন্দাবন দাস তাঁর কাব্যটিকে আদি, মধ্য এবং অন্ত্য এই তিন খণ্ডে বিভক্ত করেছেন। এতে একান্নটি অধ্যায় আছে। তবে অন্ত্যখণ্ড সংক্ষিপ্ত আকারে রচিত। মনে হয় কবি যেন হঠাৎ কাব্যটি বন্ধ করে দিয়েছেন। কাব্যপরিকল্পনায় তিনি সংস্কৃত জীবনীকার মুরারি গুপ্তের দ্বারা প্রভাবিত।

'চৈতন্যভাগবতে' ইতিহাসের নানা উপাদান থাকলেও ভক্তির আতিশয্য এবং অলৌকিক ঘটনার অতি-বর্ণনা কাব্যটিকে স্থানে স্থানে অবাস্তব করে তুলেছে। হয়তো বৃন্দাবন দাস নিজেও সেকথা অনুভব করেছিলেন, তাই অবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছেন :

"এ সব বচনে যার নাহিক প্রতীত।
সদ্যঃ অধঃপাত তার জানিহ নিশ্চিত ॥"

যাই হোক, এই জীবনীকাব্যে তিনি যে-রকম সরল ভাবে চৈতন্যজীবনী ও তাঁর প্রবর্তিত ভক্তির কথা বর্ণনা করেছেন তাতে তাঁকে বিশেষ প্রশংসা করতে হয়।

পরবর্তী কালের কবি কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যভাগবতের প্রশংসা করে বলেছেন :

"বৃন্দাবন দাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
তাহার শ্রবণে নাশ সর্ব অমঙ্গল॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥"

শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও কৈশোরের লীলাবর্ণনায় তিনি সরলতা ও বাস্তবতার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যে শ্রীচৈতন্যের ভাবমূর্তি ও মানবমূর্তি সমানভাবে বর্ণিত হয়েছে। কাব্যের স্থানে স্থানে অলৌকিক বর্ণনা থাকলেও তা এমন কিছু অপ্রাসঙ্গিক হয় নি।

এ কাব্যে কোন দুরূহ তত্ত্বকথা নেই, সেই কারণে সাধারণ শিক্ষিত বৈষ্ণব সমাজে এই গ্রন্থের জনপ্রিয়তা এখনও অক্ষুণ্ণ আছে। পরবর্তী কালে চৈতন্যজীবন-বিষয়ক যত গ্রন্থ লেখা হয়েছে তার সবগুলির উৎস এই 'চৈতন্যভাগবত'। বৈষ্ণব পদাবলী রচনাতেও কবির দক্ষতা ছিল। গৌরাঙ্গবিষয়ক এই পদটিতে তার পরিচয় পাওয়া যায় :

বিমল হেন জিনি তনু অণুপাম রে
তাহে শোভে নানা ফুল দাম।
কদম্ব কেশর জিনি একটি পুলক রে
তার মাঝে বিন্দু বিন্দু ঘাম॥

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল :

জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র যারা করিল প্রকাশ॥
সার্বভৌম ভট্টাচার্য ব্যাস অবতার।
চৈতন্য চরিত্র আগে করিল প্রচার॥

জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গল' সম্ভবত চৈতন্যজীবনীকাব্যের দ্বিতীয় গ্রন্থ। জয়ানন্দ বর্ধমানের আমাইপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুবুদ্ধি মিশ্র, মাতা ছিলেন রোদনী। মনে হয় ১৫১১ থেকে ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে তাঁর জন্ম। 'চৈতন্যমঙ্গল' রচনার মূল প্রেরণা হলেন তাঁর গুরু অভিরাম গোস্বামী আর নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর পুত্র বীরভদ্র।

ঐতিহাসিক দলিল হিসাবে চৈতন্যমঙ্গলের একটি বিশেষ মূল্য আছে। চৈতন্য-তিরোধান-সম্বন্ধে বিশ্বাসযোগ্য তথ্য তিনিই প্রথম প্রকাশ করেছেন। জগন্নাথের রথের দিন নৃত্যের সময়ে চৈতন্যদেবের পায়ে ইঁটের টুকরো ফুটে যায়। ফলে প্রবল বেদনাসহ কয়েকদিন জ্বরে ভোগার পর তিনি মর্ত্যলীলা সংবরণ করেন। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন বলেছেন, "চৈতন্যদেবের তিরোধান-সংক্রান্ত নানারূপ অলৌকিক গল্পে সত্য কাহিনী কুহকাচ্ছন্ন হইয়াছিল, জয়ানন্দের লেখায় সেই ঘনীভূত তিমির রাশি এখন অন্তর্হিত হইবে।"

নবদ্বীপে মুসলমান অত্যাচারের কাহিনী বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি বলেছেন :

আচম্বিতে নবদ্বীপে হৈল রাজভয়।
ব্রাহ্মণ ধরিয়া রাজা জাতি প্রাণ লয়।
নবদ্বীপে শঙ্খধ্বনি শুনে যার ঘরে।
ধনপ্রাণ লয়ে তার জাতি নাশ করে॥
পিরল্যা গ্রামেতে বসে যতেক যবন।
উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥

অবশ্য পরবর্তী কালে গৌড়ের সুলতান নবদ্বীপের প্রতি পুনরায় প্রসন্ন হন। তিনি ভাঙা দেব-মন্দিরগুলির সংস্কারের ব্যবস্থা করে এই অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ করেন।

নয়টি খণ্ডে সমাপ্ত এই গ্রন্থ মঙ্গলকাব্যের ঢঙে রচিত। মনে হয় 'চৈতন্যমঙ্গল' জনসাধারণের জন্যেই লেখা এবং মঙ্গলকাব্যের মতই গায়েনরা পায়ে ঘুঙুর বেঁধে আসরে দাঁড়িয়ে এই কাব্যের গান করতেন। এতে আদ্যাশক্তি এবং কালী-মূর্তির বর্ণনা আছে, নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব যা কখনও করতেন না। অনুমান করতে বাধা নেই, জনমনোরঞ্জনের জন্যই তাঁকে এই পথ বেছে নিতে হয়েছিল।

১৫৬০ খ্রীস্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে এ কাব্য রচনা সমাপ্ত হয়।

লোচন দাসের চৈতন্যমঙ্গল ঃ

"শুন শুন-প্রাণনাথ মোর শিরে দেহ হাত
সন্ন্যাস করিবে নাকি তুমি।
লোক মুখে শুনি ইহা বিদারিয়া যায় হিয়া,
আগুনেতে প্রবেশিব আমি ॥"

'চৈতন্যমঙ্গলে'র স্থান বৃন্দাবন দাসের চৈতন্য-ভাগবত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃতে'র নীচে হলেও এর সাহিত্যিক মূল্য নিতান্ত সামান্য নয়। লোচন দাস বৈষ্ণব সমাজে ও সাহিত্যে বিশেষ পরিচিত। বাল্যকালে তাঁকে ফিরিঙ্গীরা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, পরে তাঁর গুরু নরহরি সরকার তাঁকে উদ্ধার করেন। বিশেষজ্ঞেরা স্থির করেছেন লোচন দাস ১৫২৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৯৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। এই কাব্যটি ১৫৫০ থেকে ১৫৬০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে রচিত হয়।

এগার হাজার ছত্রে রচিত এই কাব্য চারটি খণ্ডে বিভক্ত। আসরে গান করার উদ্দেশ্যেই পাঁচালীর ঢঙে লেখা। বলা বাহুল্য অশিক্ষিত বা অর্ধশিক্ষিত শ্রোতারাই এই কাব্যের প্রধান লক্ষ্য ছিল। এই কাব্য কাহিনীর অভিনবত্ব হল এতে চৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দাম্পত্য-জীবনের বিস্তারিত বর্ণনা আছে—যা অন্য কোন জীবনীকাব্যে নেই। এই অসম্পূর্ণতা লোচন দাসই পূর্ণ করেছেন। নিমাইসন্ন্যাসের সংবাদে শোকবিহ্বল বিষ্ণুপ্রিয়ার যে-ছবি তিনি এঁকেছেন তা সত্যই মর্মস্পর্শী :

'চরণ-কমল-পাশে নিঃশ্বাস ছাড়িয়া বৈসে
নেহারয়ে কাতর নয়ানে।
হিয়ার উপরে থুইয়া বাঁধে ভুজলতা দিয়া
প্রিয় প্রাণনাথের চরণে ॥
'দুনয়নে বহে নীর ভিজিল হিয়ার চীর
বুকে বাহিয়া পড়ে ধার।
চেতনা পাইয়া চিতে, উঠে প্রভু আচম্বিতে,
বিষ্ণুপ্রিয়া পুছে আর বার ॥'

কিন্তু লোচন দাসের এই বর্ণনা-যে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় সে কথা ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "এই দাম্পত্যলীলা শ্রুতিসুখকর হইলেও

সর্বৈব মিথ্যা। সন্ন্যাসের পূর্বরাত্রিতে তিনি বিষ্ণুপ্রিয়ার ঘরে ছিলেন না, তখন তিনি মহাভাবাবিষ্ট প্রেমোন্মাদ—বিষ্ণুপ্রিয়ার প্রেম তখন তাঁহার গণ্ডীর বহুদূরে।"

এই গ্রন্থের অধিকাংশ কাহিনীকে ঐতিহাসিক মর্যাদা দেওয়া যায় না। মুরারি গুপ্তের কড়চার আদর্শে তিনি তাঁর কাহিনী বিন্যস্ত করেছেন। সংস্কৃত সাহিত্যেও তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল বলে মনে হয়। শ্রীচৈতন্যের তিরোধান-সম্পর্কে লোচন দাসের অভিমত হল, তিনি জগন্নাথদেবের সঙ্গে লীন হয়ে গিয়েছিলেন।

তৃতীয় প্রহর বেলা রবিবার দিনে।
জগন্নাথে লীন প্রভু হইলা আপনে॥

চৈতন্যদেবের লীলাবসান-সম্বন্ধে এই তথ্য সত্যিই অভিনব। যা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কিন্তু এই কাহিনী ভক্তদের মনঃপূত হলেও ইতিহাস একে সত্য বলে মানতে রাজি নয়।

কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্যচরিতামৃত ঃ

চৈতন্যচরিতামৃত যেইজন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা মুঞি করো পানে॥

কেবল মধ্যযুগে নয়, সর্বকালের শ্রেষ্ঠ জীবনীগ্রন্থ হল কৃষ্ণদাস কবিরাজের 'চৈতন্য-চরিতামৃত।' একে কেবল জীবনীগ্রন্থ বললে ভুল করা হবে। 'চৈতন্যচরিতামৃত' হল ধর্মগ্রন্থ, ইতিহাস, বৈষ্ণবদর্শন এবং কাব্য। এতে গৌড়, উৎকল, বৃন্দাবন, দক্ষিণ ভারত এই সব অঞ্চলের ভক্তিধর্ম ও দার্শনিকতাকে তিনি যে-রকম দক্ষতার সঙ্গে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন তাতে গ্রন্থটিকে সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যে প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী বলা চলে।

আনুমানিক ১৫১৭-২৭ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে বর্ধমানের কাটোয়ার কাছে ঝামটপুর গ্রামে কৃষ্ণদাস কবিরাজ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল ভগীরথ এবং মাতার নাম সুনন্দা। বাল্যকালেই মাতাপিতাকে হারিয়ে তিনি পিসীর কাছে মানুষ হন।

এক সময়ে নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর স্বপ্নাদেশ লাভ করে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে যান এবং দীর্ঘকাল ধরে বৈষ্ণব সাহিত্য ও ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্যের পার্শ্বচর ও শিষ্যদের সংস্পর্শে এসে কৃষ্ণদাস-যে কেবল বৈষ্ণবতত্ত্ব-দর্শনে পারদর্শী হলেন তা নয়, তিনি চৈতন্যজীবন-সম্পর্কে নতুন তথ্যও অবগত হলেন। এই সব কারণেই তাঁর উপর নতুন জীবনীগ্রন্থ রচনার ভার অর্পিত হল। 'চৈতন্য-ভাগবতে' মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলা অতি সংক্ষিপ্ত আকারে বর্ণিত। তাই বৃন্দাবনের মহান্তেরা কৃষ্ণদাস কবিরাজকে মহাপ্রভুর পূর্ণ জীবন-কাহিনী বর্ণনা করতে অনুরোধ করেন। কবি তখন বৃদ্ধ, তাই এই অনুরোধ তাঁকে একটু দ্বিধাগ্রস্ত করেছিল।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বৈষ্ণবভক্তদের অনুরোধ এড়ানো তাঁর পক্ষে সম্ভবপর হল না। তাঁদের অনুরোধকে তিনি দেবতার আদেশ বলেই মনে করলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি গ্রন্থের উপসংহারে লিখেছেন ঃ

আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান ॥
বৃদ্ধজরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥

এরূপ আদর্শ জীবনচরিত লিখতে গিয়ে কৃষ্ণদাস যে-পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন তা উল্লেখযোগ্য। চৈতন্যের বাল্যলীলা 'চৈতন্য-ভাগবতে' বিস্তারিত আকারে বর্ণিত হয়েছে বলে তাঁর বাল্যলীলার কাহিনী সংক্ষিপ্ত। এখানেই পূর্ব লেখকের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার পরিচয় পাওয়া যায়। বৃন্দাবনদাসের মত তিনি কোথাও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা অসহিষ্ণুতার পরিচয় দেন নি। গ্রন্থশেষে তিনি যে-বিনয় ও ভক্তিভাব দেখিয়েছেন তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। সাধারণ লেখক পাঠকের উপকার করছেন মনে করেই সাহিত্য রচনা করেন। কিন্তু চৈতন্য-চরিতামৃতের কবি লেখার মধ্যে নিজের ভক্তির চরিতার্থতা আকাঙ্ক্ষা করে বলেছেন :

চৈতন্য-চরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা মুঞি করো পানে ॥

'চৈতন্য-চরিতামৃত' 'চৈতন্য-ভাগবতে'র মত আদি, মধ্য ও অন্ত্য খণ্ডে বিভক্ত। মোট অধ্যায় সংখ্যা বাষট্টি। সূত্রাকারে কাহিনীর ধারা অনুসরণ করে অন্ত্য খণ্ডটিকেই বিস্তারিত আকারে রচনা করার ইচ্ছা ছিল কৃষ্ণদাসের। কিন্তু কাহিনী বাদ দিয়ে গেলেও বৈষ্ণবদর্শন, ভক্তিশাস্ত্র, চৈতন্যতত্ত্ব নিয়েও এত গুরুতর আলোচনা করেছেন যে, গ্রন্থের আয়তন ক্রমেই বেড়ে উঠেছে।

সংস্কৃতে গভীর জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও মাতৃভাষায় এই মহাগ্রন্থ রচনা করে তিনি বাঙালী ও বাংলা-ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করেছেন। বাংলা-ভাষার প্রতি এমন অনুরাগ সে যুগে একান্ত বিরল। সংস্কৃত না জেনেও আজ যে-কোন ব্যক্তি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবতত্ত্ব ও বৈষ্ণব-সাধনার মূলকথা এই গ্রন্থ পাঠ করলেই জানতে পারে।

বাংলা পয়ার ও ত্রিপদীর মধ্যে-যে কতখানি তত্ত্ব-ব্যাখ্যার ক্ষমতা আছে তা তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছেন। এ দুই ছন্দ তাঁর হাতে গদ্যের মতই কাজ করেছে। প্রেমের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন :

কাম প্রেম দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপ বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা প্রেম তার নাম ॥

পদাবলী রচনাতেও তাঁর দক্ষতা ছিল :

কৃষ্ণপ্রেম সুনির্মল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল
সেই প্রেম অমৃতের সিন্ধু।
নির্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্যদাগে
শুক্ল বস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু ॥

ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের মতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ৮৫ বছর বয়সে গ্রন্থ-রচনার কাজ শেষ করেন। রচনা করতে সময় লেগেছে নয় বছর। পণ্ডিতেরা অনুমান করেন ১৫৯০ থেকে ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে গ্রন্থ-রচনা আরম্ভ হয় এবং সমাপ্ত হয় ১৬১২ থেকে ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে।

শোনা যায় চৈতন্য-চরিতামৃতের পাণ্ডুলিপি নাকি বৃন্দাবন থেকে চুরি হয়ে যায়। সেই শোকেই কৃষ্ণদাস রাধাকুণ্ডের জলে আত্মহত্যা করেন। কিন্তু এ কাহিনী সত্য বলে মনে হয় না। কারণ কৃষ্ণদাসের মত প্রাজ্ঞ সংযমী বৈষ্ণব পাণ্ডুলিপির জন্যে আত্মহত্যারূপ মহাপাপ করবেন বলে আমাদের মনে হয় না। তবে শোকের আঘাত সহ্য করতে না পেরে বৃদ্ধ কৃষ্ণদাসের মৃত্যু হতে পারে। মনে হয়, গ্রন্থের গুরুত্ব বাড়াবার জন্যেই কৃষ্ণদাসের আত্মহত্যার কাহিনীর জন্ম।

অনুশীলনী

১। বাংলা ভাষায় রচিত প্রধান প্রধান চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থগুলির উল্লেখ করে কোন্‌খানিকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে কর তা কারণসহ লেখ। [উঃ মাঃ ১৯৮০]

২। শ্রীচৈতন্যের বাংলা ভাষায় রচিত মুখ্য চরিতগ্রন্থগুলির উল্লেখ করে কোন্‌খানিকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে কর, কারণসহ তার আলোচনা কর।

৩। চৈতন্য-জীবনীকাব্যসমূহের মধ্যে কোন্ দুটিকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দেওয়া হয়? কবির পরিচিতিসহ জীবনীগ্রন্থ দুটি সম্পর্কে আলোচনা কর।
[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৪। চৈতন্য-চরিত কাব্যগুলির মধ্যে যে-গ্রন্থটি তোমার মতে শ্রেষ্ঠ, সেই গ্রন্থটির বিস্তৃত পরিচয় দাও। [ত্রিপুরা উঃ মাঃ ১৯৮১]

৫। 'চৈতন্য-ভাগবত' কয় খণ্ডে বিভক্ত? খণ্ডগুলির নাম কি? লেখক কার আদেশে গ্রন্থটি রচনা করেন? কবির জন্ম ও বংশ-পরিচয় সম্বন্ধে কি জান?
[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৬। কাদের নির্দেশে কৃষ্ণদাস কবিরাজ 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থ রচনা করেন? এই কাব্য রচনায় কবি কাদের নিকট থেকে তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন? গ্রন্থটির রচনাকাল বল। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮০-৮১]

৭। শ্রীচৈতন্যের জীবন অবলম্বনে রচিত একটি কাব্যের পরিচয় দাও এবং সেই কাব্যের কবি-সম্পর্কে যা জান লিখ। [ত্রিপুরা উঃ মাঃ পরীক্ষা, ১৯৭৯]

৮। 'চৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থখানির লেখক-সম্বন্ধে যা জান লিখ।
[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৭৯]

৯। টীকা লেখঃ চৈতন্যমঙ্গল, বৃন্দাবনদাস, লোচনদাস জয়ানন্দ, চৈতন্যভাগবত। [ত্রিপুরা উঃ মাঃ ১৯৮১]

অষ্টম অধ্যায়

বৈষ্ণব পদাবলী

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যা অমরতার দাবি করতে পারে তা হল বৈষ্ণব পদাবলী। এর বিষয়বস্তু, রোমান্টিকতা, রচনারীতি ও ভক্তিবাদ সর্বকালের বিদগ্ধ মানুষের আদরের সামগ্রী। এর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য ভাবাদর্শ জড়িত হয়ে এর মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে। বৈষ্ণব-পদাবলীর রসোপলব্ধির জন্য চৈতন্যপ্রবর্তিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্ম-সম্বন্ধে অবহিত থাকা দরকার। কারণ এর মধ্যে সাধারণ নর-নারীর মানবীয় সম্পর্কের কাহিনী গৃহীত হয় নি। এই কাব্যের পশ্চাৎপটে একটা গূঢ় অধ্যাত্মসাধনার ব্যঞ্জনা আছে। তাই বৈষ্ণব-পদাবলী সম্বন্ধে কিছু ধারণা থাকা দরকার।

কালিদাস তাঁর 'মেঘদূত'-এ গেয় প্রবন্ধের অঙ্গ-হিসাবে 'পদ' এই শব্দটির ব্যবহার করেছেন : 'মদগোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্গাতুকামা'। বহু সংস্কৃত কাব্যে এই ব্যবহার দেখা যায়। মনে হয় পদাবলী শব্দের মূল অর্থ 'পদ' বা কবিতার সমষ্টি। পদ বা পদাবলীর প্রয়োগ জয়দেবের গীতগোবিন্দেও আছে। যেমন—'মধুর-কোমল-কান্ত-পদাবলীম্'। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যেসব গান রচিত হয় তাকে সাধারণত পদ বলা হত। যেমন বৈষ্ণবপদাবলী, শাক্তপদাবলী। আধুনিক বাংলা ভাষায় অনেক সময়ে 'পদাবলী' অর্থে গীতিকবিতার ব্যবহারও দেখা যায়। কিন্তু 'গীতিকবিতা' আর 'গেয় পদ' এক নয়। বৈষ্ণব-পদকর্তারা গান করার জন্যেই পদ রচনা করেছেন। তাই এগুলি সাধারণ গীতিকবিতা নয়। গীতিকবিতার মধ্যে কবির যে-ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশ থাকে বৈষ্ণবপদাবলীতে সে-রকম অনুভূতি প্রকাশের অবসর নেই। এ কাব্যের পেছনে একটা গূঢ় অধ্যাত্মসাধনার ব্যঞ্জনা আছে। তা সত্ত্বেও বলা চলে, শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপদাবলীর মধ্যে গীতিকাব্যের গুণ বর্তমান। কারণ পদকর্তারা তাঁদের ব্যক্তিগত আনন্দ-বেদনাকে রাধাকৃষ্ণের মাধ্যমেই প্রকাশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বৈষ্ণব-কবিতায় এই প্রশ্নটাকেই তুলে ধরেছেন—

> 'শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান ?
> পূর্বরাগ, অনুরাগ, মান-অভিমান,
> অভিসার, প্রেমলীলা, বিরহ-মিলন ;
> বৃন্দাবন-গাঁথা—এই প্রণয়-স্বপন
> শ্রাবণের শর্বরীতে কালিন্দীর কূলে,
> চারিচক্ষে চেয়ে দেখা কদম্বের মূলে
> শরমে সম্ভ্রমে—একি শুধু দেবতার ?'

এর উত্তর কবিগুরু নিজেই দিয়েছেন :

> 'দেবতারে যাহা দিতে পারি, দিই তাই
> প্রিয়জনে—প্রিয়জনে যাহা দিতে পাই

তাই দিই দেবতারে, আর পাব কোথা ?
দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা।'

এদিক থেকে বিচার করলে এক হিসাবে বৈষ্ণব পদাবলীকে গীতিকাব্য বলা যায়। পদাবলীর বাহন হল গান। একক বা সমবেত-সঙ্গীত ধর্মসাধনাকে সংহত রূপ দান করে। পদাবলীর গানকে তিন ধারায় প্রয়োগ করা হয়। নাম-কীর্তন বা সঙ্কীর্তন, পালা-কীর্তন এবং সূচক-কীর্তন। সকলে মিলে দলবদ্ধভাবে কৃষ্ণগুণগান করার নাম সঙ্কীর্তন। কীর্তন অর্থাৎ পালাকীর্তনে রাধাকৃষ্ণের কাহিনী বিভিন্ন পালার আকারে গাওয়া হয়। সূচক-কীর্তনের অর্থ হল কোন ভক্ত সাধকের তিরোধান-উৎসব উপলক্ষে গাওয়া পদ।

বৈষ্ণব-পদাবলী শ্রীচৈতন্যের অলোকসামান্য প্রভাবের দান। তাঁর প্রভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম, সাধনা ও সাহিত্য বিশেষ গৌরব অর্জন করে। শ্রীচৈতন্যের আবেগ-আর্তির মধ্যেই যেন রাধাকৃষ্ণ মূর্ত হয়ে উঠেছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সমকালে এবং পরে বহু ভক্ত কবি তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বিশুদ্ধ ভক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে অসংখ্য বৈষ্ণব পদ রচনা করেছেন। এই সব পদ বিভিন্ন পালার আকারে লেখা। চৈতন্যপূর্ব কালের বৈষ্ণব পদাবলীতে ভক্তির কথা থাকলেও তার মধ্যে দার্শনিক তত্ত্বকথা প্রবেশ করে নি। কিন্তু শ্রীচৈতন্য প্রভাবে কবিরা বৈষ্ণব পদকে ধর্ম সাধনার অঙ্গীভূত করে তুললেন। বৈষ্ণব ধর্ম সাধনা এবং সাহিত্যের প্রাণকেন্দ্রে শ্রীচৈতন্যদেব অবস্থিত বলে তাঁর জীবনকে অবলম্বন করে রচিত হল এক বিশেষ ধরনের পদ। এরই নাম গৌরচন্দ্রিকা। বৈষ্ণব কীর্তনীয়াগণ রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পালাগান গাইবার পূর্বে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক গান করে থাকেন। তাই গৌরচন্দ্রিকাকে রাধাকৃষ্ণ লীলার ভূমিকা বলা যেতে পারে। অনেক শ্রেষ্ঠ পদকর্তা নিষ্ঠার সঙ্গে গৌরচন্দ্রিকা অর্থাৎ গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ রচনা করেছেন। রাধাকৃষ্ণ পদাবলীর মত এই সব চৈতন্য-বিষয়ক পদ গান হিসাবে বাংলাদেশে ষোড়শ শতাব্দী থেকেই জনপ্রিয়। তাই পদকর্তা ও গায়কেরা কৃষ্ণলীলা গান করার আগেই চৈতন্য-বিষয়ক পদের গান করতেন। একেই বলে গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদাবলী।

বলরাম দাস ঃ

'না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননিচোর।'

কৃষ্ণনগরের কাছে দোগাছিয়া গ্রামে বলরাম দাসের জন্ম। তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর শিষ্য। কবির বংশধর এখনও বর্তমান আছেন, তাঁরাই উদ্যোগ করে বলরাম দাসের পদাবলী প্রকাশ করেছেন। বাংলা পদাবলী সাহিত্যে দুজন বলরাম দাসের অস্তিত্ব অনুভূত হয়। তাঁদের মধ্যে প্রাচীনতর বলরাম দাসই শ্রেষ্ঠ প্রতিভার অধিকারী। তিনি ছিলেন ষোড়শ শতকের শেষ ভাগের কবি। তাঁর ব্রজবুলি ও বাংলায় লেখা পদগুলি বৈষ্ণব-সাহিত্যকে বিশেষ গৌরব দান করেছে। তাঁর লেখা—"হিয়ার ভিতর হইতে কে হৈল বাহির। তেঞি বলরামের পহুঁর চিত

নহে স্থির।" এই পঙ্‌ক্তি দুটি বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের বড় প্রিয় ছিল। ভাষাগত স্বচ্ছতা ও সরলতা তাঁর পদ-সাহিত্যের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। বলরামের বাৎসল্যলীলার পদ অতুলনীয়। পুত্রের জন্য মা-যশোদার যে স্নেহকাতর ছবি তিনি অঙ্কন করেছেন, তার তুলনা বুঝি অন্য কোথাও নেই ঃ

"শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম
মিনতি করিয়ে তো সভারে।
বন কত অতিদূর, নবতৃণ কুশাঙ্কুর,
গোপাল লৈয়া না যাইও দূরে ॥"

কত সহজ কথায় জননী-হৃদয়ের স্নেহ-ব্যাকুলতা ফুটেছে। এর পাশেই আছে পুত্রাভিমানের কত ছোট কিন্তু মর্মস্পর্শী ছবি ঃ

"না থাকিব তোমার ঘরে অপযশ দেহ মোরে
মা হইয়া বলে ননিচোর।"

মনে হয় সপ্তদশ শতকে আর-একজন বলরাম দাসের আবির্ভাব ঘটেছিল। তিনিও কিছু ভাল পদ রচনা করেছেন, তবে ষোড়শ শতাব্দীর আদি বলরাম দাসের কাব্য-প্রতিভাই শ্রেষ্ঠ।

জ্ঞানদাস ঃ

"রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল ॥"

জ্ঞানদাস ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগের কবি। ১৫৩০ খ্রীস্টাব্দে বর্ধমান জেলার কাটোয়ার দশ মাইল পশ্চিমে কাঁদড়া গ্রামের এক ব্রাহ্মণ-বংশে তাঁর জন্ম হয়। মনে হয় তিনি খেতুরীর বৈষ্ণব-সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এবং নিত্যানন্দ মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে এসেছিলেন। এ ছাড়া তাঁর ব্যক্তিগত জীবন-সম্পর্কে আর কোন তথ্য জানা যায় না।

জ্ঞানদাসের ভণিতায় যে-চারশটি পদ পাওয়া যায় তার সবগুলিই একজন জ্ঞানদাসের রচনা, না একাধিক জ্ঞানদাসের, সে-সম্পর্কে সন্দেহ উপস্থিত হলেও নির্ভরযোগ্য কোন তথ্য হাতের কাছে না থাকায় একজন জ্ঞানদাসকেই আমাদের স্বীকার করতে হবে।

ব্রজবুলি এবং বাংলা দুই ভাষাতেই জ্ঞানদাস পদ রচনা করেছেন। তবে তাঁর বাংলা পদ ব্রজবুলির তুলনায় শ্রেষ্ঠ, এবং কবির যত-কিছু গৌরব এই বাংলা পদকে কেন্দ্র করেই। ব্রজবুলিতে যেমন বিদ্যাপতি তাঁর আদর্শ, তেমনি বাংলা-পদে তিনি চণ্ডীদাসকেই অনুসরণ করেছিলেন। এক হিসাবে তিনি চণ্ডীদাসের সার্থক ভাবশিষ্য। চণ্ডীদাসের মতই তাঁর কাব্যে একদিকে সাধকোচিত মনোভাব, অন্যদিকে প্রেমের গভীর ও সহজ রূপের বিকাশ লক্ষ করা যায়। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমলীলার আস্বাদনে জ্ঞানদাস ছিলেন চণ্ডীদাসের সহধর্মী। সেই কারণেই এই দুই কবির মধ্যে মিল এত

গভীর ও ব্যাপক। তবে মিলের মত দুজনের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট। এই পার্থক্য তাঁদের শিল্পী-সত্তায়। চণ্ডীদাস, স্বভাব-কবি আর জ্ঞানদাস মণ্ডনশিল্পী। জ্ঞানদাসের রূপানুরাগ, আক্ষেপানুরাগের পদগুলি বৈষ্ণব-পদাবলীর উজ্জ্বল সম্পদ। রূপের সার্থক চিত্রকর জ্ঞানদাস লিখেছেন :

"রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে।
পরাণ পীরিতি লাগি থির নাহি বান্ধে॥"

অথবা, "তোমার গরবে গরবিনী হাম রূপসী তোমার রূপে।
হেন মনে লয় ও দুটি চরণ সদা লয়্যা রাখি বুকে॥"

এগুলি প্রথম শ্রেণীর কবিকৃতি বলেই বিবেচিত হয়।

জ্ঞানদাসের ভণিতায় আক্ষেপানুরাগের যে-সব পদ পাই তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল—অতি পরিচিত এবং বিতর্কিত এই পদটি :

"সুখের লাগিয়া এ ঘর বাঁধিনু
অনলে পুড়িয়া গেল।
অমিয় সাগরে সিনান করিতে
সকলি গরল ভেল॥"

বিতর্কিত এই কারণে বলছি, পদটি কারও কারও মতে চণ্ডীদাসের রচনা। যাই হোক, জ্ঞানদাস হলেন উত্তর-চৈতন্য-যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ পদকার।

গোবিন্দদাস ঃ

"সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার।
হরি রহ মানস-সুরধুনী-পার॥"

জ্ঞানদাস যেমন চণ্ডীদাসের সার্থক উত্তর-সাধক ছিলেন, গোবিন্দদাস তেমনি ছিলেন বিদ্যাপতির ভাবশিষ্য। তাই গোবিন্দদাসকে কোন কোন ভক্ত বলেছেন—'গোবিন্দ দ্বিতীয় বিদ্যাপতি।'

নানা বৈষ্ণব-গ্রন্থে গোবিন্দদাসের জীবন-কথা বর্ণিত হয়েছে। সেই সব তথ্য থেকে জানা যায় শ্রীখণ্ড ছিল কবির জন্মস্থান। তাঁর পিতা ছিলেন বিখ্যাত চৈতন্য-ভক্ত চিরঞ্জীব সেন। গোবিন্দদাস প্রথম যৌবনেই শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বৈষ্ণব হন। বৃন্দাবনের শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে বন্ধু বলে স্নেহ করতেন এবং তাঁর পদাবলী পাঠ করে 'কবিরাজ' উপাধি দান করেন। ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত তিনি জীবিত ছিলেন।

গোবিন্দদাসকে বলা হত 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি'। তার কারণ গোবিন্দদাসের শ্রেষ্ঠ পদগুলি ব্রজবুলি ভাষায় রচিত। তাঁর বাঙ্‌মাধুরী, চিত্রকল্প, সঙ্গীত, ধর্ম, পাণ্ডিত্য ও রসানুভূতির গভীরতা থেকে জাত পদগুলি কালজয়ী গৌরব লাভ করেছে। তাঁর

সার্থকতার মূলে আছে বিদ্যাপতির ভাব-ভাষা এবং চৈতন্যযুগের ভাবাদর্শ। অভিসার-বিষয়ক পদরচনায় গোবিন্দদাস অমর হয়ে থাকবেন। বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন ঋতুতে যত রকমের দুস্তর পন্থা কল্পনা করা যায় কবি তারই বর্ণনা দিয়েছেন।

নানা ধরনের অভিসারের মধ্যে 'বর্ষাভিসার'ই প্রধান। বর্ষার দুর্গম পিচ্ছল পথে রাধাকে অভিসারে যেতে হবে তাই তিনি গৃহপ্রাঙ্গণে নিয়মিত অভ্যাস করে চলেছেন :

"কন্টক গাড়ি কমল সম পদতল
মঞ্জীর চীরহি ঝাঁপি।
গাগরি বারি চারি করি পিছল
চলতহি অঙ্গুলি চাপি।"

কন্টকময় পথে চলার অভ্যাস করছেন রাধা। তারপর এল দুর্যোগময় বর্ষা-রাত্রিতে সেই রোমাঞ্চকর অভিসার-মুহূর্ত :

"ঘন ঘন ঝন ঝন বজর নিপাত।
শুনইতে শ্রবণে মরম জরি যাত।
দশ দিশ দামিনী দহন বিথার।
হেরইতে উচকই লোচন তার॥"

যদিও "মন্দির বাহির কঠিন কপাট"—তবু রাধার কাছে এসব বাধা আর বাধা নয়। কারণ :

"কুল মরিযাদ কপাট উদ্ঘাটলুঁ
তাহে কি কাঠকি বাধা।
নিজ মরিযাদ— সিন্ধু সঞে পঙারলুঁ
তাহে কি তটিনী অগাধা॥"

গোবিন্দদাসের হাতে গৌরাঙ্গ-বিষয়ক বা পূর্বরাগের পদগুলিও প্রথম শ্রেণীর কাব্যগুণসম্পন্ন।

গোবিন্দদাস কেবল কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন কবি ও সাধক। চৈতন্য-তিরোধানের পর কবির আবির্ভাব, তাই চৈতন্য-বিষয়ক পদগুলির মধ্যে কবি নানাভাবে দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন :

"নিজরসে নাচত নয়ন ঢুলায়ত,
গায়ত কত কত ভকতহিঁ মেলি।
যো রসে ভাসি অবশ মহীমণ্ডল
গোবিন্দদাস তহিঁ পরশ না ভেলি॥"

তাঁর চোখে শ্রীচৈতন্যদেব ছিলেন 'রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত-তনু কৃষ্ণস্বরূপ'। তাঁর অনেক পদে বৈষ্ণব-সাধনার 'মঞ্জরী'-ভাবের প্রকাশ আছে। মনে হয় তিনি বৈষ্ণব-সাধনায় ছিলেন 'মঞ্জরী'-ভাবের সাধক।

এই যুগেই যদুনন্দন, মাধবদাস, অনন্তদাস প্রভৃতি আরও কয়েকজন পদকর্তার আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সূর্যের আলোর নিচে প্রদীপশিখার মত তাঁরা সকলেই

জ্ঞানদাস-গোবিন্দদাসের প্রতিভার আলোয় অদৃশ্য হয়ে গেছেন। পরবর্তী শতাব্দীতেও বহু পদকর্তার আবির্ভাব হয়েছে, কিন্তু এই ষোড়শ শতাব্দীর সুবর্ণযুগের গৌরবের কাছে তাঁদের প্রতিভা ম্লান হয়ে গেছে।

অনুশীলনী

১। বৈষ্ণব কবি গোবিন্দদাসের বিশেষত্ব কি? তাঁকে 'দ্বিতীয় বিদ্যাপতি' বলে উল্লেখ করবার কারণ কি তা আলোচনা কর। [উ. মা. ১৯৭৯]

২। কোন্ ধরনের পদ রচনায় গোবিন্দদাসের দক্ষতা লক্ষ করা যায়? তাঁর কাব্যপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [উ. মা. ১৯৮২]

৩। জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয় কেন? তাঁর কাব্যপ্রতিভার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। [উ. মা. ১৯৮০]

৪। চৈতন্য-পরবর্তী দুই বিখ্যাত পদকর্তার কবিকৃতিত্ব লেখ। [উ. মা. ১৯৮৩]

৫। বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়বস্তু কি? এই পদাবলী থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে তোমার কথা বুঝিয়ে বল।

৬। পদাবলী কাকে বলে? একজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার পরিচয় দাও।

৭। প্রাক্-চৈতন্য ও চৈতন্যোত্তর বৈষ্ণব পদাবলীর একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

৮। জ্ঞানদাস ও গোবিন্দদাস কবিরাজ কোন্ সময়কার কবি? তাঁদের কাব্য রচনা কি প্রকৃতির? উভয়ের রচনা থেকে তোমার ভালো লাগা কয়েকটি করে চরণ উদ্ধৃত কর।

৯। টীকা লেখ: জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বলরামদাস, গৌরচন্দ্রিকা, দ্বিতীয় বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য, পদাবলী।

নবম অধ্যায়

ধর্মমঙ্গলের কাহিনী

গৌড়ে ধর্মপাল নামে এক বিখ্যাত সম্রাট ছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র গৌড়ের রাজা হন। গৌড়েশ্বরের এক মন্ত্রী ছিলেন তাঁর নাম মহামদ, তিনি ছিলেন সম্পর্কে গৌড়েশ্বরের শ্যালক। অজয় নদীর তীরে ত্রিষষ্ঠীর গড়ে একজন সামন্ত রাজা বাস করতেন তাঁর নাম ছিল কর্ণসেন।

এক সময় সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ কর্ণসেনের প্রাসাদ আক্রমণ করে, এবং তাঁকে প্রাসাদ থেকে বিতাড়িত করে। পরাজিত কর্ণসেন গৌড়ে পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেন। ইছাই ঘোষ নতুন গড় নির্মাণ করে গড়ের নাম দিল ঢেকুর।

গৌড়েশ্বর ইছাইকে সমুচিত দণ্ড দেবার জন্য নয় লাখ সৈন্য নিয়ে ঢেকুর আক্রমণ করেন। কিন্তু পার্বতীর বরে ইছাই ছিল অপরাজেয়, তাই গৌড়েশ্বর কেবল পরাজিত হলেন না যুদ্ধে কর্ণসেনের ছয় পুত্রের মৃত্যু হল, ছয় পুত্রবধূ স্বামীদের সঙ্গে সহমরণে গেল এবং কর্ণসেনের স্ত্রী দুঃখে আত্মঘাতিনী হলেন।

কর্ণসেনের অবস্থা দেখে গৌড়েশ্বরের মনে দয়া হল। রানীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে তাঁর বিয়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু এই বিয়ের সবচেয়ে বড় বাধা ছিল মহামদ। রঞ্জাবতী ছিলেন মহামদের প্রিয় ভগ্নী, সে কিছুতেই ভগ্নীর সঙ্গে বৃদ্ধের বিয়ে দিতে চাইবে না রাজা একথা জানতেন। তাই রানীর সঙ্গে পরামর্শ করে তিনি মহামদকে কামরূপে পাঠিয়ে দিলেন। এই সুযোগে কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিয়ে হল। বিয়ের পর গৌড়েশ্বর কর্ণসেনকে ময়নানগরের সামন্তরাজ করে পাঠিয়ে দিলেন।

খবর পেয়ে মহামদ ক্রুদ্ধ হল। তার সব রাগ গিয়ে পড়ল কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীর উপর।

এদিকে রঞ্জাবতী পুত্র-কামনায় শালে ভর দিয়ে কঠিন তপস্যা শুরু করলেন। তাঁর তপস্যায় তুষ্ট হয়ে ধর্মঠাকুর তাঁকে পুত্রবর দান করেন। যথাসময়ে তাঁর একটি পুত্র হয়, এই পুত্রের নাম লাউসেন। ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদে রঞ্জাবতী আর একটি পুত্র লাভ করেন, তার নাম কর্পূরসেন।

যথাসময়ে লাউসেন ও কর্পূরসেন মল্লবিদ্যা শিক্ষা করেন। ধর্মঠাকুরের কৃপায় তারা অল্পদিনেই মল্লবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে উঠল। দেবী পার্বতীর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে দেবী খুশী হয়ে তাকে অজেয় অসি দান করেন।

একদিন লাউসেন তার ভাই কর্পূরকে নিয়ে গৌড় অভিমুখে যাত্রা করে। উদ্দেশ্য ছিল মেসো-গৌড়েশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং ভাগ্য-পরীক্ষা। পথে আসে নানা বিপদ। তাকে জামতী নামে এক কুচরিত্রা নারীর চক্রান্ত ব্যর্থ করতে হয়, আর গোলাহাট রাজ্যের রানী সুরীক্ষার কতগুলি হেঁয়ালীর সন্তোষজনক উত্তর দিয়ে

নিষ্কৃতি পেতে হয়। গৌড়ের পথে লাউসেন দুর্দান্ত বাঘ এবং নরমাংসখাদক কুমীরও বধ করে।

অবশেষে বাংলার রাজধানী গৌড়। এখানেও বিধি বাম। রাজধানীতে প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে মহামদ লাউসেনকে হাতী-চোর বলে কারাগারে নিক্ষেপ করল। কর্পুর লাউসেনকে ছেড়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু লাউসেন গৌড়েশ্বরের কাছে নিজেকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে। রাজা তার পরিচয় পেয়ে আনন্দিত হলেন এবং নিজের শ্রেষ্ঠ অশ্বটি তাকে দান করলেন।

'ইন্দ্রের অশ্ব'তুল্য শ্রেষ্ঠ অশ্ব এবং নানা উপহার নিয়ে লাউসেন স্বদেশের পথে যাত্রা করে। পথে কালু ডোমসহ তের জন ডোম-সৈন্যও তার সঙ্গে ময়নাগড়ে যায়। কালু ডোমকে সে নিজের সেনাপতিপদে বরণ করে।

রাজমন্ত্রী মহামদ লাউসেনকে বিপদে ফেলার জন্য নতুন উপায় খুঁজতে লাগল। ইতিমধ্যে কামরূপরাজ স্বাধীনতা ঘোষণা করায় লাউসেনকে তার বিরুদ্ধে পাঠাবার জন্য মহামদ গৌড়েশ্বরকে পরামর্শ দিল। রাজার আদেশে লাউসেনকে দুর্গম কামরূপ জয় করতে যেতে হল। কিন্তু ধর্মঠাকুরের আশীর্বাদে সে কামরূপ জয় করে। পথে মঙ্গলকোটের রাজকন্যা অমলা ও বর্ধমানের রাজকন্যা বিমলাকেও লাউসেন বিয়ে করে।

সিমুলার রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়াকে দেখে গৌড়েশ্বর তাকে বিয়ে করতে চান। হরিপাল বিয়েতে সম্মতি দিলেও কানাড়া বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরকে বিয়ে করতে রাজি হল না। ফলে গৌড়েশ্বর 'নবলক্ষ' সৈন্য নিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

কানাড়া একটি লোহার গণ্ডার দিয়ে বলে, যে এই গণ্ডার এক আঘাতে দ্বিখণ্ডিত করতে পারবে সে তাকেই বিয়ে করবে। বৃদ্ধ রাজা প্রাণপণ চেষ্টা করেও বিফল হন। রাজার আদেশে লাউসেন লোহার গণ্ডারকে এক কোপে দ্বিখণ্ডিত করে। কানাড়া লাউসেনকে বিয়ে করতে চাইলে গৌড়েশ্বর লাউসেনের উপর ক্রুদ্ধ হন। তখন লাউসেনের সঙ্গে কানাড়ার এই চুক্তি হয় লাউসেন যদি কানাড়ার হাতে পরাজিত হয়, তবে সে কানাড়াকে বিয়ে করতে বাধ্য হবে। যুদ্ধে লাউসেন পরাজিত হয়ে কানাড়াকে বিয়ে করে ময়নানগরে ফিরে আসে।

বারবার চেষ্টা করেও মহামদ যখন লাউসেনের কোন ক্ষতি করতে পারল না, তখন গৌড়েশ্বরকে পরামর্শ দিল যে, ঢেকুরগড়ের ইছাই ঘোষকে দমনের জন্য লাউসেনকে পাঠানো হোক।

রাজার আদেশে লাউসেন যুদ্ধ যাত্রা করল। ঢেকুরগড়ের প্রান্তে সেনাপতি লোহাটা বজ্জরের সঙ্গে লাউসেনের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হল। অবশেষে লাউসেনই সেই যুদ্ধে জয়ী হল। লোহাটা বজ্জরের মুণ্ড কেটে লাউসেন রাজদরবারে পাঠিয়ে দিল। এরপর আরম্ভ হল ইছাই ঘোষের সঙ্গে তার যুদ্ধ। এ যুদ্ধ দেবতার সঙ্গে

দেবতার যুদ্ধ। কারণ ইছাই ছিল পার্বতীর ভক্ত আর লাউসেন ধর্মের। অবশেষে কালু ডোমের সাহায্যে আর ধর্মঠাকুরের কৃপায় লাউসেন জয়ী হল।

এরপর গৌড়রাজ্যের অমঙ্গল দূর করার জন্য রাজার আদেশে লাউসেন হাকন্দে গিয়ে ধর্মের তপস্যা শুরু করে। ধর্মপূজার শ্রেষ্ঠ সাধনা পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় ঘটানো। লাউসেন হাকন্দ-নামক স্থানে গিয়ে সেই কাজে মন দিল। সেই সুযোগে মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করে। সেনাপতি কালুর মৃত্যু হলে লখাই ডোমনী এবং রানী কানাড়া প্রচণ্ড যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধে মহামদ পরাজিত ও বন্দী হয়। কালু ডোম নিহত হলেও ধর্মঠাকুরের কৃপায় আবার বেঁচে ওঠে। ওদিকে পশ্চিমে সূর্যোদয় কাহিনী মিথ্যা প্রমাণ করার অপচেষ্টায় মহামদ ধর্মঠাকুরের রোষভাজন হয়। তার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠরোগ দেখা দেয়। কিন্তু লাউসেন দয়াপরবশ হয়ে ধর্মের কৃপায় তাকে রোগমুক্ত করে। কেবল তার দুষ্কর্মের শাস্তিস্বরূপ মুখে একটি শ্বেতকুষ্ঠের চিহ্ন থেকে যায়। এইভাবে ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্য প্রচার করে লাউসেন স্বশরীরে স্বর্গে গমন করে। এই হল ধর্মমঙ্গলের কাহিনী।

রূপরাম ঃ

কবি রূপরাম চক্রবর্তী মঙ্গলকাব্যের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। মঙ্গলকাব্যের সমালোচক ও ঐতিহাসিক ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্যের মতে রূপরামের গ্রন্থ রচনার কাল ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দ। কবির জন্মস্থান ছিল বর্ধমান জেলার কায়তি শ্রীরামপুর গ্রামে। প্রথম জীবনে কবি পাঠে অমনোযোগী ছিলেন, একাধিক স্থানে বিদ্যাশিক্ষার জন্য গিয়ে ভর্ৎসিত হয়ে আবার ঘরে ফিরে আসেন। একদিন পথে কবির সঙ্গে ধর্মঠাকুরের দেখা হয়। কবি ঠাকুরের আশীর্বাদ লাভ করেন। এর পর রূপরাম গোপভূমের রাজা গণেশের সভায় যান এবং রাজার পৃষ্ঠপোষকতায় 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্য সরল ও সাবলীল ভাষায় লেখা। স্থানে স্থানে শব্দচয়ন এবং বর্ণনায় পাণ্ডিত্যের পরিচয় আছে। কবিকর্মের বিচারে তাঁর কাব্যকে উচ্চশ্রেণীর বলে দাবী করা যায় না।

ঘনরাম চক্রবর্তী ঃ

'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের সবচেয়ে খ্যাতিমান কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ১৭১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁর সুপ্রসিদ্ধ 'ধর্মমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন। কাব্যের নানাস্থানে কবির যে-ব্যক্তি পরিচয় আছে তা থেকে জানা যায় বর্ধমান জেলার কইয়ড় পরগণার কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। কবির পিতার নাম ছিল গৌরীকান্ত, জননী ছিলেন সীতা দেবী।

ঘনরামের কাব্যরচনার মূলে দেবতার স্বপ্নাদেশের কোন উল্লেখ নেই। কাব্য রচনার মূলে ঘনরাম একজনের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে বার বার স্মরণ করেছেন, তিনি তাঁর গুরু।

এই গুরুই ঘনরামকে কবিরত্ন উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি লিখেছেন—
"নিজগুণে করি যত্ন, নাম দিয়া কবিরত্ন, কৃপাময় করুণা আধান।"

ঘনরামের কাব্যের বৈশিষ্ট্য ছিল পরিশীলিত স্বচ্ছন্দ ভাষা। এই ভাষা ছিল গ্রাম্যতা দোষ-মুক্ত। তাই 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যের ইতিহাসে ঘনরামকে শ্রেষ্ঠ কবি বলে স্বীকার করা হয়েছে। তিনি ছিলেন প্রথম এবং প্রধান কবি যিনি পৌরাণিক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে হিন্দুর শিক্ষা-সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে যুক্ত করে 'মঙ্গলকাব্য' রচনা করেছেন। ঘনরামের কাব্যে কোন কোন সমালোচক করুণরসের অভাব লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু একটা কথা মনে রাখতে হবে, ধর্মমঙ্গলে স্ত্রীচরিত্রগুলি পুরুষের মতই বীর, সম্মুখযুদ্ধে তারা সশস্ত্র অগ্রসর হয়, সেই কারণে এই সব বীর নারীদের নিয়ে ধর্মমঙ্গলে গতানুগতিক করুণরস সৃষ্টির অবকাশ নেই। এখানে যে-করুণরস বা মানবিক আবেদন আছে তা কর্তব্যের শাসনে অত্যন্ত সংযত।

স্বভাব কবিত্বের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের মিলন ঘনরামের কাব্যকে বৈশিষ্ট্য দান করেছে। এবিষয়ে পরবর্তী কালের কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর তুলনা করা চলে। ঘনরামের কাব্যে যেন ভারতচন্দ্রের ভাষা ও ভাবের পূর্বসূচনা লক্ষ্য করা যায়। প্রবচনের মত সংক্ষিপ্ত কথায় যে-গভীর ভাবপ্রকাশে ভারতচন্দ্রের দক্ষতা ছিল ঘনরামেই দেখি তার সূচনা। কয়েকটি উদ্ধৃতি থেকে ঘনরামের সামাজিক অভিজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যাবে—

'রোগ ঋণ রিপু-শেষ দুঃখ দেয় রয়ে।'
'কলিকালে নারীর কুটুম্বে বড় ভাব।'
'হাতে শঙ্খ দেখিতে দর্পণ নাই খুঁজি।'

সব দিক বিচার করে বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে ঘনরাম কেবল ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবিরূপে নয় হিন্দু পৌরাণিক ঐতিহ্যের উদ্গাতারূপেও একজন স্মরণীয় কবি।

অনুশীলনী

১। ধর্মমঙ্গল কাব্য কাকে বলে? এই কাব্যের কাহিনীর পরিচয় দাও।

২। ধর্মমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দাও।

৩। ধর্মমঙ্গলকে কেন রাঢ়ের জাতীয় মহাকাব্য বলে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। টীকা লেখ: রঞ্জাবতী, কর্ণসেন, লাউসেন, মহামদ, ইছাই ঘোষ, ময়নাগড়, ঢেকুরগড়, কর্পূরসেন, কানাড়া।

দশম অধ্যায়

মহাভারত

কাশীরাম দাস ঃ

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কাশীরাম দাস মহাভারত অনুসরণে 'ভারতপাঁচালী' রচনা করেন। তিনি বর্ধমান জেলার কাটোয়ার কাছে সিঙ্গী গ্রামে এক কায়স্থ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম কমলাকান্ত, জ্যেষ্ঠ ভাইয়ের নাম কৃষ্ণদাস এবং কনিষ্ঠের নাম গদাধর। কবির ভ্রাতারাও কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। কাশীরাম তাঁর গুরু অভিরাম মুখোটির উপদেশে 'মহাভারত পাঁচালী' রচনায় হাত দেন।

কাশীরাম দাসের ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দরামের লেখা উদ্যোগপর্ব থেকে জানা যায়—

'আদি সভা বন বিরাটের কতদূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেলা স্বর্গপুর॥'

এই উক্তি থেকে বিশেষজ্ঞরা মনে করেন কাশীরাম সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন নি। তাঁর বংশের সকলেই কবি প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। মনে হয় কাশীরামের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র নন্দলাল এবং পুত্র জয়ন্তদেব দুজনে মিলে মহাভারতের আর চৌদ্দটি পর্ব রচনা করে তাঁর কাব্যের পূর্ণতা সাধন করেন। প্রথম চারটি পর্বে কাশীরামের নামে ভণিতা আছে, পরের পর্বে তাঁর নামে ভণিতা নেই। প্রথম চারটি পর্বের ভাষার বাঁধুনী প্রশংসনীয় কিন্তু শেষের পর্বগুলি বিভিন্ন লোকের রচনা বলে তাতে ত্রুটি, অসঙ্গতি ও বিশৃঙ্খলা ঘটেছে।

কেউ কেউ মনে করেন কাশীরাম দাস সংস্কৃত জানতেন না, কথকদের মুখ থেকে মহাভারতের গল্প শুনেই পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু মূল মহাভারতের সঙ্গে তাঁর কাব্য মিলিয়ে পাঠ করলে বেশ বোঝা যায় কাশীরাম সংস্কৃত জানতেন। তা ছাড়া কবির ভাষা, শব্দ প্রয়োগ, অলংকার রীতি এত সংস্কৃতগন্ধী যে এই ভাষায় তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল বলে মনে হয়।

কাশীরাম সংক্ষেপে মূল মহাভারতের অনুসরণ করলেও কোন কোন ঘটনা ও চরিত্র কবির নিজের সৃষ্টি। কিন্তু রচনার গুণে নিজের সৃষ্ট কাহিনীও অনুবাদ বলে মনে হয়। কবি প্রসন্ন ভঙ্গীতে পরিচ্ছন্ন ভাষায় কাহিনী বিবৃত করেছেন। যদিও কবি কৃত্তিবাসের মতো গ্রামীণ সরলতা তাঁর ভাষায় দেখা যায় না, কিন্তু কবির বৈষ্ণবমনটি রচনায় ধরা পড়েছে।

মূল সংস্কৃতের যথাযথ অনুবাদের ফলে মূলের সৌন্দর্য তাঁর রচনায় বহু স্থানেই প্রতিফলিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ শকুন্তলার তেজোদৃপ্ত ভাষায় উক্তির কথা স্মরণীয় ঃ

"লুকাইয়া যেই জন করে পাপকর্ম।
লোকে তা না জানিলেও জানেন তা ধর্ম।

চন্দ্র সূর্য বায়ু অগ্নি মহী আর জল।
আকাশ শমন ধর্ম জানয়ে সকল॥"

সর্বত্র সমানভাবে মূলের অনুগত না হলেও সংস্কৃতের প্রভাব অন্যত্র বেশ সুস্পষ্ট :

'দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনুশ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কতশুচি করিয়াছে শোভা॥'

কোথাও কোথাও নাটকীয়তা এবং হাস্যরস সৃষ্টি করেও কাশীরাম পাঠকের মনোরঞ্জন করেছেন। যে সামাজিক আদর্শ ও নীতির সন্ধান এই কাব্যে পাওয়া যায় তা মূল মহাভারত থেকে গৃহীত। প্রত্যাখ্যাত শকুন্তলা দুষ্মন্তের স্ত্রীর গৌরব সম্বন্ধে বলেছেন :

"পতিব্রতা নারী আমি না কর হেলন।
আমারে নীচের প্রায় না ভাব রাজন॥
অর্দ্ধেক শরীর ভার্য্যা সর্বশাস্ত্রে লেখে।
ভার্য্যা সম বন্ধু রাজা নাই মর্তলোকে॥"

কাশীরামের কাব্য মূলের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ভাবানুবাদ। সেই সঙ্গে সর্বজন-বোধ্য সাহিত্যিক গুণে রামায়ণের পরেই এই কাব্য বাঙালী পাঠকের হৃদয়ের সামগ্রী হয়ে উঠেছে।

কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী

কবীন্দ্র পরমেশ্বর :

"তাঁহার আদেশ মান্য মস্তকে করিল।
কবীন্দ্র পরম যত্নে পাঁচালী রচিল॥"

মহাভারত-কাব্যের সার্বজনীন প্রতিষ্ঠা বাংলার লোকজীবনে সম্ভব হতে পেরেছিল সপ্তদশ শতাব্দীর কবি কাশীরাম দাসের কল্যাণে। মহাভারত-কাব্যের এই লোক-প্রতিষ্ঠা-লাভের কারণ হিসাবে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় মন্তব্য করেছেন—"বাংলার পুরাতন সাহিত্যে ভারত পাঁচালীর উদ্ভব ও প্রসার প্রধানত রাজদরবারের আওতায়ই হইয়াছিল।" এ কথা ঠিক, বাংলা অনুবাদ-সাহিত্যের প্রসার হয়েছে রাজদরবারের ছত্রচ্ছায়ায়। কৃত্তিবাসী রামায়ণ আর মালাধরের কাব্য-প্রসঙ্গে আমরা এ কথা আলোচনা করেছি। এই কাব্য দু'টিতে অভিজাত সংস্কৃতি ও লোকসংস্কৃতির সমন্বয়-সাধনের যে-সূত্রটি ছিল, মহাভারত-কাহিনীতে সেই উপাদানের ছিল বিশেষ অভাব। বাঙালীর আদর্শোচিত গার্হস্থ্য উপাদান মহাভারত-কাহিনীর মধ্যে সবিশেষ না থাকায়, কেবল যুদ্ধ-কথাকে অবলম্বন করেই বিদেশী রাজশক্তির ছত্রচ্ছায়ায় তাকে বর্ধিত হতে হয়েছে। এ ছায়া কৃত্তিবাস ও মালাধর—দু'জনেই পেয়েছিলেন।

বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিদ্যোৎসাহী নবাব হুসেনশাহ (১৪৯৩-১৫১৮ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁর 'লস্কর' পরাগল খাঁ চট্টগ্রাম অধিকার করে সেখানের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। এই পরাগল খাঁ মহাভারতের কাহিনীর প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সভাকবি কবীন্দ্র পরমেশ্বরকে 'দিনেকে' শেষ করা যায় এমন একখানি মহাভারত কাব্য অনুবাদ করতে বলেন। তাঁরই নির্দেশে কবীন্দ্র পরমেশ্বর সংক্ষেপে মহাভারত-কাব্যের অনুবাদ করেন।

শ্রীকর নন্দী ঃ

পরাগলের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ছুটি খাঁ হলেন চট্টগ্রামের শাসনকর্তা। ইনিও পিতার মত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তাঁর সভাকবি ছিলেন শ্রীকর নন্দী। ছুটি খাঁ শ্রীকর নন্দীকে দিয়ে মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বের অনুবাদ করিয়েছিলেন। শ্রীকর নন্দী বেদব্যাসের মহাভারত পরিত্যাগ করে জৈমিনী ভারত অবলম্বনে রচনা করেন মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্ব।

সঞ্জয় নামে আর একজন কবির অনূদিত মহাভারত-কাব্য পাওয়া যায়। তবে কেউ কেউ মনে করেন কবীন্দ্র পরমেশ্বরের কাব্যকেই লিপিকারেরা সঞ্জয়ের কাব্য বলে ভুল করেছেন। এ কথা মনে করার সবচেয়ে বড় কারণ হল সঞ্জয়ের মহাভারতের সঙ্গে কবীন্দ্রের মহাভারতের বহু সাদৃশ্য। তা ছাড়া, ভণিতা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও দেখা যায় প্রবল দ্বিধা, সেখানে কবি মহাভারতের সঞ্জয়ের নামের আড়ালে আত্মগোপন করেছেন। তাই মহাভারতের আদি অনুবাদক হিসাবে কবীন্দ্র পরমেশ্বর এবং শ্রীকর নন্দীকেই নিঃসংশয়ে গ্রহণ করা যায়।

অনুশীলনী

১। মহাভারতের আদি অনুবাদক কে ছিলেন? প্রথম যুগের দুজন কবির সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। কাশীরাম দাসের কবি-জীবন ও তাঁর অনূদিত কাব্য-সম্পর্কে যা জান লেখ।

৩। পরাগলী মহাভারত কাকে বলে? এরূপ নামকরণের কারণ কি?

৪। কাশীরাম দাসকে মহাভারতের শ্রেষ্ঠ কবি বলা হয় কেন? তিনি কোন্ দিক থেকে বাঙালীর মনে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন? তাঁর ধর্মমত সম্বন্ধে কী জান?

৫। টীকা লেখ: শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর, পরাগল খাঁ।

একাদশ অধ্যায়

আরাকানের মুসলমান কবি

বাংলার তুর্কী সুলতানদের অনুকরণে সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজসভা বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। এই সভায় কবিরা সকলেই ছিলেন মুসলমান। এই সব কবির চেষ্টায় উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের লৌকিক উপাখ্যান বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করে। সৈয়দ সুলতান, মহম্মদ খান এঁরা সকলেই সপ্তদশ শতাব্দীর আরাকান রাজসভার কবি। কিন্তু দৌলত কাজী ও সৈয়দ আলাওল এমন দুজন মুসলমান কবি, যাঁদের রচনার প্রভাব কেবল মুসলমান সমাজে নয় হিন্দু সমাজেও ছড়িয়ে পড়েছিল। কারণ তাঁরা কেবল মুসলমান সমাজের কবি ছিলেন না, ছিলেন বাঙালী কবি।

দৌলত কাজী ঃ

দৌলত কাজী সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রামের রাউজান থানার অন্তর্গত সুলতানপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্পবয়সে তিনি নানা বিদ্যা শিক্ষা করে আরাকান রাজ থিরি থু ধম্মার (শ্রীসুধমা) রাজসভায় কবি হিসাবে সাদরে গৃহীত হন। রাজার সমরসচিব আশরফ খানের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৬২১ থেকে ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে হিন্দীকাব্য অবলম্বনে 'লোরচন্দ্রানী' বা 'সতী ময়না' কাব্য রচনা করেন। কিন্তু গ্রন্থ শেষ করার আগেই কবির মৃত্যু হয়। দৌলত কাজীর মৃত্যুর পর সৈয়দ আলাওল ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে কাহিনীর বাকি অংশ সমাপ্ত করেন। কাব্যের ভূমিকায় কবি তাঁর পৃষ্ঠপোষক সুফী মতাবলম্বী আশরফ খানের সম্বন্ধে অনেক কথা বলেছেন, কিন্তু নিজের সম্পর্কে বিশষ কিছু বলেন নি। দৌলত কাজীর 'সতী ময়না' কাব্যটি সম্পূর্ণ মৌলিক রচনা নয়। কোন লৌকিক হিন্দী উপাখ্যান অবলম্বনে কাব্যটি রচিত। সম্প্রতি গবেষণার ফলে জানা গেছে কেবল হিন্দী লোক-সাহিত্যে নয় 'সতী ময়না'র কাহিনী সারা ভারতেই প্রচলিত ছিল, এখনও আছে। মনে হয় দৌলত কাজী মিয়া সাধনের 'মৈনা কো সত্' কাব্য থেকে 'সতী ময়না' বা 'লোরচন্দ্রানী'র উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন।

'সতী ময়না'র কাহিনী বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন প্রকার হলেও মূল আখ্যানভাগ মোটামুটি একরকম। সংক্ষেপে দৌলত কাজির কাব্যের পরিচয় দেওয়া হল।

গোহারী দেশের রাজকুমার লোরের সঙ্গে সুন্দরী রাজকুমারী ময়নামতীর বিয়ে হয়। বিয়ের পর কিছুদিন বেশ সুখেই কাটে। একদিন এক যোগী এসে লোরকে মোহরা দেশের রাজকন্যা চন্দ্রানীর সংবাদ দিল এবং চন্দ্রানী লাভে উৎসাহিত করল।

চন্দ্রানীর স্বামী ছিল এক বামন ক্লীব রাজপুত্র। মহাবীর লোরকের সঙ্গে দেখা হবার পর চন্দ্রানী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন, লোরকও তাতে সাড়া দেন।

এর পর মালা বদল করে দুজনের বিয়ে হয় এবং বিয়ের পর লোর ও চন্দ্রানী মোহরা রাজ্য ছেড়ে পালিয়ে যান। সংবাদ পেয়ে বামন রাজকুমার এক বনের মধ্যে লোরকে আক্রমণ করেন। উভয়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বামনের মৃত্যু হয়। এর পর চন্দ্রানীর পিতা গোহারী দেশের রাজা সেখানে উপস্থিত হন এবং লোর-চন্দ্রানীর বিবাহ অনুমোদন করেন। বিয়ের পর লোর সেই দেশের রাজা হন। এদিকে স্বামীবিরহে সতী ময়নার দিন কাটে অতি দুঃখে। এক লম্পট রাজপুত্র তাঁকে প্রলুব্ধ করতে এসে ব্যর্থ হয়ে ফিরে যায়। এখানেই দ্বিতীয় খণ্ড সমাপ্ত এবং দৌলত কাজীর মৃত্যু।

এর পরের অংশ সৈয়দ আলাওলের লেখা। তৃতীয় খণ্ডে দেখা যাবে যে, প্রিয় সখীর পরামর্শে ময়নামতী এক ব্রাহ্মণকে দূত করে লোরের কাছে পাঠান। এই ব্রাহ্মণের বুদ্ধি কৌশলে তার মনে পড়ল ময়নামতীর কথা। তখন তিনি পুত্রকে মোহরা রাজ্যের রাজা করে চন্দ্রানীসহ ময়নামতীর কাছে ফিরে এলেন।

এর পর দুই সতীনে স্বামিসেবা করে দিন কাটাতে লাগলেন। আলাওলের লেখা রচনার কাব্যমূল অকিঞ্চিৎকর, গল্পের বাঁধুনিও শিথিল। যাই হোক সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দু কবিরা যখন দেবদেবীর কথা নিয়ে মত্ত তখন আরাকানবাসী মুসলমান কবি নরনারীর বিরহ মিলন অবলম্বনে যে-রোমান্টিক কাব্য রচনা করেছিলেন তার ঐতিহাসিক মূল্য সামান্য নয়।

সৈয়দ আলাওল ঃ

কবি আলাওল কেবল আরাকানের শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন মধ্যযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি। আলাওল নানা বিষয়ে কাব্য রচনা করলেও তাঁর প্রধান গ্রন্থ 'পদ্মাবতী'। 'পদ্মাবতী' অনুবাদ কাব্য হলেও গ্রন্থের মধ্যে কবির রসজ্ঞতা ও উদার দৃষ্টির যে-পরিচয় পাওয়া যায় তা সত্যিই খুব প্রশংসনীয়।

'সেকেন্দারনামা' এবং 'সয়ফুলমুলুকে' কবির যে বিস্তারিত আত্মপরিচয় আছে তা থেকে জানা যায়, ফতেয়াবাদের শাসনকর্তা মজলিস কুতুবের আমাত্য পুত্র সৈয়দ আলাওল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে জন্মগ্রহণ করেন। কবির জীবন ছিল বৈচিত্র্যময়। প্রথম জীবনে কবি সেনাবাহিনীতে চাকরী করেন, পরে আরাকানের অভিজাত হিন্দু-মুসলমান সমাজ তাঁর কবিত্ব গুণে আকৃষ্ট হয় এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকতায় তিনি আরবী, ফারসী ও হিন্দী কাব্য অবলম্বনে বাংলা কাব্য রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। কিছুদিন আলাওলকে কারাবাস করতে হয়, কিন্তু রাজকর্মচারীদের সহায়তায় তিনি পুনরায় পূর্বমর্যাদা ফিরে পান। আরাকানের প্রধানমন্ত্রী মাগনঠাকুর ছিলেন তাঁর বিশেষ গুণগ্রাহী এবং পৃষ্ঠপোষক। কবির চরিত্র ও প্রতিভায় আকৃষ্ট হয়ে মাগনঠাকুর তাঁকে কাব্য রচনায় উৎসাহ দেন। মূল আরবী ও ফারসী ভাষা থেকে কিছু ইসলামী কাহিনী ও ধর্মতত্ত্ব অনুবাদ করে তিনি মুসলমান সমাজের খ্যাতি লাভ করেন।

বাংলা সাহিত্যে আলাওল স্মরণীয় তাঁর 'পদ্মাবতী' কাব্যের জন্য। 'পদ্মাবতী' তাঁর মৌলিক রচনা নয়, হিন্দী কবি মুহম্মদ জায়সীর 'পদুমাবত' অবলম্বনে তিনি আনুমানিক ১৬৫২ খ্রীঃ রচনা করেন 'পদ্মাবতী' কাব্য। 'পদ্মাবতী' কাব্যের কাহিনী হল নিম্নরূপ :

চিতোররাজ রত্নসেন শুকমুখে সিংহল রাজকুমারী পদ্মাবতীর রূপ-লাবণ্যের খ্যাতির কথা শুনে সিংহল যাত্রা করেন এবং নানা বিপদ-আপদ অতিক্রম করে পদ্মাবতীকে বিয়ে করেন। পদ্মাবতীকে বিয়ে করে তিনি পূর্ব স্ত্রী নাগমতীকে ভুলে যান, কিন্তু এক পাখির মুখে নাগমতীর দুঃখের কথা শুনে পদ্মাবতীকে সঙ্গে করে দেশে ফেরেন। এক সময় রত্নসেন এক ব্রাহ্মণকে তাঁর রাজ্য থেকে নির্বাসন দণ্ড দেন। সেই ব্রাহ্মণ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য দিল্লীতে গিয়ে সুলতান আলাউদ্দিনকে পদ্মাবতীর রূপলাবণ্যের কথা জানায়। সুলতান তখন দূত মারফৎ রত্নসেনের কাছে পদ্মাবতীকে চেয়ে পাঠান। রত্নসেন ঘৃণার সঙ্গে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে দিল্লীর সুলতানের সঙ্গে চিতোরের দ্বাদশবর্ষ ধরে যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে রত্নসেন পরাজিত হলে তাঁকে দিল্লীতে এনে কারাগারে বন্দী করা হয়। কিন্তু গোরা ও বদিলা (বাদল) নামে দুজন অনুচরের সাহায্যে রত্নসেন কারাগার থেকে মুক্ত হন। মুক্তি পেয়ে রত্নসেন নিজের রাজ্যে ফিরে আসেন এবং পদ্মাবতীসহ কিছুদিন সুখে শান্তিতে বসবাস করেন।

এর পর দেওপাল রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে রত্নসেন আহত হন এবং কিছু দিন পরে তাঁর মৃত্যু হয়। রত্নসেনের মৃত্যুতে নাগমতী ও পদ্মাবতী সহমরণে যান। এমন সময় আলাউদ্দীন চিতোরে আসেন কিন্তু পদ্মাবতীর চিতার প্রতি নমস্কার করে ক্ষুণ্ণ মনে দিল্লীতে ফিরে যান। এই হল আলাওলের 'পদ্মাবতী' কাব্যের কাহিনী।

'পদ্মাবতী' কাব্যে আলাওল কাহিনী ও চরিত্রের দিক থেকে জায়সীর 'পদুমাবত' কাব্যকেই অনুসরণ করেছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের সমাজ জীবন ও পরিবেশের প্রভাব পড়েছিল বলে বাংলার হিন্দু-মুসলমান সমাজে দীর্ঘকাল এই কাব্যের জন-প্রিয়তা অক্ষুণ্ণ ছিল। অনুবাদ কর্মে আলাওলের কৃতিত্ব যতই ব্যাপক হোক না কেন দৌলত কাজীর মত তাঁর প্রতিভা গভীর ছিল না। রচনাশক্তির বিচারে 'লোরচন্দ্রানী'র কবি দৌলত কাজী 'পদ্মাবতী'র কবি আলাওলের চেয়ে অধিক কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন।

'পদ্মাবতী'র পর আলাওল তাঁর পৃষ্ঠপোষক মাগনঠাকুরের অনুরোধে রচনা করেন 'সয়ফুলমুলুক বাদিওজ্জমাল' (১৬৮৪-৮৫)। 'সইফ্ উল্ মুল্ক' কাব্য একটি প্রেমিক-প্রেমিকার উপাখ্যান। কাব্যটি ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ। আলাওলের চতুর্থ কাব্য 'হপ্তপয়কর' ফারসী গ্রন্থের অনুবাদ। এই কাব্যে সাজাহান পুত্র সুজার উল্লেখ আছে। আলাওলের শেষ রচনা 'দারা সেকেন্দরনামা' মূল ফারসী কাব্য 'ইস্কান্দরনামা'র অনুবাদ। আলেকজাণ্ডারের দিগ্‌বিজয়কে কেন্দ্র করে যে-সব লৌকিক কাহিনী প্রচলিত ছিল তারই কিছু কাহিনী এই কাব্যের উপজীব্য।

আলাওল কেবল কবি ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ঈশ্বরপ্রেমিক সুফী সাধক। সুফী সাধকের মত তিনি 'পদ্মাবতী' কাব্যে বলেছেন :

"প্রেম বিনে ভাব নাহি ভাব বিনে রস।
ত্রিভুবনে যত দেখ প্রেম হস্তে বশ ॥
যাঁর হৃদে জন্মিলেক প্রেমের অঙ্কুর।
মুক্তিপদ পাইল সে সবার ঠাকুর ॥"

অনুশীলনী

১। আরাকান রাজসভার কবিদের কাব্যকৃতির পরিচয় দিয়ে তাঁদের স্বাতন্ত্র্য উল্লেখ কর এবং এই রাজসভার শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দাও।

২। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মুসলমান কবিদের অবদান সম্পর্কে আলোচনা কর।

৩। দৌলত কাজী এবং তাঁর রচিত কাব্য সম্পর্কে যা জান লেখ।

৪। সৈয়দ আলাওল কে ছিলেন? তাঁর জীবন- ও কাব্য-সম্পর্কে যা জান লেখ।

৫। 'কেউ কেউ মনে করেন যে, আরাকানের মুসলমান কবিগণ মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে গতানুগতিকতা ভঙ্গ করেছেন'—এ কথার তৎপর্য কী?

৬। দৌলত কাজীর 'লোরচন্দ্রানী'র কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর। মধ্যযুগে মুসলমান কবিদের মধ্যে তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কেন বলা হয়?

৭। সৈয়দ আলাওল মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কেন খ্যাতি লাভ করেছিলেন? তাঁর জীবন সম্বন্ধে কী জান?

৮। 'পদ্মাবতী' কাব্যটি কার রচনা? এই কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত কর এবং কাব্যের উৎস উল্লেখ কর।

৯। টীকা লেখ : পদ্মাবতী, আলাওল, দৌলত কাজী, 'লোরচন্দ্রানী', আরাকান রাজসভা।

দ্বাদশ অধ্যায়

ভারতচন্দ্র ও অন্নদামঙ্গল

অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি ভারতচন্দ্র ছিলেন মঙ্গলকাব্যের ঐশ্বর্য যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁর সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় প্রাচীন কবিদের সঙ্গে ভারতচন্দ্রের জীবন-কাহিনী সংকলিত করে প্রকাশ করেন। ঈশ্বর গুপ্ত প্রদত্ত বিবরণীর উপর নির্ভর করেই পরবর্তী কালে ভারতচন্দ্রের জীবন-কথা লেখা হয়েছে।

পণ্ডিতগণ অনুমান করেন ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতচন্দ্র হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরশুট পরগণার পেঁড়ো বা রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্র পেঁড়ো অধিকার করলে ভারতচন্দ্রের পিতা নরেন্দ্র রায় হৃতসর্বস্ব হয়ে পড়েন। ভারতচন্দ্র তখন মাতুলালয়ে (নওয়াপাড়ায়) চলে যান। সেখানে সংস্কৃত টোলে ব্যাকরণ ও অভিধান পাঠ করে সংস্কৃতে দক্ষ হয়ে ওঠেন। পরে তিনি ফারসী ভাষা শিক্ষা করেন। মাত্র চৌদ্দ বছর বয়সে ভারতচন্দ্র এক বালিকাকে বিয়ে করেন। একসময় অগ্রজদের অনুরোধে বর্ধমানরাজের কাছে কিছু আর্জি নিয়ে গিয়ে রাজার বিরাগভাজন ও কারারুদ্ধ হন। পরে কারাগার থেকে পালিয়ে সন্ন্যাসীর বেশে তিনি পুরীধামে উপস্থিত হন। সেখান থেকে বৈষ্ণবদের দলে মিশে বঙ্গদেশে ফিরে আসেন এবং আত্মীয়গণের অনুরোধে পুনরায় গৃহবাসী হন।

গুণগ্রাহী মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর কবিপ্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে সভাকবির পদে বরণ করেন এবং বসবাসের জন্য মূলাজোড় গ্রামখানি দান করেন। পণ্ডিতগণ অনুমান করেন মাত্র ৪৮ বছর বয়সে ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে ভারতচন্দ্রের মৃত্যু হয়।

কিশোর বয়সেই ভারতচন্দ্র দুটি সত্যপীরের পাঁচালী রচনা করেন। পাঁচালী ছাড়াও কয়েকটি বাংলা কবিতা ও হিন্দী ফারসী মিশ্রিত ভাষায় ছোট ছোট কবিতা রচনা করেন। কিন্তু ভারতচন্দ্রের খ্যাতি তাঁর 'অন্নদামঙ্গলে'র জন্য। এই 'অন্নদা-মঙ্গল' কাব্য তিনটি খণ্ডে সম্পূর্ণ। এই তিনটি খণ্ড প্রকৃতপক্ষে তিনটি স্বতন্ত্র কাব্য। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের অনুকরণে ভারতচন্দ্র তাঁর 'অন্নদামঙ্গলে'র প্রথম খণ্ড রচনা করেন। প্রথম খণ্ডই অন্নদা বা 'অন্নপূর্ণামঙ্গল'। দ্বিতীয় খণ্ডের নাম 'কালিকামঙ্গল', এতে বিদ্যাসুন্দরের কাহিনী আছে। তৃতীয় খণ্ডে মানসিংহের বাংলা আক্রমণ ও তাঁর সঙ্গে প্রতাপাদিত্যের যুদ্ধের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রথম খণ্ডই 'অন্নদামঙ্গল' নামে খ্যাত। চণ্ডীমঙ্গলের পৌরাণিক অংশের সঙ্গে 'অন্নদামঙ্গলে'র মিল আছে, কিন্তু এই দুই কাব্যের লৌকিক অংশের মধ্যে পার্থক্য আছে।

'অন্নদামঙ্গলে'র প্রথমে আলিবর্দি-কর্তৃক কৃষ্ণচন্দ্রকে কারাগারে নিক্ষেপ এবং অন্নপূর্ণা পূজা করে কৃষ্ণচন্দ্রের বিপদ থেকে উদ্ধারের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এখানেই কিছু কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে।

ভারতচন্দ্রের উপর সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব ছিল বলেই মুকুন্দরামের চণ্ডী শুভ-ঙ্করী হয়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদায় পরিণত হয়েছে। সংস্কৃত পুরাণের অনুসরণে সতীর দেহত্যাগ, হিমালয় গৃহে তাঁর উমারূপে জন্ম এবং শিবের সঙ্গে উমার বিবাহের পর কাশীধামে অন্নপূর্ণার প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি বর্ণিত হয়েছে। কাশীধামে দেবীর মহিমা প্রতিষ্ঠিত হলে মর্ত্যের নানা স্থানে অন্নপূর্ণা পূজার ব্যবস্থা করা হয়।

'অন্নদামঙ্গলে'র লৌকিক অংশে বর্ণিত হয়েছে হরিহোড়ের প্রতি চণ্ডীর দয়া, পরে তাকে পরিত্যাগ এবং কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের ভবনে দেবীর যাত্রা। এই লৌকিক অংশের কাহিনী ভারতচন্দ্রের মৌলিক রচনা হলেও চরিত্র সৃষ্টিতে কবি বিশেষ সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। চরিত্র পরিকল্পনায় কোন মহৎ আদর্শ সৃষ্টি করতে না পারলেও ভারতচন্দ্র তাঁর কাব্যের দেবতাকেও মানুষ করে তুলেছেন। এখানেই তাঁর সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব।

ভারতচন্দ্রের অসাধারণ পাণ্ডিত্য তাঁর কবিপ্রতিভার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল বলেই গতানুগতিক বিষয় অবলম্বনে রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য বাংলা সাহিত্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। মুখ্য চরিত্র সৃষ্টিতে কবি দক্ষতার পরিচয় দিতে না পারলেও কয়েকটি গৌণ চরিত্র আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। তাদের মধ্যে ঈশ্বর পাটনীর চরিত্র অন্যতম। এই ঈশ্বর পাটনী স্বয়ং দেবী অন্নপূর্ণাকে পেয়ে বলে—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে"।

সহজ সরল কথায় মনের গভীর ভাব প্রকাশে ভারতচন্দ্রের তুলনা নেই। 'অন্নদা-মঙ্গল' থেকে দু-একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া হল—"নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়?" "বাঘের বিক্রম সম মাঘের শিশির", "মাতঙ্গ পড়িলে গড়ে পতঙ্গ প্রহার করে", "মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন"।

এগুলিই তাঁর কাব্যের লোকপ্রিয়তার পরিচয়। সংস্কৃত, ফারসী প্রভৃতি ভাষার সাহায্যে তিনি বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি করেছেন বলে ভারত-চন্দ্রের ভাষা কোথাও জড়তায় ভারাক্রান্ত নয়। তিনিই প্রথম বাংলা ভাষার গ্রাম্যতা মুক্ত করে তাকে উচ্চ সাহিত্যিক ভাষার মর্যাদা দান করেছেন। তাই বলা হয় ভারতচন্দ্রই বাংলা ভাষার প্রথম সচেতন শব্দশিল্পী।

অনুশীলনী

১। কবি ভারতচন্দ্রের জীবন এবং কবিপ্রতিভা সম্পর্কে আলোচনা কর।

২। 'অন্নদামঙ্গলে'র কাহিনী সংক্ষেপে আলোচনা করে অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গদেশের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা কর।

৩। 'কোন কোন সমালোচক মনে করেন ভারতচন্দ্রের আসাধারণ রচনা-কৌশল থাকা সত্ত্বেও চরিত্রাঙ্কনে তিনি বিশেষ মৌলিকতা দেখাতে পারেন নি'—আলোচনা কর।

৪। টীকা লেখ: অন্নদামঙ্গল, ভারতচন্দ্র, রায়গুণাকর।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সামাজিক পটভূমিতে শাক্তপদাবলী

[রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বাংলার রাজনৈতিক জীবনে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হল বঙ্গদেশে মুর্শিদকুলি খাঁর স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। তাঁর প্রবর্তিত রাজস্ব ব্যবস্থা জমিদার ও প্রজার অর্থনৈতিক জীবনে এনেছিল বিরাট পরিবর্তন। নানা কারণেই দেবানুকূল্য প্রভাবিত জীবনবাদের মধ্যে দেখা গেল ইহমুখীনতা। ডিহিদারের অত্যাচারে চণ্ডীমঙ্গলের কবি মুকুন্দরাম দেবী চণ্ডিকার চরণে আশ্রয় নিয়েছেন। বৈষয়িক অশান্তি দেবানুগ্রহের প্রলেপে সেদিন দূর হয়েছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে এই বিশ্বাসের গায়ে ফাটল ধরেছে। এসেছে অবিশ্বাস আর সন্দেহ।

রাজধানী দিল্লী থেকে এসেছে মুর্শিদাবাদে, ফলে রাজনীতি সম্বন্ধে নৈকট্যজাত আগ্রহ জেগেছে বাঙালীর মনে। বাঙালী চোখের সামনে প্রত্যক্ষ করল পরিবর্তিত ইতিহাসের স্রোত-ধারাকে। আলীবর্দির রাজনৈতিক সমস্যা বর্গীর হাঙ্গামার সঙ্গে যুক্ত হয়ে বাঙালীর জীবনে সৃষ্টি করল এক দুঃস্বপ্নের অমারাত্রি।

এযুগের দেশনেতা বা প্রধান ব্যক্তিরা চেয়েছিলেন সনাতন প্রথার নবসংস্কার। কিন্তু তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ঘটল রাজনীতিক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন। এই রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ধনকুবের কিছু বণিকের অবদান সম্পূর্ণই আধুনিক ব্যাপার। হয়তো বঙ্গদেশে বর্গীদের ক্রমবর্ধমান দাবী মেটাতে গিয়ে এইসব বণিক বংশের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার স্বীকৃতি। তাই দেখা গেল পলাশির প্রাঙ্গণে যে সূর্য অস্ত গেছে তা বাংলার মধ্যযুগের শেষ সূর্য। পরদিন প্রভাতে যে সূর্যের উদয় হয়েছে তা আধুনিকতার প্রথম সূর্য।

এরপর ইংরেজ দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ না করে রাজস্বের অধিকার দাবী করছে। বাংলার সাধারণ মানুষ পলাশীর যুদ্ধের মাত্র তের বছর পরেই ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে এই শাসন দায়িত্বহীন, শোষণসর্বস্ব রাষ্ট্রব্যবস্থার মৃত্যুযন্ত্রণা মর্মে মর্মে অনুভব করেছে। এই সময় কিছু কিছু ক্ষেত্রে শৃঙ্খলা স্থাপন ও প্রশাসনিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হয়। ইংরেজদের অবাধ ও প্রতিযোগিতাহীন বাণিজ্যনীতির ফলে বাংলার প্রাচীন বাণিজ্যের ধ্বংস হয়। আবার কোন কোন পরিবার বেনিয়া বৃত্তি অবলম্বনে নিজের সৌভাগ্য সৌধের ভিত্তি স্থাপন করে ও নব আভিজাত্য-সংস্কৃতির বীজ বপন করে। বিদেশী বাণিজ্যের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে বাঙালীর মন দেশের গণ্ডী অতিক্রম করে বহু দূরে প্রসারিত হয়। জমি-স্বত্ব আইন পরিবর্তনের ফলে বাঙ্গালীর বৈষয়িক বুদ্ধি প্রখরতর হয়ে ওঠে।

মুসলমান আমলের চাকচিক্যময় বিলাসী সমাজ ও সভ্যতার পতনের শেষ দীপ্তি সমাজের উপর পড়ে শেষবারের মত জ্বলে উঠেছিল। অন্যদিকে ইংরেজ বণিকের

অনুগ্রহপুষ্ট হয়ে দেশে এক নতুন অভিজাত ধনী-সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। ভাঙনের মুখে সমাজের কোন শাসন ছিল না, চারদিকেই অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতা রাজত্ব করে চলেছে। একদিকে হঠাৎ রাজার রাজত্বে অফুরন্ত বৈভব অন্যদিকে অসহনীয় দারিদ্র্য সমাজে ধনী-দরিদ্র শ্রেণীর বিভেদকে আরও স্পষ্ট করে তুলেছিল। দারিদ্র্য এত অসহনীয় বলেই ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটনী দেবী অন্নপূর্ণার সাক্ষাৎ পেয়ে অন্য কিছুই না চেয়ে বলেছে : "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।"

এই সামাজিক পটভূমিতে রচিত হয়েছে শাক্তপদাবলী। শাক্তপদাবলীর কবিরা অনেকেই রাজা, জমিদার বা রাজকর্মচারী ছিলেন। তাঁরা ধনদৌলতের অনিত্যতা, সংসারের ক্রূর বঞ্চনা প্রভৃতি ভাব ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে অনুভব করে এই মায়ার ফাঁদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মায়ের কাছে কাতর আবেদন জানিয়েছেন। মনে হয় শাক্ত কবিদের এই বাস্তব চেতনার একটি কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক এবং রাজনৈতিক দুঃখ লাঞ্ছনা। মুসলমান শাসনের অবসান এবং ইংরেজ রাজত্বের প্রথম পর্বে সর্বস্তরের মানুষকে সেই বিশৃঙ্খলার শিকার হতে হয়েছিল। এই যুগের অশান্তি, অনিশ্চয়তার বাস্তব ছবি কবিরা শাক্তপদাবলীতে তুলে ধরেছেন বলেই এই পদাবলী অধিক চিত্তাকর্ষী হয়েছে। যে সামাজিক পরিবেশে বালিকা কন্যাকে স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে বঙ্গজননী অশান্তি আর আশঙ্কায় প্রহর গুণতেন, সেই পরিবেশ এবং জননী হৃদয়ের বাস্তব দুঃখ 'আগমনী বিজয়ার' মধ্যে সজীব হয়ে উঠেছে। তাই এই সব পদের মধ্যে একটা সমগ্র দেশ ও কালের ছবি খুঁজে পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙালীর উল্লেখযোগ্য সাহিত্য কর্ম হল শাক্তপদাবলী। শাক্তপদাবলীর উৎপত্তি এবং বিকাশের কাল অষ্টাদশ শতাব্দী হলেও বহুকাল ধরে বাঙ্গালীর রক্তধারায় শাক্তভাব প্রবাহিত হয়ে এসেছে। ঋগ্‌বেদের সূক্তে সর্বশক্তিময়ী আদ্যাশক্তির উল্লেখ আছে। পরবর্তী কালে এই আদ্যাশক্তি চণ্ডিকা নাম নিয়ে উমা বা পার্বতীর সঙ্গে মিশে গেছেন। বিভিন্ন পুরাণে এই দেবীর কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। মঙ্গলকাব্যে এই দেবীর কাছেই ভক্তগণ ধন-জন এবং নিরাপত্তা চেয়েছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শাক্তদেবী উমা বা পার্বতীকে নিয়ে এক নতুন সাহিত্য ধারার জন্ম হয়। এই ধারার নাম শাক্তপদাবলী। এই পদাবলী একদিকে রোম্যান্টিক কবিতা, গান এবং সাধনার মন্ত্র। তাই শাক্তপদাবলীর কবিরা ছিলেন একদিকে কবি এবং সাধক।

শাক্তপদাবলী উমার বাল্যলীলা এবং হরপার্বতীর কাহিনী নিয়ে রচিত। এই পদাবলীর সর্বশ্রেষ্ঠ অংশের নাম 'আগমনী' ও 'বিজয়া'। এই সব গানে বাঙালী মায়ের প্রবাসী মেয়ের জন্য আকুল কামনা ব্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ মা মেনকার স্নেহ ব্যাকুলতার মাধ্যমে বঙ্গদেশের অসংখ্য জননীর স্নেহ ব্যাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে।

রামপ্রসাদ সেন :

হালিসহরের অন্তর্গত কুমারহট্ট গ্রামে এক বৈদ্যবংশে রামপ্রসাদ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল রামরাম সেন। কবির আবির্ভাব কাল সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের অনুমান রামপ্রসাদ ১৭১৮-১৭২৩ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। সিদ্ধিলাভের জন্য কবি নিজের গ্রামে সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। শোনা যায় তাঁর ভক্তিতে এবং সাধনায় তুষ্ট হয়ে দেবী কালিকা তাঁর কন্যার রূপ ধরে ঘরের বেড়া বেঁধে দিয়েছিলেন। কবির সাধনা এবং কবিত্ব সম্বন্ধে বহু কাহিনী প্রচলিত আছে। কবি কোন জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করার সময় হিসাবের খাতায় শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে ধরা পড়েন। সেই শ্যামা-বিষয়ক সঙ্গীত পড়ে জমিদার তিরিশ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করে কবিকে গৃহে পাঠিয়ে দেন।

রামপ্রসাদ সেন শ্যামাসঙ্গীত ছাড়াও 'কালিকামঙ্গল' বা 'বিদ্যাসুন্দর কাব্য'ও রচনা করেন। যুগের প্রয়োজনেই সাধক কবিকেও নিতান্ত নিম্নরুচির আদি রসাত্মক কাহিনী কাব্য রচনা করতে হয়েছে। 'কালিকামঙ্গল' রচনা করলেও রামপ্রসাদের খ্যাতি মূলত তাঁর রচিত শ্যামাসঙ্গীতের জন্য। শ্যামাসঙ্গীত রচনা করে রামপ্রসাদ সেই সঙ্গীতে সহজ সাদামাটা সুর দিতেন। এই সুর 'প্রসাদী সুর' নামে পরিচিত। শোনা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদের কণ্ঠে গান শোনার জন্য কবির গ্রামের কাছে কাচারী বাড়িতে এসে থাকতেন।

শাক্তপদাবলীতে দ্বিজরামপ্রসাদ নামে আর একজন কবির সন্ধান পাওয়া যায়। তিনি ছিলেন পূর্ববঙ্গের সাধক কবি এবং রামপ্রসাদ সেনের সমসাময়িক। তিনিও অনেক শ্যামাবিষক পদ রচনা করেছেন।

রামপ্রসাদ সেন 'কালীকীর্তন' এবং 'কৃষ্ণকীর্তন' নামে দুটি ক্ষুদ্র কাব্যও রচনা করেছিলেন। এই কাব্য দুটিতে বিশেষভাবে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব পড়েছে।

রামপ্রসাদের সঙ্গীতের সংখ্যা প্রায় তিনশ। এই সঙ্গীতকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—(১) উমা-বিষয়ক, (২) সাধন-বিষয়ক, (৩) দেবীর স্বরূপ (৪) তত্ত্বদর্শন- ও নীতি-বিষয়ক। এদের মধ্যে আদ্যাশক্তির স্বরূপ এবং সেই শক্তির সঙ্গে কবির বাৎসল্যরসের যে-ছবি অঙ্কিত হয়েছে বাংলা সাহিত্যে তার তুলনা নেই। সাধন-বিষয়ক পদের মধ্যে কবি নানা রূপক-উপমার মাধ্যমে নিজের সাধনার কথা ব্যক্ত করেছেন—

'মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
ওঠা মিঠার লোভে তিত মুখে সারা দিনটা গেল ॥'

সাধক কবির প্রাণের বাণী এমনই সহজ সরল ভাষায় ধরা পড়েছে। সাধক শিল্পীর হাতে আদ্যাশক্তি ঘরের জননী হয়ে উঠেছেন। তত্ত্বসাধনার সঙ্গে বাস্তব জীবনের গভীর যোগ খুব কম কবির কাব্যে বা গানে পাওয়া যায়।

১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে শ্যামাপূজার বিসর্জনের সায়াহ্নে ভাগীরথীর জলে রামপ্রসাদ দেহত্যাগ করেন।

কমলাকান্ত:

রামপ্রসাদ সেনের মত সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিলেন একজন শাক্তপদাবলীর কবি ও সাধক। বর্ধমান জেলার কালনায় কবি জন্মগ্রহণ করেন। কবির প্রতিভায় এবং পাণ্ডিত্য গুণে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানের রাজা তাঁকে সভাপণ্ডিতের পদে বরণ করেন। সেখানেই তিনি সাধন ভজন এবং শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন। কমলাকান্তের জীবনকথাও রামপ্রসাদ সেনের মতই লোকপ্রবাদে পরিণত হয়েছে।

শোনা যায় কালিকা এক বাগ্‌দিনীর বেশে এসে কবিকে মাছ দিয়ে যেতেন। এক সময় একদল দস্যু নাকি কবিকে হত্যা করে সর্বস্ব কেড়ে নেবার পূর্বে তাঁর কণ্ঠের অপূর্ব শ্যামাসঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাঁর চরণে আশ্রয় নেয়।

মৃত্যুর পূর্বেও কবি গঙ্গাতীরে যেতে চান নি। কারণ গঙ্গাদেবী হলেন মা দুর্গার সতীন। কবি বলেছেন—

"কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব?
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শরণ লব?"

কবি প্রথম জীবনে 'সাধকরঞ্জন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সাধন-বিষয়ক গ্রন্থ হলেও এতে অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা আছে। আর আছে কবির সংক্ষিপ্ত আত্ম-পরিচয়। মনে হয় ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় তিনশ শাক্ত পদ পাওয়া গেছে। এই পদের অধিকাংশই 'আগমনী' ও 'বিজয়া'-বিষয়ক সঙ্গীত। রামপ্রসাদের চেয়ে 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র গানে কমলাকান্ত শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

কন্যা উমার জন্য জননী মা মেনকার বেদনা—আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। রাত্রে তিনি কন্যা উমাকে স্বপ্ন দেখে গিরিরাজকে বলেন:

"আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ অচেতন কত না ঘুমাও হে॥
এই এখনই শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথায় গেল
হে, আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে॥"

গিরিরাজ কৈলাশে গিয়ে মেয়েকে এনে মা মেনকার কোলে অর্পণ করেন:

'গিরিরাণী' এই নাও তোমার উমারে
ধর ধর হরের জীবন ধন।"

কিন্তু উমাকে কদিনই বা ধরে রাখা যায়? নবমীর রাত শেষ হলেই আসেন ভোলানাথ উমাকে নিয়ে যান কৈলাশে। তাই বেদনা-দীর্ণ জননী-হৃদয় বলে ওঠে,

"ওরে নবমী নিশি না হওরে অবসান।" এই সব গান শাক্ত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

রামপ্রসাদের মত কমলাকান্তের পদাবলীর ভাষা নিরাভরণ নয়। মনে হয় পদসংকলনের সময় সম্পাদকের পরিমার্জন গুণে তাঁর কাব্যের ভাষা নিখুঁত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভাষা যাই হোক কমলাকান্তের পদের লিরিক বৈশিষ্ট্যটি সহজেই চোখে পড়ে। তাই গাওয়া না হলেও কাব্য হিসাবেও তাঁর পদাবলীর একটা আলাদা মূল্য আছে।

অনুশীলনী

১। শাক্তপদাবলী কি? এই পদের উদ্ভব এবং বিকাশ সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। শাক্তপদাবলীর দুজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার জীবনী ও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর। এই পদের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

৩। রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। টীকা লেখ: আগমনী, বিজয়া, রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত, মেনকা, উমা, বিদ্যাসুন্দর।

১৭৮১ খ্রীস্টাব্দে শ্যামাপূজার বিসর্জনের সায়াহ্নে ভাগীরথীর জলে রামপ্রসাদ দেহত্যাগ করেন।

কমলাকান্ত ঃ

রামপ্রসাদ সেনের মত সাধক কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়) ছিলেন একজন শাক্তপদাবলীর কবি ও সাধক। বর্ধমান জেলার কালনায় কবি জন্মগ্রহণ করেন। কবির প্রতিভায় এবং পাণ্ডিত্য গুণে মুগ্ধ হয়ে বর্ধমানের রাজা তাঁকে সভাপণ্ডিতের পদে বরণ করেন। সেখানেই তিনি সাধন ভজন এবং শ্যামাসঙ্গীত রচনা করেন। কমলাকান্তের জীবনকথাও রামপ্রসাদ সেনের মতই লোকপ্রবাদে পরিণত হয়েছে।

শোনা যায় কালিকা এক বাগ্‌দিনীর বেশে এসে কবিকে মাছ দিয়ে যেতেন। এক সময় একদল দস্যু নাকি কবিকে হত্যা করে সর্বস্ব কেড়ে নেবার পূর্বে তাঁর কণ্ঠের অপূর্ব শ্যামাসঙ্গীত শুনে মুগ্ধ হয়ে পড়ে এবং তাঁর চরণে আশ্রয় নেয়।

মৃত্যুর পূর্বেও কবি গঙ্গাতীরে যেতে চান নি। কারণ গঙ্গাদেবী হলেন মা দুর্গার সতীন। কবি বলেছেন—

"কি গরজ, কেন গঙ্গাতীরে যাব ?
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শরণ লব ?"

কবি প্রথম জীবনে 'সাধকরঞ্জন' নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। সাধন-বিষয়ক গ্রন্থ হলেও এতে অনেক শ্রেষ্ঠ কবিতা আছে। আর আছে কবির সংক্ষিপ্ত আত্ম-পরিচয়। মনে হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে পঞ্চাশ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়।

কমলাকান্তের ভণিতায় প্রায় তিনশ শাক্ত পদ পাওয়া গেছে। এই পদের অধিকাংশই 'আগমনী' ও 'বিজয়া'-বিষয়ক সঙ্গীত। রামপ্রসাদের চেয়ে 'আগমনী' ও 'বিজয়া'র গানে কমলাকান্ত শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই।

কন্যা উমার জন্য জননী মা মেনকার বেদনা—আশা-আকাঙ্ক্ষার অন্ত নেই। রাত্রে তিনি কন্যা উমাকে স্বপ্ন দেখে গিরিরাজকে বলেন :

"আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
গিরিরাজ অচেতন কত না ঘুমাও হে ॥
এই এখনই শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথায় গেল
হে, আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে ॥"

গিরিরাজ কৈলাশে গিয়ে মেয়েকে এনে মা মেনকার কোলে অর্পণ করেন :

'গিরিরাণী' এই নাও তোমার উমারে
ধর ধর হরের জীবন ধন।"

কিন্তু উমাকে কদিনই বা ধরে রাখা যায় ? নবমীর রাত শেষ হলেই আসেন ভোলানাথ উমাকে নিয়ে যান কৈলাশে। তাই বেদনা-দীর্ণ জননী-হৃদয় বলে ওঠে,

"ওরে নবমী নিশি না হওরে অবসান।" এই সব গান শাক্ত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ।

রামপ্রসাদের মত কমলাকান্তের পদাবলীর ভাষা নিরাভরণ নয়। মনে হয় পদসংকলনের সময় সম্পাদকের পরিমার্জন গুণে তাঁর কাব্যের ভাষা নিখুঁত এবং পাণ্ডিত্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভাষা যাই হোক কমলাকান্তের পদের লিরিক বৈশিষ্ট্যটি সহজেই চোখে পড়ে। তাই গাওয়া না হলেও কাব্য হিসাবেও তাঁর পদাবলীর একটা আলাদা মূল্য আছে।

অনুশীলনী

১। শাক্তপদাবলী কি? এই পদের উদ্ভব এবং বিকাশ সম্পর্কে যা জান লেখ।

২। শাক্তপদাবলীর দুজন শ্রেষ্ঠ পদকর্তার জীবনী ও সাহিত্যকৃতি সম্পর্কে আলোচনা কর। এই পদের শ্রেষ্ঠ কবি কে?

৩। রামপ্রসাদ এবং কমলাকান্ত ভট্টাচার্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

৪। টীকা লেখ: আগমনী, বিজয়া, রামপ্রসাদ সেন, কমলাকান্ত, মেনকা, উমা, বিদ্যাসুন্দর।

চতুর্দশ অধ্যায়

বাউল

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাউল নামে পরিচিত একদল রহস্যবাদী সাধক একটি উপসম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। সাধারণত যাঁরা বাহ্যিক ব্যাপারে উদাসীন এবং ঈশ্বরপ্রেমে পাগল তাঁদের বলা হয় বাউল। 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বাউল কথার উল্লেখ আছে। আলোচ্য গ্রন্থে জানা যায় শ্রীচৈতন্যদেব নিজেকে বাউল বলেছেন। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব সহজিয়াগণ বাউল সম্প্রদায়কে তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত করেন এবং বাউল নামে পরিচিত হন। আবার যে-সব মুসলমান সুফী সাধক ইসলামের বাঁধাধরা নিয়ম মানতেন না, তারাও বাউল সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বাউলদের কোন সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নেই বলে মুসলমান সাধক সহজেই এই মত গ্রহণ করেছেন।

বাউল কেবল গানের জন্য গান রচনা করে নি; বাউল গান তাদের সাধনার অঙ্গ। বাউল মনে করে প্রত্যেক মানুষের অন্তরেই আছেন 'মনের মানুষ'। এই মনের মানুষকে উপলব্ধি ও আবিষ্কার করলেই মানুষের মোহমুক্তি ঘটে, মানুষ মুক্তিলাভ করে। তাই মন্দির বা মসজিদে পূজার্চনা নয়, গানে গানে বাউল এই মনের মানুষের সন্ধান করে। বাউল বলে—

> 'তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজিদে।
> তোমার ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
> রুইখা দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে ॥'

এই সাঁই হলেন স্বামী বা ভগবান, তাঁকে উপলব্ধি করলে সীমাবদ্ধ সত্তার বিনাশ এবং অসীমের সঙ্গ লাভ করা যায়।

লালন ফকির ঃ

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে এক দল রহস্যবাদী সাধক বাউল নামে পরিচিত ছিলেন এবং একটি সম্প্রদায় গড়ে তুলেছিলেন। এই সম্প্রদায়ের একজন বিশিষ্ট কবি ও সাধক ছিলেন লালন ফকির।

কবি রবীন্দ্রনাথ লালনের গান শুনে মুগ্ধ হন, এবং তাঁরই চেষ্টায় লালনের গান সঙ্কীর্ণ সীমা ছাড়িয়ে শিক্ষিত সমাজেও সমাদৃত হয়। ১৩২২ সালের প্রবাসীতে কবিগুরু লালনের কুড়িটি গান প্রকাশ করেন।

আনুমানিক ১৭৬৫ খ্রীস্টাব্দে কুষ্টিয়ার ভাঁড়রা গ্রামে এক কায়স্থ বংশে লালনের জন্ম হয়। একবার পুরীধামে যাত্রাকালে লালন বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। সঙ্গীসাথীরা তাঁকে পথেই পরিত্যাগ করে চলে যান। এক নিঃসন্তান মুসলমান ফকির দম্পতী তাঁর সেবা করে সুস্থ করে তোলেন। পরবর্তী কালে এই যবন সংস্পর্শদোষের জন্য লালন তাঁর পিতা, মাতা এবং স্ত্রী-কর্তৃক পরিত্যক্ত হন। তখন লালন ফিরে যান তাঁর জীবনদাতা সিরাজ ফকিরের কাছে, গ্রহণ করেন

বাউল ধর্ম। লালন তাঁর পদের অনেক জায়গায় এই সিরাজ ফকিরকেই 'সিরাজ সাঁই' বলে উল্লেখ করেছেন। শোনা যায় ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দে ১১৬ বছর বয়সে লালনের মৃত্যু হয়।

লালন বাউল ধর্মমতের সাধক হলেও তাঁর গানে হিন্দু, মুসলমান, বৈষ্ণব, সুফী প্রভৃতি বহু ধর্মমতের প্রভাব পড়েছে। তিনি রাধাকৃষ্ণ-বিষয়ক পদ রচনা করেছেন, রচনা করেছেন গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদ—

"আয় দেখে যা নতুন ভাব এনেছে গোরা
মুড়িয়ে মাথা গলে কাঁথা কটিতে কৌপিন ধরা ॥
গোরা হাসে কাঁদে ভাবের অন্ত নাই।
সদা দীন দরদী বলে ছাড়ে হাই ॥"

আবার কখনও বলেছেন—

"ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্য কি পারবি তোরা।
কুলশীল ত্যাগ করিয়ে হতে হবে জ্যান্তে মরা ॥"

কখনও আবার সুফী ভক্তির বশে বলেছেন—

"নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়।
সেই যে আকার কি হল তার কে করে নির্ণয়।"

আমাদের অতিপরিচিত উপমা ও সঙ্কেতের সাহায্যে তিনি বাউল সাধন তত্ত্বকে কাব্যে প্রকাশ করেছেন। কিন্তু এই তত্ত্ব-কথা কোথাও কাব্যসঙ্গীতের সহজ গতিকে রুদ্ধ করে নি। তাঁর গানের সঙ্গে আধুনিক মনের যোগ ছিল বলেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানে মুগ্ধ হয়েছেন।

অনুশীলনী

১। বাউল গান কাকে বলে ? এই সাহিত্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর।

২। লালন ফকিরের জীবন এবং সাহিত্যকৃতির পরিচয় দাও।

৩। টীকা: লালন ফকির, বাউল গান, সিরাজ ফকির।

সংসদের নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫

১। বাঙালী জাতি ও বাংলা ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস সংক্ষেপে বর্ণনা কর।
[পৃঃ ১ দেখ]

২। বাংলা সাহিত্য ক'টি যুগে বিভক্ত? প্রতিটি যুগের কাল সীমা নির্ণয় করে যুগ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা কর।

উঃ। বাংলা সাহিত্য তিনটি যুগে বিভক্ত: ১। প্রাচীন বা আদি যুগ, ২। মধ্যযুগ, ৩। আধুনিক যুগ।

খ্রীস্টীয় দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন বা আদিযুগের কাল সীমা। বাংলা সাহিত্যের এই যুগকে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন 'হিন্দু বৌদ্ধ যুগ' নামে অভিহিত করেছেন। তাঁর মতে আদি যুগে ধর্মকলহের মাধ্যমেই ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু আধুনিক যুগের সমালোচকগণ মনে করেন, প্রাচীন বাংলাদেশে ধর্মমতের বৈচিত্র্য থাকলেও বিরোধ ছিল না। অবশ্য একথা ঠিক আদি যুগের বাংলা সাহিত্য ধর্মাশ্রিত ছিল। সে যুগের বাংলায় মুখ্য আচরিত ধর্ম ছিল হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ ও অন্যান্য তান্ত্রিক ধর্ম। এই সব ধর্মচেতনার অভিব্যক্তি আমাদের সাহিত্যে প্রকট। প্রাচীন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিদর্শন হল চর্যাপদ বা চর্যাপদাবলী। এগুলি বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের লেখা ধর্মাচরণ-বিষয়ক সঙ্গীত।

চতুর্দশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের মধ্য-যুগের কাল সীমা। চতুর্দশ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে মধ্যযুগীয় বাংলার প্রথম পর্যায় নামে অভিহিত করা হয়। খ্রীস্টীয় ষোড়শ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষার অন্ত্য পর্যায় নামে পরিচিত। মধ্যযুগে প্রথম পর্যায়ের অন্তর্গত হল বড়ু চণ্ডীদাদের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাসের বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য ও মঙ্গলকাব্য। এই যুগে অনুবাদের মাধ্যমেও ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। রামায়ণ, ভাগবত এবং মহাভারতের আংশিক অনুবাদ এই যুগের ফসল। এই যুগের সাহিত্যকে কেউ কেউ প্রাক্-চৈতন্য যুগের সাহিত্য বলেছেন। ষোড়শ শতাব্দীকে বলা হয় বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। কেউ কেউ এই যুগকে চৈতন্য চেতনার যুগও বলেছেন। কারণ বাংলা সাহিত্যের সব বিভাগের উপরেই পড়েছে শ্রীচৈতন্যের প্রভাব। রচিত হয়েছে জীবনীকাব্য, গৌরচন্দ্রিকা, চৈতন্য-প্রভাবজাত বৈষ্ণব পদাবলী এবং বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যও অনুবাদ সাহিত্য। এরই পাশে জীবনমুখী সাহিত্য রচনা করেছেন চট্টগ্রামের মুসলমান কবিরা। বৈষ্ণব পদাবলীর অনুকরণে শাক্তপদের জন্ম ও মধ্যযুগের অন্ত্যপর্বের একটি উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা। ভারতচন্দ্রের হাতে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের নবরূপায়ণ ঘটেছে। ধর্ম সঙ্গীতের পাশে শোনা গেছে মানব-সঙ্গীত। এই যুগের আর এক অভিনব সংযোজন বাউল সঙ্গীত।

এর পরবর্তী যুগ অর্থাৎ উনবিংশ শতাব্দী থেকে আরম্ভ হয় আধুনিক কাল।

এই সময় থেকে ইংরেজ আমলের সূচনা। ইংরেজী, ফরাসী, পর্তুগীজ প্রভৃতি ভাষার শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারে স্থান পেয়েছে এবং কেবল কবিতার পরিবর্তে সাহিত্যের বাহন হয়েছে বাংলা গদ্য। বাংলা গদ্যের জন্ম আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সবচেয়ে বড়ো সংবাদ।

৩। বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থের নাম কি। এই গ্রন্থ সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখ। [পৃঃ ৩ দেখ]

৪। চর্যাপদে তৎকালীন বাংলার সমাজ জীবনের যে-পরিচয় পাওয়া যায় তার চিত্র অঙ্কন কর। এই প্রসঙ্গে চর্যার সাহিত্য সম্পদ বিষয়ে আলোচনা কর।
[পৃঃ ৪ দেখ]

৫। বাংলার তুর্কী-বিজয় ও বাংলার সমাজে তুর্কী বিজয়ের ফলশ্রুতি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর। [পৃঃ ৭ দেখ]

৬। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও। বড়ু চণ্ডীদাসের কবি-প্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃঃ ৮ দেখ]

৭। বিদ্যাপতির পদাবলী ও কবিপ্রতিভা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা কর। পরবর্তী কোন্ বাঙালী কবির উপর বিদ্যাপতির বিশেষ প্রভাব পড়েছিল ?
[পৃঃ ১১ দেখ]

৮। চণ্ডীদাসের পদাবলী ও কবিপ্রতিভা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখ। পরবর্তী কোন্ বাঙালী কবির উপর চণ্ডীদাসের বিশেষ প্রভাব পড়েছিল ?
[পৃঃ ১৪ দেখ]

৯। কৃত্তিবাস ওঝার রামায়ণের মৌলিকতা নির্ণয় কর। [পৃঃ ১৯ দেখ]

১০। কৃত্তিবাসী রামায়ণের জনপ্রিয়তার কারণ নির্ণয় করে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ রচনা কর। [পৃঃ ১৯ দেখ]

১১। বাঙালীর জীবনে কৃত্তিবাসী রামায়ণের প্রভাব কতখানি নির্ণয় কর। কৃত্তিবাসী রামায়ণকে বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ বলা কতদূর সঙ্গত দেখাও।
[পৃঃ ১৯ দেখ]

১২। মঙ্গলকাব্য রচনার সামাজিক কারণ নির্ণয় কর। মঙ্গলকাব্যে বর্ণিত তৎকালীন বাংলার সমাজ-জীবনের পরিচয় দাও। [পৃঃ ২৭ দেখ]

১৩। মনসামঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা কর। এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দাও। [পৃঃ ৩১ এবং ৩৪ পৃঃ দেখ]

১৪। বাংলা সাহিত্যের কোন্ যুগকে চৈতন্যযুগ বলা হয় ? বাংলার সমাজ-জীবনে চৈতন্যদেবের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর। [পৃঃ ৩৭-৩৯ দেখ)

১৫। বাংলা সাহিত্যে চৈতন্যদেবের প্রভাব সম্বন্ধে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখ।
[পৃঃ ৩৭ দেখ]

১৬। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের কাহিনীটি সংক্ষেপে বর্ণনা কর। এই কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবির কাব্য প্রতিভার পরিচয় দাও। [পৃঃ ৪১ এবং ৪৭ দেখ]

১৭। বাংলা ভাষায় রচিত প্রধান প্রধান চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থগুলির উল্লেখ কর। কোন্ গ্রন্থকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে কর কারণসহ লেখ। [পৃ: ৫১-৫৭ দেখ]

১৮। কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় দাও। তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পর্কে যা জান লেখ। [পৃ: ৫৫-৫৭ দেখ]

১৯। বাংলার শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনীকারের গ্রন্থ ও কবিপ্রতিভা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখ। [পৃ: ৫৫-৫৭ দেখ]

২০। জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয় কেন সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃ: ৬০-৬১ দেখ]

২১। গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। তাঁকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হয় কেন সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃ: ৬১-৬৩ দেখ]

২২। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ। এ কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দাও। [পৃ: ৬৪ এবং ৬৬ দেখ]

২৩। কাশীরাম দাসের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা নির্ণয় কর। কাশীদাসী মহাভারতকে সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ বলা কতদূর সঙ্গত দেখাও। [পৃ: ৬৮-৬৯ দেখ]

২৪। আরাকান রাজসভার সাহিত্য সাধনা বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা কর। [পৃ: ৭১-৭৪ দেখ]

২৫। দৌলতকাজীর জীবন ও কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা কর। [পৃ: ৭১-৭২ দেখ]

২৬। সৈয়দ আলাওলের জীবন ও কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। [পৃ: ৭২-৭৪ দেখ]

২৭। ভারতচন্দ্রের জীবন ও কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। [পৃ: ৭৫-৭৬ দেখ]

২৮। অন্নদামঙ্গল কাব্যের পরিচয় দাও। এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও কাব্যোৎকর্ষ বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা কর। [পৃ: ৭৫-৭৬ দেখ]

২৯। কোন্ সামাজিক পটভূমিতে শাক্তপদাবলী ও বাউল গীতি রচিত হয়েছিল আলোচনা কর। [পৃ: ৭৭-৭৮ এবং পৃ: ৮২-৮৩ দেখ]

৩০। শাক্তপদাবলীর রচনার সামাজিক কারণ নির্ণয় কর। এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দাও। [পৃ: ৭৭-৭৯ দেখ]

৩১। বাউলগীতির বৈশিষ্ট্য কী? লালন ফকিরের কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। [পৃ: ৮২-৮৩ দেখ]

৩২। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও:

প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্য [নমুনা প্রশ্নের ২নং উত্তর দেখ]; মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য [নমুনা প্রশ্নের ২নং উত্তর দেখ]; আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য [নমুনা প্রশ্নের ২নং উত্তর দেখ]; চর্যাপদ [পৃ: ৩ দেখ]; তুর্কীবিজয় [পৃ: ৭

দেখ]; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন [পৃঃ ৮ দেখ]; বড়ু চণ্ডীদাস [পৃঃ ৮ দেখ]; মালাধর বসু [পৃঃ ২২ দেখ]; গুণরাজ খান [পৃঃ ২২ দেখ]; নারায়ণ দেব [পৃঃ ৩৪ দেখ]; কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ [পৃঃ ৩৫ দেখ]; দ্বিজমাধব [পৃঃ ৪৬ দেখ]; বৃন্দাবন দাস [পৃঃ ৫১ দেখ]; লোচন দাস [পৃঃ ৫৪ দেখ]; জয়ানন্দ [পৃঃ ৫৩ দেখ]; শ্রীচৈতন্যভাগবত [পৃঃ ৫১ দেখ]; বলরাম দাস [পৃঃ ৫৯ দেখ]; দ্বিতীয় বিদ্যাপতি [পৃঃ ৬১ দেখ]; রূপরাম চক্রবর্তী [পৃঃ ৬৬ দেখ]; অন্নদামঙ্গল [পৃঃ ৭৫ দেখ]; লাউসেন [পৃঃ ৬৪ দেখ]; শ্রীধর্মমঙ্গল [পৃঃ ৬৬ দেখ]; কবীন্দ্র পরমেশ্বর [পৃঃ ৬৯ দেখ]; শ্রীকর নন্দী [পৃঃ ৭০ দেখ]; পরাগল মহাভারত [পৃঃ ৭০ দেখ]; লোরচন্দ্রানী [পৃঃ ৭১ দেখ]; সতী ময়না [পৃঃ ৭১ দেখ]; পদ্মাবতী [পৃঃ ৭২ দেখ]; কমলাকান্ত [পৃঃ ৮০ দেখ]; লালন ফকির [পৃঃ ৮২ দেখ]।

১৭। বাংলা ভাষায় রচিত প্রধান প্রধান চৈতন্য-জীবনী গ্রন্থগুলির উল্লেখ কর। কোন্ গ্রন্থকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে কর কারণসহ লেখ। [পৃঃ ৫১-৫৭ দেখ]

১৮। কৃষ্ণদাস কবিরাজের পরিচয় দাও। তাঁর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ সম্পর্কে যা জান লেখ। [পৃঃ ৫৫-৫৭ দেখ]

১৯। বাংলার শ্রেষ্ঠ চৈতন্যজীবনীকারের গ্রন্থ ও কবিপ্রতিভা সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত নিবন্ধ লেখ। [পৃঃ ৫৫-৫৭ দেখ]

২০। জ্ঞানদাসের কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। জ্ঞানদাসকে চণ্ডীদাসের ভাবশিষ্য বলা হয় কেন সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃঃ ৬০-৬১ দেখ]

২১। গোবিন্দদাসের কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। তাঁকে দ্বিতীয় বিদ্যাপতি বলা হয় কেন সংক্ষেপে আলোচনা কর। [পৃঃ ৬১-৬৩ দেখ]

২২। ধর্মমঙ্গল কাব্যের কাহিনী সংক্ষেপে লেখ। এ কাব্যধারার শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দাও। [পৃঃ ৬৪ এবং ৬৬ দেখ]

২৩। কাশীরাম দাসের কবিপ্রতিভার মৌলিকতা নির্ণয় কর। কাশীদাসী মহাভারতকে সংস্কৃত মহাভারতের অনুবাদ বলা কতদূর সঙ্গত দেখাও। [পৃঃ ৬৮-৬৯ দেখ]

২৪। আরাকান রাজসভার সাহিত্য সাধনা বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা কর। [পৃঃ ৭১-৭৪ দেখ]

২৫। দৌলতকাজীর জীবন ও কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়ে একটি নিবন্ধ রচনা কর। [পৃঃ ৭১-৭২ দেখ]

২৬। সৈয়দ আলাওলের জীবন ও কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। [পৃঃ ৭২-৭৪ দেখ]

২৭। ভারতচন্দ্রের জীবন ও কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। [পৃঃ ৭৫-৭৬ দেখ]

২৮। অন্নদামঙ্গল কাব্যের পরিচয় দাও। এ কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও কাব্যোৎকর্ষ বিষয়ে একটি নিবন্ধ রচনা কর। [পৃঃ ৭৫-৭৬ দেখ]

২৯। কোন্ সামাজিক পটভূমিতে শাক্তপদাবলী ও বাউল গীতি রচিত হয়েছিল আলোচনা কর। [পৃঃ ৭৭-৭৮ এবং পৃঃ ৮২-৮৩ দেখ]

৩০। শাক্তপদাবলীর রচনার সামাজিক কারণ নির্ণয় কর। এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবির কাব্যপ্রতিভার পরিচয় দাও। [পৃঃ ৭৭-৭৯ দেখ]

৩১। বাউলগীতির বৈশিষ্ট্য কী? লালন ফকিরের কবিপ্রতিভার পরিচয় দাও। [পৃঃ ৮২-৮৩ দেখ]

৩২। সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও :

প্রাচীন যুগের বাংলা সাহিত্য [নমুনা প্রশ্নের ২নং উত্তর দেখ]; মধ্য যুগের বাংলা সাহিত্য [নমুনা প্রশ্নের ২নং উত্তর দেখ]; আধুনিক যুগের বাংলা সাহিত্য [নমুনা প্রশ্নের ২নং উত্তর দেখ]; চর্যাপদ [পৃঃ ৩ দেখ]; তুর্কীবিজয় [পৃঃ ৭

দেখ]; শ্রীকৃষ্ণকীর্তন [পৃঃ ৮ দেখ]; বড়ু চণ্ডীদাস [পৃঃ ৮ দেখ]; মালাধর বসু [পৃঃ ২২ দেখ]; গুণরাজ খান [পৃঃ ২২ দেখ]; নারায়ণ দেব [পৃঃ ৩৪ দেখ]; কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ [পৃঃ ৩৫ দেখ]; দ্বিজমাধব [পৃঃ ৪৬ দেখ]; বৃন্দাবন দাস [পৃঃ ৫১ দেখ]; লোচন দাস [পৃঃ ৫৪ দেখ]; জয়ানন্দ [পৃঃ ৫৩ দেখ]; শ্রীচৈতন্যভাগবত [পৃঃ ৫১ দেখ]; বলরাম দাস [পৃঃ ৫৯ দেখ]; দ্বিতীয় বিদ্যাপতি [পৃঃ ৬১ দেখ]; রূপরাম চক্রবর্তী [পৃঃ ৬৬ দেখ]; অন্নদামঙ্গল [পৃঃ ৭৫ দেখ]; লাউসেন [পৃঃ ৬৪ দেখ]; শ্রীধর্মমঙ্গল [পৃঃ ৬৬ দেখ]; কবীন্দ্র পরমেশ্বর [পৃঃ ৬৯ দেখ]; শ্রীকর নন্দী [পৃঃ ৭০ দেখ]; পরাগল মহাভারত [পৃঃ ৭০ দেখ]; লোরচন্দ্রানী [পৃঃ ৭১ দেখ]; সতী ময়না [পৃঃ ৭১ দেখ]; পদ্মাবতী [পৃঃ ৭২ দেখ]; কমলাকান্ত [পৃঃ ৮০ দেখ]; লালন ফকির [পৃঃ ৮২ দেখ]।

সহায়ক-পাঠ

শাস্তি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীবনী ঃ বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ কেবল একটি ব্যক্তি নন। তিনি একটি নতুন যুগের প্রতিভূ। তিনি একাধিক যুগ-প্রবাহকে তাঁর ব্যক্তিত্বের অতলে ধারণ ও বহন করে ফিরেছেন, বিপুল রচনাসম্ভারের মধ্যে সেই বিচিত্র যুগ-স্বভাবকে রূপ দিয়েছেন নব নব মূর্তিতে।

১৮৬১ খ্রীস্টাব্দের ২৫-এ বৈশাখ কলকাতার জোড়াসাঁকোয় কবির জন্ম। তাঁর পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। গৃহের শিক্ষা এবং চাকরদের কড়া শাসনে বাল্যজীবন কেটেছে কবির। চাকর-মহলে পাওয়া প্রচলিত বইগুলোই তাঁর সাহিত্যচর্চার প্রথম ধাপ। কৃত্তিবাসী রামায়ণ ছিল তাঁর বাল্যকালের সাথী। প্রথমে ওরিয়েণ্টাল সেমিনারি, পরে নর্মাল স্কুলে কবিকে ভর্তি করা হয়, কিন্তু বাঁধা-ধরা নিয়মের মধ্যে কবির জীবন হাঁপিয়ে উঠত। তিনি স্কুলে যেতে চাইতেন না। পরে তিনি কিছুদিন বেঙ্গল একাডেমিতে পড়াশুনা করেন।

বাল্যকাল থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা লেখার দিকে প্রবণতা দেখা যায়। তের বছর বয়সে মহর্ষিদেবের সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণ করতে গিয়ে মুক্ত প্রকৃতির সঙ্গে কবির পরিচয় হয়। এই প্রকৃতিপ্রেম তাঁর চিরজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল।

১২৮২ সনে কবি লিখলেন 'বনফুল', 'কবিকাহিনী' আর 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী'। এই সময় হিন্দুমেলায় তিনি স্বরচিত কবিতা ও প্রবন্ধ পাঠ করেছেন। তাঁকে ব্যারিস্টারি পড়তে বিলাতে পাঠানো হল কিন্তু পাশ করা তাঁর হল না, দেড় বছর বিলেতে কাটিয়ে তিনি দেশে ফিরলেন। এই সময়কার রচনা, 'ভগ্নহৃদয়', 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র'। বিলেত থেকে ফিরে এসে সব শক্তি সাহিত্যসাধনায় নিয়োগ করলেন। রচিত হল 'বাল্মীকি প্রতিভা', 'কালমৃগয়া', 'সন্ধ্যা-সঙ্গীত', 'প্রভাত-সঙ্গীত'।

তাঁর বিবাহ হয় তেইশ বছর বয়সে। স্ত্রীর নাম মৃণালিনী দেবী। বিবাহের পর কিছুদিনের জন্যে ইউরোপ আর বিলেত ঘুরে এলেন, ঘুরলেন ভারতের নানাস্থানে। দেখলেন—'দেশে দেশে কত না নগর রাজধানী,—কত গিরি কত সিন্ধু মরু'।

জমিদারি সংক্রান্ত কাজে কিছুকাল কবি পদ্মাতীরে বাস করেছিলেন। এটা রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনের স্বর্ণযুগ। 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি', 'বিসর্জন', 'গল্পগুচ্ছ' প্রভৃতি এই মরশুমের সোনার ফসল।

শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রনাথকে চিরকাল আকর্ষণ করত। এখানেই ১৯০১ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে স্থাপিত হল শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম-বিদ্যালয়। এখানে কবি নতুন

শিক্ষাধারার প্রবর্তন করলেন। শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ও বিশ্বভারতী এই বিদ্যালয়ের পরিণত রূপ।

১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে 'গীতাঞ্জলি' কাব্যের জন্যে রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৩৪৮-এর পঁচিশে বৈশাখ কবির জীবদ্দশার শেষ বৈশাখ। তিনি অসুস্থ—চিকিৎসা সত্ত্বেও রোগ-উপশমের চিহ্ন নেই। ডাক্তারদের পরামর্শে তাঁকে শান্তিনিকেতন থেকে আনা হল কলকাতায়; যে-বাড়িতে তিনি জন্মেছিলেন জীবনের শেষ লগ্নে কবি আবার সেখানেই ফিরে এলেন। এখানেই ১৩৪৮ সনের ২২-এ শ্রাবণ বিশ্বকবি বিশ্বের মায়া কাটিয়ে অমরলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

অসংখ্য রচনায় বাংলা সাহিত্যকে তিনি বহুযুগের গতি দান করে গেছেন। তাঁর 'মানসী', 'সোনার তরী', 'গীতাঞ্জলি', 'বলাকা', 'পূরবী', 'মহুয়া', 'পুনশ্চ', 'শ্যামলী', 'প্রান্তিক', 'আকাশপ্রদীপ', 'রোগশয্যায়', 'আরোগ্য', প্রভৃতি কাব্য এবং 'রাজা ও রানী', 'বিসর্জন', 'মালিনী', 'রাজা', 'মুক্তধারা', 'রক্তকরবী', 'চিরকুমার সভা', 'নটীর পূজা', 'শাপমোচন', 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' প্রভৃতি নাটক (গীতি ও নৃত্যনাট্য), রাজর্ষি, চোখের বালি, নৌকাডুবি, গোরা, চতুরঙ্গ, ঘরে বাইরে, যোগাযোগ, শেষের কবিতা ও গল্পগুচ্ছ প্রভৃতি উপন্যাস ও গল্প; পঞ্চভূত, লোকসাহিত্য, সাহিত্য, প্রাচীন সাহিত্য, আধুনিক সাহিত্য, শিক্ষা, ধর্ম, যাত্রী, জাপানযাত্রী, মানুষের ধর্ম, কালান্তর, পথে ও পথের প্রান্তে, বাংলা ভাষা পরিচয়, সভ্যতার সংকট—প্রভৃতি প্রবন্ধ, ভ্রমণ কাহিনী ও সমালোচনামূলক রচনাগুলি বাংলা সাহিত্যের চিরকালের সম্পদ।

এইসব সাহিত্যকৃতি বাদ দিলেও শুধু সঙ্গীতরচনার জন্যেই তিনি অজর অমর হয়ে থাকবেন।

'শাস্তি' গল্পের কাহিনী-সংক্ষেপ: একদিন সকালবেলা দুখিরাম এবং ছিদাম রুই দা হাতে নিয়ে জন খাটতে বেরিয়েছিল। বাড়িতে তখন দুই বউ, রাধা আর চন্দরার মধ্যে তুমুল ঝগড়া শুরু হয়েছে। এই দুই বউয়ের ঝগড়া ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ওদের তীব্রকণ্ঠ শুনেই পাড়ার লোক বলতো "ওইরে, বাধিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যেমনটি আশা করা যায় ঠিক তেমনটি ঘটিয়াছে।"

ব্যাপারটি প্রতিবেশীদের গা-সওয়া হয়ে গেলেও দুখিরাম আর ছিদাম স্ত্রীদের এই ঝগড়া-বিবাদে খুবই কষ্ট পেত, তার কারণ দু'ভাইয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক ছিল নিবিড়।

সময়টা ছিল বর্ষাকাল। বর্ষায় চর ডুবে যাবার আগেই যে যার জমিতে পাকা ধান কাটতে গেছে, কেউ গেছে অন্যের জমিতে পাট কাটতে। কিন্তু দুখিরাম এবং ছিদামকে ধরে নিয়ে যায় জমিদারের পেয়াদা। জমিদারের কাছারি ঘরে চাল ভেদ করে স্থানে স্থানে যে প্লাবন হচ্ছিল তা এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করাই ছিল ধরে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্য।

দু'ভাইকে সারাটা দিন কাছারিঘরে বেগার খাটতে হয়েছে জলে ভিজে রোদে পুড়ে। খাবার জন্যেও বাড়িতে আসতে পায় নি, কাছারি থেকে তাদের সামান্য জলপানের

আয়োজন করা হয়েছিল। সন্ধ্যেবেলায় জলকাদা ভেঙে দু'ভাই ঘরে এল। সারাদিন পেটে বিশেষ কিছুই পড়ে নি। দুখিরাম ঘরে ঢুকেই স্ত্রী রাধাকে বলল 'ভাত দে'।

সারাদিন ঝগড়াঝাটি করে বড় বউ রাধার মেজাজ ভালো ছিল না, সে উত্তর দিল "ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"

রাধার এই শেষ কথার কুৎসিত ইঙ্গিতে দুখিরাম ক্রুদ্ধ বাঘের মতো গর্জন করে উঠে বলে, "কী বললি"। তার পরেই স্ত্রীর মাথায় দায়ের কোপ বসিয়ে দেয়।

রাধা তার ছোটো জায়ের কোলের কাছে ঢলে পড়ে, কিছুক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হয়।

হঠাৎ ঘটে যায় ব্যাপারটা। কী করা যায় বসে ভাবছে ছিদাম, এমন সময় পাড়ার রামলোচন চক্রবর্তী খাজনার তাগাদা দেবার জন্যে কুরিদের বাড়িতে এসে পড়ে।

ছিদাম রামলোচনের কাছে রাধা হত্যার ব্যাপারটা ফাঁস করে দেয়। তবে হত্যা-পরাধ চাপিয়ে দেয় ছোটো বউ চন্দরার কাঁধে। রামলোচন তাকে বুদ্ধি দেয় দুখিরামের কাঁধেই হত্যাপরাধ চাপিয়ে দিলে চন্দরা মুক্তি পাবে। সেই মতো সে যেন থানায় গিয়ে বলে আসে। উত্তরে ছিদাম জানায় "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।"

ছিদাম চন্দরাকে বুঝিয়েছিল, "যাহা বলিতেছি তাই কর্ তোর কোন ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব"। প্রথমটায় চন্দরা এই হত্যার দায় নিজের কাঁধে নিতে রাজি হয় নি, কিন্তু স্বামীর পীড়াপীড়িতে শেষ পর্যন্ত চন্দরা রাজি হয়।

পুলিস এসে চন্দরাকে বেঁধে নিয়ে গেল থানায়। সে দোষ স্বীকার করল নিজের মুখেই। তাকে শেখানো হয় যে বড়ো জা তাকে বঁটি নিয়ে মারতে আসায় সে দা দিয়ে ঠেকাতে যায় ফলে হঠাৎ আঘাত লাগে।

কিন্তু কার্যকালে চন্দরা ছিদামের শেখানো কথা বলল না। সে এমন কথাই বলল যাতে তাকে সম্পূর্ণ অপরাধী বলে মনে হয়। অর্থাৎ বড়ো বউয়ের দিক থেকে কোনো-রকম আক্রমণের কথাই স্বীকার করল না। দারোগা থেকে শুরু করে ডেপুটি ম্যাজি-স্ট্রেট সকলের কাছে চন্দরার সেই এক কথা। ছিদাম নির্দোষ স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে অনেক চেষ্টা করেও ব্যর্থ হল।

রামলোচন চক্রবর্তীও প্রথমটায় চন্দরাকে বাঁচাবার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু যে নিজে বাঁচতে চায় না তাকে বাঁচাবার চেষ্টা করা বৃথা।

ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চন্দরাকে সেশনে চালান দিলেন। সেখানেও জজসাহেবের কাছে চন্দরা নিজের দোষ স্বীকার করল। বড়ো জায়ের দিক থেকে কোনো রকম আক্রমণের কথা বলল না।

একে একে ছিদাম এবং দুখিরাম দুভাই হত্যাপরাধ নিজেদের কাঁধে নেবার চেষ্টা করল কিন্তু তাদের কথা তখন আর কেউ বিশ্বাস করল না।

জজসাহেব চন্দরার ফাঁসির হুকুম দিলেন। ফাঁসির আগে চন্দরাকে প্রশ্ন করা হয়, "কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর" ?

উত্তরে চন্দরা বলে "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

কিন্তু স্বামীকে ডেকে আনার কথা বলায় চন্দরা শেষ কথায় বলে—"মরণ।"

'শাস্তি' সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা

'মাঝে মাঝে গেছি আমি ওপাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।'

'ওপাড়া' অর্থাৎ পল্লীজীবনে প্রবেশের বাধা তো তাঁর ছিলই :

'বাধা হয়ে আছে মোর বেড়াগুলি জীবনযাত্রার।'

কিন্তু ১৯০১ সালে জমিদারি পরিচালনার পূর্ণ দায়িত্ব নিয়ে তাঁকে যখন শিলাইদহ আসতে হল তখন পল্লীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের সুযোগ হল তাঁর। পল্লীর মানুষ আর প্রকৃতি তাঁর মধ্যে এক আশ্চর্য ঐকতানের সৃষ্টি করল। ছিন্নপত্রের ছত্রে ছত্রে এই সুর ধ্বনিত। এই পল্লীসান্নিধ্যেরই প্রত্যক্ষ প্রেরণা তাঁর ছোটোগল্প। পল্লীর সাধারণ মানুষ তাঁর গল্পে আসতে লাগল, সাহিত্যের প্রকৃতিতে উন্মোচিত হল নতুন দিগন্ত।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের রচনাকাল সুদীর্ঘ প্রায় ৬০ বছর। এই ষাট বছরে তাঁর ছোটোগল্পের সংখ্যা ১১৮। এর মধ্যে 'শাস্তি' গল্পটি একেবারেই অনন্য। অন্যান্য গল্পে সাধারণ মানুষের দুঃখদারিদ্র্যের কিছু কিছু চিত্র থাকলেও তা কবির সামগ্রিক জীবনবোধের রসে জারিত হয়ে শেষ হয় এক কাব্যিক আবেদনে। কিন্তু 'শাস্তি' একেবারেই ভিন্নধর্মী গল্প। কোনো কাব্যের বাষ্প তাকে মেদুর করে তোলে নি। পল্লীজননীর এক সুতীব্র আর্তনাদের তা বাঙ্ময় মূর্তি।

'আসমানদারি' কবিজীবনের বাদী সুর হলেও তাঁর পেশা ছিল 'জমিদারি'। সেই সূত্রে ভূমিব্যবস্থার স্বরূপ তাঁর ভালোই জানা ছিল। সন্তানের মতো যারা ভূমিপালন করে ভূমির দান তাদের ভাগ্যে কতখানি তা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতারই ফল 'শাস্তি' গল্পটি। 'এখানেও চারদিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই।' —এই গুমট তো দুখিরাম ও ছিদামদের জীবনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত। ঐ অসহ্য গুমটেই তো যে-কোনো 'ভয়ঙ্কর' যে-কোনো মুহূর্তেই দেখা দিতে পারে। 'শাস্তি' গল্পে তাই কোনো সূক্ষ্ম সাহিত্যিক আয়োজনের দরকার হয় নি। কয়েকটি পঙ্‌ক্তির পরিসরে অতি সহজে একটি ধূলির প্রাণ ধূলিসাৎ হয়েছে।

ফাঁসিতে যাবার আগে স্বামী তার সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে চন্দরা বলল, 'মরণ'। পল্লীমাটির আশা, ভালোবাসা, হতাশা, তিতিক্ষা, প্রতিরোধ সব কিছু মিলে মিশে ঐ ছোট্ট কথাটুকু হয়ে উঠেছে এক হৃদয়বিদারী আ-দিগন্ত আর্তরোল।

'শাস্তি' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩০০ সালে (ইং ১৮৯৩) ভারতীতে। এই গল্পটি প্রসঙ্গে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণীয় :

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রথযাত্রাই আমাদের গত দেড় শতাব্দী ব্যাপী সংস্কৃতির একটা বৃহদংশ রচনা করেছে, সেই রথযাত্রায় বাংলা দেশে জমিদারীর নাটমঞ্চ আলোকোজ্জ্বল ও উৎসবমুখর হয়েছে, সংস্কৃতির মেলা জমজমাট হয়েছে, সেই রথযাত্রার কল্যাণে ও প্রসাদে উদ্ভূত মধ্যবিত্ত শ্রেণী সেই বাজারে হাসিমুখে কেনাকাটা করেছে এসবই সত্য ; কিন্তু তার চেয়ে আরও সত্য এই যে, যে অগণিত নির্বাক দরিদ্রের উপর বংশানুক্রমিক ভাবে এই রথের দড়ি টানার ভার পড়েছিল, তাদের কতজনের শ্রমের স্বেদজলে ও ক্লেশের অশ্রুজলে সেই রথের গতিপথ কত পিচ্ছিল হয়েছে, এবং সেই জগদ্দল যন্ত্রের চাকায় যে কতজনের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হয়ে গিয়েছে তার হিসাব এই বৃহৎকাল ব্যাপী সংস্কৃতির পৃষ্ঠায় কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হয়েছে। যে যৎসামান্য দুর্লভ স্থানে তার কথা ধরা আছে তার মধ্যে উপরের কাহিনীটি ('শাস্তি' গল্পটি) একটি। প্রায় অন্তেবাসী একটি দরিদ্র পরিবারের এই কাহিনীতে সেই অস্থি-পঞ্জর নিঃশেষে চূর্ণ হবার নিঃশব্দ ইতিহাস পরম শ্রদ্ধা ও একান্ত বেদনার সঙ্গে বিধৃত হয়ে আছে।" (রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীর মানুষ।' পৃঃ ৩৩-৩৪)

ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথ : ছোটোগল্প কী এক কথায় তার উত্তর দেওয়া যায় না। কেউ বলেন ছোটোগল্প ছোটও বটে আবার গল্পও বটে। কেউ একাগ্রতা আর একমুখীনতাকে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করেন। ইংরেজ সমালোচক, যাকে বলেছেন, "can be finished at a single sitting" অথবা "singleness of purpose, singleness of effect, singleness of treatment" বিশ্বের বিপুল ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে ছোটোগল্পটি চোরালণ্ঠনের আলোয় এমন একটি অংশকে উদ্ভাসিত করে যার মাধ্যমে আমরা পূর্ণাংশের আস্বাদ লাভ করি। যাকে বলে বিন্দুতে সিন্ধুর স্বাদ, ছোটোগল্প তাই এনে দেয়। সেই কারণে ছোটোগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের আকৃতি প্রকৃতিতে কোনো মিল নেই, মিল আছে গীতিকবিতার সঙ্গে। গীতিকবিতাই ছোটো-গল্পের নিকট আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে।

"ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল ;
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু' চারিটি অশ্রুজল।
নাহি বর্ণনার ছটা ঘটনার ঘনঘটা
নাহি তত্ত্ব নাহি উপদেশ,
অন্তরে অতৃপ্তি রবে সাঙ্গ করি মনে হবে
শেষ হয়ে হইল না শেষ।"

বিশ্বসাহিত্যে ছোটোগল্প খুব বেশি দিনের নয়। বাংলা সাহিত্যে একে নবাগতই বলা যায়। কারণ বাংলা ছোটোগল্পের বয়েস প্রায় একশ বছর। নাটক বা উপন্যাসের মতোই ছোটোগল্প আমাদের সাহিত্যে এসেছে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য থেকে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমে।

ছোটোগল্প হল বেদনায় যুগের ফসল। আজ যন্ত্রসভ্যতা, বিশ্বযুদ্ধ, মানুষের-কল্পনা বিলাসী মনপাখিকে তীরবিদ্ধ করে মাটিতে এনে ফেলেছে, সেই রক্তপিছল কাদায় মুখ থুবড়ে পড়ে মানুষের আত্মা যে আর্তনাদ করে চলেছে ছোটোগল্প তারই বাণীরূপ।

বাংলা ছোটোগল্পের জনক রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রপূর্ব লেখক হলেও বঙ্কিম-প্রতিভা ছোটোগল্প রচনার অনুকূল ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাধারাণী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'ইন্দিরা' প্রভৃতি ছোটো আকারের উপন্যাস বা বড়ো গল্প ; এদের কখনই ছোটোগল্প বলা যায় না। সাহিত্যের বহু শাখার মতো বাংলা ছোটোগল্পও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি।

উপন্যাস রচনার বাধা অনেক সময় ছোটোগল্প রচনার গুণ হয়ে দাঁড়ায়। আমরা জানি গীতিকবিরা বস্তুগত কাহিনী বাস্তব ঘটনা বিন্যাস ফোটাতে গিয়ে বা বাস্তবানুগ চরিত্রাঙ্কন করতে গিয়ে অসুবিধে বোধ করেন। তখনই লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটা ব্যবধান সৃষ্টি হয়।

কিন্তু ছোটোগল্প লেখকপ্রধান অর্থাৎ (Subjective) হওয়ায় ছোটোগল্পলেখক তাঁর নিজের উপলব্ধি ও চেতনার পরিমণ্ডলে ঘটনা এবং চরিত্রকে স্থাপন করে শ্রেষ্ঠ ছোটো-গল্প রচনা করেন। এই কারণে ছোটোগল্প রচনায় রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব।

'হিতবাদী' পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের প্রথম ছোটোগল্প জাতীয় লেখা প্রকাশিত হয়। এই রচনা দুটির নাম, 'ঘাটের কথা' ও 'রাজপথের কথা'। রচনা দুটি পরবর্তী কালে গল্পগুচ্ছে স্থান পেলেও এ দুটিকে ঠিক ছোটোগল্প বলা যায় না। যাই হোক 'হিতবাদী' পত্রিকার সাহিত্যসম্পাদক রূপে যোগদান করে রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্প রচনা শুরু করেন।

পূর্ববাংলায় পদ্মাতীরে জমিদারি দেখাশোনার কাজ করতে গিয়ে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথ পল্লীবাংলার সাধারণ মানুষের খুব কাছে এলেন। গ্রামবাংলার সাধারণ মানুষ, তাদের প্রেম-প্রীতি, স্নেহ-ভালবাসা, স্বার্থপরতা এবং আত্মত্যাগ প্রভৃতি খুব কাছ থেকে দেখা বলেই কবির হাতে ছোটোগল্প অমরতা লাভ করেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে বিচিত্র মানুষ, প্রকৃতি, অতিপ্রাকৃত চেতনা, পারিবারিক সমস্যা, মামলা, মোকদ্দমা, এক কথায় "ছোটো প্রাণ, ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখকথা" —ভিড় করে এসেছে। পোস্টমাস্টার, কাবুলিওয়ালা, রাসমণির ছেলে, ছুটি, ঠাকুরদা— গল্পগুলিতে পাই আমাদের দৈনন্দিন জীবনের ছবি। একরাত্রি, মহামায়া, মধ্যবর্তিনী, দুরাশা, শেষের রাত্রি, নিশীথে, নষ্টনীড় প্রভৃতি গল্পে প্রেমের অপার্থিব ব্যঞ্জনা লেখক নিপুণতার সঙ্গে বিশ্লেষণ করেছেন। কবি রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রকৃতি কোনদিন জড় বলে মনে হয় নি, তিনি মানব মনের সঙ্গে প্রকৃতির গভীর সম্পর্ক আবিষ্কার করেছেন। তাঁর 'মেঘ ও রৌদ্র', 'অতিথি', 'আপদ' গল্পগুলিতে এই সম্পর্কের চিত্রই অঙ্কন করা হয়েছে। তাঁর অতিপ্রাকৃত গল্পগুলি বাংলা সাহিত্যে অভিনব। তিনি অতিপ্রাকৃত ভৌতিক গল্পকে একটা অদ্ভুত রস-রূপ দান করেছেন। এই-সব গল্পে তৃষ্ণাতপ্ত জীবনের রহস্যকে এমনভাবে উপস্থিত করা হয়েছে যে প্রাকৃত এবং অপ্রাকৃতের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে

এক অভিনব আবেদন সৃষ্টি হয়েছে। যার প্রমাণ 'ক্ষুধিত পাষাণ', 'নিশীথে', 'মণিহারা' প্রভৃতি ছোটোগল্প।

'রবিবার', 'শেষকথা', 'ল্যাবরেটরি'—প্রভৃতি গল্পে আধুনিক জীবন-সমস্যার নিপুণ বিশ্লেষণ আছে। এইসব গল্পে একদিকে লেখকের মনের সজীবতা এবং আধুনিকতা সুপ্রমাণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প 'টলস্টয়', 'মোপাসাঁ', চেকভের গল্পের পাশে শ্রদ্ধার আসন লাভ করেছে। তাঁর চেষ্টায় ছোটোগল্পের বনিয়াদ এমন সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলেই বাংলা ছোটোগল্প আজ পরিপূর্ণ শিল্পকর্ম রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে।

ছোটোগল্প হিসেবে 'শাস্তি' গল্পের বিচার ঃ রবীন্দ্রনাথ বাংলা সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ছোটোগল্প লেখক। কেবল বাংলা সাহিত্যে নয় বিশ্বসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক টলস্টয়, মোপাসাঁ এবং চেকভের পাশে তাঁর নামও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

'শাস্তি' রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পের ইতিহাসে এক অভিনব সংযোজন। অভিনব বলার কারণ, রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে বাংলাদেশের বাস্তব চিত্র বর্ণিত হলেও, অধিকাংশ গল্পের বাস্তবতা কবির চিত্তভূমি থেকে উদ্ভূত বাস্তবতা। তাছাড়া সাধারণ খেটে খাওয়া সর্বহারা শ্রেণীর মানুষের গল্প রবীন্দ্রসাহিত্যে খুব কমই আছে। সামান্য দু-একটি ব্যতিক্রমের মধ্যে 'শাস্তি' গল্প অন্যতম।

'শাস্তি' ছোটোগল্প হিসাবে কতখানি সার্থকতা অর্জন করেছে তা বিচার করার আগে সংক্ষেপে ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য বিচারের প্রয়োজন।

ছোটোগল্প কী এককথায় তার উত্তর দেওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেন, ছোটোগল্প ছোটও বটে আবার গল্পও বটে। একাগ্রতা আর একমুখীনতাকে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়।

বিশ্বের বিপুল ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে ছোটোগল্প চোরা লণ্ঠনের আলোয় এমন একটি অংশকে উদ্ভাসিত করে যার মাধ্যমে আমরা পূর্ণাংশের আস্বাদ লাভ করি। সেই কারণে ছোটোগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতিতে কোনো মিল নেই, মিল আছে গীতিকবিতার সঙ্গে। গীতিকবিতাই ছোটোগল্পের নিকট আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে। কবিতাটির অংশবিশেষ আগেই উদ্ধৃত হয়েছে।

উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য হল ছোটোগল্পে বর্ণনার বাড়াবাড়ি থাকবে না, কোনো তত্ত্ব প্রচারের বা উপদেশ দেবার আগ্রহও থাকবে না। গল্পের আরম্ভ হবে আকস্মিক এবং সমাপ্তি হবে আকস্মিক। আকস্মিক ঘটনার সংঘাতে গল্প যেন হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে কিন্তু শেষ হবার পরেও পাঠকের মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তির রেশ থেকে যাবে। মোটামুটি এই হল ছোটোগল্পের লক্ষণ।

ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ একজন দক্ষ শিল্পী। প্রকৃতপক্ষে তাঁর হাতেই বাংলা ছোটোগল্পের জন্ম, বিকাশ এবং পূর্ণতা।

ছোটোগল্পের একটা বড়ো লক্ষণ সূচনা এবং সমাপ্তিতে চমক সৃষ্টি করা। আমাদের আলোচ্য শাস্তি গল্পের মধ্যেও আমরা ছোটোগল্পের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পাই।

শাস্তি গল্পটিও হঠাৎ আরম্ভ হয়েছে। উপন্যাসের মতো কোনো ভূমিকা নেই। সাধারণ ভাবেই লেখক দুটি মানুষের কথা এইভাবে আরম্ভ করেছেন—"দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছে।" গল্পের শুরুতে দেখি না আছে "বর্ণনার ছটা", সাধারণভাবে গল্প আরম্ভ হয়ে ঘটনার স্রোত নিজস্ব গতিতে দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে।

ছোটোগল্পের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য তার একমুখী গতি। 'শাস্তি' গল্পেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি। দুই ভাইয়ের জন খাটতে যাওয়া এবং দুই জা রাধা ও চন্দরার ঝগড়া থেকে গল্পের শুরু। দুখিরাম এবং ছিদাম জন খেটে ফিরে এল সেদিন সন্ধ্যার সময়। রাধা এবং চন্দরা সারাদিন ঝগড়া করে রান্না করে নি, বিশেষত, ঘরে সেদিন চাল বাড়ন্ত।

ক্লান্ত দুখিরাম ঘরে ঢুকেই বউয়ের কাছে ভাত চেয়ে অপমানজনক কথা শুনল। একে পেটের জ্বালা তার ওপর অপমানজনক কথা, দুখিরাম মাথার ঠিক রাখতে পারল না, হাতের দা বসিয়ে দিল স্ত্রীর মাথায়। রাধার প্রাণহীন দেহ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ছিদাম এই হত্যার দায় ছোটো বউ চন্দরার কাঁধে তুলে দিল। উদ্দেশ্য বড়ো ভাইকে বাঁচানো। চন্দরা মৃদু আপত্তি করায় ছিদাম আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, "যাহা বলিতেছি তাই কর তোর কোন ভয় নাই, তোকে বাঁচাইয়া দিব।" শেষ পর্যন্ত ছিদাম চন্দরাকে বাঁচাবার বহু চেষ্টা করল কিন্তু চন্দরা নিজেই বুঝি বাঁচতে চাইল না। প্রথমে পুলিশের কাছে সে নিজের যে-দোষ স্বীকার করেছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছেও তা স্বীকার করে নিজের অপরাধকে পাকা ভিতের উপর দাঁড় করাল। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট চন্দরাকে অপরাধী বলে সেশনে চালান দিলেন। সেখানেও জজসাহেবের কাছে চন্দরা নিজের মুখে অপরাধ স্বীকার করল। ছিদাম এবং দুখিরাম দুজনেই হত্যার দায় নিজের কাঁধে নেবার চেষ্টা করল, কিন্তু জজসাহেব তাদের কথা বিশ্বাস করলেন না। হত্যার অপরাধে চন্দরার ফাঁসির হুকুম হল। ফাঁসির আগে দয়ালু সিভিল সার্জন চন্দরাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"কাহাকেও দেখিতে ইচ্ছা কর ?"

উত্তরে চন্দরা কেবল তার মাকেই দেখতে চেয়েছে। স্বামীর সঙ্গে দেখা করবে কিনা জিজ্ঞাসা করায় অভিমানী চন্দরা শেষ কথায় বলেছে—'মরণ'। এখানেই গল্পের শেষ।

এই হল 'শাস্তি' গল্পের কাহিনী। যেমন আকস্মিক এর সূচনা তেমনি আকস্মিক এর সমাপ্তি। কোনো উপকাহিনী বা অপ্রাসঙ্গিক চরিত্রের ভিড়ে 'শাস্তি' গল্পটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি, বা গল্পের গতি কোথাও শ্লথ হয় নি। একটি সাধারণ বিষয়কে কেন্দ্র করে কবি

সৃষ্টি করেছেন অসামান্য এক সাহিত্যকর্ম। এটাও ছোটোগল্পের পক্ষে একটা জরুরী ব্যাপার—"to produce maximum effect with minimum material."

আলোচ্য গল্পটি শেষ হয়েছে চন্দরার কথায়। শেষ কথায় চন্দরা বলেছে—'মরণ'। এই মরণ কথাটিকে কেন্দ্র করে একটা ব্যঞ্জনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। অনেক না বলা কথা লুকিয়ে আছে এই কথাটিকে আশ্রয় করে। আমরা জানি ব্যঞ্জনা এবং ইঙ্গিত ছোটো-গল্পের প্রাণ। গল্প শেষ হবার পরেও যা পাঠককে ভাবায়, পাঠক মনকে দোলা দেয়। কবির ভাষায়—'শেষ হয়ে হইল না শেষ'। ছোটোগল্পের সমস্ত বৈশিষ্ট্য এখানে বর্তমান, তাই 'শাস্তি' একটি আদর্শ ছোটোগল্প।

রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার ঃ

গল্প, উপন্যাস বা নাটকের নামকরণের বিশেষ এক তাৎপর্য থাকে। সেই তাৎপর্যের খাতিরেই লেখক তাঁর রচনার নামকরণ করেন। অনেক সময় কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামানুসারে রচনার নামকরণ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র কথা বলা যায়। রাজসিংহ, দেবদাস বা গোরার জীবন, তাদের ভাবনা উপন্যাসে নানাভাবে চিত্রিত, তাই তাদের নামেই উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে। আবার কখনও লেখক তাঁর লেখায় কোনো আদর্শ বা দার্শনিক ভাবনার ছবি অঙ্কন করেন, তখন নায়ক-নায়িকার নামে রচনার নামকরণ করা হয় না; সেখানে নামের মধ্যে একটি আদর্শ বা ভাবনার ছবিই ফুটে ওঠে, লেখক এমন নাম বেছে নেন। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'চোখের-বালি', 'ছুটি', 'অতিথি', 'দান-প্রতিদান', 'শাস্তি' প্রভৃতি।

রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পটির নামকরণের মধ্যে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে। এখানে কোনো চরিত্রের নামে গল্পের নামকরণ করা হয় নি। গল্পের কাহিনীতে আমরা দেখি একদিন বিশেষ উত্তেজনার মুহূর্তে দুখিরাম রুই তার স্ত্রী রাধার মাথায় দা দিয়ে আঘাত করে এবং সেই আঘাতেই রাধার মৃত্যু হয়। ছোটো ভাই ছিদাম রুই বড়ো ভাইকে বাঁচাবার জন্যে ছোটো বউ চন্দরার কাঁধে হত্যার অপরাধ চাপিয়ে দেয়। স্বামীর অনুরোধে অভিমানী চন্দরা নীরবেই হত্যার দায় নিজের কাঁধে তুলে নেয়। ছিদামের পরিকল্পনা মতো কাজ করলে হয়তো চন্দরা আইনের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারত। কিন্তু স্বামীর উপর প্রচণ্ড অভিমানবশত সে ইচ্ছে করেই আইনের হাত এড়াতে চায় নি। তাই পুলিশের জেরার উত্তরে সে বলে, "হাঁ, আমি খুন করিয়াছি।" কেন খুন করিয়াছ? আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না। কোন বচসা হইয়াছিল? না। সে তোমাকে প্রথমে মারিতে আসিয়াছিল? না।" এক কথায় বলা যায় চন্দরা ইচ্ছে করেই অভিমানবশত যে শাস্তি তার প্রাপ্য নয় তাকেই যেন হাসিমুখে বরণ করে নিল।

এমন কি ফাঁসির পূর্বে দয়ালু সিভিল সার্জনের অনুরোধেও চন্দরা তার স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চায় নি। এইভাবে 'শাস্তি' গল্পে আমরা দেখি চন্দরা হাসিমুখেই আইনের দেওয়া শাস্তি মাথা পেতে গ্রহণ করল। কিন্তু এখানেই 'শাস্তি' গল্পের তাৎপর্য সম্পূর্ণ হয়নি।

'শাস্তি' এই নামটিকে রবীন্দ্রনাথ আরও কিছু ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। চন্দরা নিরপরাধ হয়েও কঠিন শাস্তি গ্রহণ করল। নিরপরাধা চন্দরা ফাঁসিতে প্রাণ দিয়ে অব্যাহতি পায়, কিন্তু ছিদামের শাস্তি শুরু হয় তারপর থেকে। যতদিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন চন্দরার মৃত্যু তাকে অনুশোচনার আগুনে তিলে তিলে দগ্ধ করবে।

'শাস্তি' কথাটিকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে এক ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেছেন। এবং এই নামকরণের মাধ্যমে ছিদামের চরিত্রও কিছুটা প্রতিফলিত হয়েছে, তাই শাস্তি নামকরণ সার্থক ও যুক্তিসঙ্গত হয়েছে।

চরিত্র বিচার

দুখিরাম রুই : দুখিরাম রুই ছিল এক দরিদ্র কুরি পরিবারের সন্তান। বঙ্গ-দেশে মুড়ি-মুড়কি আর বাতাসা তৈরি করাই ছিল কুরিদের জাত ব্যবসা। কিন্তু আমাদের গল্পের সূচনায় দেখি কুরিদের সেই পূর্ব গৌরব অবলুপ্ত। জাত-ব্যবসা ছেড়ে তারা এখন পরের ক্ষেতে বা ঘরে জন খেটে সংসার চালায়।

গল্পের শুরুতে লেখক বলেছেন, "দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই দুই ভাই সকালে যখন দা হাতে লইয়া জন খাটিতে বাহির হইল তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচা-মেচি চলিতেছিল।" দুই ভাই এবং দুই বউ, এক শিশুপুত্র এই নিয়ে দুখিরামের সংসার। ভাইয়ে ভাইয়ে সদ্ভাব থাকলেও দুই বউয়ে ঝগড়া-বিবাদের অন্ত ছিল না। বধূদের এই বিবাদ দুখিরাম বা ছিদামকে স্পর্শ করলেও সেটাকে তারা অসুবিধের মধে গণ্য করত না।

ঘটনার দিন দুভাই জমিদারের কাছারি বাড়িতে জন খাটতে গিয়েছিল। ওপারের চরে জলিধান পেকেছে, বর্ষায় চর ভেসে যাবার আগেই ধান কাটার প্রয়োজন, কিন্তু কাছারির পেয়াদা এসে ছিদাম সহ দুখিরামকে জোর করে ধরে নিয়ে গেল। সেখানে বৃষ্টিতে ভিজে সারাদিন কাজ করতে হয়েছে, সামান্য জলপানে দুখিরামের পেটের আগুন নেভে নি। সারাদিন প্রায় বেগার খেটে লাঞ্ছিত অপমানিত দুখিরাম ঘরে এসেই স্ত্রীর কাছে ভাত খেতে চেয়েছে। সারাদিন গৃহবিবাদে বিক্ষুব্ধ রাধা তীব্রকণ্ঠে বলে উঠেছে, "ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"

স্ত্রীর রুক্ষবচন, বিশেষত শেষ কথাটার কুৎসিত ইঙ্গিত সহ্য করার মতো মনের অবস্থা দুখির ছিল না।

সে বাঘের মতো গর্জন করে কিছু না ভেবেই স্ত্রীর মাথায় দায়ের কোপ বসিয়ে দিল। দায়ের এক আঘাতেই রাধা তার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়ে গেল এবং খানিক বাদেই তার মৃত্যু হল।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে নিরীহ সহজ-সরল আত্মভোলা দুখিরামের দ্বারা এমন নিষ্ঠুর কাণ্ড সম্ভব নয়। কিন্তু সমস্ত পরিবেশ এবং দুখির সেদিনকার মানসিকতা পর্যালোচনা করলে তার এই বিক্ষোভ মনোবিজ্ঞানসম্মত বলেই মনে হয়। লেখক তার চেহারা ও চরিত্রের বর্ণনা দিয়ে বলেছেন—"দুখিরাম মানুষটা কিছু বৃহদায়তনের—হাড়গুলা খুব চওড়া, নাসিকা খর্ব, দুটি চক্ষু এই দৃশ্যমান সংসারকে যেন ভালো করিয়া বোঝে না, অথচ ইহাকে কোনরূপ প্রশ্ন করিতেও যায় না। এমন নিরীহ অথচ ভীষণ, এমন সবল অথচ নিরুপায় মানুষ অতি দুর্লভ।"

লেখক তার চেহারার সঙ্গে চরিত্রের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন তার মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য হল "নিরীহ অথচ ভীষণ।" এমন মানুষই সহ্য করতে করতে একদিন ভীষণ কিছু করে বসে। তাই দেখি প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে দুখিরাম যেন সমাজ-সংসারের বিরুদ্ধেই প্রচণ্ড প্রতিবাদে সেদিন ভেঙে পড়েছিল।

এরপর যা-কিছু ঘটেছে তার জন্যে দুখিরাম বিন্দুমাত্র দায়ী ছিল না। কারণ "সমস্ত কাজেই ছিদামের উপর দুখিরামের একমাত্র নির্ভর।" ছিদাম চন্দরার উপর হত্যার অপরাধ চাপাতে চাইলে সহজ সরল দুখিরাম প্রতিবাদ করে বলেছিল—"তাহা হইলে বউমার কী হইবে।" উত্তরে ছিদাম বলেছিল—"উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।" কনিষ্ঠ ভাই ছিল নিরীহ দুখিরামের আশা-ভরসা, তাই সে ছিদামের কথাই শেষ পর্যন্ত বিশ্বাস করে এসেছে। কিন্তু বিচারের শেষ পর্বে যখন ছোটো বউ চন্দরা প্রাণপণে ফাঁসিকাঠের দিকে এগিয়ে চলেছে তখন জজের কাছে সে সত্যকথাই খুলে বলেছে—"সাহেব, খুন আমি করিয়াছি।"

দুখিরামের সত্যভাষণ চন্দরাকে মৃত্যুদণ্ডের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে নি। কিন্তু আমাদের বুঝতে কষ্ট হয় না এই সহজ সরল নিরীহ মানুষটি আইনের চোখে নিরপরাধ বলে বিবেচিত হলেও নিজেকে সে কোনদিন ক্ষমা করতে পারবে না। মৃত্যু চন্দরাকে মুক্তি দিল, কিন্তু জীবনের কাছে যে-শাস্তি দুখিরামের প্রাপ্য তার আগুনে তাকে সারাজীবন জ্বলে পুড়ে মরতে হবে।

কবিগুরু দুখিরামের মধ্যে বহু যুগের নির্যাতিত মানবাত্মার বেদনাময় বিক্ষোভের রূপটিকেই প্রত্যক্ষ করেছেন।

ছিদাম রুই: সহজেই অনুমান করা চলে ছিদাম রুইয়ের আসল নাম ছিল শ্রীদাম রুই। উচ্চারণ বিকৃতির ফলে শ্রীদাম হয়েছে ছিদাম। ছিদাম ছিল দুখিরামের ছোটো ভাই এবং চন্দরার স্বামী।

চেহারায় এবং চরিত্রে ছিদাম ছিল ঠিক দুখিরামের বিপরীত চরিত্র। দুখিরাম ছিল বৃহৎকায়, সহজ-সরল-নিরীহ, কিন্তু ছিদাম ছিল ঠিক তার বিপরীত। লেখকের বর্ণনায় তার যে ছবি পাই তা হল: "ছিদামকে একখানি চকচকে কালো পাথরে কে যেন বহুযত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে। লেশমাত্র বাহুল্যবর্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায়

নাই। প্রত্যেক অঙ্গটি বলের সহিত নৈপুণ্যের সহিত মিশিয়া অত্যন্ত সম্পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। নদীর উচ্চপাড় হইতে লাফাইয়া পড়ুক, লগি দিয়া নৌকা ঠেলুক বাঁশ গাছে চড়িয়া বাছিয়া বাছিয়া কাঠ কাটিয়া আনুক, সকল কাজেই তাহার একটি পরিমিত পারিপাট্য, একটি অবলীলাকৃত শোভা প্রকাশ পায়। বড়ো বড়ো কালো চুল তেল দিয়া কপাল হইতে যত্নে আঁচড়াইয়া তুলিয়া কাঁধে আনিয়া ফেলিয়াছে—বেশভূষা-সাজসজ্জায় বিলক্ষণ একটু যত্ন আছে।"

এই হল 'শাস্তি' গল্পের নায়ক ছিদাম। চেহারার মতো তার চরিত্রেও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। অপরকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা যেমন ছিল, ঠিক তেমনি ছিল রসসিক্ত একটি শিল্পীমন, সেই কারণে "অপরাপর গ্রামবধূদিগের সৌন্দর্যের প্রতি যদিও তাহার উদাসীন দৃষ্টি ছিল না, এবং তাহাদের চক্ষে আপনাকে মনোরম করিয়া তুলিবার ইচ্ছাও তাহার যথেষ্ট ছিল।"

কিন্তু যুবতী স্ত্রী চন্দরার প্রতি ছিদামের ভালোবাসা কম ছিল না। লেখক বলেছেন, —'ছিদাম যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালোবাসিত।' স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয় আবার ভাব হয়, কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারত না। দুজনেই দুজনকে ধরে রাখবার চেষ্টা করত, এটাই অল্পবয়সের প্রেমের ধর্ম। "ছিদাম মনে করিত চন্দরা যেরূপ চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই আর চন্দরা মনে করিত আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্‌দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।"

আমাদের গল্পের যেখান থেকে শুরু তার কিছুদিন পূর্বে ছিদামের সঙ্গে চন্দরার একটা মান-অভিমানের পালা চলছিল। ছিদাম কর্ম উপলক্ষে কিছুদিন গ্রামান্তরে কাটিয়ে আসে, চন্দরাও স্বামীর মনে ঈর্ষা উৎপাদনের জন্যে "যখন-তখন ঘাটে যাইতে আরম্ভ করিল এবং পাড়া পর্যটন করিয়া আসিয়া কাশী মজুমদারের মেজ ছেলেটির প্রচুর ব্যাখ্যা করিতে লাগিল"। চন্দরার উদ্দেশ্য সফল হল, ছিদামের মনে ঈর্ষার আগুন জ্বলে উঠল। "তার দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজেকর্মে কোথাও একদণ্ড গিয়া স্থস্থির হইতে পারে না।"

এই হল ছিদাম চরিত্রের একটা দিক। যেখানে তার প্রেমিক মূর্তি। তার চরিত্রের আর একটা দিক ছিল যেখানে সে স্নেহপ্রবণ ভ্রাতা। হয়তো ভ্রাতৃপ্রেমই তার কাছে দাম্পত্য প্রেমের চেয়ে অনেক বড়ো ছিল। একসময় রামলোচন চক্রবর্তীকে সে বলেছে, ঠাকুর-বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।"

আমাদের দেশ ভারতবর্ষ রাম-লক্ষ্মণের দেশ। ভারতের সাধারণ মানুষ রামায়ণ কাব্য থেকেই ভ্রাতৃপ্রেমের আদর্শ রূপ জীবনে গ্রহণ করেছে। দুখিরাম ও ছিদাম ছিল সেই প্রাচীন ভ্রাতৃপ্রেমের জীবন্ত বিগ্রহ। দুখিরামও সমস্ত কাজে ছিদামের উপর একমাত্র নির্ভর ছিল। তাই ছিদাম চন্দরার উপর খুনের অভিযোগ চাপাতে চাইলে

দুখি বলেছিল, "তাহা হইলে বউমার কী হইবে।" উত্তরে ছিদাম বলেছিল, "উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব।"

চন্দরার উপর ছিদামের ভালোবাসা কিন্তু কম ছিল না। কিন্তু দাম্পত্য প্রেমের চেয়ে ভ্রাতৃপ্রেম তার মধ্যে প্রবল ছিল তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। "উহাকে আমি বাঁচাইয়া দিব" এই কথা কটি তার মিথ্যে দম্ভ ছিল না। স্ত্রীকে রক্ষা করার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে ছিদাম কিন্তু শেষ পর্যন্ত অভিমানী চন্দরা নিজেই আত্মহননের পথ বেছে নিয়েছে। লেখক তার সম্বন্ধে বলেছেন—"এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদারুণ অভিমান।"

চন্দরার অভিমানের কাছে ছিদামকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত স্ত্রীকে রক্ষা করার সব পথ রুদ্ধ দেখে ছিদাম নিজেই সমস্ত অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নিয়ে জজসাহেবকে বলেছে—"আমি খুন করিয়াছি।"

কিন্তু তখন অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। চন্দরা ফাঁসির দড়ি গলায় পরে এজীবন থেকে মুক্তি নিয়ে গেল, কিন্তু বেঁচে থেকেও ছিদামকে ভোগ করতে হল কঠিন শাস্তি।' এই শাস্তি কোনো আইন-আদালতের দেওয়া নয়, এই শাস্তি তাকে দিয়েছে অভিমানী স্ত্রী চন্দরা।

ফাঁসির পূর্বেও চন্দরা স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে চায় নি। সিভিল সার্জনের প্রশ্নের উত্তরে সে বলেছে, "একবার আমার মাকে দেখিতে চাই।"

অভিমানী চন্দরা মৃত্যুর আগেও স্বামীকে ক্ষমা করতে পারে নি। এটাই ছিদামের জীবনে বড়ো শাস্তি। বেঁচে থেকে অনুশোচনার আগুনে সারাজীবন দগ্ধ হয়েছে বলেই ছিদাম আলোচ্য গল্পে নায়ক হবার দাবি রাখে।

চন্দরা: 'শাস্তি' গল্পের নায়িকা চন্দরা ছিল ছিদাম রুইয়ের স্ত্রী। মনে হয় তার আসল নাম ছিল চন্দ্রা। এই চন্দ্রাই উচ্চারণ বিকৃতির ফলে চন্দরায় রূপান্তরিত হয়েছে।

গল্পে যখন চন্দরার প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম সে তখন কৈশোর যৌবনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে স্বামীর সঙ্গে মান-অভিমান এবং বড়ো জায়ের সঙ্গে কলহ-বিবাদে মত্ত। কি চরিত্রে কি দৈহিক গঠনে ছিদাম ছিল তার বড়ো ভাইয়ের বিপরীত, তেমনি চন্দরাও ছিল বড়ো বউ রাধার বিপরীত চরিত্রের। চেহারায় এবং স্বভাবে এই বৈপরীত্য ছিল চোখে পড়ার মতো।

চন্দরার চেহারা এবং স্বভাবের বর্ণনা দিয়ে লেখক বলেছেন: "চন্দরার বয়স সতেরো আঠারোর অধিক হইবে না। মুখখানি হৃষ্টপুষ্ট গোলগাল, শরীরটি অনতিদীর্ঘ আঁটসাঁট সুস্থসবল, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে এমন একটি সৌষ্ঠব আছে যে, চলিতে ফিরিতে নড়িতে চড়িতে দেহের কোথাও যেন কিছু বাধে না। একখানি নতুন তৈরি নৌকোর মত; বেশ ছোটো এবং সুডোল, অত্যন্ত সহজে সরে এবং তাহার কোথাও কোন গ্রন্থি শিথিল হইয়া যায় নাই। পৃথিবীর সকল বিষয়েই তাহার একটা কৌতুক এবং কৌতূহল

আছে। পাড়ায় গল্প করিতে যাইতে ভালোবাসে ; এবং কুম্ভকাঁকে ঘাটে যাইতে আসিতে দুই অঙ্গুলি দিয়া ঘোমটা ঈষৎ ফাঁক করিয়া উজ্জ্বল চঞ্চল ঘনকৃষ্ণ চোখ দুটি দিয়া পথের মধ্যে দর্শনযোগ্য যাহা কিছু সমস্ত দেখিয়া লয়।"

এই হল 'শাস্তি' গল্পের ছোটো বউ চন্দরা। কিশোরী বধূর স্বভাব তার আচার-আচরণে প্রকট। স্বামীর সঙ্গে চন্দরা প্রায়ই ঝগড়া-বিবাদ করে, তার চেয়েও বেশি কলহ বিবাদ হয় বড়ো বউ রাধার সঙ্গে। তাদের কলহ পাড়ার লোকেদের কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার বলে মনে হয়। কুরিদের বাড়ি থেকে তীব্র কণ্ঠস্বর শুনলেই— "লোকে পরস্পরে বলে, ওই রে, বাধিয়া গিয়াছে।"

স্বামীর প্রতি চন্দরার ভালোবাসা কম ছিল না, এই ভালোবাসা থেকেই জন্মেছে ঈর্ষা এবং অভিমান। চন্দরার স্বামী ছিদামের মধ্যে একটা আকর্ষণীয় শক্তি ছিল। সেই সঙ্গে গ্রাম্য বধূদের চোখে নিজেকে আকর্ষণীয় করে তোলবার দিকেও তার লক্ষ্য ছিল। অন্যদিকে, "ছিদাম মনে করিত চন্দরা যেরূপ চটুল প্রকৃতির স্ত্রীলোক তাহাকে যথেষ্ট বিশ্বাস নাই।" আর "চন্দরা মনে করিত আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্‌দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই"।

চন্দরার স্বামী অন্য গ্রাম্য বধূদের চোখে আকর্ষণীয় ছিল, তাই চন্দরাও স্বামীর মনে ঈর্ষা সঞ্চারের জন্যে নানা রকম ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছিল। যখন-তখন জল আনবার ছলে ঘাটে যেত, পাড়ায় ঘুরে বেড়াত, আর জনৈক কাশী মজুমদারের মেজ ছেলের প্রশংসা করত। এই সকল ছলচাতুরীর একটাই উদ্দেশ্য ছিল, কেবল স্বামীর মনে ঈর্ষা উৎপাদন করা। এবং এই কাজে সে সফল হয়েছিল। তাই রাধাকে বলতে শুনি, "ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি ও কোন্‌দিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে।"

ঈর্ষায় প্রেমের প্রকাশ। তাই ছিদাম চন্দরাকে ঘরে বন্দী করে রেখেছে—বলেছে, "এবার যদি কখনো শুনি তুই একলা ঘাটে গিয়েছিস তোর হাড় গুঁড়াইয়া দিব।" ছিদাম ছিল গ্রাম্য গোঁয়াড় যুবক, সে জানত না নারীর হৃদয় কখনই দৈহিক শক্তিতে জয় করা যায় না ; একমাত্র প্রেমেই তা বশ মানে।

গৃহবন্দী চন্দরা প্রচণ্ড ক্ষোভে অভিমানে তিনটে গ্রাম ছাড়িয়ে একেবারে তার মামার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। অগত্যা ছিদামকে তার কাছে হার মানতে হয়েছে। বহুকষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় সে চন্দরাকে ঘরে ফিরিয়ে এনে উপলব্ধি করেছে —"এক অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য, এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব—ও যেন দশ অঙুলের ফাঁক দিয়া বাহির হইয়া পড়ে।"

ছিদাম-চন্দরার মধ্যে যখন মানঅভিমানের পালা তুঙ্গে উঠেছে ঠিক এমনই দিনে ঘটে গেল এক পারিবারিক বিপর্যয়। বড়ো ভাই দুখিরাম রাগের মাথার তার স্ত্রী রাধাকে দায়ের কোপে হত্যা করে বসল।

বড়ো ভাইকে রক্ষা করবার জন্যে ছিদাম রাধা-হত্যার সব দায় চাপাল চন্দরার

কাঁধে। চন্দরাকে যখন তার স্বামী হত্যাপরাধ স্বীকার করতে বলল, "সে স্তম্ভিত হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার কালো দুটি চক্ষু কালো অগ্নির ন্যায় নীরবে তাহার স্বামীকে দগ্ধ করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত শরীর মন যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হইয়া স্বামী রাক্ষসের হাত হইতে বাহির হইয়া আসিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। তাহার সমস্ত অন্তরাত্মা একান্ত বিমুখ হইয়া দাঁড়াইল।

এই নারীর মধ্যে যে তেজ, ক্ষোভ অভিমান এতদিন পুঞ্জীভূত ছিল, হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই ঘটল তার বহিঃপ্রকাশ। স্বামীকে সবচেয়ে বড়ো শাস্তি দেবার জন্যেই চন্দরা মনে মনে প্রস্তুত হল। তাই ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বা জজের কাছে সে ছিদামের শিখিয়ে দেওয়া বুলি আওড়ায় নি। জেরার উত্তরে বার বার সে একই কথা বলেছে, "হাঁ, আমি খুন করিয়াছি···আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।"

লেখক বলেছেন এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না।

আর অভিমানক্ষুব্ধ চন্দরা নিজের মনে মনে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে বলেছে—"আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসিকাঠকে বরণ করিলাম—আমার ইহজন্মের শেষ বন্ধন তাহার সহিত।"

অথচ স্বামীর প্রতি চন্দরার নিখাদ ভালোবাসা ছিল। ছিদামও স্ত্রীকে ভালোবাসত। জজসাহেবের জেরার উত্তরে চন্দরা যা বলেছে তা থেকে স্বামীর প্রতি তার অভিমান-মিশ্রিত ভালোবাসাই প্রকাশ পায়, সে বলেছে—"উঃ, ভারি ভালোবাসে।" যখন প্রশ্ন হল, "তুমি উহাকে ভালোবাস না?" উত্তরে চন্দরা বলল, "খুব ভালোবাসি।"

অথচ ফাঁসির পূর্বে যখন চন্দরাকে প্রশ্ন করা হল, "কাহাকে দেখিতে ইচ্ছা কর?" উত্তরে চন্দরা তার মাকে দেখতে চেয়েছে, স্বামীকে নয়।

ফাঁসিতে যাবার আগে স্বামী তার সঙ্গে দেখা করতে চায় শুনে চন্দরা বলল, 'মরণ'! পল্লীমাটির আশা, ভালোবাসা, অভিমান, হতাশা, তিতিক্ষা, প্রতিরোধ সবকিছু মিলেমিশে এই ছোট্ট কথাটুকু হয়ে উঠেছে এক হৃদয়বিদারী আর্তরোল। জীবনের শেষ মান-অভিমানের খেলায় চন্দরাই জয়ী হল, আর স্বামীর জন্যে রেখে গেল কঠিন শাস্তি যা ছিদামের বুকে চিরকাল তুষের আগুন হয়ে জ্বলবে।

রাধা: রাধা ছিল দুখিরাম রুইয়ের স্ত্রী, অর্থাৎ রুরি পরিবারের বড়ো বউ। ছোটো বউ চন্দরার ঠিক বিপরীত চরিত্রের মানুষ ছিল রাধা। লেখকের ভাষায়—"বড়ো বউ ছিল ঠিক ইহার উল্টা অত্যন্ত এলোমেলো ঢিলেঢালা অগোছালো। মাথার কাপড়, কোলের শিশু, ঘরকন্নার কাজ কিছুই সে সামলাইতে পারিত না। হাতে বিশেষ একটা কিছু কাজও নাই অথচ কোনোকালে যেন সে অবসর করিয়া উঠিতে পারে না।"

এদিক থেকে দুখিরামের সঙ্গে রাধার চরিত্রগত একটা বিশেষ মিল ছিল। স্বামীর মতোই রাধা ছিল সহজ-সরল কিছুটা বোকা ধরনের। তাই ছোটো বউ চন্দরার সঙ্গে সে ঝগড়া-বিবাদ বা বুদ্ধির কৌশলে এঁটে উঠত না। লেখক বলেছেন—"ছোটো-জা তাহাকে

অধিক কিছু বলিত না, মৃদুস্বরে দুই-একটা তীক্ষ্ণ দংশন করিত, আর সে হাউ হাউ দাউ দাউ করিয়া রাগিয়া-মাগিয়া বকিয়া-ঝকিয়া সারা হইত এবং পাড়াসুদ্ধ অস্থির করিয়া তুলিত।"

পাড়ার মানুষ রাধার তীব্র কণ্ঠস্বর শুনে বলত, "ওই রে, বাধিয়া গিয়াছে।" সহজেই অনুমান করতে পারি সাধারণের চোখে রাধাই বেশি ঝগড়াটে বলে দুর্নাম অর্জন করেছিল।

'শাস্তি' গল্পে রাধার বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই। সাধারণ সহজ-সরল দরিদ্র গ্রাম্যবধূ যা হয় রাধা তার ব্যতিক্রম ছিল না। কুরি পরিবারের সে ছিল গৃহিণী। কিন্তু চন্দরার কাছে তার কোনো মর্যাদাই ছিল না। ছিদাম তার বড়ো জাকে সংসারের কর্তৃ বলে মনে করত এবং চন্দরার রক্ষণাবেক্ষণের ভার তার হাতেই অর্পণ করতে চাইত। কিন্তু রাধা এই চঞ্চলা কিশোরী বধূকে চিনত বলেই ভবিষ্যৎবাণী করতে পেরেছিল, "ও মেয়ে ঝড়ের আগে ছোটে উহাকে আমি সামলাইব! আমি জানি ও কোন্‌দিন কী সর্বনাশ করিয়া বসিবে।" রাধার এই ভবিষ্যৎবাণী সফল হয়েছিল। কিন্তু তা সম্পূর্ণ অন্যভাবে।

সারাদিন জমিদারের কাছারি বাড়ির কাজ করে ক্লান্ত ক্ষুধার্ত দুখিরাম ঘরে ফিরেই রাধার কাছে ভাত খেতে চাইলে—বড়ো বউ তীব্র কণ্ঠস্বরে উত্তর দিল—"ভাত কোথায় যে ভাত দিব। তুই কি চাল দিয়া গিয়াছিলি। আমি কি নিজে রোজগার করিয়া আনিব।"

সারাদিনের ক্লান্তি ও লাঞ্ছনার পর স্ত্রীর এরূপ রুক্ষবচন দুখিরাম সহ্য করতে পারল না। বিশেষত, নিজে রোজগার করে আনবার মধ্যে যে কুৎসিত শ্লেষ ছিল তা সহ্য করবার মতো মনের অবস্থা দুখিরামের ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ক্রোধে রাধার মাথায় দায়ের কোপ বসিয়ে দেয়। সেই আঘাতে "রাধা তার ছোটো জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে বিলম্ব হইল না।"

এই ভাবেই রাধা 'শাস্তি' গল্পের অন্তরালে চলে যায়। কিন্তু তার এই হত্যাকে কেন্দ্র করেই ঘটনার স্রোত এগিয়ে চলে এবং শেষ পর্যন্ত আরও একটি প্রতিমা বিসর্জনের মাধ্যমে গল্পের ভয়াবহ করুণ পরিণতি ঘটে। অশিক্ষিত গ্রাম্য বধূ রাধা দারিদ্র্যের জ্বালা এবং ঝগড়া-বিবাদজনিত লাঞ্ছনা সহ্য করতে না পেরে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে স্বামীর প্রতি রুক্ষ আচরণ করেছিল। কিন্তু তার জন্যে যে শাস্তি রাধাকে পেতে হল তা যেমনই আকস্মিক তেমনিই ভয়াবহ। একেই বলে লঘু পাপে গুরু দণ্ড। অবশ্য দুখিরামের তৎকালীন মানসিক অবস্থার কথা চিন্তা করলে এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনাকে আমরা কখনই অযৌক্তিক বা অস্বাভাবিক বলে উড়িয়ে দিতে পারি না।

যাই হোক, 'শাস্তি' গল্পে রাধার ভূমিকা সামান্য হলেও তার মৃত্যুই আলোচ্য গল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

রামলোচন চক্রবর্তী : রামলোচন চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের এক

গৌণ চরিত্র। গৌণ হলেও উপন্যাসে, গল্পে বা নাটকে কোন চরিত্রই বিনা প্রয়োজনে আসে না।

গৌণ চরিত্রের প্রধান কাজ হল, মুখ্য চরিত্রকে প্রস্ফুটিত করা, গল্পের যোগসূত্র রক্ষা করা এবং পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা।

রামলোচন চক্রবর্তী তৎকালীন সমাজের সুবিধেবাদী মানুষের প্রতিনিধি। ছুখিরাম এবং ছিদাম ছিল তার প্রজা। অনেক টাকা খাজনা বাকি পড়ায় রামলোচন খুড়ো মাঝে মাঝেই তাদের বাড়িতে টাকার তাগাদা দিতে আসতেন।

একদিন টাকার তাগাদা দিতে এসেই তিনি রাধা হত্যার ঘটনার কথা জানতে পারেন। ঠিক সেই মুহূর্তে রামলোচন খুড়ো কুরিদের বাড়িতে এসে না পড়লে হয়তো ঘটনার স্রোত অন্যদিকে প্রবাহিত হত। হয়তো গল্পের এই বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটত না। কিন্তু ঘটনার দিন রামলোচন চক্রবর্তী অকুস্থলে হাজির হয় এবং ছুখিরামকে কাঁদতে দেখে প্রশ্ন করে, "ছুখি কাঁদে কেন রে।" ছিদাম তার বড় ভাইকে বাঁচানোর জন্যে হঠাৎ বলে ফেলে—"ঝগড়া করিয়া ছোটো বউ বড়ো বউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

এই আঘাতে রাধার মৃত্যু হয়েছে শুনে রামলোচন মনে মনে প্রমাদ গুণল। ভাবল, "রাম রাম, সন্ধ্যাবেলায় এ কী বিপদেই পড়িলাম। আদালতে সাক্ষ্য দিতে দিতেই প্রাণ বাহির হইয়া পড়িবে।"

মামলা-মোকদ্দমার সঙ্গে নিজেকে জড়াতে না চাইলেও রামলোচন চক্রবর্তী ছিলেন মামলা-মোকদ্দমার পরামর্শে সমস্ত গ্রামের মন্ত্রী। অনুমান করা চলে, তিনি ছিলেন স্বার্থপর কূটবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তি। মানবিকতা, আদর্শবাদ প্রভৃতি মহৎ গুণ তাঁর চরিত্রে বিন্দুমাত্র ছিল না। তাই বিনা দ্বিধায় তিনি ছিদামকে পরামর্শ দিয়েছেন—"দেখ, ইহার এক উপায় আছে। তুই এখনই থানায় ছুটিয়া যা—বল্‌গে তোর বড়ভাই ছুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।"

পল্লীসমাজে এই রামলোচন চক্রবর্তীর মত মানুষই রাতকে দিন দিনকে রাত করে, মামলা-মোকদ্দমায় মিথ্যে সাক্ষ্য দেয় এবং এইভাবে দু পয়সা রোজগার করে। শরৎ সাহিত্যে রামলোচনদের মত অসংখ্য চরিত্রের সাক্ষাৎ আমরা পেয়েছি।

হাকিমের কাছে রামলোচন সাক্ষ্য দিতে গিয়ে নিজের কুপরামর্শের কথা সম্পূর্ণ গোপন করে নিজেকে সাধু প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছেন। বলেছেন, "আমি কহিলাম খবরদার হারামজাদা, আদালতে একবর্ণও মিথ্যা বলিস না—এতবড়ো মহাপাপ আর নাই।" কিন্তু সে নিজে যে কতবড় মিথ্যেবাদী সে কথা হাকিম জানতে না পারলেও 'শাস্তি' গল্পের পাঠকের তা অজানা নয়।

রামলোচনের চরিত্রের একটি মাত্র গুণ কিঞ্চিৎ প্রশংসার দাবী রাখে, তা হল প্রথমটায় তিনি চন্দরাকে রক্ষা করবার চেষ্টায় অনেকগুলো গল্প বানিয়ে তুলে হাকিমের

বিশ্বাস উৎপাদনে চেষ্টা করেছিলেন। এবং কি কথা বললে চন্দরা হত্যাপরাধের দায় থেকে অব্যাহতি পাবে তিনি তাও ছিদামকে শিখিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যখন বুঝলেন যে, চন্দরা নিজেই ফাঁসিকাঠের দিকে এগিয়ে চলেছে, তখন রামলোচন ভাবলেন—"ওরে বাবা রে, শেষকালে কি মিথ্যা সাক্ষের দায়ে পড়িব। যেটুকু জানি সেটুকু বলা ভালো, এই মনে করিয়া রামলোচন যাহা জানে তাহাই বলিল।"

'শাস্তি' গল্পের রামলোচন চক্রবর্তী পল্লীসমাজের এক বহু পরিচিত ধূর্ত স্বার্থপর চরিত্র। যে চরিত্র সর্বকালে সর্ব যুগেই আমাদের সমাজে বিচরণ করে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পে সমসাময়িক পল্লীবাংলার যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে সংক্ষেপে তার পরিচয় দাও।

উত্তর। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্পে পল্লীবাংলার অসংখ্য ছবি ধরা পড়েছে। এ ছবি মানবসংসারের, এ ছবি প্রকৃতির। রবীন্দ্রসাহিত্যে সাধারণ মানুষের সংসারের ছবি প্রতিফলিত হয় নি বলে কোনো কোনো সমালোচক মনে করেন। এবং রবীন্দ্রনাথ নিজেও সে-অভিযোগ মেনে নিয়ে তাঁর 'ঐকতান' কবিতায় বলেছেন—

"চাষি ক্ষেতে চালাইছে হাল
তাঁতি ব'সে তাঁত বোনে, জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে চলিতেছে সমস্ত সংসার।
অতি ক্ষুদ্র অংশে তার সম্মানের চিরনির্বাসনে
সমাজের উচ্চমঞ্চে বসেছি সংকীর্ণ বাতায়নে।
মাঝে মাঝে গেছি আমি ও পাড়ার প্রাঙ্গণের ধারে ;
ভিতরে প্রবেশ করি সে শক্তি ছিল না একেবারে।"

সমালোচকদের অভিযোগের উত্তরেই কবিগুরু এসব কথা বলেছেন। আমরা মনে করি রবীন্দ্রসাহিত্যে সাধারণ মানুষের সুখদুঃখের ছবি ধরা পড়ে নি, এ অভিযোগ সত্য নয়। বিশেষত, ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে তো নয়ই। কারণ, ছোটোগল্প রচনার কালে রবীন্দ্রনাথ বাস করতেন পদ্মাতীরে পূর্ব বাংলায়। পদ্মাতীরে বসেই তিনি শুনেছেন মাটির মানুষের অন্তরের সুর। তাই বাংলার গ্রাম্যজীবন, একান্নবর্তী পরিবার, স্বার্থ-বিরোধ, আত্মত্যাগ, প্রেমপ্রীতি, তাঁর গল্পে "ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ-কথা" হয়ে দেখা দিয়েছে।

'শাস্তি' গল্পে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে পদ্মাতীরের গ্রামীণ সমাজের একটি সার্থক ছবি ধরা পড়েছে। যদিও আলোচ্য গল্পটি পরিবারকেন্দ্রিক,—তবু নানাভাবে সেযুগের সমাজচিত্র গল্পের উপর প্রতিফলিত হয়েছে।

'শাস্তি' গল্পের কেন্দ্রে আছে দরিদ্র একটি কুরি পরিবার। দুখিরাম রুই আর ছিদাম রুই ছিল সে যুগের দরিদ্র মানুষের প্রতিনিধি। তারা পরের বাড়িতে অথবা ক্ষেতে জন-খেটে সংসার চালাত। সামান্য জমিজমা হয়তো তাদের কিছু ছিল, কিন্তু তা সামান্যই। জমির আয়ে তাদের সংসার চলত না, তাই কুরি ভ্রাতাদের জন খাটাই ছিল মুখ্য জীবিকা। অবশ্য ঘটনার দিন জন খাটতে না গেলে কুরিভ্রাতারা পদ্মাতীরে জলিধান কাটতেই যেত। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "বর্ষায় চর ভাসিয়া যাইবার পূর্বেই ধান কাটিয়া লইবার জন্যে দেশের দরিদ্র লোকমাত্রেই কেহবা নিজের খেতে, কেহবা পাট কাটিতে নিযুক্ত হইয়াছে ; কেবল কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল।"

অসহায় অন্নহীন দরিদ্র মানুষগুলির উপর জমিদারশ্রেণীর অত্যাচার ছিল সেযুগের এক সামাজিক ঘটনা। রবীন্দ্রনাথ নিজে জমিদার হয়েও জমিদারশ্রেণীর অত্যাচারের কথা 'শাস্তি' গল্পে তুলে ধরতে দ্বিধা করেন নি। এই দরিদ্র কুরি পরিবার হয়তো জমিদারের খাজনা পরিশোধ করতে পারে নি ; তাই দেখি, "কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারি ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটা কতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্তদিন খাটিয়াছে। ...উচিতমতো পাওনা মজুরি পায় নাই, এবং তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটু কথা শুনিতে হইয়াছে সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।"

সমাজে দুর্বলের উপর সবলের অত্যাচারের ছবি 'শাস্তি' গল্পে রবীন্দ্রনাথ তুলে ধরেছেন। এ প্রসঙ্গে অমর কথাশিল্পী তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্মরণীয় ; "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের রথযাত্রাই আমাদের গত দেড় শতাব্দীব্যাপী সংস্কৃতির একটা বৃহদংশ রচনা করেছে, সেই রথযাত্রায় বাংলা দেশে জমিদারীর নাটমঞ্চ আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখর হয়েছে, সংস্কৃতির মেলা জমজমাট হয়েছে, সেই রথযাত্রার কল্যাণে ও প্রসাদে উদ্ভূত মধ্যবিত্তশ্রেণী সেই বাজারে হাসিমুখে কেনাকাটা করেছে এসবই সত্য ; কিন্তু তারচেয়ে আরও সত্য এই যে, যে অগণিত নির্বাক দরিদ্রের উপর বংশানুক্রমিকভাবে রথের দড়ি টানার ভার পড়েছিল, তাদের কতজনের শ্রমের স্বেদজলে ও ক্লেশের অশ্রুজলে সেই রথের গতিপথ কত পিচ্ছিল হয়েছে, এবং সেই জগদ্দল যন্ত্রের চাকায় যে কতজনের অস্থিপঞ্জর চূর্ণ হয়ে গিয়েছে তার হিসাব এই বৃহৎকালব্যাপী সংস্কৃতির পৃষ্ঠায় কদাচিৎ লিপিবদ্ধ হয়েছে। যে যৎসামান্য দুর্লভ স্থানে তার কথা ধরা আছে তার মধ্যে শাস্তি গল্প একটি। প্রায় অন্তেবাসী একটি দরিদ্র পরিবারের এই কাহিনীতে সেই অস্থি পঞ্জর নিঃশেষে চূর্ণ হবার নিঃশব্দ ইতিহাস, পরম শ্রদ্ধা ও একান্ত বেদনার সঙ্গে বিধৃত হয়ে আছে।"

জমিদারির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে রামলোচন চক্রবর্তীর মতো মধ্যস্বত্বভোগী একদল মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল। দুখিরাম ছিল রামলোচন খুড়োর কোর্ফা প্রজা।

বলা বাহুল্য দরিদ্র এই মানুষটির খাজনা বাকী পড়েছিল, সেই খাজনার তাগাদায় রামলোচন যখন তখন কুরিদের বাড়িতে আসতেন। ঘটনার দিনেও রামলোচন খুড়োকে আমরা কুরিদের বাড়িতে দেখতে পাই। এই শ্রেণীর মানুষ মামলামোকদ্দমায় দুর্বল অসহায় মানুষের মন্ত্রণাদাতার ভূমিকা গ্রহণ করে। এখানেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ছিদাম যখন বলে—"ঝগড়া করিয়া ছোটো বউ বড়ো বউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।" তখন রামলোচন চক্রবর্তীকে বলতে শুনি—"তুই এখনই থানায় ছুটিয়া যা—বলগে, তোর বড়ো ভাই দুখি সন্ধ্যাবেলায় ঘরে আসিয়া ভাত চাহিয়াছিল, ভাত প্রস্তুত ছিল না বলিয়া স্ত্রীর মাথায় দা বসাইয়া দিয়াছে।"

পল্লীসমাজে এই জাতীয় মানুষ রাতকে দিন, দিনকে রাত করত—মামলামোকদ্দমার পরামর্শ দিত এবং মাঝখান থেকে মুনাফা লুঠত। এই জাতীয় চরিত্র পল্লীবাংলায় সে যুগেও ছিল আজও আছে।

রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য ছোটোগল্পে সাধারণ মানুষের দারিদ্র্যের কিছু কিছু চিত্র থাকলেও তা কবির সামগ্রিক জীবনবোধের রসে জারিত হয়ে শেষ হয় এক কাব্যিক আবেদনে। কিন্তু 'শাস্তি' একেবারেই ভিন্নধর্মী গল্প। কোনো কাব্যের বাষ্প তাকে মেদুর করে তোলে নি। পল্লীজননীর এ যেন এক সুতীব্র আর্তনাদের বাঙ্ময় মূর্তি। তাই যে-সমাজের ছবি এখানে উপস্থিত তা সজীব ও মর্মস্পর্শী।

প্রশ্ন ২। 'শাস্তি' গল্পের নায়ক কে? যুক্তিসহ আলোচনা কর।

উত্তর। সাধারণত গল্প-উপন্যাস এবং নাটকে কেন্দ্রীয় চরিত্রকেই বলা হয় নায়ক। অনেক সময় লেখক কেন্দ্রীয় বা মুখ্য চরিত্র অপেক্ষা কোনো অপ্রধান চরিত্রকেই বেশি গুরুত্ব দেন, যখন সেই গৌণ চরিত্রটি লেখকের জীবনদর্শন প্রচারের বাণীমূর্তি হয়ে ওঠে। কোনো রচনায় নায়ক হবার যোগ্যতা সেই চরিত্রেরই প্রাপ্য যে চরিত্র ভয়ঙ্কর কিছু করে এবং সেই কর্মের ফল নিজেই ভোগ করে। ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই-সব চরিত্র পাঠকের সহানুভূতি থেকে কখনই বঞ্চিত হয় না। মনে রাখতে হবে রচনা বিয়োগান্তক হলে নায়কের চারিত্রিক ত্রুটির জন্যেই ট্র্যাজিডি ঘটবে।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, নায়ক হবার জন্যে কেবল কেন্দ্রীয় বা মুখ্য চরিত্রই যথেষ্ট নয়; নায়ক হবার দাবি কেবল তার—যে লেখকের জীবনদর্শনের মুখপাত্র হবে, অথবা এমন কিছু করবে এবং কৃতকর্মের ফলভোগ করবে।

উদাহরণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস এবং ডি. এল. রায়ের 'সাজাহান' নাটকের কথা বলা যায়। 'চন্দ্রশেখর'-এ প্রতাপ এবং 'সাজাহান'-এ ঔরংজীব যথাক্রমে চন্দ্রশেখর এবং সাজাহান অপেক্ষা অনেক বেশি সক্রিয়। তথাপি নায়ক হল চন্দ্রশেখর এবং সাজাহান।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল 'শাস্তি' গল্পের নায়ক বিচার। 'শাস্তি' গল্পের প্রধান চরিত্র চারটি। দুখিরাম রুই, ছিদাম রুই এবং দুই বউ রাধা ও চন্দরা। এই চরিত্র-চারটির মধ্যে নায়ক হবার দাবী রাখে ছিদাম রুই এবং তার স্ত্রী চন্দরা।

গল্পের প্রথমেই আমরা দেখি ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর দুখিরাম উত্তেজনার বশে স্ত্রী রাধাকে দা দিয়ে আঘাত করে এবং সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। এর পর থেকে সম্পূর্ণ গল্পের গতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা চলে যায় ছোটোভাই ছিদামের হাতে। ছিদাম রামলোচন চক্রবর্তীর কাছে বধূহত্যার এক কাল্পনিক কাহিনী তৈরি করে বলেছে—"ঝগড়া করিয়া ছোটো বউ বড়ো বউয়ের মাথায় এক দায়ের কোপ বসাইয়া দিয়াছে।"

ছিদামের এই কাল্পনিক গল্পকে ভিত্তি করেই চন্দরা 'শাস্তি' গল্পের কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায়। ছিদামের হঠকারিতায় তার ওপর এসে পড়ে জীবন নাট্যমঞ্চের পাদ-প্রদীপের আলো। ছিদামের প্রেমহীনতা যদি হঠকারী অভিযোগের কারণ হত তাহলে সে নায়ক না হয়ে হত ভিলেন চরিত্র। কিন্তু চন্দরার প্রতি ছিদামের ভালোবাসা ছিল, চন্দরাও তার স্বামীকে ভালোবাসত। স্বামী-স্ত্রীর মান-অভিমানেই দাম্পত্য প্রেমের মাধুর্য প্রকাশিত হয়েছে।

স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসা থাকলেও ছিদামের মধ্যে অন্ধ ভ্রাতৃস্নেহ সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল।

এই অন্ধ ভ্রাতৃস্নেহই ছিদাম চরিত্রের ত্রুটি, যা রিপু হয়ে বিয়োগান্তক গল্পে এসেছে। রামলোচন চক্রবর্তীর পরামর্শের উত্তরে তাই ছিদামকে বলতে শুনি : "ঠাকুর, বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।"

অন্ধ ভ্রাতৃস্নেহই তাকে চন্দরার কাঁধে হত্যাপরাধ তুলে দিতে প্ররোচিত করেছে। সেই সঙ্গে ছিদাম তার সরল বিশ্বাসে স্ত্রীকে আশ্বাস দিয়েছে—"যাহা বলিতেছি তাই কর্ তোর কোনো ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।"

এরপর গল্পের গতি নদীর বাঁধভাঙা বন্যার মতো দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে, আর সমস্ত শক্তি দিয়ে ছিদাম চেষ্টা করেছে গল্পের পরিণতি তার নিয়ন্ত্রণে আনতে। কিন্তু আইন-না-জানা সহজ সরল এই মানুষটির হৃদয় ব্যথা বেদনায় ক্ষতবিক্ষত হয়েছে কিন্তু তার মনস্কামনা পূর্ণ হয় নি।

ছিদাম জীবনের ট্র্যাজিডিতে সহায়তা করেছে তার স্ত্রী চন্দরার অভিমান। স্বামীর প্রতি বুক-ভরা অভিমান নিয়ে চন্দরা এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে। ইচ্ছে করেই সে আইনের হাত এড়াবার চেষ্টা করে নি। পুলিশী জেরার উত্তরে শিখিয়ে-দেওয়া যে কথাকটি বললে সে হয়তো আইনের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারত, তা না বলে সে নিজের মুখেই মিথ্যা হত্যাপরাধ স্বীকার করে নিয়েছে। জজ যখন বলেছেন, "তুমি যে অপরাধ স্বীকার করিতেছ তাহার শাস্তি কী জানো।" উত্তরে চন্দরা বলেছে—'না'। এবং হত্যার শাস্তি ফাঁসি একথা জেনে বলেছে, "ওগো তোমার পায়ে পড়ি, তাই দাও না সাহেব।"

অন্যদিকে সহজসরল হতভাগ্য ছিদাম শেষ মুহূর্তে স্ত্রীকে বাঁচাবার জন্যে আদালতে দাঁড়িয়ে সমস্ত অপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নিতে চেয়ে বলেছে—"আমি খুন করিয়াছি।" কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে গেছে। বহু চেষ্টা করেও ছিদাম চন্দরাকে

ফাঁসির হাত থেকে বাঁচাতে পারে নি। চন্দরার শাস্তি হয়েছে মৃত্যুদণ্ড। মৃত্যুর মধ্য দিয়ে চন্দরা গ্লানিময় ব্যর্থ জীবনের হাত থেকে অব্যাহতি পেয়েছে। কিন্তু যে শাস্তি সে রেখে গেছে তার স্বামী ছিদামের জন্য তার সীমা নেই।—মৃত্যু চন্দরাকে শাস্তি নয় শান্তি দিয়েছে, কিন্তু বেঁচে থেকেও ছিদামকে মৃত্যুর চেয়ে বেশি শাস্তি ভোগ করতে হবে, এ কথা ভেবে আমাদের মনে অনুকম্পা জাগে। তাই আলোচ্য গল্পের নায়ক বোধ হয় আর কেউ নয়—ছিদাম রুই।

প্রশ্ন ৩। "আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সেও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণ পূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে।"—কোন্ প্রসঙ্গে কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে। উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চরিত্রের কোন্ দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে আলোচনা কর।

উত্তর। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের একটি বিশিষ্ট চরিত্র চন্দরা সম্পর্কে লেখক নিজেই এই কথাগুলি বলেছেন।

কুরিপরিবারের দুই ভাই দুখিরাম এবং ছিদাম সারাদিন জমিদারের কাছারিঘরের কাজ করে অভুক্ত এবং ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফেরার পর সেদিনকার পারিবারিক পরিবেশ সম্পর্কে লেখকের আলোচ্য মন্তব্য।

কুরি পরিবারের দুই বধূ রাধা এবং চন্দরা সাধারণ ব্যাপার নিয়ে সারাদিন কলহ-বিবাদ করত। তাদের তীব্র কণ্ঠস্বর শুনে লোকে বলত, "ওই রে, বাধিয়া গিয়াছে।"

সেদিনও কাজে বেরুবার সময় দুখিরাম এবং ছিদাম দুই বধূর কলহ শুনে গিয়েছিল। লেখকের ভাষায়, "তখন তাহাদের দুই স্ত্রীর মধ্যে বকাবকি চেঁচামেচি চলিতেছে।" এই ঝগড়া চেঁচামেচি সেদিন তুঙ্গে ওঠে। অর্থাৎ সারাদিন রাধা-চন্দরা ঝগড়া ছাড়া সংসারের কাজ কিছুই করে নি।

সময়টা ছিল বর্ষাকাল। এই ঋতুর বৈশিষ্ট্য হল প্রবল বর্ষণের পরেই গুমট আবহাওয়া সৃষ্টি। সেদিন কুরি পরিবারের অবস্থাও ছিল এই বর্ষা ঋতুর মত। বিশেষ করে চন্দরার অশ্রুবর্ষণের সঙ্গে লেখক বর্ষাঋতুর তুলনা করেছেন। কারণ ঝগড়াজনিত প্রবল ক্রন্দনের পর সেও গোমড়া মুখে বসেছিল। ক্রন্দনের সঙ্গে বর্ষণ এবং গুমট আবহাওয়ার সঙ্গে চন্দরার গোমড়া মুখের তুলনা করা হয়েছে।

আলোচ্য গল্পে আমরা যখন চন্দরার সাক্ষাৎ পাই তখন সে কৈশোর-যৌবনের সন্ধিস্থলে দাঁড়িয়ে স্বামীর সঙ্গে মান-অভিমান এবং বড়ো জায়ের সঙ্গে কলহ-বিবাদে মত্ত। কিশোরী বধূর স্বভাব তার আচার-আচরণ এবং ব্যবহারে প্রকট হয়ে উঠেছিল। স্বামীর সঙ্গে তার মান-অভিমান চলে, কলহ বিবাদ হয় বড়ো জায়ের সঙ্গে। তাদের কলহ-বিবাদ পাড়ার লোকের কাছে নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার বলেই মনে হত।

স্বামীর প্রতি চন্দরার ভালোবাসা কম ছিল না, এই ভালোবাসা থেকেই জন্মেছে ঈর্ষা এবং অভিমান। চন্দরার চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল এই অভিমানবোধ।

যে অভিমানের জন্য সে একদিন নির্দোষ হয়েও দোষের বোঝা কাঁধে তুলে ফাঁসি কাঠকে বরণ করে নেয়।

প্রশ্ন ৪। "ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজকর্মে কোথাও একদণ্ড গিয়া সুস্থির হইতে পারে না।"—ছিদামের এমন অস্থিরতার কারণ কী? কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? ছিদাম চরিত্র আলোচনা কর।

উত্তর। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের ছিদাম এবং চন্দরা দুজনেই ছিল বয়সে নবীন। তরুণ দম্পতীর মান-অভিমান, ঈর্ষা প্রভৃতি গুণগুলি দুজনের মধ্যেই বর্তমান ছিল। ছিদাম ছিল যেন কালো পাথরের খোদাই-করা মূর্তি। লেখকের ভাষায়—"লেশমাত্র বাহুল্যবর্জিত এবং কোথাও যেন কিছু টোল খায় নাই।"

এহেন অপূর্ব দেহধারী ছিদাম গ্রাম্যবধূদের সৌন্দর্যের প্রতি উদাসীন ছিল না। ফলে চন্দরা মনে করত—"আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্‌দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।"

স্বামীর মনে ঈর্ষানল জ্বালাবার জন্যে চন্দরাও কিছু বাড়াবাড়ি দেখাতে লাগল। সে যখন-তখন ঘাটে যেত, পাড়া বেড়িয়ে এসে জনৈক কাশী মজুমদারের মেজো ছেলের প্রশংসা করত। কুরি পরিবারের মর্মান্তিক ঘটনা ঘটবার আগে ছিদাম এবং চন্দরার মধ্যে কিছুদিন থেকেই একটা দাম্পত্য কলহ চলছিল। স্বামীর মনে চন্দরা ঈর্ষার উদ্রেক করতে গিয়ে যে-সব অভিনয় করেছিল তারই ফলে ছিদামের মন অস্থির হয়ে ওঠে। তাই লেখক বলেছেন, "ছিদামের দিন ও রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল।"

চেহারা এবং চরিত্রে ছিদাম ছিল ঠিক দুখিরামের বিপরীত চরিত্র। লেখকের ভাষায় "একখানি চকচকে কালো পাথরে কে যেন বহু যত্নে কুঁদিয়া গড়িয়া তুলিয়াছে।"

চেহারার মতো তার চরিত্রেও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। অপরকে আকর্ষণ করার ক্ষমতা যেমন ছিল, ঠিক তেমনি ছিল রসসিক্ত একটি শিল্পীমন।

যুবতী স্ত্রী চন্দরার প্রতি ছিদামের ভালোবাসা কম ছিল না। লেখক বলেছেন—"ছিদাম যুবতী স্ত্রীকে একটু বিশেষ ভালোবাসিত।" তাদের স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হত আবার ভাব হত। কেউ কাউকে পরাস্ত করতে পারত না। দুজনেই দুজনকে ধরে রাখবার চেষ্টা করত, এটাই হয়তো অল্পবয়সের প্রেমের ধর্ম।

ছিদাম মনে করত চন্দরা যেমন চটুল চঞ্চল প্রকৃতির স্ত্রীলোক, তাকে বিশ্বাস নেই। আবার চন্দরাও মনে করত—"আমার স্বামীটির চতুর্দিকেই দৃষ্টি, তাহাকে কিছু কষাকষি করিয়া না বাঁধিলে কোন্‌দিন হাতছাড়া হইতে আটক নাই।"

চন্দরা স্বামীর মনে ঈর্ষার আগুন জ্বালিয়ে তুলেছিল। ফলে ছিদামের "দিন এবং রাতগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজে-কর্মে কোথাও একদণ্ড গিয়া সুস্থির হইতে পারে না।"

এখানে ছিদাম চরিত্রের যে পরিচয় পাই তা হল প্রেমিক মূর্তি। কিন্তু এই প্রেমিক ছিদামের আর একটা রূপ ছিল, যেখানে সে স্নেহপ্রবণ ভ্রাতা। হয়তো ভ্রাতৃপ্রেম তার কাছে দাম্পত্য প্রেমের চেয়ে বড়ো ছিল। তাই সে বলতে পারে, "বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।"

প্রশ্ন ৫। "দেখিল এক অঞ্জলি পারদকে মুষ্টির মধ্যে শক্ত করিয়া ধরা যেমন দুঃসাধ্য এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা অসম্ভব।"—'মুষ্টিমেয় স্ত্রী' কাকে বলা হয়েছে? আলোচ্য অংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। কুরি পরিবারের ছোটো বউ চন্দরাকে কবিগুরু 'মুষ্টিমেয় স্ত্রী' বলে উল্লেখ করেছেন। লেখকের ভাষায়, এই কিশোরী বধূর "শরীর ছিল অনতিদীর্ঘ, বেশ ছোটো এবং সুডোল।" এটাই 'মুষ্টিমেয় স্ত্রী' বলার কারণ।

কিছুদিন থেকেই ছিদাম এবং চন্দরার মধ্যে একটা মান-অভিমান বা দাম্পত্য কলহ চলছিল। এই কলহে কেউ কারও কাছে পরাজিত হতে রাজি ছিল না। স্বামীর মনে ঈর্ষার উদ্রেক করবার জন্যে চন্দরা যখন-তখন পাড়ায় বেড়াতে যেত এবং জনৈক কাশী মজুমদারের মেজ ছেলের প্রশংসা করত।

একদিন চন্দরাকে স্বেচ্ছাবিচরণ থেকে বিরত করবার জন্যে ছিদাম তাকে ঘরের মধ্যে বন্দী করে রাখে। কিন্তু চঞ্চলা কিশোরী বধূ চন্দরা সুযোগ পেয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে খামারবাড়িতে পালিয়ে যায়। ছিদাম বহুকষ্টে অনেক সাধ্যসাধনায় তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হলেও সম্পূর্ণ নিজের বশে রাখতে পারে না। কোনো রকম শাসন বা বিধিবিধান মেনে চলার মতো মানসিকতা কিশোরী এই বধূর ছিল না। চন্দরা চরিত্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে লেখক আলোচ্য অংশের অবতারণা করেছেন।

পারদ একপ্রকার তরল ও পিচ্ছিল পদার্থ। তাকে জোর করে হাতের মুঠোয় ধরে রাখা যায় না। চন্দরাও ছিল এক-অঞ্জলি পারদের মতো। পারদকে যেমন হাতের মুঠোয় বন্দী করা যায় না, তেমনি কিশোরী চন্দরার মনকে জোর করে কঠিন বিধি-বিধানের বন্ধনে বন্দী করা সম্ভব ছিল না। এটাই হয়তো কিশোরীমনের স্বভাব। যা ভালোবাসায়, স্নেহ-মমতায় ধরে রাখতে হয়, তাকে জোর করে কঠিন বন্ধনে আবদ্ধ করতে চাইলে তা পারদের মতোই বন্ধন-রূপ বেড়ার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সর্বনাশের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে চন্দরার স্বামী ছিদাম এই সত্য উপলব্ধি করেছিল।

প্রশ্ন ৬। "একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না।" —কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? কেন সে এমন ব্যবহার করেছিল?

উত্তর। 'শাস্তি' গল্পে কুরি পরিবারের ছোটো বউ চন্দরা সম্পর্কে লেখক এই কথাগুলি বলেছেন।

কিশোরী বধূ চন্দরা ছিল জেদী এবং অভিমানী। কোনো রকম নিষ্ঠুর শাসন মেনে চলা ছিল তার স্বভাববিরুদ্ধ। স্বামী ছিদামের সঙ্গে কিছুদিন থেকেই তার মান-অভিমান এবং দাম্পত্য কলহ চলছিল। এমন সময় ঘটে গেল এক সর্বনাশা ঘটনা। দুখিরাম রুই রাগের মাথায় একদিন দায়ের আঘাতে তার স্ত্রী রাধাকে হত্যা করে বসে। দুখিরামকে বাঁচাবার জন্যে ভাই ছিদাম হত্যাপরাধ চন্দরার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। ছিদাম বলেছিল—"যাহা বলিতেছি তাই কর্, তোর কোনো ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।"

অভিমানে অপমানে চন্দরা এর প্রতিশোধ গ্রহণ করল। কথা ছিল পুলিশ এবং জজের কাছে চন্দরা বলবে, বড়ো বউ তাকে বঁটি নিয়ে আক্রমণ করেছিল, তখন আত্মরক্ষার জন্যেই দা নিয়ে ঠেকাতে গিয়ে হঠাৎ কেমন করে লেগে গেছে।

কিন্তু পুলিশের কাছে চন্দরা আত্মপক্ষ সমর্থনের কোনো চেষ্টাই করে নি। পুলিশের প্রশ্নের উত্তরে সে বলে, "হ্যাঁ, আমি খুন করিয়াছি।" আরও বলে, "আমি তাহাকে দেখিতে পারিতাম না।"

চন্দরার উত্তর শুনে সকলেই অবাক হয়ে যায়। ছিদাম বলে ওঠে, "উনি ঠিক কথা বলিতেছেন না।" দারোগা তাকে থামিয়ে দিয়ে চন্দরাকে নানাভাবে প্রশ্ন করেন, কিন্তু প্রত্যেক বার সেই একই উত্তর পান। অল্পবয়সী বধূ বলেই হয়তো অনেকেই চন্দরার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন, কিন্তু যে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে এগিয়ে চলেছে তাকে রক্ষা করবে কে!

এইভাবে একগুঁয়ে চন্দরা অভিমান করেই নিজে শাস্তি নিয়ে স্বামী ছিদামকে মর্মান্তিক আঘাত দিতে চেয়েছিল।

প্রশ্ন ৭। "আমি তোমাকে ছাড়িয়া আমার এই নবযৌবন লইয়া ফাঁসি-কাঠকে বরণ করিলাম। আমার ইহজন্মের শেষবন্ধন তাহার সহিত।"—বক্তা কে? বক্তা কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা বলেছে? আলোচ্য অংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। আলোচ্য অংশটি রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের চন্দরার স্বগত উক্তি। এই কথাগুলি সে মনে মনে স্বামী ছিদামকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল।

দুখিরাম রাগের বশে হঠাৎ তার স্ত্রী রাধাকে দায়ের আঘাতে হত্যা করে। সঙ্গে সঙ্গে ছিদাম হত্যাপরাধ চন্দরার ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য, নিজের ভাইকে রক্ষা করা। কিন্তু স্ত্রীর প্রতি তার ভালোবাসাও কম ছিল না। ছিদামের পরিকল্পনা ছিল একটি মিথ্যা গল্প রচনা করে পরে চন্দরাকে শাস্তিমুক্ত করা। কিন্তু অভিমানী চন্দরা ছিদামের শেখানো বুলি পুলিশের কাছে না বলে নিজেই নিজের শাস্তির পথ প্রশস্ত করে নেয়।

আলোচ্য অংশে অভিমানী চন্দরা মনে মনে স্বামীকে উদ্দেশ্য করে এই কথাগুলি বলেছিল। স্বামীর সঙ্গে স্ত্রীর বন্ধনকে হিন্দুরা জন্মজন্মান্তরের অচ্ছেদ্য এক ধর্মীয় বন্ধন বলে মনে করে। প্রচণ্ড অভিমানে চন্দরা তার স্বামীর সঙ্গে দাম্পত্যবন্ধন ছিন্ন করে মনে মনে

ফাঁসিকাঠকে বরণ করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল। এক বিপর্যস্ত মানসিকতায় চন্দরার কাছে দাম্পত্য জীবনের চেয়ে ফাঁসিকাঠ অর্থাৎ মৃত্যুই অনেক বেশি কাম্য বলে মনে হয়েছে। যে কিশোরী বধূ তার স্বপ্ন, ভালোবাসা নিয়ে স্বামীর ঘর করতে পারে নি তার বদলে জোর করেই তার কপালে পরিয়ে দেওয়া হয়েছে হত্যারূপ অপরাধের কলঙ্ক-কালিমা, স্বাভাবিক ভাবেই তার কাছে ফাঁসিকাঠ অর্থাৎ মৃত্যু এক অভিনব মুক্তিদাতা, তাই সে পরম কামনার বস্তু।

প্রশ্ন ৮। "যে দিন একরত্তি বয়সে একটি কালোকালো ছোটখাটো মেয়ে তাহার গোলগাল মুখটি লইয়া খেলার পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুর ঘরে আসিল সেদিন রাত্রে শুভলগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত।"—কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে?

উত্তর। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি'-গল্পের চন্দরা সম্পর্কে লেখক এই কথাগুলি বলেছেন।

দুখিরাম সাময়িক উত্তেজনার বশে হঠাৎ স্ত্রী রাধাকে দা দিয়ে আঘাত করে, এবং সেই আঘাতেই রাধার মৃত্যু হয়। বড়ো ভাইকে বাঁচাবার জন্যে ছোটো ভাই ছিদাম এই হত্যাপরাধ চন্দরার উপর চাপিয়ে দেয়। ছিদাম তার স্ত্রী চন্দরাকে অপরাধ নিজে স্কন্ধে নেবার জন্যে অনুরোধ করল। সে তো একেবারে বজ্রাহত হয়ে গেল। ছিদাম তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল, "যা বলছি তাই কর্, তোর কোন ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচিয়ে দিব।"

কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড অভিমানে চন্দরা নিজেই নিজের মুক্তির পথ, বাঁচার পথ রুদ্ধ করে দেয়। ছিদামের বা রামলোচন চক্রবর্তীর তৈরি-করা পরিকল্পনা চন্দরা সম্পূর্ণ বানচাল করে দিয়ে প্রাণপণে ফাঁসিকাঠকেই বরণ করে নেয়।

অল্পবয়সে চন্দরার বিয়ে হয়। তার বিবাহিত জীবনও স্বল্পকালের। একদিন খেলার পুতুল ফেলে চন্দরা যখন বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর ঘর করতে এসেছিল সেই শুভদিনের সঙ্গে ফাঁসির পূর্ব রাত্রের কতোই না প্রভেদ। শুভদিনে বসে পরবর্তী কালের অশুভদিনের পদধ্বনি শোনা যায় না বা কল্পনাও করা যায় না। চন্দরার জীবনের অশুভক্ষণে দাঁড়িয়ে লেখক উপলব্ধি করেছেন মানুষের এক অসহায় রূপের ছবি।

॥ অনুশীলনী ॥

১। ছোটোগল্পে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্বের পরিচয় দাও।

২। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' ছোটোগল্প হিসাবে কতটা সার্থক আলোচনা কর।

৩। 'শাস্তি' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

৪। 'শাস্তি' গল্পের পল্লীবাংলার যে সামাজিক পরিবেশ ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও। অথবা, 'শাস্তি' গল্পে সে-যুগের যে ছবি ফুটে উঠেছে তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

৫। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পের নায়ক কে? যুক্তিসহ আলোচনা কর। অথবা, 'শাস্তি' গল্পের নায়ক ছুখিরাম না ছিদাম আলোচনা কর।

৬। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পে প্রকৃতপক্ষে কার শাস্তি হয়েছে যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৭। চরিত্র আলোচনা কর :—ছুখিরাম রুই, ছিদাম রুই, রাধা, চন্দরা।

৮। 'শাস্তি' গল্পের একটি গৌণ চরিত্র আলোচনা কর।

৯। "আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সেও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণপূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্তি দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে।"—কার সম্পর্কে এই কথাগুলি বলা হয়েছে?

১০। "ছিদামের দিন এবং রাত্রিগুলির মধ্যে কে যেন বিষ মিশাইয়া দিল। কাজে-কর্মে কোথাও একদণ্ড গিয়া সুস্থির হইতে পারে না।"—এই অস্থিরতার কারণ কী? কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে? ছিদামের চরিত্র আলোচনা কর।

১১। "এই মুষ্টিমেয় স্ত্রীটুকুকেও কঠিন করিয়া ধরিয়া রাখা তেমনি অসম্ভব।"—মুষ্টিমেয় স্ত্রী কে? আলোচ্য অংশের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র আলোচনা কর।

১২। 'একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে।'—কার সম্পর্কে একথা বলা হয়েছে? তার এরূপ ব্যবহারের কারণ কি? উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র আলোচনা কর।

১৩। "আমার ইহজন্মের শেষ বন্ধন তাহার সহিত।"—কে, কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলেছে? তার চরিত্র বর্ণনা কর।

১৪। "যেদিন পুতুল ফেলিয়া বাপের ঘর হইতে শ্বশুরঘরে আসিল সেদিন রাত্রের শুভ লগ্নের সময় আজিকার দিনের কথা কে কল্পনা করিতে পারিত?"—কার সম্পর্কে কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে? উদ্দিষ্ট ব্যক্তির চরিত্র আলোচনা করো।

১৫। কোন্ অবস্থায় ছুখিরাম রুই তার স্ত্রী রাধাকে হত্যা করেছিল? কেন তার ভাই এই হত্যাপরাধ ছোটো বউয়ের কাঁধে চাপাল? বিস্তারিত আলোচনা কর।

১৬। কি কারণে চন্দরা মিথ্যা হত্যাপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নিল? তার চরিত্রের সঙ্গে এই কাজ কতটা সঙ্গতিপূর্ণ আলোচনা কর।

বিরিঞ্চিবাবা

রাজশেখর বসু

রাজশেখর বসু : জীবনী : বর্ধমানের বামুনপাড়া গ্রামে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান হাস্যরসিক রাজশেখর বসু জন্মগ্রহণ করেন। বামুনপাড়া রাজশেখরের মাতুলালয়। তাঁর পিতৃভূমি নদীয়া জেলার বীরনগর। পিতার নাম চন্দ্রশেখর বসু। তিনি দ্বারভাঙ্গা মহারাজের এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন।

দ্বারভাঙ্গা থেকে রাজশেখর লেখাপড়া করেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি এখানকার রাজ স্কুল থেকে এণ্ট্রান্স এবং ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে পাটনা কলেজ থেকে এফ. এ-এবং ১৮৯,৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন এবং পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। এরপর রাজশেখর ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে রসায়নে এম. এ. পাশ করেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর দু বছর পরে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন।

এরপর রাজশেখরের কর্মজীবন আরম্ভ হয়। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে সামান্য বেতনের কর্মচারী নিযুক্ত হয়ে নিজ প্রতিভার গুণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং তখনকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ কার্তিক বসুর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। সামান্য কর্মচারী রূপে যে বেঙ্গল কেমিক্যালে রাজশেখর যুক্ত হয়েছিলেন সেই সংস্থার সঙ্গে তিনি উনত্রিশ বছর যুক্ত ছিলেন এবং কালক্রমে কিছুদিন উক্ত কোম্পানীর পরিচালকও হয়েছিলেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পরেও আমৃত্যু তিনি উক্ত কোম্পানীর উপদেষ্টা-রূপে যুক্ত ছিলেন।

বাংলা-সাহিত্যে রাজশেখর বসু 'পরশুরাম' এই ছদ্মনামে পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে তিনি এক অভিনব হাস্যরসের ধারা প্রবাহিত করেন। একটু পরিণত বয়সে রাজশেখর সাহিত্যের দরবারে এলেও তাঁর রচনার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বাংলার রসিকমহলে তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ হল—গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন।

রসরচনা ছাড়াও 'চলন্তিকা' নামে অভিধান ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত প্রভৃতি বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য ও মহাকাব্যের অনুবাদ করেও রাজশেখর খ্যাতি অর্জন করেন।

সাহিত্য রচনা করে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার, একাদেমি পুরস্কার পান এবং 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে বাংলাসাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক পরলোক-গমন করেন।

কাহিনী সংক্ষেপ : সেবার পুজোর সময় চৌদ্দ নম্বর হাবশীবাগান লেনের

মেসে ম্যানেজার নিবারণ মাষ্টার এবং ইন্‌সিওরেন্সের দালাল পরমার্থ ছাড়া সকলেই দেশে চলে যায়। একদিন সন্ধ্যাবেলায় নিবারণ মাষ্টার, পরমার্থ এবং পাশের বাড়ির নিতাইবাবু মেসের বৈঠকখানায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। কথায় কথায় নিতাইবাবু বলেন, 'চিত্তে সুখ নেই দাদা। ঝি বেটী পালিয়েছে, খুকীটার জ্বর, গিন্নী খিট খিট করছেন, আপিসে গিয়েও যে দু-দণ্ড ঘুমুব তার জো নেই, নতুন ছোটসায়েব ব্যাটা যেন চরকি ঘুরছে।' এরপরে আগেকার দিনকাল কত ভালো ছিল এবং মেকেঞ্জি সায়েবের আমলে শ্যামনগরের বরদা মুখুজ্যে আফিম খেয়ে কেমন আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ঘুমুতেন তার চাঞ্চল্যকর কাহিনী শোনালেন নিতাইবাবু। এখন নাকি সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। তাই একটি ভালো সাধুর সাক্ষাৎ পেলে নিতাইবাবু সংসার ত্যাগ করার বাসনাও প্রকাশ করলেন।

পরমার্থ জানায়, সে জগন্নাথ ঘাটে 'মিরচাইবাবা' নামে এক সাধুর দর্শন পেয়েছে। সাধুটি নাকি কেবল লঙ্কা খেয়ে থাকেন। তাঁরও যিনি গুরু তিনি নাকি স্রেফ করাতের গুঁড়ো খেয়ে থাকেন। নিবারণ মাষ্টার জানান, "ও সব হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার মার্গ।"

এমন সময় একটি হ্যাটকোটধারী বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে ঘরে এসে ফরাসের উপর থপ করে বসে পড়ল। এই তরুণের নাম সত্যব্রত।

সত্যব্রতর কাছে নিবারণবাবু ভালো বাবাজী কি স্বামীজীর সন্ধান জানতে চাইলে সত্য জানায়', "বাটা চাই।"

এ প্রসঙ্গে রাজশাহীর তড়িতানন্দ ঠাকুরের কথা ওঠে। কলেজের ছেলেরা যাঁকে বলে রেডিওবাবা। বাবার দুটি টিকি, একটি পজিটিভ, একটি নেগেটিভ। তিনি নাকি আকাশ থেকে ইলেকট্রিসিটি শুষে নেন। স্পার্ক ঝাড়েন এক একটি আঠারো ইঞ্চি লম্বা। কাছে এগোয় কার সাধ্য, সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়ে দেখা করতে হয়।

নিবারণ জানায় মিরচাইবাবা বা রেডিওবাবাকে দিয়ে নিতাইদার কাজ হবে না। কোনো নিরীহ বাবাজীর দরকার।

তখন পরমার্থ বলে, "তবে দমদমায় গুরুপদ বাবুর বাগানে চলুন, বিরিঞ্চিবাবার কাছে।"

সত্যব্রত বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে বলে স্ত্রী-বিয়োগের পর গুরুপদবাবু সত্যই কি রকম বদলে গেছেন এবং একজন গুরুর পাল্লায় পড়েছেন। সত্যব্রত আরও জানায়, কেউ বলে তাঁর বয়স পাঁচ-শ বছর, কেউ বলে পাঁচ হাজার। তিনি ইচ্ছে করলে যা খুশি তাই করতে পারেন। এখনকার মানুষকে আকবরের টাইমে আগ্রাতে অথবা ফোর্থ সেঞ্চুরি বি. সি. তে পাটলিপুত্র নগরে এনে ফেলতে পারেন। কারণ সবটাই আপেক্ষিক। নিবারণ মন্তব্য করেন, "আইনস্টাইনের পসার একেবারে মাটি ?"

পরমার্থ জানায়, আইনস্টাইনও তার রিলেটিভিটি বিদ্যের জন্যে বিরিঞ্চিবাবার কাছে

বিরিঞ্চিবাবা

রাজশেখর বসু

রাজশেখর বসু ঃ জীবনী ঃ বর্ধমানের বামুনপাড়া গ্রামে ১৮৮০ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই মার্চ তারিখে বাংলা সাহিত্যের খ্যাতিমান হাস্যরসিক রাজশেখর বসু জন্মগ্রহণ করেন। বামুনপাড়া রাজশেখরের মাতুলালয়। তাঁর পিতৃভূমি নদীয়া জেলার বীরনগর। পিতার নাম চন্দ্রশেখর বসু। তিনি দ্বারভাঙ্গা মহারাজের এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন।

দ্বারভাঙ্গা থেকে রাজশেখর লেখাপড়া করেন। ১৮৯৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি এখানকার রাজ স্কুল থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৮৯৭ খ্রীস্টাব্দে পাটনা কলেজ থেকে এফ. এ-এবং ১৮৯,৯ খ্রীস্টাব্দে কলকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে রসায়ন এবং পদার্থবিজ্ঞানে অনার্স নিয়ে বি. এ. পাশ করেন। এরপর রাজশেখর ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে রসায়নে এম. এ. পাশ করেন এবং প্রথম স্থান অধিকার করেন। এর দু বছর পরে তিনি আইন পরীক্ষায় পাশ করেন।

এরপর রাজশেখরের কর্মজীবন আরম্ভ হয়। ১৯০৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে সামান্য বেতনের কর্মচারী নিযুক্ত হয়ে নিজ প্রতিভার গুণে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র এবং তখনকার ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাঃ কার্তিক বসুর প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন। সামান্য কর্মচারী রূপে যে বেঙ্গল কেমিক্যালে রাজশেখর যুক্ত হয়েছিলেন সেই সংস্থার সঙ্গে তিনি উনত্রিশ বছর যুক্ত ছিলেন এবং কালক্রমে কিছুদিন উক্ত কোম্পানীর পরিচালকও হয়েছিলেন। ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দে অবসর গ্রহণের পরেও আমৃত্যু তিনি উক্ত কোম্পানীর উপদেষ্টা-রূপে যুক্ত ছিলেন।

বাংলা-সাহিত্যে রাজশেখর বসু 'পরশুরাম' এই ছদ্মনামে পরিচিত। বাংলা সাহিত্যে তিনি এক অভিনব হাস্যরসের ধারা প্রবাহিত করেন। একটু পরিণত বয়সে রাজশেখর সাহিত্যের দরবারে এলেও তাঁর রচনার সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। বাংলার রসিকমহলে তাঁর আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ হল—গড্ডলিকা, কজ্জলী, হনুমানের স্বপ্ন।

রসরচনা ছাড়াও 'চলন্তিকা' নামে অভিধান ও বিভিন্ন বিষয়ের প্রবন্ধ গ্রন্থও তিনি রচনা করেন। রামায়ণ, মহাভারত, মেঘদূত প্রভৃতি বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্য ও মহাকাব্যের অনুবাদ করেও রাজশেখর খ্যাতি অর্জন করেন।

সাহিত্য রচনা করে তিনি রবীন্দ্র পুরস্কার, একাদেমি পুরস্কার পান এবং 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত হন। কলকাতা এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সাম্মানিক 'ডক্টরেট' উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৯৬০ খ্রীস্টাব্দে বাংলাসাহিত্যের এই শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক পরলোক-গমন করেন।

কাহিনী সংক্ষেপ ঃ সেবার পুজোর সময় চৌদ্দ নম্বর হাবশীবাগান লেনের

মেসে ম্যানেজার নিবারণ মাষ্টার এবং ইন্‌সিওরেন্সের দালাল পরমার্থ ছাড়া সকলেই দেশে চলে যায়। একদিন সন্ধ্যাবেলায় নিবারণ মাষ্টার, পরমার্থ এবং পাশের বাড়ির নিতাইবাবু মেসের বৈঠকখানায় বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন। কথায় কথায় নিতাইবাবু বলেন, 'চিত্তে সুখ নেই দাদা। ঝি বেটী পালিয়েছে, খুকীটার জ্বর, গিন্নী খিট খিট করছেন, আপিসে গিয়েও যে দু-দণ্ড ঘুমুব তার জো নেই, নতুন ছোটসায়েব ব্যাটা যেন চরকি ঘুরছে।' এরপরে আগেকার দিনকাল কত ভালো ছিল এবং মেকেঞ্জি সায়েবের আমলে শ্যামনগরের বরদা মুখুজ্যে আফিম খেয়ে কেমন আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ঘুমুতেন তার চাঞ্চল্যকর কাহিনী শোনালেন নিতাইবাবু। এখন নাকি সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। তাই একটি ভালো সাধুর সাক্ষাৎ পেলে নিতাইবাবু সংসার ত্যাগ করার বাসনাও প্রকাশ করলেন।

পরমার্থ জানায়, সে জগন্নাথ ঘাটে 'মিরচাইবাবা' নামে এক সাধুর দর্শন পেয়েছে। সাধুটি নাকি কেবল লঙ্কা খেয়ে থাকেন। তাঁরও যিনি গুরু তিনি নাকি স্রেফ করাতের গুঁড়ো খেয়ে থাকেন। নিবারণ মাষ্টার জানান, "ও সব হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার মার্গ।"

এমন সময় একটি হ্যাটকোটধারী বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে ঘরে এসে ফরাসের উপর থপ করে বসে পড়ল। এই তরুণের নাম সত্যব্রত।

সত্যব্রতর কাছে নিবারণবাবু ভালো বাবাজী কি স্বামীজীর সন্ধান জানতে চাইলে সত্য জানায়', "বাটা চাই।"

এ প্রসঙ্গে রাজশাহীর তড়িতানন্দ ঠাকুরের কথা ওঠে। কলেজের ছেলেরা যাঁকে বলে রেডিওবাবা। বাবার দুটি টিকি, একটি পজিটিভ, একটি নেগেটিভ। তিনি নাকি আকাশ থেকে ইলেকট্রিসিটি শুষে নেন। স্পার্ক ঝাড়েন এক একটি আঠারো ইঞ্চি লম্বা। কাছে এগোয় কার সাধ্য, সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়ে দেখা করতে হয়।

নিবারণ জানায় মিরচাইবাবা বা রেডিওবাবাকে দিয়ে নিতাইদার কাজ হবে না। কোনো নিরীহ বাবাজীর দরকার।

তখন পরমার্থ বলে, "তবে দমদমায় গুরুপদ বাবুর বাগানে চলুন, বিরিঞ্চিবাবার কাছে।"

সত্যব্রত বিস্তারিত বিবরণ জানিয়ে বলে স্ত্রী-বিয়োগের পর গুরুপদবাবু সত্যই কি রকম বদলে গেছেন এবং একজন গুরুর পাল্লায় পড়েছেন। সত্যব্রত আরও জানায়, কেউ বলে তাঁর বয়স পাঁচ-শ বছর, কেউ বলে পাঁচ হাজার। তিনি ইচ্ছে করলে যা খুশি তাই করতে পারেন। এখনকার মানুষকে আকবরের টাইমে আগ্রাতে অথবা ফোর্থ সেঞ্চুরি বি. সি. তে পাটলিপুত্র নগরে এনে ফেলতে পারেন। কারণ সবটাই আপেক্ষিক। নিবারণ মন্তব্য করেন, "আইনস্টাইনের পসার একেবারে মাটি ?"

পরমার্থ জানায়, আইনস্টাইনও তার রিলেটিভিটি বিষের জন্যে বিরিঞ্চিবাবার কাছে

ঋণী। কারণ শোনা যায়, বিরিঞ্চিবাবা যখন চেকোস্লোভাকিয়ায় তপস্যা করতেন তখন আইনস্টাইন তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন।

নিতাইবাবু প্রশ্ন করেন, "আচ্ছা পরমার্থ; বিরিঞ্চিবাবা নিজে তো ত্রিকালসিদ্ধ পুরুষ। ভক্তদের কোনও সুবিধে করে দেন কি?"

নিতাইবাবুর কথায় মেকিরাম আগরওয়ালার কথা এসে পড়ল। বিরিঞ্চিবাবা যাকে তিন দিনের জন্যে নাইন্টিন ফোর্টিনে নিয়ে গিয়েছিলেন।

মেকিরাম পাঁচ হাজার টন লোহার কড়ি কিনে ফেলল ছ টাকা হন্দর দরে। তার পর তাকে বিরিঞ্চিবাবা একমাস নাইন্টিন নাইন্টিনে রাখলেন। মেকিরাম বেচে দিল একুশ দরে। এইভাবে মেকিরাম এখন পনর লাখ টাকার মালিক।

পরমার্থের মুখে বিরিঞ্চিবাবার অলৌকিক কাহিনী শোনার পর নিতাইবাবু তাঁর দর্শনের জন্যে আগ্রহী হলেন। এমন কি একথাও জানালেন, বিরিঞ্চিবাবার দ্বারা আর্থিক লাভবান হলে তিনি পরমার্থকে দশ পারসেন্ট কমিশন দেবেন।

গুরুপদবাবু কিছু গুছিয়ে নিতে পারলেন কিনা জিজ্ঞাসা করে নিবারণবাবু জানতে পারলেন, গুছিয়ে তো দূরের কথা তিনি নাকি গুরুকেই সমস্ত সম্পত্তি দিয়ে যাবেন বলে ঠিক করেছেন।

পরমার্থের কথা শুনে নিবারণবাবু বিপদের আভাস পেলেন এবং সত্যব্রতর কাছে জানতে চাইলেন গুরুপদবাবুর বড়ো জামাই প্রফেসর ননি এরপরেও কী করে চুপ করে আছে। প্রফেসর ননি ছিলেন নিবারণবাবুর বন্ধু এবং সত্যব্রতের সম্পর্কে দাদা।

সত্যব্রত জানায়, "ননিদাকে তো জানই, খ্যালাখ্যাপা লোক, নিজের এক্সপেরিমেন্ট নিয়েই আছেন। আর বউদি নিতান্ত ভালোমানুষ। ওদের দ্বারা কিছু হবে না। কিছু করতে হয় তো তুমি আর আমি। কিন্তু দেরি নয়।"

ঠিক হল ভালোভাবে ব্যাপারটা জেনে নেবার জন্যে দমদমার বাগানে যাবার আগেই নিবারণবাবু আর সত্যব্রত একবার প্রফেসর ননির কাছে যাবে।

প্রফেসর ননি কোনোদিন প্রফেসারি করেন নি, কিন্তু অনেকগুলি পাশ করেছেন। খুব খেয়ালী মানুষ, বাড়িতে বসে নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করেন। সম্প্রতি খাদ্যসমস্যা দূর করার জন্যে ঘাস থেকে প্রোটিন সিন্থেসিস করার চেষ্টা করছিলেন। বন্ধুমানুষ বলেই নিবারণবাবু ননির গবেষণা নিয়ে নানান রসিকতা করেন।

অবশেষে নিবারণবাবু বিরিঞ্চিবাবার কথা তুলে নিরুপমার কাছ থেকে বিস্তারিত বিবরণ জেনে নেন।

নিরুপমা জানান, মাসখানেক ধরে বিরিঞ্চিবাবা দমদমার বাগানে আছেন, সঙ্গে আছে ছোটো মহারাজ কেবলানন্দ। গণেশমামা খিদমত করছেন। গুরুপদবাবু সেখানেই পড়ে আছেন। রোজ দু-তিনশ ভক্ত গিয়ে ধর্না দিচ্ছে। প্রতি রবিবার রাত্রে হোম হচ্ছে, তা থেকে এক একদিন এক একটি দেবতার আবির্ভাব হচ্ছে। কোনও দিন রামচন্দ্র, কোনও দিন ব্রহ্মা, কোনও দিন বিষ্ণু, কোনও দিন শ্রীচৈতন্য।

নিরুপমার কাছেই জানা যায়, বিরিঞ্চিবাবার দর্শন পেলেও হোমঘরে ঢুকতে হলে গণেশমামার হুকুম চাই।

মনে মনে নিবারণবাবু তাঁর পরিকল্পনা তৈরি করে নিয়ে ননিকে প্রশ্ন করেন, "এমন কিছু বলতে পার যাতে খুব ধোঁয়া হয় ?"

বৈজ্ঞানিক ননি তাঁর বিজ্ঞানবিদ্যার পরিচয় দেবার চেষ্টা করলে নিবারণবাবু প্রমাদ গোনেন। তখন নিরুপমা জানান, ভিজে খড় জ্বাললে খুব ধোঁয়া হয়। শুনে নিবারণবাবু খুব খুশি হন, কারণ তাঁর সাধারণ ধোঁয়ারই প্রয়োজন ছিল। আনন্দের অতিশয্যে তিনি বলে ওঠেন, "ইউরেকা ! বউদি, আপনিই নোবেল প্রাইজ পাবেন, ননেটার কিছু হবে না।"

রবিবার বিকেলে নিবারণ, সত্যব্রত, পরমার্থ আর নিতাইবাবু গুরুপদবাবুর দমদমার বাগানবাড়িতে উপস্থিত হলেন। ভক্তদের ঘরে পরমার্থ ও নিতাইবাবুকে বসিয়ে নিবারণ-বাবু সত্যব্রতকে নিয়ে গেলেন গুরুপদবাবুর কর্মচারীদের হাত করতে।

গুরুপদবাবুর পুরোনো কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন মৌলবী বছিরুদ্দি, কোচমান ঝোঁটি মিয়া, দারোয়ান ফোকু পাঁড়ে, সহিস আর মালি, এরা কেউই বিরিঞ্চিবাবাকে পছন্দ করতেন না। তাদের সামান্য কিছু টাকায় বশ করে নিবারণবাবু দলে টেনে নিলেন। নিবারণবাবু জানালেন যে, তিনি বিরিঞ্চিবাবাকে সেদিনই তাড়াবেন কেবল তাদের সহ-যোগিতা চাই। তারাও সাহায্য করতে রাজি হল।

এরপর সত্যব্রত গণেশমামার ছোটো জামাইকে চাকরী দেবার প্রলোভন দেখিয়ে হোমঘরে প্রবেশের অনুমতি আদায় করে বিরিঞ্চিবাবার দর্শনে গেলেন।

বিরিঞ্চিবাবার সভায় অনেক ভক্ত উপস্থিত ছিলেন, তাদের মধ্যে ও. কে. সেন, গোবর্ধন মল্লিক, গুরুপদবাবু প্রধান। পাশের ঘরেই ছিল মেয়েদের বসবার জায়গা, সেখানে ছিল গুরুপদবাবুর ছোটো মেয়ে বুঁচকী।

সভায় বসে বিরিঞ্চিবাবা যে-সব কথা বলছিলেন তা শুনে সত্যব্রত হাসি চাপতে পারছিল না, তাই নানারকম বিপদ আর যন্ত্রণার কথা মনে করে করে সে হাসি আটকাবার চেষ্টা করে। তাতেও কাজ না হওয়ায় একসময় হাসিকে সে কান্নায় পরিণত করে বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পায়।

বিরিঞ্চিবাবা যে-সব কথা বলছিলেন তা যেমনই হাস্যকর তেমনই অবিশ্বাস্য। তিনি নাকি নিবারণবাবুর পূর্বজন্মেও তাকে জানতেন। পূর্বজন্মে নিবারণবাবু ছিলেন জগৎশেঠের খাজাঞ্চী, তার নাম ছিল মতিরাম। বিরিঞ্চিবাবাই নাকি তুলসীদাসকে মানসিংহ করে পৃথিবীতে এনেছিলেন। তাঁর কাছে যিশু হলেন সেদিনকার ছেলে। একবার মহাপ্রলয়ের পর সূর্যের তেজ বাড়িয়ে তিনিই নাকি জীবকুলকে রক্ষা করেছিলেন।

এরপর বুঁচকীর কাছে চা খেতে গিয়ে সত্যব্রত বিরিঞ্চিবাবার সভায় যেসব কাণ্ড করে তার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নেয়।

এরপর সাধারণ ভক্তদের বিদায় করে রাত নটায় হোমঘরে হোম আরম্ভ হল।

হোমের পর প্রদীপ নিবিয়ে দেওয়া হল, চারিদিকে ভৌতিক পরিবেশ। সেই পরিবেশে আবির্ভাব ঘটল মহাদেবের,—ব্যাঘ্রচর্মধারী হাড়মালাবিভূষিত পিনাকডমরুপাণি ধবল-কান্তি দস্তুরমত মহাদেব। ভক্তরা মহাদেব দেখে অভিভূত। সহসা বাইরে কোলাহল শোনা গেল, 'আগ লাগা হ্যায়'।

সঙ্গে সঙ্গে হোমঘরের ভেতরটা ধোঁয়ার ভরে গেল। সবটাই ছিল নিবারণবাবুর পরিকল্পনা। তিনি টাকা-পয়সা দিয়ে আগেই গুরুপদবাবুর কর্মচারীদের হাত করেছিলেন। তারাই পাশের ঘর থেকে ভিজে খড় জ্বালিয়ে ধোঁয়ার সৃষ্টি করে চেঁচাতে থাকল।

বিরিঞ্চিবাবা একলাফে গৃহত্যাগ করলেও ধরা পড়ল মহাদেবের বেশধারী ছোটো মহারাজ কেবলানন্দ। এই সময় বাইরের লোক হোমঘরে ঢুকে পড়ে। ফেকু পাঁড়ের জিম্মায় কেবলানন্দকে দিয়ে নিবারণ ও সত্যব্রত গুরুপদবাবু ও বুঁচকীকে হোমঘরের বাইবে বের করে আনে।

সত্যব্রতের ভাষায়, "মহাদেব পচে গিয়ে বেরুল ক্যাবলা। বিরিঞ্চিবাবা হয়ে গেলেন জোচ্চোর।' জোচ্চোর হলেও গুরুপদবাবু তার সঙ্গে অভদ্র ব্যবহার করেন নি, তিনি সত্যব্রতকে অনুরোধ করে তাদের স্টেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেন।

এরপরের কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। সেদিন রাত্রে গুরুপদবাবুর অনুরোধে নিবারণ-বাবু ও সত্যব্রতকে খাওয়া-দাওয়া করে দমদমার বাগান বাড়িতেই থেকে যেতে হয়।

খাওয়া-দাওয়ার পর সত্যব্রত জানায় সে বুঁচকীকে বিয়ে করবে, বিয়েতে গুরুপদ-বাবুর মত আছে কিন্তু বুঁচকী নিজেই বড়ো গোলমেলে জবাব দিচ্ছে।

বুঁচকীর গোলমেলে সব কথা শুনে বিচক্ষণ নিবারণবাবু মন্তব্য করেন, বুঁচকীরও বিয়েতে আপত্তি নেই।

এইভাবে 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের মধুর পরিসমাপ্তি ঘটে।

হাস্যরস ও রাজশেখর বসু ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যে রাজশেখর বসু অন্য-তম শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক। তাঁর হাস্যরসের প্রকৃতি পূর্বসূরীদের তুলনায় কিছু ভিন্ন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারায়' বলেছেন—"রাজশেখর বসুর হাস্যরসের মধ্যে একটা স্বতঃউৎসারিত প্রাচুর্য ও অনাবিল বিশুদ্ধি আছে। তাঁহার রসিকতার প্রবাহ বুদ্ধির বপ্র-ক্রীড়ায় ঘোলাটে হয় নাই, সূর্যকরোজ্জ্বল নির্ঝরের ন্যায় সহজ, সাবলীল নৃত্যভঙ্গে হাসির ঝিকিমিকি ছড়াইতে ছড়াইতে বহিয়া চলিয়াছে।"

রাজশেখরের মৌলিক পরিকল্পনার উদাহরণস্বরূপ 'শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরী লিমিটেড,' 'চিকিৎসা সংকট', ভুসণ্ডীর মাঠে, 'বিরিঞ্চিবাবা' এবং 'উলটপুরাণ' প্রভৃতি রচনার উল্লেখ করা চলে। এই সব গল্পে পরশুরাম প্রাচীন বিশ্বাস এবং আধুনিক যুগের নাস্তিকতা এবং যান্ত্রিকতাকে পাশাপাশি রেখে এক অপূর্ব হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। আমরা বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেও প্রাচীন বিশ্বাসকে ত্যাগ করতে পারি নি। এই দুইয়ের বৈপরীত্য যে হাস্যকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করে রাজশেখরের রচনায় বার বার তা ধরা পড়েছে।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রাজশেখরের হাস্যরসের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন,

প্রথমত, "এই হাস্যরসের প্রধান উপাদান হাস্যরসজনক পরিস্থিতির উদ্ভাবন-নৈপুণ্য।" রসিকতা করবার উদ্দেশ্য নিয়েই পাত্র পাত্রীগণ গল্পের মধ্যে আসে নি। পরিস্থিতির প্রভাবেই গল্পে হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। এই হাস্যরসের একটা বড়ো লক্ষণ হল পরিমিতিবোধ এবং সংযমজ্ঞান। এই পরিমিতিবোধ তার রচনার স্টাইলেও প্রতিফলিত হয়েছে, তাই বহু চরিত্রের সংলাপ আজও স্মরণীয়।

অর্থাৎ Humour-এর সঙ্গে করুণ রসের হরপার্বতী সম্পর্ক। Humour-এর সঙ্গে করুণরসের মিশ্রণ না ঘটলে Humour পূর্ণতা লাভ করে না। কোনো কোনো সমালোচক রাজশেখরের হাস্যরসের মধ্যে করুণরসের সমাবেশ না দেখে এটাকে ত্রুটি বলে মনে করেন। এখানে ডঃ সুবোধ সেনগুপ্তের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য—তিনি বলেছেন, "ইহা সত্য অনেক শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে হিউমারের সঙ্গে করুণের সংমিশ্রণ থাকায় তাহা অনন্য-সাধারণ মাধুর্য লাভ করে।

ইহার সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত ডন্ কুইক্সোট ; আমাদের দেশের সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের হাস্যরস এই কারণে অপরাজেয় হইয়াছে। কিন্তু করুণরসের স্পর্শ না থাকিলেও হাস্যরস যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতে পারে তাহার সাক্ষ্য অ্যারিস্টফেনিস রাবেলে, মলিয়ের, বার্নার্ড শ'—আর পরশুরাম।"

রাজশেখরের গল্পের আবেদন প্রধানত হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভাবন থেকেই আহৃত হয়েছে। হাস্যকর পরিস্থিতির সীমিত পরিধির মধ্যে থেকেও রাজশেখরের বহু চরিত্র দু-একটি রেখার টানেই ভাস্বর হয়ে উঠেছে। এই-সব চরিত্র রসিকতা করার পূর্ব-নির্ধারিত উদ্দেশ্য নিয়ে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয় নি। পরিস্থিতির প্রভাবে তাদের মধ্যে হাস্যরসের ধারা প্রবাহিত হয়েছে। এই স্বতঃ উৎসারিত স্বচ্ছতার জন্যেই রাজশেখরের হাস্যরস বাংলা সাহিত্যে এক নতুন অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছে।

'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের হাস্যরস : ধর্মের নামে যে ভণ্ডামি এবং ধাপ্পাবাজি চলে বিরিঞ্চিবাবা গল্পে রাজশেখর বসু প্রচলিত সেই কুসংস্কারের উপর আঘাত হেনেছেন।

আমরা দেখি সাধারণ মানুষ অসাধারণ উপায়ে সাংসারিক সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে, তাদের সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই ভণ্ড তপস্বীর দল পশার জমায়। এই ভণ্ডামি সর্বকালের সাহিত্যে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু হয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে।

'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে বিভিন্ন পার্শ্বচরিত্রের মাধ্যমে কৌতুকপূর্ণ হাস্যরস সৃষ্টি হয়েছে। হাবশীবাগান লেনের মেসে যারা বাস করে বা আড্ডা দিতে আসে তাদের কথাই ধরা যাক। দিব্যপ্রেরণায় বিশ্বাসী পরমার্থ এবং সস্তায় কিস্তিমাৎ করে অর্থলাভ করতে আগ্রহী নিতাইবাবুর চরিত্র হাস্যরসের আধার।

আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি বা আপেক্ষিকতাবাদ পদার্থবিদ্যার সবচেয়ে দুরূহ বিষয় হলেও লেখক এই দুরূহ তত্ত্বকে একটি তুচ্ছ উপমার দ্বারা হাল্‌কা করতে গিয়ে হাস্যরসের অবতারণা করেছেন। এই তত্ত্বের আক্ষরিক অর্থ হল সবকিছুই অন্যনির্ভর। এই তত্ত্বকে নিবারণ জলের মতো এককথায় প্রাঞ্জল করে দিয়ে বলে—"জনার্দ্দন ঠাকুর পটলডাঙ্গায়

কেনে আড়াই সের আলু, আর মেসে এলেই হয়ে যায় ন'পো।" বাস্তব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে প্রাপ্ত রিলেটিভিটির হাস্যরসাত্মক উদাহরণ আর কি হতে পারে!

আলোচ্য গল্পের গৌণ চরিত্রগুলির প্রত্যেকেই হাসির খোরাক যুগিয়েছে। এদের মধ্যে সাহেবী সওদাগরী অফিসের কেরাণী বরদা মুখুজ্যে, বীরপুঙ্গব ফেকু পাঁড়ে, পূর্ববঙ্গ-নিবাসী মৌলবী বছিরদ্দি এবং তৃতীয় পক্ষের নবীনা স্ত্রীকে নিয়ে বিব্রত গোবর্ধন মল্লিক আর উপকাহিনীর নায়ক প্রফেসর ননি এরা সকলেই কৌতুক সৃষ্টিতে অসামান্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ননির কাহিনী একটু বেশি স্থান অধিকার করলেও কৌতুক সৃষ্টির সাফল্যের জন্য এই ত্রুটি চোখে পড়ে না। খেয়ালী ননিদের উঠানের একপাশে ঘাস সিদ্ধ হতে দেখে নিবারণ ননির স্ত্রীকে প্রশ্ন করে—"একি বউদি, এত শাগের ঘণ্ট কার জন্যে রাঁধছেন?" উত্তরে নিরুপমা জানায়, "শাক নয়, ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে।" তখনই নিবারণ তার কৌতুকের মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করেছে—"সেদ্ধ হচ্ছে? কেন, ননির বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না?"

দমদমায় গুরুপদবাবুর বাগানবাড়িতে মৌলবী বছিরুদ্দি, কোচম্যান ঝোঁটি মিয়া, এবং দরোয়ান ফেকু পাঁড়ের সঙ্গে পাঠকের সাক্ষাৎ ঘটে। ফেকু পাঁড়ে নিবারণের কাছে ভরসা পেয়ে তার মত প্রকাশ করে—"বিরিঞ্চিবাবা বাবাজী থোড়াই আছেন। তাঁর জনৌ ভি নাই, জটা ভি নাই। তিনি মছলি খান, বকরির গোস্ত ভি খান। দোনো সাঁঝ চা-বিস্কুট না হইলে তাঁর চলে না।" অন্যদিকে মৌলবী বছিরুদ্দি সাহেবর ফরিদপুরী উর্দু নির্ভেজাল হাস্যরসের উদ্রেক করে। বছিরুদ্দি জানান তিনি খানদানী মনিষ্যি, তাঁর ধমনীতে মোগলাই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। যদিও লোকে তাকে বছিরুদ্দি বলে, কিন্তু তাঁর আদত নাম বেদম খাঁ। তাঁর পিতার নাম জাঁহাবাজ খাঁ, পিতামহের নাম আবদুল জব্বর, তাঁদের আদি নিবাস ফরিদপুর নয়—আরব দেশে, যাকে বলে তুর্ক। সেখানে সকলেই লুঙ্গি পরে এবং উর্দু বলে, কেবল পেটের দায়ে তাঁকে বাংলা শিখিতে হইয়াছে।"

যাকে পেটের দায়ে কষ্ট করে বাংলা শিখতে হয় তার মুখে লেখক ফরিদপুরী উর্দুর যে নমুনা তুলে ধরেছেন তা যেমন হাস্যকর তেমনই ব্যঙ্গবিদ্রূপে ভরা। বছিরুদ্দি ফরিদপুরী উর্দুতে বলেন, "সেই আরব দেশের মধ্যিখেনে ইস্তাম্বুল, তার বাঁয়ে শহর বোগদাদ। এই কলকাতা শহরডা তার কাছে একেবারেই তুশ্চু।"

বিরিঞ্চিবাবার অসম্ভব ক্রিয়াকলাপকে সম্ভাব্য করার জন্য রাজশেখর বসু যে তিনটি চরিত্রের সৃষ্টি করেছেন তাঁরা হলেন প্রখ্যাত আইনজীবী গুরুপদবাবু, ব্যর্থ ব্যারিস্টার ও. কে. সেন এবং মিহি ধুতি-পরা সম্পন্ন মুৎসুদ্দি যিনি তৃতীয় পক্ষ ঘরে এনে দোটানায় পড়েছেন, সেই গোবর্ধন মল্লিক।

বিরিঞ্চিবাবা এই আসরের উপযুক্ত নায়ক। তিনি বিরিঞ্চি অর্থাৎ পিতামহ ব্রহ্মার সঙ্গে তুলনীয়। আদিম সৃষ্টির তিনি সাক্ষী, যিশু তাঁর কাছে সেদিনকার ছেলে, বৈবস্বত মনুকে তিনি 'বিবু' বলে সম্বোধন করেন। এই সব সংযত সংক্ষিপ্ত বিবরণ ক্লাসিক

স্টাইলের লক্ষণ, আর এই বৈশিষ্ট্যই অসম্ভব কাহিনীকে সরস হাস্যরসে পরিপূর্ণ করে তুলেছে।

রাজশেখর বসুর 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার।

গল্প, উপন্যাস বা নাটকের নামকরণের বিশেষ এক তাৎপর্য থাকে। সেই তাৎপর্যের খাতিরে লেখক তাঁর রচনার নামকরণ করেন। অনেক সময় কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামানুসারে রচনার নামকরণ হয়। উদাহরণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস', বা দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের 'গোরার' কথা বলা যায়। আবার কখনও লেখক তাঁর লেখায় কোন আদর্শ ভাবনার ছবি অঙ্কন করেন, তখন নায়ক-নায়িকার নামে রচনার নামকরণ না করে লেখক এমন নাম বেছে নেন যে নামে ফুটে ওঠে প্রত্যাশিত ভাবনা বা আদর্শের ছবি। যেমন বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'চোখের বালি' প্রভৃতি।

আমাদের আলোচ্য বিষয়—রাজশেখর বসুর 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের নামকরণ কতটা সার্থক হয়েছে তার বিচার করা।

বিরিঞ্চিবাবা এক ভণ্ড ধর্মগুরু। এই ভণ্ড ধর্মগুরুর নামে গল্পের নামকরণ করে লেখক সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ধর্মের নামে যে ভণ্ডামী এবং ধাপ্পাবাজি চলে রাজশেখরের উদ্দেশ্য ছিল তার উপর আঘাত হানা। এবং লেখকের এই উদ্দেশ্য যে সার্থক হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সমাজে আমরা দেখি সাধারণ মানুষ অসাধারণ উপায়ে সাংসারিক সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে, আর তাদের সেই দুর্বলতা ও বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই ভণ্ড তপস্বীর দল ব্যবসার ফাঁদ পেতে বসে। আমাদের আলোচ্য গল্পে বিরিঞ্চিবাবা হল এমনই এক ভণ্ড ব্যক্তি যে মিথ্যে অলৌকিক শক্তির মায়াজাল প্রসারিত করে দুর্বল কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু মানুষকে বশ করে লাভজনক ব্যবসা ফেঁদে বসেছে।

হাবশীবাগানের নিবারণ এবং সত্যব্রত এই ভণ্ড ধর্মগুরুর ধাপ্পাবাজি ফাঁস করে দুর্বল মানুষকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে। আলোচ্য গল্পে আমরা কুসংস্কার ও দুর্বলতার সঙ্গে সুস্থ ও শুভবুদ্ধির বিরোধের ছবি দেখতে পাই। একদিকে আছে নিবারণ ও সত্যব্রত যারা সংস্কারহীন শুভ-সুস্থবুদ্ধির প্রতীক, অন্যদিকে আছে ভণ্ড ধাপ্পাবাজ বিরিঞ্চিবাবা। বিরিঞ্চিবাবা হল বিবেকহীন লোভী ভণ্ড মানুষের প্রতিনিধি। এই দুই শক্তির সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত বিবেকহীন অশুভ শক্তির পরাজয় ঘটে।

বিরিঞ্চিবাবাকে একদিন বিদায় নিতে হয়। কারণ সত্য মিথ্যার সংগ্রামে একদিন সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। হাস্যরসের আবরণে মুড়ে লেখক এই সত্যই তুলে ধরেছেন। বিরিঞ্চিবাবার ভণ্ডামী ও ধাপ্পাবাজি লেখকের ব্যঙ্গবিদ্রূপবাণে জর্জরিত। বিরিঞ্চিবাবা দুর্বল কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষের আসরের উপযুক্ত নায়ক। এই ভণ্ড নায়কই হল বিরিঞ্চি অর্থাৎ পিতামহ ব্রহ্মা। আদি সৃষ্টির তিনিই সাক্ষী, যিশু তার কাছে 'সেদিনকার ছেলে', বৈবস্বত মনুকে সে 'বিবু' বলে সম্বোধন করে। এই সব হাস্যকর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্বারা

বিরিঞ্চিবাবা ভক্তবৃন্দকে মন্ত্রমুগ্ধ করেছিল। তার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অসাধারণ চরিত্রই ছিল লেখকের ব্যঙ্গবিদ্রূপের লক্ষ্যস্থল। তাই গল্পের 'বিরিঞ্চিবাবা' নামকরণ সার্থক।

ছোটোগল্পের আলোচনা প্রসঙ্গে 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের বৈশিষ্ট্য বিচার।

ছোটোগল্প কী এককথায় তার উত্তর দেওয়া যায় না। কেউ বলেন ছোটোগল্প ছোটোও বটে আবার গল্প বটে। একাগ্রতা আর একমুখীনতাকে ছোটোগল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়। বিশ্বের বিপুল ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে ছোটোগল্প চোরা লণ্ঠনের আলোয় এমন একটি অংশকে উদ্ভাসিত করে যার মাধ্যমে আমরা পূর্ণাংশের আস্বাদ লাভ করি। সেই কারণে ছোটোগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতিতে কোন মিল নেই, মিল আছে গীতিকবিতার সঙ্গে। গীতিকবিতাই ছোটোগল্পের নিকট আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে—

"ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল ;
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দুচারিটি অশ্রুজল।"

ছোটোগল্পে বর্ণনার বাড়াবাড়ি থাকবে না, কোন তত্ত্বপ্রচারের বা উপদেশ দেবার আগ্রহ ছোটোগল্পে থাকবে না। গল্পের আরম্ভ হবে আকস্মিক এবং সমাপ্তি হবে আকস্মিক। আকস্মিক ঘটনার সংঘাতে গল্প যেন হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে কিন্তু শেষ হবার পরেও পাঠকের মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তির রেশ থেকে যাবে। মোটামুটি এই হল ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য।

ছোটোগল্পের একটা বড় লক্ষণ সূচনা এবং সমাপ্তিতে চমক সৃষ্টি করা। সেই সঙ্গে গল্প হঠাৎ শুরু হয়ে হঠাৎ চমকের মধ্যে শেষ হবে। আমাদের আলোচ্য বিরিঞ্চিবাবা গল্পের সূচনায় চমক না থাকলেও গল্পের শেষে একটা চমক আছে এবং গল্পটি যথার্থ ছোটোগল্পের মতই হঠাৎ সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু ছোটোগল্পের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল তার একমুখী গতি। এই একমুখী গতি 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে ব্যাহত হয়েছে। চোদ্দ নম্বর হাবশীবাগান লেনের একটি ছোট মেসবাড়ির আড্ডা থেকে গল্পের শুরু হয়ে বৈজ্ঞানিক ননির বাড়ি পর্যন্ত এর ধারা প্রবাহিত হয়ে গেছে। এরপর গল্পের যবনিকা উঠেছে গুরুপদবাবুর দমদমার বাগানবাড়িতে। অর্থাৎ ছোটোগল্পের মত 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের গতি একমুখী নয়। এতে যেমন ননির উপদেশ কাহিনী সংযোজিত হয়েছে তেমনি চলেছে উপন্যাসের মত বিচিত্র চরিত্রের মিছিল হাবশীবাগান থেকে দমদমার বাগানবাড়ি পর্যন্ত। এই গল্পে আছে মেসের ম্যানেজার নিবারণ মাষ্টার, পাড়ার প্রধান ব্যক্তি নিতাইবাবু, তরুণ পরমার্থ ও সত্যব্রত, প্রফেসর ননি, তাঁর সহধর্মিণী নিরুপমা, গুরুপদবাবু, কোচম্যান ঝোঁটি মিয়া, দারোয়ান ফেকু পাঁড়ে, মৌলবী বছিরুদ্দি, গণেশমামা, মিস্টার ও. কে. সেন, গোবর্ধন মল্লিক, বুঁচকী, সর্বোপরি বিরিঞ্চিবাবা এবং তার শিষ্য কেবলানন্দ। এই বিশাল চরিত্রের মিছিলে হারিয়ে যায় গল্পের একমুখী গতি। গল্পে যেমন ননির উপকাহিনী এসে পড়ে, তেমনি কেবলমাত্র হাস্যরস সৃষ্টির জন্যই আসে মেকেঞ্জি সাহেব আর বরদা খুড়োর প্রসঙ্গ। যে বরদা মুখুজ্যে

আফিম খেয়ে ঘুমুতেন কিন্তু নড়ন-চড়ন থাকত না, দূর থেকে দেখলে কে বলবে খুড়ো ঘুমচ্ছেন। এই জাতীয় চরিত্রের প্রয়োজন হয়তো উপন্যাসে থাকতে পারে কিন্তু ছোটোগল্পে এরা অপ্রাসঙ্গিক। আর অপ্রাসঙ্গিক চরিত্র ছোটোগল্পের বন্ধনকে শিথিল করে দেয়।

উপকাহিনী এবং অপ্রাসঙ্গিক চরিত্রের ভিড়ে বিরিঞ্চিবাবা ছোটোগল্প লক্ষভ্রষ্ট, এবং গল্পের গতিও শ্লথ। তাই ছোটোগল্পের কোন কোন বৈশিষ্ট্য বর্তমান থাকলেও 'বিরিঞ্চিবাবা' আকৃতি ও প্রকৃতিতে সার্থক ছোটোগল্প নয়। গীতিকবিতার সঙ্গে এর যতটা মিল তার চেয়েও বেশি মিল উপন্যাসের সঙ্গে। তাই 'বিরিঞ্চিবাবা' সার্থক ছোটো-গল্প নয়, নাট্যধর্মী বড় গল্প।

॥ চরিত্র বিচার ॥

বিরিঞ্চিবাবা ঃ বাবাজীটি কেমন? আশ্চর্য। কেউ বলে তাঁর বয়স পাঁচশ বৎসর, কেউ বলে পাঁচ হাজার।

বাবা বলেন বয়স বলে কোন বস্তু নেই। সমস্ত কাল একই কাল; সমস্ত স্থান একই স্থান। বাবা ইচ্ছে করলেই কাউকে আকবরের আমলে পাঠাতে পারেন, অথবা খ্রীস্টপূর্ব চতুর্থ শতকের পাটলিপুত্রে। সমস্তই আপেক্ষিক কিনা।

বোঝা গেল এমন গুরু থাকতে আইনস্টাইনের পসার একেবারে মাটি। আর আইনস্টাইনের শিক্ষাও তো বিরিঞ্চিবাবার কাছ থেকে, তিনি তখন চেকোশ্লোভেকিয়ায়। অবশ্য আইনস্টাইনের মগজে সারবস্তু তেমন ছিল না বলেই অমন গুরুর সান্নিধ্যে এসেও তাঁর বিদ্যে রিলেটিভিটির বেশি এগোল না!

কলিযুগে বর্তমানে মাসখানেক হল বিরিঞ্চিবাবা আছেন দমদমার বাগানে, সঙ্গে আছেন তাঁর চেলা ছোট-মহারাজ কেবলানন্দ। গুরুপদবাবু দিনরাত সেখানেই পড়ে আছেন। রোজ দু-তিন'শ ভক্ত গিয়ে ধর্ণা দিচ্ছে বিরিঞ্চিবাবার অদ্ভুত কথাবার্তা শোনবার জন্যে।

সত্যিই আশ্চর্য তাঁর বাণী। তেমনি আশ্চর্য তাঁর অন্তর্দৃষ্টি! নিবারণকে দেখেই চিনলেন, জগৎশেঠের কুঠিতে, তার মায়ের শ্রাদ্ধের দিন তাকে দেখেছেন তিনি। নিবারণ ছিল শেঠজীর খাজাঞ্চী, নাম ছিল মোতিরাম।

সব যুগেই তাঁর অবাধ সঞ্চার। তুলসীদাসকে তিনি বুঝিয়েছিলেন ভোগ না হলে তাঁর নিবৃত্তি হবে না। তাই রামায়ণ লেখা শেষ করবার পর তিনি তাঁকে মানসিংহ করে দিয়েছিলেন।

বিরিঞ্চিবাবার কাছে যিশু তো সেদিনকার ছেলে, মানুষ সৃষ্টি করে বৈবস্বত প্রমাদ গণলেন এত জল মানুষ দাঁড়াবে কোথায়? তখন বিরিঞ্চিবাবাই তাকে অভয় দিলেন, বললেন, 'বিবু, সূর্যবিজ্ঞান আমার হাতের মুঠোর মধ্যে।' শেষ পর্যন্ত সূর্যের তেজ বাড়িয়ে জল শুকিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা করলেন তিনি। চন্দ্রসূর্য চালাবার ভার তো তাঁর ওপরেই ছিল।

বোঝা যায় বিরিঞ্চিবাবার হাই ভোল্টেজের বুলি ভক্তদের সম্মোহিত করে রেখেছে। গুরুপদবাবুও এই বুলিবিদ্ধ হয়েই হয়তো গুরুপদের শরণ নিয়েছেন।

না, শুধু তা নয়। বাবা হোমঘরে ধোঁয়ার আড়ালে বিশেষ বিশেষ ভক্তকে দেবদর্শন করাবারও ব্যবস্থা করেছিলেন। কিন্তু শেষরক্ষা করতে পারলেন না বিরিঞ্চিবাবা। নায়ক বিরিঞ্চিবাবাকে পগার পার করিয়ে নায়ক হয়ে বসল সত্যব্রত।

বিরিঞ্চিবাবার বাবাগিরিতে তেমন পরিপক্কতা ছিল না। তাঁর কথাবার্তা যতই উচ্চগ্রামে বাঁধা থাকুক না কেন তাতে অনেক ভক্তেরই মনে সন্দেহের উদ্রেক হবার কথা। আর যারা ভক্ত নয় তারা তো মনে মনে বাবাজীর বুজরুকি ধরেই ফেলেছিল, শুধু গুরুপদবাবুর জন্যই সবাই মুখ বুজে ছিল। সত্য সদলে হানা দিয়ে প্রথমেই সেই অবিশ্বাসীদের হাত করল, তারপর ধূম্রজাল বিস্তার করে তাড়াল কথার ধূম্রজাল বিস্তারী বিরিঞ্চিবাবাকে। বাবার কূটবুদ্ধির প্রহরণ তেমন ক্ষুরধার ছিল না। তাই 'প্রহারেণ ধনঞ্জয়'—মন্ত্রে তিনি বশীভূত হলেন।

প্রশ্ন ওঠে একটা ঝানু উকিল ওই বাক্‌জালে ভুললেন কেন? স্ত্রী-বিয়োগেই তিনি মোহাচ্ছন্ন হয়েছিলেন বলেই হয়তো এ ভুল করেছিলেন। ভুল ভাঙতেও দেরি হয় নি: 'বাবা সত্য, তোমরা আমায় রক্ষা করেছ, এ উপকার আমি ভুলব না।'

বিরিঞ্চিবাবার মুখোস খুলল, কিন্তু তবু তিনি ভাঙেন কিন্তু মচকান না। মহাদেববেশী কেবলানন্দ হাতেনাতে ধরা পড়লেও বাবা অম্লান বদনে বলেন, মহাদেব শেষটায় মানুষের মূর্তি ধরে বিদ্রূপ করলেন।'

মহাদেব পচে গিয়ে শেষে যেমন বেরুল ক্যাবলা তেমনি বিরিঞ্চিবাবা পচে গিয়ে বেরুল একটি জোচ্চোর।

তবে প্রবঞ্চক হলেও কিছুদিন তিনি যে সন্দেহ বিস্তার করেছিলেন তাতে তাঁকে প্রশংসা না করে পারা যায় না। কিন্তু বিশু—বুড়্ডা—বিবু কেউ-ই তাঁকে রক্ষা করতে পারলেন না। সত্য এসে তাঁর সত্য-মূর্তি তুলে ধরল।

তাই যদি 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের নায়ক কে এ প্রশ্নের উত্তরে বলতে ইচ্ছে করে—আর কেউ নয়, সত্যব্রত।

নায়কের ভাগ্যে নায়িকাও দুরায়ত্ত রইল না। মহাদেবের কামড়-খাওয়া সত্যের আঙুল বেঁধে দেবার আদেশ কন্যাকে দিলেন স্বয়ং গুরুপদ। জয় সত্যব্রতের জয়। বরং বলা যাক—সত্য এব জয়তে!

নিবারণ মাষ্টার: নিবারণ মাষ্টার এবং সত্যব্রত দুজনেই 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের দুটি প্রধান চরিত্র। আলোচ্য গল্পের নায়ক বিরিঞ্চিবাবা। কারণ লেখক এই ভণ্ড তপস্বীর ভণ্ডামী,—ক্রিয়াকলাপ এবং সাধারণ ধর্মভীরু মানুষের মনের উপর তার আধিপত্যের ঘটনা অবলম্বনে এই গল্পের পরিকল্পনা করেছেন। লেখকের বিদ্রূপাত্মক আক্রমণের লক্ষ্য ছিল বিরিঞ্চিবাবা। আমাদের সমাজে নানা ছদ্মবেশে বিরিঞ্চিবাবার দল

ঘুরে বেড়ায়। তারা দুর্বল মানুষকে বশ করে তাদের ধর্মজীবন থেকে রাজনৈতিক জীবন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রিত করে।

তাই 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে নিবারণ এবং সত্যব্রত দুই প্রধান চরিত্র হলেও নায়ক নয়। এই গল্পের নায়ক হলেন—বিচিত্রকর্মা বিরিঞ্চিবাবা। তাই লেখক পরশুরাম বিরিঞ্চিবাবার নামেই গল্পের নামকরণ করেছেন।

নিবারণ মাষ্টার কলেজে শিক্ষকতা করতেন। তিনি ছিলেন আমুদে এবং আড্ডাবাজ লোক। চোদ্দ নম্বর হাবশী বাগানের যে মেসে নিবারণবাবু ম্যানেজারী করতেন সেই মেসটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ছিল। এটি নিবারণবাবুরই কৃতিত্ব। লেখক বলেছেন, "মেসটি ছোট কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, কারণ ম্যানেজার নিবারণ মাষ্টার খুব আমুদে লোক হইলেও সব দিকে তার কড়া নজর আছে।"

এই মেসেই একদিন আড্ডার সময় 'বিরিঞ্চিবাবার' প্রসঙ্গ ওঠে এবং উৎসাহী নিতাইবাবু তার দর্শন প্রার্থী হন। নিবারণ এবং সত্যব্রতও বিরিঞ্চিবাবার দর্শনে আগ্রহ প্রকাশ করেন। কিন্তু তাদের এই আগ্রহের কারণ ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কারণ সত্যব্রত জানায় "গুরুপদবাবু সম্প্রতি একটি গুরুর পাল্লায় পড়েছেন।"

নিবারণের বাস্তব জ্ঞান ছিল অত্যন্ত প্রখর। সাধারণ বুদ্ধিতে সে সহজেই বুঝেছিল বিরিঞ্চিবাবা একজন ভণ্ড সাধু। ধর্মান্ধ দুর্বল মানুষই ভক্তির আতিশয্যে "কেউ বলে তাঁর বয়স পাঁচশ বৎসর, কেউ বলে পাঁচ হাজার।" আবার পরমার্থের ভাষায়, "বিরিঞ্চিবাবা ইচ্ছে করলে এখনই তোমাকে আকবরের টাইমে আগ্রাতে অথবা ফোর্থ সেঞ্চুরি বি. সি. তে পাটলিপুত্র নগরে এনে ফেলতে পারেন।"

এই সব অসম্ভব অলৌকিক কথা শুনে নিবারণের মনে হয়েছে এখনই গুরুপদবাবুকে উদ্ধার করা প্রয়োজন। কারণ গুরুপদবাবু ছিলেন নিবারণের বন্ধু ননীর শ্বশুর।

বাস্তব বুদ্ধির তাগিদে দমদমার বাগানবাড়িতে যাবার পূর্বে নিবারণ সত্যব্রতকে নিয়ে একবার প্রফেসর ননীর বাড়িতে এসেছে। যে শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে হবে তার ক্ষমতা এবং দুর্বলতার পরিচয় জানা দরকার।

সেখানে দুচারটি কথায় আমরা নিবারণের হিউমার বোধের পরিচয় পাই। ননির উঠানে ডেকচির মধ্যে সবুজ রঙের কোন পদার্থ সিদ্ধ হচ্ছে দেখে সে নিরুপমাকে বলেছে, "একি বউদি, এত শাকের ঘণ্ট কার জন্যে রাঁধছেন?" উত্তরে যখন শুনেছে, "শাক নয় ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে", তখন আমরা তার মন্তব্য শুনি "সেদ্ধ হচ্ছে? কেন, ননির বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না?"

অথবা আর এক জায়গায় তাকে বলতে শুনি "সকলেই তো প্রফেসর ননি বা রোমন্থক জীব নয় যে ঘাস খেয়ে বাঁচবে।"

নিবারণ সবার আগেই বিরিঞ্চিবাবাকে ভণ্ড বলে বুঝতে পারে এবং তাকে বিতাড়িত করার একটা পরিকল্পনাও মনে মনে তৈরি করে নেয়। ননির বাড়িতে এসে নিরুপমার

কাছে ঘন ধোঁয়া তৈরির কৌশল এবং হোমঘরে প্রতি রবিবার দেবতার আবির্ভাব কাহিনী শুনে নিবারণ একদিকে যেমন শক্তি সঞ্চয় করে অন্যদিকে পরিকল্পনা প্রয়োগের উপায় আবিষ্কার করে।

দমদমার বাগানবাড়িতে গিয়ে প্রথমেই সে বিরিঞ্চিবাবার বিরুদ্ধবাদীদের নিয়ে একটা দল তৈরি করে এবং তাদের টাকা দিয়ে বশ করে। বিরিঞ্চিবাবার সভায় বসেও নিবারণ তার এই ব্যক্তিত্ব এবং বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দেয়। সকলের আগেই সে বিরিঞ্চিবাবার চোখে পড়ে এবং অন্য ভক্তদের ঈর্ষার কারণ হয়। নিবারণ তার অসাধারণ বাস্তববুদ্ধি এবং শক্তির পরিচয় দিয়েছে গুরুপদবাবুকে উদ্ধার করে। তার পরিকল্পনার উপর ভিত্তি করেই সত্যব্রত তার চেলাদের সাহায্যে বিরিঞ্চিবাবাকে বিতাড়িত করে বুঁচকীকে লাভ করে।

গল্পটি শেষ হয় নিবারণের কথায়। অভিজ্ঞ নিবারণই বুঁচকীর সংক্ষিপ্ত অথচ গোলমেলে জবাবের রহস্য উদ্ঘাটন করে সত্যব্রতকে বলেছে—"দূর গাধা, যাঃ মানেই হ্যাঁঃ।"

আলোচ্য গল্পে নিবারণ মাষ্টার ছিল বুদ্ধিমান, বাস্তববাদী, সাহসী, উদার এবং সুরসিক ব্যক্তি।

সত্যব্রত : আলোচ্য গল্পে হ্যাটকোটধারী বাইশ-তেইশ বছরের ছেলে সত্যব্রত কিছুটা নিবারণবাবুর ছত্রছায়ায় আবৃত। তার ব্যক্তিত্ব তখন প্রস্ফুটিত হয় নি, বাস্তব বুদ্ধিরও অভাব ছিল। মনে হয় ব্যক্তিত্বময়ী পিসিমার আঁচলের তলায় আদরে মানুষ হয়েছে বলেই একটুতেই সে গলে যেত। "ওঃ, কি মুশকিলেই পড়া গেছে" এই কথাটা ছিল তার মুখের বুলি। লেখক বলেছেন—"সত্য প্রায়ই মুশকিলে পড়িয়া থাকে।"

নিবারণ গুরুপদবাবুকে উদ্ধারের আগ্রহ প্রকাশ করলে সত্য তার সঙ্গী হতে চেয়ে বলেছে—"ননিদাকে তো জানই, ক্ষ্যালাখ্যাপা লোক, নিজের এক্সপেরিমেণ্ট নিয়েই আছেন। আর বউদি নিতান্ত ভালমানুষ। ওঁদের দ্বারা কিছু হবে না। কিছু করতে হয় তো তুমি আর আমি।"

বিরিঞ্চিবাবাকে বিতাড়িত করার সম্পূর্ণ পরিকনল্পা ছিল নিবারণের মাথায়। সূক্ষ্ম-কৌশল সত্যর মাথায় আসত না। সে ননিকে বলেছে "তবে হুকুম দাও প্রহারেণ ধনঞ্জয় করে দি।" এটা বয়সের ধর্ম।

দমদমার বাগানবাড়িতে সত্যব্রতের যে ভূমিকা দেখি তা সহকর্মীর ভূমিকা। সে ছিল নিবারণের বিশ্বস্ত সহকর্মী। তার নির্দেশ মত সব কাজ করে বাইরে থেকে দল বাড়াবার জন্য অমূল্য আর হাবলাকে এনেছিল।

বিরিঞ্চিবাবার সভায় সত্যকে এক দুর্বিসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু এক অভিনব কৌশলে সে এই কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজের বুদ্ধি ও অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দেয়।

বিরিঞ্চিবাবার অবিশ্বাস্য হাস্যকর ধাপ্পার গল্প শুনতে শুনতে সত্য এক অভিনব

কৌশলে তার উচ্ছ্বসিত হাসি দমনের চেষ্টা করেছে, অবশেষে একসময় সে চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে সে হাসিকে পরিণত করেছে কান্নায়।

বিরিঞ্চিবাবা তাকে কাঁদতে দেখে বলেছেন—"আহা, ওকে আসতে দাও আমার কাছে।"

এই পরিস্থিতির জন্যে সত্য প্রস্তুত ছিল না তাই—অবান্তর অসংলগ্ন কথায় বলে ফেলেছে "উদ্ধার কর বাবা, মানব জন্মে ঘেন্না ধরে গেছে। আমায় হরিণ করে সেই ত্রেতা যুগে কণ্ব মুনির আশ্রমে ছেড়ে দাও বাবা।......শুধু চাট্টি কচি ঘাস শকুন্তলার নিজের হাতে ছেঁড়া। আর এক জোড়া শিং দাও প্রভু, যাতে দুষ্মন্তটাকে গুঁতিয়ে দিতে পারি।

এই অবস্থায় শিষ্যকে উদ্ধার করে নিবারণ বলে, "ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবা। বিস্তর শোক পেয়েছে কিনা।"

সত্যর এই অভিনয় বুঁচকী নিশ্চয়ই উপভোগ করেছিল। সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে এই ধরনের ছেলেমানুষী করার জন্যে কিঞ্চিৎ স্নেহের ভর্ৎসনা করে বলেছিল, "আচ্ছা, আমার বাবার সামনে কি কাণ্ডটা করলেন বলুন তো? কি ভাববেন তিনি?"

এরপর অধিকাংশ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনায় সত্যব্রত নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। সে হোমঘরে বুঁচকীকে অভয় দিয়ে বলেছে, "বুঁচু, ভয় করছে।" অথবা মহাদেব পেছনের দরজা দিয়ে পালাবার উপক্রম করতে সত্যতাকে জাপটে ধরে বলেছে "তারপর ক্যাবলরাম, কদ্দিন থেকে দেবতাগিরি করা হচ্ছে?"

তাছাড়া সকলের সামনে সর্বপ্রথম সত্যই ঘোষণা করেছে "মহাদেব পচে গিয়ে বেরুল ক্যাবলা। বিরিঞ্চিবাবা হয়ে গেছেন জোচ্চোর।"

বিরিঞ্চিবাবাকে শেষ বিদায় জানাতে গিয়ে সত্য যে মন্তব্য করে তার মাধ্যমেই অসামান্য হিউমার বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। সে বলে, "প্রভু তা হলে নিতান্তই চললেন? চন্দ্রসূর্য আপনার জিম্মায় রইল, দেখবেন যেন ঠিক চলে। দম দিতে ভুলবেন না, আর মধ্যে মধ্যে অয়েল করবেন।"

সহজেই অনুমান করা চলে, সত্যব্রত যা করেছে তার অনেকটাই বুঁচকীর জন্যে। কারণ বুঁচকীকে সে অনেক আগে থেকেই ভালবাসত। আর বুঁচকীও যে এই তরুণের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল তার প্রমাণ পাই স্নেহের শাসনে, "বাবার সামনে কি কাণ্ডটা করলেন বলুন তো? কি ভাববেন তিনি?"

উত্তরে সত্য বলে, "ভারি অন্যায় হয়ে গেছে আর কখখনো অমন হবে না।"

দুজনের সম্পর্কের মধ্যে একটা অব্যক্ত ভালবাসার বীজ লুকানো না থাকলে বুঁচকী তার বাবার চোখে সত্যব্রতর ছেলেমানুষী লুকিয়ে রাখতে চাইত না।

অভিজ্ঞ নিবারণের সিদ্ধান্ত যদি অভ্রান্ত হয় তাহলে আমরা অনুমান করতে পারি, সত্য বিরিঞ্চিবাবাকে বিতাড়িত করে অর্ধেক রাজত্ব ও এক রাজকন্যা লাভ করেছিল।

গুরুপদবাবুঃ গুরুপদবাবু একদিন ছিলেন আলিপুরের বিখ্যাত উকিল। স্ত্রীর

মৃত্যুর পর তাঁর সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আসে এবং ধর্ম-কর্মে মন দেন। অনুমান করি এই দুর্বল মুহূর্তে তিনি বিরিঞ্চিবাবা নামে এক গুরুর পাল্লায় পড়েন।

মৌলবী বছিরুদ্দির মুখে তাঁর অতীতের খ্যাতি, প্রতিপত্তি ও অর্থবৈভবের কথা শুনতে পাই। বছিরুদ্দি বলেন, "আর বাবু মশাই, সে সব দিন খ্যান কমনে চলে গেছে। মা-ঠাকরোণ বেহস্ত পাওয়া ইস্তক মোদের বাবুসাহেবের জান্‌ডা কলেজায় নেই। অত করে বললাম, হুজুর অমন পসারডা নষ্ট করবেন না।"

ওকালতি ত্যাগ করলেও বছিরুদ্দিকে তিনি নিয়মিত মাসহারা দিয়ে থাকেন। এটা গুরুপদবাবুর ঔদার্যের পরিচয়।

তিনি কোন সংকীর্ণ স্বার্থের মোহে অন্য ভক্তদের মত বিরিঞ্চিবাবার শরণাপন্ন হন নি। এক অহৈতুকী ভক্তিই তাঁকে এই ধাপ্পাবাজ সাধুর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। পরমার্থের মুখে আমরা শুনেছি "তাঁর ইহকালের কোনও চিন্তা নেই। শুনেছি বিষয়-সম্পত্তি সমস্তই গুরুকে দেবেন।"

একমাসের কিছু বেশি সময় ধরে গুরুপদবাবু ভণ্ড সাধুর পাল্লায় পড়েছিলেন। এই সময়টা সংসারের সমস্ত কাজকর্ম দেখাশুনা করত গণেশ নামে তার এক শ্যালক।

বলাবাহুল্য বিনা স্বার্থে এই সচতুর ব্যক্তিটি তাঁদের খিদমত করত না। কিন্তু গুরুপদবাবুর তখন সংসারের দিকে মন ছিল না। তিনি ছিলেন একটা ঘোরের মধ্যে।

এই ঘোর কাটল নিবারণ সত্যব্রতের চেষ্টায়। তখন এই বিচক্ষণ বুদ্ধিমান আইনজীবী মানুষটি নিজের ভুল বুঝতে পারেন, কিন্তু অন্যদের মত বিরিঞ্চিবাবাকে অপমান করার উদ্যোগী হন নি।

বিরিঞ্চিবাবাকে জোচ্চোর বলে জানতে পেরে গোবর্ধন মল্লিক বলেন, "মারো শালাকে দুই থাবড়া।" কিন্তু তাকে নিবৃত্ত করে বিচক্ষণ আইনজীবী গুরুপদবাবু তাঁর মহত্ত্বের পরিচয় দিয়ে বলেছেন, "না-না, যেতে দাও যেতে দাও। সত্য গাড়িটা জুতিয়ে এঁদের স্টেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। কেউ যেন কিছু না বলে।"

পুরস্কারস্বরূপ সত্যর হাতে বুঁচকীকে তুলে দেবার অঙ্গীকার করে তিনি মহত্ব এবং উদারতার পরিচয় দিয়েছেন।

নিরুপমা : আলিপুরের বিখ্যাত উকিল গুরুপদবাবুর দুটি কন্যা ছিল। প্রথম কন্যার নাম নিরুপমা এবং দ্বিতীয়ার নাম বুঁচকী।

'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের উপকাহিনীর নায়ক প্রফেসর ননির সঙ্গে নিরুপমার বিয়ে হয়। সেই অর্থে নিরুপমা ছিল উপকাহিনীর নায়িকা। সত্যব্রতর সঙ্গে প্রফেসর ননির একটা পারিবারিক সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়। নিরুপমা সম্পর্কে সত্য মন্তব্য করে—"বউদি নিতান্ত ভালমানুষ।"

এই ভালমানুষ নিরুপমার সহনশীলতা, স্নেহ, ঔদার্য এবং বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় পাই প্রফেসর ননির বাড়িতে। এই সহজ-সরল, ভালমানুষ স্বামীগতপ্রাণা নারীটি ছিল খামখেয়ালী প্রফেসর ননির সহকর্মী। স্বামী সংসারে অনভিজ্ঞ 'হ্যালা খ্যাপা লোক'

হলে সংসারের সব ঝক্কি ঝামেলা গিয়ে পড়ে স্ত্রীর উপর। বৈজ্ঞানিক স্বামীকে তার গবেষণার কাজে সাহায্য করাও নিরুপমা তার কর্তব্য বলে মনে করত। অথচ এইসব উপদ্রব সে হাসিমুখেই মেনে নিয়েছিল। নিবারণের রসিকতার উত্তরে একবার তাকে বলতে শুনি—"শাক নয়, ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে।" ওঁর কত রকম খেয়াল হয় জানেন তো।"

খেয়ালী বৈজ্ঞানিক স্বামীর সহকর্মী হলেও—নিরুপমার সব দিকে লক্ষ্য ছিল। গুরুপদবাবু সন্ন্যাসীর পাল্লায় পড়ায় এবং টাকাকড়ি সব গুরুকে দেবেন শুনে বোন বুঁচকীর জন্যে তার চিন্তার অন্ত ছিল না। কিন্তু অসুস্থ শ্বাশুড়ীর প্রতি বধূর কর্তব্যবোধ তাকে পিত্রালয়ে গিয়ে থাকার হাত থেকে নিবৃত্ত করেছে।

নিরুপমা ছিল অসাধারণ বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন মহিলা। সে-ই নিবারণ ও সত্যব্রতদের বিরিঞ্চিবাবা সম্পর্কে রহস্য উদ্ঘাটনে সব চেয়ে বেশি সাহায্য করেছে। তার কাছেই নিবারণবাবু মন্ত্রগুপ্তি লাভ করে তবেই দমদমার বাগানবাড়ির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছে। নিরুপমা বলেছিল—"গণেশমামাকে বশ করুন, হুকুম না দিলে হোমঘরে ঢুকতে পাবেন না।" তা ছাড়া ধোঁয়া তৈরির কৌশলটিও নিরুপমার কাছে পাওয়া। নিরুপমা বলেছিল "মামার বাড়িতে দেখেছি গোয়াল ঘরে ভিজে খড় জ্বালে, খুব ধোঁয়া হয়।"

পণ্ডিত বৈজ্ঞানিকদের মাথায় যে কথা আসে নি সাধারণ নারী সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ায় উচ্ছ্বসিত নিবারণ বলেছিল, "ইউরেকা! বউদি, আপনিই নোবেল প্রাইজ পাবেন।"

বুঁচকী ঃ গুরুপদবাবুর ছোট মেয়ের নাম ছিল বুঁচকী। লেখক গল্পে তার পোশাকী নামটা ব্যবহার করেন নি।

বিরিঞ্চিবাবার সভাঘরের পাশে মেয়েদের ঘরে আমরা প্রথম বুঁচকীকে আবিষ্কার করি। লেখকের ভাষায়, "একটি সতর-আঠার বছরের মেয়ে লাল শাড়ির উপর এলোচুল মেলিয়া বসিয়া আছে এবং মাঝে মাঝে গুরুপদবাবুর দিকে করুণ নয়নে চাহিতেছে।"

বুঁচকী চরিত্রের ছুটি বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে। প্রথমত, পিতার প্রতি অফুরন্ত করুণা ও স্নেহ। দ্বিতীয়ত, অদম্য সাহস। তার সাহসের কথা নিরুপমাও স্বীকার করে বলেছে—"আমার তো দেখেই দাঁতে দাঁত রেখে ফিট হল। গণেশমামা ঘর থেকে টেনে বার করে দিলেন। বুঁচকীর বরং সাহস আছে।"

আর একবার হোমঘরেই বুঁচকীর সাহসের পরিচয় পাই। অন্ধকার ঘরে বিরিঞ্চিবাবা গালবাদ্য করে চলেছেন, "সেই গম্ভীর বু-বু-বু-বু নিনাদে ক্ষুদ্র গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল।"

এই রহস্যময় ভৌতিক পরিবেশে সত্যব্রত বুঁচকীর কানে কানে বলে—"বুঁচু, ভয় করছে?" উত্তরে বুঁচকী বলেছিল, "না।"

বড় বোন নিরুপমার মত বুঁচকীরও সব দিকে লক্ষ্য ছিল। এই লক্ষ্যের কেন্দ্রে ছিলেন তার অসহায় পিতা।

সত্যর কান্নার অভিনয় পাশের ঘরে বসেও বুঁচকী ধরতে পারে। আর পাছে তার ধর্মভীরু বাবার মনে এই কান্না ব্যঙ্গ হয়ে আঘাত দেয় তাই সে সত্যকে একান্তে পেয়ে মৃদু স্নেহের ভর্ৎসনায় বলে, "আচ্ছা আমার বাবার সামনে কি কাণ্ডটা করলেন বলুন তো? কি ভাববেন তিনি?"

সত্যব্রতর সঙ্গে বুঁচকীর আগে থেকেই পরিচয় ছিল, হয়তো পছন্দও হয়েছিল সত্যকে, কিন্তু তার সংযম, শালীনতাবোধ এবং নারীত্বসুলভ লজ্জা সেই ভাল লাগার পরিচয়কে আড়াল করে রেখেছিল।

বিরিঞ্চিবাবা গল্পটি বুঁচকীর মুখের একটি অব্যক্ত শব্দের দ্বারা শেষ হয়েছে। কথাটি হল, 'যাঃ'। কিন্তু লেখক এই 'যাঃ' শব্দটিকে এমনভাবে প্রয়োগ করেছেন যে, এই শব্দটিকে ঘিরে একটা অব্যক্ত মাধুর্য ব্যক্ত হয়ে পড়ে, এবং সেই সঙ্গে ব্যক্ত হয় সত্যব্রতর প্রতি বুঁচকীর ভালবাসা।

প্রফেসর ননিঃ প্রফেসর ননি ব্যক্তিগত জীবনে ছিলেন গুরুপদবাবুর বড় জামাই। তিনি কোনদিন প্রফেসারি করেন নি, অনেকগুলি পাস করে বাড়িতে বসেই বৈজ্ঞানিক গবেষণা করতেন। হয়তো সেই কারণেই বন্ধুরা তাঁকে প্রফেসর আখ্যা দিয়েছিল।

প্রফেসর ননি ছিলেন 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের উপকাহিনীর নায়ক। নিবারণ মাষ্টারের বন্ধুলোক ছিলেন তিনি, তাই দমদমার বাগানবাড়িতে বিরিঞ্চিবাবার দর্শনে যাবার পূর্বে সাধুবাবা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে নিবারণ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন।

সঙ্গে সঙ্গে গল্পের মূল স্রোতধারার সঙ্গে উপকাহিনীর মিলন ঘটেছে। প্রফেসর ননির চরিত্রটি এই গল্পে লেখকের ব্যঙ্গবিদ্রূপের শিকার। যদিও প্রচুর হাস্যরসের গোলাপ জলে এই বিদ্রূপের কশাঘাত অনেক নরম করে নেওয়া হয়েছে।

প্রফেসর ননির বিচিত্র এক্সপেরিমেন্ট হাস্যরসের একটি স্বতঃস্ফূর্ত উৎস। ছবিটি এই রকম—প্রকাণ্ড এক ডেকচিতে সবুজ রঙের কোন পদার্থ সিদ্ধ হচ্ছে, ননির স্ত্রী নিরুপমা কাঠি দিয়ে ঘাঁটছেন, পাশের বারান্দায় একটা হারমোনিয়ম আছে, তা থেকে একটা রবারের নল এসে ডেকচির ভেতর প্রবেশ করেছে। প্রফেসার ননি মালকোঁচা মেরে কোমরে হাত দিয়ে আছে।

নিবারণ রসিকতা করে বলেন, "কেন ননির বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না?"

উত্তরে প্রফেসর ননি বলেন, "নিবারণ ইয়ারকি নয়। পৃথিবীতে আর অন্নাভাব থাকবে না।"

অথবা, "আরে ও কি আর ঘাস থাকবে? প্রোটিন সিন্থিসিস হচ্ছে। ঘাস হাইড্রোলাইজ হয়ে কার্বোহাইড্রেট হবে। তাতে দুটো অ্যামিনো গ্রুপ জুড়ে দিলেই বস্।"

এই আত্মভোলা বৈজ্ঞানিক যতই "হ্যালা খ্যাপা" হোক না কেন নিজের আত্মসম্মানবোধ ছিল খুবই প্রখর। তাই সত্যব্রতর অনুযোগের উত্তরে তাঁকে বলতে শুনি "তা কখনও পারি ? শ্বশুরমশাই ভাববেন ব্যাটা সম্পত্তির লোভে আমার ধর্ম-কর্মের ব্যাঘাত করতে এসেছে।"

খেয়ালী বৈজ্ঞানিকের অবাস্তব বুদ্ধির সব চেয়ে বড় পরিচয় হল সামান্য ধোঁয়া হবার জন্যে তাকে বলতে শুনি, "যদি লাল ধোঁয়া চাও তবে নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যাণ্ড তামা, যদি বেগনী চাও তবে আয়োডিন ভেপার, যদি সবুজ চাও—"

এর পর 'প্লেন ধোঁয়া চাই,' বলা হলেও প্রফেসর ননিকে বলতে শুনি "তা হলে ট্রাই-নাইট্রো-ডাই-মিথাইল—"

উপকাহিনীর নায়ক প্রফেসর ননির চরিত্রকে অবলম্বন করে লেখক হাস্যরস সৃষ্টি করলেও তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণার উদ্দেশ্য যে মহৎ ছিল সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

পরমার্থ : পরমার্থ ছিল চোদ্দ নম্বর হাবশীবাগান লেনের এক মেসের অধিবাসী। পেশায় সে ছিল ইন্‌সিওরেন্সের দালাল। তার নেশা ছিল হঠযোগ এবং থিয়সফির চর্চা করা আর সাধু-সন্ন্যাসীর সন্ধানে ঘুরে বেড়ানো। সে-ই একদিন জগন্নাথ ঘাটে মিরচাইবাবার সন্ধান আনে এবং অবশেষে বিরিঞ্চিবাবার সংবাদ দিয়ে বলে—"তবে দমদমায় গুরুপদবাবুর বাগানে চলুন, বিরিঞ্চিবাবার কাছে।"

পরমার্থ কেবল আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্যই সাধু-সন্ন্যাসীর খোঁজে বেড়াত বলে মনে হয় না। নিতাইবাবুর মত পরমার্থের চেয়ে অর্থকেই সে মূল্যবান সম্পদ বলে মনে করত। তাই নিতাইবাবু যখন বলেন "বাবার দয়ায় যদি হপ্তাখানেক নাইন্টিন ফোর্টিনে ঘুরে আসতে পারি, তবে তোমায় ভুলব না পরমার্থ। টেন পারসেন্ট—বুঝলে ?"

বিরিঞ্চিবাবার দর্শনের মূলে হয়তো যতটা ভক্তিভাব ছিল তার চেয়েও বেশি ছিল এই "টেন পারসেন্টের" প্রলোভন। সাধারণ মানুষ অসাধারণ উপায়ে সাংসারিক উন্নতি করতে চায়, পরমার্থ তার ব্যতিক্রম ছিল না।

নিতাইবাবু : নিতাইবাবু ছিলেন হাবশীবাগান লেনের অধিবাসী। তিনি ছিলেন অতি সাধারণ গৃহীমানুষ। ধর্মকে তিনি স্বার্থসিদ্ধির উপায় বলেই মনে করতেন। সংসারের দায়-দায়িত্ব পালনের শক্তি ও নিষ্ঠা তাঁর ছিল না। তাই যখন তখন তাঁকে বলতে শোনা যেত "চিত্তে সুখ নেই দাদা," অথবা—"সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে। একটি ভাল সাধু সন্ন্যাসী পাই তো সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি।"

অর্থের জন্যেই পরমার্থের সন্ধান ছিল নিতাইবাবুর জীবন-বেদ। তাঁর জীবনের মূল কথা—আধ্যাত্মিক উন্নতি নয়, আর্থিক উন্নতি। এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাপার' মত তিনি পরশপাথর খুঁজে বেড়াতেন। বিরিঞ্চিবাবার দ্বারা তাঁর উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় তিনি মিরচাইবাবার কাছে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

সাধারণ মানুষের মত নিতাইবাবু আর্থিক ও সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকে জীবনে একমাত্র কাম্যবস্তু বলে মনে করতেন।

মৌলবী বছিরুদ্দি : ফরিদপুর নিবাসী মৌলবী বছিরুদ্দি ছিলেন গুরুপদবাবুর প্রাক্তন মুহুরী। লেখকের নিজের ভাষায় বলি, "গুরুপদবাবু ওকালতি ত্যাগ করায় বছিরুদ্দির উপার্জন কমিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তিনি নিয়মিত মাসহারা পাইয়া থাকেন, সেইজন্য প্রায়ই মনিবকে সেলাম করিতে আসেন।"

কোচম্যান ঝোঁটি মিয়া এবং দারোয়ান ফেঁকু পাঁড়ের কাছে মৌলবী সাহেবের বিশেষ খাতির ছিল। তারা বছিরুদ্দিকে খাতির করে বেঞ্চে বসিয়ে গল্প করত। গল্প হত একতরফা। "মৌলবী সাহেব ফরিদপুরী উর্দুতে দুনিয়ার বর্তমান দুরবস্থা" বিবৃত করতেন। কোচম্যান, দারোয়ান অথবা সহিস তার কথাগুলি আগ্রহ সহকারে শুনে যেত।

মৌলবী বছিরুদ্দি ফরিদপুরের একজন সহজ সরল বাঙ্গালী মুসলমান হলেও তার মনের মধ্যে 'খানদানী মনিষ্যি' হবার অদম্য আকাঙ্ক্ষা ছিল।

মনের মত শ্রোতা পেলে তিনি নিজের খানদানের পরিচয় দিতে কার্পণ্য করতেন না, বলতেন—"তাঁর ধমনীতে মোগলাই রক্ত প্রবাহিত হইতেছে। যদিও লোকে তাঁকে বছিরুদ্দি বলে, কিন্তু তাঁর আদত নাম বেদম খাঁ। তাঁর পিতার নাম জঁহাবাজ খাঁ, পিতামহের নাম আবদুল জব্বর, তাঁদের আদিনিবাস ফরিদপুর নয়—আরব দেশ, যাকে বলে তুর্থ। সেখানে সকলেই লুঙ্গি পরে এবং উর্দু বলে, কেবল পেটের দায়ে তাঁকে বাংলা শিখিতে হইয়াছে।"

'খানদানী মনিষ্যি' সাজার প্রলোভন তাঁর চরিত্রে এতই প্রবল ছিল যে তিনি নিজের মাতৃভূমি ও মাতৃভাষার চেয়ে অদেখা দেশ এবং অপরিচিত ভাষার প্রতি বেশি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতেন। যদিও বাংলাই ছিল বছিরুদ্দির মাতৃভাষা, কিন্তু 'খানদানী মনিষ্যি' সাজার লোভে তাঁকে বলতে হয়েছে—"কেবল পেটের দায়ে তাঁকে বাংলা শিখিতে হইয়াছে।"

এই দুর্বলতার জন্যই বছিরুদ্দি চরিত্রটি লেখকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হয়েছে। লেখকের ভাষায় তিনি বাংলায় কথা বলতেন না, কথা বলতেন, 'ফরিদপুরী উর্দুতে'।

ফেকু পাঁড়ে : দারোয়ান ফেকু পাঁড়ে ছিল গুরুপদবাবুর দমদমার বাগানবাড়ির দারোয়ান। মৌলবী বছিরুদ্দির মত সেও বিরিঞ্চিবাবার উপর বীতশ্রদ্ধ ছিল। ফেকু পাঁড়ে ছিল অতি সাধারণ মানুষ। সাধারণ বুদ্ধিতেই সে জগৎ জীবনকে বিচার করত। সাধু-সন্ন্যাসী সম্পর্কে তার ধারণা বা বিশ্বাসটাও ছিল অসাধারণ, আর সে কথা ফেকু অকপটেই স্বীকার করত। বলত—"বিরিঞ্চিবাবা বাবাজী থোড়াই আছেন। তাঁর জনৌ ভি নাই, জটা ভি নাই। তিনি মছলি খান, বকরির গোস্ত ভি খান। দোনো সাঁঝ চা-বিস্কুট না হইলে তার চলে না।"

সাধারণ মানুষের মত ফেকু পাঁড়ে বিশ্বাস করত সাধু-সন্ন্যাসী হবেন গোঁফ-দাড়ি-ওয়ালা জটাজুটধারী যিনি মাছ মাংস ছোঁবেন না, চা-বিস্কুট খাবেন না। তার এই সাধারণ বিশ্বাসের মূলে আঘাত লাগায় সে বলে, "এসব বাংগালী বাবাজী বিলকুল জুয়াচোর।"

মৌলবী বছিরুদ্দি সাহেবের সঙ্গে ফেকু পাঁড়ের একটা জায়গায় বড় রকমের মিল খুঁজে পাই, তারা দুজনেই ছিল আত্মপ্রশংস।

বছিরুদ্দির মতই ফেকু যখন আত্মপ্রশংসা করত তখন তার মাত্রাজ্ঞান থাকত না। ছোট মহারাজ কেবলানন্দের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে সে বলেছে—"তিনি জানেন না যে উক্ত ফেকু পাঁড়ে মিউটিনিমে তলোয়ার খেলায়া থা (যদিও ফেকু তখনও জন্মে নাই)।"

দারোয়ান ফেকু পাঁড়ে ভীতু প্রকৃতির মানুষ ছিল বলেই মনে হয়। সেই কারণে বিরিঞ্চিবাবা-বিতাড়নে তাদের সাহায্য চাওয়া হলে সে প্রথমেই জানতে চায়—"মার পিট হোবে?" এই সময় তার কণ্ঠস্বরে ও চোখেমুখে এমন কোন স্পষ্ট দুর্বলতার চিহ্ন ফুটে উঠেছিল যা দেখে নিবারণ বলে ওঠে "আরে না-না, তোমাদের কোন ভয় নেই।"

ফেকুর যত সাহস ও বীরত্ব সবই ছিল মুখে। তবে এটা ঠিক নেপথ্যে থেকে অন্যদের সঙ্গে নিবারণ ও সত্যব্রতকে বিরিঞ্চিবাবা-বিতাড়নে সহায়তা করেছে। বিরিঞ্চি-বাবার উপর তার ভক্তিশ্রদ্ধা ছিল না। তার উপর পুরনো কর্মচারী হিসাবে যেটুকু সম্মান তার প্রাপ্য ছিল শিষ্য কেবলানন্দ এবং গণেশমামা তা থেকে ফেকুকে বঞ্চিত করায় পাঁড়েজী তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছিল।

ঝোঁটি মিয়া : কোচমান ঝোঁটি মিয়া, সহিস ও মালী—দমদমার বাগানবাড়িতে আমরা তাদের দর্শন পাই। লেখক বলেছেন—"ফটকের পাশেই একসারি টালি ছাওয়া ঘর, তাতে আস্তাবল এবং কোচমান, দারোয়ান, মালী ইত্যাদির থাকিবার স্থান।"

এরা সকলেই মৌলবী বছিরুদ্দি ও দরোয়ান ফেকু পাঁড়েকে শ্রদ্ধা করত।

রঙ্গমঞ্চে বিরিঞ্চিবাবার আবির্ভাবকে তারা কেউ ভাল চোখে দেখে নি। তাই নিবারণ এবং সত্যব্রত সহজেই তাদের কাজে লাগাতে পেরেছিল।

গণেশমামা : গুরুপদবাবুর শ্যালক গণেশমামা বাংলা সাহিত্যের অতি পরিচিত চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসে গণেশমামার মত স্বার্থপর পরজীবী মানুষের সাক্ষাৎ পাই।

স্ত্রী-বিয়োগের পর গুরুপদবাবু সংসারের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে বিরিঞ্চিবাবার সেবায় আত্মনিয়োগ করলে গণেশমামা স্বেচ্ছায় তাঁর সাংসারিক দায়-দায়িত্ব পালনে যত্নবান হন। বিরিঞ্চিবাবাকে জুটিয়ে দেবার মূলেও এই মানুষটির অবদান সবচেয়ে বেশি ছিল। অনিবার্য কারণে সত্যব্রত সন্দেহ প্রকাশ করেছে "আচ্ছা নিবারণদা, মামাবাবুর কিছু বখরা আছে নাকি?"

উত্তরে নিবারণ জানায় "ভগবান জানেন। তবে গুরুপদবাবু যতদিন সংসারে নির্লিপ্ত থাকেন, মামাবাবুর ততদিন সুবিধে।" এটাই হল গণেশবাবুর আসল চেহারা।

স্বার্থপর সুযোগ সন্ধানী এই মানুষটিকে সত্যব্রত সহজেই চিনতে পারে, তাই হোমঘরে আসল দেবতা দেখার আবেদন জানাবার আগেই তার জামাইকে চাকরী দেবার আশ্বাস দেয়।

ও. কে. সেন এবং গোবর্ধন মল্লিক: ও. কে. সেন এবং গোবর্ধন মল্লিক দুজনেই ছিলেন বিরিঞ্চিবাবার গুণমুগ্ধ ভক্ত। গল্পে দেখি তাঁরা স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যেই ধর্ম-কর্মে মন দিয়েছেন।

মিস্টার ও. কে. সেন ছিলেন সাহেবী পোশাক-পরা প্রৌঢ় ব্যক্তি, বার-অ্যাট-ল। কয়লার খনিতে অনেক টাকা লোকসান দিয়ে ধর্মকর্মে মন দিয়েছিলেন।

স্থূলকায় গোবর্ধন মল্লিক ছিলেন একজন বিখ্যাত মুৎসদ্দী। সাধারণত তাঁর পরণে থাকে মিহি জরি পাড় ধুতি, গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পাঞ্জাবির ভেতর দিয়ে সরু সোনার হার দেখা যায়। বিরিঞ্চিবাবার সভায় আসবার কিছুদিন পূর্বে তিনি তৃতীয় পক্ষ ঘরে এনেছেন।

এই গোবর্ধনবাবুই ভক্তিভাবে বিরিঞ্চিবাবাকে প্রশ্ন করেছিলেন "বাবা, প্রবৃত্তিমার্গ আর নিবৃত্তিমার্গ এর কোন্‌টা ভাল?"

বৃদ্ধবয়সেও সংসারের প্রতি চরম আসক্তি হয়তো তাঁর মনে একটা দ্বন্দ্বের সৃষ্টি করেছিল, তাই প্রবৃত্তিমার্গ ও নিবৃত্তিমার্গ নিয়ে তিনিও চিন্তিত ছিলেন।

ও. কে. সেনকে সর্বদাই আমরা শিশুর বিস্ময় নিয়ে বিরিঞ্চিবাবার কথায় বিগলিত হতে দেখি। কখনও তিনি বলেন, "ওআণ্ডারফুল!" "মাই ঘড্।" কখন সবিস্ময়ে বলেছেন, "এক্সকিউজ মি প্রভু, আপনি কি জিসস ক্রাইস্ট্‌কে জানতেন?" দুর্বল মানুষ যখন অন্ধবিশ্বাসে যুক্তিতর্ক ও বাস্তববুদ্ধি এমন কি নিজের বিবেককে পর্যন্ত হত্যা করে তখন তাদের কাছে অসম্ভব বলে কিছু থাকে না। গোবর্ধন মল্লিক এবং ও. কে. সেন ছিলেন এমনই দুজন ধর্মান্ধ ব্যক্তি। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে তাঁরা ভণ্ড সাধুর সভার পরিবেশকে ফুটিয়ে তুলেছেন।

কেবলানন্দ: কেবলানন্দ ছিল বিরিঞ্চিবাবার শিষ্য। ভক্তরা তাকে ছোটো-মহারাজ বলে জানতেন। লেখক তাঁর চেহারা ও পোশাকের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছেন —"ইহার বয়স কয় শতাব্দী তাহা ভক্তগণ এখনও নির্ণয় করেন নাই, তবে দেখিতে বেশ জোয়ান বলিয়াই মনে হয়। ইনিও গুরুর অনুরূপ বেশধারী, তবে কাপড়টা সস্তাদরের।"

বিরিঞ্চিবাবার পরণে ছিল গৈরিকরঞ্জিত আলখাল্লা মাথায় কানঢাকা টুপি। অতএব অনুমান করা যায় কেবলানন্দের পরণেও ছিল গেরুয়া পোশাক আর মাথায় কানঢাকা টুপি।

বিরিঞ্চিবাবার বিরুদ্ধ পথের লোকেরা বিরিঞ্চিবাবার চেয়ে কেবলানন্দের উপরেই বেশি বিতশ্রদ্ধ ছিল। কথায় বলে বাঁশের চেয়ে কঞ্চিদড়। বিরিঞ্চিবাবার এই শিষ্যটির

কামড়ে দেবার রোগ ছিল। সে দরোয়ান ফেকু পাঁড়েকে দংশন করে এবং গল্পের শেষ পর্বে আমরা দেখি মহাদেবরূপী কেবলানন্দকে ধরতে গিয়েই সত্যব্রত দংশিত হয়। এই সব কারণেই দরোয়ান ফেকু পাঁড়ে তাকে 'বিচ্ছু' আখ্যা দিয়েছিল। কেবলানন্দের সবচেয়ে বড়ো গুণ, যেটা আমাদের চোখে পড়ে তা হল বহুরূপীর মত রামচন্দ্র, ব্রহ্মা, চৈতন্য, যিশু, মহাদেব প্রভৃতির রূপধরার ক্ষমতা। মনে হয় কেবলানন্দ ছিল ভণ্ডতপস্বী বিরিঞ্চিবাবার অযোগ্য শিষ্য। তার অসহিষ্ণু মনোভাব এবং দংশনরোগ নিয়ে কী-করে এত দিন সে বিরিঞ্চিবাবার মত ভণ্ড সাধুর চেলাগিরি করে এসেছে সেটা ভাবতেই আমাদের অবাক লাগে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। বিরিঞ্চিবাবা গল্পে প্রফেসর ননির বৈজ্ঞানিক গবেষণার পরিচয় দাও। এ প্রসঙ্গে লেখকের হাস্যরস সৃষ্টির দক্ষতা বর্ণনা করো।

উত্তর। রাজশেখরের 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের একটি ছোটো উপকাহিনীর নায়ক হল প্রফেসর ননি। প্রফেসর ননি কোনদিন প্রফেসারি না করলেও বাড়িতে নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক গবেষণা করে বলে বন্ধুরা তার নাম দিয়েছিল প্রফেসর ননি।

বিরিঞ্চিবাবা সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহের জন্যে নিবারণ এবং সত্যব্রত প্রফেসর ননির বাড়িতে উপস্থিত হয়।

তারা ননির অন্দরমহলের উঠানে গিয়ে দেখল একটা উনোনের উপর প্রকাণ্ড ডেকচিতে সবুজ রঙের কোন পদার্থ সিদ্ধ হচ্ছে। ননির স্ত্রী নিরুপমা সেটা কাঠি দিয়ে ঘাঁটছে। পাশের বারান্দায় একটা হারমোনিয়ম আছে, তা থেকে একটা রবারের নল এসে ডেকচির মধ্যে প্রবেশ করেছে। প্রফেসর ননি কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার গবেষণা লক্ষ্য করছে।

নিবারণের রসিকতার উত্তরে ননি তার দুরূহ গবেষণার বিষয়টি সহজ করে জানিয়ে দেয়। পৃথিবীতে অন্নাভাব দূর করাই ছিল তার গবেষণার বিষয়। সে জানায় ডেকচিতে ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে কিন্তু ও ঘাস ঘাস থাকবে না। তার ভাষায় "ঘাস হাইড্রোলাইজ হয়ে কার্বোহাইড্রেট হবে। তাতে দুটো অ্যামিনো গ্রুপ জুড়ে দিলেই বস্। হেক্সা-হাইড্রক্সিডাই-অ্যামিনো—"। একেই নাকি বলে প্রোটিন সিন্থেসিস। নলযুক্ত হারমোনিয়মটা রাখা হয়েছে অক্সিডাইজ করার জন্য। ননির আদেশে তার স্ত্রী হারমোনিয়মে বেলো করেন, সুরের বদলে রবারের নল দিয়ে হাওয়া এসে ডেকচির ভিতর 'বগবগ' করতে থাকে। এটাই নাকি অক্সিডাইজ করার পদ্ধতি। প্রফেসর ননির বিশ্বাস তার গবেষণা সার্থক হলে এই ভাবেই প্রোটিন সিন্থেসিস হবে। ফলে পৃথিবীতে আর অন্নাভাব থাকবে না।

রাজশেখর ছিলেন বাংলা সাহিত্যের একজন দক্ষ হাস্যরসিক। প্রফেসর ননির উপকাহিনীর হাস্যরস মূলতঃ সংলাপ ভিত্তিক। ননির উঠানে বিশাল এক ডেকচিতে সবুজ রঙের পদার্থ সেদ্ধ হচ্ছে দেখে নিবারণ ননির স্ত্রীকে প্রশ্ন করে "একি বউদি, এত শাকের ঘণ্ট কার জন্যে রাধছেন?"

পরে যখন জানতে পারেন—"শাক নয় ঘাস সেদ্ধ হচ্ছে"। তখন আমরা নিবারণকে বলতে শুনি—"সেদ্ধ হচ্ছে? কেন ননির বুঝি কাঁচা ঘাস আর হজম হয় না?" অথবা আর এক জায়গায় তাকে বলতে শুনি—"সকলেই তো প্রফেসর ননি বা রোমন্থক জীব নয় যে ঘাস খেয়ে বাঁচবে।"

প্রফেসর ননির প্রোটিন সিন্থেসিসের প্রক্রিয়াও কম হাস্যকর ব্যাপার নয়। গবেষণার ব্যাপারটা সহজ করে বোঝাবার জন্যে ননির নির্দেশে নিরুপমা হারমোনিয়ম বাজালে "স্বর বাহির হইল না, রবারের নল দিয়া হাওয়া আসিয়া ডেকচির ভিতর বগবগ করিতে লাগিল। তাই দেখে নিবারণ রসিকতা করে, "শুধুই ভুড়ভুড়ি! আমি ভাবলুম বুঝি সংগীতরস রবারের নল বয়ে ঘাসের সঙ্গে মিশে সবুজ-অমৃতের চ্যাঙড় সৃষ্টি করবে।"

এইভাবে ননির উপকাহিনীতে সংলাপের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক গবেষণার বাহ্যিক আড়ম্বরের প্রতি যে ব্যঙ্গবাণ নিক্ষেপ করা হয়েছে তার হাস্যরসের মূল্যও নিতান্ত কম নয়।

প্রশ্ন ২। 'বিরিঞ্চিবাবা সভা অলংকৃত করিয়া বসিয়াছেন'।

—বিরিঞ্চিবাবা কে? তাহার এবং ছোট মহারাজের চেহারার বর্ণনা দাও। সভাগৃহে কাহারা কিরূপে অবস্থান করিতেছিলেন তাহাদেরও বর্ণনা দাও।

উত্তর। বিরিঞ্চিবাবা ছিলেন একজন ভণ্ড ধর্মগুরু। বিরিঞ্চি অর্থ ব্রহ্মা। বিরিঞ্চিবাবা নিজেকে ব্রহ্মার সমতুল্য বলে মনে করতেন। তিনি নাকি আদি সৃষ্টির সাক্ষী; যীশু তার কাছে 'সেদিনকার ছেলে, বৈবস্বত মনুকে তিনি 'বিবু' বলে সম্বোধন করেন। এই ধাপ্পাবাজ ভণ্ড ব্যক্তিটি গুরুপদবাবুর দমদমার বাগান বাড়িতে ভক্তদের নিয়ে জাঁকিয়ে বসেছিলেন।

বিরিঞ্চিবাবার চেহারাটি বেশ লম্বাচওড়া, গৌরবর্ণ মুণ্ডিত মুখ, সুপুষ্ট গালের আড়াল থেকে যেন উজ্জ্বল চোখ উঁকি দিচ্ছে। বিশাল শিঙাড়ার মত নাক, মৃদু হাস্যমণ্ডিত প্রশস্ত ঠোঁট, তার নীচে থাঁজে থাঁজে চিবুকের স্তর।

—পরণে গৈরিকরঞ্জিত আলখাল্লা। মাথায় কান ঢাকা টুপি। দেখে বয়স মনে হয় পঞ্চাশ কি পঞ্চান্ন।

বিরিঞ্চিবাবার বেদীর নিচে ছোটো মহারাজ কেবলানন্দের আসন। তাকে দেখে বেশ জোয়ান বলে মনে হয়। ছোটোমহারাজের পোশাক ঠিক গুরুর মতোই, তবে কাপড়টা সস্তাদরের।

বেদীর নিচে বাঁ দিকে শীর্ণকায় গুরুপদ বাবু বেদীতে মাথা ঠেকিয়ে অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন, তিনি জাগ্রত কি নিদ্রিত দেখে বোঝবার উপায় ছিল না। ভক্তদের অনেকে সটান লম্বা অবস্থায় উপুড় হয়ে যুক্তকর সামনে প্রসারিত করে পড়ে আছেন। অবশিষ্ট সকলে হাতজোড় করে পা ঢেকে বিরিঞ্চিবাবার বচনামৃত পানের জন্যে উদ্গ্রীব হয়ে বসেছিলেন।

এই সভাগৃহের পাশে ছিল মহিলা ভক্তদের বসবার ঘর। সেখানে একটি সতর-আঠার বছরের মেয়ে লাল শাড়ি পরে এলোচুলে বসেছিল এবং মাঝে মাঝে গুরুপদ বাবুর দিকে করুণ চোখে চাইছিল। এই মেয়েটির নাম বুঁচকী, গুরুপদবাবুর ছোটো মেয়ে।

প্রশ্ন ৩। দমদমার সভাগৃহে নিবারণ আত্মপরিচয় দিবার পর বিরিঞ্চিবাবা কিরূপে তাহার পূর্বজীবনের পরিচয় দিল।

উত্তর। গুরুপদবাবুর দমদমার বাগান বাড়িতে বিরিঞ্চিবাবার সভায় গিয়ে নিবারণ ছোটে। মহারাজের বাধা অগ্রাহ্য করেই একেবারে বিরিঞ্চিবাবার পা জড়িয়ে ধরল। সেই সময় বিরিঞ্চিবাবা বলেন, "চেনা চেনা বোধ হচ্ছে!"

উত্তরে নিবারণ আত্মপরিচয় দান করে বলে, 'অধমের নাম নিবারণ চন্দ্র।'

কিন্তু বিরিঞ্চিবাবার কাজ তো কেবল বর্তমান নিয়ে নয়,—তিনি যে আদি সৃষ্টির একজন সাক্ষী, তার কাছে যিশু হলেন সেদিনকার ছেলে, মনুকে তিনি 'বিবু' বলে সম্বোধন করেন। তাই নিবারণের অতীত জীবনের পরিচয় দান তার পক্ষে মোটেই কঠিন ব্যাপার ছিল না।

প্রথমে বিরিঞ্চিবাবার মনে হল নিবারণের পূর্বজীবনে তিনি তাকে নেপালে দেখেছেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই যেন তাঁর মনে পড়ে যায় গতজীবনে নিবারণ ছিল জগৎশেঠের খাজাঞ্চী নাম ছিল মোতিরাম। মুরশিদাবাদে জগৎশেঠের কুঠিতে শেঠজীর মাতৃশ্রাদ্ধের দিন বিরিঞ্চিবাবা তাকে প্রথম দেখেছিলেন।

শেঠজীর মাতৃশ্রাদ্ধে নিমন্ত্রিত হয়ে উপস্থিত ছিলেন—রাজা কৃষ্ণচন্দ্র, রায় রায়ান জানকী প্রসাদ, নবাবের সিপাহসলার খানখানান মহব্বৎ জং, সুতোনুটির আমিরচন্দ। তিনি সেই শ্রাদ্ধবাড়ির ভোজের বর্ণনা দিতেও ছাড়েন নি।

প্রশ্ন ৪। হাসি ঠেকাইবার জন্য সত্যব্রত কোন্ কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল? শেষ পর্যন্ত সফল না হইয়া সে কী করিল?

উত্তর। সত্যব্রতের একটা মহৎ রোগ ছিল, সে কিছুতেই হাসি সামলাতে পারত না। নিজে গম্ভীর হয়ে পরিহাস করলেও অন্যের মুখে অদ্ভুত কথা শুনলে তার গাম্ভীর্যরক্ষা করা কঠিন হয়ে পড়ত। হাসি দমনের জন্যে সত্যব্রত একটি মুষ্টিযোগ ব্যবহার করত। গুরুজনদের সামনে হাসির কারণ উপস্থিত হলে সে কোনো ভয়াবহ অবস্থার কল্পনা করে হাসি ঠেকাবার চেষ্টা করত।

একসময় বিরিঞ্চিবাবার সভায় নিতাইবাবু ছুটে গিয়ে বাবার সামনে গলবস্ত্র হয়ে

বললেন—'দয়া কর প্রভু।' উত্তরে বিরিঞ্চিবাবা বললেন—"কি চাই তোমার?" এই সময় নিতাইবাবু থতমত খেয়ে বলল—"নাইন্টিন ফোর্টিন"। নিতাইবাবুর বিশ্বাস ছিল আধ্যাত্মিক শক্তিতে শক্তিমান বিরিঞ্চিবাবা ইচ্ছে করলেই তাকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগের দিনগুলিতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। তাই বিরিঞ্চিবাবার কাছে তিনি সংক্ষেপে বলেন,—'নাইন্টিন ফোর্টিন।'

বিরিঞ্চিবাবা প্রথমটায় একথার অর্থ বুঝতে না পারলেও সত্যব্রত এবং নিবারণ সহজেই নিতাইবাবুর অভিপ্রায় বুঝতে পারেন। তার উপর স্থরসিক নিবারণবাবু নিতাই বাবুর গাণিতিক সংখ্যাটিকে টেলিফোন নাম্বারে রূপান্তরিত করে অভিনয়ের ভঙ্গীতে চুপি চুপি বলেন—"ওআন-নাইন-ওআন-ফোর, ক্যালকাটা। নো রিপ্লাই? ট্রাই এগেন মিস।"

নিতাইবাবুর উদ্ভট পরিকল্পনার কথা ভেবে এবং নিবারণবাবুর রসিকতা শুনে সত্যব্রতর পক্ষে হাসি চেপে রাখা শক্ত ছিল। তাই সে মনে মনে কল্পনা করতে লাগল —ছুতার মিস্ত্রী যেন তার পিঠের উপর র‍ঁাদা চালাচ্ছে। পিঠের উপর চকলা চকলা চামড়া উঠে যাচ্ছে। "ওঃ সে কি অসহ্য যন্ত্রণা!" এইভাবে দৈহিক যন্ত্রণার কথা কল্পনা করে সে হাসির বেগ রোধ করতে চেয়েছিল।

এরপর বিরিঞ্চিবাবা মিষ্টার সেনের এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন—"যিশু তো সেদিনকার ছেলে।"

গৌতমবুদ্ধকেও জানতেন কিনা জিজ্ঞেস করলে নিবারণবাবু রসিকতা করে চুপি চুপি উত্তর দেন—"গৌতমবুদ্ধ কোন্ ছার, প্রভু মনু পরাশরের সঙ্গে এক ছিলিমে গাঁজা খেতেন। সব্বার সঙ্গে ওঁর আলাপ ছিল। ভগীরথ, টুটেন খামেন, নেবুচাডনাজার, হাম্মুরাব্বি, নিওলিথিক ম্যান, পিথেকান্থ্রোপস ইরেকটস, মায় মিসিং লিংক্।"

এই জাতীয় রসিকতার বিনাহাস্যে সহ্য করার মতো শক্তি ছিল না সত্যব্রতর। এর আগেই তার কানের ভিতর গঙ্গাফড়িং, নাকের ভিতর গুবরে পোকা কুরে কুরে খাচ্ছিল। অর্থাৎ অদম্য হাসির বেগ দমন করতে সে অস্থির হয়ে উঠেছিল। কিন্তু নিবারণের আলোচ্য মন্তব্য শুনে তার পক্ষে হাসি চেপে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বলেই সে এবার কল্পনা করল, সাতটা বাঘ তার পেছনে তাড়া করে আসছে আর সামনে তিনটে ভালুক থাবা তুলে দাঁড়িয়ে আছে।

এরপর ধাপ্পাবাজ বিরিঞ্চিবাবা তার আর এক অলৌকিক শক্তির কাল্পনিক গল্প ফেঁদে বসলেন। ঐ কাহিনী মহাপ্রলয়ের পর বৈবস্বত কর্তৃক মানব সৃষ্টির আদি কাহিনী। বিরিঞ্চিবাবা বললেন—"চারিদিকে জল থই থই করছে, আমি বললুম ভয় কি বিবু, আমি আছি, সূর্যবিজ্ঞান আমার মুঠোর মধ্যে। সূর্যের তেজ বাড়িয়ে দিলুম, চোঁ করে জল শুকিয়ে গেল, বসুন্ধরা ধনধান্যে ভরে উঠল। চন্দ্র সূর্য চালাবার ভার আমারই ওপর কিনা।"

এ কথা শুনে হাসি চাপবার জন্যে সত্য কল্পনা করতে থাকল যে "সে

মরিয়া গিয়াছে। পাঞ্জাব মেলের সঙ্গে দার্জিলিং মেলের কলিশন—রক্তারক্তি—পিসীমা—"

সত্যব্রতের এত চেষ্টা এবার ব্যর্থ হল। পুঞ্জীভূত হাসির বেগ ঠেলে বাইরে বেরিয়ে পড়ল। কিন্তু সুচতুর সত্য সেই হাসিকে কান্নায় রূপান্তরিত করে দুহাতে মুখ ঢেকে ভেউ ভেউ করে কেঁদে উঠল।

বিরিঞ্চিবাবা তার ছদ্ম হাসিকে কান্না এবং ভক্তির আতিশয্য মনে করে কাছে আহ্বান করেন। সত্য বলে ওঠে "আমায় হরিণ করে সেই ত্রেতাযুগে কণ্ব মুনির আশ্রমে ছেড়ে দাও বাবা। অর্থ চাই না, মান চাই না, স্বর্গও চাই না। শুধু চাট্টি কচি ঘাস, শকুন্তলার নিজের হাতে ছেঁড়া। আর এক জোড়া শিং দিও প্রভু, দুষ্মন্তটাকে যাতে গুঁতিয়ে দিতে পারি।"

এই অবস্থায় নিবারণ তাকে কৌশলে উদ্ধার করে বলে "ছেলেটার মাথা খারাপ হয়ে গেছে বাবা। বিস্তর শোক পেয়েছে কিনা।"

এইভাবে সত্যব্রত নানান যন্ত্রণাদায়ক হৃদয়বিদারী ঘটনার কল্পনা করে হাসির বেগ চেপে রাখার চেষ্টা করেছিল।

প্রশ্ন ৫। কীভাবে নিবারণ এবং সত্যব্রত বিরিঞ্চিবাবাকে গুরুপদ বাবুর দমদমার বাগানবাড়ি থেকে বিতাড়িত করেছিল? এই বিদায় পর্বের বর্ণনা দাও।

উত্তর। ভণ্ড তপস্বী ধাপ্পাবাজ বিরিঞ্চিবাবার হাত থেকে গুরুপদবাবুকে উদ্ধার করার জন্যে একদিন নিবারণ এবং সত্যব্রত দমদমায় আসার আগে গুরুপদবাবুর জামাই প্রফেসর ননির সঙ্গে দেখা করে বিরিঞ্চিবাবার সম্পর্কে নানান জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করে নেয়।

দমদমার বাগান বাড়িতে এসে প্রথমেই তারা গুরুপদবাবুর মুহুরী মৌলবী বছিরুদ্দি, কোচম্যান ঝোঁটি মিয়া, দরোয়ান ফেকু পাঁড়ে এবং সহিস-মালীদের টাকা দিয়ে বশ করে নেয়।

গুরুপদবাবুর এইসব পুরনো কর্মচারীর দল নানা কারণে আগে থেকেই বীতশ্রদ্ধ হয়েছিল। সুযোগ বুঝে নিবারণ বলল—"দেখুন মৌলবী সাহেব, আমরা বাবাজী দুটোকে তাড়াবই তাড়াব। যদি সুবিধে হয় তো আজই। কিন্তু একলা পেরে উঠব না। আপনি আর দরোয়ানজী সঙ্গে থাকা চাই।"

মারপিট হবে কিনা জানতে চাইলে নিবারণ বলে, "আরে না না।' তোমাদের কোন ভয় নেই। কেবল একটু চিল্লাচিল্লি করতে হবে।"

বিরিঞ্চিবাবাকে বিতাড়িত করার কৌশলটা নিবারণ অবস্থা বুঝে ধীরে ধীরে প্রকাশ করে। তার আগে কর্মযজ্ঞের নায়ক গণেশমামাকে বিনয়ে বশ করে এবং তার ছোটো জামাইকে চাকরি দেবার প্রলোভন দেখিয়ে সত্যব্রত ও নিবারণ হোমঘরে বসে দেবদর্শনের অধিকার পায়। এই হোমঘরে প্রত্যেক রবিবার রাত্রে হোম হয়,

তা থেকে এক একদিন এক একটি দেবতার আবির্ভাব হয়। সেদিন মহাদেব বেরুবার কথা ছিল।

সভা ভঙ্গের পর সাধারণ ভক্তরা বিদায় নিয়ে গেলে রাত নটায় হোমঘরে হোম আরম্ভ হল। এই ছোটো ঘরের জানলা-দরজা সব বন্ধ। প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে গণেশবাবু পাহারা দিচ্ছেন। হোমঘরে ছিলেন কেবল বিরিঞ্চিবাবা, গুরুপদবাবু, বুঁচকী, নিবারণ, সত্যব্রত এবং বিশিষ্ট ভক্ত গোবর্ধনবাবু।

একসময় প্রদীপ নিবতে হোমকুণ্ডের ক্ষীণ আলোকে দেখা গেল ব্যাঘ্রচর্মধারী—হাড়মালা বিভূষিত ধবলকান্তি মহাদেব। এই সময় নিবারণ সত্যব্রতকে চুপিচুপি বলল, 'এইবার।' সঙ্গে সঙ্গে সত্যব্রত বলে উঠল—"বম্ বাবা মহাদেব।" এটাই ছিল নিবারণ ও সত্যব্রতদের ইঙ্গিত।

সহসা বাইরে থেকে কারা যেন চিৎকার করে বলে উঠল—'আগ লাগা হ্যায়।' এটাই ছিল নিবারণবাবুদের পরিকল্পনা। তাদেরই কথামতো বকশিস-প্রাপ্ত ফেকু পাঁড়ে, মৌলবী বছিরুদ্দি, কোচমান ঝোঁটি মিয়া, খড়ে আগুন ধরিয়ে—'আগ লাগা হ্যায়' বলে আর্তনাদ করতে থাকে। ছোটো হোমঘরটা ঘন ধোঁয়ায় ভরে যায়। বাইরে থেকে সমবেত কণ্ঠে ধ্বনিত হয়—"আগুন আগুন, বেরিয়ে আসুন শিগ্‌গির।"

বিরিঞ্চিবাবা একলাফে গৃহত্যাগ করেন। কিন্তু ধরা পড়ে যায় মহাদেবরূপী কেবলানন্দ। মহাদেবরূপী কেবলানন্দের কণ্ঠে আমরা শুনতে পাই—"আঃ ছাড় ছাড় লাগে, মাইরি এখন ইয়ারকি ভাল লাগে না—চাদ্দিকে আগুন ছেড়ে দাও বলছি।" এরপর কেবলানন্দকে ফেকু পাঁড়ের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

ধূর্ত বিরিঞ্চিবাবা এর পরেও নানান কথায় তার দেবত্ব ও পশার বাঁচিয়ে রাখতে চেষ্টা করল; অর্থাৎ "ভাঙেন কিন্তু মচকান না।" তাকে বলতে শোনা গেল—"যে নাস্তিক, তার দিব্যদৃষ্টি হবে কেন? তাই তোমার কপালে দেবতা দেখা দিয়েও দিলেন না। শেষটায় মানুষের মূর্তি ধরে বিদ্রূপ করলেন।"

ভূতপূর্ব ভক্তরাই এখন জোচ্চোর বিরিঞ্চিবাবাকে অপমান করতে উদ্যত হল। কিন্তু গুরুপদবাবু বাধা দিয়ে বললেন—"না-না, যেতে দাও, যেতে দাও। সত্য, গাড়িটা জুতিয়ে এঁদের স্টেশনে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। কেউ যেন কিছু না বলে।"

তল্পিতল্পা গুছিয়ে বিরিঞ্চিবাবা কেবলানন্দসহ গাড়িতে গিয়ে বসলেন। বিদায় কালে সত্যব্রত রসিকতা করে বলল—"প্রভু, তা হলে নিতান্তই চললেন? চন্দ্রসূর্য আপনার জিম্মায় রইল, দেখবেন যেন ঠিক চলে। দম দিতে ভুলবেন না, আর মধ্যে মধ্যে অয়েল করবেন।"

এই ভাবে সুকৌশলে ভণ্ড তপস্বী জোচ্চোর বিরিঞ্চিবাবুকে সত্যব্রত এবং নিবারণ বিতাড়িত করেছিল। বিতাড়নের কৌশল অস্ত্র হল প্রজ্বলিত ভিজে খড় এবং দরোয়ান, মৌলবী বছিরুদ্দি, কোচম্যান অমূল্য, হাবলা প্রভৃতির মিথ্যে হল্লা।

প্রশ্ন ৬। "মৌলবী সাহেব ফরিদপুরী উর্দু'তে দুনিয়ার বর্তমান দুরবস্থা বিবৃত করিতেছিলেন।"

—মৌলবী সাহেব কে? তাহার ফরিদপুরী উর্দু'র নমুনা দাও।

উত্তর। মৌলবী বছিরুদ্দির আদত নাম ছিল ম্রেদম খাঁ এবং তার পিতার নাম জাঁহাবাজ খাঁ। তার বর্তমান নিবাস ফরিদপুর, কিন্তু তারা নাকি "খানদানী মনিষ্যি"। নিবাস ছিল আরব তার "ধমনীতে মোগলাই রক্ত প্রবাহিত।"

মৌলবী বছিরুদ্দি ছিলেন গুরুপদ বাবুর অন্যতম মুহুরী। স্ত্রীর মৃত্যুর পর গুরুপদ বাবু ওকালতি ত্যাগ করে বিরিঞ্চিবাবার খপ্পরে পড়ায় বছিরুদ্দির উপার্জন কমে গিয়েছিল। কেবল গুরুপদবাবু তাঁকে নিয়মিত মাসহারা দিতেন। সেই কারণে মৌলবী সাহেব প্রতিদিন মনিবকে সেলাম দিতে আসতেন। ফরিদপুর নিবাসী এই নিরীহ মুসলমান বছিরুদ্দিকে নিয়ে রাজশেখর কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছেন।

মৌলবী বছিরুদ্দির জগৎ ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র, কোচম্যান, দরোয়ান, সহিস-মালী এরাই ছিল তার আপনজন।

বাইরের জগতে আকাঙ্ক্ষিত মর্যাদা না পেলে মানুষ তার নিজের কল্পনায় অলভ্য বস্তুকে পেতে চায়। মৌলবী বছিরুদ্দির আচার আচরণের মাধ্যমে লেখক এই সত্যকেই তুলে ধরেছেন। যিনি খানদানী মনিষ্যি, যার ধমনীতে মোগলাই রক্ত প্রবাহিত তিনি যে উর্দু ভাষায় কথা বলবেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু যেহেতু মৌলবী সাহেবের বর্তমান নিবাস ফরিদপুর এবং তাকে পেটের দায়ে বাধ্য হয়ে বাংলা শিখতে হয়েছে, তাই তার ভাষা ফরিদপুরী উর্দু।

এখানে মৌলবী সাহেবের ফরিদপুরী উর্দু'র কিঞ্চিৎ উদাহরণ দেওয়া হল—"আর বাবু মশাই, সে সবদিনখ্যান কম্নে চলে গেছে। মা ঠাকরোন বেহস্ত পাওয়া ইস্তক মোদের বাবুসায়েবের জানডা কলেজায় নেই। অত করে বললাম, হুজুর অমন পসারডা নষ্ট করবেন না। তা কে শোনে?—খোদার মর্জি।"

উদ্ধৃত অংশের ভাষা ফরিদপুরের সাধারণ বাঙ্গালী মুসলমানের মুখের ভাষা। কিন্তু এই ভাষাকে ফরিদপুরী উর্দু আখ্যা দিয়ে রাজশেখর খানদানী রক্তের প্রতি বছিরুদ্দির আনুগত্যকে ব্যঙ্গ করতে চেয়েছেন।

প্রশ্ন ৭। "ইউরেকা! বউদি, আপনিই নোবেল প্রাইজ পাবেন, ননেটার কিছু হবে না।"

—কে, কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলিয়াছিল? বউদি কে? কি কারণে নোবেল প্রাইজ পাইবার কথা বলা হইয়াছে? আলোচনা করো।

উত্তর। আলোচ্য অংশের বক্তা হল চোদ্দ নম্বর হাবশীবাগান লেনের মেসের ম্যানেজার নিবারণ মাস্টার। বিরিঞ্চিবাবা নামে একজন ধাপ্পাবাজ ভণ্ড তপস্বী প্রফেসর ননির শ্বশুর গুরুপদবাবুকে মিথ্যে অলৌকিক শক্তির গল্প শুনিয়ে তার সর্বস্ব গ্রাস করবার মতলব করে।

বুদ্ধিমান নিবারণ ও সত্যব্রত বিরিঞ্চিবাবার কাহিনী শুনেই তাকে ভণ্ড বাবাজী বলে বুঝতে পারে এবং বিরিঞ্চিবাবার কাহিনী আরও বিস্তারিত ভাবে জানবার জন্যে প্রফেসর ননির বাড়িতে হাজির হয়। প্রফেসর ননি ছিল গুরুপদবাবুর বড়ো জামাই এবং নিবারণের বন্ধু।

সেখানে বিরিঞ্চিবাবার বিস্তারিত কাহিনী শুনে তার ধাপ্পাবাজী সম্পর্কে নিবারণ সত্যব্রতদের ধারণা দৃঢ় হয়। সঙ্গে সঙ্গে বিরিঞ্চিবিতাড়নের পরিকল্পনা করে ফেলে। নিবারণের পরিকল্পনায় ঘন ধোঁয়ার প্রয়োজন ছিল। প্রথমে সে বৈজ্ঞানিক ননির পরামর্শ চায়। কিন্তু বন্ধু ননির পাণ্ডিত্যপূর্ণ উত্তর তার মনঃপূত হয় না। ননির স্ত্রী নিরুপমার বাস্তববোধ তার বৈজ্ঞানিক স্বামীর চেয়েও বেশি ছিল। তাই সে প্রবল ধোঁয়ার উপায় সম্পর্কে জানায়—"মামার বাড়িতে দেখেছি গোয়ালঘরে ভিজে খড় জালে, খুব ধোঁয়া হয়।"

বিরিঞ্চিবাবা বিতাড়নে নিবারণের যে পরিকল্পনা ছিল তাতে এই ধরনের সাধারণ ধোঁয়ার প্রয়োজন ছিল বলেই নিবারণ প্রবল উৎসাহে আলোচ্য মন্তব্য করেছে।

এখানে নিরুপমাকে বউদি বলে সম্বোধন করা হয়েছে। তিনি ছিলেন প্রফেসর ননির স্ত্রী।

নোবেল প্রাইজের কথাটাকে নিয়ে লেখক কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছেন। বিরিঞ্চিবাবাকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনায় কিছুটা ঘন ধোঁয়ার প্রয়োজন ছিল। সেকথা বৈজ্ঞানিক ননিকে বলতে ননি তার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে বলে—"কি রকম ধোঁয়া? যদি লাল ধোঁয়া চাও তবে নাইট্রিক অ্যাসিড অ্যাণ্ড তামা, যদি বেগনী চাও তবে আয়োডিন ভেপার, যদি সবুজ চাও—"

উত্তরে নিবারণ জানায়—"আরে না না। প্লেন ধোঁয়া চাই।"

তখন পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক ননি জানায়—"তাহলে ট্রাই-নাইট্রো ডাই-মিথাইল"—

শেষ পর্যন্ত নিরুপমাই এই সমস্যার সমাধান করে দেয়। সাধারণ বুদ্ধিতে সেই সাধারণ ধোঁয়ার সন্ধান দেয়, বলে "মামার বাড়িতে দেখেছি গোয়ালে ভিজে খড় জালে, খুব ধোঁয়া হয়।"

নিবারণের কাছে এ-আবিষ্কার ছিল ননির পাণ্ডিত্যপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের চেয়েও অনেক বেশি মূল্যবান, তাই আনন্দের উচ্ছ্বাসে সে আলোচ্য অভিমত ব্যক্ত করে। আমরা জানি গুরুত্বপূর্ণ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের জন্যে নোবেল পুরস্কার দেবার রীতি। কিন্তু অনেক সময় এই পুরস্কার অযোগ্য ব্যক্তির কপালেও জুটে যায়। এখানে তাই লেখক হয়তো নোবেল পুরস্কারকে নিয়ে কিঞ্চিৎ ব্যঙ্গ করেছেন।

প্রশ্ন ৮। 'বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্কর!'

—বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে? বিষ বলতে কী বোঝানো হয়েছে? বক্তার চরিত্রের পরিচয় দাও।

উত্তর। আলোচ্য উক্তির বক্তা হলেন হাবশীবাগান লেনের নিতাইবাবু। তিনি ভলচার ব্রাদার্সের দেড়শ টাকা মাইনের লেজার কিপার।

নিতাইবাবু ছিলেন সাধারণ গৃহী মানুষ। সাধারণ মানুষের মতো তিনিও অসাধারণ উপায়ে সাংসারিক সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করেছেন। আর সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সাধুসন্ন্যাসীর সন্ধান করে বেড়াতেন। তাকে আমরা বলতে শুনেছি, "একটি ভাল সাধু সন্ন্যাসী পাই তো সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি।"

সংসার ত্যাগ করা একটা কথার কথা মাত্র, তাঁর আসল উদ্দেশ্য ছিল অলৌকিক গুণসম্পন্ন কোনো সন্ন্যাসীর সহায়তায় আর্থিক দৈন্য দূর করা।

হাবশীবাগান লেনের মেসের আর এক সভ্য পরমার্থের মুখে নিতাইবাবু বিরিঞ্চিবাবার অলৌকিক ক্ষমতার কথা শুনে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন এবং দমদমায় গুরুপদবাবুর বাগান বাড়িতে এই অলৌকিক গুণসম্পন্ন সাধুর দর্শনে আসেন। নিতাইবাবুর মূল উদ্দেশ্য পরমার্থ নয়, অর্থ। তিনি পরমার্থের মুখেই শুনেছেন বিরিঞ্চিবাবা ইচ্ছে করলে সময়কে পেছনের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারেন। উদাহরণ দিয়ে পরমার্থ বলে—"এই সেদিন মেকিরাম আগরওয়ালার বরাত ফিরিয়ে দিলেন। তিন দিনের জন্যে তাকে নাইন্টিন ফোর্টিনে নিয়ে গেলেন, ঠিক লড়াইয়ের আগে। মেকিরাম পাঁচ হাজার টন লোহার কড়ি কিনে ফেলল—ছ-টাকা হন্দর।"

এসব কথা শুনেই নিতাইবাবুর ভক্তি উথলে ওঠে। বলেন—"পরমার্থ ভাইরে, আমায় এক্ষুনি নিয়ে চল্ বিরিঞ্চিবাবার কাছে।"

পরমার্থের সঙ্গে নিতাইবাবু বিরিঞ্চিবাবার সভায় উপস্থিত হন, এবং সুযোগ বুঝে বাবার সামনে গিয়ে গলবস্ত্র হয়ে বলেন—"দয়া কর প্রভু।"

বিরিঞ্চিবাবা প্রশ্ন করেন, 'কি চাই তোমার?'

নিতাইবাবু সুযোগ বুঝে উত্তর দেন—"সাত দিনের জন্যে আমায় লড়ায়ের আগে নিয়ে যান বাবা, সস্তায় লোহা কিনব—দোহাই বাবা!"

বিরিঞ্চিবাবা ছিলেন ধাপ্পাবাজ, ভণ্ড—ধূর্ত। তিনি সহজেই নিতাইবাবুর উদ্দেশ্য এবং আর্থিক সামর্থ্যের সীমার কথা বুঝে ফেলেন। যার অর্থ নেই, যাকে দোহন করা যাবে না, এরূপ ব্যক্তিকে বিরিঞ্চিবাবা ভক্তরূপে পেতে চান নি। তাই এক দুরূহ তপস্যার বিধান দিয়ে তিনি নিতাইবাবুকে বিদায় করেন। বলেন—"সূর্যকে পিছু হাঁটাতে হবে। সূর্যবিজ্ঞান আয়ত্ত না হলে কালস্তম্ভ করা যায় না। তাতে বিস্তর খরচ—তোমার কম্ম নয়।"

বিরিঞ্চিবাবা তাকে সূর্যের দিকে তাকিয়ে একশ আটবার 'মার্তণ্ড' কথাটা উচ্চারণ করতে বলেন। আর সাবধান করে দিয়ে বলেন—"খবরদার চোখের পাতা না পড়ে, জিভ জড়িয়ে না যায়,—তাহলেই মরবে।"

নিতাইবাবু এমন কঠিন জীবনঘাতী সাধনায় সিদ্ধিলাভ করতে চান নি। তিনি সস্তায় ষড়ৈশ্বর্য লাভ করতে চেয়েছেন। নিজের কার্যসিদ্ধি তথা স্বার্থসিদ্ধি না হওয়ায় নিতাইবাবু

বিরিঞ্চিবাবার মৌখিক শক্তি-দম্ভকে আলোচ্য অংশে ব্যঙ্গ করেছেন। নিতাইবাবু অলৌকিক শক্তিকে 'বিষ' বলে উল্লেখ করেছেন। যদি বিষ থাকে তবেই সাপের বিশাল চক্র শোভা পায়।—বিষহীন সাপের কুলোপানা চক্র অপদার্থ ব্যক্তির ব্যর্থ আস্ফালন রূপে আমাদের প্রবাদ বাক্যে পরিণত হয়েছে। একথা বলার উদ্দেশ্য হয়তো বিরিঞ্চিবাবার অলৌকিক শক্তির পরিচয় না পেয়ে নিতাইবাবুর মনে সংশয় দেখা দেয়।

নিতাইবাবু ছিলেন অতি সাধারণ গৃহী মানুষ। ধর্মকে তিনি স্বার্থসিদ্ধির উপায় বলে মনে করতেন। সংসারের দায় দায়িত্ব পালনের শক্তি ও নিষ্ঠা তার ছিল না। তাই যখন তাকে বলতে শোনা যায়—"চিত্তে সুখ নেই দাদা", অথবা "সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে। একটি ভাল সাধু-সন্ন্যাসী পাই তো সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি।"

অর্থের জন্যেই পরমার্থের সন্ধান, নিতাইবাবুর আদর্শ ছিল। মূল কথা আধ্যাত্মিক উন্নতি নয় আর্থিক উন্নতি। এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের 'খ্যাপার' মতো তিনি পরশ পাথর খুঁজে বেড়াতেন। বিরিঞ্চিবাবার দ্বারা তার উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় তিনি "মিরচাই বাবার" কাছে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। সাধারণ মানুষের মত নিতাইবাবু আর্থিক ও সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে জীবনে একমাত্র কাম্য বস্তু বলে মনে করতেন।

প্রশ্ন ৯। 'দূর গাধা, যাঃ মানেই হ্যাঁঃ।'

—বক্তা কে? কোন্ প্রসঙ্গে তিনি এই কথা বলেছেন? এই কথার তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। রাজশেখর বসুর বিরিঞ্চিবাবা গল্পের অন্যতম মুখ্য চরিত্র নিবারণ মাষ্টার আলোচ্য উক্তির বক্তা। তার মুখের এই সংলাপ দিয়েই লেখক বিরিঞ্চিবাবা গল্পটি সমাপ্ত করেছেন।

গুরুপদবাবু এক ভণ্ড সাধুর পাল্লায় পড়েন। সাধুর নাম বিরিঞ্চিবাবা। নিবারণ মাষ্টার এবং সত্যব্রতর উদ্দেশ্য ছিল কৌশলে বিরিঞ্চিবাবার ভণ্ডামির মুখোস খুলে দিয়ে গুরুপদবাবুকে উদ্ধার করা।

নিবারণ ও সত্যব্রত তাদের পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে গুরুপদবাবুর বাগানের কর্মচারী-দের টাকায় বশ করে দলে টানে। এবং তাদের দিয়ে আগুন লাগার অভিনয় করিয়ে ধাপ্পাবাজ বিরিঞ্চিবাবার প্রকৃত স্বরূপ উদঘাটন করে। কৃতজ্ঞ গুরুপদবাবু বলেন—"বাবা নিবারণ, বাবা সত্য তোমরা আমায় রক্ষা করেছ, এ উপকার আমি ভুলব না। আজ তোমরা এখানেই খাওয়া দাওয়া করে থাক, অনেক রাত হয়েছে।"

বিরিঞ্চিবাবার মহাদেববেশী শিষ্য কেবলানন্দকে ধরার সময় সে সত্যব্রতের হাতে কামড়ে দেয়। একথা জেনে গুরুপদবাবু বলেন—"তুমি আমার সঙ্গে এস, বুঁচকী টিংচার আয়োডিন দিয়ে বেঁধে দেবে এখন।"

এই বুঁচকী ছিল গুরুপদবাবুর অবিবাহিতা কন্যা। প্রফেসর ননির বাড়িতেই বুঁচকীর প্রথম উল্লেখ পাই। গুরুপদবাবুর বড় মেয়ে নিরুপমা বিরিঞ্চিবাবা সংক্রান্ত কাহিনী বলতে গিয়ে বলেছে—"শুনেছি টাকাকড়ি সবই গুরুকে দেবেন। বুঁচকীটার জন্যেই ভাবনা।"

মনে হয় গুরুপদবাবুর চেয়ে এই বুঁচকীকে উদ্ধার করাই সত্যব্রতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল। বুঁচকীদের সঙ্গে সত্যব্রতর পারিবারিক সম্পর্ক ছিল। এবং তার সঙ্গে বুঁচকীর ঘনিষ্ঠতা দেখে অনুমান করা চলে ভালবাসার সম্পর্ক না হলেও উভয়ের মধ্যে একটা প্রীতির সম্পর্ক ছিল।

তাই সত্যব্রতকে একা পেয়ে বুঁচকী স্নেহের শাসন করে বলেছে—"আচ্ছা আমার বাবার সামনে কি কাণ্ডটা করলেন বলুন তো? কি ভাববেন তিনি?"

উত্তরে সত্য বলেছে, "ভারি অন্যায় হয়ে গেছে, আর কখ্খনো অমন হবে না। আপনার বাবার কাছে মাপ চেয়ে তাঁকে খুশী করে তবে বাড়ি ফিরব।"

আর একবার আমরা বুঁচকী সত্যব্রতর ঘনিষ্ঠ চিত্র পাচ্ছি। হোমঘরের ঘৃতপ্রদীপ নিবিয়ে দিয়ে বিরিঞ্চিবাবা ভীষণ গালবাদ্য আরম্ভ করেছেন, "সেই গম্ভীর বু-বু-বু-বু নিনাদে ক্ষুদ্র গৃহ কম্পিত হইতে লাগিল" এমন সময় সত্যব্রত বুঁচকীর কানে কানে বলল—"বুঁচু, ভয় করছে?" উত্তরে বুঁচকী বলিল "না।" এরপর পাঠকের বুঝতে বাকি থাকে না সত্যব্রত বুঁচকীকে ভালবাসে।

গল্পের শেষ পর্বে এসে আমরা জানতে পারি নিবারণের কাছে সত্যব্রত তার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলেছে, "আমি বুঁচকীকে বে করব।"

কিন্তু এই বিয়েতে বুঁচকীর মত আছে কিনা জানতে চাইলে প্রেম বিষয়ে অনভিজ্ঞ সত্যব্রত বলেছে বুঁচকী, "বড় গোলমেলে জবাব দিচ্ছে।" বুঁচকীর গোলমেলে জবাবটা হল 'যাঃ'।

এই কথা শুনে অভিজ্ঞ নিবারণ কেবল বলেছিল, "দূর গাধা যাঃ মানেই হ্যাঁঃ।" কারণ সে জানত এই 'যাঃ' কথাটির "দ্বিধা থর থর চূড়ায়" প্রেমের অমরাবতী বিরাজ করছে। এই সামান্য কথাটির মধ্যে লুকিয়ে আছে অনেক না বলা বাণী। অনভিজ্ঞ সত্য সে কথা বুঝতে না পারলেও নিবারণ বুঝেছিল বুঁচকী তাকে ভালবাসে এবং বিয়েতে তার অমত নেই।

প্রশ্ন ১০। "এখন সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই। সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে।"

—বক্তা কে? তিনি কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিলেন? বক্তার চরিত্র আলোচনা করো।

উত্তর। রাজশেখর বসুর 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের নিতাইবাবুর উক্তি। বক্তা নিতাই বাবু চৌদ্দ নম্বর হাবশীবাগান লেনের মেস বাড়ির পাশেই থাকতেন, এবং নিবারণ পরমার্থ সত্যব্রতের সঙ্গে সন্ধ্যার দিকে আড্ডা দিতে আসতেন।

একবার পূজোর আগে মেসের সকলে দেশে চলে গেলে নিবারণ পরমার্থের সঙ্গে নিতাইবাবু আড্ডা দিতে আসেন। সেদিন নিতাইবাবু এইভাবে কথা আরম্ভ করেন "চিত্তে সুখ নেই দাদা। ঝি বেটি পালিয়েছে, খুকীটার জ্বর, গিন্নী খিটখিট করছেন,

অফিসে গিয়েও যে দু-দণ্ড ঘুমব তার জো নেই, নতুন ছোটো সায়েব ব্যাটা যেন চরকি ঘুরছে।

কথা প্রসঙ্গে পরমার্থ তাদের অফিসে দিবানিদ্রার সু-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে নিতাইবাবু আলোচ্য মন্তব্য করেছিলেন।

নিতাইবাবুর দুঃখের কারণ হল মেকেঞ্জি সায়েবের আমল অতিক্রান্ত। সে আমলে শ্যামনগরের বরদা মুখুজ্যের মত মানুষ আফিম খেয়ে আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ঘুমুতেন। নিতাইবাবু এখানে মেকেঞ্জি সায়েবের আমলের এক উপভোগ্য কাহিনী তুলে ধরেছেন—একদিন লেজার ঠিক দিতে দিতে বরদাবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। নড়ন চড়ন নেই, নাক ডাকা নেই, ঘাড় একটু ঝুঁকল না, লেজার টোটালের জায়গায় হাতের কলমটা ঠিক ধরা আছে। এমন সময় মেকেঞ্জি সাহেব ঘরে এলেন, সকলে শশব্যস্ত। সায়েব বরদাবাবুর কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে তার কাঁধে একটি চিমটি কাটলেন। বরদাবাবু অমনি আরম্ভ করলেন—"সাইত্রিশের সাত নাবে তিনে-কত্তি তিন।"

মেকেঞ্জি সায়েব হয়তো বৃদ্ধের ঘুমিয়ে পড়া ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলেন কিন্তু শাস্তি দেবার পরিবর্তে সায়েব হেসে বলেছিলেন—"হ্যাভ এ কাপ অফ টী বাবু।" সায়েবের সেই মহানুভবতার কথা ভেবেই নিতাইবাবুর উক্তি হল "এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই।" অফিসের অতীত সুখের দিনগুলিকে নিতাইবাবু রাম রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

নিতাইবাবু ছিলেন অতি সাধারণ গৃহী মানুষ। ধর্মকে তিনি স্বার্থসিদ্ধির উপায় বলেই মনে করতেন। সংসারের দায়দায়িত্ব পালনের শক্তি ও নিষ্ঠা তার ছিল না। তাই যখন তখন তাকে বলতে শোনা যেত—"চিত্তে সুখ নেই দাদা" অথবা "সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে। একটি ভাল সাধুসন্ন্যাসী পাই তো সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি।"

অর্থের জন্যেই পরমার্থের সন্ধান ছিল নিতাইবাবুর জীবনবেদ। তার জীবনের মূলকথা আধ্যাত্মিক উন্নতি নয় আর্থিক উন্নতি। এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের খ্যাপার মতো তিনি পরশ পাথর খুঁজে বেড়াতেন। বিরিঞ্চিবাবার দ্বারা তার উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় তিনি মিরচাই বাবার কাছে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অথচ তার আবেদন ছিল অবৈজ্ঞানিক। চেষ্টা করেও অতীতের দিনগুলিকে আর ফিরিয়ে আনা কারও পক্ষেই যে সম্ভব নয় তা শিক্ষিত মানুষ হয়েও তিনি বুঝতে চাইতেন না। তাই বিরিঞ্চিবাবার কাছে তার আবেদন ছিল—"সাতটি দিনের জন্যে আমায় লড়ায়ের আগে নিয়ে যান বাবা, সস্তায় লোহা কিনব—দোহাই বাবা।"

সাধারণ মানুষের মত নিতাইবাবু আর্থিক ও সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে জীবনে একমাত্র কাম্য বস্তু বলে মনে করতেন।

অনুশীলনী

১। 'বিরিঞ্চিবাবা' ছোটো গল্প কিনা আলোচনা করো।

২। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের নামকরণ কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে আলোচনা করো।

৩। বিরিঞ্চিবাবার চরিত্র আলোচনা করো। অথবা বিরিঞ্চিবাবা নায়ক কিনা আলোচনা করো।

৪। 'বিরিঞ্চিবাবা গল্পের গৌণ চরিত্র আলোচনা করো।

৫। চরিত্র আলোচনা কর :

নিবারণ, সত্যব্রত, ননি, নিরুপমা, গুরুপদবাবু, বুঁচকী

৬। 'ছুর গাধা যাঃ মানেই হ্যাঁ'

কে কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলেছেন ? এই কথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৭। কিভাবে নিবারণ ও সত্যব্রত বিরিঞ্চিবাবাকে বিতাড়িত করে ?—তার বিদায়-দৃশ্য বর্ণনা করো।

৮। ফরিদপুরী উর্দু বলতে কি কি বুঝিয়েছেন ? বছিরুদ্দি কে ছিলেন ? তার চরিত্র আলোচনা কর।

৯। পরশুরামের দুই নারীচরিত্র আলোচনা করো।

১০। বিরিঞ্চিবাবা গল্পের হাস্যরসের পরিচয় দাও।

১১। বৈজ্ঞানিক ননির গবেষণার পরিচয় দাও। এ প্রসঙ্গে লেখকের হাস্যরস সৃষ্টির দক্ষতার উদাহরণ দাও।

১২। বিরিঞ্চিবাবার সভাগৃহের বর্ণনা দাও।

১৩। বিরিঞ্চিবাবা কিভাবে নিবারণের আত্মপরিচয় দেন, আলোচনা করো।

১৪। হাসি ঠেকাবার জন্যে সত্যব্রত কি কি কৌশল অবলম্বন করেছিল ? শেষ পর্যন্ত সফল না হয়ে সে কি করল ?

১৫। "ইউরেকা! বউদি আপনিই নোবেল প্রাইজ পাবেন।"

একথা কার ? বউদি কে ? বক্তা কেন নোবেল প্রাইজ পাবার কথা বলেছিল ?

১৬। 'বিশ্বের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্র'

বক্তা কে ? কোন্ সময় তিনি একথা বলেন ? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বক্তার চরিত্র আলোচনা করো।

১৭। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের উপকাহিনীটি নিজের ভাষায় লেখো। এই উপকাহিনী কোন্ প্রয়োজনে গল্পে এসেছে আলোচনা করো।

অফিসে গিয়েও যে দু-দণ্ড ঘুমব তার জো নেই, নতুন ছোটো সায়েব ব্যাটা যেন চরকি ঘুরছে।

কথা প্রসঙ্গে পরমার্থ তাদের অফিসে দিবানিদ্রার সু-ব্যবস্থার কথা উল্লেখ করলে অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে নিতাইবাবু আলোচ্য মন্তব্য করেছিলেন।

নিতাইবাবুর দুঃখের কারণ হল মেকেঞ্জি সায়েবের আমল অতিক্রান্ত। সে আমলে শ্যামনগরের বরদা মুখুজ্যের মত মানুষ আফিম খেয়ে আড়াইটা থেকে সাড়ে চারটে পর্যন্ত ঘুমুতেন। নিতাইবাবু এখানে মেকেঞ্জি সায়েবের আমলের এক উপভোগ্য কাহিনী তুলে ধরেছেন—একদিন লেজার ঠিক দিতে দিতে বরদাবাবু ঘুমিয়ে পড়েছেন। নড়ন চড়ন নেই, নাক ডাকা নেই, ঘাড় একটু ঝুঁকল না, লেজার টোটালের জায়গায় হাতের কলমটা ঠিক ধরা আছে। এমন সময় মেকেঞ্জি সাহেব ঘরে এলেন, সকলে শশব্যস্ত। সায়েব বরদাবাবুর কাছে গিয়ে অনেকক্ষণ নিরীক্ষণ করে তার কাঁধে একটি চিমটি কাটলেন। বরদাবাবু অমনি আরম্ভ করলেন—"সাঁইত্রিশের সাত নাবে তিনে-কত্তি তিন।"

মেকেঞ্জি সায়েব হয়তো বৃদ্ধের ঘুমিয়ে পড়া ব্যাপারটা ধরতে পেরেছিলেন কিন্তু শাস্তি দেবার পরিবর্তে সায়েব হেসে বলেছিলেন—"হাভ এ কাপ অফ টী বাবু।" সায়েবের সেই মহানুভবতার কথা ভেবেই নিতাইবাবুর উক্তি হল "এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই।" অফিসের অতীত সুখের দিনগুলিকে নিতাইবাবু রাম রাজত্বের সঙ্গে তুলনা করেছেন।

নিতাইবাবু ছিলেন অতি সাধারণ গৃহী মানুষ। ধর্মকে তিনি স্বার্থসিদ্ধির উপায় বলেই মনে করতেন। সংসারের দায়দায়িত্ব পালনের শক্তি ও নিষ্ঠা তার ছিল না। তাই যখন তখন তাকে বলতে শোনা যেত—"চিত্তে সুখ নেই দাদা" অথবা "সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে। একটি ভাল সাধুসন্ন্যাসী পাই তো সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি।"

অর্থের জন্যেই পরমার্থের সন্ধান ছিল নিতাইবাবুর জীবনবেদ। তার জীবনের মূলকথা আধ্যাত্মিক উন্নতি নয় আর্থিক উন্নতি। এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের খ্যাপার মতো তিনি পরশ পাথর খুঁজে বেড়াতেন। বিরিঞ্চিবাবার দ্বারা তার উদ্দেশ্য সফল না হওয়ায় তিনি মিরচাই বাবার কাছে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অথচ তার আবেদন ছিল অবৈজ্ঞানিক। চেষ্টা করেও অতীতের দিনগুলিকে আর ফিরিয়ে আনা কারও পক্ষেই যে সম্ভব নয় তা শিক্ষিত মানুষ হয়েও তিনি বুঝতে চাইতেন না। তাই বিরিঞ্চিবাবার কাছে তার আবেদন ছিল—"সাতটি দিনের জন্যে আমায় লড়ায়ের আগে নিয়ে যান বাবা, সস্তায় লোহা কিনব—দোহাই বাবা।"

সাধারণ মানুষের মত নিতাইবাবু আর্থিক ও সাংসারিক সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে জীবনে একমাত্র কাম্য বস্তু বলে মনে করতেন।

অনুশীলনী

১। 'বিরিঞ্চিবাবা' ছোটো গল্প কিনা আলোচনা করো।

২। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের নামকরণ কতটা যুক্তিযুক্ত হয়েছে আলোচনা করো।

৩। বিরিঞ্চিবাবার চরিত্র আলোচনা করো। অথবা বিরিঞ্চিবাবা নায়ক কিনা আলোচনা করো।

৪। 'বিরিঞ্চিবাবা গল্পের গৌণ চরিত্র আলোচনা করো।

৫। চরিত্র আলোচনা কর:
নিবারণ, সত্যব্রত, ননি, নিরুপমা, গুরুপদবাবু, বুঁচকী

৬। 'তুর গাধা যাঃ মানেই হ্যাঁ'
কে কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলেছেন? এই কথার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

৭। কিভাবে নিবারণ ও সত্যব্রত বিরিঞ্চিবাবাকে বিতাড়িত করে?—তার বিদায়-দৃশ্য বর্ণনা করো।

৮। ফরিদপুরী উর্দু বলতে কি কি বুঝিয়েছেন? বছিরুদ্দি কে ছিলেন? তার চরিত্র আলোচনা কর।

৯। পরশুরামের দুই নারীচরিত্র আলোচনা করো।

১০। বিরিঞ্চিবাবা গল্পের হাস্যরসের পরিচয় দাও।

১১। বৈজ্ঞানিক ননির গবেষণার পরিচয় দাও। এ প্রসঙ্গে লেখকের হাস্যরস সৃষ্টির দক্ষতার উদাহরণ দাও।

১২। বিরিঞ্চিবাবার সভাগৃহের বর্ণনা দাও।

১৩। বিরিঞ্চিবাবা কিভাবে নিবারণের আত্মপরিচয় দেন, আলোচনা করো।

১৪। হাসি ঠেকাবার জন্যে সত্যব্রত কি কি কৌশল অবলম্বন করেছিল? শেষ পর্যন্ত সফল না হয়ে সে কি করল?

১৫। "ইউরেকা! বউদি আপনিই নোবেল প্রাইজ পাবেন।"
একথা কার? বউদি কে? বক্তা কেন নোবেল প্রাইজ পাবার কথা বলেছিল?

১৬। 'বিষের সঙ্গে খোঁজ নেই কুলোপানা চক্র'
বক্তা কে? কোন্ সময় তিনি একথা বলেন? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বক্তার চরিত্র আলোচনা করো।

১৭। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের উপকাহিনীটি নিজের ভাষায় লেখো। এই উপকাহিনী কোন্ প্রয়োজনে গল্পে এসেছে আলোচনা করো।

মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের জীবনী ঃ ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর বাংলা ১২৮৩ সনের ৩১-এ ভাদ্র তারিখে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্ম। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। পাঁচ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরের প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হন। সেখান থেকে সিদ্ধেশ্বর মাস্টারের স্কুলে তিন বছর পড়াশুনা করেন। এর পর বেশ কিছু দিন ভাগলপুরে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করে ভাগলপুর জেলা স্কুলে ভর্তি হন।

শরৎচন্দ্রের জীবন বৈচিত্র্যময়। বাল্যকালেই তাঁকে বহুবার ভাগলপুর আর দেবানন্দপুর করতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে স্কুল-বদল। বাল্যকালেই দারিদ্র্যের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হয়েছে শরৎচন্দ্রের। কারণ, শরৎচন্দ্রের বাবা মতিলাল ছিলেন কর্মবিমুখ শান্ত প্রকৃতির মানুষ।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে শরৎচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতি কষ্টে কলেজে ভর্তি হলেন শরৎচন্দ্র। ছেলে পড়িয়ে, পরের বই চেয়ে কলেজের পড়া চালিয়েও মাত্র কুড়ি টাকা পরীক্ষার ফি দিতে না পারায় তাঁর এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া হয় নি।

এর পর শুরু হল শরৎচন্দ্রের ভবঘুরে জীবন। গান, অভিনয়, খেলাধূলা, সমাজসেবা আর গল্প লেখা—এই করেই দিন কাটে। এক সময়ে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন শরৎচন্দ্র। বাল্যকালেই তিনি মাকে হারিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যু হল তাঁর গৃহত্যাগের কিছুকাল পরে। বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে আসেন। সেখানেই পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে ছোটো ভাই-বোনকে আত্মীয়দের কাছে রেখে তিনি ভাগ্য-অন্বেষণে কলকাতায় আসেন। সেখান থেকে যান রেঙ্গুনে,—বর্মা রেলওয়ের অডিট অফিসে চাকরি নিয়ে নেন। বছর দুই পরে সে চাকরি চলে গেলে শরৎচন্দ্র এলেন পেগুতে—রেঙ্গুন থেকে ৪৫ মাইল উত্তরে। সেখান থেকে নতুন চাকরি নিয়ে আবার তিনি রেঙ্গুনে আসেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই চাকরিতে বহাল ছিলেন শরৎচন্দ্র।

রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্রের বিয়ে হয়। স্ত্রীর নাম শান্তিদেবী। তাঁর এক পুত্রও হয়েছিল। কিন্তু নিদারুণ প্লেগরোগে শান্তিদেবী এবং শিশুপুত্রের মৃত্যু হয়। শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম হিরণ্ময়ী দেবী।

রেঙ্গুনে কেবল চাকরি করেই দিন কাটান নি শরৎচন্দ্র। পড়াশুনা, গান-বাজনা, সর্বোপরি সাহিত্যসাধনা ছিল তাঁর প্রবাস-জীবনের ব্রত। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পরে যমুনায় প্রকাশিত হল

'রামের সুমতি'। তখন থেকেই সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে শক্তিশালী লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্র পরিচিত হন।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে রেঙ্গুনের চাকরি ছেড়ে দেশে আসেন শরৎচন্দ্র। প্রথমে হাওড়া শহরের বাজেশিবপুরে, পরে রূপনারায়ণের তীরে সামতাবেড়েতে জায়গা কিনে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করেন। শরৎচন্দ্রের শেষজীবন শারীরিক কারণেই ভালো যায় নি। ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ে তাঁর যকৃতে ক্যানসার হয়েছে এবং তা পাকস্থলীকেও আক্রমণ করেছে। অপারেশন করেন সে যুগের বিখ্যাত ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয় নি। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি রবিবার বাংলার এই অপরাজেয় কথাশিল্পী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।"

'মহেশ' গল্পের কাহিনী-সংক্ষেপ : কাশীপুর গ্রামের জমিদার শিবচরণের ছোটো ছেলের জন্মতিথির পুজো সেরে দুপুর বেলায় তর্করত্ন বাড়ি চলেছেন। বৈশাখের শেষ অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। ফুটিফাটা মাঠ, সেই মাঠের প্রান্তে গফুর জোলার বাড়ি।

যেতে যেতে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তর্করত্ন গফুর জোলাকে ডাকছেন। হাঁকডাকে গফুরের মেয়ে আমিনা বেরিয়ে আসে, বলে—"বাবার যে জ্বর।"

মেয়ের কথা শুনেও তর্করত্ন শান্ত হন না। শেষে গফুর নিজেই জ্বর-গায়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

তর্করত্ন অদূরে-বাঁধা মহেশ-নামে ষাঁড়টিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলেন, "ওটা হচ্চে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে?"

গফুর প্রথমটায় তাঁর ক্রোধের কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। পরে তর্করত্ন তাকে বুঝিয়ে বলেন গো-সেবার কথা। কয়েক আঁটি খড় অথবা ফ্যানজলে মহেশের মুখের কাছে ধরে দেবার পরামর্শ দেন।

কিন্তু মহেশকে খেতে দেবার মতো কোনো খড় গফুরের বাড়িতে ছিল না। ভাগে যে কাহন খানেক খড় সে পেয়েছিল জমিদারবাবু গেল-সনের বকেয়া বলে সব রেখে দিলেন, মহেশ তার থেকে 'কুটোটি পেলে না'।

এরপর গফুর তর্করত্নের কাছে কাহন দুই খড় ধার চাইল। তার নাকি চার চারটে গাদা গফুর নিজের চোখে দেখে এসেছে। কিন্তু তর্করত্নের দয়া হল না। মহেশকে পথের ধার থেকে সরিয়ে বাঁধবার উপদেশ দিয়ে তিনি বিদায় হলেন।

মহেশের নিবিড় গভীর বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা কালো চোখের দিকে তাকিয়ে

মহেশ

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্রের জীবনী ঃ ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর বাংলা ১২৮৩ সনের ৩১-এ ভাদ্র তারিখে অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের জন্ম। তাঁর পিতার নাম মতিলাল চট্টোপাধ্যায় এবং মাতার নাম ভুবনমোহিনী দেবী। পাঁচ বছর বয়সে শরৎচন্দ্র দেবানন্দপুরের প্যারী পণ্ডিতের পাঠশালায় ভর্তি হন। সেখান থেকে সিদ্ধেশ্বর মাস্টারের স্কুলে তিন বছর পড়াশুনা করেন। এর পর বেশ কিছু দিন ভাগলপুরে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করেন। ১৮৮৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি ছাত্রবৃত্তি পাশ করে ভাগলপুর জেলা স্কুলে ভর্তি হন।

শরৎচন্দ্রের জীবন বৈচিত্র্যময়। বাল্যকালেই তাঁকে বহুবার ভাগলপুর আর দেবানন্দপুর করতে হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হয়েছে স্কুল-বদল। বাল্যকালেই দারিদ্র্যের সঙ্গে মুখোমুখি পরিচয় হয়েছে শরৎচন্দ্রের। কারণ, শরৎচন্দ্রের বাবা মতিলাল ছিলেন কর্মবিমুখ শান্ত প্রকৃতির মানুষ।

১৮৯৪ খ্রীস্টাব্দে ভাগলপুরের তেজনারায়ণ জুবিলী কলেজিয়েট স্কুল থেকে শরৎচন্দ্র এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতি কষ্টে কলেজে ভর্তি হলেন শরৎচন্দ্র। ছেলে পড়িয়ে, পরের বই চেয়ে কলেজের পড়া চালিয়েও মাত্র কুড়ি টাকা পরীক্ষার ফি দিতে না পারায় তাঁর এফ. এ. পরীক্ষা দেওয়া হয় নি।

এর পর শুরু হল শরৎচন্দ্রের ভবঘুরে জীবন। গান, অভিনয়, খেলাধূলা, সমাজ-সেবা আর গল্প লেখা—এই করেই দিন কাটে। এক সময়ে গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাসী হলেন শরৎচন্দ্র। বাল্যকালেই তিনি মাকে হারিয়েছিলেন। বাবার মৃত্যু হল তাঁর গৃহত্যাগের কিছুকাল পরে। বাবার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে শরৎচন্দ্র ভাগলপুরে আসেন। সেখানেই পিতৃশ্রাদ্ধ সম্পন্ন করে ছোটো ভাই-বোনকে আত্মীয়দের কাছে রেখে তিনি ভাগ্য-অন্বেষণে কলকাতায় আসেন। সেখান থেকে যান রেঙ্গুনে,—বর্মা রেলওয়ের অডিট অফিসে চাকরি নিয়ে নেন। বছর দুই পরে সে চাকরি চলে গেলে শরৎচন্দ্র এলেন পেগুতে—রেঙ্গুন থেকে ৪৫ মাইল উত্তরে। সেখান থেকে নতুন চাকরি নিয়ে আবার তিনি রেঙ্গুনে আসেন। ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দ থেকে ১৯১৬ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত এই চাকরিতে বহাল ছিলেন শরৎচন্দ্র।

রেঙ্গুনেই শরৎচন্দ্রের বিয়ে হয়। স্ত্রীর নাম শান্তিদেবী। তাঁর এক পুত্রও হয়েছিল। কিন্তু নিদারুণ প্লেগরোগে শান্তিদেবী এবং শিশুপুত্রের মৃত্যু হয়। শরৎচন্দ্রের দ্বিতীয় স্ত্রীর নাম হিরণ্ময়ী দেবী।

রেঙ্গুনে কেবল চাকরি করেই দিন কাটান নি শরৎচন্দ্র। পড়াশুনা, গান-বাজনা, সর্বোপরি সাহিত্যসাধনা ছিল তাঁর প্রবাস-জীবনের ব্রত। ১৯১৩ খ্রীস্টাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় শরৎচন্দ্রের 'বড়দিদি' উপন্যাসটি প্রকাশিত হয়। পরে যমুনায় প্রকাশিত হল

'রামের সুমতি'। তখন থেকেই সাহিত্যিক ও পাঠক মহলে শক্তিশালী লেখক হিসাবে শরৎচন্দ্র পরিচিত হন।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে রেঙ্গুনের চাকরি ছেড়ে দেশে আসেন শরৎচন্দ্র। প্রথমে হাওড়া শহরের বাজেশিবপুরে, পরে রূপনারায়ণের তীরে সামতাবেড়েতে জায়গা কিনে বাড়ি তৈরি করে বসবাস করেন। শরৎচন্দ্রের শেষজীবন শারীরিক কারণেই ভালো যায় নি। ডাক্তারি পরীক্ষায় ধরা পড়ে তাঁর যকৃতে ক্যানসার হয়েছে এবং তা পাকস্থলীকেও আক্রমণ করেছে। অপারেশন করেন সে যুগের বিখ্যাত ডাক্তার ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কিন্তু তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয় নি। ১৯৩৮ খ্রীস্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারি রবিবার বাংলার এই অপরাজেয় কথাশিল্পী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। তাঁর মৃত্যুতে শোকাহত রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

"যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি।"

'মহেশ' গল্পের কাহিনী-সংক্ষেপ : কাশীপুর গ্রামের জমিদার শিবচরণের ছোটো ছেলের জন্মতিথির পুজো সেরে দুপুর বেলায় তর্করত্ন বাড়ি চলেছেন। বৈশাখের শেষ অনাবৃষ্টির আকাশ থেকে যেন আগুন ঝরে পড়ছে। ফুটিফাটা মাঠ, সেই মাঠের প্রান্তে গফুর জোলার বাড়ি।

যেতে যেতে একটা পিটালি গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে তর্করত্ন গফুর জোলাকে ডাকছেন। হাঁকডাকে গফুরের মেয়ে আমিনা বেরিয়ে আসে, বলে—"বাবার যে জ্বর।"

মেয়ের কথা শুনেও তর্করত্ন শান্ত হন না। শেষে গফুর নিজেই জ্বর-গায়ে বাইরে এসে দাঁড়ায়।

তর্করত্ন অদূরে-বাঁধা মহেশ-নামে ষাঁড়টিকে ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলেন, "ওটা হচ্চে কি শুনি? এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে?"

গফুর প্রথমটায় তাঁর ক্রোধের কারণ বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। পরে তর্করত্ন তাকে বুঝিয়ে বলেন গো-সেবার কথা। কয়েক আঁটি খড় অথবা ফ্যানজলে মহেশের মুখের কাছে ধরে দেবার পরামর্শ দেন।

কিন্তু মহেশকে খেতে দেবার মতো কোনো খড় গফুরের বাড়িতে ছিল না। ভাগে যে কাহন খানেক খড় সে পেয়েছিল জমিদারবাবু গেল-সনের বকেয়া বলে সব রেখে দিলেন, মহেশ তার থেকে 'কুটোটি পেলে না'।

এরপর গফুর তর্করত্নের কাছে কাহন দুই খড় ধার চাইল। তার নাকি চার চারটে গাদা গফুর নিজের চোখে দেখে এসেছে। কিন্তু তর্করত্নের দয়া হল না। মহেশকে পথের ধার থেকে সরিয়ে বাঁধবার উপদেশ দিয়ে তিনি বিদায় হলেন।

মহেশের নিবিড় গভীর বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা কালো চোখের দিকে তাকিয়ে

গফুরের কত কথাই না মনে হয়। সে মহেশের সঙ্গে সুখ-দুঃখের কত কথা বলে। তারপর একসময় মেয়েকে লুকিয়ে গোপনে ঘরের চাল থেকে পুরনো খড় পেড়ে এনে পুত্রতুল্য মহেশের মুখের সামনে ধরে দেয়।

ঠিক তখনই কন্যা আমিনা তাকে ভাত খাবার জন্যে ডাকতে আসে। মেয়ের কাছে গফুর ধরা পড়ে যায়। এই সময় গফুর নিজের মুখের ভাত মহেশকে খয়ে দেবার জন্যে আমিনার সঙ্গে কিঞ্চিৎ অভিনয় করে। আমিনা গফুরের ছলনা বুঝতে পেরেও মহেশের প্রতি তার স্নেহ-ভালোবাসার কথা ভেবে বাবার আদেশ পালন করে।

এই ঘটনার পাঁচ-সাতদিন পরে গফুর একদিন চিন্তিতমুখে ঘরের দাওয়ায় বসে ছিল, তার মহেশ কাল থেকে ঘরে ফেরে নি। নিজে সে অসুস্থ, তাই কন্যা আমিনা মহেশকে সর্বত্র খুঁজে বেড়িয়েছে।

অবশেষে পড়ন্ত বেলায় আমিনা এসে সংবাদ দিল গ্রামের মাণিক ঘোষেরা নাকি মহেশকে দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে দিয়েছে। আরও জানাল তিনদিন হলেই পুলিশের লোক তাকে গোহাটায় বেচে ফেলবে।

মেয়ের কাছে মহেশকে ছাড়িয়ে আনবার কোনো আগ্রহ প্রকাশ না করলেও, রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে গফুর বংশীর দোকানে পিতলের থালা বন্ধক দিয়ে একটি টাকা ধার করে আনে এবং সেই টাকায় মহেশকে খোঁয়াড় থেকে ছাড়িয়ে আনে।

দরিয়াপুর থেকে ফেরার পথেই মহেশকে বিক্রি করার কথা মনে হয় গফুরের। তাই একজন কসাইয়ের কাছে কিঞ্চিৎ বায়না নিয়েও আসে। কিন্তু কার্যকালে সেই কসাই যখন টাকা-পয়সা মিটিয়ে মহেশকে নিয়ে যেতে আসে তখন গফুরের প্রাণে আঘাত লাগে। সে বায়নার টাকা ফিরিয়ে দেয় এবং কসাইদের গ্রাম ত্যাগ করে যেতে বলে।

গ্রামে কসাই ঢোকানোর অপরাধে জমিদার শিবচরণের কাছে গফুরকে কম গঞ্জনা সহ্য করতে হয় নি। কিন্তু সে সব অপমান নীরবে সহ্য করে এবং অন্যায় স্বীকার করে নেয়। তর্করত্ন মহাশয় জমিদারের সভায় গো-শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা শোনান।

বৈশাখের খরা জ্যৈষ্ঠের শেষেও ভীষণ রুদ্র মূর্তিতে আবির্ভূত হল। সারাদিন রোদে রোদে কাজের সন্ধানে ঘুরে ক্ষুধার্ত তৃষ্ণার্ত গফুর সেদিন ঘরে ফিরে এল।

ঘরে এসে সে মেয়ের কাছে ভাত খেতে চাইল। বলল, আমিনা ভাত হয়েছে রে?

আমিনা এ কথার কোনো উত্তর দেয় নি। সে কেবল বাইরে এসে খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে রইল। পরে গফুরের তর্জন গর্জনে উত্তর দিয়েছিল চাল নেই বলে রান্না হয় নি।

ঘটনা সত্য, কিন্তু গফুরের তখন সত্য উপলব্ধি করবার মতো মানসিক অবস্থা ছিল না। সে চাল না থাকার জন্যে আমিনাকেই দোষী সাব্যস্ত করে এবং পরে জল খেতে চায়। সেদিন গফুরের ঘরে তৃষ্ণার জলটুকুও ছিল না। খানিক বাদে গফুর যখন বুঝতে পারল ঘরে তৃষ্ণার জল পর্যন্ত নেই তখন তার পক্ষে রাগ সামলে রাখা আর সম্ভব হল না। সে মেয়ের গালে একটা চড় মেরে বলল, "এত লোকে মরে তুই মরিস নে।"

কিন্তু আমিনা শূন্য মাটির কলসী তুলে নিয়ে জলের সন্ধানে বেরিয়ে যেতেই গফুরের সম্বিৎ ফিরে এল। সে বুঝতে পারল চাল না থাকায় আমিনার দোষ নেই, তেমনি উপলব্ধি করে খরার দিনে একটু জল সংগ্রহ করাও কী কঠিন কাজ।

এমন সময় জমিদারের পেয়াদা এসে গফুরের নাম ধরে ডাকে। বলে, "বাবুমশায় ডাকচেন, আয়।"

ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর গফুর সে ডাকে সাড়া দিতে পারে না। অবশেষে পেয়াদার দুর্ব্যবহারে বলে বসে, "মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।"

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অতবড়ো দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয় বিপদের কারণ। খানিক বাদে গফুরকে জোর করেই পেয়াদারা জমিদার সদরে ধরে নিয়ে যায়, সেখানে চলে দৈহিক নির্যাতন। তার এই কঠিন শাস্তির একমাত্র কারণ মহেশ। মহেশ নাকি জমিদারবাবুর বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করে এবং ছোটোমেয়েকে ফেলে দেয়। মহেশের অপরাধেই গফুর জোলাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়। বিশেষত, সে মহারাণীর রাজত্বে খাজনা দিয়ে বাস করে বলে যে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করে তা শিবচরণের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব ছিল না।

জমিদারের বাড়িতে প্রহার-লাঞ্ছনা ভোগ করে গফুর যখন নিজের বাড়িতে ফিরে এল তখন তার ক্ষুধাতৃষ্ণার কথা মনে ছিল না, বুকের ভেতরটা কেবল বাইরের মধ্যাহ্ন আকাশের মতো জ্বলতে লাগল।

সহসা মেয়ের আর্তকণ্ঠ কানে যেতেই গফুর সবেগে উঠে দাঁড়াল, দেখল আমিনা মাটিতে পড়ে আছে এবং ভাঙা ঘট থেকে জল ঝরে পড়ছে, "আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মতো যেন শুষিয়া খাইতেছে।"

দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য গফুর লাঙ্গলের মাথাটা দুহাতে ধরে মহেশের অবনত মাথার ওপর সজোরে আঘাত করল। সে আঘাত সহ্য করার ক্ষমতা ছিল না মহেশের, সে মারা গেল।

আমিনা বলল, "কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল।"

গফুর কোনো উত্তর না দিয়ে কেবল একজোড়া কালো চোখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চল হয়ে রইল।

খানিক বাদে খবর পেয়ে মুচির দল এসে মহেশকে ভাগাড়ে নিয়ে গেল। পাড়ার লোক সংবাদ দিল তর্করত্নের কাছে বিধান নিতে জমিদার লোক পাঠিয়েছে।

গফুর এসব কথার কোনো উত্তর দিল না। কেবল দুহাঁটুর উপর মুখ রেখে ঠায় বসে রইল।

তারপর অনেক রাত্রে ঘুমন্ত আমিনাকে তুলে নিয়ে গফুর ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে চলে গেল। যাবার সময় পিতলের ঘটি আর ভাতখাবার থালাটিও রেখে গেল। মেয়ে আনতে চাইলে গফুর বলল,"ও সব থাক মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।"

আঙিনা পার হয়ে পথের ধারে সেই বাবলা তলায় এসে গফুর হু হু করে কেঁদে ফেলল, "তারপর নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ ক'রো না।"

ছোটোগল্প হিসাবে 'মহেশ' গল্পের বিচার :

শরৎচন্দ্র মূলত ঔপন্যাসিক। জীবনের সামগ্রিক রূপের ছবি আঁকাই ঔপন্যাসিকের কাজ। আর ছোটোগল্প-লেখক অঙ্কন করেন জীবনের স্মরণীয় মুহূর্তের ছবি।

অল্প হলেও শরৎচন্দ্র কয়েকটি মূল্যবান ছোটোগল্পের স্রষ্টা। এই সব গল্পের মধ্যে তাঁর লেখা 'মহেশ' অন্যতম। ছোটোগল্প হিসাবে মহেশ কতখানি সার্থক তা বিচারের পূর্বে সংক্ষেপে ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য আলোচনার প্রয়োজন।

ছোটোগল্প কী, এক কথায় তার উত্তর দেওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেন ছোটোগল্প ছোটোও বটে আবার গল্পও বটে। একাগ্রতা আর একমুখীনতা ছোটোগল্পের মূল্যবান বৈশিষ্ট্য।

বিশ্বের বিপুল ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে ছোটোগল্প চোরা লণ্ঠনের আলোয় এমন একটি অংশকে উদ্ভাসিত করে যার মাধ্যমে আমরা জীবনের সামগ্রিক রূপকে প্রত্যক্ষ করি। সেই কারণে ছোটোগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতিতে কোনো মিল নেই, মিল আছে গীতিকবিতার সঙ্গে। ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সেই অবিস্মরণীয় পঙ্‌ক্তিগুলোর কথা বার বার মনে পড়ে :

"ছোট প্রাণ ছোট ব্যথা ছোট ছোট দুঃখকথা
নিতান্তই সহজ সরল ;
সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দুচারিটি অশ্রুজল।"

ছোটোগল্পে বর্ণনার বাড়াবাড়ি থাকবে না, কোনো তত্ত্ব প্রচারের বা উপদেশ দেবার আগ্রহ থাকবে না। গল্পের আরম্ভ এবং সমাপ্তি হবে আকস্মিক। আকস্মিক ঘটনার মোচড়ে গল্প যেন হঠাৎ শেষ হয়ে যাবে কিন্তু শেষ হবার পরেও পাঠকের মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তির রেশ থেকে যাবে। আমাদের আলোচ্য 'মহেশ' গল্পের মধ্যেও ছোটোগল্পের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাই।

'মহেশ' গল্প হঠাৎ আরম্ভ হয়েছে। উপন্যাসের মতো এই গল্পের কোনো ভূমিকা নেই। গল্পের শুরুতে ঘটনার ঘনঘটা বা বর্ণনার ছটা নেই। লেখক এই ভাবে গল্প আরম্ভ করেছেন—"গ্রামের নাম কাশীপুর। গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু দাপটে তাঁর প্রজারা টুঁ শব্দটি করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।" গল্পে শেষ পর্যন্ত এই প্রতাপের পরিচয়ই পেয়েছি।

ছোটোগল্পের সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য হল তার একমুখী গতি। 'মহেশ' গল্পেও তার

ব্যতিক্রম ঘটে নি। আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রে আছে গফুর জোলার মহেশ-নামে একটি ষাঁড়, যার সঙ্গে গফুরের স্নেহ-বাৎসল্যের একটা নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল।

আট সন চাষের কাজে সাহায্য করে মহেশ বুড়ো হয়েছে কিন্তু গফুর তার সন্তানতুল্য মহেশকে দুবেলা পেটপুরে খাওয়াতে পারে না, লোকে তাকে গোহাটায় বেচে ফেলতে বলে, কিন্তু কথাটা মনে হলেই গফুরের বুক ফেটে যায়। সে অভুক্ত মহেশকে ঘরের চাল থেকে খড় পেড়ে খাওয়ায়, নিজের মুখের ভাত তার সামনে ধরে দেয়, এমনি করেই খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দিন যায়। অজন্মা, খরা, অসহনীয় দারিদ্র্য, সেই সঙ্গে উচ্চ হিন্দু সমাজ ও ব্রাহ্মণ জমিদারের অত্যাচারের ফলে একদিন গফুর তার মনের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ফলে নিজের হাতেই পুত্রতুল্য মহেশকে সে খুন করে, রাতের অন্ধকারে কন্যা আমিনার হাত ধরে ঘর ছেড়ে যায় ফুলবেড়ে চটকলে কাজ করতে। এই হল কাহিনী।

দরিদ্র মুসলমান গফুরের উপর হিন্দুদের অত্যাচার-কাহিনী আর সেই সঙ্গে মূকবধির পশুর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার সম্পর্ক 'মহেশ' গল্পে তুলে ধরা হয়েছে। এবং যেখানে গল্পটি শেষ হয়েছে সেখানেই লেখক আমাদের ঘুমন্ত চেতনার উপর প্রচণ্ড আঘাত হেনে এক সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। গল্প শেষ হয়, কিন্তু পাঠক-মনে চলতে থাকে আর এক গল্পের জাল বোনা, অর্থাৎ "শেষ হয়ে হইল না শেষ"। গফুর-আমিনার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনও চলে যায় ফুলবেড়ের চটকলে, বেদনাদীন মনে আমরা আঁকতে থাকি গফুরের ভবিষ্যতের ছবি।

গল্পের দ্রুত গতি এবং পরিণামে একটা চমক, সবই আদর্শ ছোটোগল্পের লক্ষণ। তা ছাড়া, 'মহেশ' গল্পে অবান্তর কোনো চরিত্র অথবা ঘটনা এসে গল্পের গতিবেগকে শ্লথ করে নি। তাই শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' একটি আদর্শ ছোটোগল্প। কেবল শরৎ-সাহিত্যে নয়, বাংলা সাহিত্যেও মহেশ একটি আদর্শ ছোটোগল্প বলে বিবেচিত।

'মহেশ' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার :

প্রত্যেক রচনার নামকরণের বিশেষ এক তাৎপর্য থাকে। সেই তাৎপর্যের দিকে লক্ষ্য রেখেই লেখক রচনার নামকরণ করেন। অনেক সময় কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামানুসারে গল্প বা উপন্যাসের নামকরণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বঙ্কিমচন্দ্রের 'রাজসিংহ', শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র কথা বলা যায়। রাজসিংহ, দেবদাস বা গোরার জীবন, তাদের ভাবনা বা জীবনদর্শন উপন্যাসে নানা ভাবে চিত্রিত, তাই তাদের নামেই লেখক উপন্যাসের নামকরণ করেছেন।

আবার কখনও লেখক তাঁর লেখায় কোনো আদর্শ বা দর্শনিক ভাবনার ছবি অঙ্কন করেন, তখন নায়ক-নায়িকার নামে রচনার নামকরণ না করে এমন নাম বেছে নেওয়া হয় যার মাধ্যমে বিশেষ আদর্শ বা ভাবনার ছবি ফুটে ওঠে। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ, শরৎচন্দ্রের গৃহদাহ, রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন, চোখের বালি, ছুটি, অতিথি, দানপ্রতিদান, শাস্তি প্রভৃতি উপন্যাস বা ছোটোগল্প।

শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটির নামকরণের মধ্যে একটি বৈশিষ্ট্য আছে। গফুর জোলা গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র, কিন্তু তার নামে গল্পের নামকরণ করা হয় নি। গফুরের পুত্রপ্রতিম 'মহেশ' নামে একটি ষাঁড়কেই গল্পে প্রাধান্য দিয়ে তার নামে গল্পের নামকরণ করা হয়েছে 'মহেশ'।

'মহেশ' ছিল গফুরের ছেলের মতো, গফুর নিজেই বলেছে, "মহেশ, তুই আমার ছেলে তুই আমাদের আটসন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারিনে—কিন্তু তুই ত জানিস তোকে আমি কত ভালোবাসি।"

মূকবধির প্রাণীর সঙ্গে মানুষের আত্মীয়তার, ভালোবাসার, স্নেহ-প্রীতির গল্প হল 'মহেশ'। তাই মহেশ এক ষাঁড়ের নাম হলেও 'মহেশ' আদর্শ প্রীতি ও স্নেহেরও একটি নাম।

মহেশ গফুরকে দীর্ঘকাল চাষের কাজে সাহায্য করেছে কিন্তু দরিদ্র গফুর অজন্মার ফলে 'এই দুবছরে' পুত্রতুল্য মহেশকে পেটপুরে খেতে দিতে পারে নি। গফুরের নিজের কথায় বলি, "দেশের কেউ তোকে চায় না—লোকে বলে তোকে গোহাটায় বেচে ফেলতে।" কথাটা ভাবতেই গফুরের দুচোখ জলে ভরে যায়। ঘরের চাল থেকে খড় পেড়ে খাওয়ায়, নিজের মুখের ভাত ধরে দেয় মহেশের মুখের সামনে।

মহেশ দড়ি ছিঁড়ে পরের বাগানের গাছপালা নষ্ট করে, ফলে মহেশকে দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে যেতে হয়। দরিদ্র গফুর তার একমাত্র পিতলের সানকি বন্ধক দিয়ে মহেশকে ছাড়িয়ে আনে। কসাইয়ের হাতে তুলে দিতে গিয়েও মহেশের পরিণামের কথা ভেবে শেষ মুহূর্তে মত বদল করে। কিন্তু একদিন জমিদারের বাড়ি থেকে গফুরকে অত্যাচার আর লাঞ্ছনা মাথায় নিয়ে ফিরে আসতে হয়। 'তার এত বড়ো শাস্তির হেতু প্রধানতঃ মহেশ'। সেদিন রোগজীর্ণ অভুক্ত গফুরের ঘরে ক্ষুধার অন্ন দূরের কথা, তৃষ্ণার জলটুকুও ছিল না। বিনা দোষে আমিনা গফুরের হাতে মার খেয়ে জল আনতে গিয়েছিল, আর গফুর ঘরে এসে নিঃশব্দে শুয়েছিল। সহসা তার মেয়ের আর্তকান্না কানে যেতেই সে সবেগে উঠে দাঁড়াল, বাইরে গিয়ে দেখল, "আমিনা মাটিতে পড়িয়া এবং বিক্ষিপ্ত ভাঙ্গা ঘট হইতে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। আর মহেশ মাটিতে মুখ দিয়া সেই জল মরুভূমির মতো যেন শুষিয়া খাইতেছে। চোখের পলক পড়িল না, গফুর দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া গেল। মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপরে সজোরে আঘাত করিল।"

পুত্রতুল্য মহেশকে হত্যা করে গফুর ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে গেল। আমিনা জল খাবার ঘটি ও পিতার ভাত খাবার পিতলের থালাটি সঙ্গে নিতে চেয়েছিল কিন্তু গফুর তাকে নিষেধ করে বলল, "ও সব থাক্ মা, ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে"।

আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে, গফুরই মহেশকে হত্যা করেছিল, কিন্তু মহেশ হত্যার

জন্য দায়ী গফুর নয়, দায়ী গোঁড়া হিন্দু সমাজ,—জমিদার ও মহাজন শ্রেণীর মানুষ, যারা তিলে তিলে মহেশকে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে।

কত বেদনায় কত অভিমানে যে গফুর নিজের হাতে পুত্রতুল্য মহেশকে হত্যা করে তা সহৃদয় পাঠক মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে। গফুরের মহেশ-প্রীতি ও ভালোবাসার নিদর্শন গল্পের শেষে তার ফরিয়াদেই মূর্ত হয়ে উঠেছে: "আল্লা, আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"

আলোচ্য গল্পে মহেশকে কখনই মূকবধির পশু বলে মনে হয় নি। সে হয়ে উঠেছে আমাদের আত্মীয়, প্রিয় পাত্র। তার জন্যে আমরাও চোখের জল না ফেলে পারি না। শরৎচন্দ্রের হাতে এই মূকবধির পশু হয়ে ওঠে আমাদের প্রিয়জন, আত্মার আত্মীয়। 'মহেশ' পশু আর মানুষের মধ্যে মিলনের এক সেতু নির্মাণ করেছে। তাই আলোচ্য গল্পের 'মহেশ' নামকরণ সার্থক।

চরিত্র

গফুর জোলা: কাশীপুর গ্রামের প্রান্তে দরিদ্র মুসলমান গফুর জোলার বাড়ি। একে দরিদ্র তায় মুসলমান বলে হিন্দুপ্রধান, বিশেষত, ব্রাহ্মণ জমিদারের গ্রামে গফুর জোলা ছিল অবহেলিত এবং অপাঙ্‌ক্তেয়।

দরিদ্র হলেও গফুর-চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো ঐশ্বর্য ছিল মূকবধির এক ষাঁড়ের প্রতি অপত্যস্নেহ। প্রবল পশুপ্রীতিই গফুরকে সম্রাটের মর্যাদা দান করেছে। আন্তর ঐশ্বর্যে মহান গফুর তার ঘরের চাল থেকে খড় পেড়ে মহেশের মুখে দেয়, নিজের মুখের ভাত ধরে দেয় পুত্রপ্রতিম মহেশের সামনে। এমন কি, কাহন দুই খড়ের জন্যে সে তর্করত্নের সামনে নতজানু হতেও কুণ্ঠিত হয় না।

সাধারণের কাছে গফুর "জেদি এবং বদ্‌মেজাজি" বলে পরিচিত ছিল। কিন্তু নিজের ভুলত্রুটি এবং অন্যায় স্বীকার করতেও সে কোনোদিন কার্পণ্য করে নি। তাই দেখি, কসাইকে গরু বিক্রির উদ্যোগ হিন্দুর চোখে অমার্জনীয় অপরাধ জেনে সে জমিদারের সদরে গিয়ে বলে, "এমন কাজ আর কখনো কোরব না কর্তা। এই বলিয়া সে নিজের দুই হাত দিয়া নিজের দুই কান মলিল, এবং প্রাঙ্গণের একদিক হইতে আর একদিক পর্যন্ত নাকখৎ দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।"

দারিদ্র্য সত্ত্বেও ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করাকে সে মর্যাদার চোখে দেখে নি, কারণ "সেখানে ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জৎ ও আব্রু থাকে না", তা ছাড়া "পরের দ্বারে জনমজুর খাটাও গফুরের কাছে মর্যাদা-হানি করছিল। কিন্তু পেটের জ্বালায় মর্যাদা বিসর্জন দিয়ে তাকে একদিন কাজের সন্ধানে বেরুতে হয়েছে, "কিন্তু এই প্রচণ্ড রৌদ্র কেবল তাহার মাথার উপর দিয়া গিয়াছে, আর কোন ফল হয় নাই।"

শরীর-মনের এই অবস্থায় অসুস্থ দুর্বল এবং অভুক্ত গফুর যখন তৃষ্ণার জলটুকু মেয়ের কাছে চেয়েও পায় না তখন তার সংযমের বাঁধ ভেঙে পড়ে। লেখকের ভাষায়, "তখন সে আর আত্মসংবরণ করিতে পারিল না। দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কষাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া হারামজাদা মেয়ে, সারাদিন তুই করিস কি? এত লোকে মরে তুই মরিস নে!"

কিন্তু শূন্য কলসী তুলে নিয়ে আমিনা চোখের আড়াল হতেই "গফুরের বুকে শেল বিঁধিল। মা-মরা এই মেয়েটিকে সে যে কি করিয়া মানুষ করিয়াছে সে কেবল সেই জানে।"

'জেদি এবং বদমেজাজি' এই মানুষটির বাইরের কঠিন আবরণের ভেতর ছিল অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো স্নেহ-ভালোবাসার অনন্ত প্রস্রবণ। যে স্নেহ-ভালোবাসায় ধারায় আমিনা থেকে মহেশ পর্যন্ত অভিষিক্ত। কিন্তু নিষ্ঠুর সমাজ, মানুষের তৈরি অজন্মা এবং ভয়ঙ্কর খরা এবং মহেশকে কেন্দ্র করে কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনা গফুরকে নিষ্ঠুর ও ভয়ঙ্কর করে তুলেছিল।

এর সঙ্গে যুক্ত হল জমিদারের পেয়াদার কুৎসিত সম্ভাষণ, "গফরা ঘরে আছিস।" গফুর এমনিতেই আত্মমর্যাদাসচেতন মানুষ, অথচ তাকে শুনতে হল, 'বাবুর হুকুম, জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।' এর পরেই আমরা গফুরকে প্রথম জ্বলে উঠতে দেখি, জেদি এবং বদমেজাজি এই মানুষটি প্রায় বিদ্রোহের স্বরে বলে উঠেছে, "মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না।"

কিন্তু সংসারে অত ক্ষুদ্রের অতবড়ো দোহাই দেওয়া শুধু বিফল নয়, বিপদের কারণ। সেদিন অনাহারক্লিষ্ট গফুরকে জমিদারের সদরে দৈহিক নির্যাতন সহ্য করে ফিরে আসতে হয়। এর পরেই সব অঘটনের নায়ক মহেশকে গফুর নিজের হাতে হত্যা করে। গফুরের তৎকালীন মানসিকতার কথা চিন্তা করলে আমরা এই গো-হত্যার দায় থেকে তাকে অনায়াসেই অব্যাহতি দিতে পারি। পুত্রপ্রতিম মহেশ-হত্যা গফুরের কাছে কম বেদনার ব্যাপার ছিল না, তাই ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে যাবার আগে গফুর গো-হত্যার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তি ফেলে যায়। এবং আল্লার কাছে তার শেষ ফরিয়াদে জানায়, "আল্লা, আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"

গফুরের শেষ উক্তির মধ্যেই তার স্নেহ, বেদনা, ঈশ্বরবিশ্বাস, অক্ষমের ব্যর্থ ক্রন্দন মূর্ত হয়ে উঠেছে। দরিদ্র মুসলমান হলেও আত্মমর্যাদাসচেতন আপাত বদরাগী স্নেহশীল মহানুভব এই মানুষটি আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। পশুপ্রীতির যে নিদর্শন সে স্থাপন করেছে সাহিত্যে তার দৃষ্টান্ত বিরল।

তর্করত্ন ঃ শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে তর্করত্ন একটি গৌণ চরিত্র। লেখক তাঁর

আসল নাম বলেন নি, কেবল 'তর্করত্ন' উপাধিটি ব্যবহার করেছেন। গৌণ হলেও উপন্যাসে বা গল্পে কোনো চরিত্রই বিনাপ্রয়োজনে আসে না। গৌণ চরিত্রের কাজ হল মুখ্য চরিত্রকে প্রস্ফুটিত করা, গল্পের যোগসূত্র রক্ষা করা এবং পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা।

'তর্করত্ন' উপাধিধারী কাশীপুর গ্রামের সঙ্গতিসম্পন্ন এই ব্রাহ্মণ ছিলেন জমিদার শিবচরণবাবুর পুরোহিত। ক্রিয়াকর্মে জমিদারবাড়িতে তাঁর ডাক পড়ত। গল্পের প্রথমেই জমিদারবাড়িতে এক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান সাঙ্গ করে ফেরার পথে আমরা তাঁর সাক্ষাৎ পাই। লেখক বলেছেন, "ছোট ছেলের জন্মতিথি পূজা। পূজা সারিয়া তর্করত্ন দ্বিপ্রহর বেলায় বাড়ি ফিরিতেছিলেন"।

তর্করত্ন ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ, তাই গো-সেবাকে পরম ধর্ম বলে মনে করতেন। এই গো-সেবার ত্রুটি ঘটলে তাঁকে বিধিমতো উপদেশ এবং বক্তৃতা দিতে দেখা যায়। তিনি বলেন, এ হিঁদুর গাঁ, ব্রাহ্মণ জমিদার, সে খেয়াল আছে ?

কিন্তু এই মানুষটি আবার চার-চারটে খড়ের গাদার মালিক হয়েও গফুরকে দু-কাহন খড় ধার দিতে রাজি হলেন না। কারণ প্রখর বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন এই মানুষটি মনে মনে হিসাব করে দেখেছেন ঋণ দিলে গফুরের ঋণ পরিশোধ করার সঙ্গতি ছিল না। তাই বলতে শুনি, "ধার নিবি শুধবি কি করে শুনি।"

তর্করত্ন সেই শ্রেণীর মানুষ যাদের কথায় ও কাজে কোনো সঙ্গতি থাকে না এবং যা বলে তা কোনোদিন বিশ্বাস করে না। মুখেই আমরা তাকে গো-সেবার মাহাত্ম্য কীর্তন করতে বা গো-শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করতে শুনি কিন্তু তাঁর হৃদয়ে মূকবধির এই পশুদের জন্যে বিন্দুমাত্র স্নেহপ্রীতি ছিল না। গফুরকে তিনি 'পাষণ্ড ম্লেচ্ছ' বা 'ব্যাটা কসাই' বলে গাল দিতে কুণ্ঠিত হন না, কিন্তু এই পাষণ্ড ম্লেচ্ছ কসাই ব্যক্তিটি তার নিজের মুখের অন্ন মহেশের সামনে ধরে দেয়। অভুক্ত মহেশের জন্যে তারই চোখের জল পড়ে। কিন্তু তর্করত্নের হাতের ভিজে চাল ও ফলমূলের পুঁটলির প্রতি ইঙ্গিতে করে গফুর যখন বলে, গন্ধ পেয়েছে, একমুঠো খেতে চায়,। তার উত্তরে একমুঠো চাল গো-সেবায় ব্যয় না করে রসিক তর্করত্ন বলেছেন, "খেতে চায় ? তা বটে ! যেমন চাষা তার তেমনি বলদ। খড় জোটে না চালকলা খাওয়া চাই।"

এই খড় জোটানোর ব্যবস্থা তিনিই করতে পারতেন, কিন্তু করেন নি। তর্করত্নের আর একটা বড়ো পরিচয় হল, তিনি ছিলেন জমিদারের পারিষদ বা মোসাহেব। তাই গফুর শিবচরণের যে বিরূপ সমালোচনা করে তিনি তা সহ্য করতে পারেন নি, সমালোচনার উত্তরে তিনি বলেছেন, "তোরা ত রাম রাজত্বে বাস করিস, ছোটলোক কিনা তাই তাঁর নিন্দে করিস।"

পাড়ার লোকের কথায় আমরা জানতে পারি এই তর্করত্নের কাছেই গো-হত্যার বিধান নিতে জমিদার লোক পাঠান, কারণ তিনি ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ব্যক্তি। কিন্তু গো-জাতির উপর বিন্দুমাত্র মমতা থাকলে গফুরের জীবনে এমন ভয়ঙ্কর ট্র্যাজিডি ঘটত না, মহেশেকেও তেষ্টা নিয়ে মরতে হত না। ধর্মের বাইরের আবরণটাকেই যারা

মুখ্য বলে মনে করে, ধর্মের সহজ-সরল মানবিক প্রেমের দিকটা যাদের হৃদয়ে অনুপস্থিত তর্করত্ন ছিলেন সেই সব ধর্মধ্বজী ভণ্ডদেরই একজন।

শিবচরণ : 'মহেশ' গল্পে শিবচরণবাবু ছিলেন কাশীপুর গ্রামের জমিদার। জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ। গল্পের প্রথমেই লেখক তাঁর চরিত্রটি এক কথায় তুলে ধরেছেন—"গ্রাম ছোট, জমিদার আরও ছোট, তবু, দাপটে তার প্রজারা টুঁশব্দটি করতে পারে না—এমনই প্রতাপ।"

জমিদারীপ্রথার স্বর্ণযুগে শিবচরণের মতো জমিদারেরা ছিলেন গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা। মহারানীর রাজত্বে খাজনা দিয়ে বাস করলেও জমিদারের খেয়াল-খুশির উপর প্রজাদের ভাগ্য নির্ধারিত হত। এই সব জমিদারশ্রেণীর মানুষকে কেন্দ্র করে একদল মধ্যসত্বভোগী মানুষের সৃষ্টি হয়েছিল। পল্লীবাংলায় এরাই পারিষদ বা মোসাহের নামে পরিচিত ছিল। আমাদের আলোচ্য গল্পে জমিদার শিবচরণেরও এমনই একদল পারিষদ ছিল, তর্করত্ন ছিলেন তাদের অন্যতম।

ছোটো জমিদার হলেও শিবচরণের যে-প্রতাপের পরিচয় লেখক তুলে ধরেছেন তা নিষ্ঠুরতার নামান্তর মাত্র। এই নিষ্ঠুরতার পরিচয় পাই গফুরের মুখে। সে বলে, "কাহন-খানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামহাশয় সব ধরে রাখলেন। কেঁদেকেটে হাতেপায়ে পড়ে বললাম, বাবুমশাই হাকিম তুমি, তোমার রাজত্ব ছেড়ে আর পালাবো কোথায়, আমাকে পণদশেক বিচুলিও না হয় দাও।.........কিন্তু হাকিমের দয়া হল না। মাস দুয়েক খোরাকের মতো ধান দুটি আমাদের দিলেন, কিন্তু বেবাক খড় সরকারের গাদা হয়ে গেল।" এটাই জমিদার শিবচরণের প্রতাপ অর্থাৎ নিষ্ঠুরতার পরিচয়।

গো-ব্রাহ্মণে ভক্তির খ্যাতি ছিল শিবচরণের। তর্করত্ন বলেছেন, "গো-হত্যা হলে যে কর্তা তোকে জ্যান্ত কবর দেবে। সে যে সে বামুন নয়।"

কিন্তু স্বার্থপর এই মানুষটি শ্মশানের ধারে গাঁয়ের যে গোচরটুকু ছিল তাও পয়সার লোভে জমা বিলি করে দিলে। মুখে এদের গো-ভক্তির কথা শোনা যায় কিন্তু গো-সেবায় পণদশেক বিচুলিও এরা দেয় না। কসাইয়ের কাছে গরু বিক্রি করাকে তিনি অপরাধ বলে মনে করতেন, কিন্তু সেই গরুর বেঁচে থাকার পথ তিনি নিজের হাতেই রুদ্ধ করতেন সেটা অপরাধ বলে গণ্য হয় নি।

শিবচরণের কাছে ধর্ম ছিল কেবল স্বার্থসিদ্ধির উপায়। স্বার্থ বিঘ্নিত হলে তিনি ধর্মাধর্ম বিচার করতেন না। তাই দেখি, গফুরের মহেশ তাঁর বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করলে তিনি মহেশের অপরাধে গফুরকে শাস্তি দিতেও কসুর করেন নি। গ্রামের জমিদার হয়েও প্রচণ্ড জলকষ্ট নিবারণের কোনো চেষ্টাই তাঁকে করতে দেখা যায় না। লেখক বলেছেন, "শিবচরণবাবুর খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে, তাহা সাধারণে পায় না।"

আলোচ্য গল্পে শিবচরণবাবু ছিলেন পল্লীবাংলার স্বার্থপর জমিদারশ্রেণীর প্রতিনিধি।

নিষ্ঠুরভাবে প্রজার রক্ত শোষণ ছাড়া তাঁর অন্য কোনো কাজ ছিল না। তিনি ছিলেন গ্রামের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, কিন্তু গ্রামের মঙ্গলের দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল না, তাই গফুর আল্লার কাছে তার ফরিয়াদে বলেছে, "যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"

আমিনা ঃ 'মহেশ' গল্পে আমিনাছিল গফুরের দশ বছরের কিশোরী কন্যা। এই মুসলমান দরিদ্র কন্যাটিকে গল্পের প্রথমেই আমরা স্নেহশীলা গৃহকর্মনিপুণা-রূপে দেখতে পাই। রুগ্ন পিতার সেবা ও রান্নার কাজে সমান দক্ষতা ছিল তার। আমিনা-চরিত্রের একটা বড়ো বৈশিষ্ট্য ছিল তার সবদিকে সচেতন ও সজাগ দৃষ্টি। তাই গোপনে ঘরের চাল থেকে খড় টেনে মহেশকে খাওয়াতে গিয়ে গফুর ধরা পড়ে যায়। দুঃখের দিনে ভাতের ফ্যান নষ্ট করতে নেই, সে কথাও দশবছরের মেয়ের অজানা ছিল না। এমন কি, গফুর যখন জরের ভান করে মুখের অন্ন মহেশকে ধরে দেবার প্রস্তাব করে তখনও তার ছলনা একমাত্র আমিনার কাছেই ধরা পড়ে যায়।

ঘরসংসারের কাজ ছাড়াও গ্রামের নানা সংবাদ আমিনা সংগ্রহ করে আনত। মহেশকে দরিয়াপুরের খোঁয়াড়ে দেওয়ার সংবাদ সে-ই মাণিক ঘোষের চাকরের কাছ থেকে সংগ্রহ করে আনে।

স্নেহশীলা নীরব কর্মী এই মেয়েটিকে গফুর বিনা দোষে চড় মারলে বা চুরি করে খাবার মিথ্যে অপবাদ দিলে সে কোনো প্রতিবাদ করে নি। শরৎচন্দ্র আমিনার মাধ্যমে একটি করুণ ছবি আমাদের উপহার দিয়েছেন। যখন তেষ্টার জল না পেয়ে গফুর "দ্রুতপদে কাছে গিয়া ঠাস করিয়া সশব্দে তাহার গালে এক চড় কসাইয়া দিয়া কহিল, মুখপোড়া হারামজাদা মেয়ে, সারাদিন তুই করিস কি? এত লোক মরে তুই মরিস নে! মেয়ে কথা কহিল না, মাটির শূন্য কলসীটি তুলিয়া লইয়া সেই রৌদ্রের মাঝেই চোখ মুছিতে মুছিতে নিঃশব্দে বাহির হইয়া গেল।" আমিনা ছিল যেন তার বেদনার প্রতিমূর্তি।

গল্পের শেষ পর্বে মহেশ-হত্যার পর আমিনা আর্তনাদ করে কেঁদে উঠে বলেছে, "কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল।" অথবা অনেক রাত্রে গৃহত্যাগ করে যাবার সময় গফুর যখন বলল, দেরি করিস নে মা, চল্, অনেক পথ হাঁটতে হবে। তখনও বাস্তববাদী সজাগ দৃষ্টিসম্পন্ন আমিনা পিতার ভাত খাবার পেতলের থালা এবং জলখাবার ঘটি সঙ্গে নেবার চেষ্টা করে। এমনই ছিল তার সদাসতর্ক ও সজাগ দৃষ্টি।

আমিনা ছিল দরিদ্র মুসলমান কিশোরী কন্যা। স্নেহ-মমতায়, নিপুণ গৃহকর্মে, সেবায়, বাস্তববাদী সজাগ দৃষ্টিতে সে ছিল পল্লী বালিকার প্রতিনিধি।

প্রশ্নোত্তর

১। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে পল্লীবাংলার যে সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে তার পরিচয় দাও।

উত্তর। শরৎ-সাহিত্যে পল্লী বাংলার পরিবার ও সমাজ-জীবনের এক নির্ভরযোগ্য ছবি

ফুটে উঠেছে। শরৎচন্দ্র ছিলেন সাধারণ খেটে-খাওয়া মানুষের প্রতিনিধি। তিনি নিজেই বলেছেন, "যারা দিল অনেক, পেল না কিছুই তারাই পাঠাল আমাকে"। সাধারণ মানুষের ছোটো ছোটো সুখ-দুঃখ-বেদনা তাঁর গল্প-উপন্যাসে জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য 'মহেশ' গল্পেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। 'মহেশ' গল্পের কাশীপুর গ্রাম বাংলা দেশের কোনো বিচ্ছিন্ন গ্রাম ছিল না বা জমিদার শিবচরণবাবুও সে-যুগের জমিদার-সমাজের বিরল ব্যতিক্রম ছিলেন না। অর্থাৎ একশো বছর আগে বাংলার যে-কোনো গ্রামই ছিল কাশীপুরের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং যে-কোনো জমিদার ছিলেন শিবচরণের মতো মমতাহীন জাত্যাভিমানী।

ব্রাহ্মণ জমিদার হিন্দুপ্রধান গ্রামে গফুরের মতো দরিদ্র মুসলমান পরিবার ছিল অপাংক্তেয় এবং অবহেলিত। ব্রাহ্মণসমাজে তর্করত্নের মতো ভণ্ড ধর্মধ্বজী মানুষেরও অভাব ছিল না। তাঁরা মুখেই গো-শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করতেন, কিন্তু চারচারটে গাদা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কাহন-দুই খড় ধার দিতে পারেন না। শ্মশানের ধারে গ্রামের গোচরটা জমিদার পয়সার লোভে জমাবিলি করে দেয়। দরিদ্র মুসলমান গফুরকে তর্করত্ন কসাই বলে অভিযোগ করেন, "কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে" মহেশের মুখের খড় জমিদারের গাদা হয়ে যায়। এই হল জোতদার-মহাজনের চরিত্র, যে-চরিত্র সর্বকালে সর্বযুগেই দুষ্ট ক্ষতের মতো বাংলার সমাজদেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে।

কসাইয়ের কাছে গরু বিক্রি করা হিন্দুদের চোখে ধর্মীয় অপরাধ বলে বিবেচিত। কিন্তু সেই গরুকে বাঁচিয়ে রাখবার কোনো ব্যবস্থাই এ সমাজ করে নি। উপরন্তু মহেশকে ধার্মিক মাণিক ঘোষের মতো মানুষও খোঁয়াড়ে দিতে দ্বিধা করে না।

জমিদার বা জোতদার শ্রেণীর মানুষকে অবলম্বন করে একটি স্বার্থান্বেষী ভোগী সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল। এই পারিষদ বা মোসাহেব সম্প্রদায়ের কাজ ছিল সবসময় ধনীর পদলেহন করা। এই কাজেও প্রতিযোগিতার অন্ত ছিল না।

ধর্মীয় গোঁড়ামি, ছুৎমার্গ সমাজের সর্বস্তরে দুষ্ট ক্ষতের মতো প্রবেশ করেছিল। তাই দেখি তর্করত্ন গফুরের ছোঁয়াচ বাঁচাতে—"তীরবৎ দু'পা পিছাইয়া গিয়া কহিলেন, আমায় ছুঁয়ে ফেলবি নাকি?"

মুসলমান-কন্যা বলে আমিনা সহজে তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করতে পারে নি। লেখকের কথায়, "ঘন্টার পর ঘন্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয় বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে ঢালিয়া দেয় সেইটুকু সে ঘরে আনে।" সর্বকালেই খরা-মহামারী নিয়ে বাঙালীকে ঘর করতে হয়েছে। এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছে দরিদ্র মানুষ। ক্ষুধার অন্ন, তৃষ্ণার জল সাধারণ দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যেত। লেখক বলেছেন: "শিবচরণবাবুর খিড়কির পুকুরে যা-একটু জল আছে তাহা সাধারণে পায় না। অন্যান্য জলাশয়ের মাঝখানে দু-একটা গর্ত খুঁড়িয়া যাহা কিছু জল সঞ্চিত হয় তাহাতে যেমন কাড়াকাড়ি তেমনি ভিড়।"

দেশে তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসানের পর মহারানী ভিক্টোরিয়ার

রাজত্বকাল শুরু হয়েছে। কিন্তু জমিদারশ্রেণীই ছিলেন পল্লীগ্রামে প্রকৃত রাজা। তাঁরা দরিদ্র প্রজার বাড়িতে পেয়াদা পাঠিয়ে জোর করে কাছারিতে ধরে নিয়ে যেতেন, সেখানে চলত দুর্বল নিরন্ন মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার। 'মহেশ' গল্পে দুর্বলের উপর উচ্চ শ্রেণীর সবল মানুষের অকথ্য অত্যাচারের কাহিনী সহানুভূতির সঙ্গে চিহ্নিত হয়েছে।

২। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের নায়ক কে? যুক্তি সহ আলোচনা কর।

উত্তর। সাধারণত গল্প-উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রকেই বলা হয় নায়ক। অনেক সময় লেখক মুখ্য চরিত্র অপেক্ষা কোনো গৌণ চরিত্রকেই রচনায় বেশি গুরুত্ব দেন, যখন সেই গৌণ চরিত্র লেখকের জীবনদর্শন প্রচারের বাণীমূর্তি হয়ে ওঠে। কোনো রচনায় নায়ক হবার যোগ্যতা সেই চরিত্রেরই প্রাপ্য যে-চরিত্র ভয়ঙ্কর কিছু করে এবং সেই কৃতকর্মের ফল নিজেই ভোগ করে। নানান্ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই সব চরিত্র পাঠকের সহানুভূতি থেকে কখনই বঞ্চিত হয় না।

তা হলে দেখা যাচ্ছে, নায়ক হবার জন্যে কেবল কেন্দ্রীয় বা মুখ্য চরিত্রই যথেষ্ট নয়; নায়ক হবার দাবি কেবল তারই যে লেখকের জীবনদর্শনের মুখপাত্র হবে, অথবা এমন কিছু করবে যে-কাজের ফলভোগ তার পক্ষে অনিবার্য হয়ে উঠবে।

উদাহরণ হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাস এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের 'সাজাহান' নাটকের কথা বলা যায়। চন্দ্রশেখরে প্রতাপ এবং সাজাহানে ঔরংজীব যথাক্রমে চন্দ্রশেখর এবং সাজাহান অপেক্ষা অনেক বেশি সক্রিয়। তথাপি এই চরিত্র দুটি নায়ক নয়। নায়ক হল চন্দ্রশেখর এবং সাজাহান।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের নায়ক বিচার। আলোচ্য গল্পের মুখ্য চরিত্র গফুর জোলা। কিন্তু গফুরের নামে গল্পের নামকরণ করা হয় নি, নামকরণ করা হয়েছে গফুরের প্রাণ-প্রিয় পুত্রপ্রতিম একটি ষাঁড়ের নামে। গফুর আদর করে তার প্রিয় ষাঁড়ের নাম রেখেছিল মহেশ। এই মহেশের নামেই গল্পের নাম হয়েছে 'মহেশ'।

গফুর-চরিত্রের সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা ছিল বুড়ো বলদের প্রতি তার পুত্রবৎ স্নেহ। গফুর বলেছে, "মহেশ, তুই আমাদের ছেলে, তুই আমাদের আট সন প্রতিপালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারিনে—কিন্তু তুই ত জানিস তোকে আমি কত ভালবাসি।"

মহেশের প্রতি পুত্রবৎ স্নেহই তাকে গোহাটায় বেচার পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু পর পর কয়েক বছর অজন্মাজনিত অসহনীয় দারিদ্র্য এবং নিষ্ঠুর সমাজ ও জমিদারের অত্যাচার ধীরে ধীরে গফুরকে মহেশ-হত্যার দিকেই চালিত করেছে। কিন্তু গল্পের প্রথম থেকে আমরা দেখেছি মহেশকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে গফুর নানাভাবে চেষ্টা করে গেছে। ঘরের চাল থেকে সে তাকে খড় পেড়ে খাইয়েছে, নিজের মুখের

ভাত ধরে দিয়েছে মহেশের মুখে। একমাত্র ভাত খাবার থালাটি বন্ধক দিয়ে মহেশকে ছাড়িয়ে এনেছে দরিয়াপুরের খোঁয়াড় থেকে। দু'কাহন খড়ের জন্যে তর্করত্নের সামনে নতজানু হতেও সে লজ্জিত হয় নি। কসাইয়ের হাতে মহেশকে তুলে দিতে গিয়েও শেষ মুহূর্তে প্রবল স্নেহে সে কাজে বিরত হয়েছে।

এত করেও গফুর জোলা মহেশকে বাঁচাতে পারে নি। নিষ্ঠুর সমাজ এবং হৃদয়হীন জমিদারের অত্যাচার তাকে মহেশহত্যায় প্ররোচিত করেছে। অবশেষে কোনো এক দুর্বিষহ যন্ত্রণার মুহূর্তে গফুর নিজের হাতেই "মেরামত করিবার জন্য কাল সে তাহার লাঙ্গলের মাথাটা খুলিয়া রাখিয়াছিল, তাহাই দুই হাতে গ্রহণ করিয়া সে মহেশের অবনত মাথার উপরে সজোরে আঘাত করিল।"

মহেশের মৃত্যুতে গফুরের সমস্ত জীবনটা এলোমেলো হয়ে যায়। সে গৃহত্যাগ করে চলে যায় ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে। মহেশের মৃত্যু এক মর্মান্তিক বেদনাময় ঘটনা সন্দেহ নেই। কিন্তু এই মৃত্যুজনিত বেদনা গফুরের বুকেই বজ্রের মতো আঘাত হানে। তাই গৃহত্যাগ করে যাবার আগে সে আল্লার কাছে চোখের জলে প্রার্থনা জানায়—"আল্লা, আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"

গফুর নিজের কৃতকর্মের ফল নিজেই ভোগ করেছে। মহেশ-হত্যার বেদনাই তাকে গৃহত্যাগ করিয়েছে। "ধর্ম থাকে না, মেয়েদের ইজ্জত আব্রু থাকে না" জেনেও সে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে গেছে। অর্থাৎ মহেশের মৃত্যুতে ট্র্যাজেডি ঘটেছে একমাত্র গফুরের জীবনে। তাই 'মহেশ' গল্পের নায়ক অন্য কেউ নয়, গফুর জোলা।

৩। "পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হইয়া গেল, তাহা এই দুটি প্রাণী ছাড়া আরও একজন বোধ করি অন্তরীক্ষে থাকিয়া লক্ষ্য করিলেন।"

—'পিতা ও কন্যা' কে? ছলনার অভিনয় কী? কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা বলা হয়েছে?

উত্তর। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের নায়ক গফুর হল 'পিতা' এবং তার দশ বছরের মেয়ে আমিনাকে এখানে 'কন্যা' বলা হয়েছে।

গফুরের বলদের নাম ছিল মহেশ। গফুর মহেশকে নিজের সন্তান বলেই মনে করত। কারণ মহেশ তাকে আট সন চাষের কাজে সাহায্য করে বুড়ো হয়েছে। কিন্তু দরিদ্র গফুর পর পর কয়েক সন অজন্মায় আরও দরিদ্র ও নিঃস্ব হয়ে পড়ায় মহেশকে পেট পুরে খাওয়াতে পারত না। দেশের জমিদার শ্মশানের ধারে গোচরটা পয়সার লোভে জমাবিলি করে দেয়, গো-সেবা যাদের ধর্ম সেই তর্করত্নও চার-চারটে গাদার মালিক হলেও কাহন দুই খড় ধার দিতে চান না। ফলে অসহায় গফুর মহেশের মুখে কিছু দিতে না পেরে নিজের ঘরের চাল থেকে খড় টেনে খাওয়ায় এবং অবশেষে নিজের মুখের ভাত

তার সামনে ধরে দেবার এক কৌশল আবিষ্কার করে মেয়ের সঙ্গে ছলনার অভিনয় করে।

আমিনা গফুরকে ভাত খেতে ডাকলে গফুর বলে, "আমার গায়ে যে আবার শীত করে মা, জ্বর গায়ে ভাত খাওয়া কি ভাল" ?

এরপর গফুর তার বাড়া ভাত মহেশকে ধরে দেবার প্রস্তাব করে যেন একটা সমস্যা সমাধানের ভঙ্গিতে বলে ওঠে, "রাতের বেলা আমাকে এক মুঠো ফুটিয়ে দিতে পারবি নে আমিনা ?"

আমিনা পাছে গফুরের মিথ্যে জ্বরের অভিনয় ধরে ফেলে তাই সে আসন্ন জ্বরকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে রাতের বেলা গরম ভাত খেতে চেয়েছে। আমিনা গফুরের ছলনা বা অভিনয় ধরে ফেলে, এবং সে বুঝতে পারে ক্ষুধার্ত মহেশকে খাওয়ানোর জন্যেই পিতার এই ছলনা বা জ্বরের অভিনয়। কিন্তু গফুরকে লজ্জার হাত থেকে বাঁচাবার জন্যে সেও পাল্টা অভিনয় করে না বোঝার ভান করে। লেখক গফুর ও আমিনার এই ছলনাকেই পিতা ও কন্যার মাঝখানে ছলনার অভিনয় বলে উল্লেখ করেছেন।

৪। "মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়। খাজনা দিয়ে বাস করি, আমি যাবো না"।

—কে কোন্ প্রসঙ্গে এ কথা বলেছিল? বক্তার এই উক্তির মাধ্যমে দেশের যে সামাজিক অবস্থার ইঙ্গিত পাওয়া যায় তা আলোচনা কর।

উত্তর। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের নায়ক গফুরের উক্তি। মহেশ ছিল গফুরের পুত্রপ্রতিম এক বলদ, যে চাষের কাজে কৃষক গফুরকে সাহায্য করে বুড়ো হয়েছিল। কিন্তু পর পর কয়েক বছর অজন্মার দরুন অসহায় গফুর এই ষাঁড়টিকে দু'বেলা পেটপুরে খাওয়াতে পারত না। ফলে খিদের জ্বালায় মহেশ প্রায়ই দড়ি ছিঁড়ে পরের বাগানে ঢুকে গাছপালা নষ্ট করত। একবার জমিদারের বাগানে ঢুকে মহেশ বাগানের গাছপালা নষ্ট করে এবং জমিদারকন্যাকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যায়।

সেদিন রোগজীর্ণ গফুর পরের দ্বারে জনমজুরির আশায় ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হয়ে দ্বিপ্রহর বেলায় ঘরে এসে আমিনার কাছে খেতে চায়। কিন্তু সেদিন কন্যার কাছে ক্ষুধার অন্ন এবং তৃষ্ণার জল না পেয়ে তার সংযমের সব বাঁধ ভেঙে পড়ে, তখন সে মেয়ের গালে চড় মেরে বলে "মুখপোড়া হারামজাদা মেয়ে, সারাদিন তুই করিস কি ? এত লোক মরে তুই মরিস নে!"

আমিনা ছিল দরিদ্র গফুরের নয়নের মণি। মাতৃহীনা এই মেয়েটিকে অনেক কষ্টে অনেক যত্নে সে এত বড়োটি করেছে। আজ সেই মমতাময়ী কন্যাটির গায়ে হাত তুলে যখন সে ক্ষুধাতৃষ্ণা ভুলে অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিল ঠিক তখনই জমিদারের পেয়াদা এসে তাকে সদরে যাবার জন্যে জমিদারের হুকুম জানায়, এবং এ কথাও বলে, "বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।" এই কথার উত্তরে গফুর আলোচ্য মন্তব্য করেছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসানে আমাদের দেশে তখন মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব শুরু হয়। মহারানীর রাজত্বকালে আগের চেয়ে কিছুটা আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণ মানুষের মনে একটা নিশ্চিত বিশ্বাস সৃষ্টি হয় যে, মহারানীর রাজত্বে কেউ কারও গোলাম নয়। কিন্তু কার্যত দেশের জমিদারই ছিল দেশের প্রকৃত শাসনকর্তা। তাদের জোরজুলুম এবং অত্যাচারে প্রজারা অতিষ্ঠ হয়ে উঠত। অত্যাচারী জমিদারের বিরুদ্ধাচরণ করার শক্তি সমাজে কারও ছিল না। যদিও প্রজাদের অসন্তোষ ধীরে ধীরে দানা বেঁধে উঠতে শুরু করেছিল কিন্তু সেই অসন্তোষ তখনও প্রচণ্ড বিক্ষোভরূপে আত্মপ্রকাশ করে নি।

৫। "মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে। তার চরে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয় নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"

—এই উক্তি কার? কোন্ প্রসঙ্গে সে এই কথাগুলি বলেছিল? এই উক্তির মাধ্যমে সমাজের যে-ছবি প্রকাশিত হয়েছে তাকে তোমার নিজের ভাষায় রূপ দাও।

উত্তর। এটি শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পের নায়ক গফুরের উক্তি। গফুরের পুত্রপ্রতিম এক ষাঁড়ের নাম ছিল মহেশ। মহেশ আট বছর গফুর জোলাকে চাষের কাজে সাহায্য করে বুড়ো হয়েছে। কিন্তু দরিদ্র গফুর মহেশকে পেটপুরে খেতে দিতে পারত না। পেটের জ্বালায় মহেশ দড়ি ছিঁড়ে প্রতিবেশীর বাগানের গাছপালা নষ্ট করত, ফলে শাস্তি-স্বরূপ মহেশকে খোঁয়াড়ে যেতে হয়েছে। স্নেহকাতর গফুর তার ভাত খাবার পাত্র বন্ধক দিয়ে মহেশকে ছাড়িয়ে এনেছে।

আলোচ্য গল্পে দেখি নানাভাবে মহেশকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করেছে গফুর। কিন্তু চারটে গাদার মালিক হওয়া সত্ত্বেও তর্করত্ন তাকে দু-কাহন খড় ধার দিতে রাজি হন নি। জমিদার তার প্রাপ্য ধান ও খড় কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়েছেন, পয়সার লোভে গ্রামের গোচরটা জমাবিলি করে দিয়েছেন। অবশেষে মহেশকে বাঁচিয়ে রাখার আর কোনো উপায় না দেখে গফুর তাকে কসাইয়ের হাতেই তুলে দিতে গেছে। কিন্তু শেষ মুহূর্তে সে মহেশকে বিক্রি করতে পারে নি।

কিন্তু একদিন রোগশীর্ণ অনাহারক্লিষ্ট গফুরের জীবনে এমন কতগুলি ঘটনা ঘটে যার ফলে সে নিজের হাতেই মহেশকে হত্যা করে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করবার জন্যে গৃহত্যাগ করে যায়। অন্ধকার গভীর নিশীথে মেয়ের হাত ধরে আঙিনার পারে এসে গফুর সহসা কান্নায় ভেঙে পড়ে। আলোচ্য উক্তি আল্লার উদ্দেশে গফুরের ফরিয়াদ।

আলোচ্য উক্তির মাধ্যমে ব্রাহ্মণশাসিত সমাজের অবহেলিত দরিদ্র মানুষের বেদনার ছবি মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমাজের ধর্মধ্বজী ভণ্ড মানুষের দল মুখেই গো-সেবার বাণী শোনায়, কিন্তু তাদের লোভের আগুনে পুড়ে ছাই হয় অসহায় পশু আর দরিদ্র মানুষ।

ধনী জমিদার পয়সার লোভে গ্রামের গো-চর জমাবিলি করে দেয়। খরার কালে পানীয় জল থাকে সাধারণ মানুষের আয়ত্তের বাইরে। প্রজাদের রক্ষা করার বদলে তাদের শোষণ করাই ছিল জমিদারশ্রেণীর একমাত্র কাজ। ধর্মভীরু সাধারণ মানুষ সেদিন সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে শেখে নি, তাই ঈশ্বর বা আল্লার কাছে তারা কেবল চোখের জলে মর্মবেদনা জানিয়ে গেছে।

৬। "শুধু নির্নিমেষ চক্ষে আর একজোড়া নিমেষহীন গভীর কালো চক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।"—প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলোচ্য অংশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। আলোচ্য অংশটি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'মহেশ' গল্প থেকে গৃহীত। দুর্বিষহ মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করার পর উত্তেজিত গফুর নিজের হাতেই পুত্রপ্রতিম মহেশ-নামে ষাঁড়কে হত্যা করে। মহেশের মৃত্যুর পর লেখক গফুরের ভাষাহীন গভীর বেদনার ছবি আলোচ্য অংশে মমতার সঙ্গে চিত্রিত করেছেন।

মহেশ ছিল গফুরের প্রাণ, কিন্তু দরিদ্র গফুর পর পর কয়েক সন অজন্মা এবং নিষ্ঠুর সমাজের অত্যাচারে এই উপকারী প্রাণীটিকে দুবেলা পেটপূরে খাওয়াতে পারে নি। সমাজপতি থেকে জমিদার পর্যন্ত সকলেই মুখে গো-সেবার মাহাত্ম্য কীর্তন করেছেন, কিন্তু কেউ মহেশকে বাঁচিয়ে রাখতে বিন্দুমাত্র দাক্ষিণ্য প্রদর্শন করেন নি। উপরন্তু দরিদ্র মুসলমান এই মানুষটির উপর গ্রামের জমিদার অকথ্য অত্যাচার চালিয়ে তার মানসিক ভারসাম্য নষ্ট করে দেয়। ফলে দুর্বিষহ উত্তেজনায় প্রাণপ্রিয় মহেশকে গফুর নিজের হাতে হত্যা করে।

লাঙলের ফাল দিয়ে মহেশের মাথায় আঘাত করার পর কন্যা আমিনা গফুরকে সচেতন করে দিয়ে বলেছিল—"কি করলে বাবা, আমাদের মহেশ যে মরে গেল!" এ কথার উত্তরে গফুর কোনো জবাব দিতে পারে নি। কারণ তার বেদনার পাষাণ-ভারে সে যেন মূকবধির হয়ে গিয়েছিল। গফুর কোনো কথাই বলতে পারে নি, কারণ গভীর ব্যথার কোনো ভাষা নেই। কেবল পলকহীন চোখে মহেশের চোখের দিকে তাকিয়ে সে নীরব ভাষায় তার গভীর বেদনাই প্রকাশ করেছে। বেদনার এই নিঃশব্দ অনুভূতি কখনই প্রকাশ করা যায় না। দরদী কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র এইজন্যেই গফুরের মুখে কোনো ব্যথা-বেদনার কথা সংযোজিত না করে বেদনার এক অব্যক্ত করুণ ছবি এঁকেছেন।

অনুশীলনী

১। ছোটোগল্প-লেখক হিসাবে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের স্থান নির্ণয় করো।
২। 'মহেশ' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার করো।
৩। 'মহেশ' গল্পের নায়ক কে, যুক্তিসহ বিচার করো।
৪। 'মহেশ' গল্পে তৎকালীন পল্লীবাংলার যে সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে তার বিস্তারিত পরিচয় দাও।

৫। চরিত্র আলোচনা করো :
গফুর, শিবচরণ, তর্করত্ন, আমিনা।

৬। 'মহেশ' গল্পে পিতা ও কন্যার মাঝখানে কী ছলনার অভিনয় হয়েছিল? এই অভিনয়ের প্রয়োজন হল কেন? এ প্রসঙ্গে গফুর-চরিত্র আলোচনা করো।

৭। 'মহারাণীর রাজত্বে কেউ কারো গোলাম নয়।'—বক্তা কে? মহারানী কে? বক্তা কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলে? এই মন্তব্যের পরিণতি কী হয় আলোচনা করো।

৮। 'একজোড়া নিমেষহীন গভীর কালো চোখের পানে চাহিয়া পাথরের মতো নিশ্চল হইয়া রহিল'।—প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলোচ্য অংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করো।

৯। 'মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেচে'।—কখন বক্তা এই কথা বলেছে? মহেশের মৃত্যুর জন্যে তুমি কাকে দায়ী বলে মনে কর?

১০। কী কারণে গফুর জোলা তেষ্টার জল পায় নি? এ প্রসঙ্গে পল্লী অঞ্চলের সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করো।

১১। গফুরের পশুপ্রীতির পরিচয় দাও।

১২। নিজের সন্তানতুল্য মহেশকে গফুর কী কারণে হত্যা করল?—মহেশ-হত্যার সময় তার মানসিক অবস্থা কেমন ছিল? সংক্ষেপে আলোচনা করো।

১৩। কোন্ পরিস্থিতিতে গফুর ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে গেল? গ্রাম ত্যাগ করে যাবার দৃশ্যটি বর্ণনা করো।

১৪। গফুর ও তর্করত্নের কথোপকথন আলোচনা করো। এই কথোপকথনের মাধ্যমে তর্করত্নের চরিত্রের যে পরিচয় পাওয়া যায় তা সংক্ষেপে আলোচনা করো।

———

পাশফেল

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জীবন ও সাহিত্য : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আসল নাম প্রবোধকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়। সাঁওতাল পরগণার ডুমকা শহরে ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের ১৯-শে মে মঙ্গলবার তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আদি নিবাস ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের মালবদিয়া গ্রামে। পিতার নাম ছিল হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায়।

হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারী চাকরি করতেন। বাবার সঙ্গে বাঙ্‌লা ও বিহারের বহু অঞ্চলে তাঁর বাল্যকাল কেটেছে। বাঁকুড়ার ওয়েসলিয়ন মিশন কলেজ থেকে আই. এস. সি. পাশ করে তিনি গণিতশাস্ত্রে অনার্স নিয়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হন।

বি. এস. সি. পড়ার সময় মাত্র কুড়ি বছর বয়সে পূর্বপ্রস্তুতি ছাড়াই তিনি বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে সাহিত্যে আসেন। প্রথম রচনা 'অতসীমামী' ১৩৩৫ সালের পৌষ সংখ্যায় সে যুগের বিখ্যাত 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত হয়। এই মনভোলানো উচ্ছ্বাসময় গল্পেই তিনি পাঠকের স্বীকৃতি পেয়ে গেলেন। অতসীমামী গল্পটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে প্রকাশিত হয়। 'মানিক' ছিল তাঁর ডাকনাম। কিন্তু প্রথম গল্প থেকেই মানিক নামটি স্মরণীয় হয়ে গেল, হারিয়ে গেল তাঁর আসল নাম প্রবোধ-কুমার।

মানিকবাবুর কলেজী শিক্ষা বেশিদূর অগ্রসর হয় নি। আর কলেজীয় শিক্ষার উৎসাহে ভাঁটা পড়ায় অভিভাবকেরা তাঁর প্রতি উদাসীন হয়ে পড়েন। ফলে শুরু হয় দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম। কেবল সাহিত্য করেই তাঁকে সংসার চালাতে হত। সেই অর্থে মানিকবাবু ছিলেন পেশাদার সাহিত্যিক। সংসারের প্রয়োজনে তাঁকে কঠোর পরিশ্রম করতে হত, লিখতে হত প্রচুর। ফলে অল্পবয়সেই তিনি মৃগীরোগে আক্রান্ত হন, তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। তিনি নিজেই এক জায়গায় লিখেছেন—

"প্রথম দিকে 'পুতুল নাচের ইতিকথা' প্রভৃতি কয়েকখানি বই লিখতে গিয়ে যখন আমি নিজেও ভুলে গিয়েছিলাম যে আমার একটা শরীর আছে এবং পরিবারের মানুষরাও নিষ্ঠুরভাবে উদাসীন হয়ে গিয়েছিল তখন একদিন হঠাৎ আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ি।"

মানিকবাবু কিছুদিন 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় সম্পাদকের কাজ করেছেন কিন্তু কোনোদিন সাংবাদিক হতে পারেন নি। তিনি ছিলেন জাত লেখক আর সেই জন্যেই দুবছরের বেশি সম্পাদকের চাকরি করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি।

শরৎচন্দ্র এবং কল্লোল যুগের পর মানিকবাবু তাঁর সাহিত্যে এক নব বাস্তবতার স্বৃষ্টি করেন। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বকে তিনিই যথার্থ জীবনবোধের সঙ্গে যুক্ত করে বিভিন্ন সমাজের নানা পরিপ্রেক্ষিকায় রূপদান করেছেন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি ফ্রয়েডীয় প্রভাব কাটিয়ে মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। জীবনশিল্পী মানিকবাবু বুঝেছিলেন যৌনক্ষুধার সঙ্গে উদরপূরণের সমস্যা মানব আচরণের নিয়ামক। তাই অর্থনৈতিক বাস্তবতাবোধ মানিকবাবুকে সাম্যবাদী চেতনার দিকে নিয়ে গেছে।

উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ : অতসীমামী ও অন্যান্য গল্প (১৯৩৫), পুতুলনাচের ইতিকথা (১৯৩৬), পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬), প্রাগৈতিহাসিক (১৯৩৭), অমৃতস্য পুত্রাঃ (১৯৩৮), মিহি মোটা কাহিনী (১৯৩৮), সরীসৃপ (১৯৩৯), সহরতলী (১৯৪০), প্রতিবিম্ব (১৯৪৩), চতুষ্কোণ (১৯৪৮), হরফ (১৯৫৫), মাশুল (১৯৫৬)।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে তিনি যে নানামুখী বৈচিত্র্য ও আশ্চর্য মৌলিকতা দেখিয়েছেন তার ফলে তিনি আধুনিক ঔপন্যাসিকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী হয়েছেন।

আধুনিক যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ এই কথাশিল্পী অপরিণত বয়সে ১৯৫৬ খ্রীঃ ৩রা ডিসেম্বর কলকাতায় পরলোক গমন করেন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্প :

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটোগল্পগুলির মধ্যে প্রেম, দাম্পত্যসম্পর্ক এবং পারিবারিক জীবনের নানান দিক ও ব্যক্তিগত সমস্যার ছবি অঙ্কিত হয়েছে।

'নেকী', 'শিপ্রার অপমৃত্যু', 'সর্পিল', 'মহাকালের জটার জট', 'বিষাক্ত প্রেম', 'শৈলজ শিলা', 'খুকী' প্রভৃতি গল্পে প্রেমের বিচিত্র লীলা প্রকাশিত।

'নেকী' গল্পটি মানিকবাবুর প্রথমদিকের রচনা। তাই এই গল্পের গঠনরীতি দুর্বল। 'শিপ্রার অপমৃত্যু' গল্পে এক বিগতযৌবনা শিক্ষয়িত্রীর দুঃসাহসিক কৌশলজাল বিস্তারের কাহিনী আছে। 'সর্পিল' গল্পে দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে অসুস্থ মানসিকতা ও তৎকারণ হিংসার ভয়াবহ ছবি ফুটে উঠেছে। মানিকবাবুর বহু উপন্যাসের মৌলিক বীজ যেন এক গল্পে নিহিত আছে। 'মহাকালের জটার জট', 'বিষাক্ত প্রেম', 'সরীসৃপ', 'শৈলজ শিলা' এবং 'খুকী' গল্পে অবৈধ প্রেমভাবনার সঙ্গে উচ্চাঙ্গের মনস্তত্ত্ব কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

'আগন্তুক', 'প্রকৃতি' প্রভৃতি গল্পে সংসারযাত্রার জটিল ঘাত-প্রতিঘাতের ছবি বর্ণিত হয়েছে। জীবনজগৎ সম্বন্ধে মানুষের একটা সাধারণ ভাসা ভাসা জ্ঞান থাকে। লেখক এইসব গল্পে পূর্বধারণার সূত্র ধরে, "ঈষৎ-বেদনা-স্পৃষ্ট বিপর্যয়ের কাহিনী বিবৃত" করেছেন। 'আগন্তুক' গল্পে দীর্ঘ প্রবাসের পর ঘরে ফিরে মুকুল তার পরিবারের সানন্দ অভ্যর্থনার মধ্যে কৃত্রিমতা ও স্বার্থপরতার অভিব্যক্তিই লক্ষ করেছে। 'প্রকৃতি' গল্পের সমস্যা আরও জটিল। ধনী-দরিদ্র উভয়কে পরিত্যাগ করে নায়ক মধ্যবিত্ত জীবনকে আশ্রয় করতে চেয়ে শেষ পর্যন্ত আবার আভিজাত্যের দুর্গেই আশ্রয় নিয়েছে।

'ফাঁসি' মানিকবাবুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প। ফাঁসির আসামী মুক্তি পেলে স্বাভাবিক কারণেই তার মনে একটা বিভ্রান্তির আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। এই গল্পে সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত গণপতির মানস বিপর্যয়ের স্তরগুলি খুব সূক্ষ্মভাবে আলোচিত হয়েছে।

'আত্মহত্যার অধিকার' গল্পে প্রাকৃতিক কারণে জীর্ণ আশ্রয় ত্যাগ করতে বাধ্য বিকলাঙ্গ নীলমণির মানসিক অবস্থা, তার অভিমানভরা ক্রোধ, স্ত্রী ও কন্যার ভৎর্সনা-পূর্ণ দৃষ্টিতে অস্বস্তি আর সকলের বিরুদ্ধে অসহায় আক্রোশ সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। পারিবারিক জীবন বর্জন করে দেশের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য নারীর যে দাবি সাধারণত সংবাদপত্রে আর রাজনৈতিক বক্তৃতায় সমর্থিত হয়, "লেখক সেই অতি সাধারণ বিতর্কটিকে মানস পরিণতির অনেক উচ্চতর স্তরে উন্নীত করিয়াছেন" তাঁর 'বৃহত্তর ও মহত্তর' গল্পে।

'ভয়ঙ্কর' গল্পে মানবমনের এক নতুন প্রতিক্রিয়ার দ্বার উদ্ঘাটিত। এখানে ভয়ের চাপে এক দুর্বল পরমুখাপেক্ষী মানুষের ভয় বা মোহ কেটে গিয়ে তার মধ্যে কেমন করে আত্মনির্ভরতার উন্মেষ ঘটেছে তারই চমকপ্রদ আবিষ্কারের কাহিনী বিবৃত হয়েছে। নায়ক প্রসাদের বিস্ময়কর পরিবর্তনের মাধ্যমে মানবজীবনের এক নিগূঢ় সত্যের আভাস পাওয়া যায় বলেই গল্পটি সার্থক শিল্প। 'রোমান্স', 'ধনজনযৌবন' 'মুখেভাত'—তিনটি গল্পে রোমান্স বা আবেগহীন স্থূল ব্যাভিচারের গ্লানিকর চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। 'মেয়ে', 'দিশেহারা হরিণী', 'স্বজনে দেহ প্রাণ', 'যে বাঁচায়', 'বাস', 'স্বামীস্ত্রী' —প্রভৃতি গল্পে মানিকবাবু নানামুখী বৈচিত্র্য এবং আশ্চর্য মৌলিকতা দেখিয়েছেন।

উপন্যাসের মতো ছোটোগল্পেও মানিকবাবু যে-বৈচিত্র্য এবং মৌলিকতা সৃষ্টি করেছেন তারই শক্তিতে অবাস্তবতা এবং যৌনবিষয়ের প্রতি অতি পক্ষপাত সত্ত্বেও তাঁকে আধুনিক ছোটোগল্প লেখকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসনের অধিকারী করেছে।

ছোটোগল্প হিসাবে 'পাশফেল' গল্পের সার্থকতা বিচার ঃ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' ছোটোগল্প হিসাবে কতখানি সার্থকতা অর্জন করেছে তা বিচার করার আগে সংক্ষেপে ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্য আলোচনার প্রয়োজন। ছোটোগল্প কী এক কথায় তার উত্তর দেওয়া যায় না। কেউ কেউ বলেন, ছোটোগল্প ছোটোও বটে আবার গল্পও বটে। একাগ্রতা আর একমুখীনতাকে এর প্রধান বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়।

বিশ্বের বিপুল ঘটনাপুঞ্জের মধ্যে ছোটোগল্প চোরালণ্ঠনের আলোয় এমন একটি অংশকে উদ্ভাসিত করে যার মাধ্যমে আমরা পূর্ণাংশের আস্বাদ লাভ করি। সেই কারণে ছোটোগল্পের সঙ্গে উপন্যাসের আকৃতি ও প্রকৃতিতে কোনো মিল নেই, মিল আছে গীতি-কবিতার সঙ্গে। গীতি-কবিতাই ছোটোগল্পের নিকট-আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় ছোটোগল্পের বৈশিষ্ট্যটি ফুটে উঠেছে—

"ছোটো প্রাণ ছোটো ব্যথা ছোটো ছোটো দুঃখ কথা
নিতান্তই সহজ সরল;

সহস্র বিস্মৃতি রাশি প্রত্যহ যেতেছে ভাসি
তারি দু চারিটি অশ্রুজল।"

ছোটোগল্পে বর্ণনার বাড়াবাড়ি থাকবে না, কোনো তত্ত্ব প্রচারের বা উপদেশ দেবার আগ্রহও থাকবে না। গল্পের আরম্ভ হবে আকস্মিক এবং সমাপ্তিও হবে আকস্মিক। আকস্মিক ঘটনার সংঘাতে গল্প যেমন হঠাৎ শেষ হবে, কিন্তু শেষ হবার পরেও পাঠকের মনের মধ্যে একটা অতৃপ্তির রেশ থেকে যাবে। মোটামুটি এই হল ছোটোগল্পের লক্ষণ।

ছোটোগল্পের একটা বড়ো লক্ষণ গল্প হঠাৎ আরম্ভ হয়ে যাবে এবং সমাপ্তিতে থাকবে নাটকীয়তা, যাকে বলে চমক। আমাদের আলোচ্য 'পাশফেল' গল্পের মধ্যেও আমরা ছোটোগল্পের এই বৈশিষ্ট্যকে খুঁজে পাই। 'পাশফেল' গল্পটি আদর্শ ছোটোগল্পের মতোই হঠাৎ আরম্ভ হয়ে গেছে। উপন্যাসের মতো এর কোনো ভূমিকা নেই। অনাড়ম্বর ভাষায় অতি সাধারণ ভাবে লেখক শুরু করেছেন—"খবরের কাগজে খবর বেরিয়েছে যে, একটি ছেলে আত্মহত্যা করার জন্যে বিষ খেয়েছিল, এখন সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে আছে।"

গল্পের শুরুতে দেখি না আছে "বর্ণনার ছটা"। সাধারণ অনাড়ম্বর ভাষায় গল্প আরম্ভ হয়ে ঘটনার ধারা নিজস্ব গতিতে দ্রুত অগ্রসর হয়ে চলেছে।

ছোটোগল্পের আর একটা বৈশিষ্ট্য হল তার একমুখী গতি। 'পাশফেল' গল্পেও তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

'পাশফেল' গল্পের কাহিনীতেই পাই, আই. এ. পরীক্ষার ফলাফল জানতে যায় নীরেন আর বিমল নামে দুই তরুণ। এক কলেজের ছাত্র না হলেও তারা এক পাড়ার ছেলে। লেখাপড়ায় নীরেন খুব ভালো ছাত্র আর বিমল খুবই সাধারণ। লেখকের ভাষায় "পাশের কৃতিত্বে অনেক তারতম্য ছিল দু'জনের। নীরেন খুব ভালোভাবে পাশ করেছিল। বিমলের ফলটা সেরকম হয় নি।

এবার আই. এ. পরীক্ষার পাশের হার শুনে দুজনেরই মনে দুশ্চিন্তা ছিল। পথে যেতে যেতে বিমল জানিয়েছিল এবার পাশ করতে না পারলে তার আর পড়া হবে না। ব্যাপারটা এতক্ষণ খেয়াল হয় নি নীরেনের। বিমল ফেল করলে একসঙ্গে বাড়ি ফিরতে কী বিশ্রী লাগবে তার, নিজের পাশের খবর জেনেও খুশি হবার উপায় থাকবে না।

শেষ পর্যন্ত দেখা যায় অনুমান মিথ্যে হয় নি। নীরেন ভালোভাবে পাশ করেছে আর বিমল পাশ করতে পারে নি। বিমলের অনুরোধে নীরেনকে তাদের বাড়িতে যেতে হয়, সেখানে বহু প্রশ্ন বহু উৎকণ্ঠা সে এক অস্বস্তিকর পরিবেশ। এর মধ্যেই বিমলের দিদি পরিবেশ সহজ করে দিয়ে বলেছে—"খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু বলে রাখলাম।" বিমলের অসুস্থ বাবা তার ফেলের ব্যাপারটাকে বিশেষ কোনো গুরুত্ব না দিয়ে বললেন—"বিমল ফেল করেছিস তো? বেশ করেছিস!"

নীরেন সবচেয়ে বেশি বিস্মিত হয়েছে নিজের বাড়িতে এসে। বাবার সহকর্মী

তার পাশের খবর শুনে খুশি হলেও বাবার ব্যবহারে সে মর্মাহত হয়। বিমল ফেল করেছে শুনে ভদ্রলোক মন্তব্য করেন—"পাশ করেই বা কী করত।"

নীরেন বাবার কথা শুনে অবাক হয়। অথচ তাকে পড়ানোর জন্যে তিনি গায়ের রক্ত জল করেছেন, স্ত্রীর গয়না বন্ধক দিয়েছেন, বাজারে দেনা করেছেন। বাবার কাছে যোগ্য অভিনন্দন না পেয়ে নীরেন ক্ষুণ্ণ মনে বাড়ির ভেতরে যায়। সেখানে যোগ্য সমাদর হয় ঠিক দিগ্‌বিজয়ী বীরের মতো।

বাবার কাছে অনাদরের বেদনা তার ভাই-বোন এবং দোতলার ভাড়াটের কন্যা বকুল এসে ভুলিয়ে দেয়। আশা আর স্বপ্নে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে নীরেনের মন।

ভালোভাবে বি. এ. পড়ার স্বপ্ন দেখে নীরেন। কত আলোচনা হয় বকুলের সঙ্গে। বকুলের চোখে নীরেন ছিল আদর্শ ছাত্র। তাই সে হাসিমুখে নীরেনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলে, "ছুঁয়ে দাও, পাশের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দাও। ছোঁয়া লেগে আমিও যদি উত্‌রে যাই।"

আত্মীয়স্বজনদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে অভিনন্দন আর পুজো আদায় করে আরও কয়েকটা দিন কাটে। দিন তিনেক পরে নীরেনের বাবা প্রাণেশবাবু ছেলেকে ডেকে বলেন, তার একার পক্ষে আর সংসার চালানো সম্ভব হচ্ছে না—নীরেনকেও এবার থেকে কিছু করতে হবে। প্রাণেশ বলেন বিমল চাকরির চেষ্টা করছে, তোমারও এবার রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে, নইলে আর চলে না।

নীরেনের ভবিষ্যৎ জগৎ অন্ধকার হয়ে যায়, বাস্তবের আঘাতে ছিন্ন হয় রঙীন স্বপ্ন।

সব শুনে বকুল বলেছিল, তবে কী হবে?

এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়েই যেন নীরেন রাত্রে বিষ খায়। নীরেনের বিষ খাওয়ার সংবাদটাই কেবল কাগজে ছিল, কিন্তু তার ভালোভাবে পাশ করার সংবাদটা "খবরে লেখা ছিল না।"

এই হল সংক্ষেপে 'পাশফেল' গল্পের ঘটনা। হঠাৎ যেমন এ গল্প শুরু হয়েছে, তেমনি এক নাটকীয় চমকের মধ্যে দিয়ে গল্পটি সমাপ্ত হয়েছে। কোনো উপকাহিনী বা অপ্রাসঙ্গিক চরিত্রের ভিড়ে গল্পটি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় নি, এবং গল্পের গতিও কোথাও শ্লথ হয় নি। সামান্য বিষয়কে অবলম্বন করে লেখক সৃষ্টি করেছেন অসামান্য এক মানবিক আবেদন। এটাও ছোটোগল্পের পক্ষে জরুরী ব্যাপার—"to produce maximum effect with minimum material."

ব্যঞ্জনা বা ইঙ্গিত হল ছোটোগল্পের প্রাণ। গল্প শেষ হবার পরেও এই ব্যঞ্জনাই পাঠক মনকে ভাবায় এবং দোলা দেয়।

'পাশফেল' গল্পের শেষেও আমরা লেখকের ব্যঞ্জনাময় ইঙ্গিত লক্ষ করি। অর্থাৎ ছোটোগল্পের সব বৈশিষ্ট্যই এখানে উপস্থিত। তাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' একটি সার্থক ছোটোগল্প।

'পাশফেল' গল্পের নায়ক-বিচার।

সাধারণত গল্প-উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্রকেই বলা হয় নায়ক। অনেক সময় লেখক কেন্দ্রীয় বা মুখ্য চরিত্র অপেক্ষা কোনো অপ্রধান চরিত্রকেই বেশি গুরুত্ব দেন, যখন সেই অপ্রধান চরিত্র লেখকের জীবনদর্শন প্রচারের বাণীমূর্তি হয়ে ওঠে। কোনো রচনায় নায়ক হবার যোগ্যতা সেই চরিত্রেরই প্রাপ্য যে-চরিত্র ভয়ঙ্কর কিছু করে এবং সেই কর্মের ফল নিজেই ভোগ করে। নানান ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও এই সব চরিত্র পাঠকের সহানুভূতি থেকে কখনই বঞ্চিত হয় না।

তা হলে দেখা যাচ্ছে নায়ক হবার জন্যে কেবল কেন্দ্রীয় বা মুখ্য চরিত্রই যথেষ্ট নয়, নায়ক হবার দাবি কেবল তার যে লেখকের জীবনদর্শনের মুখপাত্র হবে, অথবা এমন কিছু করবে এবং সেই কৃতকার্যের ফলভোগ করবে।

উদাহরণ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের এবং দ্বিজেন্দ্রলালের 'সাজাহান' নাটকের কথা বলা যায়।

'চন্দ্রশেখর'-এ প্রতাপ এবং 'সাজাহানে'-এ ঔরংজীব যথাক্রমে চন্দ্রশেখর এবং সাজাহান অপেক্ষা অনেক বেশি সক্রিয়। তথাপি এই চরিত্র দুটি নায়ক নয়। নায়ক হল চন্দ্রশেখর এবং সাজাহান।

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' গল্পের নায়ক-বিচার। নীরেন এবং বিমল নামে দুই বন্ধুর আই. এ. পরীক্ষায় পাশ ও ফেলের ঘটনাকে অবলম্বন করে 'পাশফেল' গল্পটি রচিত।

এই পরীক্ষায় নীরেন ভালোভাবে পাশ করে আর বিমল করে ফেল। প্রথম থেকে নীরেনের চোখ দিয়ে অর্থাৎ তার অনুভবের আলোয় গল্পটিকে দেখা হয়েছে। বিমলের বাড়িতে তাকে একা অস্বস্তিকর পরিবেশের সম্মুখীন হতে হয়। মানবিক কারণেই সেখানে তাকে ম্লান মুখে থাকতে হয়। এই সময় তার মনে হচ্ছিল বিমলের পরীক্ষায় অকৃতকার্যতার জন্যে যেন সেই দায়ী। তার মনে হয়েছে—"সামান্য কিছু ছেলে পাশ করেছে বলেই না বিমলের মতো গাদা গাদা ছেলের ফেল করাটা দাঁড়িয়েছে ফেল করায়।"

নীরেনের আশা ছিল তার পাশের খবর পেয়ে বাবার মুখ গর্বে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কিন্তু সেখান থেকে এল আঘাত। বিমলের অকৃতকার্যতার কথা শুনে বলেন, 'পাশ করেই বা কী করত।' বাবার কথায়-ব্যবহারে নীরেন আঘাত পায়, হতাশ হয়।

তবুও তার সব অভিমান, ব্যথা-বেদনা ভুলিয়ে দিয়ে পাশের গৌরব-এ তিলক পরিয়ে দেয় ভাইবোনেরাই।

উপরতলার ভাড়াটে দীনেশবাবুর মেয়ে বকুলের চোখে নীরেন ছিল আদর্শ ভালো ছাত্র। তরুণ মনে এই মর্যাদা রঙীন স্বপ্ন হয়ে দেখা দেয়। পাশের খবর পেয়ে বকুল এসে নীরেনের দিকে হাত বাড়িয়ে বলে, "ছুঁয়ে দাও, পাশের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দাও। ছোঁয়া লেগে আমিও যদি উতরে যাই।"

বাড়িতে মা-বাবার কাছে যোগ্য সমাদর না পেয়ে অভিমান পাক দিয়ে ওঠে নীরেনের মধ্যে। মনে ভাবে, "এদের যখন আগ্রহ নেই, থাক। যার আগ্রহ আছে তার সঙ্গেই আলোচনা করা যাক আজ পাশ করার মধ্যে তার কোন্ ভবিষ্যৎ সূচিত হলো।"

বকুলের সঙ্গে আলোচনা করতে বসে নীরেন তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে। যে-স্বপ্ন আশাবাদী তরুণ চোখ দেখতে অভ্যস্ত। সে আলোচনা করে বকুল শোনে। নীরেন বলে, "বি. এ.-তে সে আরও ভালো রেজাল্ট করবে। এবার আরেকটু শক্ত হবে, লোককে বুঝিয়ে দেবে যে, উঁচুদিকের পরীক্ষায় কোনো ছেলে যদি ভালো রেজাল্ট করতে চায় সংসারের দশটা বাজে কাজের ঝামেলা তার ঘাড়ে চাপালে চলবে না।"

সেই রঙীন কল্পনা, তরুণ মনের স্বপ্ন। যে-স্বপ্ন বাস্তবের এক আঘাতেই ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সংসারের প্রয়োজনে আর্থিক কারণে নীরেনকে তার বাবা রোজগারের চেষ্টা করতে বলেন। নীরেনকে শুনতে হয় "বিমল চাকরির চেষ্টা করছে। তোমারও এবার রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে, নইলে আর চলে না।" বাবার এই কথায় এক মুহূর্তেই নীরেনের রঙীন স্বপ্ন ভেঙে যায়। লেখকের ভাষায়—"মাথায় যেন বজ্রাঘাত হয় নীরেনের। জগৎ হয়ে যায় অন্ধকার, ভবিষ্যৎ জীবন হয়ে যায় অর্থহীন।"

নীরেনের তরুণ মন স্বপ্নভঙ্গের এই বেদনা সহ্য করতে পারে নি। তাই বিষ খেয়ে সে নিষ্ঠুর বাস্তবের রণক্ষেত্র থেকে বিদায় নিতে চেয়েছিল।

নীরেনের তরুণ মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা হতাশা ও বেদনার কথা 'পাশফেল' গল্পের উপজীব্য। ভালো ছেলে হয়েও ভালোভাবে পাশ করেও তাকে বিষ খেতে হয়, তার সঙ্গে ফেল করা ছেলের কোনো প্রভেদ থাকে না, নিজের হাতে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রদীপশিখা জ্বালিয়ে সেই প্রদীপ নিজেকেই নিবিয়ে ফেলতে হয় এর চেয়ে জীবনের বড়ো ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে। তাই অন্য কেউ নয় নীরেনই হল 'পাশ ফেল' গল্পের নায়ক। তার জীবনের ট্র্যাজিক হাহাকার পাঠক মনকে স্পর্শ করে, ভাবায়। পাঠক তার সঙ্গে একাত্ম হয়ে অনুভব করে এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যে পাশ ও ফেলের কোনোই প্রভেদ নেই।

সারসংক্ষেপ ঃ খবরের কাগজে সংবাদটা বেরিয়েছে যে, একটি ছেলে আত্মহত্যা করার জন্যে বিষ খেয়েছিল, এখন সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে আছে।

নীরেন আর বিমল এক সঙ্গে আই. এ. পরীক্ষার ফল জানতে যায়।

নীরেন ছিল লেখাপড়ায় খুবই ভালো ছেলে আর বিমল ছিল খুব সাধারণ। ম্যাট্রিক ফলাফলেই সেটা বোঝা গেছে। পাশের পার্সেন্টেজের খবর শুনে নীরেনের মনে হয় বিমলের সঙ্গে রেজাল্ট দেখতে আসাটা উচিত হয় নি। কারণ সে পাশ করেও আনন্দ পাবে না। সর্বদাই মুখটা বিমলের জন্যে বিমর্ষ করে রাখতে হবে।

দেখা গেল বিমল সত্যি সত্যি ফেল করেছে। দুজনেই তারা গরিব সন্তান।

তাই ফেল করার অর্থ যে কী তা দুইজনেই বুঝতে পারে। বিমল বলল, "বাস্ স্টুডেন্ট লাইফ খতম হয়ে গেল।"

নীরেন নানাভাবে তাকে সান্ত্বনা দিলেও নিজেই সে তেমন জোর পাচ্ছিল না। কারণ নিম্নমধ্যবিত্ত বাড়ির সন্তান হয়ে সে নিজেও জানত বিমলের পক্ষে আবার লেখাপড়া করা কত শক্ত। বিমল নিজেও আর পড়তে চাইল না। তার বক্তব্য হল, পড়ার নামে সংসারের দাবিকে সে বহুকাল ঠেকিয়ে রেখেছে "কেউ বাদ যায় নি, সবাইকে ভুগতে হয়েছে। বাচ্চা বোনটা তো মরেই গেল। আমার কলেজে পড়ার চাপ না থাকলে মরত না, নিশ্চয় মরত না।"

নীরেনের মনে হতে লাগল পাশ করে সে যেন সত্যি সত্যি নৈতিক আর সামাজিক একটা অপরাধ করে বসেছে। বাড়ির সামনে এসে বিমল জোর করেই নীরেনকে বাড়ির ভেতর ধরে নিয়ে গেল। বলল, খবরটা জানিয়ে যাও।

ওদের দেখে সকলেই আগ্রহ করে, এগিয়ে এসেছিল। বিমল নিজেই জানিয়ে দিল সংবাদটা, বলল, আমি ফেল করেছি মা, নীরেন পাশ করেছে। সে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। নীরেনের জন্যে আনন্দ প্রকাশ সেই সঙ্গে বিমলের জন্যে হতাশা। বিমলের বড়দিদি বলেই ফেলল, "আমাদের খুশির সীমা রইলো না। খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু বলে রাখলাম। বিমলটা ফেল করেছে তাতে—"

সকলেই বিমলকে সান্ত্বনা আর সহানুভূতি জানাতে এগিয়ে আসে, এমনকি এবাড়ির ভাড়াটেরাও বাদ পড়ে না। বিমলের বাবা অসুস্থ ছিলেন, তিনি টলতে টলতে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে দরজা ধরে দাঁড়ালেন, তারপর কেউ কিছু বলার আগেই শান্ত গম্ভীর গলায় বলে উঠলেন, "বিমল ফেল করেছিস তো ? বেশ করেছিস !"

বাড়ির কাছে এসেই নীরেন মুখে হাসি হাসি ভাব আনতে পেরেছিল। এতক্ষণ বাদে যেন পাশ করার আনন্দের স্বাদ পেল। তার পিতৃবন্ধু সুজনবাবু প্রশ্ন করেন, 'কী খবর হে ?' নীরেন জানায় সে পাশ করেছে, কী রকম পাশ করেছে তাও জানায়। শুনে সুজনবাবু বলেন, "বাহাদুর ছেলে ! এই ফেলের বাজারে এত ভালোভাবে পাশ করা তো সোজা ব্যাপার নয়।" নীরেনের বাবা প্রাণেশবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর কাছ থেকে পাশ করার জন্যে যথাযোগ্য অভিনন্দন না পেয়ে নীরেন খুবই হতাশ হল। কিন্তু বাড়ির ভেতর যেতেই তার অভ্যর্থনা জোটে ঠিক দিগ্‌বিজয়ী বীরের মতো।

নীরেনের ছোটো ভাইবোনেরা ছুটে আসে, ছুটে আসেন মা আর আসে উপরতলার ভাড়াটে দীনেশের মেয়ে বকুল। তাদের কাছে অভিনন্দন পেয়ে পরীক্ষাপাশের রোমাঞ্চ অনুভব করে নীরেন। মা কিন্তু ভুলতে পারেন না নীরেনের পড়ার খরচ চালাতে গিয়েই তাঁর গয়না বিক্রি করতে হয়েছে। সে কথা শুনিয়ে মা বলেন—"আমার গয়না ধার নিয়েছিস, পাশ করে শোধ দিবি না।"

আপিসের ব্যাপারে সেদিন প্রাণেশ খুবই চিন্তিত ছিলেন, তাই ছেলের পাশের আনন্দে যোগ দিতে পারেন নি, অথবা তার ভবিষ্যৎ নিয়েও কোনো জল্পনা-কল্পনা

করেন নি। তিনি তখন টোকেন স্ট্রাইকের পর আপিসের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। তাঁর কাছে পাশ-ফেল সবই সমান।

নীরেনের কিছুটা সময় কাটে সদ্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া মেয়ে বকুলের সঙ্গে বসে ভবিষ্যৎ পড়াশুনার গল্প করে। পরিচিত বাড়িতে পাশ করার জন্যে অভিনন্দন কুড়িয়ে আরও কয়েকটা দিন যায় নীরেনের। তার পর একদিন প্রাণেশ সেই হৃদয়-বিদারক কথাটা তাকে শুনিয়ে দেয়, "বিমল চাকরির চেষ্টা করছে তোমারও এবার রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে নইলে আর চলে না।"

পরিষ্কার বোঝা যায় নীরেনকে পড়াবার ক্ষমতা তার পরিবারের নেই। সেদিন রাত্রেই নীরেন আত্মহত্যার জন্যে বিষ খেয়েছিল, এই সংবাদটাই কাগজে আছে। সে যে ভালোভাবে পাশ করেছিল সে সংবাদ কাগজে ছিল না।

পাশফেল গল্পের সমাজচিত্র :

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' ছোটোগল্পে ছুটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের ছবি ধরা পড়েছে। এ ছবি সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবনের। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের উত্তরপর্ব স্বাধীনতা, দেশবিভাগ, বেকারসমস্যা, উৎপাদন-বণ্টনের অসম ব্যবস্থা, মুদ্রাস্ফীতি, অবক্ষয়, স্ট্রাইক এই গল্পের পটভূমি রচনা করেছে।

বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে মানিকবাবু জীবনকে বিচার করেছেন। জীবনশিল্পীর এই মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে মার্কসবাদী জীবনদর্শনে। মার্কসীয় জীবনদর্শনে বিশ্বাসী লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিশ্বাস করতেন আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে আমাদের মনোভাব নয়, অর্থনীতি।

আমাদের আলোচ্য গল্পে লেখক নীরেন এবং বিমল নামে যে-দুজন তরুণের জীবনের ছবি অঙ্কন করেছেন তার মাধ্যমেই দেশের সমাজ ও অর্থনৈতিক জীবন প্রতিভাত হয়েছে।

মধ্যবিত্ত সমাজ কলেজী শিক্ষাকে চাকরি লাভের উপায় বলে মনে করে। শিক্ষা তাদের কাছে জ্ঞানলাভের উপায় মাত্র নয়, শিক্ষা হল চাকরি লাভের হাতিয়ার। নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবার তাই ঘটি-বাটি বেচে ধার-দেনা করে সন্তানকে কলেজীয় শিক্ষা দেয় যাতে তারা একদিন চাকরি করে সংসারের হাল ধরতে পারে। আই. এ. পরীক্ষার ফল বেরোবার তিনদিন পরেই প্রাণেশ তার ছেলেকে বলেছেন,— "তুমি বড়ো হয়েছো, সংসারের কথাটাও এবার তোমায় একটু ভাবতে হয়।…বিমল চাকরির চেষ্টা করছে, তোমারও এবার রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে, নইলে আর চলে না।"

দরিদ্র বাড়ির সন্তানকে ধার দেনা করে গয়না বেচে লেখাপড়া শেখানো হয়, একদিন সেই সন্তান চাকরি করে সংসার দেখবে কেবল এই প্রত্যাশায়। পড়ার খরচ চালাতে গিয়ে বিবাহযোগ্যা মেয়ের বিয়ে স্থগিত রাখা হয়। বিমলের একটি কথায় দারিদ্র্যের যে ছবি ফুটে ওঠে তার সঙ্গে আমাদের দেশের প্রত্যেকটি নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মিল আছে। বিমল বলে, "পড়ার নামে দুবছর সকলের রক্ত

শুষেছি। কেউ বাদ যায় নি, সবাইকে ভুগতে হয়েছে। বাচ্চা বোনটা তো মরেই গেল। আমার কলেজে পড়ার চাপ না থাকলে মরত না, নিশ্চয় মরত না।"

এইরকম পরিবারে দৈবাৎ শুভমুহূর্ত আসে আবার অল্পকালের মধ্যেই বিদায় নিয়ে যায়। আদি অকৃত্রিম সত্য কেবল দেনা আর সংসারের অভাব-অনটনের কথা। যা লেখক নীরেনদের পারিবারিক ছবির সাহায্যে তুলে ধরেছেন—"রেখা আজ সকালেও কান্নাকাটি করেছে, তার একটিও আস্ত জামা নেই। মুদী দোকানে কিছু টাকা না দিলে এবার হয়তো গলায় গামছা দিয়ে অপমান করবে, মাসকাবারে একটা পাঞ্জাবি না করলে আর আপিস করা সম্ভব হবে না প্রাণেশের।"

নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ সুখে-দুঃখে আনন্দ-বেদনায় একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে। তাই দেখি বিমলের পরীক্ষার ফলাফলের খবর জানতে বিমলের মা-দিদির সঙ্গে "বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের দুচারজন মেয়ে-পুরুষ এসে তাদের ঘিরে দাঁড়ায়।" নীরেনদের বাড়ির উঠোনেও দেখি একই চিত্র। নীরেনের পাশের সংবাদ শুনে ছুটে আসে উপরতলার ভাড়াটে দীনেশের মেয়ে বকুল। এরা সকলেই সুখ বা দুঃখকে একত্রে ভাগ করে নেয়। এটাই মধ্যবিত্ত জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই সমাজ তরুণের স্বপ্ন মুছে দিয়ে তাকে নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই "বিমল একটু হাসে। হাসি তো নয়, যেন প্রাণের জ্বালার একটা ঝলক।" বলে, "বাস্ স্টুডেণ্ট লাইফ খতম হয়ে গেল।...আমি আর পড়ছি না। এ জুয়া খেলায় চান্স নিতে আমি রাজি নই।" পরে প্রাণেশের কাছেই আমরা সংবাদ পাই "বিমল চাকরির চেষ্টা করছে।"

নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে থেকেও যে আশাবাদী তরুণ স্বপ্ন দেখে, তৈরি করে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল পরিকল্পনা, তার সেই স্বপ্ন একদিন বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আলোচ্য গল্পে নীরেনের বিষপান বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতের প্রতীক। নিষ্ঠুর বাস্তব স্বপ্ন দেখা তরুণ মনকে নির্বিচারে হত্যা করে। বিষপানে সঙ্কটাপন্ন এক তরুণের কথা দিয়ে গল্পের সূচনা, আর বিষপানের কারণ নির্দেশে গল্পের সমাপ্তি। এটাও যেন মুমূর্ষু সঙ্কটাপন্ন মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতীক। যে জীবনের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সবটাই মৃত্যু বিষে নীল হয়ে গেছে।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রের দীনতা ও অযোগ্যতার চিত্র লেখক এখানে উপস্থিত করতে ভোলেন নি। সংবাদপত্রে যে সত্য পরিবেশন করে তা অর্ধসত্য, পূর্ণ সত্য নয়। "তাই নীরেনের আত্মহত্যার জন্য বিষ খেয়ে হাসপাতালে যাওয়ার খবরটাই খবরের কাগজে বেরিয়েছে,...কিন্তু নীরেন যে ফেল করে নি, পরীক্ষায় খুব ভালোভাবে পাশ করেছিল—এটা খবরে লেখা ছিল না।"

চরিত্র বিচার

নীরেন:

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' গল্পে নীরেন হল কেন্দ্রীয় চরিত্র।

কৃতী ছাত্র হিসাবে নীরেনের সুনাম ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে ভালো ছাত্র হিসাবে সুনাম অর্জন করে।

আই. এ. পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা যায় সে ভালোভাবে পাশ করেছে, কিন্তু বন্ধু বিমল পাশ করতে পারে নি। বন্ধুর প্রতি সমবেদনায় তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সে নানাভাবে বিমলকে সান্ত্বনা দেয়, বলে—"এত ছেলে তো ফেল করেছে। একবার ফেল করলে কী হল ?"

নীরেনের জীবনে সবচেয়ে বড়ো অগ্নিপরীক্ষা শুরু হয় বিমলের বাড়িতে এসে। কী নিদারুণ দুর্বিষহ অবস্থা ! প্রতি মুহূর্তেই নীরেনের মনে হতে থাকে "পাশ করে সে যেন সত্যিই নৈতিক আর সামাজিক একটা অপরাধ করে বসেছে। মানুষের জীবন নিয়ে ভাগ্যের খেলার জুয়া আর জুয়াচুরিতে জিতে গেছে।"

এক বুক আনন্দ নিয়েও মুখে শোকের ভাব ফুটিয়ে নীরেনকে এই অস্বস্তিকর পরিবেশে আরও কিছু সময় কাটাতে হয়েছে। বিমলের দিদির মুখের শুভেচ্ছাবাণী—"তুমি পাশ করেছো ? আমাদের খুশির সীমা রইলো না। খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু বলে রাখলাম। বিমলটা ফেল করেছে তাতে—"সেই পরিবেশে ব্যঙ্গের মতো শুনিয়েছে। কিন্তু হৃদয়বান বন্ধুবৎসল এই তরুণ সদ্যপ্রাপ্ত পাশের আনন্দ দমন করে বন্ধুর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে দুঃখবেদনা ভাগ করে নিয়েছে। নিজেকে আরও বেশি ক'রে অপরাধী মনে হয় নীরেনের।"

সাধারণ আরও পাঁচটা তরুণের মতো নীরেন নিজের সাফল্যের পুরস্কার পেতে চেয়েছে, শুনতে চেয়েছে পাঁচজনের মুখে শুভেচ্ছাবাণী।

নিজের বাড়িতে ফিরে পিতৃবন্ধু সুজনবাবুর কাছে অভিনন্দিত হয়ে "সে প্রথম অনুভব করতে পেরেছে পরীক্ষা পাশের রোমাঞ্চ—দুটি বছর গরিবের ছেলের প্রাণপাত কষ্ট করে সফল হওয়ার উত্তেজক সুখ।"

কিন্তু বাবার কাছে ঠিকমতো অভিনন্দন না পেয়ে নীরেন ক্ষুণ্ণ মনেই ভেতরে যায়। "সেখানে অবশ্য তার অভ্যর্থনা জোটে দিগ্‌বিজয়ীর মতোই—ছোটো ভাইবোনদের কাছে।"

নীরেন আরও পাঁচটা তরুণের মতো এই অভিনন্দন-অভ্যর্থনার প্রত্যাশী ছিল। যোগ্যতা সে অর্জন করেছে ফাঁকি দিয়ে নয়, দু বছর প্রাণপণ পরিশ্রম করে।

উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্ন-দেখা তরুণের মতো হয়তো নীরেনের প্রেরণা ছিল উপরতলার ভাড়াটে দীনেশের মেয়ে বকুল। ভক্ত শিষ্যার মতো এই বকুল "হাসিমুখে হাতটা নীরেনের দিকে বাড়িয়ে বলে, ছুঁয়ে দাও, পাশের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দাও। ছোঁয়া লেগে আমিও যদি উতরে যাই।"

এই কিশোরী ভক্ত শিষ্যা বকুলের সঙ্গে বসে নীরেন তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করেছে—"বকুল সাগ্রহে তার কথা শোনে।"

কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। কল্পনাবিলাসী, আদর্শবাদী, মেধাবী, হৃদয়বান নীরেন কেবল ভবিষ্যতের উজ্জল স্বপ্নই দেখে এসেছে, বাস্তব সত্যের মুখোমুখি

শুষেছি। কেউ বাদ যায় নি, সবাইকে ভুগতে হয়েছে। বাচ্চা বোনটা তো মরেই গেল। আমার কলেজে পড়ার চাপ না থাকলে মরত না, নিশ্চয় মরত না।"

এইরকম পরিবারে দৈবাৎ শুভমুহূর্ত আসে আবার অল্পকালের মধ্যেই বিদায় নিয়ে যায়। আদি অকৃত্রিম সত্য কেবল দেনা আর সংসারের অভাব-অনটনের কথা। যা লেখক নীরেনদের পরিবারিক ছবির সাহায্যে তুলে ধরেছেন—"রেখা আজ সকালেও কান্নাকাটি করেছে, তার একটিও আস্ত জামা নেই। মুদী দোকানে কিছু টাকা না দিলে এবার হয়তো গলায় গামছা দিয়ে অপমান করবে, মাসকাবারে একটা পাঞ্জাবি না করলে আর আপিস করা সম্ভব হবে না প্রাণেশের।"

নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজ সুখে-দুঃখে আনন্দ-বেদনায় একসঙ্গে মিলেমিশে থাকে। তাই দেখি বিমলের পরীক্ষার ফলাফলের খবর জানতে বিমলের মা-দিদির সঙ্গে "বাড়ির অন্যান্য ভাড়াটেদের দুচারজন মেয়ে-পুরুষ এসে তাদের ঘিরে দাঁড়ায়।" নীরেনদের বাড়ির উঠোনেও দেখি একই চিত্র। নীরেনের পাশের সংবাদ শুনে ছুটে আসে উপরতলার ভাড়াটে দীনেশের মেয়ে বকুল। এরা সকলেই সুখ বা দুঃখকে একত্রে ভাগ করে নেয়। এটাই মধ্যবিত্ত জীবনের বৈশিষ্ট্য। এই সমাজ তরুণের স্বপ্ন মুছে দিয়ে তাকে নিষ্ঠুর বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। তাই "বিমল একটু হাসে। হাসি তো নয়, যেন প্রাণের জ্বালার একটা ঝলক।" বলে, "বাস্ স্টুডেন্ট লাইফ খতম হয়ে গেল।...আমি আর পড়ছি না। এ জুয়া খেলায় চান্স নিতে আমি রাজি নই।" পরে প্রাণেশের কাছেই আমরা সংবাদ পাই "বিমল চাকরির চেষ্টা করছে।"

নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজে থেকেও যে আশাবাদী তরুণ স্বপ্ন দেখে, তৈরি করে ভবিষ্যতের উজ্জ্বল পরিকল্পনা, তার সেই স্বপ্ন একদিন বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায়। আলোচ্য গল্পে নীরেনের বিষপান বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতের প্রতীক। নিষ্ঠুর বাস্তব স্বপ্ন দেখা তরুণ মনকে নির্বিচারে হত্যা করে। বিষপানে সঙ্কটাপন্ন এক তরুণের কথা দিয়ে গল্পের সূচনা, আর বিষপানের কারণ নির্দেশে গল্পের সমাপ্তি। এটাও যেন মুমূর্ষু সঙ্কটাপন্ন মধ্যবিত্ত জীবনের প্রতীক। যে জীবনের শুরু থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত সবটাই মৃত্যু বিষে নীল হয়ে গেছে।

আমাদের দেশের সংবাদপত্রের দীনতা ও অযোগ্যতার চিত্র লেখক এখানে উপস্থিত করতে ভোলেন নি। সংবাদপত্রে যে সত্য পরিবেশন করে তা অর্ধসত্য, পূর্ণ সত্য নয়। "তাই নীরেনের আত্মহত্যার জন্য বিষ খেয়ে হাসপাতালে যাওয়ার খবরটাই খবরের কাগজে বেরিয়েছে,...কিন্তু নীরেন যে ফেল করে নি, পরীক্ষায় খুব ভালোভাবে পাশ করেছিল—এটা খবরে লেখা ছিল না।"

চরিত্র বিচার

নীরেন ঃ

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' গল্পে নীরেন হল কেন্দ্রীয় চরিত্র।

কৃতী ছাত্র হিসাবে নীরেনের সুনাম ছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় সে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করে ভালো ছাত্র হিসাবে সুনাম অর্জন করে।

আই. এ. পরীক্ষার ফল বেরোলে দেখা যায় সে ভালোভাবে পাশ করেছে, কিন্তু বন্ধু বিমল পাশ করতে পারে নি। বন্ধুর প্রতি সমবেদনায় তার অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সে নানাভাবে বিমলকে সান্ত্বনা দেয়, বলে—“এত ছেলে তো ফেল করেছে। একবার ফেল করলে কী হল ?”

নীরেনের জীবনে সবচেয়ে বড়ো অগ্নিপরীক্ষা শুরু হয় বিমলের বাড়িতে এসে। কী নিদারুণ দুর্বিষহ অবস্থা ! প্রতি মুহূর্তেই নীরেনের মনে হতে থাকে “পাশ করে সে যেন সত্যিই নৈতিক আর সামাজিক একটা অপরাধ করে বসেছে। মানুষের জীবন নিয়ে ভাগ্যের খেলার জুয়া আর জুয়াচুরিতে জিতে গেছে।”

এক বুক আনন্দ নিয়েও মুখে শোকের ভাব ফুটিয়ে নীরেনকে এই অস্বস্তিকর পরিবেশে আরও কিছু সময় কাটাতে হয়েছে। বিমলের দিদির মুখের শুভেচ্ছাবাণী—“তুমি পাশ করেছো ? আমাদের খুশির সীমা রইলো না। খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু বলে রাখলাম। বিমলটা ফেল করেছে তাতে—”সেই পরিবেশে ব্যঙ্গের মতো শুনিয়েছে। কিন্তু হৃদয়বান বন্ধুবৎসল এই তরুণ সদ্যপ্রাপ্ত পাশের আনন্দ দমন করে বন্ধুর শোকসন্তপ্ত পরিবারের সঙ্গে দুঃখবেদনা ভাগ করে নিয়েছে। নিজেকে আরও বেশি ক'রে অপরাধী মনে হয় নীরেনের।”

সাধারণ আরও পাঁচটা তরুণের মতো নীরেন নিজের সাফল্যের পুরস্কার পেতে চেয়েছে, শুনতে চেয়েছে পাঁচজনের মুখে শুভেচ্ছাবাণী।

নিজের বাড়িতে ফিরে পিতৃবন্ধু সুজনবাবুর কাছে অভিনন্দিত হয়ে “সে প্রথম অনুভব করতে পেরেছে পরীক্ষা পাশের রোমাঞ্চ—দুটি বছর গরিবের ছেলের প্রাণপাত কষ্ট করে সফল হওয়ার উত্তেজক সুখ।”

কিন্তু বাবার কাছে ঠিকমতো অভিনন্দন না পেয়ে নীরেন ক্ষুণ্ন মনেই ভেতরে যায়। “সেখানে অবশ্য তার অভ্যর্থনা জোটে দিগ্‌বিজয়ীর মতোই—ছোটো ভাইবোনদের কাছে।”

নীরেন আরও পাঁচটা তরুণের মতো এই অভিনন্দন-অভ্যর্থনার প্রত্যাশী ছিল। যোগ্যতা সে অর্জন করেছে ফাঁকি দিয়ে নয়, দু বছর প্রাণপণ পরিশ্রম করে।

উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন-দেখা তরুণের মতো হয়তো নীরেনের প্রেরণা ছিল উপরতলার ভাড়াটে দীনেশের মেয়ে বকুল। ভক্ত শিষ্যার মতো এই বকুল “হাসিমুখে হাতটা নীরেনের দিকে বাড়িয়ে বলে, ছুঁয়ে দাও, পাশের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দাও। ছোঁয়া লেগে আমিও যদি উতরে যাই।”

এই কিশোরী ভক্ত শিষ্যা বকুলের সঙ্গে বসে নীরেন তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা তৈরি করেছে—“বকুল সাগ্রহে তার কথা শোনে।”

কিন্তু বাস্তবকে অস্বীকার করা যায় না। কল্পনাবিলাসী, আদর্শবাদী, মেধাবী, হৃদয়বান নীরেন কেবল ভবিষ্যতের উজ্জ্বল স্বপ্নই দেখে এসেছে, বাস্তব সত্যের মুখোমুখি

হয় নি। সে যখন স্বপ্ন দেখে—"বি. এ.-তে আরও ভালো রেজাল্ট করবে। এবার আরেকটু শক্ত হবে, লোককে বুঝিয়ে দেবে যে, উচুঁদিকের পরীক্ষায় কোনো ছেলে যদি ভালো রেজাল্ট করতে চায় সংসারের দশটা বাজে কাজের ঝামেলা তার ঘাড়ে চাপালে চলে না।"

তখনই সংসার তার কাছে দাবি করেছে, "তুমি বড়ো হয়েছো, সংসারের কথাটাও এবার তোমার একটু ভাবতে হয়। কী দিনকাল পড়েছে বুঝতেই পার!" বাস্তবের একটি আঘাতে ঘুচে যায় পাশফেলের পার্থক্য। নীরেন উপলব্ধি করে অর্থনৈতিক পরাধীনতা আমাদের স্বাধীনভাবে বাঁচবার অধিকার দেয় নি। রঙীন স্বপ্ন এবং নিষ্ঠুর বাস্তবের দ্বন্দ্বে নীরেন তার মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। বুঝতে পারে, যে-সমাজে পাশফেলের কোন প্রভেদ নেই, সেখানে বেঁচে থাকা অর্থহীন। এরূপ মানসিক অবস্থায় নীরেন আত্মহত্যার জন্যে বিষ খেয়ে হাসপাতালে যায়।

নীরেনের চরিত্রে অভিনবত্ব বিশেষ কিছুই নেই। সে ছিল নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের আরও পাঁচটা আশাবাদী তরুণের মতো। অর্থনৈতিক পরাধীনতা যে-সমাজে তরুণের চোখের স্বপ্ন, বুকের আশাকে হরণ করে নেয় নীরেন হল সেই সমাজের আশাবাদী তরুণ মনের প্রতিনিধি। যাদের স্বপ্ন-কল্পনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, প্রতি মুহূর্তেই বাস্তবের আঘাতে পথের ধূলায় হারিয়ে যায়।

বিমল :

বিমল ছিল 'পাশফেল' গল্পের নায়ক নীরেনের বন্ধু। ছাত্র হিসাবে সে যে নীরেনের মতো মেধাবী ছিল না তা ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্টেই প্রমাণ হয়ে গেছে। গল্পের প্রথমেই দেখি বন্ধু নীরেনের সঙ্গে সে আই. এ. পরীক্ষার ফলাফল জানতে চলেছে। পাশের হার শুনে বিমলের মনে স্থির বিশ্বাস হয়েছিল সে পাশ করতে পারবে না।

তার অনুমান মিথ্যে হয় না। দেখা যায়, বিমল পাশ করতে পারে নি। রেজাল্ট দেখে, "বিমল একটু হাসে। হাসি তো নয়, যেন প্রাণের জ্বালার একটা ঝলক। বলে, "বাস্, স্টুডেণ্ট লাইফ খতম হয়ে গেল।"

বন্ধু নীরেন ক্ষীণকণ্ঠে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে যায়,—"আরেকবার—"। কিন্তু বাস্তববাদী বিমল জানত একটি গরীবের সাধারণ ছেলের পক্ষে তা সম্ভব নয়।

তাই তার সমস্ত অন্তর প্রতিবাদে গর্জন করে ওঠে। বলে, "ক্ষেপেছিস? এমন জানলে কলেজেই ভর্তি হতাম না। পড়ার নামে দু বছর সকলের রক্ত শুষেছি। কেউ বাদ যায় নি, সবাইকে ভুগতে হয়েছে। বাচ্চা বোনটা তো মরেই গেল। আমার কলেজে পড়ার চাপ না থাকলে মরত না।"

বাস্তব সত্যকে সহজ ভাবেই মেনে নেয় বিমল। নিজেকে তার অপরাধী মনে হয়, কারণ সকলকে বঞ্চিত করে এতদিন যে-সংসার থেকে সে পড়ার খরচ আদায় করেছে বিনিময়ে সে সংসারকে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে নি। তাই বিমলের শেষ কথা—"আমি আর পড়ছি না। এ জুয়াখেলার চান্স নিতে আমি রাজী নই।"

নীরেনকে তার বাড়িতে ধরে আনার মধ্যেও বিমলের বাস্তববোধের আর একটা পরিচয় পাই। বিমল জানত নীরেন সঙ্গে থাকলে তার বাবা-মা এই পরাজয়-সংবাদকে সহজভাবে গ্রহণ করতে পারবে। নীরেন বাইরের ছেলে, তার সামনে কেউ অশোভন আচরণ করবে না, তাছাড়া নীরেন নিজেও সান্ত্বনা বাক্য শুনিয়ে পরিবেশকে অনেক হাল্কা অনেক স্বাভাবিক করে দেবে।

বিমলের অনুমান মিথ্যে হয় নি। নীরেন সঙ্গে থাকায় পরিবেশ অনেক হাল্কা হয়ে যায়। শেষে এক সময় মনে হয় পাশফেলের মধ্যে কোনো প্রভেদ নেই। তাই বিমল তার দিদিকে বলে, "আমায় সান্ত্বনা দিতে পাশফেল সব সমান করে দিলি যে দিদি।" দিদি উত্তর দেয়, "সমান কখনো হয় ? বলছি আজকাল ফেল করাটাও দোষের নয়, লজ্জারও নয়।"

এইভাবে বিমলের প্রাণের জ্বালা আর ব্যর্থতার ক্ষোভ মুছে দিয়ে পরিবারের সকলেই তাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে। কারণ "বিমল চিরদিন বড় অভিমানী ছেলে, চিরদিন একরোখা। ফেল করার প্রতিক্রিয়ায় সে এখন কি করে বসে এটাই দাঁড়িয়েছে সকলের সবচেয়ে বড় দুর্ভাবনা।"

বিমল অভিমানী একরোখা হলেও ব্যর্থতার গ্লানি তাকে স্পর্শ করে নি। আমরা নীরেনের বাবার মুখেই শুনি, "বিমল চাকরির চেষ্টা করছে"। এই হল বাস্তববাদী জীবনমুখী চরিত্র। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার পরিবর্তে সে দারিদ্র্যের হাত থেকে সংসারকে বাঁচাবার সংকল্প গ্রহণ করে আর এক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রাণেশ :

অপ্রাসঙ্গিক কোনো চরিত্রের স্থান গল্পে নেই। যত গৌণই হোক প্রত্যেক চরিত্র এক একটি বিশেষ প্রয়োজনে গল্প উপন্যাসে স্থান পায়। ছোটো চরিত্রের কাজ হল পরিবেশ রচনা করা, মুখ্য চরিত্রকে প্রস্ফুটিত করা এবং গল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা।

'পাশফেল' ছোটোগল্প। এখানে চরিত্রের সংখ্যাও অল্প। নায়ক নীরেন এবং উপনায়ক বিমল ভিন্ন এখানে যে-সব চরিত্র আছে সেগুলি সবই গৌণ চরিত্র। তারা পরিবেশ রচনার জন্যে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, আর তারা দু-একটি প্রয়োজনীয় কথা এবং কাজের পর ঘটনা থেকে বিদায় নিয়েছে। কেবল আভাসে-ইঙ্গিতে ফুটে উঠেছে চরিত্রের একটা আংশিক রূপ।

'পাশফেল' গল্পে গৌণ চরিত্রের মধ্যে আছে প্রাণেশ, বিমলের মা, বিমলের দিদি, ভূপেনবাবু, নীরেনের মা, রেখা, বকুল, স্বজনবাবু, কমলবাবুর স্ত্রী এবং নীরেন-বিমলের ভাইবোনেরা।

গল্পের প্রথমেই নীরেনের চিন্তার সূত্র ধরে আমরা তার বাবা প্রাণেশের পরিচয় পাই। দু'বছর কষ্ট করে প্রাণেশ ছেলেকে কলেজে পড়িয়েছে, স্ত্রীর গয়না বিক্রি করতে হয়েছে ছেলেকে পড়িয়ে পাশ করাবার জন্যে। কিন্তু এই দু'বছরে তার মানসিকতার আমূল পরিবর্তন হয়েছে। তাই দেখি আগ্রহ নিয়ে "উদ্‌গ্রীব হয়ে ছেলের সঙ্গে

ম্যাট্রিকের রেজাল্ট জানতে ছুটেছিল এবার আর তার সে রকম কোন লক্ষণ দেখা যায় নি।"

এটা হয়তো প্রাণেশের সাম্প্রতিক বাস্তব অভিজ্ঞতার ফল। তাছাড়া প্রাণেশের কর্মস্থলেও ছিল অশান্ত পরিবেশ। তার নিজের ভাষায়—"আজ তো শুধু টোকেন স্ট্রাইক হলো। এরপর কি হয় দেখা যাক।"

কর্মস্থলের অশান্ত পরিবেশ, এবং দেশের বাস্তব অভিজ্ঞতা প্রাণেশকে নৈরাশ্যবাদী করে তুলেছে। তাই সে পাশফেলের মধ্যে কোনো ব্যবধান খুঁজে পায় না। নীরেন যখন বলে—"বিমল পাশ করতে পারে নি বাবা।" প্রাণেশ আপসোস করে না, সংক্ষেপে বলে, "পারে নি ? পাশ করেই বা কি করত।"

বাবার কথা শুনে নীরেন দুঃখ পেয়ে ভেবেছে "বিমলের ফেল করা আর ছেলের পাশ করা ব্যাপারটাই যেন বিশেষ কোন মূল্য নেই প্রাণেশের কাছে।"

আলোচ্য গল্পে প্রাণেশ যদিও খুবই অল্প স্থান জুড়ে আছে, তবু এই গৌণ চরিত্রটি মধ্যবিত্ত পরিবারের ব্যথা-বেদনা ও অবক্ষয়ের চিত্রকে ফুটিয়ে তুলেছে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও যে-সমাজের মানুষ মেধাবী পুত্রকে উচ্চশিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে—বলে, "তোমারও এবার রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে, নইলে আর চলে না—"প্রাণেশ ছিল সেই সমাজের প্রতিনিধি।

বিমলের মা, দিদি ও ভূপেন :

বিমলের মা, দিদি এবং ভূপেন খুব অল্প সময়ের জন্যে গল্পে উপস্থিত হয়েছে। এরা সকলেই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের আশা-আকাঙ্ক্ষা, অভাব-অনটন এবং দারিদ্র্যের জীবন্ত ছবি। বিমলের আই. এ. পরীক্ষার ফলাফল জানার আগ্রহে উৎকণ্ঠিত। "সাগুর স্যসপ্যান উনুন থেকে নামিয়ে রান্নাঘর থেকে বিমলের মা, আদ্দেক সাবান-মাখা ছেঁড়া ভেজা শাড়িটা তাড়াতাড়ি শতজীর্ণ ভিজা সেমিজটার উপরে জড়িয়ে ফাঁকা কলতলা থেকে বিমলের সতের মাস বয়সের বড় অবিবাহিতা দিদি এবং এদিক ওদিক থেকে বিমলের ভাইবোন আর বাড়ির অন্য ভাড়াটেদের দু-চারজন মেয়ে পুরুষ এসে তাদের ঘিরে দাঁড়ায়।"

তাদের চোখের সামনে মূর্তিমান সাফল্য এবং ব্যর্থতা রূপে দাঁড়িয়ে আছে নীরেন এবং বিমল। তাই বিমলের দিদির মুখে দেখ হাসি আর অন্তরে বেদনার অশ্রুধারা। দিদি তাই বলে, "তুমি পাশ করেছো ? আমাদের খুশির সীমা রইলো না। খাইয়ে দিতে হবে কিন্তু বলে রাখলাম। বিমলটা ফেল করেছে তাতে—"

আনন্দবেদনার কী সুন্দর অভিব্যক্তি। এই দুই ভাবের মিশ্রণে দিদির এক অপূর্ব ছবি ফুটে উঠেছে।

স্নেহময়ী জননী তার পুত্র:ক খুব ভালোভাবেই জানে যে, "বিমল চিরদিন বড় একরোখা !" তাই বিমলের ফেলের খবর পেয়ে স্বামীকে সে জানাতে ভিতরে যায়, সেই সঙ্গে সাবধানও করে দেয় "ফেলকরা অভিমানী ছেলের সঙ্গে যেন বুঝে-শুনে কথা বলে।"

বিমলের বাবা ভূপেন এই সময় তিনদিন ধরে শয্যাগত ছিল। দু'বছর অতিকষ্টে সে বিমলের আই. এ. পড়ার খরচ চালিয়ে এসেছে। আর কলেজে পড়ার খরচ যোগাবার অজুহাতে মেয়ের বিয়ে স্থগিত রাখতে হয়েছে। সেই ভূপেন অসুস্থ শরীরেও বিমলের পরীক্ষার ফলাফল জানার আগ্রহে আকুল হয়েছিল। পুত্রের ব্যর্থতার সংবাদ হয়তো তাকে ভিতরে ভিতরে বিচলিত করেছে। কিন্তু আমরা বাইরে তাকে দুর্বল হতে দেখি না। "টলতে টলতে বিছানা ছেড়ে উঠে এসে ভূপেন দরজা ধরে দাঁড়ায়। এর পর সকলের মুখের দিকে তাকিয়ে কেউ কিছু বলার আগেই "শান্ত গম্ভীর গলায় বিমলের বাবা বলে, "বিমল ফেল করেছিস তো ? বেশ করেছিস !" ভূপেনকে একজন সংগ্রামী মানুষ বলে মনে হয়।

নীরেনের মা ঃ

নীরেনের মায়ের সঙ্গে বিমলের মায়ের বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। এরা দুজনেই প্রায় এক ছাঁচে ঢালা। অনাদিকালের দরিদ্র ঘরণী এবং বাঙালী জননী।

পুত্রের সাফল্যে জননীর অন্তর গর্বে পূর্ণ হয়ে ওঠে। নীরেনের পাশের সংবাদে তার মা মুখে কোন উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে নি। তবু তার "মুখের হাসি আর চোখের গর্বভরা চাউনিতেই নীরেনের প্রাণ ভরে গিয়েছিল।"

তবু মায়ের মুখে কিছু শুনতে চাইলে মা বলেছে "আমি জানতাম তুই পাশ করবি। আমার গয়না ধার নিয়েছিস, পাশ করে শোধ দিবি না।"

এখানেই গরিব মায়ের গর্ব।

ছেলের সাফল্যে জননী তার অলঙ্কার উৎসর্গের বেদনা ভুলে যায়।

রেখা ঃ

রেখা ছিল নীরেনের বোন। দাদার সাফল্যে সে অন্য ভাই-বোনের সঙ্গে হৈ হৈ চেঁচামিচি শুরু করেছে। পরে "উঠানে গিয়ে চেঁচিয়ে উপরতলায় খবর পাঠিয়ে দেয়, বকুলদি। ও বকুলদি। দাদা পাশ করেছে।"

অথচ আজই সে "সকালেও কান্নাকাটি করেছে তার একটাও আস্ত জামা নেই।"

কিশোরী রেখা জানত উপরতলার বকুলদি তার দাদা নীরেনের একজন বড়ো ভক্ত। তাই দাদার পাশের সংবাদ শুনে সবার আগে তার মনে পড়েছে বকুলদির কথা।

বকুল ঃ

বকুল যেন উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। সে ছিল নীরেনের কাছে একমুঠো মুক্তির আকাশ। তাই নীরেন তার সঙ্গে বসে ভবিষ্যতের পরিকল্পনা করে, বলে, "বি. এ.-তে সে আরও ভালো রেজাল্ট করবে।" নীরেনের পাশের খবর পেয়ে বকুল "হাসিমুখে হাতটা নীরেনের দিকে বাড়িয়ে বলে, ছুঁয়ে দাও, পাশের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দাও। ছোঁয়া লেগে আমিও যদি উতরে যাই।"

এ হল নিষ্পাপ কিশোরীর আন্তরিক শ্রদ্ধা। যে শ্রদ্ধা নিয়ে মানুষ দেবতাকে স্পর্শ করে।

বকুলের সঙ্গে নীরেন কথা বলে শান্তি পায়, কারণ বকুল ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। বকুলও নীরেনের কথা মন দিয়ে শুনত, কারণ নীরেন ছিল তার আদর্শ-প্রেরণা, যার ছোঁয়াচ লাগলে পরীক্ষাসিন্ধু উতরে যাওয়া যায়। এই আবেগ কল্পনা কিশোরীর মনের সম্পদ। বকুলকে লেখক সব কালের রোমান্টিক এক কিশোরী কন্যারূপেই গল্পে উপস্থিত করেছেন।

সুজনবাবু এবং দু'একজন ভাড়াটের চরিত্রও গল্পে আছে কিন্তু এরা কেউ চরিত্র-রূপে গল্পে আসে নি। এরা এসেছে কেবল পরিবেশ ফোটাবার জন্যে এবং যোগসূত্র রচনার উদ্দেশ্যে।

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। মানিক বন্দোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

উত্তর। গল্প, উপন্যাস বা নাটকের নামকরণের বিশেষ একটা তাৎপর্য থাকে। সেই তাৎপর্যের খাতিরেই লেখক তার রচনার নামকরণ করে থাকেন। অনেক সময় কেন্দ্রীয় চরিত্রের নামানুসারে রচনার নামকরণ করা হয়। উদাহরণ হিসাবে বঙ্কিম-চন্দ্রের 'রাজসিংহ' শরৎচন্দ্রের, 'দেবদাস', রবীন্দ্রনাথের 'গোরা'র কথা বলা যায়। রাজসিংহ, দেবদাস, বা গোরার জীবন তাদের ভাবনা উপন্যাসে নানাভাবে বর্ণিত, তাই তাদের নামেই উপন্যাসের নামকরণ করা হয়েছে। আবার কখনও লেখক তাঁর লেখায় কোন আদর্শ দার্শনিক ভাবনার ছবি অঙ্কন করেন, তখন নায়ক-নায়িকার নামে রচনার নামকরণ করা হয় না ; সেখানে নামের মধ্যে একটি আদর্শ বা ভাবনার ছবিই ফুটে ওঠে লেখক সাধারণত এমন নামই বেছে নেন। যেমন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহ', রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন', 'চোখের বালি', মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুল নাচের ইতিকথা' প্রভৃতি।

এখন আমাদের বিচার্য বিষয় হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' গল্পটির নামকরণ কতখানি সার্থক তা আলোচনা করা। আলোচ্য গল্পের প্রথমেই আমরা দেখি দুই তরুণ নীরেন এবং বিমল আই. এ. পরীক্ষার ফলাফল জানতে বেরিয়েছিল।

নীরেন ভাল ছাত্র, সে মাট্রিক পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করে পাশ করে, আর বিমল ছাত্র হিসাবে ছিল খুবই সাধারণ। তাই সে জানত পাশের হার যেখানে খুবই কম সেখানে তার মতো সাধারণ ছেলের আই. এ. পাশ করা কখনই সম্ভব নয়। আর পাশ করতে না পারলে তার লেখাপড়া এখানেই শেষ।

দেখা যায় বিমলের অনুমান সত্য। সে পাশ করতে পারে নি। খবর জানার পর তাকে বলতে শুনি, "বাস্। স্টুডেন্ট লাইফ খতম হয়ে গেল।"

অন্যদিকে ভালভাবে পাশ করেও নীরেন ফেল-করা বন্ধুর জন্যে খুশি হতে পারে না। সে "ভয় পেয়ে যায়। যা ভেবেছিল ঠিক তাই হল। বন্ধুর বিরাট ও বিকট ব্যর্থতার আঘাতের প্রতিক্রিয়ার প্রথম ধাক্কাটা এখন তাকেই সামলাতে হবে।"

আমরা দেখি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় গল্পের নামকরণে প্রতীকী ব্যঞ্জনা এনেছেন। দেশের এক সামাজিক সত্য এখানে প্রতিফলিত। সমাজের বনিয়াদ অর্থনীতি, পাশফেলের নিয়ন্ত্রকও অর্থনীতি। অর্থনৈতিক উপযোগিতায় পাশফেলের মূল্য বিচার্য। অস্তিত্বের সংগ্রামে নীরেনের পাশফেলের কোন মূল্য নেই। যেমন বিমলের ব্যর্থতাও অর্থনৈতিক দুনিয়ায় বড় করে চোখে পড়ে না। বিশেষত বিমল যেখানে ফেল করার পর আর পড়াশুনার চেষ্টা না করে চাকরির চেষ্টায় মন দিয়েছে। অবশ্য পাশ করার পর কিছু প্রশংসাবাক্য নীরেনের উপর বর্ষিত হয়েছে, কিন্তু এ প্রশংসা মূল্যহীন। পিতা প্রাণেশের নিরুত্তাপ, অসহায় দৃষ্টি নীরেনকে নিরানন্দ করেছে। সমকালীন সমাজসত্য প্রাণেশের নিরুত্তাপ আচরণের মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। পাশ করার পর স্বাভাবিক কারণেই নীরেন আশা করেছিল সে বাবার কাছে যোগ্য অভিনন্দনের দ্বারা সংবর্ধিত হবে। কিন্তু ছোট ভাইবোন এবং ভক্ত কিশোরী বকুল ভিন্ন তার পাশের সংবাদে কেউ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে না। এমন কি তার মাও এই আনন্দের দিনে তাঁর ব্যক্তিগত অবদানের কথা না শুনিয়ে পারেন না, বলেন—"কি আবার বলব? আমি জানতাম তুই পাশ করবি। আমার গয়না ধার নিয়েছিস পাশ করে শোধ দিবি না!"

নীরেন ভাবে, "আজকের বিশেষ দিনটিতেও গয়না দিতে হওয়ার কথাটা মা পর্যন্ত ভুলতে পারে না।"

নীরেন ভেবেছিল বাবা তার সঙ্গে ভবিষ্যৎ নিয়ে একচোট জল্পনা-কল্পনা করবেন। কিন্তু তার বাবা ঘরে এসে সটান বিছানায় শুয়ে পড়েন, "ছেলের সম্পর্কে তাঁর কথা বলবার কোনো উৎসাহই আর দেখা যায় না।"

তাহলে 'পাশফেলে'র মধ্যে প্রভেদটা কোথায়? বিমলের বাড়িতে তার অকৃতকার্যতার জন্যে নীরেন কাউকেই দুঃখ করতে, হাহুতাশ করতে দেখে নি, বরং তার বাবা বলেছেন, "ফেল করেছিস তো? বেশ করেছিস!"

লেখক এই ছোটগল্পে আমাদের দেশের এক বিপর্যস্ত সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনের ছবি তুলে ধরেছেন। যেখানে অসংখ্য বেকারের চাকরীর সুযোগ সীমাবদ্ধ, স্ট্রাইক, লকআউটের দুঃস্বপ্ন নিয়ে কর্মীদের রাত কাটাতে হয়, মায়ের গয়না বিক্রি করে অথবা বড় বোনের বিয়ে বন্ধ রেখে চলে পড়ার খরচ, অর্থের অভাবে ঘটে শিশুমৃত্যু, সেখানে পাশ এবং ফেলের মধ্যে বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। নীরেন শেষ পর্যন্ত জীবন ও মৃত্যুর মধ্যেও বিশেষ কোন প্রভেদ খুঁজে পায় নি, তাই আত্মহত্যার চেষ্টা। জগৎ জীবন সম্পর্কে তার প্রবল অনীহা এসেছে, কারণ বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে উপলব্ধি করেছে এই সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশে পাশফেলের বিশেষ কোন প্রভেদ নেই। সেই কারণে তাকে শুনতে হয়েছে—"বিমল চাকরির চেষ্টা করছে তোমারও এবার রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে।"

'পাশফেল' এই নামের দ্বারা লেখক দেশের সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থাকে

তীব্র ব্যঙ্গের কষাঘাতে জর্জরিত করেছেন। তাঁর মতে দেশের বিপর্যস্ত অর্থনৈতিক অবস্থায় পাশফেলের মূল্য সমান। আমাদের মনে হয় গল্পের নামকরণ যথার্থ হয়েছে।

প্রশ্ন ২। "বাস্, স্টুডেন্ট লাইফ খতম হয়ে গেল।"—বক্তা কে? কাকে, কোন্ প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলা হয়েছে?

উত্তর। এখানে বক্তা হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' গল্পের উপনায়ক বিমল।

বিমল এবং নীরেন দুই বন্ধু আই. এ. পরীক্ষার ফল জানতে যায়। লেখাপড়ায় খুব সাধারণ ছাত্র হলেও নীরেনের মতই গরীবের সন্তান বিমল কষ্ট করে দু' বছর পড়াশুনা চালিয়ে এসেছে। এই কষ্টের উদাহরণ প্রসঙ্গে সে বলেছে—"পড়ার নামে দু'বছর সকলের রক্ত শুষেছি। কেউ বাদ যায় নি, সবাইকে ভুগতে হয়েছে। বাচ্চা বোনটা তো মরেই গেল। আমার কলেজে পড়ার চাপ না থাকলে মরত না, নিশ্চয় মরত না।"

পরীক্ষার ফলাফল জানতে যাবার সময় বিমল বলেছে—"পাশের পার্সেন্টেজ জেনে ভড়কে গেছি। এত ছেলে কচুকাটা হয়েছে তুই যদি না বাদ গিয়ে থাকিস! আমাদের বাড়িতে তো ধরেই রেখেছে আমি এবার নির্ঘাৎ কুপোকাত।" কেবল বাড়িতে নয়—বিমলের নিজের ধারণা ছিল পাশের হার যেখানে এত কম সেখানে অতি সাধারণ ছাত্র হয়ে সে হয়তো পাশ করতে পারবে না।

দেখা যায় বিমলের অনুমান মিথ্যে হয় নি। নীরেন পাশ করেছে আর বিমল করেছে ফেল। ফলাফল জানার ঠিক পরমুহূর্তেই বিমলের মুখ দিয়ে এই কথাগুলি স্বগত উক্তির মত বেরিয়ে এসেছিল। সেই কারণে কথাগুলির বক্তা বিমল হলেও সে কাউকে উদ্দেশ্য করে বলে নি।

প্রশ্ন ৩। 'পাশ করে সে যেন সত্যই নৈতিক আর সামাজিক একটা অপরাধ করে বসেছে। মানুষের জীবন নিয়ে ভাগ্যের খেলার জুয়া আর জুয়াচুরিতে জিতে গেছে।'—প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলোচ্য অংশের তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

উত্তর। আলোচ্য অংশটি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' গল্প থেকে গৃহীত। আলোচ্য গল্পে নীরেন এবং বিমল নামে দুই তরুণ আই. এ. পরীক্ষার ফলাফল জানতে যায়। দুজনেই নিম্ন মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান। বহু কষ্টে ধারদেনা করে গয়না বেচে তাদের পড়ার খরচ চালাতে হয়েছে। পাশের পার্সেন্টেজের খবর শুনে নীরেন ভয় পেলেও দেখা যায় সে পাশ করেছে আর বিমল করেছে ফেল।

বিমল ফেল করায় নীরেনের যে মানসিক অবস্থা হয়েছিল লেখক আলোচ্য অংশে তাই বর্ণনা করেছেন।

প্রথম থেকেই ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করেছে নীরেন। "ভেবেছে যদি দেখা যায় সে পাশ করেছে আর ও পারে নি একসঙ্গে বাড়ি ফিরতে কি বিশ্রী লাগবে দু'জনেরই।" কারণ তখন "নিজের পাশের খবর জেনেও খুশি হবার উপায় থাকবে

না।" অর্থাৎ এটা হল মানবিকতার প্রশ্ন। এই অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে নানা ভাবে নীরেন তার বন্ধুকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছে। বলেছে "আর একবার চেষ্টা কর, এত ছেলে তো ফেল করছে। একবার ফেল করলে কি হয়?"

কিন্তু তার সহপাঠি বন্ধু সেই মুহূর্তে আর পরীক্ষা দেবার কথা ভাবতে পারে না। যদিও তার বিশ্বাস এই অসহনীয় দারিদ্র্যের মধ্যেও তার বাবা হয়তো বলবেন "এত টাকা গেল সময় গেল এনার্জি গেল, আরেকটা বছর চেষ্টা করেই ছাখো, নইলে তো সবটাই লোকসান।"

এরপর বিমল পরীক্ষায় পাশফেলের ব্যাপারটাকে একটা জুয়াখেলার সঙ্গে তুলনা করে বলে "এ জুয়াখেলায় চান্স নিতে আমি রাজি নই।"

বিমল পরীক্ষায় পাশফেলের ব্যাপারটাকে জুয়া খেলার সঙ্গে তুলনা করায় নীরেন মনে মনে বিব্রত বোধ করে, নিজেকে তার মনে হয় অপরাধী। কারণ জুয়াখেলা নীতিগত ভাবে সমাজ-কর্তৃক স্বীকৃত নয়, তাই জুয়াখেলা সামাজিক অপরাধ। এই খেলায় অন্যায়ভাবে একজনকে পরাজিত করে তবেই আর একজন জয়লাভ করে। বিমলের মতে পরীক্ষায় পাশফেল হল জুয়ার মতই এক ভাগ্যের খেলা। জুয়াখেলা যেহেতু নৈতিক ও সামাজিক অপরাধ তাই এই খেলায় যারা জেতে তারাও সেই অপরাধের অংশীদার হয়। এই কথা ভেবে নীরেনের নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়েছে; কারণ সেও জুয়াড়ীদের মত ভাগ্যের জুয়াখেলায় জিতে গিয়ে অন্যদের কপালে লেপে দিয়েছে পরাজয়ের কালিমা। সহপাঠী বন্ধুর মর্মান্তিক মানসিক যন্ত্রণার অংশীদার হয়ে নীরেন যে ঔদার্য ও মহানুভবতার পরিচয় দিয়েছিল আলোচ্য অংশে তার পূর্ব প্রকাশ দেখতে পাই।

প্রশ্ন ৪। "ফেল করা অভিমানী ছেলের সঙ্গে যেন বুঝে শুনে কথা বলে, এ বিষয়ে তাকে সাবধান করে দিতে যায়।"

—ফেল করা অভিমানী ছেলে কে? কাকে সাবধান করে দিতে যায়? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে অভিমানী ছেলের চরিত্র আলোচনা কর।

উত্তর। ফেল করা অভিমানী ছেলে হল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' গল্পের উপনায়ক বিমল।

বিমল আই. এ. পরীক্ষায় তার অকৃতকার্যতার সংবাদ নিয়ে বাড়িতে এসে জানায় "আমি ফেল করেছি মা।"

জ্বরে শয্যাগত ভূপেন ছেলের গলার আওয়াজটাই কেবল শুনতে পেয়েছিল কথা বুঝতে পারে নি। তাই ঘরের ভেতর থেকে বার বার একটা প্রশ্নই করতে থাকে, "বিমল ফিরে এসেছে না? ফেল করেছে তো?"

স্বামীকে বিমলের অকৃতকার্যতার সংবাদ জানাবার জন্যে বিমলের মা ঘরের ভেতরে যায়। সেই সঙ্গে আর একটা বিষয়ে সাবধান করে দেওয়া তিনি প্রয়োজনীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। "বিমল চিরদিন বড় অভিমানী ছেলে, চিরদিন একরোখা।"

সেই কারণেই বিমলের সঙ্গে সংযত হয়ে সাবধানে কথা বলার জন্য তিনি উপদেশ দেন। 'অভিমানী' তরুণের মনে কখনই আঘাত দেওয়া উচিত নয় একথা মায়ের প্রাণ সবার আগে উপলব্ধি করেছিল।

বিমল ছিল 'পাশফেল' গল্পের নায়ক নীরেনের বন্ধু। ছাত্র হিসাবে সে যে নীরেনের মত মেধাবী ছিল না তা ম্যাট্রিক পরীক্ষার রেজাল্টেই প্রমাণ হয়ে গেছে।

আই. এ. পরীক্ষায় বিমল পাশ করতে পারে নি। রেজাল্ট দেখে সে একটু হেসেছে কেবল। "হাসি তো নয় যেন প্রাণের জ্বালার একটা ঝলক।" বলছে "বাস্, স্টুডেন্ট লাইফ খতম হয়ে গেল।"

বন্ধু নীরেন ক্ষীণ কণ্ঠে সান্ত্বনার বাণী শোনাতে যায়, "আর একবার।" কিন্তু বাস্তববাদী বিমল জানে একটি গরীবের সাধারণ ছেলের পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই তার সমস্ত অন্তর প্রতিবাদে গর্জন করে ওঠে। বলে "ক্ষেপেছিস? এমন জানলে কলেজেই ভর্তি হতাম না। পড়ার নামে দু'বছর সকলের রক্ত শুষেছি। কেউ বাদ যায় নি, সবাইকে ভুগতে হয়েছে।"

বাস্তব সত্যকে সহজভাবেই বিমল মেনে নিয়েছে। আজ নিজেকে তার অপরাধী মনে হয়, কারণ সকলকে বঞ্চিত করে এতদিন যে সংসার থেকে সে পড়ার খরচ আদায় করেছে বিনিময়ে সংসারকে ব্যর্থতা ছাড়া আর কিছুই দিতে পারে নি। তাই বিমলের শেষ কথা, "আমি আর পড়ছি না। এ জুয়াখেলায় চান্স নিতে আমি রাজি নই।"

নীরেনকে নিজের বাড়িতে ধরে আনার মধ্যেও বিমলের বাস্তব বোধেরই পরিচয় পাই। সে জানতো বন্ধু সঙ্গে থাকলে তার বাবা-মা এই পরাজয় সংবাদকে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারবে। বাইরের ছেলের সামনে কেউ অশোভন আচরণ করবে না।

বিমলের অনুমান মিথ্যে হয় নি। নীরেন সঙ্গে থাকায় পরিবেশ অনেক হালকা হয়ে গিয়েছিল। শেষে এক সময় মনে হয়েছে পাশফেলের মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। তাই বিমল তার দিদিকে বলে, "আমায় সান্ত্বনা দিতে পাশফেল সব সমান করে দিলি যে দিদি।" দিদি উত্তর দেয় "সমান কখনো হয়? বলছি আজকাল ফেল করাটাও দোষের নয়, লজ্জারও নয়।" এই ভাবে বিমলের প্রাণের জ্বালা আর ব্যর্থতার ক্ষোভ মুছে দিয়ে পরিবারের সকলেই তাকে সান্ত্বনা দিতে চেয়েছে। কারণ, "বিমল বড় অভিমানী ছেলে, চিরদিন একরোখা।"

বিমল অভিমানী একরোখা হলেও ব্যর্থতার গ্লানি তাকে স্পর্শ করে নি। আমরা একসময় নীরেনের বাবার মুখেই শুনি "বিমল চাকরীর চেষ্টা করছে।" এই হল বাস্তববাদী জীবনমুখী চরিত্র। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করার পরিবর্তে সে দারিদ্র্যের হাত থেকে সংসারকে বাঁচাবার সংকল্প গ্রহণ করে আর একটা কঠিন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছে।

প্রশ্ন ৫। এতক্ষণে সে প্রথম অনুভব করতে পেরেছে পরীক্ষা পাশের রোমাঞ্চ—দুটি বছর গরীব ছেলের প্রাণপাত কষ্ট করে সফল হওয়ার উত্তেজক সুখ।"—কার সম্পর্কে কোন্ প্রসঙ্গে একথা বলা হয়েছে? আলোচ্য অংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

উত্তর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' গল্পের নায়ক নীরেন সম্পর্কে লেখক আলোচ্য মন্তব্য করেছেন।

নীরেন ভালোভাবে আই. এ. পরীক্ষায় পাশ করলেও বন্ধু বিমলের জন্য তার খুশি হবার উপায় ছিল না। কারণ সহপাঠী বন্ধু বিমল এই পরীক্ষায় পাশ করতে পারে নি। তাই "মুখখানা ম্লান করে রাখতে হয় নীরেনকে।"

সে জানত "বন্ধুর বিরাট ও বিকট ব্যর্থতার আঘাতের প্রতিক্রিয়ার প্রথম ধাক্কাটা এখন তাকেই সামলাতে হবে।" নানা ভাবে তাই সে বিমলকে সান্ত্বনা দেয়, বলে, "এত ছেলে তো ফেল করছে। একবার ফেল করলে কি হয়?"

বন্ধুকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সদ্য পাশের আনন্দ সে অনুভব করতে পারে না। বিমল একরকম জোর করেই তাকে বাড়িতে ধরে নিয়ে যায়। বলে, "এক মিনিটের জন্যে আয়। খবর জানিয়ে যা।"

বিমলের বাড়িতে তখন প্রায় শোকের পরিবেশ। নিজের পাশের আনন্দকে বন্ধুর ব্যর্থতার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে মানবতার খাতিরেই নীরেনকে মুখে বিষাদের চিহ্ন বজায় রাখতে হয়েছিল।

অবশেষে এই অস্বস্তিকর পরিবেশ থেকে মুক্তি পেয়ে নিজের বাড়ির কাছে এসে নীরেন মুখে হাসিখুশি ভাব আনতে পেরেছিল, যেন প্রথম "পাশ করার আনন্দের স্বাদ পাচ্ছিল।" এতক্ষণ নিজের আনন্দ ভুলে ফেল-করা বন্ধুকে সান্ত্বনা দেওয়াই ছিল তার একমাত্র কাজ।

পিতৃবন্ধু সুজনবাবু যখন বলেন, "বাঃ বাহাদুর ছেলে! এই ফেলের বাজারে এত ভালভাবে পাশ করা তো সোজা ব্যাপার নয়।"

এই প্রশংসার কথা শুনেই নীরেনের অন্তর ভরে যায়। এতক্ষণ সে এই উৎসাহ-ব্যঞ্জক অভিনন্দনই প্রত্যাশা করে এসেছে। কিন্তু মানবিক কারণে বিমলের জন্য সে তার প্রাপ্য থেকে এতক্ষণ বঞ্চিত হয়েছিল।

আলোচ্য অংশে লেখক নীরেনের তৎকালীন মানসিকতার বর্ণনা দিয়েছেন। নীরেন ছিল গরীব বাড়ির ছেলে। বহু কষ্ট, আত্মত্যাগ, আর চোখের জল দু'বছরের প্রাণান্তকর পরিশ্রমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে। পড়ার খরচ চালাতে গিয়ে তার বাবা প্রাণেশকে বাজারে দেনা করতে হয়েছে, মাকে দিতে হয়েছে গায়ের গয়না।" "রেখা আজ সকালেও কান্নাকাটি করেছে, তার একটাও আস্ত জামা নেই। মুদি দোকানে কিছু টাকা না দিলে এবার হয়তো গলায় গামছা দিয়ে অপমান করবে।"

এই হল সংসারের মর্মান্তিক চিত্র, যে সংসার নীরেনের পড়ার খরচ চালিয়ে

এসেছে দুটি বছর। আর নীরেন ভালভাবে আই. এ. পাশ করে সংসারের সার্বিক উৎসর্গকে সার্থক করে তুলেছে। এক কথায় তার সাধনায় আজ সে সিদ্ধিলাভ করেছে। কিন্তু যোগ্য অভিনন্দনের অভাবে সে এতক্ষণ সফল হওয়ার, উত্তেজনার সুখ অনুভব করতে পারে নি। যে সফলতার জন্যে দীর্ঘকাল তাকে অনেক দুঃখ-কষ্ট বরণ করতে হয়েছে সেই সফলতারূপ রুদ্রের প্রসন্ন দক্ষিণ মুখ দর্শনের রোমাঞ্চ অনুভব করার মুহূর্তকে লেখক এখানে তুলে ধরেছেন।

প্রশ্ন ৬। 'সেখানে অবশ্য তার অভ্যর্থনা জোটে দিগ্‌বিজয়ীর মতোই।' —কার অভিনন্দনের কথা বলা হয়েছে? এই অভিনন্দনের চিত্র অঙ্কন কর।

উত্তর। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাশফেল' গল্পের নায়ক নীরেন আই. এ. পরীক্ষায় ভালভাবে পাশ করলেও নানা কারণেই এই সাফল্যের যোগ্য অভিনন্দনের অভাব ঘটে। প্রথমত, পরীক্ষায় অকৃতকার্য বিমলের সঙ্গে থেকে এবং নানাভাবে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে সদ্য পাশের আনন্দদায়ক উত্তেজনা অনুভব করতে পারে নি।

ভেবেছিল বাড়ি ফিরলে সে বাবার কাছে যোগ্য অভিনন্দন পাবে এবং উৎসাহ-ব্যঞ্জক কোন প্রশংসার বাণী শুনবে। কিন্তু নীরেন অবাক হয়ে ভাবে, "প্রাণেশ কিছু বলেন না কেন? প্রাণের হাসি ও গর্ব উজ্জ্বল হয়ে ওঠে না কেন?"

এটাই তো কাম্য। গরীবের ছেলে সে প্রাণপাত পরিশ্রম করে আজ সফল হয়েছে। আর তাকে, "পাশ করানোর জন্য সেও গায়ের রক্ত জল করেছে।" কিন্তু ছেলেকে অভিনন্দিত করার পরিবর্তে প্রাণেশ এমন কথা বলেন, শুনে মনে হয় "বিমলের ফেল করা আর ছেলের পাশ-করা ব্যাপারটারই যেন বিশেষ কোন মূল্য নেই।"

বাবার কাছে ঠিক মত অভিনন্দন না পেয়ে ক্ষুণ্ণ হয়ে নীরেন বাড়ির ভেতরে যায়। সেখানেই তার অভ্যর্থনা জোটে ঠিক দিগ্‌বিজয়ী বীরের মত। নীরেনকে অভিনন্দিত করার জন্য উপস্থিত ছিল তার ছোটো ছোটো ভাই-বোনেরা। এরা সকলেই নীরেনের পাশের সংবাদ পেয়ে —"হৈ হৈ চেঁচামিচি শুরু করে দেয়। তের বছরের বোন রেখা উঠানে গিয়ে চেঁচিয়ে উপরতলায় খবর পাঠিয়ে দেয়, বকুলদি! ও বকুলদি! দাদা পাশ করেছে!"

ছোটো ছোটো ভাই-বোনেদের সে যেন এক আনন্দের উৎসব। এই উৎসবে যোগ দেয় নীরেনের এক কিশোরী ভক্ত। নাম তার বকুল। বকুল "হাসিমুখে হাতটা নীরেনের দিকে বাড়িয়ে বলে, ছুঁয়ে দাও, পাশের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দাও। ছোঁয়া লেগে আমিও যদি উতরে যাই।" নীরেনের মা কোন কথা না বললেও তাঁর মুখের হাসি আর চোখের গর্বভরা চাউনিতেই নীরেনের প্রাণ ভরে গিয়েছিল।

এইভাবে গরীবের ছেলে নীরেন দিগ্‌বিজয়ী বীরের মত পরীক্ষা পাশের সাফল্যে সেদিন অভ্যর্থনা লাভ করেছিল।

প্রশ্ন ৭। "হাসিমুখে হাতটা নীরেনের দিকে বাড়িয়ে বলে, 'ছুঁয়ে দাও পাশের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দাও। ছোঁয়া লেগে আমিও যদি উতরে যাই।"

—বক্তা কে? কাকে উদ্দেশ্য করে এই কথা বলা হয়? প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আলোচ্য অংশের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর এবং বক্তার চরিত্র অঙ্কন কর।

উত্তর। আলোচ্য অংশের বক্তা হল 'পাশফেল' গল্পের নায়ক নীরেনের এক কিশোরী ভক্ত ও শুভানুধ্যায়ী। নাম তার বকুল। সে ছিল ম্যাট্রিক পরীক্ষার্থিনী।

বকুল তার আদর্শ মেধাবী ছাত্র নীরেনকে উদ্দেশ্য করে উচ্ছ্বাসভরা এই কথাগুলি বলেছিল।

নীরেন বাবার কাছে যোগ্য অভিনন্দন না পেয়ে ক্ষুণ্ণমনে বাড়ির ভেতরে আসে। সেখানে তার অভ্যর্থনা জোটে দিগ্‌বিজয়ী বীরের মত। পাশের সংবাদ পেয়ে ভাইবোনেরা "হৈ হৈ চেঁচামেচি শুরু করে দেয়।" ছোটো ছোটো ভাইবোনদের সেদিন যেন এক আনন্দের উৎসব। এই উৎসবে যোগ দিতে আসে বকুল নামে নীরেনের এক কিশোরী ভক্ত। বকুল কেবল নীরেনের ভক্ত ছিল না, সে ছিল নীরেনের কাছে একমুঠো মুক্তির আকাশ। তাই বকুলকে নীরেন তার ভবিষ্যতের সব পরিকল্পনার কথা বলত।

বকুল তখন ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে রেজাল্টের জন্যে অপেক্ষা করছিল। তার আগেই আই. এ. পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশিত হয় এবং সেই পরীক্ষায় তার আদর্শ ছাত্র নীরেন ভালভাবে পাশ করায় ছাত্রীজীবনের আদর্শ মেধাবী তরুণকে সে যে আবেগপূর্ণ উচ্ছ্বাসময় ভাষায় অভিনন্দিত করে তাই আলোচ্য অংশে বর্ণিত। সাধারণের বিশ্বাস স্পর্শমণির ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়, চন্দনবৃক্ষের স্পর্শে সাধারণ বৃক্ষও চন্দন-গন্ধ প্রাপ্ত হয়। সেই বিশ্বাসের বশে কিশোরী মেয়ে হঠাৎ আনন্দের সংবাদ পেয়ে তার অন্তরের আবেগ-উচ্ছ্বাস, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা প্রকাশ করতে গিয়ে 'পাশের ছোঁয়াচ' লাগিয়ে দেবার কথা বলেছিল। বিশেষ বিশেষ মুহূর্তে আবেগ-উচ্ছ্বাসময় ভাষার আক্ষরিক কোন অর্থ থাকে না। কেবল শব্দগুলিকে কেন্দ্র করে একটা অব্যক্ত মাধুর্য ব্যক্ত হয়। আলোচ্য অংশে আমরা সেই অব্যক্ত মাধুর্যই ব্যক্ত হতে দেখি।

বকুল ছিল উজ্জ্বল ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন। সে ছিল নীরেনের কাছে একমুঠো মুক্তির আকাশ। তাই নীরেন তার সঙ্গে বসে ভবিষ্যতের নানান পরিকল্পনা করত। নীরেনের পাশের সংবাদ পেয়ে সে বলেছিল, "ছুঁয়ে দাও, পাশের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দাও। ছোঁয়াচ লেগে আমিও যদি উতরে যাই।"

এ হল নিষ্পাপ কিশোরী মনের আন্তরিক শ্রদ্ধা। যে, শ্রদ্ধা নিয়ে ভক্ত মানুষ দেবতাকে স্পর্শ করে।

বকুলের সঙ্গে দরিদ্র ঘরের মেধাবী ছাত্র নীরেন কথা বলে আনন্দ পেত শান্তি পেত, কারণ বকুল ছিল ভবিষ্যতের রঙীন স্বপ্ন। বকুল নীরেনের কথা মন দিয়ে শুনত, কারণ নীরেন ছিল তার আদর্শ প্রেরণা, যার ছোঁয়াচ লাগলে পরীক্ষা সিন্ধু

উতরে যাওয়া যায়। এই আবেগ-কল্পনা কিশোরী মনেরই নিজস্ব সম্পদ। বকুলকে লেখক সর্বকালের রোমান্টিক এক কিশোরী কন্যারূপেই গল্পে উপস্থিত করেছেন।

প্রশ্ন ৮। 'পাশফেল' গল্পে নীরেনের আত্মহত্যায় কাহিনীর সমাপ্তি ঘটেছে। নীরেনের এই মৃত্যুর জন্য কে বা কারা দায়ী তা বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দাও।

উত্তর। 'পাশফেল' গল্পে নীরেন ভালভাবে আই. এ. পাশ করেও বি. এ. পড়ার সুযোগ পায় নি। ফল প্রকাশের দু-চারদিন পরেই নীরেনের বাবা প্রাণেশ সেই হৃদয়-বিদারক কথাটা তাকে শুনিয়ে দেয়, "বিমল চাকরির চেষ্টা করছে, তোমারও এবার রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে নইলে আর চলে না।"

এই মন্তব্য থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় নীরেনকে পড়াবার ক্ষমতা তার পরিবারের নেই। সেদিন রাত্রেই নীরেন আত্মহত্যার জন্যে বিষ খেয়েছিল। এইভাবে 'পাশফেল' গল্পের সমাপ্তি ঘটেছে।

এখন আমাদের আলোচ্য বিষয় হল নীরেনের এই মৃত্যুর জন্যে কে বা কারা দায়ী তা বিশ্লেষণ করে দেখা। প্রথমেই মনে রাখতে হবে নীরেন "আত্মহত্যার জন্যে বিষ খেয়েছিল, এখন সংকটাপন্ন অবস্থায় হাসপাতালে আছে।" 'পাশফেল' গল্প থেকে আমরা কেবল এই তথ্যটুকু লাভ করি। 'সংকটাপন্ন অবস্থা' এবং 'মৃত্যু' এক জিনিস নয়। তবে প্রশ্ন হতে পারে তাকে আত্মহত্যার জন্য কে বা কারা ইন্ধন যুগিয়েছিল। ভালভাবে পাশ করেও নীরেন পাশের আনন্দ উপভোগ করতে পারে নি, কারণ বিমলের ব্যর্থতা। দু'জনেই তারা গরীব ঘরের সন্তান। তাই ফেল করার অর্থ যে কী তা দু'জনেই বুঝতে পারে। নীরেন তাকে সান্ত্বনা দিলেও নিজেই সে তেমন জোর পাচ্ছিল না। নিম্ন মধ্যবিত্ত বাড়ির সন্তান হয়ে সে জানত বিমলের পক্ষে আবার লেখাপড়া করা কত শক্ত। এক সময় নীরেনের মনে হয়েছিল পাশ করে সে যেন সত্যি সত্যি নৈতিক আর সামাজিক একটা অপরাধ করে বসেছে।

বাড়ির কাছে এসেই এতক্ষণ বাদে নীরেন যেন প্রথম পাশ করার আনন্দের স্বাদ পেল। তার পিতৃবন্ধু সুজনবাবু বলেন—'বাহাদুর ছেলে! এই ফেলের বাজারে এত ভালভাবে পাশ করা তো সোজা ব্যাপার নয়।'

এরপর নীরেনের ছোটো ভাইবোনেরা ছুটে আসে, আসেন মা, দীনেশবাবুর মেয়ে বকুল। তাদের কাছে অভিনন্দন পেয়ে পরীক্ষা পাশের রোমাঞ্চ অনুভব করে নীরেন। অফিসের ব্যাপারে সেদিন নীরেনের বাবা খুবই চিন্তিত ছিলেন, তাই ছেলের পাশের আনন্দে যোগ দিতে পারেন নি, অথবা তার ভবিষ্যৎ নিয়েও কোন জল্পনা-কল্পনা করেন নি। তিনি তখন টোকেন স্ট্রাইকের পর অফিসের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত। তাঁর কাছে পাশফেল সবই সমান।

নীরেনের কয়েকটা দিন ভালই কেটেছে সদ্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া মেয়ে বকুলের সঙ্গে বসে ভবিষ্যৎ পড়াশুনার গল্প করে। তারপর একদিন প্রাণেশ সেই হৃদয়-

বিদারক কথাটা তাকে শুনিয়ে দেন—"বিমল চাকরীর চেষ্টা করছে তোমারও এবার রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে, নইলে আর চলে না।"

এই ঘটনার পরেই নীরেন আত্মহত্যার জন্যে বিষ খেয়েছিল। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে নীরেনের মানসিক দুর্বলতা এই বিষপানের জন্যে দায়ী। সে ছিল আশাবাদী তরুণ, সে আরও ভালভাবে বি. এ. পড়ার স্বপ্ন দেখেছিল, বকুলের সঙ্গে বসে তৈরি করেছিল ভবিষ্যতের পরিকল্পনা। নীরেন বলেছে "বি. এ.-তে সে আরও ভাল রেজাল্ট করবে। এবার আরেকটু শক্ত হবে, লোককে বুঝিয়ে দেবে যে উঁচুদিকের পরীক্ষায় কোন ছেলে যদি ভাল রেজাল্ট করতে চায় সংসারের দশটা বাজে কাজের ঝামেলা তার ঘাড়ে চাপালে চলে না। উত্তরে বকুল বলে, "সত্যি।"

বাস্তবের আলোতে নীরেনের স্বপ্ন টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়ে, সে বুঝতে পারে বিমলের মতই তার "স্টুডেন্ট লাইফ খতম হয়ে গেল।" কিন্তু সে তো বিমলের মত ফেল করে নি, ফেলের বাজারেও ভালভাবে পাশ করেছে। কিন্তু অস্তিত্বের সংগ্রামে এ পাশের কোন মূল্য নেই। সুতরাং পাশ করেও জীবনযুদ্ধে সে ফেল করেছে। এদিক থেকে বিচার করলে বলা চলে দায়ী হল নীরেনের দুর্বল মানসিকতা ও আশাহীনতা। কিন্তু এটা আংশিক সত্য। সমাজের অর্থনৈতিক অবস্থাও নীরেনের বিষপানের জন্য দায়ী। আমাদের সমাজ কলেজী শিক্ষাকে চাকরি লাভের উপায় বলে মনে করে। এর কারণ আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থা। নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবার তাই ঘটিবাটি বেচে ধারদেনা করে ছেলেকে কলেজী শিক্ষা দেয়, যাতে তারা একদিন চাকরি করে সংসারের হাল ধরতে পারে। প্রাণেশ তাঁর ছেলেকে বলেছেন—"তুমি বড়ো হয়েছো, সংসারের কথাটাও এবার তোমায় একটু ভাবতে হয়।...বিমল চাকরির চেষ্টা করছে, তোমারও এবার রোজগারের চেষ্টা দেখতে হবে, নইলে আর চলে না।"

দরিদ্র ঘরের সন্তানকে ধারদেনা করে গয়না বেচে লেখাপড়া শেখানো হয়, একদিন সেই সন্তান চাকরী করে সংসার দেখবে কেবল এই প্রত্যাশায়। অর্থাৎ উচ্চশিক্ষা হল একটা মূলধন। অধিক উৎপাদনের জন্যে কলকারখানার মূলধনের সঙ্গে এর বিশেষ প্রভেদ নেই। সমাজের অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বেকার সমস্যা, উৎপাদন বণ্টনের অসম ব্যবস্থা, মুদ্রাস্ফীতি, অবক্ষয়, স্ট্রাইক ইত্যাদিও পরোক্ষভাবে নীরেনকে আত্মহত্যায় প্ররোচিত করেছে। এক সময় কলেজীয় উচ্চশিক্ষা সমাজের চোখে মূল্যবান ছিল। কারণ পরীক্ষায় পাশ করলে জীবিকা সংস্থানের সুরাহা হত। কিন্তু অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমাজ-কাঠামোকে বদলে দিয়েছে। এখন আর পাশ করলেই চাকরীর ছাড়পত্র পাওয়া যায় না। প্রতিযোগীর সংখ্যা অনেক, জীবিকা সংস্থানের সুযোগ সীমিত। উপযোগিতার কষ্টিপাথরে এখন পাশের মূল্য বিচার্য। তাই—চাকরীর বাজারে পাশ করা আর না করা সমান। লেখক বলেছেন—"বিমল ও নীরেন পরীক্ষায় বিপরীত ফল করলেও সংসার তাদের একই সমতলে নামিয়ে এনেছিল।" সেই কারণে বলা চলে সমাজব্যবস্থা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়

পরোক্ষভাবে এই অঘটনের জন্যে দায়ী। যদিও নীরেনের অত্যধিক আবেগ-উচ্ছ্বাস স্বপ্ন কল্পনা এবং দুর্বল মানসিকতাই আপাতদৃষ্টিতে বিষপানের জন্যে দায়ী বলে মনে হয়।

প্রশ্ন ৯। 'পাশফেল' গল্পের কাহিনী বিবৃত করে গল্পটির নামকরণ কতদূর সার্থক হয়েছে লেখ। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

উত্তর। পৃঃ ১৬, ১নং প্রশ্ন দেখ।

প্রশ্ন ১০। 'পাশফেল' গল্পে, মধ্যবিত্ত জীবনের অর্থনৈতিক ক্লিষ্টতার যে মর্মান্তিক চিত্র অঙ্কিত হয়েছে তার বিশদ পরিচয় দাও।

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

উত্তর। পৃঃ ৯ দেখ।

প্রশ্ন ১১। 'পাশফেল' গল্পটির কেন্দ্রীয় চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে দেখাও। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

উত্তর। পৃঃ ১০ দেখ।

প্রশ্ন ১২। পরীক্ষায় পাশ করেও নীরেন বিষ খেল কেন, তা 'পাশফেল' গল্পটির কাহিনী অবলম্বনে সংক্ষেপে বর্ণনা কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

এই গল্পে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমাজসচেতন দৃষ্টিভঙ্গীর যে পরিচয় রয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখাও।

উত্তর। পৃঃ ৯ এবং ১নং প্রশ্ন দেখ।

অনুশীলনী

১। ছোটগল্প হিসাবে 'পাশফেল' গল্পের মূল্য নিরূপণ কর।

২। 'পাশফেল' গল্পের নায়ক কে যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৩। 'পাশফেল' গল্পের উপনায়ক কে যুক্তিসহ আলোচনা কর।

৪। 'পাশফেল' গল্পের গৌণ চরিত্রগুলি আলোচনা কর।

৫। 'পাশফেল' গল্পে প্রাণেশের চরিত্র আলোচনা কর। কি কারণে নীরেনের রেজাল্ট জানায় তার আগ্রহের অভাব ছিল ?

৬। পাশফেল গল্পের নামকরণের সার্থকতা বিচার কর।

৭। "যার আগ্রহ আছে তার সঙ্গেই আলোচনা করা যাক আজ পাশ করার মধ্যে তার কোন্ ভবিষ্যৎ সূচিত হল।"—কার সম্পর্কে, কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলা হয়েছে ?

৮। 'বাড়িতে যে উদাসীনতা তাকে ব্যথিত করেছিল সেটা কেটেছে বাইরের মানুষের সাদর অভিনন্দনে'।—কার সম্পর্কে বলা হয়েছে ? বাড়ির উদাসীনতা কি ? কেন এই উদাসীনতা ? বাইরের মানুষের সাদর অভিনন্দন কেমন ছিল ?

৯। "পাশের ছোঁয়াচ লাগিয়ে দাও। ছোঁয়াচ লেগে আমিও যদি উতরে যাই।" —কে, কোন্ প্রসঙ্গে এই কথাগুলি বলেছিল ? বক্তার চরিত্র আলোচনা কর।

১০। নীরেন এবং বিমলের পারিবারিক জীবনের যে ছবি লেখক অঙ্কন করেছেন তা তোমার নিজের ভাষায় লেখ।

১১। 'পাশফেল' গল্পের দুটি মহিলা চরিত্র আলোচনা কর।

১২। 'পাশফেল' গল্পের উপনায়ক কে? তার সম্পর্কে আলোচনা কর এবং তার পারিবারিক অবস্থা কেমন ছিল সংক্ষেপে বল।

১৩। 'পাশফেল' গল্পে কে কি কারণে বিষ খেয়েছিল, আলোচনা কর। সেই প্রসঙ্গে তার চরিত্র আলোচনা কর।

১৪। 'বাস্, স্টুডেণ্ট লাইফ খতম হয়ে গেল।'—কে, কোন্ প্রসঙ্গে এই কথা বলেছিল? বক্তার চরিত্র আলেচেনা কর।

সহায়ক পাঠের অতিরিক্ত প্রশ্নোত্তর

শাস্তি

প্রশ্ন ১। 'শাস্তি' গল্পের বিষয়বস্তু ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-সচেতনতার পরিচয় দাও। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

উত্তর। পৃঃ ১৮, ১নং প্রশ্ন দেখ।

প্রশ্ন ২। 'শাস্তি' গল্পটির নিসর্গ বর্ণনার পরিচয় দাও। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫] **এই বর্ণনা গল্পের প্রয়োজনে কীভাবে ব্যবহৃত হয়েছে বিশ্লেষণ করে দেখাও।**

উত্তর। গল্পটা লেখার সময় পদ্মা নদীর প্রকৃতির দিকে কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল এ কল্পনা সঙ্গত কারণেই করা যেতে পারে। এমনও হতে পারে শ্রাবণের ঘন মেঘচ্ছায়া কবির মনের মধ্যে একটি স্তম্ভিতাশ্রু কাহিনীর ছায়াপাত করেছিল।

গল্পের প্রায় গোড়ার দিকেই যখন দুখি আর ছিদাম ক্লান্ত দেহে ঘরে ফিরেছে তখনকার বর্ণনাটুকু দেখি :

"বাহিরেও অত্যন্ত গুমট। দুই প্রহরের সময় খুব একপসলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। এখনও চার দিকে মেঘ জমিয়া আছে। বাতাসের লেশমাত্র নাই।"

এ যে দু-ভাইয়ের জীবনের ছবি! যে ট্রাজেডি তাদের জীবনে ঘটতে যাচ্ছে তারই প্রতিচ্ছবি যেন এই প্রকৃতি-বর্ণনা। রাধার মৃত্যুজনিত ভয়াবহ গুমট এবং দুই ভায়ের স্তম্ভিত মূর্তি এই প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে যেন একাকার হয়ে গিয়েছে।

"ঝগড়ার বর্ণনায় আছে : ছোট জা চন্দরা ভূমিতে অঞ্চল পাতিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া আছে—আজিকার এই মেঘলা দিনের মতো সে-ও মধ্যাহ্নে প্রচুর অশ্রুবর্ষণ পূর্বক সায়াহ্নের কাছাকাছি ক্ষান্ত দিয়া অত্যন্ত গুমট করিয়া আছে।"

এ বর্ণনা শুধু পটভূমি নয়, নিসর্গ বা মানুষকে সম্পূর্ণ একাকার করে দেখা। দুখির আঘাত মাথা পেতে নিল রাধা, আর শাস্তিকে মাথা পেতে নিল চন্দরা। উদাসীন প্রকৃতি। প্রত্যহের মতই তা অবিকৃত, অচঞ্চল। চন্দরারা মরবেই,

সমাজও অমনি উদাসীনই রইবে, রইবে অচঞ্চল। "বাহিরে তখন পরিপূর্ণ শান্তি'—শুধু এইটুকু কথাতেই অনুভূতিলেশহীন জড় সমাজের হৃদয়টি উদ্‌ঘাটিত।

শিল্পের ধর্ম আত্মগুপ্তিতে। বাস্তবধর্মী গল্পটিতে প্রকৃতি আছে। কিন্তু অতি সামান্য একটি অংশে, কিন্তু এই সামান্যই অসামান্য হয়ে উঠেছে। গল্পটির রসনিস্পত্তিতে ফল্গুধারার মতই কাজ করেছে এই প্রকৃতি। অংশতঃ থেকেও তা বিস্তারিত হয়েছে সমস্ত গল্প জুড়ে। সার্থক শিল্প কর্মের এই তো ধর্ম।

প্রশ্ন ৩। 'শাস্তি' গল্পের কাহিনী বিশ্লেষণ করে এরূপ নামকরণের সার্থকতা নিরূপণ কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

উত্তর। পৃঃ ৯ দেখ।

প্রশ্ন ৪। ছোটগল্পের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। 'শাস্তি' গল্পটি ছোটগল্প হিসেবে কতখানি সার্থক হয়েছে আলোচনা করে দেখাও।

[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

উত্তর। পৃঃ ৭ দেখ।

প্রশ্ন ৫। 'শাস্তি' গল্পে চন্দরার শাস্তিলাভের জন্য কে দায়ী—সে নিজে, তার স্বামী, না সমাজ ব্যবস্থা—বিশ্লেষণ করে দেখাও। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

উত্তর। রবীন্দ্রনাথের 'শাস্তি' গল্পে আমরা দেখি হত্যাপরাধে ছোট বউ চন্দরার ফাঁসির হুকুম হয়। জজসাহেব বলেছিলেন, "তাহার শাস্তি ফাঁসি।" এই শাস্তি লাভের জন্য কে দায়ী তা আলোচনা করার পূর্বে সংক্ষেপে ঘটনা বিবৃতির প্রয়োজন আছে।

দুখিরাম রুই এবং ছিদাম রুই ছিল নিরন্ন, দরিদ্র পরিবারের মানুষ। ঘটনার দিন দু-ভাই জমিদারের কাছারি ঘরে কাজ করতে গিয়েছিল। নদীর চরে তাদের জমিতে হয়তো জলি ধান পেকেছিল, কিন্তু তারা ক্ষেতের কাজ করবার সময় পায় নি। লেখকের ভাষায়, "কাছারি হইতে পেয়াদা আসিয়া এই দুই ভাইকে জবরদস্তি করিয়া ধরিয়া লইয়া গেল। কাছারির ঘরে চাল ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে জল পড়িতেছিল তাহাই সারিয়া দিতে এবং গোটাকতক ঝাঁপ নির্মাণ করিতে তাহারা সমস্ত দিন খাটিয়াছে।" এই অবস্থায় তারা সারাদিন বৃষ্টিতে ভিজেছে, রোদে পুড়েছে, ক্ষুধার অন্ন পায় নি, পায় নি পাওনা মজুরি। "তাহার পরিবর্তে যে-সকল অন্যায় কটুকথা শুনিতে হইয়াছে, সে তাহাদের পাওনার অনেক অতিরিক্ত।"

এই মানসিক অবস্থায় সেদিন ঘরে ফিরে ক্ষুধার্ত দুখিরাম স্ত্রীর কাছে ভাত চেয়ে পেয়েছে শুধুই ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ! সারাদিনের শ্রান্তি ও লাঞ্ছনার পর অন্নহীন নিরানন্দ অন্ধকার ঘরে স্ত্রীর শ্লেষ-মিশ্রিত রুক্ষ বচন শুনে দুখিরাম নিজেকে সংযত রাখতে পারে নি। তার হাতের দা সবেগে স্ত্রীর মাথার ওপর নেমে আসে, এই আঘাতে "রাধা তাহার ছোট জায়ের কোলের কাছে পড়িয়া গেল এবং মৃত্যু হইতে মুহূর্ত বিলম্ব হইল না।"

এই হত্যার ঘটনাকে কেন্দ্র করেই 'শাস্তি' গল্প রচিত এবং চন্দরার শাস্তিলাভের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে গল্পের সমাপ্তি। আমাদের বিচার্য হল তার শাস্তির জন্য দায়ী কে?

রাধাহত্যার পরমুহূর্তেই আমরা দেখি বড় ভাইকে আইনের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য ছোট ভাই হত্যাপরাধ ছোট বউ চন্দরার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে। ছিদাম তাকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিল, "যাহা বলিতেছি তাই কর, তোর কোন ভয় নাই, আমরা তোকে বাঁচাইয়া দিব।"

স্বামীর এই অনুরোধে চন্দরা "একেবারে বজ্রাহত হইয়া গেল।" তার চোখের সামনে দুখিরাম রাধাকে হত্যা করে অথচ সেই হত্যার দায়-দায়িত্ব ছিদাম তাকে গ্রহণ করতে বলায় প্রথমে সে মৃদু আপত্তি তোলে, কিন্তু জোর করেই তার উপর হত্যাপরাধ চাপিয়ে দেওয়ায় সে বাধ্য হয়েই স্বীকার করে, "হাঁ, আমি খুন করিয়াছি।" এটা চন্দরার অভিমানের কথা। সে স্বামীকে বলতে শুনছে, "ঠাকুর বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।" স্বামীর এই কথায় অভিমানী চন্দরার আত্ম-মর্যাদায়, ভালোবাসায় আঘাত লাগে। সেও তখন মরিয়া হয়ে প্রতিশোধ-গ্রহণে সচেষ্ট হয়। চন্দরা জানত স্বামী তাকে ভালোবাসে। সেই কারণেই সে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে স্বামীকে নিষ্ঠুরতম আঘাত দিতে চেয়েছে। লেখকের ভাষায় বলা যায়, "এমন একগুঁয়ে মেয়েও তো দেখা যায় না। একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না। এ কী নিদারুণ অভিমান।"

চন্দরার স্বামী ছিদাম মনে-প্রাণে চন্দরাকে শাস্তি দিতে চায় নি। তার ধারণা ছিল সাময়িকভাবে স্ত্রীর উপর হত্যাপরাধ চাপিয়ে দিয়ে বড়-ভাইয়ের জীবন রক্ষা করা। সাময়িক বিপদ থেকে রক্ষা পেলে ছিদামের হয়তো বিশ্বাস ছিল আইনের চোখে ধুলো দিয়ে সে স্ত্রীকে রক্ষা করতে পারবে। তাই স্ত্রীকে শিখিয়েছিল, "তুই বলিস, বড়ো জা আমাকে বঁটি লইয়া মারিতে আসিয়াছিল, আমি তাহাকে দা লইয়া ঠেকাইতে গিয়া হঠাৎ কেমন করিয়া লাগিয়া গিয়াছে।" কিন্তু যে "একেবারে প্রাণপণে ফাঁসিকাষ্ঠের দিকে ঝুঁকিয়াছে, কিছুতেই তাহাকে টানিয়া রাখা যায় না।" ছিদামও তাকে রক্ষা করতে পারে নি। তাই জজসাহেবের কাছে শেষ মুহূর্তে ছিদাম হত্যাপরাধ নিজের কাঁধে তুলে নেবার চেষ্টা করেছে। সে বলেছে "আমি খুন করিয়াছি।" দুখিরামও শেষ মুহূর্তে সত্য ঘটনাই কবুল করে নিজের দোষ নিজের কাঁধে নিতে চেয়েছে। কিন্তু "Truth is stronger than fiction."—তাই জজসাহেব তাদের কথায় কর্ণপাত করেন নি। চন্দরার শাস্তি হয়ে গেছে।

আপাত-দৃষ্টিতে মনে হতে পারে ছিদামের ভ্রাতৃ-প্রীতি, স্বার্থপরতা এবং আইন-বিষয়ক অজ্ঞতা, চন্দরার শাস্তির জন্য দায়ী। আবার কখনও মনে হয় চন্দরার সীমাহীন অভিমান তার নিজের শাস্তির জন্য দায়ী। কিন্তু এগুলি আংশিক সত্য, পূর্ণসত্য নয়। তার শাস্তির জন্য সম্পূর্ণ দায়ী সমাজ-ব্যবস্থা। যে সমাজ-ব্যবস্থার শিকার তাদের মত দুর্বল, নিরন্ন অসংখ্য-কৃষক পরিবার। জমিদার-মহাজনের নির্যাতন দুখিরামের মত শ্রান্ত ক্ষুধার্ত মানুষকে মুহূর্তে পশুর মতই উত্তেজিত করে তোলে। এই উত্তেজনার বলি রাধা। যদি রাধা-হত্যার ঘটনা না ঘটত

তাহলে চন্দরার শাস্তিবিধানের প্রশ্ন উঠত না। সেই কারণে চন্দরা বা তার স্বামী নয় আমাদের নিষ্ঠুর সমাজ-ব্যবস্থাই চন্দরার শাস্তি লাভের জন্য দায়ী।

প্রশ্ন ৬। 'শাস্তি' গল্পটি অবলম্বনে ছিদাম চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।
[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

উত্তর। পৃঃ ১১ দেখ।

প্রশ্ন ৭। শাস্তি গল্পটি অবলম্বনে চন্দরা চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।
[নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

উত্তর। পৃঃ ১৩ দেখ।

মহেশ

প্রশ্ন ১। 'মহেশ' গল্পের ঘটনা ও চরিত্র বিশ্লেষণ করে শরৎচন্দ্রের সমাজ-চেতনার ও মানবদরদী দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দাও। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

উত্তর। পৃ: ১৩, প্রশ্ন ১ দেখ।

প্রশ্ন ২। একটি মূক পশুকে অবলম্বন করে 'মহেশ' গল্পে যে জীবনরস পরিবেশিত হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখাও। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

উত্তর। গফুর জোলার বাড়ির প্রাচীরটা পড়ে গিয়ে প্রাঙ্গণে মিশে অন্তঃপুরের লজ্জাসম্ভ্রম পথিকের করুণায় আত্মসমর্পণ করেছে। তা করুক, তবু গফুরের বাড়ি স্নেহের একটি নীড়, জীবনরসে উচ্ছলিত। গফুর আছে, আছে মা-মরা মেয়ে আমিনা। আর একজন আছে, এই বাড়িরই পরিবারভুক্ত সে। সে মহেশ—একটি ষাঁড়। মুখে তার কথা নেই বটে, তবু সে এই স্নেহনীড়েরই একজন আপনজন। বাপ-বেটীর জীবনচর্চার প্রধান অবলম্বন তো সে-ই। আশ্চর্য এক ত্রিমুখী স্নেহ। পিতার প্রতি কন্যার টান, কন্যার প্রতি পিতার টান, আর পিতা ও কন্যার টান ঐ অবোলা জীবের প্রতি; কে বলে সে অচেতন? জীবনের সমস্ত রুক্ষতার মধ্যে যারা স্নেহ-ধারা ঢেলে চলেছে তাদের প্রতি ঐ মূক প্রাণীটির চাহনিই বলে দেয়—সে সব বোঝে, সব জানে।

'বাবা ভাত খাবে এসো।'—আমিনার আহ্বান।

কিন্তু অসুস্থতার অভিনয় করে সে ভাত যে গফুর মহেশকে খাওয়াতে চায় আমিনা যেন তা বুঝেও বোঝে না। পিতা ও কন্যার মাঝখানে এই যে একটুখানি ছলনার অভিনয় হয়ে গেল, এই অভিনয়ে যে জীবনরস উচ্ছলিত, সম্পন্ন গৃহস্থের প্রাচুর্যের মধ্যেও কি তা আছে?

মহেশের জন্যেই যত জ্বালা! ঠিকই। তবে যার বুক স্নেহে উচ্ছ্বসিত এ জ্বালার মধ্যেও যে তার অপার আনন্দ। মহেশকে গোহাটায় বেচতে গিয়েও যে গফুর তাকে ফিরিয়ে নিয়ে এল, জীবনরহস্যের এ এক আশ্চর্য কৌতুক!

স্নেহের দ্বন্দ্ব কী আশ্চর্য ভূমিকা নিল! আমিনা পড়ে গিয়েছে, বিক্ষিপ্ত ভাঙা ঘট থেকে জল ঝরে পড়ছে। মহেশ মাটিতে মুখ দিয়ে মরুভূমির মত সেই জল খাচ্ছে। আমিনার জন্যে পিতৃস্নেহের নিঃস্রাব হঠাৎ নিষ্ঠুরতায় অনূদিত হয়ে মহেশের প্রাণ

নিল। জীবন অলক্ষ্যে হাসল। প্রাণের মধ্যেই যে বাসা বেঁধেছে, সে যে প্রাণের মধ্যেই অমর হয়ে থাকে। মহেশ গফুরের হৃদয়েই প্রাণবন্ত হয়ে রইল। আর সে কারো ক্ষেতে মুখ দেবে না। তার জন্যে আর কারো কাছে গঞ্জনা সহ্য করতে দেবে না গফুরকে।

স্নেহ শেষে হয় ক্ষমাহীন বিদ্রোহী—"আল্লা। আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখে নি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।" গ্রাম থেকে বিদায় নেবার সময় রুক্ষ মাটি চোখের জলে ভিজিয়েছে গফুর। ঐ চোখের জলই বলে দিচ্ছে 'আমি জীবনরসেরই আর এক রূপ।'

প্রশ্ন ৩। 'মহেশ' গল্পে গফুর ও আমিনার মতোই মূক পশু মহেশও একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে"—আলোচনা কর। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

উত্তর। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পটি মানুষের সঙ্গে মানবেতর একটি প্রাণীর নিবিড় সৌহার্দ্যের রূপচিত্র। 'মহেশ' গল্পের মহেশ ছিল একটি বৃদ্ধ বলদ। গফুর তাকে নিজের সন্তান বলেই মনে করত। কারণ মহেশ তাকে আটসন চাষের কাজে সাহায্য করে বুড়ো হয়েছে।

গফুর তাকে নিজের পরিবারের একজন বলেই মনে করত। আমিনা এবং মহেশ দুজনেই তার কাছে ছিল সমান। দুজনের প্রতি গফুরের ছিল সীমাহীন স্নেহ ও মমতা।

আলোচ্য গল্পে শরৎচন্দ্র কেবল মানবেতর একটি প্রাণীর প্রতি মানুষের সেই প্রীতিই প্রকাশ করেন নি। লেখকের শিল্পীপ্রাণের দরদ ও সহানুভূতির স্পর্শে মূক বধির বৃদ্ধ ষাঁড়ও মননশীল এক মানব চরিত্রে পরিণত হয়েছে। মহেশের নামে গল্পের নামকরণ করে লেখক এই সত্যকেই গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন।

আমরা দেখি তর্করত্নের নিষ্ঠুরতায় তীব্র ব্যঙ্গে বেদনাদীর্ণ গফুর জোলা মহেশের পিঠে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তার সঙ্গে চুপি চুপি মনের কথা বলছে। এখানে লেখক যে বর্ণনা দিয়েছেন তাতে অবোধ পশুকেও বোধের জগতে উন্নীত হতে দেখা যায়। "গফুর সেদিক হইতে দৃষ্টি ফিরাইয়া ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মহেশের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার নিবিড় গভীর কালো চোখ দুটি বেদনা ও ক্ষুধায় ভরা, কহিল, "তোকে দিলে না এক মুঠো ? ওদের অনেক আছে তবু দেয় না। না দিক গে—" ...কাছে আসিয়া নীরবে ধীরে ধীরে তাহার গলায় মাথায় পিঠে হাত বুলাইয়া দিতে দিতে চুপি চুপি বলিতে লাগিল, "মহেশ তুই আমার ছেলে, আমাদের আটসন প্রতি পালন করে বুড়ো হয়েছিস, তোকে আমি পেটপুরে খেতে দিতে পারি নি কিন্তু, তুই তো জানিস তোকে আমি কত ভালবাসি।"

স্নেহের প্রত্যুত্তরে মহেশ কেবল গলা বাড়িয়ে 'আরামে চোখ বুজিয়া রহিল'। গফুরের এই ব্যবহার প্রমাণ করে তার সংসারে দুটি প্রাণী, একটি আমিনা অন্যটি মহেশ।

দুজনেই গফুরের কাছে সমান। দুজনের প্রতি গফুরের পিতৃহৃদয়ের সীমাহীন স্নেহ ও মমতা।

পিতার মতই গফুর মহেশকে সস্নেহে শাসন করে বলেছে, "ছেড়ে দিলে তুই পরের গাদা খাবি, মানুষের কলাগাছে মুখ দিবি—তোকে নিয়ে আমি কি করি! গায়ে আর তোর জোর নেই, দেশের কেউ তোকে চায় না—লোকে বলে তোকে গোহাটায় বেচে ফেলতে, কথাটা মনে মনে উচ্চারণ করিয়াই আবার তাহার দুচোখ বাহিয়া টপটপ করিয়া জল পড়িতে লাগিল।"

কেবল স্নেহের শাসন নয় অসহায় গফুর মহেশের মুখে কিছু দিতে না পেরে নিজের ঘরের চাল থেকে খড় টেনে খাওয়ায় এবং অবশেষে নিজের মুখের ভাত তার সামনে ধরে দেবার এক কৌশল আবিষ্কার করে মেয়ের সঙ্গে ছলনার অভিনয় করে।

দারিদ্র্য-বিড়ম্বিত গফুর একদিন বাধ্য হয়ে মহেশকে গোহাটায় বেচে দেবার সিদ্ধান্ত করে, কিন্তু তার কথামত গোহাটার লোকেরা যখন মহেশকে নিতে আসে তখন সে মহেশের পরিণামের কথা ভেবে তাদের অপমান করে তাড়িয়ে দেয়। অবশেষে একদিন গফুর নিজের হাতেই তার পুত্রতুল্য মহেশকে হত্যা করেছে। এই হত্যা বা আঘাত আসলে তার নিজের ভাগ্যের প্রতি আঘাত। নিজের পুত্রকে নিজের হাতে হত্যা করলে পিতার যে অবস্থা হয় গফুরের ঠিক সেই অবস্থা হয়েছে। শরৎচন্দ্র গফুরের প্রতিক্রিয়ার যে-ছবি এঁকেছেন তা বড়ই মর্মস্পর্শী। "গফুর নড়িল না, শুধু নির্নিমেষ চক্ষে আর এক জোড়া নিমেষহীন গভীর কালো চক্ষের পানে চাহিয়া পাথরের মত নিশ্চল হইয়া রহিল।"

পুত্রতুল্য মহেশের মৃত্যুর পর তার গ্রাম পিতৃপুরুষের বাসভূমি গফুরের কাছে অর্থহীন হয়ে গেল। সে গভীর রাতে আমিনার হাত ধরে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে চলে যায়। যাবার সময় আমিনা জল খাবার ঘটি ও পিতলের থালাটি সঙ্গে নিতে চেয়েছিল, কিন্তু গফুর বাধা দিয়ে বলে, "ওসব থাক মা-ওতে আমার মহেশের প্রাচিত্তির হবে।"

হতভাগ্য মহেশের জন্য ভাগ্যহীন দরিদ্র গফুরের শেষ আর্তনাদ ধ্বনিত হল ঠিক গ্রাম ত্যাগের পূর্বে—"আঙ্গিনা পার হইয়া পথের ধারে সেই বাবলা তলায় আসিয়া সে থমকিয়া দাঁড়াইয়া সহসা হু হু করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। নক্ষত্রখচিত কালো আকাশে মুখ তুলিয়া বলিল, আল্লা! আমাকে যত খুশি সাজা দিয়ো, কিন্তু মহেশ আমার তেষ্টা নিয়ে মরেছে। তার চ'রে খাবার এতটুকু জমি কেউ রাখেনি। যে তোমার দেওয়া মাঠের ঘাস, তোমার দেওয়া তেষ্টার জল তাকে খেতে দেয়নি, তার কসুর তুমি যেন কখনো মাপ করো না।"

পশু হয়েও যে অর্থে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের 'আদরিণী', তারাশঙ্করের 'কালাপাহাড়'—এক একটি চরিত্র হয়ে উঠেছে ঠিক সেই অর্থেই মানবিক নানান গুণে শরৎচন্দ্রের মহেশও একটি জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে। সেই কারণে গল্পের নাম 'মহেশ'।

প্রশ্ন ৪। 'মহেশ' গল্পে বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত ও অত্যাচারিত কৃষক জীবনের যে ছবি অঙ্কিত হয়েছে তার বিশদ পরিচয় দাও। [নমুনা প্রশ্ন, ১৯৮৫]

উত্তর। শরৎচন্দ্রের 'মহেশ' গল্পে পল্লীবাংলার অত্যাচারিত কৃষক জীবনের এক নির্ভরযোগ্য ছবি ফুটে উঠেছে। লেখক নিজেই বলেছেন—"যারা দিলে অনেক, পেলে না কিছুই তারাই পাঠাল আমাকে।" তাই দেখি সাধারণ নিরন্ন খেটে খাওয়া মানুষের ছোটো ছোটো সুখ-দুঃখ বেদনা তাঁর লেখায় জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।

আলোচ্য 'মহেশ' গল্পেও এর ব্যতিক্রম ঘটে নি। 'মহেশ' গল্পের কাশীপুর গ্রাম বঙ্গদেশের কোনো বিচ্ছিন্ন গ্রাম নয়, এবং জমিদার শিবচরণও সে-যুগের জমিদার-সমাজের বিরল ব্যতিক্রম ছিলেন না। অর্থাৎ একশো বছর আগে বাংলার যে-কোনো গ্রামই ছিল কাশীপুরের মতো কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং যে কোনো জমিদার ছিলেন শিবচরণের মতো মমতাহীন, জাত্যভিমানী, প্রজাপীড়ক। লেখক বলেছেন 'দাপটে তাঁর প্রজারা টু শব্দটি করিতে পারে না—এমনই প্রতাপ।'

হিন্দুপ্রধান গ্রামে দরিদ্র কৃষক বিশেষত মুসলমান পরিবার ছিল অপাংক্তেয় এবং অবহেলিত। দরিদ্র কৃষকসমাজের কল্যাণের কথা ভূস্বামীরা চিন্তা করতেন না, তাই গফুরকে অভিযোগের উত্তরে বলতে শুনি, 'কাহনখানেক খড় এবার ভাগে পেয়েছিলাম কিন্তু গেল সনের বকেয়া বলে কর্তামশাই সব ধরে রাখলেন।'

গফুরের অনুনয়বিনয়, চোখের জল ব্যর্থ হয়। সে জমিদারকে বলে 'চালে খড় নেই—একখানি ঘর, বাপবেটিতে থাকি, তাও নাহয় তালপাতার গোঁজা দিয়ে এ বর্ষাটা কাটিয়ে দেব, কিন্তু না খেতে পেয়ে আমার মহেশ মরে যাবে।' কিন্তু হাকিমের কঠিন হৃদয় দরিদ্র কৃষকের চোখের জলে ভেজে না। মাস দুয়েকের মতো কিছু ধান বাদে সবটাই জমিদার সরকারে গাদা হয়ে যায়।

ব্রাহ্মণসমাজে তর্করত্নের মতো ভণ্ড ধর্মধ্বজী মানুষের অভাব ছিল না। তাঁরা মুখেই গো-শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করতেন, কিন্তু চার চারটে গাদা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা কাহন-দুই খড় দরিদ্র মানুষকে ধার দিতে পারেন না। শ্মশানের ধারে গ্রামের গোচরটা অর্থলোভী জমিদার পয়সার লোভে জমাবিলি করে দেয়। এই হল জোতদার-মহাজন শ্রেণীর চরিত্র।

দরিদ্র মুসলমান-কন্যা আমিনা সহজে তৃষ্ণার জল সংগ্রহ করতে পারে নি। লেখকের ভাষায়, "ঘণ্টার পর ঘণ্টা দূরে দাঁড়াইয়া বহু অনুনয়বিনয়ে কেহ দয়া করিয়া যদি তাহার পাত্রে ঢালিয়া দেয় সেইটুকু সে ঘরে আনে।" সর্বকালেই খরা-মহামারী নিয়ে বাঙালীকে ঘর করতে হয়েছে। এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার হয়েছে দরিদ্র কৃষকসমাজ।

ক্ষুধার অন্নের মতোই তৃষ্ণার জল সাধারণ দরিদ্র মানুষের আয়ত্তের বাইরে চলে যেত। লেখক বলেছেন, 'শিবচরণের খিড়কির পুকুরে যা একটু জল আছে তা সাধারণে পায় না।'

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্বের অবসানের পর দেশে তখন মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকাল শুরু হয়েছে। কিন্তু জমিদার ছিল পল্লী অঞ্চলের প্রকৃত রাজা। তারা দরিদ্র প্রজার গৃহে পেয়াদা পাঠিয়ে যখন তখন তাদের কাছারিতে ধরে নিয়ে যেত, সেখানে চলত দুর্বল নিরন্ন মানুষের উপর অকথ্য অত্যাচার। 'মহেশ' গল্পে দেখি ক্ষুধার্ত-দুর্বল গফুর জমিদারের পিয়াদার হুকুম অমান্য করায় সে, "কুৎসিত একটা সম্বোধন করিয়া কহিল, বাবুর হুকুম জুতো মারতে মারতে টেনে নিয়ে যেতে।'

যে গফুর কোনোদিন ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে চায় নি, সে-ই মহেশহত্যার পর ভিটেমাটির মায়া ত্যাগ করে চলে গেছে শ্রমিকবৃত্তি গ্রহণ করতে। এক কথায় ভাগ্যের কাছে পরাজয় বরণ করেছে গফুর। গ্রামের ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় পরিত্যাগ করে গ্রামের দরিদ্র কৃষকশ্রেণী কেন শ্রমিকবৃত্তি গ্রহণ করে, এ কথার উত্তর দিয়েছেন শরৎচন্দ্র। দরিদ্র ভাগচাষীর দারিদ্র্যবিড়ম্বিত জীবন এবং জমিদারের নিদারুণ অত্যাচার কেমন করে কৃষকশ্রেণীকে শ্রমিকশ্রেণীতে পরিণত করে তারই ছবি 'মহেশ' গল্পে বিধৃত হয়েছে।

প্রশ্ন ৫। 'মহেশ' গল্পটি অবলম্বন করে গফুরের চরিত্রটি বিশ্লেষণ কর।
[পৃঃ ৬৯ দেখ]

প্রশ্ন ৬। 'মহেশ' গল্পটি অবলম্বনে তর্করত্ন ও আমিনার চরিত্র দুটি বিশ্লেষণ কর।
[পৃঃ ৭০ এবং ৭৩ দেখ]

বিরিঞ্চিবাবা

প্রশ্ন ১। 'বিরিঞ্চিবাবা গল্পের কাহিনী ও চরিত্র অবলম্বনে সমাজের ভণ্ড বাবাজীদের সম্পর্কে পরশুরামের যে-দৃষ্টিভঙ্গী প্রকাশ পেয়েছে তা বিশ্লেষণ করে দেখাও।

উত্তর। আমাদের দেশে ধর্মের নামে যে ভণ্ডামি এবং ধাপ্পাবাজি চলে, বিরিঞ্চি-বাবা গল্পে রাজশেখর বসু প্রচলিত সেই কুসংস্কারের উপর আঘাত হেনেছেন। আমরা দেখি সাধারণ মানুষ অসাধারণ উপায়ে সাংসারিক সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে, তাদের সেই বিশ্বাসকে কেন্দ্র করেই ভণ্ড তপস্বীর দল পশার জমায়। এই ভণ্ডামি সর্বকালের সাহিত্যে বিদ্রূপ ও ব্যঙ্গের বিষয়বস্তু হয়ে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছে। পরশুরামের রচনায় তার ব্যতিক্রম ঘটে নি।

বিরিঞ্চিবাবা গল্পের নায়ক বিরিঞ্চিবাবা ছিলেন এমনই এক ভণ্ড ধর্মগুরু। এই ভণ্ড ধর্মগুরুর নামে গল্পের নামকরণ করে লেখক সমাজের প্রচলিত কুসংস্কারের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

আমাদের আলোচ্য গল্পের বিরিঞ্চিবাবা হল এমনই এক ভণ্ড ব্যক্তি যে মিথ্যে অলৌকিক শক্তির মায়াজাল প্রসারিত করে দুর্বল কুসংস্কারাচ্ছন্ন কিছু মানুষকে বশ করে লাভজনক ব্যবসা ফেঁদে বসেছে।

হাবশীবাগানের নিবারণ এবং সত্যব্রত এই ভণ্ড ধর্মগুরুর ধাপ্পাবাজি ফাঁস করে দুর্বল মানুষকে রক্ষা করতে এগিয়ে এসেছে। এরাই হল লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতীক।

লেখকের চোখে বিরিঞ্চিবাবা হল বিবেকহীন, লোভী আর ভণ্ড। হাস্যরসের আবরণে মুড়ে লেখক তার এই চরিত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করেছেন। লেখকের ভাষায় "বাবাজীটি কেমন ?...আশ্চর্য। কেউ বলে তাঁর বয়স পাঁচশো বৎসর, কেউ বলে পাঁচ হাজার,...তাঁকে জিজ্ঞাসা করলে একটু হেসে বলেন—বয়স বলে কোন বস্তু নেই। সমস্ত কাল একই কাল, সমস্ত স্থান একই স্থান। যিনি সিদ্ধ তিনি ত্রিকাল, ত্রিলোক এক সঙ্গেই ভোগ করেন।" এইভাবে সর্বত্রই লেখক তাঁর ব্যঙ্গ এবং বিদ্রূপের ধার পরীক্ষা করে চলেছেন।

বিরিঞ্চিবাবা গল্পের কাহিনী শুরু হয়েছে হাবশীবাগান লেনের এক মেসবাড়ি থেকে। সেখানে বৈঠকী আলোচনায় জগন্নাথ ঘাটের মিরচাইবাবার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। এই সাধুটি নাকি কেবল লঙ্কা খেয়ে জীবন ধারণ করেন।

তাঁরও যিনি গুরু তিনি নাকি ব্রেক কষাতের গুঁড়ো খেয়ে থাকেন। নিবারণ মাষ্টারের ভাষায় 'ও সব হচ্ছে ভিন্ন ভিন্ন সাধনার মার্গ।'

এ প্রসঙ্গে রাজশাহীর তড়িতানন্দ ঠাকুরের কথাও ওঠে। কলেজের ছেলেরা যাকে বলে রেডিওবাবা। বাবার দুটি টিকি, একটি পজিটিভ, অন্যটি নেগেটিভ। তিনি নাকি আকাশ থেকে ইলেকট্রিসিটি শুষে নেন। স্পার্ক ঝাড়েন এক একটি আঠারো ইঞ্চি লম্বা। কাছে এগোয় কার সাধ্যি, সিল্কের চাদর মুড়ি দিয়ে দেখা করতে হয়। বিরিঞ্চিবাবার মতো এরাও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার।

এর পরেই দমদমায় গুরুপদবাবুর বাগানে বিরিঞ্চিবাবার প্রসঙ্গ ওঠে। কেউ বলে তাঁর বয়স পাঁচশ বছর, কেউ বলে পাঁচ হাজার। তিনি ইচ্ছে করলে যা খুশি তাই করতে পারেন। এখনকার মানুষকে আকবরের টাইমে আগ্রাতে অথবা ফোর্থ সেঞ্চুরি বি. সি.-তে পাটলিপুত্রে এনে ফেলতে পারেন। কারণ সবটাই আপেক্ষিক। আরও জানা যায়, আইনস্টাইনও তাঁর রিলেটিভিটি বিদ্যের জন্যে বিরিঞ্চিবাবার কাছে ঋণী। শোনা যায়, তিনি যখন চেকোস্লোভাকিয়ায় তপস্যা করতেন তখন আইনস্টাইন তাঁর কাছে যাতায়াত করতেন। এইভাবে লেখক সীমাহীন ভণ্ডামির ছবি এঁকেছেন, তারপরই এক টানে খুলেছেন সেই মুখোশ।

এরপর মেকিরাম আগরওয়ালার কথা এসে পড়ল। বিরিঞ্চিবাবা যাকে তিন দিনের জন্যে নাইন্টিন ফোর্টিনে নিয়ে গিয়েছিলেন। মেকিরাম পাঁচ হাজার টন লোহার কড়ি কিনে ফেলল ছ' টাকা হন্দর দরে। তারপর তাকে বিরিঞ্চিবাবা একমাস নাইন্টিন নাইন্টিনে রাখলেন। মেকিরাম বেচে দিল একুশ টাকা দরে। এই ভাবে মেকিরাম এখন পনর লাখ টাকার মালিক।

বিরিঞ্চিবাবা সম্পর্কে এসব কথা যেমনই হাস্যকর তেমনই অবিশ্বাস্য। কিন্তু যারা এই সব ধাপ্পাবাজ বাবাজীদের সাহায্যে সাংসারিক সমস্যার সমাধান করতে চায়,

দেখে লাখ টাকার স্বপ্ন, তারাই কেবল সত্যাসত্য বাস্তব-অবাস্তবের সীমারেখা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু লেখক ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণে এই সব ভণ্ড বাবাজীদের জর্জরিত করেছেন, তাদের জমাট পসার বন্ধ করে ভণ্ডামির মুখোশ খুলে দিয়েছেন। তাই দেখি লেখকের প্রতিনিধি হয়ে আমাদের আলোচ্য গল্পের নিবারণ মাষ্টার এবং তরুণ সত্যব্রত দমদমায় গুরুপদবাবুর বাড়িতে গিয়ে বিরিঞ্চিবাবার মুখোশ খুলে দিয়ে জোচ্চোর প্রতিপন্ন করে তার বিদায়ের ব্যবস্থা করেছে। লেখকের ভাষায় "মহাদেব পচে গিয়ে বেরুল ক্যাবলা। বিরিঞ্চিবাবা হয়ে গেলেন জোচ্চোর।"

ধর্ম-ব্যবসায়ী এইসব বাবাজীদের অভিনয় ক্ষমতা ও প্রতারণা কৌশল অভিনব সন্দেহ নেই। মানুষের ধর্মাবেগের সুযোগ নিয়ে তাদের প্রতারণা করাই এই শ্রেণীর মানুষের কাজ। এরা সকলেই বুদ্ধিমান শয়তান। সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব যেমন তাদের জানা, তেমনই সময়োপযোগী কৌশল অবলম্বনেও এরা পটু। কথায় কথায় পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করে এরা ভক্তকে বিমূঢ় করে দেন।

ধর্মের নামে আমাদের সমাজে যে ভণ্ডামি চলে তাকে উন্মোচিত করাই ছিল পরশুরামের উদ্দেশ্য। ব্যঙ্গের অস্ত্রেই তিনি মানুষের সর্ববিধ গোঁড়ামিকে টুকরো টুকরো করে কৌতুকের নিরবচ্ছিন্ন বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। সেদিক থেকে বিরিঞ্চিবাবা সার্থক সৃষ্টি।

প্রশ্ন ২। বিরিঞ্চিবাবা গল্পে কারা, কীভাবে বাবাজীর ভণ্ডামি উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল, বিবৃত কর। [প্রশ্ন ৫, পৃষ্ঠা ৫৩দ্রঃ]

প্রশ্ন ৩। 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পে ব্যঙ্গ ও কৌতুকরসের ব্যবহারে পরশুরামের দক্ষতা ঘটনা চরিত্র ও সংলাপ আশ্রয়ে নিরূপণ কর। [পৃষ্ঠা ৩৩, দ্রঃ]

প্রশ্ন ৪। "তিনি মূর্তির পর মূর্তি গড়িয়া তুলিয়াছেন। এমন করিয়া গড়িয়াছেন যে মনে হইল ইহাদিগকে চিরকাল জানি।"—পরশুরাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্প সম্পর্কে কতদূর প্রযোজ্য বিচার কর।

উত্তর। পরশুরাম রচিত 'বিরিঞ্চিবাবা' গল্পের চরিত্রগুলি আমাদের অতিপরিচিত সমাজ জীবন থেকেই উঠে এসেছে, তাই সেগুলি আমাদের অতিপরিচিত চেনা-মুখ। আমাদের আশেপাশে সমাজের সর্বত্রই তাদের আমরা বিচরণ করতে দেখি—নানা রূপে নানা নামে।

চরিত্রসৃষ্টির ক্ষেত্রে রাজশেখরের সাফল্য যথার্থভাবেই পরিলক্ষিত হয়। সমাজের মধ্যবিত্ত বিচিত্র মানুষের স্বরূপ উদ্ঘাটন করা তাঁর গল্পের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। অলস, অকর্মণ্য বাঙালী, তাদের মোসাহেবি, জীবন সম্পর্কে মন্থর ঔদাসীন্য, দাম্পত্য কলহ, প্রেম ও বিবাহ সমস্যা, বাঙালীর ব্যবসায় বুদ্ধি, গুরুভক্তি এই সব প্রেক্ষাপটের উপরে ভিত্তি করেই পরশুরামের গল্প রচিত। মোটামুটি বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের বাঙালী সমাজের মানচিত্র এইসব গল্পের মধ্যে পাওয়া যায়।

রাজশেখরের 'বিরিঞ্চিবাবা'-গল্পে অনেকগুলি চরিত্র আছে। তাদের মধ্যে প্রধান হল বিরিঞ্চিবাবা, নিবারণ মাষ্টার, সত্যব্রত, গুরুপদবাবু, প্রফেসর ননি, নিরুপমা, নিতাইবাবু, পরমার্থ, বুঁচকী, কেবলানন্দ প্রভৃতি। তাছাড়া আলোচ্য গল্পে কতকগুলি অপ্রধান পার্শ্বচরিত্রও আছে, যেমন—মৌলবী বছিরুদ্দি, ফেকু পাঁড়ে, ঝেঁাটিমিয়া, গণেশ-মামা, ও. কে. সেন, গোবর্ধন মল্লিক। এরা সকলেই উঠে এসেছে সরাসরি বর্তমান সমাজজীবন থেকে। তাদের সমস্যা বর্তমান মানসিকতা নিয়ে। আমাদের নিজেদের জগতের মধ্যেই তাদের বাস, আমাদের একান্ত পরিচিত পরিমণ্ডলে।

এরা কেউ ধর্মধ্বজী ভণ্ড ধাপ্পাবাজ, কেউ অলস, অকর্মণ্য, অসাধারণ উপায়ে সাংসারিক সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করে, কেউ মোসাহেব, কারও জীবন সম্পর্কে মন্থর ঔদাসীন্য, কারও অগাধ গুরুভক্তি। এদের মধ্যেই দু একটি সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের সন্ধান পাই যারা সাধারণ হলেও ধাপ্পাবাজের ভণ্ডামির কাছে আত্মবিক্রয় করে না।

নিবারণ মাষ্টার, সত্যব্রত, নিরুপমা, বছিরুদ্দি, ফেকু পাঁড়ে, ঝেঁাটি মিয়া—এরাই হল সমাজের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ। যাদের বিপরীত দিকে আছে ধাপ্পাবাজ ভণ্ড সাধু, মোসাহেব স্বার্থপর, গুরুবাদে বিশ্বাসী, দুর্বল প্রকৃতির কয়েকটি চরিত্র। এদের মধ্যে বিরিঞ্চিবাবা বুদ্ধিমান শয়তান। সাধারণ মানুষের মনস্তত্ত্ব যেমন তার জানা তেমনি সময়োপযোগী কৌশল অবলম্বনেও তিনি তুলনাহীন। কথায় কথায় পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি ভক্তদের বিমূঢ় করেছেন। তাঁর বাচনভঙ্গির মধ্যে একটা সম্মোহন শক্তি আছে, ফলে অবলীলাক্রমে তিনি বলে যান—"ঠিক ঐ কথা তুলসী আমায় জিজ্ঞেস করেছিল। তুলসী ছিল সন্ন্যাসী। আমি বললুম, বাপু ভোগ না হলে তোমার নিবৃত্তি হবে না। তার রামায়ণ লেখা শেষ হলে তাকে রাজা মানসিংহ করে দিলুম"। অন্যত্র তাকে বলতে শুনি—"ধন দৌলত সকলেই চায়, কিন্তু উপযুক্ত পাত্রে পড়া চাই। এই নিয়ে তো যিশুর সঙ্গে আমার ঝগড়া। যিশু বলত, ধনীর কখনও স্বর্গরাজ্য লাভ হবে না। আমি বলতুম—তা কেন? অর্থের সদ্ব্যবহার করলেই হবে। আহা বেচারা বেঘোরে প্রাণটা খোয়ালে।"

এইসব ভণ্ড শয়তানের সকলের চরিত্রই এক, ভাঙে কিন্তু মচকায় না। বিরিঞ্চি-বাবার ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ার পরেও তাকে আমরা বলতে শুনি, "কেমন গুরুপদ, এখন আশা মিটল তো? সে নাস্তিক, তার দিব্যদৃষ্টি হবে কেন? তাই তোমার কপালে দেবতা দেখা দিয়েও দিলেন না। শেষটায় মানুষের মূর্তি ধরে বিদ্রূপ করে গেলেন।"

ধর্মকে যাঁরা স্বার্থসিদ্ধির উপায় বলে মনে করেন নিতাইবাবু ছিলেন তাদেরই একজন। সংসারের দায়দায়িত্ব পালনের শক্তি ও নিষ্ঠা তার ছিল না। যখন তখন তাকে বলতে শোনা যায়—"চিত্তে সুখ নেই দাদা" অথবা "সংসারে ঘেন্না ধরে গেছে। একটি ভাল সাধুসন্ন্যাসী পাই তো সব ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়ি। যদিও তাঁর জীবনের মূল কথা আধ্যাত্মিক উন্নতি নয়, আর্থিক উন্নতি। তাই পরমার্থের দু হাত ধরে তাকে বলতে শুনি "পরমার্থ ভাই রে, আমায় এক্ষুনি নিয়ে চল্ বিরিঞ্চিবাবার কাছে। বাবার পায়ে ধরে হত্যা দেব।...বাবার দয়ায় যদি হপ্তাখানেক

নাইনিটন ফোর্টিনে ঘুরে আসতে পারি, তবে তোমায় ভুলব না পরমার্থ। টেন পারসেণ্ট বুঝলে?"—এই হল স্বার্থপর দুর্বল চরিত্রের নমুনা, যারা বাবাজীদের ধাপ্পাবাজিকে বেপরোয়া হতে সাহায্য করে। পরমার্থও ছিল ঐ একই পথের পথিক যারা আমাদের অতিপরিচিত সমাজজীবন থেকে উঠে এসেছে। তাই নিতাই-বাবু আর পরমার্থদের একবার দর্শনেই আমরা চিনতে পারি।

গুরুপদবাবু ছিলেন আলিপুরের বিখ্যাত উকিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তাঁর সংসারের প্রতি বৈরাগ্য আসে এবং ধর্মকর্মে মন দেন। অনুমিত হয় এই দুর্বল মুহূর্তেই তিনি বিরিঞ্চিবাবার মতো ধাপ্পাবাজ বাবাজীর পাল্লায় পড়েন। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির জন্যে তিনি বিরিঞ্চিবাবার শরণাপন্ন হন নি, এক অহৈতুকী ভক্তিই তাকে ধাপ্পাবাজ সাধুর প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। স্ত্রীবিয়োগের পর সাধারণ দুর্বল মানুষ শোকের আঘাতে এমনই একটা ঘোরের মধ্যে আছন্ন থাকে। তখন তাকে দিয়ে চতুর শয়তান ভণ্ড লোকেরা যা খুশি তাই করিয়ে নেয়। সেই কারণে গুরুপদবাবুও আমাদের অতি নিকট প্রতিবেশী!

গুরুপ্রসাদ বাবুর শ্যালক গণেশমামা বাংলা সাহিত্য ও সমাজের অতি পরিচিত চরিত্র। রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের বহু উপন্যাসে যেমন গণেশ মামাদের দর্শন পাই, তেমনি তাদের দেখি হাঁটাচলার পথের ধারে। স্বার্থপর সুযোগসন্ধানী এই মানুষটিকে সত্যব্রতর চিনতে অসুবিধে হয়নি, তাই হোমঘরের আসল দেবতা দেখার আবেদন জানাবার আগেই তার জামাইকে চাকরি দেবার আশ্বাস দেয়।

মিস্টার ও. কে. সেন এবং গোবর্ধন মল্লিক হলেন সমাজের সেইসব মানুষের প্রতিনিধি যারা নিছক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ধর্মকর্মে মন দেন, গুরুসেবা করেন। আর মনোবাসনা পূর্ণ না হলে গুরুবদল করেন।

মৌলবী বছিরুদ্দি, ফেকু পাঁড়ে, ঝোঁটি মিয়ারা হল সমাজের অতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষ। এদের মধ্যে সমাজের সাধারণ মানুষের ছোটো ছোটো সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। কত সামান্য এদের প্রত্যাশা ভাবলে অবাক হতে হয়। এদের মধ্যে মৌলবী বছিরুদ্দি—নিজেকে 'খানদানী মনিষ্যি, বলে গর্ববোধ করতে। এই দুর্বলতার জন্যেই চরিত্রটি লেখকের ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শিকার হয়েছে।

বিরিঞ্চিবাবা গল্পের নিবারণ মাষ্টার, সত্যব্রত, মনোরমা, বুঁচকী বৈচিত্র্যহীন সাধারণ চরিত্র। এরা সকলেই আমাদের বাঙালি ঘরের অতি পরিচিত। কেউ শুভবুদ্ধিসম্পন্ন পরোপকারী, কেউ প্রেমিক, কেউ প্রেমের উন্মাদনায় আধফোটা ফুল। এদের মধ্যে প্রফেসর ননিই কিছুটা বৈচিত্র্যের দাবী রাখে। কিন্তু ননি আমাদের সমাজে দুর্লভ নয়। বিদ্বান বুদ্ধিমান অর্থবান মানুষ প্রফেসর ননির মতই সারা জীবন নানান খেয়ালে—অপব্যয় করে চলে। তাদের স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তবের বড়ো একটা মিল থাকে না।

শেষ করার আগে বলি, রবীন্দ্রনাথে উল্লিখিত মন্তব্য বিরিঞ্চিবাবা সম্পর্কে সর্বাংশে সত্য। এরা আমাদেরই পরিচিত সমাজ জীবন থেকে উঠে এসেছে, তাই যেমন জীবন্ত তেমনই আমাদের একান্ত চেনামুখ।

ব্যাকরণ

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলা ভাষার দুইরূপ

(সাধু ও চলিত রীতি)

দীর্ঘদিন ধরে যে-ভাষায় সাহিত্য রচিত হয়ে আসছে তার প্রাচীন ও অর্বাচীন রূপের মধ্যে একটা প্রভেদ অনিবার্য হয়ে ওঠে। বাংলার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।

বাংলা সাধু ভাষার ভিত্তি ছিল পশ্চিমবঙ্গে প্রচলিত প্রাচীন বাংলা ভাষা, যদিও পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রভাব তার অনেক ক্ষেত্রেই ছিল। ষোড়শ শতকের পত্র, দলিল-দস্তাবেজ ও কড়চাতে এই ভাষার নিদর্শন পাওয়া যাবে। তবে সাহিত্যিক গদ্যভাষার নিদর্শন ফোর্ট উইলিয়াম প্রতিষ্ঠার পর থেকেই। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের উদ্যোগে বাইবেলের গদ্যানুবাদে যথেষ্ট জড়তা ছিল। উইলিয়াম কেরীর রচনাতেই (১৮০১) সাহিত্যিক বাংলা গদ্যের সম্ভাবনার দিকটি ফুটে ওঠে। তিনি বুঝেছিলেন কথিত বাংলার বিধিসম্মত রচনার মধ্য দিয়েই বাঙালীর মনে রেখাপাত করা সম্ভবপর। রামমোহন বাংলা গদ্যকে নিমজ্জমান দশা থেকে উদ্ধার করলেও তাতে লাবণ্য সঞ্চার করেন বিদ্যাসাগর। বঙ্কিমচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অনুগামী হয়েই বাংলাগদ্যের অঙ্গনে এসেছিলেন, তবে তাঁর প্রতিভাগুণে তিনি তাতে স্বকীয়তার ছাপ রাখতে পেরেছিলেন।

প্যারীচাঁদ কথ্যভাষার রীতি ধরতে পারলেও রূপটি ঠিকমতো ধরতে পারেন নি। এই দিক দিয়ে 'হুতোম প্যাঁচার নকসা' অনেক উন্নত। কালীপ্রসন্ন সব্যসাচী ছিলেন; মহাভারতের গদ্য আর হুতোমী গদ্যে সাধু ও চলিত ভাষার দুটি ধারা তিনি প্রবাহিত করে দিয়েছিলেন :

'আজকাল বাঙ্গালা ভাষা আমাদের মত মূর্তিমান্ কবিদলের অনেকের উপজীব্য হয়েছে। বেওয়ারিশ লুচির ময়দা বা তইরি কাদা পেলে যেমন নিষ্কর্মা ছেলেমাত্রেই একটা না একটা পুতুল তইরি করে খ্যালা করে, তেম্নি বেওয়ারিস্ বাঙ্গালা ভাষাতে অনেকে যা মনে চায় কচ্চেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র এ ভাষাকে তেমন সুনজরে দেখেন নি। রবীন্দ্রনাথও গদ্যরচনায় বাস্তব-ধারাকেই অনুসরণ করলেন, যদিও বাক্যবিন্যাস ও শব্দচয়নে তিনি অনেক সহজ ও স্বাভাবিক হতে পেরেছিলেন।

সবুজপত্রের আহ্বানেই হয়তো তিনি চলিত ভাষায় লিখতে শুরু করেছিলেন। সত্যি, প্রতিভা যা-কিছু স্পর্শ করে তাকেই সজীব করে। রবীন্দ্রনাথের চলিত ভাষাও আশ্চর্য এক নিদর্শন স্থাপন করতে পারল। তিনি চলিত ভাষার স্বরূপটিও হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন। সাহিত্যে চলিত ভাষা চালু করবার আন্দোলনে যাঁরা অগ্রণী হয়েছিলেন বিবেকানন্দ তাঁদের অন্যতম। তিনি লিখলেন—'স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না। সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও

ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সে দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরী ভাষা কোনও কালে হয় না।'

চলিত ভাষার এই শক্তির কথা রবীন্দ্রনাথও নানা প্রসঙ্গে বলেছেন।

এখন সাহিত্যে চলিত ভাষারই রাজত্ব, এমন-কি অধিকাংশ খবরের কাগজেও চলিত ভাষা চলছে। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যেও চলিতভাষার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

আমরা বলি ভাষাচর্চায় সাধু ও চলিত—এই দুই ভাষার অনুশীলনই করা উচিত, দুই ভাষার শ্রেষ্ঠ সাহিত্যই পাঠ করা উচিত।

সাধু ও চলিত ভাষার কয়েকটি নমুনা

সাধুভাষা

১ কতিপয় পদ গমন করিয়া, শকুন্তলার গতিভঙ্গ হইল। শকুন্তলা, আমার অঞ্চল ধরিয়া কে টানিতেছে ; এই বলিয়া মুখ ফিরাইলেন। কণ্ব কহিলেন, বৎসে! যাহার মাতৃবিয়োগ হইলে তুমি জননীর ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলে ; যাহার আহারের নিমিত্ত তুমি সর্বদা শ্যামাক আহরণ করিতে ; যাহার মুখ কুশের অগ্রভাগ দ্বারা ক্ষত হইলে তুমি ইঙ্গুদীতৈল দিয়া ব্রণশোষণ করিয়া দিতে ; সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করিতেছে।—শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

২. যুবক এই কথানুসারে মন্দিরের বাহিরে আসিয়া জ্যোৎস্নার আলোকে দেবালয়-রক্ষকের গৃহ দেখিতে পাইলেন। গৃহদ্বারে গমন করিয়া তাহার নিদ্রা ভঙ্গ করিলেন। মন্দিররক্ষক ভয়প্রযুক্ত দ্বারোদ্‌ঘাটন না করিয়া, প্রথমে অন্তরাল হইতে কে আসিয়াছে দেখিতে লাগিল। বিশেষ পর্যবেক্ষণে পথিকের কোন দস্যুলক্ষণ দৃষ্ট হইল না ; বিশেষতঃ তৎস্বীকৃত অর্থের লোভ সংবরণ করা তাহার পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া উঠিল। সাত-পাঁচ ভাবিয়া মন্দিররক্ষক দ্বার খুলিয়া প্রদীপ জালিয়া দিল।—দুর্গেশনন্দিনী, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

৩. হঠাৎ বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপাইয়া দিয়া জাহাজের বাঁশি বাজিয়া উঠিল। উপরের দিকে চাহিয়া মনে হইল, মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলাইয়া গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নাই—সমস্ত ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া কি করিয়া সমস্ত আকাশটা যেন হাল্কা হইয়া কোথাও উধাও হইয়া চলিয়াছে, পরক্ষণেই একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত হইতে ছুটিয়া আসিয়া কানে বিঁধিল, যাহার সহিত তুলনা করিয়া বুঝাইয়া দিই এমন কিছুই জানি না। —শ্রীকান্ত, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

চলিত ভাষা

১. বস্তুত, ঋণ তারাই গোপন করতে চেষ্টা করে ঋণই যাদের হাতে ঋণ রয়ে গেছে, ধন হয়ে ওঠে নি। ভারতের কাছ থেকে জাপান যদি কিছু নিয়ে থাকে সেটা সম্পূর্ণ তার আপন সম্পত্তি হয়েছে। যে-জাতির মনের মধ্যে চলন-ধর্ম প্রবল সেই জাতিই পরের সম্পদকে নিজের সম্পদ করে নিতে পারে। যার মন স্থাবর, বাইরের

জিনিস তার পক্ষে বিষম ভার হয়ে ওঠে, কারণ, তার নিজের অচল অস্তিত্ব তার পক্ষে প্রকাণ্ড এক বোঝা।—জাপান-যাত্রী, রবীন্দ্রনাথ।

২. …এগুলো শোধরাবার লক্ষণ এখন হচ্ছে, এখন ক্রমে বুঝবে যে, যেটা ভাবহীন প্রাণহীন—সে ভাষা, সে শিল্প, সে সংগীত কোনো কাজের নয়। এখন বুঝবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসবে, তেমন তেমন ভাষা, শিল্প, সংগীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হয়ে দাঁড়াবে। দুটো চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসবে, তা দু-হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখলেই ভক্তি হবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলে বোধ হবে, আর বাড়ি-ঘর-দোর সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করবে। —বাঙ্গালা ভাষা, স্বামী বিবেকানন্দ।

৩. কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরেছে, সে অবশ্য আমাদের দোষ নয়, আমাদের শিক্ষার দোষ। যার আনন্দ নেই সে নির্জীব, একথা যেমন সত্য, যে নির্জীব তারও যে আনন্দ নেই, সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করেছে। জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উল্‌টো টান যে আমাদের টানতে হবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চার স্বপক্ষে এত বাক্যব্যয় করলুম।—বই পড়া, প্রমথ চৌধুরী।

সাধু ও চলিত ভাষার পার্থক্য সংক্ষেপে বর্ণিত হচ্ছে, এ থেকে বোঝা যাবে এক ভাষাকে আর এক ভাষায় কীভাবে রূপান্তরিত করা যাবে।

১। সর্বনাম

সাধু	চলিত
তাহা, তাহারা, তাহাকে, তাহাদিগকে	তা, তারা, তাকে, তাদেকে, তাদের
তাহার, তাহাদের, তাহাতে	তার, তাদের, তাতে
ইহা, ইহারা, ইহাকে, ইহাদিগকে	এ, এরা, একে, এদের
ইহার, ইহাদের, ইহাতে	এর, এদের, এতে
যাহা, যাহারা, যাহাকে, যাহাদিগকে	যা, যারা, যাকে, যাদের
যাহার, যাহাদের, যাহাতে	যার, যাদের, যাতে
কাহারা, কাহাকে, কাহাদিগকে	কারা, কাকে, কাদের
কাহার, কাহাদের	কারা, কাদের

[হ-কার-লোপ প্রবণতা লক্ষণীয়]

২। অসমাপিকা ক্রিয়া

সাধু	চলিত
করিতে, বলিতে, শুনিতে	করতে, বলতে, শুনতে
করিয়া, বলিয়া, শুনিয়া	ক’রে, ব’লে, শুনে
করিলে, বলিলে, শুনিলে	করলে, বললে, শুনলে

৩। অনুসর্গ

সাধু	চলিত
দিয়া	দিয়ে
সহিত	সঙ্গে
হইতে	থেকে

৪। সমাপিকা ক্রিয়া

সাধু	চলিত
করিতেছে, বলিতেছে, শুনিতেছে	করছে, বলছে, শুনছে
করিতেছি, বলিতেছি, শুনিতেছি	করছি, বলছি, শুনছি
করিতেছ, বলিতেছ, শুনিতেছ	করছ, বলছ, শুনছ
করিয়াছে, করিয়াছি, করিয়াছ	করেছে, করেছি, করেছ
করিল, করিলাম, করিলে	করল, করলাম, করলে
করিয়াছিল, করিয়াছিলাম, করিয়াছিলে	করেছিল, করেছিলাম, করেছিলে
করিতেছিল, করিতেছিলাম, করিতেছিলে	করছিল, করছিলাম, করছিলে
করিত, করিতাম, করিতে	করত, করতাম, করতে
করিবে, করিব, করিবে	করবে, করব, করবে
করিতে থাকিবে, করিতে থাকিব	করতে থাকবে, করতে থাকব
করিয়া থাকিবে, করিয়া থাকিব	করে থাকবে, করে থাকব
করিও, বলিও, শুনিও	কোরো, বোলো, শুনো

৫। সংযোগমূলক ধাতু

সাধু	চলিত
শ্রবণ করা, ভক্ষণ করা	শোনা, খাওয়া

সাধু ভাষা থেকে চলিত ভাষায় রূপান্তরে মূলত সমাপিকা ক্রিয়া, অসমাপিকা ক্রিয়া, সর্বনাম ও অনুসর্গ পরিবর্তিত হয়, তবে একটু ওজনে-ভারি তৎসম শব্দের সঙ্গে রূপান্তরিত ক্রিয়াদি মানানসই না হলে সেইরকম তৎসম শব্দের জায়গায় তদ্ভব শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে।

নিদর্শনস্বরূপ এই আলোচনায় আগে যে সাধু ভাষা ও চলিত ভাষার উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে তার রূপান্তর করে দেওয়া হল।

সাধু>চলিত

১। কয়েক পা গিয়ে শকুন্তলার গতিভঙ্গ হল। শকুন্তলা 'আমার আঁচল ধরে কে টানছে' এই বলে মুখ ফেরালেন। কণ্ব বললেন 'যার মাতৃবিয়োগ হলে তুমি জননীর মতো প্রতিপালন করেছিলে, যার আহারের জন্যে তুমি সর্বদা শ্যামাক আহরণ করতে, যার মুখ কুশের অগ্রভাগে ক্ষত হলে তুমি ইঙ্গুদীতেল দিয়ে ব্রণশোষণ করে দিতে, সেই মাতৃহীন হরিণশিশু তোমার গতিরোধ করছে।

২। যুবক কথা অনুসারে মন্দিরের বাইরে এসে জ্যোৎস্নার আলোয় দেবালয়-রক্ষকের গৃহ দেখতে পেলেন। গৃহদ্বারে গিয়ে তার ঘুম ভাঙালেন। মন্দিররক্ষক ভয়ে দুয়োর না খুলে প্রথমে অন্তরাল থেকে কে এসেছে দেখতে লাগল। বিশেষ পর্যবেক্ষণে পথিকের কোন দস্যুলক্ষণ দেখা গেল না ; বিশেষতঃ তার স্বীকৃত অর্থের লোভ সংবরণ করা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য হয়ে উঠল। সাতপাঁচ ভেবে মন্দিররক্ষক দুয়োর খুলে প্রদীপ জ্বালল।

৩। হঠাৎ বুকের ভিতর পর্যন্ত কাঁপিয়ে দিয়ে জাহাজের বাঁশি বেজে উঠল। উপরের দিকে চেয়ে মনে হল মন্ত্রবলে যেন আকাশের চেহারা বদলে গেছে। সেই গাঢ় মেঘ আর নেই—সমস্ত ছিঁড়ে খুঁড়ে কি করে সমস্ত আকাশই যেন হাল্কা হয়ে কোথাও উধাও হয়ে চলেছে, পরক্ষণেই একটা বিকট শব্দ সমুদ্রের প্রান্ত থেকে ছুটে এসে কানে বিঁধল, যার সঙ্গে তুলনা করে বুঝিয়ে দিই এমন কিছুই জানি না।

চলিত > সাধু

১। বস্তুত ঋণ তাহারাই গোপন করিতে চেষ্টা করে ঋণ যাহাদের হাতে ঋণই রহিয়া গিয়াছে, ধন হইয়া উঠে নাই। ভারতের কাছ হইতে জাপান যদি কিছু লইয়া থাকে তাহা সম্পূর্ণ তাহার আপন সম্পত্তি হইয়াছে। যে জাতির মনের মধ্যে চলনধর্ম প্রবল সেই জাতিই পরের সম্পদ্‌কে নিজের সম্পদ্ করিয়া লইতে পারে। যাহার মন স্থাবর, বাহিরের জিনিস তাহার পক্ষে বিষম ভার হইয়া উঠে ; কারণ, তাহার নিজের অচল অস্তিত্ব তাহার পক্ষে প্রকাণ্ড এক বোঝা।

২। এগুলি শোধরাইবার লক্ষণ এখন হইতেছে, এখন ক্রমে বুঝিবে যে, যাহা ভাবহীন প্রাণহীন সে ভাষা, সে শিল্প, সে সংগীত কোনো কাজের নয়। এখন বুঝিবে যে, জাতীয় জীবনে যেমন যেমন বল আসিবে, তেমন তেমন ভাষা, শিল্প, সংগীত প্রভৃতি আপনা-আপনি ভাবময় প্রাণপূর্ণ হইয়া দাঁড়াইবে। দুইটি চলিত কথায় যে ভাবরাশি আসিবে তাহা দু হাজার ছাঁদি বিশেষণেও নাই। তখন দেবতার মূর্তি দেখিলেই ভক্তি হইবে, গহনা-পরা মেয়ে-মাত্রই দেবী বলিয়া বোধ হইবে, আর বাড়ি-ঘর-দুয়ার সব প্রাণস্পন্দনে ডগমগ করিবে।

৩। কাব্যামৃতে যে আমাদের অরুচি ধরিয়াছে, তাহা অবশ্য আমাদের দোষ নহে, আমাদের শিক্ষার দোষ। যাহার আনন্দ নাই সে নির্জীব, একথা যেমন সত্য, যে নির্জীব তাহারও যে আনন্দ নাই সে কথাও তেমনি সত্য। আমাদের শিক্ষাই আমাদের নির্জীব করিয়াছে। জাতীয় আত্মরক্ষার জন্য এ শিক্ষার উল্টো টান যে আমাদের টানিতে হইবে, এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। এই বিশ্বাসের বলেই আমি স্বেচ্ছায় সাহিত্যচর্চার স্বপক্ষে এত বাক্যব্যয় করিলাম।

আরও কয়েকটি উদাহরণ

সাধু ঃ এতদিন ছেলেদের ধর্মপ্রচারে উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোনমতে সহিয়া ছিল ; কিন্তু দুই-একদিনের মধ্যেই তাদের চাঁদা আদায়ের উৎসাহ গ্রামের ইতর-ভদ্র

গৃহস্থের কাছে এমনি ভয়াবহ হইয়া উঠিল যে, খাতা-বগলে ছেলে দেখিলেই তাহারা বাড়ির দরজা-জানালা বন্ধ করিয়া ফেলিতে লাগিল। বেশ দেখা গেল, গ্রামে ধর্মপ্রচার ও দুর্নীতি-দমনের রাস্তা যতখানি চওড়া পাওয়া গিয়াছিল, লাইব্রেরীর জন্য অর্থ-সংগ্রহের পথ তাহার শতাংশের একাংশও প্রশস্ত নয়। অপূর্ব কি করিবে ভাবিতেছে, এমন সময়ে হঠাৎ একটা ভারি সুরাহা চোখে পড়িল।

চলিত ঃ এতদিন ছেলেদের ধর্মপ্রচারে উৎসাহ গ্রামের লোকেরা কোনমতে সয়েছিল। কিন্তু দুই-একদিনের মধ্যেই তাদের চাঁদা আদায়ের উৎসাহ গ্রামের ইতর-ভদ্র-গৃহস্থদের কাছে এমন ভয়াবহ হয়ে উঠল যে, খাতা-বগলে ছেলে দেখলেই তারা বাড়ির দরজা-জানলা বন্ধ করে ফেলতে লাগল। বেশ দেখা গেল, গ্রামে ধর্মপ্রচার ও দুর্নীতি-দমনের রাস্তা যতখানি চওড়া পাওয়া গিয়েছিল, লাইব্রেরীর জন্যে অর্থ সংগ্রহের পথ তার শতাংশের একাংশও প্রশস্ত নয়। অপূর্ব কি করবে ভাবছে, এমন সময় হঠাৎ একটা ভারি সুরাহা চোখে পড়ল।

চলিত ঃ কিন্তু বাংলার এই জাগরণের সূচনা কখন থেকে ধরা হবে? সে সম্বন্ধে উত্তর নির্ভর করে, এই জাগরণ বলতে কি বোঝা হবে প্রধানত তার উপরে। পরকালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে মানুষ যখন ইহকালের দিকে ভালো করে তাকিয়েছিল তখন সূচনা হয়েছিল রেনেসাঁসের, এই ধারণা থেকে কেউ কেউ কবি ভারতচন্দ্রের কাল থেকে এর সূচনা দেখেছেন।

সাধু ঃ কিন্তু বাংলার এই জাগরণের সূচনা কখন হইতে ধরা হইবে? সে সম্বন্ধে উত্তর নির্ভর করে, এই জাগরণ বলিতে কি বুঝা হইবে প্রধানত তাহার উপর। পরকালের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া মানুষ যখন ইহকালের দিকে ভালো করিয়া তাকাইয়াছিল তখন সূচনা হইয়াছিল রেনেসাঁসের, এই ধারণা হইতে কেহ কেহ কবি ভারতচন্দ্রের কাল হইতে ইহার সূচনা দেখিয়াছেন।

পাঠ্যগত উদাহরণ

সাধু হইতে চলিত

পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন

সাধু ঃ এই প্রকার ক্রমাগত নিষ্পীড়িত হইয়া কোন্ ব্যক্তি স্বীয় ইচ্ছাতে দান করিতে পারে? ভূস্বামির পুনঃপুনঃ শোষণের পর দীন দুঃখী প্রজাদের আর কি অবশিষ্ট থাকে যে তদ্দ্বারা তাহাদের লোভকুণ্ডে অনবরতই আহুতি প্রদান করিবেন। অতএব তাহাদিগকে ঋণ জালে জড়িত হইতে হয় এবং এ প্রকারও ঘটে, যে যৎকালে কেহ নিতান্ত অপার্য্যমানে ভূস্বামির দূত হস্তে বিত্ত সমর্পণ করিতেছে, তৎকালেই উত্তমর্ণের নিষ্ঠুর বাক্য স্মরণ করিয়া তাহার অন্তঃকরণ ব্যাকুলিত হইতেছে। (পৃঃ ৪)

চলিত ঃ এইভাবে ক্রমাগত নিষ্পীড়িত হয়ে কে আর নিজের ইচ্ছায় দান করতে পারে? জমিদারের বারবার শোষণের পর দীন দুঃখী প্রজাদের আর কি অবশিষ্ট থাকে যে তা দিয়ে তাঁর লোভকুণ্ডে অনবরতই আহুতি দান করবে? অতএব তাদেকে ঋণের

জালে জড়িত হতে হয় এবং এরকমও ঘটে, যে যখন কেউ নিতান্ত বাধ্য হয়ে জমিদারের দূতের হাতে টাকা দিচ্ছে তখনই উত্তমর্ণের নিষ্ঠুর বাক্য স্মরণ করে তার অন্তর ব্যাকুল হচ্ছে।

সাধু: প্রজারা ধন্য! তাহাদের সহিষ্ণুতাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। তাহারা চিরজীবন দাবদাহে দগ্ধ হইবে জানিতেছে, তথাপি দেশত্যাগ করে না! তাহারা যদি স্বকীয় ভূস্বামিদিগের ন্যায় নির্মায়িক ও স্নেহশূন্য হইত,—মাতৃতুল্য জন্মভূমির মায়া এককালে পরিত্যাগ করিত, তবে এতদিনে বঙ্গভূমি শ্মশানভূমি সদৃশ জনশূন্য হইয়া যাইত। মাতর্বঙ্গ-ভূমি! কেবল তোমারি অপার ঔদার্যগুণে তাহারা জীবিতবান্ আছে, অদ্যাপি নির্মূল হয় নাই। (পৃঃ ৫)

চলিত: প্রজারা ধন্য! তাদের সহিষ্ণুতাকে সাধুবাদ দিতে হয়। তারা চিরজীবন দাবদাহে দগ্ধ হবে জানছে, তবুও দেশত্যাগ করে না। তারা যদি নিজেদের জমিদারদের মতো নির্মম ও নিষ্ঠুর হত,—মাতৃতুল্য জন্মভূমির মায়া এককালে পরিত্যাগ করত, তবে এতদিনে বঙ্গভূমি শ্মশানভূমির মতো জনশূন্য হয়ে যেতো। মা বঙ্গভূমি! কেবল তোমারি অপার ঔদার্যগুণে তারা বেঁচে আছে, কৃষককুল আজও নির্মূল হয় নি।

সাধু: পরমেশ্বর তাহারদিগকে লোকাতীত তিতিক্ষা শক্তি প্রদান করিয়াছেন সন্দেহ নাই।—উত্তপ্ত লৌহদণ্ড হৃদয় মধ্যে প্রবেশিত হইলেও সেই দুর্জয় তিতিক্ষাকে পরাভব করিতে পারে না। ভিন্ন দেশীয় লোকে কি এ প্রকার ভাবিতে পারে না যে, তাহারা বুঝি অনশনব্রত পালন করিয়াও প্রণয়াস্পদ ভূমিপদে জীবন সমর্পণ করিতে পারে? (পৃঃ ৯)

চলিত: পরমেশ্বর তাদেকে লোকাতীত তিতিক্ষা শক্তি দিয়েছেন সন্দেহ নাই।—উত্তপ্ত লোহার দণ্ড হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ করলেও সেই দুর্জয় তিতিক্ষাকে পরাজিত করতে পারে না। ভিন্ন দেশের লোকে কি এ রকম ভাবতে পারে না যে তারা বুঝি অনশনব্রত পালন করেও তাদের প্রণয়াস্পদ ভূমির চরণে জীবন সমর্পণ করতে পারে?

বাবু

সাধু: জনমেজয় কহিলেন, হে মহর্ষি! আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে একপ্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য্য করিবেন, তাহা শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণনা করুন। (পৃঃ ১৭)

চলিত: জনমেজয় বললেন, হে মহর্ষি! আপনি বললেন যে, কলিযুগে বাবু নামে একরকম মানুষ পৃথিবীতে আবির্ভূত হবেন। তাঁরা কি রকম মানুষ হবেন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে কি কাজ করবেন, তা শুনতে বড় কৌতূহল হচ্ছে। আপনি অনুগ্রহ করে সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

সাধু: মহারাজ! বাবু শব্দ নানার্থ হইবে। যাহারা কলিযুগে ভারতবর্ষে রাজ্যাভিষিক্ত হইয়া, ইংরাজ নামে খ্যাত হইবেন, তাহাদিগের নিকট 'বাবু' অর্থে কেরানী

ষা বাজার সরকার বুঝাইবে। নির্ধনদিগের নিকট 'বাবু' শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বুঝাইবে। ভৃত্যের নিকট 'বাবু' অর্থে প্রভু বুঝাইবে। এ সকল হইতে পৃথক্‌, কেবল বাবুজন্ম নির্বাহাভিলাষী কতকগুলি মনুষ্য জন্মিবেন; কেবল তাহাদিগেরই গুণকীর্তন করিতেছি। (পৃ: ১৭)

চলিত: মহারাজ! বাবু শব্দের নানা অর্থ হবে। যাঁরা কলিযুগে ভারতবর্ষে রাজ্যে অভিষিক্ত হয়ে ইংরেজ নামে খ্যাত হবেন, তাঁদের কাছে 'বাবু' অর্থে কেরানী বা বাজার সরকার বোঝাবে। গরিবদের কাছে 'বাবু' শব্দে অপেক্ষাকৃত ধনী বোঝাবে। ভৃত্যের কাছে 'বাবু' অর্থে 'প্রভু' বোঝাবে। এসব থেকে আলাদা, কেবল বাবুজন্ম যাপন করতে ইচ্ছুক কতগুলো মানুষ জন্মাবেন, কেবল তাদেরই গুণকীর্তন করছি।

সাধু: চন্দ্র ইঁহাদের গৃহে এবং গৃহের বাহিরে নিত্য বিরাজমান থাকিবেন—কদাপি অবগুণ্ঠনাবৃত। কেহ প্রথম রাত্রে কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র, শেষ রাত্রে শুক্লপক্ষের চন্দ্র দেখিবেন, কেহ তদ্বিপরীত করিবেন। সূর্য ইঁহাদিগকে দেখিতে পাইবেন না। যম ইহাদিগকে ভুলিয়া থাকিবেন। কেবল অশ্বিনীকুমারদিগকে ইহারা পূজা করিবেন। অশ্বিনীকুমারদিগের মন্দিরের নাম হইবে 'আস্তাবল'। (পৃ ১৮)

চলিত: চাঁদ এঁদের বাড়িতে এবং এঁদের বাড়ির বাইরে সর্বদাই বিরাজ করবেন—কখনও অবগুণ্ঠনে ঢাকা থাকবেন। কেউ প্রথম রাতে কৃষ্ণপক্ষের চাঁদ, শেষ রাতে শুক্লপক্ষের চাঁদ দেখবেন, কেউ তার উল্টোটা করবেন। সূর্য এঁদের দেখতে পাবেন না। যম এঁদেকে ভুলে থাকবেন। কেবল অশ্বিনীকুমারদেকে এঁরা পূজা করবেন। অশ্বিনীকুমারদের মন্দিরের নাম হবে 'আস্তাবল'।

লোকহিত

সাধু: আমরা পরের উপকার করিব মনে করিলেই উপকার করিতে পারিব না। উপকার করিবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর উপকার অতি সহজে করিতে পারে, কিন্তু ছোটোর উপকার করিতে হইলে কেবল বড়ো হইলে চলিবে না—ছোটো হইতে হইবে, ছোটোর সমান হইতে হইবে। মানুষ কোনো দিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষারূপে গ্রহণ করিবে না, ঋণরূপেও না, কেবলমাত্র প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিতে পারিবে। (পৃ ৩৬)

চলিত: আমরা পরের উপকার করব মনে করলেই উপকার করতে পারি না। উপকার করবার অধিকার থাকা চাই। যে বড়ো সে ছোটোর উপকার অতি সহজে করতে পারে, কিন্তু ছোটোর উপকার করতে হলে কেবল বড়ো হলেই চলবে না—ছোটো হতে হবে, ছোটোর সমান হতে হবে। মানুষ কোনো দিন কোনো যথার্থ হিতকে ভিক্ষা হিসেবে গ্রহণ করবে না, ঋণ হিসেবেও না। কেবলমাত্র প্রাপ্য বলেই গ্রহণ করতে পারবে।

সাধু: ও দেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরিয়া গুমরিয়া উঠিতেছে ততই তাহাদিগকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়া ঘুম পাড়াইবার গান গাওয়া হইতেছে; তাহাদিগকে

অল্পস্বল্প এটা ওটা দিয়া কোনো মতে ভুলাইয়া রাখিবার চেষ্টা। কেহ বলে, 'উহাদের বাসা একটু ভালো করিয়া দাও,' কেহ বলে, 'যাহাতে উহারা দু চামচ সুপ খাইয়া কাজে যাইতে পারে তাহার বন্দোবস্ত করো' কেহ বা তাহাদের বাড়িতে গিয়া মিষ্ট মুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে, শীতের দিনে কেহ বা আপন উদ্‌বৃত্ত গরম কাপড়টা তাহাদিগকে পাঠাইয়া দেয়।
(পৃ ৩৯)

চলিত: ও দেশে শ্রমজীবীর দল যতই গুমরে গুমরে উঠছে ততই তাদেকে ক্ষুধার অন্ন না দিয়ে ঘুম পাড়াবার গান গাওয়া হচ্ছে; তাদেকে অল্পস্বল্প এটা ওটা দিয়ে কোনো মতে ভুলিয়ে রাখবার চেষ্টা। কেউ বলে, 'ওদের বাসা একটু ভালো করে দাও', কেউ বলে, 'যাতে ওরা দু চামচ সুপ খেয়ে কাজে যেতে পারে তার বন্দোবস্ত করো', কেউ বা তাদের বাড়িতে গিয়ে মিষ্টি মুখে কুশল জিজ্ঞাসা করে, শীতের দিনে কেউ বা নিজের উদ্‌বৃত্ত গরম কাপড়টা তাদেকে পাঠিয়ে দেয়।

সাধু: আমি কিন্তু সবচেয়ে কম করিয়াই বলিতেছি, কেবলমাত্র লিখিতে পড়িতে শেখা। তাহা কিছু লাভ নহে, তাহা কেবলমাত্র রাস্তা—সেও পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট, কেননা এই রাস্তাটা না হইলেই মানুষ আপনার কোণে আপনি বদ্ধ থাকে। তখন তাহাকে যাত্রা-কথকতার যোগে সাংখ্য যোগ বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনাইয়া যাইতে পারো। তাহার আঙিনায় হরিনাম-সংকীর্তনেরও ধুম পড়িতে পারে, কিন্তু একথা তাহার স্পষ্ট বুঝিবার উপায় থাকে না যে, সে একা নহে, তাহার যোগ কেবল অধ্যাত্মযোগ নহে, একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ।
(পৃ ৪১)

চলিত: আমি কিন্তু সবচেয়ে কম করেই বলছি, কেবলমাত্র লিখতে পড়তে শেখা। তা কিছু লাভ নয়, তা কেবলমাত্র রাস্তা—সেটা পাড়াগাঁয়ের মেটে রাস্তা। আপাতত এই যথেষ্ট, কেননা এই রাস্তাটা না হলেই মানুষ নিজের কোণে নিজেই বদ্ধ থাকে। তখন তাকে যাত্রা-কথকতার যোগে সাংখ্য যোগ বেদান্ত পুরাণ ইতিহাস সমস্তই শুনিয়ে যেতে পারো। তার আঙিনায় হরিনাম সংকীর্তনেরও ধুম পড়তে পারে। কিন্তু একথা তার স্পষ্ট বোঝবার উপায় থাকে না যে, সে একা নয়, তার যোগ কেবল অধ্যাত্মযোগ নয়, একটা বৃহৎ লৌকিক যোগ।

আরণ্যক

সাধু: বেলা যখন যায় যায় তখনও জঙ্গলের কূলকিনারা নাই, আমার মনে হইল আর বেশীদূর অগ্রসর না হইয়া একটা বড় গাছের তলায় আশ্রয় লওয়া ভাল, অবশ্য বনের মধ্যে ইহার পূর্বে দুইটি বন্য গ্রাম ছাড়াইয়া আসিয়াছি—একটার নাম কূলপাল, অন্যটার নাম বুরুডি, কিন্তু সে প্রায় বেলা তিনটার সময়। তখন যদি জানা থাকিত যে, সন্ধ্যার সময়ও জঙ্গল শেষ হইবে না, তাহা হইলে সেখানেই রাত্রি কাটাইবার ব্যবস্থা করা যাইত।
(পৃ ৮০)

চলিত: বেলা যখন যায় যায় তখনও জঙ্গলের কূলকিনারা নেই, আমার মনে

হল আর বেশী দূরে এগিয়ে না গিয়ে একটা বড় গাছের তলায় আশ্রয় নেওয়া ভাল, অবশ্য বনের মধ্যে এর আগে দুটো বন্য গ্রাম ছাড়িয়ে এসেছি—একটার নাম কূলপাল, অন্যটার নাম বুরুডি, কিন্তু সে প্রায় বেলা তিনটের সময়। তখন যদি জানা থাকত যে, সন্ধ্যার সময়ও জঙ্গল শেষ হবে না, তাহলে সেখানে রাত কাটাবার ব্যবস্থা করা যেত।

সাধুঃ আমরা গ্রামে আসিয়া দাঁড়াইলাম, বুদ্ধু সিং-এর ভাবে মনে হইল এই-বার রাজপ্রাসাদের সম্মুখে নীত হইয়াছি। অন্য ঘরগুলির সঙ্গে রাজপ্রাসাদের পার্থক্য এইমাত্র লক্ষ্য করিলাম যে, ইহার চারিপাশ পাথরের পাঁচিলে ঘেরা—বস্তির পিছনেই অনুচ্চ পাহাড়, সেখান হইতেই পাথর আনা হইয়াছে। (পৃ ৮৩)

চলিতঃ আমরা গ্রামে এসে দাঁড়ালাম। বুদ্ধু সিংএর ভাবে মনে হল এইবার রাজপ্রাসাদের সামনে আনা হয়েছে আমাকে। অন্য ঘরগুলোর সঙ্গে রাজপ্রাসাদের পার্থক্য এই মাত্র লক্ষ্য করলাম যে, এর চারপাশ পাথরের পাঁচিলে ঘেরা—বস্তির পিছনেই অনুচ্চ পাহাড়, সেখান থেকেই পাথর আনা হয়েছে।

চলিতঃ ওসব আমাদের বংশে নিয়ম নেই। শিকার করার মান সকলের চেয়ে বড়, তাও এক সময়ে ছিল বর্শা নিয়ে শিকার সবচেয়ে গৌরবের। তীর-ধনুকের শিকার দেবতার কাজে লাগে না, ও বীরের কাজ নয়। তবে এখন সবই চলে। আমার বড় ছেলে মুঙ্গের থেকে একটা বন্দুক কিনে এনেছে; আমি কখনও ছুঁই নি। বর্শা ধরে শিকার আসল শিকার। (পৃ ৮৬)

সাধুঃ ঐসব আমাদের বংশে নিয়ম নাই। শিকার করার মান সর্বাপেক্ষা বড়। তাহাও এক সময়ে ছিল বর্শা লইয়া শিকার সর্বাপেক্ষা গৌরবের। তীর-ধনুকের শিকার দেবতার কাজে লাগে না, উহা বীরের কাজ নহে। তবে এখন সবই চলে। আমার বড় ছেলে মুঙ্গের হইতে একটা বন্দুক কিনিয়া আনিয়াছে; আমি কখনও স্পর্শ করি নাই। বর্শা ধরিয়া শিকার আসল শিকার।

চলিতঃ টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকলে শিকারীরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্বংশ করে ছেড়ে দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়বার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়িয়ে হাত তুলে বাধা দেন—কত লোক দেখেছে। (পৃ ৮৯)

সাধুঃ টাঁড়বারো বড় জাগ্রত দেবতা। তিনি না থাকিলে শিকারীরা চামড়া আর শিঙের লোভে বুনো মহিষের বংশ নির্বংশ করিয়া ছাড়িয়া দিত। উনি রক্ষা করেন। ফাঁদে পড়িবার মুখে তিনি মহিষের দলের সামনে দাঁড়াইয়া হাত তুলিয়া বাধা দেন—কত লোক দেখিয়াছে।

নৈশ অভিযান

চলিতঃ উই—উই যে কালো মত বাঁদিকে দেখা যায় ওটা চড়া। ওরি মধ্যে দিয়ে একটি খালের মত আছে, তারি ভিতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে হবে, কিন্তু খুব

আস্তে—জেলেরা টের পেলে আর ফিরে আসতে হবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে। (পৃঃ ৬২)

সাধু: ওই—ওই যে কালো মত বাঁদিকে দেখা যায় উহা চড়া। উহারই মধ্য দিয়া একটি খালের মত আছে, তাহারি ভিতর দিয়া বাহির হইয়া যাইতে হইবে। কিন্তু খুব আস্তে—জেলেরা টের পাইলে আর ফিরিয়া আসিতে হইবে না। লগির ঘায়ে মাথা ফাটাইয়া পাঁকে পুঁতিয়া দিবে।

চলিতঃ আর টের পেলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা! ত্যাখ্‌, শ্রীকান্ত, কিচ্ছু ভয় নেই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে কিন্তু যদি দেখিস ঘিরে ফেললো ব'লে—আর পালাবার জো নেই তখন ঝুপ ক'রে লাফিয়ে পড়ে এক ডুবে যতদূর পারিস গিয়ে ভেসে উঠলেই হ'ল। এ অন্ধকারে আর দেখবার জোটি নাই। তারপর মজা করে সতুয়ার চড়ায় উঠে ভোরবেলায় সাঁতরে এপারে এসে গঙ্গার ধা'র ধরে বাড়ি ফিরে গেলেই ব্যস্‌। কি করবে ব্যাটারা? (পৃঃ ৬২)

সাধুঃ আর টের পাইলেই বা কি? ধরা কি মুখের কথা! ত্যাখ্‌ শ্রীকান্ত, কিছুই ভয় নাই—ব্যাটাদের চারখানা ডিঙি আছে বটে, কিন্তু যদি দেখিস ঘিরিয়া ফেলিল বলিয়া—আর পালাইবার জো নাই, তখন ঝুপ করিয়া লাফাইয়া পড়িয়া এক ডুবে যতদূর পারিস গিয়া ভাসিয়া উঠিলেই হইল। এই অন্ধকারে আর দেখিবার জোটি নাই। তাহার পর মজা করিয়া সতুয়ার চড়ায় উঠিয়া ভোরবেলায় সাঁতরাইয়া এপারে আসিয়া গঙ্গার ধার ধরিয়া বাড়ি ফিরিয়া গেলেই হইল। কি করিবে ব্যাটারা?

অন্ন চাই প্রাণ চাই

চলিতঃ ত্যাখো নির্মলবাবু, অত কথা ভাবতে পারবো না, বুঝলে, অত কথা ভাবতে পারবো না। সংসারে অন্যায় অবিচার দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর লাখো লাখো ঘটছে। এখন সব কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গেলে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ-কর্ম তো দেখি সব বন্ধ করে দিতে হয়। (পৃ ২৫)

সাধুঃ ত্যাখো নির্মলবাবু, অত কথা ভাবিতে পারিব না। সংসারে অন্যায় অবিচার দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টার ভিতর লক্ষ লক্ষ ঘটিতেছে। এখন সব কিছুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে গেলে নিজের ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজকর্ম তো দেখি সব বন্ধ করিয়া দিতে হয়।

চলিতঃ কুঞ্জ তাকিয়ে থাকে রাধিকার দিকে সাশ্রুচোখে। রাধিকাও ব্যাণ্ডেজ বাঁধা শেষ করে ফ্যাল ফ্যাল করে কুঞ্জর দিকে চেয়ে থাকে। চোখে তারও জল ভরে আসে সবকিছু স্মরণ ক'রে। গভীর মমতায় রাধিকা শুধু কুঞ্জর কপালের উপর থেকে বিস্রস্ত চুলগুলো সরিয়ে দেয়। হঠাৎ কেঁদে ফেলে। কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে রাধিকার দিকে; তারপর বাঁ হাত'খানা তুলে দেয় রাধিকার মাথার ওপর। (পৃঃ ২৬)

সাধুঃ কুঞ্জ সাশ্রুনেত্রে রাধিকার দিকে তাকাইয়া থাকে। রাধিকাও ব্যাণ্ডেজ-

বাঁধা শেষ করিয়া ফ্যাল ফ্যাল করিয়া কুঞ্জর দিকে চাহিয়া থাকে। সব কিছু স্মরণ করিয়া তাহার চোখেও জল ভরিয়া আসে। গভীর মমতায় রাধিকা শুধু কুঞ্জর কপালের উপর হইতে বিস্রস্ত চুলগুলি সরাইয়া দেয়। হঠাৎ কাঁদিয়া ফেলে। কুঞ্জ অপলক দৃষ্টিতে রাধার দিকে চাহিয়া থাকে। তাহার পর বাম হাতখানা তুলিয়া দেয় রাধিকার মাথার উপর।

অনুশীলনী

১। চলিত ভাষায় রূপ দাও :

(ক) তাহারা ঋণগ্রস্ত হইয়া বহু কষ্টে যৎসামান্য শস্যভক্ষণ ও ঘন মলিন চীর পরিধান করিয়া জীবন ক্ষেপণ করে। অনাহারী ও নগ্নপ্রায় থাকাতেও যদি তাহারদের দুঃখের পর্যাপ্তি হইত, তথাপি অপেক্ষাকৃত অনেক মঙ্গল বিবেচনা করিতাম।

(পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন, পৃষ্ঠা ৯)

(খ) হে নরাধিপ! বাবুগণ দ্বিতীয় অগস্ত্যের ন্যায় সমুদ্ররূপী বরুণকে শোষণ করিবেন, স্ফটিক পাত্র ইঁহাদিগের গণ্ডূষ। অগ্নি ইঁহাদিগের আজ্ঞাবহ হইবেন—'তামাকু' এবং 'চুরুট' নামক দুইটি অভিনব খাণ্ডবকে আশ্রয় করিয়া রাত্রিদিন ইঁহাদিগের মুখে লাগিয়া থাকিবেন। (বাবু, পৃ ১৭)

(গ) শক্তির ধারাটা এখন ক্ষত্রিয়কে ছাড়িয়া বৈশ্যের কূলে বহিতেছে। লোক সাধারণের কাঁধের উপরে তাহারা চাপিয়া বসিয়াছে। মানুষকে লইয়া তাহারা আপনার ব্যবসায়ের যন্ত্র বানাইতেছে। মানুষের পেটের জ্বালাই তাহাদের কলের স্টীম উৎপন্ন করে। (লোকহিত পৃঃ ৩৯)

(ঘ) আমাদের নৌকা কোণাকুণি পাড়ি দিতেছে, এইমাত্র বুঝিয়াছি। কিন্তু পরপারের ঐ দুর্ভেদ্য অন্ধকারের কোন্‌খানে যে লক্ষ্য স্থির করিয়া ইন্দ্র হাল ধরিয়া নিঃশব্দে বসিয়া আছে তাহার কিছুই জানি না। (নৈশ অভিযান পৃ ৬১)

২। সাধু ভাষায় রূপ দাও :

(ক) মুঘল বাদশাহের আমলে এরা মুঘল সৈন্যদের সঙ্গে লড়েছে—এই জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তারা যখন বাংলাদেশে যেত—এরা উপদ্রব করত তীর-ধনুক নিয়ে। শেষে রাজমহলে যখন মুঘল সুবাদারেরা থাকতেন, তখন এদের রাজ্য যায়। ভারী বীরের বংশ এরা, এখন আর কিছু নেই। (আরণ্যক পৃ ৮২)

(খ) সত্যি কথা বলতে গেলে এই চোরাবাজারটি ছিল ব'লে তাই এখনও কিছুতে আটকাচ্ছে না, নইলে করবে কি বলো? ব্ল্যাকমার্কেটের সুবিধে না নিয়ে উপায় কি? বেশী কি কথা; এই ধর না সামান্য চিনির ব্যাপারটাই। সংসারে গিন্নি বলেন মাসে অতি কম দেড় মণ চিনি তাঁর চাই-ই।

(অন্ন চাই প্রাণ চাই পৃঃ ৯৪)

৩। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ সংশোধন ক'রে সাধুভাষায় লেখ :

(ক) সেই শক্তি দিতে গেলেই তাদের হাতে এমন একটি উপায় দিতে হবে যাহাতে

ক্রমে তারা পরস্পর সম্মিলিত হইতে পারে—সেই উপায়টি তাদের সকলকেই লিখিতে পড়তে শেখানো।

৪। সাধু ও চলিত ভাষার মিশ্রণ বর্জন করে চলিত ভাষায় লেখ :

আমার ইঙ্গিতে বনোয়ারীলাল পাটোয়ারী নিজে জিনিসগুলি বয়ে অদূরবর্তী রাজার বাড়ীতে লইয়া গেল ভানুমতীর পিছু পিছু। বৃদ্ধের কথা অমান্য করিতে পারিলাম না, বৃদ্ধের দিকে চাহিয়াই আমার সম্ভ্রমে মন পূর্ণ হয়ে গিয়াছিল।

৫। চলিত ভাষায় রূপ দাও :

(ক) কথাটি এই যে যাহারা এ পর্যন্ত বাঙ্গালাভাষায় লেখনী ধারণ করিয়াছেন। তাঁহারা কেহই বাঙ্গালা ভাষা ভাল করিয়া শিক্ষা করেন নাই। হয় ইংরেজি পড়িয়াছেন, না হয় সংস্কৃত পড়িয়াছেন, পড়িয়াই অনুবাদ করিয়াছেন। কতকগুলি অপ্রচলিত সংস্কৃত ও নূতন গড়া চোয়ালভাঙা কথা চলিত করিয়া দিয়াছেন। নিজে ভাবিয়া কেহ বই লেখেন নাই। সুতরাং নিজের ভাষায় কি আছে তাহাতে তাঁহাদের নজরও পড়ে নাই।

(খ) সাধু ভাষায় লেখ :

যিনি সংসারের প্রতি বিমুখ হয়েছেন, যিনি সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন, যিনি ইন্দ্রিয় জয় করেছেন এবং যিনি শান্তিকামী, এ পৃথিবীতে তিনিই মুক্ত—তিনিই মহৎ। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতা পেয়েও কেউ যদি ইন্দ্রিয় পরতন্ত্র এবং বাসনার দাস হয় তবে সে প্রকৃত মুক্তির বিশুদ্ধ আনন্দ পাইতে পারে না।

[শেষের দুটি উদ্ধৃতি পাঠ্যবহির্ভূত। প্রথমটি হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বাঙ্গালা ভাষা থেকে দ্বিতীয়টি বিবেকানন্দের বাণী থেকে।]

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

শব্দের অর্থ পরিবর্তন

শব্দ কখনও তার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ছাপিয়ে চলতে চায়, কখনও গায়ে মেখে নেয় অন্য দেশকালের প্রভাব। কখনও সে নিজের অর্থকে আনে গুটিয়ে, কখনও দেয় ছড়িয়ে। এর মধ্যে ধরা পড়ে আমাদের মানসিকতা, আমাদের সমাজচিন্তা এবং ইতিহাসের প্রভাব। শব্দের এই অর্থ পরিবর্তনের ধারাটি শব্দবিজ্ঞানের বিশিষ্ট একটি বিষয়। আমরা এই ধারাটির অঙ্গগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করছি।

১. **অর্থবিস্তার :** বিশিষ্ট অর্থটি অনেক সময়ে সাধারণ অর্থে পরিণত হয়। 'কালি' শব্দটি আগে শুধু কালো কালিকে বোঝাত, এখন যে-কোনো কালিকে বোঝায়—লাল কালি, সবুজ কালি ইত্যাদি। 'লক্ষ্মী' আসলে দেবী, এখন লক্ষ্মী মেয়েই শুধু নয়, লক্ষ্মী ছেলেও। 'পরশু' <পরশ্ব, আগে আগামীকালের পরের দিন বোঝাত, এখন গতকালকার আগের দিনও বোঝাচ্ছে। সংস্কৃত 'গঙ্গা' থেকে বাংলায় 'গাঙ' এসেছে। কিন্তু 'গাঙ' শব্দের অর্থ 'গঙ্গা' নয়, যে-কোনো নদী।

২. **অর্থসঙ্কোচ**: অর্থের ব্যাপক অর্থ অনেক সময়ে সঙ্কুচিত হয়। 'অন্ন' কথাটির মূল অর্থ ছিল যে-কোনো খাদ্য, কিন্তু এখন শুধু ভাত বোঝাচ্ছে। ইংরেজি meat মানে একদিন ছিল যে-কোনো খাদ্য, এখন শুধু মাংস।

'মৃগ' শব্দের মূল অর্থ ছিল পশু, এখন শুধু হরিণ। পশ্চিমবঙ্গে 'জন' অর্থে 'দিনমজুর' এখানে অর্থসংকোচ ঘটেছে।

৩. **অর্থসংক্রম** (Transfer of meaning): অনেক সময়ে শব্দ তার মূল অর্থ না বুঝিয়ে সংশ্লিষ্ট অন্য অর্থ বোঝায়।

'কলম' এক ধরণের শর, এখন অর্থ দাঁড়িয়েছে 'লেখনী', কারণ একদিন ঐ শরই লেখনী-হিসেবে ব্যবহৃত হত।

'ঘর্ম' কথাটির মূল অর্থ গ্রীষ্ম বা গরম ('ঘর্ম' আর ফার্সী 'গর্ম'-এর ধ্বনিসামঞ্জস্য লক্ষণীয়), পরে অর্থ দাঁড়াল 'ঘাম', গরমে তা ঝরে বলে।

'সন্দেশ' শব্দের মূল অর্থ সংবাদ, কিন্তু সংবাদ আদান-প্রদানে মিষ্টান্ন পাঠানোর প্রথা ছিল বলে সন্দেশ মানে দাঁড়াল এক রকমের মিঠাই।

'সহসা' ও 'হঠাৎ' এই দুইটি শব্দের মূল অর্থ ছিল 'সবলে'। বলপ্রয়োগে চিন্তা-প্রয়োগের অভাব দেখা দেয়, তা থেকেই আসে আকস্মিকতা। ফলে শব্দদুটির অর্থ দাঁড়ায় 'আকস্মিক'

৪. **অর্থের উন্নতি বা উৎকর্ষ** (Elevation or Melioration of meaning): শব্দার্থ যে স্তরে ছিল তার থেকে উচ্চস্তরে উন্নীত হলে তাকে অর্থের উন্নতি বা উপকর্ষ বলে। 'মন্দির' শব্দের মূল অর্থ ছিল গৃহ। এখন তা দেবালয় অর্থে উন্নীত হয়েছে।

'ভোগ' কথাটির 'ভোগ্য'-অর্থ উন্নীত হয় যখন তাকে 'দেবতার কাছে নিবেদিত ভোজ্য' অর্থে ব্যবহার করি।

৫. **অর্থের অবনতি** (Degeneration or Pejoration of Meaning): শব্দ যে-স্তরে ছিল তার থেকে নিম্ন স্তরে গেলে তাকে অর্থের অবনতি বা অপকর্ষ বলে।

'দেবী'র অর্থ স্ত্রী-দেবতা। কিন্তু যখন মহিলার নামের সঙ্গে ব্যবহার করে বলি 'অমুক দেবী' তখন অর্থের অবনতি ঘটল।

বিপ্রকর্ষের ফলে অনেক সময়ে শব্দের অবনতি ঘটে।

'প্রীতি' মানে ভালোবাসা, যেই 'পীরিত' বলা হল অমনি তা অবৈধ বা অসঙ্গত ভালোবাসা বোঝালো।

যখন বলি 'রতনে রতন চেনে', তখন ঐ 'রতন' 'রত্ন' বা 'উৎকৃষ্টগুণের অধিকারী' অর্থ বহন করে না।

'হাতি' ও 'ঘোড়া' শব্দ বাংলায় হীনার্থে প্রযুক্ত হয়: কবি না হাতি—অর্থাৎ নিকৃষ্ট কবি বা আদৌ কবিপদবাচ্য নয়, 'ঘড়ি না ঘোড়া'—অর্থাৎ অতি নিকৃষ্ট ঘড়ি।

বিদেশী শব্দের অর্থও শব্দটি উচ্চারণে বিকৃত হলে অবনত হয়। 'কিস্‌সা' মানে

কাহিনী। কিন্তু 'কেচ্ছা' নিন্দাত্মক, 'নেক' মানে ভালো, কিন্তু 'ন্যাকা'—সরলতার ভানকারী।

অর্থ পরিবর্তনের কয়েকটি উদাহরণ

শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
লাঞ্ছিত	চিহ্নিত	নির্যাতিত
অদৃষ্ট	যা দেখা হয় নাই	দৈব
সম্ভ্রম	চাঞ্চল্য, বিচলন	শ্রদ্ধা
তন্নতন্ন	তাহা নয়, তাহা নয়	পুঙ্খানুপুঙ্খভাব
সংস্কৃতি	মার্জিতভাব	কৃষ্টি (culture)
আন্দোলন	সঞ্চালন	কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে উত্তেজনা সৃষ্টি
ইতিহাস	এই রকমই ছিল	ইতিকথা বা পুরাবৃত্ত (history)
সভ্যতা	সভায় সাধু হইবার ভাব	শিষ্টতা, সমাজ ও জীবনযাত্রায় একটি বিশিষ্ট উৎকর্ষ
অভিমান	অহংকার, মর্যাদাবোধ	প্রিয়জনের ত্রুটিপূর্ণ আচরণের জন্যে ক্ষোভ বা মনোবেদনা
গ্রন্থ	যাহা গ্রথিত	পুস্তক
অর্বাচীন	পশ্চাদ্‌বর্তী	মূর্খ
গবেষণা	গো-অন্বেষণ	কোনো বিশেষ বিষয়ে অনুসন্ধান ও চর্চা
দিব্য	স্বর্গীয়	উত্তম
ইতস্ততঃ	এদিকে ওদিকে	দ্বিধা
পারদর্শী	পার দেখিয়াছে যে	দক্ষ
জিজ্ঞাসা	জানিবার ইচ্ছা	প্রশ্ন
সুতরাং	অত্যন্ত	অতএব
প্রভৃতি	হইতে	ইত্যাদি
সকল	কলার সহিত বর্তমান	সমস্ত
সাগর	সগর সম্বন্ধীয়	সমুদ্র
গোধূলি	গোর ধূলি বা ধূলি উড়িবার কাল	সন্ধ্যা
প্রবীণ	বীণাবাদনে দক্ষ	অভিজ্ঞ, বয়ঃস্থ
দৈব	দেবসম্বন্ধীয়	ভাগ্য, নিয়তি
শরৎ	বর্ষ	তৃতীয় ঋতু
মন্বন্তর	অন্য মনু	দুর্ভিক্ষ, মহামারী
দ্বিধা	দুইভাগে বিভক্ত	ইতস্ততঃ ভাব
দারুণ	কাষ্ঠময়	অত্যন্ত কঠোর
শুশ্রূষা	শুনিবার ইচ্ছা	সেবা

শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
সিংহ	হিংস্রক	জন্তু বিশেষ
ভিন্ন	বিদীর্ণ	ব্যতীত
অরাজক	রাজা নাই যেখানে	বিশৃঙ্খল

পাঠ্যগত উদাহরণ

রাবণের রণসজ্জা

শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
ভৈরব	ভীষণ	শংকর
ভূত	বিগত, যাহা হইয়াছে	প্রেত
রাবণ	যে আর্তনাদ করায়	রাক্ষসরাজ
তুরঙ্গম	যে ত্বরায় গমন করে	অশ্ব
গবাক্ষ	গোরুর চোখের ন্যায়	জানালা
পঙ্কজ	পঙ্কে জন্মে যাহা	পদ্ম
নিভৃত	সযত্নে রক্ষিত	নির্জন
সমর	সম্মুখে অভিযান	যুদ্ধ
বিকল	কলারহিত	বিহ্বল

সহমরণ

শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
শয্যাশায়ী	শয্যায় শয়ান	শয্যাত্যাগ করিতে পারে না এমন অসুস্থ
শরীর	যাহা শীর্ণ হয়	দেহ
সাদী <ফা. শাদী	আনন্দ	বিবাহ
মরদ <ফা. মর্দ	পুরুষ	পৌরুষবান, সাহসী

জীবন-বন্দনা

শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
শ্বাপদ	শ্বা-এর ন্যায় পদবিশিষ্ট	হিংস্র জন্তু
ব্যাঘ্র	বিশেষ ভাবে আঘ্রাণ নেয় যে	শার্দূল
সিংহ	হিংস্রক	পশুরাজ
বাজি	ক্রীড়া	পণ
বিপ্লব	মহাপ্লাবন	রাষ্ট্রনৈতিক ব্যাপক বিপুল পরিবর্তন, ক্রান্তি।

১৯৪৬-৪৭

শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
ঘাস	খাদ্য	তৃণ
অন্ন	খাদ্য	ভাত

শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
গ্রাম	সমূহ	পল্লী
অন্ধকার	অন্ধ করে দেয় যা	তিমির
আলপনা	প্রলেপ	ভূমিতে চিত্রিত মঙ্গলচিত্রবিশেষ
সন্তান	সম্যক্ বিস্তার	অপত্য
মন্বন্তর	অন্য মনু	দুর্ভিক্ষ
হরিণ	হরণে পটু	মৃগ
ইতর	অপর	নীচ
বিরাট	প্রবলরূপে বিরাজমান	বিপুল

ওরা কাজ করে

সময়	যাহা যায়	কাল
সন্ধ্যা	সম্যক্ ধ্যান করিবার কাল	সায়ংকাল
সূর্য	গমনশীল	সবিতা
রেখা	লেখা	দাগ, চিহ্ন
অস্ত্র	যাহা নিক্ষিপ্ত হয়	আয়ুধ

পূর্বরাগ

রাধা	তোষদায়িনী; কান্তা	কৃষ্ণপ্রিয়া
বঁধু	বন্ধু	নায়িকার বন্ধু, প্রণয়ী
বেণী	যা গতিশীল	বিন্যস্তকেশ

আঠারো বছর বয়স

বিরাট	বিশেষভাবে শোভমান	বিশাল
রক্ত	লোহিতবর্ণ	শোণিত
প্রান্তর	প্রকৃষ্ট অন্তর যেখানে	শূন্যভূভাগ, মাঠ
বেদনা	বোধ	ব্যথা
কাপুরুষ	কুৎসিত পুরুষ	পৌরুষহীন, ভীরু

কর্ণকুন্তীসংবাদ

নেত্র	নেওয়া যায় যাহা দ্বারা	নয়ন
বেদনা	অনুভূতি	ব্যথা
অভিষেক	স্নান, স্নাপন	সিংহাসনে বা পূজাবেদিতে স্থাপনের বিশেষ অনুষ্ঠান
পৌরুষ	পুরুষের ভাব	তেজ

শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
ধর্ম	যা ধরে থাকে	ঈশ্বরোপাসনাপদ্ধতি বিশেষ
বৎস	পশুশাবক, বাছুর	স্নিগ্ধ সম্বোধন

অন্ন চাই প্রাণ চাই

বাবা (লাটকে যাবে যে বাবা !)	পিতা	অব্যয়বিশেষ
অন্ন	খাদ্য	ভাত
মশাই<মহাশয়	মহানুভব	সৌজন্যসূচক সম্বোধন-বিশেষ
ভারী	ভারযুক্ত	অত্যন্ত

পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন

মৃগয়া	হরিণ শিকার	শিকার
দারুণ	কাষ্ঠময়	কঠিন, ভীষণ
জন্তু	যে জন্মগ্রহণ করিয়াছে	পশু
রাজস্ব	রাজসম্পদ	খাজনা
বিত্ত	যা আছে	ধন
কৌশল	কুশ তুলিবার নৈপুণ্য	নৈপুণ্য
ধন্য	ধনযুক্ত, শ্রদ্ধেয়	কৃতকৃত্য
শোণিত	লালিমাযুক্ত	রক্ত

বাবু

সন্দেশ	সংবাদ	মিষ্টান্নবিশেষ
দ্রব্য	দ্রবণীয়	বস্তু, সামগ্রী
গ্রন্থ	যাহা গ্রথিত হয়	বই
ব্রাহ্ম	ব্রহ্মসম্বন্ধীয়	ধর্মবিশেষ
অবতার	অবতরণ	মানুষরূপে অবতীর্ণ ঈশ্বর
হিন্দু	ভারতবাসী	সম্প্রদায়বিশেষ
নাস্তিক	নাই-বাদী	ঈশ্বরে অবিশ্বাসী
এবং<এবম্	এইরূপ	ও

লোকহিত

মহাজন	মহাপুরুষ	ব্যবসায়ী
সহজ	সহজাত	সুকর
সংকোচ	হ্রস্বীভবন	কুণ্ঠা

শব্দ	মূল অর্থ	পরিবর্তিত অর্থ
ক্ষত্রিয়	ক্ষত হইতে ত্রাতা	বর্ণবিশেষ
বই<আ. বহী	দিব্যবাণীবাহী গ্রন্থ	সাধারণ গ্রন্থ
উত্তেজিত	তীক্ষ্ণীকৃত	উদ্দীপিত
	নৈশ অভিযান	
একাকার	সমাকৃতিবিশিষ্ট	একশা
ধীবর	শ্রেষ্ঠধী	মৎস্যজীবী
	আরণ্যক	
তার (পাওয়া)	ধাতুনির্মিত সূত্র	টেলিগ্রাফ
ইতিহাস	এইরূপই ছিল	ইতিবৃত্ত
লাবণ্য	লবণের ভাব	লালিত্য
সম্ভ্রম	বিচলিত ভাব	শ্রদ্ধা
দিব্য	স্বর্গীয়	চমৎকার, বিলক্ষণ
আপত্তি	প্রাপ্তি	অসম্মতি
বনস্পতি	বনের রাজা	বড়োগাছ
প্রাচীন	পূর্ববর্তী	পুরাতন
সমাধি	সম্যক্ আধার	কবর
সভ্যতা	সভায় সাধুতা	শিষ্টতা
সংস্কৃতি	পরিমার্জনা	কৃষ্টি (culture)
ভীষণ	ভয়ঙ্কর	অত্যন্ত

অনুশীলনী

১. মূল অর্থ ও পরিবর্তিত অর্থ লেখ :

ক. পাঠ্যগত : তুরঙ্গম, বিকল, শরীর, শ্বাপদ, ব্যাঘ্র, ঘাস, গ্রাম, সন্তান, ইতর, ধর্ম, পৌরুষ, নেত্র, দারুণ, ধন্য, সন্দেশ, হিন্দু, এবং, মহাজন, দিব্য, সংস্কৃতি।

খ. পাঠ্যবহির্ভূত : কালি, মোরগ, কলম, ঠাকুর, ঝি, লাঞ্ছিত, অর্বাচীন, ইতস্তত, সুতরাং, সাগর, প্রবীণ, সিংহ, শরৎ।

২. কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ ধরনের অর্থ পরিবর্তন ঘটেছে লেখ :

(সঙ্কেত : মহাজন—অর্থের অপকর্ষ। হিন্দু—অর্থের সংকোচন। অবতার—অর্থের উৎকর্ষ বা উন্নতি। ধন্য—অর্থসংশ্লেষ। সাহস—অর্থসংশ্লেষ। জন্তু—অর্থসংকোচন। দারুণ—অর্থসংশ্লেষ।)

অন্ন ; রাজস্ব ; প্রজা ; সরস্বতী ; বেদ ; পুঙ্গব ; অভিষেক ; ধর্ম ; জগৎ ; উচ্ছিষ্ট ; সামান্য ; ব্যাটা ; পিশাচ ; চাকুরি ; অমায়িক ; রহস্য ; রাবণ ; গবাক্ষর ; বিকল ; ছত্র ; কুলীন ; স্বামী ; ব্যাঘ্র ; বিপ্লব ; অভিযান ; গ্রাম ; ঘাস ; মন্বন্তর ; সকল ; হরিণ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

(ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা)

বাংলা সাধুভাষা ও চলিতভাষার পরস্পরের মধ্যে সম্বন্ধ বুঝতে হলে বাংলা ভাষায় মধ্যযুগে ও আধুনিক যুগে আগত অর্ধতৎসম শব্দগুলির পরিবর্তনের ধারাটি লক্ষ্য করা দরকার। বাংলার নিজস্ব বিশেষ কয়েকটি উচ্চারণভঙ্গী বা ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা-গুলোর বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে। আমরা উদাহরণ সহ সেই সব ধারার সংজ্ঞা নির্দেশ করলাম।

যদিও উচ্চ মাধ্যমিকে এই ধারাগুলির মধ্যে চারটি ধারা পাঠ্য হিসেবে নির্ধারিত হয়েছে তবু আমরা অন্যান্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

১। **অপিনিহিতি** (Epenthesis)—শব্দের মধ্যে পরবর্তী ই বা উ কে আগেই উচ্চারণ করে ফেলার নাম অপিনিহিতি।

আজি > আইজ, আশু > আউশ।

২। **অভিশ্রুতি** (Umlaut)—অপিনিহিতি-স্বরের সঙ্গে তার আগেকার স্বর মিলে যে বিশেষ রূপান্তর তার নাম অভিশ্রুতি।

করিয়া > কইর‍্যা > ক'রে, রাখিয়ো > রাইখ্যো > রেখো।

৩। **স্বরসঙ্গতি** (Vowel Harmony)—পূর্বস্বরের প্রভাবে পরের স্বরের এবং পরের স্বরের প্রভাবে পূর্বস্বরের বিশেষ একটি সঙ্গতিস্থাপনের প্রচেষ্টাকে স্বরসঙ্গতি বলে। অতি > ওতি, বিলাত > বিলেত, পূজা > পুজো।

৪। **সমীভবন** (Assimilation)—বিষম দুই ধ্বনি পরস্পরের প্রভাবে অথবা অপরের প্রভাবে প'ড়ে সমতা লাভ করে। একে সমীভবন বলে।

পদ্ম > পদ্দ, ধর্ম > ধম্ম, অদ্য, > অজ্জ > আজ।

৫। **বিষমীভবন** (Dissimilation)—এ হল সমীভবনের বিপরীত সমধ্বনির মধ্যের একটির রূপান্তর। পর্তু: আরমারিও > আলমারি, লাল > নাল।

৬। **বর্ণ-বিপর্যয়** বা **বিপর্যাস** (Metathesis)—দুই ধ্বনির স্থান-পরিবর্তনকে বিপর্যয় বা বিপর্যাস বলে।

আহ্নিক > আন্‌হিক, বক্স > বাক্‌স > বাস্ক, আ. কুফ্‌ল্‌ > কুলুপ (= তালা)।

অপশ্রুতি—গুণ বৃদ্ধি ও সম্প্রসারণকে অপশ্রুতি বলে। গুণ = ই,ঈ > এ, উ,ঊ > ও, ঋ > অর্। ছুট্ > ছোটে। বৃদ্ধি – অ > আ, ই.ঈ > ঐ, উ, ঊ > ঔ, ঋ > আর। যেমন, অলস > আলস্য, ভূমি > ভৌম, সম্প্রসারণ = য > ই, ব > উ, র > ঋ, যজ্ঞ > ইষ্ট, দ্বার > দুয়ার। গ্রহণ > গৃহীত।

৭। **ধ্বনিলোপ :**

(ক) আদিস্বর-লোপ (Aphesis)—উপানৎ > পানই, অলাবু > লাউ।

(খ) মধ্যস্বরলোপ (Syncope)—মিশিকালে > মিশকালো, দেবকুল > দেঅউল > দেউল।

(গ) অন্ত্যস্বর-লোপ—দদ্রু > দাদ, গোরূপ > গোরু।

৮। **ব্যঞ্জনধ্বনি-লোপ**—দুই-স্বর-মধ্যবর্তী ব্যঞ্জনের লোপ বাংলাভাষার পূর্ব-স্তরে প্রায়ই ঘটত। হ-ধ্বনিলোপের প্রবণতা বাংলার একটি বৈশিষ্ট্য।

ফলাহার > ফলার, গাহিল > গাইল।

৯। **সমাক্ষর-লোপ** (Haplology বা Syllabic Syncope)—দুই সমান বর্ণ পাশাপাশি থাকলে একটির লোপ হয়। একে সমাক্ষর-লোপ বলে।

পাদোদক > পাদোক, চাক্‌খড়ি > চাখড়ি, ছোটকাকা > ছোট্‌কা।

১০। **ধ্বনি-সংযোজন :**

শ্রুতি (Glide)—একটি ধ্বনি উচ্চারণের পর আর একটি ধ্বনি উচ্চারণের সময়ে তার মধ্যে অন্য একটি ধ্বনি শ্রুত হয়। তার নাম শ্রুতি।

(ক) য়-শ্রুতি—মা > আমায় > মায়ামায় (মা য়্ আমায়)

মাএ > মায়ে, সাগর > সাঅর > সায়র।

(খ) ব-শ্রুতি—খা + আ = খাওয়া (খাব্‌য়া)

(গ) হ-শ্রুতি—বাআন্নো > বাহান্নো।

১১। **আদিস্বরাগম** (Prothesis)—প্রধানত উচ্চারণের সুবিধার জন্যে যুগ্মধ্বনির আগে স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয়। এর নাম আদিস্বরাগম।

স্কুল > ইস্কুল, স্পর্ধা > আস্পর্ধা।

১২। **মধ্যস্বরাগম বা বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি** (Anaptyxis) : উচ্চারণকে সহজ করার প্রয়াসে যুগ্মধ্বনির মধ্যে স্বরধ্বনি আনার নাম বিপ্রকর্ষ বা স্বরভক্তি।

রত্ন > রতন, গ্রাস > গরাস, শ্লোক > শোলোক।

১৩। **অন্তস্বরাগম** (Catathesis) : ব্যঞ্জনান্ত শব্দের শেষে স্বরধ্বনি এনে অনেকসময়ে উচ্চারণকে সহজ করা হয়। এর নাম অন্তস্বরাগম। বেঞ্চ > বেঞ্চি, ডেস্ক > ডেস্কো

১৪। **দ্বিতীয়ভবন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব** (Gemination or Doubling of Consonant)—অনেক সময়ে জোর দেবার জন্যে বা অন্য কোনো কারণে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়। একে দ্বিতীয়ভবন বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব বলে। ছোট > ছোট্ট, বড় > বড্ড, হাড় > হাড্ডি, গোলা > গোল্লা।

১৫। **ঘোষীভবন** (Voicing) ; অঘোষধ্বনির ঘোষধ্বনিতে পরিণত হওয়ার নাম ঘোষীভবন। কাক > কাগ, শাক > শাগ

১৬। **অঘোষীভবন** (Devoicing) : ঘোষবর্ণের অঘোষবর্ণে রূপান্তরের নাম অঘোষীভবন। রাগ করা > রাক্ করা (সমীভবনের ক্ষেত্রে) খরাব > খারাপ, গুলাব > গোলাপ

১৭। **মহাপ্রাণীভবন** (Aspiration)—মহাপ্রাণধ্বনির সংস্পর্শে অনেক অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জন মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের রূপ নেয়, একে মহাপ্রাণীভবন বলে।

জীর্ণ>জুন্ন>ঝুনা. √ক্রীড়া> √খেল্, ক্ষরতি>ঝরই>ঝরে।

১৮। **অল্পপ্রাণীভবন** (De-aspiration): মহাপ্রাণধ্বনির অল্পপ্রাণধ্বনিতে রূপান্তরের নাম অল্পপ্রাণীভবন।

বাঘ>বাগ, মাঝ>মাজ, আধ>আদ।

১৯। **নাসিক্যীভবন** (Nasalization): অনুনাসিক ব্যঞ্জন লুপ্ত হলে পূর্ববর্তী স্বর অনুনাসিক করার নাম নাসিক্যীভবন। হংস>হাঁস, অঙ্ক>আঁক, আমিষ<আঁইস>আঁষ।

২০। **স্বতোনাসিক্যীভবন** (Spontaneous Nasalization): পূর্বস্তরে অনুনাসিক ধ্বনি নেই অথচ পরের স্তরে অনুনাসিকতা দেখা দিলে তাকে স্বতোনাসিক্যীভবন বলে। পেচক>পেঁচা. যূথী>জুঁই, হাসি>হাঁসি।

২১। **বিনাসিক্যীভবন** (De-nasalization): পূর্বস্তরে নাসিক্যব্যঞ্জন থাকা সত্ত্বেও পরবর্তী স্তরে অনুনাসিকতা বর্জন করা হলে তাকে বিনাসিক্যীভবন বলে। কিঞ্চিৎ>কিছু, শৃঙ্খল>শিকল।

২২। হ-কার লোপ প্রবণতা—(ব্যঞ্জনধ্বনিলোপ প্রসঙ্গে আলোচিত)

তদ্ভব বা অর্ধতৎসম শব্দে তৎসমশব্দের 'হ'-লোপের প্রবণতা দেখা যায়। ফলাহার>ফলার, মহিষ>মোষ।

পাঠ্যগত উদাহরণ

পূর্বরাগ

ধেয়ান<ধ্যান (বিপ্রকর্ষ)। নয়ান<নয়ন (দীর্ঘায়ন)। চুলি<চুল (অন্ত্যস্বরাগম) বঁধু<বন্ধু (ন্-লোপে পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন)।

রাবণের রণসজ্জা

এ<ইহা ('হ'-লোপ, অভিশ্রুতি)। ইহা>ইআ>এ। বারতা<বার্তা (বিপ্রকর্ষ)।

ওরা কাজ করে

বেয়ে<বাহিয়া (অভিশ্রুতি) হ-লোপ। চেয়ে<চাহিয়া (অভিশ্রুতি)। আঁখি<অক্ষি (স্বতোনাসিক্যীভবন)। ভগ্নশেষ 'পরে<উপরে (আদ্য স্বরলোপ)। ঢাকি<ঢাকিয়া (বর্ণলোপ)।

সহমরণ

হিঁদু<হিন্দু ('ন্'-লোপ ও পূর্বস্বরের নাসিক্যীভবন)। মরদ<(ফা. মর্দ্ (বিদেশী শব্দে বিপ্রকর্ষ)।

জীবনবন্দনা

ভ'রে<ভরিয়া (অভিশ্রুতি)। বেদে<বেদিয়া (অভিশ্রুতি)। র'চে<রচিয়া (অভিশ্রুতি)।

১৯৪৬—৪৭

আলো<আলোক (বর্ণলোপ)। জিনিস<আ. জিন্‌স্ (বিদেশী শব্দে বিপ্রকর্ষ) মেজো<মাজুয়া<মাঝুয়া<মাঝ+উয়া (অভিশ্রুতি)। খেয়ে যেত<খাইয়া যাইত (অভিশ্রুতি)। বুকের 'পরে<উপরে আদ্য স্বরলোপ। কেউ>কেঅ>কেহ ('হ'কার লোপ, স্বরসঙ্গতি)। পবিত্রতা নেই<নাই<নাহি (স্বরসঙ্গতি)।

আঠারো বছর বয়স

সঁপে<সঁপিয়া (অভিশ্রুতি)। নেমে<নামিয়া (অভিশ্রুতি)।

কর্ণকুন্তীসংবাদ

পরম গরবে<গর্বে (বিপ্রকর্ষ)। পরশ করিছে<স্পর্শ (বিপ্রকর্ষ)। তেয়াগো< 'ত্যাগ' থেকে গঠিত নামধাতুতে বিপ্রকর্ষ (স্বরভক্তি)।

পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন

দুই<দ্বি=দ্‌ব্‌ই (সম্প্রসারণ : ব্>উ)। হওয়া<হআ (ব-শ্রুতি ও য়-শ্রুতি)

বাবু

আস্তাবল<ইং Stable (বিদেশীশব্দে আদ্য-স্বরাগম ও স্বরভক্তি)। জমিদার< জমিনদার, (স্বরভক্তি) বিদেশীশব্দে বর্ণলোপ।

লোকহিত

গরজ<আ. গর্জ (বিদেশীশব্দে স্বরভক্তি)। নকল<আ. নক্‌ল (বিদেশীশব্দে স্বরভক্তি । গরম<আ. গর্ম (বিদেশীশব্দে স্বরভক্তি)। বই<বহি (হকারলোপ প্রবণতা)

নৈশঅভিযান

ভেঙে পড়লে<ভাঙিয়া পড়িলে (অভিশ্রুতি)। আস্তে<ফা. অহিস্তা। হ-লোপ, স্বরসঙ্গতি। শুয়োর<শূকর (য়-শ্রুতি, স্বরসঙ্গতি) (শূকর>শূঅর>শূয়র>শুয়োর)।

আরণ্যক

জায়গা<জগহ ('হ' লোপ, বর্ণাগম)। জিজ্ঞেস্<জিজ্ঞাসা (দ্বিমাত্রিকতা, স্বর সঙ্গতি)। কলকাতা<কলিকাতা (অভিশ্রুতি)। জুতো<জুতা (স্বরসঙ্গতি)।

অন্ন চাই, প্রাণ চাই

ক'রে<কইর‍্যা<করিয়া, (অভিশ্রুতি)। ছেঁটে<ছাইট্যা<ছাঁটিয়া, (অভিশ্রুতি)। ক'রতে<কইরতে<করিতে, (অভিশ্রুতি)। শ<শত, (বর্ণলোপ)। করতে পাল্লে >পারলে, সমীকরণ। জিনিষ<আ. জিন্‌স্, (বিদেশীশব্দে স্বরভক্তি)। যন্তন্না<যন্তন্না< যন্ত্রণা, র্<ন্, সমীকরণ, স্বরভক্তি। মুখুজ্জে<মুখার্জী (সমীকরণ, স্বরসঙ্গতি) (মুখার্জী<মুখুর্জে<মুখুজ্জে)। কাষ্যি<কার্য (সমীকরণ, অন্ত্যস্বরাগম)। চাড্ডিখানি< চারটি (সমীকরণ, ঘোষীভবন) (চারটি>চাট্টি>চাড্ডি)। গিন্নি<গৃহিণী ('হ'-লোপ, দ্বিমাত্রিকতা)।

অনুশীলনী

১. ধ্বনি পরিবর্তনগত টীকা লিখ :

ক. পাঠ্যগত : ধেয়ান, বারত্তা, ধেয়ে, মরদ, আলো, নেমে, পরশ, আস্তাবল, শুয়োর, করতে **পাল্লে**, **চাড্ডি**খানি ।

২. পাঠ্যবহির্ভূত : (অ) বড়োর **পিরীতি** বালির বাঁধ

(আ) রতনে **রতন** চেনে

(ই) গান **গেয়ে** তরি **বেয়ে** কে আসে পারে ?

(ঈ) **বিলিতি** জিনিসের কদর আছে এখনও ।

(উ) **বাঘের** আগে **বাঘা** ছোটে ।

(ঊ) আধ **জনম** হাম নিদে গঙায়লুঁ ।

(এ) বিনি **সুতোয়** গাঁথা মালা ।

(ঐ) **আউশ** ধান এবার ভালোই হয়েছে ।

(ও) নৌকা **বাইচ দেখে** আয় ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাক্য পরিবর্তন

মনের ভাব-প্রকাশক পরস্পর সম্পূর্ণ অর্থবহ পদসমূহকে বাক্য বলে ।

সাহিত্য-দর্পণে যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা আর আসত্তিকে বাক্যের লক্ষণ বলা হয়েছে ।

যোগ্যতা হচ্ছে অর্থসঙ্গতি । সিংহের কেকাধ্বনিতে বনভূমি কম্পিত হল । এমন বাক্য শুনলে কেউ তা মেনে নেবে না, সিংহের আবার কেকা-ধ্বনি কী ?

আকাঙ্ক্ষা হচ্ছে স্পষ্ট অর্থবোধের জন্যে পদান্তর বা অন্য পদগুচ্ছের আকাঙ্ক্ষা । 'এক দেশে ছিল এক –'বলে থেমে গেলে চলে না । কর্তৃপদটির আকাঙ্ক্ষা প্রবল হয়ে ওঠে শ্রোতার মনে ।

'আসত্তি' মানে নৈকট্য । এটি পদবিন্যাসের ধারাটিকে বোঝাচ্ছে । মত পথ যত তত । এভাবে শব্দ সাজালে বাক্য হবে না । বলতে হবে 'যত মত তত পথ' ।

প্রথমে উল্লিখিত সংজ্ঞাটির সঙ্গে অলঙ্কারশাস্ত্র-বর্ণিত বাক্যলক্ষণের কোনো বিরোধ নেই ।

বাক্যের অঙ্গ : উদ্দেশ্য ও বিধেয় ।

সমস্ত বাক্যেই কোনো কিছু সম্বন্ধে বা কারো সম্বন্ধে কিছু বলা হয় ।

যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তাকে উদ্দেশ্য (Subject), আর উদ্দেশ্য-সম্বন্ধে যা বলা হয় তাকে বিধেয় (Predicate) বলে ।

পাখি ডাকছে ।—এই বাক্যে পাখি উদ্দেশ্য, ডাকছে বিধেয় ।

এই বাক্যটিকে আমরা আরও বড়ো করতে পারি উদ্দেশ্য বা বিধেয় অংশকে সম্প্রসারিত করে।

একটা ছোট্ট নীল পাখি ডাকছে।—এই বাক্যে উদ্দেশ্য সম্প্রসারিত হল 'একটা ছোট্ট' এই বিশেষণ-স্থানীয় শব্দগুচ্ছ-প্রয়োগে।

যদি বলি 'একটা ছোট্ট নীল পাখি গাছে বসে মধুর স্বরে ডাকছে' তাহলে বিধেয় সম্প্রসারিত হল। কারণ 'ডাকছে' এই বিধেয়াংশের সমাপিকা ক্রিয়াটিকে বিশেষিত করছে 'মধুর স্বরে' এই অংশটি।

বাক্যের গঠন-গত শ্রেণীবিভাগ : গঠনের দিক দিয়ে বাক্য তিন রকমের— সরল বাক্য (Simple sentence), জটিল বাক্য (Complex sentence) এবং যৌগিক বাক্য (Compound sentence)।

সরল বাক্য : যে-বাক্যে বিধেয় ক্রিয়া অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়া মাত্র একটাই থাকে তাকে সরল বাক্য বলে। পাখি ডাকে—এটি একটি সরল বাক্য। এটিকে সম্প্রসারিত করে আমরা যে বড়ো বাক্যটি পেয়েছিলাম, তা-ও সরল বাক্যই, কারণ সমাপিকা ক্রিয়াপদ সেখানেও একটি।

সরল বাক্যে একাধিক অসমাপিকা ক্রিয়া থাকতে পারে, কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া থাকবে একটি। —তাকে সব বুঝিয়ে ব'লে শান্ত ক'রে বাড়ি পাঠিয়ে দিলাম।

জটিল বাক্য : একটি প্রধান খণ্ডবাক্য এবং এক বা একাধিক অধীন খণ্ড বাক্য অবলম্বনে যে-বৃহত্তর বাক্য হয় তাকে জটিল বাক্য বলে।

যে সহে সে রহে।—'যে সহে' খণ্ডবাক্য।

এই খণ্ডবাক্যটির স্বতন্ত্র প্রয়োগের যোগ্যতা নেই, এ প্রধান বাক্যেরই অধীন।

এখানে এই খণ্ডবাক্যটি 'সে' পদটিকে বিশেষিত করছে, তাই এটি বিশেষণ-স্থানীয় খণ্ডবাক্য। খণ্ডবাক্য বিশেষ্য এবং ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয়-ও হতে পারে।

কী চাই বলো।—এখানে 'বলো' = প্রধান বাক্য ('তুমি' উহ্য) 'কী চাই' বলো-ক্রিয়ায় কর্মস্থানীয়, অর্থাৎ এটি বিশেষ্য-স্থানীয় খণ্ডবাক্য।

যখন যাবে বলে যেও।—এখানে 'বলে যেও' প্রধান বাক্য, 'যখন যাবে' ক্রিয়া-বিশেষণ-স্থানীয় খণ্ডবাক্য, কারণ এটি 'বলে যেও' ক্রিয়াপদটিকে বিশেষিত করছে।

যৌগিক বাক্য : দুটি বা দুইয়ের অধিক স্বাধীন বাক্য (সরল বা জটিল) যদি 'এবং' 'কিন্তু' ইত্যাদি সংযোজক অব্যয় (Conjunction) দ্বারা পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে দীর্ঘতর বাক্য গঠন করে তবে তাকে যৌগিক বাক্য বলে।

সে অসুস্থ কিন্তু আমার সঙ্গে সময়মতোই দেখা করেছে। (সরল + সরল)

নিজে কাজ করবে এবং যাকে দিয়ে কাজ হবে তাকেও সঙ্গে নেবে।

(সরল + জটিল)

বাক্যের অর্থগত শ্রেণীভেদ

১। **নির্দেশসূচক বাক্য** (Indicative or Assertive sentence) :

যে-বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা অবস্থার বিবৃতি থাকে তাকে নির্দেশসূচক বাক্য বলে। এই নির্দেশসূচক বাক্য আবার দু'রকমের।

(ক) **সদর্থক বাক্য** (Affirmative) : যে-বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা অবস্থা বিবৃতির মাধ্যমে স্বীকৃত বা প্রতিষ্ঠিত হয়, তাকে সদর্থক বাক্য বলে। যেমন—

যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি। মানুষের জীবনে উত্থান পতন আছে।

(খ) **নঞর্থক বাক্য** (Negative) : যে-বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা অবস্থা বিবৃতির মাধ্যমে অস্বীকৃত হয় তাকে নঞর্থক বাক্য বলে। যেমন—

কেউ অমর নয়। আমি অন্যায়কে মানি না।

২। **প্রশ্নাত্মক বাক্য** (Interrogative sentence) : যে-বাক্যে কোনো ঘটনা, ভাব বা অবস্থা-সম্বন্ধে কিছু জানার ইচ্ছা প্রকাশ পায় তাকে প্রশ্নাত্মক বাক্য বলে। যেমন— সে কেন এখানে আসে? তোমার নাম কী?

৩। **অনুজ্ঞাবাচক বাক্য** (Imperative sentence) : যে-বাক্যে আদেশ, উপদেশ, অনুরোধ, নিষেধ ইত্যাদি প্রকাশিত হয় তাকে অনুজ্ঞাবাচক বাক্য বলে। যেমন—আমাকে সব বলো। এখানে এসো। রোদে যেয়ো না।

৪। **ইচ্ছা বা প্রার্থনাসূচক বাক্য** (Optative sentence) : ঈশ্বর তার মঙ্গল করুন। ঠিক এমনি যেন হয়।

৫। **আবেগসূচক বাক্য** (Interjective sentence) : কী অবাক কাণ্ড! কী বিচ্ছিরি! ছিঃ, এমন নিচু মন!

বাক্য পরিবর্তন

গঠনগত

সরল : জ্ঞানীরাই সুখী।
জটিল : যারা জ্ঞানী তাঁরাই সুখী।

সরল : বৃষ্টি হলে আর বেরুব না।
জটিল : যদি বৃষ্টি হয় তা হলে আর বেরুব না।

সরল : অসুস্থতা সত্ত্বেও সে পরীক্ষা দিয়েছে।
জটিল : যদিও সে অসুস্থ, তবু সে পরীক্ষা দিয়েছে।

যৌগিক : সে বুদ্ধিমান কিন্তু বড়ো অলস।
সরল : বুদ্ধিমান হলেও সে বড়ো অলস।

সরল : মেঘ না চাইতে জল।
যৌগিক : মেঘ চাই নি, তবু জল।

জটিল : যদিও সে দরিদ্র, তবু সৎ।
সরল : দরিদ্র হলেও সে সৎ।

জটিল : পরিশ্রম না করলে সফল হবে না।
যৌগিক : পরিশ্রম কর, তাহলে সফল হবে।

সরল : জানলেও বলব না।
যৌগিক : জানি কিন্তু বলব না।

অর্থগত

সদর্থক : সে অসৎ।
নঞর্থক : সে সৎ নয়।

নঞর্থক : সে সফল হতে পারে নি।
সদর্থক : সে অসফল হয়েছে।

সদর্থক : সে সব বিষয়েই অজ্ঞ।
নঞর্থক : সে কোনো বিষয়েই কিছু জানে না।

নঞর্থক : তার উৎসাহ দমন করা যায় না।
সদর্থক : তার উৎসাহ অদম্য।

সদর্থক : আমি তোমাকে সব বলেছি।
প্রশ্নবোধক : আমি কি তোমাকে সব বলি নি?

প্রশ্নবোধক : কেন গিয়েছিলে?
নির্দেশাত্মক : তোমার যাওয়ার কারণ জানতে চাই।

নির্দেশাত্মক : সে যথেষ্ট সতর্ক।
প্রশ্নবোধক : সে কি যথেষ্ট সতর্ক নয়?

নঞর্থক : এ বিষয়টি আমি জানি না।
প্রশ্নবোধক : এ বিষয়টি কি আমি জানি?

প্রশ্নবোধক : কে সুখী?
নঞর্থক : কেউ সুখী নয়।

নির্দেশাত্মক : উন্নতির চেষ্টা করা কর্তব্য।
অনুজ্ঞাবাচক : উন্নতির চেষ্টা করো।

অনুজ্ঞাবাচক : যাও।
নির্দেশাত্মক : আমি তোমাকে যেতে বলছি।

নির্দেশাত্মক। ফুলটা খুব সুন্দর।
আবেগসূচক : কী সুন্দর ফুলটা !

আবেগসূচক : কী কষ্ট !
নির্দেশাত্মক : খুবই কষ্ট।

আবেগসূচক : কী আরাম !
নির্দেশাত্মক : খুব আরাম লাগছে।

আবেগসূচক : কী জঘন্য ওর প্রবৃত্তি !
নির্দেশাত্মক : ওর প্রবৃত্তি অত্যন্ত জঘন্য।

আকাঙ্ক্ষাসূচক : দীর্ঘজীবী হও।
নির্দেশাত্মক : তোমার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

নির্দেশাত্মক : ভগবানের কাছে তোমার মঙ্গল কামনা করি।
আকাঙ্ক্ষাসূচক : ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন।

উক্তি-ভেদ

প্রত্যক্ষ : রাম আমাকে ডেকে বলল, 'তুই কি সব শুনেছিস ?'
পরোক্ষ : রাম আমাকে ডেকে জিজ্ঞেস করল আমি সব শুনেছি কিনা।

প্রত্যক্ষ : 'কেন জ্বালাচ্ছিস বল তো ?' সুধা বলল।
পরোক্ষ : সুধা জিজ্ঞেস করল আমি ওকে জ্বালাচ্ছি কেন।

প্রত্যক্ষ : 'যদি পটলের সঙ্গে কথা বলিস,' আমি ওকে স্পষ্ট বললাম, 'তবে তোর সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক থাকবে না।'
পরোক্ষ : আমি ওকে স্পষ্ট বললাম, যদি পটলের সঙ্গে ও কথা বলে তবে আমার সঙ্গে ওর কোনো সম্পর্ক থাকবে না।

প্রত্যক্ষ : আমি ওকে বললাম, 'যা জানিস বল্, আমার কাছে কিছু লুকোস নে।'
পরোক্ষ : আমি ওকে ও যা জানে বলতে বললাম এবং আমার কাছে কিছু লুকোতে নিষেধ করলাম।

প্রত্যক্ষ : কোথায় যাচ্ছিস ? একটু অপেক্ষা কর। আমি তোর সঙ্গে যাব।
পরোক্ষ : আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম সে কোথায় যাচ্ছে। তারপর তাকে একটু অপেক্ষা করতে ব'লে বললাম আমি তার সঙ্গে যাব।

প্রত্যক্ষ : মাষ্টারমশাই বললেন, 'যে সয় সে রয়।'
পরোক্ষ : মাষ্টারমশাই বললেন, যে সয় সে রয়।

প্রত্যক্ষ : 'মঙ্গল হোক তোমার,' এই বলে তিনি চলে গেলেন।
পরোক্ষ : আমার মঙ্গল কামনা করে তিনি চলে গেলেন।

পরোক্ষ : সে আমাকে জানিয়ে দিল, তার সঙ্গে আমি যেন না মিশি।
প্রত্যক্ষ : সে আমাকে বলল, 'আমার সঙ্গে মিশিস নে।'

পরোক্ষ : তিনি আমার দীর্ঘায়ু কামনা করলেন।
প্রত্যক্ষ : তিনি আমাকে বললেন, 'দীর্ঘায়ু হও।'

পরোক্ষ : তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কী নিয়ে পড়ব আমি।
প্রত্যক্ষ : তিনি আমাকে বললেন, 'কী নিয়ে পড়বে তুমি ?'

কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে

বাক্য পরিবর্তন :

(ক) এই নবজন্মের বা ব্যাপক জাগরণের প্রভাব হয়েছিল **সুদূরপ্রসারী** (স্থূলাক্ষরে লিখিত সমাসবদ্ধ পদটি ভেঙে বাক্যটিকে লেখো।)—এই নবজন্মের বা ব্যাপক জাগরণের প্রভাব সুদূরে প্রসারলাভ করেছিল।

(খ) ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় যে জাগরণ ঘটে তাও এমনি একটি রেনেসাঁস (জটিল)।—ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় ঘটা জাগরণও এমনি একটি রেনেসাঁস (সরল)।

(গ) কিন্তু বাংলার এই জাগরণের সূচনা কখন থেকে ধরা হবে ? (প্রশ্ন পরিহার কর)—কিন্তু বাংলার এই জাগরণের সূচনা কখন থেকে ধরা হবে তা ভাববার বিষয়।

(ঘ) বাংলার একালের জাগরণে এই ধরনের মানবিকতার প্রতিবাদ সুস্পষ্ট। (প্রশ্নাত্মক বাক্যে পরিণত করো।)—বাংলার একালের জাগরণে এই ধরনের মানবিকতার প্রতিবাদ কি সুস্পষ্ট নয় ?

(ঙ) কাব্যকলা, দর্শনবিজ্ঞান এসব ক্ষেত্রে ঘটে বহু প্রাচীন সম্পদের সঙ্গে নতুন পরিচয়, আর নতুন নতুন সৃষ্টি, ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মত দূর দূরান্তের দেশ হয় আবিষ্কৃত (যৌগিক)—যখন কাব্যকলা দর্শনবিজ্ঞান এসব ক্ষেত্রে বহু প্রাচীন সম্পদের সঙ্গে নতুন পরিচয় আর নতুন নতুন সৃষ্টি ঘটে, তখন ভারতবর্ষ ও আমেরিকার মত দূর দূরান্তের দেশ আবিষ্কৃত হয়। (জটিল)

(চ) পাশ্চাত্ত্য-জগৎ তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যযুগীয় খোলস চুকিয়ে দিয়ে আধুনিক হয়ে ওঠে (সরল)—পাশ্চাত্ত্য জগৎ তার সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যযুগীয় খোলস চুকিয়ে দেয় এবং আধুনিক হয়ে ওঠে (যৌগিক)।

(ছ) ভারতচন্দ্রের পরে অষ্টাদশ শতাব্দীর বড়ো কবি রামপ্রসাদ (সরল)।—ভারতচন্দ্রের পরে যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর বড় কবি, তিনি রামপ্রসাদ (জটিল)।

(জ) বস্তুসম্পদ তাতে কম অর্থপূর্ণ নয়। (নাস্ত্যর্থক)—বস্তুসম্পদ তাতে খুবই অর্থপূর্ণ (অস্ত্যর্থক)।

(ঝ) রক্তের অবিমিশ্রতা কোথাও যদি দেখাতে চাই তাহলে বর্বর জাতির মধ্যে যেতে হয় (জটিল)।—রক্তের অবিমিশ্রতা কোথাও দেখাতে চাইলে বর্বর জাতির মধ্যে যেতে হয় (সরল)।

(ঞ) ভারতবর্ষেও অনার্যে আর্যে যে মিশ্রণ ঘটেছিল সে সম্বন্ধে সন্দেহ নেই (জটিল)।—ভারতবর্ষেও অনার্যে আর্যে মিশ্রণ ঘটেছিল, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই (যৌগিক)।

(ট) পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই তার বেশি আমাদের পক্ষে দুর্লভ (অস্ত্যর্থক)।—পরের কৃপণ হস্ত থেকে আমরা যেটুকু পাই তার বেশি আমাদের পক্ষে সুলভ নয় (নাস্ত্যর্থক)।

(ঠ) জাপানি-সভ্যতার সৌধ এক-মহলা—সেই হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি ও দক্ষতার নিকেতন (যৌগিক)।—জাপানি-সভ্যতার এক-মহলা সৌধই হচ্ছে তার সমস্ত শক্তি ও দক্ষতার নিকেতন (সরল)।

(ড) আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে সরল)।—আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা (প্রচলিত) ছিল এবং সেই জন্য বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটি অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে (যৌগিক)।

(ঢ) তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? (প্রশ্ন পরিহার করো)—তাতে ছাড়াও পাণ্ডিত্য হয়।

(ণ) যখন দেশটা উৎসন্ন যেতে আরম্ভ হল তখন এই-সব চিহ্ন উদয় হল (জটিল)। — দেশটা উৎসন্নে যেতে আরম্ভ হলে এই-সব চিহ্ন উদয় হল (সরল)।

বিভিন্ন ধরনের বাক্য পরিবর্তন

পাঠ্যগত উদাহরণ

পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন

অদ্যাপি সজীব রহিয়াছে। (অস্ত্যর্থক)

অদ্যাপি নির্জীব হয় নাই। (নঞর্থক)

যে রক্ষক সেই ভক্ষক। (জটিলবাক্য)

রক্ষকই ভক্ষক । (সরলবাক্য)

ইহার অপেক্ষা অনর্থমূলক ব্যাপার আর কি আছে? (প্রশ্নাত্মক বাক্য)

ইহার অপেক্ষা অনর্থমূলক ব্যাপার আর কিছুই নাই। (নির্দেশাত্মক বাক্য। প্রশ্ন পরিহৃত।)

এইরূপ প্রজাদেরও গৃহে কোন কর্ম উপস্থিত হইলে ভূস্বামির খরতর দৃষ্টি তদুপরি তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। (সরলবাক্য)

এইরূপ প্রজাদেরও গৃহে যখন কোন কর্ম উপস্থিত হয় তখন ভূস্বামির খরতর দৃষ্টি তদুপরি তৎক্ষণাৎ পতিত হয়। (জটিল বাক্য)

এ শব্দের কি বিষম তাৎপর্য ! (বিস্ময়বোধক বাক্য)

এ শব্দের তাৎপর্য অতি বিষম। (নির্দেশাত্মক বাক্য)

নিরশ্রু নেত্রে এ সমস্ত ভয়ানক ব্যাপার বর্ণনা করা কি মানুষের সাধ্য ? (প্রশ্নাত্মক বাক্য)

নিরশ্রু নেত্রে এ সমস্ত ভয়ানক ব্যাপার বর্ণনা করা মানুষের অসাধ্য। (নির্দেশাত্মক বাক্য, প্রশ্ন পরিহৃত)

আর ধৈর্য্যাবলম্বন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য, অতএব এবার এই স্থানেই সমাপ্তি। (যৌগিক বাক্য)

আর ধৈর্যাবলম্বন করা নিতান্ত দুঃসাধ্য বলিয়া এবার এই স্থানেই সমাপ্তি। (সরল বাক্য)।

বাবু

আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন। (অনুজ্ঞাসূচকবাক্য)

আপনার সানুগ্রহ সবিস্তার বর্ণনা কাম্য। (নির্দেশাত্মক বাক্য)

তিনি গোজন্ম গ্রহণ করিয়া বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন। (সরল বাক্য)

তিনি গোজন্ম গ্রহণ করিবেন ও বাবুদিগের ভক্ষ্য হইবেন। (যৌগিক বাক্য)

সূর্য ইহাদিগকে দেখিতে পাইবেন না। (নঞর্থক বাক্য)

সূর্য ইহাদিগককে দেখিতে অসমর্থ হইবেন। (অস্ত্যর্থক)

বাবুদিগের জয় হউক। (অনুজ্ঞা বা আকাঙ্ক্ষাসূচক বাক্য)

বাবুদিগের জয় কামনা করি। (নির্দেশাত্মক বাক্য)

লোকহিত

এই কারণে, ভাবনার জন্যই ভাবনা হয়। (সরল বাক্য)

ভাবনার জন্যই যে ভাবনা হয় এটাই তাহার কারণ। (জটিলবাক্য)

ঘরে যখন আগুন লাগিয়াছে তখন কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। (জটিল বাক্য)

ঘরে আগুন লাগিলে কূপ খুঁড়িতে যাওয়ার আয়োজন বৃথা। (সরলবাক্য)।

কিন্তু সেখানে কাণ্ডটা কী হইতেছে জানা চাই। (অস্ত্যর্থক)

কিন্তু সেখানে কাণ্ডটা কী হইতেছে তাহা না জানিলে নয়। (নঞর্থক)

ধনকামী নিজের গরজেই ধন সৃষ্টি করিয়া থাকে। (সরলবাক্য)

যে ধনকামী সে নিজের গরজেই ধন সৃষ্টি করে থাকে। (জটিল বাক্য)

নৈশ অভিযান

সাঁতার জানলে আবার ভয় কিসের ! (প্রশ্নাত্মক বাক্য)

সাঁতার জানলে আর ভয় নাই। (নির্দেশাত্মক বাক্য, প্রশ্ন পরিহৃত)

কত বড় পাড় ? (প্রশ্নাত্মক বাক্য)

পাড়টি খুবই বড়। (নির্দেশাত্মক বাক্য)

লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে পুঁতে দেবে। (অস্ত্যর্থক বাক্য)

লগির ঘায়ে মাথা ফাটিয়ে পাঁকে না পুঁতে ছাড়বে না। (নঞর্থক বাক্য)

তাহার এত বড় স্বার্থত্যাগ আমি মানুষের দেহ ধরিয়া ভুলিয়া যাই কেমন করিয়া? (প্রশ্নাত্মক বাক্য)

তাহার এতবড় স্বার্থত্যাগ আমি মানুষের দেহ ধরিয়া কোন মতেই ভুলিয়া যাইতে পারি না। (নির্দেশাত্মক বাক্য, প্রশ্ন পরিহৃত)

ভয় না থাকে ভালই। (জটিল বাক্য)

ভয় না থাকুক, সেই তো ভাল। (যৌগিক বাক্য)

আরণ্যক

এঁকে দিয়া জমিদারীর কাজ আর কতদিন চলিবে? (প্রশ্নাত্মক বাক্য)

এঁকে দিয়া জমিদারীর কাজ আর বেশিদিন চলিবে না। (নির্দেশাত্মক, নঞর্থক)

বড় একটা আগুন কর। (অনুজ্ঞাসূচক)

বড় একটা আগুন করিতে বলিতেছি। (নির্দেশাত্মক বাক্য)

বড় কৌতূহল হইল। (নির্দেশাত্মক বাক্য, অস্ত্যর্থক)

কী কৌতূহলই না হইল! (বিস্ময়সূচক বাক্য)

রাজার সঙ্গে দেখা করিবার বড়ই ইচ্ছা হইল। (নির্দেশাত্মক বাক্য, অস্ত্যর্থক)

রাজার সঙ্গে দেখা করিবার কী ইচ্ছাই না হইল! (বিস্ময়বোধক বাক্য)

বাবুজী, সজারুর মাংস খান? (প্রশ্নাত্মক বাক্য)

বাবুজী সজারুর মাংস খান কিনা জিজ্ঞাসা করি। (নির্দেশাত্মক বাক্য)

জগরু আগে যাও। (অনুজ্ঞাসূচক বাক্য।)

জগরুর আগে যাওয়া আমার ঈপ্সিত। (নির্দেশাত্মক বাক্য)

বিজিত অনার্যজাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই। (নঞর্থক বাক্য)

বিজিত অনার্যজাতিদের ইতিহাস সর্বত্র অলিখিত। (অস্ত্যর্থক বাক্য)

অন্ন চাই, প্রাণ চাই

চাড্ডিখানি কথা নয়। (নির্দেশাত্মক, নঞর্থক)

এ কি চাড্ডিখানি কথা? (প্রশ্নাত্মক বাক্য)

সে পয়সা যাঁদের আছে তাঁরা বলতে পারেন একথা। (অস্ত্যর্থক)

সে পয়সা যাঁদের আছে তাঁরা ছাড়া কেউ একথা বলতে পারেন না। (নঞর্থক বাক্য)

খুব রসিকতা করতে পারো যাহোক তুমি নির্মলবাবু। (নির্দেশাত্মক)

কী রসিকতাই না তুমি করতে পারো নির্মলবাবু! (বিস্ময়সূচক বাক্য)

কবিতা থেকে

না চলে নয়ান তারা। (নঞর্থক)

নয়ান তারা অচল। (অস্ত্যর্থক)

এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে ! (আকাঙ্ক্ষাসূচক বাক্য)
এ বিষম জ্বালা ভুলিতে পারিলে স্বস্তি পাইতাম। (নির্দেশাত্মক)
কি ফল বিলাপে। (প্রশ্নাত্মক)
বিলাপে ফল নাই অথবা বিলাপ নিষ্ফল। (নির্দেশাত্মক)

মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কলকলরবে
বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে। (জটিলবাক্য)

মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলে সেখানে নানাপথে নানা দলে দলে বিপুল জনত কলকলরবে চলা দেখি। (সরলবাক্য)
রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে। (নঞর্থক)
রণডঙ্কা নিঃশব্দ থাকে। (অস্ত্যর্থক)

গাহি সেই বেদে বেদুইনদের গান,
যুগেযুগে যারা করে অকারণ বিপ্লব অভিযান। (জটিলবাক্য)
যুগেযুগে অকারণ বিপ্লব অভিযানকারী
সেই বেদেবেদুইনদের গান গাহি। (সরলবাক্য)

মৃতেরা কোথাও নেই। (নির্দেশাত্মক, নঞর্থক)
মৃতেরা কোথাও আছে কি ? (প্রশ্নাত্মক)
সকলেই আড়চোখে সকলকে ছাখে (অস্ত্যর্থক)
কেউ সোজা-চোখে কাউকে ছাখে না। (নঞর্থক)
আঠারো বছর বয়স কী দুঃসহ ! (বিস্ময় সূচক বাক্য)
আঠারো বছর বয়স অত্যন্ত দুঃসহ। (নির্দেশাত্মক বাক্য)

বাক্য সঙ্কোচন বা এক কথায় প্রকাশ

অর্থ অপরিবর্তিত রেখে একাধিক পদকে একপদে সঙ্কুচিত করা যেতে পারে প্রধানত কৃৎ-প্রত্যয়, তদ্ধিত প্রত্যয় এবং সমাসের সাহায্যে এই রকম পদসঙ্কোচন ক হয়। যেমন—

যাহা উড়িতেছে = উড়ন্ত, এখানে 'উড়' ধাতুর সঙ্গে কৃৎপ্রত্যয় 'অন্ত' যোগ করে 'উড় পদটি গঠিত হয়েছে। (ঘটমান অর্থে

বাঘের মতো = বাঘা। এখানে 'বাঘ' শব্দটির সঙ্গে তদ্ধিত প্রত্যয় 'আ' সদৃশ অ যোগ করে 'বাঘা' শব্দটি গঠিত হয়েছে।

নদী মাতা যাহার = নদীমাতৃক। এখানে বহুব্রীহি সমাসের সাহায্যে পদসঙ্কো করা হয়েছে।

কখনও সম্পূর্ণ অন্য একটি পদ দ্বারাও একাধিক পদের অর্থ প্রকাশিত হয়। যেমন ময়ূরের ডাক = কেকা।

এইভাবে বিভিন্ন উপায়ে একাধিক পদের জায়গায় একপদের উদাহরণ নিচে দেওয়া হল।

কৃৎ প্রত্যয়ের সাহায্যে

পান করিবার ইচ্ছা = পিপাসা। লাভ করিবার ইচ্ছা = লিপ্সা। যাহা জ্বলিতেছে = জ্বলন্ত। জানিবার ইচ্ছা = জিজ্ঞাসা। যাহা নিবারণ করা কঠিন = দুর্নিবার। যে পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছে = অনুজ। যাহা দমন করা যায় না = অদম্য।

তদ্ধিত প্রত্যয় যোগে

মনুর পুত্র = মানব। জনকের কন্যা = জানকী। দশরথের পুত্র = দাশরথি। শিবের উপাসক = শৈব। যিনি ব্যাকরণে পণ্ডিত = বৈয়াকরণ। সবচেয়ে বড় = জ্যেষ্ঠ। যাহা রেশমের তৈরি = রেশমী। যাহা শরৎকালে ঘটে = শারদীয়। একই সময়ে বর্তমান = সমসাময়িক। মান আছে যাহার = মানী।

সমাস দ্বারা

ভিক্ষার অভাব = দুর্ভিক্ষ। সমান পতি যাহার = সপত্নী। ভাতের অভাব যাহার = হাভাতে। পা হইতে মাথা পর্যন্ত = আপাদমস্তক। শত্রু জন্মে নাই যাহার = অজাতশত্রু।

সম্পূর্ণ ভিন্ন শব্দ যোগে

পরিব্রাজকের ভিক্ষা = মাধুকরী। ভূষণের শব্দ = শিঞ্জন। অশ্বের রব = হ্রেষা। যে গাছ ফল পাকিলে মরিয়া যায় = ওষধি।

উপসংহার : বাক্যের অংশবিশেষে সংহতিসাধনের উদ্দেশ্যে বহু পদকে একপদে পরিণত করার প্রয়োজন হয়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, এই সঙ্কোচনকে হতে হবে বাগ্‌বিধিসম্মত। তাই 'প্রোষিতভর্তৃকা'র জায়গায় 'প্রবাসিভর্তৃকা' বা 'প্রোষিতস্বামিকা' চলবে না। 'অবিমৃষ্যকারী'র জায়গায় 'অবিচিন্ত্যকারী'ও এই কারণে অচল। 'পূর্বজন্মের বৃত্তান্ত যাহার স্মরণে আছে'— এখানে সঙ্কুচিত পদটি হবে 'জাতিস্মর', একে 'জন্মস্মর' করলে কান বিদ্রোহ করবে।

পাঠাগত উদাহরণ

রাবণের রণসজ্জা

ত্বরায় গমন করে যে = তুরঙ্গম
হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিকের সমাহার = চতুরঙ্গ
ঢাকজাতীয় রণবাদ্য বিশেষ = দামামা
নিতান্ত দগ্ধ হয় যে সময়ে = নিদাঘ

জীবনবন্দনা

কুকুরের ন্যায় পা যাহার = শ্বাপদ

নির্দিষ্ট আবাসহীন নিয়তভ্রমণকারী = যাযাবর

কর্ণকুন্তীসংবাদ

সিংহাসনে স্থাপনের সময় বিহিত বিশেষ স্নানক্রিয়া = অভিষেক

অশ্ব রাখিবার স্থান = মন্দুরা

পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন

উৎপাদক শক্তি বিশিষ্ট = উর্বরা

জ্ঞান বা নীতিগত সংক্ষিপ্ত বচন বা পরম্পরাগত বাক্য = প্রবাদ

মৃত্যু আসন্ন যার = মুমূর্ষু

ক্ষমা করিবার ইচ্ছা = তিতিক্ষা

রাজাকে বা সরকারকে দেয় খাজনা = রাজস্ব

কেবল একব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আয়ত্ত = একচেটে

শবদেহ দাহ করিবার স্থান = শ্মশান

চোরের ভাব = চৌর্য

সহ্য করিবার ক্ষমতা = তিতিক্ষা

বাবু

ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই যার = নাস্তিক

যাহার পরাজয় বা অনিষ্ট সাধন করা কঠিন = দুর্ধর্ষ

প্রকৃতিতে আছে যে = প্রকৃতিস্থ

লোকহিত

আব্রু নাই যাহার = বেআব্রু

ক্ষত হইতে ত্রাণ করে যে = ক্ষত্রিয়

ভুক্তবস্তুর পরিত্যক্ত অংশ = উচ্ছিষ্ট

যাহা নিক্ষেপ করিতে হয় এরূপ আয়ুধ = অস্ত্র

নৈশ অভিযান

যাহা ভেদ করা কঠিন = দুর্ভেদ্য

জানিবার ইচ্ছা = জিজ্ঞাসা

সামনাসামনি মুখ রাখিয়া = মুখোমুখি

আকাশে সঞ্চরণশীল অগ্নিপিণ্ড = উল্কা

আরণ্যক

ক্রয়েচ্ছুদের মধ্যে সর্বাধিক মূল্যদানে ইচ্ছুক ব্যক্তিকে বিক্রয় নীলাম

নাই উপমা যাহার = অনুপম

সুন্দরের ভাব = সৌন্দর্য
সভায় সাধু = সভ্য
লবণের ভাব = লাবণ্য
মায়া জানেনা যে = অমায়িক
যে বৃক্ষে ফল হয় কিন্তু ফুল ধরে না = বনস্পতি
দূর হইতে চাহিলে যেখানে আকাশ পৃথিবীর সহিত মিশিয়াছে বলিয়া মনে হয় — চক্রবালরেখা

মৃত্যুর পর শবদেহ ভূমিগর্ভে স্থাপন — সমাধি
সভ্যতাজনিত উৎকর্ষ = সংস্কৃতি
শত বৎসরের সমাহার = শতাব্দী

অন্ন চাই, প্রাণ চাই

সসম্মান অভ্যর্থনা = সম্বর্ধনা
শিশুর প্রথম অন্নগ্রহণের অনুষ্ঠান — অন্নপ্রাশন
অতিশয় আদর — প্রশ্রয়
যে কানে শোনে না — বধির
যাহাতে রজোগুণের প্রাবল্য আছে — রাজসিক

অনুশীলনী

১. এক কথায় প্রকাশ কর :

পাঠ্যগত : গাছের গোড়ায় জল দিবার জন্য মাটির ঘের, রঘুবংশে জন্ম যাহার, যে উপকারীর উপকার স্বীকার করে না, সুমিত্রার পুত্র, অন্ত নাই যাহার, যে যুদ্ধে কপটতার আশ্রয় নেয়, বিদেহরাজের তনয়া, সুন্দর গ্রীবা যাহার, শবদাহের স্থান, শ্বা-এর পদের ন্যায় পদ যাহার, যে সংযমী নয়, চোরের কর্ম, উপমা নাই যাহার, যাহার কামনা বিগত হইয়াছে, ভীরুপুরুষ, ভগীরথের কন্যা, যাহা নিবারণ করা কঠিন।

পাঠ্যাতিরিক্ত : যাহা অবশ্যই হইবে, যাহা জানা কঠিন, যাহা হজম করা কঠিন, শুনিবার ইচ্ছা, জয় করিতে ইচ্ছুক, একই গুরুর শিষ্য, আগাইয়া গিয়া অভ্যর্থনা, বাক্য ও মনের অগোচর, হস্তীর রব, অশ্বের রব, ময়ূরের রব, ভূষণের শব্দ, ঢাকায় প্রস্তুত, ভৃগুর অপত্য, যিনি ন্যায়ে পণ্ডিত, যিনি পণ্ডিত, জানু পর্যন্ত, জন্ম হইতে, শুভক্ষণে জন্ম যাহার, হাতি রাখিবার স্থান, বাঁচিবার ইচ্ছা, আমরণ উপবাস, নীলের ভাব, পতিপুত্রহীনা নারী, যাহা পূর্বে কখনও হয় নাই, যাহার স্বাদ পূর্বে কখনও পাওয়া যায় নাই, ন্যায় হইতে অনপেত, মূর্ধা হইতে জাত।

বাক্যসম্প্রসারণ

ভাষার ক্ষেত্রে বাক্যসংকোচন যেমন একটি অনুশীলন, বাক্যসম্প্রসারণও তেমনিই একটি অনুশীলন।

যখন আমরা সরল বাক্য থেকে জটিলবাক্য করি তখন আমরা বাক্যটিকে অল্প বিস্তর সম্প্রসারিতই করি।

পরিশ্রমী সফল হবেই।—এই সরল বাক্যটিকে যখন জটিল বাক্যে পরিণত করে বলি 'যারা পরিশ্রম করে তারা সফল হবেই', তখন মূল বাক্যটি যে বিবর্ধিত হল তা তো স্পষ্ট। সরল বাক্য থেকে যৌগিক বাক্যেও সামান্য বৃদ্ধি ঘটে :

সরল বাক্য ঃ গরিব হলেও সে সৎ।

যৌগিক বাক্য ঃ সে গরিব বটে কিন্তু সৎ।

এই-ধরনের সম্প্রসারণ 'বাক্য পরিবর্তন' বিভাগের অন্তর্গত।

সাধারণত বাক্যসম্প্রসারণ বলতে আমরা যা বুঝি তা হল প্রদত্ত বাক্যে নতুন কিছু অংশ যোগ করে উদ্দেশ্যকে, বিধেয়কে কিংবা উভয়কেই সম্প্রসারিত করা।

যার সম্বন্ধে কিছু বলা হয় তা উদ্দেশ্য (Subject) আর উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যা বলা হয় তা বিধেয় (Predicate)

ফুল ফোটে

এই বাক্যে 'ফুল' উদ্দেশ্য এবং 'ফোটে' বিধেয়। এখন এই বাক্যটির উদ্দেশ্য পদকে সম্প্রসারিত করে আমরা বলতে পারি **রঙবেরঙের ফুল**। আরও বাড়িয়ে বলতে পারি **রঙবেরঙের সুগন্ধি ফুল**। দেখা যাচ্ছে সম্প্রসারক পদ বা পদগুচ্ছ হয় বিশেষণ, না হয় বিশেষণস্থানীয়। বিশেষণস্থানীয় অঙ্গবাক্য (Adjective clause) দিয়েও উদ্দেশ্য সম্প্রসারিত হতে পারে :

মূল বাক্য ঃ ছেলেটা কাল এসেছিল।

সম্প্রসারিত বাক্য ঃ যে এবারে বার্ষিক পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছে সেই ছেলেটা কাল এসেছিল।

এখানে স্থূলাক্ষর বাক্যাংশটি বিশেষণস্থানীয় অঙ্গবাক্য যা 'ছেলেটি' এই পদটিকে বিশেষিত করছে।

বিধেয়াংশ সম্প্রসারিত করতে হলে কর্মাদি বিভিন্ন কারকের পদ, ক্রিয়াবিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় পদগুচ্ছ বা ক্রিয়াবিশেষণস্থানীয় অঙ্গবাক্য (Adverbial clause) দিয়ে করতে হবে।

ফুল ফোটে এই বাক্যে কালাধিকরণ 'ভোরে' পদটি যোগ করা চলে।

'ছেলেটি কাল এসেছিল' এ বাক্যের বিধেয়াংশকে বিবর্ধিত করে বলতে পারি :

ছেলেটি কাল পোটোপাড়া থেকে এসেছিল।—এখানে অপাদান কারকের পদ ব্যবহার করা হল।

বলতে পারি 'ছেলেটি কাল চুপি চুপি এসেছিল।' এখানে 'চুপিচুপি' ক্রিয়াবিশেষণ-পদ।

যদি বলি 'ছেলেটি ঠিক যখন বলেছি তখন এসেছে' তাহলে সম্প্রসারক যে ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় বাক্য তা বোঝা যাচ্ছে।

কোন্ বা কেমন জিজ্ঞাসা করে যে উত্তর পাওয়া যাবে তা হবে উদ্দেশ্যের সম্প্রসারক।

আর মূল বিধেয় অর্থাৎ সমাপিকা ক্রিয়াটিকে আশ্রয় করে কোথায়, কেন, কখন, কী-শর্তে, কীভাবে ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করে যে উত্তর পাওয়া যাবে তা-ই হবে বিধেয়বিবর্ধক।

এই সমাপিকা ক্রিয়া সকর্মক হলে তার কর্মপদটি বিধেয় সম্প্রসারক হিসেবেই গণ্য হবে।

মূলবাক্য ঃ হরি পড়ে।

বিবর্ধিত বাক্য ঃ হরি বই পড়ে

এখানে 'বই' এই কর্মপদটি বিধেয়াংশকেই বিবর্ধিত করেছে। শুধু কর্মপদ কেন বিধেয়াংশের যে কোনো পদকেই বিশেষিত করে বাক্যকে বাড়ানো যেতে পারে।

এবারে পাঠ্য থেকে কয়েকটি উদাহরণ নেওয়া যাক। আলোচনাপ্রসঙ্গে বাক্য সম্প্রসারণের আরও কিছু দিক নজরে আসবে।

মূলবাক্য ঃ সমাজ মীমাংসায় লাগিয়া যায়।

বিবর্ধিত বাক্য ঃ **তখন** সমাজ, **দয়া করিয়া নহে, নিজের গরজে সেই সমস্যার** মীমাংসায় লাগিয়া যাইবে।

এখানে সংযোজিত অংশগুলিকে স্থূলাক্ষর করা হল। এবারে তাদের প্রয়োগগত পরিচয় নেওয়া যাক।

১. তখন = ক্রিয়াবিশেষণ

২. দয়া করিয়া নহে = প্রক্ষেপ বাক্য (Parenthesis)

৩. নিজের গরজে—ক্রিয়াবিশেষণ।

৪. সেই সমস্যার = বিধেয়াংশের অন্তর্গত 'মীমাংসায়' পদের বিশেষণস্থানীয়।

মূলবাক্য ঃ রহিল জলস্রোত (উদ্দেশ্য = জলস্রোত, রহিল = বিধেয়)

বিবর্ধিত বাক্য ঃ রহিল **শুধু দক্ষিণে ও বামে সীমান্তরালে প্রসারিত বিপুল উদ্দাম** জলস্রোত।

১. শুধু = বিধেয় সম্প্রসারক, ক্রিয়াবিশেষণ

২. দক্ষিণে ও বামে সীমান্ত প্রসারিত = উদ্দেশ্য সম্প্রসারক, বিশেষণস্থানীয় পদগুচ্ছ

৩. বিপুল, উদ্দাম = উদ্দেশ্য সম্প্রসারক, বিশেষণ পদ—

(এখানে লক্ষণীয় : বিধেয় আছে আগে, উদ্দেশ্য পরে)

মূল বাক্য ঃ আমরা গুঁড়িয়ে যাব।

বিবর্ধিত বাক্য ঃ একটা পাড় ভেঙে পড়লে ভিত্তিসুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাব।

১. একটা পাড় ভেঙে পড়লে = বিধেয় সম্প্রসারক, ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় পদ গুচ্ছ।

২. ভিত্তিসুদ্ধ = বিধেয় সম্প্রসারক, সমাসবদ্ধ ক্রিয়া বিশেষণ পদ।

৩. সব = উদ্দেশ্য সম্প্রসারক। সর্বনামীয় বিশেষণ পদ।

মূলবাক্য ঃ চমকাইয়া উঠিয়াছিলাম (উদ্দেশ্য পদ 'আমি' উহ্য)

বিবর্ধিত বাক্য ঃ প্রায় চমকাইয়া উঠিয়াছিলাম বোধহয়।

১. প্রায় = বিধেয় সম্প্রসারক, ক্রিয়াবিশেষণ

২. বোধহয় = ,, ,,

মূল বাক্য ঃ সে রাজকন্যা।

বিবর্ধিত বাক্য ঃ যে মেয়েটি আমাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিয়াছিল সে সত্যিই রাজকন্যা।

১. স্থূলাক্ষর প্রথমাংশ = উদ্দেশ্য সম্প্রসারক, বিশেষণস্থানীয় অঙ্গবাক্য।

২. সত্যিই = বিধেয় সম্প্রসারণ, ক্রিয়াবিশেষণ রূপে প্রযুক্ত। (উহ্য 'হয়' ক্রিয়ার ক্রিয়াবিশেষণ)

অনুশীলনী

১. শুধু উদ্দেশ্য সম্প্রসারিত করো ঃ

ক) কোকিল ডাকছে। খ) নদী যায় বয়ে। গ) বন্ধু এসেছে। ঘ) কিছু নেই।
ঙ) গুহার মধ্যে গন্ধ।

২. শুধু বিধেয়াংশ সম্প্রসারিত করো।

ক) চাঁদ উঠছে। খ) মেয়েটি হাসছে। গ) পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন। ঘ) শব্দ শুনলাম ঙ) কেন এলে?

৩. উদ্দেশ্য ও বিধেয়াংশ সম্প্রসারিত করো

ক) পাহাড়ে উঠছে। খ) একটা রাস্তা থাকা চাই। গ) মানুষ কী শিখিতেছে।
ঘ) চাষীরা চাষ করে।

৪. নিচে-লেখা বাক্যগুলির উদ্দেশ্য পদ ও মূলবিধেয় বা বিধেয়াংশ দিয়ে সংক্ষিপ্ততম বাক্যটি লেখ, তারপর বাড়তি অংশগুলি উদ্দেশ্য বিধেয়ের সঙ্গে কীভাবে সম্পর্কিত লেখো ঃ

ক) ভানুমতী নিতান্ত স্বাস্থ্যবতী সুঠাম মেয়ে।

খ) রাজদর্শনে যাইতে হইলে কিছু নজরা লইয়া যাওয়া উচিত।

গ) অনুকূল স্রোতে মিনিট দুইতিন খরবেগে ভাঁটাইয়া আসিয়া—হঠাৎ একস্থানে একটা দমকা মারিয়া যেন আমাদের এই ক্ষুদ্র ডিঙিটি পাশের ভুট্টা ক্ষেতের মধ্যে প্রবেশ করিল।

ঘ) যতটা পারো তোমার হাত দিয়া ছিদ্র সামলাও। ঙ) গুরু গুরু গর্জন গুন্ গুন্ স্বর দিন রাত্রি গাঁথা পড়ি দিনযাত্রা করিছে মুখর। চ) উল্কার মতো ঘুরিছে ধরণী শূন্যে অমিতবেগে। ছ) অন্ধকারে অর্ধসত্য সকলকে জানিয়ে দেবার নিয়ম এখনও আছে।

উক্তি পরিবর্তন

কে বলছে তা বিচার করে বাক্যে দুরকম উক্তি ধরা হয়েছে : প্রত্যক্ষ উক্তি (Direct narration) এবং পরোক্ষ উক্তি (Indirect narration)। ১। বক্তার নিজের উক্তি যদি হুবহু অনুকরণ করা হয় তাহলে তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলা হয়। যেমন মানিক বলল, 'আমি কথাটা শুনিনি।' এখানে মানিক যা বলেছিল তারই হুবহু অনুকরণ করা হয়েছে। মানিকের কথাটুকু তাই উদ্ধার-চিহ্নের মধ্যে রাখা হয়েছে।

২। বক্তা যা বলছে অন্য কেউ যদি তার বক্তব্য প্রকাশ করে তবে তাকে পরোক্ষ উক্তি বলে। মানিক বলল যে ঘটনাটা সে শোনে নি।

প্রত্যক্ষ থেকে পরোক্ষ উক্তিতে রূপান্তরের নিয়ম যদিও উদাহরণেই অনেকটা প্রকাশিত তবু তার একটা রূপরেখা দেওয়া হল।

নিয়ম

১। প্রত্যক্ষ উক্তিতে বক্তার বক্তব্য উদ্ধার চিহ্নের মধ্যে থাকে। এই অংশটিকে আমরা উদ্ধৃতি বলি।

২। উদ্ধৃতির আগে বল্ বা কহ্-ধাতুর যে-ক্রিয়াটি থাকে (যেমন, বলিল বা কহিল) তাকে আমরা জ্ঞাপক-ক্রিয়া (Reporting verb) বলব। আর তার কর্তাকে বলব জ্ঞাপক-কর্তা।

৩। এই জ্ঞাপক-ক্রিয়াটি সাধুভাষায় হলে সম্পূর্ণ বাক্যটি সাধুভাষায় রূপান্তরিত হবে, আর চলিতভাষায় হলে সম্পূর্ণ বাক্যটি চলিতভাষায় রূপান্তরিত হবে।

[সাধুভাষা—বলিল, চলিত ভাষা—বলল]

৪। পরিবর্তনটি হবে অর্থ-অনুসারে বাক্যের শ্রেণী-অনুসারে।

৫। উদ্ধৃতি নির্দেশাত্মক বাক্য হলে জ্ঞাপক-ক্রিয়ার পর 'যে' আসবে। এই 'যে' অবশ্য উহ্য থাকতে পারে। জ্ঞাপক-কর্তার পুরুষ অথবা জ্ঞাপক-ক্রিয়ার কর্মপদের পুরুষ-অনুযায়ী উদ্ধৃতি-বাক্যের কর্তার পুরুষ পরিবর্তিত হবে। এটি সর্বত্র প্রযোজ্য।

রাম বলিল, 'আমি স্কুলে যাব না'।

= রাম বলিল যে সে স্কুলে যাইবে না।

তুমি বললে যে তুমি কোনো কথা শুনবে না।

= তুমি বললে "আমি কোনো কথা শুনব না"।

রাম আমাকে বলল, 'তুমি বোকা।'

= রাম আমাকে বলল যে আমি বোকা।

৬। উদ্ধৃতি-বাক্য প্রশ্নবোধক হলে জ্ঞাপক-ক্রিয়াটিও প্রশ্নাত্মক হবে। বলিল> জিজ্ঞাসা করিল। উদ্ধৃতি-বাক্যের প্রশ্নটির উত্তর যদি সম্মতি বা অসম্মতি সূচক (হাঁ বা না) হয়, তা হলে ক্রিয়াপদের পর 'কিনা' বসবে।

আমি রামকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কি যাবে ?'

= আমি রামকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে যাইবে কি না।

উক্তি-বাক্যের প্রশ্নটি যদি কেন, কোথায়, কখন ইত্যাদি দ্বারা হয়—এককথায় প্রশ্নটির উত্তর যদি 'হাঁ' 'না' না হয়, তা হলে 'কিনা' বসবে না। উভয়ক্ষেত্রেই প্রশ্নচিহ্নটি তুলে দিয়ে দাঁড়ি দিতে হবে।

রাম আমাকে বলল. "কেন এসেছ ?"

= রাম আমাকে জিজ্ঞেস করল আমি কেন এসেছি।

৭। উক্তি অনুজ্ঞা-বোধক বাক্য হলে জ্ঞাপক-ক্রিয়াটিও অনুজ্ঞা-বোধক হবে (আদেশ করিল, অনুরোধ করিল ইত্যাদি)। অবশ্য শুধু 'বলিল'-ও অনুজ্ঞা বোঝাতে পারে। উক্তির অনুজ্ঞা-বোধক ক্রিয়ার ধাতুর সঙ্গে 'ইতে'-প্রত্যয় যোগ করতে হবে।

রাম আমাকে বলিল, 'যাও'

= রাম আমাকে যাইতে বলিল (বা আদেশ দিল)।

লক্ষণীয়—জ্ঞাপক-ক্রিয়াটি ইতে—প্রত্যয়ান্ত পদটির পরে বসবে।

অনুজ্ঞা-বাক্যটি নঞর্থক হলে 'ইতে'-প্রত্যয়ান্ত পদটির পর 'নিষেধ করিল' বা 'মানা করিল' এই ধরনের জ্ঞাপক-ক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে।

সে আমাকে বলল, 'রোদে যাস্‌নে'।

সে আমাকে রোদে যেতে নিষেধ করল।

৮। উক্তি-বাক্যটি আবেগ-সূচক হলে জ্ঞাপক-ক্রিয়াটির সঙ্গে 'সবিস্ময়ে', 'সখেদে' এই ধরনের ক্রিয়াবিশেষণ-স্থানীয় পদ বা পদগুচ্ছ ব্যবহার করতে হবে। উক্তিটি নির্দেশাত্মক বাক্যে রূপান্তরিত হবে। 'খুব' 'অত্যন্ত' ইত্যাদি কোনো আতিশয্য-দ্যোতক বিশেষণ ঐ রূপান্তরিত বাক্যে ব্যবহৃত হবে।

সে বলল, 'কী অদ্ভুত দৃশ্য' !

সে সবিস্ময়ে বলল দৃশ্যটি খুবই অদ্ভুত বা সত্যিই অদ্ভুত।

উক্তি-বাক্যটি আকাঙ্ক্ষাসূচক হলে জ্ঞাপক-ক্রিয়াটিকেও আকাঙ্ক্ষাসূচক করতে হবে—বলিল > ইচ্ছা করিল, প্রার্থনা করিল। মূলবাক্যে 'যেন' পদটি আসবে।

মা বললেন, 'তুমি দীর্ঘজীবী হও' !

= মা প্রার্থনা করলেন, আমি যেন দীর্ঘজীবী হই। (অথবা মা আমার দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করলেন।)

পাঠ্যাংশের উদাহরণ

প্রত্যক্ষ : ইন্দ্র কহিল, সেদিন ত আমি ঠিক এমনি করেই পালিয়েছিলাম। তার পরদিন এসে ডিঙি কেড়ে নিয়ে গেলাম, বললাম, নৌকা ঘাট থেকে চুরি করে আর কেউ এনেছিল—আমি না। (পৃ ৬৩)

পরোক্ষ : ইন্দ্র কহিল সেদিন ত সে ঠিক এমনি করিয়াই পলাইয়াছিল। সে আরও

বলিল যে তাহার পর দিন আসিয়া সে ডিঙি কাড়িয়া লইয়া গেল, বলিল, নৌকা ঘাট হইতে চুরি করিয়া অপর কেহ আনিয়াছিল—সে নহে।

প্রত্যক্ষ : ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল, চুপ! শালারা টের পেয়েছে—চারখানা ডিঙি খুলে দিয়েই এদিকে আসছে—ঐ দ্যাখ! (পৃ ৬৩)

পরোক্ষ : ইন্দ্র আর একটা ঠেলা দিয়া নৌকাখানা আরও খানিকটা ভিতরে পাঠাইয়া দিয়া কহিল সে যেন চুপ করিয়া থাকে, (কারণ) শালারা টের পাইয়াছে—চারখানা ডিঙি খুলিয়া দিয়াই এদিকে আসিতেছে। এই বলিয়া সে তাহার দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করিল।

প্রত্যক্ষ : সভয়ে ডাকিলাম, ইন্দ্র? হাত পাঁচ-ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল আমি নীচে।

নীচে কেন?

ডিঙি টেনে বের করতে হবে। আমার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে।

টেনে কোথায় বার করতে হবে?

ও গঙ্গায়। খানিকটা যেতে পারলেই বড় গাঙে পড়ব।

পরোক্ষ : সভয়ে ইন্দ্রকে নাম ধরিয়া ডাকিলাম। হাত পাঁচ ছয় দূরে বনের মধ্য হইতে সাড়া আসিল যে সে নীচে দাঁড়াইয়া আছে। আমি তাহাকে নীচে থাকিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। সে বলিল ডিঙি টানিয়া বাহির করিতে হইবে, তাহার কোমরে দড়ি বাঁধা আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম টানিয়া কোথায় বাহির করিতে হইবে। ইন্দ্র জানাইল উহা ঐ গঙ্গায় বাহির করিতে হইবে, খানিকটা যাইতে পারিলেই (তাহারা) বড় গাঙে পড়িবে।

আরণ্যক

প্রত্যক্ষ : বলিলাম—খাস্বা কি করে জানলে?
সে বলিল—চিরকাল শুনে আসছি বাবুজী, তাছাড়া সেই রাজার বংশধর এখনও বর্ত্তমান। (পৃ ৮২)

পরোক্ষ : জিজ্ঞাসা করিলাম উহা যে খাস্বা তাহা সে কি করিয়া জানিল। সে তাহাকে 'বাবুজী' বলিয়া সম্বোধন করিয়া বলিল যে সে তাহা চিরকাল শুনিয়া আসিতেছে। তাহা ছাড়া সেই রাজার বংশধরও তখনও বর্ত্তমান।

প্রত্যক্ষ : বুদ্ধু সিং বলিল—সেলাম রাজা সাহেব। রাজা দোবরু পান্না কানে শুনিতে পাইলেও চোখে ভাল দেখিতে পায় বলিয়া মনে হইল না। বলিল—কে? বুদ্ধু সিং? সঙ্গে কে? বুদ্ধু বলিল—একজন বাঙালী বাবু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। উনি কিছু নজর এনেছেন—আপনাকে নিতে হবে। (পৃ ৮৫)

পরোক্ষ : বুদ্ধু সিং রাজা সাহেবকে সম্বোধন করিয়া তাহাকে সেলাম জানাইল। রাজা দোবরু পান্না কানে শুনিতে পাইলেও চোখে ভাল দেখিতে পান বলিয়া মনে হইল না। জিজ্ঞাসা করিল কে আসিয়াছে—বুদ্ধু সিং কিনা, সঙ্গেই বা কে আসিয়াছে।

বুদ্ধ্ সিং বলিল একজন বাঙালী বাবু তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন, উনি কিছু নজর আনিয়াছেন। ইহার পর সে তাহাকে ঐ নজর লইবার জন্য অনুরোধ করিল।

প্রত্যক্ষ : (দোবরু পান্না বলিলেন—এখন আর কি আছে) আমাদের বংশ সূর্যবংশ। এই পাহাড় জঙ্গল, সারা পৃথিবী আমাদের রাজ্য ছিল। আমি যৌবন বয়সে কোম্পানীর সঙ্গে লড়েছি। এখন আমার বয়স অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলাম। তার পর আর কিছুই নেই।

পরোক্ষ : দোবরু পান্না সখেদে বলিলেন এখন আর তেমন কিছুই নাই। তাহাদের বংশ সূর্য বংশ এই পাহাড় জঙ্গল, সারা পৃথিবী—তাহাদের রাজ্য ছিল। তিনি যৌবন বয়সে কোম্পানীর সহিত লড়িয়াছেন। এখন তাহার বয়স অনেক। যুদ্ধে হেরে গেলেন, তাহার পর আর কিছুই নাই।

অন্ন চাই প্রাণ চাই

প্রত্যক্ষ : ২য় ভদ্রলোক। হ্যাঃ, তারপর কতজনকে নেমতন্ন করলে?

বড়কর্তা। তা-ভাই হাজার খানেক হবে। কেটেছেঁটে ওর চেয়ে কমতি করা গেল না।

৩য় ভদ্রলোক। পুরোপুরি এক হাজার। বল কি হে, পঞ্চাশ জনের জায়গায় এক হাজার! ভারতরক্ষা আইনে লটকে যাবে যে বাবা।

বড়কর্তা। নাও তোমার ভারত রক্ষা বিধান। ও আইন যারা একদিন করেছিলেন দেখবে তাঁদের অনেকেই আজ অধীনের বাড়িতে।

পরোক্ষ : দ্বিতীয় ভদ্রলোক পূর্বসূত্র টেনে জিজ্ঞাসা করিলেন কতজনকে তিনি (বড়কর্তা) নিমন্ত্রণ করলেন। বড়কর্তা জানালেন নিমন্ত্রিতের সংখ্যা হাজার খানেক হবে। কেটেছেঁটে তার চেয়ে কমতি করা গেল না। তৃতীয় ভদ্রলোক নিমন্ত্রিতের সংখ্যা পুরোপুরি এক হাজার শুনে বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন পঞ্চাশজনের জায়গায় সংক্ষেপে এক হাজার হওয়া সত্যিই ভাববার মতো। তার পর তিনি বড়কর্তা ভারতরক্ষা আইনে লটকে যেতে পাবেন বলে আশঙ্কা প্রকাশ করলেন। বড়কর্তা ভারতরক্ষা বিধান কথাটি নিয়ে বিদ্রূপ করে জানালেন ও আইন যারা একদিন করেছিলেন, তিনি (৩য় ভদ্রলোক) দেখবেন, তাঁদের অনেকেই আজ অধীনের বাড়িতে।

প্রত্যক্ষ : ২য় ভদ্রলোক।...তা ও বেঁচে থাক বা-বা ব্ল্যাকমার্কেট, বেঁচে থাক আমার মজুতদার। না হয় চতুর্গুণ পয়সা নেবে, জিনিসটা তো ঠিক ঠিক পাওয়া যাবে। করব কি বলো, পয়সা তো আর সঙ্গে যাবে না।

নির্মলবাবু। সে পয়সা যাঁদের আছে তাঁরা বলতে পারেন এ কথা। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে বেশি লোকেরই আবার সেটা নেই কিনা?

পরোক্ষ : দ্বিতীয় ভদ্রলোক ব্ল্যাকমার্কেট ও মজুতদারের দীর্ঘজীবন কামনা করে বললেন চতুর্গুণ পয়সা নিলে ক্ষতি নেই, জিনিসটা তো পাওয়া যাবে। তারপর মন্তব্য করলেন অত নীতিজ্ঞানের কথা না ভাবাই ভাল, কারণ পয়সা তো আর সঙ্গে যাবে না। নির্মলবাবু বললেন সে পয়সা যাদের আছে তাঁরা বলতে পারেন একথা কিন্তু সমস্যা হচ্ছে যে বেশি লোকের সেটা নেই।

রাবণের রণসজ্জা

[কবিতার উক্তি পরিবর্তনে গদ্য রূপ করে নেওয়া বাঞ্ছনীয়]

১

প্রত্যক্ষ : কহিলা রাক্ষস শ্রেষ্ঠ : এ কনকপুরে
ধনুর্দ্ধর আছে যত, সাজ শীঘ্র করি
চতুরঙ্গে রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্বালা।

পরোক্ষ : রাক্ষস শ্রেষ্ঠ এ কনকপুরে যত ধনুর্দ্ধর আছে তাদের শীঘ্র করিয়া সাজিতে আজ্ঞা দিলেন এবং জানাইলেন চতুরঙ্গে রণরঙ্গে এ জ্বালা ভুলিবেন।

২

প্রত্যক্ষ : কহিলা সত্রাসে
পাণ্ডুগণ্ডদেশ রক্ষ : মিত্র চূডামণি,—
কি আর কহিব দেব ? কাঁপিছে এ পুরী
রক্ষোবীর পদ ভরে, নহে ভূকম্পনে !
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ
গগনে, বিদেহী নাথ ! স্বর্ণবর্ণ-আভা।
অস্ত্রাদির তেজ: সহ মিলি উজলিছে
দশদিশ।

পরোক্ষ : পাণ্ডুগণ্ডদেশ মিত্রচূডামণি রক্ষ: সত্রাসে তঁহাকে সশ্রদ্ধ সম্বোধন করিয়া তাহার অভিভূত অবস্থা ব্যক্ত করিলেন এবং জানাইলেন এ পুরী রক্ষোবীর পদভরে কাপিতেছে, ভূকম্পনে নহে। আরও জানাইলেন বেদেহী নাথ গগনে যাহা দেখিতেছেন তাহা কালাগ্নিসম্ভব বিভা নহে। স্বর্ণ-বর্ণ আভা অস্ত্রাদির তেজের সহিত মিলিয়া দশ দিশ উজ্জ্বল করিতেছে।

প্রত্যক্ষ : সুস্বরে কহিলা প্রভু;—যাও ত্বরা করি
মিত্রবর, আহ্বানি হেথা আনি সত্বরে
সৈন্যাধ্যক্ষ দলে তুমি। দেবাশ্রিত সদা,
এ দাস দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে।'

পরোক্ষ : প্রভু স্বরে বিভীষণকে মিত্রবর সম্বোধন করিয়া তাহাকে এখানে সত্বর সৈন্যাধ্যক্ষদলকে আহ্বান করিয়া আনিতে বলিলেন। তাহার পর তাহাকে আশ্বস্ত করিয়া বলিলেন এ দাস অর্থাৎ রামচন্দ্র সদা দেবাশ্রিত, অতএব দেবতাকুল তাহাদের রক্ষা করিবে।

সহমরণ

প্রত্যক্ষ : জন্ম আমার হিঁদুর ঘরে
বাপের ঘরে, খুব আদরে
ছিলাম বছর দশ ;
কুলীন পিতার, কুলের গোলে,
ফেলে দিলেন বুড়োর গলে ;
হলাম পরের বশ।

পরোক্ষ : সে বলল তার জন্ম হিঁদুর ঘরে, বাপের ঘরে সে খুব আদরে দশবছর ছিল। তারপর কুলীন পিতা কুলের গোলে তাকে বুড়োর গলায় ফেলে দিলেন, সে পরবশ হল।

কর্ণকুন্তী সংবাদ

প্রত্যক্ষ :

কুন্তী। পুত্র, ভিক্ষা আছে —
বিফল না ফিরি যেন।

কর্ণ। ভিক্ষা, মোর কাছে !
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া, আর
যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।

পরোক্ষ : কুন্তী তাঁহাকে 'পুত্র'-সম্বোধন করিয়া জানাইলেন তাঁহার ভিক্ষা আছে। তিনি যেন বিফল হইয়া না ফেরেন। কর্ণ বিস্ময় প্রকাশ করিয়া জানিতে চাহিলেন তাঁহার নিকট কুন্তীর কী ভিক্ষা। তাহার পর আপন পৌরুষ ছাড়া ধর্ম ছাড়া তিনি যাহা আজ্ঞা করেন তাহা তাঁহার চরণে দিতে অঙ্গীকার করিলেন।

প্রত্যক্ষ :

কুন্তী। এসেছি তোমারে নিতে।
কর্ণ। কোথা লবে মোরে ?
কুন্তী। তৃষিত বক্ষের মাঝে,
লব মাতৃ ক্রোড়ে,

পরোক্ষ : কুন্তী বলিলেন তিনি তাঁহাকে (কর্ণকে) লইতে আসিয়াছেন।
কর্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন তাঁহাকে তিনি কোথায় লইবেন।
কুন্তী বলিলেন তিনি তাঁহাকে তৃষিত বক্ষের মাঝে মাতৃক্রোড়ে লইবেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাচ্য

'বাচ্য' কথাটির ব্যুৎপত্তিগত (বচ্ + ণ্যৎ) অর্থ 'বক্তব্য'। ক্রিয়া কীভাবে উক্ত বা ব্যক্ত হবে এ প্রক্রিয়া তাই বলে দেয়। ক্রিয়াপদ কর্তা বা কর্ম কাকে অবলম্বন করে প্রযুক্ত হয়েছে এবং বাক্যে উভয়ের মধ্যে কার প্রাধান্য সূচিত করছে অথবা নিজেই প্রধান হয়ে প্রকাশিত হচ্ছে তা ক্রিয়ার যে-শক্তি বা রূপভেদ থেকে বোঝা যায় তাই **বাচ্য**।

কর্তৃবাচ্য

যে-কর্তা স্বয়ং ক্রিয়া নিষ্পন্ন করে এবং বাক্যের মধ্যে প্রধানভাবে প্রতীয়মান হয় সেখানে ক্রিয়াটি কর্তৃবাচ্যের।

রাম পত্র লিখিতেছে।

এখানে রাম লিখনক্রিয়া সম্পাদন করছে। এ বাক্যে কর্তারই প্রাধান্য। ক্রিয়াপদটি সর্বতোভাবে কর্তৃপদের অধীন। কর্তার পুরুষ অনুসরণে ক্রিয়াটি প্রযুক্ত। তাই এখানে ক্রিয়াটি কর্তৃবাচ্যে আছে বুঝতে হবে।

কর্মবাচ্য

কিন্তু যেখানে কর্মই মুখ্যরূপে প্রতীয়মান হয়, কর্তা অপেক্ষা কর্মের সঙ্গেই ক্রিয়ার যোগ প্রকাশিত সেখানে ক্রিয়াকে কর্মবাচ্যের ক্রিয়া বলা হয়।

রাম-কর্তৃক পত্র লিখিত হইতেছে। এই বাক্যে কর্মপদ 'পত্র'ই যেন কর্তৃত্ব করছে, ক্রিয়াপদটি তারই অধীন। কর্তা যেন এখানে কেমন নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছে। তাই এখানে ক্রিয়ার কর্মবাচ্য হয়েছে তা বুঝতে হবে। এ ধরনের বাক্যে কর্তাকে অনুক্ত কর্তা বলা হয়।

বাচ্যান্তর

কর্তৃবাচ্য থেকে কর্মবাচ্যে রূপান্তর করবার নিয়ম।

১। বাক্যটি সাধুভাষায় হলে কর্তৃবাচ্যের কর্তৃপদটির সঙ্গে কর্তৃক বা দ্বারা অনুসর্গ যোগ করতে হবে। কর্তৃপদে 'র' বা 'এর' বিভক্তিও ব্যবহার করা যেতে পারে।

২। কর্মপদটিকে উদ্দেশ্য পদে পরিণত করতে হবে।

৩। ক্রিয়া এই উদ্দেশ্যরূপে ব্যবহৃত কর্মপদের পুরুষকে অনুসরণ করবে।

৪। এই ক্রিয়াপদটির মূল ধাতুটির সঙ্গে 'ত' (ইত) বা 'আ' প্রত্যয় যোগে গঠিত কৃদন্তপদটির সহিত √হ, √আছ, √চল্, √পড়্, √যা ইত্যাদি ধাতুজাত ক্রিয়া ব্যবহার করতে হবে।

৫। মূলবাক্যের কাল কর্মবাচ্যে বজায় রাখতে হবে এবং মূলবাক্যের সাধু বা চলিত রূপ অনুসৃত হবে।

কর্তৃবাচ্য	কর্মবাচ্য
১। রাম পুস্তক পড়িতেছে।	রাম-কর্তৃক পুস্তক পঠিত হইতেছে।
২। রাম বইটি পড়ছে।	রামের বইটি পড়া হচ্ছে।
৩। বালকটি ভাত খেল।	বালকটির ভাত খাওয়া হল।
৪। পুলিশ চোর ধরিয়াছে।	পুলিশ-কর্তৃক চোর ধৃত হইয়াছে অথবা, পুলিশের হাতে চোর ধরা পড়িয়াছে।

[এখানে 'পুলিশের হাতে, 'পুলিশ-কর্তৃক' অর্থ প্রকাশ করছে]

৫। কী পাই নি?	(আমার) কী পাওয়া হয় নি?
৬। কী চাস?	তোর কী চাই?

['চাই' ক্রিয়াপদটি কর্মবাচ্যের, হিন্দী 'চাহিয়ে' শব্দটির অনুরূপ।)

৭। আমি সে কথা জানি।	সে কথা আমার জানা।

কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য

কর্মবাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্য করার নিয়ম :

১। কর্মবাচ্যের উদ্দেশ্য পদকে কর্মরূপ দিতে হবে।

২। অনুসর্গযুক্ত অথবা সম্বন্ধপদরূপী নিষ্ক্রিয় বা অনুক্ত কর্তাটিকে উদ্দেশ্য রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। (গৌণ কর্মের রূপ ঠিকই থাকবে)

৩। কর্মবাচ্যের 'হ' ধাতুর সমাপিকা ক্রিয়াটি আর থাকবে না। তার জায়গায় 'ত' বা 'আ' যুক্ত ক্রিয়াবাচক পদটির ধাতু থেকে গঠিত ক্রিয়া ব্যবহৃত হবে এবং এই ক্রিয়া কর্তৃবাচ্যে ও পুরুষ অনুযায়ী প্রযুক্ত হবে।

৪। ক্রিয়ার কালরূপের কোনো পরিবর্তন হবে না।

কর্মবাচ্য	কর্তৃবাচ্য
১। রামের গান গাওয়া হয়েছে।	রাম গান গেয়েছে।
২। তার সব দেখা হয়েছে।	সে সব দেখেছে।
৩। দূর থেকে তাকে দেখা যাচ্ছে।	দূর থেকে তাকে দেখছি।
৪। ওর হাতে তোকে শাস্তি পেতে হবে।	ও তোকে শাস্তি দেবে।
৫। রাবণ-কর্তৃক সীতা অপহৃত হইয়াছিল।	রাবণ সীতাকে অপহরণ করিয়াছিল।
৬। ডাক্তার ডেকে আনা হোক।	ডাক্তার ডেকে আনো।

ভাববাচ্য

এখানে ভাব = ক্রিয়া। যে-বাক্যে ক্রিয়াই প্রধানরূপে প্রকাশ পায় এবং কর্তা ও কর্মের সঙ্গে সমাপিকা ক্রিয়ার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ থাকে না তাকে ভাববাচ্য বলে। ভাববাচ্যে সমাপিকা

ক্রিয়ার প্রথম পুরুষের রূপ হয় এবং মূল কর্তায় সাধারণত 'কে', 'র' বা 'এর' বিভক্তি হয়। যেমন,

আমাকে যেতে হবে। মহাশয়ের কোথায় থাকা হয়?

অনেক সময় কর্তার উল্লেখ একেবারেই না থাকতে পারে। যেমন. এ কলমে লেখা যায় না।

ভাববাচ্য থেকে কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর করতে কর্তার উল্লেখ করতে হয় এবং তাতে প্রথমা (শূন্যবিভক্তি) হয়। ক্রিয়াপদ কর্তার অনুগামী হয়।

ভাববাচ্য	কর্তৃবাচ্য
আমার খাওয়া হবে না।	আমি খেতে পারব না।
তাকে যেতে হবে।	সে যাবে।
মশাইয়ের কোথায় যাওয়া হবে?	মশাই কোথায় যাবেন?

কর্তৃবাচ্য থেকে ভাববাচ্যে রূপান্তর করতে কর্তায় 'এর' (বা 'র') বিভক্তির প্রয়োগ করতে হয়। [কর্তা উহ্যও থাকতে পারে]

কর্তৃবাচ্য	ভাববাচ্য
সে আসবে।	তার আসা হবে।
সে যায় নি।	তার যাওয়া হয় নি।
একটু শোওয়া যায় নি।	একটু শুতে পারি নি।
কোথায় যাওয়া হচ্ছে?	কোথায় যাচ্ছ?
বেড়ানো হল?	বেড়ালে?

কর্মকর্তৃবাচ্য

যে-স্থানে বিধেয়-ক্রিয়ার রূপ কর্তৃবাচ্যের ক্রিয়ার মতোই, কিন্তু ক্রিয়া-ব্যাপারে আসল কর্ম বাক্যের উদ্দেশ্য-পদ-রূপে ব্যবহৃত বলে মনে হয়, সেখানে বাক্যের বিধেয় ক্রিয়া কর্মকর্তৃবাচ্যে প্রযুক্ত। যেমন—সভা ভাঙে, কাপড় ছেঁড়ে, বাঁশি বাজে, বইটা ভালো কাটছে, মাথা ধরেছে। কর্মকর্তৃবাচ্য থেকে বাচ্যান্তর করা চলে না। তোমার কথা ভালো শোনাচ্ছে না। একে বিশুদ্ধ কর্তৃবাচ্যে রূপান্তর করতে হলে বলতে হবে—'তোমার কথা ভালো শুনছি না।'

পাঠ্যাংশের উদাহরণ

পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন

তাহাদিগকে যাতনাযন্ত্রে পেষণ করা হয়। (কর্মবাচ্য)

ভূস্বামী তাহারদিগকে যাতনাযন্ত্রে পেষণ করে। (কর্তৃবাচ্য)

তিনি মাঙ্গন অর্থাৎ ভিক্ষা উপলক্ষ্য করিয়া বলপূর্বক অপহরণ করেন। (ভাববাচ্য)

[অপহরণ করেন = সংযোগমূলক ধাতুজাত]

তাহার দ্বারা মাঙ্গন অর্থাৎ ভিক্ষা উপলক্ষ্য করিয়া বলপূর্বক অপহরণ করা হয়।
(কর্তৃবাচ্য)

সংপ্রতি এক ভূস্বামির বিষয় শ্রবণ করা গেল। (কর্মবাচ্য)

সংপ্রতি এক ভূস্বামির বিষয় শ্রবণ করিলাম। (কর্তৃবাচ্য)

তাহারা তথাপি দেশত্যাগ করে না। (কর্তৃবাচ্য)।

তাহাদিগের দ্বারা তথাপি দেশত্যাগ করা হয় না। (কর্মবাচ্য)

ভূস্বামির নিরূপিত ভাগ আহরণের পূর্বেই আপন আপন ভাগ গ্রহণ করেন। (কর্তৃবাচ্য)

ভূস্বামির নিরূপিত ভাগ আহরণের পূর্বেই (তাহাদিগ কর্তৃক) আপন আপন ভাগ গৃহীত হয়। (কর্মবাচ্য)

তদ্ভিন্ন অন্য অন্য লোকেও প্রজাদিগকে ক্লেশ দিতে ত্রুটি করে না। (কর্তৃবাচ্য)

তদ্ভিন্ন অন্য অন্য লোকের দ্বারাও প্রজাদিগকে ক্লেশ দিতে ত্রুটি করা হয় না। (ভাববাচ্য)

বাবু

আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণনা করুন। (কর্তৃবাচ্য)

আপনা দ্বারা অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণনা করা হউক। (ভাববাচ্য)

যাহাদিগের ইন্দ্রিয়মাত্রেরই ঐরূপ প্রশংসা করা যাইতে পারে, তাঁহারাই বাবু। (কর্মবাচ্য)

যাঁহাদিগের ইন্দ্রিয়মাত্রেরই ঐরূপ প্রশংসা করিতে পারি তাহারাই বাবু। (কর্তৃবাচ্য)

অগ্নি জ্বলিবেন। (কর্তৃবাচ্য)

অগ্নির জ্বলা হইবে। (ভাববাচ্য)

আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন। (কর্তৃবাচ্য)

আপনা দ্বারা অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করা হউক। (কর্মবাচ্য)

লোকহিত

সে সুদ আসলকে ছাড়াইয়া যায়। (কর্তৃবাচ্য)

সে সুদের দ্বারা আসলকেও ছাড়াইয়া যাওয়া যায় (কর্মবাচ্য)

তাহার হিসাব কেহ জমাইয়া রাখে না। (কর্তৃবাচ্য)

তাহার হিসাব কাহারও দ্বারা জমাইয়া রাখা হয় না। (কর্মবাচ্য)

ধনকামী নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্টি করিয়া থাকে। (কর্তৃবাচ্য)

ধনকামী দ্বারা নিজের গরজে দারিদ্র্য সৃষ্ট করা হয়। (কর্মবাচ্য)

আমরা তো নাইটস্কুল খুলিয়াছি। (কর্তৃবাচ্য)

আমাদিগ কর্তৃক নাইটস্কুল খোলা হইয়াছে। (কর্মবাচ্য)।

নৈশ অভিযান

এইমাত্র বুঝিয়াছি। (কর্তৃবাচ্য)

এইমাত্র বোঝা গিয়াছে। (ভাববাচ্য বা কর্মবাচ্য)
[এইমাত্রকে কর্মপদ ধরলে এটা কর্মবাচ্য, ক্রিয়া বিশেষণ ধরলে ভাববাচ্য]
অসহিষ্ণু মন আজ বারংবার এই প্রশ্নই করিতেছে। (কর্তৃবাচ্য)
অসহিষ্ণু মন দ্বারা আজ বারংবার এই প্রশ্নই করা হইতেছে। (কর্মবাচ্য)
সে হৃদয় কি দিয়া কে গড়িয়া দিয়াছিল। (কর্তৃবাচ্য)
সে হৃদয় কি দিয়া কাহার দ্বারা গড়া হইয়াছিল। (কর্মবাচ্য)

আরণ্যক

দেখে আসি কি জিনিসটা। (কর্তৃবাচ্য)
দেখে আসা যাক কি জিনিসটা (কর্মবাচ্য)
দোবরু পান্না আমাকে থাকিতে অনুরোধ করিতেছে। (কর্তৃবাচ্য)
দোবরু পান্না কর্তৃক আমি থাকিতে অনুরুদ্ধ হইতেছি। (কর্মবাচ্য)
পাহাড়ের উপর উঠিলাম। (কর্তৃবাচ্য)
পাহাড়ের উপর ওঠা গেল। (ভাববাচ্য)
এখানে তোমার দয়ালু হস্ত এই নির্যাতিত পশুকে কি করিয়া রক্ষা করিবে। (কর্তৃবাচ্য)
এখানে তোমার দয়ালু হস্ত দ্বারা এই নির্যাতিত পশু কি করিয়া রক্ষিত হইবে।
(কর্মবাচ্য)

অন্ন চাই প্রাণ চাই

যেটা অন্যায় তাকে প্রশ্রয় দেবেন? (কর্তৃবাচ্য)
যেটা অন্যায় তাকে প্রশ্রয় দেওয়া হবে? (কর্মবাচ্য)
ঝাঁটা মারো। (কর্তৃবাচ্য)
ঝাঁটা মারা হউক। (কর্মবাচ্য)

কবিতা থেকে

[কবিতাংশের বাক্য পরিবর্তনে গদ্যরূপই বাঞ্ছনীয়]
ওরা চিরকাল টানে দাঁড় ধরে থাকে হাল। (কর্তৃবাচ্য)
ওদের চিরকাল দাঁড় টানতে হয়. হাল ধরে থাকতে হয়। (কর্মবাচ্য)
ভুলিলাম ক্রমে যত ক্লেশ। (কর্তৃবাচ্য)।
ক্রমে যত ক্লেশ ভোলা গেল। (কর্মবাচ্য)
বন্দনা করি তারে। (কর্তৃবাচ্য)
সে বন্দিত হয়। (কর্মবাচ্য)
তবু আঠারোর শুনেছি জয়ধ্বনি। (কর্তৃবাচ্য)
তবু আঠারোর জয়ধ্বনি শোনা গেছে। (কর্মবাচ্য)

অনুশীলনী

১. (ক) ইহাতে তাহারদিগকে যাতনা যন্ত্রে পেষণ করা হয়। (কর্তৃবাচ্য করো) (খ) তাঁহারা বিজাতীয় যাতনা প্রদান করেন। (কর্মবাচ্যে রূপ দাও) (গ) লোক-সাধারণে তাহাদিগকে স্বভাবতই আপনাদের উপরিবর্তী বলিয়া মানিয়া লইত। (কর্মবাচ্যে পরিণত কর) (ঘ এই মাত্র বুঝিয়াছি। (ভাববাচ্যে রূপ দাও) (ঙ) তাহা ভাবিয়া পাইলাম না। (কর্মবাচ্যে রূপ দাও) (চ) শিহরিয়া নৌকার মাঝখানে জড়সড় হইয়া বসিলাম (ভাববাচ্যে রূপ দাও) (ছ) দেখে আসি। (ভাববাচ্যে রূপ দাও) (জ) কতজনকে নেমতন্ন করলে? (কর্মবাচ্য করো) (ঝ) অত কথা ভাবতে পারব না। (কর্মবাচ্যে রূপ দাও)

পাঠ্যাতিরিক্ত

(ঞ) অন্ধকারে ঢাকা পড়ল চারজনই (কর্মবাচ্য কর)। (ট) বালির উপরে দৌড়ানো যায় না। (কর্তৃবাচ্য করো)। (ঠ) কমলাকান্তের মনের কথা এ জন্মে আর বলা হইল না। (কর্তৃবাচ্য করো)। (ড) বইটা সম্পূর্ণ পড়েছি। (কর্মবাচ্য করো)। (ঢ) সবাইকে আহ্বান করেছি। (কর্মবাচ্য করো)। (ণ) আমাকে বিরক্ত কোরো না। (কর্মবাচ্য করো)। (ত) এই নীচে ঘাসেই বোসো না। (ভাববাচ্য করো)। (থ) কিন্তু বিরোধ কখনও কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। (কর্মবাচ্য করো) (দ) কোন্‌টি গ্রহণ করব? (কর্মবাচ্য করো)। (ধ) আবশ্যক না হলেই কি আর এসেছি মশায় (ভাববাচ্য করো)। (ন) জাপান বুদ্ধদেবের কাছ থেকে ধর্মের দীক্ষা গ্রহণ করেছে। (কর্মবাচ্য করো)।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

ছেদ ও যতি চিহ্ন

লেখা শুরুর প্রথম পর্বে কোনো ভাষাতেই ছেদ চিহ্ন ছিল না। যারা ধর্মকর্ম নিয়ে থাকত অর্থাৎ যাজক বা পুরোহিত সম্প্রদায় তাদের লেখ্য উপকরণ প্রধানত ছিল তাদেরই ব্যবহার্য। সময় ছিল প্রচুর, তাই ধীরেসুস্থে লিখিত পঙ্‌ক্তিকে মনে মনে সাজিয়ে অর্থ উদ্ধার করতে তাদের অসুবিধে হত না। ক্রমে জ্ঞানচর্চা সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তারিত হবার ফলে এবং ক্রমশ সমাজজীবনে ব্যস্ততা বাড়বার ফলে অর্থবোধের স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে সামান্য কিছু সংকেতচিহ্নের প্রয়োজন হল। শুধু পূর্ণবাক্যের শেষেই এই চিহ্নের ব্যবহার হত; অন্য কোথাও নয়।

পাণ্ডুলিপির যুগ পার হয়ে আমরা যখন পঞ্চদশ শতকের মুদ্রণের যুগে এলাম, তখন ক্রমে ক্রমে মুদ্রকেরাই প্রয়োজনবোধে নানা চিহ্নের প্রবর্তন করলেন, লেখকেরা তা অনুসরণ করে চললেন। অবশ্য লেখকদেরও কিছু উদ্ভাবনকেও মুদ্রাকরেরা মেনে নিলেন।

পুঁথির যুগে বাংলায় আমরা শুধু পেয়েছি দাঁড়ি (।) আর জোড়া দাঁড়ি (॥)।

সংস্কৃতের অনুসরণে আমরা কবিতার প্রথম চরণে দাঁড়ি দিয়েছি, আর দ্বিতীয় চরণে দিয়েছি জোড়া দাঁড়ি (॥)।

ঊনবিংশ শতকের একেবারে গোড়ায় গদ্য সাহিত্যের উদ্ভবের পর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের লেখকেরা ক্রমশ ইংরেজি ছেদ চিহ্ন কিছু কিছু ব্যবহার করতে শুরু করলেন। এখন আমরা দাঁড়ি ছাড়া অন্যান্য যে-সব চিহ্ন ব্যবহার করি তা সবই ইংরেজি থেকে গৃহীত।

সংজ্ঞা

অর্থবোধের সুবিধার জন্যে এবং অনেক সময় কোন্ ভঙ্গীতে আমরা কথা বলছি তা বোঝাবার জন্যে যে বিশেষ সংকেত-চিহ্ন ব্যবহৃত হয় তার নাম ছেদ ও যতি চিহ্ন।

যতি মানে 'বিরাম'। সংস্কৃতে 'যতি'র সংজ্ঞা—যতি র্জিহ্বেষ্টবিরামস্থা ম্। অর্থাৎ (জিহ্বার অভীপ্সিত বিরামস্থান)— আর ঐ বিরামস্থান বোঝাবার যে 'চিহ্ন' তাই হল যতি-চিহ্ন। বস্তুত ছেদ ও যতি সমার্থক।

'জিহ্বেষ্ট' কথাটির কিছুটা ব্যাখ্যা প্রয়োজন। এক প্রযত্নে আমরা পদগুচ্ছ উচ্চারণ করে থামতে চাই, এই থামা শুধু জিহ্বার ইচ্ছায় হয় না, অর্থও জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থের খাতিরেই জিহ্বা আগেপরে থামে। অর্থের তাগিদে জিহ্বা ইচ্ছার বিরুদ্ধেও কিছুটা পথ অতিক্রম করে। জিহ্বাপ্রযত্ন আসেলে ইংরেজির breath impulse, আর এই breath impulse thought impulse-র সঙ্গেই সন্ধি করে চলে।

বাংলায় ব্যবহৃত বিভিন্ন ছেদচিহ্ন

পূর্ণচ্ছেদ (ইং Full Stop) **: চিহ্ন দাড়ি (।) :** সাধারণত বাক্যের শেষে এই চিহ্ন বসে।

তুমি বদ্ধ নও। কেহই কোনকালে বদ্ধ ছিল না। আত্মা সংসারের অতীত। আত্মাই সব। —বিবেকানন্দ

কবিতা :

আপন করিতে
কাঁদিয়া বেড়াই
যে মোরে করেছে পর। —জসিমউদ্দীন

অর্ধচ্ছেদ : চিহ্ন সেমিকোলন (;) : অপেক্ষাকৃত বড়ো বাক্যের মধ্যে তুলনা ছোটো বাক্য থাকলে অর্থবোধের সুবিধার জন্যে এই চিহ্ন বসে।

অন্নপূর্ণা আজ হয়েছেন কালী ; তাঁর অন্নপরিবেশণের হাতা আজ হয়েছে রক্ত পান করবার খর্পর। —রবীন্দ্রনাথ।

কবিতায় :

দুঃখ বেগে জাগিয়ে তোলেন

সকল ভয়ের ভয় ;
জয়ের নৃত্যে আপনাকে তাঁর জয়। —রবীন্দ্রনাথ

পাদচ্ছেদ (ইং Comma) চিহ্ন (,) ঃ একই ধরনের দুই বা ততোধিক পদ বা পদগুচ্ছ বা বাক্যাংশ পরপর ব্যবহার হলে এই চিহ্নের ব্যবহার হয়।

ধন, মান, ভালোবাসা কে না চায় বলো ?

আধপেটা খাও, অম্বলের ব্যামোটি বাধাও, আর অমনি কোথায় আকাশের চাঁদ, কোথায় দক্ষিণের বাতাস, কোথায় কোকিলপক্ষীর ডাক, এই নিয়ে প্রাণ আনচান করতে থাকে।

—শেষরক্ষা

সম্বোধন পদের পরেও এই চিহ্ন বসে।

প্রভু, বলো কবে
তোমার পথের ধুলার রঙে রঙে
আঁচল হবে রঙিন। —অরূপ রতন।

প্রত্যক্ষ উক্তির অব্যবহিত আগে ও পরে সাধারণত এই চিহ্নের প্রয়োগ বিধেয় :

ও বলল, 'যাচ্ছিস যা,
চিঠি দিস গিয়ে।'

কহিল, ঠাকুর, শোনো—
তুমি পণ্ডিত আমি তো মূর্খ
জ্ঞান নেই মোর কোনো :—

ভক্তির যুক্তি, কুমুদরঞ্জন

প্রশ্নচিহ্ন ঃ চিহ্ন (?) ঃ প্রশ্নাত্মক বাক্যের শেষে এই চিহ্ন বসে।

এ কী করলি ? এর নাম ভালোবাসা ?

পাটে কত পেলি, নয়ালির ধান
ঘরে এল ক' কাহন ?
মহাজন দেনা, রাজার খাজনা—
হয়েছে তো সব শোধ ?

—চাষার ঘরে, যতীন্দ্রমোহন বাগচী

বিস্ময়াদি আবেগসূচক চিহ্ন (Note of Exclamation) চিহ্ন ঃ (!) ঃ বিস্ময়াদি আবেগ প্রকাশ করতে এই চিহ্ন ব্যবহার করা হয়।

কী আশ্চর্য এ জগৎ !
কী নিদারুণ দুর্ভাগ্য !
আহা ! কী দেখিলাম !

সম্বোধনেও এ চিহ্নের প্রয়োগ হয়।

কত রাজা, কত রাজ্য গরিছ নীরবে
হে পুণ্য ! হে প্রিয় !

অনেক সময় প্রশ্নাত্মক বাক্যেও বিস্ময় মিশে থাকলে প্রশ্নচিহ্নের পরিবর্তে এই চিহ্ন দেওয়া হয় : এ কী করেছিস !

উদ্ধার চিহ্ন (ইং Inverted Comma) **চিহ্ন** : (" " অথবা ' ') : প্রত্যক্ষ উক্তি অর্থাৎ কারো বক্তব্য হুবহু উদ্ধৃত করলে এই চিহ্ন দেওয়া রীতি।

সে বলল, 'যদি তুমিই আস, সবচেয়ে ভালো হয়।'
'ওগো তারা, জাগাইয়ো ভোরে'
কুঁড়ি তারে কহে ঘুম ঘোরে।

পদযোজক চিহ্ন (Hyphen) : **চিহ্ন** (-) : সমাসবদ্ধ শব্দে বিকল্পে এই চিহ্নের ব্যবহার হয় ; জন্ম-মরণ, ঘর-গেরস্ত

নদীমুখে কলগীতি

সমুদ্র-হৃদয়ে স্ফীতি
অগুরু চন্দন-ধূপে অলস সমীর।—

সন্ধ্যা, অক্ষয় কুমার বড়াল।

পঙ্‌ক্তি-শেষে সমাসবদ্ধ শব্দের স্থান সংকুলান না হলে যে অংশটি ঐ পঙ্‌ক্তির শেষে থাকে তার পর এই চিহ্ন প্রযুক্ত হয়।

রেখা চিহ্ন (Dash) : একটি বিষয় উপস্থাপন করে অন্য প্রসঙ্গ শুরু করার আগে, কোনো বিষয়ে উদাহরণ দেবার আগে অথবা কখনও কখনও প্রত্যক্ষ উক্তির আগে এই চিহ্ন ব্যবহার হয়।

আমি প্রতিজনে, —যাদ্বিজ চণ্ডাল,
প্রভু ক্রীতদাস।

—মানব বন্দনা/অক্ষয় কুমার বড়াল।

সংলাপে দুজনের কথাবার্তায় উক্তি প্রত্যুক্তির আগেও এই চিহ্ন ব্যবহার হয় :

—কোথায় যাচ্ছিস্।
—আর বলিস্ না, কেরোসিনের লাইন দিতে যাচ্ছি।

কোলন চিহ্ন (:) : এই চিহ্ন প্রায়ই '-' '—' এর কাজ করে। রেখা চিহ্নের সংকেতে এর প্রয়োগ ব্যাপক (:—)।

বিশেষ করে প্রশ্নপত্রে, যখন যে কোনো দুটি উত্তর করো :—

যতিচিহ্নের ধরাবাঁধা কোনো নিয়ম নাই, আধুনিক কবিতায় যতিচিহ্নের ব্যবহার ক্রমেই কমছে, আর কবিতার ভাষা গদ্যের ভাষাকে প্রভাবিত করে বলে গদ্যেও যতি চিহ্নের—বিশেষ করে অর্ধচ্ছেদ, পাদচ্ছেদ ইত্যাদি প্রয়োগ কমছে।

এবারে আমরা পাঠ্য বই থেকে উদাহরণ দিচ্ছি। প্রথমে আছে যতিচিহ্নহীন বিন্যাস, পরেই আছে ঐ অংশের যতি-যুক্ত পাঠ।

পাঠ্যাংশের উদাহরণ

[প্রথমাংশ ছেদযতিহীন, পরের অংশ ছেদযতি-যুক্ত]

পল্লীগ্রামস্থ প্রজাদের দুরবস্থা বর্ণন

(১) তিনি ন্যায্য রাজস্ব ভিন্ন বাটা যথাকালে অনাদায়ি রাজস্বের নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি বাটার বৃদ্ধি বৃদ্ধির বৃদ্ধি আগমনি, পার্বণি, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ্য করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিষ্পীড়ন করিয়া থাকেন অনেকানেক ভূস্বামি অনাদায়ি ধনের চতুর্থাংশ বৃদ্ধি স্বরূপে গ্রহণ করেন। (পৃঃ ৩)

তিনি ন্যায্য রাজস্ব ভিন্ন বাটা, যথাকালে অনাদায়ি রাজস্বের নিয়মাতিরিক্ত বৃদ্ধি, বাটার বৃদ্ধি, বৃদ্ধির বৃদ্ধি, আগমনি, পার্বণি, হিসাবানা প্রভৃতি অশেষ প্রকার উপলক্ষ্য করিয়া ক্রমাগতই প্রজা নিষ্পীড়ন করিতে থাকেন। অনেকানেক ভূস্বামি অনাদায়ি ধনের চতুর্থাংশ বৃদ্ধি স্বরূপে গ্রহণ করেন।

(২) প্রজারা ধন্য তাহারদের সহিষ্ণুতাকে শত-শত সাধুবাদ প্রদান করিতে হয় তাহারা চিরজীবন দাবদাহে দগ্ধ হইবে জানিতেছে তথাপি দেশত্যাগ করে না তাহারা যদি স্বকীয় ভূস্বামিদিগের ন্যায় নির্মায়িক ও স্নেহশূন্য হইত মাতৃতুল্য জন্মভূমির মায়া এককালে পরিত্যাগ করিত তবে এতদিনে বঙ্গভূমি শ্মশানভূমি সদৃশ জনশূন্য হইয়া যাইত। মাতর্বঙ্গভূমি কেবল তোমারি অপার ঔদার্য্যগুণে তাহারা জীবিতবান আছে কৃষীকুল অদ্যাপি নির্মূল হয় নাই। (পৃঃ ৫)

প্রজারা ধন্য! তাহারদের সহিষ্ণুতাকে শত শত সাধুবাদ প্রদান করিতে হয়। তাহারা চিরজীবন দাবদাহে দগ্ধ হইবে জানিতেছে, তথাপি দেশত্যাগ করে না! তাহারা যদি স্বকীয় ভূস্বামিদিগের ন্যায় নির্মায়িক ও স্নেহশূন্য হইত,—মাতৃতুল্য জন্মভূমির মায়া এককালে পরিত্যাগ করিত, তবে এতদিনে বঙ্গভূমি শ্মশানভূমিসদৃশ জনশূন্য হইয়া যাইত। মাতর্বঙ্গভূমি! কেবল তোমারি অপার ঔদার্যগুণে তাহারা জীবিতবান্ আছে,—কৃষীকুল অদ্যাপি নির্মূল হয় নাই।

বাবু

(১) জন্মেজয় কহিলেন হে মহর্ষে আপনি কহিলেন যে কলিযুগে বাবু নামে এক প্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন তাহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য্য করিবেন তাহা শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণন করুন। (পৃঃ ১৭)

জন্মেজয় কহিলেন, হে মহর্ষে! আপনি কহিলেন যে, কলিযুগে বাবু নামে এক প্রকার মনুষ্যেরা পৃথিবীতে আবির্ভূত হইবেন। তাঁহারা কি প্রকার মনুষ্য হইবেন এবং পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া কি কার্য করিবেন, তাহা শুনিতে বড় কৌতূহল জন্মিতেছে। আপনি অনুগ্রহ করিয়া সবিস্তারে বর্ণনা করুন।

(২) হে নরনাথ আমি যাহাদিগের কথা বলিলাম, তাঁহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস

জন্মিবে যে আমরা তাম্বূল চর্বণ করিয়া উপাধান অবলম্বন করিয়া দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব জন্মেজয় কহিলেন হে মুনিপুঙ্গব বাবুদিগের জয় হউক আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন। (পৃ: ১৯)

হে নরনাথ! আমি যাহাদিগের কথা বলিলাম, তাঁহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে আমরা তাম্বূল চর্বণ করিয়া উপাধান অবলম্বন করিয়া দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।

জন্মেজয় কহিলেন, হে মুনিপুঙ্গব। বাবুদিগের জয় হউক, আপনি অন্য প্রসঙ্গ আরম্ভ করুন।

লোকহিত

(১) লোকহিতৈষীরা বলিবেন আমরা তো সেই কাজেই লাগিয়াছি আমরা তো নাইট স্কুল খুলিয়াছি কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না আমরা ভদ্রলোকেরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সেটাতে আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি সেটা আমাদিগকে দান করা অনুগ্রহ করা নয় কিন্তু সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা। (পৃ: ৪২)

লোকহিতৈষীরা বলিবেন, 'আমরা তো সেই কাজে লাগিয়াছি, আমরা তো নাইট স্কুল খুলিয়াছি।' কিন্তু ভিক্ষার দ্বারা কেহ কখনো সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না।

আমরা ভদ্রলোকেরা যে শিক্ষা লাভ করিতেছি সেটা আমাদের অধিকার আছে বলিয়া আমরা অভিমান করি—সেটা আমাদিগকে দান করা, অনুগ্রহ করা নয়, কিন্তু সেটা হইতে বঞ্চিত করা আমাদের প্রতি অন্যায় করা।

(২) আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি গরিব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি নিম্নতনদের সহিত ন্যায় ব্যবহার করা মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার পরে নির্ভর করে অপর পক্ষে শক্তির পরে নহে এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইতেছে নিম্নশ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা। (পৃ: ৪৩)

আমরা ভৃত্যকে অনায়াসে মারিতে পারি, প্রজাকে অনায়াসে অতিষ্ঠ করিতে পারি, গরিব মূর্খকে অনায়াসে ঠকাইতে পারি—নিম্নতনদের সহিত ন্যায় ব্যবহার করা, মানহীনদের সহিত শিষ্টাচার করা নিতান্তই আমাদের ইচ্ছার 'পরে নির্ভর করে, অপরপক্ষের শক্তির 'পরে নহে—এই নিরন্তর সংকট হইতে নিজেদের বাঁচাইবার জন্যই আমাদের দরকার হইয়াছে নিম্ন শ্রেণীয়দের শক্তিশালী করা।

নৈশ অভিযান

(১) এ আবার কি কথা সভয়ে বলিলাম তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল আর ত পথ নেই এর মধ্যে দিয়ে যেতেই হবে বড় চড়ার

বাঁদিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না আমরা যাব কি করে ফিরে আসতে পারা যাবে কিন্তু যাওয়া যাবে না। (পৃঃ ৬২)

এ আবার কি কথা! সভয়ে বলিলাম, তবে ওর ভিতর দিয়ে নাই গেলে! ইন্দ্র বোধ করি একটু হাসিয়া কহিল, আর তো পথ নেই। এর মধ্যে দিয়েই যেতে হবে। বড় চড়ার বাঁদিকের রেত ঠেলে জাহাজ যেতে পারে না—আমরা যাব কি করে? ফিরে আসতে পারা যাবে, কিন্তু যাওয়া যাবে না।

(২) কিন্তু সে যাই হোক ওই লোকটি কি মানুষ দেবতা পিশাচ কে ও কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি যদি মানুষই হয় তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্ব সংসারে আছে সে কথা কি ও জানে না বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরি সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হয় না। (পৃঃ ৬৫)

কিন্তু সে যাই হোক, ওই লোকটা কি? মানুষ? দেবতা? পিশাচ? কে ও? কার সঙ্গে এই বনের মধ্যে ঘুরিতেছি? যদি মানুষই হয়, তবে ভয় বলিয়া কোন বস্তু যে বিশ্বসংসারে আছে সে কথা কি ও জানে না! বুকখানা কি পাথর দিয়া তৈরি? সেটা কি আমাদের মত সঙ্কুচিত বিস্ফারিত হয় না?

আরণ্যক

(১) বুদ্ধু সিং একজন স্ত্রীলোককে বলিল রাজা ছে রে স্ত্রীলোকটি বলিল সে দেখে নাই তবে কোথায় আর যাইবে বাড়ীতেই আছে।

বুদ্ধু সিং একজন স্ত্রীলোককে বলিল—রাজা ছে রে? স্ত্রীলোকটি বলিল, সে দেখে নাই, তবে কোথায় আর যাইবে, বাড়ীতেই আছে।

(২) কোথায় ঘর বলিলাম কলকাতা উঃ অনেক দূর বড় ভারী জায়গা শুনেছি কলকাতা আপনি কখনও যাননি না আমরা কি শহরে যেতে পারি। (পৃঃ ৮৪)

—কোথায় ঘর?

বলিলাম—কলকাতা।

—উঃ অনেক দূর। বড় ভারী জায়গা শুনেছি কলকাতা।

—আপনি কখনও যাননি?

—না আমরা কি শহরে যেতে পারি?

পূর্বরাগ

রাধার কি হইল অন্তরে ব্যথা বসিয়া বিরলে—
থাকয়ে একলে না শুনে কাহারো কথা (পৃঃ ১১)

রাধার কি হৈল অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে থাকয়ে একলে
না শুনে কাহারো কথা॥

রাবণের রণসজ্জা

(১) চমকি শিবিরে শূররবিকুলরবি কহিলা
সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে দেখ হে সখে কাঁপিছে
লঙ্কা মুহুমুহুঃ এবে ঘোর ভূকম্পনে যেন (পৃঃ ২০)
চমকি শিবিরে শূর রবিকুলরবি
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে, —'দেখ,
হে সখে, কাঁপিছে লঙ্কা মুহুর্মুহুঃ এবে
ঘোর ভূকম্পনে যেন!'

(২) নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে বারিদপ্রতিমস্বনে
স্বনি উত্তরিলা সুগ্রীব মরিব নহে মারিব রাবণে (পৃঃ ১০)
এ প্রতিজ্ঞা শূরশ্রেষ্ঠ তব পদতলে
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে।
বারিদপ্রতিমস্বনে স্বনি উত্তরিলা
সুগ্রীব ; —'মরিব, নহে মারিব রাবণে,
এ প্রতিজ্ঞা, শূরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে!'

(৩) জ্বলিল কাননে দাবাগ্নি প্লাবন নাদি
গ্রাসিল সহসা পুরী পল্লী ভূকম্পনে
পড়িল ভূতলে অট্টালিকা তরুরাজী
জীবন ত্যজিল উচ্চ কাঁদি জীবকুল (পৃঃ ১২)
প্রলয়ে যেমতি
জ্বলিল কাননে
দাবাগ্নি ; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা
পুরী, পল্লী ; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে
অট্টালিকা, তরুরাজী ; জীবন ত্যজিল
উচ্চ কাঁদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি!

ওরা কাজ করে

(১) মাটির পৃথিবী পানে আঁখি মেলি যবে দেখি
সেথা কল-কলরবে বিপুল জনতা চলে
নানা পথে নানা দলে দলে যুগযুগান্তর
হতে মানুষের নিত্যপ্রয়োজনে জীবনে-মরণে (পৃঃ ১·)
মাটির পৃথিবী-পানে আঁখি মেলি যবে
দেখি সেথা কল-কলরবে
বিপুল জনতা চলে

নানা পথে নানা দলে দলে
যুগ-যুগান্তর হতে মানুষের নিত্য প্রয়োজনে
জীবনে মরণে।

(২) রাজছত্র ভেঙে পড়ে রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে
জয়স্তম্ভ মূঢ়সম অর্থ তার ভোলে
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত আঁখি শিশুপাঠ্য
কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি (পৃঃ ২৮)

রাজছত্র ভেঙে পড়ে, রণডঙ্কা শব্দ নাহি তোলে;
জয়স্তম্ভ মূঢ় সম অর্থ তার ভোলে,—
রক্তমাখা অস্ত্র হাতে যত রক্ত-আঁখি
শিশুপাঠ্য কাহিনীতে থাকে মুখ ঢাকি।

সহমরণ

জিজ্ঞাসিছ পোড়া কেন গা শুনিবে তা
শোন তবে মা দুখের কথা বলব কারে বা (পৃঃ ৩০)

'জিজ্ঞাসিছ পোড়া কেন গা?'
শুনিবে তা? —শোন তবে মা—
দুখের কথা বলব কারে বা!'

জীবন-বন্দনা

গাহি তাহাদের গান ধরণীর হাতে দিল যারা
আনি ফসলের ফরমান শ্রম কিনাঙ্ক কঠিন
যাদের নির্দয় মুঠি তলে ত্রস্তা ধরণী
নজরানা দেয় ডালি ভরে ফলে ফুলে (পৃঃ ৪০)

গাহি তাহাদের গান—
ধরণীর হাতে দিল যারা আনি ফসলের ফরমান।
শ্রম-কিনাঙ্ক-কঠিন যাদের নির্দয় মুঠি তলে
ত্রস্তা ধরণী নজরানা দেয় ডালি ভ'রে ফুলে ফলে!

১৯৪৬-৪৭

আজকে অস্পষ্ট সব ভালো করে কথা ভাবা
এখন কঠিন অন্ধকারে অর্ধসত্য সকলকে
জানিয়ে দেবার নিয়ম এখন আছে তারপর
একা অন্ধকারে বাকি সত্য আঁচ

করে নেওয়ার রেওয়াজ রয়ে গেছে
সকলেই আড়চোখে সকলকে দ্যাখে (পৃঃ ৪৫)

আজকে অস্পষ্ট সব ? ভালো ক'রে কথা ভাবা এখন কঠিন ;
অন্ধকারে অর্ধসত্য সকলকে জানিয়ে দেবার
নিয়ম এখন আছে ; তারপর একা অন্ধকারে
বাকি সত্য আঁচ ক'রে নেওয়ার রেওয়াজ
র'য়ে গেছে ; সকলেই আড় চোখে সকলকে দ্যাখে।

আঠারো বছর

আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর তাজা তাজা
প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা এ বয়সে প্রাণ
তীব্র আর প্রখর এ বয়সে কানে (পৃঃ ৫৩)
আসে কত মন্ত্রণা

আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর
তাজা তাজা প্রাণে অসহ্য যন্ত্রণা,
এ বয়সে প্রাণ তীব্র আর প্রখর
এ বয়সে কানে আসে কত মন্ত্রণা।

কর্ণকুন্তীসংবাদ

(১) ধৈর্য ধর, ওরে বৎস ক্ষণকাল দেববিবাকর আগে যাক অস্তাচলে সন্ধ্যার তিমির আসুক নিবিড় হয়ে কহি তোরে বীর কুন্তী আমি। (পৃঃ ৭২)

ধৈর্য ধর ওরে বৎস, ক্ষণকাল। দেবদিবাকর আগে
যাক অস্তাচলে। সন্ধ্যার তিমির
আসুক নিবিড় হয়ে—কহি তোরে বীর,
কুন্তী আমি।

(২) কুন্তী। পুত্র ভিক্ষা আছে বিফল না ফিরি যেন।
কর্ণ। ভিক্ষা মোর কাছে আপন পৌরুষ ছাড়া ধর্ম ছাড়া আর যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার। (পৃঃ ৭৩)

কুন্তী। পুত্র, ভিক্ষা আছে—
বিফল না ফিরি যেন।
কর্ণ। ভিক্ষা, মোর কাছে !
আপন পৌরুষ ছাড়া, ধর্ম ছাড়া, আর
যাহা আজ্ঞা কর দিব চরণে তোমার।

অন্ন চাই প্রাণ চাই

প্রধান নেংটি পরে দাঁড়িয়ে বড় বাড়ীর দিকে হাত তুলে চেঁচাচ্ছে আর কত চেঁচাব বাবু ছুটো ভাতের জন্যে তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু বা কিছু কানে শোন না অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু। (পৃ: ৯১)

প্রধান। (নেংটি পরে দাঁড়িয়ে বড় বাড়ীর দিকে হাত তুলে চেঁচাচ্ছে) আর কত চেঁচাব বাবু ছুটো ভাতের জন্যে! তোমরা কি সব বধির হয়ে গেছ বাবু বা কিছু কানে শোন না! অন্তর কি সব তোমাদের পাষাণ হয়ে গেছে বাবু!

অনুশীলনী

১। উপযুক্ত যতিচিহ্ন ব্যবহার করো :

(ক) জিজ্ঞাসা করিলাম কত বড় পাড় কেমন স্রোত সে ভয়ানক স্রোত ওঃ তাইত কাল জল হয়ে গেছে আজ ত তার তলা দিয়ে যাওয়া যাবে না একটা পাড় ভেঙ্গে পড়লে ডিঙ্গি সুদ্ধ আমরা সব গুঁড়িয়ে যাবো তুই দাঁড় টানতে পারিস।

(খ) আমি প্রতিবাদ করিয়া বলিলাম না না সে কি আমরা এখুনি চলে যাব আপনার সঙ্গে দেখা করেই আমার থাকার বিষয়ে কিন্তু দোব্রু পান্না বলিলেন না তা হতে পারে না ভানুমতী এই জিনিষগুলো নিয়ে যা এখান থেকে।

(গ) মহারাজ পুনশ্চ শ্রবণ করুন যাঁহার বাক্য মনোমধ্যে এক কথনে দশ লিখনে শত এবং কলহে সহস্র তিনিই বাবু।

(ঘ) যাও ফিরি কেন নিবাইবে এ রোষাগ্নি অশ্রুনীরে রানী মন্দোদরি।

(ঙ) লীন হয়ে গেলে তারা তখনো তো মৃত মৃতেরা এ পৃথিবীতে ফেরে না কখনো মৃতেরা কোথাও নেই আছে

(চ) বীর তুমি পুত্র মোর ধন্য তুমি হা ধর্ম এ কি সুকঠোর দণ্ড তব।

পাঠ্যবহির্ভূত

(ছ) এক যে ছিল পাখি সে ছিল মূর্খ সে গান গাহিত শাস্ত্র পড়িত না লাফাইত উড়িতে জানিত না কায়দাকানুন কাকে বলে।

(জ) এই সভায় আমার ডাক পড়েছে ছুটো কারণে একে ত মৈত্রমশাই আমার বয়সের সম্মান করেছেন দ্বিতীয়ত একটা জনরব আছে দেশের পল্লীতে পল্লীতে গ্রামে গ্রামে আমি অনেক দিন ধরে অনেক ঘুরেছি।

(ঝ) আমরা পূর্ব তোমরা পশ্চিম আমরা আরম্ভ তোমরা শেষ আমাদের দেশ মানবসভ্যতার সূতিকাগৃহ তোমাদের দেশ মানবসভ্যতার শ্মশান আমরা ঊষা তোমরা গোধূলি আমাদের অন্ধকার হতে উদয় তোমাদের অন্ধকারের ভিতর বিলয়।

(ঞ) কেমনে আনিবে বন্ধু বসন্ত নূতন
আবার জীবনে এ যে শরতের দিন

শেষ প্রায় হেমন্তের হয় আগমন
মুগ্ধ পিক মুগ্ধকণ্ঠে পূর্ণ চিরন্তন
আকাশ নীলিমা আমি ধুসরে নিলান

সপ্তম পরিচ্ছেদ

প্রবাদ-প্রবচন

সংজ্ঞা : প্রচলিত বচনই প্রবাদ বা প্রবচন। কবে কার মুখ থেকে এর জন্ম তা কেউ জানে না, কিন্তু ঐ একজনের জ্ঞানের স্ফুলিঙ্গ সকলের সম্পদ হয়ে উঠেছে। প্রবাদ হল অভিজ্ঞতার খনি থেকে আনা ছোট্ট সব হীরের টুকরো। সেই-সব হীরের দীপ্তিতে দেশকে চেনা যায়, চেনা যায় দেশের মানুষকে।

লক্ষণ : ভালো প্রবাদের প্রথম লক্ষণ হল তা হবে ছোট্ট—মানিকের খানিক। দ্বিতীয় লক্ষণ হল তার প্রকাশভঙ্গীটি হবে চমকপ্রদ, মাঝে বা শেষে মিল থাকলে তা শুনতেও লাগে ভালো। তৃতীয় লক্ষণ হল তা ঠুনকো হবে না, হবে সারবান।

উৎস : আমাদের দেশে প্রবাদের বড়ো উৎস মেয়েরা, তারপর চাষী বা খেটে-খাওয়া নানা বৃত্তির মানুষ। কাশীরাম-কৃত্তিবাস থেকেও অনেক প্রবাদ এসেছে, তেমনি কিছু কিছু এসেছে কবিদের লেখা থেকে। 'বিনা স্বদেশী ভাষা পূরে কি আশা' বা 'তুমি যে তিমিরে তুমি সেই তিমিরে' বা 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—এসব প্রবাদের মতোই। শ্রীরামকৃষ্ণের বহু কথাই প্রবাদে পরিণত হয়েছে, যেমন 'যত মত তত পথ' বা 'যত দিন বাঁচি তত দিন শিখি' ইত্যাদি।

সংস্কৃত থেকে সরাসরি বহু প্রবাদ বাংলায় এসেছে। যেমন—অধিকন্তু ন দোষায়, অন্ন-চিন্তা চমৎকারা, যেন তেন প্রকরেণ, ঋণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ ইত্যাদি। ইংরেজি থেকেও কিছু প্রবাদ বাংলায় এসেছে : যেমন আঙুর ফল টক 'grapes are sour'-এরই অনুবাদ বলে মনে হয়। খনা বা ডাকের বচনও প্রবচনই। বাদল বাতাস বান দক্ষিণা পেলেই যান, যদি বর্ষে মাঘের শেষ ধন্য রাজার পুণ্য দেশ ইত্যাদি।

বিষয় : কিছু প্রবাদ কোনো বিশেষ সত্যের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, এ গুলোকে উপলব্ধিই বলা চলে, যেমন, যেমন কর্ম তেমনি ফল, ধর্মের কল বাতাসে নড়ে, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, ইত্যাদি। কিছু প্রবাদ আমাদের কোনো বিশেষ মনোভাব বা অভ্যাস নিয়ে কটাক্ষ, যেমন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া, ভাঙে তো মচকায় না, বামন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর। গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল, মশা মারতে কামান দাগা ইত্যাদি। কোনো কোনো প্রবাদ আমাদের দেয় কর্তব্যের ইঙ্গিত, যেমন কাজ করবি শক্ত, কাজের হরি ভক্ত, ঠ্যাং থাকতে কেন নিবি লাঠি ইত্যাদি।

কতগুলো শুধু অভিজ্ঞতায় ফল, যেমন গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না, অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট। দশের লাঠি একের বোঝাতে ইত্যাদি।

আলংকারিকতা : প্রবাদের বিশেষ একটি গুণ তার আলংকারিকতা। যখন বলি

গভীর জলের মাছ, তখন মাছকে না বুঝিয়ে বিশেষ স্বভাব বা গুণের মানুষকে বোঝায়, যখন বলি বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়ো, তখন বাঁশ বা কঞ্চিকে ছাড়িয়ে বড়ো আর ছোটোর অর্থে তা হয় সঞ্চারিত। অলংকার বিশ্লেষণ করলে তা হয়তো রূপক বা অতিশয়োক্তিতে দাঁড়াবে।

প্রবাদচর্চার প্রয়োজন: ইতিহাস, সমাজ, সাহিত্য সব বিষয়ের গবেষণাতেই প্রবচন অবশ্য পাঠ্য। সবচেয়ে বড়ো কথা বিভিন্ন দেশের প্রবাদ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় আভ্যন্তরীণ ঐক্য; কালো আর ধলো বাইরে কেবল ভেতরে সবাই সমান রাঙা।

প্রবাদ নিয়ে প্রবাদ

হিব্রু: একটি প্রবাদই অনেক সময় একজনের জীবন গড়ে দেয়। বাগানের যেমন ফুল, খাবারের যেমন মশলা, কাপড়ের যেমন জরির নকসা, আকাশের যেমন তারা, ভাষার তেমনি প্রবাদ।

তুর্কি: প্রবাদে কান না দিলে তার প্রতিপদে ভুল হবে।

ইদ্দিশ: প্রবাদবচন খাঁটি রতন।

রাশিয়ান: বুদ্ধি থেকে প্রবাদ, প্রবাদ থেকে বুদ্ধি, প্রবাদগুলোই লোকের সোনাদানা।

হাঙ্গেরিয়ান: দশের জ্ঞানই প্রবাদ
প্রবাদ অভিজ্ঞতার কন্যা।

অর্থ ও প্রয়োগ

অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট: চৈত্র মাসে চড়ক পূজার সময় গাজন বা গম্ভীরা উৎসবে বহু লোক মিলিত হয়, এর মধ্যে কিছুসংখ্যক শিবের সন্তুষ্টির জন্যে সাময়িকভাবে সন্ন্যাস গ্রহণ করে। এই সন্ন্যাসীদের সংখ্যাধিক্য ঘটলে বিবাদ বিসংবাদ বা মতান্তর ঘটে, তার ফলে উৎসবও পণ্ড হয়। প্রয়োজনের অতিরিক্ত লোক মিলে কিছু করতে গেলে প্রায়ই বিশৃঙ্খলা ঘটে।

সিধুবাবু মেয়ের বিয়েতে আয়োজন করেছিলেন প্রচুর, কিন্তু সাতকর্তার সাতরকম মত দেওয়াতেই সব মাটি! অধিক সন্ন্যাসীতে গাজন নষ্ট!

তুলনীয়: সাত ধরুনীতে পো মারে। এক হেঁসেলে তিন রাঁধুনী। Too many cooks spoil the broth, বহুতসে জোগী মঠ উজাড়।

উলুবনে (বেনাবনে) মুক্তা ছড়ানো: উলুঘাসের জঙ্গলে মুক্তা ছড়িয়ে দিলে মুক্তার দীপ্তি বা লাবণ্য কিছুই দেখা যায় না।

যে ব্যক্তি বস্তুবিশেষের মূল্য বোঝে না তার কাছে সেই বস্তুর উপস্থাপনা ব্যর্থ হয়।

ও গানের গ জানে না, ওকে দিলে তুমি গীতবিতান, এ যে ভাই উলু বনে মুক্তা ছড়ানো!

ওরে আমি উলু বনে মুক্ত ছড়াই না,······কালে সব বুঝতে পারবি।—শ্রী রামকৃষ্ণ

তুলনীয়ঃ অরসিকেষু রসস্য নিবেদনম্। Casting pearls before swine. বানরের গলায় মুক্তার হার!

গেঁয়ো যোগী (গুণী) ভিখ পায় না—যোগী>যুগী—পূর্বে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সম্প্রদায়ের অন্তর্গত, পরে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত ভিক্ষাজীবী জাতি।

স্বদেশ বা স্বজনের মধ্যে গুণীর আদর নেই।

ওঁর থিসিসটা কেউ ছাপলেই না এদেশে, শেষ পর্যন্ত তা লণ্ডন থেকে প্রকাশিত হয়ে বিশেষ সম্মান পেল, এমনটাই হয়, গেঁয়ো যোগী (গুণী) ভিখ পায় না।

দক্ষিণেশ্বরের লোক বেশি পাত্তা দেয় না ঠাকুরকে। গেঁয়ে যুগীরই ভিখ মেলে না।
—অচিন্ত্যকুমার

তুলনীয় : A prophet is not honoured in his own country.

ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে—গোবর এবং ঘুঁটে একই জিনিস, কেবল একটি আর একটির অবস্থান্তর মাত্র। গোবর শুকিয়ে ঘুঁটে হলে তা পোড়ানো হয়। কাঁচা গোবর তাই দেখে ভাবে ঘুঁটের কী সর্বনাশটাই না হচ্ছে, কিন্তু সে তো বেশ সুখেই আছে। কিন্তু তারও যে ঐ অবস্থান্তর ঘটবে তা সে ভাবে না।

নিজের ভবিষ্যৎ দুর্দশার চিন্তা না করে অনেকে অন্যের বিপদে উল্লসিত হয়।

আমার মাইনে কাটা গিয়েছে বলে হাসছে অনেকে, কিন্তু ভাবছে না এমনটা ওদের হল বলে। ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে।

তুলনীয়ঃ গহুরী জ্বলে, গোবর হাসে

He laughs best who laughs last.

ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি—দেবীর অনুগ্রহ লাভ হল বটে, কিন্তু সে অনুগ্রহ এমন দুঃসহ হয়ে উঠল যে নিষ্কৃতি পেলে প্রাণ ভরে কেঁদে শান্তি পাওয়া যাবে।

ভালো হবে আশা করে বা কোনো দুরবস্থায় পড়ে মুক্তি পাবার বাসনা।

মামা চাকরি করে দেবে বলে নিয়ে এল কোলকাতায়, চাকরির নামে দেখা নেই, শুধু খাটিয়ে মারছে, এখন আমার অবস্থা ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচি।

তুলনীয়ঃ ভিখ চাই না, কুকুর ঠেকা।

জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ—জলেও বিবাদ, স্থলেও বিবাদ। উভয় সংকট।

জলে ভাসে কুমীর, ডাঙায় ডাকে বাঘ। —শিবায়ন।

আমার এখন জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ। কাজটা করলে বড়োবাবু চটেন, না করলে চটেন মেজোবাবু। এখন করি কী?

তুলনীয়ঃ On the horns of a dilemma between the devil and the deep sea; between Scylla and Charybdis.

ঠক বাছতে গাঁ উজাড়—অসাধু লোকদের ছাঁটাই করতে গেলে কেউ আর অবশিষ্ট থাকে না।

যারা কাজে ফাঁকি দেয় তাদের ধরতে গিয়ে দেখা গেল ফাঁকি দেয় না এমন কেউ নেই—ঠক বাঁচতে গাঁ উজাড়।

কে জানে কে ছোট, বড় 'ঠক বাঁচতে গাঁ উজাড়' —বিহারী চক্রবর্তী

তুলনীয়ঃ কম্বলের লোম বাছা

কেকর কেকর ধরো নাম,

কমরী বচলে সারী পাও।

ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে—ঢেঁকির অভ্যাস ধান ভানা। সে যদি স্বর্গেও যায় সেখানেও সে আরাম পায় না, অভ্যাসমতো ধান ভানা ছাড়া অন্য কিছুই করতে পারে না।

কোনো অবস্থাতেই অভ্যস্ত কাজ ছাড়া যায় না।

এ কী ভায়া? এলে দার্জিলিঙে এখানেও তোমার অফিসের খাতা সঙ্গে! ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে।

ইহারা সিনেমার গল্প শুরু করিয়াছে। পূর্ণিয়ায় আজও রাত্রে তাহারা সিনেমা দেখিয়াছে, তা নাকি যৎপরোনাস্তি বাজে। এই সব গল্প। সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার সিনেমার সঙ্গে তাহার তুলনা করিতেছে। ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে, কথা মিথ্যা নয়। —আরণ্যক। বিভূতিভূষণ

দশের লাঠি একের বোঝা—দশজনের দশখানা লাঠি যদি একজনকে বইতে হয় তবে তা তার কাছে ভারী বোঝা হয়ে পড়ে। কিন্তু দশজনে যদি এক একটা করে লাঠি হাতে নেয় কারো কাছেই তা ভার বলে মনে হয় না।

যে কাজ একজনের পক্ষে দুঃসাধ্য, তা ভাগাভাগি ক'রে নিলে সহজ হয়।

রিটায়ার করার পরও তুমি এত খাটছ! তোমার ছেলেরা তো সব বড়োই, কাজ ভাগ করে দাও তাদের মধ্যে। দশের লাঠি একের বোঝা।

তুলনীয়ঃ জনে জনে কী লকড়ী, একজনে কা বোঝ।

নুন আনতে পান্তা ফুরায়—পান্তাভাত লবণ মেখে খাওয়া হয়। কিন্তু খেতে বসে লবণ এনে দিতে খুব দেরি হলে ততক্ষণ তো বসে থাকা যায় না, বিনানুনেই খাওয়া হয় শেষ।

কোনো কাজের উদ্যোগ করতে করতে কাজের প্রয়োজন ফুরোনো।

রিক্সা আনতে দিলাম ছকুকে। দেরি দেখে হেঁটেই গন্তব্যে রওনা হলাম। এসে দেখি রিক্সা এসেছে। নুন আনতে পান্তা ফুরায়।

যদি বা খাই যথাসাধ্য খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য;

পান্ত আন্‌তে লবণ ফুরায় লবণ আন্‌তে পান্ত।

—হাসির গান। দ্বিজেন্দ্রলাল

তুলনীয়ঃ After meat comes mustard.

ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যাওয়া—সম্পূর্ণ প্রবাদটি হল, একুশ কোড়া গ'ণে খান

ফুলের ঘায়ে মূর্ছা যান। একুশটা কোড়া (=চাবুকের ঘা) খেয়েও তার কিছু হয় না, কিন্তু ফুলের মৃদু আঘাতেই সে মূর্ছিত হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় অংশটির অর্থই ক্রমে মুখ্য হয়ে পড়েছে—

এত কোমল যে সামান্য আঘাতও সহ্য করতে পারে না অথবা এত আত্মসম্মানবোধ যে একটু রূঢ় কথাও সহ্য করতে পারে না। শাশুড়ি বললেন, কী এমন তোমাকে বলেছি বৌমা যে কেঁদে ভাসালে, ফুলের ঘায়ে মূর্ছা গেলে ?

তুলনীয়: চড়ের ঘা তুচ্ছ, ফুলের ঘায়ে মূচ্ছো।

বরের ঘরের পিসী কনের ঘরের মাসী—যে উভয়পক্ষের হিতৈষী বলে পরিচয় দেয় কিন্তু যখন একপক্ষে যোগ দেয় তখন অপর পক্ষের ক্ষতি করার চেষ্টা করে।

পাঁচীকে তুমি আস্কারা দিয়ো না। ও হচ্ছে বরের ঘরের পিসী কনের ঘরের মাসী। ও ঘরে গিয়ে আবার তোমার পিণ্ডি চটকাবে।

তোমাদের আড়তের ঐসব চক্কোত্তি ফক্কোত্তিকে আমি আগে তাড়াব। ওরা সব হচ্ছে—বরের ঘরের মাসী কনের ঘরের পিসী, বুঝলে মামা ! ভেতরে ভেতরে যদি না ওরা তোমার বিনোদের দলে যোগ দেয়, ত আমার নামই নিমাই রায় নয়।

—বৈকুণ্ঠের উইল, শরৎচন্দ্র

তুলনীয়: Running with the hare and hunting with the hound.

বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড় (টন্‌কো)—প্রধানের চেয়ে অপ্রধানের প্রতাপ বা দৃঢ়তা। জমিদার যদি বলে ধরে আন, পুত্রটি বলে বেঁধে আন। বাঁশের চেয়ে কঞ্চি দড়।

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত—আকাশে মেঘ থাকলে বজ্রপাতের সম্ভাবনা, কিন্তু যেখানে মেঘই নেই সেখানে বজ্রপাত সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

বিনা কারণে বা অপ্রত্যাশিতভাবে কোনো বিপদ এসে পড়া।

ওদের ব্যবসাটাতো ভালোই চলছিল, জানি না হঠাৎ কী হ'ল খরচ কমাতে ছাঁটাইয়ের কোপ এসে পড়ল। এ যে বিনা মেঘে বজ্রপাত ! ভূপালে বিষাক্ত গ্যাসের বলি হল হাজার হাজার মানুষ, এ যে একেবারে বিনা মেঘে বজ্রাঘাত।

অনাচার কৈল জানাই অতি দুরাচার।
যবনী করিয়া বিয়া জাতি কৈল আর ॥
ধুলায় বসিল ঠাকুর শিরে দিয়া হাত।
বিনা মেঘে হৈল যেন শিরে বজ্রাঘাত ॥ —চন্দ্রাবতী। নয়নচাঁদ

তুলনীয়: A bolt from the blue.

ভাঙে তবু মচকায় না—তেজী বা একগুঁয়ে লোক মরে গেলেও নতি স্বীকার করে না।

ছেলেটা মার খেয়ে মরছে কিন্তু দোষ স্বীকার করছে না, ভাঙে তো মচকায় না।

তুলনীয়: মরিহোঁ পর হটি হোঁ নাহী।

মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন—হয় মন্ত্রের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিব, নয় তা সাধন করতে করতে দেহপাত করব। সুদৃঢ় সংকল্পের মনোভাব।

অভিযাত্রীরা দুর্গমের পথে ছুটে গিয়েছে প্রাণের মায়াকে তুচ্ছ করে; মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন।

কালীর ব্যাটা শ্রীরামপ্রসাদ ভালমতে তাই জানাব। তাতে মন্ত্রের সাধন শরীর পাতন যা হবার তাই ঘটাব। —রামপ্রসাদ। পদাবলী

তুলনীয়: Do or die. করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে।

মশা মারতে কামান দাগা (পাতা)—অকিঞ্চিৎকর কাজের জন্যে বিরাট আয়োজন করা।

একটা ছিঁচকে চোর ধরতে এক পুলিশের বাহিনীকে পাঠানো হয়েছে! একেই বলে মশা মারতে কামান দাগা।

তুলনীয়: To break a fly on the wheel.

মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ—এটি সংস্কৃত প্রবাদ থেকে এসেছে। সম্পূর্ণ শ্লোকটি এই:

জিহ্বা টলতি ধীরস্য
পাদস্খলতি হস্তিনঃ।
ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো
মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ॥

ধীর ব্যক্তির জিহ্বাও কখনও কখনও বিচলিত হয়। গজরাজেরও সময় সময় পদস্খলন হয়। ভীমও কখনও কখনও রণে ভঙ্গ দেন। মুনিদেরও কোনো-না-কোনো সময়ে মতিভ্রম হয়ে থাকে।

জ্ঞানী লোকেরও ভুল হতে পারে।

ওর মতো বিশেষজ্ঞের প্রবন্ধে যে এমন একটা ভ্রান্তি থাকবে এ আশাই করা যায় না, অবশ্য মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ।

তুলনীয়: Even Homer nods.

মেঘ না চাইতে জল—অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য। ভাবছিলাম ইন্টারভিউ কি আর আসবে, কিন্তু এ যে একেবারে চাকরির ডাক! মেঘ না চাইতে জল!

সেদিন সন্ধ্যাবেলায় কম্পিত হস্তে যত্নের সহিত তাহার স্বামীর জন্য সরবৎ প্রস্তুত করিল এবং নিজে হাতে স্বামীকে খাওয়াইল। নিবারণ হাসিয়া বলিল, 'বাঃ এ যে মেঘ না চাইতে জল।—

যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ—মুমূর্ষু রোগীর দেহে যতক্ষণ শ্বাসপ্রশ্বাস ক্রিয়া চলতে থাকে ততক্ষণ তার জীবনের আশা ত্যাগ করা যায় না।

যতক্ষণ সাফল্যের লেশমাত্র সম্ভাবনা থাকে ততক্ষণ আশা থাকে।

ভারতের সাত উইকেট পড়ে গেলেও আমরা ভাবছিলাম বাকি তিন উইকেটে প্রয়োজনীয় রান তোলা সম্ভব হবে। একেই বলে যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ।

তুলনীয়: জবতক সাঁসা তব তক আশা

While there is a life there is hope.

যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা—যার প্রতি অসন্তোষ, ঈর্ষা বা বিদ্বেষের ভাব থাকে তার নিখুঁত কাজেও খুঁত ধরা।

সৌদামিনী গৃহকর্ত্রীকে বলল, এমন কি করলাম যে আপনি অমন করে বকলেন। কাপড় মেলতে ছাদে গেলাম, এর নাম হল কাজে ফাঁকি! যাকে দেখতে নারি তার চলন বাঁকা।

যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে—ভারত = ১. মহাভারত গ্রন্থ, ২. ভারতবর্ষ। সারা ভারতবর্ষে এমন কিছুই নাই যার উল্লেখ মহাভারতে নাই।

আমাদের নানা সমস্যার সমাধান মহাভারত থেকে পাওয়া যেতে পারে। সত্যি যা নাই ভারতে তা নাই ভারতে।

যেমন বুনো ওল তেমনি বাঘা তেঁতুল—বুনো ওল যেমন কুটকুটে, তেমনি টক তেঁতুল, তেঁতুলের টক রসে ওলের কুটকুটানি নষ্ট করে। ও যতই ধড়িবাজ হোক, কর্তার কাছে ওর রেহাই নেই। যা অনিষ্টকর তার প্রতিরোধ ব্যবস্থা করা, বা দুষ্টের উপর দুষ্টামি করে তাকে জব্দ করা।

তুলনীয়: যেমন ভাস্থ তেমনি হনু, যেমন কুকুর তেমনি মুগুর, যেমন রোগ তেমন রোজা। Tit for tat. Desperate disease, requires desperate remedies.

রথ দেখা কলা বেচা—এককার্যে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া।

দার্জিলিংএ গেলাম অফিসের কাজে, টাইগার হিলের সানরাইজটা দেখলাম। একেবারে রথ দেখা কলা বেচা।

তুলনীয়: এক পন্থ দো কাজ। Kill two birds with one stone.

হাতে মারে না ভাতে মারে—শারীরিক দণ্ড না দিয়ে তার বদলে রুজি বন্ধ করে নির্যাতন।

পরোক্ষভাবে কষ্ট দেওয়া, দোহাই হুজুর দোষ করে থাকি সাজা দিন, হাতে না মেরে ভাতে মারবেন না, দোকানটা গেলে খাব কী?

অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়া-কোনো বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকার ফলে আন্দাজে তার সম্বন্ধে কিছু বলা।

সন্ধান না করে আন্দাজের উপর নির্ভর করে কিছু বলা।

শব্দটার ব্যুৎপত্তি আমার জানা ছিল না, দিলাম আন্দাজে ঢিল ছুঁড়ে, লেগে গেল ভাগ্যক্রমে। মাষ্টারমশাই বললেন—ঠিক হয়েছে।

তুলনীয়: অটকল পচ্চু। To draw the bow at a venture.

অরণ্যে রোদন—জনমানবহীন স্থানে কান্নাকাটি করলে তা শোনবার লোকের অভাবে বিফল হয়। তেমনি হৃদয়হীন লোকের কাছে দুঃখের কথা বলা বৃথা।

বৃথা অনুনয় বিনয়।

হ্যাঁ, ওর টাকা আছে বটে, কিন্তু বিপদে পড়ে তুমি ওর কাছে বৃথাই চাইতে গেলে। ওর মতন হাড় কেপ্পনের কাছে কিছু চাওয়া অরণ্যে রোদন ছাড়া কী?

তোর যা বলতে হয় ওকে বল, আমার কাছে বলা অরণ্যে রোদন।

—দীনবন্ধু। নীলদর্পণ

তুলনীয়: To cry in wilderness.

অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী—সামান্য জ্ঞান বড়ো ভয়ঙ্কর, তাতে মানুষের মনে আনে গর্ব। প্রয়োগের বেলা ঘটে অনর্থ।

দুপাতা ডাক্তারি বই পড়ে ও গিয়েছে কঠিন রোগীর চিকিৎসা করতে। অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী আর কাকে বলে। একটু হলেই দিয়েছিল শেষ করে! ভাগ্যি ডঃ হালদার এসে পড়লেন।

তুলনীয়: A little learning is a dangerous thing

আকাশ কুসুম—আকাশে ফুলফোটার মতো অবাস্তব বা আজগুবি ব্যাপার; অলীক কল্পনা।

আকাশ কুসুম কী সব ভাবছিস বল তো? কাজে নেমে পড়, সব ঠিক হয়ে যাবে।

তুলনীয়: মন কা লাড্ডু খানা; খ্যালী খিচড়ী পকানা।

To build castles in the air.

তুলনীয়: প্রবাদটির উৎস সংস্কৃত 'খ-পুষ্প' কথাটি।

মৃগতৃষ্ণাম্ভসি স্নাতঃ শশশৃঙ্গধনুর্ধরঃ।

এষ বন্ধ্যাসুতো যাতি খপুষ্পকৃতশেখরঃ।

(এই যে বন্ধ্যার ছেলে চলেছে, মরীচিকার জলে সে নেয়ে এসেছে, আকাশ কুসুম দিয়ে সে কেশ বিন্যাস করেছে, তার হাতে খরগোশের শিঙের ধনুক।)

কান পাতলা—নির্বিচারে যে অন্যের লাগানো কথা বিশ্বাস করে।

শাশুড়ি কানপাতলা, বৌদের তাই ভারি মুশকিল।

কূপ মণ্ডুক—কূপমণ্ডুক কথাটির উৎস সংস্কৃত। কূপকচ্ছপ বা কূপদর্দুর কথাটিও একই অর্থে প্রযোজ্য।

কূপের কচ্ছপ বা ভেক যেমন কূপেরই বিষয় জানে, বাহ্য বিষয় জানে না, সেইরকম স্বল্প বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক।

যো ন নির্গত্য নিঃশেষমবলোকয়তি মেদিনীম্।

অনেকাশ্চর্যসম্পূর্ণাং স নরঃ কূপদর্দুরঃ।

(যে বাইরে বেরিয়ে বহু বিস্ময়বতী এই বসুন্ধরাকে নিঃশেষে না দেখে সে কূপমণ্ডুক।)

কূপমণ্ডুক হয়ে থাকলে তো চলবে না, দুনিয়াটাকে চিনতে হবে।

কেঁচো খুড়তে সাপ—মাটি খুঁড়ে নিরীহ কেঁচো বের করতে গিয়ে শেষে গর্তের ভিতর থেকে সাপ বের হতে পারে।

অতি সাধারণ নিরাপদ আলোচনায় বা কাজে প্রবৃত্ত হয়ে বেশি দূর এগোলে

বিপজ্জনক পরিণাম হতে পারে বা অপ্রত্যাশিত কোনো বিষয় বা ঘটনা জানা যেতে পারে।

লোকটাকে জেরা করতে সে এমন সব কথা বলল যা কেউ ধারণাও করতে পারে নি; একেবারে কেঁচো খুঁড়তে সাপ!

তারপর কে জানে যে কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরুবে! আমি আগে অতশত জানতাম না। রাজকৃষ্ণ রায়। রাজা বিক্রমাদিত্য

কৈ মাছের প্রাণ—সম্পূর্ণ প্রবাদটি 'কৈ মাছের প্রাণ অল্পেতে না যান'।

কৈ মাছ সহজে মরে না, কাটার পরেও সে ছটফট করে। কৈ মাছ সম্বন্ধে বলা হয়—কৈ নাকি যে কাটে তাকে দেখে, যে বাঁধে তাকেও দেখে।

কঠিন প্রাণ, দারুণ কষ্ট স্বীকারের শক্তি।

কী যে বলেন বাবু, এই মোট বইতে কষ্ট! আমাদের কৈ মাছের প্রাণ বাবু; অল্পেতে নেতিয়ে পড়ি না আমরা।

তুলনীয়: The cat has nine lives.

খয়ের খাঁ—ফার্সী খয়ের (মঙ্গল)+খ্বাহ্ (ইচ্ছুক)=মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী বা হিতৈষী। লোকব্যুৎপত্তিতে (Folk etymology)-তে মুসলিম নামের অনুকরণে খয়ের খাঁ।

যে প্রভুস্থানীয় ব্যক্তির মনস্তুষ্টিতে ব্যস্ত; চাটুকার।

সাহেব ছিলেন সঙ্গে সব খয়ের খাঁয়েরাও ছিল, খানাপিনা ভালোই হল।

গড্ডলিকা প্রবাহ—গড্ডলিকা=স্ত্রী মেষ।

মেষ অত্যন্ত নিরীহ ও নির্বোধ বলে পরিগণিত। তারা নিজের বুদ্ধি অনুসারে চলতে পারে না। মেষের পাল যখন এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যায়, তখন কয়েকটি স্ত্রী মেষ সামনে চলে, অন্যান্য মেষ নদীর স্রোতের মতো অনুসরণ করে।

নিরুদ্দিষ্টভাবে অন্যের দৃষ্টান্ত অনুকরণকারী মানুষ।

সমস্ত দেশের মানুষই যেন গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়েছে।

তুলনীয়: ভেড়িয়া ধসান

গভীর জলের মাছ—শব্দটির উৎস সংস্কৃত প্রবাদ:

অগাধজলসঞ্চারী বিকারী নাপি রোহিতঃ
গণ্ডূষজলমাত্রেণ শফরী শর্ফরায়তে

শফরী চঞ্চল, কিন্তু রোহিত অচঞ্চল।

গভীর জলের মাছ রূপকার্থে 'স্থিতধী ব্যক্তি' বা 'বিশেষ বিষয়ে অভিজ্ঞ' মূলত এই অর্থ প্রকাশ করত। অর্থের অপকর্ষে, 'ধূর্ত' অর্থে প্রযুক্ত।

ও বাবা গভীর জলের মাছ, বাইরে থেকে বুঝতে পারবে না মনে মনে কী ফন্দী আঁটছে।

গৌরচন্দ্রিকা—গৌরচন্দ্র সম্বন্ধে যা তা গৌরচন্দ্রিকা। কীর্তনে যে-রসের গান হবে গৌরচন্দ্রিকায় সেই রসাশ্রিত পদ গীত হয়। সুতরাং গৌরচন্দ্রিকা থেকে বোঝা

যায় গায়ক অভিসার মান বিরহ রাসলীলা ইত্যাদি। কোন্ বিষয়টি গাইবেন। এই রকম পূর্বাভাস থাকে বলে গৌরচন্দ্রিকার গৌণ অর্থ হয়েছে 'সূচনা' বা 'পূর্বাভাস।

আসল কথা উত্থাপন করার আগে দীর্ঘ ভূমিকা।

অত আমড়াগাছির দরকার কী বাবা, গৌরচন্দ্রিকা ছেড়ে আসল কথাটা বলো তো। কিছু টাকা চাই তোমার, এই তো?

ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো—পুরনো কুলো অকেজো হয়ে পড়লে তা-ই আবর্জনা ফেলতে ব্যবহার করা হয়, অন্য কাজে লাগে না।

তাৎপর্য:

যাকে অপদার্থ বলে অবজ্ঞা করা হয় তাকে দিয়েই অপ্রীতিকর বা দুঃসাধ্য কোনো কাজ করিয়ে নেওয়া।

আমাকে তো ছাড়িয়ে দিয়েছিলে মা, আবার বুড়োকত্তামার সেবা করতে আমারই ডাক পড়ল। ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো।

দশচক্রে ভগবান ভূত—রাজার প্রিয়পাত্র ভগবান-পণ্ডিতের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে পারিষদেরা তার মৃত্যু ঘোষণা করেছিল। পরে রাজার সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটলে সবাই রাজাকে বোঝালো আসলে ভগবান বেঁচে নেই, সে ভূত হয়ে রাজার দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করছে।

কয়েক জনের চক্রান্তের ফলে সত্যও মিথ্যা বলে প্রতিপন্ন হয়।

ভোটের বাজারে কত জনই তো দশচক্রে ভগবান ভূত।

(সংক্ষেপে শুধু 'দশচক্র'ও ব্যবহৃত হয়)

'বিলুর মা-ও মনে মনে ভাবে যে তাহার ছেলের উচ্চ শিক্ষা হয় নাই—ছেলের দোষে নয়, দশচক্রে পড়িয়া।'

দু নৌকায় পা—দুটো চলন্ত নৌকায় দুই পা দিয়ে থাকলে নৌকা একটু সরলেই জলে পড়ে যাবার ভয়।

দুদিক বজায় রাখার চেষ্টা।

একদিকে অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাজের বোঝা অন্য দিকে সাহিত্যচর্চা—দু নৌকায় পা দিয়ে আর চলে না ভাই। ভাবছি চাকরিটা ছেড়ে পুরোপুরি সাহিত্যের দিকেই ঝুঁকব।

ধনুকভাঙা পণ—অত্যন্ত কঠোর প্রতিজ্ঞা। সে ধনুকভাঙা পণ করেছে যে পাশ না করলে আর এ বাড়ি আসবে না।

ধরি মাছ না ছুঁই পানি—মাছ ধরতে গেলে জলে নামার ধকল তো সইতেই হবে। মাছ ধরব অথচ জলে নামব না এতো হয় না।

কোনো কাজ না করে ফাঁকি দিয়ে ফল লাভের চেষ্টা—

ঝুঁকি বা দায়িত্ব এড়িয়ে কর্তব্য করা।

ওর ভাবটা হচ্ছে ধরি মাছ না ছুঁই পানি, নিজে থাকবে ওপর ওপর, খেটে মরব আমি।

কোন্ গ্রহ কোথায় থাকিলে কি ফল হইবে, তাহা খোলসা করিয়া বলিতে হইবে। বলিবার ভাষা যেন স্পষ্ট হয়—ধরি মাছ না ছুঁই পানি হইলে চলিবে না।

জিজ্ঞাসা। রামেন্দ্রসুন্দর।

ধান ভানতে শিবের গীত—ধান ভানিবার সময় শিবের গীত গাওয়া নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক।

কোনো বিষয়ের মধ্যে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা।

নিশিবাবুর বক্তৃতা ঠিক বক্তৃতা নয় বরং ধান ভানতে শিবের গীত। ভাষণটি গ্রামোন্নয়ন সম্পর্কে, তার মধ্যে ঢোকালেন ওঁর লণ্ডন ভ্রমণের বিবরণ। অসহ্য।

তুলনীয়ঃ আক ছেঁচতে কুকুনীমের কথা।

বেজড়াকে পীদনহারী গেহু কে গীত গাবে।

নয় ছয়—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে, সতর্কতার অভাবে নষ্ট হওয়া।

বাপের মৃত্যুর পর উড়নচণ্ডী ছেলেটা সমস্ত সম্পত্তি নয় ছয় করে ছাড়ল।

তুলনীয়ঃ তীন তেরহ হোনা।

বাস্তুঘুঘু—ঘুঘু পাখি নির্জন জায়গায়, বিশেষত পরিত্যক্ত বাস্তুজমিতে চরে থাকে।

যে ঘুঘু ধ্বংসোন্মুখ বাস্তুতে চরতে আসে এবং বাস্তু সম্পূর্ণ ধ্বংস হবার পর স্থায়ীভাবে সেখানে বাস করে।

যে ব্যক্তি দীর্ঘ কাল এক জায়গায় থেকে ধ্বংস সাধন করে।

ঐ মাধুখুড়োকে জান না? এক নম্বর বাস্তু ঘুঘু। কারখানাটায় আছে সেই কবে থেকে, নিজের কোলে ঝোল টেনে এখন লাল বাতি জ্বালাবার ধান্দা করছে।

নিমতলার কুণ্ডুদের আড়ত কানা করিয়া গোকুলের শ্বশুর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্যন্ত পাকা লোক। আড়তের ছোঁড়ারা আড়ালে বলিত বাস্তু ঘুঘু।

—শরৎচন্দ্র। বৈকুণ্ঠের উইল।

বিড়াল তপস্বী—পাখিচুখি খাইনে এখন ধর্মে দিয়েছি মন
তুলসীর মালা গলায় দিয়ে যাচ্ছি বৃন্দাবন।

—বিড়ালের এই তপস্বী সাজার গল্প থেকে প্রবাদটি এসেছে।

গল্পটির মূল উৎস হিতোপদেশঃ সেখানে গল্পে বর্ণিত বিড়াল তরুকোটরবাসী বৃদ্ধ অন্ধ গৃধ্রকে তপস্বীর মিথ্যা পরিচয় দিয়ে পাখির ছানা ধরে খেত।

অত্যন্ত লোভী ব্যক্তি সাধুতার ভাব দেখালেও তা মিথ্যা ভান মাত্র।

তুমি একটা বিড়াল তপস্বীর পাল্লায় পড়েছ দেখছি। লোকটার অকরণীয় কুকর্ম কিছু নেই, অথচ ভেকধারী।

তুলনীয়ঃ বক ধার্মিক।

ভস্মে ঘি ঢালা—মূলত আগুনে ঘি দিলে তা পুড়ে আহুতির কাজ করে, কিন্তু আগুন নিভে গেলে ছাইয়ের উপর ঘি ঢাললে তাতে কোনো ফল হয় না।

কাজের সময়ে কাজ না করে কাজ পণ্ড হয়ে গেলে তার জন্যে শ্রম বা অর্থ ব্যয় করা নিরর্থক।

আগে কিছু দেখ নি, বাইরে বাইরে ঘুরেছ, ছেলেটা সময়ে লেখা পড়া করল না। এখন দশটা মাস্টার রাখলে কী হবে—এ যে ভস্মে ঘি ঢালা।

শুধু 'নিষ্ফল কাজ' এই অর্থেও প্রবাদটির প্রয়োগ আছে।

অপরকে খাওয়ানো পরানো শুধু অধর্মের ভোগ—ভস্মে ঘি ঢালা। অসময়ে কোন কাজেই আসে না। শরৎচন্দ্র।—নিষ্কৃতি

শাক দিয়ে মাছ ঢাকা—হিন্দু বিধবার পক্ষে মাছ খাওয়া নিষিদ্ধ। শাক চাপা দিয়ে সেই মাছ লুকোবার চেষ্টা করলে তা ব্যর্থ হয়।

দোষ গোপন করার বৃথা চেষ্টা।

সোজা কথা, এটা তহবিল তছরূপ। একথা সেকথা বলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করে লাভ নেই।

তুলনীয়: ছাই দিয়ে আগুন চাপা।

শাঁখের করাত—কাঠ কাটার করাতের দাঁতগুলো একদিকে হেলানো থাকে, তাই করাত টানবার সময় কাটে না। ঠেলে দেবার সময় কাটে। কিন্তু শাঁখা ইত্যাদি তৈরি করার জন্যে যে করাত ব্যবহার করা হয় তার দাঁতগুলো এমনভাবে থাকে যা আসতেও কাটে যেতেও কাটে।

সর্বপ্রকার অনিষ্ট করার শক্তি।

ঐ টাকাটা ধার করা হয়েছে আমার শাঁখের করাত, ঘরেও লজ্জা, বাইরেও লজ্জা।

কানুর পীরিতি বলিতে বলিতে
বুকের পাঁজর ফাটে
শঙ্খ বণিকের করাত যেন
আসিতে যাইতে কাটে। (চণ্ডীদাস পদাবলী)

প্রবচনটি **'উভয় সংকট'** অর্থেও ব্যবহৃত।

শিরে সংক্রান্তি—রাশিচক্রের একরাশি থেকে পরবর্তী রাশিতে সূর্যের প্রবেশ-কাল—যখন বাংলা মাস শেষ হয়।

নির্ধারিত সময়ের শেষাংশ।

আমার পরীক্ষা—শিরে সংক্রান্তি, এখন কি আর তোমার চিঠির মুসাবিদা করে দেবার সময় আছে?

তুলনীয়: The eleventh hour.

অনুশীলনী

১। অর্থ লেখো এবং বাক্যে প্রয়োগ করো:

পাঠ্যগত: উলুবনে মুক্তা ছড়ানো, ঘুঁটে পোড়ে গোবর হাসে, জলে কুমীর

ডাঙায় বাঘ, নুন আনতে পানতা ফুরোয়, বরের ঘরের পিসী কনের ঘরের মাসী, ভাঙে তবু মচকায় না, যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, হাতে মারে না ভাতে মারে।

পাঠ্যবহির্ভূত ঃ নাচতে না জানলে উঠান বাঁকা, বামন গেল ঘর তো লাঙল তুলে ধর, উঠন্তি মূল পত্তনে চেনা যায়, কাঁঠালের আমসত্ত্ব, যত গর্জে তত বর্ষে না, ভাগের মা গঙ্গা পায় না, কালনেমির লঙ্কাভাগ।

২। অর্থ বুঝে প্রাসঙ্গিক প্রবাদটি লিখো ঃ

বৃথা অনুনয় বিনয়, আন্দাজের উপর নির্ভর করে কিছু বলা, অপ্রত্যাশিত বিপদ, অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্য, কোনো অবস্থাতেই অভ্যস্ত কাজ ছাড়া যায় না, জ্ঞানী লোকেরাও ভুল করতে পারে, এককাজে দুই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়া, নিষ্ফল কাজ, আসলকথা উত্থাপনের আগে দীর্ঘভূমিকা।

৩। প্রবাদগত অশুদ্ধি সংশোধন কর ঃ

ভাত দিয়ে মাছ ঢাকা, শাঁখের কুড়োল, ধরি মাছ না ছুঁই জল, নোংরা ফেলতে ভাঙা কুলো, অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী, জল আনতে পান্তা ফুরোয়, পরের মাথায় নারকেল ভাঙা।

৪। পাঁচটি প্রবাদ উল্লেখ করো এবং বাক্যে প্রয়োগ করো।

৫। শূন্যস্থান পূরণ করো ঃ

দশের লাঠি একের —। ঠক বাছতে — উজাড়। জলে কুমীর ডাঙায় — ছেড়ে দে — কেঁদে বাঁচি। গেঁয়ো যোগী — পায় না।
